প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

পঞ্চদশ ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড
১৩২২ সাল, কার্ত্তিক—চৈত্র

প্রবাসী কার্য্যালয়
২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

১৫শ ভাগ ২য় খণ্ড,

বিষয়ানুক্রমণিকা।

লেখক ও তাঁহাদের রচনা।

চিত্রানুক্রমণিকা।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।"

১৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩২২

১ম সংখ্যা

পথভোলা

কোন্ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল
আশ্বিনেরি আঙিনায়।
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা
পাগল হাওয়ার গান সে গায়।
মাঠে মাঠে পুলক লাগে
ছায়ানটের নৃত্যরাগে,
শরৎ-রবির সোনার আলো
উদাস হয়ে মিলিয়ে যায়।

কি কথা সে বলতে এল
ভরা ক্ষেতের কানে কানে ?
লুটিয়ে-পড়া কিসের কাঁদন
উঠেছে আজ নবীন ধানে ?
মেঘে অধীর আকাশ কেন,
ডানা-মেলা গরুড় যেন,
পথভোলা এই পথিক এসে
পথের বেদন আনল ধরায় ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ডাক

তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
বলেছে গান গাহিবারে।
ফুলে ফুলে তারায় তারায়
বলেছে সে কোন্ ইসারায়,
দিবস-রাতির মাঝ-কিনারায়
ধূসোর আলোর অন্ধকারে।
গাইনে কেন কি কব তা ;
কেন আমার আকুলতা !
ব্যথার মাঝে লুকায় কথা,
সুর যে হারায় অকূল পারে ॥

তুমি যেতে যেতে গভীর স্রোতে
ডাক দিয়েছ তরী হতে।
ডাক দিয়েছ ঝড়-তুফানে
বোবা মেঘের বজ্রগানে,
ডাক দিয়েছ মরণপানে
শ্রাবণ-রাতের উতল ধারে।
যাইনে কেন জান না কি ?
তোমার পানে তুলে আঁখি
কূলের ঘাটে বসে থাকি
পথ কোথা পাই পারাবারে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিবিধ প্রসঙ্গ

অনাহারে মৃতকল্প বাঙালীর মহত্ত্ব।

দুঃখ দারিদ্র্য মানুষকে কতক পরিমাণে উদ্যোগী ও তৎপর করিয়া তোলে। কিন্তু তাহার গুরু চাপে মানুষের মন দমিয়া যায়, হৃদয়ের সংবৃত্তিগুলি মৃতপ্রায় হইয়া যায়, মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হইয়া আসে। ভারতের এই চিরদারিদ্র্য ও লাগ্নিক দুর্ভিক্ষ ভারতবাসীকে নিরুদ্যম পঙ্গু দুর্ব্বল সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতেছে; কিন্তু সেই সঙ্গে দুর্দ্দশা প্রতিকারের যে অল্প বিস্তর চেষ্টা চারিদিকে কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতেছে তাহা প্রাণের ও আশার লক্ষণ। এই দারুণ দুর্দ্দিনে আমরা বুঝিতেছি যে সবাই আমরা এক মায়ের সন্তান—এখানে ইতর ভদ্র ভেদ নাই; সেবা ও স্বাবলম্বন আমাদের ধর্ম্ম; সহযোগিতা ও সহমর্ম্মিতা আমাদের কর্ত্তব্য।

বাঁকুড়া অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়া কত প্রাণ যে গ্রাস করিতেছে তাহার কতক বিবরণ আমরা গত মাসে প্রকাশ করিয়াছিলাম, কতক বিবরণ এই সংখ্যার শেষের দিকে প্রকাশ করিতেছি। দুর্ভিক্ষপীড়িত, অনশনে মৃতপ্রায় লোকদিগকে অন্ন জোগাইবার চেষ্টা করিতেছেন—রামকৃষ্ণ মিশন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী এবং বাঁকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ মিচেল সাহেব ও তাঁহার সহৃদয় ছাত্রগণ, বাঁকুড়ার মাড়োয়ারী ব্যবসাদারগণ, এবং তথাকার কতকগুলি ভদ্রলোক। ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় স্বয়ং দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে দুইবার গিয়া সেবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন; প্রবাসী-কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে চালের মোট ঘাড়ে বহিয়া লোককে সাহায্য করিয়াছেন;—ইহা যেমন সেবকদের মহত্ত্ব, তেমনি সেবিতদেরও মহত্ত্ব অধিকতর ভাবে এই উপলক্ষ্যে প্রকাশ পাইতেছে;—শ্রীযুক্ত মিচেল সাহেব, বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়কে এক পত্রে লিখিয়াছেন—

All the people in the villages are in distress, but the condition of some is so terrible that unless we help them at once they will die of starvation......Some were absolute skeletons and from some I had to turn my head away......I explained that I had only a small sum of money at my disposal......Only the most needy must ask for tickets. It was fine to see those strong but starving men give the names of the old women and helpless men and children. Not one of them asked for a ticket for themselves, yet some of them had had no food for three days......There is true manliness among these lowly people......If only some one would help them to dig out their poor shallow tank it would give them work (which was the only thing they asked for, for themselves) and it would be a God-send as regards the future. They are fine unselfish fellows......It was the same story in the other villages. The same unselfish spirit prevailed. I found higher caste people there......secretly starving......I noticed a tall thin emaciated Bauri lad looking wistfully on in silence. I asked if he were ill. No, he was not getting enough to eat, but as he was getting something, he had not asked for a ticket, and how much do you think he was getting. One pice per day by cutting grass. Poor lad! my heart bled for him. I gave him a ticket unasked for......I had a loaf of bread with me and as I only required a little I gave the rest to the children. One little chap took his share and immediately broke it up into four pieces, for his mother, two sisters and himself, leaving by far the smallest portion for himself......They are deserving for the utmost we can do The secret suffering is far greater than any of us can imagine. Please help us.

যাহাদিগকে আমরা অস্পৃশ্য ছোটলোক বলি সেই বাউরী-জাতীয় লোকেরা নিজেরা তিন দিন অনাহারে থাকিয়া এবং অনেকে অস্থিচর্ম্মসার হইয়াও ভিক্ষা গ্রহণ করে নাই, কেননা তাহারা খাটিয়া খাইতে পারে, তাহারা কাজেরই প্রার্থী! তাহারা ভিক্ষার টিকিটের জন্য বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, অক্ষমপুরুষ এবং শিশুদের নাম লিখাইয়া দিয়াছে; বালক ঘাস কাটিয়া রোজ এক পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে বলিয়া ভিক্ষার জন্য হাত পাতে নাই; শিশু এক টুকরা পাউরুটি পাইয়া মাতা ও ভগিনীদের জন্য ভাগ রাখিয়া নিজে সব-ছোট খণ্ডটি লইয়াছিল; ইহারা সকলে রোজগারের উপায়হীন হইয়া অনাহারে মরিতেছে, এখনো তাহারা কাজ পাইলে খাটিয়া খাইতে প্রস্তুত আছে। দেশে কি এমন সহৃদয় ধনী কেহ নাই যিনি এই-সমস্ত মহৎপ্রাণ মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে দিয়া কর্ম্ম করাইয়া লইয়া দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ গ্রামের জলাভাব দূর করিয়া দিতে পারেন। অনাহারে মৃতকল্প এই-সব কঙ্কালসার "ছোট"-লোকেরা যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছে তাহার দ্বারা আমাদের বাঙালী জাতির অন্তর্নিহিত সত্ত্ব ও প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া

গিয়াছে—তাহাদের মধ্যে সমস্ত বাঙালীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে! A nation dwells in the cottage—জাতির প্রকৃত পরিচয় চাষী মজুরদেরই মধ্যে। সেখানে আমরা দেখিতেছি—বাঙালী বীর, আত্মত্যাগে বলিষ্ঠ, কর্ম্মে অকুণ্ঠ, আত্মসম্মানবোধে সুপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু এই মহৎ গুণ যে দুঃখদারিদ্র্যের চাপে পিষিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে—ইহার প্রতিকারও বাঙালীকেই অতি শীঘ্র করিতে হইবে। গভর্মেণ্টের তরফ হইতে শ্রীযুক্ত বীটসন বেল বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান পরিদর্শন করিয়া এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা তকাবি ঋণ দাদনের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন। গভর্মেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া বর্দ্ধমান-রাজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ও বীটসন সাহেবের সঙ্গ লইয়াছিলেন। আশা করা যায়, মহারাজাধিরাজ তাঁহার নিরন্ন প্রজাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। শুনা যায়, বাঁকুড়া জেলার প্রায় এগার আনা জমিদারী তাঁহার। গভর্মেণ্ট ও জমিদার উভয়েরই জানা উচিত যে প্রজাকে বাঁচাইয়া শক্ত সমর্থ করিয়া রাখিতে পারিলে তাঁহাদেরই লাভ।

পল্লীর মলমূত্রত্যাগের ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামগুলির অবস্থা কখনোই খুব উন্নত ছিল না; এখন ত ক্রমশই মন্দ হইতেছে। চারিদিকে জঙ্গল, বাড়ীর পাশেই পচা ডোবা সারকুড় আঁস্তাকুড়,—পল্লীগ্রামের সাধারণ দৃশ্য। পল্লীগ্রামের লোকেরা স্বাস্থ্যতত্ত্ব ধনতত্ত্ব ও ভব্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকাতে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এই ব্যাপারটা এমনই কদর্য্য অশোভন যে অশ্রাব্য হইবার ভয়ে কেহই এ বিষয়ে আলোচনা পর্য্যন্ত করেন না। সম্প্রতি মাইশোর একনমিক জার্ণাল এ বিষয়ের খুব স্পষ্ট আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে পল্লীগ্রামের এই যদৃচ্ছ ব্যবস্থায় দেশের স্বাস্থ্য ও অর্থ কিরূপ অপচয় হইতেছে। ঐ পত্রিকার উক্তি মহীশূরের পল্লীসম্বন্ধে হইলেও আমরাও তাহা হইতে ঐ ব্যবস্থার অপকারিতা স্পষ্ট বুঝিতে পারি।

মানুষের যত্রতত্র মলমূত্র-ত্যাগ অশোভন অভব্য অস্বাস্থ্যকর ও অর্থহানিকর। মলমূত্র জমির উৎকৃষ্ট সার; উহা যেখানে-সেখানে পড়িয়া অপচয় হইলে অর্থই নষ্ট হইল ধরিতে হইবে। উদ্ভিদ উৎপন্ন করিয়া জমি নিঃসত্ত্ব হইয়া পড়িলে তাহার খাদ্য পুষ্টি জোগানো উচিত; এবং মানুষ উদ্ভিদ আহারের দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া যাহা ত্যাগ করে তাহা উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য ক্ষেত্রে ফিরাইয়া দেওয়াই তাহার উচিত। পল্লীগ্রামগুলিতে যথোপযুক্ত স্থানে মলমূত্র-ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যে ব্যক্তি সেই মলমূত্র ক্ষেত্রে সাররূপে সঞ্চারিত করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া তুলিতে পারিবেন তিনি দেশের মহাহিত সাধন করিবেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একা মহীশূর-প্রদেশে যে সার নষ্ট হয় তাহার মূল্য আন্দাজ দুই কোটি অর্থাৎ ২০০ লক্ষ টাকা। তবে সমগ্র ভারতের অপচয় একশত কোটি টাকা হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের ন্যায় চিরদুর্ভিক্ষপীড়িত নিরন্ন কৃষিপ্রধান দেশে অত টাকার সার বৃথা অপব্যয় হইতে দেওয়া বুদ্ধিবিবেচনার কার্য্য নহে।

একনমিক জার্ণাল দেখাইয়াছেন যে জাপান চীন প্রভৃতি দেশের পল্লীব্যবস্থা এরূপ নহে: সেখানে প্রত্যেক গৃহস্থ নিজের নিজের পাইখানা রাখে এবং তাহাতেও মল সঞ্চিত হইতে না দিয়া হয় নিজের ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া ফেলে অথবা বিক্রয় করিয়া দ্যায়। আমাদের দেশের লোকেরা মলমূত্রকে অপবিত্র মনে করিয়া স্পর্শ করিতে চাহে না; কিন্তু অস্থানে কোনো বস্তু থাকিলেই তাহা অপবিত্র, উপযুক্ত স্থানে তাহা অপবিত্র নহে। মলমূত্র ভক্ষিত খাদ্যেরই বর্জ্জিত অংশ, তাহা মহাশুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিও সর্ব্বদা অন্ত্রমধ্যে বহন করিয়া ফিরে; উহা অস্থানে পরিত্যক্ত হইয়া গ্রামের বাতাস জল দূষিত করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে থাকিলে উহা নিশ্চয়ই অপবিত্র, কিন্তু উহা যথাস্থানে পরিত্যক্ত ও যথাকার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহা মহৎ কল্যাণের আকর হইয়া উঠে। ভাতডাল পাত্রে করিয়া যখন ভোজ্যরূপে দেওয়া হয় তাহা তখন অতি পবিত্র ব্যাপার; কিন্তু সেই ভাতডাল যদি আমার বিছানায় লেখাপড়ার টেবিলে ছড়াছড়ি যায় তবে সেটা অত্যন্ত অপবিত্র ব্যাপার। ফুলের ন্যায় পবিত্র সুন্দর জিনিস ত নাই; কিন্তু সেই ফুল ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ করিলে সুন্দর বা পবিত্র বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই যথাস্থানে যথোপযুক্ত ভাবে রাখিলে পবিত্র। ইকনমিক জার্ণাল প্রস্তাব করেন যে গ্রামপ্রান্তে পুরুষ ও

স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথক দুইসারি পাইখানা প্রস্তুত করা উচিত, এবং পাইখানার নীচে মল-ধারণের জন্য লম্বা জোল কাটিয়া গর্ত্তের মাটি পাশে ঢিপি করিয়া রাখিতে হইবে; একটা জোল কিছুদিন ব্যবহারের পরে সেই ঢিপির আলগা মাটি দিয়া চাপা দিয়া তাহার নিকটে অপর একটা জোলে পাইখানা সরাইয়া দেওয়া হইবে। প্রকৃতির কারসাজিতে যখন প্রথম জোলের মল মাটি-চাপা থাকিয়া অল্পদিনেই উত্তম সারে পরিণত হইয়া যাইবে তখন তাহা ক্ষেত্রে চারাইয়া দিয়া সেই জোল আবার ব্যবহার করা চলিবে এবং দ্বিতীয় জোল তখন মাটি-চাপা থাকিবে। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে দুটি জোলে বরাবর কাজ চলিলে গ্রামের স্বাস্থ্য অর্থ ভব্যতা স্বচ্ছন্দে রক্ষিত হইতে পারিবে! জাপানে যেমন কাঁচা মলই কৃষকেরা কিনিয়া লইয়া যায় আমাদের দেশে এক্ষণে তেমন ব্যবস্থা চলিবে না; আপাততঃ উপরের লিখিত ব্যবস্থাই অবলম্বনীয়। আমাদের দেশের যে-সব জাতি মল স্পর্শ করা অপবিত্র বা অপমানজনক কাজ মনে করে না—যেমন, মেথর হাড়ি ডোম—তাহারা কালে যখন লেখাপড়া শিখিয়া কিসে কি হয় বুঝিতে পারিবে এবং তখন যদি তাহারা এইদিকে তাহাদের মনোযোগ করে তবে অচিরেই তাহারা দেশের মধ্যে খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিবে; কারণ অনায়াসলভ্য ধনাগমের পথ তাহারা একচেটিয়া করিয়া রাখিবে। এক্ষণে ঐসকল জাতির যাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়া ভালো মন্দ বুঝিতে শিখিয়াছেন তাঁহারা মিথ্যা ভদ্রলোক সাজিয়া না থাকিয়া এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে একসঙ্গে দেশের ও নিজের উপকার করিতে পারিবেন।

জাপানের মতলব।

জাপান পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে নিজের দেশকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে; এখন এশিয়া মহাভূমিতে তাহার সমকক্ষ অপর কোন জাতি নাই। য়ুরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতি ইংরেজ এশিয়াখণ্ডের ভারতবর্ষের অধীশ্বর বলিয়া এশিয়াতে তাহার প্রভাব অত্যধিক; সেই ইংরেজ জাপানের মিত্র। এই সুবিধা পাইয়া জাপান নানাপ্রকারে নিজের জাতীয় স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া লইতেছে। সে ইংরেজ-বন্ধুর শত্রু বলিয়া জার্ম্মানীর অধিকারে এশিয়ায় যতটুকু স্থান ছিল তাহা দখল করিয়া লইয়াছে। প্রথমে বলিয়াছিল চীনের স্থান চীনকে ও অষ্ট্রেলিয়ার সন্নিহিত দ্বীপগুলি অষ্ট্রেলিয়াকে ফেরত দিবে; কিন্তু কাজে তাহা না করিয়া বরং উল্টা চীনের বুকে চাপিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছিল; কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকার চোখ রাঙানিতে চীনের বুকে জোর করিয়া হাঁটুগাড়িতে পারিতেছে না। তাই এখন সে রুশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা করিয়া আপন স্বার্থসিদ্ধি করিবার মতলবে আছে।

এ সম্বন্ধে আমরা বহুকাল হইতে প্রবাসী ও মডার্ণ-রিভিউ-পত্রে আলোচনা করিয়া এইরূপই যে হইবে তাহা বার বার বলিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি জাপানের বিলাতের ও এদেশের বহু সংবাদপত্রে এই কথা সমর্থিত হইতে দেখিতে পাইতেছি।

জাপান ম্যাগাজিনে জাপানী লেখক য়োকোয়ামা Japan helps Russia নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—জাপানীরা বড় উদার প্রকৃতির জাতি, দশ বৎসর আগে রুশিয়াকে সে পরাজিত করিয়াছিল, রুশিয়ার সেই গ্লানি মুছিয়া দিবার জন্য জাপান তাহার সহিত মিত্রতা করিয়া তাহাকে ডাক্তার সৈন্যশুশ্রূষাকারিণী রসদ গোলা বারুদ জোগাইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—জাপানের সমস্ত গোলাবারুদের কারখানা অবিশ্রাম খাটিয়া রুশিয়ার জন্য ৩০ লক্ষ ইয়েনের ধূমবিহীন বারুদ তৈয়ারি করিতেছে, চামড়ার কারখানাগুলি রুশসৈন্যের কার্ত্তুজ-বেল্ট বুটজুতা তৈয়ারি করিতে ব্যস্ত, কাপড়ের কল রুশসৈন্যদের পোষাকের কাপড় বুনিতে লাগিয়া গিয়াছে। জাপানের এই রুশপ্রীতির দুটি কারণ দেখানো হইয়াছে—(১) উভয়ে প্রতিবেশী; একজন পশ্চিমের প্রাচ্যজাতি, অপরজন প্রাচ্যের পাশ্চাত্যজাতি; রুশ শক্তিমান সুতরাং শ্রদ্ধার পাত্র! (২) রুশের সহিত মিত্রতা করাতে রুশ পূর্ব্বসীমান্তের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া সমস্ত সৈন্য পশ্চিমসীমান্তে জড়ো করিয়া জার্ম্মানীকে পরাজিত করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে পারিতেছে। জার্ম্মানীকে পরাজিত করার উপর জাপানের নিজের উন্নতি ও স্বার্থসিদ্ধি নির্ভর করিতেছে, অর্থাৎ কিনা জাপান জার্ম্মানীর যে জায়গাগুলি আত্মসাৎ করিয়াছে তাহা সে আপনার দখলেই রাখিতে চায়, ইংলণ্ড ত তাহার মিত্র

আছেই, এখন রুশকেও হাত করা তাহার নিতান্ত আবশ্যক, সুতরাং রুশের মনস্তুষ্টি করা তাহার এখন প্রধান কাজ।

বিলাতের ফর্টনাইটলী রিভিউ পত্রে East and West a new line of Cleavage নামক প্রবন্ধে জাপানের মতলব বিশদভাবে সমালোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে জাপান সমস্ত এশিয়াকে গ্রাস করিবার কিরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে। কোরিয়া জাপানের করতলগত অধীন রাজ্য; মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে সে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া উঠিয়াছে; চীনেও হাঁটু গাড়িতেছে; ভারতবর্ষ জাপানের মিত্ররাজ্য, এখানে জোর জবরদস্তি চলিবে না, এখানে সে সস্তা মাল পাঠাইয়া ব্যবসাবাণিজ্য দখল করিয়া বসিতেছে। চারিদিকে তাহার এই স্বার্থ বিস্তার ও রক্ষা করা তখনই সম্ভব যতক্ষণ তাহার বল আছে। ইহা বুঝিয়া জাপান সৈন্য ও রণতরীর বহর বাড়াইতে লাগিয়া গিয়াছে। জাপানের আড়াইলক্ষ সৈন্য সর্ব্বদা মজুদ থাকে, সেই সংখ্যা বাড়াইয়া তোলা হইতেছে। এই রণসজ্জা শুধু স্বার্থরক্ষার জন্য নহে, দরকার হইলে আত্ম-বিস্তারের জন্য পরকে আক্রমণ করিবার জন্যও বটে। তাহাদের বাণিজ্যসচিব ব্যারন মাকিনো বলিয়াছেন যে—ইংরেজরা যেমন প্রতীচ্যদেশে সর্ব্বেসর্ব্বা, আমরা তেমনি প্রাচ্যদেশে সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে চাই। যেসব জাতির সামাজিক জীবন অনুন্নত ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর আদর্শ খাটো তাহাদের সঙ্গে বাণিজ্য করিতে পারিলে যথেষ্ট লাভ—সেরূপ জাতি চীন ও ভারতবাসী। জাপানের বাড়তি লোকের বাসের জন্য উপযুক্ত উপনিবেশস্থান ও ধনাগমের জন্য উপযুক্ত বাজার আবশ্যক জাপান সেই দুই মতলবেই যা কিছু করিবার করিতেছে। জাপানের এই-সব কাজে বাধা পাইবার ভয় একমাত্র রুশিয়ার নিকটে। এইজন্য জাপান রুশিয়াকে হাত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিতেছে। এখন প্রশ্ন এই দাঁড়াইতেছে যে যেসব রাজ্য নিজে শক্তিশালী নয় অথচ এখন পর্য্যন্ত কোনো মতে স্বাধীনতা বাঁচাইয়া টিকিয়া আছে—যেমন, তিব্বত, বহির্ভারত, হিন্দু-চীন প্রভৃতি—তাহারা প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কোন্ কবলে পড়িবে।

পাইওনিয়ারের তোকিওস্থ সংবাদদাতা এইসব কথাই সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন—বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয় জাপানের স্বার্থের জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত। এজন্য জাপানের সমস্ত লোক রুশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

মর্নিং পোষ্টের তোকিওস্থ সংবাদদাতা বলিতেছেন—জাপানের লোকের বিশ্বাস, জাপান যে চীনকে দখল করিয়া বসিতে পারিল না তাহা ইংরেজ, ইংলণ্ড ও আমেরিকার জন্য। এই বাধা অগ্রাহ্য করিতে পারার জন্য তাহার রুশের সহিত মিত্রতা করা নিতান্তই আবশ্যক বোধ হইতেছে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে সৈন্য ও বহর বৃদ্ধি চলিতেছে। জাপান জার্ম্মানীর শিষ্য। সে মন্ত্রে শুনিয়াছিল এবং দৃষ্টান্তে দেখিতেছে যে—বলং বলং বাহুবলং, যাহার বল যথেষ্ট আছে পাঁচজনে তাহাকে খাতির করে, সমঝিয়া চলে। প্রিন্স ওকুমা জাপানের প্রধান মন্ত্রী এবং জাপানের শান্তিসমিতির সভাপতি, তিনিই এই কথা প্রচার করিতেছেন। জাপান নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে এবং ৮ ড্রেডনট বা কুছ-পরোয়া-নেহি যুদ্ধজাহাজ, ৮ যুদ্ধ ক্রুইজার বা টহলদার জাহাজ, ৬ আড়কাটি জাহাজ, ৬৪ বিনাশক জাহাজ, ২৪ অন্তর্জলী জাহাজ, উড়ো জাহাজ, জল-আকাশ-চারী জাহাজ, সৈন্য-ও-রসদবাহী জাহাজ তৈয়ারি করিতে লাগিয়া গিয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার কোনো জাতি অপেক্ষা জাপান খাটো হইয়া থাকিতে চাহে না—তাহা হইলে তাহারা জাপানের কার্য্যের আর প্রতিবাদ করিতেও সাহস করিবে না।

জাপানের এই-সমস্ত মতলব ও আয়োজন হইতে ভারতবর্ষেরও ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদের স্বল্পাবশিষ্ট শিল্প জাপানের অত্যাচারে ও প্রতিযোগিতায় একেবারে নষ্ট হইয়া গেলে দেশে অধিকতর অন্নের অভাব ঘটিবে। ইহারই মধ্যে বোম্বাইএর কাপড়ের কলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। জাপানী সস্তা গেঞ্জি চিরুণী সাবান আয়না বুরুশ এসেন্স কাচের বাসন আলো প্রভৃতিতে দেশ একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে; আর অল্পদিনে ভারতবাসীর সকলপ্রকার আবশ্যকদ্রব্য জাপানীরা প্রস্তুত করিয়া আনিয়া ফেলিবে। সময়

থাকিতে গভর্মেণ্টের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। আমদানী শুল্ক চড়া করিয়া, দেশের মধ্যে দেশীয় মালের রেলভাড়া যথাসম্ভব কম করিয়া, দেশীয় শিল্প ও কারখানার উৎসাহ দিয়া পৃষ্ঠপোষণ করিয়া, আদর্শ কারখানা খুলিয়া, দেশী লোককে শিক্ষা ও সুযোগ দিয়া দেশীয় শিল্প বলিষ্ঠ ও উন্নত করিয়া তোলা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। সঙ্গে-সঙ্গে দেশীয় সকল প্রদেশের লোককে সৈন্যবিভাগে গ্রহণ করিয়া ও সেনাপতি পর্য্যন্ত হইবার অধিকার দিয়া দেশের আন্তরিক বল বৃদ্ধি করিয়া তোলা উচিত। এরূপ করিলে য়ুরোপের যুদ্ধ সত্বর শেষ করিতে পারা যাইবে এবং সাম্রাজ্যের বলাধান ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাও খুব সহজ হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতবাসীর আনুগত্য ও ত্যাগস্বীকার দেখিবার পরও ভারতবাসীকে অবিশ্বাস করিয়া বা অবহেলা করিয়া দুর্ব্বল পঙ্গু অসমর্থ করিয়া রাখা গভর্মেণ্টের উচিত নহে। লর্ড হার্ডিং, এবং লর্ড কারমাইকেল প্রভৃতি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা একটু মনোযোগী হইলে ভারতের অন্নসঙ্কট দারিদ্র্যসমস্যা ও বীরত্বের অভাবের অখ্যাতি সহজেই দূর হইতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ান্স কলেজ।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের এক অধিবেশনে বলেন যে ভারতগভর্মেণ্টের নিকট প্রত্যাশিত সাহায্য না পাওয়াতে সায়ান্স কলেজের কাজ আরম্ভ করিতে পারা যাইতেছে না। অমনি কালা গোরা অনেক সিনেটার আতঙ্কে অস্থির হইয়া ঘোষণা করিলেন—দোহাই ধর্ম্মাবতার, সার আশুতোষের কথার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই! গভর্মেণ্ট সাহায্য করিতেছেন না এমন কথা মুখে আনা?—কথাটা কিন্তু সত্যই, যে, টাকার অভাবে সার তারকনাথ ও সার রাসবিহারীর দানের বৃক্ষ নিষ্ফল হইয়া আছে। গভর্মেণ্টের উচিত ইহাকে ফলবান করিয়া তোলা। যাঁহাদের দানে সায়ান্স কলেজের উৎপত্তি তাঁহাদের মধ্যে জীবিত সার রাসবিহারী বা সেইরূপ বদান্য কোনো ধনীর দানে উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে পারা আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু তাহা যে-পরিমাণে আমাদের দেশের লোকের গৌরবের কারণ হইবে সেই পরিমাণে তাহাতে গভর্মেণ্টের নিন্দা ও কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে। সামান্য টাকা বাঁচাইতে গিয়া গবর্ণমেণ্টের এরূপ নিন্দাভাজন হওয়ায় কোনই লাভ নাই।

রসায়ন-বিভাগে অল্প কয়েকটি ছাত্র লইয়া সম্প্রতি কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

নেশাখোরের সংখ্যাবৃদ্ধি।

ভারতবর্ষ ধীরমন্থর গতিতে শিক্ষায় উন্নত হইতেছে ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিতেছে; কিন্তু এক বিষয়ে তাহার উন্নতি অতি আশ্চর্য্যজনক দ্রুত—সেটা নেশা করাতে। ১৮৭৪-৭৫ সালে আবকারী-বিভাগের আয় ছিল ১৫,৬১,০০০ পাউণ্ড; ১৯১১-১২ সালে হইয়াছে ৭২,৫০,০০০ পাউণ্ড; অর্থাৎ ৩৬ বৎসরে চারগুণ! চমৎকার!

সাঁতার ও দৌড়ে ভারতবাসীর কৃতিত্ব।

য়ুরোপের সমাজতত্ত্বজ্ঞ ও মনস্তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এবং আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা মানুষের খেলার উপকারিতা ঘোষণা করিতেছেন। খেলা মানুষের মনকে পবিত্র ও সুস্থ করে, বলিষ্ঠ ও তৎপর করে; তাহাতে মানুষ কাজের অধিকতর উপযোগী হয়। ভারতবাসী বড় ভারিক্কি জাত, খেলা মনে করে ছেবলামি, লঘুতা; তাই তাহার অঙ্গে স্ফূর্ত্তি নাই, অন্তরে আনন্দ নাই, কর্ম্মে উদ্যোগ নাই, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা ও অধিকক্ষণ লাগিয়া থাকিবার শক্তি নাই। য়ুরোপের লোকেরা ছেলে হইতে বুড়ো পর্য্যন্ত খেলে খুব, খাটেও খুব। তাহাদের দেখাদেখি এখন আমাদের দেশেও খেলার প্রচলন হইতেছে। প্রতিযোগিতা সকল কাজে মানুষের আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়াইয়া তোলে; খেলার মধ্যেও তাই প্রতিযোগিতা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন কালে গ্রীসে ম্যারাথনে সমস্ত দেশের খেলোয়াড়েরা সমবেত হইয়া বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতা করিয়া আপনাদের কৃতিত্ব দেখাইয়া পুরস্কৃত হইত। সেই ধারা য়ুরোপে আজও চলিতেছে; যে, যে-খেলা ভালো খেলিতে পারে সে প্রতিযোগিতায় সকলকে হারাইয়া প্রথমে দেশের মধ্যে প্রধান হয়; পরে ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে সে সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি

সাঁতারে প্রথম শ্রীযুক্ত ম. ল. মুখোপাধ্যায়।

Champion হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে ঘুষির লড়াই, দৌড়, সাঁতার, বাচ, ক্রিকেট, ফুটবল, গোল্‌ফ, শতরঞ্জ প্রভৃতি সকল খেলারই World Champion বা জগৎজয়ী বীর এক-একজন আছে। আমাদের দেশ এখনো জগৎসভায় স্থান না পাইলেও, ক্রমশঃ নিজের দেশের মধ্যেই কৃতিত্ব দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা আনন্দ ও আশার কথা। সম্প্রতি কলিকাতায় সাঁতারের প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে—তাহাতে য়ুরোপীয় ও ভারতবাসী উভয়েই যোগ দিয়াছিলেন; আধ মাইল সাঁতার খেলায় আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের শ্রীযুক্ত ম, ল, মুখোপাধ্যায় এ বৎসর প্রথম হইয়া পুরস্কার পাইয়াছেন এবং বিজয়ী Champion বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। পুনাতে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত স, ব, দত্তর ২ ঘণ্টা ৫৯ মিনিটে ২১ মাইল পথ দৌড়িয়া গিয়াছিলেন; ম্যারাথনের সার্ব্বভৌম দৌড়ে এ পর্য্যন্ত যত লোক দৌড়িয়াছে তাহার মধ্যে মাত্র একজনের দৌড় ইঁহার চেয়ে বেশী। এখনও পর্য্যায়ক্রমে পাশ্চাত্য দেশ-সকলের কোথাও না কোথাও ম্যারাথন রেস্ বা প্রতিযোগিতা হয়; তাহাতে ভারতবাসীর যোগ দিয়া জগতের সমক্ষে প্রমাণ করা উচিত যে ভারতবাসী অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল নহে; ভারতবাসী সকল প্রকার বলের ও কৌশলের কাজই দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু অনাহারক্লিষ্ট ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বলিয়া আমাদের প্রাণশক্তি অল্প, দম অল্প। অনেক পুরুষ ধরিয়া বাল্যপিতৃত্ব ও বাল্যমাতৃত্বও আমাদিগকে হীনবল করিয়াছে। বলহীনতার এই-সকল এবং আরও অনেক কারণের প্রতিকার অবিলম্বে আমাদের করা কর্ত্তব্য।

পরলোকগত শ্রীযুক্ত কেয়ার হার্ডি।

শ্রীযুক্ত কেয়ার হার্ডি বিলাতের মজুর-দলের নেতা ও পার্লামেণ্টে তাহাদের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি এককালে নিজেও মজুর ছিলেন; সেইজন্য তিনি নিজের অধ্যবসায় ও চরিত্রের বলে বড় হইয়াও দরিদ্র উৎপীড়িত কর্ম্মভারে প্রপীড়িত লোকদিগের বন্ধু ছিলেন; সে লোক তাঁহার স্বদেশী বা বিদেশী, গোরা বা কালা; এ বিচার তাঁহার ছিল না; তিনি মনুষ্যত্বের সমাদর করিতেন, স্বজাতি ও বিদেশী সকলের জন্য স্বাধীনতা ভালো বাসিতেন। বঙ্গদেশ যখন বঙ্গবিচ্ছেদের বেদনায় জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় তিনি ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন; সেই সময় বাঙালীদের দৃঢ়তা, নির্ভয় স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া তিনি ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া দেশে ফিরেন। ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতারা ভারতবর্ষকে চিরকাল নাবালক করিয়া তাঁহাদের হাত-তোলা দয়ার দানের উপর রাখিতে চাহেন; ভারত-শাসনের কার্য্যে ভারতবাসীকে অধিকার দিতে চাহেন না, তাহার কারণ তাঁহারা এই দেখান যে ভারতবাসী অক্ষম অশিক্ষিত ও অনুপযুক্ত। শ্রীযুক্ত কেয়ার হার্ডি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে গভর্মেণ্টের কর্ত্তব্য প্রজাকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা; তাহা না করিয়া, যে প্রাচীন জাতি সভ্যতায়

শ্রীযুক্ত কেয়ার হার্ডি।

সার জেম্‌স্ মারে।

সকলের অগ্রগামী, যাহারা এতকাল নিজের দেশ নিজেরা শাসন করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে অক্ষম বলিয়া প্রতিপন্ন করাতে ভারতবাসীর মন বিরক্ত হইয়া উঠে—

Our whole system of Government in India rests upon the assumption that its people are either unfit or unworthy to be trusted even with the semblance of self-Government. It is that which galls the mind and sears the heart of this cultured and refined people.

তিনি সেই অবধি ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু হইয়া ভারতের অভাব অভিযোগ লইয়া পার্লামেণ্টে আলোচনা করিতেন। এই ভারতমিত্রের মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত। ইনি বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরেজের যোগ দেওয়ার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন।

শ্রেষ্ঠ অভিধানিকের তিরোধান।

অক্‌সফর্ড হইতে প্রকাশিত এখনও অসম্পূর্ণ ও অতি বৃহৎ অত্যুৎকৃষ্ট New English Dictionary সঙ্কলন-কর্ত্তা সার জেম্‌স্ মারের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি অদ্ভুতকর্ম্মা অসাধারণ ধৈর্য্যশীল ও অধ্যবসায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার অভিধান সঙ্কলনের ইতিহাস হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে, অভিধান কেমন করিয়া সঙ্কলন করিতে হয় এবং তাঁহার সঙ্কলিত অভিধান কিরূপ উপাদেয় ও নির্ভরযোগ্য হইয়াছে।

ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭৯ সালে) প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক স্কীট ও ডাক্তার ফার্ণিভালের সহযোগে এই কর্ম্মের সূত্রপাত করেন; সহকারীদের তিরোধানেও প্রধান কর্ম্মীর উৎসাহ কমে নাই—৭৮ বৎসর বয়সেও তিনি দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। সপ্তাহে তিনি ৯০ ঘণ্টা করিয়া খাটিতেন; এক ক্রিয়া-সূচক to কথাটির ইতিহাস লিখিতে তাঁহার দুই মাস লাগিয়াছিল। ফাইললজিক্যাল সোসাইটি অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বের সভা যে শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন; সেই শব্দগুলিকে বর্ণমালার অনুক্রমে সাজাইয়া লইতে তিন বৎসর লাগিয়াছিল; এক-একটি শব্দ এক-একটি কাগজের টুকরায় লেখা হইতেছিল—সেই টুকরাগুলির ওজন হইয়াছিল ৫৬ মণ। তাঁহার আহ্বানে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ৮০০ পাঠক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিভিন্ন বই পড়িয়া শব্দের ব্যবহারের

পরিচায়ক ৫০ লক্ষ গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন ; ১৫০০ সাল হইতে ইংরেজিতে যত বই প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সমস্তই পড়া হইয়াছিল, একখানিও বাদ পড়ে নাই ; তার পরের সমস্ত প্রধান প্রধান বই পড়া হইয়াছিল। এত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক শব্দের ইতিহাস ও উৎপত্তি ধরা পড়ে নাই বলিয়া তাঁরে স্বীকার করিয়াছেন।

ঢাকার শিক্ষাসম্বন্ধে সার্কুলার।

ঢাকা ডিভিজনের স্কুল-ইন্সপেক্টার টার্ণার সাহেব স্কুলের হেডমাষ্টারদিগকে সার্কুলার পাঠাইয়া জানিতে চাহিয়াছেন, যে, ঐ প্রদেশে লোকের উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা কতদূর জন্মিয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্ম শ্রীযুক্ত ব ক বসু, আই-সি-এস, বিশেষ ভাবে শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন ; তিনি নিম্নলিখিত তথ্য-গুলি চান—(১) যাহারা অশিক্ষিত বা সেকেলে ধরণের তাহারা তাহাদের সন্তানদিগকে কি পরিমাণে স্কুলে দিতেছে, (২) উহারা ছেলেদিগকে স্কুলে পড়াইয়া কোন্ কাজে লাগাইতেছে, (৩) স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের পিতাদের মধ্যে কতজন এণ্ট্রান্স ম্যাট্রিকুলেশন বা উচ্চতর পরীক্ষায় পাশ, (৪) কতজন নিরক্ষর, (৫) ছাত্রদের পিতাদের সামাজিক অবস্থা ও প্রতিপত্তি কিরূপ—(ক) কতজন গভর্মেণ্টের চাকর, উকিল ডাক্তার শিক্ষক বা এমনিতর শিক্ষা-সাপেক্ষ পেশা অবলম্বন করিয়াছে, (খ) কতজন কেরানী, (গ) কতজন ব্যবসাদার, (ঘ) কতজন জমির উপস্বত্বভোগী—যেমন জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার, (ঙ) কতজন দোকানদার, (চ) কতজন কারিগর, (ছ) কতজন চাষী, (জ) কতজন বা অন্যবিধ। (৬) যে-সকল ছাত্র গত বৎসর প্রথম শ্রেণীতে ছিল তাহাদের কতজন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে, কতজন কলেজে পড়িতেছে, বাকি যাহারা তাহারা কি করিতেছে ; যাহারা ফেল হইয়াছে তাহাদের কতজন আবার পড়িতেছে, বাকি যাহারা তাহারা কিকরিতেছে।

এই তথ্যসংগ্রহের চেষ্টায় আমরা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি ; কারণ পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ কোন কোন নিয়ম চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, যাহার ফলে বিস্তর ছাত্রের ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান তথ্য-সংগ্রহ-চেষ্টার ফলে উচ্চশিক্ষার বা শিক্ষা বিস্তারের পথে কোনোরূপ নূতন বাধা উপস্থিত না হইলেই মঙ্গল। এই তথ্য সংগ্রহ করিয়া শিক্ষার উন্নততর সুবন্দোবস্তও হইতে পারে ; এবং গভর্মেণ্টের তাহাই করা উচিত, এবং সেই-রূপই হইবে আশা করিতে পারি কি ?

ছোট ছেলেকে গহনা পরানো।

ছোট ছেলেকে আদর করিয়া গহনা-পরানো আমাদের দেশের একটা কু-প্রথা। ইহাতে ধনলোভী তস্করদিগকে প্রলুব্ধ করা হয় এবং তাহার ফলে গহনার সঙ্গে-সঙ্গে শিশুর প্রাণ পর্য্যন্ত যায়। আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট মেষ্টন সাহেব এই কু-প্রথা সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এইরূপ করিতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিয়া-ছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে মীরাট জেলায় ছয় বৎসরের একটি জাঠ-বালককে ১২৲ টাকা দামের গহনার জন্য চোরে খুন করিয়াছিল ; এরূপ দৃষ্টান্ত তিনি আরও দেখাইয়াছেন। সাধারণের এ বিষয়ে সতর্ক হইয়া শিশুদিগকে নিরাভরণ রাখাই উচিত।

দেশী ফটোগ্রাফী সরঞ্জামের কারবার।

শ্রীযুক্ত সহস্রবুদ্ধি নামে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট বিলাতে গিয়া ম্যাঞ্চেষ্টার টেক্‌নোলজিক্যাল ইনস্‌টিটিউট হইতে ফটো-মেকানিক্স বিষয়ে অনার্স কোর্সে প্রথম পুরস্কার পাইয়া পাশ হন এবং লণ্ডনের পলিটেক্‌নিক ল্যাবরেটারীতে এক বৎসর কাজ করেন। ভারতে ফিরিয়া পুনার ফার্গুসান কলেজের ল্যাবরেটারীতে তিনি দেশের আলো ও তাপের সম্পর্কে ফটোগ্রাফীর অবস্থা পর্য্যালোচ-নায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এক্ষণে পুনায় কারখানা করিয়া ফটোগ্রাফের শুষ্কপ্লেট ও ব্রোমাইড কাগজ প্রস্তুত করিতে-ছেন। তিনি ব্যবহৃত নেগেটিভের কাচগুলিকে পুনরায় শুষ্কপ্লেটে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারেন। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর অনেক লক্ষ টাকার ফটোগ্রাফী সরঞ্জাম বিদেশ হইতে আমদানী হয় ; তাহার কিয়দংশ টাকা দেশে থাকিলে দেশেরই অন্নসমস্যা মিটে। সুতরাং সকলের উচিত এই নব উদ্যমের যথাসাধ্য পৃষ্ঠপোষণ করা।

শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন।

আমাদের দেশ যে শিক্ষায় জগতের সকল সভ্য দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে তাহা বলা পুনরুক্তি মাত্র। এক লক্ষ লোকের মধ্যে কোন্ দেশের কত লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে—

আমেরিকার যুক্তরাজ্য	২৭৯·৯
সুইজারল্যাণ্ড	২০০·৮
স্কটল্যাণ্ড	১৭৮·৭
ফ্রান্স	১০৬·৭
ওএল্‌স্	১০০·২
ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ	৮৬·২
স্পেন	৮৫·৯
অষ্ট্রীয়া	৮২·৭
জার্ম্মানী	৭৬·৬
ইংলণ্ড	৭৩·৫
আয়ারল্যাণ্ড	৭৩·১
নরওয়ে	৭০·৭
ফিনল্যাণ্ড	৭৭·০
সুইডেন	৭০·০
ইটালী	৬৮·৭
বেলজিয়ম	৬৪·৮
হল্যাণ্ড	৬২·৭
জাপান	৬২·৩
হাঙ্গেরী	৫০·৩
আমেরিকার নিগ্রো	৪৫·৫
মেক্সিকো	৩৩·১
পর্টুগাল	২৩·৩
রুশিয়া	২২·১
ভারতবর্ষ	১০·৪

এই অবস্থায় ভারতবর্ষের শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে কোনো প্রচেষ্টা ও যে-কোনো লোকের দান স্বাগত ও প্রশংসার যোগ্য। সম্প্রতি বড়লাটের সভা হইতে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে; কোনোরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় আমাদের মনঃপূত নহে; তবে বিদ্যালয় যদি যথার্থ বিদ্যা দিয়া কতকগুলি বেশী লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারে তবে সাম্প্রদায়িকতা আপনি ঘুচিয়া যাইবে—কারণ কুসংস্কার বা সাম্প্রদায়িকতা ও শিক্ষা আলোক-অন্ধকারের ন্যায় একসঙ্গে থাকিতে পারে না এবং প্রকৃত হিন্দুধর্ম অতি মহৎ উচ্চ ধর্ম, তাহার প্রকৃত শিক্ষায় সঙ্কীর্ণতা মনে জন্মিতে পারে না; হিন্দুধর্ম মানে কতকগুলি আচার বা অনুষ্ঠান নহে, জ্ঞানমূলক স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র তাহার মধ্যে প্রচুর প্রসারিত আছে; হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈন ও শিখধর্ম শিক্ষারও ব্যবস্থা হইতে পারিবে—উহার একটি নিরীশ্বর- ও অপরটি একেশ্বর-বাদী; সুতরাং হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট উদার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইবে আশা করা যাইতে পারে। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের কতকগুলি লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারিবে বলিয়া আমরা উহাকে অভিনন্দন করিতেছি।

বড়োদার মহারাণী স্বামীর সহধর্ম্মিণী—তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য দেড়লক্ষ টাকা, বড়োদা চিম্নাবাঈ উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৬ হাজার টাকা, ও দিল্লির স্ত্রী-চিকিৎসাবিদ্যালয়ে ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

মহীশূরে বৎসরে ৭৮ হাজার টাকা বেশী ব্যয় করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে; বর্ত্তমান পাঠশালাগুলির উন্নতির জন্য ১৭ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

কাশ্মীরের মহারাজা বলিয়াছেন যে, আমার বাসনা যেন দেশের প্রত্যেক বালক অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়া উত্তম কারিগর, ব্যবসাদার, চাষী, দেশসেবক ও রাজকর্ম্ম-চারী হইতে পারে। তাঁহার ইচ্ছা ফলবতী হউক, এবং স্ত্রীলোকও যে রাজ্যের প্রজা এবং অংশ সে দিকেও যেন তাঁহার দৃষ্টি পড়ে।

রাণাঘাট মহেশগঞ্জের জমিদার পরলোকগত বিপ্রদাস পালচৌধুরী মহাশয় তাঁহার উইলে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার সম্পত্তির সিকি আয় নদীয়া জেলার শিক্ষা ও হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। ঐ টাকা হইতে তাঁহার জমিদারীর মধ্যে তাঁহার প্রজাদের বালকবালিকাদিগের জন্য পাঠশালা এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য কৃষ্ণনগর সহরে একটি টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার কিছু ঋণ আছে; সেই ঋণ শোধ হইয়া গেলে এই দানের পরিমাণ অনেক টাকা হইবে। নদীয়া যমশেরপুরের জমিদার ও হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয়

এই কার্য্যের ট্রাষ্টি হইয়াছেন; আশা করি, তাঁহার কর্তৃত্বে এই কার্য্য অচির সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। বিপ্রদাস বাবু আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন; অপর জমিদারেরা এই পথে চলিলে দেশ অচিরে শিক্ষিত হইয়া উঠিতে পারে—এবং শিক্ষালাভ মানেই অশেষ দুর্গতির নাশ, অত্যাচার হইতে অব্যাহতি! "এ নহে স্বপন, এ নহে কাহিনী, আসিবে সেদিন আসিবে।"

সাম্রাজ্য-সভায় ভারতের স্থান।

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য বহু বিস্তৃত। তাহার অন্তর্গত যত স্ব শাসক দেশ আছে, ইংলণ্ডের সহিত তাহাদের সম্পর্ক মাতা-কন্যার; সে-দিন যে বোয়ারদেশ ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও ইংলণ্ডের স্নেহভাজন; তাহাদের দাবী আবদার ইংলণ্ড গ্রাহ্য করিয়া চলেন। ভারতবর্ষও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত; কিন্তু ইহার সম্পর্ক প্রভুভৃত্যের—কারণ ভারতবর্ষ Dependency বা অধীন দেশ; যদিও ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় ইংলণ্ডের হিতকর শাসন মানিয়া লইয়াছিল, তথাপি তাহাকে সমানের বা প্রীতির মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। সেই অধিকার লাভ করাই ভারতবাসীর মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই মর্য্যাদা লাভ করিতে হইলে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিতে হইবে—নিজের ভাগ্য পরের হাতে সঁপিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না—নিজের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা তাহার নিজের হাতেই থাকা চাই। এইজন্য কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ভারতবাসী নানা প্রকারে স্বায়ত্তশাসনের দাবী করিয়া আসিতেছে। ইংরেজ রাজভৃত্যেরা এই বলিয়া ঐ দাবী এ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছেন যে, ভারতবাসী অশিক্ষিত, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভে অযোগ্য। এই অশিক্ষার অখ্যাতি দূর করিবার জন্য মহামতি গোখলে সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; গভর্মেণ্ট তাহা কিন্তু মঞ্জুর করিলেন না। তারপর এই সর্ব্বগ্রাসী মহাসমর আরম্ভ হইল। অনাদৃত ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হিতের জন্য অকাতরে ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে—এক্ষণে ভারতবর্ষের কদর ইংলণ্ড ও অবজ্ঞাকারী ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি কতক বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু এদেশ-প্রবাসী ইংরেজরা একটা ধুয়া তুলিয়াছে যে, এই যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ আপনার দাবী করিয়া ইংলণ্ডকে বিব্রত করিয়া তুলিলে অন্যায় করিবে, যুদ্ধশেষের প্রতীক্ষা করিয়া থাকুক, খুদ-কুঁড়া কিছু বকশিশ মিলিয়া যাইবে! আমাদের অতিসাবধান নেতারা সেই কথাই মানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—কি ভিক্ষা মিলে দেখা যাক! আমরা চুপ করিয়া আছি, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপর অঙ্গগুলি ত চুপ করিয়া নাই—খাস ইংলণ্ডে ও উপনিবেশে সকলেই আলোচনা করিতেছে, যুদ্ধশেষে কে কি অধিকার পাইবে। সকলেই আপন-আপন দাবী পেশ করিয়া রাখিতেছে। কেবল ভারতবর্ষই কি চুপ করিয়া থাকিবে? যুদ্ধশেষে বিজয়ী রাজা যখন প্রতিদানে পারিতোষিক বিতরণ করিবেন, তখন অপর সকলে প্রার্থিত কাম্য ধন লাভ করিয়া হৃষ্ট মনে ধনী হইয়া ঘরে ফিরিবে, আর ভারতবর্ষ কি চাহে তাহা না জানিয়া রাজা যে অনুগ্রহ-দান দিবেন তাহাতে ভারতের চিত্ত ভরিবে কি? সেইজন্য আবশ্যক হইয়াছে আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিব—আমরা যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গ, আমরা সুস্থ সবল স্বায়ত্ত থাকিতে চাই; তাহাতে অঙ্গের ও অঙ্গীর উভয়েরই কল্যাণ; অসুস্থ পঙ্গু জড় অঙ্গ বহিয়া কোনো অঙ্গী আরামে সুস্থ থাকিতে পারে না। অতএব আমাদের স্বায়ত্তশাসন চাই; আমাদের আপনার ঘরকন্না আমরা নিজেরা চালাইতে চাই। আমরা ইহা বকশিশ বলিয়া চাই না, ন্যায্য অধিকার বলিয়া চাই; বকশিশ চাওয়া এবং লওয়া সম্মানের বিষয় নয়।

সম্প্রতি বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত মহম্মদ সাফী মহোদয় প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্মিলন-সভায় ভারতবর্ষের স্থান হোক। মহামান্য লর্ড হার্ডিং ভারতবর্ষের বহু হিতকর কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; তিনি এই প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং সম্রাটের মন্ত্রীসভার অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়াছেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত সাফীর প্রস্তাব সমর্থনের প্রসঙ্গে এই ব্যবস্থা যে ফলে কিরূপ ভুয়া অন্তঃসারশূন্য হইবে তাহা দেখাইয়াছিলেন—ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-সম্মিলন-সভায় ইংলণ্ডের প্রতিনিধিরূপে

কোন কোন মন্ত্রী এবং উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিরূপে তাহাদের মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকেন; ভারতবর্ষের দাবী গ্রাহ্য হইলে ভারতের পক্ষ হইতে শাসক সম্প্রদায়ের কেহ, সম্ভবত ইংলণ্ডবাসী ভারতসচিব, উপস্থিত থাকিবেন; উপনিবেশের শাসনকর্ত্তারা স্বজাতীয় এবং দেশের লোকেরই নির্ব্বাচিত, তাহাদের সুখদুঃখের অংশীদার; কিন্তু ভারতের শাসনকর্ত্তারা ভারতবর্ষের কেহ নন, ভারতের প্রীতি অপ্রীতি তাঁহাদের কাছে তুল্যমূল্য, ভারতের প্রতি দরদ তাঁহাদের অল্প; এ অবস্থায় ভারতের উপকার হইবে সামান্যই; এখন সমস্ত উপনিবেশের কর্ত্তারা উপনিবেশের দাবী দাওয়া আলোচনা করিতে ব্যস্ত, কিন্তু ভারতসচিব একেবারে উদাসীন ও নির্বাক হইয়া নিশ্চিন্ত আছেন; যাহাই হোক দাবীটা মঞ্জুর হইয়া থাক; কালে যখন ভারতের রাজকর্ম্মচারীরা ভারতবাসীর নির্ব্বাচিত লোক হইবে তখন আমাদের সুবিধা হইতেও পারে।

যেদিক দিয়াই দেখা যাক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার না পাইলে ভারতবর্ষের ভদ্রস্থ নাই; সর্ব্বাগ্রে তাহার স্বায়ত্তশাসন পাওয়া দরকার।

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব।

বিহার-প্রবাসী শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এস্‌সী, এবার বিহার গবর্ণমেণ্টের সরকারী বৃত্তি পাইয়া শিক্ষা সমাপনের জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। ইনি ভাগলপুরের সব্-জজ্ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র।

বাঁকীপুরের শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দে এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এস্‌সী পরীক্ষায় বিশুদ্ধ গণিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব আইন-অধ্যাপক ও পাটনার তাৎকালীন প্রধান উকীল পরলোকগত নবীনচন্দ্র দে মহাশয়ের পুত্র।

বঙ্গে সিবিলিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি।

ভারত-সচিব বাংলাদেশে আরও আটজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৪ জন বিচারকের কাজ করিবেন, এবং ৪ জন সেট্‌লমেণ্টের কাজ করিবেন। আটটি মোটা বেতনের চাকরীর মধ্যে ৭টি সিবিল সার্বিসের লোকেরা পাইবেন, এবং কেবল একটি মাত্র প্রাদেশিক সার্বিসের লোকে পাইবেন। বাংলা দেশে এমন বিস্তর উকীল, মুন্সেফ, সব-জজ আছেন, যাঁহারা সিবিলিয়ানদের চেয়ে আইন ভাল জানেন, এবং জজের কাজ তাঁদের চেয়ে ভাল করিতে পারেন। ডেপুটী-কালেকটরদের মধ্যেও এরূপ লোক অনেক আছেন, যাঁহারা সেট্‌ল্‌মেণ্টের কাজ সিবিলিয়ানদের চেয়ে ভাল করিয়া করিতে পারেন। অতিরিক্ত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইয়া থাকিলে এই-সকল দেশী লোককে গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত করা উচিত ছিল। কারণ, (১) বাংলা দেশের কাজে বাঙ্গালীরই দাবী আগে; (২) বাঙ্গালীর দ্বারা বিচারের ও সেট্‌লমেণ্টের কাজ ভাল হইত; এবং (৩) বাঙ্গালী নিযুক্ত করিলে খরচ কিছু কম হইত।

পব্লিক সার্ভিস্ কমিশনের রিপোর্টে কমিশনারেরা দেশী লোকদিগকে কি অনুপাতে চাকরী দিতে বলিয়াছেন, তাহা জানা যায় নাই। এ অবস্থায় সাত সাত জন সিবিলিয়ানের নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া তাহার সঙ্গে কেবল এক জন মাত্র বাঙ্গালীকে চাকরী দিবার বন্দোবস্ত করা উচিত হয় নাই। অথবা হয় ত ভারতসচিব, কমিশনের রিপোর্ট দেখিয়াই উচিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। কারণ রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে; কেবল প্রকাশিত হইতে বাকী আছে।

যখন বাংলার কয়েকটি জেলাকে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হয়, তখন দেশের লোকেরা বলিয়াছিল যে এই ব্যবস্থা দ্বারা কতকগুলি সিবিলিয়ানের অন্নের সংস্থান হইবে, এবং গবর্ণমেণ্টের খরচ বাড়িবে। তাহাতে লর্ড কারমাইকেল এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন যে সিবিলিয়ানদের চাকরীর সংখ্যা বাড়ান গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে, এবং সরকারের ব্যয়ও বিশেষ কিছু বাড়িবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, ফলে ত সেই সিবিলিয়ানদেরই জন্য নূতন সাতটি চাকরীর সৃষ্টি হইল।

আরব দেশের শিখ-বাসিন্দা।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলস্বরূপ পারস্য উপসাগরের অদূরবর্ত্তী বস্রা ইংরেজের অধীন হইয়াছে। পঞ্জাবের একখানি কাগজে প্রকাশ যে বস্রায় একজন শিখ-সাস্ত্রী

পাহারা দিতেছিল; এমন সময় দুজন অপরিচিত লোক আসিয়া ভাঙা হিন্দুস্থানীতে তাহাকে বলিল, "হম্ হিন্দী, হম্ হিন্দী"—"আমরা ভারতবর্ষীয়, আমরা ভারতবর্ষীয়।" তাহার পর ক্রমশঃ অনুসন্ধানে জানা গেল যে বস্রায় ঐরূপ স্থায়ী বাসিন্দা ১৫০।২০০ আছে। ঐ সান্ত্রী যে সিপাহীদল-ভুক্ত, তাহা যখন আরব দেশের কালাডসলাহ নামক স্থানে বদলি হইল তখন তাহারা দেখিল যে তথায় সভি (সম্ভবতঃ পঞ্জাবী "সোধি" জাতির অপভ্রংশ) নামে একটি জাতি আছে; তাহারা দেখিতে আরবদের মত নয়, এবং তাহাদের সঙ্গে উহাদের কোন সামাজিক আদানপ্রদান নাই। ঐ সভিদের প্রধান একজন লোক একজন শিখ সুবেদারকে বলেন যে সভিরা মুসলমানদের ছোঁয়া দুধ দৈ খায় না, এবং জবাই করা জন্তুর মাংস খায় না, হিন্দু ও শিখদের প্রথা অনুযায়ী নিহত জন্তুর মাংস খায়। তাহারা লম্বা দাড়ী রাখে, এবং তাহাদের ত্বকচ্ছেদ সংস্কার হয় না। তাহারা বাবা নানকের নাম ছাড়া শিখধর্ম্মের আর কিছু জানে না, কিন্তু গুরুমুখী পড়িতে ও "শবদ" আবৃত্তি করিতে ভাল বাসে।

এই-সব খবর যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধান করা দরকার যে এইসব দূর মুসলমান দেশে শিখ ধর্ম্মের প্রচার এবং এ পর্য্যন্ত অতি ক্ষীণভাবেও জীবন ধারণ কেমন করিয়া সম্ভব হইল।

বঙ্গে ও পঞ্জাবে অপরাধ।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, বঙ্গের লোকসংখ্যা পঞ্জাবের দ্বিগুণেরও অধিক হইলেও, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে ৮১,৫৪৪ টা ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন অনুসারে ১২৬,৩৫৪ জন লোকের বিচার হইয়া ৪১,৪৪১ জনের অর্থাৎ শতকরা ৩২॥ জনের শাস্তি হয়; পঞ্জাবে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৭৬,১৮৬টা ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন অনুসারে ১৮৬,৩২৭ জনের বিচার হইয়া কেবল ২৭,০১৯ জনের অর্থাৎ শতকরা ১৪। জনের দণ্ড হয়।

ইহা হইতে নানারূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এক এই যে পঞ্জাবে বেআইনী কাজ করিবার প্রবৃত্তি বাংলা দেশের চেয়ে খুব বেশী। দ্বিতীয় এই যে, পঞ্জাবের পুলিস অপরাধী নিরপরাধীর বিচার না করিয়া যাহাকে-তাহাকে গ্রেফতার করে ও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারায় ধৃত বিস্তর লোক খালাস পায়; কিম্বা পুলিস স্বধর্মী বলিয়া অনেক আসামীর বিরুদ্ধে উপযুক্তরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করে না (কারণ পঞ্জাবে বাংলা অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও রেষারেষি অধিক)। বঙ্গের পুলিস সম্ভবতঃ পঞ্জাবের পুলিস অপেক্ষা কার্য্যক্ষম ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। ইহাও সম্ভব যে কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে পঞ্জাবে কোন কোন বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের অনেককে দণ্ড দেন না।

যাহাই হউক, এংলোইণ্ডিয়ান মহলে বাঙালীরাই অপরাধপ্রবণ বলিয়া ভারী বদ্‌নাম রটিয়াছে। তাহার কারণ বোধ হয়, বাঙালী শিক্ষায় অগ্রসর বলিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বেশী করে, সুতরাং বেশী ঈর্ষ্যাভাজন হয়; দ্বিতীয়তঃ, বাঙালীই বোধ হয় প্রথমে বেশী পরিমাণে রাজনৈতিক অপরাধ করিয়াছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভুত্ব।

কোন কোন পত্রিকায় এইরূপ অভিযোগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে আজকাল বাংলা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে বড় অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে; যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে তাহাই লিখিতেছে, কেহ কোন নিয়ম বা শাসন মানিতেছে না। অভিযোগকারীরা বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি সাহিত্যসম্রাট ছিলেন, তাঁহার শাসন সকলে মানিত, তাঁহার প্রবর্ত্তিত রীতির অনুসরণ করিত, তাঁহাকে ভয় করিত।

কেহ কোন নিয়ম মানিবে না, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু চিরকালই পুরাতন নূতনকে শাসন করিবে বা পথ দেখাইবে, ইহা মঙ্গলকর বা স্বাভাবিক নহে; কোন দেশেই এরূপ ঘটে নাই। সংস্কৃত সাহিত্যেও লিখিবার নানাবিধ রীতি দৃষ্ট হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সকলেই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য নহে। তিনি নিজে প্রতিভাশালী ও শক্তিশালী ছিলেন বলিয়া আপনার পথ আপনিই দেখিয়া লইয়াছিলেন, পুরাতনের অনুবর্ত্তন করেন নাই। বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতেও প্রতিভাশালী ও শক্তিশালী লোকেরা ঠিক্ ঐ ভাবেই আপনাদের পথ আপনি নির্দ্দেশ করিয়া লইবে। যাঁহাদের প্রতিভা ও শক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের সমান তাঁহারা এইরূপ করিবেন, যাঁহাদের কম তাঁহারাও করিবেন। কাহারও প্রতিভা ও শক্তি যদি আরও বেশী হয়, তাহা হইলে তাঁহার ত নিজেই নিজের নিয়ন্তা হইবার অধিকার আরও বেশী।

সমালোচনার, শাসনের, নিয়মের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই পুরাতনের, গুরুমহাশয়ের মত বেত্রহস্তে

নূতনকে চোখ রাঙাইবার অধিকার আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি না।

বাংলা মাসিকপত্রে ও খবরের কাগজে, বিশেষ করিয়া বিজ্ঞাপনে, "সাহিত্যসম্রাট" কথাটা চালান হইতেছে। ইংরেজীতে "Republic of Letters" "সাহিত্যের সাধারণতন্ত্র" কথাটির চলন আছে। সাহিত্যকে সাম্রাজ্য না বলিয়া যে সাধারণতন্ত্র বলা হইয়াছে, ইহাতে সত্য কথা ত বলা হইয়াছেই, অধিকন্তু ইহাতে পাশ্চাত্যদের স্বাধীনতাপ্রিয়তাও প্রকাশ পাইতেছে। বাস্তবিক, সাহিত্যক্ষেত্রে কাহারও একচ্ছত্র প্রভুত্ব অমঙ্গলকর, এবং সেরূপ প্রভুত্ব অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে কখনও কাহারও ছিল না, এখনও নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যের সম্রাট ছিলেন না, বা রবীন্দ্রনাথ সম্রাট নহেন, ইহা ভালই। যাহা কিছু ভাল, তাহার সমস্তটি কোন মানুষেরই লেখাতে বা লিখন-রীতিতে নাই; এবং কোন মানুষেরই রচনারীতি বা সব লেখা দোষক্রটিশূন্য নহে।

ফিজি দ্বীপে চুক্তিবদ্ধ মজুর।

ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর অজ্ঞ নিরক্ষর বহু লোককে চুক্তিতে বদ্ধ করিয়া বিভিন্ন দেশে মজুরী করিতে লইয়া যায়। এই প্রথা দাসত্বের রূপান্তর। যত পুরুষ যায়, তত স্ত্রীলোক যায় না; অনেক পুরুষ বা স্ত্রীলোক তাহাদের স্ত্রী বা স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; ইহার ফলে নানাবিধ দুষ্ক্রিয়া প্রশ্রয় পায়। ১৯১৪ সালে ১৪৪৪ জন মজুরের মধ্যে ১০০ জন পুরুষ-পিছু ৪০ জন মাত্র স্ত্রীলোক ছিল; ইহারা যে স্বামীর সঙ্গে গিয়াছিল তাহাও নহে। সুতরাং মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় ইহাদের মধ্যে যে ব্যভিচার হইবে তাহা নিশ্চিত; এবং সেজন্য দায়ী, যাহারা মজুর আমদানী করে। তা ছাড়া এদেশে কিরূপ অন্যায় রকমে কুলি সংগ্রহ করা হয় তাহার প্রমাণ এই যে ১৪৪৪ জনের মধ্যে বয়স্ক বলিয়া প্রেরিত ১৩ জনকে বালক বালিকা বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল এবং ৪৪৮ জনকে অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল বলিয়া দেশে ফেরত পাঠাইতে হইয়াছিল। অপঘাতে ও অত্যাচারে ৭২ জনের মৃত্যু হইয়াছে; ১১ জন আত্মহত্যা করিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে মজুরেরা কিরূপ দুঃখের অসহ্য জীবন বহন করে। শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন বোলপুর শান্তিনিকেতন হইতে ফিজিদ্বীপের মজুরদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করিতে গিয়াছেন। তাঁহাদের শুভ চেষ্টা সফল হোক প্রার্থনা করি।

ভারতের নিরস্ত্র হওয়ার ফল।

কংগ্রেসের সৃষ্টি হইতে ভারতবাসী এই সুদীর্ঘ কাল প্রত্যেক বৎসর যে কয়েকটি বিষয় দাবী করিয়া আসিতেছে তাহার প্রধানগুলি এই—শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক করা, উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগের প্রতিযোগী পরীক্ষা ইংলণ্ডে ও ভারতে উভয়ত্র হওয়া, এবং অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার। যে ম্যাজিষ্ট্রেট একজন লোককে অপরাধী বলিয়া গ্রেপ্তার করিতে পারেন, তিনিই তাহার বিচারও করিতে পারেন—এ ব্যবস্থা এমন অদ্ভুত ও হাস্যজনক যে ইহা ভারতবর্ষ ছাড়া কোনো সভ্যদেশের লোকে কল্পনাও করিতে পারে না। ভারতবাসী স্বদেশের কার্য্যের উপযুক্ত ইহারই প্রমাণ দিবার জন্য তাহাকে দশ হাজার মাইল দূর দেশে গিয়া পরীক্ষা দিতে হয়; স্বদেশেই তাহার যোগ্যতার বিচার হওয়া উচিত। ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য মানুষের সশস্ত্র থাকা আবশ্যক, ভারতবাসী সেই অধিকারে বঞ্চিত। তাহার ফল হইতেছে এই যে যাহারা দুর্বৃত্ত তাহারা চুরি করিয়া অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া শান্ত গৃহস্থের ধন লুণ্ঠন করিতেছে ও অনেকস্থলে প্রাণেও মারিয়া যাইতেছে—আধুনিক ঘন ঘন ডাকাতিগুলি তাহার প্রমাণ। এই-সমস্ত ডাকাতদের দলে শিক্ষিত লোকও রহিয়াছে দেখা যাইতেছে; সাহসের কর্ম্মে ঝাঁপাইয়া পড়া, adventure ভালো বাসা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কিন্তু আইনের কঠোরতায় ভারতবাসীর স্বাভাবিক বীরত্ব-প্রকাশের বৃত্তি পরিতৃপ্ত হইতে না পাইয়া হয়ত কোন কোন স্থলে পাপ ও অন্যায়ের পথে ধাবিত হইতেছে; যুদ্ধে যাইবার অধিকার থাকিলে এই-সমস্ত লোকের অন্তত কিয়দংশ সাম্রাজ্যের হিতকারী সৈনিক হইয়া সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য প্রাণ দিতে পারিত। হিংস্র জন্তুর নখ দন্ত ইংরেজী আইনে বাজেয়াপ্ত হয় নাই; তাহারা দিব্য নিশ্চিন্ত মনে অতি সহজে ভারতবাসীকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছে, কিন্তু ভারতবাসী স্বাভাবিক অধিকারে বঞ্চিত হইয়া কৃত্রিম আইনে নিরস্ত্র, সে হিংস্র জন্তুর কিছুই করিতে পারিতেছে না। ইংরেজ-সরকারের রিপোর্টে প্রকাশ—১৯১৪ সালে মোট ১৭৪৫ লোক হিংস্র জন্তুর হাতে মরিয়াছে; ১৯১৩ সালের চেয়ে শতকরা ৮·৯ বেশী, কিন্তু ১৯১০-১২ সালের চেয়ে কম। বিহার ও উড়িষ্যার মৃত্যুসংখ্যা সবচেয়ে বেশী—সমস্ত ভারতের এক-তৃতীয়াংশ। অন্যান্য অনেক প্রদেশে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা কিছু কিছু কম। সবচেয়ে বেশী প্রাণহানি করিয়াছে বাঘে—৬৩৬ জনকে বাঘে খাইয়াছে—১৫৫ জন মান্দ্রাজে, ৬০ বঙ্গে, ৩০ বর্ম্মায়; চিতাবাঘে মারিয়াছে ২৮১ জনকে; ভালুকে ৯৫, নেকড়ে বাঘে ১৩৭, হাতীতে ৫৭, হায়েনা ২৭। গৃহপালিত পশু বধ করিয়াছে ৯৪ হাজার ৭ শত ৫৬; গেল বৎসরের চেয়েও বেশী। আসামে পশু মারিয়াছে ১৭৭৯৩, বিহার-উড়িষ্যায় ১৬১০৫। চিতাবাঘে মারিয়াছে সবচেয়ে বেশী—অর্দ্ধেক। বাঘে মারিয়াছে ৩০৪১৮, নেকড়ে বাঘে ১০১১৫, সাপের

কামড়ে মরিয়াছে ১০৯৩৯। সাপের কামড়ে মানুষ মরিয়াছে ২২৮৯৪, গত বৎসরের চেয়ে অনেক বেশী। এক্ষেত্রেও বিহার-উড়িষ্যা সর্ব্বাগ্রে—৫৯৬৮, তৎপরে আগ্রা-অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশ,—৫৫১৩, তৎপরে বঙ্গ—৪৩৫৬, পাঞ্জাবে ১১২৯—পাঞ্জাবে এত সর্পাঘাত পূর্ব্বে হয় নাই। সান্ত্বনার বিষয় যে ১৯১৪ সালে ১৯১৩ সালের চেয়ে বেশী হিংস্র প্রাণী বধ করা হইয়াছিল। ১৯১৪ সালের সংখ্যা—২৫২০৩,—বাঘ ১৩৮১, চিতা ৬৫৫৭, ভালুক ৩০৭৮, নেকড়ে ৩০৬৬। হিংস্রজন্তু বধের পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল ১ লক্ষ ৯১ হাজার ১৮১ টাকা। সাপ মারা পড়িয়াছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৬। ১৯১৪ সালে ২৫৬২৭ জনকে অস্ত্র ব্যবহারের নূতন অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল—মোট হইয়াছিল ১৭৬৭৭৯; ১৯১৩ সালের চেয়ে মোটের উপর কম। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে হিংস্রজন্তুর আক্রমণ কেন বেশী হইয়াছিল।

বঙ্গের স্বাস্থ্য-সংবাদ।

কলিকাতা গেজেটে সম্প্রতি বঙ্গের ১৯১৪ সালের স্বাস্থ্য-সংবাদের একটা ফিরিস্তি বাহির হইয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে এ বৎসর বঙ্গের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ গিয়াছে; বৃষ্টির অভাব হওয়াতে জ্বর বেশী হইয়া মৃত্যুও অধিক হইয়াছে; দুর্ভিক্ষের কারণও বৃষ্টির অভাব; অন্নাভাব জীবনীশক্তি হ্রাসের প্রধান কারণ।

জন্মসংখ্যা এ বৎসর বেশী হয় নাই—১৯১১ সালের লোকগণনার পর জন্মমৃত্যুর হার প্রায় সমান হওয়াতে জনসংখ্যা বাড়িতে পারে নাই।

মৃত্যুর হার খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। জ্বরে মৃত্যুই বেশী, এবং তাহারই ফলে জন্মের অনুপাত অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। অন্নাভাবও সন্তান-জন্মের অন্তরায়। শিশুমৃত্যু অত্যন্ত বেশী—এ বিষয়ে কলিকাতা অগ্রগণ্য ছিল, এবারে বীরভূম, নদীয়া ও পাবনা প্রধান দোষী।

জ্বরে মৃত্যুর পরিমাণ ৯২৫৫৪৬ হইতে ১০৬১০৪১ হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক মাইলে মৃত্যুসংখ্যা ১৯১৪, ১৯১৩ ও গত ৫ বৎসরের গড় অনুসারে যথাক্রমে ২৩·৪০, ২১·৩০, ২০·৫৪।

জ্বরের প্রতিকারের জন্য কুইনিন বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল এবং কুইনিনের বিক্রয়ও দ্বিগুণ হইয়াছিল। কুইনিন ক্রমশ লোকের পরিচিত হইয়া উঠিতেছে।

কলেরায় মৃত্যু বেশী হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসরে ছিল ৭৮৮৯৮, এ বৎসর হইয়াছে ৮৯২২৪—প্রতি মাইলে ১·৯৬। মুর্শিদাবাদ নদীয়া মালদহে বেশী কলেরা হইয়াছে। জলাশয়ের অল্পতায় জন্য জল বিশুদ্ধ রাখা যায় নাই।

প্লেগে মৃত্যু কমিয়া প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে। আমাশয় উদরাময় কমিয়াছে, শ্বাসযন্ত্রের পীড়া বাড়িয়াছে।

এ বৎসর (১৯১৪-১৫) ১৬ লক্ষ ৫ হাজার ৭১১ জন বসন্তের টীকা লইয়াছিল। প্রথম টীকা লওয়া কমিয়াছে; পুনঃ টীকা লওয়া বাড়িয়াছে। টীকা লওয়া সত্ত্বেও বসন্তে শিশুমৃত্যু বেশী হইয়াছে—তাহার মানে ঠিক করিয়া টীকা দেওয়া হয় নাই।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এ বৎসর (১৯১৩-১৪) ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার ৯৪৬ টাকা ও গত বৎসর ১৩১৪৩৬৮ টাকা খরচ করা হইয়াছে। ভারতগভর্মেণ্টের নিকট ১৩৮৫৯৭০ ও ৯১০০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। ড্রেনেজ ও জলের কল অনেক জায়গায় হওয়াতে এ বৎসর খরচ বাড়িয়াছে। অনেক জেলায় মজা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও জঙ্গল কাটা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বগ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির যথেষ্ট উপায় করিয়াছেন; তাঁহার দৃষ্টান্ত সকল ধনী, জমিদার, গ্রামবাসীর অবলম্বনীয়।

নব্য ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়।

মহাত্মা রাজা রামমোহন আধুনিক ভারতবর্ষের প্রায় সকলবিধ কর্ম্ম চেষ্টা ও চিন্তার প্রবর্ত্তক ছিলেন; এইজন্য আধুনিক কালকে রাজা রামমোহনের যুগ বলা হয়। ইহা যে কেবলমাত্র বাঙালীরাই স্বদেশ- বা স্বজাতিপ্রীতির গর্ব্ব হইতে বলিয়া থাকেন তাহা নহে, ভিন্ন প্রদেশের লোকেরাও ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। সম্প্রতি রাজা রামমোহনের বাৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে বোম্বাই প্রার্থনা-মন্দিরে আরাধনার পর সার নারায়ণ চন্দাবরকর বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

Ram Mohan Roy was the foremost Indian of the modern times. His courage, stout patriotism and earnestness of purpose in the cause of religious, social and political reform have resulted in bringing into existence a new phase of national life, and therefore he could appropriately be called *the Father of modern India.*

ভারতের প্রকৃত ঋষিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম একেশ্বরবাদ নানা আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি বাহ্যিক আড়ম্বরে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল; ভারতবাসী তাহার বিশ্বযাত্রা ভুলিয়া ঘরের কোণে বদ্ধ হইয়াছিল; শিক্ষা ও সংস্কার ভুলিয়া মূর্খ জড়-প্রকৃতি হইয়াছিল; রমণীর মহত্ত্বের সম্মান ও সমাদর ভুলিয়া তাহাদের উপর অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল; সেই সময় প্রাচীন ঋষিদের উত্তর-সাধক রাজা রামমোহন ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের সকলবিধ সংস্কারে আপনার জীবন নিযুক্ত করিয়াছিলেন; বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বমানবের একত্ব অনুভব করিয়া তিনি জগৎকে যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে সমস্ত জগৎ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে, তাঁহার

আদর্শে কবে পূর্ণতা লাভ করিবে বলা কঠিন। আমরা মানি আর-না মানি আমরা সকলেই সু-যুক্তি ও কু-যুক্তি দিয়া যেসব কথা বলি, যে কাজ করি, যে প্রতিবাদ বা প্রতিকূলতা করি সে সমস্তই প্রমাণ করে যে আমরা রামমোহনের ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া আছি। তবে সচেতন ভাবে কয়জন সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি আর কতজন বা আবহাওয়ায় ভাসমান ভাবগুলিকে অজ্ঞাতে না গ্রহণ করিয়া পারি নাই তাহার বিচারের উপর আমাদের জাতির সচেতন বুদ্ধিবিবেচনার প্রমাণ নির্ভর করিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ আপনাকে রাজা রামমোহন রায়ের উত্তরসাধক মনে করিতেন;—যদিও এ বিষয়ে মতভেদ হইবে।

রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের শ্রাদ্ধবাসরে বলিয়াছিলেন—

"রাজা রামমোহনের কর্ম্মজীবনের বৈচিত্র্য নানাদিকে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর জীবনের এই কর্ম্মবৈচিত্র্য বর্ণনায় আমি অসমর্থ। আমি কেবল তাঁর জীবনের একটি কথা আপনাদের নিকটে বলব। এ পর্য্যন্ত আমরা তাঁর স্মৃতিসভায় কেউ তাঁহার রাজনীতি, কেউ শিক্ষা, কেউ সমাজসংস্কার এইরূপে খণ্ড খণ্ড করে তাঁর জীবনের এক একটা দিক আলোচনা করেছি। এমন টুকরা টুকরা করে কোন মহৎ-চরিত্র আলোচনা করা আমি অন্যায় বলে মনে করি, ইহাতে তাঁকে সম্মান না করে অপমান করা হয়। ঠিক আসল যে শক্তিটি তাঁর জীবনে সঙ্গীতের মত বেজে উঠেছিল তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। বিশেষতঃ যেখানে রাজা রামমোহনের মহত্ব তাঁর সেই দিকটা বাদ দিয়ে আমরা যদি তাঁকে কেউ আট আনা, কেউ বারো আনা স্বীকার করি তা'হলে তাঁর অপমানই করা হবে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের হয় সম্মান করে ষোল আনা স্বীকার করতে হবে, না হয় অস্বীকার ক'রে অপমানিত করতে হবে; এর মাঝামাঝি অন্য পথ নেই। আমি মনে করি, সত্যকে স্বীকার করে, রামমোহন তাঁর দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন, সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁর মহত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করেছিলেন সেই নিন্দাই তাঁর গৌরবের মুকুট। লোকে গোপনে তাঁহার প্রাণবধেরও চেষ্টা করেছিল।"

বৈদিক যুগে ঋষিরা এক সময়ে সূর্য্যকেই দেবতা বলে পূজা করতেন। আবার উপনিষদের ঋষি সেই সূর্য্যকেই বলেছেন, "হে সূর্য্য, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত কর, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যদেবতাকে দেখি।"

সেকালে যতই পূজা, হোম, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান থাকুক না কেন, সেই সকলের আবরণ ভেদ করে ঋষিরা সত্যকে দেখেছিলেন। যে ঈশোপনিষদে ঋষি সূর্য্যকে অনাবৃত হতে আহ্বান করেছেন সেই উপনিষদেরই প্রথম শ্লোক হচ্ছে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

সকলই দেখতে হবে সেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে, তাঁর দান ভোগ করতে হবে।

রাজা রামমোহন এই এককে, অদ্বিতীয়কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই এককেই তিনি দেশাচার লোকাচার প্রভৃতির অন্তরাল হতে অনাবৃত করে, কেবল বাঙ্গালীকে নয়, ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসীকে দেখালেন। তিনি তাঁকে জেনে প্রাচীন ঋষির মত বল্লেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি সমস্ত আবরণের মধ্য হতে একমেব অদ্বিতীয়কে আবিষ্কার করেছেন। তিনি একদিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্যদিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদূর পর্য্যন্ত আধুনিক হওয়া যায় তিনি তাই। আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই বস্তুকে পাকলে থাকতে পারে না। রামমোহন তাহা স্বীকার করলেন না, তিনি সকলকেই বল্লেন,—"জান সেই একে।"

আজকার সভার এই প্রারম্ভ সঙ্গীত—"জান সেই একে" ইহাই রামমোহনের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা।

যিনি যাহাতে বড়, তাঁকে সেই দিক দিয়ে সম্মান দেখাতে হয়; টাকায় বড় যিনি তিনি ধনী বলে সম্মান পান; বিদ্যায় বড় যিনি, তিনি বিদ্বান বলে সম্মান পান। রামমোহনকে সেই-সকল দিক দিয়ে দেখলে চলবে না; তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্যকে লাভ করেছেন, সেই সত্যই তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড় জিনিষ। তাঁকে স্বীকার করেই তিনি নিন্দার মুকুট উপহার পেয়েছেন।

পৃথিবীর অন্য সব মহাপুরুষের মত তিনি টাকা কড়ি, বিদ্যা, খ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি, তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই একমেব সত্যকেই চেয়েছিলেন।

ভীষণ মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় একটা প্রস্রবণ প্রকাশ পায়। হো'ক না সেটা মরুভূমি, তথাপি সেখানেও ধরিত্রীর বুকের ভিতরে প্রাণের রসধারা আছে; এই ধারা সর্ব্বত্রই আছে। চারিদিকে শুষ্ক নির্জ্জীব সমতল বালুর ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রস্রবণ একান্ত খাপছাড়া বলে মনে হবে সন্দেহ নাই। হয়তো চারিদিক বলবে, "বেশ তো নির্জ্জীব শান্ত ছিলাম আমরা, হঠাৎ কোথেকে এল এই চাঞ্চল্য ও জলধারার কলধ্বনি।"

এই শুষ্ক নির্জ্জীব দেশে মুক্তির বাণী, ও জীবনের চঞ্চলতা নিয়ে রামমোহন এসেছেন। আমরা জোর করে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই কিন্তু সাধ্য কি তাঁকে অস্বীকার করি। যেদিকে তাকাই সেইদিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই। আমরা এখন বল পাচ্ছি, তাই অনায়াসে গাছের গোড়ার কথা অস্বীকার করছি। রামমোহন আমাদের কাছে আত্মার মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছেন। আমরা এখন বিদেশী স্বাধীনতা শিখতে চাই, পশ্চিমের অনুকরণে বাইরে থেকে অপকৃষ্ট উপায়ে স্বাধীনতা চাই; সে অসম্ভব। সকল শক্তির যেখানে উৎপত্তি, ও প্রাণের যেখানে কেন্দ্র, সেখান থেকে আমরা জীবনধারা লাভ করতে না পারলে, আমরা বাইরের চেষ্টায় মুক্তি পাব না।

অনেকের এই ধারণা আছে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই, তারা বস্তুতেই বড় হয়ে উঠেছে। আমি তা স্বীকার করি না। আধ্যাত্মিকতায় বড় না হলে মানুষ কিছুতেই বড় হতে পারে না। তাদের সেবা, তাদের প্রেম, তাদের ত্যাগের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা কখনও কিছুতেই বলতে পারেন না যে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই।

রামমোহনকে সম্মান করতে হলে তাঁর জীবনের এই সত্যকে বরণ করতে হবে।

তাঁর জীবনের এই আসল কথাটিই আমার বক্তব্য। আর কিছু বলার সাধ্য আমার নেই।"

(বঙ্গ ভাষা ঘর্ম্ম প্রতিষ্ঠানী সংস্কৃত [illegible])

"নানাজাতি পুষ্প আনি অর্ঘ্য বিরচিয়া
ইতঃপর জলধরে কহে সম্বোধিয়া।"

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রকর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেনের সৌজন্যে মুদ্রিত।

RAY & SONS

ভারতের অর্থসমস্যা

বিজ্ঞানের নিয়ম এক, কিন্তু প্রয়োগ বিভিন্ন। তাহাতে বিজ্ঞান-প্রণালীর হানি হয় না। অর্থনীতিশাস্ত্রও একটি বিজ্ঞান, ইহার কতকগুলি সাধারণ সূত্র। সেই সূত্রগুলি সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রয়োগ হয় না, তাহার প্রধান কারণ অর্থনীতি জটিল সমাজ-বিজ্ঞানের অঙ্গ মাত্র। প্রাকৃতিক ঘটনা যত সহজে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা যায়, সামাজিক জীবন এবং ঘটনা তত সহজে অনুধ্যেয় নয়। সেইজন্য অনেকে এখনও পর্য্যন্ত অর্থনীতিকে বিজ্ঞান বলিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন। তবে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে যদি সামাজিক বিজ্ঞানের কোনও অংশকে বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে তবে তাহা অর্থনীতি।

১৭৭৬ খৃঃ অব্দে অ্যাডাম-স্মিথ সাহেব তাঁহার জাতীয় সম্পদ (Wealth of Nations) নামক পুস্তক রচনা করেন। তখন পণ্ডিতগণ বলিয়া উঠিলেন সকলদেশেই আর্থিক বিষয়ের নিয়ম এক। রিকার্ডো ও মিল্, স্মিথসাহেবের পশ্চাদনুবর্ত্তন করিলেন। ইহারা সকলে টাকাকে অর্থ বলিয়া ভুল করিতেন না। যাহাতে মানুষের সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, যাহাতে মানুষ আনন্দ ও স্বাস্থ্য লাভ করে সেইসমস্ত বিনিময়যোগ্য দ্রব্যই অর্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। দেশে কেবল টাকার সমাগম হইলে দেশ ধনী হয় না। পরন্তু দেশের লোক যত সামগ্রী উপভোগ করিতে পারিবে ততই তাহারা অর্থশালী হইবে। পূর্ব্বে লোকে মনে করিত টাকাই অর্থ, সেইজন্য তাহারা রপ্তানীর বৃদ্ধি এবং আমদানীর হ্রাসের পোষকতা করিত। স্মিথসাহেবের নীতি অবলম্বন করিয়া অবাধ বাণিজ্যের আন্দোলন চলিল। যে দেশের যে বস্তু উৎপাদনের ক্ষমতা বেশী সে দেশ সেই বস্তুতেই অপর দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে। আর যে বস্তু উৎপাদন করিবার সুবিধা তেমন নাই তাহা অপর দেশ হইতে আমদানী করিবে। ইহাতে জগতের সম্পদ বাড়িয়া যাইবে এবং তাহার সঙ্গে প্রত্যেক জাতির বিশেষত্ব লাভ হইবে। পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া মানুষের দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া কেবল শক্তি উদ্বুদ্ধ করিবে এবং এক বিশ্বপ্রেমের সূচনা করিবে। যে কেহ এই নিয়মের প্রতিবন্ধক হইবে সে আত্মঘাতী হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে জার্ম্মানীর ফ্রেড্‌রিক লিষ্ট দেখিলেন অবাধ বাণিজ্যের আবর্ত্তে সকল দেশের শক্তি বিকাশ পায় না, অপরপক্ষে বরং কোন-কোন জাতির ধ্বংসের সম্ভাবনা আছে। তাঁহার মতে প্রত্যেক জাতিকে আত্মশীল হইতে হইবে। অবাধ-বাণিজ্য-মন্ত্রে মুগ্ধ ইউরোপে আত্মশীলতার ভাব প্রচার হইতে সময় লাগিল। কিন্তু লিষ্টের মত আজ জার্ম্মানী এবং আমেরিকার প্রধান মন্ত্র। জার্ম্মানীর শিল্প যে এত উন্নত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ জার্ম্মানী আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বিশ্বপ্রেমে পাগল হইয়া আপনার সকল দ্বার কুটুম্ব জ্ঞাতি বান্ধবকে উন্মুক্ত করিয়া দেয় নাই। আমেরিকারও সেইকথা।

ইংলণ্ড তাহার গুরুর মন্ত্র এখনও ভোলে নাই। বর্ত্তমানে কেহ কেহ আসিয়া বলিলেন যখন সকলে আমাদিগকে আত্মীয়জ্ঞানে সমাদর করিতেছে না, তখন আমরা কেন তাহাদিগকে আদরে গ্রহণ করিব। গ্রেটব্রিটেন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। শিল্পে যদিও ইহার স্থান খুব উচ্চে, কৃষিক্ষেত্রে ইহার যথেষ্ট উৎপাদন হয় না যাহাতে সকল অধিবাসীর আহারের সংস্থান হইতে পারে। সেইজন্য গ্রেটব্রিটেনকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে। সুতরাং অবাধ-বাণিজ্যের নীতি সর্ব্বত্র সমানভাবে খাটিল না। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমস্যা,—কতকগুলি আন্তর্জাতিক আর কতকগুলি আভ্যন্তরিক। বর্ত্তমানে ইহারা পরস্পরে সংশ্লিষ্ট। দ্রুতগামী বাণিজ্যপোত অনেক সমস্যাকে জটিল করিয়াছে।

সম্পদশালী বলিয়া ভারতবর্ষের একদিন খ্যাতি ছিল। বাণিজ্যের তালিকায় এখনও ভারতের নাম অনেক উচ্চে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয় সম্পদের পরিমাণ কত তাহা নিরূপণের উপায় কি? অনেকে উৎপন্ন ও রাজস্বের হিসাব করিয়া জাতীয় সম্পদ নির্ণয় করেন। কেহ কেহ আবার একটি সাধারণ পরিবার লইয়া তাহার আয়ব্যয়ের হিসাব করিয়া জাতীয় শক্তির পরিমাণ করে। ইংলণ্ড বোধ হয় ধনে খুব বড়, কিন্তু তাহার কর্ম্মহীনের সমস্যা আছে; আমেরিকাও খুব ধনী কিন্তু তাহার ধনের অসমবিভাগের

সমস্যা আছে। ভারতের সমস্যা সাধারণ দারিদ্র্য। ভারতবাসী সাধারণতঃ কৃষিজীবী। ইহার সহর অল্প। ইহার প্রধান রপ্তানী কৃষি-উৎপন্ন পদার্থের এবং প্রধান আমদানী শিল্পের। আমাদের রপ্তানীর মূল্য আমদানীর মূল্য অপেক্ষা অধিক। কারণ আমরা যে-সকল শিল্পদ্রব্য আমদানী করি তাহার মূল্য ছাড়া যে-সকল বিদেশী আমাদের দেশে কাজ করে তাহাদের কাজের দাম ও ভারতের উন্নতির জন্য যে টাকা ধার হইয়াছে তাহার সুদ আমাদিগকে দিতে হয়। আমরা খাই আর না খাই আমাদিগকে ইহা দিতেই হইবে। যদি নিজেদের উদর পূর্ণ করিয়া আমরা এইসকল দেনা পরিশোধ করিতে পারি তবে আমরা আর দেউলিয়া হইলাম না। আর যদি নিজেদের উদরপূর্ণ না করিতে পারি তাহা হইলে আমাদিগকে অকালে কালগ্রাসে পড়িতে হইবে।

ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ-বিশেষ। ইহাতে প্রায় তেত্রিশ কোটি লোকের বাস। ইহার উৎপন্ন সামগ্রী নিতান্ত কম নয়, কিন্তু তবুও আমরা দেখি ভারতবাসী দীর্ঘ-জীবী হয় না, অনেকে জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে না। দারিদ্র্য ভারতবাসীকে এমন দুর্ব্বল করিয়াছে যে সে আর রোগকে পরাস্ত করিতে পারে না। উত্তম আহার এবং উত্তম স্থানে বাস রোগদূরীকরণের প্রধান উপায়; এই দুই জিনিস ভারতবর্ষে দুর্ল্লভ নহে, কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে দুর্ল্লভ। উভয়ই পাইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন, ভারতবাসীর তাহা নাই। তাই ভারতবাসী মূর্খ, ভারত-বাসী দুর্ব্বল। গ্রীকপণ্ডিত পেরিক্লিস বলিয়াছিলেন আমরা দারিদ্র্যকে ঘৃণা করি না কিন্তু দারিদ্র্য দূর না করার চেষ্টাকে ঘৃণা করি। ভারতবাসী নাকি ধর্ম্মপ্রাণ তাই সংসার-ত্যাগকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছে। তাহারা দরিদ্র হওয়ার জন্য—পরের দ্বারে ভিক্ষার জন্য ব্যস্ত। শাক-অন্ন এবং ছিন্ন কন্থাকে যথেষ্ট বলিয়া মনে করে। অনেকেই জনক ও শুকদেবের উপাখ্যান জানেন। রাজর্ষি জনক প্রভূত ধনের অধিপতি আর শুকদেব সর্ব্বত্যাগী। জনক শুকদেবের ধর্ম্মভাবের গভীরতা-পরীক্ষার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার প্রাসাদের এক-দিকে অগ্নি-সংযোগ হইলে দেখিলেন শুকদেবের মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কারণ তাঁহার কৌপীন সেইখানে শুকাইতে দিয়াছেন, —কিন্তু জনক নিশ্চল, শান্ত, ধীর। সর্ব্বত্যাগ করিয়াও শুকদেব কৌপীনের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। মানুষের মধ্যে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, সেই প্রবৃত্তি-গুলিকে কিছুতেই ধ্বংস করিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহা-দিগকে পরিচালিত করিয়া সুপথে আনা যাইতে পারে। ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা পাপ নহে, ইহা একটি প্রবল প্রবৃত্তি। জঠরানলে ইহার জন্ম এবং সুখভোগেচ্ছায় ইহার বৃদ্ধি। মহাপণ্ডিত মার্শ্যাল বলেন ধর্ম্ম ও অর্থের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ পৃথিবীতে যত সব মহৎ কাজ করিয়াছে। আমাদের দেশে বলা হইয়াছে "অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্"। কিন্তু অর্থই আবার চারি বর্গের মধ্যে একটি, সুতরাং অর্থ পদার্থটি নিতান্ত তুচ্ছ নয়। আমি না বলিলেও সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন।

এখন প্রশ্ন এই, অর্থ কি মানুষের ক্ষমতার অধীন না ভাগ্যাধীন। অনেকেই হয়ত বলিবেন ইহা ভাগ্যাধীন। পাশ্চাত্যশিক্ষালব্ধ ব্যক্তিগণ ইহা স্বীকার করিবেন না। পুরুষকারের বাণী আমাদের দেশেও শুনা গিয়াছিল। কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করাতেই ধর্ম্ম; কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জড়জীবনে ধর্ম্ম নহে। গীতার বোধ হয় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। মনুষ্যত্ব-লাভের জন্য অর্থের আবশ্যক। বিনা অর্থে জীবনের পরিপূর্ণতা হয় না। কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিলে ধর্ম্ম হয় না, সংযমে ধর্ম্ম। লাভেই প্রকৃত সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়, অভাবে নহে। মানুষের দেহ জ্ঞান ও আত্মার উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। তাহাতে জাতির শক্তি বৃদ্ধি হয়, ভগবচ্ছক্তির বিকাশ হয়, প্রেমের প্রসার হয়, এবং পুণ্যলাভের সুযোগ হয়। অর্থ এই-সকল শক্তিলাভের একটি প্রধান উপকরণ। উদ্যম করিলেই এই অর্থ লাভ হয়। "উদ্যোগীনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ। দৈবেন দেয়ম্ ইতি কাপুরুষা বদন্তি।"

ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার জন্য ভারতবাসীই দায়ী। অনেকসময় পরের উপর দোষ চাপাইয়া আমরা আনন্দ পাই, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব উপরি-উক্ত কথাটি কতদূর সত্য।

আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। প্রথমতঃ,

আমরা আমাদের সুবিধা ও সুযোগ-অনুসারে সামগ্রী উৎপন্ন করিতেছি কিনা। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের উৎপন্ন সামগ্রী যথাযথরূপে বিতরিত হইতেছে কি না। তৃতীয়তঃ, ক্রয়-বিক্রয় ও বাণিজ্যের কোন বাধা হইতেছে কি না, কিংবা তাহা দ্বারা সামগ্রী পুনরুৎপাদনের সুবিধা হইতেছে কি না।

সামগ্রী-উৎপাদনের প্রধান উপাদান—ভূমি শ্রম ও মূলধন। ভারতের সকল ভূমি এখনও ব্যবহার হইতেছে না এবং তাহাদের উৎপাদনশক্তির শেষ হয় নাই। কৃষি-জাত দ্রব্যের জন্য যত ভূমি আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত জমী এখনও আছে, তবে প্রদেশভেদে কম আর বেশী। ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। সার-প্রয়োগ করিলে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। ভারতে খুব কম স্থানে জমীতে সার দেওয়া হয়। তারপর প্রাকৃতিক শক্তি—ভারতে অত্যুচ্চ পাহাড়, গভীর নদী, খর জলস্রোত অনেক আছে। বর্ত্তমান দুএক স্থানে এইসকল সম্পদের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। বোম্বাই-প্রদেশে কাবেরী-জলপ্রপাত হইতে তড়িচ্ছক্তি সংগ্রহ হইতেছে। হরিদ্বারের খর জলস্রোতে তড়িৎ-সঞ্চার হয়, কিন্তু এখনও স্থায়ীভাবে তথায় কোন শিল্প স্থাপিত হয় নাই। হিমালয়ের নানাস্থান আছে যেখানে নানা-রকমের কলকারখানা অতি-কম খরচে চলিতে পারে—কিন্তু এদিকে কোন উদ্যম নাই, কাহারও চেষ্টা নাই। সময়ে সময়ে মনে হয় বাক্‌লু সাহেব বুঝি সত্যই বলিয়াছেন যে ভারতের প্রাকৃতিক শক্তি মানুষকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তির ভীষণতা মানুষের শক্তির আয়ত্ত হইতে পারে লোকে বোধ হয় কল্পনা করিতে পারে নাই। আমি কিন্তু তাহা স্বীকার করি না। এই ভারতে সমুদ্রগামী নাবিক আছে। একসময়ে ভারতের সমুদায় নদীতে দূরগামী বহর চলিত। এখন কিন্তু ভারতবাসীর আত্ম চেষ্টা কম। দ্রুতগামী রেল অন্তর্বাণিজ্যের সহায়তা করিয়াছে বটে কিন্তু ভারতবাসীর একটা ব্যবসায় বিনষ্ট করিয়াছে। এই রেল যদি ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত হইত তাহা হইলে দেশের তত ক্ষতি হইত না। কেবল মাত্র ব্যবসায়ের স্থান পরিবর্ত্তন হইত মাত্র। রেলওয়ে পরিচালিত হয় বিদেশীর দ্বারা, সমস্ত লাভ বিদেশীই উপভোগ করে। মূলধন যদি ধার করিয়া এদেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত হইত তাহাতেও আমাদের লাভ হইত। সেইজন্য বর্ত্তমান সমস্ত রেলওয়ে জাতীয় (national) করিয়া লইবার চেষ্টা হইতেছে। রেলওয়ে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারবার, ইহাতে লক্ষলক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। কিন্তু ভারতবাসীরা কেবলমাত্র নিম্নতম কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। ইহারা প্রধান পদ লাভ করিতে পারে না, কারণ বিদেশী কোম্পানী অধিকাংশ রেলওয়ে পরিচালনের ভার পাইয়াছেন। ঠিক সেই কথা অন্যান্য কলকারখানায় খাটে। বিদেশী উদ্যমে দেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। বাঙ্গলাদেশের পাটের কলের কথা মনে করুন; তাহাতে একজনও বাঙ্গালী প্রধান পদ লাভ করিতে পারে নাই, কারণ বিদেশী ব্যবসায়ী নিজেদের দেশের লোকের উপর অধিক বিশ্বাস করে। আমরা কেবল সেখানে কুলী থাকিতে পারি, ইহার অধিক অধিকার আমাদের নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় ভারতের শিল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রদেশে অনুসন্ধান চলিতেছে। বাঙ্গলাদেশের অনুসন্ধান-কর্ত্তা সোয়ানসাহেব বলিয়াছেন যে এদেশে কোন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহার প্রধান কারণ দেশের লোকে পরিচালন-অক্ষম এবং তাহাদের অর্থের অভাব। তিনি ধনীদিগকে অর্থ দিয়া শিল্প স্থাপিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যৌথ-কারবার চলিতে পারে না ইহাই তাঁহার মত। ক্রমে যখন লোকের শিক্ষা বৃদ্ধি হইবে, তাহারা যখন কর্ম্মকুশলতা লাভ করিবে, যখন পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে শিখিবে, তখন যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সোজাকথা বলিতে গেলে এদেশের লোকে ব্যবসায় বোঝে না এবং ব্যবসানীতি উল্লঙ্ঘন করে। আমার বোধহয় সোয়ানসাহেব আমাদের ব্যাধির ঠিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে হইলে দেশের ধনাগম হইতে অনেক সময় লাগিবে। আমরা শ্রমকুশল নহি এবং আমাদের ধন নাই। এই দুই অভাব কি করিয়া মোচন করিতে পারা যায়? ভারতবাসী স্বাবলম্বনপন্থা অবলম্বন করিয়া যদি এই দুই অভাব মোচন করিতে পারে তাহা অপেক্ষা মঙ্গল আর কিছু হইতে পারে না।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক জিভন্স্‌সাহেব বলিয়াছেন যে এদেশের উন্নতি করিতে হইলে প্রধান আবশ্যক দেশে শিক্ষার বিস্তার। তিনি সাধারণের শিক্ষা বাধ্যকরী করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের চরিত্র এমন যে কোন কাজ আমাদের জোর করিয়া না করাইলে আমরা করি না—আমাদের সমাজের উন্নতি বলুন আর ধর্ম্মের উন্নতি বলুন। সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিতে যদি আমরা বাধ্য না হই তাহা হইলে আমরা তাহাদের শিক্ষার আয়োজন করিব না। সেইজন্য মহামতি গোখলে চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে প্রাথমিক-শিক্ষা ক্রমে বিস্তৃত হয়। গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা-বিস্তার করিতে প্রতিশ্রুত এবং প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিকশিক্ষার জন্য দায়ী। নানাকারণে প্রাথমিকশিক্ষার বিস্তার হইতেছে না। সে-সকল বিষয় এখানে আলোচ্য নয়। তবে এইমাত্র বলিতে হইবে যে দেশের লোকের দায়িত্ব ইহাতে কম নয়। দেখিতে পাওয়া যায় উচ্চশিক্ষার জন্য অনেকে দান করেন। নিম্নশিক্ষার জন্য দান খুব কম। যাঁহারা দরিদ্রের ধন অপহরণ করেন—সামান্য মানসিক পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা ইচ্ছা করিলে দরিদ্রের মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিতে পারেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত উকীলগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

প্রাথমিকশিক্ষা এমনভাবে হওয়া উচিত যাহাতে মানুষের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়, উদার ভাবের প্রসার হয়, এবং শিল্পজ্ঞানের উন্মেষ হয়। বর্ত্তমানে যে-ভাবে নিম্নশিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাতে না আছে উদার ভাব, না হয় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। যাঁহারা পুস্তক রচনা করেন তাঁহাদের গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বোধ হয় নিতান্ত কম। যদি বইয়ের ভিতর চিড়িয়াখানার গল্প না লিখিয়া কি করিয়া বিভিন্ন দেশে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার গল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের আবশ্যকতা ও উন্নতির উপায়বিষয়ক গল্প লেখা হইত, যদি এদেশের ইতিহাস-পর্য্যায় অনুসারে প্রধান ব্যক্তিদের জীবনী ও উপাখ্যান লেখা হইত এবং সকল কার্য্যকরী কথার দ্বারা মানসিক বৃত্তিসমূহের পরিচালনার বন্দোবস্ত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় দেশের পক্ষে মঙ্গল হইত। এখন হইয়াছে বিজ্ঞানপাঠ, তাহাতে ছেলেরা মুখস্থ করে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বাক্যের ইংরেজী নাম। তাহাতে যে কিরূপ বিজ্ঞান শিক্ষা হয় আমার বুদ্ধির অগম্য।

লোকে আশা করে শিক্ষার দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, মন সবল হইবে, হৃদয় উচ্চ হইবে, এবং নীতি ও ধর্ম্মের শক্তি বাড়িবে। যদি তাহা না হইয়া কেবল চাকরির আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, তাহাতে কেবল জাতীয় দুর্ব্বলতাই আসে, শিক্ষার সুফল ফলে না। যদি দেশকে অর্থশালী করিতে হয় তবে প্রথমে সুশিক্ষার আবশ্যক। কৃষিক্ষেত্রে পণ্য-বিপণীতে শিল্পাগারে বাণিজ্যবন্দরে সর্ব্বত্র জ্ঞান ও নীতির আবশ্যক। যদি আমার স্বাস্থ্য না থাকে আমি কর্ম্মঠ হইতে পারিব না; যদি জ্ঞান না থাকে নূতন নূতন উপায় দ্বারা উৎপন্ন বৃদ্ধি করিতে পারিব না; যদি আমি নীতিবান না হই, যদি ব্যবসায়ে সততা না থাকে লোকে আমাকে বিশ্বাস করিবে না, আমার প্রস্তুত শিল্পের আদর থাকিবে না, লোকে বলিবে ইহা ভাল জিনিষ নহে। যদি সততা না থাকে ব্যবসায়ে লোকে আমার আবশ্যকতা-অনুসারে সাহায্য করিবে না। সুশিক্ষায় এই-সকল গুণ লাভ করিবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়, শিক্ষার বিস্তৃতি হইলে লোকের আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইবে। তখন ময়লা জায়গায় থাকিতে পারিবে না, গৃহসামগ্রীর সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি পড়িবে, উত্তম আসবাব ও উত্তম সরঞ্জামের অভাব অনুভব করিবে। তাহাতে উদ্যম বাড়িবে এবং যাহা পাইবার ইচ্ছা হইয়াছে তাহা পাইতে চেষ্টা হইবে। কৃষিপ্রধান দেশে নানা শিল্পের সূচনা হইবে। দেশে কাঠের কারখানা, লোহার কারখানা, জুতার কারখানা, গাড়ীর কারখানা, কাপড়ের কারখানা প্রভৃতি বাড়িয়া যাইবে। এখন গ্রামের হাটে গিয়া দেখুন সেখানে দেখিবেন তরকারীর দোকান, মাছের দোকান, গামছার দোকান, চিঁড়ে বাতাসার দোকান, তেলের দোকান, মোটা কাপড়ের দোকান, বেনে-মসলার দোকান, মাটীর হাঁড়ির দোকান এবং মনোহারীর দোকান। এই মনোহারী দোকানে প্রায়ই সব বিলাতী জিনিষ। বড় বড় হাটে লোহা ও

জুতার দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় দেশের লোক কি পাইলে সন্তুষ্ট হয়। ইহার বেশী লোকের সাধারণ অভাব নাই। দেশের অর্থ বৃদ্ধি করিতে গেলেই অভাব বৃদ্ধি করিতে হইবে। অভাব বাড়িলেই উদ্যম বাড়িবে, উদ্যম বাড়িলেই শিল্প-প্রতিষ্ঠা হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে—কম অভাবই যখন মোচন হইতেছে না, অধিক অভাব কি করিয়া মিটিবে। ইহার উত্তরে যীশুখৃষ্টের কথা বলিতে হয়—যাহাদের আছে তাহারাই পায়, যাহাদের নাই তাহাদের নিকট হইতে সব কাড়িয়া লওয়া হয়। আমাদের অভাব কম বলিয়া উদ্যম নাই। গত বন্যার সময়ে কাঁথি অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম লোকে ভিক্ষা করিয়া খাইবে কিন্তু পরিশ্রম করিয়া অর্জ্জন করিবে না। সামান্য ভিক্ষালব্ধ ধনে তাহারা সন্তুষ্ট। পরিশ্রম করিয়া অধিক উপার্জ্জন করিতে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই। বাস্তবিকই ইহা শোচনীয় অবস্থা।

শিক্ষার ফলে আচার পরিবর্ত্তিত হইলে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। গ্রামের মধ্যে খাট টেবিল চেয়ার উত্তম কপাট চৌকাট প্রস্তুতের চেষ্টা হইবে। জমীর উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা হইবে। কেবল ধানের উপর লোকে নির্ভর করিবে না। উত্তম তরকারী উৎপাদনের আয়োজন হইবে। জমীতে সার পড়িবে। তাঁতীর কাজ বাড়িয়া যাইবে, ভাল ভাল কাপড় প্রস্তুত হইবে। ভাল ভাল জুতা প্রস্তুত হইবে। দর্জ্জির কাজ বাড়িয়া যাইবে, লোকে সুন্দর পোষাক চাহিবে। ইত্যাদি নানা রকম শিল্পের বৃদ্ধি হইবে। এইরূপে নানা ক্ষুদ্র শিল্পের সৃষ্টি হইবে। ইহাতে অধিক টাকার আবশ্যক নাই অথচ আয়ের উপায় হয়। দেখিতে পাওয়া যায় এই-সকল শিল্প সহরের কাছেই হয়। কারণ সহরের লোক শিক্ষিত। শিক্ষার বিস্তৃতি হইলে ইহা গ্রামের মধ্যেও প্রবেশ করিবে। ইহা গেল ক্ষুদ্র শিল্পের কথা। দেশে অর্থ আসিলে পথ ঘাট পরিষ্কার হইবে, যাতায়াতের সুবিধা হইবে, সুপানীয়ের ব্যবস্থা হইবে। স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসিবে।

বৃহৎ শিল্পের সমস্যা আরও কঠিন। ইহাতে অনেক টাকার প্রয়োজন। যৌথকারবারে ভারতবাসী এখনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। অর্থশালী ধনীর সংখ্যাও কম। যাহাদের অর্থ আছে তাহারা অল্পলাভে কিংবা লাভের সন্দেহস্থলে অর্থ দিতে প্রস্তুত নহে। সুতরাং এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা কম। আমার মনে হয়, গভর্ণমেণ্ট যেরূপ রেলওয়ে জাতীয় করিবার প্রয়াস পাইতেছেন সেই ভাবে বৃহৎ শিল্পগুলি জাতীয় করিতে পারিলে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। কোনও কোনও পাটের কলে দেখিতে পাওয়া যায় অংশীদারগণকে শতকরা ২০৲ টাকা বা ২৫৲ টাকা লাভ দেওয়া হইয়াছে। শতকরা ১০৲ দশ টাকার অধিক অনেক কারখানার লাভ। গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে শতকরা ৩৷৹ সাড়ে তিন টাকা বা ৪ চারি টাকা সুদে টাকা পাইতে পারেন। সুবিধা করিয়া লক্ষ টাকার অধিক দামের সমস্ত কারখানা যদি কিনিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে দেশের মহা উপকার হয়। যোগ্যতা-অনুসারে দেশীয় লোকদিগকে এইসকল কারখানায় কাজ দিতে হইবে। বিচার এবং শাসনবিভাগে দেশের লোক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ব্যবসায়েও দেশীয়দের কৃতিত্ব নিতান্ত কম নয়। শিল্পের কোন কোন বিভাগে দক্ষতা প্রকাশ পাইতেছে। সুযোগ পাইলেই মানুষের শক্তি ফুটিয়া উঠে। রাণী এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডের লোকে বাণিজ্যবিস্তার করিয়াছে। বাণিজ্যবিস্তারের ফলে দেশে ধনাগম হইয়াছে। ধনাগমের সঙ্গে কলকৌশল বাড়িয়াছে। ইহাকে বলে ভাগ্যলক্ষ্মীর তেলা-মাথায় তেলঢালা। Nothing succeeds like success। ইংলণ্ডের প্রবল রাজশক্তি এই ধনাগমের সাহায্য করিয়াছে।

ভারতবর্ষ সেই ব্রিটিশসাম্রাজ্যের প্রধান অঙ্গ। ভারতের অর্থবৃদ্ধি হইলেই ইংলণ্ডের সুখ ও আনন্দ। যে-ভাবে ইংলণ্ডের ধনবৃদ্ধি হইয়াছে ঠিক সেইভাবে ভারতবর্ষে নাও হইতে পারে, কিন্তু ভারতকে অন্যান্য দেশের ন্যায় সুযোগ দেওয়া উচিত। অষ্ট্রেলিয়ার সুবর্ণখনিসকল জাতীয় সম্পত্তি। তাহাতে দেশের অর্থ বাড়িয়াছে। জার্ম্মানীর রেলওয়ে এবং অন্যান্য অনেক শিল্প জাতীয়, সেইজন্য বোধ হয় জার্ম্মানী এত পরাক্রমশালী। আমাদের দেশের প্রধান শিল্পগুলি জাতীয় করার বিশেষ আবশ্যক। ইংলণ্ডে ভূমি

জাতীয় করিবার আন্দোলন চলিতেছে। এদেশে শিল্প জাতীয় করার প্রধান অন্তরায় বিদেশী ব্যবসায়ীগণ। তাহারা এতদিন ধরিয়া শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যদি তাহাদের হস্তচ্যুত হয় তবে আশঙ্কার সম্ভাবনা। এক উপায় করিলে এই বিপদ না ঘটিতেও পারে। যত কারখানা হইবে তাহাদের সহিত চুক্তি হওয়া আবশ্যক যে তাহারা দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষানবীশরূপে গ্রহণ করিবে এবং শিল্প শিক্ষা করিবার এবং পরিচালনা করিবার সুযোগ দিবে। দশবৎসর কিংবা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ঐ কারখানা ক্রয় করিয়া লইতে পারিবেন। ক্রমে যখন এই ভাবে অনেক দেশীয় লোকের শিক্ষা হইবে তখন গভর্ণমেণ্ট এই-সকল কারখানা পরিচালনের ভার দেশীয় লোকদিগকে দিবেন। এইভাবে গভর্ণমেণ্টের আয় বাড়িবে এবং দেশীয়দের শিক্ষা হইবে। সময় আসিলে, দেশের অর্থাগম হইলে, দেশীয় লোক বিদেশীর সমকক্ষ হইলে, সমস্ত কারখানায় সকলের সমান অধিকার দেওয়া যাইতে পারে। যখন দেখা যাইতেছে দেশীয় লোকদিগের সুযোগের অভাব এবং তাহাদিগের অধিকার নিতান্ত কম তখন গবর্ণমেণ্টের এই পন্থা অবলম্বন করা যুক্তি-বিরোধী হইবে না। কোন কোন বিভাগে গভর্ণমেণ্ট এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

লোককে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য সমবায়সমিতি (Cooperative Credit Society) প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ক্ষুদ্র চেষ্টা মিলিত করিয়া অনেক কাজ করা যায়। দেশের অর্থশালী ব্যক্তি যদি সত্যই দেশের উপকার করিতে চান তাঁহারা সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য করিয়া অনেক ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। অর্থের অভাবে লোকে কৃষির উন্নতি করিতে পারে না, ক্ষুদ্র শিল্পে হাত দিতে পারে না, বৃহৎ শিল্পের কল্পনাও করিতে পারে না। নানাদেশে সমবায়সমিতির দ্বারা প্রভূত মঙ্গল হইতেছে। রাফাইসন্ এবং স্কুলস্‌ডিলিসের কৃপায় জার্ম্মানীর অনেক অনুর্ব্বর প্রদেশ উর্ব্বর হইয়াছে। মিশরদেশের পিপল্‌স্ ব্যাঙ্কস্ অনেক উপকার করিয়াছে। এ কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতে সমবায়সমিতি অনেক কাজ করিয়াছে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় ইহাতে দেশীয় লোকদের বিশেষ উৎসাহ নাই। কারণ উত্তমর্ণদের ইহাতে লাভ কম এবং দরিদ্র প্রজাকুলের ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নিতান্ত অল্প নয়। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে রঘুপতির উত্তরকোশল আর নাই, যদুপতির মথুরাপুরীও নাই। স্বার্থান্ধ ধনী, তুমি মনে করিতেছ সম্পত্তিশালী হইয়া তুমি দরিদ্রগণকে তোমার কবলে রাখিবে? সময় আসিবে যখন তুমিও অপরের কবলে পড়িবে। তুমি অপরের সুখের চেষ্টা কর, নিজের সম্পদ কম হইলেও সুখ কম হইবে না। তোমার অল্পত্যাগে অপরের প্রচুর উন্নতি হইবে। দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। তাহা না করিয়া যদি সুখের অন্বেষণ কর, সুখ পাইবে না। ইহা কালের কঠোর নিয়ম। যদি কেহ অপরকে সাহায্য না করিয়া কেবল নিজে উঠিতে চায় তবে বাতাসে সে ভাঙ্গিয়া যাইবে। সমত্ব ও সমবায়ের মধ্যে ভয় নাই। সমত্ব-বাণী প্রচারের জন্য পাশ্চাত্যজগতে সোশ্যালিষ্ট সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান। এদেশে এ ভাবের কোন লক্ষণ বর্ত্তমান নাই। তবে পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বের ভাবের আদান-প্রদান চলিতেছে। সমাজের উন্নতির জন্য যাহা আবশ্যক হইবে তাহা একদিন-না-একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে। এদেশেও শ্রমজীবীদিগের সমিতি হইবে, ব্যবসায়ীগণের সঙ্ঘ হইবে, নানান আয়োজন হইবে, ভারতের বৈরাগ্য উড়িয়া যাইবে। অভাবের মধ্যে ধর্ম্ম হয় না, ধর্ম্ম অভাব-পূরণের উপায়ের মধ্যে।

আমরা দেখিলাম এ দেশের উৎপন্ন বাড়াইতে হইলে কর্ম্মকুশলতা ও অর্থের প্রয়োজন। শ্রমকুশলতার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সমবায় এবং বৃহৎ শিল্পের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও বিদেশীয় অর্থের আবশ্যক। পাশ্চাত্যদেশে দেখিতে পাওয়া যায় অনেক ব্যবসায় পরিচালন-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এই-সকল পরিচালকদিগকে Entrepreneur বলে। ইঁহারা অর্থশালী নহেন, কিন্তু ধীশক্তি-সম্পন্ন। ইঁহারা অর্থ ও শ্রমের সমাবেশ করিয়া দেশকে সম্পদশালী করেন। এইরূপ মেধা-সম্পন্ন পুরুষ ক্ষণজন্মা। তবে দেশের অনুকূল আব-হাওয়াতে এইরূপ মেধার উৎপত্তি হয়। যদি ভারতে শিল্প ও ব্যবসায়ের আবহাওয়া প্রবাহিত হয় তবে ধীশক্তি-সম্পন্ন পরিচালকের আবির্ভাব হইবে। মানুষকে তাহার জন্য

প্রস্তুত হইতে হইবে। জমী প্রস্তুত হইলে উপযুক্ত বীজ পড়িয়া শস্যের উৎপত্তি হইবে।

এখন দরকার মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ফিরাইয়া আনা। যেন প্রাণের স্পন্দন নাই; উত্তাপ দাও স্পন্দন আসিবে, আশার সঞ্চার হইবে, ক্ষুদ্রশক্তি উপযুক্ত কার্য্যে নিয়োজিত হইবে। ভারতবাসী পঙ্গু নয়, ক্রিয়াবিমুখ। একবার কর্ম্মের ভাব জাগিয়া উঠুক, দেশে নবজীবন আসিবে, দরিদ্রতা ঘুচিবে, স্বাস্থ্য ফিরিবে এবং ভারতের উৎপাদনী শক্তি বাড়িবে। পুরাকালে লোকে এই দেশকে অর্থশালী মনে করিত, তাহা আবার সত্য প্রতিপন্ন হইবে।

অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষের সমাজপদ্ধতি আর্থিক উন্নতির অন্তরায়। কথাটা যে একেবারে মিথ্যা তাহাও নহে। ভারতের জাতিভেদ একটা কৃত্রিম প্রাচীর খাড়া করিয়া লোককে কার্য্যনির্ব্বাচনের বাধা দেয়। আমার শক্তি এবং ইচ্ছা যাহাই হোক না কেন পূর্ব্বপুরুষের পেশা আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বপুরুষের পেশা গ্রহণ করার অনেক উপকারিতা আছে, যথা কার্য্যতৎপরতা নিপুণতা প্রভৃতি। এক বংশে এক পেশা চিরকাল থাকিলে সেইকাজে লোকে খুব দক্ষতা লাভ করে। কিন্তু অনেক-সময় আবার বিপরীত ফল ফলে। মানুষ নূতনত্বের পক্ষপাতী, একটা নূতন জিনিষ না দেখিলে তার জিজ্ঞাসার ভাব জাগ্রত হয় না। অভ্যাসবশতঃ পুরাতনে কৌতূহলের উদ্রেক হয় না, তাহাতে মানসিক বৃত্তির বিকাশের বাধা পায়। ক্রমে জ্ঞান হ্রাস হইয়া আসে, নিজের বংশের কাজও ভাল করিয়া করিতে পারে না। সেন্‌সাস্‌-রিপোর্ট পাঠ করিলে জানা যায় এদেশে জাতি-অনুসারে কর্ম্মের বিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ ব্যবসা করিতেছে, শূদ্র ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিতেছে, ক্ষত্রিয় শূদ্রের কাজ করিতেছে, তন্তুবায় উকীল হইয়াছে, ইহা ছাড়া নানাপ্রকারে কর্ম্মের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। যখন কর্ম্মব্যবসা বংশপরম্পরা হইতে নির্ব্বাচনে যাইবে, তখনি তাহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে। যাহারা কেবল পরম্পরা লইয়া ব্যস্ত তাহারা বদ্ধ, ক্রীতদাস, স্বাধীন মানুষ নয়। সাধারণজনমণ্ডলীর মধ্যে এখনও নির্ব্বাচনের ভাব আসে নাই, শিক্ষার সঙ্গে এই নির্ব্বাচনের ভাব ফুটিয়া উঠিবে।

শ্রমজীবীগণ যথেষ্ট লাভ করিতে পারে না তাহার প্রধান কারণ শ্রম অধিকাংশস্থলেই স্থিতিশীল। একস্থান হইতে অন্যস্থানে লোকে সহজে যাইতে চায় না। এ বিষয়ে বিহার ও আগ্রা-প্রদেশের লোক অগ্রণী, তাহারা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা গতিশীল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কল-কারখানায় অধিকাংশ শ্রমজীবী পরদেশী—হয় বিহার, নয় নাগপুর, নয় আগ্রা-প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে যত খনি আছে তাহার শ্রমজীবীগণ প্রায়ই ভিন্ন প্রদেশের, অথচ সেইসব স্থানে লোকে মাসে ১৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। গঙ্গায় যত জাহাজ ও নৌকা যাতায়াত করে তাহার সমস্ত খালাসী ও মাঝিমাল্লা মুসলমান। খালাসীরা প্রায়ই ১৫৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা রোজগার করিয়া থাকে। সাধারণ শ্রমজীবীগণের এ-সব বিষয়ে উদ্যম নাই।

কলিকাতার সমস্ত জুতার ও কাঠের কারবার চীন-দেশীয় লোকের হাতে চলিয়া যাইতেছে। এ দেশের লোক তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। উৎসাহী মাড়োয়ারীগণ আসিয়া কলিকাতা এবং বাঙ্গলার প্রত্যেক বাণিজ্যকেন্দ্রে বৃহৎ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। অথচ বাঙ্গালীরা হা অন্ন হা অন্ন করিয়া পরের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। টাকার কারবারে মাড়োয়ারী ও বিদেশী সরফগণ অগ্রগামী, বাঙ্গালী ততদূর নয়। অর্থের অভাবে বাঙ্গালী উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে না। বোম্বাইএর ব্যবসায়ীগণ অর্থ আছে বলিয়া এত দান-শীল। দানশীল তাতা সেইজন্য ভারতে বিজ্ঞানাগার স্থাপন করিবার জন্য এত দান করিতে পারিয়াছেন। ব্যবসায়ে বাঙ্গালীরা পশ্চাৎপদ। উন্নতিশীল জাতি ও সম্প্রদায় মাত্রেই গতিশীল। তাহারা নিজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ভারতের উন্নতির পথ এই দিকে। আমি ব্রাহ্মণ সুতরাং আমি সূত্রধরের কাজ করিব না কিংবা আমি বাঙ্গালী কেবল কর্ম্মের জন্য ব্রহ্মদেশে যাইব না বলিলে দেশে ধনাগম হইবে না। কেবল প্রাচীন রীতি-নীতির দিকে তাকাইলে প্রাচীনের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যাইব। প্রাচীন নবীনের মধ্যে আত্মহারা হইয়াছে, তেমনি প্রাচীন ভাব না ফেলিয়া দিলে জাতীয় শক্তি বাড়িবে না।

কোন জিনিষ চিরকাল একভাবে থাকিবে না। পরিবর্ত্তন প্রকৃতির নিয়ম, সমাজ এই নিয়মের অধীন। মানুষকে ইহা স্বীকার করিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। অনন্ত কাল-স্রোতের ন্যায় সমাজেরও গতি। প্রাচীনের সহিত নবীনের অবিচ্ছেদ সম্পর্ক। কিন্তু প্রাচীন কখনও নবীন নহে। অতীতের মধ্যে বর্ত্তমান নিহিত, কিন্তু বর্ত্তমান কেবল অতীতের পুনরভিনয় নহে।

তৃতীয় অন্তরায় আর্থিক দুর্গতির মধ্যে ধর্ম্মের নামে বিবাহ। লোকে স্বর্গলাভ করিবে বলিয়া বিবাহ করে, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় সংসারে নরকযন্ত্রণাই ভোগ করে। বাঙ্গলাদেশের লোক কর্ম্মশীল নয় তাহার প্রধান কারণ বোধহয় বাল্যবিবাহ। অল্পবয়সে সংসারে জড়িত হইয়া পড়িলে সাহসিকতার কার্য্য করিতে পারে না, ক্রমে জীবন হীনবল হয়। অন্যান্য প্রদেশে অল্পবয়সে বিবাহ হয় বটে কিন্তু তাহারা অপরিণত বয়সে একত্র বাস করে না। বিবাহের পরেও তাহারা পরিণত না হাওয়া পর্য্যন্ত নিঃসঙ্গ থাকে। সেইজন্য তাহারা অধিক বলিষ্ঠ ও কর্ম্মশীল। কেবল পুত্রোৎপাদন করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না; সামাজিক জীবন রক্ষা করিতে হইলে, প্রকৃতপক্ষে বংশ বৃদ্ধি করিতে হইলে, সন্তানের শিক্ষা ও কার্য্যক্ষমতালাভের উপায় করিতে হইবে। প্রত্যেকে চেষ্টা করে যে আমার সন্তানগণ আমা অপেক্ষা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, কিন্তু আমি যদি সংসারের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়ি সন্তানগণকে সে সুযোগ দিতে পারি না। তাহাতে বংশের দুর্ব্বলতা বাড়ে, দুর্ব্বলতা হইতে বিনাশ।

শ্রমশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে এই তিন অন্তরায় দূর করা আবশ্যক। তারপর শ্রম ও অর্থ-সমাবেশ এবং শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ের বন্দোবস্ত। আপাততঃ সে বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব না। শ্রমের উন্নতি করা আমাদের প্রধান আবশ্যক। পূর্ব্বে যাহা সম্পন্ন করিতে দুই ঘণ্টা লাগিত তাহা এক ঘণ্টায় করিতে হইবে, যাহা দুইজনে করিত তাহা একজনে করিতে হইবে, ইত্যাদি নানা উপায়ে শ্রমসংক্ষেপ ও শ্রমের শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইবে। আমাদের দেশের শ্রমজীবীগণ অপেক্ষা ইংলণ্ডের শ্রমজীবীগণ অধিক কর্ম্মশীল, ইহার কারণ কি পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে আমাকে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের যথাযথ বিতরণ হইতেছে কি না আলোচনা করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বস্তু-উৎপাদনের জন্য ভূমি এবং মূলধনের প্রয়োজন। উৎপন্ন দ্রব্যের উপর ইহাদের প্রত্যেকের দাবী আছে, তবে কি পরিমাণে কাহার প্রাপ্য স্থির করা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে ভূমির নির্দ্দিষ্ট হার এবং মূলধনের নির্দ্দিষ্ট হার থাকা উচিত। শ্রমই উৎপাদনের প্রধান সহায়, সুতরাং ভূমি ও মূলধনের পাওনা দেওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ শ্রমেরই প্রাপ্য। কিন্তু কোথাও তাহা হয় না। হয় ভূমি নয় মূলধন শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করে আর শ্রম নির্দ্দিষ্ট হারে সামান্য মাত্র পায়। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার শ্রমজীবীগণ এই বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন করিতেছে। কার্‌ল্ মার্কস শ্রমজীবীদিগের প্রাপ্য সম্বন্ধে যে সুযুক্তিপূর্ণ পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাকে শ্রমজীবীগণের বেদ বলা হয়। আমাদের দেশে শ্রমজীবীগণের বিষয়ে সে ভাবে কেহ আলোচনা করেন নাই। শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবী, তাহারা সমুদয় শক্তি দিয়া উৎপাদন করে আর ভূম্যধিকারী শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করে। তাহাতে শ্রমজীবীগণের শক্তি বাড়ে না। নিজের এবং স্ত্রীপুত্রকন্যার ভরণপোষণের জন্য একজন শ্রমজীবী যদি উপার্জ্জন না করিতে পারিল তবে সে শ্রম করিয়া কেবল বিনাশের দিকেই চলিল। একজন লোক সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া হয়ত চারি আনা পাইল। দুইসের চাল কিনিলেই তাহা ফুরাইয়া গেল। বস্ত্র, ঔষধ এবং শিক্ষার বন্দোবস্ত কোথা হইতে আসিবে? কেবল শ্রমের উপর তাহার পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে না। কৃষিপ্রধান দেশে এইরূপ অবস্থা। এই-সকল কারণেই শ্রমজীবীগণের দুর্দ্দশা বাড়িয়া যাইতেছে। সে দুই বেলা উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পায় না। সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিবে কি করিয়া? অথচ ভূম্যধিকারীর সুখ, ধনীর আনন্দ এই শ্রমজীবীর শ্রমে। তাহার মজুরের পারিশ্রমিক এক পয়সা বাড়িলে ভূম্যধিকারী নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে শ্রমজীবীকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্যদেশে কেহ কেহ মনে করেন যে যদি শ্রমজীবীকে ব্যবসায়ের অংশীদার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে সে লাভ করিবে অধিক এবং প্রাণ দিয়া

কাজ করিবে। কোন-কোন ব্যবসায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বাস্তবিকই তাহাতে শ্রমজীবীগণের এবং ব্যবসায়ীর উভয়েরই উন্নতি হইয়াছে। এ দেশে জমী ভাগে দেওয়ার প্রথা উত্তম বলিয়া আমার বিশ্বাস, তবে তাহার সঙ্গে কতকগুলি মন্দ সংস্কার আছে। জমী ভাগে দিলে তাহার সঙ্গে কিছু ধান্য দাদন দেওয়া হয় এবং আদায়ের সময় তাহার দ্বিগুণ কিংবা দেড়গুণ লওয়া হয়। তাহাতে শ্রমজীবীর যাহা প্রাপ্য তাহার অনেক কমিয়া যায়। সে যে-দুর্দ্দশার মধ্যে ছিল সেই দুর্দ্দশার মধ্যেই থাকে, ভূম্যধিকারীর বোঝা বহিয়াই মরে।

বড়-বড় কলকারখানায় কুলী নির্দ্দিষ্ট মজুরী পায় আর পরিচালক রাজা হইয়া যায়। ইত্যাদি নানাপ্রকারে উৎপন্ন দ্রব্যের যথাযথ বিভাগ হয় না। শ্রমজীবীগণ শিক্ষার অভাবে ইহা লইয়া আন্দোলন করিতে পারে না, তাহারা কলের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। কোন কোন স্থলে তাহারা যে অর্থ পায় তাহার অপব্যবহার করিতেছে। প্রভু তাহাদের নীতি এবং জীবন-বিষয়ে উদাসীন। তিনি নিজের লাভের জন্য ব্যস্ত। প্রভুর উচিত শ্রমজীবীগণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং তাহাদের সন্তানগণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট শ্রমজীবী-সম্পর্কীয় কোন-কোন বিষয়ে আইন করিতেছেন। তাহা হইতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। কিন্তু স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকগণ যদি শ্রমজীবীদিগের মূল্য বুঝিয়া তাহাদের উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে প্রকৃত উন্নতি হয়। নতুবা আইনে ফাঁকির অভাব হয় না।

তৃতীয় প্রশ্ন বিনিময়ের। দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার বিক্রয় আবশ্যক। বিক্রয়-লব্ধ অর্থে আবার উৎপাদন হইবে। উৎপন্ন দ্রব্য জমিয়া থাকিলে পুনরুৎপাদন হইতে পারে না। আবার ক্রয়-বিক্রয়ের প্রণালীর উপর লাভালাভ নির্ভর করে। দরিদ্র প্রজা যাহা উৎপাদন করিয়াছে তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিলে খাজনা দিতে পারিবে এবং সংসারের অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিতে পারিবে। কিন্তু যে কিনিবে সে-সময়ে তাহার তত আবশ্যক না থাকিতে পারে, সুতরাং মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হইবে। সরবরাহ ও অভাবের সমাবেশে জিনিষের মূল্য স্থির হয়। যদি অভাব অপেক্ষা সরবরাহ অধিক হয় তবে মূল্য কম হইবে। আবার যদি অভাব সরবরাহ অপেক্ষা অধিক হয় তবে দাম অধিক হইবে। যে-পরিমাণে অভাব সেইপরিমাণে সরবরাহ হইলে যে মূল্য হইবে তাহাকে সাধারণ মূল্য বা ন্যায্য দাম বলা হয়।

আমাদের দেশে যে-সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার জন্য অভাব যথেষ্ট। ধান্য, গম, ভুট্টা, ডাল, চা, পাট, কয়লা, কার্পাস প্রভৃতির অভাব যথেষ্ট, এদেশে এবং বিদেশে এসকল দ্রব্যের আবশ্যকতা আছে। মহাজনগণ এইসকল দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করে। তাহারা কৃষকের নিকট ক্রয় করিয়া লইয়া যেখানে এইসকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় না অথচ আবশ্যক আছে তথায় বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করে। একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়ার জন্য তাহাদের পরিশ্রম হয়, এবং এই ব্যবসায়ে বিপদ ও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, সেইজন্য লাভের পরিমাণ কিছু বেশী ধরা হয়। দেশীয় মহাজনগণের স্থান এখন বিদেশীগণ অধিকার করিতেছে। ভারতের চা, গম, পাট, কার্পাস প্রভৃতি যে-সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয় তাহা সমস্ত বিদেশী বণিকের হস্তে। বাণিজ্যে হল্যাণ্ড এক-সময়ে খুব ধনী ছিল; এখন ইংলণ্ড, আমেরিকা ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। ভারতে এ বিষয়ে এখনও সাড়া পড়ে নাই। শুনা যায় পুরাকালে ভারতীয় বণিক পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমরা এখন তাহার গর্ব্ব করিয়া থাকি, কিন্তু এখন দেখিতেছি আমাদের সামান্য বস্তুটি পর্য্যন্ত বিক্রয় হয় বিদেশী বণিকের দ্বারা, এবং আমরা বিদেশ হইতে যে-সকল বস্তু আনাই তাহা বিদেশীর দ্বারা। আসাম হইতে কলিকাতায় চা আসিবে বিদেশী জাহাজে, কলিকাতা হইতে গেঁওখালী আসিব বিদেশী জাহাজে, হাওড়া হইতে কাঁথি আসিব বিদেশী রেলে। কলকারখানায়, বহনকার্য্যে, বিক্রয়ে, আমরা সর্ব্বত্র বিদেশীর করতল-গত। ইহাতে ভারতের অর্থ-বৃদ্ধি হইবে কি করিয়া? ভারতের অর্থে লাভ করিবে বিদেশী অংশীদার ও বিদেশী পরিচালক বা ম্যানেজার আর ভারতবাসী পাইবে কুলীর বেতন। বিদেশী মহাজন টাকা দাদন দিয়া ভারতের কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয় করিল, শিল্প একচেটিয়া করিল, সমস্ত

ব্যবসায়ের লাভ বিদেশে লইয়া গেল। ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে ব্যবসা ও বাণিজ্যে ভারতবাসীকে অগ্রসর হইতে হইবে। এখানেও অক্ষমতা ও অর্থাভাব। ইহা দূরীকরণের উপায় কি? সহজে ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে প্রত্যেক কার্য্যেই সামান্য আরম্ভে ক্রমে সুফলের সম্ভাবনা। প্রথমে গ্রামের মধ্যে ব্যবসায়ে নিজেরা প্রবেশ করিতে হইবে। শিক্ষিতলোকে যদি চাকরীর আশা পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে মন দেন, তাঁহারা ব্যবসায়ে নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবেন, ছোটবাজার হইতে ক্রমে বৃহৎ-বাজারে ব্যবসায় প্রসারিত করিতে পারিবেন। দেশের মধ্যে সহজে কোন্ জিনিষ উৎপাদন করিতে পারা যায় তাহার উৎসাহ দিতে হইবে এবং কোন্ জিনিষ অপর-স্থান হইতে আনিলে বিক্রয় হইতে পারে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রথমে যখন এদেশে বিলাতী কাপড়ের আমদানী হয় তখন পাড় ভাল হইত না, লোকে এ রকম কাপড় পছন্দ করিত না। বিদেশী কারখানা হইতে এদেশে লোক আসিল লোকের পাড়ের রুচি-পর্য্যবেক্ষণের জন্য। ফলে হইল বিলাতী কলে খুব সুন্দর সুন্দর মন-ভুলান পাড় প্রস্তুত। এদেশী কাপড়ের জায়গায় লোকে সস্তায় সুন্দর কাপড় পরিতে লাগিল। ইহাকে বলে ব্যবসায়ে উৎসাহ। এদেশে শিল্পপ্রদর্শনী হয়, লোকে শিল্পে প্রতিযোগিতা করিবে বলিয়া, কিন্তু লাভবান হয় বিদেশী ব্যবসায়ী। তাহারা এদেশের বিশেষত্ব বেশ সহজে বুঝিতে পারে। জাপান অতি অল্পদিনের মধ্যে ভারতে বাণিজ্য বাড়াইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু চীন ও জাপানে ভারতের ব্যবসা কমিয়া যাইতেছে।

অনেকে মনে করেন ভারতে অবাধ-বাণিজ্য আছে বলিয়া এদেশে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে না। অবাধ-বাণিজ্যকে এদেশের দারিদ্র্যের কারণ অনেকে বলেন। কথাটা একেবারে অযৌক্তিক না হইতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের নিষ্ক্রিয় ভাব এই দুর্দ্দশার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। আমরা অদ্যকার আহার থাকিলে কল্যকার জন্য চিন্তা করি না, বর্ষাকালে চাষ করিয়া শরতে বাবুগিরি করি, একটা দোকান ভাল করিয়া চালাইতে পারি না। আর আমরা চাই অর্থ ও স্বাধীনতা! অবাধ-বাণিজ্যে দেশের অসুবিধা হইতে পারে কিন্তু সে অসুবিধা দূর করা নিতান্ত কঠিন নয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ আমাদের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের বুদ্ধি আনয়ন করা। আমরা ভাল করিয়া কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিলে, সুতা তৈয়ারী করিতে পারিলে, বিলাতী আমদানী কমিতে পারে। অবাধ বাণিজ্য উঠিয়া গেলে কেবল দরিদ্রের পক্ষে দাম বাড়িবে আর লাভ হইবে কয়েকজন ধনীর। অবাধ-বাণিজ্যের সমস্যা বা স্বর্ণমুদ্রার সমস্যা আমাদের প্রধান সমস্যা নয়। দরিদ্র দেশে রৌপ্য-মুদ্রাই যথেষ্ট। মুদ্রাসমস্যা বা অবাধ-বাণিজ্যের আলোচনা করিয়া বিশেষ লাভ নাই। প্রধান আলোচনা হওয়া উচিত কি করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি হয়।

ধনবৃদ্ধির প্রধান সহায় চরিত্র। চরিত্রের উপর ব্যবসায়ের ফলাফল নির্ভর করে। আমি যাহা বুঝি না তাহা যদি করি তাহাতে আমার দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পায়। কয়েকস্থলে দেখা গিয়াছে লোকে আপনার লোককে নিযুক্ত করিবে, সে কাজ জানুক আর না জানুক। যৌথ-ব্যাঙ্ক করিয়া টাকা ধার দিবে কুটুম্বকে, তার শোধ করিবার ক্ষমতা থাকুক আর না থাকুক। এইসকল দোষ চরিত্রহীনতার পরিচয়। সম্প্রতি যে কয়টি ব্যবসায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ দোষের জন্য।

দ্বিতীয় আবশ্যক অতৃপ্তি। সামান্য লইয়া তৃপ্ত হইতে পারি না। অতৃপ্তির ফলে আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম বাড়িবে। সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে অতৃপ্তি দেখা যায়, কিন্তু আমরা অনেক সময় সামান্যতেই সন্তুষ্ট হইয়া পড়ি, তাহাতে আর্থিক উন্নতি হয় না। আমেরিকায় ছোট ব্যবসায় হইতে কোটি কোটি টাকার এক একটি কারবার চলিতেছে। পরিচালকগণ এক এক দেশের শাসনকর্ত্তার মত ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন, তবুও তাহাতে সন্তুষ্ট নন। লক্ষ-লক্ষ শ্রমজীবী তাঁহাদের অধীনে কর্ম্ম করিতেছে। সেনাপতির ন্যায় পরিচালক সকলকে চালাইতেছেন। প্রবল আকাঙ্ক্ষার জন্য ইহা ঘটিয়াছে।

তৃতীয় আবশ্যক বিশ্বাস। পরস্পর পরস্পরকে না বিশ্বাস করিলে ব্যবসায় চলিতে পারে না। শ্রমজীবী পরিচালককে বিশ্বাস করিবে, পরিচালক শ্রমজীবীকে বিশ্বাস

করিবে, ধনদাতা বা অংশীদার পরিচালককে বিশ্বাস করিবে। যন্ত্রের ন্যায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি না বিশ্বাস করিয়া না নির্ভর করিতে পারে, যন্ত্র বিকল হইয়া যাইবে। বিশ্বাসের দ্বারা ক্ষুদ্র অর্থ বৃহৎ সমষ্টিতে পরিণত হইবে, কর্ম্মকুণ্ঠব্যক্তি কর্ম্মশীলের হস্তে অর্থ অর্পণ করিবে, তবে দেশের অর্থ বৃদ্ধি হইবে। যৌথ-কারবার ব্যতীত বৃহৎ-কারবার পরিচালন অসম্ভব এবং বিশ্বাস ব্যতীত যৌথ-কারবার অসম্ভব। অন্যান্য দেশে ব্যবসাদারগণ আবশ্যক হইলে ব্যাঙ্কের নিকট ধার গ্রহণ করে এবং সহজে ধার পায়। আমাদের দেশে ব্যবসাদারগণ সহজে ধার পায় না। টানাটানির সময় ধার না পাইলে ব্যবসায় বিনাশ পায়। দেশীয় ব্যাঙ্ক হইলে দেশীয় ব্যবসাদারের সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সততা ও বিশ্বাস ব্যতীত ব্যাঙ্ক চলিতে পারে না।

আমি এই প্রবন্ধে ভারতের অর্থসমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি মোটা কথা আলোচনা করিলাম। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, দেশে শিক্ষার বিস্তার, চরিত্রের উন্নতি, ব্যবসা ও বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি, ব্যবসাকেন্দ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা, গ্রামের মধ্যে সমবায়-সমিতি, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা, শিল্প-শিক্ষা ও বৃহৎ কারখানা পরিচালনের আয়োজন, ক্রমে বাণিজ্য-বিস্তার প্রভৃতি অত্যন্ত অত্যাবশ্যক বিষয়ে ভারত-বাসীর বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। তাহা হইলে দেশে লক্ষ্মী আসিবেন। জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি হইবে এবং জীবনের অনেক সংগ্রামে মানুষ টিকিতে পারিবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল।

হোঁদের কথা

আমাদের দেশে (ভারতবর্ষে) যেমন সভ্যলোক অনেক কাল থেকে বাস করে আসচে—আবার তেমনি অসভ্য জঙ্গলীরাও গভীর বনে পাহাড়ের গায়ে কুঁড়ে ঘরে আজ পর্য্যন্ত বাস করে। এদের সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে তফাত এই যে আমরা লিখতে পড়তে জানি আমরা ক্রমে ক্রমে তাই সভ্যতায় খুব দিন দিন বেড়ে উঠ্‌চি, আর ওরা লেখাপড়া যে কি তাই জানে না—তাই ঠিক্ হুবহু আগেও যেমন ছিল এখনও সেইরকম আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য যে ওরা খুব অল্পেই সন্তুষ্ট। আর আমরা যতই বড় হচ্চি অভাব ততই বাড়চে। আমাদের গাড়ী হ'লে মোটর, মোটর হ'লে এরোপ্লেন, এমনি করে ক্রমশঃ অভাব বাড়ে—আর ওরা এখনও একটা আস্ত গাছকে এড়োভাবে কেটে গাছের চারিধার যেমন এবড়োখেবড়োই থাক গাড়ীতে লাগিয়ে চাকার কাজ করে নেয়। আমাদের কিন্তু তাই বলে ওদের মত নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। ওরা থাকে জঙ্গলে, তাই গাছপালার মত স্বাভাবিক ভাবে আপনাআপনি বেড়ে ওঠে ;—আর আমরা থাকি পাঁচিলঘেরা লোকালয়ে, তাই আমাদের ঠেলাঠেলি করে বড় হ'য়ে উঠ্‌তে হয় এই তফাৎ।

অসভ্য হোজাতির বহু আগেকার বিষয় কিছুই জানা যায় না। ওদের দেশ রাঁচিজেলার অসভ্যদের দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে। এদের সঙ্গে রাঁচি জেলার মুণ্ডাদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিল আছে। তবে, আমাদের বাঙলায় যেমন পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ আছে আর তাদের সকলেরই ভাষা আর চালচলন কিছু-না-কিছু তফাৎ, এদেরও ঠিক্ মুণ্ডা, সাঁওতাল, খেড়িয়া প্রভৃতির সঙ্গে সেইরকম আচারে বিচারে, ভাষায় ভঙ্গীতে কিছু কিছু তফাৎ। যেমন, রাঁচিজেলার লোকে মাঠকে বলে 'পিড়ি' আর 'হো'রা বলে 'পি'; মুণ্ডারা মেয়েকে বলে 'কুড়ি', 'হো'রা বলে 'কুয়ি'; এইরকম মুণ্ডারা বাড়ীকে বলে 'ওড়া' হো'রা 'ওয়া' বলে।

হোদের যে আর একটা নাম 'লড়কাকোল' আছে সেটা ওদের আসল নাম নয়। ওরা লড়াই ভালবাসে ব'লে 'লড়কা' নামটা চ'লে আসচে। এদের ছোটছোট ছেলেরা গরুচরাতে যাবার সময় বা অপর সময় সর্ব্বদাই হাতে তীরধনুক রাখে। ছেলেদের খেলাই হ'ল তীর ছোড়া—বড় হ'লে তারা শেষে খুব ভাল তীরন্দাজ হ'য়ে দাঁড়ায়। 'হো' মানে ওদের ভাষায় মানুষ। আর মুণ্ডারিরা নিজেদের 'মুড়া' বলে, এ কথাটার মানে 'মুণ্ড' (মাথা বা শ্রেষ্ঠ)। দেখা যায় সবজাতের লোকেরাই নিজের নিজের জাতকে সব চেয়ে বড় দেখে। এই অসভ্য 'হো'রা তাই কেবল নিজেদের 'হো' 'হোড়ো' বা

'মানুষ' বলে, আর মুণ্ডারা নিজেদের 'মুড়া', 'মাথা' বা শ্রেষ্ঠ বলে।

অসভ্যজাত মাত্রেই দেখা যায় ফুল আর রঙচঙ খুব ভালবাসে। এরাও তাই রঙ আর ফুল খুব পছন্দ করে। কোথাও লাল টক্‌টকে ফুল দেখলেই সেটি তুলে পুরুষেরা কাণে আর মেয়েরা তাদের উড়ে মেয়েদের মত করে বাঁধা এক পেশে খোঁপায় গুঁজে ফেল্‌বে। এদের বাড়ী তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন, আবার ঘরের দেয়ালে নানা-রকম লাল, হলুদ, সাদা কালো মাটি দিয়ে চিত্রবিচিত্র করা। সবারই ঘরের সামনে ঐরকম পরিষ্কার উঠান (রাচা) থাকে, সেইখানে কাজকর্ম্মের পর কিছুক্ষণ অনেকে এক সঙ্গে বসে বসে তাদের চাষবাসের সুখদুঃখের কথাবার্ত্তা কয়। এদের ঘর তৈরীর একটা মস্ত দোষ এই যে, আলো হাওয়ার জন্যে এরা জানালা আদৌ রাখে না, কেবল ঘরে ঢোকবার একটিমাত্র দরজা থাকে। বাঘ ভাল্লুকের ভয়ে এদের বাড়ীর উঠান খুব ছোট করে আর চারপাশটা খুব উঁচু পাথরের বা কাঠের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে রাখে।

এদের চাষবাস করেই চলে। ওদের চাষবাসের আবার অনেক দেবদেবী আছেন, তাঁদের কথা ক্রমশঃ বলব।

এই সব অসভ্যদের চেহারা প্রায়ই বিশ্রী। গায়ের রং কালো মিশমিশে, ঠোঁট পুরু, নাক থাঁদা, চোখ ফুলো ফুলো। কিন্তু, হোদের মধ্যে কোন কোন অঞ্চলের লোককে বেশ সুশ্রী আর ফর্সা দেখা যায়। এদের পুরুষ আর মেয়েরা সকলেই খুব খাটে বলে ওদের শরীরের গঠন খুব সুন্দর হয়। এরা প্রায় আমাদের দেশের সভ্যদের চেয়ে বেশীদিন বাঁচে। খুব বুড়ো হ'লে আমাদের লোকেরা যেমন অথর্ব্ব হয়ে পড়ে এরা তা' হয় না। মরবার আগে পর্য্যন্ত বন থেকে গাছে চড়ে কাট কেটে ঘরে আনতে ও কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে জমি তৈরী করতে এদের দেখা যায়।

'হো'রা দিকুর (বিদেশীর) সঙ্গে মিশতে ভালবাসে না। এরা অনেককাল থেকে ভুইয়া বা জৈনদের সংশ্রবে এসেছিল বটে, কিন্তু তাতে ওদের স্বাভাবিক আচারবিচার বা অন্য কিছুরই বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়নি।

এরা কিছুকাল আগে কাপড় পর্য্যন্ত পরতে জানত না। কেবল কোমরের কাছে একটু পাতালতা দিয়ে বেঁধে জড়িয়ে রাখত। 'সারাণ্ডাপি' বলে এক যায়গায় পাহাড়ী অঞ্চলের লোকেরা এখনও পর্য্যন্ত এইরকম ভাবে পাতা পরে থাকে। আজকাল 'হো'রা একরকম খুব মোটা সুতির কাপড় পরে। ওরা নিজেরা এই কাপড় বুনতে জানে না। বহুকাল পূর্ব্বে যেসব তাঁতি ওখানে গিয়ে বসবাস করেছিল তাদের বংশধরেরাই তাদের কাপড় বোনে। এই তাঁতিরা বেশীদিন ওদের সঙ্গে থেকে থেকে ওদের মতই হয়ে পড়েচে। বিজাতির সংসর্গে এসে কচিৎ একটা কি দুটো সংস্কৃত কথা ওদের ভাষায় ঢুকেচে দেখা যায়। যেমন, রাখালকে (গোপকে 'গুপিণী' বলে। প্রাচীরকে 'পাচ্‌রি', অঞ্জলিকে 'অঞ্জলি' বলে। আবার কর্কটকে (কাঁকড়াকে) 'কাটকোম্‌'; গাছকে 'দারু' বলে। এদের ভাষায় কথার সংখ্যা খুবই কম, তাই ওদের একটি কথাতে অনেক ভাব প্রকাশ করতে হয়। যেমন আকাশকে 'সিরমা' বলে আবার বৎসরকেও 'সিরমা' বলে। আকাশ যেমন অনেকটা স্থান জুড়ে থাকে তেমনি বৎসরও অনেকটা সময় জুড়ে থাকে, তাই ঐ এক কথাতেই ওরা দুটো ভাবই প্রকাশ করে।

সিংভূমের রাজা (জমিদার) নিজেদের মাড়োয়ার দেশের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে মারকুইস ওয়েলেসলির সঙ্গে এখানকার রাজার পূর্ব্বপুরুষ কানুয়ার অভিরামসিংএর সঙ্গে সন্ধি হয়। এইসময় লড়কাকোলেরা জমিদারের খাজনা-আদায়ের অত্যাচারে সবাই মিলে একজোট হ'য়ে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। রাজার সৈন্যরা এই বিদ্রোহ কিছুতেই থামাতে পারেনি—অনেককাল ধরে এদের অশান্তির কাল চলে। হো'রা শেষে এমন হয়ে উঠেছিল যে হিন্দু বা অপর কোন জাতকে নিজেদের ত্রিসীমানায় আসতে দিত না। তাদের দেশের ভিতর দিয়ে জগন্নাথতীর্থ প্রভৃতি কোন যায়গাতেই যেতে দিত না—নানারকম অত্যাচার করত। শেষে রাজা অপর কোন উপায় না দেখে ইংরেজদের শরণাপন্ন হলেন। মেজর রাফসেজ কামান-বন্দুক আর অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে তবে এইসব ধনুক-

ধারী হোদের থামাতে পেরেছিলেন। সাহসী লড়কা-হোরা সহজে ছাড়েনি। শত শত আগুনের গোলার সামনে মরণ নিশ্চয় জেনেও শুধু তীর ধনুক নিয়ে এগোনো অসম সাহসিকের কাজ। এই সময় লড়কাদের লড়াই একটা অদ্ভুত কাণ্ড। এই যুদ্ধে মেজর সাহেবের প্রাণ অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছিল। আবার কিছুদিন পরে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ওদের দমন করবার জন্যে পুনরায় ইংরেজদের প্রচুর আয়োজন করতে হয়েছিল। তখন তারা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে রাজাকে লাঙ্গল-পিছু আট আনা খাজনা দেবে বলে স্বীকার করলে। এবার ইংরেজ সরকারের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে তাঁদের অধীনে বাস করবার তারা ইচ্ছা প্রকাশ করলে। সে-সময় সরকারবাহাদুর তাতে রাজি হননি। পুনরায় ১৮৩৬ খঃ যখন রাজা আর কোন মতেই প্রজাদের চালাতে পারলেন না, তখন সার টমাস্ উইল্‌কিন্‌সন্ প্রথমে লড়কা হোদের চাঁইবাসার এলাকাভুক্ত করে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ গভর্মেণ্টের দখলে আনেন। আজ পর্য্যন্ত সেই ভাবেই ওখানকার রাজকাজ চলে আসচে।

বাঙলাদেশ বা হিন্দুস্থানের অপর যায়গার মত হো'রা পূর্ব্বকালে মুসলমান বা অপর রাজার সম্পূর্ণ বশ্যতাস্বীকার কখনও করেনি এখনও পর্য্যন্ত এদের কতকটা সেই স্বাধীন ভাব আছে। এদের প্রতি গভর্মেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহ। এদের উপর পুলিশ চৌকিদার বা খাজনা-আদায়ের জন্যে নায়েব নিযুক্ত করার নিয়ম একেবারেই নেই। এদের প্রত্যেক গ্রামে একজন করে প্রধান আছে তাকে এরা 'মুণ্ডা' বলে। আর চারপাচটি গ্রাম নিয়ে এক একজন 'মান্‌কি' আছে। মানকিরা পুলিশের দারোগার কাজ করে আর মুণ্ডারা গ্রামের খাজনা আদায় করে মানকির হাতে দেয়— মানকিই সেগুলি গভর্মেণ্টকে দেয়।

অসভ্য বলে এদের ভয় করবার কিছুই নেই। এরা খুবই সাধাসিধে আর খুব সত্যবাদী। বরং এদের মধ্যে যারা খৃষ্টান হয়ে আজকাল বাবুয়ানা শিখেচে আর যারা চাঁইবাসার আদালতের সংশ্রবে এসেচে তারাই সরলতা ভুলে গেছে—ধূর্ত্ত হ'য়ে পড়েচে। হো'রা সহজে অপর জাতের সঙ্গে মিশতে চায়না বলে মুণ্ডা বা অপর সব অসভ্যদের মত সহজে খৃষ্টান হয়ে যায় না বা আসাম প্রভৃতিতে চাবাগানের কুলির কাজে দেশ ছেড়ে যায় না।

এরা নাচগান ও গল্পস্বল্প ভালবাসে। এদের প্রত্যেক গ্রামে নাচবার বিশেষ জায়গা আছে। সাধারণতঃ তাকে "আখড়া" বলে। সমস্তদিন কাজকর্ম্মের পর এই আখড়ায় গাঁয়ের একপাশে একটা খোলা যায়গায় সব যুবকযুবতী মিলে মদ খেয়ে নৃত্য করতে থাকে। সেখানে কোনরকম আলো জ্বালার ব্যবস্থা থাকে না। অমাবস্যার অন্ধকারেই নাচগান এদের বেশী জমে।

পৃথিবীর জন্মসম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বহুকাল থেকে এদের চলে আসচে। এদের প্রধান দেবতা হলেন 'সিংবোঙ্গা'—সূর্য্যদেব। আর দেবী, তাঁর স্ত্রী 'চাণ্ডু' চাঁদ। এই দুটি ছাড়া আরো অনেক ছোটখাটো দেবতা আছেন। যেমন 'চালালা', 'সে সুথবোঙ্গা' আর তাঁর বৌ 'পানগোরা' এদের বছরে সাতটা পর্ব্ব। প্রায় সব পর্ব্বই ওদের চাষবাস নিয়ে। ওদের মাঘি-পরব সবচেয়ে বড় উৎসব। এই পূজোতে দেমাউলিবোঙ্গার পূজো হয়। এই সময় ধেনো মদ খেয়ে মেয়েপুরুষে সব নিজেদের নিশান উড়িয়ে নৃত্য জুড়ে দেয়। সমস্ত মাঘমাসের কোন-একটা দিনে যে-কোন গ্রামে দলে দলে লোকজন জড় হয় আর ওদের আখড়ায় নাচগান হয়। ঘরে ঘরে মদখাওয়া আরম্ভ হয়। কোন্ গ্রামে কবে এই উৎসব হবে প্রায় তার ঠিক্ থাকে না। যেগ্রামে যেদিন হয় সেইগ্রামে দলে দলে কাছাকাছি অপর-অপর পল্লীর লোক এসে জড়ো হয়। এদের নাচ সাঁওতালদের মতই হাত ধরাধরি করে—একদল স্ত্রীপুরুষে তালে তালে পা ফেলে একবার এগিয়ে একবার পেছিয়ে একবার ঝুঁকে একবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সিপাইদের ড্রিলের মত। ওদের নাচে একজন-না-একজন পুরুষ মাদল বাজিয়ে থাকে, এই মাদলের তালে নাচ খুব ভাল জমে।

'বা-বোঙ্গা' নামে ওদের অপর উৎসবটি বসন্ত-উৎসব। যেসময় শালগাছের ফুল ফোটে সেই সময়ে এই উৎসব হয়। হো ভাষায় ফুলকে 'বা' বলে। এই ফুলের গন্ধে খুসি হয়ে উঠে ওরা নাচগান মেলা-ভোজ আরম্ভ করে দেয়। ছেলে-মেয়েরা সেই সব ফুল তুলে মালা গেঁথে ঘর সাজানোর

আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে! উৎসবের আর-একটি আয়োজন হচ্চে মুরগী বলি।

তৃতীয় উৎসবটি হয় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে; এটি ক্ষেতের কল্যাণের জন্যে। এর নাম 'দামুরাই'; এটা প্রায়ই ওদের পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে হয়। একটি মুরগী, একটি পাঁঠা, ভোগ দিতে হয়, তা না হ'লে পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মা ফসলের বীজ নষ্ট করে দেন, এই তাদের বিশ্বাস।

চতুর্থটির নাম 'হোরোবোঙ্গা।' এটি আষাঢ় মাসে সম্পন্ন হয়। এসময় বাড়ীর কর্ত্তা একটা 'বেলওয়া' গাছের ডাল ক্ষেতে পুঁতে দিয়ে আসেন, আর পুরুতেরা সেখানে একটা পাঁঠা, এক হাঁড়ি (ডিয়ং) মদ আর একমুঠো চাল উৎসর্গ করে আসে। এরপর আবার তৌলি বোঙ্গার পূজো। শ্রাবণে যখন খুব বৃষ্টি পড়ে তখন প্রত্যেক চাষী-মুরগী বলি দিয়ে তার একটা ডানা নিয়ে তাতে মন্ত্রপড়ে একটা বাঁশের আগায় বেঁধে ক্ষেতে পুঁতে রেখে আসে। তা না হলে ধান ভাল হয় না, এদের বিশ্বাস।

ভাদ্র মাসের শেষে যখন গোড়া-(আউস) ধান পাকে তখন ওদের প্রথম ফসল 'সিংবোঙ্গাকে' দিতে হয়। এই উৎসবটির আগে নূতন চাল খায় না। আমাদের যেমন অঘ্রান মাসে নবান্ন হয় ওদেরও ঐ উৎসবটি তেমনি। একটি সাদা মুরগী ওরমাদেবকে নিবেদন করে তাঁর নাম স্মরণ করে। একে 'জুমনামা' বলে। দেবতাকে না ধন্যবাদ দিয়ে নতুন ধান খাওয়া মহা অধর্ম্ম মনে করে।

তারপর শেষ উৎসবটির নাম 'কমলাবোঙ্গা'। এটি ধান-মাড়ানোর জায়গা অর্থাৎ খামার থেকে ধান-তোলার উপলক্ষ্যে হয়। অপর সব পূজোর মত এতেও মুরগী-বলি আছে।

হো'রা শুওর গরু ছাগল পোষে। এরা গরু পাঁঠা মুরগী খায়, কিন্তু সাঁওতাল, মুণ্ডাদের মত শুওর সাপ খায় না। অনেক সময় গাছের কাঁচা পাতা এদের এখনও খেতে দেখা যায়। ওরা অপরের হাতের রাঁধা কিছু খায় না। এমন কি ওদের রাঁধা খাবারের উপর অপর জাতের ছায়া পর্য্যন্ত পড়লে সে রান্না ফেলে দেয়। আমরা ব্রাহ্মণকে সব জাতের বড় জাত বলি, কিন্তু ওরা তাদের হাতেও খায় না, কেননা ওরা নিজেদের ব্রাহ্মণদের চেয়েও বড় জাত বলে মনে করে। এদের আচারবিচার ভারি মজার। সব কথা লিখতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে, তাই একটিমাত্র আচারের কথাই বলচি। ছেলের নামকরণ করবার সময় সাধারণতঃ ঠাকুরদাদার নামই ওরা রাখে, তবে আরও একটা পরীক্ষা আছে। ছেলের বাপমা ভাইবোন আত্মীয়স্বজন এক-জায়গায় বসে একটি পাত্রে জল রাখে, তাতে একে একে ধান ফেলে, যদি বেশী ধান ভাসে তবেই ছেলের ঠাকুর-দাদার নামে নামকরণ হয়, তা না হ'লে যেদিন হয়েচে সেই-দিনের যেমন, সোমবারে জন্মালে 'সোমা' বৃহস্পতিতে জন্মালে 'বিরসা' এইরকম বা অন্য একটা কিছু নাম দেয়। এই উপলক্ষ্যে আত্মীয়স্বজনকে ছেলের বাপমা মদ-মাংস-ভোজ খাওয়ান। নাচগানও হয়।

হো'দের বিয়েতে যিনি বর তিনি কনের বাপকে পণ দিয়ে বিয়ে করেন। কনের বাপকে বলদ আর ধান দেওয়ার নিয়ম। টাকা খুব সামান্য দিলেই চলে। পণটি কিন্তু বিয়ের আগেই কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। বলদ আর ধান দেখলে কন্যার বাপ বিয়ে পাকা ঠিক্ করেন।

এরা স্ত্রীপুরুষে বেশ মিলে মিশে থাকে। স্ত্রী যদি মনের মত না হয় বা স্বামী স্ত্রীর মনের মত না হয় তবে তাকে ছেড়ে আবার বিয়ে করে।

হো'দের কারুকার্য্যের মধ্যে লাঙ্গল তৈরী কোদাল তৈরী ঘর তৈরী। ছুতোরের আর লোহারের কাজ তারা নিজেরাই কিছু কিছু জানে।

এরা যেমন দেবদেবী মানে তেমনি আবার দুষ্ট আত্মা, ডাইন প্রভৃতিও মানে। নিজেদের বা গরুবাছুরের কোন অসুখবিসুখ হলেই ওদের অন্ধবিশ্বাস এইযে সেটা হয়, কোনো দুষ্ট আত্মার নয় কোনো ডাইনের কাজ। তখন তার প্রতিকারের জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। প্রথমে ডাইন ধরবার জন্যে পাড়ার 'সোখা'র (যারা ডাইন ধরে দেয় তাকে ওরা 'সোখা' বলে) কাছে যায়। শেষে, পাড়ার কোন লোক ডাইন বলে সাব্যস্ত হলে তার আর লাঞ্ছনার শেষ থাকে না! আগে ওরা একেবারেই তাকে মেরে ফেলত; ইংরেজের শাসনে এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

সব অসভ্যরাই নানারকম কুসংস্কার নিয়ে আছে।

আমি একবার একটা বীরভূমের সাঁওতাল-পল্লীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে একটি গোশালার দেয়ালে দেখলুম পূজোর ঘটে হিন্দুদের যেমন সিঁদুর দিয়ে মানুষের আদ্‌রা আঁকা থাকে এও সেই রকম গোবর দিয়ে আঁকা। জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে এটি একটি দেবতা, গোশালা পাহারা দিচ্চেন। হো'রা আবার নানান শুভ-অশুভ লক্ষণ মানে। পথে একপাল হনুমান দেখলে গরুবাছুর বৃদ্ধি, রাস্তার মাঝে বিনাকারণে একটা কোন গাছের ডাল পড়ে থাকতে দেখলে হয় শ্বশুরকুলের নয় নিজের পরিবারের মধ্যে কোন আত্মীয়ের অমঙ্গল হবে বলে স্থির করে। আবার হিন্দুদের মতই পূর্ণকুম্ভকে খুব ভাল লক্ষণ বলে ধরে। গুব্‌রে পোকাকে যদি পথের মাঝে একটা অসম্ভব রকম বড় গোবর তাল পাকিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়, তবে যে দেখ্‌তে পায়—সে গরীব হয়ে যায়।

এদের মৃতসংকার মহাসমারোহে হয়ে থাকে। কোনো লোকের মৃত্যু হলে তাকে প্রথমে চান করায়, পরে একটা বাক্সে পুরে তাতে তার কোদাল সাবল তীর ধনুক যা সে ব্যবহার করত সব দিয়ে, সবসুদ্ধ দাহ করে। পরে সেই ছাই একটা মাটির হাঁড়িতে রেখে মহা ধুমধামে ওদের যেখানে মৃতের চিহ্ন পাথরচাপা দিয়ে সবাই রাখে সেই 'সসান দিরিতে' একটা প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে চাপা দেয়। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা পাথর দেয়। সেই সময় খুব জোরে জোরে মাদল বাজায়। সসান দিরিতে পাথর খাড়া করেও বসান থাকে। পুরাকালে অসভ্য বৃটনদের মৃতদেহের উপর এইরকম পাথর দিয়ে রাখার (cromlech) প্রথা ছিল। যখন তারা পরে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয় তখন থেকে ভাল করে নানা সুদৃশ্য ও সুসমঞ্জস আকারে পাথর কেটে ক্রশ চিহ্ন দিয়ে কবর দেওয়া প্রচলিত হয়।

হো'দের মধ্যে অনেক মজার মজার কাহিনী প্রচলিত আছে। নমুনা এইরূপ—

জল ঢোড়ার (দা'তুন্দু রিংএর) জন্ম।

এক গাঁয়ে একটি মেয়ে থাকত। সে রোজ অজগর বনের মধ্যে থেকে শুকনো জ্বালানিকাঠ আর পাতা আন্‌তে যেত।

একদিন বনের মধ্যে কাঠপাতা কুড়চ্চে—কুড়তে কুড়তে হঠাৎ দেখতে পেলে একটা গাছের তলায় ঝোপের মধ্যে দুটো বেশ বড় বড় ডিম রয়েচে। সে ময়ূরের ডিম মনে করে ভারি খুসি হয়ে ডিম দুটি বাড়ী নিয়ে গেল—আর লুকিয়ে একটা ঝুড়ির ভিতর করে রেখে দিলে।

দু-একদিন কেটে গেলে, তারও অত-আর ডিমের কথা মনে নেই। এখন হ'য়েচে কি, তার ছোট ভাইটি ঝুড়ির ভিতর তার ডিম দুটির কি করে সন্ধান পেয়েচে। তার বোন যেমন যায় তেমনি জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেছে—ইতিমধ্যে দিব্যি করে সে ডিম দুটি ভেঙে ভেজে খেয়ে বসে আছে।

মেয়েটি সন্ধের সময় জঙ্গল থেকে কাঠকুটো মাথায় করে বাড়ী এসেচে। তার হঠাৎ তখন ডিম দুটোর কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি তার ডিমের ঝুড়ি পেড়ে দ্যাখে ডিম নেই। ভারি মুস্কিল ত!—কি হল' দেখ্ দেখ্—খোঁজ খোঁজ, কারু কাছে কোথাও আর ডিম দুটো না পেয়ে ভারি বিরক্ত হ'য়ে পড়ল। এমন সময় তার ছোট ভাই হাসতে হাসতে বল্লে "দিদি, আমি ভেজে খেয়ে ফেলেচি।"

সে ত শুনে ভারি ভয় পেয়ে গেল, বল্লে "করেচিস্ কি? ও দুটো আমি যে জঙ্গল থেকে ময়ূরের ডিম মনে করে কুড়িয়ে এনেছিলুম; এই যাঃ গোঁয়ারতুমি করে খেয়ে বসে রইলি? সেগুলো কিসের ডিম তার ঠিক কি?"

তারপর, আরো দু-তিনদিন ত কেটে গেল। ছেলেটার তারপর থেকে হঠাৎ শরীরটা কেমন্ কেমন করতে লাগল—তার ক্রমেই মনে হ'তে লাগল যে সে নিজে একটু একটু করে সাপ হ'য়ে পড়চে! চুপি চুপি তার বোনকে সব কথা বল্লে। "আর আমায় নিয়ে তোদের কি হ'বে, আমায় একটা ঝুড়িতে পুরে বনের মধ্যে রেখে আয়।"

তবে বোন আর কি করে মনের দুঃখে তাকে একটা ডালা-আঁটা বাঁশের ঝুড়িতে বন্ধ করে গভীর বনের ভিতর রাখতে গেল।

তাকে যখন বনের এক জায়গায় রাখলে, তখন ঝুড়ির ভিতর থেকে তার ভাই বলতে লাগল "আমি ত এখন একেবারে সাপ হ'য়ে গেছি। তুমি দিদি, আমায় এখানে রেখে একজায়গায় দূরে গিয়ে লুকিয়ে দাঁড়াও। পাহাড়ী

সাপেরা তোমাকে দেখলে বিপদ ঘটবে আমি এবার থেকে ওদের সঙ্গেই পাহাড়ে সাপ হয়ে বাস করব।"

তার ভাইয়ের কথামত সে একটু দূরে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। এমন সময় ঝুড়ি থেকে তার ভাই গান জুড়ে দিলে :

"নাইংদো নাইংদো বুরুবিংকিং নোড়াতিং,
নাইংদো নাইংদো সাংস্থকিং নিদিংতানা।"

মানে, "আমি এখন পাহাড়ী সাপের বাড়ী যাচ্ছি,
সাপদুটো আমায় তাদের বাড়ী নিয়ে যাচ্চে।"

যেই সেই গান শেষ হওয়া, আর অমনি পাহাড়ের গায়ের পাথরের ফাটাল থেকে দুটো মিশমিশে কালো প্রকাণ্ড সাপ বেরিয়ে এসে ফোঁস ফোঁস করে লকলকে জিভ দিয়ে ঝুড়িটার উপর ছোব্‌লাতে লাগল। কিন্তু তাতে ঝুড়ির ডালাটা কিছুতেই খুললোনা। লাভের মধ্যে বেচারীদের নিজেদেরই মুখে আঘাত লাগল। তারা শেষে আবার তাদের ফাটালের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তখন আবার তার বোনকে ডেকে ছেলেটা তাকে কোনো ঝরণার বা ডোবার জলে রেখে আসতে বল্লে। তার কথামত তাকে নিয়ে ডোবার সন্ধানে তার বোন চল্ল। অনেক খোঁজ করে একটা ডোবা পেলে—তাকে ঝুড়িসুদ্ধ তার মধ্যে রেখে দিলে। তার ভাই তখন বল্লে "দিদি, আমি ত এখানেই রইলুম ; জলের সাপ (দা'ডুন্দুবিং) হলুম, তুমি মাঝে মাঝে এখানে এসে মাছ ধোরো। কিন্তু দেখো সাবধান করে দিচ্ছি, বেশী জলে কখনো নেবোনা—যারা না জেনে একেবারে বেশী জলে নেবে মাছ ধরতে যাবে তারাই সাপের ছোবলে মরবে।

এইরকমে প্রথম জল ঢোঁড়ার (দা'ডুন্দুবিংএর) সৃষ্টি হয়। এর আগে ডাঙ্গার সাপ ছিল, জলের কোনো সাপ ছিল না।

রাঁচি। শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

সেখ আন্দু

(১৯)

পুলিশ আইনের কুটিল মারপ্যাচের মধ্য দিয়া শাসন-রহস্যের কৌতুকাবহ ঘটনাবলী আন্দুর হৃদয়ের একটা প্রান্ত এমনি তীব্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল যে, আন্দু তাহাতে সময় সময় স্পষ্টতঃ হৃদয়ে দগ্ধ-যন্ত্রণা ভোগ করিত। সব-ইনেস্‌পেক্টার মহিমারঞ্জন বাবু আন্দুকে বড় ভাল বাসিতেন ; তিনি প্রায়ই পরিহাস করিয়া বলিতেন যে আন্দুর বিনয়াবনত কোমল চেহারাটির সঙ্গে পুলিশের বেল্ট ব্যাটন ইউনিফরমের মোটেই সামঞ্জস্য হইতেছে না, অতএব আন্দু যদি পুলিশের চাকরী বজায় রাখিতে চায়, তাহা হইলে লাল পাগড়ীর সহিত, নম্র চক্ষু দুটিকে সমান রুক্ষ কঠোরতায় শানাইয়া লাল করিয়া লউক, নচেৎ সে নিশ্চিত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে। আন্দু দাদাজীর সৌম্য সুন্দর মাধুর্য্য আপন মর্ম্মের মধ্যে দৃঢ় স্থিরতায় নিরীক্ষণ করিয়া স্মিত হাস্যে উত্তর দিত,—লাল চোখ বাহির করিতে যাইলেই তাহার মাথা ধরিয়া উঠে, সুতরাং পারত পক্ষে মিষ্ট মুখে কার্য্যোদ্ধারই শ্রেয়স্কর,—কারণ মাথা ধরিয়া পীড়িত হইলেই লক্ষ্যভ্রষ্টের সম্ভাবনা তাহার পক্ষে অধিক।—ছোট বাবু হাসিয়া বলিতেন, পুলিশের শাসনবিধি যে নিষ্ঠুরতায় ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধির মত তেউড়িয়া বাঁকান ; আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া সন্দেশ রসগোল্লা ভক্ষণ করিলেও—এই দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্ত জীব মিষ্টের আস্বাদ মোটেই টের পায় না—তাহার রসনায় সংলিপ্ত থাকে শুধু লঙ্কার চিড়্‌বিড়ে ঝাল।

আন্দু চারিদিক হইতে বিক্ষিপ্ত চিত্তটা জোর করিয়া টানিয়া আপনার মধ্যে শান্ত সমাহিত হইয়া বসিবার চেষ্টা করিল। সহকর্ম্মীদিগের সহিত সংস্রব সংক্ষিপ্ত করিয়া বাহিরের অনাবশ্যক ব্যাপার থাটা বন্ধ করিয়া, আপনার নির্জ্জন গৃহ-কোণটিতে আশ্রয় লইল। মহম্মদের বাড়ী একবার করিয়া যাইতে হয় তাই যাইত, কিন্তু উদ্যমের উচ্ছ্বাস আর তেমন বেগে বিস্ফুরিত হইত না। জীবনের নির্ম্মল আনন্দ-স্রোতের মুখে কে যেন একখানা পাথর চাপাইয়া দিয়াছিল, আন্দু আপনাকে নিয়ম মাত্রায় সংযত করিয়া লইল। একটা দুঃসহ ক্লান্তি তাহার সমস্ত হৃদয়টা

এমনি পীড়িত, এমনি বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছিল,— যে আবেগের মাত্রা পাছে কোথায়, কোন অসতর্ক বাতাসে, সীমার উর্দ্ধে উঠিয়া যায় এই ভয়ে সে সশঙ্ক হইয়া থাকিত। চারি দিকের দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ রুক্ষ কঠোরতার অবিরাম প্রতিঘাতে দাদাজীর সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেও তাহার এক এক সময় দ্বিধা ঠেকিত। দাদাজী কিন্তু তাহাকে এমনি আদরে এমনি সহৃদয়তায় বিমোহিত করিয়া লইতেন যে, তাঁহার কাছে আন্দু আপনার কোন অংশটা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিত না।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন অপ্রতিহত গতিতে কাটিয়া চলিল। আন্দু আর কাহারও অন্যায় বড় একটা চোখ দিয়া দেখিত না। সমস্ত পৃথিবীর উপরই তাহার একটু প্রচ্ছন্ন অভিমান জাগিয়াছিল, সে আর কাহাকেও কিছু বলিবে না। পাছে বাহিরের দৃশ্য চোখে বেশী পড়ে বলিয়া, বা ঘটনাক্ষেত্রে পাছে অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে বলিয়া সে অত্যন্ত নিঝুম হইয়া, যন্ত্রচালিতের মত দাসত্বের কর্ত্তব্য-টুকু সারিয়া লইয়া গৃহকোণে বই মুখে করিয়া নিরুদ্বেগে সময় কাটাইতে লাগিল। সময় সময় ছোট বাবুর কাছে গিয়া তাঁহার পুস্তকরাশি ঘাঁটিয়া-ঘুঁটিয়া, তাহার সহিত দেশ বিদেশের কথা কহিয়া, নির্জ্জীব মনটাকে একটু সচেতন করিয়া লইয়া ফিরিত। ছোট বাবুর সহিত তাঁহার সখ্য ক্রমশঃই বেশী হইয়া উঠিল। ছোট বাবু খাস বাঙ্গালী লোক—থিয়েটারী উত্তেজনায় রাজস্থানের রাজপুত গৌর-বাগ্নি তাঁহার মস্তিষ্কে প্রখর বেগে জ্বলিত। এক একদিন নির্জ্জন সন্ধ্যায়, অভিনয়-দৃষ্ট অভিজ্ঞতার প্রবল উচ্ছ্বাসে, গভীর বিক্রমে হাত পা ছুড়িয়া, লম্ফ ঝম্ফ করিয়া এমনি হাস্যোদ্দীপক বীরত্বাভিনয় করিতেন যে আন্দুরও পাকস্থলীতে বিষম বেদনা বোধ হইত। এইখান হইতে যে তরল প্রমোদ-উত্তেজনাটুকু খানিক ক্ষণের জন্য আন্দুর চিত্ত উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত, বাসায় ফিরিবার সময় ঠিক ততটুকুই গাঢ় অবসাদ তাহার চিত্তটা তিক্ত নিরুৎসাহ করিয়া দিত! একদিক হইতে জমা, একদিক হইতে খরচ তাহাকে প্রবল বেগে পীড়ন করিতে লাগিল। দাদাজী তাহাকে সত্বর বিবাহের পরামর্শ দিলেন। সে কথা আন্দুর মর্ম্মে বিভীষিকার মত বাজিল। সে মাথা নাড়িল।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল, সাহেব তাহাকে প্রায়ই আদর করিয়া খাস কামরায় ডাকিয়া, স্বীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে বুদ্ধি কৌশলের পরিচয়, বল বিক্রমের প্রভাব দেখাইতে উপদেশ দিতেন, এবং শীঘ্রই তাহার উন্নতির আশ্বাসও যথেষ্ট উৎসাহ সহকারে জানাইতেন। আন্দু নীরবে রহিত—হায় তাহার করুণ হৃদয় যে নির্দ্দয়তার পীড়নে আপনিই সঙ্কুচিত—শাসনের মধ্যে সে কি কৃতিত্ব দেখাইবে, সেখানে যে তাহার দুর্ব্বল হস্ত একেবারেই অবশ!

অশিষ্টের দমন? উত্তম প্রথা, কিন্তু মানুষ কি সাধ করিয়া অশিষ্ট হয়? নানা অত্যাচার, নানা অভাব যে তাহাকে ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ উন্মত্ত করিয়া দিনে দিনে তিলে তিলে দুর্দ্দান্ত দুষ্ট করিয়া তুলে। তাহার প্রতি নির্ম্মমতা প্রকাশে কি হাত উঠে? যদি একান্তই উঠাইতে হয়, তাহা হইলে, যে পারে সে উঠাক্, আন্দু পারিয়া উঠিবে না, পৃথিবীতে তাহার অন্য কাজ যথেষ্ট আছে। সকল কাজে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ না করিলে মানুষ যদি একান্তই মানুষ হইয়া না উঠে তাহা হইলে, আন্দু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জন্তুর শ্রেণীভুক্ত হইতে রাজী আছে, কিন্তু হিংস্রবৃত্তির তীব্র উদ্বোধনে কোন দিন অসতর্ক দোষীর ঘাড়ে দস্তাঘাত করিতে গিয়া নির্দ্দোষীর গ্রীবা হইতে রক্ত নিঃসৃত করিতে সে একান্তই অপারগ; আন্দু আপনার মধ্যে একটা ক্ষিন্ন বিষাদময় দুর্ব্ব-লতা ক্রমাগত বাড়াইয়া তুলিল। দূরদর্শী বিচক্ষণ দাদাজী ঠিক বলিয়াছিলেন তুফান জোরে আসিলে নোঙ্গর-সুদ্ধ উৎপাটিত হইবার সম্ভাবনা। আন্দু এতদিনে মানিল, যে, মুখে বলিলেও সে মনের সহিত এখনো বন্দরে আশ্রয় লইতে পারে নাই! আত্মপ্রত্যয়ে শিথিলতা দেখিয়া আন্দু আপ-নার মধ্যে ভয়াবহ যন্ত্রণা অনুভব করিল। সে দ্বন্দ্ব ছাড়িয়া বিশ্বের সহিত সন্ধির সন্ধান খুঁজিতে লাগিল। না হইলে সে যে আপনার মধ্যে আর জোর পাইতেছে না।

প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া আন্দু জানালার কাছে দাঁড়াইয়া জামা পরিতেছিল, হাতে বোতাম লাগাইতে গিয়া দেখিল হাতার কাছে অনেকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সে-দিন শ্রীকৃষ্ণ পাঁড়ের সহিত ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতে গিয়া জামাটি সর্ব্বপ্রথম আহত হয়, তাহার পর কয়দিনের উপর্য্যু-পরি ব্যবহারে আরো দুর্দ্দাশাগ্রস্ত হইয়াছে।

স্থচস্থতা লইয়া আন্দু সেলাই করিতে বসিল। জামাটি আর বেশী দিন টিকিবে না, এবার একটি কিনিতে হইবে। এ জামাটি চৌধুরী-সাহেবের বাড়ীতে থাকিতে নিজে কলে সেলাই করিয়া লইয়াছিল। ভাগলপুরের কথা মনে পড়িতেই—একটা সুদীর্ঘ বেদনাবহ নিশ্বাস পড়িল। দূর হোক, সে যে এ কথা ভুলিয়া থাকিতেই শান্তি পায়। জামাটি সেলাই করিতে করিতে আন্দু ভাবিল, দু-একদিনের মধ্যে আর-একটি জামা কিনিয়া লইয়া এটি কাহাকেও বিলাইয়া দিবে। তাহার অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিশ্চয়ই অপরের প্রয়োজনে লাগিতে পারে।

আজ বিশেষ কোন কাজ নাই। আন্দু স্থির করিল আজই সুবিধামত সময়ে একটা জামা কিনিয়া আনিবে। দ্বিতলের গবাক্ষ দিয়া ঘনশ্রেণীবিন্যস্ত সুদরব্যাপী বৃক্ষ-শীর্ষগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাসিল—অভাব মানুষের অনন্ত; যতদূর দৃষ্টি চলে।

কাঠের ক্যাস-বাক্সটি খুলিয়া কয়মাসের মাহিনার টাকাগুলি মিলাইয়া দেখিল, পঁচাত্তর টাকার উপর আছে। আন্দু অবাক হইয়া গেল। এতগুলা টাকা তাহার হাতে ইহার মধ্যে জমিয়া গিয়াছে! কেহ তো তাহাকে রাখিতে দিয়া যায় নাই? টাকাকড়ির হিসাবে তাহার প্রায়ই ভুল হইত। সন্দিগ্ধ চিত্তে বাক্স খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল একটা খবরীতে কাগজে মোড়া ৩৲ রহিয়াছে, কাগজের গায়ে আন্দুর হাতে লেখা রহিয়াছে "মহাদেবের জমা, ১৪ই সেপ্টেম্বর"। বাকী টাকাগুলা সবই তাহা হইলে তাহার।

আত্মদ্বন্দ্বে বাহিরের সংবাদের আদান প্রদান বন্ধ হওয়ায় কয়মাস আন্দুর দানের হাত একেবারেই বন্ধ হইয়াছে। রাস্তাঘাটে বাহির হইলে যা দুই এক জনের খবর পায়, তাহাতেই পকেট খালি করিয়া, কর্ম্মগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নিরীহ জীবের মত নিজের ধান্ধা ভাবিতে ভাবিতে—পাঁচ জনের কথা ভাবিতে, পাঁচ জনের মুখ চাহিতে ভুলিয়া গিয়া, নিজের কোটরে আসিয়া ঢোকে, কাজেই মাহিনার টাকা জমিবে না ত কি হইবে? আন্দু ভাবিয়া দেখিল তাহার মনটা ইদানী বড় সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এই-সব নিষ্করুণ-চিত্ত সহকর্ম্মীদিগের কঠোর সংশ্রবে বাস করিয়া আন্দুর হৃদয়টাও কেমন শুষ্ক নির্দ্দয় হইয়া গিয়াছে, কাতরের অশ্রু এখন আর আন্দুর হৃদয়কে তেমন করিয়া গলাইতে পারে না, আর্ত্তের আর্ত্তনাদ আন্দুর বুকে আগেকার মত আর বাজে না, আন্দুর অন্তর দিন দিন কেমন কঠিন বিতৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার মানুষের মত মমতা-ভরা কোমলচিত্ত দিনের দিন যেন আড়ষ্ট পাষাণ হইয়া যাইতেছে, অলক্ষিতে—আন্দু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারে তাহার অন্তরে সঞ্চিত পরার্থপরতার স্নেহসুধা—অলক্ষিতে এখন স্বার্থের তিক্ত গরলে অনেকখানি কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। এখন পরের দুঃখ, পরের বেদনা অনুভবের সুতীক্ষ্ণ সকরুণ চিত্তশক্তির উপর একটা অন্ধ ঔদাসীন্যের যবনিকা পড়িয়াছে – সে যেন তাহারই বাহিরে নিশ্চিন্ত শান্তিতে থাকিবার জন্য ব্যগ্র; পরের কথা তাহার কানে এখন তেমন ভাল করিয়া পৌছে না, পরের ক্লেশ এখন তেমন গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাহার এমনি অধঃপতন হইয়াছে!

সেই আলোকোজ্জ্বল প্রভাতের মাঝে আন্দুর মনটা সহসা অত্যন্ত মলিন হইয়া গেল। মানুষ অবস্থার দাস! কথাটা প্রকাণ্ড সত্য। ওর মধ্যে দুর্ব্বলহৃদয় কাপুরুষের জন্য অনেকখানি অক্ষম দীনতার করুণ সান্ত্বনা আছে। সহসা আন্দু উগ্রভাবে মুষ্টি উদ্যত করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু যে অবস্থাকে নিজের দাস করিতে পারিয়াছে?—হাঁ তাহার পৌরুষের জয়! সে দেবতা! আন্দু জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া স্থির দৃষ্টিতে প্রভাত-পবনে নিৰ্ম্মলগগনের নীচে পক্ষসঞ্চালনকারী পক্ষীকুলের নির্ভীক বিচরণ দেখিতে লাগিল। উড়ন্ত পাখী কি সুন্দর!

আন্দু ভাবিতে লাগিল, সে নিজের হৃদয়ের সজীবতা হারাইতে বসিয়াছে, অবস্থাচক্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে, তাহার উচ্চ মনোবৃত্তির পূর্ণ মাধুরিমা নিস্তেজ নির্জ্জীব হইয়া উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আন্দু ছিল, মহিমাময় পরমেশ্বরের কর-সৃষ্ট সত্যকার মানুষ। এখন হইয়াছে, শয়তানের ইঙ্গিত-চালিত আত্মপরায়ণ প্রেত।

মর্ম্মান্তিক আত্মগ্লানিতে আন্দুর সমস্ত অন্তঃকরণটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দাসত্ব ছাড়িয়া সে যদি স্বাধীনজীবী হইতে পারে, তাহা হইলে কি তাহার অপহৃত চিত্তশক্তি

আবার ফিরিয়া আসে? কে জানে? কে বলিতে পারে? হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, সে ত আজিকার দাস নয়! অনেক দিনই দাসত্ব করিতেছে। বিপত্নীক পিতার সৎশিক্ষায় সদ্দৃষ্টান্তে না হয় তাহার বাল্যজীবনটাই শুভ্র শুচিতার নির্ম্মল বাতাসে নৈষ্ঠিক আনন্দে স্বচ্ছন্দে কাটিয়াছে। তাহার পর ত তাহাকে জগতের জনস্রোতে মিশিয়া, এলোমেলো ঝড়ঝাপ্টায় প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সহিত যুঝিতে হইতেছে! চৌধুরীসাহেবের বাড়ীতেও ত তাহাকে দাসত্বের জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে, কিন্তু সেখানে সে ত জানোয়ার বনিয়া যায় নাই। সেখানে সে নিজের অন্তরের মাঝে মানুষের সাড়া পাইত, দাসত্বের মধ্য হইতেও সে মহত্ত্বের মহিমালোক হইতে দৃষ্টিশক্তির নির্ব্বাসনদণ্ড পায় নাই, তাহার চিত্তশক্তি ত সজীব তেজস্বীই ছিল! শেষটা না হয় দায়ে পড়িয়া সরিতে হইল।

আন্দুর কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল। কত দিনের কথা, কিন্তু ভাবিতে আজিও তাহার চিত্তে অস্বস্তি আসে, পরের ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা, আজিও তাহার চিত্তকে প্রপীড়িত করিয়া তুলে!—চিন্তাপ্রবাহ এইখানেই স্থগিত রাখিবার জন্য, আন্দু সবেগে মুখ ফিরাইয়া দেয়ালের তাকের উপর হইতে একখানা ফার্শী বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল।

বইখানি পাচ ছত্র পড়িতে না পড়িতে সে আপনার কথা পরের কথা সব ভুলিয়া গেল। তন্ময়চিত্তে পড়িতে লাগিল, তাহার হাত-ঘড়িতে দম দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, মনে রহিল না।

বারান্দায় দুপ্ দাপ্ করিয়া দ্রুত পদশব্দ হইল, আন্দুর চমক ভাঙ্গিল। এ সকাল বেলা দাসত্বজীবীর নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া থাকিবার সময় নহে। ত্রস্তে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, রাস্তায় দাঁড়াইয়া ডাকপিওন থানার কনেষ্টবলদের চিঠি বিলি করিতেছে। আন্দুর ত প্রবাসে আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই, যে চিঠি দিয়া খোঁজ লইবে, সুতরাং তাহার আর পিওনের উপর দরদ কিসের? আন্দু উদাসীনভাবে ফিরিয়া আসিয়া পোষাক পরিতে পরিতে ভাবিল, পিওনের কণ্ঠধ্বনিতে সকলেই উৎসাহিত হইয়া ছুটিতেছে, শুধু সে-ই একলা নিশ্চিন্ত নিরুদ্যম! তাহার কি একান্তই ইহাতে যোগ দিবার কিছু নাই?—হঠাৎ আন্দুর প্রাণে কে যেন তপ্ত কঠিন বেত্রাঘাত করিয়া, তাহার প্রসুপ্ত চিত্তখানি পুনরুদ্বোধিত করিয়া তুলিল।—ওঃ! সে কি নির্দ্দয় স্বার্থপরতাই শিখিয়াছে! আর পাচজনের কুশলে প্রফুল্লমুখ দেখিয়া সে কি পরিতুষ্ট হইতে পারে না?—আগে তো সে এমন ছিল না, আগেও তো সে আর পাঁচজনের সুখ-দুঃখের সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিত—এখন কেন তা হয় না? এখন তাহার চিত্তের স্নিগ্ধ করুণ সহানুভূতির পূত তরল নির্ঝর, আদান-প্রদানের বিনিময়-ব্যভিচারে যেন কঠিন, অপবিত্র, ভাররুদ্ধ, স্তব্ধ! এখন সে মানুষের জন্য নিঃস্বার্থ মমতা খরচ করিতে কুণ্ঠিত!—দাদাজীর অমন মহানুভব উদার সংসর্গ, এখন সে প্রাণ দিয়া পরিপূর্ণরূপে স্পর্শ করিয়া আপনার মধ্যে ধন্য হইতে পারিতেছে না, তাহার স্বচ্ছন্দ শান্তির গোপন আশ্রমটি ভাঙ্গিয়া কে যেন তাহাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় অসহায় করিয়া পৃথিবীর বক্ষে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার প্রকৃতির সহিত পৃথিবীর বিশাল আকৃতির যেন একটা মস্ত বক্র ব্যবধান হইয়া গিয়াছে, তাহার কোথাও যেন সে সুবিধা-মত নির্দ্বন্দ্ব ভাবে সংলগ্ন হইতে পারিতেছে না! ইহার হেতু কি? শুধু আত্মাভিমান?—সত্যই আন্দুর শোচনীয় দৈন্য দশা আসিয়াছে!

ভাবিবার সময় নাই, এখনই বড়সাহেবের কামরায় যাইতে হইবে। আন্দু ইউনিফরম পরিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল, হাত-ঘড়িতে দম দেওয়া হইল না।

সাহেবের কামরায় আসিয়া দেখিল, সাহেব তখন চুরুট টানিতে টানিতে, চিঠিপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, পাশেই নতুন ইনেস্‌পেক্টার মোহিনীবাবু নীরবে বসিয়া একখানা সরকারী পত্র দেখিতেছেন।

আন্দু যাইয়া সেলাম দিতেই, সাহেব চুরুটে লম্বা টান দিয়া বলিলেন, "আজই তোমাদের শীকারগঞ্জে রওনা হ'তে হবে। কাল মহরম। গেল বছর ঐ সময় সেখানে মারপিট হয়ে গেছে, এবারে তাই কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করতে হবে।"

আদেশ শুনিয়া আন্দু সেলাম করিল। সাহেব চুরুটের

ছাই ঝাড়িয়া পুনরায় বলিলেন "সবইনেসপেক্টার বাবুও আজ যাবেন, কাল এই ইনেসপেক্টার বাবু যাবেন। তোমাদের সেখানে তাঁবুতে থাক্‌বে হবে, পশু তোমরা তাঁবু তুলবে। খুব সাবধানে নিয়ম বাঁচিয়ে কাজ করবে।"

আন্দু পুনরায় সেলাম দিয়া বাহিরে আসিল,—কাল মহরম উৎসব, তাহার মনেই ছিল না—কতকগুলো নূতন উৎসাহব্যঞ্জক কথা ভাবিয়া ভারাক্রান্ত চিত্তটা প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিল। কাল মহরম, মহা পর্ব্বোৎসব, কালকের শুভদিনে কারবালাক্ষেত্রে কিছু দান করিয়া—আন্দু সুখী হইবে!

দ্রুতপদে গিয়া ছোটবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, যাত্রার ব্যবস্থা সব ঠিক করিয়া, থানার যে-সমস্ত কনেষ্টবল মেলায় যাইবে তাহাদের নামের তালিকা দেখিয়া জানিল, মাতাল রামলালও যাইবে। আন্দু ছোটবাবুকে একটু আগ্রহের সহিত বলিল, "আপনি সকলকে একটু জোর হুকুমে হুঁসিয়ার থাক্‌তে বলবেন,"—

হতভাগ্য রামলালের জন্য তাহার বড় ভয়, পাছে সে মদ খাইয়া কিছু গোলমাল করে। ছোটবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন "হাঁ হাঁ তোমায় সেই কথা বলতেই খুঁজছিলুম, দেখ এই বরসজ্জায় সেজে, আজকে শুধু হাঁক ডাক করে বাসর জাগালেই চলবে না, কালকে তোমায় গিরগিটি সেজে একচাল চালতে হবে,—এ পোষাক ছাড়া দুএকটা অন্য পোষাক সঙ্গে নিও, বুঝলে!"

আন্দু হাসিয়া উঠিল। বুঝিল অন্যবেশে তাহাকে পুলিশের লোকেরই ক্রিয়াকলাপের উপর গুপ্ত দৃষ্টিতে গোয়েন্দাগিরি করিতে হইবে। হোক ক্ষতি কি? সে পুলিশ হইয়া পুলিশের ত্রুটী সংশোধন করিয়া সাধারণের সুবিধা দেখিবে—তাহাতে অপমান কি? সাধারণের সম্ভ্রম শান্তিরক্ষার ভার যে তাহাদেরই হাতে।

ছোটবাবুর কাছে বিদায় লইয়া রাস্তায় বাহির হইল। বাজারে আসিয়া দেখিল অলস ঔদাসীন্যের ঝোঁকে সে না অনুভব করিতে পারিলেও, মহরমের জাঁকে চারিদিকই বেশ জমকাইয়া উঠিয়াছে; সকল মুসলমানই নূতন, অভাবে রজকালয়ের ফেরৎ, জামা কাপড় পরিয়া চকচকে হইয়াছে; দোকানে দোকানে বিষম ভিড়। আন্দুর মনটা চারিদিকের প্রফুল্লতায় বেশ মাতিয়া উঠিল। সেও দুই চারি দোকান ঘুরিয়া একজোড়া সৌখীন জুতা, গোটা দুই আধুনিক ফ্যাশানের বুকখোলা জামা, একজোড়া দেশী ধুতি, একটা চুড়িদার পাঞ্জাবী কিনিয়া ফেলিল। জিনিসগুলা লইয়া উঠিবার সময় তাহার একটু হাসি পাইল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে আন্দু ভাবিল কাল সে গরীবের জন্য ভালরকম খরচ করিবে।

(২০)

থানা হইতে শীকারগঞ্জ ছয়মাইল দূর, সেইখানেই কারবালায় মেলা হইবে। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সমাধা করিয়া আন্দু দলবল সকলকে গুছাইয়া অগ্রসর করিয়া দিয়া, নিজেও রওনা হইল, পশ্চাতে ছোটবাবু ঘোড়ায় আসিবেন, কথা রহিল।

থানা হইতে বাহির হইয়া বরাবর পাকা রাস্তা ধরিয়া দীর্ঘ তিন মাইল পথ আন্দু একাকী গান গাহিয়া শীস্ দিয়া চলিয়া যাইবার পর, দূরে এক সাইকেল-আরোহী দেখিতে পাওয়া গেল। রাস্তার বাঁ ধারে এক বটগাছে একটি ছোট পাখী গান করিতেছিল, আন্দু তাহারই পানে চাহিয়া ঊর্দ্ধ-মুখে শীস্ দিতে দিতে চলিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে সাইকেল-আরোহী খুব নিকটবর্ত্তী হইল।

"একি আন্দু!"—অকস্মাৎ ব্যগ্র আনন্দে উচ্চধ্বনি! পরমুহূর্ত্তেই ব্রেক টানিয়া আরোহী নীচে নামিল। চমকিত আন্দু চাহিয়া দেখিল—পরিমল!

সরল প্রীতি-উদ্ভাসিত হাসিতে আন্দুর মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। "আপনি, সাহেব! সেলাম সেলাম!—ভাল আছেন ত? সাহেব, মাইজী সাহেব, খুকুমণি, ছোট সাহেব, সব কেমন আছেন? ভাল ত?" আন্দু সাইকেল ধরিয়া দাঁড়াইল, আনন্দে তাহার বুক মুহূর্ত্তে এমনি ভরিয়া উঠিল, যে, অন্য চিন্তার স্থানমাত্র রহিল না!

প্রফুল্ল বিস্ময়ে সকলের সুস্থ সংবাদ দিয়া পরিমল বলিল, "তুমি পুলিশের পোষাকে যে?"

ক্লিষ্ট হাসিতে আন্দু বলিল "এই কাজই নিয়েছি।"

উৎফুল্ল মুখে পরিমল বলিল "তবু ভাল, আমরা সবাই মনে করেছিলুম, তুমি বুঝি যুদ্ধে কাজ করতে গেছ।

আচ্ছা, আন্দু, তুমি আমাদের না বলে কি করে পালিয়ে এলে ?"—

বড় কঠিন প্রশ্ন !—আন্দু দেড় বৎসর ধরিয়া, প্রবল চিন্তাস্রোতের মাঝে অস্পষ্ট ক্ষীণ ভাবে এই কথাটার জবাব কি একটা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল—এখন অতর্কিতে সেই প্রশ্নের পুরোবর্ত্তী হইয়া, সেই বহ্বালঙ্কার-মণ্ডিত রং-চঙে জবাবটা সহসা থতমত খাইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। অপ্রস্তুত আন্দু একটু ইতস্ততঃ করিয়া জবাব দিল "আজ্ঞে আমার ত আসবার ঠিক ছিল না, হঠাৎ জরুরী কাজের তাগাদা পেলুম, চলে এলুম !—আপনাদের বলবার ফুরসুৎ হ'ল না !" দ্রুতভাষী পরিমল উৎসুক ব্যগ্রতায় বলিল "সেই শিখ পালওয়ানের সঙ্গে খেলা করবার ভয়ে তুমি পালিয়েছিলে—নয় !"

আন্দু পথ পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বলিল "আজ্ঞে হ্যাঁ—খেল্‌ব না বলেই ত পালিয়েছিলুম !"

পরিমল বলিল "কেন ?"

আন্দু চট্ করিয়া জবাব জোগাইল, "আজ্ঞে পল্টনের কাজে ঢোকবার তখন ভারি জিদ্ ছিল, খেলতে গেলে পাছে হার জিতের ফেরে পড়ে লোকটাকে চটিয়ে মতলব মাটি করে ফেলি, এই ভয়ে পালিয়েছিলুম !"

অপরিণতবুদ্ধি পরিমল আন্দুর কথাই বিশ্বাস করিয়া শুধু দুঃখিত ভাবে বলিল "তারপর আর ফিরলে না কেন ?" আন্দু আশ্বস্ত হইয়া বলিল "আজ্ঞে তার পরই মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টে সব খোঁজ খবর নিতে করতে দিনকতক মিছে কেটে গেল, তারপরই পুলিশে এই চাকরিটা জুট্‌ল।"

অধিকতর ক্ষুণ্ণ মুখে পরিমল কি বলিতে উদ্যত হইতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আন্দু বলিল "ভাল কথা, আপনি এখানে কোথায় রয়েছেন, কবে এলেন ?"

উত্তেজিত আনন্দে পরিমল বলিল "মহরমের ছুটিতে কাল এসেছি, এইখানেই আছি, এইখানেই যে দিদি, জামাই-বাবু, সব রয়েছেন। দিদির বিয়ে হয়েছে জান ?"—

নিতান্ত অবিচলিত ভাবে আন্দু বলিল "হ্যাঁ সে সব ঠিকঠাক শুনে এসেছিলুম,"—যেন সে জানিয়াও আসিয়াছিল।

পরিমল স্বভাবসিদ্ধ দ্রুতস্বরে সংলগ্ন অসংলগ্ন প্রক্ষিপ্ত নানা কথা কহিতে লাগিল। অবশেষে বলিল "চল দিদির সঙ্গে দেখা করে আসবে চল।"

আন্দুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে ত্রস্ত হইয়া, চাকরীর দোহাই দিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিল, পরিমল কিন্তু কিছুই মানিল না, বলিল "ডাক্তার সাহেবের শরীর খারাপ, তাই মাস দুয়েকের জন্যে হাওয়া খেতে এসেছিলেন, আমি এঁদের নিতে এসেছি, বোধহয় পশু'-ই আমরা চলে যাব। তুমি আবার কবে দেখা করতে আসবে ?"

হায় হায় ! আন্দু কি জবাব দিবে ? পরিমল তাহাকে পাকড়াইয়া লইয়া চলিল। দুশ্চিন্তাপীড়িত আন্দু যখন দেখিল একান্তই পরিত্রাণের উপায় নাই, তখন প্রসঙ্গান্তরে মনটা সুস্থ করিয়া লইতে সচেষ্ট হইল। ভাগলপুরের প্রত্যেক পরিচিত লোকের সংবাদ খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আখড়া, ওস্তাদ, ভবতারণ, লছমী ভকত, সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিল। পরিমল চলিতে চলিতে উৎসাহিত আনন্দে সকলের আনুপূর্ব্বিক সংবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। লছমী ভকত এখন খুব ভাল হইয়াছে, আন্দুর কথা সে প্রায়ই সকলের কাছে বলে। আন্দু যেদিন চলিয়া আসে, তাহার পরদিন যখন তাহার পলায়ন-বৃত্তান্ত চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, তখন কে কিরূপ গভীর পরিতাপ করিয়াছিল, চৌধুরী-সাহেব কিরূপ দুঃখিত হইয়াছিলেন, কয় দিন তাহার কিরূপ খোঁজ খবর কোথায় কোথায় লইয়াছিলেন, পিয়ারী সাহেব মোটর চালাইতে আসিয়া প্রথম প্রথম কিরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিল, সমস্ত পরিমল আগাগোড়া বলিল। আন্দু সকৌতুকে শুনিতে শুনিতে চলিল। তারপর বাহিরের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া সে যখন লতিকার বিবাহের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণন করিল,—তখন ঘন নিশ্বাসে পরিস্ফুট, উচ্ছ্বসিত চিত্তভাব দমন করিয়া, নতদৃষ্টিতে সাইকেলের ঘণ্টাটা বাজাইয়া, অকারণে আন্দু সারা পথ মুখরিত করিয়া তুলিল। আজ পরীক্ষায় জয় লাভের উল্লাসে তাহার সারা বক্ষ তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল !—এই ভাল, এই হওয়াই সব চেয়ে ভাল !

পরিমল আপন মনে তাহাকে গল্প শুনাইতে শুনাইতে চলিয়াছে।

একটা মস্ত গোলাপী রঙের বাংলা বাড়ীর সামনে সবুজ রেলিং-ঘেরা বাগানের গায়ে ফটকের সামনে আসিয়া পরিমল বলিল "এই বাড়ীতে দিদিরা আছে।"

সহসা আন্দুর সর্ব্বশরীরের শোণিত যেন শুষ্ক হইয়া গেল! তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। আজ এত দিনের পর—সেই সাক্ষাতের পর এই সাক্ষাৎ! লতিকা কি মনে করিবে তাহাকে দেখিয়া!—

আন্দুর ইচ্ছা হইল সেইখান হইতে সে ছুটিয়া ফিরে। তাহার ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। সে ব্যাকুলভাবে একবার রাস্তার প্রান্ত অবধি চাহিয়া দেখিল, যদি ছোটবাবুর ঘোড়া আসিতে দেখা যায়,—তাহা হইলে সেই উপলক্ষ্য করিয়া যে সে পলাইয়া বাঁচিবে! কিন্তু আন্দুর দুরদৃষ্ট, কেহই রাস্তায় নাই!

পরিমল অগ্রসর হইয়া সামনে ফুলের-টব-সাজান প্রশস্ত সোপানযুক্ত দীর্ঘ বারান্দায় উঠিল; ঘনকম্পিত হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড আস্ফালনে পীড়িত আন্দু সাইকেলটা কাঁধে তুলিয়া নতশিরে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বারান্দায় একটা থামের গায়ে গাড়ীখানা ঠেসাইয়া রাখিল।

বারান্দার কেম্বিসের চেয়ারে, পায়ের উপর পা তুলিয়া আড় হইয়া শুইয়া সাহেবী-পোষাক-পরা, পাংলা চেহারার, ময়লা রংয়ের এক বাঙ্গালী সাহেব বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন; পাশে টুলের উপর তাঁহার হ্যাট্ ও ছড়ি রহিয়াছে। সদা-চাপ্‌কান্‌-পরা একজন খানসামা, চা ও বিস্কুট লইয়া ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিল। পরিমলদের জুতার শব্দে ও খানসামার আগমনে, সাহেব কাগজ হইতে চোক তুলিয়া, পরিমলকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা তাহার পিছনে আর-একজন পুলিশের লোককে দেখিয়া—সবিস্ময়ে বলিলেন "একি!"

পরিমল সংক্ষেপে আন্দুর পরিচয় দিল; আন্দু বুঝিল ইনিই পরিমলের ভগ্নীপতি; সে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সেলাম দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব টুলের উপর টুপী-ঢাকা একখানা টেলিগ্রাম বাহির করিয়া বলিলেন "শ্বশুর-মশায় টেলিগ্রাম করেছেন, তাঁর বন্ধুটি মারা গেছেন, আমাদের পর্শু ফির্‌তে হবে।"

"মারা গেছেন! আহা!" পরিমল টেলিগ্রামটা তুলিয়া লইল, দেখিয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া বলিল "দিদি শুনেছে?—আহা বেচারী। ছেলেটি নেহাৎ ছোট।"

"হুঁ!"—বলিয়া ডাক্তার-সাহেব পেয়ালায় চুমুক দিলেন। আন্দুর পানে চাহিতেই তাহার উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া পরিমল বলিল "দিদির সঙ্গে ভাগলপুর গেছলো সেই যে জ্যোৎস্নাদেবী"—

চমকিত আন্দু বলিল "হাঁ হাঁ—"

"তাঁরই বাপ মারা গেছেন! জ্যোৎস্নার স্বামী আমেরিকায় গিছলেন, আসবার সময় জাহাজে মারা যান। সেই শোকে তাঁর বাপও আজ ক'দিন হোল মারা গেছেন! আহা কি দুঃখ!"

আন্দুর মনে ধক্ করিয়া ঘা লাগিল! আহা তেমন সুন্দর মেয়েটি! কি দুঃখ!

পরিমলের পানাহার্য্য আসিল। পেয়ালার দিকে চাহিয়া পরিমল বলিল, "ওকি কোকো? আন্দু খাবে?"

পরিমলের সৌজন্যে আন্দুর ক্লিষ্ট চিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সদ্যশ্রুত দুঃসংবাদে তাহার মনটা বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছিল তাহাতে এই অপরিচিত ব্যক্তির গৃহে অনাহুত ভাবে ঢুকিয়াই তাহার বিনা আমন্ত্রণে কোন্ নির্লজ্জ দৈন্যে পেয়ালার জন্য হাত বাড়াইবে? আন্দু মাথা নাড়িল "না সাহেব, আমায় এখনি যেতে হবে।"

এই সময় ভিতর হইতে আর-একজন খানসামা বাহিরে আসিয়া অনুচ্চ স্বরে ডাকিল "লাল্লু আও, ফুড্ হোগিয়া"—

বাহিরের রেলিং-ঘেরা বাগানের হাতার মধ্যে একজন চাকর একটি ছোট শিশুকে লইয়া বেড়াইতেছিল। আন্দু তাহাকে এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই। খানসামার ডাকে সে হন্ হন্ করিয়া আসিয়া বারান্দায় উঠিল। ডাক্তার-সাহেব পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তাহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন। কাছাকাছি হইতেই তীব্র স্বরে ধমক দিলেন "এইও উল্লু—বেবিকো জুতি কাঁহা?"

উল্লু অত্যন্ত থতমত খাইয়া বলিল "পিন্‌হাতে সাব।"

"জল্‌দী যাও,"—সাহেব পেয়ালা শেষ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া রুমালে মুখ মুছিলেন। চাকরটা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। আন্দু অসহিষ্ণু চিত্তে বিদায়ের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। পরিমল ত অকাতরে বিস্কুট কোকোয়

মজিয়াছে, এখন সে কি ছলে বিনয় বজায় রাখিয়া বিদায় লয় ?

আন্দু মাথার পাগড়ি খুলিয়া, ঘর্ম্মাক্ত চুলগুলিকে অঙ্গুলি-সঞ্চালনে কপালের উপর হইতে পিছন দিকে টানিতে টানিতে বারান্দার ও-ধারে টবের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব চুরুট ধরাইয়া হ্যাট ও ছড়ি তুলিয়া বহির্গমনের উদ্যোগ করিলেন, সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আন্দুর পানে চাহিয়া বলিলেন "বসহে।"

আন্দু মাথা নোয়াইয়া বলিল "আজ্ঞে আমাকে এখনি যেতে হবে, আর বসব না।"

সিঁড়ির গায়ে ছড়ি ঠুকিয়া সাহেব বলিলেন "কোথা ?"

"শীকারগঞ্জের মেলায়।"

"ওঃ। বাড়ীতে দেখা করে যাও।" সাহেব চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। আন্দু দেখিল লতিকা দেবী যে গ্য পাত্রেই পড়িয়াছেন, কিন্তু এসব বিবেচনার অধিকার তাহার নাই। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল পরিমলের খাওয়া শেষ হইয়াছে। বলিল "ছোট সাহেব, তাহলে আসি দাদা, সেলাম!"

"ওকি, বাঃ! দিদির সঙ্গে দেখা করবে না ? চল।"—পরিমল অগ্রসর হইল। শুষ্ক-তালু আন্দু প্রাণপণে মুখের উদ্বেগ-চিহ্নটা বদলাইয়া, তাহার পশ্চাৎগামী হইল।

বারান্দার দুপাশে দুখানা ঘর; মাঝে লম্বা হল। পরিমলের সহিত হলঘরে ঢুকিয়াই আন্দু দেখিল, হলঘরের মেজেয় বসিয়া একজন দাসী, সেই শিশুকে কোলে লইয়া বোতলে দুগ্ধ পান করাইতেছে, আর নিকটে বসিয়া সাহেবের সেই "উল্লু" চিহ্নিত, নিতান্ত নিরুপায় আকৃতির জীবটি শিশুকে মোজা জুতা পরাইতেছে। কৌতূহলপূর্ণ চক্ষে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শিশুর পানে চাহিয়া আন্দু মৃদুস্বরে বলিল "খুকিটি কার ?"

পরিমল বিস্ময়-উদ্দীপ্ত স্বরে বলিল "দিদির মেয়ে হয়েছে তাও জান না ?"

আন্দুর যেন মহৎ দুর্ভাবনা ঘুচিল। উল্লসিত হইয়া বলিল "বটে! বাঃ! বেশ ত খুকিটি!" হাঁটু পাতিয়া নত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল মুখে খুকিকে চুম্বন করিল; দাসীটা খুকিকে একটু তুলিয়া ধরিল; আন্দু সন্তর্পণে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল। এসেন্স, পাউডার, ব্রুম, টোপ, জামা, জুতায় মেয়েটিকে বেশ মানাইয়াছিল, আন্দু তাহাকে দুইহাতে ধরিয়া লুফিয়া লুফিয়া আদর করিতে লাগিল। মেয়েটি তিন চার মাসের, বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট।

আন্দুর নড়িবার গতিক নহে দেখিয়া পরিমল বলিল, "চল হে, কর্ত্তব্য-প্রিয় পুলিশ মহাশয়, সময় নষ্ট করছ কেন ?"

আন্দু সে কথায় কান না দিয়া বলিল "খুকিটি চমৎকার হয়েছে।"

পাশের ঘরের দ্বারে সবুজ শাশির অন্তরাল হইতে একজন উঁকি দিল। দাসীর সহিত তাহার চোখোচোখী হইবামাত্র দাসী একটু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চাকরটাও মাথা ফিরাইয়া সেইদিকে চাহিল। পরিমল চাকরটার দৃষ্টি অনুসরণে সেইদিকে চাহিয়াই হাসিয়া উঠিল "এই যে দিদি, এস এঘরে, দেখসে কে এসেছে!" আন্দু উৎসুক হইয়া চাহিয়া দেখিল কাঁচের দ্বার খুলিয়া আসিতেছে লতিকা! সেই লতিকাই বটে, গর্ব্বিত গৌরবে, বিলাস বৈভবে, সৌভাগ্যশ্রীতে উজ্জ্বলা লতিকাই বটে! লতিকা এখন আর অভিমান-উচ্ছলা, ঝঙ্কারমুখরা, পিত্রালয়ের আদরের দুলালী নহে, সে এখন সন্তানের জননী—গৃহের গৃহিণী! আন্দু পূর্ণ আগ্রহে, পরীক্ষকের দৃষ্টিতে চাহিল। না, সহস্র পরিবর্ত্তনের মধ্যে, লতিকার নিজস্ব মূর্ত্তিটি ঠিক অপরিবর্ত্তনীয় আছে, লতিকা সেই লতিকাই বটে! তাহার বদনের গাম্ভীর্য্যে, গমনের স্থৈর্য্যে, মৃদুতার লেশ মাত্র নাই—আছে শুধু দম্ভ-স্ফীত, বিকৃত উগ্রতা! সে যেন কি একটা কে মহা-মহাজন হইয়া পড়িয়াছে, এমনিতর উদ্ধত ভাবখানা!

আন্দুর বাহুমূল ধরিয়া, তাহাকে টানিয়া ফিরাইয়া পরিমল বলিল "একে চিনতে পার ?"

লতিকা তাচ্ছিল্য দৃষ্টিতে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল "আন্দু না ?"

লতিকার তাচ্ছিল্যে আন্দুর রক্তকেন্দ্রের জমাট রক্ত-রাশিতে আবার যেন তরল জীবনপ্রবাহ ফিরিয়া আসিল; সে নত মুখে অভিবাদন করিয়া বলিল "জী হজুর।"

সহসা তাহার জ্যোৎস্নাকে মনে পড়িল, আহা!

লতিকা গ্রীবা বাঁকাইয়া, বাম স্কন্ধের ব্রুচটা খুলিতে লাগিল।

আন্দু খুকির চিবুকে আঙ্গুলের টোকা মারিয়া আদর করিতে লাগিল।

লতিকা ব্রুচটা খুলিয়া হাতের চুড়িতে সেটা আটকাইয়া রাখিয়া বলিল, "পরিমল, বাবার টেলিগ্রাম এসেছে।"

পরিমল বলিল, "হাঁ সে দেখ্‌লুম, আহা, শুনে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে।"

লতিকা বিবেকপ্রবুদ্ধ বৈরাগীর মত মহা নিশ্চিন্ত মুখে বলিল "ওর আর দুঃখ করে কি হবে? এ ত সকলের আছে। এখন আমাদের যাওয়ার উজ্জুগ কর।"

আন্দু অন্তরে চমকিয়া লতিকার মুখের পানে তাকাইল। লতিকার সত্যই এতখানি তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে? সেও না জ্যোৎস্নারই মত—পিতার কন্যা, পতির পত্নী! সে আজ জ্যোৎস্নার সাংঘাতিক সর্ব্বনাশের সংবাদে এতটুকু শিহ্‌রিল না? ধন্য মেয়ে বটে!

চাকরটা দেয়ালের গায়ে মিশিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আন্দু তাহার কাছে আসিয়া তাহার কোলে খুকিটিকে দিল। লতিকা পরিমলের সহিত যাত্রার ব্যবস্থা লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। আন্দু চাকরটার কাছে একখানা চেয়ারে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া দাড়াইয়া, উর্দ্ধদৃষ্টিতে দেয়ালের ছবিগুলো দেখিতে লাগিল।

বাড়ী ঢুকিতে তাহার যে আতঙ্ক অন্তরে জাগিয়াছিল, এখন তাহা নিঃশব্দে মরিয়া গেল দেখিয়া, সে অত্যন্ত শান্তি বোধ করিল। কিন্তু এ বিরক্তিকর 'বড়লোকী' বিড়ম্বনার মধ্যে বেশীক্ষণ অবস্থান করিলে তাহার মত ক্ষুদ্র প্রাণী দম বন্ধ হইয়া মরিবে। আন্দু অনাবশ্যক ব্যস্ততায় চেয়ারটা সশব্দে সরাইয়া রাখিয়া বলিল "আপনাদের পশু যাওয়াই ঠিক হ'ল?"

লতিকা চক্ষু আকুঞ্চিত করিয়া টানা গম্ভীর আওয়াজে বলিল "হুঁ—তাই হল বৈকি।"

আন্দু তাহার সে ভঙ্গী দেখিয়াও দেখিল না, পরিমলকে বলিল—"সাহেবকে মাইজীকে আমার সেলাম দেবেন। আমার তো আর সময় হবে না, না হলে পশু এসে একবার দেখা করতুম।"

লতিকা হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল "তুমিসুদ্ধ চলনা আমাদের সঙ্গে?"

আন্দু হাসিল, "আমার যে চাকরী রয়েছে।"

প্রবল তাচ্ছিল্যে ঠোঁট বাঁকাইয়া লতিকা ঠাকুরাণী জবাব দিলেন, "ওঃ! চাক্‌রী!"

আন্দু বলিল "আমি তবে এখন আসি, অনেক দেরী হয়ে গেল, তারা আবার আমায় খুঁজবে।"

আন্দুর এমনি ঔদাস্যপূর্ণ কথাবার্ত্তা, এমনি সংক্ষেপ বিদায় প্রার্থনা, লতিকার প্রভুত্ব-গর্ব্বিত হৃদয়কেও এইবার একটু দমাইল। এতক্ষণে বোধ হয় তাহার যেন প্রকৃতই মনে পড়িল, যে, আন্দু এখন তাদের সেই পূর্ব্বের মোটর-চালক নহে—লতিকার মনে বোধহয় একটু কুণ্ঠিত ভাবের উদয় হইল, সে মানুষের মত সহজ মুখে এবার বলিল "পুলিশের কাজে কি খাটুনী খুব বেশী?—তোমার যুদ্ধে যাওয়ার কি হ'ল আন্দু?"

পরিমল আন্দুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঠিক দেড়বৎসর পূর্ব্বের মতই অসঙ্কোচ সৌহৃদ্যে ঝুলিয়া পড়িয়া সাগ্রহে বলিল "তুমি জান না দিদি, যুদ্ধের স্বপ্ন, এখনো সোলজার সাহেবের মগজের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে—না আন্দু?"

আন্দু মৃদুলজ্জিত হাসিতে নিরুত্তরে সস্নেহে দুইহাতে পরিমলের মুখখানি ধরিয়া তুলিয়া গভীর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এবার লতিকা সত্যই পূর্ণ-উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ভালই তো, চেষ্টা থাকলে, সাহস থাকলে সকল দিকেই উন্নতি হবে, উন্নতির হাত পা নেই—তাকে নিজের হাতে গড়ে নিতে হয়!"

শিক্ষিতা লতিকার মার্জ্জিত মন্তব্যে, মুহূর্ত্তে আন্দুর সুপ্ত হৃদয়ের মধ্যে সত্যই একটা কল্যাণময় উদ্যমের সাড়া পড়িয়া গেল। প্রফুল্ল মুখে হাসিয়া বলিল "তা বই কি দিদিমণি! নিজের চেষ্টা ভিন্ন নিজের উন্নতি কখনো হতে পারে না"—

নবীন উৎসাহের ঝোঁকে অনেকগুলা কথা তাহার মনে হইল, কিন্তু সে সব বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষে উজ্জ্বল আনন্দের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। আন্দু তৃপ্ত চিত্তে আভূমি প্রণত হইয়া লতিকাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইয়া অগ্রসর হইল।

লতিকার উন্নতগর্ব্বিত চিত্তের তীক্ষ্ণ আত্মসম্ভ্রম-বোধ সহসা যেন ঋজু হইয়া গেল। প্রসন্ন দৃষ্টিতে আন্দুকে বিদায়

দিয়া, পরিমলের পশ্চাৎ তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া দ্বার পর্য্যন্ত আসিল। আন্দু দ্বারের বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া যুক্তকরে পুনরভিবাদন পূর্ব্বক সরল হাসিমুখে বলিল "তবে আসি দিদিমণি, খানিক-ক্ষণের জন্যে এসে খুব জ্বালাতন করে চল্লুম, কিছু মনে করবেন না, আমি বড় খুসী হয়ে চল্লুম।"

লতিকার কঠিন দর্পের ক্ষীণ রেখাটুকু নিমিষে যেন চূর্ণ হইয়া গেল। এতক্ষণে সে দেখিল, আন্দুর নম্র মহত্ত্ব কত সুন্দর! আন্দু প্রায় ফটকের কাছে চলিয়া গিয়াছে, সহসা লতিকা সকাতরে ডাকিল "আন্দু"—

আন্দু ফিরিল, দেখিল লতিকার চক্ষে উচ্ছ্বসিত বিষণ্ণতা! দীনস্বরে লতিকা বলিল "আন্দু, তুমি কিছু মনে কোরো না"--

মমতা-বিগলিত আন্দুর চক্ষের কোণে এক বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল, ত্রস্তে অভিবাদনের আবরণে সে দুর্ব্বলতাটুকু সম্বরণ করিয়া লইয়া—তরল কোমলকণ্ঠে করুণ আবেগের সহিত আন্দু বলিল "না-না দিদিমণি, আপনারা এই গোলামের অপরাধ মাপ করবেন"—

আন্দু আর দাঁড়াইল না!

ম্লানবদনা দিদির পানে চাহিয়া পরিমল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আহা! এমন লোক আর দেখলুম না!"

লতিকা সবেগে বলিল "নাঃ!"

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

প্রবুদ্ধ ভারতী

অন্তর আছিল স্তব্ধ মুগ্ধ নেত্র সম,
অহোরাত্রি ছিল শুধু অনুভব-সুখে,
কামনা-কুসুম-দলে সুপ্ত ভৃঙ্গোপম
মেলিয়া স্বপন-পাখা ছায়াস্নিগ্ধ বুকে!
আকণ্ঠ করিয়া পান লাবণ্য অমিয়া
উদ্বেল পরাণে আজি সঙ্গীত গুঞ্জরে,
কাঁপিছে চঞ্চল পাখা, বিকাশিত হিয়া
আলোর পরশে ফুল্ল পুলকের ভরে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পঞ্চশস্য

জাপানী ছেলেমেয়ের খেলা ও খেলনা—

জাপানী ছেলেমেয়েদের খেলা ও খেলনার অন্ত নাই। প্রধান কতকগুলি এই—(১) ও-তেদামা; তেদামা মানে লাল-শিম-ভরা থলে; এক-একজন ছেলে ৭টা থেকে ১০টা করিয়া শিম-ভরা থলে লইয়া ক্রমাগত শূন্যে উর্দ্ধে ছুড়িতে থাকে এবং মাটিতে পড়িবার আগেই লুফিয়া ধরে এবং ক্রমাগত এইরূপ করাতে সমস্ত থলেই মালার আকারে শূন্যে উঠানামা করিয়া ঘুরিতে থাকে; শুকনো শিম ভরা থাকে বলিয়া থলে ঝমঝম করিয়া বাজে; ছেলেমেয়েরা এই খেলা খেলিয়া কখনো ক্লান্ত ও বিরক্ত হয় না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই খেলা খেলে। (২) ইশীকেরী; মানে পাথরে লাথি; রাস্তায় খড়ি দিয়া লম্বা চতুষ্কোণ একটা ঘর কাটা হয় এবং সেই ঘর ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা হয় ও সেই ছোট ঘরগুলিতে পাথরের নুড়ি বা খোয়া রাখা হয়; ছেলেমেয়েরা এক পায়ে লাফাইয়া লাফাইয়া অপর পা না নামাইয়া লাফাইতে লাফাইতেই নুড়িগুলি লাথি মারিয়া ঘর হইতে ছুড়িয়া বাহিরে ফেলিতে থাকে।

জাপানী কান-টানাটানি ও গলা-টানাটানি খেলা

(৩) ইকুস-গোকো; এক রকম যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা; ছেলেমেয়েরা কাগজের তৈরি একই ধরণের উর্দ্দি পরিয়া তরোয়াল ঘুরাইয়া কাওয়াজ করিতে থাকে। (৪) মিমিহিকি; মানে কান টানাটানি; ছেলে-মেয়েরা একটা লম্বা দড়ির দুমুখ বাঁধিয়া মালার মতন করিয়া হাতে লইয়া দুজন দুজন সামনাসামনি বসে, এবং প্রত্যেকে চেষ্টা করে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কানে সেই দড়ির মালা ছুড়িয়া আটকাইয়া টানিতে; যে পারে সে জেতে। (৫) কামিফুকি; এই খেলায় এক-এক টুকরা কাগজ ভিজাইয়া ছেলেদের কপালে আঁটিয়া দেওয়া হয় এবং অপরে চেষ্টা করে ফুঁ দিয়া সেই কাগজ খুলিয়া উড়াইয়া ফেলিতে; এই চেষ্টায় ফুঁ দিবার সময় যে নানারূপ মুখভঙ্গি ও মুখবিকৃতি হয় তাহাই বালকবালিকাদের প্রচুর আনন্দের কারণ। (৬) কুবিহিকি; মানে গলা টানাটানি; দুজন ছেলের গলায় গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং এ উহাকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করে; যে অপরকে নিজের দিকে টানিয়া আনিতে পারে সেই জেতে। (৭) উদেওশী; দুজন ছেলে সামনাসামনি বসিয়া হাতে হাত লাগাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতকে চারিদিকে ঘুরাইয়া আনিতে চেষ্টা করে; যে পারে সে জেতে; ইহা অনেকটা

জাপানী পাঞ্জা-কষা।

আমাদের পাঞ্জা-কষার মতন। (৮) যুবিজুমো, মানে আঙুলের লড়াই, সামনাসামনি বসিয়া দুজনে হাতের আঙুলে আঙুলে জোড় লাগায়, বুড়ো আঙুলটা খোলা থাকে; যে কব্জির জোরে অপরের হাতকে কাবু করিতে পারে সে জেতে। (৯) নিরামেক্কুর, দুজন সামনা-সামনি বসিয়া একদৃষ্টে পরস্পরের দিকে চাহিয়া থাকে, যে না হাসিয়া যত বেশীক্ষণ থাকিতে পারে তাহার জিত। (১০) ওনিগোক্কো; চোর-চোর খেলা; একজন চোর হয়, সে যাকে ছুঁইয়া দিবে সে তখন চোর হইবে এবং আগেকার চোর সাধুদের দলে ফিরিয়া যাইবে, এইরূপে অনেকক্ষণ খেলা চলে; শীঘ্র খেলা শেষ করিতে হইলে, প্রথমে একজন চোর হয়, সে যাহাকে ছুঁইতে পারে সেও চোর হইয়া দুইজন হয়,

জাপানী কাণামাছি খেলা।

আবার তাহাদের দুজনের চেষ্টায় যতগুলি ছোঁয়া পড়ে তার সকলেই চোরের দলপুষ্টি করে; অবশেষে ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া খেলা শেষ হইয়া যায়; যে ছেলে বা মেয়ে সকলকার শেষে চোর হয় সে সকলের সেরা। (১১) কাকুরেম্বো; চোর চোর খেলারই রূপান্তর—লুকাচুরি খেলা,—চোর চোখ বুজিয়া দাঁড়ায়, অপর সকলে লুকাইয়া টু দিলে চোর তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করে। (১২) কাণামাছি খেলাও জাপানী ছেলেমেয়েরা খুব খেলে, হয় সকলের মাঝে একজন চোখ বাঁধিয়া সঙ্গীদের ধরিতে যায় এবং সঙ্গীরা পাশ কাটাইয়া এড়াইয়া বেড়ায় এবং যাহাকে ধরে সেই কাণামাছি হয়; নয় একজনের চোখ বাঁধিয়া দিয়া আর সকলে গোল হইয়া বসে; চক্রে উপবিষ্ট ছেলেমেয়েরা একে একে শব্দ করিয়া সাড়া দিতে থাকে, এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া কাণামাছি এক পেয়ালা চা হাতে করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া কাহাকেও ধরিয়া তাহার নাম বলিতে পারিলে সে অব্যাহতি পায় এবং যাহাকে ধরিয়াছিল সে কাণামাছি হয়; ইহাকে ওচাবোজু বলে। (১৩) মুকো-নো-ওবাসান মানে "মামী গো মামী"; এও একরকম চোর-চোর খেলা; ছেলেমেয়েদের একদল রাস্তার এপারে আর-একদল ওপারে দাঁড়ায়; একদল ডাকে—"মামী গো মামী হেথায় আয়!" অপর দল জবাব দায়— "বাছা গো বাছা ভূতের ভয়!" তখন প্রথম দল—

"আপনি না এসো ধরবে যে ভূত,
যাকে ছোঁবে তার লাগবে যে ছুত।"

বলিয়াই ছুটিয়া অপর দলের উপর গিয়া পড়ে; যে প্রথম ধরা পড়ে সে ভূত হয়। (১৪) কো-ও-তোরো-কো-তোরো, মানে—সব কটাকে ছেড়ে দিয়ে শেষের-টাকে ধর; একদল ছেলেমেয়ে সারবন্দি হইয়া একের পিছনে আর একজন কোমরের কাপড় চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়ায়; দলের মধ্যে সব চেয়ে মাথায় যে বড় সে আগে থাকে, ক্রমে ছোটরা দাঁড়াইয়া সব-শেষে সব-ছোটটি দাঁড়ায়; তখন বড় ছেলেটি দীর্ঘ অজগর সর্পের লেজ কামড়ানোর ন্যায় ছেলেদের শৃঙ্খলটিকে টানিয়া ঘুরাইয়া শেষের ছোট ছেলেটিকে ধরিতে চেষ্টা করে এবং শেষের ছেলেটির চেষ্টা হয় তাহার হাত এড়াইয়া থাকিবার। (১৫) ইমোমুশী-কোরোকোরো, মানে—গুটিপোকার গুটিগুটি; ১৪ নম্বরের খেলার ন্যায়ই ছেলেরা একের পিছনে অপর সারিবন্দি হইয়া কোমরের কাপড় ধরিয়া দাঁড়ায় এবং "গুটিপোকার গুটিগুটি" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ঘুরিয়া বেড়ায়। (১৬) হিতোতোরি, মানে, ছেলেধরা; আমাদের কপাটি বা হাডুডুডু খেলার মতন, দুদলে বিভক্ত হইয়া সামনাসামনি দাঁড়াইয়া একদল অপরদলের লোককে ধরিয়া নিজের কোটে আনিয়া বন্দী করিতে চেষ্টা করে। (১৭) দোরোবোগোক্কো—আর-এক রকম চোর-চোর খেলা, দলের মধ্যে যে সব চেয়ে বলিষ্ঠ সে ডাকাত হয়, অপর সকলে হয় পুলিশ; পুলিশ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করে এবং ডাকাত পুলিশকে ফাঁকি দিতে ও তাহাদের হাত এড়াইতে বিধিমত চেষ্টা করে। (১৮) পুতুল-খেলা জাপানের অতি প্রাচীন খেলা, খৃষ্টজন্মের ৯৬ বৎসর পূর্ব্বেও জাপানে পুতুল ছিল, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হইতে পাওয়া গিয়াছে। (১৯) তাকেউমা; একটা সরু বাঁশের লাঠির এক মুড়ায় দড়ি বাঁধিয়া লাঠিটাকে তেরছা করিয়া ধরিয়া তাহার দুইধারে পা দিয়া দাঁড়াইয়া ছেলেরা ঘোড়া-ঘোড়া খেলে; এই খেলা ৫০০ বৎসরের পুরাতন; ক্রমে লাঠির মাথায় একটা ঘোড়ার মুখ কাঠে তৈরি করিয়া লাগানো হইতেছে; এবং নীচের দিকে একজোড়া চাকাও জোড়া হইতেছে; স্থলবিশেষে উহাকে একেবারে পূর্ণাবয়ব ঘোড়া করিয়া তিনচাকার গাড়ীতে বা নাগরদোলায় বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একজোড়া কাঠের পায়ার উপর জুড়িয়া চালানো বা ঘোরানো বা দোলানো হইয়া থাকে। (২০) কোমা; লাটিম, ইহা কোরিয়া হইতে জাপানে প্রবর্ত্তিত হয়; অতি প্রাচীন খেলা।

(২১) তোগোমা; এও একরকম লাটিম; একটা বাঁশের চোঙার মধ্যে একটা কাঠি পুঁতিয়া ঘোরানো হয়; কাঠির ভরে চোঙা ঘুরিবার সময় বেণুরন্ধ্রে বাতাস ঢুকিয়া শব্দ করে। (২২) শামুকের খোলার মধ্যে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া সেই শামুকটাকে দড়ি দিয়া ঘোরায়। (২৩) তাতাকিগোমা; ইহা ২২ নম্বরেরই মতন, তফাৎ মাত্র এই যে এর খোলটা শামুকের নয়, কাঠের হয়। (২৪) জেনিগোমা; একটা পয়সার মধ্যখানে ফুটা করিয়া একটা গোঁজ পরাইয়া সেই গোঁজ ধরিয়া পাক দিয়া আলের উপর ঘোরায়। (২৫) তাকো বা ঘুড়ি জাপানের বহু পুরাতন ও বহু সমাদৃত খেলনা; জাপানে ঘুড়ি-উড়ানোর একটা বিশেষ উৎসব হয়; এলাহাবাদেও পতঙ্গ উড়াইবার উৎসব দেখিয়াছি। (২৬) হাগোইতা অর্থাৎ দাণ্ডা-গুলি। (২৭) ইমুহারিকো—কাগজের কুকুর; আগে সুপ্রসব হইবার তুকতাক-রূপে প্রসূতির আঁতুড়ঘরে রাখা হইত—অর্থ, কুকুর যেমন সহজে বাচ্চা প্রসব করে তেমনি সহজ প্রসব হোক; এখন উহা ছেলেদের খেলনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (২৮) ঢোল ও বাঁশী। (২৯) ওকিয়াগারি-কিবোশী—দারুমা নামক দেবতার কাগজময় মূর্ত্তি, তাহার তলায় ভার থাকে; ইহাতে পুতুলটাকে যেমন করিয়াই কাত করিয়া ফেলা যাক না কেন সেটা ছাড়া পাইলেই আবার খাড়া হইয়া উঠে; পুতুলের এই গোঁ ছেলেদের ভারি আমোদ দ্যায়। (৩০) হাজিকিজারু—চোঙার বাঁদর; একটা লম্বা কাঠির মাথায় একটা বানরের মূর্ত্তি বসানো থাকে; কাঠির নীচে একটা দড়ি বাঁধা থাকে; সেই কাঠিটা একটা চোঙার মধ্যে ভরিয়া লম্বা দড়ির খেইটা চোঙার বাহিরে রাখা হয়; দড়ি ধরিয়া টানিলেই কাঠিটা উপরের দিকে উঠে এবং নোল পাইলেই চোঙার মধ্যে নামিয়া যায়; ইহাতে বানরের নৃত্য চলিতে থাকে;—এইরূপ চোঙার বাঁদর বাংলা দেশের (অন্তত হুগলি জেলার) খেলনা; জাপানীরা উহা আরো উন্নত করিয়াছে—একটা কাঠির নীচে একটা বানর থাকে, একটা স্প্রিং খুলিয়া দিলেই বানরটা ধীরে ধীরে কাঠি বাহিয়া গাছের উপরে চড়িয়া যায়। (৩১) কাজাগুরুমা—কাগজ ও বাঁশের চেঁচাড়িতে তৈরি পবন-চক্র—এক-একটা সুন্দর ও চিত্রশোভিত কারুকৌশলময় হয়। (৩২) কুস্তীগির পুতুল; পুতুলের নীচে খুব শক্ত শুওরের কুচি আঁটা থাকে, পুতুলগুলিকে একটু উপর হইতে মাটিতে ফেলিলে তড়াংতড়াং করিয়া কুস্তীগিরের ন্যায় লাফাইতে থাকে; যে পুতুলটা আগে কাত হইয়া পড়ে তার হার হয়। (৩৩) তুলো বা রেশমের বল। (৩৪) পুতুলনাচ, দড়ি বা তার বাঁধিয়া পুতুলবাজির ন্যায় নানা ভঙ্গিতে নাচানো যায়। (৩৫) ওশাবুরি—ঝুমঝুমিবাঁশী। (৩৫) হারিকোনোতোরা—ঘাড়নাড়া পুতুল। (৩৬) প্যাঁকপেঁকে পুতুল। (৩৭) বিলাতী খেলনার অনুকরণে দম-দেওয়া কলের গাড়ী, জন্তু জানোয়ার মোটরকার, ঠেলা বা টানা গাড়ী, ঘরকন্না রান্নাবান্নার জিনিষের ক্ষুদ্র সংস্করণ, কারিগরের হাতিয়ার, তারে তৈরি ধাঁধা, ছবির তাস, খণ্ড খণ্ড চিত্রিত কাঠ জুড়িয়া একটা গোটা ছবির আকার গড়া, যুদ্ধোপকরণ তরোয়াল বন্দুক কামান নিশান প্রভৃতি বহুবিধ খেলনা জাপানী ছেলেমেয়েদের খুব প্রিয়। জাপানের দেশী খেলা ও খেলনার উদ্দেশ্য যাহাতে শিশুদের ব্যায়াম ও আনন্দ দুইই হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও কল্পনাও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে; দেশী খেলা শান্ত রকমের; যে-সব খেলা হিংসা-দ্বেষের চিহ্ন তাহা য়ুরোপের আমদানি। প্রাচীন জাপানীরা খেলনা-তৈরি ব্যবসাটাকে খুব উঁচু নজরে দেখিত না; এজন্য বড় কারখানাও কখনো হয় নাই। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচলনের পর ছেলেদের শিক্ষায় খেলনা যে কত দরকার তাহা বুঝিয়া খেলনা প্রস্তুতের দিকে লোকের মন ছুটিয়াছে, কিন্তু এখনো এই ব্যবসাটা গৃহস্থেরই ব্যবসা হইয়া আছে—পাইকার ফোড়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাহাদের তৈরি মাল সংগ্রহ করিয়া দোকানে বাজারে লইয়া যায়। সমস্ত জগতের ছেলেদের খেলনা জোগাইত জার্ম্মানী। এখন জার্ম্মানীর রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে সকল দেশেই নানান জিনিষের অভাব পড়িয়াছে এবং সেইসমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা জাগিয়াছে। জাপান অনুকরণ করিতে উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়াছে—জাপানী খেলনা জার্ম্মান খেলনা অপেক্ষা সস্তা কিন্তু কম মজবুত। জাপান হইতে বৎসরে কুড়িলক্ষ ইয়েন (এক ইয়েন—১৸৴০) মূল্যের খেলনা রপ্তানী হইতেছে; জার্ম্মানী হইতে হইত চার কোটি ইয়েন।

ভারতবর্ষের খেলা ও খেলনা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এইদিকে ভারতবাসীর নজর দিবার সময় আসিয়াছে; নতুবা জার্ম্মানীর পরিত্যক্ত ক্ষেত্র জাপানীরা দখল করিয়া বসিয়া দেশের অর্থ শোষণ করিতে থাকিবে এবং আমরা দরিদ্রতর হইতে থাকিব।

* * *

রুষ সৈন্যের স্নানের ব্যবস্থা—

রুষেরা স্নান না করিয়া থাকিতে পারে না। গরিব গৃহস্থের বাড়ীতেও গরমজলের ভাপরা লইবার ঘর থাকে। কাজেই রুষিয়াকে তাহার সৈন্যদের স্নানের ব্যবস্থার জন্য ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। রুষিয়া এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া স্নানের রেলগাড়ী উদ্ভাবন করিয়াছে—রেলগাড়ীতে চলিতে চলিতে সৈন্যেরা স্নান সারিয়া লইতে পারিবে। এক-এক স্নানের ট্রেনে তিন তিন হাজার করিয়া স্নান-কক্ষ ও গরমজলের ভাপরা লইবার ঘর থাকিবে। গাড়ীর দেওয়ালগুলো বনাতের কাপড় ও কর্ক দিয়া মোড়া, যেন স্নানের সময় বাহিরের ঠাণ্ডা গাড়ীর ভিতরে না লাগে; ইঞ্জিনের বয়লার হইতে গরম জল ও জলের গাড়ী হইতে ঠাণ্ডা জল জোগানো হয়; গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-পাম্প থাকে; জল ফুরাইয়া গেলে ৩৫০-৭০০ ফুট গভীর বা ৩০০-৬০০ ফুট দূর স্থান হইতে জল চুষিয়া আনা যাইতে পারিবে। স্নানের গাড়ীর পাশেই কাপড়-ছাড়ার গাড়ী—নম্বরওয়ারি বেঞ্চি থাকে; যে যে নম্বরের সৈন্য সে সে-নম্বরে তার কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া রাখিয়া যায় এবং ময়লা কাপড় নম্বরওয়ালা একটা ব্যাগে ভরিয়া রাখিয়া ধোয়া কাপড় পরে; পরদিন স্নানের সময় সেই ময়লা কাপড় ধোলাই হইয়া ব্যাগবন্দি হইয়া তাহার নম্বরের জায়গায় কাপড়-পরার গাড়ীতে মজুত থাকে। গাড়ীর মধ্যে ক্ষৌরী হাজামতের ব্যবস্থা আছে। স্নানের ঘরে প্রত্যেক সৈন্য-পিছু একখানা করিয়া সাবান, গা রগড়াইবার জন্য একটা ধোঁদলের ছিবড়ে থাকে; যার যেমন ইচ্ছা কাঁচা-পাকা জল গামলায় মিশাইয়া লইতে পারিবে বলিয়া ফি ঘরে গরম ও ঠাণ্ডা জলের কল ও গামলা এবং ঝাঁঝরা-কল থাকে। স্নান করিয়া কাপড় পরিবার গাড়ীতে চা তামাক খাইতে পায়। গাড়ীতে জুতো-জামা বিশোধিত (disinfection or sterilizing) করিবার ব্যবস্থাও আছে। গাড়ীতে জুতা মেরামতের জন্য মুচি, জামা কাপড় রিফু করিবার জন্য দর্জ্জি, কাপড় কাচিবার জন্য ধোপা, কামাইবার জন্য নাপিত, জলখাবার চা দিবার জন্য খানসামা, সবই থাকে। সকলেই সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে চলে; এতবড়টা ভারতবর্ষ শুধু অতীতের দিকে তাকাইয়া আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া শুইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে—হায়রে আমার অদেখা অদৃষ্ট অতীত সেকাল!

* * *

চাষা জাতের বুদ্ধির আবাদ আর বিদ্যার ফসল—

সার্ভিয়া দেশটা চাষার দেশ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ঐ চাষারা একেবারে আকাট মূর্খ নয়; তারা পেটের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের খাদ্যেরও আবাদ করে এবং উত্তম ফসল ফলায়। স্লাভ জাতির মধ্যে সার্ভিয়ার লোকেরা নাকি সব-চেয়ে কবিত্বপ্রবণ; তাহারা সঙ্গীত নৃত্য ও যা-কিছু

সুন্দর ভালো বাসে। তাহাদের অশিক্ষিত কবিরা পথে পথে জাতীয় ভাবের ছড়া গাহিয়া লোককে স্বদেশী-ব্রতে উদ্বোধিত করে, তাহারা জাতীয় জীবনের ঘটনা গানে বাঁধিয়া কাফিখানায় গিয়া গাহিয়া শুনায়—লোককে খবরের কাগজের শুকনা খবর পড়িতে হয় না। স্লাভ ভাষার মধ্যে সার্ভিয়ার ভাষাই পুষ্টতম ও মিষ্টতম; রুষ ভাষারও এই খ্যাতি আছে—কিন্তু সার্ভিয়ার তুল্য নয়। য়ুরোপের মধ্যে সার্ভিয়াতেই প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম পত্তন হয়—অর্থাৎ সার্ভিয় সব আগে যুক্তিমূলক ধর্ম্মকে সমাদর করে। সার্ভিয়া আড়াল থাকিয়া তুর্কিকে সারা য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়িতে দায় নাই এবং এখন সে মধ্য য়ুরোপের দুর্দ্দান্ত জাতিদের পূর্ব্বাঞ্চল দখল করিবার পথ আড়াল করিয়া বসিয়া আছে। ইটালীর বহু বিখ্যাত চিত্রকর জাতিতে সার্ভিয়। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ স্থপতি ব্রামাণ্ট (Bramante) রোমের সেণ্ট পীটারের গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া বিখ্যাত; তিনি সার্ভিয়ার স্থপতি জুলিয়াস্ লোরেনের শিষ্য। প্রসিদ্ধ চিত্রকর টিশিয়ানের বন্ধু বিখ্যাত চিত্রকর শিয়াভোন ওরফে আন্দ্রিয়া মেহুলিক সার্ভিয়ার লোক। ফ্লোরেন্সের কতকগুলি উৎকৃষ্ট ও সুন্দর মূর্ত্তি সার্ভিয়-ভাস্কর গিয়োভান্নি দালমাতা নির্ম্মাণ

নিরাশার কানে আশার ডাক। মেষ্ট্রোভিক কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ মূর্ত্তি।

করেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক সার্ভিয় ইটালী ও ফ্রান্সে চিত্র ও মূর্ত্তি-রচনায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। রোজার বোস্কোভিক প্রসিদ্ধ আঙ্কিক, জ্যোতিষী ও দার্শনিক—সার্ভিয়ার লোক। নিকোলা তেসলা বৈদ্যুতিক ব্যাপারে জগতে একমাত্র এডিসনের নীচে; তিনিও সার্ভিয়ার লোক। বর্ত্তমানে লণ্ডনের বাসিন্দা ভাস্কর ইভান মেষ্ট্রোভিক আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর; রোডাঁর ন্যায় ভাস্করও তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। ইনি দক্ষিণের

সার্ভিয় স্বাধীনতার প্রতিনিধি মার্কো ক্রালিয়েভিক—ইনি ১৩৮৯ সালে একেশ্বর ৩০০ তুর্কী শত্রুর গতিরোধ করিয়া যুদ্ধ করেন। মেষ্ট্রোভিকের গঠিত এই মূর্ত্তি তুর্কীর হাতে পরাজয়ের ক্ষেত্রে পুনর্লব্ধ স্বাধীনতার স্মরণচিহ্নস্বরূপ দেশ-মাতৃকার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

স্লাভজাতির জাতীয় ভাবের ও বুদ্ধিবিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া গণ্য। ইনি অষ্ট্রিয়ার অধীন স্বদেশাংশে দেবতার ন্যায় পূজ্য কারণ ইনি স্বদেশবাসীদের স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র উৎসুক করিয়া বিজেতা অষ্ট্রিয়ার অত্যাচারে অসহিষ্ণু হইতে শিখাইয়াছেন। ইনি বাল্যে রাখাল ছিলেন; ১৪ বৎসর বয়সে কাঠ কুঁদিতে ও কাদা দিয়া মূর্ত্তি গড়িতে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বদেশের হীনতাগ্লানি ও অসহিষ্ণুতার বিবিধ কাহিনী তাঁহার মনে শিল্পবোধ জাগ্রত করিয়া তোলে. তিনি রাখালী ছাড়িয়া ভিয়েনাতে এক পাথর মিস্ত্রীর কারখানায় পাথর কাটিতে শিখিতে আরম্ভ করেন এবং অবশেষে তক্ষণ ও ভাস্কর্য্য শিক্ষা করেন। এখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর। ফ্রান্সে রোদাঁর যে স্থান, দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপে মেষ্ট্রোভিকের সেই স্থান; ১৯১১ সালে রোমে শিল্পপ্রদর্শনীতে শুধু ইহাঁর রচনা প্রদর্শনের জন্য একটি চত্বর পৃথক করা ছিল; ইহাঁর সমস্ত রচনাতেই অষ্ট্রিয়ার জুলুম ও অত্যাচার এবং স্বদেশের বেদনা ও গ্লানি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা রূপ পাইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নামজাদা রচনা—স্বদেশমাতৃকার মন্দির। ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে কোসোভো-ক্ষেত্রে তুর্কীরা সার্ভিয়াকে পরাজিত করিয়া চিরদিনের জন্য দুর্ব্বল ও পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। তার পর গ্রীসের স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধে স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক ইংরেজদের সাহায্যে সার্ভিয়াও স্বতন্ত্র হইতে পারিয়া-

ছিল ; এবং এখন আবার তাহার স্বাধীনতা-নাশের আশঙ্কা করিয়া তাহার পুরাতন বন্ধু স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরেজ তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। এই হীন অবস্থার পর স্বাধীনতা-লাভ স্মরণীয় করিবার জন্য সার্ভিয়া গভর্মেণ্ট কোসোভো-ক্ষেত্রে দেশমাতৃকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন ; মেষ্ট্রোভিক সেই মন্দিরের পরিকল্পনা ও নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন—ইহার রচনা-সাম্য মাপ-সামঞ্জস্য ও বৃহত্ব তাঁহাকে প্রাচীন ওস্তাদদের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছে ; ঐ মন্দিরের পাচটি চূড়া পাঁচ শতাব্দীর অভ্রভেদী অত্যাচার সূচনা করিতেছে ; কোসোভোর যুদ্ধে পরাজয়ের পর যে স্বদেশী বীর একাকী তিনশত তুর্কীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি এই দেশ-মাতৃকার মন্দিরের কোলে স্থাপিত হইবে—সে মূর্ত্তিও মেষ্ট্রোভিকের রচনা।

* * *

কবির আক্রমণ—

ইংলণ্ড জার্ম্মানীর আক্রমণের ভয়ে তত নয় কবিদের আক্রমণের ভয়ে যত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল সেখানে সবাই কবি এবং লর্ড কীচনার জজ্ ফ্রেঞ্চ কেহই তাহাদের পদ্যপংক্তির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইতেছেন না। গত এগার শতাব্দীতে যত কবিতা লেখা হইয়াছিল গত এগার মাসে তার চেয়ে ঢের বেশী লেখা হইয়াছে।

চারু।

* * *

যুদ্ধ-বার্ত্তা-প্রচারে সত্যের অপলাপ—

"একটা মিথ্যা সংবাদে যদি জনসাধারণকে তিনদিনও বিশ্বস্ত রাখা যায় তাহাতে শাসক-সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার হইতে পারে।" মেডেসীর ক্যাথেরাইনকে এই রাজনৈতিক সুত্রটির আবিষ্কর্ত্তী বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়া থাকে। অনেকে খাঁটী মিথ্যা কথা বলা ও সত্যটাকে ছদ্মবেশে লোকসমক্ষে হাজির করা এতদুভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং এরূপ প্রতারণাযোগে শাসন-কার্য্যপরিচালন করাকে রাজনীতি-বিষয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা খাঁটী মিথ্যা কথা না বলিয়া সত্যটাকে একটু ঘুরফের করিয়া ছদ্মবেশে প্রকাশ করাটাই অধিক প্রশস্ত বলিয়া মনে করেন ; কারণ, যখন আসল খবর আর চাপিয়া রাখা যাইবে না তখন তাহাকে সহজে কলে-কৌশলে সত্যের অনুযায়ী করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইতিহাসে এইরূপ মিথ্যার সাময়িক ও চিরস্থায়ী প্রভাবের অনেক পরিচয় পাইতে পারেন। অকস্মাৎ একটা ভয় কিংবা বিষাদের ভার যাহাতে জাতিকে অবসন্ন করিতে না পারে এ উদ্দেশ্যে এ পন্থা বহুধা পরিগৃহীত হইয়াছে। মানুষ যখন আকুল-আগ্রহে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকে তখন নৈরাশ্যের তীব্র আঘাত তাহার হৃদয়ে এমন করিয়া লাগে যে সে তাহাতে একেবারে দমিয়া পড়ে। সুতরাং জাতিকে নিরাশা ও নিরুদ্যমের হাত হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া রাজনৈতিকগণ এ কৌশল অনেক সময়ে অবলম্বন না করিয়া পারেন না। সত্যটাকে অত্যন্ত চাতুরীর সহিত ঢাকা হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সময় সময় ব্যাপারটা এমন বেখাপ্পা হইয়া দাঁড়ায়, যে, লোকে তাহাতে স্বভাবতঃ সন্দিগ্ধ হইয়া থাকে।

এইরূপ মিথ্যা সংবাদসমূহ একবার পুঁথিগত হইয়া পড়িলে সাধু ঐতিহাসিকের পক্ষে সত্যনির্ণয়ে অনেক ক্লেশ পাইতে হয়।

বহুদূরবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্রে অদৃষ্টের যে পরীক্ষা বহুপূর্ব্বে শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা লইয়া হয়ত দেশবাসী তাহার পরবর্ত্তী বহুকাল পর্য্যন্ত বাক্‌বিতণ্ডায় বিব্রত আছেন, লেখক মনগড়া কথায় রাশি রাশি কাগজ-পত্র বোঝাই করিয়া লোকসমক্ষে যুদ্ধকালকে আরও দীর্ঘ করিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছেন, ভাবী সুখের স্বপ্ন আঁকিয়া দেশবাসীর বক্ষ আশার আনন্দে স্ফীত করিতেছেন। ইহা কিছু-একটা অসাধারণ ঘটনা নহে। যে কয়েকটা প্রধান যুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্নজাতির ভাগ্যবিপর্য্যয় নির্ণীত হইয়াছিল, তাহাদের সংবাদ-আদানপ্রদান-বিষয়েও সম্পূর্ণ সন্দেহশূন্য থাকা যায় না। কোন স্থলে হয়ত একটা হাতাহাতি মারামারিকে প্রকাণ্ড যুদ্ধে পরিণত করা হইয়াছে বা হতাহতের সংখ্যার তালিকামাত্র দিয়া পরাজয়ের সংবাদ চাপা দেওয়া হইয়াছে, আবার স্থলবিশেষে উভয়পক্ষই জয়লাভের সমভাবে দাবী করিতেছেন! (Velleroy) ভেলেরয়ের সহিত (Marlborough) মার্ল্‌বরোর যে কয়েকটা সংঘর্ষণ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ভেলেরয় দেশে যে-সমস্ত সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন তাহা হইতে কেহই বুঝিতে পারিবেন না যে তিনি বিপন্ন হইয়াছিলেন। সিজারের সহিত যুদ্ধে পম্পির যে সাংঘাতিক ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল তাহা সকলেই বিদিত আছেন, কিন্তু তিনি রোমের সমস্ত প্রদেশের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে রটাইয়াছিলেন যে তিনি খুব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন ; রাজাসুদ্ধ লোকের বিশ্বাস ছিল, সীজার যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছেন। প্লুটার্ক লিখিয়াছেন, অন্যূন তিন শত লেখক ম্যারাথনের বিখ্যাত যুদ্ধের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এত মতানৈক্য যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রথম জেমসের রাজত্বকালীন চিঠিপত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিলে বিখ্যাত লুজান (Lutzan) সমরের সংবাদগুলির মধ্যে পরস্পর অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখা যায়, কোনটা (Gustavas Adolphus) গাষ্টেভাস এডল্‌ফাসের জয়ের কোনটা পরাজয়ের অতিরঞ্জিত সংবাদে পূর্ণ। কখন কখন সুইডেন-বাসীরা জয়লাভ করিয়াছে এরূপ সংবাদ রটিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সময় প্রটেষ্টাণ্ট পন্থাবলম্বী ইংরেজজাতির চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দোলায়িত ছিল। অবশেষে যখন প্রকৃত সংবাদটি প্রকাশ হইয়া পড়িল তখনও ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ সংবাদটি দেশে সহজে রাষ্ট্র করিতে সাহস পান নাই, কারণ যদিও প্রটেষ্টাণ্টদিগেরই জয়লাভ হইয়াছিল ধরা যায়, তথাপি প্রটেষ্টাণ্ট বীরবরের পতনে সমগ্র সমাজ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এডল্‌ফাসের জীবনীলেখক বলেন, এইরূপ সংবাদ গোপন করিতে নাকি মন্ত্রীসমাজ চিরকালই অভ্যস্ত। যদিও লেখকের এ উক্তি সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত বলা যাইতে পারে না, তথাপি খুব সম্ভব, ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা দেশের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া বহুদিন ঐ সংবাদটি অপ্রকাশ্য রাখিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে যে-সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল তাহার অনেকগুলি তাঁহারা নিজেদের মতানুযায়ী করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ইতিহাস হইতেও এরূপ ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। (Boyne) বয়েনের বিখ্যাত যুদ্ধেও আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃত সত্যকে চাপা দিয়া বিভিন্ন পক্ষ আপনাদের মনের-মত করিয়া ঘটনাগুলিকে জাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফরাসী-দেশের ক্যাথলিক সম্প্রদায় বহুদিন পর্য্যন্ত রটনা করিয়াছিলেন, কাউণ্ট লজান (Lauzun) জয়লাভ করিয়াছেন এবং তৃতীয় উইলিয়ম যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

বুসী রাবুটিন তাৎকালীন বিবরণ অসত্যের দ্বারা কলঙ্কিত না করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তিনি লিখিয়াছেন, সংবাদটি প্রথমে যেরূপ প্রচারিত হইয়াছিল আমি তদনুযায়ীই লিখিয়া-ছিলাম কিন্তু যখন প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন মিথ্যা জয়ের সংবাদকে সংশোধনপূর্ব্বক পরাজয়ের সংবাদে পরিবর্ত্তিত করাতে

সম্প্রদায়বিশেষ আমার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিল। পেয়ার্ লণ্ডেল (Pere Londel) উক্ত সময়ের আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীর একটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—"আয়রলণ্ডে বয়েনের যুদ্ধ! সোমজ্ বার্গ ইংরেজসৈন্যের পুরোভাগে নিহত হইয়াছেন।" লেখক এমনভাবে সত্যকে ছদ্মবেশে ঢাকিয়া প্রচার করিয়াছেন যেন ইংরেজসৈন্য সে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে।

সমগ্র জগতটা এরূপ মিথ্যা সংবাদের বেসাতি করিতে এমন অভ্যস্ত যে গোপনীয় ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ছাড়া সাময়িক প্রচারিত সংবাদ হইতে সত্যের খুঁটিনাটি বাহির করিয়া লওয়া বড়ই দুষ্কর, এমন কি সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রসিদ্ধ লেখক (Bayle) বায়লী এমন কতকগুলি বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার অযৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন যাহা গোপনীয় ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ব্যতীত কখনই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিত না।

১৫৮০ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডে প্রচার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে ফরাসীদেশের ও স্পেনদেশের রাজা এবং পোপভক্ত ডিউক অব আলভা লোকান্তরিত হইয়াছেন। এই সংবাদে তদ্দেশস্থ বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের উৎসাহ উদ্দীপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। স্পেনরাজ ফিলিপ যখন তাঁহার স্বনামখ্যাত অপরাজেয় নৌবহর লইয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে আসিতেছিলেন, তখন বালে রটাইয়া দিয়াছিলেন, স্পেনীয়গণ থামস্ক্রু নামক বুড়া আঙ্গুল মোচড়াইয়া ভীষণ যন্ত্রণা দিবার অস্ত্র লইয়া আসিতেছে। ইহাতে ইংরেজজাতির হৃদয়ে শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

আকস্মিক বিপদের নৈরাশ্যব্যঞ্জক সংবাদ ও শত্রুভয় মানুষের হৃদয়ের উপর কিরূপ অবসাদ আনয়ন করে দ্বিতীয় জেমসের লিখিত বিবরণ হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। প্রিন্স অব অরেঞ্জের ঘোষণাপত্র বলিয়া এরূপ একটা সংবাদ দেশে রটিয়া যায় যে আইরিশ সৈন্যদল ইংলণ্ডে আপতিত হইয়া বিষম অত্যাচার করিতেছে, তাহারা ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দিতেছে, লোকজনকে নৃশংসভাবে কাটিয়া বা গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতেছে। এই সংবাদ ইন্দ্রজালের মত সমগ্র দেশে মুহূর্ত্তের মধ্যে এরূপভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে সহরের একাংশের লোক মনে করিয়াছিল যে অপরাংশে ভীষণ রক্তস্রোত বহিতেছে, আগুনে ঘর বাড়ী পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে। ভীষণ ভয়ে লোকে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভয়ের কিছুমাত্র কারণ ছিল না। আইরিশগণ অস্ত্রবিহীন হইয়া খাদ্যাভাবে ইংলণ্ড হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে সমগ্র ইংলণ্ড যখন ঘরোয়া বিবাদে বিষম বিপন্ন ছিল তখন সংবাদপত্রস্তম্ভে এবং ব্যক্তিগত সংবাদ আদানপ্রদানে রাজনীতির এই অদ্ভুত কৌশল প্রয়োগ করিতে কোন পক্ষই পশ্চাৎপদ হন নাই। মিথ্যা সংবাদ গড়িয়া স্বপক্ষের মধ্যে প্রচার করিতে যতদূর চাতুরী দেখাইতে হয় এ সময়ে তাহার চূড়ান্ত হইয়াছিল। একদিন গুজব রটিল যে বিদ্রোহীরা প্রচুর পরিমাণ বারুদের সাহায্যে টেমস নদী উড়াইয়া দিয়াছে। যেমন রাজমিস্ত্রীরা খিলান গাঁথিতে হইলে তাহা শক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কাঠ, ইটের কুচি তাহার অবলম্বন স্বরূপে ব্যবহার করে, পরে কার্য্যসিদ্ধি হইলে তাহা ফেলিয়া দেয়, অনেক রাজনৈতিক তদ্রূপ মিথ্যা ঘটনা-কৌশল তাঁহাদের সাময়িক কার্য্যসিদ্ধির অবলম্বন-স্বরূপে গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের গৃহবিবাদের সমসাময়িক ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাদের এ ক্ষমতার দক্ষতা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কি সুন্দর গোছ-গাছ করিয়া তাঁহারা মিথ্যাটাকে সত্যের সাজে খাড়া করিয়াছেন! আবার সেটা যখন বাতিল হইয়া গিয়াছে তখন কি চাতুরীর সহিত মিথ্যার উপর মিথ্যা সৃষ্টি করিয়া তাহার অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন-সাধনে প্রয়াস পাইয়াছেন! বাস্তবিকই এমন বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না! কি রাজপক্ষ কি পার্লিয়ামেণ্টের দল সকলেই এবিষয়ে সমতুল্য।

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে "পৃথিবীতে কিছুই নূতন নহে।" প্রাচীনকালের লোকেরাও এ রাজনৈতিক কৌশল বা ফন্দি বিশেষরূপে জানিত। সিফাক্স সিপিয়োর কাছে সংবাদ পাঠাইলেন তিনি কিছুতেই রোমীয়দিগের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন না, পরন্তু তিনি কার্থেজবাসীদেরই পক্ষাবলম্বন করিবেন। সিপিয়ো এমন ভদ্রতা ও জাঁকজমকের সহিত এই সংবাদবাহকদিগকে পুরস্কৃত করিলেন যে তাঁহার সৈন্যগণ মনে করিল, সিফাক্সের সৈন্য রোমীয়দিগের সহিত মিলিত হইতে সম্মত হইয়াছে।

প্লুটার্ক একটি কৌতুকপ্রদ গল্পের অবতারণা করিয়া দেখাইয়াছেন তৎকালে শাসকসম্প্রদায়ের অসন্তোষজনক বার্ত্তা প্রচার করিলে কিরূপ শাস্তিভোগ করিতে হইত। গল্পটি এইরূপ—একজন বিদেশী সিসিলীদ্বীপ হইতে আসিয়া এথেন্সের কোন নাপিতের দোকানে এথেন্সবাসীদিগের নৌযুদ্ধে পরাজয়ের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে, তথাকার লোকে এ সংবাদ সম্বন্ধে তখনও কিছু জানিতে পারে নাই। নাপিত সংবাদটি পাইয়া আর হজম করিতে পারিল না, ভদ্রলোকের দাড়ির অর্দ্ধেকটা কামাইয়া রাখিয়াই সে ছুট দিল এবং একদম সহরের বিচারপতি আর্কনদিগের নিকট যাইয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। সেই মুহূর্ত্তে সারা সহরে একটা তুমুল হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। তখনই আর্কনেরা জনসাধারণের এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। বেচারা নাপিতকে তথায় গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসা হইল। কী! এথেন্স জলযুদ্ধে হারিয়া গিয়াছে! এতবড় কথা! সভাসুদ্ধ লোক তাহার উপর চটিয়া লাল!

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নাপিত জেরার পাল্লায় পড়িয়া সংবাদদাতার সঠিক পরিচয় দিয়া উঠিতে পারিল না; তাহাকে মিথ্যা গুজব রটাইয়া সাধারণের শান্তিভঙ্গ করিবার অপরাধে অভিযুক্ত করা হইল। গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া বেচারাকে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছনা দেওয়া হইতে লাগিল, পরে যখন সংবাদটি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল তখন তাহার পরিত্রাণ!

বায়লী (Bayle) এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, নাপিত যদি এথেন্সবাসীদিগের জয়ের সংবাদ দিত এবং তাহা পরে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইত তাহা হইলে বেচারার অদৃষ্টে এ লাঞ্ছনাভোগ ঘটিত না। তিনি বলেন, ষ্ট্রাটোক্লেস্ (Stratocles) নামক একব্যক্তি এথেন্সবাসীরা জয়লাভ করিয়াছে এই সংবাদ প্রচার করিয়া খুব ধুমধাম করিবার জন্য নগরবাসীদিগকে প্রোৎসাহিত করে, কিন্তু সে নিজে বিশেষরূপে জানিত এথেন্স জলযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে। যখন প্রকৃত তথ্য বাহির হইয়া পড়িল তখন লোকটাকে মিথ্যাসংবাদ প্রচার করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইল। লোকটি বড় ধূর্ত্ত ছিল। সে মাথা খাটাইয়া এক অপূর্ব্ব ফন্দি বাহির করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। সে আদালতে বলিল, আমি ত কাহারও কিছু অনিষ্ট করি নাই বরং আমার দৌলতে সমগ্র সহরের লোকের ভাগ্যে তিনদিনের জন্য জয়লাভের আনন্দভোগ ঘটিয়াছে। বায়লী বলেন, বেচারা নির্দ্দোষী নাপিতের সাজা না হইয়া দ্বিতীয় লোকটিরই সাজা হওয়া উচিত ছিল; কারণ নাপিত কাহাকেও প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে কিছু বলে নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তিই প্রাপ্ত সংবাদ গোপন করিয়া লোককে প্রতারিত করিবার মানসে তাহা অন্যরূপে প্রচার করিয়াছে সুতরাং সে-ই প্রকৃত অপরাধী।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

* * *

ডষ্টয়ভেস্কির চিঠি

সুপ্রসিদ্ধ রুস সাহিত্যিক Crime and Punishment প্রভৃতি প্রণেতা ফিডার ডষ্টয়ভেস্কি যে-সমস্ত চিঠি তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও পরিবার-বর্গকে লিখিয়াছিলেন সম্প্রতি ম্যাকমিলান কোম্পানী কর্ত্তৃক সেই চিঠি-গুলি প্রকাশিত হইয়াছে। এই চিঠিগুলিতে রুস সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের পশ্চিম-ইওরোপীয় সভ্যতার উপর বিদ্বেষভাব বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম-ইওরোপীয় জাতির বিলাস—এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যেরূপ সভ্যতা আদর্শ করিয়া চলিতেছেন—ডষ্টয়ভেস্কি ঘৃণা করিতেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেম অনেকস্থলেই অতি উচ্ছ্বসিত। এক বন্ধুর কাছে লিখিতেছেন—

"রুসিয়ার বাহিরে গেলে আমার সমস্ত শক্তি উৎসাহ নিবে যায়, জল থেকে মাছ উপরে উঠলে যেমন তার কোন শক্তি থাকে না তেমনি হয়ে যাই—বিদেশে সবস্থানেই আমি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি।"

জর্ম্মানবিদ্বেষ ও ফরাসীবিদ্বেষ কোনটিই তাঁর কম ছিল না। ডষ্টয়ভেস্কি ও টুর্গেনিভের মনোমালিন্যের কারণ—ডষ্টয়ভেস্কির জর্ম্মান-সভ্যতার প্রতি অতিবিদ্বেষ ও টুর্গেনিভের সর্ব্বজাতিকে সমভাবে দর্শন।

টুর্গেনিভ ডষ্টয়ভেস্কির সঙ্গে বেডেন-বেডেনে দেখা করেন এবং এই অতিবাদী রুসসভ্যতার পাণ্ডাকে বলেন—

"এমন নূতন করে একটা আদর্শ রুসসভ্যতা গড়তে গেলে জর্ম্মান-সভ্যতার সম্মুখে আমাদিগকে মাটিতে মিশে যেতে হবে।"

ডষ্টয়ভেস্কি গম্ভীর ভাবে টুর্গেনিভকে পারী থেকে একটা টেলিস্কোপ আনিয়া যাহাতে রুসজনসাধারণকে ভাল করিয়া পরখ করিয়া দেখিতে পারা যায় তাহারই উপদেশ দিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "সব সময় আপনি জার্ম্মান-সভ্যতা জার্ম্মান-সভ্যতা কচ্ছেন—কিন্তু কি এমন একটা সভ্যতার তারা পরিচয় দিয়েছে—কিসেই বা তারা আমাদের উপরে?"

এই-সব ব্যাপার লইয়া দু'জন শ্রেষ্ঠ লেখকের মধ্যে মনের অমিল ক্রমে বাড়িতে থাকে। টুর্গেনিভের উপর ডষ্টয়ভেস্কির বিদ্বেষ এত বেশী হইয়াছিল যে, তিনি "The Possessed"এ টুর্গেনিভকে ঘৃণিত জঘন্য ভাবে অঙ্কিত করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন নাই। জেনিভা থেকে তিনি ১৮৬৭ খৃঃ তাঁর বন্ধু মেকভ্‌কে যে চিঠি লেখেন তাতেও টুর্গেনিভ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি গিয়ে তাঁকে (টুর্গেনিভকে) দেখলুম—প্রাতর্ভোজন কচ্ছেন। সত্যি কথা বলতে কি আমি এই লোকটাকে মোটেই পছন্দ করি না—এই ভাবটা ১৮৬২ খৃঃ হতেই বেশী হয়েছে—এই সময়ে ও যেন বেড়েনে। আমি তার কাছে ৫০ ডলার ধার নিয়েছিলাম—(সেটা আজও আমি শোধ দিতে পারিনি)। ইনি যে রকম আমিরী ভাবে সকলকে আলিঙ্গন করেন—চুমো খাবার জন্য গণ্ড এগিয়ে দেন—এ আমি মোটে সহ্য করতে পারি না। ভারী একটা চালে উনি থাকেন—যা হোক সব চেয়ে তাঁর ঐ বইখানা "Smoke" আমার মন চটিয়ে দিয়েছে। উনি নিজেই আমায় বলেছেন—বইখানার প্রধান উদ্দেশ্যই 'যদি রুসিয়া একটা বিরাট ভূমিকম্পে বিশ্ব থেকে মুছে যায়—তায় মানবসমাজের কোনই ক্ষতি হবে না—কেহ লক্ষ্যও করবে না।'

এটা আমি লক্ষ্য করে আসছি যে, বিলিনস্কীর দলের স্বাধীনচেতা লোকেরা রুসিয়াকে গালাগালি দিয়ে থাটো করেই আনন্দ পায়, এবং ঐ সঙ্গে এও বলে যে তারা রুসিয়াকে বড় ভাল বাসে, তবু তারা স্বদেশের সবই ঘৃণা করে—ওতেই আনন্দ পায়।

১৮৭০ খৃঃ। প্রুসিয়ানরা তখন ফ্রান্স আক্রমণ করেছে। সে সময় ড্রেসডেন থেকে তিনি এক চিঠি লেখেন, তাতে তাঁর জর্ম্মান-বিদ্বেষ পূর্ণ মাত্রায় প্রকটিত। জর্ম্মানীর সম্বন্ধে এই ঘৃণা সমস্ত ইওরোপের বিদ্বেষের অংশ মাত্র ছিল। তিনি লিখিয়াছেন ফ্রান্স সম্প্রতি পশুভাবাপন্ন হইয়া গেছে—অনেক অবনতি হইয়াছে। তিনি আশা করিতেছেন হয়তো এই জর্ম্মান-ফরাসী যুদ্ধের হীনতায় দেশে তাদের সংস্কার হতে পারে।

ফরাসী শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া রুস ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার তিনি ভয়ানক বিরোধী ছিলেন।—তিনি লিখিতেছেন—

"She will inject them with her vulgar, corrupt, ridiculous and imbecile code of manners and her distorted notions about religion and society."

ইটালির স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য কলাও তাঁর কাছে রুসিয়ার পর্ণকুটির বাসের তুলনায় কিছু নয়।—তিনি লিখিতেছেন—

"এখনও আমাদের সমাজ পবিত্র ও খাঁটি আছে"—পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন—"যদি শুধু জানতে এই চারি বৎসরের মধ্যে আমার অন্তর পশ্চিম-ইওরোপের উপর কি বিজাতীয় ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে গেছে।" পশ্চিম-ইওরোপের উপর তাঁহার ঘৃণা এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে "পশ্চিম-ইওরোপবাসীরা খৃষ্টের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে তাই তারা পতনের কিনারায় দাঁড়িয়েছে—"। তাঁহার বিশ্বাস খৃষ্টের আদর্শই সভ্যতাক্ষেত্রে অগ্রগামী হইবার পন্থা এবং রুসিয়াই সেটি করিতে পারিবে।

এই চিঠিগুলি প্রকাশিত হওয়াতে নানা পত্রিকা মত প্রকাশ করিয়াছেন—উপন্যাসে গ্রন্থকার যে আবরণে আত্মগোপন করিয়া চরিত্র চিত্রণ ও মানব-মন বিশ্লেষণ করিয়াছেন—যে মহত্ত্বের আবরণে নিজের নীচ পরছিদ্রান্বেষী মন গোপন করিয়া বিশ্বমৈত্রীর বাণী শুনাইয়াছেন—গ্রন্থকার সে রকম সহৃদয় বা উচ্চমনা মোটেই নন।

* * *

সাহিত্যিক কাইজারিন'—

'কাইজারিন' নামের মোহটাই লোককে এমন অভিভূত করিয়া ফেলে, যে, সাহিত্য বা সুকুমার কোন কিছুর দিকে তাঁহার ঝোঁক আছে কি না—সাধারণে সেটা ভাবিবার অবকাশ পায় না। জর্ম্মান-সম্রাজ্ঞী কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃতা ভগ্নী রাজকুমারী ফিডোরার পত্রসমূহ একত্র করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। রাজকুমারীর জীবনচরিত পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। অসুস্থ ছিলেন বলিয়া রাজকুমারী চিরকুমারী ছিলেন, তিনি নিজেও একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক—এবং পল্লীচিত্রাঙ্কণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

জর্ম্মান-সম্রাজ্ঞী তাঁহার পিতা ডিউক ফ্রেডারিকের জীবন-চরিত লিখিতেছিলেন। হার নিউলাণ্ডার বলেন সম্রাজ্ঞী জীবন-চরিত ও ইতিহাস ছাড়া আর কিছু পড়েন না এবং এই সমস্ত জীবনী ও ইতিহাসে তিনি যথেষ্ট সরসতা-সজীবতা চান। বিদেশী ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মেকলে ও প্রেসকট তাঁহার প্রিয়। জীবনচরিতকারদের মধ্যে 'রিনহোল্ড কোজার' প্রিয়, ইনি ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সুবৃহৎ জীবনী লিখিয়া কাইজার কর্ত্তৃক উচ্চ সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন।

* * *

বালক সম্পাদক—

প্যারিসের এলেন ভি সেণ্ট ওগান, তাঁহার বয়স সবে আঠার বৎসর মাত্র, সাধারণের ধারণা ইনিই জগতের সর্ব্বকনিষ্ঠ সংবাদপত্র-সম্পাদক ও প্রকাশক। আজকাল তাঁর কাগজের কাটতি ৪।৫ হাজারের উপর,—Princes Radolin, Sarah Bernhardt, President Fallieres,

Mme Casimir-Parier, Francois Berge, প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিরা এই কাগজের নিয়মিত গ্রাহক। সাত বৎসর বয়সে এলেন এক তা' কাগজে "The Echo of Auteuil" নামে কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন। তখন কাগজে বিজ্ঞাপন আদৌ ছিল না, প্রথম হইতেই কাগজখানিতে নানাপ্রকার আলোচনা ছিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, সংগীত, নাট্য, ছোট গল্প, হাসির গল্প, রঙ্গচিত্র প্রভৃতি বাহির হইতে থাকে। বালক চিত্রবিদ্যায় দক্ষ—রঙ্গচিত্রে অসাধারণ ক্ষমতাশালী, ফ্রান্সের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত লোকেরই ছবি ইনি করিয়াছেন। কাগজখানি এখন মাসে মাসে বাহির হয়, এই দীর্ঘ দশ বার বৎসরের মধ্যে কোন দিনও ইহার এক সংখ্যা অপ্রকাশিত কিম্বা বিলম্বে প্রকাশিত হয় নাই। প্রথমতঃ কাগজখানি একটিমাত্র গ্রাহক লইয়া বাহির হয়। সেও বালকের বন্ধু।

কাগজখানি চালাইতে বালক আর দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য পান নাই। সম্পাদক প্রুফ্‌রিডার রিপোর্টার চিত্রকর সকলই নিজে। ইনি এখনও ছাত্র; চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।

বালকের মাতা একজন উৎকৃষ্ট গল্প-লেখিকা। পিতা সহরের পত্রিকা-সমূহের নামজাদা সম্পাদকীয় স্তম্ভের লেখক।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

"অন্ধজনে দেহ আলো"

এই জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য মানুষ চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই উপভোগ করিয়া থাকে। সেই-সকল ইন্দ্রিয়ের একটির অভাব হইলেই সে বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হয়। এই জ্ঞানলাভ ও সৌন্দর্য্য-উপভোগে চক্ষু যেমন করিয়া মানুষের সহায় হয় তেমন করিয়া কোন ইন্দ্রিয় কি অন্য কোন বস্তুই হইতে পারে না। কাজেই অন্ধের নিকট জগৎ যে কি মূর্ত্তি ধারণ করে তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। প্রভাতসূর্য্য তাহার নিকট কোন রহস্যই উদ্ঘাটন করে না, সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর কোন নূতন রূপ তাহাকে দেখায় না। প্রতিদিন প্রতিমাস প্রতিঋতু কত বিচিত্র শোভা-সৌন্দর্য্যে ধরণীকে সাজাইয়া চক্ষুষ্মানের চক্ষু সার্থক করে; কিন্তু চক্ষুহীনের জগৎ চির-তিমিরেই আবৃত থাকে।

শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই এই দুর্ভাগ্যদের সংখ্যা বেশী। প্রখর সূর্য্যালোক, ধূলির আধিক্য ও বায়ুর শুষ্কতাই বোধ হয় ইহার কারণ। সমুদ্র-উপকূলবাসীদের মধ্যেও অন্ধের পরিমাণ কিছু বেশী।

এমন শত শত অন্ধ ও অল্পদৃষ্টি মানুষ আছে, যাহাদের অন্ধতা চেষ্টা করিলেই দূর করা যাইত। জন্মের সময় দূষিত পদার্থের সংস্পর্শে অনেক শিশুর চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। অজ্ঞ ধাত্রী ও পিতামাতা না বুঝিয়া অবহেলা করিয়া এইরূপে অনেক সন্তানের জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই জাতীয় অন্ধের সংখ্যা অন্যপ্রকার অন্ধের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। এইজন্য জন্মের পর দুই সপ্তাহের মধ্যে চোখের কোন দোষ কিম্বা যন্ত্রণা দেখিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

অন্ধদের দুঃখ কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য এবং তাহাদিগকে মানুষনামের যোগ্য করিবার জন্য সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত। কি প্রাচীনকালে কি আধুনিক যুগে সকল সময়েই হৃদয়বান্ মানুষেরা দুর্ভাগ্যের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কাজেই দেড়হাজার বৎসর পূর্ব্বেও অন্ধ-চিকিৎসালয় ছিল শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে পারি না। তবে ১২৬০ খৃষ্টাব্দে পারী নগরেই সাধারণের চেষ্টায় প্রথম অন্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্ব হইতেই ইয়োরোপে মাঝে মাঝে দুই-একজন শিক্ষিত অন্ধের কথা ও স্পর্শের সাহায্যে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার নানাপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে ফ্রান্সে অন্ধভিক্ষুকের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য ছিল। রাস্তার ধারে ভিক্ষা করিবার জন্য জায়গা লইয়া তাহারা প্রায়ই তুমুল কলহ বাধাইয়া তুলিত। তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি না করিয়া লোকে তাহাদের লইয়াই নানাপ্রকার মজা করিত। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে পারীর কোন মেলায় এক সরাইওয়ালা প্রত্যহ একদল অন্ধ ভিক্ষুককে লম্বা লম্বা গাধার কান, ময়ূরের লেজ, কাগজের চশমা প্রভৃতি পরাইয়া বাদক সাজাইয়া তামাসা দেখাইত; দলে দলে লোক আসিয়া এই আমোদে যোগ দিত ও হাসি ঠাট্টায় মেলা মাতাইয়া তুলিত। কিন্তু (Valentin Hany) ভালাঁতাঁ আনী নামক একজন সদয় ভদ্রলোকের হৃদয়ে এই অমানুষিক আমোদ অত্যন্ত আঘাত করিয়াছিল। তিনি অন্ধদের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। প্রথম চেষ্টা সফল হওয়াতে তিনি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম অন্ধ-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।

প্রথম প্রথম অন্ধদের জন্য কেবল আশ্রমই প্রতিষ্ঠিত হইত। বিদ্যালয়ের একান্তই অভাব ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পর হইতে ইয়োরোপের নানা দেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে।

আমরা বিশেষ করিয়া চক্ষুর সাহায্যেই অনুভূতি লাভ করিয়া থাকি; সুতরাং চক্ষু না থাকিলে মনের অবনতির সম্ভাবনা খুবই বেশী। এইজন্য শিশুকাল হইতেই অন্ধের মানসিক উন্নতির চেষ্টার আবশ্যক। অন্ধের প্রতি দয়া

শ্রীযুক্ত লালবিহারী শাহ, কলিকাতার অন্ধবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনেরা অন্ধের নড়ি সাজিয়া সচরাচর উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই বেশী করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহারা আত্মনির্ভরে অক্ষম হয় এবং দয়াল আত্মীয়ের অভাব হইলেই অনন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। তাহাদের কার্য্যতৎপর ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলাই আত্মীয়ের কার্য্য, দয়া করিয়া অলস ও নির্জীব করিয়া তোলা শত্রুর কার্য্য।

অন্ধের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা প্রায়ই অত্যন্ত হীন

শ্রীযুক্ত অরুণকুমার শা'হ, কলিকাতার অন্ধবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

হয়। কোন কাজ না করিতে পাওয়ায় ও চিন্তা করিবার কোন বিষয় না থাকায় তাহারা প্রায়ই অত্যন্ত দুর্ব্বল শক্তিহীন ও জড়বুদ্ধি হইয়া উঠে। এই-সকল বাধা অতিক্রম করিবার জন্য স্পর্শ ও শ্রবণশক্তি প্রভৃতির সাহায্যে তাহাদিগের দেহ ও মনকে যতদূর সম্ভব সজীব করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা দরকার। নানাপ্রকার ক্রীড়া, ভাষা-শিক্ষা, মনে মনে অঙ্ক-কষা, গীতবাদ্য শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা তাহাদের দেহ মনকে উন্নতির পথে অগ্রসর করে। শুধু উন্নত হইবার জন্যই যে অন্ধদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত ইহা যেন কেহ মনে না করেন। জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী শিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। তাহা না লইলে পরের গলগ্রহ হইয়া অন্ধতার দুঃখের উপর আরও দুঃখের কারণ সৃষ্টি হইতে থাকে। নিজের জীবিকা নিজে উপার্জ্জন করিতে পারিলে অন্নকষ্ট ত দূর হয়ই তদুপরি একটা আত্ম-

কলিকাতার অন্ধবিদ্যালয়ের অনাথ অন্ধ শিশু ছাত্রী।

দেখিবার বিষয় প্রায় কিছুই নাই। কিন্তু শুধু কানে শুনিয়া যন্ত্রের মত গাহিয়া কিম্বা বাজাইয়া গেলে উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতচর্চ্চা হয় না। এই সঙ্গীতকে অন্ধের মনের সহিত গাঁথিয়া দিয়া তাহাকে তাহার অন্তরের ধন ও হৃদয়ের ভাষা করিয়া তুলিতে হইবে। এইজন্য অন্ধ গায়ক ও বাদকের মানসিক শক্তি ও বৃত্তিগুলি যাহাতে গানের সুরের মতই সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে সেইদিকে শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। অন্ধ ছাত্রগণ যেন সঙ্গীত-বিদ্যার সকল বিভাগ আয়ত্ত করিয়া তাহার সকল অঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া বুদ্ধি-বৃত্তি দ্বারা বিচার করিয়া জ্ঞানী-জনের মত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সঙ্গীতচর্চ্চা করিতে পারেন এ বিষয়েও নজর দিতে হইবে। তাহা না হইলে ভবিষ্যতে শিক্ষকতার কার্য্যে তাঁহারা কখনই সফল হইতে পারিবেন না। মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে সাধারণ ছাত্র অপেক্ষা দৃষ্টিহীন ছাত্রের শিক্ষার সময় অনেক বেশী যত্নের প্রয়োজন হয়। পারীর অন্ধ-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত শতকরা প্রায় ষাট জন অন্ধ ছাত্র সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

প্রসাদ আসিয়া দৃষ্টিহীনের দুঃখটাও কিছু ভুলাইয়া রাখে। ইয়োরোপে পিয়ানোর সুর বাঁধা, বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখান ও সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া রকমের কয়েকটি ব্যবসায় অন্ধগণ প্রায়ই করিয়া থাকেন। ঝুড়ি মাদুর প্রভৃতি বোনাও শুধু হস্তের সাহায্যে বেশ করা যায়। অন্ধের পক্ষে সঙ্গীত-চর্চ্চা সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক ব্যবসায়। এই কার্য্যে চক্ষুষ্মানদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফল হইতে হইলে যথেষ্ট শিক্ষালাভ, প্রচুর অভ্যাস ও সর্ব্বদা সঙ্গীত শ্রবণ করিতে হয়। ইহাতে

অন্ধ বালকবালিকারা সচরাচর অলস ও অসহায় ভাবেই দিন কাটায়। পরিবারের কিম্বা নিজেদের কোন কাজই তাহারা করিতে পারে না। এইজন্য তাহারা প্রায়ই সময়ের মূল্য বোঝে না। বড় হইয়া উঠিলে এই জিনিষটা শিখান অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অতি শিশুকাল হইতে কাজকর্ম্মে অভ্যস্ত করিয়া তুলিলে ও

আপন কার্য্যকুশলতায় বিশ্বাস জাগাইয়া তুলিলে তাহারা সহজেই আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে। সাধারণের মনে অন্ধ বলিলেই কাঙ্গাল গরীব অসহায় কতকগুলি লোকের ছবি জাগিয়া উঠে। এই ছবিটা এত দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছে যে লোকে খুব উঁচুদরের অন্ধ-বিদ্যালয়গুলিকেও আতুরাশ্রমের দলেই ফেলিয়া দেন। ইহা তাহাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির পথে একটি প্রধান বিঘ্ন। অন্ধের শিক্ষাকার্য্যটা সচরাচর দয়াদাক্ষিণ্যের মধ্যেই ধরা হয় বলিয়া আমরা তাহাদের সমাজের গলগ্রহ রূপেই চালাইয়া আসিতেছি। অঙ্গহীনেরও যে অঙ্গবানদের মত শিক্ষার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। তাহাদের অধিকার আমাদের অপেক্ষা বেশী বলিলেও ভুল হয় না।

কলিকাতার অন্ধবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কাজ শিখিতেছে।

অন্ধদের সাধারণের বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে। সাধারণের সঙ্গে পড়িতে হইলে তাহারা যে অন্যান্য বালক বালিকাদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র ইহা তাহাদের মনে সর্ব্বদাই জাগাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা সকল বিষয়ে অন্যদের সহিত যোগ দিতে পারে না এবং শিক্ষকের কথিত দৃষ্টান্তাদি ও পাঠপ্রণালী প্রায়ই বুঝিতে পারে না। অনেকে বলেন ইহাতে তাহারা অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা শিক্ষা করে।

অনেকে কম পয়সায় কাজ চালাইবার জন্য মূকবধির ও অন্ধদিগকে একই বিদ্যালয়ে পড়াইয়া থাকেন। ইহা একটি মস্ত বড় ভুল। ইহাদের অভাব যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, কাজেই শিক্ষা-প্রণালী ও শিক্ষালয়ও ভিন্ন হওয়া আবশ্যক।

আজকাল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা লাভের পর স্ব স্ব রুচি ও শক্তির উপযোগী বিষয় বাছিয়া লইয়া তাহারই অনুশীলন করিতে পারেন। ইহাতে যাহার যে বিষয়ের উপর টান আছে, তিনি তাহার ভিতর দিয়াই আপনার মনোবৃত্তিগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। অন্ধ-বিদ্যালয়েও

অক্ষর হাতলওয়ালা ফ্রেমে বসাইয়া চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই-সকল উপায় ফ্রান্সে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। জর্ম্মনীতে একজন অন্ধ শক্ত মোটা কাগজে অক্ষর কাটিয়া ও তাহাতেই ফুটা করিয়া মানচিত্র আঁকিয়া ব্যবহার করিতেন। ইহার সাহায্যে তিনি দুই-একজনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। (Valentin Hany) ভালাঁতাঁ আনীর পুস্তকাদি উঁচু উঁচু অক্ষরে কাগজে ছাপা। এই অক্ষরগুলিকে আরও সহজ করিবার জন্য সোজা ও বাঁকা রেখার সাহায্যে সাধারণ অক্ষরগুলিকে অনেক বিভিন্ন রূপ দেওয়া হইয়াছিল। সেই রেখা ক্রমশঃ বিন্দুতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ফ্রান্সের (Louis Braille) লুই ব্রেল এই-সকল অক্ষরমালার সাহায্য লইয়া এক অক্ষরমালার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই আজকাল সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুটি দুটি করিয়া তিন সারিতে ছয়টি বিন্দু দিয়াই এই সাঙ্কেতিক অক্ষরমালার সৃষ্টি। এই ছয়টি বিন্দুকে ৬৩ রকম রূপ দেওয়া যায়। তাহাতেই সমস্ত অক্ষর ও চিহ্নাদির কাজ চলিয়া যায়। আমাদের দেশে যে-সকল অন্ধবিদ্যালয় আছে, সেখানেও এই অক্ষরমালারই চলন। আমেরিকায় একরকম যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহার সাহায্যে অন্ধেরা সাধারণ ছাপা বইও হাত বুলাইয়া পড়িতে পারে।

কলিকাতার অন্ধবিদ্যালয়ের ছাত্রর কাজ শিখিতেছে।

যদি কিছুদিন সাধারণ শিক্ষার পর ছাত্রছাত্রীগণের শক্তি ও মনের গতি বুঝিয়া সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদের উপর কোন প্রকার চাপও পড়ে না এবং অনুরাগের সহিত শিক্ষালাভ করার ফলে শিক্ষাও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়।

অন্ধরা স্পর্শের সাহায্যে ভিন্ন পড়িতে পারে না বলিয়া প্রায় চারি শত বৎসর ধরিয়া তাহাদের জন্য নানাপ্রকার অক্ষর আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। প্রথম প্রথম কাঠের উপর খোদাই করা কিম্বা সীসার অক্ষর চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহার পরে গদির উপর পিন্ বসাইয়া অক্ষর তৈরি হইয়াছিল। একজন অন্ধ ঢালাইকরা ধাতুতে নির্ম্মিত

শীতপ্রধান পাশ্চাত্যদেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অন্ধ অনেক বেশী। মিসরের অন্ধ-সংখ্যার শতকরা হার বোধ-হয় সব দেশকে ছাড়াইয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষও নেহাত নীচে যায় না। ভারতসাম্রাজ্যের অন্ধের সংখ্যা ৪,৪৩,৬৫৩ অর্থাৎ প্রতি দশলক্ষে ১,৪০৮ জন। মিত্র ও করদরাজ্য ধরিলে ভারতবর্ষের অন্ধের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ হয়। সমগ্র ইয়োরোপের অন্ধ-সংখ্যার উপর কিঞ্চিদধিক ১০০,০০০

কলিকাতার অন্ধবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ড্রিল।

যোগ করিলে ভারতবর্ষের অন্ধ-সংখ্যার সমান হয়। ইংলণ্ডে অন্ধের যে সংজ্ঞা ভারতবর্ষে তাহা এখনও ব্যবহৃত হয় নাই; কাজেই বোধহয় ইংলণ্ডে যাহাদিগকে অন্ধ বলিয়া ধরা হইত, এমন অনেক লোক এখানে চক্ষুষ্মান বলিয়াই পরিচিত। তাহাদের যোগ করিলে অন্ধসংখ্যা আরও অনেক অধিক হইত। এই গণনাতেই ভারতবর্ষের অন্ধ সংখ্যা পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা অধিক। শিশুদিগের চক্ষুপীড়া (opthalmia neonatorum) ও বসন্তই অন্ধতার প্রধান কারণ। ইহার মধ্যে আবার রাজপুতানা সিন্ধুদেশ প্রভৃতি যে-সকল দেশে বৃষ্টি খুব কম হয় সেখানেই খুব বেশী অন্ধ। বাংলা ও আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে বৃষ্টির আধিক্যবশতঃ অন্ধের সংখ্যাও কম। অল্প হইলেও বাংলার ৪,৫৪,৮৩,০০০ লোকের মধ্যে ৩২০০০ অন্ধ। ইহার মধ্যে ১০০০ কলিকাতাবাসী। কলিকাতার লোকসংখ্যা ১২,২২,০০০। আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির দুঃখের ও দুর্দ্দশার অন্ত নাই বলিলেই চলে। তাহার উপরে এই অন্ধতার দুঃখও তাহাদের মধ্যেই বেশী। এ বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন যে নারীগণকে সচরাচর গৃহে বদ্ধ থাকিয়া রন্ধনশালার ধোঁয়া খাইতে হয়, ও দূষিত বায়ুপূর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয় বলিয়াই তাহাদের মধ্যে অন্ধ বেশী। চক্ষুরোগ হইলে আমরা, বালিকাই হউক আর বয়স্কাই হউক, পর্দ্দার খাতিরে ও তাহাদের প্রতি অধিক ভালবাসাবশতঃ কোন রমণীকেই চিকিৎসালয়ে পাঠাইতে রাজি হই না। এই প্রেমের ধাক্কা সামলাইতে গিয়া অনেককে চির অন্ধ হইয়া থাকিতে হয়।

সকল রোগই যেমন উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীতে অধিক প্রভাব বিস্তার করে অন্ধতার সময়েও তাহাই হয়। ব্যতিক্রম হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে মালয়ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রায় অন্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা অধিক অন্ধ। নিম্নশ্রেণীর এই-সকল অন্ধদের মধ্যে অধিকাংশই ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মুসলমান-অন্ধদের মধ্যে অনেকে 'হাফেজ' হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোরান আবৃত্তি করিয়া ভদ্রভাবেই কাল

কলিকাতার অন্ধবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাইক্ল চড়িতেছে।

কাটায়। হিন্দুদের মতে পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে মানুষ অন্ধ হয়; এই বিশ্বাস ইহাদের শিক্ষাপথের একটি বিশেষ বিঘ্ন। তাঁহাদের মতে পরমেশ্বরই যাহাকে মারিয়াছেন, মানুষ তাহার কি করিতে পারে। অনেক দরিদ্র পরিবারে অন্ধশিশুগণই একমাত্র উপার্জ্জক। এইজন্য পিতামাতারা তাহাদিগকে সহজে বিদ্যালয়ে দিতে চায় না। ভারতবর্ষে ভিক্ষা একটা ব্যবসায়। কাণা-খোঁড়াদের ভিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিবার একদল লোক আছে। ভিক্ষাশেষে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য চুক্তি-অনুসারে ভাগ হয়। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে অনেক বালকবালিকাকে কলিকাতায় ভিক্ষা করিবার জন্য ভাড়া করিয়া আনা হয়। এই-সকল ভিক্ষা-ব্যবসায়ী, একদল অন্ধ বালকবালিকা লইয়া যাত্রাদলের অধিকারীর মত দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়।

অন্ধদের যে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এ কথা এদেশে অনেকেই বিশ্বাস করে না। প্রথম প্রথম যাঁহারা বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন তাঁহাদিগকে এজন্য অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে। যাঁহারা ছাত্রের সন্ধানে ঘুরিতেন, তাঁহাদিগকে লোকে ঠাট্টা করিত, এমন কি নরবলি দিবার জন্য ছেলে ধরিতে আসিয়াছে, মনে করিয়া অনেক সময় অত্যন্ত উৎপীড়ন করিত। আজকাল শিক্ষার ফল দেখিয়া অনেকের ভুলবিশ্বাস ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

এই শিক্ষাব্যাপারের ইতিহাস বিশেষ পুরাতন নয়। ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে এই কার্য্যের প্রথম সূচনা হয়। ভারতবর্ষে মোটের উপর ষোলটির বেশী অন্ধবিদ্যালয় নাই। কলিকাতায় ১টি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ৫টি, এলাহাবাদে ১টি, লাহোরে ২টি, মান্দ্রাজে ১টি, মহীশূরে ১টি, পালামকোট্টায় ১টি, রাঁচিতে ১টি ,গুণ্টুরের নিকট রেণ্টাচিন্তালায় ১টি, দেরাদুনের নিকট রাজপুরে ১টি ইত্যাদি।

বাংলাদেশে কলিকাতায় একটি ও বিহারে রাঁচিতে একটি আছে। কলিকাতার বিদ্যালয়টি শ্রীযুক্ত লালবিহারী শাহ নামক একজন বাঙ্গালী খৃষ্টান ভদ্রলোক কর্ত্তৃক
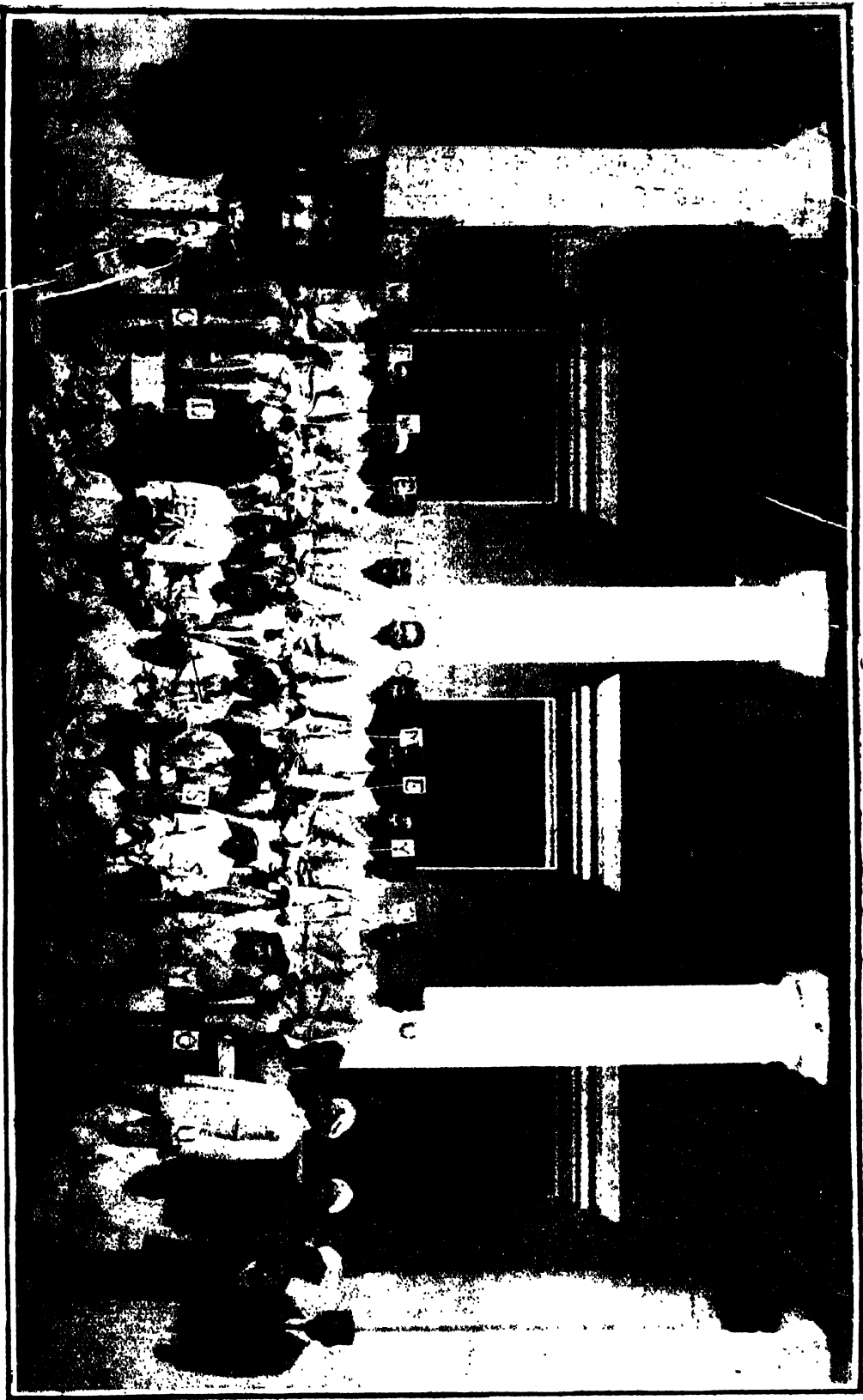
মহীশূরের বোবাকালা ও অন্ধ-বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ।
ডাহিন দিকে দণ্ডায়মান মধ্য সারির চতুর্থ শ্বেতপরিচ্ছদধারী ব্যক্তি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রাও।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২৬টি —২০টি বালক ও ছয়টি বালিকা। সেখানে ব্রেল-অক্ষরের সাহায্যে লেখাপড়া ও অঙ্ক, এবং ঝুড়িবোনা, চেয়ার তৈয়ারি ও সামান্য গানবাজনা শিক্ষা দেওয়া হয়। অল্পদিন হইল এই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শ্রীযুক্ত অরুণকুমার শাহ ইংলণ্ড হইতে অন্ধশিক্ষার আধুনিক প্রণালীসকল শিখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মতে ইংলণ্ডের অন্ধবিদ্যালয়গুলির সহিত এখানকার বিদ্যালয়ের তুলনাই হয় না। সেখানকার ছাত্রেরা সমাজের গণ্যমান্য ও আবশ্যকীয় ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কলিকাতার অন্ধ-বিদ্যালয়ের কয়েকজন পুরাতন ছাত্রও কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। দুইজন ছাত্র এই বিদ্যালয়েই লেখা ও পড়ার শিক্ষকতার কার্য্য করেন। একজন বেতের কাজ শিখান। একজন খৃষ্টান বালক বর্দ্ধমানের খৃষ্টান মিশনারিদের অধীনে শিক্ষাদান ও প্রচারের কার্য্য করিতেছেন। তিনজন মৌ সহরে বেতমিস্ত্রীর কাজ করেন। একজন সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে গোয়ালিয়ারে বাস করেন। এই বিদ্যালয়েরই একটি পুরাতনছাত্র এবার পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অন্ধ বলিয়া ইঁহাকে পরীক্ষার সময় কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় নাই। রাঁচির বিদ্যালয়ে ঝুড়িবোনা মাদুরবোনা ও চেয়ারবোনা প্রভৃতি শেখান হয়।

পঞ্জাবে লাহোরে দুটি অন্ধ-বিদ্যালয় আছে। একটি গভর্মেণ্টের, একটি (Railway Technical School) রেলওয়ে টেকনিক্যাল স্কুলের সংযুক্ত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দেরাদুনের নিকটবর্ত্তী রাজপুরে একটি অন্ধাশ্রম আছে। ইহা আশ্রম ও বিদ্যালয় দুই নামই পাইতে পারে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরে মিস্ এ শার্প নাম্নী কোন মহীয়সী মহিলা ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে North India Industrial Home and School for Christian Blind নাম গ্রহণ করিয়া এই বিদ্যালয়ই দেরাদুনে স্থানান্তরিত হয়। এই আশ্রম ১৬টি বালক ২০টি বালিকা ও ১৮জন স্ত্রীলোককে আশ্রয় দিতেছে। এখানে লেখাপড়া ছাড়া বাঁশের ও বেতের কাজ এবং সূতাকাটা, কাপড়বোনা, নেয়ারবোনা প্রভৃতি মোটা কাজ শেখান হয়। আজকাল সূক্ষ্ম বুননের কাজ শিখাইবারও চেষ্টা হইতেছে। এই বিদ্যালয় বেশ সুন্দর কাজ করিতেছেন। এখানকার বালকেরা এমন স্বাভাবিকভাবে কুস্তি দৌড়াদৌড়ি ও লাফালাফি করে, এমন করিয়া দোলনায় দোলে, গাছে চড়ে, নূতন নূতন খেলা আবিষ্কার করে ও ছোট ছোট বাগান তৈরি করে যে তাহাদের দৃষ্টিহীন বলিয়া বোঝাই যায় না। বালকদের এই অকৃত্রিম আনন্দ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের হৃদয়ে অসীম আনন্দের সঞ্চার করে। নেহাত কলহবিবাদ না করিলে তাঁহারা তাহাদের ক্রীড়ায় কিম্বা কোলাহলে কখনও বাধা দেন না। এই বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র ও ছাত্রী উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছে। অন্ধদের মধ্যে কয়েকজনের বিবাহ ও সন্তানাদি হইয়াছে। আমেরিকার অন্ধ ছাত্ররা ফুটবল খেলে—ফুটবলের মধ্যে ঝাঁঝ-ঘণ্টা থাকে, ঝনঝন শব্দ শুনিয়া অন্ধ খেলোয়াড়েরা বলের পশ্চাতে ধাবিত হয়।

এলাহাবাদে অন্ধদের জন্য একটি খ্রীষ্টীয় দাতব্য আশ্রম আছে। ইহাকে শিক্ষালয় বলা চলে না। সাধারণের দয়াতেই আশ্রমটি পরিচালিত হয়।

বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীতে পাঁচটি অন্ধ বিদ্যালয় আছে। বোম্বাই সহরে মিস্ মিলার্ডের বিদ্যালয় বেশ সুফল প্রসব করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের একটি শিল্পবিভাগ আছে। বিদ্যালয়ে মোটের উপর ২০টি বালক ও ২৪টি বালিকা পাঠ করে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কয়েকজন অন্যকার্য্যও করেন। এই সহরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্কুল নামক আর-একটি অন্ধ-বিদ্যালয় আছে। ইহা ডাক্তার নীলকণ্ঠরায় দয়াভাই নামক একজন অন্ধ ভদ্রলোক কর্ত্তৃক পরিচালিত। ইনি সুদক্ষ চিকিৎসক হইবার কিছুদিন পরে দৃষ্টিহারা হন। নিজে অন্ধ হইয়া তিনি অন্ধের শিক্ষায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। পুনায় একটি জেনানা-মিশন অন্ধ-বিদ্যালয় আছে। তাহা ছাড়া প্রান্তিজ ও সিরুর সহরে আর দুইটি মিশনস্কুল আছে।

মহীশূরে বোবাকালা ও অন্ধদের একটি মিশ্রিত বিদ্যালয় আছে, তাহার ৪১টি ছাত্রের মধ্যে ২৭ জন অন্ধ।

ইহারা ব্রেল-অক্ষরের লিখন, পঠন ও অঙ্ক শিক্ষা করে। গীতবাদ্যে অর্থাৎ বীণা, বেহালা, তবলা প্রভৃতি বাজনা শিখিতেও ইহারা খুব দ্রুত উন্নতি করিতেছে। বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার মনে করেন, সর্ব্বসাধারণের জন্য শিক্ষাবিভাগে যে-সকল পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাঁহার ছাত্রেরা সুবিধা পাইলে তাহার মধ্যে অনেকগুলিতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। ইহাদের যে-সকল শিল্পকার্য্য শিল্পপ্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল, তাহা-দ্বারা ইহারা অনেক পুরস্কার পাইয়াছে। বেতের কাজে ইহারা খুব দক্ষ। সেলাই করিতেও শেখান হয়; অন্ধরা বেশ সেলাই করিতে পারে।

মহীশূর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সঙ্গীতচর্চ্চা-বিষয়ে প্রসিদ্ধ; কাজেই এখানকার অন্ধবিদ্যালয়ে গীতবাদ্যের উপরই বেশী ঝোঁক। এই অঙ্গহীন ছাত্রেরা তাহাদের গীতবাদ্যের মাধুর্য্যে শিক্ষিত-সমাজকেও দুই তিন ঘণ্টা মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। এজন্য এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ গর্ব্বিত। আর-একটি সুখের বিষয় এই যে এখানকার পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্বাধীনভাবে আপন-আপন জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। অন্ধদের মধ্যে কয়েক জন মৃদঙ্গ, বেহালা, বীণা প্রভৃতি বাজান। একজন উড়ুপী-মন্দিরের বীণবাদক। দুই-তিনজন সঙ্গীত শিক্ষা দেন। একজন লেখাপড়ার শিক্ষকতা করেন। আর একজন দোকান করেন। দেবতার আরাধনা হইতে মানুষের দৈনন্দিন বেচাকেনা পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই এই অন্ধ মানুষগুলি শিক্ষিত হইয়া প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ম শ্রীনিবাস রাও এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রাও মহীশূর গভর্মেণ্টের দ্বারা অন্ধ-শিক্ষার কার্য্য বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে শিখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া আছেন; কলিকাতার অন্ধ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অরুণকুমার শাহ বিলাত হইতে সদ্য শিখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট সাহায্য পাইতেছেন। পরে ক্রমে ক্রমে ভারতের অন্যান্য অন্ধ-বিদ্যালয়েও বিশেষ কোনো শিক্ষাপদ্ধতি আছে কিনা জানিতে যাইবেন এবং কিছু নূতন দেখিলে তাহা স্বদেশের অন্ধদিগের শিক্ষাসৌকর্য্যের জন্য শিক্ষা করিবেন।

মান্দ্রাজ প্রসিডেন্সীতে তিনটি অন্ধ-বিদ্যালয় আছে। তাহার মধ্যে মান্দ্রাজ সহরে (Christian Association) খ্রীষ্টীয় সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ও পালামাকোটায় দুইটি। মান্দ্রাজের বিদ্যালয়টি রামস্বামী আয়াঙ্গার নামক একজন অন্ধ ভদ্রলোক কর্ত্তৃক পরিচালিত। গুণ্টুরের নিকট রেণ্টাচিন্তালা নামক স্থানে একজন জার্ম্মান মিশনরী মহিলা একটি অন্ধবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; তাহা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরও আছে, না জার্ম্মান মহিলা অবরুদ্ধ হওয়াতে উঠিয়া গিয়াছে, সে খবর পাওয়া যায় নাই।

কুমারী শ্রীমতী এসকুইথ, পালামকোটার অন্ধবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী ও অধিনেত্রী।

পালামকোটার বিদ্যালয়গুলি অন্যগুলির অপেক্ষা অনেক উঁচুদরের। ভাগ্যহীন অন্ধদের উন্নতির জন্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণই সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাহার সম্যক উন্নতিসাধনের ভার

পালামকোটার অন্ধবিদ্যালয়ের সদ্যসমাগত শিশু ছাত্রছাত্রী ও তাহাদের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির শিক্ষয়িত্রী।

কুমারী এ জে এস্‌কুইথের উপর পড়ে। এই পুণ্যশীলা রমণী তাঁহার অন্ধ ভাই ভগিনীদের সেবায় আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এই কার্য্য আরম্ভ হয়। জগতের সকল ব্যাপারই যেমন ক্ষুদ্র অঙ্কুরে উৎপন্ন হইয়া পরে ফলেফুলে শোভিত হয়, ইহাও সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে।

কুমারী এসকুইথ বলেন, "সুপ্পু নামক অন্ধ রাখালবালক আমাদের প্রথমছাত্র! সে পালামকোটার কোন বাংলোয় ভিক্ষা করিতে যাইত। এইরূপ ভিক্ষার জন্য তিরস্কৃত হওয়ায় সে বলিয়াছিল যে অন্ধবালক আবার ভিক্ষা ছাড়া কি করিতে পারে আমি ত জানি না। তখন তাহাকে পাখা টানিতে বলা হইল। নিয়মিত কাজ করিলে পারিশ্রমিক পাইবে এ কথাও বলিয়া দেওয়া হয়। বালক প্রত্যহ দুই মাইল পথ হাঁটিয়া মাতৃগৃহ হইতে কাজ করিতে আসিত। অন্যান্য ভৃত্যের ন্যায় কাজ করিতে পাওয়ায় সে বেশ খুসী ছিল। একদিন আমি তাহাকে বিলাতের অন্ধবালকদের শিক্ষার কথা বলিয়াছিলাম। সে কথাটা খুব আগ্রহের সঙ্গেই শুনিল এবং তাহার পক্ষে পড়া সম্ভব কি না জিজ্ঞাসা করিল।"

"সেই বৎসর ছুটিতে দেশে গিয়া আমি তামিলভাষায় ডাঃ মুনের প্রণালী অনুসারে উঁচু উঁচু অক্ষরের প্রথমভাগ প্রস্তুত করিয়া আনি। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যেদিন আমি এদেশে ফিরিয়া আসিলাম সেদিন আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সুপ্পুই সর্ব্বপ্রথমে ষ্টেশনে আসিয়াছিল, সে বিশেষ করিয়া তাহার পুস্তক চাহিতেই আসিয়াছিল। আমি বর্ণমালা ও ছোট প্রথমভাগ খানি তাহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম! তিন মাসের মধ্যেই সে পড়িতে শিখিল। তাহার পর অন্যান্য অন্ধবালক-বালিকাগণকে তাহার আনন্দের ভাগ দিবার জন্য পাখাটানার কাজ ছাড়িয়া দিয়া ছাত্র সংগ্রহে লাগিয়া গেল। শীঘ্রই অনেকগুলি ছাত্র ও কয়েকটি ছাত্রী জুটিল। আমি তখন (Sarah Tucker College) দারা টাকার কলেজ পরিচালনা করিতাম। সেই কলেজের সংলগ্ন কয়েকটি ছোট বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে আশ্রয় দেওয়া হইল, বড়দের জন্য কলেজের সীমার বাহিরে একটি বাড়ীতে বন্দোবস্ত হইল।"

এখানে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে সুপ্পুকে লইয়া যে ছোট কাজটির আরম্ভ হইয়াছিল সে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতি দেখিয়া যাইতে পারে নাই। সে অন্ধদের ভিক্ষাবৃত্তি হইতে ভাঙাইয়া লইয়া যাইতেছে বা খৃষ্টান করিতে লইয়া যাইতেছে মনে করিয়া তাহাকে মারিবার জন্য একটা গুণ্ডা নিযুক্ত করা হইয়াছিল; হতভাগ্য বালক আপনার অন্ধ ভাইবোনের সেবা করিতে গিয়া তাহার হাতে প্রাণ হারাইয়াছে।

সহরের কোলাহলের বাহিরে একটি উচ্চ স্বাস্থ্যকর স্থানে ১৯।২০ বিঘা জমির উপর এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। সেখানে বালক ও বালিকাদের দুইটি স্বতন্ত্র আবাসগৃহ; এতদ্ব্যতীত শিক্ষকদের গৃহ, তত্ত্বাবধায়িকার বাসভবন ও অন্ধাশ্রমের কার্য্যালয় প্রভৃতি আরও কয়েকটি বাড়ী আছে।

আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি-সন্ধ্যায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়। একেবারে খোলা জায়গা বলিয়া সেখানে অন্ধদের কোনপ্রকার বিপদের সম্ভাবনা নাই, কাজেই প্রায়

কাহারই পথপ্রদর্শকের দরকার হয় না। ছাত্রনিবাস ও ছাত্রীনিবাসের মাঝের জায়গায় ছেলেদের একটি ব্যায়ামশালা আছে। অন্ধাশ্রমের এলাকার মধ্যে বালক ও বালিকাদের জন্য দুটি সুন্দর কূপ আছে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪৯ জন, তাহার মধ্যে ২৮ জন শিল্পবিভাগের অন্তর্ভুক্ত; ৩৩টি ছাত্রীর মধ্যে ৭ জন শিল্পবিভাগের। বিদ্যালয় দুইটিতে ইংরেজী, তামিল ও রাগযুক্ত কবিতা (সঙ্গীত) শিক্ষা দেওয়া হয়। ফুটা ও পেরেকযুক্ত ফ্রেম দিয়া অঙ্ক কষান এবং উঁচুনীচু করিয়া গড়া মানচিত্রের সাহায্যে ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বস্তুপাঠ (object lesson) কিণ্ডারগার্টেন ও মাটির ছাঁচ গড়া প্রভৃতিরও ব্যবস্থা আছে। বালিকারা ড্রিল ও বালকেরা জিমন্যাষ্টিক্স শিক্ষা করে। পূর্ব্বে 'মুন' অক্ষরের সাহায্যে তামিলভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত, কিন্তু অল্পদিন হইল 'ব্রেল' অক্ষরের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে; এই প্রণালীতে তামিল ও মালয়ম প্রথমভাগ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে।

পালামকোটার অন্ধ ছাত্রদের বাদ্য-সঙ্গত।

পালামকোটার অন্ধ ছাত্রীদের ঘরকন্নার কাজ শিক্ষা।

বালকদের শিল্পবিভাগে কাপড়-বোনাই প্রধান কার্য্য, ইহাদের আটটি তাঁত আছে। এখানে ছেলেরা নিজেদের ও মেয়েদের জন্য কাপড় বুনিয়া থাকে। বাহিরের লোকদের ফরমাস-মত অনেক ঝাড়ন এবং তোয়ালেও বোনা হইয়া থাকে। ইহার কাট্‌তি এত বেশী যে ছাত্রেরা অনেক সময় জিনিষ জোগাইয়া উঠিতে পারে না। ইহার উপর মাদুর-বোনা ও বেতের কাজও শেখান হয়। মেয়েরা ফিতে বোনা, তালপাতার চুবড়ি ও ডালা বোনা, পুঁতির পরদা তৈরি করা ও নানারকম সূচিশিল্প শিখিয়া থাকে। ইহারা রন্ধনকার্য্যও অল্প অল্প জানে এবং ধান ভানিতে বিশেষ পটু; যাহারা এই কার্য্য করে তাহারা ইহার জন্য কিছু পারিশ্রমিক পায়। শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীর মধ্যে তিনজন ইংরেজমহিলা ও পঁচিশজন ভারতবর্ষীয়,—তাঁহাদের মধ্যে এগার জন অন্ধ। মাসিক ব্যয় প্রায় বারশত টাকা,—তাহার মধ্যে কিছু গভর্ণমেণ্ট ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড হইতে প্রাপ্ত, বাকি সমস্তই সাধারণের দান। ইহার মধ্যে থাওয়ার খরচটাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য, বৎসরে প্রতিজনের ৫০৲ টাকা করিয়া লাগে।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি অন্ধদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়:—ঝুড়ি বোনা, ব্রুস তৈয়ারি, জুতা তৈয়ারি

পালামকোটার অন্ধ ছাত্রীদের ড্রিল।

পালামকোটার তাঁতের কাজে দক্ষ পাশকরা চারিজন ছাত্র।

হইয়াছে, আরও বলা যাইতে পারে যে পালামকোটা বিদ্যালয়ের চারিটি ছাত্র গভর্ণমেণ্ট শিল্পপরীক্ষার বয়নবিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখন ইহারা রীতিমত তাঁতির ব্যবসায় করিতেছে এবং সেইজন্য মাহিনা পাইতেছে। তাহাদের উপার্জ্জন দেখিয়া আরও অনেকে এই কার্য্যে উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে।

অন্ধবর্ণমালা সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার। ভারতবর্ষে প্রায় দেড়শত ভাষা আছে, তাহার মধ্যে যে যে ভাষায় অন্ধশিক্ষা হইতেছে তাহাতেই নূতন অন্ধশিক্ষার বর্ণমালার সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নূতন বর্ণমালার স্রষ্টারা পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন কাজ করেন না। কাজেই এক-এক ভাষাতে অনেকগুলি বর্ণমালার সৃষ্টি হইতেছে। বাংলা ভাষাতেই বোধ হয় ২।৩টি বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার ফলে বোধ হয় বাইবেল-কথিত ব্যাবেলের ন্যায় এক ভীষণ বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইবে।

অন্ধের শিক্ষা যে একটা সম্ভবপর

ও মেরামত, পড়ম নির্ম্মাণ, বেত ও নলখাগড়া দ্বারা চেয়ার-ছাউনি, দারুকর্ম্ম, গা-ডলা, মাদুর বোনা, গদী নির্ম্মাণ, সঙ্গীতবিদ্যা, পিয়ানোর সুরবাঁধা ও মেরামত, "শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং", টেলিফোনিং, উদ্যান পালন, মুরগী হাঁস প্রভৃতি পালন, মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য, ছাঁচে সীসা ঢালাই করিয়া অক্ষরনির্ম্মাণ, কলের ও হাতের নানাপ্রকার বুনন ও সেলাই, ধোপার কাজ, তাঁতবোনা, দর্জ্জির কাজ, বইবাঁধা, গৃহস্থালির কাজ। শেষের পাঁচছয়টি কাজ বিশেষ করিয়া মেয়েদের জন্য।

প্রকৃত শিক্ষা পাইলে যে অন্ধগণও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। ইহার প্রমাণস্বরূপ পূর্ব্বে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া

কার্য্য ইহা যাঁহারা জনসাধারণকে দেখাইয়া দিতেছেন তাঁহারা সকলেই আমাদের নমস্য। গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগকে এই সদনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে সাহায্য ও সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।

ভারতবর্ষে প্রায় ছয়লক্ষ অন্ধ আছে। তাহার তুলনায় অন্ধাশ্রম ও অন্ধবিদ্যালয়ের সংখ্যা অতি সামান্য। যে কয়টি বিদ্যালয় আছে তাহাতে বোধ হয় ১০০০ হাজারের বেশী ছাত্রছাত্রীর স্থান নাই। এক মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতেই ৩৫,০০০ কি ৪০,০০০ অন্ধ, কিন্তু পালামকোটার এই বিদ্যালয়ে একশত জনও কুলায় না। কুমারী এসকুইথ আরও অধিক ছাত্র গ্রহণ করিতে খুবই ইচ্ছুক কিন্তু তাহার অনুরূপ অর্থ একেবারেই নাই। আমরা জানি যে অন্ধের শিক্ষার

প্রয়োজন আছে; কিন্তু তবুও যদি আমরা কার্য্যকালে আমাদের বিশ্বমাতার দুঃখী সন্তানের দুঃখ দূর করিতে বিমুখ হই—তবে কি তাহা তাঁহার সন্তানের উপযুক্ত কার্য্য হইবে? আমরা জানি যে ইহাদের মধ্যে অকালমৃত্যু ও অপঘাত মৃত্যু খুবই বেশী, অনেক অন্ধশিশু যে পিতা-মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় তাহাও আমরা জানি, আবার ইহাদের দিয়া ভিক্ষা করাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য অনেকে ইহাঁদিগকে লইয়া যায় তাহাও আমাদের অজ্ঞাত নহে। অনাথা অন্ধ বালিকাদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। জগতে আপনার বলিবার ও দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার তাহাদের কেহই নাই।

হিন্দুজাতি স্বভাবতই দানশীল, কিন্তু এই-সকল বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহাদের ততটা টান দেখা যায় না। এই অবহেলার কয়েকটি কারণ বলা যাইতে পারে। অন্ধকে যে শিক্ষাদান করা যাইতে পারে এই কথাটাই এখনও অনেকে জানেন না। বাহিরের অধিকাংশ লোকই এই-সকল বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যাঁহারা জানেন তাঁহারাও অনেকে এখানকার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। যাঁহারা এই-সকল আশ্রমের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে অন্ধগণকে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী করাই আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের মূল উদ্দেশ্য। তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করা অপেক্ষা স্বধর্ম্মে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকাই শ্রেয় মনে করেন। ইঁহারা যদি এইরূপ নিশ্চিন্ত না থাকিয়া এক-একটি হিন্দুবিদ্যালয় স্থাপন করেন তাহা হইলে প্রকৃত মানবের কর্ম্ম হয়। পালামকোটার একজন ধনী হিন্দু অন্ধ-বিদ্যালয়ের উচ্চ-শ্রেণীর অন্ধ ছাত্রদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র ছাত্রাবাস করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত দালাভাই মুদেলিয়ার।

অধিকাংশ অন্ধবিদ্যালয়ই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণেরই কীর্ত্তি। আমাদের দেশে আধুনিক যুগে এই জাতীয় কার্য্যে ইঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। হিন্দুগণ ইহার জন্য তাঁহাদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

অন্ধগণ বিদ্যালয়ে আসিবার পূর্ব্বে অনন্ত দুর্দ্দশা ভোগ করে। বিদ্যালয়ে আসিয়া আদর যত্ন ও শিক্ষা পাইয়া তাহারা স্বভাবতই তাহাদের পিতৃমাতৃস্থানীয় শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কোন কুণ্ঠা বোধ করে না। ইহার পূর্ব্বে তাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই জানিত না বলিয়া প্রথম যে ধর্ম্মের বাণী তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে তাহাই অবলম্বন করা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

মানবপ্রেমেই ভগবদ্‌প্রেম পরিস্ফুট হয়। অন্ধ ও চক্ষুষ্মান উভয়েই এক ঈশ্বরের সন্তান। যাঁহাকে ভগবান দৃষ্টিশক্তি দিয়াছেন তিনি যে-পরিমাণে দৃষ্টিহীনের দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হইবেন সেই-পরিমাণেই জগৎপিতার প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। গীতাকার বলেন যিনি সর্ব্বজীবের মঙ্গল-সাধনে যত্নবান তিনিই ভক্ত।

অন্ধদিগের উন্নতির কেবলমাত্র সূচনা হইয়াছে। এখনও আরও অনেক আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে যথেষ্ট সময় ও প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। এই কার্য্য কেবল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য নহে, অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়েরও এবিষয়ে যথেষ্ট কাজ আছে। লণ্ডনে জগতের সকল দেশের অন্ধবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক সম্মিলন হয়; সেই সম্মিলন ভারতের অন্ধদের সাহায্য করিতে গভমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন; সেই সম্মিলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত অরুণকুমার শাহ। ইহার ফলে ভারতের রাষ্ট্রসচিব (Secretary of State for India) পোষ্টাপিসের অধ্যক্ষকে (Director General of Post and Telegraphs) অন্ধ-ভাষার চিঠি ও বই ইত্যাদি পাঠাইবার মাশুল কম করা যায় কি না বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

অন্ধশিক্ষা ভারতবর্ষে কতদূর উন্নতিলাভ করিতেছে বা অগ্রসর হইতেছে তাহার বিবরণ পাওয়া কঠিন। লর্ড কারমাইকেল কলিকাতার অন্ধবিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ-সভায় এই অসুবিধার উল্লেখ করিয়া সকল প্রদেশের স্কুলের শিক্ষকদের এক সমিতি সংগঠনের পরামর্শ দেন। শ্রীযুক্ত অরুণকুমার শাহ ও শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রাও এই কর্ম্ম উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়া সম্পন্ন করিতে বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন।

এই প্রবন্ধ সংকলন করিতে আমরা শ্রীযুক্ত অরুণকুমার শাহ ও শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রাওএর নিকট তথ্য সংগ্রহে অনেক সাহায্য পাইয়াছি; তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশান্তা চট্টোপাধ্যায়।

চীনে হিন্দুরাজত্ব *

যে জাতির প্রাচীন ইতিহাস নাই, সে জাতির গৌরব করিবার কিছুই নাই; সে জাতির আত্ম-পরিচয় দিবার কিছুই নাই; সে জাতির লোকের প্রাচীন গৌরব-স্মৃতি জাগরুক করিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার কিছুই নাই; সে জাতি কেবল নিশ্চিন্ত মনে আহার বিহার করিয়া ইতর-জীবের জীবন-লীলায় এই মহামূল্য মানবজীবনের অবসান করিয়া থাকে।

প্রাচীন ইতিহাসশূন্য বর্ত্তমান ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর, দশা অনেকটা প্রায় সেইপ্রকার দাঁড়াইয়াছে। যে ভারতের সীমা পশ্চিমে মাডাগাস্কার দ্বীপ, পারস্য ও আরব-উপকূলবর্ত্তী স্থান, এমন কি আবিসিনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পূর্ব্বে শ্যাম ব্রহ্ম মালয় সুমাত্রা জাবা বালী দ্বীপসকল এবং পশ্চিম-চীনের ইউনান প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিয়া লজ্জায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হয়। অতি প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও মধ্যযুগ পর্য্যন্ত এইসকল অঞ্চল যে বহির্ভারত বলিয়া গণ্য হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভিনিশদেশীয় প্রসিদ্ধ পর্য্যটক মহামতি মার্কো-পোলো (Marco-Polo) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আশিয়া মহাদেশের প্রায় সমগ্র প্রদেশ স্থল- ও জলপথে ভ্রমণ করিয়া যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন আজ তাঁহার সেই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা উপরোক্ত কথার প্রমাণ পাই। তিনি খাস ভারতকে বৃহৎ ভারত (Greater India) ও ভারতের বাহিরের দেশগুলিকে ক্ষুদ্র ভারত (Lesser India) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মার্কো-পোলো আবসিনিয়া (হাবসি) দেশকে মধ্য-ভারত (Middle India) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কেন তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। আবিসিনিয়া মধ্যভারত বলিয়া গণ্য হইলে তাহার বাহিরের দেশগুলিও কি ভারতের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত? এ কথার মীমাংসা হওয়া দুষ্কর।

মার্কো-পোলো যে-সময়ে ভারতভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন ভারতের গৌরবসূর্য্য নিশ্চয়ই অস্তমিত হইয়াছিল, কেননা এই সময়েই পাঠানগণ কর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্ত বিধ্বস্ত হইতে আরম্ভ করে।

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এই বহুবিস্তৃত অঞ্চল যে তখন বহির্ভারত বলিয়া গণ্য হইত তাহার কারণ কি? এইসকল অঞ্চল যে তখন ভারতীয় নরপতিগণ কর্ত্তৃক সাক্ষাৎভাবে শাসিত হইত তাহা নহে; তৎকালে ভারতের রাজনৈতিক প্রভাব এত প্রবল ছিল, ধর্ম্ম ও শিক্ষার প্রাতপত্তি এত ছিল, অন্তর- ও বহির্বাণিজ্য এত ঐশ্বর্য্যশালী ছিল, যে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে এই-সকল অঞ্চল অল্পাধিক পরিমাণে ভারতকে গুরুস্থানীয় বলিয়া মান্য করিয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিত, অর্থাৎ বর্ত্তমানে যাহাকে sphere of influences বলে প্রাচীন কালে এই-সকল অঞ্চল সেইরূপ ভারতের প্রতিপত্তির অধীন ছিল। যেমন আজকাল ইংলণ্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও কেন্দ্র শক্তিরূপে গণ্য হইলেও পৃথিবীর সকল দেশ ইংলণ্ডের শাসনাধীন নহে; কোথাও বা সাক্ষাৎ ভাবে, কোথাও বা পরোক্ষ ভাবে বাণিজ্য ও রাজনৈতিক বিষয়ে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হয়; যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ চীনের কোনও কোনও প্রদেশ, আফগানিস্থান ও পারস্যদেশ; ভারতবর্ষও এককালে তেমনি ছিল বলিয়া মনে হয়।

ভারতের কি ছিল? যাহা ছিল তাহা কেন গেল? ইহার কিছুই আমরা জানি না। হায়! ভারতের প্রাচীন গৌরবস্মৃতি জাগাইবার পক্ষে আমাদিগের এমন কিছুই নাই, যাহাতে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইতে পারে। যাহা আছে তাহা যৎসামান্য; তাহাতে কোন ধারাবাহিক বিবরণ নাই, তাহার একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ

* চীন ইতিহাসে লিখিত আছে টিয়েন-চু বা ভারতবর্ষ (স্বর্গ) এবং ইংরেজী অনুবাদে India; বাঙ্গালা তরজমায় হিন্দু বলিয়া উল্লেখ করিলাম; কারণ অতি প্রাচীন কালে সমস্ত ভারতবর্ষেই বোধ করি হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, সুতরাং হিন্দু বলিলে ভারতবাসীই বুঝাইত। ভারতবর্ষের অপর নাম হিন্দুস্থান।

নাই। তাহার অধিকাংশ বিদেশীর মুখে শ্রুতিকথার গ্রহণ মাত্র। কেবল ছিন্ন কথার মত জোড়া তালি দিয়া সাজান। আজ যে প্রসঙ্গ লইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম তাহাও সেই ছিন্ন কথার একখানি তালির কার্য্য করিবে আশা করি।

সুপ্রসিদ্ধ মিশনারি মার্শাল ব্রুমহল (Marshall-Broomhall) সাহেব "চীন সাম্রাজ্য" "Chinese Empire" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে খাস চীনার অষ্টাদশ প্রদেশ ছাড়া তিব্বত মাঞ্চুরিয়া মংগোলিয়া প্রভৃতি অধীনস্থ প্রদেশগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে বর্ণিত এক বা দুই প্রদেশের বিবরণ সম্বন্ধে লেখক ভিন্ন ভিন্ন। ইউনান প্রদেশের বিবরণের লেখক রেভারেণ্ড ম্যাকার্থী। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের মুখবন্ধেই লিখিয়াছেন যে "It is generally accepted that the inhabitants of this Province originally came through Burma from Hindoostan." আবার China and the Gospel নামক ১৯১২ খ্রীঃর বার্ষিক রিপোর্টে ইউনান প্রদেশের প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে "Yunnan (south of the clouds) previous to 1259 A. D. was ruled by native princes who were of Hindoo origin." এই-সমস্ত পাঠ করিয়া আমার অত্যন্ত কৌতূহল হয়; চীনের সহিত ভারতের কি সম্পর্ক ছিল জানিতে ব্যস্ত হইয়া উঠি; কিন্তু পাদরিগণ কোন্ গ্রন্থ হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিলেন তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি নাই। দুঃখের বিষয় রেভারেণ্ড ম্যাকার্থী গতবৎসর এ জগৎ হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই ইহার অনুসন্ধান পাইতাম। কারণ তিনি আমার বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার কথা পূর্ব্বে আমি প্রবাসীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। এদিকের পথ বন্ধ হইলেও অন্য উপায়ে এই তথ্যের প্রমাণমূলক গ্রন্থসকল সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং ইউনানফুর দৈনিক চীনপত্রিকায় এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিতে লাগিলাম যে যিনি এই বিষয়ের কোন প্রাচীন গ্রন্থ অথবা কোন প্রাচীন শিলালিপির বিবরণ আমাকে দিতে পারিবেন তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট কতক পরিমাণ অর্থ পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত হইবে। যদি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া আশানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হই তাহা হইলে হিন্দুচীনের লুপ্ত গৌরবের এক অধ্যায় উন্মুক্ত হইবে এই আশার আনন্দে আমার মন উৎসুক ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল।

"Where there is a will, there is a way" ইচ্ছা থাকিলেই উপায় আসিয়া জুটে– ইহা একটি মহাসত্য। আমার যে প্রবল ইচ্ছা ছিল তাহা পূর্ণ হইয়াছে। ইউনানফুর দৈনিক পত্রিকায় অনেক টাকা খরচ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফল পাই নাই। সমস্ত প্রদেশ হইতে একটুও সাড়াশব্দ পাই নাই। স্থানীয় চীনপণ্ডিতগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও এ বিষয়ে কোন উত্তর পাই নাই। ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম বটে কিন্তু আশা ছাড়ি নাই। গতবৎসর চায়না ইনল্যাণ্ড মিশনের পাদরি রেভারেণ্ড ফ্রেজার (Fraser) সাহেব অপর একজন পাদরি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য টালিফু (Tali-fu) গিয়াছিলেন; যাত্রাকালীন তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে যদি তিনি পথিমধ্যে বা উক্ত সহরে ভ্রমণকালীন কোন প্রস্তরলিপি দেখিতে পান, বা কোন গ্রন্থ খুঁজিয়া পান যাহাতে আমার অভিলষিত বিষয়ের তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে তজ্জন্য যে খরচ হইবে তাহা আমি দিব এবং তাঁহার নিকট এজন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। তিনি ঘটনাক্রমে টালিফু-সহরে একখানি ইংরেজী গ্রন্থ দেখিতে পান, তাহা ইউনান প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাসের অনুবাদ। রেভারেণ্ড ক্লার্ক ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ "নান-চাও-ইয়েশীঃ" (Nan-chao-ye-shih) নামক মূল চীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে তরজমা করিয়াছিলেন। ফ্রেজার সাহেব টালিফু হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দয়া করিয়া আমাকে উক্ত গ্রন্থ প্রদান করিলে আমি যে কত আনন্দিত হইলাম তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এ বিষয়ে তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইলাম।

এই অনূদিত গ্রন্থ আমার চীনে বন্ধুকে (যিনি

আমাকে বিজ্ঞাপন লিখিয়া দিয়াছিলেন) দেখাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ মূল গ্রন্থখানি চিনিতে পারিলেন এবং কএক দিন মধ্যে আমাকে একখানি মূলগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিলেন। ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ আর-একজন চীনে বন্ধুর সাহায্যে ইংরেজীর সঙ্গে মূল চীনা গ্রন্থখানি মিলাইয়া দেখিয়া লইলাম যে অনূদিত গ্রন্থখানির মূলের সঙ্গে ঠিক ঐক্য আছে। এই বিষয়ে চীনাদিগকে এতদিন নীরব থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কারণ বড় বড় সকল সহরেই এই গ্রন্থ পাওয়া যায়। তবে কেন আমার প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের সাড়া একজন লোকেও দিল না? ইহার অন্য কোন কারণ বুঝিতে পারি না, হয়ত চীনারা ভারতবাসীর বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থা দর্শন করিয়া এ কথা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক যে হিন্দুরা প্রাচীনকালে এদেশে রাজত্ব করিত। আমি যখনই শিক্ষিত চীনাদিগের সঙ্গে আলাপ করিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তখনই তাহারা এ কথায় আস্থা করিতে পারে না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, কেহ বা কথাটা চাপা দিয়া অন্য বিষয়ের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কারণ জগতে আমাদিগের এখন ডাকনাম "ইণ্ডিয়ান কুলি"।

ইউনান প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাসের মূল গ্রন্থখানি ছি-ছোয়ান (Sze-chuan) প্রদেশের রাজধানী চ্চেন-ঠৌফু (Chein-twfu) সহরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মিঃ ইয়াং-চাই (Yang Tsai) কর্ত্তৃক ১৫৫১ খৃঃ সংকলিত ও লিখিত হয় এবং এই গ্রন্থখানা হুপে (Hupe) প্রদেশের রাজধানী উ-চাং (Wuchaing) সহরের মিঃ হু-ই (Hu-yi) কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া ১৭৭৬ খৃঃ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। এই উভয় পণ্ডিতই পেকীন-বিশ্ববিদ্যালয়ের চোয়াং ইউয়েন (Chwang yüen) উপাধিধারী। এই উপাধি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ডিগ্রির সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী পাইয়া থাকে। মিঃ ইয়াং চাইয়ের পর ইউনান প্রদেশের কোন ব্যক্তি অদ্যাবধি উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ইনি পরে বৌদ্ধ-সন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বন করিয়া ইউনান প্রদেশে এক ভিক্ষু-আশ্রম ও মঠ নির্ম্মাণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন। রেভারেণ্ড ক্লার্ক লিখিয়াছেন যে উপরোক্ত সুপণ্ডিতগণ যাহা ইতিহাসরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য। সেই কারণে সেই ইতিহাসের ভারত-সম্পর্কীয় অংশের অবিকল অনুবাদ আমরা ক্রমশ প্রকাশ করিতে থাকিব।

টেঙ্গিয়ে, চীন। শ্রীরামলাল সরকার।

আর্য্যমতবাদে চীনের প্রভাব

যাঁহারা বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন ঋষি; ঋষি অর্থই হইল মন্ত্রদ্রষ্টা। এই ঋষিগণ যে দল- বা জতিভুক্ত ছিলেন, প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেই জাতির নাম হইয়াছে আর্য্যজাতি। বেদমন্ত্রে যে দেবতত্ত্ব এবং পূজাপদ্ধতি সূচিত হয়, উহা যে প্রাচীনতম সময়ে ভারতের আর্য্যদলের সকল লোকেরাই অবলম্বনীয় অথবা প্রতিপাল্য মনে করিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। যাঁহারা আপনাদের দলের লোক, তাঁহারাও যে বৈদিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই, এবং যাঁহারা রাজা হইয়া স্থানে স্থানে আর্য্যসমাজ শাসন করিতেছিলেন তাঁহারাও যে ঋষিদিগকে পীড়ন করিতেন এবং অগ্রাহ্য করিতেন, একথা খাঁটি বৈদিক মন্ত্রেই উল্লেখিত আছে। এরূপ স্থলে একথা কেহ বলিতে পারেন না, যে, যাঁহারা প্রাচীনকালে মধ্যদেশের নিখুঁত বৈদিক আদর্শ গ্রহণ করেন নাই, অথবা মগধাদি দেশে নূতন ধরণের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা আর্য্যদলের লোক ছিলেন না। কোন্ প্রদেশে, কত পরিমাণে, আর্য্যেতর রক্ত অঙ্গীকৃত হইয়াছিল, এ প্রবন্ধের প্রয়োজনের হিসাবে তাহার অনুসন্ধান করিব না; অন্যের রক্ত গায়ে না থাকিলেও যে, আর্য্যদলের লোকেরা বেদবিহিত ধর্ম্মাদি পালন না করিয়া স্বাধীন মত পোষণ করিতে পারিতেন, খাঁটি বৈদিক সূক্ত হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। যাহা বেদের মতবাদ বা ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা যে আর্য্যদলের লোকেরা নিজের বুদ্ধিতে উদ্ভাবন করেন নাই, এ কথা বলা চলে না।

মহাবীর এবং বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, বহুযুগ ধরিয়া যে অবৈদিক সাধনা চলিতেছিল, এবং বহুতর লোক-শিক্ষক বা বুদ্ধ যে অবৈদিক আর্য্যপন্থা অনুসরণ করিতেছিলেন, তাহা বৌদ্ধ ঐতিহ্য হইতে জানিতে পারি। কোন

সুনির্দ্দিষ্ট সাহিত্য নাই বলিয়া, ঐ প্রবাদ বা ঐতিহ্য সহজে অস্বীকৃত হইতে পারে না; বরং বেদগ্রন্থে, বেদবিরোধী আর্য্যের উপন্যাস আছে বলিয়া, প্রবাদটিকে সত্যমূলক মনে করা উচিত।

যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের পবিত্র মধ্যদেশে বাস করিতে-ছিলেন, এবং মোক্ষসাধনার জন্য বেদমন্ত্রগুলিকেই দেব-তত্ত্বের এবং শিষ্টাচারের একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় আকর ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লে-ষণ প্রভৃতি করা ছাড়া অন্য কার্য্য বড় কিছু ছিল না; এইজন্য বেদমন্ত্রের রক্ষকেরা কেবল বিশুদ্ধ রকমের ব্রাহ্মণ হইয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানের মাহাত্ম্যে এবং চিন্তাশীলতায় প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। সকল দেশে এবং সর্ব্বকালে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছিল; যাঁহারা খানিকটা অবৈদিক বা layman ছিলেন, জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ হউন অথবা ক্ষত্রিয় হউন, তাঁহারাই নবতত্ত্ব এবং নবসাহিত্য উদ্ভাবন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। উপনিষদের নূতন ব্রহ্মতত্ত্বে এবং যোগাচার্য্য জনকের প্রবাদ প্রভৃতিতে ঐ কথাই সমর্থিত হয়।

একজাতির লোকের মধ্যে অতি প্রাচীনকালেও ধর্ম্মমতের সম্পূর্ণ একতা না থাকিতে পারিত; কিন্তু যে-সকল বিশ্বাস প্রাচীনকালে নিশ্চয়ই জাতিনিষ্ঠ হইত, তাহাতে প্রভেদ দেখিলে নানা কথা মনে পড়ে। বেদ-সংহিতায় জন্মান্তরবাদ বা সংসারচক্রবাদ পাওয়া যায় না অথচ পূর্ব্বাঞ্চলের উপনিষদাদি আর্য্যশাস্ত্রে ঐ মতটি সর্ব্বত্রই স্বীকার্য্যের মত গৃহীত হইয়াছে। বেদসংহিতায় পিতৃলোক এবং ঋভু-লোক প্রভৃতি পাই; এবং পরলোক-গতদিগের মঙ্গল এবং তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধের বিধান পাই। মৃতব্যক্তি জলৌকের মত দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিলে শ্রাদ্ধের প্রয়োজন থাকে না, এবং বংশলোপের ভয়ে পিতৃদিগকে অজাতপুত্রের তর্পণের জল নিঃশ্বাস ফেলিয়া কবোষ্ণরূপে উপভোগ করিতে হয় না। পৌরাণিক শ্রাদ্ধপদ্ধতি বৈদিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদমন্ত্রে জন্মান্তরবাদ না থাকিলেও প্রাচীন ভারতবর্ষে যে আর্য্যেতর জাতীয়দের মধ্যে ঐ মত প্রবল ছিল, তাহা একালের দ্রবিড়জাতির বিশ্বাসাদি দেখিয়াই স্থির করা যাইতে পারে। দ্রবিড়জাতীয়েরা এবং মোঙ্গলজাতীয়েরা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সকল দিকে আর্য্যদিগের সহিত নিঃসম্পর্কিত; অথচ উহাদের মধ্যে জন্মান্তরে বিশ্বাস অতিশয় দৃঢ় এবং প্রবল। আর্য্যদের আদর্শ মধ্যদেশে অতি প্রাচীনকালে আর্য্যেতর সংস্রব ঘটিতে পারে নাই; কিন্তু মগধাদি পূর্ব্বাঞ্চলে আর্য্যেতর জাতীয়েরা আর্য্যদিগের অতি সুপরিচিত প্রতিবেশী ছিলেন। অতি উচ্চ শিক্ষিত এবং মার্জ্জিতরুচির লোককেও নিম্নস্তরের লোকের প্রভাবে পড়িতে হয়। কাজেই এ অনুমান কদাচ অসঙ্গত নহে, যে, ভাবের অপরিহার্য্য আদানপ্রদানের ফলে পূর্ব্বাঞ্চলের আর্য্যেরা আর্য্যেতর জাতির জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সকলেই পড়িতেছেন, মনে করিতে পারি; কারণ ঐরূপ সুরচিত মৌলিক প্রবন্ধ, বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। প্রায় নেপালসীমান্তে অবস্থিত কপিলবাস্তনগর যাঁহার স্মৃতিপূত, সেই মহর্ষি কপিল যে, অবৈদিক ঋষি এবং অবৈদিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে সকলেই পড়িয়াছেন। মনস্বী কপিল তাঁহার আত্ম-প্রতিভায় অজ্ঞাত প্রাচীনকালে যে নূতন দার্শনিক মত উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই, একথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। অন্য উৎপত্তি প্রমাণিত না হইলে মহর্ষি কপিলকেই সাংখ্যদর্শনের পিতা বলিতে হইবে, এবং তাঁহাকে অঋণী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমি নিজে বহুশ্রেণীর দ্রবিড়জাতীয়দিগের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, এবং ঐ বিষয়ে অন্যান্য পণ্ডিতদিগের বিবরণী বহুপরিমাণে পড়িয়াছি, কুত্রাপি সাংখ্যদর্শনের বীজমন্ত্র, অথবা ঐ মন্ত্রের অনুরূপ কোন ভাব, দ্রবিড়জাতীয়দিগের মধ্যে পাই নাই।

নেপালের সন্নিহিত বলিয়া কপিলবাস্ত প্রভৃতি স্থানে কোন মঙ্গোলীয় মতবাদ সংক্রমিত হইয়াছিল কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

নৃতত্ত্ববিচারে, ক্ষত্রিয়ের "পীতবর্ণ" সম্বন্ধীয় প্রাচীন উল্লেখ, মোঙ্গল-রক্ত-সংস্রব সূচনা করে কি না, সেকথা অবান্তর বলিয়া পরিত্যাজ্য। খাঁটি চীনদেশ বা মহাচীনের সহিত আমাদের পরিচয় খুব বহুদিনের না হইলেও হিমালয়-

প্রদেশস্থ "চীন"দিগের সহিত আমাদের পরিচয় হয়ত স্মরণাতীত যুগ হইতে। মহাচীনের লোকেরা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং ভারতসভ্যতা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে; এবং তাহার বহুপূর্ব্বেও য়ুন্নান প্রভৃতি স্থান আর্য্যসংস্পর্শে আসিয়া কিয়ৎপরিমাণে আর্য্য সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বহুপূর্ব্বকালে যে কোন দেশের নরস্রোত বা ভাবের বাতাস, মহাচীনে প্রবাহিত হইতে পারে নাই, তাহা চীনদেশের প্রাচীন বিবরণে জানিতে পারি। নৃতত্ত্ববিদেরা চীনজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহাই বলুন, একথা নিশ্চিত যে অন্ততঃ খৃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে পীতনদীতীরে চীনসভ্যতা বিকশিত হইয়াছিল। সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া, খাঁটী আপনাদের জাতির লোক লইয়া খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দেও যে ইহারা সাহিত্যাদি রচনা করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এখন সংগৃহীত হইতেছে।

চীনজাতীয় লোকের একটি জাতিনিষ্ঠ মৌলিক সুপ্রাচীন বিশ্বাস খৃষ্টাব্দের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে যে ভাবে অবস্থিত ছিল তাহার পরিচয় দিতেছি; উল্লেখিত প্রাচীন সময়ের জগৎ-তত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে, যে, এই পৃথিবী এবং বিশ্বজগৎ সম্পূর্ণ অনাদি অর্থাৎ অনন্তকাল হইতেই বিশ্বের উপাদান রহিয়াছে, এবং কখন কেহ সৃষ্টি করে নাই। "কিছু-না" হইতে কিছুর উৎপত্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশ্বের এই অজাত এবং অনাদি ভূতসঙ্ঘের সমগ্র শরীর এবং প্রাণ ব্যাপিয়া দুইটি জিনিস রহিয়াছে; একটি সূক্ষ্ম পুরুষ এবং অন্যটি প্রকৃতি। সূক্ষ্ম-পুরুষ ভাবের মধ্যে যে চেতনা আছে তাহাতে ডুবিয়া গিয়া স্থূল নিশ্চলতা বা প্রকৃতি দৃশ্যমান জগতে পরিণত হয়। পুরুষ একটি ভাব, এবং প্রকৃতিও একটি ভাব; ঐ দুইটিরই অস্তিত্ব পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া দুইটিই এক সঙ্গে জড়াইয়া আছে, এবং ভৌতিক অভিব্যক্তিতে যেরূপভাবে প্রকাশিত হয়, তাহার রূপান্তরমাত্র ঘটে কিন্তু পরিবর্ত্তন ঘটে না। চীনদেশের এই অতি পুরাতনকালের মতবাদ অন্যকোন স্থান হইতে সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ মিশর এবং বাবিলনে এই মতবাদ দেখা যায় না এবং সুপ্রাচীন বৈদিকযুগেও এই মতবাদ পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে যেখানে যেখানে প্রথম সভ্যতার জন্ম হইয়াছিল, সেখানে যাহা নাই, তাহা চীনের আদিম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মিশর, ভারত প্রভৃতির মত, চীনদেশও যে অন্যের পরিচয় না লইয়া প্রাথমিক সভ্যতা বিকাশ করিয়াছিল, সে কথা বলিয়াছি; এবং অন্ততঃ বুদ্ধদেবের জন্মসময়ের যুগ পর্য্যন্ত যে চীনদেশের লোকেরা বাহিরের কোন সংবাদ লয় নাই, তাহাও সে দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা পড়িলে স্বীকার করিতে হয়।

মহর্ষি কপিল যে স্বীয় প্রতিভার বলে চীনদেশের বিশ্বাসের অনুরূপ একটা মতবাদ নেপালসীমান্তে বসিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই, তাহা বলা যায় না। কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশের চীন-কিরাতেরা যখন প্রতিবেশী ছিল, তখন কপিলবাস্তু প্রভৃতি স্থানে মঙ্গোলদিগের জাতীয় বিশ্বাস কিছু পরিমাণে সংক্রামিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। পূর্ব্বপরবর্ত্তিতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়, যে, চীনদেশের প্রাচীনকালের নিরীশ্বর জগৎ-তত্ত্বই সাংখ্য-তত্ত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতেছি। বুদ্ধদেব যে-সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা কে, কোথায় উদ্ভূত হইয়াছিলেন, জানা যায় না। কিপ্রকার অবৈদিক ধর্ম্মমতের ঐতিহ্য পূর্ব্বাঞ্চলে বিকশিত হইয়াছিল, এবং কিপ্রকারে একটি গুরুপরম্পরা এবং ভাবের ধারা-বাহিকতা সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাও অজ্ঞাত। যে "কপিলস্তু বস্তু" বুদ্ধদেবের জন্মভূমি, উহা যদি কোনপ্রকারে চীন-দেশের সহিত সংসৃষ্ট ছিল, তাহা হইলে অনেক কথা ভাবিয়া দেখিতে হয়। যাঁহারা তথ্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা যদি চীনদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত পরিচয় লাভ করেন, তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন যে, বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম গৃহীত হইবার পূর্ব্বে কোনদেশের বিন্দুমাত্র কিছু চীনদেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। যাহারা প্রাণান্তেও বিদেশের পরিচয় লয় নাই, এবং কেবল প্রাচীর তুলিয়া বাহিরের জনস্রোতকে রুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণবিষয়ে দেশের চিরন্তন প্রথার বিরোধ ঘটাইল কেন? বৌদ্ধধর্ম্ম যে চীনদেশের মৌলিক বিশ্বাস এবং ভাবের অনম্নরূপ নহে, তাহা বুদ্ধদেবের কথঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কনফুসসের মতবাদ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। মতের সহিত কিঞ্চিৎ মিল থাকিলেই যে রক্ষণশীলেরা নূতন দেশের নূতন

কিছু লইবেন, তাহা মনে হয় না ; নূতন মতবাদ বলিয়া প্রচার করিলে চীনে কিছু গৃহীত হইত না। স্বয়ং কন্‌ফুসস্‌কে বলিতে হইয়াছিল এবং দেখাইয়া দিতে হইয়াছিল, যে, তিনি যাহা প্রচার করিতেছিলেন তাহা নূতন নহে এবং ঐসকল কথা প্রাচীন বংশপ্রবর্ত্তকেরা বলিয়া গিয়াছিলেন। এত করিয়া কন্‌ফুসসের মত চীনে গৃহীত হইয়াছিল। সহসা কনফুসসের শতবর্ষ পরে পরবাদ-অসহিষ্ণু চীনের লোক কি কারণে ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম লুফিয়া লইল তাহা অনুসন্ধেয়। পূর্ব্ব হইতেই চীনদেশের কোন প্রজ্ঞাবানের সহিত এদেশের বোধিসত্ত্বদিগের আধ্যাত্মিক যোগ ছিল কিনা, তাহাও খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। এ যুগে নিশ্চয় করিয়া কোন কথাই বলা চলে না ; তবে যদি সম্ভাবনার কথাগুলি মনে রাখিয়া তত্ত্বসংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভারতের নিকট চীনের এবং চীনের নিকট ভারতের ঋণ সম্বন্ধে অনেক রহস্য উদ্ভিন্ন হইতে পারে।

লোকসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিবার পর, এবং মগধ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে ক্ষত্রিয়প্রভাব বাড়িয়া উঠিবার পর, সাধারণ শ্রেণীর লোকের অবৈদিক ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতির কথা সাহিত্যে স্থানলাভ করিয়াছিল। একসময়ে আদর্শ ব্রাহ্মণেরা যাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া অজ্ঞাত ছিল, তাহাই অনুকূল অবস্থায় সুজ্ঞেয় হইয়াছিল মাত্র। যে নদী অন্তঃসলিলা ছিল তাহাই কেবল বহতা হইয়াছিল। অনুসন্ধান করিলেই ধরিতে পারা যায়, যে, যাহাকে একালে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বলি, অথবা যে-সকল ধর্ম্মসাধনপদ্ধতি যাদু-বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার সহিত আমাদের পরিচয় ও সম্বন্ধ যত অল্প দিনেরই হউক, উহার উৎপত্তি স্মরণাতীত প্রাচীনকালে। তন্ত্রবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধে অনেক পূর্ব্বে অন্যত্র যে-সকল কথা লিখিয়াছিলাম, তাহার পুনরুক্তি করিব না। কিন্তু এই কথাটি উল্লেখ করিতেছি, যে, যাহাকে মোটা-মুটি তান্ত্রিক ধর্ম্ম বলি, তাহাতে মোঙ্গল এবং দ্রবিড়জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে রহিয়াছে। রক্তমিশ্রণের কথা লইয়া যত তর্কই উঠুক না কেন, আর্য্যের সহিত আর্য্যেতর জাতির ভাবমিশ্রণ কদাচ অস্বীকৃত হইতে পারে না। দেশের যথার্থ ইতিহাসের জন্য ইহা বিশেষ আলোচনার সামগ্রী।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কষ্টিপাথর

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধঃপাত।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন, তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। ভিক্ষুরা ক্রমশ খুব বাবু, বিলাসী ও তাহার উপর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠিল।

মহাযান ধর্ম্ম খুব উঁচু ধর্ম্ম—কিন্তু মহাযান বুঝিতে, আয়ত্ত করিতে ও মহাযানের মতে কর্ম্ম করিতে বহুকাল লাগে, অনেক পরিশ্রম করিতে হয়—অনেক পড়িতে হয়—ভাবনাচিন্তা করিতে হয়। ততটা সকলে পারিয়া উঠিত না। মহাযানের আচার্য্যেরা ইহার জন্য একটা সহজ পন্থা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়া দিয়াছিলেন তোমরা 'ধারণী' মুখস্থ কর—'ধারণী' জপ কর—ধারণীর পুঁথি পূজা কর। তাহা হইলেই তোমাদের মহাযানের পাঠ, স্বাধ্যায়—যোগ—সকলের ফল হইবে।

"ওঁ ধুণু ধুণু ক্রীং ফট্ স্বাহা" প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত অর্থহীন মন্ত্রকে ধারণী বলে।

এইরূপে যে কত ধারণী তৈয়ার হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। এক "বৃহদ্ধারণী সংগ্রহে" আমরা চারি শত এগারটি ধারণী পাইয়াছি। ক্রমে ধারণী মুখস্থ করাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তখন 'হুং' 'ফট্' 'ক্রীং' 'স্বাহা' এই-সকল শব্দের প্রচুর ব্যবহার হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা ইহাতেই আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। যে মহাযান ধর্ম্ম চিন্তাশক্তির চরম সীমায় উঠিয়াছিল, মন্ত্রযানে তাহা ক্রমে 'হুং' 'ফট্' 'স্বাহায়'—দাঁড়াইল। ইহা কি অধঃপাত নহে ?

বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দেবতার সংশ্রব নাই—দেবতার পূজা-অর্চ্চা হীনযানে ছিলই না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ৪।৫ শত বৎসর পরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ক্রমে একটি একটি করিয়া ধ্যানী বুদ্ধ আসিতে লাগিলেন। প্রথম 'অমিতাভ', তারপর 'অক্ষোভ্য,' তারপর 'বৈরোচন,' তারপর 'রত্নসম্ভব,' তারপর 'অমোঘসিদ্ধি' আসিয়া জমিলেন। ক্রমে এই পঞ্চতথাগতের পাঁচটি শক্তি দাঁড়াইল। শক্তি-গণের নাম—'লোচনা,' 'মামকী,' 'তারা,' 'পাণ্ডরা,' 'আর্য্যতারিকা'। বহুকাল অবধি তাঁহারা যন্ত্রে থাকিতেন, তাঁহাদের মূর্ত্তি ছিল না—ক্রমে তাঁহাদেরও মূর্ত্তি হইল। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চশক্তিতে পাঁচজন 'বোধিসত্ত্ব' হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'মঞ্জুশ্রী' ও 'অবলোকিতেশ্বর' প্রধান। বর্ত্তমান কল্পে অর্থাৎ ভদ্রকল্পে 'অমিতাভ' প্রধান ধ্যানী বুদ্ধ। তাঁহার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর—প্রধান বোধিসত্ত্ব। অবলোকিতেশ্বর করুণার মূর্ত্তি। তিনি মহোৎসাহে জীব উদ্ধার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার পূজা খুব আরম্ভ হইল। সেবকের উৎসাহ অনুসারে তাঁহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল—অনেক পদ হইতে লাগিল—অনেক মস্তক হইতে লাগিল ;—তাঁহার পূজা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তারাদেবীও নানা রূপ ধারণ করিয়া বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী, ভৈরব, বৌদ্ধগণের উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল। বোধিসত্ত্ব ও যোগিনীগণের ধ্যানকে সাধন বলে। যে পুস্তকে অনেক ধ্যান লেখা আছে তাহাকে সাধনমালা বলে। একখানি সাধনমালায় দুই শত ছাপ্পান্নটি সাধন আছে। 'বজ্রবারাহী,' 'বজ্রযোগিনী,' 'কুরুকুল্ল,' 'মহাপ্রতিসরা,' 'মহামায়ূরী,' 'মহাসাহস্র প্রমর্দ্দিনী' প্রভৃতি অনেক যোগিনীর ধ্যান ইহাতে আছে। এই-সকল সাধন লইয়া মূর্ত্তিনির্ম্মাণে বৌদ্ধকারিগরেরা এক সময়ে যথেষ্ট বাহাদুরী দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরবীর

পূজা লইয়া ও তাঁহাদের মূর্ত্তি লইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম চলিতে লাগিল, তখন আর অধঃপতনের বাকী কি রহিল?

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মধ্যে 'গুহ্যপূজা" আরম্ভ হইল। লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিব—কাহাকেও দেখিতে দিব না; এ পূজার অর্থ কি? অর্থ এই যে, সে-সকল দেবমূর্ত্তি লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না। ঐ মূর্ত্তির নাম—উহারা বলিত শম্বর। সেই-সকল মূর্ত্তি যখন বৌদ্ধদের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল—তখন আর অধঃপাতের বাকী রহিল কি? সে-সকল উপাসনার প্রকার আরও অশ্লীল। বুদ্ধদেব প্রাণিহিংসার একান্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 'তথাগত গুহ্যকে' বলিতেছে—

"হস্তিমাংসং হয়মাংসং শ্বানমাংসং তথোত্তমম্।
ভক্ষয়েদ্ আহারকৃত্যর্থম্ ন চ অন্যম্ তু বিভক্ষয়েৎ॥"
"অন্নং বা অর্থ বা পানং যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষয়েৎ ব্রতী।
বিণ্মূত্রমাংসযোগেন বিধিবৎ পরিকল্পয়েৎ॥"
"সময়চতুষ্টয়ং রক্ষ বুদ্ধজ্ঞানোদধিপ্রভোঃ।
বিণ্মূত্রং তু সদা ভক্ষ্যমিদং গুহ্যং মহাদ্ভুতং॥"

এই ত গেল আহারের কথা। গুহ্যসিদ্ধি লাভ করিতে গেলে বিষ্ঠা, মূত্র নিশ্চয়ই খাওয়া চাই—নহিলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হইবে না।

বুদ্ধদেবের শীলরক্ষা, উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ, মাল্যগন্ধবিলেপনাদি ত্যাগ, নৃত্যগীতবাদিত্রাদি ত্যাগ প্রভৃতি কঠোর নিয়ম কোন কাজেরই নয়, কেবল যথেচ্ছাচার কর—যথেচ্ছাচার কর—যথেচ্ছাচার কর। অধঃপাতের আর বাকী কি?

'তথাগত গুহ্যকে'র ন্যায় আরও অনেক পুস্তক আছে। 'চণ্ডমহারোষণ তন্ত্র,' 'চক্রসম্বর তন্ত্র,' 'চতুষ্পীঠ তন্ত্র' 'উড্ডীষ তন্ত্র,' 'সেকোদ্দেশ,' 'পরমাদিবুদ্ধোদ্ধৃত কালচক্র,' 'কালচক্রগর্ভতন্ত্র,' 'সর্ব্ববুদ্ধসমাযোগ ডাকিনী-জাল-সম্বরতন্ত্র,' 'হেবজ্রতন্ত্ররাজ,' 'আর্য্যডাকিনীবজ্রপঞ্জরমহাতন্ত্ররাজকল্প,' 'মহামুদ্রাতিলক,' 'জ্ঞানগর্ভ,' 'জ্ঞানতিলক', 'যোগিনীতন্ত্ররাগপরমমহাদ্ভুত,' 'তত্ত্বপ্রদীপ,' 'বজ্রডাক,' 'ডাকার্ণব,' 'মহাসম্বরোদয়,' 'হেরুকাভ্যুদয়,' 'যোগিনীসঞ্চার্য্য,', 'সম্পুট-তন্ত্র,' 'চতুর্যোগিনী সম্পুট,' 'গুহ্যবজ্র,' ইত্যাদি। যখন এইরূপ শত শত পুস্তক আছে—সে-সকল পুস্তক পড়া হইত—সেইরূপ ক্রিয়াকর্ম্ম হইত—তখন আর অধঃপাতের বাকী কি?

এ-সকল গুহ্যতন্ত্র—মূলতন্ত্র—সঙ্গীতি আকারে লেখা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এই-সকল গুহ্যবিদ্যার পুস্তকের আবার টীকা, টিপ্পনী, পঞ্জিকা, ব্যাখ্যা, বিবরণ, উহার প্রয়োগপদ্ধতিপ্রকরণ আছে। মূল যদি বিশখানি থাকে—টীকা টিপ্পনীতে তাহা পাঁচশত হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ খুঁজিতে গেলে এই-সকল জঘন্য বই ঘাঁটিতে হইবে। ভবিষ্যতে কোন্ হতভাগ্য পণ্ডিতের অদৃষ্টে যে সে দুর্ভোগ আছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সে দুর্ভোগ না ভুগিলেও এত বড় জাতিটা—এত বড় ধর্ম্মটা—কেন যে অধঃপাতে গেল, তাহা ত বুঝা যায় না। তাই কাহাকেও না কাহাকে একদিন সে দুর্ভোগ ভুগিতেই হইবে। কিন্তু যে ভুগিবে সে সত্য সত্যই ভারতের একটা মহা উপকার সাধন করিয়া যাইবে। সে অন্ততঃ বলিবে—"বাপু! এ পথে আর আসিও না—এ পথে আসিলে অধঃপতন অবধারিত।"

বুদ্ধদেব দেবতা মানিতেন না। মানুষ আপনা হইতেই চরিত্রশুদ্ধি করিয়া ক্রমে লোকে যাহাদের দেবতা বলে তাহাদের অপেক্ষাও উচ্চ যে পরমপদ—যে পদে গেলে জন্ম জরা মরণের আর ভয় থাকিবে না—যে পদে গেলে সংসারের কোন চিন্তা থাকে না—যে পদে গেলে মহাশান্তি লাভ করা যায়—সেই পদে উঠিতে পারিবে। তাঁহার শিষ্যেরা শেষে ডাক, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, কটপুতনা, কঙ্কালিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া আপনারাও অধঃপাতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দেশটাসুদ্ধ অধঃপাতে দিল।

বৌদ্ধধর্ম্মে অনেকদিন হইতেই ঘুণ ধরিয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে যেদিন স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষুণী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেইদিন হইতেই তাঁহাকে সংঘের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনেক কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছিল। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের এক বিহারে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ ছয় শত বৎসর পর হইতে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করিতে লাগিল—ক্রমে একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইল। এইখান হইতেই ঘুণ ধরা আরম্ভ হইল। সমাজে আসল ভিক্ষুদের খাতির অধিক ছিল। গৃহস্থ ভিক্ষুদের আদর তত ছিল না। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুদের নাম ছিল 'আর্য্য'। আসল ভিক্ষুরা আর্য্যদের নমস্কার করিতেন না, কিন্তু অনার্য্য হইলেও আসল ভিক্ষুদের আর্য্যেরা নমস্কার করিতেন। এই গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষুরাই ক্রমে দলে পুরু হইতে লাগিল। কারণ তাহাদের সন্তান সন্ততি হইত—তাহারা আপনা-আপনি ভিক্ষু হইয়া যাইত। একজন গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া যদি ভিক্ষু হইতে যাইত—তাহাকে প্রথম 'ত্রিশরণ' গ্রহণ করিতে হইত—তাহার পর 'পুণ্যানুমোদনা' শিখিতে হইত, 'পাপদেশনা' শিখিতে হইত, 'পঞ্চশীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'অষ্টশীল' গ্রহণ করিতে হইত, দশশীল গ্রহণ করিতে হইত, 'পোষধব্রত' ধারণ করিতে হইত—আরও কত কি করিতে হইত—অনেক সময় যাইত। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুর ছেলে—সে একেবারেই ভিক্ষু হইত। যে-সকল জিনিষ অন্যকে বহুকালে শিখিতে হইত, সে সেসকল বাড়ীতেই শিখিত—তবে আমাদের যেমন এখন পৈতা হয়—একটা সংস্কার মাত্র—উহাদেরও ঐ রকম 'ত্রিশরণ গমন,' 'পঞ্চশীল গ্রহণ,' এক একটা সংস্কারের মত হইয়া যাইত। আমাদের দেশে যেমন "জাত বৈষ্ণব" বলিয়া একটা জাতি হইয়াছে—সেকালেও তেমনি 'জাত ভিক্ষু' বলিয়া একটি জাতির মত হইয়াছিল। উহাদের যত দলপুষ্টি হইতে লাগিল, আসল ভিক্ষুদের অবস্থা তত হীন হইতে লাগিল। গৃহস্থ ভিক্ষুরা কারিগরি করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিত—ভিক্ষাও করিত—কেহ বা রাজমজুর হইত, কেহ বা রাজমিস্ত্রী হইত, কেহ বা চিত্রকর হইত, কেহ বা ভাস্কর হইত, কেহ বা স্যাকরা হইত, কেহ বা ছুতার হইত—অথচ ভিক্ষাও করিত, ধর্ম্মও করিত, পূজা পাঠও করিত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পৌরোহিত্যটা ক্রমে নামিয়া আসিয়া কারিগরদের হাতে পড়িল। যে কাজে পরিশ্রম কম—ঘরে বসিয়া করা যায়—একটু হাত পাকিলে কাজও ভাল হয়—দু'পয়সা আসেও বেশী, গৃহস্থ ভিক্ষু সেই-সকল কাজ করিত। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম করিবার সময়ও থাকিত—বড় বড় উৎসবে দু'চার পয়সা খরচও করিতে পারিত। কিন্তু বেশী লেখাপড়া শেখা, ধ্যানধারণা করা, ভাবনাচিন্তা করার সময়ও থাকিত না—প্রবৃত্তিও থাকিত না। তাহা হইলেই মোট দাঁড়াইল এই যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পৌরোহিত্যটা মূর্খ কারিগরদের হাতে পড়িয়া গেল। আসল ভিক্ষুরা বিহারে থাকিতেন। বিহারের জমিজমার আয় হইতে কোনরূপে গুজরান করিতেন। ক্রমে রাজারা প্রায় বিধর্ম্মী হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ পণ্ডিত হইলে যে রাজসম্মান পাইবেন তাহার উপায় রহিল না। রাজারাও ছোট ছোট রাজা—আপনাদের পণ্ডিত পোষণ করিয়া আবার যে বিধর্ম্মী বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদের সে সাধ্য ছিল না—থাকিলেও তাঁহাদের পণ্ডিতেরা তাহা করিতে দিত না; সুতরাং আসল ভিক্ষুদের এবং তাহাদের বিহারের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে আফগানিস্তানের উপত্যকা হইতে পাঠানেরা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এবং মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের কাফের বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বঙ্গদেশে আসিয়া পড়িলেন। যাঁহারা

আসিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও আসিতেছেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইঁহাদের অপেক্ষা যে বেশী জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তখন বাঙ্গলায় ত সেনবংশ রাজা—কিছু বড় রাজা মাত্র। আশে পাশে চারিদিকে অনেক ছোট ছোট রাজা ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধও ছিলেন। বল্লালের সময় ব্রাহ্মণদের একটা আদমসুমারি লওয়া হয়। সে সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে আট শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। আট শত ঘর ব্রাহ্মণে যতটুকু হিন্দু করিয়া লইতে পারে, দেশের ততটুকু হিন্দু ছিল—অবশিষ্ট সবই বৌদ্ধ। বৌদ্ধেরা পুতুল পূজা খুব করিত। সুতরাং মুসলমান আক্রমণের রোকটা বৌদ্ধদের উপরই পড়িয়া গেল। তাঁহারা বৌদ্ধদের বিহারগুলি সব ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এক ওদন্তপুরী বিহারেই দুই হাজার আসল ভিক্ষু বধ হইল। বিহারটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল; পাথরের মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা হইল; সোনা রূপা তামা পিতল কাঁসার মূর্ত্তিগুলি গালাইয়া ফেলা হইল; পুঁথিগুলি পোড়াইয়া দেওয়া হইল। বিক্রমশীল বিহারেরও এই দশাই হইয়াছিল। নালন্দা জগদ্দল প্রভৃতি বড় বড় বিহারের এই দশা হইল। ওদন্তপুরী বিহারের ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে—নালন্দা বিহারেরও ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমশীল ও জগদ্দলের এখনও কোন খোঁজ হয় নাই। আসল ভিক্ষু এই সময় হইতেই একরূপ লোপ হইয়াছে। যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়ায় চলিয়া গিয়াছিল, কতক বর্ম্মায় ও সিংহলে গিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গলায় বৌদ্ধদের বিদ্যাবুদ্ধি, পুঁথি-পাঁজির এই পর্য্যন্ত শেষ।

এক-একবার মনে হয় তিন চারি শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্ম্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকে শুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভরা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের সেই ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভূতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা ও তাহাই শিখান—এই-সকলের পরিণামে তাহাদিগকে বঙ্গদেশ চিরকালের জন্য ছাড়িতে হইল। দেশে রহিল—কারিগর পুরোহিত ও তাহাদেরই যজমান। লেখাপড়া বুদ্ধিবিদ্যার নামগন্ধ পর্য্যন্ত বৌদ্ধদের সঙ্গে লোপ পাইল।

(নারায়ণ, আশ্বিন) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* *
*

আইভরি।

পুরান হইলে অনেক সময়ে আইভরির রঙ্ পরিষ্কার নূতন আইভরির ন্যায় শুভ্র না থাকিয়া হলদে হইয়া যায়। আইভরির হলদে রঙ্ বিনষ্ট করিয়া শুভ্র করিবার উপায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথমে যে সোডা দিয়া কাপড় পরিষ্কার করে সেই সোডার দ্রাবণে আইভরির দ্রব্যটি সাবধানে এবং উত্তমরূপ পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে পুরান আইভরির গাত্রে যদি কোনও তৈলাক্ত পদার্থ লাগিয়া থাকে, তাহা অপসারিত হইয়া যায়।

দশ ভাগ লবণবিহীন জলে একভাগ নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত করা হয়। ব্রুস্ দিয়া আইভরির দ্রব্যটি সেই দ্রাবণে উত্তমরূপে মার্জ্জন করা হয়। পরে পরিষ্কার জলে বেশ করিয়া ধৌত করিয়া কাচের ঢাকার নিম্নে রৌদ্রে রাখিলে আইভরি সাদা হইয়া যায়।

আইভরি শুভ্র করিবার জন্য সেফিল্ডের কারিকরগণ হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ব্যবহার করে। প্রথমে উপরোক্ত উপায়ে সোডার দ্রাবণে আইভরির গাত্রস্থিত কোনও প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ বিনষ্ট করা হয় এবং আইভরির গাত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি পরিষ্কার হইয়া যায়। পরে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড লাগাইলে আইভরি পরিষ্কার শুভ্র আকার ধারণ করে।

পরিষ্কার চূণের জলে চব্বিশ ঘণ্টা ডুবাইয়া পরে ফট্‌কিরির জলে এক ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া লইলে এবং শুষ্ক বাতাসে শুকাইয়া লইলে আইভরি সাদা হইয়া যায়।

উপরে যে-সমস্ত উপায় প্রদত্ত হইল, উহাতে আইভরির রঙ্ শুভ্র হয় বটে, কিন্তু উজ্জ্বল হয় না। উজ্জ্বল করিতে হইলে পালিস করিবার প্রয়োজন।

হাড় হইতে যে চর্ব্বিময় দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ বাহির হয়, তাহা নষ্ট করিতে এবং আইভরি কিম্বা হাড়গুলির রঙ্ সাদা করিতে স্পিরিট অফ্ টারপেণ্টাইন ব্যবহার করিতে হয়। একটি কাচের পাত্রে টারপেণ্টাইনের মধ্যে হাড়গুলি রাখিয়া তিন দিন কিম্বা চারিদিন রৌদ্রে রাখিয়া দিতে হয়। রৌদ্রের অভাব হইলে আরও কিছু বেশী সময় রাখা হয়। হাড়গুলি রৌদ্রের প্রভাবে টারপেণ্টাইন হইতে অক্সিজেন গ্যাস টানিয়া লয় এবং একপ্রকার অম্ল পদার্থ তলায় জমিতে থাকে। এই অম্ল পদার্থ আইভরি কিম্বা হাড় নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। সেইজন্য আইভরি কিম্বা হাড়গুলি দস্তার পাতের উপর এমন ভাবে রাখা হয় যাহাতে কাচ পাত্রের তলা স্পর্শ না করে। পরে টারপেণ্টাইন হইতে হাড়গুলি বাহির করিয়া লইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিলে হাড়গুলি শুভ্র বর্ণ ধারণ করে।

(বিজ্ঞান, জুন) শ্রীসতীশচন্দ্র দে, বি-এস সি।

* *
*

ম্যালেরিয়া।

ম্যাল্ (Mal) অর্থে খারাপ ও এয়ার (air) অর্থে বায়ু। দুষ্ট বায়ুজনিত যে জ্বর তাহার নাম ম্যালেরিয়া জ্বর। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে দূষিত বায়ু ম্যালেরিয়ার কারণ নয়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরাঙ্গপুষ্ট জীবাণুগণ রস-রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া ঐ জ্বর উৎপাদন করে এবং এনোফিলিস্ নামক মশকজাতি মনুষ্য-শরীর দংশন করিলে সেই মশকের সহকারিতে ঐসকল জীবাণু রক্তস্থ হইয়া রক্তের লাল কণা-সকল ভক্ষণ করিয়া একপ্রকার বিষ উৎপাদন করে এবং সেই বিষ হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়।

সৃষ্টির আদি হইতেই ম্যালেরিয়া জ্বরের অস্তিত্ব আছে। প্রাচীন হিন্দু ও মিশরবাসীগণ এই জ্বরের কথা জানিতেন।

ম্যালেরিয়া জ্বরের ইতিহাস জানিতে গেলে অতি প্রয়োজনীয় তিনটি আবিষ্কারের কথা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ১মতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে সিন্‌কোনাবার্ক যে অদ্ভুত কার্য্যকারী এই একটি আবিষ্কার। ২য়তঃ ইংরেজী ১৮৮০ সালে লাভারন সাহেব আবিষ্কার করেন যে রক্তস্থ পরাঙ্গপুষ্ট জীবাণুগণই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির হেতু। ৩য়তঃ—তৎপরবর্ত্তী কালে রোনাল্‌ড রস্ আবিষ্কার করেন যে ঐ রক্তস্থিত পরাঙ্গপুষ্ট জীবাণুগণ মশক কর্ত্তৃক এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হয়।

আমেরিকা দেশের অন্তঃপাতী পেরু রাজ্য হইতে ইংরেজী ১৬৪০ অব্দে সিন্‌কোনা বার্ক প্রথমতঃ স্পেন্ দেশে আনীত হয়। তখন স্পেন দেশের রাজ্ঞীসমা মহামান্যা সিনকোনা লেডী ঐ বার্কের বিষয় ইউরোপে প্রচার করেন। তদবধি উহা তাঁহার নামানুসারে সিনকোনা নামে

অভিহিত। ইংরেজী ১৮২০ সালে ক্যাভেন্টান্ এবং পেলিটিয়ার নামক দুইজন প্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ ঐ সিন্‌কোনা হইতে উহার সার কুইনাইনের আবিষ্কার করেন। পরে ইংরেজী ১৮৪৫ অব্দ হইতে এদেশে কুইনাইনের ব্যবহার প্রচলন হইয়াছে।

ভারতে প্রতিবৎসর ৫০ লক্ষেরও অধিক লোক জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করে। এই সংখ্যার সিকিভাগের ম্যালেরিয়াই মৃত্যুর কারণ। প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে কষ্ট পায়।

সমগ্র ম্যালেরিয়া রোগীর ; ভাগই পল্লীগ্রামবাসী। ম্যালেরিয়ায় দেশবাসীর দেহের বল ও কর্ম্মশক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া এরূপ বিশেষ হানি করে যে তাহার তুলনায় ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর ক্ষতি অতি সামান্য। ম্যালেরিয়ায় ভারতবাসীর অগণ্য অর্থনষ্ট হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব-কালে সহস্র সহস্র ক্রোশব্যাপী ভূমি অকর্ষিত থাকা, উপার্জ্জন-ক্ষমতার হীনতা, সময়ের অপচয় এবং মৃত্যু প্রভৃতিতে সাতিশয় ক্ষতি ছাড়া ম্যালেরিয়ার জনগণের কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি আনয়ন করে। ম্যালেরিয়াই প্রাচীন রোমান রাজত্বের পতনের কারণ বলিয়া আরোপিত হইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের আনুষঙ্গিক কারণ।

আবহাওয়া—যে-সকল স্থানে গ্রীষ্মকালেও উত্তাপ ৬০ ডিগ্রীর কম থাকে সে স্থানসমূহে ম্যালেরিয়া হয় না। এনোফিলিস মশক বৃদ্ধির সুবিধা হয় বলিয়া, বৃষ্টিপাতে ম্যালেরিয়া বিস্তারের সহায়তা হইয়া থাকে। উত্তপ্ত ও আর্দ্র বর্ষাকালে এবং তৎপরবর্ত্তী সময়েই ম্যালেরিয়ার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

অনুকূল স্থান—ভূমির উপর জল জমিয়া থাকিলে ম্যালেরিয়া বিস্তৃতির সুবিধা হইয়া থাকে।

বয়স—ম্যালেরিয়া সকল বয়সের লোককেই আক্রমণ করে কিন্তু ১০ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুরাই অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। অতি বৃদ্ধ এবং অতি শিশুরা (৬ মাসের ন্যূনবয়স্ক) সংক্রামিত স্থানেও কদাচিৎ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। অধিক সময়ে অনাবৃত থাকায় মশক দংশনে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেই ম্যালেরিয়ার দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়।

জাতি—ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জেলায় বয়স্ক দেশীয়গণ অপেক্ষা ইউরোপীয়গণই ম্যালেরিয়ায় অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

পেশা—ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে যাহারা রেললাইন বা রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য জমি খনন-কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং যাহারা এই-সকল খনিত ভূমির নিকট বাস করে, মশকের জন্মস্থানের মধ্যে থাকাতে তাহারাই ম্যালেরিয়ায় অধিক আক্রান্ত হয়।

শারীরিক অবস্থা—সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা ও অবসাদেই ম্যালেরিয়া-বীজাণুর শক্তি বৃদ্ধি হইয়া রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে, এই কারণে অধিক দিন ধরিয়া কুইনাইন ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত।

দরিদ্রতা—আহারের অল্পতা এবং পুষ্টির অভাব দ্বারা শরীরের রোগপ্রতিষেধ-শক্তি কমিয়া যাওয়াই ম্যালেরিয়া আক্রমণের কারণ।

দরিদ্রতার সহিত ম্যালেরিয়ার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

অস্বাস্থ্যকর অবস্থা—ও অপরিচ্ছন্নতার দ্বারা ম্যালেরিয়া বিস্তৃতির সহায়তা হইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়ার পূর্ব্বাক্রমণ—পূর্ব্বে একবার ম্যালেরিয়া হইয়া থাকিলে, অল্পকারণেই পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। সামান্য সর্দ্দি, অজীর্ণতা, অধিক পরিশ্রম, ঠাণ্ডা জলে স্নান—এমন কি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও ফাঁক স্থানে গমন করিলেও রোগের আক্রমণ হইতে পারে।

সময়—দিবস অপেক্ষা রাত্রিকালেই ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

ম্যালেরিয়া সংক্রমণের কারণ (১) এনোফিলিস মশক (২) স্থানীয় বা অন্য স্থান হইতে আগত নবাক্রান্ত বা পুরাতন ম্যালেরিয়া-রোগী (৩) আবহাওয়া, আর্দ্রতা, উত্তাপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থার সাহায্যে ও মশকদ্বারা রোগ সংক্রমণের এবং ম্যালেরিয়া-বীজাণু বৃদ্ধির সহায়তা (৪) মশকের ও দংশিত ব্যক্তির রোগ সঞ্চারণ-ক্ষমতার বর্ত্তমানতা।

ম্যালেরিয়ার নিদান।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু। প্রাণী-দেহ চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টি মাত্র। এমন অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী আছে যাহাদের দেহে কেবলমাত্র একটি কোষ আছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে ইহাদিগকে দেখা যায় না। ম্যালেরিয়া-জীবাণু এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষে নানা প্রকারের ম্যালেরিয়া-জীবাণু দেখা যায়। এক এক প্রকারের জীবাণু এক এক ধরণের জ্বরের কারণ। একবার রক্তস্রোতের ভিতর প্রবেশ করিলে ম্যালেরিয়া-জীবাণু অতি সত্বর বংশবৃদ্ধি করে। ম্যালেরিয়ার জীবাণু দুই প্রকারে বংশ বৃদ্ধি করে—জীবাণুগণের স্ত্রীপুরুষ-সহযোগে যে বংশ বৃদ্ধি তাহাকে সেকস্যুয়াল (sexual) মিথুনীকৃত, ও আপনাপনি বিভক্ত হইয়া তাহাদের যে বংশবৃদ্ধি তাহাকে এসেকস্যুয়াল (Asexual) বা অমিথুনীকৃত বংশবৃদ্ধি বলে। সেই জন্য ম্যালেরিয়া-জীবাণুর জীবনাবর্ত্তও (Life cycle) দুই প্রকারের। মানুষের রক্তের ভিতর ম্যালেরিয়া-জীবাণু এসেকস্যুয়াল্ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে এবং মশকের দেহের ভিতর সেকস্যুয়াল্ উপায়ে বংশ বৃদ্ধি করে।

এই জীবনাবর্ত্ত সমাপন হইতে জীবাণু ভেদে ৪৮ ঘণ্টা বা ৭২ ঘণ্টা লাগে। এই জীবনাবর্ত্তন সমাপ্ত হইয়া যখন নূতন জীবাণু রক্তকণিকার ভিতর প্রবেশ করে ও বিষ (Toxin) উৎপাদন করে তখনই পুনরায় জ্বর আসে।

একটি মশকের শরীরে এই উপায়ে ৫০ লক্ষ জীবাণু-শাবক থাকিতে দেখা গিয়াছে। এনোফিলিস্ মশকের ভিতর ম্যালেরিয়া-জীবাণুর সেকস্যুয়াল জীবন-আবর্ত্ত সমাপ্ত হইতে ছয় হইতে দশ দিন লাগে। এনোফিলিস্ মশক যদি এক্ষণে কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে তাহা হইলে তাহার লালার সহিত ম্যালেরিয়া-জীবাণু শরীরের ভিতর প্রবেশ করে ও এসেকস্যুয়াল উপায়ে পুনরায় বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। কিন্তু যদি কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে এনোফিলিস্ দংশন করে তাহা হইলে রোগীর জ্বরের পুনরাক্রমণের সময় পরিবর্ত্তিত হয়। যে রোগীর শরীরে তৃতীয়ক জ্বরের জীবাণু আছে (অর্থাৎ যাহার একদিন অন্তর জ্বর আসে বা যাহার শরীরস্থ জীবাণুর জীবন-আবর্ত্ত সমাপ্ত হইতে ৪৮ ঘণ্টা লাগে) এমন রোগীর শরীরে যদি পুনরায় তৃতীয়ক জ্বরের জীবাণু প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহার একদিন অন্তর জ্বর না আসিয়া প্রত্যহ জ্বর আসিতে পারে।

রোগের প্রথমাবস্থা হইতে কুইনাইন দেওয়া হইলে এই জীবাণু জন্মিতে পারে না।

ম্যালেরিয়া-জীবাণুর প্রকার ভেদ :—ভারতবর্ষে সাধারণতঃ তিন প্রকারের ম্যালেরিয়া-জীবাণু দেখা যায়। (১) কোয়ার্টান জীবাণু :—এই জীবাণুর জীবনাবর্ত্ত ৭২ ঘণ্টা ব্যাপিয়া। সেই জন্য কোয়ার্টান জীবাণুতে আক্রান্ত ব্যক্তির ৭২ ঘণ্টা অন্তর বা প্রতি চতুর্থ দিনে জ্বরের পুনরাক্রমণ হয়। এই জীবাণুর দুই বা তিন বংশ যদি একত্রে বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে তাহা হইলে ৭২ ঘণ্টা অন্তর জ্বর না আসিয়া প্রত্যহ একবার জ্বর আসে। চতুর্থ দিনের জ্বর প্রথম দিনের জ্বরের ন্যায় ও

টোলের অধ্যাপক।
চিত্রকর শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে মুদ্রিত।

পঞ্চম দিনের জ্বর দ্বিতীয় দিনের জ্বরের ন্যায় দেখা যায়। (২) সাধারণ টার্টিয়ান্ জীবাণু:—এই জীবাণুর জন্য ৪৮ ঘণ্টা অন্তর জ্বরের বেগ আসে। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর জীবাণু-জনিত জ্বরের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। (৩) বিষম টার্টিয়ান জীবাণু:—এই শ্রেণীর জীবাণুর জীবনচক্র ৪৮ ঘণ্টাতেই সমাপ্ত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ দুই তিন বংশ একত্রে বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে সেই জন্য প্রত্যহ বা অনির্দ্দিষ্ট ভাবে জ্বর আসিয়া থাকে।

এই জ্বরের অপ্রকট অবস্থা বা ক্রমবিকাশের সময় ছয়দিন হইতে বিশদিন পর্য্যন্ত।

ম্যালেরিয়া-বিষ মনুষ্য-দেহে প্রবেশ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিলে রোগের অবস্থা নানা প্রকারে প্রকাশ পায়। ১। ইণ্টারমিটেণ্ট বা সবিরাম জ্বর (কয়েক প্রকারের)। (Intermittent fever.) ২। রেমিটেণ্ট বা অবিরাম জ্বর (Continued fever.) ৩। সাংঘাতিক বা প্রাণঘাতী জ্বর (Pernicious or malignant fever.) ৪। পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর—ম্যালেরিয়া ক্যাকেক্সিয়া (Malaria Cachexia.) ৫। অপরিস্ফুট ম্যালেরিয়া—(Larval fever.)

১। ইণ্টারমিটেণ্ট বা সবিরাম জ্বর।

নানা রকমের। প্রতিদিন একবার, প্রতিদিন দিনে একবার এবং রাত্রে একবার, একদিন অন্তর অর্থাৎ তৃতীয় দিনে, দুই দিন অন্তর অর্থাৎ প্রতি চতুর্থদিনে, ৫ দিন অন্তর, ৬ দিন অন্তর, ৭ দিন অন্তর এবং ৮ দিন অন্তরও জ্বর হইতে দেখা যায়। জীবাণুগণের জীবনচক্রের ভিন্নতা অনুসারে জ্বরের আক্রমণের কালেরও ভিন্নতা হয়। কুইনাইন সেবনেও যদি সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বর নিয়মমত আসিতে থাকে তখন বুঝিতে হইবে যে ইহা ম্যালেরিয়ার সবিরাম জ্বর নয়।

২। রেমিটেণ্ট বা অবিরাম জ্বর।

(ক) সাধারণ রেমিটেণ্ট জ্বর—এই জ্বর কুইনাইন-সেবনে আরোগ্য হইয়া থাকে। যদি কুইনাইন যথেষ্ট পরিমাণ না প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে এই জ্বর প্রাত্যহিকে পরিণত হইয়া থাকে।

(খ) পৈত্তিক রেমিটেণ্ট জ্বর—অন্ত্রের ও পিত্তের বিকৃত অবস্থা জন্য।

(গ) টাইফো-ম্যালেরিয়াল জ্বর—ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েড জ্বরের বিষ উভয়ে মনুষ্যদেহকে আক্রমণ করিলে এই জ্বর হইয়া থাকে।

বিষম টার্টিয়ান জীবাণুর দুই তিন পর্য্যায় একত্র বংশ বৃদ্ধি করিলে প্রত্যহ অনির্দ্দিষ্টভাবে জ্বর হইয়া থাকে। এই জ্বর অবিরাম বা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়। নানা প্রকারের জীবাণুর আক্রমণেও এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক প্রকারের জীবাণু আপন আপন বংশবৃদ্ধির সময় জ্বর উৎপাদন করে, সুতরাং একটি জ্বরবেগ বিরাম হইবার পূর্ব্বেই আবার অন্য জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হওয়ায় জ্বরও অবিরাম অবস্থায় থাকিয়া যায়। ইহাই অবিরাম জ্বরের কারণ।

অবিরাম জ্বর ম্যালেরিয়া রোগ ভিন্ন নানা রোগে দেখা যায়।

৩। সাংঘাতিক বা প্রাণঘাতী ম্যালেরিয়া জ্বর।

ম্যালেরিয়া জ্বর যখন রোগীর দেহমধ্যে এরূপ বিষম বিপর্য্যয় ঘটায় যে, রোগী অল্পদিন মধ্যে—এমন কি, সুচিকিৎসা না হইলে, কয়েক ঘণ্টা মধ্যেই—মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, তখন তাহাকে আমরা প্রাণঘাতী ম্যালেরিয়া বলিয়া থাকি।

মেদ মজ্জা প্রভৃতি নানা আভ্যন্তরিক যন্ত্রকে অথবা নাড়ীচক্রকে ম্যালেরিয়া-জীবাণু আক্রমণ করাতে রোগ প্রাণঘাতী হইয়া থাকে। জনসংহারকারী রোগ-সকলের মধ্যে প্রাণঘাতী ম্যালেরিয়া অন্যতম। যে স্থান পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া-শূন্য ছিল এবং যে স্থলে ম্যালেরিয়ার নূতন আবির্ভাব হয়, তথায় এই প্রাণঘাতী রোগ বিস্তর লোককে শমন-সদনে প্রেরণ করে; সুস্থ এবং সবলকায় যুবক ও যুবতীরাই অধিক সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহারা নিয়তই অনাহারী বা অল্পাহারী—আহারের সম্বন্ধে যাহাদের কোন দৃষ্টি নাই—যাহারা ব্যভিচারী ও অহিতাচারী—তাহাদের পক্ষে ম্যালেরিয়া বিপজ্জনক আকার ধারণ করে।

যে যে অবস্থায় প্রাণঘাতী ম্যালেরিয়া ঘটিয়া থাকে।

১। যে-সকল লোক পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইতেছে এবং যাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসা হইতেছে না ও যাহারা কুইনাইন-সেবনে অবহেলা করিয়াছে।

২। যাহারা রৌদ্রাভ্যস্ত না হইয়া অধিককাল যাবৎ রৌদ্রের উত্তাপে পরিশ্রম করে।

৩। যে-সকল লোকের শরীরে আদৌ ম্যালেরিয়াবিষ প্রবেশ করে নাই তাহাদের শরীরে ম্যালেরিয়ারোধক ক্ষমতা আদৌ থাকে না। কেননা, তাহাদের রক্তের শ্বেতকণিকাসকল ম্যালেরিয়া-জীবাণুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অভ্যস্ত না থাকাতে জীবাণুর হঠাৎ আক্রমণ তাহারা ব্যর্থ করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং ইহাদের মধ্যে জীবাণুর সংখ্যা-বৃদ্ধি ও বিষ-উৎপাদন অতি দ্রুতভাবে হইয়া থাকে ও প্রাণঘাতী লক্ষণ-সকল হঠাৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুস্থ ও সবল লোকদিগের মধ্যে হঠাৎ এইরূপে ম্যালেরিয়া প্রাণঘাতী হইয়া থাকে। এইজন্য ম্যালেরিয়ার দেশে আগন্তুক লোকদিগের মধ্যে এই প্রাণঘাতী রোগ অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

৪। যাহারা প্রায়ই পেটের রোগে অর্থাৎ তরল দাস্ত আমাশয় ইত্যাদিতে আক্রান্ত হন এবং যাহাদের শরীর ওজোধাতুবর্জ্জিত তাহাদেরও এই ভীষণ রোগ আক্রমণ করে।

ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণ ও পুনঃসংক্রমণ।

দুইটি কারণ বশতঃ ১৫ দিন বা ১ মাস অন্তর পালা-জ্বর আসিতে পারে—(১) পূর্ব্বেকার জীবাণু প্রবল হইয়া বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে—(২) মশকদংশনদ্বারা শরীরে নূতন জীবাণু প্রবেশ করে। পূর্ব্বেকার জীবাণুর জন্য যদি জ্বর হয় তাহা হইলে আমরা তাহাকে পুনরাক্রমণ (Relapse) বলি, আর পুনরায় নূতন জীবাণু প্রবেশ করিয়া যদি জ্বর আনয়ন করে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে পুনঃসংক্রমণ (Reinfection) বলিয়া থাকি।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।

ম্যালেরিয়া প্রতিষেধের সাধারণ কথা—মশকের ধ্বংসবিধানই এই রোগনিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে মশারি-ব্যবহারের সঙ্গেও প্রতিষেধক মাত্রায় কুইনাইন্ সেবন করা অনেকটা নিরাপদ। যাহারা মশক-নিবারণ ও কুইনাইন্-সেবন দুইই করে তাহাদের মধ্যে শতকরা ১.৭৫ জন আক্রান্ত হয়, যাহারা কেবল মশক নিবারণ করে তাহাদের শতকরা ২.৫ জন আক্রান্ত হয়; যাহারা কেবল কুইনাইন্ সেবন করে তাহাদের শতকরা ২০ জন আক্রান্ত হয়, এবং যাহারা কিছুই করে না তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন আক্রান্ত হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্যজনক নিয়মাদি প্রতিপালন করাও ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক। পুষ্টিকর এবং আরোগ্যজনক খাদ্য-সেবন, উত্তম গৃহে বাস, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান, নির্ম্মল বায়ু সেবন প্রভৃতি দ্বারা আত্মশক্তির বৃদ্ধি হইলেও ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেহের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। সুতরাং

উহারাও ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক। জ্বরের বেগ আসিবার সময় পর্য্যন্ত যদি উপবাস করা যায় তাহা হইলে কুইনাইনের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফল হয়। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে ম্যালেরিয়া জ্বরের পরাঙ্গপুষ্ট জীবাণুগণ উপবাসে নষ্ট হয়, বিশ্রামেরও জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং জ্বরে উপবাস ও বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজনীয়। খালি পেটে ঔষধ খাওয়ার উপকারিতা অধিক।

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা।

সকল রোগই ভোগকাল শেষ হইলেই আরোগ্য হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়াও সেইরূপ আপনা-আপনি আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া-জীবাণু রক্তের লালকণিকাকে আক্রমণ করিলে শ্বেতকণিকাগুলি সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং ম্যালেরিয়া-জীবাণুকে ধ্বংস করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এই চেষ্টাতেই ম্যালেরিয়া জ্বর স্বাভাবিক উপায়ে বিনা ঔষধে অর্থাৎ কুইনাইন ব্যবহার ব্যতীত আরোগ্য হয়।

জ্বরে আমাদের দেশে লঙ্ঘনের প্রথা আছে। উপবাস করিলে ম্যালেরিয়া-জীবাণু নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং শ্বেতকণিকাগুলি শীঘ্রই তাহাদিগকে বিনাশ করে। এইরূপে বিনা ঔষধে কেবল উপবাসদ্বারা সাধারণ ম্যালেরিয়া আরোগ্য হয়। প্রত্যেকবার জ্বরের আক্রমণে বহুসংখ্যক রক্তকণিকা ধ্বংস হইয়া থাকে। এইজন্য কেবল উপবাস-দ্বারা আরোগ্য হইতে চেষ্টা না করিয়া, প্রথম হইতেই কুইনাইন সেবন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, শ্রাবণ)

ত্যাগ

(গল্প)

জীবনে লোকের কতই না বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয় —কত বিপদের গ্রাস হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হয়—কত কঠোর পরিশ্রম সহ্য করিতে হয়—তবে ত লোকে বড় হয়। কিন্তু বাধা অনেক আছে—বিপদও অনেক আছে—পরিশ্রমও অনেকেই করে—উপেনের ভাগ্যে যে এমন ছিল তাহা সে বেচারা পূর্ব্বে জানিত না। বিপদ-বাধা নানা মূর্ত্তি ধরিয়া লোকের কাছে দেখা দেয়—উপেনের কাছে সে বিবাহের রোশনচৌকী বাজাইয়া আলোকের ঘটা করিয়া চেলীর ঘোমটা টানিয়া বধূর রূপ ধরিয়া আসিল। যে রজনী হইতে অশিক্ষিতা গ্রাম্যবালিকা অমলার সহিত উপেনের বিবাহসূত্র গ্রথিত হইল—সে রজনী হইতে—সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার জীবনের সব আশা সব উদ্যম কোথায় দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল। সে দেখিল একটা বালিকা তাহার অবগুণ্ঠনাবৃত মুখ ব্যাদান করিয়া তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে। জীবন-প্রভাতে ভগবানের এ শাস্তি উপেনের বড়ই কঠোর বলিয়া বোধ হইল। অমলার দোষ কিছুই ছিল না। দোষ তাহার ভাগ্যের। রূপ ত যথেষ্টই ছিল, গুণ ছিল কি না সে পরিচয় কেহ চাহিল না। যাহা হউক—রূপ গুণ থাকুক আর নাই থাকুক—অমলা তাহার জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা স্বামীর সকল কার্য্যে একটা বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সে কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না—শুধু উপেন নিজের দুর্দ্দশা ভাবিয়া মর্ম্মাহত হইয়া গেল।

(২)

উপেন যখন প্রথম কলিকাতায় আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হয় সে আজ অনেক দিনের কথা। উপেনের পিতা নিজ গ্রামেই থাকিতেন—পড়াশুনার সুবিধার জন্য উপেনকে তিনি কলিকাতায় পাঠাইলেন।

পাঠ্যাবস্থায় নানা রকমের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া বিশাল কলিকাতা সহরের নিত্য নূতন কাণ্ডকারখানা দেখিয়া দেশবিদেশের কাহিনী পাঠ করিয়া উপেন তাহার নবলব্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডারকে বেশ করিয়া একটা সামঞ্জস্যে আনিতে পারে নাই। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যখন সে পড়িত কত দরিদ্র অসহায় অনাথ লোক তাহাদের ধৈর্য্য ও মনের জোরে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া তাহাদের অমরকীর্ত্তি-গাথা দেশবিদেশে প্রচারিত করিয়া গিয়াছে—কত দীনা সামান্যা নারী সমগ্রদেশের পূজ্যাস্থানীয়া হইয়াছে—কত পিতৃমাতৃহীন শিশু পথের ধূলায় মানুষ হইয়া শেষে স্বোপার্জ্জিত যশোমহিমায় নিজেকে ও সমস্ত জগৎকে ধন্য করিয়াছে—তখন বাস্তবিকই উপেন তাহার মনটাকে সেই-সকলের মধ্যে একেবারে হারাইয়া ফেলিত। পড়িতে পড়িতে তাহার মনে হইত সে যেন চোখের সম্মুখে সেই অতীতের কাহিনীগুলার পুনরাবর্ত্তন দেখিতে পাইতেছে। শুধু তাহাই নহে—সে যতই নূতন জ্ঞান পাইতে লাগিল ততই যেন তাহার হৃদয়ে সেগুলার প্রতি একটা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ আসিয়া পড়িতে লাগিল।

উপেন মেসে থাকিত বটে কিন্তু সে কাহারও সহিত মিশিত না—কলেজ হইতে আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ

করিত, কোনও কারণে কেহ তাহাকে বাহির করিতে পারিত না। ঘরে বসিয়া সে খানিক পড়িত, খানিক ভাবিত। পড়িয়া পড়িয়া ভাবিয়া ভাবিয়া উপেন একটা অসাধারণ লোকের মত সেই মেসে বাস করিত। সকলে তাহাকে Sentimental বলিয়া বিদ্রূপ করিত; সে তাহাদের কথাতে কর্ণপাতও করিত না।

অবশেষে ভাবিয়া ভাবিয়া উপেন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। সে পুরাতন মহাবাক্য "What man has done man can do" বারংবার স্মরণ করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল "আমিও ত একটা মানুষ—আমার জীবনটা সামান্য অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে কেন নষ্ট করিব? আমি সমগ্র দেশের মধ্যে জগতের মধ্যে কেন না এমন কিছু করিতে সক্ষম হইব যাহাতে বংশপরম্পরায় আমার দৃষ্টান্ত সকলের পক্ষে একটা দুর্ল্লভ দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে!" একদিন সন্ধ্যায় সে মেসের ছাদে বসিয়া ঊর্দ্ধে নীলাকাশ—চতুষ্পার্শ্বে অট্টালিকাশ্রেণী—নিম্নে পুণ্যবঙ্গভূমি—সকলকে সাক্ষী রাখিয়া এই সর্ত্তে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল।

উপেনের এরূপ মহৎ উদ্দেশ্য খুবই ভাল ছিল। কিন্তু কে তাহার কানে কানে বলিয়া গেল "বাপু সাবধান! বিবাহ এ-সকল কার্য্যে একমাত্র বাধা—বিবাহ করিও না।"

সব গোল বাধিল এইখানে। কথাটা সে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল—যতদিন না সে একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবে, যতদিন না সে তাহার উচ্চ আদর্শলাভের পথে যথেষ্ট অগ্রসর হইবে, যতদিন না প্রকৃত সহধর্ম্মিণী পাইবে, ততদিন সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। না কিছুতেই নহে। 'সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন—উপাড়ি পাড়িব নভো নক্ষত্রমণ্ডল।'

কিন্তু হায়! প্রতিজ্ঞা তাহার থাকিল না—বিএ পাশ করিয়া যেবার সে মেডিকেল কলেজে ঢুকিল সেই বারই তাহার পিতা তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। এই নূতন ঘটনার খরস্রোতের মাঝে পড়িয়া গতিস্থির করিবার পূর্ব্বেই সে দেখিল ইতিমধ্যে কখন সে বিবাহের ঘূর্ণিপাকের ভিতর পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। সে যাত্রা সে আর সামলাইতে পারিল না। স্রোতের মাঝে যদিও কোনও গতিকে নিজেকে ভাসাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত—কিন্তু তাহার গলায় একটা প্রকাণ্ড পাথর বাঁধা—পাথর অমলা। মগ্নপ্রায় উপেন প্রাণপণে পাথরটা ছুড়িয়া ফেলিল।

(৩)

অনেক দিন অতীত হইয়া গিয়াছে—উপেন তাহার জন্মের সুখময় স্মৃতি, যৌবনের উচ্চ আশা, সমস্তই দুর্ভেদ্য রহস্যের অন্ধকারের ভিতর হারাইয়া ফেলিয়াছে। এরূপ অবস্থায় যাহা সচরাচর ঘটে এক্ষেত্রে তাহাই হইল। উপেনের বিবাহ হইয়াছে প্রায় ছয় বৎসর—এই দীর্ঘ ছয় বৎসরের ভিতর তাহার স্ত্রীর সহিত দেখা করা দূরে থাকুক এপর্য্যন্ত তাহাকে একখানা পত্রও লেখে নাই। সে বাড়ীতে বড় যাইত না—পিতা যাইতে লিখিলে অবকাশের অভাব ইত্যাদি নানা ওজর আপত্তি দেখাইত; যদিও কখনও বাটী যাইত—যখন যাইত তাহার পূর্ব্বে অমলাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিত।

উপেন সবই ক্ষমা করিতে পারিত, না হয় একটা ভুল হইয়াছে কি হইবে, কিন্তু যখন সে ভাবিত যে জীবনের প্রথমে যে একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে স্থির করিয়াছিল তাহাই যদি সে রাখিতে পারিল না, তবে ভবিষ্যতে কোন্ ভরসায় সে কার্য্যে সফল হইবার আশা করে। সে যতই ভাবিত ততই যেন অমলার প্রতি, পরোক্ষে পিতার প্রতি, তাহার ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিত। সে হৃদয় হইতে মায়ামমতা সব এক একে বিসর্জ্জন দিয়া অচল অটল হইয়া বসিয়া রহিল।

উপেনের বন্ধুবান্ধব বিশেষ ছিল না। সন্তোষ তাহার সহপাঠী, যদি কিছু সে কাহাকেও বলিত, তবে তাহাকেই বলিত। তাহার বিবাহ হইয়াছে একথা সন্তোষ জানিত; অথচ সে বাটী যায় না, আজ পর্য্যন্ত তাহার স্ত্রীর একখানাও পত্র সে দেখে নাই, এ-সব ব্যাপার তাহার নববিবাহিত জীবনে যে খুবই রহস্যময় তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিত।

একদিন উপেন কলেজ হইতে আসিয়া তাহার ঘরে নিত্যকার মত ঘোর চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, এমন সময় সন্তোষ প্রবেশ করিল। উপেন তাহাকে লক্ষ্যই করে নাই। অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সে তাহার পিছনে

গিয়া দাঁড়াইল, উপেনের হাবভাব দেখিয়া সে মনে করিল "কি এ! মনোবিকারের পূর্ব্বলক্ষণ নয় ত?"

ধীরে ধীরে ডাকিল "উপেন।"

সুপ্তোত্থিতের মত চমকিয়া উপেন উত্তর দিল—"কেও! সন্তোষ! এস, বস।"

নানা কথার পর সন্তোষ উপেনের পক্ষে একটা ঘোর অপ্রীতিকর কথা পাড়িয়া ফেলিল। বলিল "উপেন, আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—বলবে?"

উপেন বলিল—"কি কথা আগে না শুনে বলব কি না কি করে বলি।"

সন্তোষ হাসিয়া বলিল—"আরে আমি ত আর তোমাকে কোন অবক্তব্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব না—তবে কথাটা তোমার নিজেরই সম্বন্ধে।"

"আমার সম্বন্ধে?"

"হাঁ তোমারই কথা। এই দেখ ভাই প্রায় ছ বছর হল আমরা একসঙ্গে বাস করছি—এক কলেজে পড়ছি—কিন্তু এই ছ বছরের ভিতর তোমার মনোভাব কিছুই বুঝতে পারলুম না—তোমার হাবভাব, তোমার কার্য্যকলাপ আমার কাছে যেন একটা ঘোর প্রহেলিকাচ্ছন্ন বলে বোধ হয়।"

উপেন বলিল—"কই কি এমন তুমি দেখলে? আমি ত অতি সাধারণ মানুষ।"

সন্তোষ বলিল—"আচ্ছা তোমার বিয়ে হয়েছে—বাপ মা বাড়ীতে রয়েছেন—তবুও তুমি বাড়ী যাওনা কেন বলতে পার?"

উপেন যেন চমকিয়া উঠিল—সে চুপ করিয়া রহিল।

সন্তোষ বলিল "চুপ করে রইলে যে?"

উপেন নীরব। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল "আছে বৈকি কিছু কারণ।"

সন্তোষ বলিল "সেইটাই ত শুনতে চাই।"

উপেন কিছুতেই তাহার মর্ম্মকথা কাহাকেও জানাইতে রাজী হইত না, তবে আজ সন্তোষ কিছুতেই যখন ছাড়িল না তখন অগত্যা সে তাহার জীবনের আমূল বিবরণ তাহাকে বলিল।

কথাটা উপেনের কাছে যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন সন্তোষ সেটাকে অতি সাধারণ রকমের বলিয়া ধরিয়া লইল। তাহার কথা শুনিয়া সে নিজে একটু বিরক্তও হইল, বলিল —"এই কথা! সেই বঙ্গবীরের দাম্পত্যজীবনের চিরবিখ্যাত ইতিহাস। খুব বাহাদুর তুমি। বাড়ী যাও বাপু বাড়ী যাও। সব কাজই বাড়ী থেকে আরম্ভ করতে হয়। এ রকম ফাঁকি দিয়ে দায়িত্বশূন্য হয়ে অনেকেই বড় হতে পারে, কিন্তু সংসারের মধ্যে থেকে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে, সেখানকার সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করে, সমস্ত আপদবিপদের অংশ গ্রহণ করে, যে বড় হতে পারে, সেই যথার্থ বড়। বড় কে? যে বনে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়, না যে সংসারে থেকে দশ জনকে খেতে পরতে দিয়ে মানুষ করে? বড় কে? যে মেসে বসে ঘোর চিন্তায় দিনগুলা কাটিয়ে তার নিরপরাধ পত্নীর জীবনের সমস্ত সুখ কেড়ে নেয়, না যে নিজের স্ত্রীপুত্রকে সুখী করে পিতামাতাকে সুখী করে দেশের উপকার করে? ও সব পাগলামি ছেড়ে দাও।"

আর সহ্য হয় না—সন্তোষের কথাগুলা উপেনের কানে বিষের মত লাগিতেছিল। সে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল—"বাস্। আমি তোমার লেক্‌চার শুনতে চাই না। লেকচার শোনবার আমার কোনও আবশ্যক হয়নি। আশা করি আমার সম্বন্ধে তোমরা ভবিষ্যতে আর কখনও কোন আলোচনা করবে না।" তাহার উচ্চ আদর্শের মর্ম্ম—তাহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কথা—সন্তোষ কি বুঝিবে?

সন্তোষ হাসিয়া উঠিল, বলিল "আচ্ছা সে দেখা যাবে।"

এদিনকার ঘটনার ফল হইল, এই যে সেদিন সন্তোষ যাহা যাহা শুনিয়াছিল তাহা মেসের প্রত্যেকের কাছে সালঙ্কারে ফাঁস করিয়া দিল। হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ—উপেনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। উপায় না পাইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া উপেন একদিন সকলের অনুপস্থিতিতে মেস পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল।

(৬)

দীর্ঘ ছয়বৎসর কালের অতীত গহ্বরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অমলা এই দীর্ঘ ছয় বৎসর তাহার বুকে পাষাণ বাঁধিয়া কাটাইয়াছে।

সে অশিক্ষিতা সামান্যা গ্রাম্য-বালিকা—তাহার ক্ষুদ্র

হৃদয়ে ভবিষ্যতের যে-একটা অস্পষ্ট চিত্র স্বপ্নের মত তাহার জীবনপ্রভাতে ঈষৎ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, হতাশার কঠোর হস্ত তাহা ধীরে ধীরে মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যৎজীবনের একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কখনও তাহার মনে স্থান পায় নাই—সামান্যা বালিকা বধূ সে, তাহার মনে উচ্চ আশা কিছুই ছিল না। যন্ত্রচালিতের মত শ্বশুরশাশুড়ীর আদেশ পালন করিয়াই সে তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার সফলতা পাইত। বৈদেশিক ইতিহাসে বীরাঙ্গণার কীর্ত্তি কখনও সে পড়ে নাই, সে আদর্শের দিকে তাহার মন কখনও ধাবমান হয় নাই। পিতৃগৃহে পিতা-মাতাকে ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ীতে শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেখিয়া তাঁহাদিগকেই তাহার একমাত্র আদর্শ মনে করিত। সুখ-দুঃখের একটা নিখুঁত ছবি কখনও তাহার মনে আসে নাই। সে কোন কাজেই অতিশয় দুঃখিত হইত না—আনন্দাতিশয্যেও কখন বিকল হইয়া পড়িত না।

স্বামীর সম্বন্ধে তাই বলিয়া সে যে ভাবিত না এমন নহে। এ পর্য্যন্ত সে স্বামীর সহিত কখনও কথা কহে নাই—স্নেহ ভালবাসা পাওয়া দূরে থাকুক, দুইটা মিষ্টকথা পর্য্যন্ত শুনে নাই—কাজেই সে দাম্পত্যজীবনের চিত্রটা সেই রকম ভাবেই আঁকিয়া রাখিয়াছিল। স্বামীসন্দর্শন হয় না বলিয়া যখনই তাহার মনে কষ্ট হইত তখনই সে মনে করিত "পাঠের জন্তই তিনি ত আসিতে পারেন না—তা আর কি হইবে?" যাহাকে সকলে স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার বলে সে সেগুলাকে আবশ্যকীয় বলিয়া ধরিয়া লইত। সরল হৃদয় বলিয়া বোধ হয় সে এত সহ্য করিতে পারিত, যদি কখনও ঘুণাক্ষরে সে তাহার নির্দ্দয় স্বামীর মনোভাব জানিতে পারিত তাহা হইলে তাহার কোমল হৃদয় এতদিনে নিষ্পেষিত হইয়া যাইত কি না কে জানে?

(৫)

উপেন এখন নূতন মেসে থাকে। এ মেসে আসিয়া পর্য্যন্ত সে পিতাকে কোনও সংবাদ দেয় নাই। তাহার কারণ এই যে এইবার যা হয় একটা করিবে—এই ব্যাপার-টাকে সে আর তাহার জীবনের কণ্টক করিয়া রাখিবে না। স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারযাত্রা প্রতিপালন করা তাহার দ্বারা হইবে না, সে ত পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছে। আপাতত সে তাহার কর্ত্তব্য দেখিল—যদি সে পাপের বোঝা ঘাড় হইতে নামাইতে চায় তবে তাহাকে দেশ ছাড়িতে হইবে। ভাবিয়া সে স্থির করিল কোন একটা সুবিধা পাইলেই বিদেশে চলিয়া যাইবে—সেখানে যাইয়া মানুষের মত জীবন যাপন করিবে। দেশে ফিরিবার মত যদি সে তাহার অবস্থা উন্নত করিতে পারে তবে ফিরিবে, নচেৎ নহে। তাহার মত সামান্য লোক ত প্রতিবৎসর ম্যালেরিয়ায় লক্ষ লক্ষ মরিতেছে—ম্যালেরিয়ায় মরিয়া কি হইবে? তাহা অপেক্ষা যেখানে মানুষ মানুষের মত মরিতে জানে—সেইখানে গিয়া মরাই ভাল। এ প্রস্তাব পিতার কর্ণগোচর করিলে হয় ত নানা অসুবিধা ঘটিবে—কাজ নাই সে-সব ঝঞ্ঝাটে। যথাসময়ে সংবাদ দিবে স্থির করিল।

(৬)

জীবনে কষ্ট কাহাকে বলে তাহাই অমলাকে জানাই-বার জন্য সেবার তাহার শ্বশুর পীড়িত হইলেন। বহুদিন হইতেই তাঁহার কাসির অসুখ ছিল, সম্প্রতি সেটা খুব বাড়া-বাড়ি রকমের হইয়াছে। তাঁহার জীবনব্যাপী এই রোগের জন্তই তিনি উপেনকে ডাক্তারী পড়িতে পাঠান। উপেন ডাক্তার হইলে তাঁহার সুচিকিৎসার আর ভাবনা থাকিবে না সে আশা ত খুবই পুরিল? সংসারে তাঁহার একমাত্র পুত্রবধূ অমলা ও পত্নী। উপেনের অনুপস্থিতিতে তিনি অমলাকেই তাঁহার পুত্রের স্থান দিয়াছেন। একমাত্র পুত্রবধূ অমলা শ্বশুরশাশুড়ী উভয়ের সমস্ত হৃদয়টা অধি-কার করিয়া রাখিত—তাঁহাদের সমস্ত স্নেহভালবাসার উপর সে একছত্র আধিপত্য করিত।

অমলারও আনন্দের মধ্যে ছিল তাহার শ্বশুরশাশুড়ী। কাজেই শ্বশুরের অসুখে অমলা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল—তাহার কোমল অন্তঃকরণকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। প্রথম-প্রথম তিনি উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিতেন, ইদানীং ডাক্তারে তাহাও বারণ করিয়াছে।

এরূপ অবস্থায় উপেনকে বাটী আসিবার জন্ত লেখা তাঁহারা খুবই আবশ্যক বোধ করিলেন। বৃদ্ধ রোগশয্যায় শুইয়া নিজেই পত্র লিখিলেন "বাবা, আমার বড়

অসুখ, শীঘ্র বাড়ী এস।" কিন্তু অন্যান্য বারের মত এবার পত্রের উত্তর যথাসময়ে আসিল না। পুনরায় পত্র লিখিলেন, তাহারও উত্তর নাই। উপর্য্যুপরি পত্রের উত্তর না পাইয়া তাঁহারা সকলেই সাতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এরূপভাবে পত্রের উত্তর না পাওয়ার একটা বিশেষ কারণ কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। কিছুদিন এরূপ অবস্থায় কাটিল বটে কিন্তু তাঁহার পীড়ার উপশম হওয়া দূরে থাকুক ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একে নিজের শরীর ভগ্নপ্রায়, তাহার উপর পুত্রের সংবাদ না পাইয়া সাতিশয় চিন্তিত হইয়া উপেনের পিতা কি করিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে একদিন কলিকাতায় চলিয়া আসাই স্থির করিলেন।

অমলা তাহার বৃদ্ধ রোগগ্রস্ত শ্বশুরকে উপযুক্ত পুত্রের মত রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া সেবাশুশ্রূষা করিয়া পথে কোনই কষ্ট পাইতে দিল না। সে যে-রকম ভাবে গ্রাম হইতে তাঁহাদের কলিকাতায় লইয়া আসিল তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। রেলষ্টেশনে আসিয়া নিজেই কুলী ডাকিয়া জিনিষপত্র উঠাইয়া লইল। চাকর শম্ভু সঙ্গে ছিল, তাহার বোকার মত ব্যবহারে অমলা তাহাকে দুইটা তাড়া দিতেও ছাড়িল না। অমলার হাবভাব দেখিলে কে বলে সে গ্রাম্য বালিকা, কে বলে সে অশিক্ষিতা—সে "জগতের-কিছুই-জানি-না" রূপিণী অবগুণ্ঠনাবৃতা বঙ্গবধূ? বৃদ্ধ শ্বশুর তাঁহার বধূর কার্য্যকলাপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন "মা তুইই আমার ছেলে।"

(৭)

সেদিন সন্ধ্যায় উপেন তাহার নূতন মেসের বারাণ্ডায় একখানা চেয়ারে বসিয়া শেষ বারের মত তাহার অতীত জীবনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি একে একে উল্টাইয়া দেখিতেছিল। প্রথম মনে পড়িল তাহার বাল্যকালের কথা। তারপর কলিকাতায় তাহার পাঠের জন্য আগমন। সেখানে তাহার জীবনের দীক্ষা। তাহার হৃদয়ের একমাত্র আদরের সামগ্রী উচ্চ আশার উন্মেষ। পৃথিবীর মধ্যে কর্ম্মবীর হইবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার জাগরণ। সমস্তই একে একে তাহার কল্পনায় ফুটিয়া উঠিল। তারপর তাহার মনে পড়িল—সেই ভয়ানক দৃশ্য—তাহার জীবনের হলাহল—তাহার বিবাহ।

এতদিন ধরিয়া উপেন কেবল বিষয়টার এই দিকটাই ভাবিয়া আসিতেছে। সেদিন শেষ দিন বলিয়া সে একবার মাত্র দৃশ্যের অপর দিকটায় একবার দৃষ্টিপাত করিতে চেষ্টা করিল। একবার তাহার মনে হইল—"আচ্ছা ইহার কি কোন উপায় নাই? যদিই বিবাহ করিয়াছি তবে কি সে পাপের খণ্ডন করিতে পারিব না? স্ত্রী ত সহধর্ম্মিণী—এই কথাই ত বলে। জীবনে তাহার সাহায্য ত অনেক কার্য্যেই আবশ্যক হইতে পারে—তবে কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছি?" এতটা ভাবিয়া, সে চমকিয়া উঠিল। কী—স্বহস্তে সে গরল ভক্ষণ করিবে? না না। আবার তাহার মন দৃঢ় হইল, প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। সে বলিয়া উঠিল "সে হইতেই পারে না।"

তাহার পর, এ স্ত্রী কি সেই স্ত্রী? অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা। বিবাহরাত্রের অবগুণ্ঠনাবৃতা অমলার চকিত দৃষ্টি মনে পড়িয়া তাহার আরও ঘৃণা হইতে লাগিল।

সন্ধ্যা যখন কাটিয়া গিয়াছে, রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বালিয়াছে, উপেন তখনও সেই বারাণ্ডায় বসিয়া এই সমস্ত আলোচনা করিতেছিল। এইবার সে শেষবারের মত বারবার তিনবার বলিয়া উঠিল—"সে হইতেই পারে না—সে হইতেই পারে না—সে হইতেই পারে না।" একখানা চলন্ত ঘোড়ার গাড়ীর ঘর্ঘরশব্দের মধ্যে তাহার নিভৃত বিলাপধ্বনি মিশাইয়া গেল।

(৮)

কলিকাতায় আসিয়া প্রায় একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে উপেনের কোনও সংবাদ এখনও না পাইয়া তাহার পিতা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে যে বাসায় সে থাকিত সেখানে চাকরটাকে দুই তিনবার পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতেও কোন সন্ধান পান নাই। এ ব্যাপারটা তাঁহার খুবই আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চিন্তাজীর্ণ হইয়া তাঁহার শরীরের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। অমলা যখন কলিকাতায় আসিল তখন তাহার শ্বশুরের অসুখ-সত্ত্বেও একটা অজানা আনন্দের আশায় তাহার মনটা

একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে মনে মনে একবার ভাবিল তাহার সুখের জন্যই বুঝি ভগবান তাহাদের কলিকাতায় আনাইলেন। এখানেই ত তাহার স্বামী থাকেন না? এবার সে ত বড় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে! একটা অপরিচিত আনন্দাবেগ অমলার হৃদয়ে অলক্ষ্যে বহিয়া গেল।

অনেক চেষ্টাতেও যখন উপেনের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না তখন সে একবার নিজে চেষ্টা করিয়া দেখিবে স্থির করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল চিঠিগুলা নিশ্চয়ই ডাকে হারাইয়াছে, না হইলে কেন এমন হইবে?

একদিন দুপুর বেলা তাহার শ্বশুর যখন ঘুমাইতেছিলেন তখন সে ধীরে ধীরে গিয়া চাকরটাকে ডাকিল "শম্ভু!"

শম্ভু শম্ভুর মতই নিদ্রালু। তাড়াতাড়ি উঠিয়া উত্তর দিল "আজ্ঞে।"

অমলা বলিল "তুই একবার সেই বাসায় যা ত। যদি তাঁর দেখা না পাস্ ত অন্য কারুর কাছ থেকে তাঁর সংবাদ নিয়ে আসবি।"

প্রায় তখন সন্ধ্যা। শম্ভু ফিরিল। অমলা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি শম্ভু, দেখা পেলি?"

"আজ্ঞে না।"

অমলা একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল, ভাবিল "তাইত।" আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আর কারুর দেখা পেলি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এক বাবুর দেখা পেয়েছি।"

শম্ভু যখন মেসে যায় তখন সন্তোষ উপস্থিত ছিল। সে উপেনের সম্বন্ধে যথাসাধ্য সংবাদ তাহাকে দিয়াছিল। উপেনের মানসিক অবস্থাটাও তাহার পিতার কর্ণগোচর করাইবার জন্য তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। অমলা শম্ভুর কথায় আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি কি বল্লেন?"

"আজ্ঞে তিনি বল্লেন, যে, দাদাবাবু সেখানে থাকেন না। আর তিনি বল্লেন যে—" বলিতে বলিতে সে চুপ করিল।

"কিরে চুপ করলি যে।"

তবুও সে কথা বলে না। অমলা উৎকণ্ঠিত হইয়া আবার বলিল—"কি বল না!"

একটু আমতা-আমতা করিয়া সে বলিল "আজ্ঞে তিনি বল্লেন যে, দাদাবাবু নাকি আপনার উপর রাগ করে কোথায় চলে গেছেন। আর নাকি বাড়ী ফিরবেন না।"

শম্ভুর কথাবার্তায় অমলাকে একটা অজানা অমঙ্গল-আশঙ্কা ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল বটে কিন্তু স্বপ্নেও সে একথা শুনিবে ভাবে নাই। তাহার মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইল। প্রকৃতিস্থ হইয়া চাকরটাকে তাহার মনোভাব না জানিতে দিবার উদ্দেশ্যে বলিল—"কে বললে তোকে ও-সব কথা। কোন কাজের নয়—একটা কাজে পাঠালে কখনও তোর দ্বারায় তা হবে না।"

সে রাত্রে অমলার ঘুম হইল না। কিন্তু এত দিনের অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সামান্য একটা চাকরের কথা কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। মনে ভাবিল "লোকটা বোকা, হয় ত কেহ বিদ্রূপ করিয়াছে।"

এপর্য্যন্ত তাহার ত এমন কোন স্বকৃত দোষ মনে পড়িল না যাহার জন্য তাহার স্বামী তাহার উপর রাগ করিয়া গৃহত্যাগী হন। কথাগুলা সে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল।

কিন্তু তাহার সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও ঐ চিন্তাটাই অমলাকে বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। আবার ভাবিল—তাহাও কি সম্ভব? এতদিন যাহার জন্য সে জীবনের সমস্ত সুখ জলাঞ্জলি দিয়াছে—তাহার নিকট হইতে এমন কথা সম্ভব? এতদিন ধরিয়া যাহার উপর সে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ভক্তি ভালবাসা অর্পণ করিয়া আসিয়াছে—তিনি এত নির্দ্দয়?

অন্ধের মত সে তাহার স্বামীকে ভক্তি করিয়া আসিয়াছে—বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে—আজ কখনই তিনি এরূপ মনোভাব লইয়া গৃহত্যাগী হইতে পারেন না। নিস্তব্ধ রজনীতে শুইয়া শুইয়া সে কতই আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল। শেষে ভাবিয়া দেখিল কথাটা সত্য হইলেও হইতে পারে—"এইজন্যই বোধ হয় তিনি বাড়ী আসিতেন না—এইজন্যই বোধ হয় তিনি পত্র লিখিতেন না।" সন্দেহকীট তাহার মনে প্রবেশ করিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, শ্বশুরের অসুখের চিন্তার উপর, এই চিন্তাক্লেশ অমলার বড়ই কষ্টকর বলিয়া বোধ হইল। জীবনে সে আজ প্রথম এ কষ্ট পাইল—স্বামীর জন্য এত

বেদনা ইতিপূর্ব্বে সে কখনও অনুভব করে নাই। ভাবিতে ভাবিতে অমলার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

অমলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কখন্ হঠাৎ একটা কাতর স্বরে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখে শ্বশুরের বড় জ্বর হইয়াছে, তিনি প্রলাপ বকিতেছেন। অমলার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। শ্বশুরের শিয়রে গিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া তাঁহার ঘর্ম্মসিক্ত ললাটে হাত বুলাইতে লাগিল।

"কে ও! অমলা?—এস মা। উপেন এসেছে?"

কম্পিতস্বরে অমলা বলিল "না।"

আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "উপেন এসেছে?"

অমলা আবার বলিল "না।"

অমলার চক্ষু আর বাধা মানিল না—দুইবিন্দু অশ্রু বৃদ্ধের উত্তপ্ত ললাটে ঝরিয়া পড়িল। বৃদ্ধ চমকিয়া ডাকিলেন—"মা—অমলা।"

"বাবা!"—অমলা ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল।

"কাঁদছ?"

রুদ্ধকণ্ঠে অমলা বলিল "কই?..না ত।"

(৯)

কলিকাতার ষ্টীমার-কোম্পানিরা প্রায়ই ডাক্তারের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। অনেক চেষ্টা করিয়া উপেন এইরূপ একটা জাহাজে ডাক্তারীর কাজ যোগাড় করিল। বিদেশ-যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া সে স্থির করিল পিতাকে সংবাদ দিবে। অমলাকে সে কখনও চিঠি লেখে নাই—সেদিন শেষ চিঠি একখানা তাহাকেও লিখিল। যাত্রার চারদিন আগে সে তাহার গ্রামের ঠিকানায় চিঠি দুইখানা পোষ্ট করিয়া সকলের নিকট হইতে মনে মনে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। মূর্খ তখন জানে না যে তাহার পিতা মুমূর্ষু।

অমলার শ্বশুরের অসুখটা যে রাত্রে খুব বেশী হইয়াছিল তাহার পরদিন প্রাতে দুইখানা চিঠি অমলার হস্তগত হইল। শ্বশুরের অসুস্থাবস্থায় সেইই সমুদয় চিঠিপত্র খুলিয়া পড়িত। চিঠি দুইখানা লইয়া দেখে তাহাদের গ্রাম হইতে ফেরৎ আসিতেছে—একখানা তাহার নিজের নামে, অপর খানা তাহার শ্বশুরের নামে। অমলা তাহার চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল—

"তোমার সহিত সামাজিক নিয়মে আমার সম্পর্ক হইয়াছিল বটে কিন্তু কখনও আমার হৃদয় তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে নাই। বোধ হয় একথা তুমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলে। আমার জীবন কেবল তোমার জন্যই বিষময় হইয়াছে, কিন্তু আমি সহ্যের শেষ সীমায় আসিয়া পড়িয়াছি, এ বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় আমি স্থির করিয়াছি দেশত্যাগী হওয়া। ভগবানের কৃপায় তাহারও সুবিধা হইয়াছে—আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমি এস্ এন্ কোংর জাহাজে বিলাত চলিলাম। দেশে ফিরি কি না স্থির নাই। পিতামাতাকে প্রণাম দিও। তুমি আমার কথা জীবনের মত ভুলিয়া যাও। ইতি

উপেন্দ্রনাথ।"

সমস্ত চিঠিটা যখন পড়া শেষ হইল তখন অমলার স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যেন সে চোখের সামনে দেখিতেছে অন্ধকারের ঘন আবরণ ভেদ করিয়া একটা কী ভয়াবহ দৃশ্য ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে—ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিল।

শ্বশুরের চিঠিখানা খুলিল—দেখিল লেখা—

শ্রীচরণকমলেষু—

আপনিই আমার জীবন বৃথা করিয়া দিয়াছেন, অসময়ে বিবাহ দিয়া আমার জীবনের ব্রত নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। দোষ আমার ভাগ্যের, সে দোষ খণ্ডন করিবার জন্য আমি দেশত্যাগী হইব। আপনার ও মাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমি আপনাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলাম। আজ হইতে মনে করিবেন—উপেন মরিয়াছে। ইতি

হতভাগ্য উপেন।

চিঠি দুইখানা পড়িয়া অমলা কাহাকেও কিছু বলিল না। শোকের এমন একটা অবস্থা আসে যখন ক্রন্দনে তাহার বিকাশ হয় না—তখন সমস্ত জগৎ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়।

তাহার শ্বশুর মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাহার শোকের সময় এখন নাই। অমলা আবার বুকে বল বাঁধিল—

চিঠি দুইখানা লুকাইয়া রাখিয়া—আবার শ্বশুরের রোগ-শয্যার পার্শ্বে গিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা! এখন কেমন আছেন?"

তাঁহার তখনও জ্বরের অত্যন্ত প্রকোপ—তখনও 'উপেন' 'উপেন' করিয়া কাঁদিয়া ভাসাইতেছেন—অমলার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন "মা! উপেন এসেছে?" অমলা নীরবে চোখ মুছিল।

আজই ত না বৃহস্পতিবার? অমলা দুপুর বেলা আর-একবার চিঠিখানা খুলিয়া দেখিল। হাঁ তাইত? নীচে চাকরটা শুইয়া ছিল—অমলা ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া বলিল—"শম্ভু, একখানা গাড়ী নিয়ে আয়।"

শম্ভু জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যাবে?"

"বল্‌গে, বিলাত যাবার ষ্টীমার-ঘাটে।"

শম্ভু গাড়ী আনিল। অমলা কাহাকেও কিছু বলিল না—শম্ভুকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। কোচম্যানকে বলিল—"যে ঘাট হইতে বিলাতী ষ্টীমার ছাড়ে সেই ঘাটে চল।"

"বহুত আচ্ছা।"

তখন বেলা প্রায় তিনটা।

(১০)

যথাসময়ে উপেন ষ্টীমারে উঠিয়াছে। তখনও সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় নাই। উপেন তাহার নির্দ্দিষ্ট ক্যাবিনের সম্মুখে ডেকের উপর একখানা বেঞ্চে বসিয়া আছে।

এতদিন ধরিয়া উপেন একটা অপরিচিত আশার ছলনায় তাহার জীবনটাকে কতই না কষ্ট দিয়াছে। সে একটা দুর্লভ মানসিক দৃঢ়তা লইয়া এই সুদীর্ঘ-কাল বুকে পাথর বাঁধিয়া কাটাইয়াছে—আজ সন্ধ্যায় কিন্তু হৃদয়ের সেই বল সে হারাইয়া ফেলিল। এত দিন যাহা হউক, রাগ করুক আর যাই করুক, মনে মনে স্ত্রীকে যতই ঘৃণা করুক, পিতামাতার উপর যতই অসন্তুষ্ট হউক, সে সমস্তই কাল্পনিক ছিল। আজ সন্ধ্যায় যখন দেখিল বাস্তবিকই সে তাহার আপন-জনকে ছাড়িয়া কোন্ অজানা দূরদেশে চলিয়াছে, তখন তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কোথায় আজ তার পিতা-মাতা? কোথায় তাহার পত্নী? কোথায় তাহার বন্ধু সন্তোষ? কই? কেহ ত তাহাকে আজ কোন উপদেশ দিতে আসিতেছে না? এক-একবার সে সেই অলীক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া মন স্থির করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হৃদয় তার আজ বড় দুর্ব্বল—প্রাণ তাহার বড় শূন্য। অনুতাপে সে দগ্ধ হইতে লাগিল, মনে হইল "আহা সেই নিরপরাধ বালিকাকে কত কষ্টই দিয়াছি—পিতামাতার প্রতি কতই দুর্ব্যবহার করিয়াছি—কেন? কিসের জন্য?" সে আবেগ উপেন আর সহ্য করিতে পারিল না। জাহাজে কত লোকের আত্মীয় স্বজন তাহাদের বিদায় দিবার জন্য আসিয়াছে, কই তাহার জন্য ত কেহ আসে নাই? জগতে কি তাহার কেহই নাই? সে সেই সহস্র-কণ্ঠ-মুখরিত, সহস্র-আলোক-উজ্জ্বল জাহাজের ডেকে বসিয়া বুঝিতে পারিল যে সে বাস্তবিকই আজ বন্ধুহীন—সহায়হীন—পিতৃহীন হতভাগ্য।

একবার মনে করিল "যাই ফিরিয়া যাই।" আবার মনে হইল "কোন মুখে ফিরিব।" সেই বেঞ্চের উপর বসিয়া উপেন আকাশপাতাল ভাবিতে ভাবিতে কখন তন্দ্রার আবেশে অভিভূত হইয়া পড়িল।

হঠাৎ সে চমকিয়া শুনিল কে ডাকিতেছে "দাদাবাবু।"

উপেন চোখ চাহিল—ভাল করিয়া চোখ মুছিল—দেখিল তাহাদের বাড়ীর চাকর—শম্ভু। তাহার মনে হইল—এ কি ভ্রম? এ কি স্বপ্ন?

সে আবার ডাকিল "দাদাবাবু।"

"কি রে শম্ভু, তুই এখানে কি করে এলি?"

"আজ্ঞে আমিও এসেছি, বউঠাকুরুণও এসেছেন, তিনি ঘাটে গাড়ীতে রয়েছেন, আপনাকে ডাকছেন।"

উপেন শিহরিয়া উঠিল, বলিল—"এ্যাঁ—কই?"

যন্ত্রচালিতের মত উপেন শম্ভুর সঙ্গে-সঙ্গে ডেক হইতে ঘাটে নামিল। নিকটেই একটা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল।

শম্ভু বলিল—"এই যে বউঠাকুরুণ দাদাবাবু।"

আজ ছয়বৎসর পরে উপেন অমলাকে দেখিল—দেখিয়া চিনিতে পারিল। সেই একদিন তাহাকে সে দেখিয়াছিল—অবগুণ্ঠনাবৃতা বালিকাবধূ। আর আজ দেখিল যেন সাক্ষাৎ দেবী—অসঙ্কোচে দৃপ্ত! সে ভাবিল এ কি স্বপ্ন? তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পৃথিবীটা টলিয়া পড়িতেছে।

অমলা ধীরে ধীরে উপেনের পদধূলি লইল।

উপেন বলিল "তুমি অমলা? তুমি এখানে কেন?"

"তোমার বাবা মৃত্যুশয্যায়, একথা বোধ হয় তুমি জান না—তাই বোধ হয়"—

অমলার কণ্ঠরোধ হইল। খানিক পরে বলিল "তোমার যাওয়া হবে না। তুমি বাড়ী ফিরে চল, তোমার কোন দুঃখ কোন ক্ষোভ আমি রাখব না।"

উপেন সে আদেশ অগ্রাহ্য করিবার অবসর পাইল না।

"জিনিষপত্র নামিয়ে আনতে বল।"

উপেন ধীরে ধীরে ভৃত্যের মত সে আদেশ প্রতিপালন করিতে গেল।

উপেন জিনিষপত্র আনিতে পুনরায় জাহাজে গেল। অমলা একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল—দেখিল উপরে নীলাকাশ—পার্শ্বে গঙ্গা—সহস্র আলোকমালায় শোভিত চতুর্দ্দিক—স্বামীসন্দর্শন হইয়াছে।

শম্ভুকে বলিল "শম্ভু দাঁড়া। আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে নি।"

এই বলিয়া সেই অন্ধকারের ভিতর অমলা গঙ্গায় ডুব দিতে নামিল।

উপেন ফিরিয়া আসিয়া অনেক খুঁজিল। যাহাকে এই দীর্ঘকাল পায়ে ঠেলিয়া আসিয়াছে তাহার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিল। কিন্তু অমলা নাই। সে অমলাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, আজ অমলা তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মনের বিষ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি মরা। আমি আমার জীবন-কাহিনী লিখিতেছি স্বয়ং, অথচ আমি মৃত; জগতের চক্ষে, সমাজের পক্ষে আমি গতায়ু, আমার প্রাণহীন নশ্বর দেহের সমাধি বহু পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। প্রত্যয় না হয়, আমার জন্মভূমি তাম্রলিপ্তি-নগরে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তাম্রলিপ্তির সকলেই একবাক্যে বলিবে, "হেমরাজ ইহ-জগতে নাই। মহামারীতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। শ্রেষ্ঠী-পরিবারের সমাধি-ভাণ্ডারে সে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত চিরনিদ্রায় অভিভূত।" ইহার পরেও কি আমার জীবনান্তের অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন আছে? আমি মৃত, সমাহিত, আমার দেশে তাহা সর্ব্বজনবিদিত, সুনিশ্চিত! হউক সুনিশ্চিত; আল্প-বুদ্ধি-অ। মানুষের সুনিশ্চয়তার মূল্য কি? লোক-লোচনে যাহা অসম্ভব, ভগবানের রাজ্যে তাহা সুসম্ভাব্য। আমার জীবনই তাহার জীবন্ত প্রমাণ। আমি, শ্রেষ্ঠী হেমরাজ, মৃত, প্রোথিত হইয়াও, আজিও জীবিত; উষ্ণ শোণিতপ্রবাহ প্রতিমুহূর্ত্তে আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে; ত্রিংশবর্ষীয় যুবকের যে শৌর্য্য যে বল থাকা উচিত তাহা আজিও আমাকে পরিত্যাগ করে নাই; মনুষ্য-জীবনের অস্তিত্ব আমি পূর্ণভাবে অনুভব করিতেছি; দেহ, মন, আমার ক্রিয়াবান; আমি মৃত নহি,—জীবন্ত! মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল সত্য; করাল কাল কাহাকেই বা অব্যাহতি দিতেছে? পলে পলে সে, জীবের কেশাকর্ষণ করিয়া তাহার ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছে। তাহারা যদি জীবিত হয়, মৃত আমি কোন্ অপরাধে? আকস্মিক দুর্ঘটনায়, অন্য অপেক্ষা আমার উপর তাহার অধিকার বিস্তার করিবার উৎকৃষ্ট সুযোগ সে পাইয়াছিল; তাহার হিমানীশীতল কর-চিহ্ন আমার ললাটে অঙ্কিত করিতে সে ছাড়ে নাই; তাহার অত্যাচারে আমার কাক কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, বৃদ্ধের কাশ-ধবল কেশে পরিণত হইয়াছে! হউক, মৃত্যুর ক্রিয়া অপেক্ষা তাহাতে দুরদৃষ্ট দুশ্চিন্তার প্রভাবই প্রবলতর! আমি আবার বলিতেছি, মানুষের চক্ষে আমি পরলোকগত হইয়াও আজি জীবিত। যে পরলোকগত সে আবার জীবিত কি প্রকারে?—সেই কথাই বলিতেছি। আমার করুণ জীবন-কাহিনী সেই সমস্যার সমাধান। কিন্তু সমাধানের আবশ্যক? আমার তাহাতে সুখ কি? এতদিন আমি তাহা ভাবিয়াই অন্তরের দুঃসহ যন্ত্রণা নীরবে বহন করিয়াছি। আজ আমার মানসিক অবস্থা অন্যপ্রকার। এখন আমি সমাজ হইতে বহুদূরে। দণ্ডাকারণ্যের নগ্ন সৌন্দর্য্য এখন আমার একমাত্র অবলম্বন; অসভ্য আমার সঙ্গী; সভ্য জগতের কৃত্রিম নিন্দা প্রশংসা আমাকে

স্পর্শ করিবে না। কি জন্ত তবে আর হৃদয়ভাব গোপন করিব? সভ্যতা-গর্ব্বিত মোহান্ধ একটি প্রাণীও যদি আমার জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া সাবধান হয়,—আমার নিষ্ফল জীবন সফল হইবে। হৃদ্‌পিণ্ডে তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল বিদ্ধ হইয়া যে ক্ষত উৎপন্ন করিয়াছে, যাহা হইতে অবিরত শোণিত ক্ষরিত হইতেছে, আজ আমি সেই ক্ষত বৃদ্ধি করিয়া তাহার লোহিত উজ্জ্বল উষ্ণ শোণিতে আত্ম-কাহিনী বর্ণনা করিব; রক্ত-গঙ্গা দেখিয়াও কি কাহারও পরিণাম-চিন্তা চিত্তে জাগিবে না? বিবেক-বুদ্ধি না জাগে, ভয়ে বিপদগামী পথিক এ পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে! আমি তাহাই চাই, এ আত্ম-কাহিনীর তাহাতেই সফলতা!

আমি ধনীর পুত্র; স্বর্গীয় পিতার বিপুল ঐশ্বর্য্যের, বংশগত সম্মানের একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমাদের বংশ ও বিত্ত দেশপ্রসিদ্ধ, আমাদের বুনিয়াদী ঘর। অভাব কি আমি কখনও জানি নাই; আশৈশব সুখসমৃদ্ধির মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছি। আত্মীয় আমার, রক্ত-সম্বন্ধীয়, কেহ বর্ত্তমান ছিলেন না,—এই যা অভাব। সে অভাবও আমি কখনও অনুভব করিতে পারি নাই। বন্ধুবর গোবিন্দ তাহার অসীম স্নেহে আমাকে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছিল। স্নেহের কাঙ্গাল আমি ছিলাম না।

আমি তখন বিংশবর্ষীয়, অভিভাবকহীন ধনী যুবক। আমার ইয়ার বন্ধুর অভাব হইবার কথা নহে। দলে দলে স্তাবক আসিয়া আমার দ্বারে নানাছলে উপস্থিত হইত; আমাকে আকৃষ্ট করাই যেন তাহাদের জীবন-ব্রত। সে সুখ আমি তাহাদিগকে দান করি নাই। আমি তাহাদিগকে বিশেষভাবে চিনিতাম। আমার অধীত গ্রন্থে চাটুকার-গণের মৌখিক হাস্যের নিগূঢ় অর্থ পরিস্ফুট ছিল। আমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! সে দৃষ্টি যদি আমি সর্ব্বঘটে সমভাবে প্রেরণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আজ আমার এই দশা হয়! বনবাসে আমার জীবন শেষ হয়! এখন আর আক্ষেপ অভিযোগে ফল কি! মানুষ প্রেমে অন্ধ!

রমণীর প্রেম আমার উপাস্য ছিল না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, রমণী সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি অল্পই ছিল। বিবাহযোগ্য কন্যার পিতামাতা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আত্মীয়তা-সংস্থাপনের চেষ্টা বহুবার করিয়াছেন; আমি তাঁহাদের আহ্বান বিনীতভাবে বার বার প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছি। প্রেম অপেক্ষা বন্ধুত্ব আমার অধিকতর বরণীয় ছিল। প্রিয়তম গোবিন্দ, তাহা আমাকে দান করিয়াছিল। তাহার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারিতাম। আমার বিশ্বাস ছিল, সেও আমাকে প্রাণের অধিক স্নেহ করিত। রমণীর প্রতি আমার ঔদাস্য উপলক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ আমাকে উপহাস করিতে ছাড়িত না। সে বলিত "ওটা তোমার দুর্ব্বলতা। রমণীর প্রেমসুধা যে-হৃদয়ে বর্ষিত না হইয়াছে তাহা যে মরুভূমি! কিশোরীর অগাধ নয়ন-সাগরে যে না ডুবিয়াছে, সৌন্দর্য্যরহস্য সে বুঝিবে কি! নারীর হাস্যলাস্য যে-হৃদয়ে পতিত হয় নাই, তাহা যে চির অন্ধকার, বৃথা।"

বন্ধু আরও কতপ্রকারে আমাকে রমণীর মাধুর্য্য বুঝা-ইতে চেষ্টা পাইত। আমি তাহার বাক্যের উত্তর দিতাম না; হাসিতাম মাত্র। মনে হইত, আমাকে সুখী করি-বার জন্য গোবিন্দর কত চেষ্টা! নিজে সে অজস্র স্নেহ দিয়াও পরিতুষ্ট হইতে পারিতেছে না! আমাকে সংসারী করিয়া, রমণীর প্রেমে আমার জীবন মধুময় করিয়া দিয়া, সে তৃপ্ত হইতে চায়। বন্ধুর স্নেহে অতুল আনন্দ অনুভব করিতাম; গর্ব্বে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত—এমন অকৃত্রিম বন্ধুলাভ করিয়াছি বলিয়া।

গোবিন্দের স্বভাবই আনন্দময়, হাস্যরহস্য তাহার নিত্য-সহচর। ব্যবসায়ে সে চিত্র-শিল্পী। চিত্রকলা, সঙ্গীত, সুকুমার বিদ্যায় তাহার বিরক্তিহীন অনুরক্তি। তাহার গুণ অনেক; সমস্তই তাহার অনিন্দ্য সুন্দর, মানবোচিত। —অন্ততঃ তখন তাহাই ভাবিতাম। তাহার প্রত্যেক কার্য্যে আমি সহায় ছিলাম; তাহার আনন্দে প্রকৃতই আমি বিপুল আনন্দ অনুভব করিতাম। তাহার ব্যতীত অন্যের স্নেহের কথা আমার হৃদয়ে ছিল না। বন্ধুর সরস নারীগৌরবগাথা সেইজন্যই আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

অকস্মাৎ এক দিন আমার সকল গর্ব্ব ধূলিসাৎ হইয়া গেল। বন্ধুর বক্তৃতায় নহে; বিধিলিপির অখণ্ডনীয় আঘাতে। গোবিন্দ তখন উপস্থিত ছিল না; কার্য্যোপলক্ষে

বিদেশে গিয়াছিল। আমি তখন একা। বন্ধুর অনুপস্থিতি আমাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। গৃহে কিছুতেই মন বসিতেছিল না। নগরে আমার পরিচিতের অভাব ছিল না, কিন্তু কাহারও সঙ্গলাভে আমার লিপ্সা ছিল না। আমি একা ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম; নির্জ্জন সমুদ্র-উপকূল আমার লক্ষ্য। সে এক বাসন্তী প্রভাত, দিকে দিকে সৌন্দর্য্য-লীলা! মাথার উপর দিগন্তব্যাপী সুনির্ম্মল সুনীল আকাশ; গায়ে লাগিতেছিল সাগরশীকর-স্নাত মৃদুল বাতাস; কানে আসিতেছিল বিহঙ্গমের সুমধুর কাকলী; চোখে পড়িতেছিল বৃক্ষ-অঙ্গে মনোরম নব পরিচ্ছদ, পত্রপুষ্পের কি অতুল শোভা! প্রকৃতির সে কি মোহন বেশ; কি আনন্দ-আহ্বান,—সে আহ্বানে যে মুগ্ধ না হইয়াছে সে পাষাণ। আমার ক্ষুদ্র হৃদয় সেই সৌন্দর্য্যমহত্ত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। একা সে আনন্দ উপভোগ করিতে কেমন কষ্ট হইতেছিল। মনে হইতেছিল—সঙ্গে যদি আর এক-জন থাকিত।

কে সে, সময় বুঝিয়া আমাকে মধুর স্বরে আকুল করিল? সে স্বর বড়ই মধুর; কোকিল-কূজন, বীণার ঝঙ্কারের সহিত তাহার তুলনা হয় না; তাহা অপার্থিব—দেবকণ্ঠেরই উপযুক্ত! ভাববিহ্বল চিন্তাকুল চিত্তে, আমি ধীর পদে সমুদ্রকূলের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। পথিমধ্যে সেই আহ্বান! ভিক্ষুণী-আশ্রমের একটি শোভা-যাত্রা সঙ্গীত-সুধা বিকীর্ণ করিয়া সেইপথ দিয়া মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। আমি আধ-অলস আধ-উৎসুক ভাবে সে দিকে চাহিয়া ছিলাম। সহসা কাহার সঙ্গীতলহরী আমাকে আকৃষ্ট করিল। সেই অনিন্দ্যসুন্দর বদনখানি আবিষ্কার করিতে বিলম্ব হইল না। জানি না, কোন্ আকর্ষণ-বলে চারি চক্ষুতে মিলন হইল। কি সুন্দর নয়ন! স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের প্রশান্ত অশেষ লীলা-নিকেতন! গোধূলি-ললাটে রোহিণী-নক্ষত্রের ন্যায় সে নয়ন-তারকা অনন্ত নক্ষত্ররাজির মধ্যে আপনার বিশেষত্বে আপনি ফুটিয়া আছে; তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না। তাহা অতুলনীয়! বন্ধু-কথিত অতল নীলসাগরে ঝাঁপ দিলাম,—ডুবিলাম। এক-বার, দুইবার, বারবার সে বদনে, নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াও মন তৃপ্ত হইল না। হায়, রমণী! এতদিন তোমাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, আজ কি তাহারই প্রতিশোধ? রমণীর সৌন্দর্য্যে পুরুষকে এমনি হতবুদ্ধি করে।

শোভা-যাত্রা ধীরে ধীরে দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল। জানি না ইচ্ছায় কি অসাবধানে, বিদায়-মুহূর্ত্তে সে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছিল। আবার নয়নে নয়নে মিলন—আমাকে পাগল করিল। এক মুহূর্ত্তে, এতটুকু সময়ের মধ্যে বিজয়িনী রমণী আমার এতকালের শৌর্য্যগর্ব্ব ধূলিসাৎ করিয়া গেল। আমার এত সাধের পূর্ব্বজীবন এক দণ্ডে বিসর্জ্জন দিয়া প্রেমের ফকির সাজিলাম!

বলা বাহুল্য আমি তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। আমরা তাম্রলিপ্তিবাসী এ-সকল বিষয়ে ভাবনা চিন্তার অপেক্ষা রাখি না। আমরা পরিণামদর্শী নই। আমাদের পূর্ব্বানুরাগ বর্ণনা করিব না। প্রেমপরীক্ষা সেই এক মুহূর্ত্তেই হইয়া গিয়াছিল। সুগায়কের গাওয়া মনোরম সঙ্গীতের মত হৃদয় মন ঝঙ্কৃত করিয়া অনুরাগ অন্তরতম প্রদেশে বাসা বাঁধিয়াছিল। আমাদের মিলনপথে কোন বাধা ছিল না। আমার চিত্তহারিণী অষ্টাদশী সমতটের জনৈক হতসম্পদ চরিত্রহীন জমিদারদুহিতা; বালিকা "ভিক্ষুণী-আশ্রমে" পালিত হইতেছিল। প্রস্ফুটিত ঢলঢল পদ্মপুষ্প হৃদয়ে ধারণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলাম। তাহার পিতা বিনা-আপত্তিতে জগতের শ্রেষ্ঠদান আমাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। মনে মনে খুসী হইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না; আমার ন্যায় ধনীর হস্তে নিরাভরণা যৌতুকহীনা কন্যা সমর্পণ সহজ নহে, তাহা নিশ্চিত।

বিবাহবাসরে গোবিন্দ উপস্থিত ছিল। সম্প্রদান শেষ হইয়া গেলে, বন্ধু হাসিয়া বলিয়াছিল, "কি হে ভায়া? এখন বল ত গোবিন্দর বাচালতার মূল্য আছে কি না? এ সবই আমার বলার ফল। প্রণয়-দেবতার সঙ্গে কয়দিন লুকোচুরি চলে ভাই? সুখী তুমি, ফুলশরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরতম পুষ্পটি চুরি করিতে পারিয়াছ। ফুলশর তোমাকে সুখী করুন।"

আমি আবেগভরে বন্ধুর হস্ত নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া-ছিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে একটি দীর্ঘশ্বাস পতিত হইয়াছিল। মনে হইতেছিল,—গোবিন্দ আজ আর আমার একমাত্র অনুরাগপাত্র নয়। এখন আমি অন্যের। বিবাহিত জীবনের

প্রথম প্রভাতেই, অতীত জীবন স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছিলাম। যাহা যায় তাহা বড় মধুর, তাহাকে বিদায় দিতে কেমন কষ্ট হয়। যাহা আসিবে তাহা আশাময়, কিন্তু সে যে অজ্ঞাত!

নীলার পানে ফিরিয়া চাহিলাম। নীলা আমার স্ত্রী, প্রাণাধিকা পত্নী। আর কি চাই! তাহার রূপ আমাকে উন্মত্ত করিয়াছিল। তাহার নয়নজ্যোতি আমার হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিয়াছিল। আমি সংসারের সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মনে প্রাণে কেবল সেই মূর্ত্তি। প্রণয়ের মদিরামোহে আমি তখন বিভোর। প্রণয় আমার জীবন, মূলমন্ত্র, প্রণয়ের জন্যই বিশ্বজগতের সৃষ্টি। প্রতি উষাই যেন তাহাকে নূতনত্বে অলঙ্কৃত করিত; প্রতি রজনীতে প্রণয়-পুষ্প নবানুরাগে প্রস্ফুটিত হইত। নীলার প্রেম অফুরন্ত; সৌন্দর্য্য তাহার চিরোজ্জ্বল। ক্ষণে ক্ষণে মনে হইত,—নীলা কি আমাকে মনপ্রাণ ভরিয়া ভালবাসে? নিশ্চয় বাসে; অমন সরল, প্রেম-ঢলঢল নয়নযুগলকে কে অবিশ্বাস করিবে!

আমার প্রাসাদ এখন সর্ব্বদা উন্মুক্ত। অতিথি-অভ্যাগতের অভাব ছিল না। তাম্রলিপ্তির অভিজাত-সমাজের অনেকরই সাক্ষাৎলাভ নিত্য ঘটিত। সকলেই একবাক্যে আমার স্ত্রীর সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠবের ও সুমার্জ্জিত রুচির শতমুখে প্রশংসা করিতেন। নীলার রূপমাধুর্য্যের প্রশংসা তাহাদের গল্প আলাপের উপাদানে পরিণত হইয়াছিল। গোবিন্দর মুখে সর্ব্বদাই সেই কথা। সে আমার পরম বন্ধু; সহোদর-তুল্য; তাহার নিকট আমার কিছু গোপনীয় ছিল না। আমার গৃহে তাহার যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা অবারিত দ্বার। আমি সম্পূর্ণ সুখী! প্রেম, বন্ধুত্ব, ঐশ্বর্য্য, সকলই আমার করায়ত্ত,—মানুষকে সুখী করিতে ইহা অপেক্ষা আর কি আবশ্যক?

আমার সুখপূর্ণ হৃদয়পাত্রের মাধুর্য্য বর্দ্ধিত করিতে বৎসর অন্তে, আর এক বাসন্তী প্রভাতে নীলা আমাকে একটি কন্যারত্ন উপহার দিয়াছিল। বন্ধু ও আমি একটি পুষ্পভারাক্রান্ত সুগন্ধি লতামণ্ডপে বসিয়া সুখে আলাপ করিতেছিলাম; ধাত্রী নবজাতশিশুকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। একটি স্বর্গীয় যূথিকা। শালে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, কেবলমাত্র সুন্দর বদনখানি দেখা যাইতেছে। বিধাতার আশীর্ব্বাদ জ্ঞানে ক্ষুদ্র বালিকাকে বক্ষে তুলিয়া লইলাম; কোমল বদনে মৃদু চুম্বন করিলাম। শিশু তাহার আয়তকৃষ্ণ নয়নযুগল উন্মোচন করিল। স্বর্গের সৌরভ তখনও যেন তাহার অঙ্গে লাগিয়া ছিল। গোবিন্দও তাহাকে চুম্বন করিল। মণ্ডপশীর্ষে একটি পাখী বসিয়া সুমধুর স্বরে গান গাহিতেছিল। মৃদুমন্দ পবন জুঁইফুলের মৃদু সুগন্ধ বহন করিয়া আনিতেছিল। বাতাসে একটি পুষ্পের পাপড়ি আমার গায়ে ঝরিয়া পড়িল। আমি ধাত্রীর ক্রোড়ে শিশুকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম, "বলগে তাঁহাকে, আমি তাঁহার বসন্ত-কলিকাকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা করিয়াছি।"

ধাত্রী চলিয়া গেলে, গোবিন্দ আমার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিল, "হেমরাজ, তুমি প্রকৃতই সুখী।"

আমি স্মিতমুখে উত্তর করিলাম, "কেন বল ত? সাধারণ হইতে আমার ভাগ্য কি স্বতন্ত্র?"

গোবিন্দ। "নিশ্চয়ই। তাম্রলিপ্তির এই অধঃপতনের দিনে তোমার মত কয়জন সুখী,—কয়জন সন্দেহমুক্ত?"

আমি। "সন্দেহ? কাহাকে সন্দেহ? আমার সম্পর্কীয়ের মধ্যে সন্দেহ করিবার মত কেহ আছে কি গোবিন্দ?"

গোবিন্দ হাহা করিয়া হাসিয়া বলিল, "কিছু না, কিছু না। তাম্রলিপ্তির বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ওকথা বলিতেছিলাম।"

আমি বলিলাম, "তাম্রলিপ্তি লইয়া কাজ কি আমার? নীলা, সরলা বালিকা,—আজ সে সন্তানের জননী,—সংসারের সে কি জানে?"

বন্ধু বলিল, "ঠিক, ঠিক। অমন নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্ক তাম্রলিপ্তি-গগনে আর কোথায়?"

আমরা লতামণ্ডপ পরিত্যাগ করিলাম। বন্ধুর উক্তিতে কেমন একটু অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিলাম। সত্বরই প্রসঙ্গান্তরে সে ভাব বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু জীবনে এমন আর-একদিন আসিয়াছে, যখন সে দিনের কথা স্মরণ না করিয়া পারি নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে বৎসরের নিদারুণ গ্রীষ্মের কথা এখনও তাম্রলিপ্তি-

বাণীর স্মরণ আছে। সে দুর্দ্দিন অনেকের হৃদয়ে যে গভীর কালিমারেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, তাহা জীবনে মুছিবার নহে। মহামারীতে তখন দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। নিত্য শত শত নরনারী ভীষণ মহামারীর করাল কবলে পতিত হইতেছিল। সকলেই আতঙ্কে মৃতপ্রায়। কে কাহার শুশ্রূষা করে,—পীড়িতের মুখে একবিন্দু জল দেয়! মাতা প্রাণের আতঙ্কে পীড়িত সন্তানকে পরিত্যাগ করিতেছিল,—অন্যের ত কথাই নাই! গৃহে গৃহে কেবল রোগীর আর্ত্তনাদ,—মৃত দেহ। রাজপথে শবের স্তূপ। সংখ্যাতীত, এত শবের সমাধির বা চিতার স্থান কোথায়? কেই বা কাহাকে দাহ সমাহিত করে! দুর্গন্ধে তিষ্টিতে না পারিয়া, সময় সময় পথের আবর্জ্জনার মত, মেথরের কদর্য্য শকটে শবরাশি স্থানান্তরিত করা হইত। নরক আর কাহাকে বলে!

দুরন্ত গ্রীষ্ম ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। বায়ু না অগ্নি-শিখা। তাহার স্পর্শে পত্রবিরল তরুলতা তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। আকাশ যেন অগ্নিকুণ্ড; সূর্য্যের এত তেজ কেহ কখন দেখে নাই। প্রকৃতির প্রলয়াকার। সুকণ্ঠ বিহঙ্গম নীরব,—কদাচিৎ গভীর রজনীতে বুলবুল চমকিত হইয়া ডাকিয়া উঠিত। সে গীতে তাহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠ না ফুটিয়া বিষাদতান মুখরিত হইত।

আমি তথাপি তাম্রলিপ্তি পরিত্যাগ করি নাই। আমার বিশ্বাস, আতঙ্কই পীড়ার প্রধান কারণ। ভয়-বিহ্বল হইয়া বিদেশে পলায়ন করিলেও পরিত্রাণ নাই। আমার প্রাণে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। নীলাও সে বিষয়ে সবল; চম্পা,—আমার শিশু কন্যা—তাহার স্বাস্থ্য সুন্দর ছিল। আমি, রোগবীজব্যাপ্ত নগরের মধ্য দিয়া রোগাক্রান্ত সহযাত্রীর সহিত বিদেশে পলায়ন অপেক্ষা গৃহে সাধ্যমত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা শ্রেয় মনে করিয়াছিলাম। আমার প্রাসাদ উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। সাগরের অপেক্ষাকৃত শীতল মুক্ত বায়ুর তাহাতে অভাব ছিল না। নগরের সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধ রহিত করিয়া আমি প্রিয়তমার সহিত মহাশ্মশানের এককোণে পড়িয়া ছিলাম। গোবিন্দও আমার ভবনে আশ্রয় লইয়াছিল। দিন একপ্রকার স্বচ্ছন্দেই কাটিতেছিল। নীলার সৌন্দর্য্য, তাহার সুকণ্ঠ আমাকে বাহ্যজগত হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। বুলবুল নীরব হইয়াছিল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নীলা নীরব নহে। সে সঙ্গীতের পর সঙ্গীত-তরঙ্গ উত্থিত করিয়া, মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় আমার হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিত। গোবিন্দ কখন কখন তাহার সহিত যোগ দিত। উভয়ের মিলিতকণ্ঠ আজিও আমার কর্ণে নির্ম্মম ভাবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমি একটু দূরে বসিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী,—রূপের মন্দির; আর একটি তাম্রবর্ণ যুবক;—আমার স্ত্রী এবং আমার বন্ধু—উভয়েই আমার প্রাণাধিক. আমার আপনার —কেমন মিলিত হইয়া একমনে সঙ্গীতে রত! বড় আনন্দ হইত। সুখস্বপ্ন! স্বপ্ন মাত্রই কি অলীক?

একদিন গ্রীষ্মাতিশয্যে অতি প্রত্যুষে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। গৃহের গরম অসহ্য হইয়াছিল; মনে হইল বাগানে গিয়া একটু বেড়াইয়া আসি। নীলা, আমার পার্শ্বেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত। আমি অতি সন্তর্পণে শয্যা ত্যাগ করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলাম, পাছে নীলার নিদ্রাভঙ্গ হয়। কক্ষ পরিত্যাগ করিতে যাইতেছি, এমন সময় কেন যেন মনে হইল, প্রিয়তমার সুপ্ত-সৌন্দর্য্য একবার প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া যাই। ফিরিয়া চলিলাম,—নিদ্রায় নীলা কি সুন্দর! রূপতরঙ্গ তাহার অঙ্গে অঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে! এ সুন্দরী আমারই—হৃদয়রাণী, আমারই,—আমারই; একা আমারই। হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। নিদ্রিতার অন্ধকারের ন্যায় কেশরাশি উপাধানের উপর দিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহার একগুচ্ছ ধীরে ধীরে তুলিয়া লইলাম; প্রাণের আবেগে চুম্বন করিলাম। তারপর—তারপর—অদৃষ্টের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা আমি, —তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম। বিদায়! বিদায়!

উদ্যানের মুক্ত বাতাস অতি মৃদু; বায়ুশ্বাসে একটি পত্রও কম্পিত হইতেছিল কি না সন্দেহ; তবুও উষার করস্পর্শে প্রাণ শীতল হইল। অনেক দিন একা এ সময়ে এ স্থানে আসি নাই। মনে পড়িল, কত দিন সকাল সন্ধ্যায় এখানে কপিলের গভীর তত্ত্ব-অনুশীলনে

অতিবাহিত করিয়াছি। পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। আমার অজ্ঞাতে অতীত জীবনে নীত হইলাম। জানিনা কখন উদ্যান-প্রান্তে লতাবিতানপথে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। অনতিদূরে উপসাগরবক্ষে শুভ্র পালের পক্ষ বিস্তার করিয়া তরণীগুলি কোন দেশে চলিয়া যাইতেছে। সাধ হইল একবার উপকূলে গিয়া বসি। বাহির হইলাম। অধিকদূর অগ্রসর হই নাই,—একটা গভীর যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক অস্পষ্টস্বর আমাকে চমকিত করিল। শব্দ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলাম। দেখি,—ঘাসের উপর পড়িয়া একটি বালক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। হাতে ধরিয়া তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিলাম; বলিলাম "কি হইয়াছে তোমার? কিসে তোমাকে এ অসহ্য যন্ত্রণা দিতেছে?"

বালক অতি কষ্টে আমার দিকে মুখ ফিরাইল। কি সুন্দর মুখখানি,—যন্ত্রণায় কালী হইয়া গিয়াছে। গোঙ্গাইয়া বলিল, "মারী, মহাশয়, মারী! দূরে সরিয়া দাঁড়ান। আমাকে স্পর্শ করিবেন না; স্পর্শ করিলে আপনার রক্ষা নাই! আমি ত মরিতেছি!"

মুহূর্ত্তের তরে বিচলিত হইলাম; নিজের জন্য নহে, আমার স্ত্রী ও কন্যাকে স্মরণ করিয়া। তাহাদের জন্য ও আমার সাবধানতার আবশ্যক আছে। কিন্তু রোগগ্রস্ত নিঃসহায় বালককে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে ফেলিয়া দিতে আমার চিত্ত চাহিল না। আমি তাহাকে উৎসাহিত করিতে বলিলাম, "ভয় কিহে, হতাশ হইও না। পীড়া মাত্রই মারী নয়। আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি অন্যত্র যাইতে চেষ্টা করিও না। শীঘ্রই বৈদ্য লইয়া আসিতেছি।"

বালকের বেদনা-ব্যথিত ম্লান মুখ ক্ষণেকের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কি যেন বলিতে চাহিল। বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। আমি দ্রুতপদে বন্দরাভিমুখে চলিলাম। বন্দরে কয়েকটি সন্ন্যাসীবেশী মূর্ত্তি লক্ষ্যশূন্য ভাবে বিচরণ করিতেছিল। বড় আশায় তাহাদের নিকট বালকের করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিলাম। ভণ্ডগণ তাহাতে কর্ণপাত করিল না! নিরাশ হইয়া বৈদ্যের সন্ধানে চলিলাম। একটি ওড্র দেশীয় বৈদ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রোগীর অবস্থা বলিবামাত্র, বৈদ্য প্রভু বলিলেন, "এতক্ষণ হইয়া গিয়াছে, আর কেন?"

অনুনয় করিয়া, তাহাকে বালকটিকে একটিবার মাত্র দেখিতে বলিলাম; স্বর্ণমুদ্রার প্রলোভন দেখাইলাম; সকলই বৃথা হইল। বলিলাম, "আপনি বৈদ্য, বিনা চেষ্টায় একটি প্রাণীকে মরিতে দিবেন!"

বৈদ্য বলিল, "ক্ষমা করিবেন মহাশয়। নিজের প্রাণ রক্ষা করে কে ঠিক নাই, পরের প্রাণের বালাই লইয়া মরিব! আপনার স্বর্ণ আপনার থাকুক। মারী-রোগী স্পর্শ করিয়া প্রাণ হারাইলে আপনার স্বর্ণ কি প্রাণ দিতে পারিবে?"

ঘৃণায় আমার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। মনে হইল, প্রকৃতই মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া আছি। শ্মশানবিহারী পিশাচগুলির প্রাণে মায়ামমতার লেশ মাত্র নাই। ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছিলাম,—"এখন কি করি।"

একটা গম্ভীর স্নেহের স্বর আমাকে জাগ্রত করিল। "বৎস! এ ভাবে দাঁড়াইয়া কেন? কি চাই?"

চাহিয়া দেখিলাম,—এক সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি তাঁহাকে নত হইয়া নমস্কার করিলাম। বালকের বিপদবার্ত্তা বলিলাম। সাধু-পুরুষ দয়ার্দ্র-কণ্ঠে বলিলেন, "এই আমি তাহার নিকটে চলিলাম। আশঙ্কা হইতেছে, বিপদ বুঝি চরমে পৌঁছিয়াছে। ঔষধ আমার সঙ্গেই আছে। ভগবান, বিলম্ব যেন সাংঘাতিক না হয়।"

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম, "আমি আপনার সঙ্গে যাইতেছি। একটি মানুষ কেন, একটি কুকুরও যেন অসহায় অবস্থায় মারা না যায়।"

সাধুপুরুষ আমার বদনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আমরা দ্রুত বালকের উদ্দেশে চলিলাম। সহসা তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আপনি বোধ হয় তাম্রলিপ্তির অধিবাসী নন?"

আমি আমার পরিচয় প্রদান করিলাম। আমার নাম তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। আমি বলিলাম, "অদ্যাবধি আমরা সুন্দর স্বাস্থ্য ভোগ করিয়া আসিতেছি; নগরের আতঙ্ক আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, ভীরুতাই নগরবাসীকে এত শীঘ্র রোগাক্রান্ত করিতেছে!"

তিনি ধীর স্বরে বলিলেন, "তাহাই। সকলেই বাহ্যিক

সুখ লইয়া ব্যস্ত; পার্থিব জীবন লইয়াই তাহারা বাঁচিয়া থাকে। কোন কারণে তাহার একটুকু ব্যতিক্রম হইলেই, তাহারা জীবনের আশা ছাড়িয়া দেয়। উপরে যে আর-একজন তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা জাগ্রত আছেন, তাহা তাহারা স্মরণে আনে না।" দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হয় ত অনেকে সে কথা ঠিক বিশ্বাস করে না। নতুবা ভগবানের বলে দৃঢ় হইয়া আত্ম-শক্তি উদ্বুদ্ধ করিলে, লোকে এত শীঘ্র কি জীবন হারায়!"

"তাই। আপনি ত সর্ব্বদা মারীর মধ্যে" বাক্য শেষ করিবার পূর্ব্বেই ললাটে কেমন বিকট যন্ত্রণা অনুভব করিলাম।

তিনি বলিলেন "আমার কথা স্বতন্ত্র। আমার কার্য্যই এই। ভয় করিয়া কি করিব! যে দিন তিনি ডাকিবেন, হাজার চেষ্টা করিলেও ত এ জগতে থাকিবার উপায় থাকিবে না। সকলকেই যখন একদিন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে তবে আর মৃত্যু বলিয়া ভয় কি।"

বাক্য শেষ করিয়া তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। ত্রস্ততার সহিত আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি না ধরিলে আমি মাটিতে পড়িয়া যাইতাম। আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম; মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল; চতুর্দ্দিকের সমস্ত বস্তুই যেন ঘুরিতেছিল; আমার দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি ছিল না। সাধুপুরুষ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন হইলেন যে, শরীর কি অসুস্থ বোধ হইতেছে?"

অতি কষ্টে উত্তর দিলাম, "বোধ হয় দুঃসহ গরমে এমন হইয়াছে। দাঁড়াইতে পারিতেছি না,—মাথা ঘুরিতেছে। আমি এখানে বসি, আপনি বালককে দেখিতে যান।"

মহাপুরুষ বাক্যব্যয় না করিয়া আমাকে সবল হস্তে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। নিকটস্থ একটি চটিতে লইয়া গেলেন। একখানি খট্টায় আমাকে শয়ন করাইয়া আপণ-স্বামীকে ডাকিলেন। সে তাঁহার সুপরিচিত বলিয়া বোধ হইল। যদিও আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছিলাম, জ্ঞান হারাই নাই। যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, যাহা যাহা ঘটিতেছিল, বুঝিতেছিলাম। তিনি গৃহস্বামীকে বলিলেন, "ত্রিবিক্রম, সাবধানে ইঁহার শুশ্রূষা কর। ইনি ধনীশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী হেমরাজ। তোমার পরিশ্রম বৃথা যাইবে না। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছি।"

"শ্রেষ্ঠী হেমরাজ! তাঁহার এই দশা! মারী তাঁহাকেও ধরিল!"

মহাপুরুষ তীব্রস্বরে বলিলেন, "তুমি ওকি বলিতেছ? নিতান্ত নির্ব্বোধ তুমি; সূর্য্যাঘাত আর মারী কি এক? পীড়িতের শুশ্রূষা কর, নতুবা ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন না।"

ত্রিবিক্রম দ্বিরুক্তি করিল না। কম্পিত হস্তে একটি উপাধান আনিয়া আমার মস্তকের নিম্নে স্থাপন করিল। সাধুপুরুষ ঔষধপাত্র আমার মুখে ধরিলেন। অতি কষ্টে ঔষধ গলাধঃকরণ করিলাম।

তিনি বলিলেন, "বৎস, এখানে কিছুকাল বিশ্রাম করুন। ইহারা অতি ভদ্রলোক; আপনার যত্নের ত্রুটি হইবে না। আমি বালকটিকে দেখিয়া অতিসত্বর ফিরিয়া আসিতেছি।"

আমি তাঁহার হস্ত বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম; ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম, "আর একটু অপেক্ষা করুন; আমাকে বলিয়া যান, একি মারী?"

তিনি সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, "বোধ হয় না। হইলেই কি! আপনার যে বয়স, যেরূপ সবল শরীর, তাহাতে মারী কিছু করিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম, "মারীর ভয়ে ভীত হই নাই। একটি অনুরোধ আপনাকে রাখিতে হইবে,—আমার এ পীড়ার সংবাদ আমার স্ত্রীকে দিবেন না। প্রতিজ্ঞা করুন, আমি যদি অজ্ঞানও হই, মৃত্যুই ইহার পরিণাম হয়, তবুও আমাকে আমার গৃহে লইয়া যাইবেন না। বাক্য দিন, মহাশয়, প্রতিজ্ঞা করুন। আপনার প্রতিশ্রুতি লাভ না করিলে কিছুতেই আমি শান্তি পাইতেছি না।"

তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি অতি স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইতেছি। মঙ্গলময়ের নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার অনুরোধ,—পরিজনের মঙ্গলের জন্য যে ইচ্ছা, আমার দ্বারা তাহার কখন অন্যথা হইবে না।"

অত যন্ত্রণার মধ্যেও বক্ষ হইতে একটা পাষাণ-ভার

নামিয়া গেল। আমি চাই, আমার বিপদ আমার প্রাণাধিক স্ত্রীকণ্ঠাকে বিপন্ন না করে।

তিনি প্রস্থান করিলেন। ক্রমে আমার জ্ঞান লোপ হইয়া আসিল। কত কি যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম; তাহার সমস্ত স্মরণে নাই; কেবল মনে আছে, নীলা আমার স্বপ্নে জড়িত ছিল। চক্ষের সম্মুখে তাহাকে যেন দেখিতেছিলাম। "নীলা, নীলা, আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, প্রিয়তমা, প্রাণাধিকা এসো, নিকটে এসো!" চীৎকার করিয়া নীলাকে আলিঙ্গন-প্রয়াসে উঠিয়া বসিয়াছিলাম। ত্রিবিক্রম ও তাহার সহচর সবলে আমাকে কঠিন শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল। আর একবার মনে পড়িল—"আমি কোথায়!" চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

"স্থির হন, বৎস, স্থির হন। ভগবানকে ডাকুন, তিনি আপনার সকল যন্ত্রনার লাঘব করিবেন।"

চক্ষু উন্মোচন করিলাম। আমার বিপদের বন্ধু মহাপুরুষ ফিরিয়া আসিয়াছেন। আর একবার ঔষধ দিলেন। তাহা পান করিয়া অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বালকটি এখন কেমন?"

সাধু ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া করজোড়ে বলিলেন, "পরম পিতা, তাহার মুক্ত আত্মার কল্যাণ করুন। সে তাঁহার রাজ্যে মহাপ্রস্থান করিয়াছে!"

মৃত্যু! এত সত্বর!—আমি ধারণা করিতে পারিলাম না। অব্যক্ত বেদনায় বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। চক্ষুর সম্মুখ হইতে সকলি ডুবিয়া গেল। আঁধার! ভয়ানক আঁধার! পৃথিবীর অন্ধকার গর্ভে কে যেন আমাকে নিক্ষেপ করিতেছে! সে স্বপ্ন, না প্রকৃত, বুঝিবার শক্তি নাই। ডুবিতেছি, নিম্ন হইতে নিম্নস্তরে নিমজ্জিত হইতেছি! ঘোর অন্ধকার! বিভীষিকার রাজ্য! এই কি মৃত্যু?

ক্রমশঃ

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

খৃষ্টধর্ম্মের "নববিধান"

হিন্দুসন্তান কাশীতে আসিয়া আর কিছু না দেখিলেও একবার বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করে। সেইরূপ ভারতবাসী বষ্টনে পদার্পণ করিলে অন্ততঃ একবার Unitarian Association অর্থাৎ একেশ্বরবাদীদিগের সমিতিতে আসে। খৃষ্টানসমাজের "ইউনিটেরিয়ান্" সম্প্রদায় যথাসম্ভব নরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরধর্ম্মবিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া এক উদার ও প্রশস্ত মতবাদের উপর মানবজীবন গঠন করিতে চাহেন। কাজেই গোঁড়া খৃষ্টানদের মাপকাঠিতে ইউনিটেরিয়ানেরা হয়ত খৃষ্টান বলিয়া গণ্যই হন না—কিন্তু দুনিয়ার স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী ভাবুক নরনারীগণ ইহাদিগকে ভ্রাতৃত্বের "রাখী" পাঠাইয়া থাকেন। ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্মজীবন, ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে ইউনিটেরিয়ান্ সম্প্রদায় যেরূপ আলোচনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন দেশ, এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের স্বাতন্ত্র্য ও বিভিন্নতা রক্ষা পায়।

গোঁড়া খৃষ্টানেরা বিবেচনা করেন—খৃষ্ট-ধর্ম্ম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম্ম মানবের উন্নতি বিধান করিতে পারে না।

"The old idea of all religions except the Jewish and Christian was that they were utterly bad, superstitious, corrupt aud cruel. While Judaism and Christianity had been revealed, Brahmanism, Buddhism, Confucianism, and in fact, all other world-faiths, had been invented. Christianity alone was true, all other religions were false. They were natural; Christianity was supernatural, and hence alone among them all divinely authoritative and trustworthy."

য়িহুদি ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ছাড়া অপর সকল ধর্ম্মই যারপরনাই খারাপ, কুসংস্কারে পূর্ণ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর। য়িহুদি-ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্ম প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম, অপর সকল ধর্ম্ম—যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, কনফুসিয়াসের ধর্ম্ম, ইত্যাদি—মানুষের কৌশলে উদ্ভাবিত। খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য, অপর সকল ধর্ম্মই মিথ্যা। অপর সকল ধর্ম্ম স্বভাবানুগত, খৃষ্ট-ধর্ম্ম অতিপ্রাকৃত, সুতরাং ভগবৎ-আদিষ্ট ও বিশ্বাসের যোগ্য।

এইরূপ গোঁড়া মত সমালোচনা করিয়া একজন জার্ম্মান-ইয়াঙ্কি ইউনিটেরিয়ান্ পণ্ডিত বলিতেছেন—

"Such a view was derived chiefly from the prevailing ignorance concerning the other great religions of the world. Their traditions were still unknown; their scriptures had not yet been read; their doctrines and development had not been studied."

অন্যান্য ধর্ম্মের সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এরূপ ধারণার কারণ—যাহাদের ঐতিহ্য জানা নাই, যাহাদের শাস্ত্র পড়া নাই, যাহাদের মতবাদ ও উন্নতির ইতিহাস অনায়ত্ত তাহাদিগকে বিচার করিলে এরূপ ভুল হয়ই।

মূর্খের অশেষ দোষ—অজ্ঞ তাহার গৃহ-কোণকেই দুনিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু নানা ধর্ম্ম, নানা দেশ, নানা সাহিত্য যখন কোন ব্যক্তির জ্ঞান-রাজ্যে উপস্থিত হয় তখন কি দেখা যায়? প্রকৃতির বৈচিত্র্য, জীবনের বৈচিত্র্য, কর্ম্মপ্রণালীর বৈচিত্র্য—ইহাদের ভিতর উচ্চনীচ ক্ষুদ্র-মহৎ বিশ্লেষণ করা বড়ই কঠিন। নানা পথে সকলেই এক কেন্দ্রে উপস্থিত হইতেছে। All roads leadto Rome "নৃণাম্ একো গম্যস্ ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।" ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের প্রণালীতে ধর্ম্মতথ্য আলোচিত হইলে এই উদার ধারণাই পুষ্ট হইবে। ইউনিটেরিয়ানেরা এই Comparative Method বা তুলনামূলক প্রণালী অবলম্বনের পক্ষপাতী। এইজন্য ইঁহারা গোঁড়া স্বধর্ম্মী-দিগের সহানুভূতি হারাইয়াছেন—কিন্তু জগতের বিজ্ঞান-সেবী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় ক্রমবিকাশ-পন্থী জনগণের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।

তুলনামূলক আলোচনাপ্রণালী অবলম্বন করিলে বাইবেল-গ্রন্থের কি রূপ হয় তাহা পাদ্রী সাণ্ডারল্যাণ্ডের গ্রন্থপাঠে বুঝা যায়। এই "Higher Criticism" অর্থাৎ উচ্চাঙ্গের সমালোচনার ফলে অন্যান্য ধর্ম্মও খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্গে এক আসনে স্থান পাইবে। (American Unitarian Association) আমেরিকার একেশ্বরবাদীদিগের সমিতির বিদেশী-বিষয়ের কর্ম্মচারী (Foreign Secretary) শ্রীযুক্ত ওয়েণ্ডটে (Wendte) বলিতেছেন—

"Thanks to the researches of eminent scholars, we are arriving at a juster estimate of the part played by the non-Christian religion since the regeneration of mankind. We have come to see that they all have their root in the same soil of human feeling and thought which gave birth to the Jewish and Christian faiths. Deep in human nature lie the instincts, the intuitions, the moral and spiritual capacities to which all great religious teachers appeal and out of which spring the various philosophies and forms of religion. These are all useful to their day and generation, and expressed the degree of ethical insight to which their followers had attained, 'Christianity is not generally distnict from these. She is their younger sister, differing from them mainly in environment and degree of development attained, but sharing with them a common origin and fulfilling a common mission,—to interpret to man the facts of his own spiritual nature and the moral order of the universe; to teach him to look up and away from matter and sense to the spiritual life that is in God."

পণ্ডিতদিগের চেষ্টায় আমরা জানিতে পারিতেছি যে খ্রীষ্টানধর্ম্ম ছাড়া অপরাপর ধর্ম্ম মানবজাতির উন্নতির জন্য কতখানি করিয়াছে। যে চিন্তা ও ভাবের ফলে য়িহুদি ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উদ্ভব, তাহাদেরও মূল সেইরূপ চিন্তা ও ভাবের মধ্যেই। মানব-মনের মধ্যে যে-সমস্ত ভাব ও সংস্কার নিহিত আছে, ধর্ম্মগুরুগণ সেই-সমস্তই উদ্বোধিত করিয়া তোলেন, এবং তাহা হইতে বিবিধ দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্ম্মপ্রণালীর উদ্ভব হয়; সেই-সমস্ত তত্ত্ব ও প্রণালী যে-সময়কার, সে সময়ের উহাই উপযোগী এবং তখনকার ধর্ম্মগুরুদের শিষ্যগণ কতদূর নৈতিক দৃষ্টি লাভ করিয়াছিল তাহারই পরিচায়ক। খ্রীষ্টের ধর্ম্ম এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহাদের অনুজ, তফাৎ শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থানের এবং পূর্ব্বজদিগের জ্ঞানের সুযোগ পাইয়া পরবর্ত্তী কে কতখানি উন্নততর হইতে পারিয়াছে তাহারই তারতম্যে।—বস্তুত কিন্তু সকলের জন্মকারণ একই এবং উদ্দেশ্যও একই—মানুষকে তাহার আধ্যাত্মিক দিকটা সমঝাইয়া জগৎসংসারের নৈতিক প্রতিষ্ঠাটা বুঝাইয়া দেওয়া; যাহা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় তাহা ছাড়িয়া মানুষকে ঈশ্বরের মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিকতার দিকে লইয়া যাওয়া।

ধর্ম্মজীবনবিষয়ক তথ্যসমূহের বিশ্লেষণে তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালী (Higher Criticism), ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক সমালোচনা ইত্যাদি অবলম্বিত হইলে মানবাত্মার ক্রমবিকাশ স্পষ্টতর হইতে থাকিবে। চিত্তের উৎকর্ষসাধন, আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান, শরীর ও মনের সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় এবং আত্মার পরস্পর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা পরিস্ফুট হইবে। তখন দেখা যাইবে যে গীত, লোকসাহিত্য, নৃত্য, বাদ্য, শোভাযাত্রা, পূজা, আরতি, ব্রতানুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কণ, মূর্ত্তিগঠন, দেবালয়স্থাপন, ধ্যান, আরাধনা, কবিতাআবৃত্তি, মন্ত্রপাঠ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ইত্যাদি সকল বস্তুরই ধর্ম্মজীবনে যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই-সমুদয়ের কোনটিকে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। সমাজসেবা, লোকহিত, সংযমপালন এবং প্রার্থনা ছাড়াও এই সমুদয় অনুষ্ঠান মানবজীবনের পক্ষে ন্যূনাধিক পরিমাণে আবশ্যক। টেনিসনের কয়েক পংক্তি মনে পড়িতেছে।

Where is one that, born of woman, altogether can escape
From the lower world within him, moods of tiger or of ape?
Man is yet being made, and ere the crowning Age of ages,
Shall not æon after æon pass and touch him into shape?"

হিন্দুধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যের আলোচনায় (Comparative Method) তুলনায় সমালোচনা এবং (Higher Criticism) উচ্চাঙ্গের সমালোচনা অবলম্বিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে প্রথমতঃ ক্রমবিকাশমান বিরাট হিন্দুসভ্যতার বিশ্বমূর্ত্তি দেখিতে পাইব। বুঝিতে পারিব যে, বৈদিকযুগেই, অথবা উপনিষদ-বেদান্তের যুগেই হিন্দুত্ব ফুরাইয়া যায় নাই। বুঝিতে পারিব যে, সকল যুগেই ভারতে ধর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—আমাদের জাতীয় জীবনগঙ্গা পুরাণ-তন্ত্রের গহনবনে আসিয়া শুকাইয়া যায় নাই। পুরাণ-তন্ত্রের যুগেও বেদ-উপনিষদ্-বেদান্তের জীবনধারা নবরূপে প্রবাহিত হইতেছিল। এখনও নূতনরূপ পরিগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের জন্য হিন্দুধর্ম্ম নবনব ধর্ম্মবীরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে। কাজেই বিংশশতাব্দীর হিন্দু-নরনারী কোন প্রাচীন বেদগ্রন্থ মাত্রের উপর নির্ভর না করিলেও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষবিধানের জন্য নবনব বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-সংহিতার সাহায্য পাইবেন।

ওয়েণ্ডটে বলিলেন—"মহাশয়, আপনি কলিকাতার New Dispensation বা "নববিধান"-সমাজের সংবাদ রাখেন কি? ইঁহাদের সভ্যসংখ্যা দুই তিন শত মাত্র। কিন্তু ইঁহারা বক্তৃতায় বাগাড়ম্বর অত্যধিক করেন। দুনিয়ার লোকই যেন ইঁহাদের সমাজের অন্তর্গত!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইঁহারা কি নিজ "সমাজের মাহাত্ম্য এই ভাবে প্রচার করেন—না স্বকীয় আদর্শ ও মতবাদের বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে এইরূপ গৌরব করেন? আদর্শ প্রচার সম্বন্ধে এইরূপ তেজস্বিতা বাঞ্ছনীয় নহে কি?" ওয়েণ্ডটে বলিলেন—"কথাটা যদি বক্তারা খুলিয়া বলেন তাহা হইলে গোলযোগ থাকে না। দূর হইতে আমাদের কানে অনর্থক বাগাড়ম্বরগুলি বড়ই বিকট লাগে। "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" এবিষয়ে বেশ সংযত।"

ওয়েণ্ডটের মতে ভারতবর্ষীয় লোকেরা বড়ই "গুরু"-বাদী। চরিত্রবান্ অথবা প্রতিভাবান্ কোন নরনারী প্রাদুর্ভূত হইলে ভারতবর্ষে তাঁহাদের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যভোগ আরম্ভ হয়। "অল্পকালের ভিতরেই আপনাদের দেশে 'ঋষি', 'মহর্ষি', 'মহাত্মা', 'পরমহংস', 'স্বামী' ইত্যাদি কত হইয়াছেন! এমার্সন ভারতবর্ষে জন্মিলে আজ হয়ত "অবতার" বিবেচিত হইতেন। কিন্তু ইয়াঙ্কিরা এমার্সনের মত ব্যক্তিকে লইয়াও বেশী মাতামাতি করে না।"

অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়কে ওয়েণ্ডটে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় মৈত্রেয় মহাশয় নাকি বলিয়াছেন—"হিন্দুরা বড়ই হৃদয়বান জাতি, লোকজনকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। আমরা ভক্তিপ্রবণ ও উচ্ছ্বাসময় জাতি—বিশেষত্বশীল অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট আমাদের মস্তক আপনা-আপনিই অবনত হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইয়াঙ্কিস্থান ত ডিমক্রেসি বা সাধারণ তীর্থক্ষেত্র, কিন্তু ইয়াঙ্কিরাও কি Aristocracy বা শক্তি-তন্ত্র ও গুণতন্ত্রের পক্ষপাতী নহেন? দুনিয়া কি সাধারণ শক্তিতে আপনা-আপনি চলিতেছে—না অ-সাধারণ ক্ষমতায় চালিত হইতেছে? শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থার চরম লক্ষ্য কি?—Average অর্থাৎ সাধারণ রামাশ্যামা তৈয়ারী করা, না genius বা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাসম্পন্ন কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর তৈয়ারী করা?" ওয়েণ্ডটে বলিলেন—"মহাশয় আমেরিকায় জর্জ্জ ওয়াশিংটনের আমলে Aristocracy ছিল—তিনি লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে উনিশবিশ, উচ্চনীচ ভেদ জ্ঞান করিয়া চলিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ সে সব চলিয়া গিয়াছে—এব্রাহাম লিঙ্কলনের যুগ হইতে আমরা পুরাপুরি সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী হইয়াছি। সভাপতি লিঙ্কলন নিতান্তই সাদাসিধা লোক ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে কোন লোক তাঁহাকে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বিবেচনা করিতেই পারিত না। এমার্সনেরও জীবন অত্যন্ত সাধারণ ধরণের ছিল। রাস্তাঘাটের লোকজন হইতে ইঁহাকে পৃথক করা কঠিন ছিল।"

আমি বলিলাম—"গুণতন্ত্র, বা শক্তিতন্ত্র য়্যারিষ্টক্রেসির নিয়মে "অসাধারণ" ব্যক্তিগণ অহঙ্কারী, উচ্চাধিকারাকাঙ্ক্ষী বা যশঃপ্রার্থী হইবেন—কে বলিল? প্রতিভাবান্ ব্যক্তি অহঙ্কারীই হউন অথবা সাদাসিধাই হউন—আমাদের তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ চরিত্রের পার্থক্যে আমরা হয়ত তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইবার সময়ে উনিশ-বিশ করিব। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমরা পঞ্চাশ হাজার কিম্বা তিনকোটি নরনারীর মধ্য হইতে এক, দুই বা দশজন

লোককে বাছিয়া আমাদের নেতৃত্বপদে বরণ করিলাম সেই সময়ে আমরা কি সাধারণতন্ত্রের প্রভাব স্বীকার করিতেছি, না শক্তিতন্ত্র ও গুণ-তন্ত্রের নিয়মানুসারে কাজ করিতেছি? আমেরিকার ইয়াঙ্কিরা যদি পুরাপুরি ডিমক্র্যাট বা সাধারণতন্ত্রবাদী হইত তাহা হইলে তাহারা রামাশ্যামাকেও ওয়াশিংটন-লিঙ্কলন-এমার্সনের পদে প্রতিষ্ঠিত করিত। কিন্তু তাহা ত কেহই করে নাই। উচ্চনীচ, সাধারণ-অসাধারণ, average ও genius ইত্যাদি ভেদ এবং অনৈক্য, জগতে স্বাভাবিক। এই ভেদ স্বীকার না করিয়া কাহারও চলা অসম্ভব। জগতের উন্নতি, উচ্চতর অসাধারণ *genius hero* ইত্যাদি ব্যক্তিগণের কর্ম্মফল। এমার্সন এইরূপ একজন বীর—য্যাব্রাহাম লিঙ্কলন্ এইরূপ একজন বীর—তাঁহারা অন্যান্য ইয়াঙ্কি হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ মিল্টন সম্বন্ধে বলেন—"Thy soul was like a star and dwelt apart". ইঁহারা সাধারণ লোকজনের সঙ্গে সাদাসিধাভাবে মিশিতেন সন্দেহ নাই—কিন্তু ইঁহারা কি এই কারণে তাহাদের সমান মাত্র ছিলেন? আমি অসাম্য চাহি—অনৈক্য চাহি—aristocracyর প্রবর্ত্তন চাহি—geniusএর উদ্ভব দেখিতে চাহি-শক্তিমানের প্রাধান্য চাহি—গুণবানের কর্ত্তৃত্ব চাহি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলুন, রাষ্ট্রকেন্দ্র বলুন-সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ বীরপুরুষ তৈয়ারী করিবার সুযোগ থাকা আবশ্যক।"

ওয়েগুটে বলিলেন—"মহাশয়, এই ব্যবস্থায় গুণবান্ ব্যক্তিগণের একাধিপত্য এবং ক্রমশঃ অত্যাচার আসিয়া উপস্থিত হয় না কি? মানুষের স্বভাব বড়ই অবিশ্বাসযোগ্য। আজ যিনি ভক্তি ও পূজার পাত্র কাল তিনি মদমত্তপাষণ্ড। পূজা খাইতে খাইতে মানুষেরা অন্ধ হইয়া পড়ে। এইজন্য প্রথম হইতেই কোন ব্যক্তি বা জাতিকে উচ্চ অধিকার না দেওয়াই ভাল।"

আমি বলিলাম—"লোকচরিত্র যদি স্বভাবতই এইরূপ দূষিত হয় তাহার জন্য দুঃখ কি? যুগে যুগে নূতন নূতন গুণীব্যক্তি নূতন নূতন hero, নূতন নূতন কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর আমাদের পূজা পাইবেন। প্রত্যেক ত্রিশবৎসর পরেই হয়ত মানবসমাজে নবনব "গুরু" এবং পথপ্রদর্শকের আবির্ভাব হইবে। মদমত্ত পুরাতন গুরু প্রত্যাখ্যাত হইবেন—এবং উদীয়মান নবীন বীর জনসমাজের হৃদয়-সিংহাসনে বসিবেন। নীট্‌শের ভাষায় কালোপযোগী এইরূপ নবীন সমাজ গঠনের নাম Transvaluation of Values, কথাটা একেবারেই নূতন নয়। জগতে চিরকাল এইরূপই ঘটিয়াছে। ইয়াঙ্কিস্থানেও এইরূপই কার্য্যতঃ ঘটিতেছে। কেবল কথার মারপ্যাচে "ডিমক্রেসী" শব্দটা দুনিয়ার রাষ্ট্রমহলে সুপ্রচলিত হইয়াছে। অথচ সর্ব্বত্রই aristocracyর প্রভাব দেখিতে পাই। কাজেই এক্ষণে সূত্র পারিভাষিক শব্দ এবং ফর্ম্মুলা বর্জ্জন করিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করা কর্ত্তব্য যে, মানবসমাজের পক্ষে সকলক্ষেত্রে aristocracyই বাঞ্ছনীয় এবং আবশ্যক, কোনক্ষেত্রেই "ডিমক্রেসী" নয়।

ওয়েগুটে বলিলেন—"মহাশয়, আপনি জাতিভেদের এবং ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের দেশ হইতে আসিতেছেন। আপনার পক্ষে aristocracyর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন স্বাভাবিক।"

আমি বলিলাম—"আমি সাধারণ-তন্ত্রের মূল্যও স্বীকার করি—ইহার দ্বারা দুনিয়ার প্রত্যেক কেন্দ্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্ট হয়—নব নব অঞ্চলে নব নব ক্ষমতা-বিকাশের সাহায্য প্রদত্ত হয়। ইহা একটা educative process মাত্র—একটা উপায় ও প্রণালী মাত্র—ইহা মানবসমাজের লক্ষ্য হইতে পারে না। লক্ষ্য হইবে ব্যক্তিত্ব বিকাশ, অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন নরনারীর সৃষ্টি—যাহারা বর্ত্তমানকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন বিশ্ব গড়িতে পারে সেইরূপ লোকের আবির্ভাবেই জগতের উন্নতি হয়। যাহারা কোনমতে মামুলি গতানুগতিক জীবনধারার সূত্র রক্ষা করিয়া চলিতে পারে তাহাদের হ্রাসবৃদ্ধিতে জগতের বেশী আসে যায় না। যাহারা চিন্তার কর্ম্মের সভ্যতার জীবনের পুরাতন মাপকাঠি বদলাইয়া নূতন মাপকাঠির প্রবর্ত্তন বা ইঙ্গিত মাত্র করিতে পারে, সেইরূপ নরনারীর উদ্ভবই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কাজেই অসাম্যের পথ বিস্তৃত রাখা নিতান্ত আবশ্যক।"

ওয়েগুটে বহুবার ইয়োরোপের নানাদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। ইউনিটেরিয়ান সমিতির নায়কতায় জগতের নানা কেন্দ্রে স্বাধীনতাপ্রিয় ধর্ম্মসমাজের ক্ষুদ্রবৃহৎ সম্মিলন হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে লণ্ডন আমষ্টার্ডাম জেনেভা

বষ্টন বার্লিন এবং পারী নগরে এইরূপ সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্ম্মানি ইতালী সুইজলণ্ড হল্যাণ্ড ডেন্‌মার্ক নরওয়ে হাঙ্গারী আমেরিকা ও ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের বহু পৃষ্ঠপোষক আছেন। অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ভারতীয় সমিতির ধুরন্ধর। এই বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানের নাম "International Congress of Free Christians and other Religious Liberals." এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য—"To open communication with those in all lands who are striving to unite pure religion and perfect liberty, and to increase fellowship and co-operation among them.". সর্ব্বদেশে যাঁহারা পবিত্র ও নির্ম্মল ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে মিলাইতে চাহেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের সুবিধা করা এবং তাঁহাদের সৌহৃদ্য ও সহকারিতা প্রবর্দ্ধিত করা। যাঁহারা পৃথিবীর ধর্ম্মসাহিত্য-গুলি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের প্রণালীতে আলোচনা করিতে চাহেন তাঁহারা এই সম্মিলনসমূহের কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইয়া থাকেন। Comparative Literature, Comparative Philosophy, Comparative Religion এবং Comparative Sociology ইত্যাদি তুলনাসিদ্ধ বিদ্যাসমূহের প্রবর্ত্তকগণ ভারতবর্ষেও এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ওয়েণ্ডটে এইবার সদলবলে ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন—মাদ্রাজে Theistic Conferenceএ ইঁহাদের উপস্থিত হইবার কথা ছিল। বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রসমরের প্রভাবে ইঁহাদের ভারতাভিযান স্থগিত রহিয়াছে। ওয়েণ্ডটের গৃহে মাদ্রাজ-অঞ্চলের খৃষ্টানমিশন-কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের চিত্র দেখিলাম। "দেবালয়" সংক্রান্ত ইংরেজী রিপোর্ট একখানা সম্মুখেই পড়িয়া ছিল। ওয়েণ্ডটে "Indian Messenger"এ প্রকাশিত ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরিক গণ্ডগোল সম্বন্ধে এক মন্তব্য বষ্টনের কাগজে পাঠাইলেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ফটোগ্রাফ দেখাইয়া ওয়েণ্ডটে বলিলেন—"ভারতবর্ষ হইতে এরূপ প্রতিভাবান লোক আমেরিকায় বোধ হয় আর কেহ আসেন নাই।"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

দেশের কথা

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সমভাবেই চলিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে ছিল, এখন পশ্চিমবঙ্গেও বিস্তৃত হইতেছে। বাঁকুড়া জেলায় অন্না-ভাব ক্রমশঃ নিদারুণ হইয়া উঠিতেছে। প্লাবনের জলরাশি বহু জনপদ ও শস্যক্ষেত্র হইতে এখনো সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নাই—রিক্ত সর্ব্বহারাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। তবুও এই দুর্গতির অন্ধকারে আমরা একেবারে নিরাশ হই নাই—দেশবাসী তাঁহাদের যথাসাধ্য সাহায্য হাতে লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তবে একথা বলিতে হইবে সাহায্য তাঁহারাই করিতেছেন যাঁহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যৎসামান্য উপার্জ্জন করেন, যাঁহাদের বিস্তীর্ণ জমিদারী নাই বা যাঁহাদের ব্যাঙ্কের বড় বড় খাতাও নাই—এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, দেশবাসীর অভাবের কথা তাঁহাদেরই মনে আঘাত করিয়াছে যাঁহারা নিত্যনিয়ত অভাবের মধ্যে বাস করেন। আমাদের দেশে ধনকুবের উকিল অনেক আছেন, ধনী জমিদারেরও অভাব নাই; তাঁহারা নিরন্নের দুর্দ্দশা-মোচনের জন্য কে কি করিতেছেন জানিতে পারিলে সুখী হইতাম। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে সার রাসবিহারী ঘোষের নাম; "বগুড়া-হিতৈষী"তে প্রকাশ তিনি দুর্ভিক্ষের জন্য ২,৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। আমাদের মনে আছে দামোদরের বন্যার সময়ও তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তাঁর বিপুল দানের কথা কাহারো অবিদিত নাই। তিনি সার্থক ধনী।

পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষপীড়িত জনপদসমূহে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম মুসলমান-সমাজের ধনীগণ তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই প্রসঙ্গে "মোসলেম-হিতৈষী" লিখিতেছেন—

এক বিশাল সম্প্রদায়ের খয়েরখাগণ এই ব্যাপারে একেবারে নীরব। দেশে কোন বিপদ আসিলেই বার আনা মুসলমান তাহাতে জড়িভূত হইবে, ইহা আমরা জানি। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছে। এই বিপদানলে দগ্ধীভূত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়া যাঁহাদের কর্ত্তব্য, মুসলমানসমাজের ধনী, গনি, জমিদার, নওয়াব, আমির, ওমরা প্রভৃতি দল তাহাতে উদাসীন। ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ঢাকা, ময়মনসিংহ জেলা মুসলমান জমিদারে পূর্ণ এবং এই জেলাগুলির মধ্যেই যত নওয়াব ও আমির-ওমরার ছড়াছড়ি। দেশবাসী

দূরের কথা, স্বীয় প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিতে, বিপদকালে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে, একমুষ্টি ক্ষুধার অন্ন মুখে তুলিয়া দিতে, তাঁহারা যে ভাবে কৃপণতা ও উদাসীনতার পরিচয় দিতেছেন ইসলামের পক্ষে তাহা কলঙ্কের কথা। এই অঞ্চলে এতগুলি সমাজনেতা থাকিতে, এতগুলি নামকাটা সেপাই থাকিতে, এতগুলি সমাজের জন্য মুখে আত্মোৎসর্গকারী জীব বর্ত্তমান থাকিতে কাহারও সাড়া শব্দ না পাইয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। যে ত্রিপুরা অন্নকষ্টে ত্রাহি-ত্রাহি, সেখানে গণ্ডা-গণ্ডা নওয়াব থাকিতে প্রজাহিতে তাঁহাদের নাম নাই কেন? কেহ কেহ বলেন, ইঁহারা কৃষিলোনে বহু টাকা ঢালিয়াছেন, আমরা জানিতে পারিলে সুখী হইব সে কোন্ গ্রামে, কাহার বাড়ী এবং কোন্ পরিবারের মধ্যে? তারপর ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা এখানেও মুসলমান ধনী জমিদারের অভাব নাই। কিন্তু সকলেই এক পথের পথিক—কেবল আত্মসুখে বিভোর।

"গৌড়দূত" মালদহের দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিয়া লিখিতেছেন—

আজকাল প্রায়ই দেখা যাইতেছে যে, সাঁওতাল ও সাঁওতাল-রমণীগণ বনে বনে অনুসন্ধান করতঃ মৃত্তিকানিম্নস্থিত মেটে আলু সংগ্রহ করিবার জন্য দলে দলে গমন করিতেছে। ইহাই এক্ষণে তাহাদের জীবনরক্ষার মূলীভূত খাদ্য। সহরে বসিয়া যখন আমরা অহরহ এইরূপ দুর্ভিক্ষপীড়িত শত শত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি তখন মফঃস্বল-গ্রামসমূহে যে কত কত পরিবার দিনান্তেও উদরপূর্ণ করিতে পারিতেছে না ইহা সহজেই বুঝা যায়।

"২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ" পরগণায় অন্নকষ্টের সংবাদ দিয়াছেন—

২৪ পরগণা বাদুড়িয়া থানার অধীন লক্ষ্মীনাথপুর গ্রামে ৬০ ঘর লোকের বাস; তাহার মধ্যে ৪০ ঘর লোকেরই অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। কয়েক দিবস বৃষ্টি হওয়াতে কাষ্ঠের অভাব ও চাউলের দারুণ অভাব হইয়াছে। কাহারও কাহারও উনুন উর্ণনাভজালেও ঘিরিয়াছে।

কাঁথির "নীহার" মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিয়াছেন—অতিবৃষ্টিতে সুবর্ণরেখা নদীর জল বৃদ্ধি পাইয়া অধিকাংশ শস্যক্ষেত্র ভাসাইয়া দিয়াছে। পাঁচশতাধিক প্রজার বসতি আছে এমন কয়েকটি গ্রামে প্রায় একশত ঘর প্রজা সম্পূর্ণ অন্নাভাবে মরণাপন্ন হইয়াছে। "স্বরাজ" ফরিদপুরে ভীষণ বন্যার সংবাদ দিয়াছেন। গোয়ালন্দ মহকুমার প্রায় সমস্ত অংশই পদ্মার বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে। ইহাতে কৃষককুলের মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। "পুরুলিয়া-দর্পন" সংবাদ দিয়াছেন মানভূম জেলায় কোনো কোনো অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশে স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। এমন বৎসর যায় না যখন কোথাও-না-কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা না দ্যায়। য়ুরোপ আমেরিকা জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশে দুর্ভিক্ষ নাই। তাহার কারণ সে-সব দেশে অর্থাগমের নানান্ পথ খোলা আছে। দেশে শস্য না জন্মিলেও অন্য-দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করা অসম্ভব নয়, কারণ অর্থ আছে। আমাদের দেশে কৃষিজীবীসম্প্রদায়ের অর্থ নাই, শস্যের উপর তাহারা সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাই অজন্মা হইলে তাহাদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। আমাদের দেশে স্থায়ীভাবে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইলে ধনাগমের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বরিশালের "কাশীপুর-নিবাসী" চিন্তা করিয়াছেন, সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। "কাশীপুর-নিবাসী"র প্রস্তাবে ভাবিবার কথা যথেষ্ট আছে—আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

আমরা দেখিতে পাইতেছি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানগণ নিজহস্তে হলচালনা করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে বাধ্য হইবেন। নতুবা ধ্বংসমুখে পড়িতে হইবে। এখন যেমন নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের লোকে সমাজচ্যুত হয়েন, লাঙ্গল ধরিয়া নিজ হস্তে চাষ করিলেও ঐ-সব লোক সমাজের চক্ষে হীন হইবেন না।

পূর্ব্ববঙ্গের ভিতর বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ঢাকাবিভাগের লোক বিদেশে চাকুরী অথবা ব্যবসাবাণিজ্যোপলক্ষে গমন করিতেছেন। গত কয়েক বৎসর হইতে বাকরগঞ্জ জিলা প্রভৃতি অপরাপর জিলার লোকেও বিদেশে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা শুভ লক্ষণ বটে। কিন্তু ইহা হইলেও পর্য্যাপ্ত হইল না। দুই দশ জনের অন্নসংস্থান হইলে ত সমগ্র দেশের দুঃখ ঘুচিল না। অর্থোপার্জ্জনের নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করিতে হইবে। আপাততঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে ও জমি সংগ্রহ করিয়া কৃষিকার্য্যে মধ্যবিত্ত লোককে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আমাদের দেশে জমি এখনও অনেক পাওয়া যায়। ইহাতে অধিক মূলধনের আবশ্যক হয় না; যাহাদের তাদৃশ সংস্থানও নাই, চেষ্টা করিলে সংগ্রহ করিতে পারেন। ভদ্র-সন্তানের পক্ষে অন্তরায় লোকাভাব। কিন্তু যত্ন ও চেষ্টা করিলে এ অভাবও দূর করা যায়।

বিহার প্রদেশে ও সাঁওতাল পরগণায় লোক পাওয়া যায়। ঐ-সব দেশ হইতে লোক আনাইয়া এদেশে বাস করাইয়া তাহাদের দ্বারা কার্য্য চালাইতে পারা যায়। জীবনরক্ষার জন্য মধ্যবিত্ত লোককে ব্যবসা অথবা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইতেই হইবে। নতুবা রক্ষা নাই। গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। শিল্প ও বাণিজ্য এখন পরহস্তগত। গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে কিয়ৎ পরিমাণে ফিরিয়া পাওয়া যাইতে পারে। ইউরোপীয়েরা আজকাল ভারতবর্ষের ভিতরেও বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাদের সহিত প্রতিযোগীতায় আমরা পারিব না। সুতরাং বিস্তীর্ণ বাণিজ্যে লিপ্ত হইবার অবস্থা

আমাদের নাই। যতদিন পর্য্যন্ত যৌথ-কারবার আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ না করিবে ততদিন পর্য্যন্ত বড় বড় ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ আমরা করিতে পারিব না। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে আমাদের লিপ্ত হইতে হইবে।

অনেক ইউরোপীয় লোকে নীলের চাষ ও চা বাগান করিয়া ব্যবসা করিয়া থাকেন। তাহারও জমির অসদ্ভাব হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ মাইল পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীরে পাট, তূলা ও কাগজের অনেক কল কারখানা গত ৪০।৫২ বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক কলে প্রত্যহ ৩।৪ হাজার জন করিয়া মজুর কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের অবস্থা মন্দ নহে। হিন্দুস্থানী উড়িয়া ও বাঙ্গালী তিন প্রকার লোকেই কার্য্য করিয়া থাকে। অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানও এই-সমস্ত কলে বাইস-ম্যানের ও "ফিটারের" কাজে নিযুক্ত থাকিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কেহই তাহাদিগকে অশ্রদ্ধা করে না। বরং যাহারা লোহা পিটাইয়ের কাজ করিতে শিখিয়াছে তাহাদের উপার্জ্জনও অধিক। আবার যাহাদের শিক্ষা সামান্য তাহারা কেরাণীগিরি করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গ নদীমাতৃক দেশ। ষ্টীমার এবং রেলওয়ে প্রায় সমস্ত প্রদেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাল বহন করিয়া নানা দেশে পৌছাইয়া দিতেছে। দুঃখের বিষয় কলকারখানা এদেশে এ পর্য্যন্ত সংস্থাপিত হয় নাই। পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ জিলাতেই প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মিয়া থাকে। জুট মিল প্রতিষ্ঠিত হইলে বোধ হয় বিস্তর উপকার হয়। কানপুরে দুইটি কলে সতরঞ্চী জাজিম, বিছানার চাদর তাম্বুর কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রীত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ঐপ্রকার একটি কল প্রস্তুত হইলে বেশ চলিতে পারে। পাঁচ কোটি লোকের যে দেশে বাস তথায় এই প্রকার ২।১টি কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীত হইয়া যে কল-প্রতিষ্ঠাকে লাভবান করিতে পারে এবিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তা ছাড়া অন্ততঃ পক্ষে ২।৩ হাজার লোকের মজুরীরও এইসব কলে স্থান হইতে পারে। এইরূপ একটি কল প্রতিষ্ঠা করিতে ৮।৯ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

"রত্নাকর" সংবাদ দিয়াছেন কাঁথির "নীহার" পত্রিকায় প্রকাশ—

কাঁথি অঞ্চলে অনেক স্থানে নাকি গোপনে গো-হত্যা ব্যাপার চলিতেছে। দুর্ব্বৃত্তগণ নাকি লোকের গোয়াল হইতে ও মাঠ হইতে গরু চুরি করিয়া মাংস ও চর্ম্ম সংগ্রহ করিবার জন্য বধকরিতেছে। দুর্ব্বৃত্তদিগের অত্যাচারে এপর্য্যন্ত নাকি অনেক গরু বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয় যে এপর্য্যন্ত পুলিশ ও জনসাধারণ বিস্তর চেষ্টা করিয়া আজ পর্য্যন্ত একজন দুর্ব্বৃত্তকেও ধরিতে পারিল না। ইহাতে তাহাদের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষক মহলে সেই জন্য অত্যন্ত হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। গোধনই যাহাদের একমাত্র উপজীবিকা তাহাদের দুর্গতির কি সীমা আছে? ব্যাপার অত্যন্ত সাংঘাতিক। এবিষয়ে বিশেষ তদন্তের বন্দোবস্ত না করিলে আর উপায় নাই। দুর্ব্বৃত্তগণ অত্যন্ত দুঃসাহসী ও বুদ্ধিমান। সুতরাং তদনুযায়ী তদন্তের ব্যবস্থা না করিলে ইহার প্রতিকার হইবে না। আমরা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

আজকাল বাংলাদেশে একটা কিছু ঘটিলেই হুজুক করিয়া সভা আহ্বান করিয়া গোলমাল করা, সকালে উঠিয়া চা পান করার মতই স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। যার-তার জন্য স্মৃতি সভা আহ্বান করা এরূপ একটি স্বভাব। স্নেহলতার মৃত্যুর পর হইতে বরপণ-নিবারণী সভা আহ্বান করা আর একটি স্বভাব। বলা বাহুল্য এরূপ সভায় আন্তরিকতা মোটেই নাই, সমস্তই মিথ্যা অন্তঃসারশূন্য। এ সম্বন্ধে "বরিশাল-হিতৈষী"র মতের সঙ্গে আমাদের মত সম্পূর্ণ মিলিতেছে। "বরিশাল হিতৈষী" লিখিয়াছেন—

গত সপ্তাহে কলিকাতায় প্রজাপতি-সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক তিথি উপলক্ষে সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতায় বরপণের নিন্দা যথেষ্ট হইয়াছে, আমাদের দেশের আশাস্থল যুবকদিগকে বরপণ নিবারণের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করাও হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ নাই কেবল একটি কথা যে সভার উদ্যোগ ও চেষ্টায় বরপণ নিবারণ ব্যাপারটা কতদুর অগ্রসর হইয়াছে। অথবা সভার কোন্ কোন্ হোমরা-চোমরা মেম্বর বিনাপণে আপন পুত্রাদির বিবাহ দিয়াছেন, অথবা একজনও গরীবের মেয়ে গৃহে আনয়ন করিয়াছেন কিনা। আমাদের দেশের এই প্রকারের কতগুলি ফ্যাসনের সভা সমিতির কার্য্য দর্শনে আমাদের বড়ই বিরক্তি ধরিয়া যাইতেছে। ইহার নেতৃবৃন্দ চিন্তা করিয়া কোনও কাজ করেন না, কোনও ব্যক্তি উদ্যোগ করিয়া ডাকিলে সভায় উপস্থিত হন—মামুলী গৎ-আওড়িয়া বক্তৃতা করেন, বাড়ীতে যাইবার পথে আপন বক্তৃতা আপনারা বেশ করিয়া মন হইতে মুছিয়া ফেলেন, তারপর স্বার্থ হিসাবে মতলব-মত যদৃচ্ছ কার্য্য করেন। আচ্ছা আমরা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি স্নেহলতার মৃত্যুর পরে যে-সমস্ত যুবককে দস্তখত করাইয়া প্রতিজ্ঞা করান হইয়াছিল, তাহাদের নামের তালিকাটা আছে কি? যদি থাকে তবে আমাদের অনুরোধ উহা প্রকাশ করিয়া সমাজে দেখান হোক কয়জন যুবক সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে বিনাপণে বিবাহ করিয়াছে। বৃথা প্রহসনে সমাজ রক্ষা পাইবে না।

"বীরভূমবাসী"ও এই প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

প্রজাপতি সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সমিতির প্রধানতম উদ্দেশ্য পণপ্রথার বিলোপ সাধন। তৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ বক্তৃতা দিয়াছেন। বিবাহে পণপ্রথা যে নিতান্তই গর্হিত প্রথা তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, অথচ পণহীন বিবাহও অদ্যাপি শ্রুতিগোচর হইল না ইহাই বিষম সমস্যা। যে প্রথা সকলেই নিন্দনীয় বলিয়া স্বীকার করেন তাহা সমাজে আবার স্থান পায় কি প্রকারে ইহা এক প্রকার হেঁয়ালী বিশেষ। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি এবং সমাজ সমষ্টিরই নামান্তর, সুতরাং ব্যক্তিগত হিসাবে যাহা স্বীকার্য্য তাহা সমষ্টিভাবেও তেমনি স্বীকার্য্য; কিন্তু এমনই দুরদৃষ্ট যে বচনের বাহিরে আমরা অস্তিত্বহীন বলিয়া "ফলেন-পরিচীয়তে" কথা আমাদের বক্তৃতা-কল্পবৃক্ষের নিকট আদৌ খাটে না। সংসারধর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই বিবাহ একটি অত্যাবশ্যক সংস্কার, অথচ কন্যার পিতা বিবাহের প্রস্তাব লইয়া পুত্রের পিতার দ্বারস্থ হইলে শেষোক্ত পিতা মহাশয় একবারে ষোলআনা গরজ সমঝিয়া পুত্র-দ্রব্যটিকে তুলাদণ্ডে চাপাইতেও ছাড়িবেন না এবং কন্যার পিতার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া মুদ্রা শোষণ করিয়া পুত্রের গুরুত্বের হিসাবটা টাকার ওজনে বুঝিয়া লইবেনই লইবেন।

এই প্রসঙ্গে "২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহে" প্রকাশিত একটি বিবাহ-বিভ্রাটের সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

মহেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ও তাহার ভ্রাতা ক্ষীরোদের সহিত রাণীবালা বাঁকুড়া হইতে কলিকাতায় আইসেন। মহেন্দ্র রাণীবালার কন্যা সরলার সঙ্গে ক্ষীরোদের বিবাহের প্রস্তাব করেন। রাণীবালা ২০০০৲ পণ দিবেন ধার্য্য হয়। রাণীবালার হাতে টাকা না থাকায় মহেন্দ্রের যুক্তিমত জমী বন্ধক রাখিয়া টাকা তোলার কথা হয়। রাণীবালা জমী বন্ধক রাখিয়া ১৯২৫৲ পান এবং এই টাকা মহেন্দ্রকে দেন। পরে বিবাহের কথায় গোল বাঁধিলে রাণীবালা টাকা ফিরাইয়া চাহেন। তখন মহেন্দ্র বলে যে যদি রাণীবালা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি মহেন্দ্রের নামে হস্তান্তরিত করিয়া না দেন তবে তিনি টাকা পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিবেন না। রাণীবালা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মহেন্দ্রের নামে নালিশ করেন। বিচারে তাহার প্রতি ৬ সপ্তাহের কারাবাস ও ১০০০৲ অর্থদণ্ড হয়।

আসামী হাইকোর্টে আপীল করে। গত বৃহস্পতিবার আপীল নামঞ্জুর হইয়াছে।

বিচারকের আসনে বসিলেই মানুষকে দয়াধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। কঠিন শাস্তি দিলেই বিচার করা হয় না—হয়ত অবিচার করা হয় কিন্তু সুবিচার করা হয় না। বিচারককে দেখিতে হইবে আসামী কোন্ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া দোষ করিয়াছে। অনেক সময় দেখা যায় ক্ষুধা বা অভাবের তাড়নে পাগল হইয়া মানুষ চুরি করে। যেমন করিয়াছিল Les Miserables-এর জাঁ ভালজাঁ (Jean Valgean)। জাঁ ভালজাঁ সুবিচার পায় নাই। বরিশালের "কাশীপুর-নিবাসী" একজন যথার্থ বিচারকের পরিচয় দিয়াছেন। ঘটনাটি দুর্ভিক্ষের একটি করুণ চিত্র, নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গৌরনদী থানার অধীন চাউলাকাঠী নিবাসী মফেজদ্দী, শোলক নিবাসী কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ১ ছড়া কলা ও ১ খানা মৎস্য ধরিবার ছোট চাই (মৎস্য ধরিবার খাচা) চুরি করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া স্থানীয় ডিপুটী মেজিষ্ট্রেট বাবু অতুলচন্দ্র কর মহাশয়ের আদালতে বিচার জন্য সোপর্দ্দ হইয়াছিল। গত ২রা সেপ্টেম্বর ঐ মোকদ্দমার বিচারের সময় আসামী মফেজদ্দীর স্ত্রী দুইটি শিশু-সন্তান লইয়া উপস্থিত হইয়া আদালত সমক্ষে কাঁদিয়া বলে, "খাবার কিছু ছিল না। ২।৩ দিন উপবাস করিয়াছি, শিশুদের চীৎকার সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামী তাহাদের খাবার যোগাড় করিতে না পারিয়া ঐ কলা ও চাই চুরি করিয়াছিল, স্বামীকে পুলিশে চালান দিবার পরে আমি এই ২টি শিশুসন্তান নিয়া গ্রামে ভিক্ষা করিতে নামিয়াছি কিন্তু তাহাতেও ইঁহাদের উপযুক্ত আহারের সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। আমি দুই দিন কলার থোড় সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছি, গতকল্যও অদ্য কিছুই খাই নাই। শিশু দুই-টিকে গতকল্য ৴১৫ পয়সার ময়দা জাল দিয়া খাওয়াইয়াছি, অদ্য তাহারা উপবাসী।" বাস্তবিক উক্ত স্ত্রীলোকটি ও বালক দুটি অনশনে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের চক্ষু কোটরগত, পেটে পেট লাগিয়া গিয়াছে। অতুল বাবু এই অবস্থা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং আসামীর বিরুদ্ধে দুইটি চুরি মোকদ্দমার চার্জ্জ প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে প্রত্যেক অপ-রাধের জন্য ৩ দিন করিয়া ৬ দিন জেল দিলেন। ঐ সময় আসামীর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিল হুজুর খাব কি? তখন অতুলবাবু নিজ পকেট হইতে দুইটি টাকা আসামীর স্ত্রীকে দিয়া বলিলেন যে এই ৬ দিন ২৲ টাকা দ্বারা চালাও। ৬ দিন পরে আসামী বাড়ী গেলে তাহাকে লোকের মজুরী করিতে ও আউস ধান কাটিতে পাঠাইও। তবেই এক প্রকার চলিয়া যাইবে।

আমাদের দেশ অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য যিনি অর্থ দিয়া বা অন্য প্রকারে চেষ্টা করেন তাঁহার মত হিতৈষী বন্ধু আর নাই। কারণ শিক্ষা আমাদের মনের জড়তা দূর করিবে, কুসংস্কারের জাল হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিবে, আমাদিগকে আত্মপ্রতিষ্ঠ স্বাধীন-চেতা করিয়া তুলিবে। শিক্ষা আমাদের অন্নের মত, তাহা না হইলে চলিবে না। দেশময় যেদিন জ্ঞানের আলো ছড়াইয়া পড়িবে সেই দিন দেশ জাগিবে—তার আগে নয়।

শ্রীহট্টের "পরিদর্শক" বলেন—

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা যে যদি গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে চাকুরীর জন্য এত প্রত্যাশিত হইতে না দেখেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট আমা-দিগকে অবৈতনিক উচ্চশিক্ষা (Free education) দিতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হইবেন না; তখন আমাদের অভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে।

"সম্মিলনী"তে প্রকাশ—

রঙ্গপুরে এক কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহার জন্য রঙ্গপুর তাজহাটের রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় এক লক্ষ টাকা এবং মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারের মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন।

"পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী" সংবাদ দিয়াছেন—

গৌরীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ও বদান্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী মহাশয় নেত্রকোণাতে একটী ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ জন্য ১৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

উল্লিখিত মহোদয়গণের সুদৃষ্টান্ত দেশের অন্যান্য ধনীকে শিক্ষাবিস্তারের শুভ চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করুক!

"রঙ্গপুর দিকপ্রকাশের" বগুড়ার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

বন্যা-প্রপীড়িত ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে আর্ত্তের সেবার জন্য যোড়হাট (আসাম) সারস্বত মঠের অন্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমের ৩ জন সেবক অর্থাদিসহ প্রেরিত হইয়াছে। এই অর্থের অধিকাংশ যোড়হাট অঞ্চল ও ঢাকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

"রঙ্গপুর দিকপ্রকাশের" বরিশালের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে স্থানীয় উকীলসভা ৩০০৲ টাকা ও স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পূজা আসিয়া পড়িল, এবার পূজায় আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কি? "জ্যোতিঃ" বলিতেছেন—

তুমি কার পূজা করিতে চলিতেছ? কোন্ দেবীর পায়ে অঞ্জলি দিতে চাহিতেছ? এস সকলে মিলিয়া আমরা জীবন্ত দেবতার সেবায় রত হই। এতদিন ত নিজের ঘর সাজাইয়াছ। এ এক বৎসর মাত্র অতিরিক্ত সখের খরচগুলি হ্রাস কর। একটি বৎসর মাত্র তরুণীর নর্ত্তন ও বারুণীর প্রবাহ বন্ধ কর। চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে লক্ষ কিম্বা উচ্চাবহ বন্ধুবান্ধবদিগের জন্য মহাসমারোহে ভোজের আয়োজন না করিয়া দীন হীন নিরন্ন অনশনক্লিষ্ট প্রতিবেশীদিগের মুখে দুই মুঠো অন্ন দাও। দেখিবে পূজার মণ্ডপে প্রাণময়ী দেবী-মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী সুহাসিনী মূর্ত্তিতে বিরাজ করিবেন, মৃণ্ময়ী প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে, গৃহ প্রাঙ্গন দিব্য সুষমায় পরিব্যাপ্ত হইবে, মায়ের পূজা সফল হইবে। হিন্দুদিগের প্রতিগৃহ আবার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির বিমল প্রভায় মহিমময়ী হইয়া উঠিবে। তা যদি না হয়

যদি ক্ষুধাতুরে অন্ন নাহি পায়
তবে আর কিসের উৎসব?
যদি দেয় কাটাইয়া
ম্লান মুখে বিষাদে দিবস;
তবে মিছে সহকার শাখা,
তবে মিছে মঙ্গল কলস।

"রংপুর দিক্‌প্রকাশ" বঙ্গবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

আজ তুমি দুর্ব্বল হইলেও তোমার অপেক্ষা দুর্ব্বলতর ভ্রাতার হাত ধরিয়া অগ্রসর হও, তোমার দৈহিক ও মানসিক শক্তির কিয়দংশ তোমার দুর্ব্বল ভাইদের দান কর—এসো আজ, সকলে মিলিয়া মায়ের পূজা করি, কোটি কোটি বঙ্গের সন্তান শক্তির পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করুক, দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ব্বলতা ঘুচিয়া যাউক। প্রয়াগে অক্ষয় বটের নিকটে সকল যাত্রীকেই একটি করিয়া ফলত্যাগ করিতে হয় আজ বাঙ্গালী, আদ্যাশক্তির নিকটে বিলাস বাসনা বিসর্জ্জন দেও—ধনী স্বদেশীয় দ্রব্য সম্ভারে শারদীয় উৎসব সমাপন করুন, দরিদ্র আজ একটি পয়সায় স্বদেশী শিল্প কুসুম মায়ের চরণে উপহার দাও! যাহার কিছু নাই, তিনি ধানদূর্ব্বায় কায়মনোবাক্যে বঙ্গের শিশু শিল্পকে আশীর্ব্বাদ করুন—বঙ্গের গৃহে গৃহে মঙ্গল-বায়ু প্রবাহিত হউক।

দশ বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশ ও "স্বদেশী"র কথায় দেশের আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, আর আজ "স্বদেশী"র নাম করিতেও যেন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কথাটা বলা যেন মহাপাপ! আমরা সদাই শঙ্কিত, না জানি কি হইতে কি হয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা ভয়ে ভয়ে কাটাইয়া দিই—মারাত্মক ভয়কে আর কিছুতেই জয় করিতে পারি না। এমন দিনে "চারুমিহির" যে দেশবাসীকে "স্বদেশী" ব্রতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। "চারুমিহির" লিখিয়াছেন—

দশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী কিরূপ উৎসাহে এই স্বদেশীব্রত পরিচালন করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই; হঠাৎ বাঙ্গালীর এই কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া পৃথিবীর সকল লোক তখন অবাক হইয়াছিল। অনুষ্ঠিত কার্য্যের সার্থকতা দেখিয়া বাঙ্গালী তখন স্বদেশী ব্রতের আদিম উদ্দেশ্য বঙ্গভঙ্গ নিবারণকে আর ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে স্থান দিল না। স্বদেশের দরিদ্রতা নিবারণ জন্য স্বদেশের লোককে [illegible]বিত রাখিবার জন্য চিরকাল যে এই ব্রতকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে, বাঙ্গালী তাহা বুঝিতে পারিয়া তদুদ্দেশ্যে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল।

কিন্তু আজ কাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, স্বদেশী দ্রব্য অনেক স্থলেই অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। সুতরাং আমাদের স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিষ্ঠা অর্থনীতির হিসাবে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। উহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে আমাদের এই প্রতিজ্ঞা যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে তাহা আমরা পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি। এই স্বদেশী ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা যে দেশের বহু লোকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে তাহাও আমরা পরীক্ষাদ্বারা উপলব্ধি করিয়াছি। বঙ্গবাসী তুমি মনে রাখিও যে, বিলাস ব্যসনে প্রতিদিন তুমি কত অর্থ বৃথা ব্যয় করিতেছ। তাহার সামান্য অংশ তোমার প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য ব্যয় করিয়া তুমি যদি তোমার স্বদেশের একটি লোকেরও জীবিকাসংস্থান করিতে পার, তদ্দ্বারা যদি একটি নিরন্ন মজুরের এক দিনের অন্নেরও সংস্থান হয়, যদি একটি দরিদ্র বাঙ্গালী তদ্দ্বারা ঘৃণিত দাস ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনে সক্ষম হয় তাহা হইলে তুমি ইহকালে পরকালে মহা পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবে, নিজের অন্তঃকরণে মহা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবে এবং নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া জগতে মনুষ্য নামে পরিচিত হইতে পারিবে। সম্মুখে মহা উৎসবের দিন আগতপ্রায়। এই সময়ে তুমি বহু অর্থব্যয় করিয়া নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় করিবে। নিরন্ন দেশবাসীর দিকে চাহিয়া, নিজের দিকে চাহিয়া, মনুষ্যত্বের দিকে চাহিয়া স্বদেশীব্রত রক্ষার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইও না।

সনেটের আদর

আঙ্গুরের কৌটা তুমি, থাকে থাকে সদা ভরপুর
সুমধুর আঙ্গুরে আঙ্গুরে! পাটনার অপূর্ব্ব বেদানা
তুমি মোর, ভরা যাহে সুরসাল লালে লাল দানা!
তুমি মোর নিকুঞ্জ-সরসী ক্ষুদ্র, তৃষা করে দূর
যেই জলে বনের হরিণী; মেলিয়া ধবল ডানা,
যেই জলে রাজহংস কেলী করে, আনন্দে আতুর!
ঢলঢল করে জল—আরক্তিম শতদল নানা
যেই জলে হাসে নিত্য—মধুকর গুঞ্জরে মধুর।
সোহাগিনি, তুমি মোর কমনীয় কনক কলসী,
রতনে রতনে ভরা; তুমি মোর কাঞ্চন-কারাবা,
সুরভি গোলাপী জলে ভরপুর; অশোক, অতসী,
করবী ও গন্ধরাজ, কৃষ্ণকেলী, ঝলকিয়া আভা,
সাজায়েছে তনু যার, তুমি সেই, লো মোর রূপসি,
লাবণ্যের ফুলদানী!—নীলাকাশে চতুর্দ্দশী-শশী!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

"RULE BRITANNIA"

When Britain first at Heaven's command arose
From out the azure main,
—Arose, arose, arose from out the azure main,
This was the charter of the land
And guardian angels sung the strain :—
Rule Britannia, rule the waves,
Britons never will be slaves.

বঙ্গানুবাদ

প্রথম ব্রিটেন্ যবে বিধির আজ্ঞায়
সুনীল সাগর হতে উঠিল ভাসিয়া,
এই-এ সনন্দ বিধি দিলেন তাহায়,
দেবগণও এই তানে উঠিল গাহিয়া :—
"ধরি রাজদণ্ড করে তুমি ব্রিটানিয়,
তরঙ্গের পরে তব শাসন বিস্তারো,
বিস্তারো শাসন তব, জলধি ব্যাপিয়া,
ব্রিটেন হবে না দাস কখনো কাহারো।

স্বরলিপি

(এই গানের সুর কড়ি মধ্যমে আসিয়া স্থানে-স্থানে বিশ্রাম করায় কেমন সুরটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। "Rule Britannia" হইতে "Britons never will be slaves"—এই অংশটার সুর গানের ভাবের সহিত মিলিয়াছে, অর্থাৎ উহার বেশ একটু গাম্ভীর্য্য ও তেজ আছে। বিশেষত "never will be slaves" এই অংশের সুরে খুব একটা জোর আছে।)

II া া া া । া া া রা I পা -া পা -া । পধা-নর্সা -র্রা পা । ধা-া-া নর্সা । না-া া রা I
When Bri • tain- • fi- • • rst, at Heaven's com- mand a-

I পধা-পধা-নর্সা-নর্সা । র্রা ধা-না ধা । পা-ধনা-ধা পা । হ্মা-া া রা I হ্মা রা ধা হ্মা ।
ro- • • • • • • se from ou-t, the a- • • • zure main • a- rose, a- rose, a-

। র্রা ঋণা ধপা হ্মগা । রা -া গাঃ -রঃ । রা -া া া I পা -া পাঃ -রঃ । গা সা -া পা ।
rose from out the a- • zu re main • this • was the char- ter • the

। র্সাঃ নঃ ধা পা । হ্মা -া া ধা I র্রা -া র্সা -া ।
chart- er of the land • and guar- dian

। নপা -র্সধা -র্রা র্সা । না -া ধা -া । পা -া -া -া I
a- • • • n- gels sung • this strain • • •

I না -া া না । র্সা র্সা া না । র্সাঃ নঃ ধা পা । হ্মা -া -া -া I র্রা -া র্সা -া ।
Rule • Bri- tan- nia Bri- tan- nia rule the wa- • • ves Bri • tons •

। নপা -র্সধা -র্রা র্সা । না -া ধা -া । পা -া -া -া I না -া -া -না । র্সা র্সা া না ।
ne- • • • • ver will • be • slaves • • • ru- • le Bri- tan- nia Bri-

। র্সা না ধা পা । হ্মা -া -া -া I র্রা -া র্সা -া । নপা -ধপা -র্রা র্সা ।
tan- nia rule the waves • • • Bri- • tons ne- • • • ver

। না -া র্সা -া । পা -া -া -া IIII
will • be • slaves • • •

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

টিপরারী গানের

স্বরলিপি

(তাল কাওয়ালী, লয় ঈষদ্দ্রুত)

(ণ-খরজ)

আজকাল এই গানটি ইংরেজ সৈনিকেরা যুদ্ধযাত্রার সময় গাইয়া থাকে। আসলে এই গানটা যুদ্ধের গান নহে। ইহা Comic ধরণের একটি প্রেমের গান। আসলে Rule-Britannia ইংরেজদের রাষ্ট্রসঙ্গীত বা যুদ্ধের গান হওয়া উচিত। বোধ হয় "টিপরারী"র হাল্কা সুর বলিয়া সাধারণ ইংরেজ সৈনিকের এই গানটাই পছন্দ।

II ণা র্রা র্সা ণা। পা মা রা জ্ঞা। মা পা মা রা। মা -া -া -া I
(১) Up to might-y London came an Ir-ish-man one day • • •
(২) Pad-dy wrote a let- ter to his Ir- ish Mol- ly O'
(৩) Mol-ly wrote a neat re- ply to Ir- ish Pad- dy O'

I ণা র্রা র্সা ণা। পা মা রা মা। ধা ণা ধা গা। ধা -া -া -া I
(১) As the streets are paved with gold sure ev-'ry one was gay • • •
(২) Say-ing "should you not re- ceive it write and let me know • • •
(৩) Say-ing "Mike Ma- lon- y wants to mar-ry me and so • • •

I ণা র্রা র্সা ণা। পা মা রা মা। ধা ণা ধা গা। ধা -া -া র্সা I
(১) Say-ing songs of Pic - ca - dil - ly Strand and Lieces-ter Square till
(২) If I make mis- takes in "spell-ing Mol- ly dear" said he • • re-
(৩) Leave the strand and Pic-ca- dil- ly or you'll be to blame for

I র্রা র্সা ণা ধা। র্সা ণা র্সা র্রা। ধা পা ধা ণা। র্সা -া
(১) Pad-dy got ex- cit - ed then he shout -ed to them there :
(২) mem-ber it's the pen [illegible]'s bad don't lay the blame on me."
(৩) love has fair-ly drove me sil - ly hop-ing you're the same !"

{ রা জ্ঞা I মা -া মা -া। -া মা পা ধা। ণা -া র্রা -া। -া -া র্রা র্সা I
It's a long • way • • to Tip-per- ar- y • • • It's a

I ণা -া পা -া। -া -া ণা -া। মা -া -া -া। -া -া গা রা I
long • way • • • to • go • • • • It's a

I মা -া মা -া। -া মা পা ধা। ণা -া র্রা -া। -া -া ণা না I
long • way • • to Tip- per- ar- • y • • • to the

I র্সা -া পা -া। ধা -া ণা -া। র্সা -া -া -া। -া -া -া -া I পুনরাবৃত্তির পর এইখানে শে
sweet- • est • girl • I • know • • • • •

I মা -। মা -।। -। -। পা ধা। ণা -। র্রা -।। -। -। ।। I
good • bye • • • Pic-ca- dil • ly • • •

I জ্ঞা -। পা -।। ণা -। র্সা -।। র্রা -। -। -।। -। -। ণা র্সা I
Fare • well • Lieces- • ter • Square • • • • • It's a

I র্রা -। র্রা -।। র্রা ণা র্সা ণা। পা -। -। -।। মা -। ণা -। I
long • long • way to Tip-per- ar- • • • y • but •

I র্রা -। ণা -।। -। -। র্সা -।। ণা -। -। -।। -।। }
my • heart's • • • right • there • • •

(প্রবাসীর জন্য লিখিত)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হারামণি

[এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। প্রবাসীর পাঠকপাঠিকা এই কার্য্যে আমাদের সহায় হইবেন আশা করি। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন; কবিওয়ালা, তর্জ্জাওয়ালা, জারিওয়ালা, বাউল, দরবেশ, ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের। প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকারা ইঁহাদের যথার্থ কবিত্বপূর্ণ বা রসভাবপূর্ণ রচনা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিব।]

বাউলের সুর

(১)

মন হ'ল না মনের মত (রে)।
প্রবোধ দিয়ে রাখ্‌বো কত, ক্ষ্যাপা মন
সদাই খোঁজে নাতা ছুতো।
শোন্‌রে মন, তোরে বলি,
ভোলা মন, ভ্রান্ত হ'য়ে সব খোয়ালি,
পেয়ে ধন হারাইলি, গুরুদত্ত ধন পদার্থ।

(২)

নাবিক চিনে নৌকায় চড়।
ভড়্‌কা গাঙ্, তুফান্ ভারী,
আছ্‌ড়ে তরী, ভোলা মন, আছ্‌ড়ে
তরী কর্‌বে গুঁড়ো।
(ওরে) যত দেখ লম্বা দাড়ি,
এরা বাঙাল্ মাঝি সব আনাড়ি,
দিতে পার্‌বে না পাড়ি,
ভয়ে হ'বে জড়সড়ো।
তরীর ভরসা করা বৃথা,
ও কে পাড়ি দ্যায়্, কার আছে মাথা!
তখন দাঁড়াবি কোথা?
নাইক সেথা বাবা খুড়ো।

বাল্যকালে বাউলদের মুখে শোনা। রচয়িতার নাম জানা নাই।

বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত গানটি গত ভাদ্র মাসের হারামণিতে অসম্পূর্ণ ছাপা হইয়াছিল।—

গোঁসাই জীব! কোন রঙ্গে বেঁধেছ ঘর, মিছে ধন্দবাজী
এদিক ওদিক ঘুরে মলেম বুঝলাম না তোর কি কারসাজী।
হাড়ের ঘরখানি চামের ছাউনি, বন্দে বন্দে জোড়া,
সেই না ঘরে প্রহরী মন রায় কেমনে পশিল চোরা॥
বাল্যকাল গেল হাসিতে খেলিতে, যৌবন গেল রে হেলে,
শেষের কাল যাবে ভাবিতে চিন্তিতে গুরু বা ভজবি কবে—
এ দন্ত পড়িবে, কেশ পাকিবে, যৌবনে পড়িবে ভাটা।
দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে রঙ্গিলা দালানের মাটী॥
মাইলানীর বাড়ীতে ফুলের বাগিচা গন্ধে আমোদ করে।
সে ফুল তুলিয়া গাঁথিয়া মালা, পরাব বন্ধুর গলে॥

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত বক্সী।

(পাঠান্তর)

হাড়ের ঘরখানি, চামের ছাউনি, বন্দে বন্দে জোড়া ;
সেই না ঘরে মোহন মুরারী ডাক্‌লে না দেয় সাড়া।
মিছে ধন্দবাজে গোঁসাইজী, কোন্ রঙ্গে বাঁধিয়াছ ঘর।
(chorus)

আমার চেঙ্গড়াত কাল গেল হাসিতে খেলিতে,
যৌবনকাল গেল রসে ;
বৃদ্ধ কাল গেল ভাবিতে ভাবিতে মসীদ ভজব কবে ?
মিছে ধন্দবাজে গোঁসাইজী, কোন্ রঙ্গে বাঁধিয়াছ ঘর।
আমার কেশ পাকিবে, দন্ত পড়িবে, যৌবন পড়ে যাবে
ভাটি ;
আস্তে আস্তে খসিয়া পড়িবে রঙ্গিলা দেউলের মাটি।
মিছে ধন্দবাজে গোঁসাইজী, কোন্ রঙ্গে বাঁধিয়াছ ঘর।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

১৩২২ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায় "হারামণি"র অন্তর্গত কিরণচাঁদ দরবেশের প্রেরিত গানটি অসম্পূর্ণাবস্থায় মুদ্রিত হইয়াছে। প্রেরক উল্লেখ করিয়াছেন যে ঐ সঙ্গীতটির রচয়িতা কেরামত আলি খাঁ মুন্সি। কিন্তু আমরা জানি কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত শ্যামগ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ সঙ্গীতভক্ত সাধক স্বর্গীয় ভুবনরায়ের কোনও সাগরেদ দ্বিজদাস নামক এক ব্যক্তি উক্ত রহস্যসঙ্গীতটি রচনা করেন। ঐ সঙ্গীতের অবিকল নকল যাহা আমি ৭।৮ বৎসর হইল সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা এইসঙ্গে পাঠাইলাম। ইহার শেষ পদেই রচয়িতার নাম উল্লেখ দেখিবেন। উক্ত দ্বিজদাসের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী মনোহন নামধেয় ত্রিপুরার অন্য একব্যক্তি দ্বিজদাসের উক্ত সঙ্গীতটির একটি প্রতিবাদ-সঙ্গীতও রচনা করেন।

হরি কি কালী বলা ভুল,
কালী কি হরি বলা ভুল।
যেজন নির্গুণ নিষ্কাম,
তার কি আছে নাম,
ভাব্‌তে ভাব্‌তে পাগল হলাম,
পেলাম না তার মূলামূল ॥
হরি হরি হরি বলে বাজায়ে করতাল খোল,
করি কত লম্ফ ঝম্প দশে মিলে গণ্ডগোল,
ইথে থাক্‌ত যদি সার
তবে হইত সুসার,
ঘুচ্‌ত মনের অন্ধকার,
ফুলবাগানে ফুটত ফুল্ ॥

কালী কালী কালী বলে মদ খেয়েছি কতকাল,
লাভের মধ্যে পয়সা গেল আরও লোকে কয় মাতাল,
মন ত মজ্‌ল না রসে,
শেষে ধরিল রসে,
শরীর কাঁপে বাতের দোষে
হাত পায় বাঁধ্‌তে হল গুল্ ॥
ফোঁটা দিয়ে ঘটা করে কত কাণ্ড করেছি,
তিন বেলা গঙ্গাস্নান করে মন্ত্র জপে দেখেছি,
কর্‌তে কর্‌তে প্রাণায়াম,
হইল হাঁপানীর ব্যারাম,
(শেষ) কয়বৎসর নিরামিষ খেলাম্
ফল পেলাম তার পিত্তশূল ॥
সকল ফিকির ছেড়ে নিলেম ফকিরেরই উপদেশ,
অল্প কয়দিন লাগ্‌ল ভাল ঘুচ্‌লো মনের হিংসাদ্বেষ,
ক'দিন পরে নেহারি,
(গেলো) নিজের মাল্‌খানা চুরি,
কইতে নারি সইতে নারি,
পাছে বাজে গণ্ডগোল্ ॥
চক্ষু গেল কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কান গেল কোনও কারণে,
শেষের সম্বল কম্বল গেল ঐ চোরা মালের সন্ধানে,
নিজে হয়েছি বোকা,
(আমার) চারি দিকই ঠেকা,
"দ্বিজদাস" কয় লাগ্‌ল ধোকা,
যে যা বলে সবই কবুল ॥

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কিরণচাঁদ দরবেশ 'হারানিধি' বিভাগে যে গানটি দিয়াছেন তাহাতে একটু ভুল আছে এবং একপদ দেওয়া হয় নাই। আর মেহেরের কালীবাড়ী ত্রিপুরা জিলায় চাঁদপুর মহকুমায়, নোয়াখালীতে নহে।

রসবাতের বেরাম হইলে হাতে পায়ে লোহাপুড়াইয়া ছেঁকা দিয়া ঘা করিয়া তাহার মধ্যে একটা কাঠের গুটি দিয়া ঘা তাজা রাখা হয় এবং তাহা হইতে রস ঝরে। ইহাকেই গুল বা গোল বলে।

অমূল্যচরণ চক্রবর্ত্তী।

গত শ্রাবণসংখ্যা প্রবাসীতে কিরণচাঁদ দরবেশ যে "হরিকে কালী বলা ভুল" গানটি পাঠাইয়াছেন, তাহার সবটা বোধ হয় তিনি জানেন না। জানিলে গানের ভিতরেই রচয়িতার পরিচয় পাইতেন। তিনি লিখিয়াছেন, কেরামত আলি খাঁ মুন্সি ইহার রচয়িতা। "ইনি নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ মেহেরকালীবাড়ীতে থাকিতেন।" কিন্তু, মেহেরকালীবাড়ী নোয়াখালি জেলাতে নয়,—ত্রিপুরা জেলায়, চাঁদপুরের নিকটে। গানটির নীচে "দ্বিজদাস" এই নাম উল্লেখিত

আছে। গানটির প্রথম চরণ "হরিকে কালী বলা ভুল" নয়, "হরি কি কালী বলা ভুল" অর্থাৎ হরি বলাও ভুল, কালী বলাও ভুল।

এই দ্বিজদাস কে, অনুসন্ধানে তাঁহার কতক পরিচয় জানিতে পারিলাম। শুনিলাম, তাঁহার বাড়ী ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণায়, পারুলিয়া গ্রামে। তিনি এখনও জীবিত আছেন; তাঁহার প্রকৃতনাম দ্বিজদাস নয়, বৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তিনিই নাকি এই গানটির রচয়িতা।

এইসব গ্রাম্য গান একরকম বে-ওয়ারিশি মাল। যে, যেভাবে ইচ্ছা ইহাদের উপর নিজ নিজ কেরদানী জাহির করে। গানের পদ তো পরিবর্ত্তন করেই, এমনকি রচয়িতার নামেরও গোলমাল করিয়া বসে এবং এক গানের পদ আনিয়া অন্য গানের সহিত যোগ করিয়া দেয়। যেমন এই গানটিতে,—দরবেশ মহাশয় যেখানে লিখিয়াছেন, "গোটা দু'চার ষণ্ডা জুটে করে কেবল গণ্ডগোল" সেখানে আমাদের এদিকে গায় "দশে মিলে লম্ফ ঝম্প, করে কত গণ্ডগোল" ইত্যাদি।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত।

লক্ষ্মী-পূর্ণিমা

আজকে অই আকাশ হ'তে সোনার রথে ঝর্‌ল কে?
দিগ্বিদিকে ভাসিয়ে দিয়ে হাসির ঝোরা খুল্‌ল কে?
খুল্‌ল কে অই গলা-মোতির লক্ষ নদীর ঝরণাটা?
উড়িয়ে দিলে চূর্ণহীরার রেণুর গড়া ওড়্‌নাটা?—
লক্ষ্মীদেবীর আড়ৎ আজি মুক্ত বুঝি আশ্‌মানে,
ঝর্‌ঝরিয়ে ছড়িয়ে গেল তাই এ-ধরার মাঝ্‌খানে।

ধরার মাঝে ঝর্‌ঝরিয়ে সুধার ধারা ছড়িয়ে রে,
সকল ব্যথা ভুলিয়ে দিয়ে দুখের মাথা মাড়িয়ে রে,
মোচন করি মনের গ্লানি, নামিয়ে বুকের পাথরটি,
শুকিয়ে দিয়ে চোখের কোলে অশ্রুজলের সাগরটি,
পরীর দেশে ধরায় আনি, মর্ত্তে করি পরীর গাঁ,
লক্ষ্মীদেবী জ্যোস্নাধারায় ধুলেন তাঁরি জরির পা।

লক্ষ্মীমাতা পা ধুয়েছেন ঝর্‌ছে তারি জ্যোৎস্নারে;
ঘরের মাঝে আট্‌কে তোরা বদ্ধ বসে রোস্‌না রে।
রোস্‌না রে আর বদ্ধ হয়ে অন্ধ ঘরের মাঝ্‌খানে,
উছ্‌লে উঠে পিছ্‌লে পড়ে আয়রে ছুটে বা'র পানে।
জলের তলে এলিয়েছে রে ঢেউয়ের দলে লক্ষ গা,
ঢেউয়ের তালে দুলিয়ে দেবে অচল তোদের বক্ষটা।

আজ লেগেছে রূপের মাতন নীলের কেতন গগন-গায়,
আজ স্বপনে বন্দনা যে গাইছে টিয়ে চন্দনায়।

হাজার দলে আজ ফুটেছে পদ্মগুলোও সাঁঝ-রাতে,
রূপটা তারি চুলিয়ে কে আজ ঢাল্‌লে ধরার মাঝটাতে?
মোতির মালা আজ পরেছে ময়ূরকণ্ঠী গাছপালা,
আজ আঁধারের টুক্‌রোগুলোয় জোনাক-পোকার দীপ জ্বালা।

সবাই আজি বেরিয়ে পড় আঁধারের এই বাঁধ ভেঙে,
হাল্‌কা হাওয়ায় হেলিয়ে তনু হুরীর দলের সাথ মেঙে।
জ্যোৎস্না-ধারায় মনের ভেলা ভাসিয়ে দে রে ভাসিয়ে দে,
রূপের বেচা-কেনার হাটে হৃদয়টিরে বিকিয়ে নে।
মুঠ-ভরে নে হীরের গুঁড়োয়, মন ভরে নে রূপ-মায়ায়,
হীরের গুঁড়ো জ্বল্‌ছে আজি লক্ষ্মীমায়ের ধূপছায়ায়।

বাঁয়ের দিকে চাস্‌রে আজি, ডানেও চেতে ভুলিস্‌নে,
সাম্‌নে হ'তেও চোখ দুটোরে একেবারেই তুলিস্‌নে।
কাশের ক্ষেতে আজ নেমেছে আকাশ হ'তে অপ্সরী,
হাজার তাঁবু বসিয়ে গেছে জরির তারে কাজ করি।
হাজার পরী আজ নেমেছে কেয়াফুলের কেশরটায়,
চুমোর ঝুরি ছড়িয়ে গেছে নীল সায়রের সবুজ গায়।

কোজাগরের রাত্রি আজি অজাগরের জাগর যে—
আজকে তবু ঘরের মাঝে ঘুমের ঘোরে বিভোর কে?
লক্ষ রাজার সোনার ভাঁড়ার দ্যাখোওনিকো চক্ষে যা—
মোতির ঝারা, হীরের গুঁড়া বিকোয় রাতে আজকে তা।
আয়রে ছুটে মাঠের মাঝে জেগে স্বপন দেখবি কে,
হীরের গুঁড়ো ঝর্‌ছে আজি পা ঝেড়েছেন লক্ষ্মী যে!

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

পুস্তক-পরিচয়

পসরা — শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত, বৈদ্যবাটী যুবক-সমিতি হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। প্রধান বিক্রয়-স্থান—রায় বাহাদুর এম্, সি, সরকারের পুস্তকালয়—৭৫।১।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। দাম—একটাকা।

এখানি গল্পের বই। ইহাতে কেরাণী, স্মৃতির শ্মশানে, কপোতী, যশের মূল্য, জীবনযুদ্ধে, অন্ধ, সোনার চুড়ী প্রভৃতি সাতটি গল্প আছে। প্রথম গল্পটি আগাগোড়া একটা করুণ রসের পাত দিয়া মোড়া। বর্ণনাও সতেজ ও তীব্র। গ্রন্থকার যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা বেশ ফুটিয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে একটু অতিরঞ্জিত হইয়া পড়িয়াছে—ভাবের বন্যায় বাস্তব ভাসিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্মৃতির শ্মশানে গল্পটির প্লট ভালো—সাজানোর কায়দাও মন্দ নহে। কিন্তু উহার

নায়ক সুখেন্দুর চিত্তবৃত্তি লইয়া পাঠককে অনেক সময় বেশ একটু ধাঁধাঁয় পড়িতে হয়। সে কেন যে সহসা সরযূর উপর রাগিয়া উঠে, কেন যে তাহার উপর অন্যায় অবিচার করিয়া বসে তাহার কোনোই অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সরযূর হৃদয়ের নিভৃততম কথাটি সুখেন্দুর কাছে যে ধরা পড়ে নাই এমন নহে, বরং সে তাহা খুব ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিল। তথাপি এরূপ ব্যবহার তাহার পক্ষে কি করিয়া যে সম্ভব হইয়াছে তাহা প্রচুর চেষ্টা করিয়াও আমরা যুক্তির গণ্ডীর ভিতর আনিয়া ফেলিতে পারি নাই। মানুষের খামখেয়ালী চিত্তবৃত্তিকে এখানে অপরাধী করা যায় না। কারণ সুখেন্দু একটু ভাবপ্রবণ হইলেও, তাহার চিত্তবৃত্তি একেবারেই সে-ধরণের নহে। গল্পটার ভাবাটাও একটু কমদুরস্ত। কথোপকথন স্থানে-স্থানে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ২৩ পৃষ্ঠায় "আপনারা ব্রাহ্ম—স্ত্রীলোককে যথেষ্ট সুশিক্ষা দেন"—বলিয়া যে লম্বা চওড়া লেকচারটি ছুটিয়া চলিয়াছে তাহাও আমাদের কাছে ভালো লাগে নাই। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের সহজ ধারাটি কোন্ সাহারার মরু-বালুকার বুকে যে হারাইয়া গিয়াছে তাহার সন্ধান করিয়া উঠা দায়। কপোতী যে ধরণের গল্প তাহাতে তাহার ভিতর কাব্যের দিকটা আরও একটু গাঢ়—আরও একটু জমাট বাঁধা উচিত ছিল। এ গল্পটির ভিতর যে একটি মাত্র নারী-চরিত্র আছে তাহাতে মাতৃত্বের ও নারীত্বের গোপনধারা শিরার ভিতরে রক্তের ধারার মতো বহিয়া গিয়াছে। "হাজার হোক কেষ্টর জীব ত" অত্যন্ত সাধারণ করুণার কথা—ইংরেজীতে যাহাকে pity বলে। ইহার ভিতরে মাতৃহৃদয়ের একাগ্র ভালবাসা—নারী-হৃদয়ের উন্মুখ ও সহজ স্নেহ-পরায়ণতা নাই। সুতরাং এই কথাটি কপোতীর একান্ত দুর্দ্দিনের মুহূর্ত্তে কৃপা প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার মাতৃত্ব ও নারীত্বকে খর্ব্ব করিয়া দিয়াছে। ছোট গল্পের ভিতর ছোটপাট এই একটি কথায় অনেকখানি যায় আসে। 'যশের মূল্য' গল্পটিতে অসম্ভবত্বের মাত্রাটা আরো একটু কম পড়িলে গল্পটি মন্দ হইত না। 'জীবনযুদ্ধে' আমাদের ভালো লাগে নাই। 'অন্ধ' গল্পটির প্রথম অংশটুকুর ভাবা স্নেহের আবরণে অতিরিক্ত মাত্রায় তীব্র করিতে গিয়া গ্রন্থকার বড় বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু শেষের দিকটার ভাবা এতই করুণ যে চোখের জল ধরিয়া রাখা যায় না। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভালো লাগিয়াছে 'সোনার চুড়ী।' মুখবন্ধে গ্রন্থকার, এই গল্পটিতে যে দুর্নীতির প্রচার করেন নাই তাহাই বুঝাইবার জন্য অনেকখানি যুক্তিতর্কের খরচ করিয়াছেন। তাঁহার এত কিছুই করিবার প্রয়োজন ছিল না।

"There is no such thing as a moral or immoral book ; books are well-written or badly written that's all."—Oscar Wilde

কিন্তু স্থানে স্থানে আরো একটু রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে পারিলে ভালো হইত, কারণ কদর্য্য কুৎসিত চিত্র আর্টের পরিত্যাজ্য।

এইতো গেল পৃথক ভাবে প্রত্যেকটি গল্পের কথা। সবগুলি গল্প একত্র করিয়া দেখিতে গেলে সৌন্দর্য্যের দাঁড়িতে বইখানি ওজনে একটু হাল্কা হয়। কয়েকটি গল্পের ভিতরে 'প্লটের' কোনো কোনো অংশ অনেকটা একই ধরণের হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে গ্রন্থের বৈচিত্র্য ব্যাহত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাবা মার্জ্জিত ও ঝরঝরে। বাহির হইতে এরূপ ভাবার খুঁত ধরা শক্ত। কিন্তু তবুও পড়িয়া মনে হয় এ যেন ঠিক ছোট গল্পের ভাবা নহে—উপন্যাস এ ভাষায় লেখা চলিতে পারে কিন্তু গল্পলেখা এ ভাষায় যেন ঠিক খাপ খায় না। এবং হয়ত সেইজন্যই গল্পগুলি স্থানে-স্থানে আর্টি হিসাবে অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

বীরবিক্রম—দৃশ্য কাব্য। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্, এ, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়—সিটি লাইব্রেরী ঢাকা। মূল্য আট আনা।

ইবসেনের যে-সমস্ত নাটক ইয়োরোপের নাট্যজগতে নূতন যুগের সাড়া আনিয়া দিয়াছে "The Warriors at Helgeland" তাহারই একখানি। মূলের সৌন্দর্য্য অনুবাদে ফোটে নাই। নারী-হৃদয়ের সেই দুর্দ্দমতা—প্রকৃত বীরের সেই নীরব আত্মত্যাগ, হৃদয়ের সহিত তাহার শোণিত-পাত-যুদ্ধ যাহা ইবসেনের দুই-একটি কথায় আশ্চর্য্য রকমে ফুটিয়া উঠিয়াছে বর্ত্তমান অনুবাদকের হাতে তাহা প্রচুর পরিমাণে ক্ষুন্ন হইয়াছে। তবুও আমরা গ্রন্থকারকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি—কারণ বঙ্গ-সাহিত্যে, আমাদের যতদূর স্মরণ হয়—তিনিই প্রথম ইবসেনের অনুবাদক। গ্রন্থের ভাবা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিবার আছে। ইহাতে এত বেশী প্রাদেশিকতা ঢুকিয়া পড়িয়াছে যে তাহা কানকে আঘাত করিয়া রীতিমত পীড়িত করিয়া তোলে। 'তুমি ভারি রাগ হবে,' 'তবে চুপ থাক,' 'যখন লাগ পেলাম,' 'তাদের কি বলে বুঝ দেবে' প্রভৃতি লেখার ভাষায় একেবারেই অচল। আমরা সংস্কৃত-ভাঙ্গা রচনার পক্ষপাতী নাই—বরং বাংলা যাহাতে খাঁটি বাংলাতেই লিখিত হয় আমরা তাহাই চাই। কিন্তু তবুও আমরা এগুলিকে কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিলাম না। গ্রন্থের ভিতর ছাপার ভুলও অসংখ্য রহিয়া গিয়াছে।

বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা—শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা প্রণীত। কুমারী শান্তিপ্রভা মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত ওয়ামেন তাকেদার সহিত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বামীর স্বদেশ জাপানে গমন করেন এবং সেখানে চারি মাসকাল অবস্থান করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই গ্রন্থখানি তাঁহার সেই প্রবাসের রোজনাম্চা বলিলেই চলে। গ্রন্থকর্ত্রীর দেখিবার ক্ষমতা বিশেষ নাই। তথাপি তাঁহার পথের এবং বিদেশের অনেক নূতন তথ্য তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। গ্রন্থের ভাবা কাঁচা হইলেও সহজ ও সরল—বলিবার ভঙ্গিও সুন্দর কোথাও এতটুকু আড়ম্বর নাই। তিনি নিজের জীবনের যে ছবি বইখানির ভিতর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—সবিনয় সরলতার দ্বারা মণ্ডিত হইয়া তাহা পরম উপভোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থের লাভ গ্রন্থকর্ত্রী ঢাকার মাতৃনিকেতনের সাহায্যার্থে দান করিয়াছেন।

বঙ্গ-সাহিত্য—গভীর চিন্তা—শ্রীদুর্গামোহন কুশারী দেবশর্ম্মা প্রণীত—নামমাত্র মূল্য চারি পয়সা।

গ্রন্থকার তাঁহার গভীর চিন্তাশক্তির দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে যদি বাংলাদেশকে কখনো উঠিয়া দাঁড়াইতে হয় তবে তাহার আগে বাংলার প্রত্যেক মানুষকে সাহিত্যিক হইতে হইবে।

সাহিত্যিক মানে—চিন্তাশীল ব্যক্তি—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, চিত্রকর, ধার্ম্মিক, জ্যোতির্ব্বিদ, ঐতিহাসিক ও চিকিৎসক। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।" কিসে দেশসুদ্ধ লোক সাহিত্যিক হইতে পারে, সে সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন নহেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে কতকগুলি উপায় ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেনই, উপরন্তু ভরসাও দিয়াছেন যে ভবিষ্যতে অনেক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তিনি এ সম্বন্ধে আরও উপদেশ দিবেন। আপাততঃ আপনারা সকলে সামান্য চারি পয়সামাত্র ব্যয় করিয়া এই পুস্তকখানি ক্রয় করুন।

আর্ষ রামায়ণে বাল্মীকি—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। প্রকাশক ও প্রণেতা শ্রীশ্রীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ। পোঃ গৌরনদী

গ্রাম মাহর', জেলা বরিশাল। প্রাপ্তিস্থান—বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী বি-এ, ২ শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা।

মূল্য প্রথম ভাগ আট আনা—দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ বারো আনা।

এখানি রামায়ণের সমালোচনা—রামায়ণ রচনায় আদি কবির উদ্দেশ্য, তাঁহার কবিত্ব, তাঁহার ভাষা, চরিত্রচিত্রণে তাঁহার দক্ষতা, রামায়ণের ঘটনাবিন্যাস ইত্যাদি লইয়া গ্রন্থকার অল্প-বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের ভিতর তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও দৃষ্টিশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা একটু সংস্কৃতভাঙ্গা কিন্তু সেটি তাঁহার ইচ্ছাকৃত। 'হিসাব' 'বেশীর' মতো ঘরোয়া দুই একটি বিদেশী শব্দ তাঁহার গ্রন্থের ভিতর স্থান পাইয়াছে—এজন্য তিনি ক্ষুব্ধ। আমরা কিন্তু তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের মনে হয় বাংলা ভাষার পুষ্টির পক্ষে ওরূপ শব্দ প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

টীয়ানাকী—উপকথা—শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবীশ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—নন্দিনী কার্য্যালয়, শিবপুর, হাওড়া। কর্ম্মযোগ প্রেস, ৪নং তেলকল ঘাট, হাওড়া। মূল্য আট আনা, ভালো বাঁধাই বারো আনা।

প্রাচীন উপকথা লইয়া অতি আড়ষ্ট ও অতি পানসে ভাষায় এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। ইহার ভিতর কোথাও পল্লীর সেই অজস্র সারল্য অনাহত আনন্দের আভাস নাই। গ্রন্থকার কল্পনার ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপুত্রের সহিত হাওয়ার দেশের রাজকন্যার উদ্দেশে যাত্রা করিতে পারেন তাই—পরিত্যক্ত রাজকন্যার অশ্রুসজল বেদনার সহিতও তাঁহার হৃদয়ের কোনই যোগ নাই। গ্রন্থের ভিতর প্রচলিত কাহিনীর অঙ্গ কোনো পল্লী-কবির একটি সুন্দর কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার ছন্দ যেমন মিষ্ট তেমনি তাহার অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি—কোথাও এতটুকু জড়তা নাই। আমরা এখানে কবিতাটির কিয়দংশ না তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

> কোন্ বা দেশের রাজার ছেলে,
> কোন্ বা দেশে ঘর?
> আমার সঙ্গে চল তুমি,
> হবে আমার বর।
>
> *   *   *   *
>
> সোনার খাটে বসে থাক্‌বে,
> রূপার খাটে পা।
> কাছে বসে পান খাওয়াব—
> ঠাণ্ডা হবে গা।
>
> *   *   *   *
>
> 'সোনার পুরীর রাণীর দেশে—
> কপিলবরী গাই,
> রাজা রাণীর সাধ হয়েছে,
> দেখ্‌তে তারে চাই।
> যে আমারে দেখিয়ে দেবে
> তারি আমি হবো,
> আমার রাজার রাজ্য ছেড়ে
> তার কাছেতে রবো।'

বাংলা ভাষা তাহার একান্ত নিজস্ব এই নৃত্যদোদুল ছন্দ হারাইয়া সংস্কৃত-জিঞ্জীরের কাঠগড়ার ভিতর আপনাকে সঁপিয়া দিয়া এতদিন কি করিয়া যে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিল তাহাই ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হই।

সেরশা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। চেরি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্। ৩০ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য একটাকা।

একখানি ঐতিহাসিক নাটক। কতকগুলি চরিত্রের সমাবেশে বইখানি 'জবরজং' গোছের হইয়া পড়িয়াছে। সেরশার চরিত্রটি মন্দ ফোটে নাই। কিন্তু অন্যান্য চরিত্রগুলি বড়ই একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন। শব্দচয়নে স্থানে-স্থানে গ্রন্থকার বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু সংযমের অভাবে তাহা দোষেরই কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রচনার ভিতর স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাব বড় বেশী। নাটকের প্লটটি মন্দ হয় নাই, ঐতিহাসিক সত্যও অধিকাংশ স্থলেই রক্ষিত হইয়াছে। গানগুলিকে গদ্য বলিলেই চলে, কারণ তাহাতে না আছে কবিত্ব না আছে ছন্দমাধুর্য্য। চেষ্টা করিলে গ্রন্থকার নাটক লিখিতে পারিবেন, কিন্তু তাহার আগে তাঁহাকে হাত পাকাইতে হইবে—মাজিয়া ঘষিয়া নিজের শক্তিকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়া তাহার পরে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ হওয়া উচিত।

ব্রতকথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রকাশক—শ্রীহরিরাম ধর, বি, এ, পপুলার লাইব্রেরী, ঢাকা।

গ্রন্থের গদ্য-ভাগে সম্পদনারায়ণ, ফুলকর, ষষ্ঠীব্রত, কর্ম্মাদীব্রত, মনসা, জারসী বা গরুই ব্রত, যমপুকুরব্রত, ছয়াব্রত, ক্ষেত্রব্রত, মাঘমণ্ডল, একচোরাব্রত, বরকুমারব্রত, সংকটতারিণীব্রত প্রভৃতি ব্রতকথা, ও পদ্যভাগে মঙ্গলচণ্ডী, শনির পূজা, সত্যনারায়ণের পূজা প্রভৃতি পাঁচালী সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ব্রতকথার ভিতরে বাংলার পল্লীর চিরন্তন সেবাপরায়ণ ও ভক্তিনম্র আত্মাটি যে অপূর্ব্বভাবে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে গ্রন্থকার তাহাই দিয়া বীণাপাণির মন্দির-তোরণে পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া আনিয়াছেন। আমরা সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। স্থানে স্থানে তাঁহার বীণার তার একটু বেশী চড়িয়া গিয়াছে—পল্লীর সহজ সরল লীলার সহিত তাহা ঠিক সুর মিলাইয়া গাহিয়া যাইতে পারে নাই। ব্রতের ভাবটাও কথার ভাষা, আটপৌরে ঘরোয়া ভাষা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এমন দোষসত্ত্বেও মোটের উপর বইখানি ভালোই হইয়াছে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই গ্রন্থকারের সুরুচির পরিচায়ক। কিন্তু ছবিগুলি নিতান্তই সাধারণ ধরণের, তাহাদের ভিতর কোনোই বিশেষত্ব নাই।

?

গোবর গণেশের গবেষণা—শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার প্রণীত ও ৭৮।২ হ্যারিসন রোড, অন্নদা বুকষ্টল হইতে শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা। গ্রন্থখানি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত (১) ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান (২) আইন ও আদালত (৩) গুরু ও গেরুয়া (৪) ঋদ্ধি ও সিদ্ধি (৫) খিদাও বুদ্ধি (৬) অবস্থা। এই ছয় বিভাগের সমাজে কতখানি ব্যতিক্রম তাহাই দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার একএকটি নমুনা (type) ধরিয়া ব্যঙ্গমিশ্রিত ব্যাজস্তুতি করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানযুগে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যঙ্গ পুস্তক আমাদের চোখে পড়ে নাই। লেখক প্রকৃত স্বদেশ-প্রাণ ব্যক্তি; তিনি দেশের কথা ভাবেন বোঝেন ও দেশের জন্য প্রকৃতই তাঁহার প্রাণ কাঁদে, প্রত্যেকটি লাইনেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল সূত্রটুকু কোথায় তাহা তিনি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন।

যে-সকল কারণে বাংলাদেশ দিন দিন হীনবীর্য্য হীনবল ও অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে, পারিবারিক সুখ শান্তি হারাইতেছে, সরলতা ও নিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, বিচক্ষণ গ্রন্থকার তাহার প্রত্যেকটি বিষয় সরস ব্যঙ্গের সহিত জনসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে আমরা আমাদের নিখুঁত ছবি দেখিয়া হাসিয়াছি, সে হাসি লজ্জার ও বেদনার।

গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমাদের যতকিছু গলদ শ্রীযুক্ত গোবরগণেশ ধীর সংযতভাবে গবেষণা করিয়া ব্যাজস্তুতি করিয়াছেন।

ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মের ভানে আমাদের দেশে কত কি ঘটিতেছে, কত কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, ধর্ম্মের নামে আমরা কি না করিতেছি? অথচ আমরা সে দিকে একেবারে নির্ব্বাক, সংস্কার করিতে ত চাহিই না বরং সে-সকল লুপ্তপ্রায় অতীতের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মকে পূর্ণ মাত্রায় জাগাইয়া তুলিবার জন্য উদগ্র হইয়া উঠিয়াছি। মূল কথাটাই ভুলিয়া যাই যে ধর্ম্ম কোথায়? আমরা ধর্ম্মকেই যে চাই তা ত নয়, আমরা চাই শুধু অনুষ্ঠানের বাহ্যাড়ম্বর।

আমাদের ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গোবর গণেশের গবেষণার নমুনা কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—"জগতের যে-সকল জাতির ধর্ম্মের বোঝা হাল্কা তাহারা সহজে হাসিতে হাসিতে বৈতরণী পার হইয়া যায়। জাপানীরা ধর্ম্মের ধার ধারে না, তাই তাহারা হারাকিরি করিয়া ঝাড়া হাত পায় তুড়ি লাফ খাইয়া চলিয়া যায়। আর ম্যালেরিয়া-প্লেগ-ও-ওলাউঠারূপী যমদূত আসিয়া যখন আমাদিগের গলায় দড়ী টানে তখন আমরা ধর্ম্মের বিরাট বোঝা মাথায় লইয়া বৈতরণীর জলের সঙ্গে চোখের জল মিশাইয়া চুবুনি খাইতে থাকি।"

"আমরা সকল হারাইয়া এক মাত্র ধর্ম্মকেই সার করিয়াছি। তাই সকল কাজেই আমরা ধর্ম্মের নাড়া দিয়া থাকি। প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া আমরা বলিয়া থাকি, ধর্ম্ম আছেন, আমি সহিলাম, ধর্ম্মে সহিবে না। আমাদিগকে যে ব্যক্তি পদাঘাতে সম্মানিত করিবে, আমরা তাহাকে করযোড়ে ধর্ম্মাবতার বলিয়া সম্বোধন করিব।"

"কোন্ তীর্থের কোন্ কুণ্ডে স্নান করিলে কোন্ পাপের খণ্ডন হইবে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার সুন্দর স্কেল বাঁধা আছে।" "কলিতে ধর্ম্ম পতনোন্মুখ। সুতরাং অনুষ্ঠান ও সংস্কারের চাড়া দিয়া ধর্ম্মের জীর্ণ ঘরখানিকে কোনও গতিকে খাড়া রাখিতে হইবে।"

তাহার পরে "আইন ও আদালত" বিভাগে বিচার বিবেচনার যত কিছু গলদ তিনি ধরিয়া চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন।

"গুরু ওগেরুয়া" বিভাগে গুরুগিরির ফল ও গেরুয়ার প্রতি আমাদের অকারণ মোহ তীব্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে। "আমরা একপ্রকার গেরুয়ার কুকুর। গুরুবাদ হইতে গেরুয়া প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। গুরুর পায়ে মাথা নোয়াইয়া নোয়াইয়া ভারতবাসীর মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে। তাই তাহারা আর মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া চলিতে পারে না। অতএব গেরুয়ার সঙ্গে গুরুবাদকেও বিতাড়িত করিতে হইবে। যাহারা শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানীয় তাহাদিগেরও স্বদেশী বা বিদেশী গুরুবিশেষের আবশ্যক হয়।" "যখন পাঠান মোগলেরা এদেশে আসিয়া প্রবৃত্তির গোলকধাঁধায় সাত শত বৎসর ঘুরিয়া মরিতেছিল, আমরা সেই সময়ের মধ্যে কপনি ও টুকনি সার করিয়া হরিনাম করিতে করিতে সরাসরি নিবৃত্তির পথ ধরিয়া একেবারে নির্ব্বাণের কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছি। আর পোয়াটাক পথ বাকী আছে মাত্র।"

"ঋদ্ধি ও সিদ্ধি" বিভাগে ধনেই যে সকল কার্য্যে যোগ্যতা না থাকিলেও উপযুক্ত বলিয়া লোকের কাছে মান্য হওয়া যায় সেই ব্যাপারটাকে কষাঘাত আছে। বনিয়াদী ঘর মানে যে আদিপুরুষ দস্যুবৃত্তির দ্বারা বনিয়াদ পত্তন করিয়া গিয়াছেন—অথচ বংশধরদের গর্ব্ব দেখে কে? "যাহার ধন থাকে, তাহার চোখে জল থাকে না—অর্দ্ধদগ্ধ গরম জিনিষ।" "জাতিকুলমানের ন্যায় বুদ্ধিও এখন লোহার সিন্দুকে থাকে, মস্তিষ্কে থাকে না। অল্পবুদ্ধি দ্বৈতবাদী হয়ত বলিবে, অর্থ ও ভগবান উভয়ই আছেন। আমি অদ্বৈতবাদী, আমি বলিব অর্থই আছে, ভগবান নাই।"

"বিদ্যা ও বুদ্ধি" বিভাগে বুদ্ধি ও বিদ্যা এদেশে কিরূপ অপচয় ও অকাজে ব্যয় হইতেছে তাহাই স্পষ্ট করিয়া দেখানো হইয়াছে। "ঐতিহাসিক ইতিহাস লিখেন উদরের জন্য—সুতরাং তাহা স্কুলপাঠ্য হওয়া চাই এবং তাহার মধ্যে তদুপযুক্ত কথা সন্নিবেশ করা চাই।" পাঠ্য পুস্তকে রাজভক্তি শিখাইবে, রাজনীতি নয়—যেন দুটা বিরুদ্ধ জিনিস। 'যে কথা সাধারণ ভাবে চলিলে অশ্লীল বা রুচিবিরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা তাহা প্রাচীন কাব্যের দোহাই দিয়া কৃষ্ণপ্রেমের আবরণে প্রকাশ করিলে সকলে বিশেষ রুচিপূর্ব্বক উদরস্থ করে।" "শুঁড়ির দোকানে মদের বোতল সাজান থাকে; আর মাতালকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দোকানের সম্মুখে সরকারী রাস্তার উপর পুলিস মোতায়েন থাকে। আমার মনে হয়, এদেশের ইংরেজি স্কুল কলেজগুলি শুঁড়ির দোকান, ইয়ং বেঙ্গল এইখানে পাশ্চাত্য বিদ্যার ডোজ টানিয়া রাজনৈতিক পথে পদার্পণ করিয়া বিপন্ন হয়। এদেশবাসীর ইহা সেবন করা অকর্ত্তব্য। ভারতবাসীর পক্ষে প্রাচীন প্রাচ্য বিদ্যাই শ্রেয়। গঞ্জিকা ও অহিফেনের ন্যায় এই বিদ্যা ভিতরে প্রবেশ করিলে দেহ ও মনের চাঞ্চল্য দূর করে।" "মিশনারি ও ব্রাহ্মগণ বিধর্ম্মী বালিকাবিদ্যালয় খুলিয়া বাঙ্গালীর মেয়েদিগকে ইংরেজী শিখাইয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে দেখিয়া সমাজের নেতাগণ তাহার প্রতিকারের উপায় করিয়াছেন। তাহা হচ্ছে মহাকালী পাঠশালা অর্থাৎ বাঙ্গালী মেয়েদের ধর্ম্মশিক্ষার বিদ্যালয়, এই পাঠশালায় বালিকাদিগকে পাঠের মধ্যে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ এবং শিবপূজা সেঁজুতী ও অন্যান্য যাবতীয় নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।" "সাবান চর্ব্বি দিয়া তৈয়ার হয়; অতএব তোমরা সাবানের পরিবর্ত্তে গোবর ব্যবহার করিবে; গোবরের তুল্য পবিত্র শোধক দ্রব্য আর নাই।"

"অবস্থা ও ব্যবস্থা" বিভাগে সমাজের অবস্থা ও তাহার গলদ প্রতিকারের ব্যবস্থা আলোচিত হইয়াছে। "রমণীকুলের সম্মান করিয়া বীরভোগ্যা লক্ষ্মীশ্রী লাভ করিতে হয় ত সাহেবেরাই করুক, আমরা সাহেব নহি আমরা বাঙালী। স্ত্রীলোক সম্মুখে পড়িলে সাহেব মাতালের মাতলামী স্থগিত হয়,' আর বাঙালী মদ না খাইয়াও মাতাল হইয়া উঠে। "বাঙ্গালীজাতির সমাজ মহিষপ্রকৃতিবিশিষ্ট। সমাজ-সংস্কারকগণ ইহার উপর যতই বলপ্রয়োগ করেন, ইহার গোঁ ততই বাড়িয়া যায়।'

এরূপ ভাবে গণেশ মহাশয় সমাজের প্রত্যেক ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি চিন্তাশীলতা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সবগুলিই সমাজের নিখুঁত ফোটোগ্রাফ। কিন্তু কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি নাই—ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই—ভাষার অপব্যবহার নাই; অতি নিরপেক্ষ ভাবে সমাজের বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এ পুস্তকে ভাবিবার, শিখিবার ও বুঝিবার অনেক আছে।

ভাষা সরল, কিন্তু যে তীক্ষ্ণতা থাকিলে ব্যঙ্গ মর্ম্মস্পর্শী হয় তাহার কিঞ্চিৎ অভাব আছে; ভাষা একটু ভারী ও ভোঁতা; এবং রসিকতা স্থানে স্থানে একটু মোটা ও বাজে ধরণের। তথাপি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইবে—শিক্ষা ও আনন্দ একত্র পাওয়া যাইবে। আমরা পড়িয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয়।

সমাজের ও আপনার উন্নতিকামী, স্বাধীন চিন্তায় সত্য চিনিতে উৎসুক, সকল আবর্জ্জনার সংস্কার-প্রয়াসী ব্যক্তির এই বই পড়া উচিত। প্রত্যেক বাঙালী পুরুষ ও স্ত্রীর এই বই বার বার করিয়া পড়া উচিত; লাভবান হইবেন নিশ্চয়। গোবরগণেশের লেখনীর জয় হোক।

মুদ্রা-রাক্ষস।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ

এবার অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি বন্যা প্লাবন ইত্যাদি দৈব বিড়ম্বনায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদহ, ত্রিহুত, অযোধ্যা, সিন্ধুদেশ, কাঠিয়াওয়াড় প্রভৃতি বহুস্থানে অত্যন্ত অন্নাভাব উপস্থিত হইয়া বহু নরনারী ও চাষের সহায় গাই বলদ মারা পড়িতেছে; সন্তানের অনাহার-ক্লেশ দেখিতে করা উচিত। ১৮৭৮ সালে গভমেণ্ট একটি Famine Insurance Fund বা দুর্ভিক্ষ-প্রতিষেধক ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন; তাহার জন্য আলাদা ট্যাক্স আদায় করিয়া বৎসরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয় এবং আশ্বাস দেওয়া হয় ঐ টাকা দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর প্রাণ-রক্ষার জন্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে ব্যয় করা হইবে না। কিন্তু উক্ত ভাণ্ডারের সঞ্চিত অর্থ হইতে আফগান যুদ্ধ, রেলপথ নির্ম্মাণ প্রভৃতির সাহায্য করা হইয়াছিল। তারপরে বিলাতের পার্লামেণ্টে ঐ কথা লইয়া আন্দোলন হওয়াতে পুনরায় উক্তভাণ্ডার দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্যই রাখা হইয়াছে। কিন্তু তাহার সাহায্যেও দেশের অভাব মিটিতেছে না; গভমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী সবই প্রায় বিদেশী, তাঁহারা দেশের লোকের প্রকৃত দুঃখ অভাবও শীঘ্র অনুভব করিতে পারেন না, কাজেই যথাসময়ে যথোপ-

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষে কঙ্কালসার নরনারী।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্বেচ্ছাসেবকের তোলা ছবি।

না পারিয়া মা ২।১ টাকায় ছেলে মেয়ে বেচিয়া ফেলিতেছে বা আত্মহত্যা করিতেছে। এই যে প্রতি বৎসর দেশের কোথাও না কোথাও দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেশবাসীর প্রতিকারের চেষ্টা যুক্ত সাহায্যও পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে ত গভমেণ্ট বিদেশে যুদ্ধের ভাবনাতেই ব্যস্ত আছেন, এদেশের দিকে দেখিবার অবসর ও অর্থ তাঁহাদের অল্পই আছে। সাধারণ লেখকের সমবেত চেষ্টায় ও ধনীর বদান্য সাহায্যে কষ্ট

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষে কঙ্কালসার নরনারী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্বেচ্ছা সবকের তোলা ছবি।

কথঞ্চিৎ দূর হইতে পারে. কিন্তু দুর্ভিক্ষ ভীষণ হইবার পূর্ব্বে যুদ্ধের সাহায্যে অর্থদান করিয়া দেশ একেবারে নিঃস্ব রিক্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দুর্ভিক্ষের জন্য কিছু সাহায্য করা লোকের সাধ্যাতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে—কারণ দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে তাহার দংশন অল্প বিস্তর সকলকেই ভোগ করিতে হয়, যাহারা স্বচ্ছল ছিল তাহারাও অনটন অনুভব করিতেছে।

তথাপি আনন্দ ও আশার কথা সমস্ত পীড়িত স্থানেই গভর্মেণ্ট ও জনসাধারণ সাহায্য করিবার আয়োজন করিয়াছেন। কিন্তু অভাবের অনুপাতে এই সাহায্য এত অল্প যে তাহা নগণ্য। তবু যে কয়টা প্রাণ বাঁচে তাহাই লাভ। এবং আমাদিগকে বিলাস ব্যসন ত্যাগ করিয়া নিজেরাও দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রতিবেশী ভ্রাতাভগিনীদের দুঃখের অংশ লইয়া তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে।

বাঁকুড়া জেলায় সম্প্রতি দুর্ভিক্ষ অত্যন্ত কঠিন হইয়া দেখা দিয়াছে। বাঁকুড়ার লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৭০; তাহাদের অধিকাংশই অসভ্য অনুন্নত জাতি; কাজেই এই জেলা বঙ্গের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। এক বৎসর অজন্মা হইলেই দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়া বহু প্রাণ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়; যাহারা উহার কবল হইতে অব্যাহতিও পায় তাহারা মৃতকল্প হইয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশই ডাঙা জমি; বৃষ্টি না হইলে ফসল ভালো হয় না; জল সেঁচিয়া চাষ করার মতন জলাশয় ও বন্দোবস্ত এবং শিক্ষা সকলেরই অভাব. সুতরাং অল্পবিস্তর দুর্ভিক্ষ প্রত্যেক বৎসরই হয়। এবার উহা চরমে উঠিয়াছে।

বাঁকুড়া জেলার মুখপত্র বাঁকুড়া-দর্পণের প্রতিসংখ্যা জেলার সকল গ্রামের দারুণ দুর্দ্দশার সংবাদে পূর্ণ থাকিতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসী কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষে কঙ্কালসার নরনারী।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্বেচ্ছাসেবকের তোলা ছবি।

সম্প্রতি দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী, রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারী সম্প্রদায়, প্রভৃতির প্রতিনিধি এবং বাঁকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ ও ছাত্রগণ স্বচক্ষে দেখিয়া যে ভীষণ হৃদয়-বিদারক বর্ণনা দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই অবস্থার শোচনীয়তা বুঝা যায়।

বাঁকুড়া-দর্পণ সংবাদ দিতেছেন—

"যাঁহারা স্বচক্ষে এই দুর্ভিক্ষ, দেখিয়া আসিয়াছেন ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বলিলেন যে, 'পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ' এই বাঁকুড়া জেলায় যে দুর্ভিক্ষ হইতে চলিয়াছে তাহার তুলনায়, সামান্য।' এখানে কাহারও গৃহে অন্ন নাই। কঙ্কালসার শীর্ণ-দেহ লইয়া লোকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। লোক-সকলও গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে, হা অন্ন হা অন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অন্নকষ্ট কতদূর ভীষণ তাহা অন্নকষ্টে পতিত ব্যক্তির গৃহে দুই মুষ্টি অন্ন লইয়া স্বয়ং উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

"সিমলাবান্দ গ্রামের প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ জমি পতিত অবস্থায় আছে। ইতর শ্রেণীর লোকগণ ইতিপূর্ব্বেই বাটী ঘর পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্বেষণে দূর দেশে চলিয়া গিয়াছে। মধ্যবিত্ত লোকগণ অন্নাভাবে অতিকষ্টে দিন যাপন করিতেছে। টাকা কড়ি হাওলাত দেওয়া বা পাওয়া দূরের কথা, টাকা দিয়া ধান্য কনিতে পাওয়া যায় না।

"বাঁকুড়ার ১১ এগার লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৮ লক্ষ দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়াছে। উপস্থিত দুর্ভিক্ষের সবে মাত্র সূত্রপাত হইয়াছে, সুসময়ের জন্য এখনও প্রায় দেড়বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে।"

থানা রাইপুরের অন্তর্গত ফুলকুমরা গ্রামের অনেকে

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষে কঙ্কালসার নরনারী।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্বেচ্ছাসেবকের তোলা ছবি।

"কোনরূপ কার্য্য না পাইয়া বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলায় কার্য্য করিবার জন্য গিয়াছিল কিন্তু শেষে ঐ স্থানে কার্য্য না পাওয়ায় অনশনে ও অর্দ্ধাশনে কঙ্কালসার অবস্থায় বাটীতে প্রত্যাগত হইয়াছে। অনেকেরই আর কার্য্যাদি করিবার শক্তি কিছুমাত্র নাই।

"মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা আরও ভীষণ। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বহুকষ্টে সামান্য পয়সা সংগ্রহ করিতে পারিলেও ধান্য বা চাউল ক্রয় করিতে পাইতেছে না। অনেকে লজ্জার খাতিরে অর্থের অভাবে কাহারও নিকট নিজ কষ্টের বিষয় পরিচয় দিতে না পারিয়া সপরিবারে কোন কোন দিন অনশনে কাটাইতেছে। এই-সকল বাটীস্থ পুরমহিলা ও কুলবালাগণ অনশন-জনিত কষ্টে নীরবে অবিরাম চক্ষুজল বিসর্জ্জন করিতেছে।"

সোনামুখী, পেয়ারবেড়া, শ্যামনগর, বিষ্ণুপুর, মবারকপুর, গোঁসাইপুর যগড়ে, চাবড়া, বেলে, ঢেঙ্গারতলা, নাড়িকা, রামেশ্বরকুড়ি, বড়জোড়া, পখন্না, নিধিরামপুর, প্রভৃতি গ্রামও অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছে।

"থানা গঙ্গাজলঘাটীর সামিল নিধিরামপুর, বড়বাইদ ডাঙ্গজুড়া, কুদরা, মদনপুর, কুমর্য়া, গোপীনাথপুর, ভালকা, খলডমরা, দেউলী, নন্দনপুর, দুর্ল্লভপুর প্রভৃতি গ্রামের শ্রমজীবীগণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে—তাহারা কোথাও মজুরি পাইতেছে না। তাহাদের সন্নিকটস্থ গ্রামে এমন কোন সঙ্গতিপন্ন লোক নাই যে তাহাদিগকে সামান্য বেতন দিয়াও খাটাইতে পারে।

"কেঞ্জাকুড়া ও তৎপার্শ্বস্থিত গ্রামসমূহে দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি ভীষণতররূপে প্রকটিত হইতেছে। চারিদিকেই হাহাকার। লোকে হা অন্ন হা অন্ন করিয়া কান্দিয়া বেড়াইতেছে। লোকে যাহা পাইতেছে তাহাই খাইতেছে। গাছের পাতা, শাক, ছাল প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতেছে। ইতর লোকে কায়িক পরিশ্রম পাইবার আশায় নামাল গিয়াছিল কিন্তু তাহাদের অনেকে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সেদিন নামাল-প্রত্যাগত কতকগুলি মজুর কেঞ্জাকুড়া বাজারে আসিয়া পড়িল। তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অশ্রু সংবরণ

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষে কঙ্কালসার নরনারী।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্বেচ্ছাসেবকের তোলা ছবি।

করিতে পারা যায় না। তাহারা আসিয়াই বাজারের একটি অনাচ্ছাদিত স্থানে শয়ন করিল। কোন শব্দ নাই—এক ঘণ্টা পড়িয়া থাকিবার পর তাহাদের চৈতন্য হইল। এক ব্যক্তি দুই পয়সার কলাই ভাজা কিনিয়া তাহাদের মুখে কিছু কিছু দিলেন। দুই পয়সার কলাই ভাজায় তাহাদের কি হইবে? তাহারা বার জন ছিল। কতক্ষণ পরে তাহাদের মধ্যে যাহারা চলিতে সমর্থ তাহারা অসমর্থকে হাত ধরিয়া লইয়া গেল। এখনও অনেক লোক শিশু সন্তানসহ নামাল যাইতেছে, জানি না পরে তাহাদের কি হইবে। এখানে এখন ধান টাকায় ১৫ সের, চাউল ৬॥ সের, ভুট্টা ১৩ সের। ভুট্টাই বেশীর ভাগ বিক্রয় হইতেছে। এক প্রকার ক্ষুদ আমদানী হইয়াছে। অনেক লোক সস্তা দেখিয়া তাহাই কিনিতেছে কিন্তু ইহা খাইয়া কেহ কেহ ফুলিতেছে।

"অনশনক্লিষ্ট শীর্ণকায় নরনারী দ্বারা সহর দিন দিন পূর্ণ হইতেছে। পেটের জ্বালায় যে কত লোক সহরে আসিতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না।"

বাঁকুড়া থানার এলাকাধীন, সহরের অতি সন্নিকট, বাঁকি, সেন্দড়া, মুগরা, ভূতসহর, আদড়া, বগা ও ডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামসমূহে অন্নাভাব হওয়াতেই ক্লিষ্ট নরনারী সহরে ভিক্ষার আশায় আসিতেছে।

"সহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পল্লীগ্রামে ভিক্ষার অভাব হওয়াতেই সহরে ভিক্ষুকের সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইয়াছে তৎপক্ষে অণুমাত্র সংশয় নাই, এবং তদ্দ্বারাই পল্লীগ্রামের অবস্থা যে দিন দিন বর্ণনাতীত ভীষণাকার ভাব ধারণ করিতেছে তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ছত্রি প্রভৃতি ভদ্র সন্তানগণ "বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিয়া অন্নাভাবের কথা আত্মীয় স্বজনের কর্ণগোচর করেন না" ইহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং আজি বাঁকুড়া সহরের উপকণ্ঠ-স্থিত কয়েকটি গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্র পরিবারের অবস্থা অবর্ণনীয়।"

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সংবাদ দিয়াছেন—

ধান গাছে শীষ নাই।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে গো-শকটে বাঁকুড়ার দক্ষিণ পশ্চিমে ইঁদপুর থানার দিকে যাত্রা করি। রাস্তার উভয় পার্শ্বে যত ক্ষেত্র

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষে কঙ্কালসার নরনারী।—বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর স্বেচ্ছাসেবকের তোলা ছবি।

দেখিলাম, অধিকাংশ পতিত। কোথায়ও কোথায়ও নিম্নভূমিতে ধান হইয়াছে, কিন্তু একটি গাছেও ধানের শীষ নাই এবং আর হইবারও সময় নাই।

লোকে পূবে যাইতেছে।

দলে দলে স্ত্রী পুরুষ কাজের অনুসন্ধানে "পূবে" যাইতেছে।

সন্তান-বিক্রয়।

পরদিন প্রাতে সতীশ বাবু এবং সত্য বাবু অম্বিকানগরের অবস্থা দেখিতে গেলেন। সেদিককার লোকের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এমন লোক অনেক আছে, যাহারা এক মাসের মধ্যে ভাত খায় নাই; ভুট্টা, কেঁদ (শালজাতীয় গাছের ফল) বা মারুয়া (শ্যামা ঘাসের ন্যায় একপ্রকার শস্য) খাইয়া আছে। এই-সকল লোক অনেকে কঙ্কালসার হইয়াছে। কেহ কেহ খাইতে দিতে অসমর্থ হইয়া ২।১ টাকার লোভে অপরকে সন্তান বিক্রয় করিতেছে।

বাজারে চাউল নাই।

বাজারে চাউল কিনিতে পাওয়া যায় না—সুতরাং চাউল দেওয়া গেল না। খাতড়ার অবস্থা যাহা বুঝা গেল, তাহাতে এদিকে মাসখানেক পরে সকল লোকেরই সাহায্য প্রয়োজন হইবে। এখন লোকে ভুট্টা খাইয়া আছে।

জেলাবোর্ডের সাহায্য।

শুনিলাম মুসেড়া নামক একটি গ্রামে লোকের খুব কষ্ট। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে রাস্তা নিৰ্ম্মাণ করিয়া ৭০০।৮০০ লোককে সাহায্য দিতেছেন।

অনাহারে মৃত্যু।

১৭ই সেপ্টেম্বর খাতড়া হইতে ফিরিবার পথে গোবিন্দপুর ও জীয়ড়দা গ্রামের অবস্থা অনুসন্ধান করিলাম। পথেই আমরা শুনিয়াছিলাম জীয়ড়দাতে ক্ষান্ত বাউরির একটি ছেলে অনাহারে মরিয়াছে এবং অবশিষ্ট দুটিও মরণাপন্ন। সেদিন বৃষ্টি হওয়াতে পথে অত্যন্ত কাদা ছিল, আমি ও সতীশ বাবু জীয়ড়দা যাইতে পারিলাম না। সত্য বাবু গেলেন। ক্ষান্ত বাউরীর ছেলে অনাহারে মরার কথা সত্য। আমাদের নিজের খাওয়ার জন্য সঙ্গে ৬।৭ সের চাউল ছিল। সত্য বাবু এই চাউল ঘাড়ে লইয়া ৩॥ মাইল পথ হাঁটু পর্যন্ত কাদা ভাঙ্গিয়া ক্ষান্ত বাউরির বাড়ী গিয়া চাউল টাকা দিলেন। গ্রামের আর সকলের অবস্থাও অতিশয় শোচনীয় দেখিলেন। ৪ সের চাউল অনেকের মধ্যে ভাগ করিয়া, কয়েকজনের তখনই নিজের সমক্ষে রান্না চড়াইয়া দিলেন। কারণ তাহারা কয়েকদিন যাবৎ উপবাসী ছিল। অন্যান্য গ্রামবাসীর মধ্যে ১৫্ টাকা বিতরণ করিলেন। সতীশ বাবু গোবিন্দপুরবাসীদের অবস্থাও খুব খারাপ দেখিলেন। তাহাদের মধ্যেও কিছু টাকা বিতরণ করিলেন।

শিশু-মৃত্যু।

প্রায় ৩টার সময় আমরা ইঁদপুরে ফিরিলাম। সেখানে একজন কণ্ট্রাক্টার আমাদের বলিলেন যে মুক্তিডি গ্রামে এক বাউরী স্ত্রীলোকের কয়েকটি সন্তান অতি শোচনীয় অবস্থায় মারা গিয়াছে। নিজে অনাহারে এবং ভুট্টা খাইয়া থাকাতে বুকের দুধ শুকাইয়া যায় এবং চাউল না থাকাতে ফেনও জোগাড় করিতে পারে না, দুধের ত কথাই নাই—এই অবস্থায় তাহার শিশু সন্তানটি মারা যায়। তাহাকে ঘরের মধ্যে ফেলিয়া আর দুইটি সন্তান লইয়া ভিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে পলায়ন করে। রাস্তায় অপর দুটি সন্তানও মারা গিয়াছে।

কর্ত্তব্যের পরিমাণ।

বাঁকুড়ার চারি পঞ্চমাংশ লোককে খাওয়াইতে হইবে। দুর্ভিক্ষের সবে মাত্র আরম্ভ। এখনই এই অবস্থা। অগ্রহায়ণের পরে যখন সকলেরই ঘরে খাদ্যাভাব হইবে—তখন যে ভীষণ অবস্থা হইবে তাহা কল্পনা করিতেও মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আমার ভরসা আছে এখন যে যাহাই বলুন শীঘ্রই রাজা প্রজা সকলেরই এক মত হইবে। নবেম্বর মাস হইতে বাঁকুড়া জেলাকে অন্নসত্রে ছাইয়া ফেলিতে হইবে। এখনও স্থানে স্থানে অল্পমাত্রায় কাজ করিতে হইবে। কারণ সম্মুখে যে অবস্থা আসিতেছে, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান অবস্থা কিছুই নহে। একটা জেলায় প্রায় চারি-পঞ্চমাংশ লোককে একবৎসর খাওয়াইয়া রাখা বড় গুরুতর সমস্যা। কঠিন হইলেও এপ্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে।

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর সভ্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু স্বচক্ষে বাঁকুড়া জেলার অবস্থা দেখিয়া লিখিয়াছেন—

"বাঁকুড়ার কষ্ট অবর্ণনীয়। সহস্র সহস্র পুরুষ, নারী, ও শিশু অনাহারে ও ক্লেশে মৃতপ্রায় হইয়াছে।"

উক্ত মণ্ডলীর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মণ্ডল পলাশডাঙ্গা, ছাতনা, বড়জোড়া অঞ্চল স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন—

The condition of the people in these places is hopelessly distressing. The sight of these starving people reduced to skeletons makes one's heart bleed. When they heard of our arrival, they at once flocked to us to receive gifts of rice, but many, numbering about 100, dropped on the way through exhaustion, some of them, alas! never to rise again.

অর্থাৎ এইসব স্থানের দুরবস্থা দেখিলে হতাশ হইতে হয়। কঙ্কালসার লোকগুলিকে দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমদের আসার সংবাদ পাওয়া মাত্র লোকে দান পাইবার জন্য সমবেত হইতে লাগিল, কিন্তু ১০০ আন্দাজ লোক অনাহারের ক্লান্তিতে পথেই পড়িয়া গেল, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আর উঠিল না।

উপরে উদ্ধৃত সংবাদগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে বাঁকুড়া জেলার অবস্থা কি দারুণ রকমে শোচনীয় হইয়াছে। যে কয়েক সম্প্রদায় সাহায্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া দুঃস্থদের দান করিতেছেন তাহার তুলনায় অভাব অত্যন্ত বেশী; অধিকাংশ স্থানে এখনো সাহায্য পৌঁছে নাই অথচ লোক অনশনে কষ্ট পাইয়া মরিতেছে। অবিলম্বে অল্প দূরে দূরে সমস্ত জেলাব্যাপিয়া সাহায্যকেন্দ্র করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আমাদের উচিত সকলেরই যথাসাধ্য মুক্তহস্ত হইয়া দান করা। সকল সাহায্যকারীর দ্বারাই যথেষ্ট উপকার হইতেছে; যাঁহার সামর্থ্য ও সচ্ছলতা আছে তিনি সকল ভাণ্ডারেই দান করুন; যিনি ততদূর না পারিবেন তিনি যে ভাণ্ডারকে তাঁহার ভালো লাগিবে সেই ভাণ্ডারের হস্তে তাঁহার দান বিতরণের ভার অর্পণ করুন। বিলম্বে বা পরে করিব বলিয়া অপেক্ষা করিবার সময় নাই, তৎপর হইয়া অগ্রসর হইবার জরুরী তাগাদা মৃত্যুদেবতার মুখে দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে!

বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট অধিবাসীদের জন্য আবেদন।

সাহায্য করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বাঁকুড়া-সম্মিলনী হইতে একটি কার্য্যকরী সভা গঠিত হইয়াছে, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সভার সভাপতি হইয়াছেন। অতএব সহৃদয় দেশবাসীগণের নিকট আমরা সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি। যিনি যাহা দান করিবেন তাহা যতই সামান্য হউক কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটে প্রেরণ করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ইতি

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, সম্পাদক, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু, সহকারী সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীঋষীন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, বি, এল উকীল হাইকোর্ট, সেক্রেটারী।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শাজাহানের মৃত্যু

চিত্রকর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা অঙ্কিত

RAY & SONS

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৫শ ভাগ ২য় খণ্ড	অগ্রহায়ণ, ১৩২২	২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কাব্যরচনা ও কাব্যসমালোচনা।

বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের কাব্য বহুশতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। তখন ছাপাখানা ছিল না। এক এক খানি কাব্যের এক একটি প্রতিলিপি করিতে অনেক সময় লাগিত। এই-সকল কাব্যের রচনা-কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে নৈসর্গিক নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, রাষ্ট্রবিপ্লব অনেকবার হইয়াছে। তাহাতে কত নগরী, কত প্রাসাদ, কত প্রস্তর ও ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি, বিনষ্ট ভগ্ন বা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও শত শত সংস্কৃত কাব্য ও অন্যবিধ গ্রন্থ পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নহে, যে, ভারতবর্ষের লোকেরা এই-সকল কাব্যের আদর করিত। তাহা না হইলে এগুলি রক্ষিত হইল কিরূপে? কাব্যগুলি হইতে তাহারা আনন্দ পাইত, কাব্যরস আস্বাদন করিবার শক্তি তাহাদের ছিল।

অথচ দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমানকালে, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য দেশ-সকলে, এক এক কবির গ্রন্থাবলীর বা এক এক খানি কাব্যের যেরূপ বিস্তৃত সমালোচনা, গুণ ব্যাখ্যা, রস বিশ্লেষণ, রসপরিচায়ক গ্রন্থ দেখা যায়, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তদ্রূপ কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না।* এক শেক্স্‌পীয়র ও তাঁহার কাব্যগুলি সম্বন্ধে ইংরেজীতে শত শত বহি লেখা হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। জার্ম্মেন, ফরাসী, প্রভৃতি ভাষাতেও ইংরেজ কবি ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে বিস্তর পুস্তক আছে। কিন্তু আমাদের কালিদাস সম্বন্ধে সংস্কৃত প্রাচীন এরূপ একখানি বহিও আছে বলিয়া শুনি নাই। বোধ হয় শুধু ভারতবর্ষের নয়, অন্যান্য দেশেও এই জাতীয় সমালোচনার বহি বা রসপরিচায়ক গ্রন্থ, প্রাচীনকালে রচিত হইত না। আমরা গ্রীক লাটিন সাহিত্যের বেশী খবর রাখি না; কিন্তু যতটুকু জানি, তাহাতে ঐ দুই সাহিত্যে এরূপ বহির প্রাচুর্য্য আমাদের জ্ঞানগোচর হয় নাই। কিন্তু এরূপ গ্রন্থের স্বল্পতা বা অত্যন্ত অভাব হইতে এরূপ অনুমান করা চলে না যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা তাহাদের কবিদের রচনার আদর করিত না, মূল্য বুঝিত না, রস আস্বাদন করিয়া আনন্দ পাইত না। কেননা তাহা হইলে সেই-সব অমূল্য কাব্য বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই লোপ পাইত।

আমাদের বাঙ্গালী কবিদের রামায়ণ মহাভারত আদি কাব্য কেবল হাতের লেখা পুঁথি এবং গায়ক কথকদের স্মৃতির সাহায্যে বহুকাল জীবিত থাকিয়া এক শতাব্দী পূর্ব্বে ছাপাখানার সাহায্য লাভ করে। কিন্তু তখনও উৎকৃষ্ট

* আমরা সংস্কৃতসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নহি। ভ্রম হইয়া থাকিলে পণ্ডিতবর্গ তাহা দেখাইয়া উপকৃত করিবেন।

কাগজে সুমুদ্রিত হইয়া নানা নয়নরঞ্জন কাপড়ের বাঁধাইয়ে তাহারা পাঠকদের গৃহে আবির্ভূত হয় নাই। বটতলার মুদ্রাকর ও পুস্তকবিক্রেতা, এবং গ্রাম্য অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। গ্রাম্য পাঠক ও শ্রোতারা মাসিকপত্রে দীর্ঘ-সমালোচনা লিখিত না, পড়িত না; সমালোচনার বহিও তখন ছিল না। কিন্তু রামায়ণ যে-সকল নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে হাসাইত, কাঁদাইত, ধর্ম্মসঙ্গত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ ও সমর্থ করিত, তাহারা রামায়ণের সমজ্দার ছিল না, একথা বলা চলে না। হিন্দুনারীকে সীতার মত সাধ্বী হইতে, ছোট ভাইকে লক্ষ্মণের মত অগ্রজপ্রাণ হইতে, রাজাকে রামের মত প্রজারঞ্জক হইতে, কোন সমালোচক শিখান নাই, সাক্ষাৎ-ভাবে রামায়ণই শিখাইয়াছে।

অতএব যে জাতি সমালোচনার বহি বা রসপরিচায়ক গ্রন্থ বেশী লেখে না, বা মোটেই লেখে না, তাহারা কাব্যের আদর করে না, কাব্য বুঝে না, কাব্যের রস গ্রহণ করিতে পারে না, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। যে প্রেমিক প্রেমাস্পদের রূপগুণ সুন্দর করিয়া নানা ছন্দে বর্ণনা করিতে পারেন, তিনিই প্রেমিক, আর যাঁহার সে ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি নাই, তিনি প্রেমিক নহেন, ইহা স্বীকার করা কঠিন। অতি অল্পসংখ্যক জননীই নিজের শিশুর সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন, বা পুত্রহারা হইয়া কবিতায় শোক ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া কেহ এমন মনে করে না যে অকবি জননীদের মাতৃস্নেহ নাই।

আমরা এমন মনে করি না, বলিও না, যে, সমালোচনা করিবার, রসের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিবার, উহার পরিচয় দিবার ক্ষমতাটা তুচ্ছ, বা তদ্দ্বারা সমাজের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এই শক্তির মূল্য আছে, প্রয়োজন আছে, উপকারিতা আছে।

তবে, এখানে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। কৃষক চাষ করিতে জানে; সেটাও একটা বিদ্যা। সেই বিদ্যা কাজে লাগাইয়া এবং পরিশ্রম করিয়া কৃষক ইক্ষু উৎপাদন করিল। আমি সেই ইক্ষুর রস পান করিয়া তৃপ্ত হইলাম, এবং "আঃ, কি চমৎকার!" বলিয়া তৃপ্তিজ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু তাহাতে ইহা প্রমাণিত হইল না যে কৃষক অপেক্ষা আমি বেশী গুণবান্ বা শক্তিশালী। ইহাও প্রমাণ হইল না যে কৃষকসম্প্রদায় অপেক্ষা ইক্ষুরসপায়ী সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা সন্দেশ খান, তাঁহারা ময়রাদের চেয়ে নিশ্চয়ই গুণশালী ইহাও স্বতঃসিদ্ধ নহে। কবিগণ সমালোচক বা কাব্যরসগ্রাহীদের চেয়ে নিকৃষ্ট নহেন। কবিদের স্বজাতীয়েরাও সম্ভবতঃ সমালোচক বা কাব্যরস-গ্রাহীদের স্বজাতীয়বর্গ অপেক্ষা সাহিত্যিক শক্তিতে স্বভাবতঃ হীন নহেন।

যে সহরে বসিয়া আমরা লিখিতেছি তথায় প্রয়োজনীয় বহি হাতের কাছে পাই না। কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিতেছি যে সম্ভবতঃ জার্ম্মেনরাই প্রথমে শেক্‌স্পীয়রের নাটকগুলির বিস্তৃত সমালোচনা ও রস ব্যাখ্যা করে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কি ইহা প্রমাণ হয় যে ইংরেজদের চেয়ে জার্ম্মেনদের সাহিত্যিক শক্তি বেশী? আমাদের ত তা মনে হয় না।

বাঙ্গলা দেশে প্রকৃত সমালোচনা, ভাল রসপরিচায়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ অল্পই লিখিত হইতেছে। এইরূপ রচনার সংখ্যা ও উৎকর্ষবৃদ্ধি প্রার্থনীয়। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে এই-সব জিনিষ লিখিত হইতেছে না বলিয়া ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না, যে, বাঙ্গালীর সাহিত্যিক শক্তি কম, বা বাঙ্গালী উৎকৃষ্ট সাহিত্যের আদর করে না। এক সময়ে ত বাঙ্গলা দেশে উপন্যাস ও ছোট গল্পও লিখিত হইত না। কিন্তু এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে স্বাভাবিক শক্তিহীনতা তাহার কারণ নয়। আমাদের দেশে এখনও সেই প্রাচীন ধাঁচা অনেকটা চলিতেছে যখন লোকে সাহিত্যরস উপভোগ করিত, কিন্তু কেন আনন্দ পাইতেছে, তাহা বলিতে জানিত না, বা বলিত না। তদ্ভিন্ন, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর। শিক্ষিত-দেরও, শব্দার্থ, ধাতুপ্রত্যয়, ব্যুৎপত্তি, ব্যাকরণ, প্রভৃতি বাল্যে ও যৌবনে যে পরিমাণে শিখিতে হয়, সাহিত্যের প্রাণের, মর্ম্মস্থলের, হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি সে পরিমাণে আকৃষ্ট হয় না। সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ছাড়িয়া সাহিত্যের উদারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত লোকও এখনও দেশে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাইতেছে না। এমন কোন কোন বহিও বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে যাহার রস উপভোগ করিতে

হইলে পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তাই যথেষ্ট নহে; আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টিরও প্রয়োজন হয়।

আমাদের দেশে যাঁহারা উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিতেছেন, তাঁহারা বিদেশী নহেন। তাঁহাদের শক্তির উদ্ভব ও বিকাশ, অন্ততঃ আংশিকভাবেও বঙ্গদেশ ও বঙ্গীয়সমাজ হইতেই হইয়াছে। সুতরাং বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি অবজ্ঞেয় নহে। যে দেশ ও যে জাতি কবিদিগকে জন্ম দিতে পারিয়াছে, সেই দেশ ও সেই জাতি কালে যথেষ্ট পরিমাণে সমালোচক ও রসগ্রাহী রসপরিচায়কেরও জন্ম দিতে পারিবে। শেক্সপীয়রের জীবিতকালে তাঁহার কাব্যগুলি উপভোগ করিবার ও বুঝাইবার লোক বেশী ছিল না। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াছে।

বড়োদা ও বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষ।

শিক্ষা। বড়োদা রাজ্যের দেওয়ান ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের বড়োদার শাসনবিবরণীতে কোন কোন বিষয়ে অন্য দুই একটি দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের সহিত বড়োদার তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মধ্যে শিক্ষায় বাংলাদেশ অগ্রসর। ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে সমগ্র শিক্ষার ব্যয় হইয়াছিল ২০৩ লক্ষ। তন্মধ্যে (মিউনিসিপালিটি-সমূহের প্রদত্ত অর্থ সহ) সরকারী ব্যয় ৮২ লক্ষ; বাকী ছাত্রদত্ত বেতনাদি হইতে পাওয়া গিয়াছিল। বড়োদার ১৯১৩-১৪ সালে মোট ব্যয় হইয়াছে ১৭,২১,০০০ টাকা, তন্মধ্যে সরকারী ব্যয় ১৫,৪৩,০০০ টাকা। অর্থাৎ বঙ্গে মোট ব্যয়ের শতকরা ৪০ টাকা সরকার দিয়াছেন, বড়োদায় মোট ব্যয়ের শতকরা ৮৯ টাকার উপর সরকার দিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে শিক্ষা বিষয়ে বড়োদারাজ্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখাইয়াছেন। আর এক দিক দিয়া এই তুলনা করা যাইতে পারে। বড়োদার লোকসংখ্যা মোটামুটি ২০ লক্ষ; তাহাদের জন্য বড়োদারাজ শিক্ষার্থ ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। বঙ্গের লোকসংখ্যা মোটামুটি ৪৫৪ লক্ষ; তাহাদের জন্য শিক্ষাকার্য্যে বাংলা গবর্ণমেণ্ট (মিউনিসিপাল সাহায্য সহ) ব্যয় করিয়াছেন ৮২ লক্ষ টাকা। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাকার্য্যে যদি ৩৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন তাহা হইলে এ বিষয়ে বড়োদারাজের সমকক্ষ হইতে পারিবেন।

বড়োদার লোকসংখ্যা ২০,৩২,৭৯৮। তন্মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২,২৯,৯০৩। অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার শতকরা ১১·৩ ছাত্রছাত্রী। বঙ্গের মোট লোক সংখ্যা ৪,৫৪,৮৩,০৭৭। তন্মধ্যে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৭,৪৭,৬০৮। অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৩·৮ জন ছাত্রছাত্রী। বাংলাদেশে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৭·৫ জন বাড়িলে অর্থাৎ মোটছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরও ৩৪,১১,২২৫ জন বাড়িলে বাংলাদেশ শিক্ষায় বড়োদার সমান অগ্রসর হইবে।

দেশভাষায় উচ্চ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। বড়োদায় বৃটিশ ভারতের মত ইংরেজী স্কুল ও কলেজ আছে। তথায় ইংরেজীভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন দেশভাষার সাহায্যেও উচ্চশিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ট্রেনিং কলেজে মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতিবিজ্ঞান, অর্থতত্ত্ব, আধুনিক ইউরোপীয় ও আমেরিকান্ ইতিহাস, প্রভৃতি বিষয় দেশভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। কলাভবনে প্রধানতঃ দেশ-ভাষার সাহায্যেই নানাপ্রকার শিল্প শিখান হয়।

লাইব্রেরী। মানুষকে শুধু পড়িতে শিখাইলেই হয় না; সে কি পড়িবে, তাহারও ব্যবস্থা করা চাই। বড়োদারাজ বহু অর্থব্যয়ে এবং উৎসাহের সহিত এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯১৩-১৪ সালের শেষে বড়োদা-রাজ্যে ৪২৪ টি লাইব্রেরী ও পাঠগৃহ ছিল। প্রায় প্রত্যেক বৃহৎ গ্রামে একটি করিয়া পুস্তকালয় আছে। কোন স্থানের লোকেরা লাইব্রেরী-গৃহের জন্য যত চাঁদা দিবে, গবর্ণমেণ্ট এবং লোকাল বোর্ড প্রত্যেকে তত করিয়া টাকা দিবেন, বড়োদায় এই নিয়ম থাকায় এখন প্রায় সমুদয় মহকুমার সদর সহরে লাইব্রেরীগুলি নিজ নিজ গৃহে স্থাপিত হইয়াছে। স্থায়ী লাইব্রেরী ছাড়া বড়োদায় চলিষ্ণু লাইব্রেরীও আছে। অর্থাৎ কতকগুলি বাছা বাছা বহি (সাধারণতঃ ত্রিশ খানি) বাক্স-বন্দী করিয়া এক গ্রামে পাঠান হয়। তথাকার লোকদের উহা পড়া হইয়া গেলে

ঐ সব বহি অন্যত্র প্রেরিত হয়, এবং নূতন আর এক বাক্স বহি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। বক্ষ্যমান বৎসরে এইরূপ ২৯৭ টি বাক্স নানা গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। এক একটি গ্রামে একটি বাক্স তিনমাস করিয়া রাখা হয়। তাহার পর রিপোর্ট লওয়া হয় যে ঐ গ্রামে কতজন বহিগুলি পড়িয়াছে, এবং তথায় প্রধানতঃ কিরূপ বহির পাঠক বেশী। লাইব্রেরীর জন্য ১৯১৩-১৪ সালে ৭৭,০৪৬ টাকা এবং ১৯১২-১৩ সালে ১,০২,০০০ টাকা সরকারী খরচ হইয়াছিল।

চাক্ষুষ শিক্ষা। ইহা ছাড়া লোকশিক্ষার জন্য "চাক্ষুষ শিক্ষা" (Visual Instruction) নামক এক নূতন শাখা খোলা হইয়াছে। সাধারণতঃ লোকে আমোদের জন্য বায়োস্কোপ দেখিতে যায়। কিন্তু উহা দ্বারা নানা বিদ্যাও শিখান যায়। বড়োদাতে সেই চেষ্টা হইতেছে। বক্ষ্যমান বৎসরে ৪৮ টি গ্রামে ৭৯ টি বায়োস্কোপ-প্রদর্শনী হইয়াছিল, এবং ৬০,০০০ লোক বিনাব্যয়ে উহা দেখিয়াছিল।

অনুন্নতজাতির শিক্ষা। জঙ্গলীজাতি এবং অসভ্য আদিমজাতিসকলের বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য বড়োদায় বহুসংখ্যক ছাত্রাবাস-সমন্বিত বিদ্যালয় (Boarding Schools) আছে। এই-সকল বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা ছাড়া নানাবিধ অর্থকর শিল্প শিখান হয়, এবং বালিকাদিগকে গৃহিণীপনা শিক্ষা দেওয়া হয়। যে-সকল গ্রামে বহুসংখ্য অন্ত্যজক "অস্পৃশ্য" লোক আছে, মহারাজা তথায় তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বড়োদা রাজধানীর অন্ত্যজ বিদ্যালয়ে সংস্কৃতও শিখান হয়। যে-সকল ছাত্র অন্ত্যজদিগের পৌরোহিত্য করিবে, তাহাদিগকে আর্য্যসমাজের উপদেশকেরা সংস্কৃত মন্ত্র শিখাইয়া থাকেন।

প্রজানিপীড়ন নিবারণ। যে-সকল রাজকর্ম্মচারী রাজকার্য্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের বা তাঁহাদের পিয়াদা চাপরাসী ও অন্য ভৃত্যদের দ্বারা যাহাতে প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়ন না হয়, মহারাজা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট পদবীর ভ্রমণকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে একটি করিয়া মুদিখানা থাকে। কর্ম্মচারী, তাঁহার পিয়াদা, চাপরাসী, ভৃত্য প্রভৃতি সকলকে এই মুদিখানার মালিকের নিকট হইতে জিনিষ পত্র নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কিনিতে হয়। মুদি বিল্ করে, এবং তাহার মূল্য তৎক্ষণাৎ দিতে হয়। এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইতেছে কি না, তৎপ্রতি বড়োদারাজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে। ইহার ফলে রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা প্রজাদের শস্য, তরকারী, দুগ্ধ ঘৃত আদি, পশুপক্ষী, ডিম্ব প্রভৃতি বিনামূল্যে গৃহীত হইতে পায় না।

অনাথপালন। দুর্ভিক্ষ বা অন্যবিধ কারণে যে-সকল বালকবালিকা পিতৃমাতৃহীন হয়, রাজসরকার কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত অনাথাশ্রমে তাহারা প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হয়। তাহাদিগকে অন্নবস্ত্রের জন্য বাপপিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টিয়ান হইতে হয় না।

বিচার ও শাসনবিভাগের স্বাতন্ত্র্য। ব্রিটিশ-ভারতবর্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ফৌজদারী মোকদ্দমার তদন্ত করেন, বা পুলিশকে তদন্ত করিতে আদেশ করেন, আবার ঐ-সব মোকদ্দমার বিচারও তাঁহারা করেন। ইহাতে অনেক সময় সুবিচারের ব্যাঘাত হয়, কখন কখন বিচারবিভ্রাট ঘটে। এইজন্য কংগ্রেস বহু বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ ভারতে শাসন- ও বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ, প্রভৃতি অনেক বিচারকার্য্যে-অভিজ্ঞ ব্যক্তি কংগ্রেসের এই আবেদনের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোথাও বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ হইতে সম্পূর্ণ বা অংশতঃ পৃথক করেন নাই। বড়োদায় ১৯০৪ হইতে এই সংস্কারের সূত্রপাত হইয়া এখন প্রায় সর্ব্বত্র বিচার ও শাসনকার্য্য স্বতন্ত্র কর্ম্মচারীদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। তাহাতে বিচারকার্য্য শীঘ্র ও সুসম্পন্ন হইতেছে, অথচ শাসকদিগের আইনসঙ্গত প্রভুত্ব, শক্তি বা কার্য্যকারিতা কমে নাই।

বালকবালিকার বিচারালয়। বালকবালিকারা যদি কোন আইনবিরুদ্ধ কাজ করে, তাহা হইলে আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে (U. S. A.) এবং ইউরোপের কোন কোন দেশে সাধারণ বিচারালয়ে তাহাদের

বিচার হয় না, দোষী সাব্যস্ত হইলে সাধারণ কারাগারেও তাহারা প্রেরিত হয় না; তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয়, বিচারক, আইন, এবং সংশোধনপ্রণালী ও সংশোধনাগার আছে। সাধারণ কারাগারে দুশ্চরিত্র কয়েদীদের সংসর্গে তাহাদের পাকা বদ্‌মায়েস হইয়া উঠা এই প্রকারে নিবারিত হয়, এবং তাহারা সুশিক্ষা পাইয়া ভবিষ্যতে অন্যান্য লোকদের মত সদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সৎপথে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। বড়োদার মহারাজা ইউরোপ আমেরিকার ব্যবস্থা ও পদ্ধতি সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া নিজ রাজ্যে অভিযুক্ত বালকবালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয় স্থাপন ও অন্যান্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৬ ও তন্নিম্ন বয়স্ক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার, দণ্ড, সংশোধন, শিক্ষা, এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে হয়। নির্দ্দিষ্ট কোন কোন স্থলে বিচারের পূর্ব্বে, বা বিচারের সময় অভিযুক্ত বালকবালিকা তাহাদের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবক, বা অন্য কোন যোগ্য দায়ী ব্যক্তির জামিনে মুক্তি পাইতে পারে। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে বার বৎসরের কম বয়সের কোন ছেলে বা মেয়ের প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাস হইতে পারে না। অপরাধী বালক বা বালিকাকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিম্বা পিতামাতার বা অন্য অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রক্ষার জন্য এই সর্ত্তে অর্পিত হইতে পারে যে আদালত উপযুক্ত কারণে অপরাধীকে আবার ডাকাইয়া দণ্ড দিতে পারিবেন। অপরাধীরা তিন বৎসরের অন্যূন এবং সাত বৎসরের অনধিক কালের জন্য সংশোধনাগারে প্রেরিত হইতে পারে। এই সংশোধনাগারগুলি জেলের মত নয়, অনাথ বালকবালিকাশ্রমের মত, এবং শিক্ষাবিভাগের অধীন। ব্রিটিশ-ভারতের "ছোকরা জেল" (reformatories) গুলি জেলবিভাগের অধীন। বড়োদায় কোন বালকবালিকা আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলেও, তাহারা সাধারণ নির্দ্দোষ প্রজার কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না। অর্থাৎ ফৌজদারী আদালতে দণ্ডিত ব্যক্তিরা যেমন সরকারী চাকরী পায় না, বা তাহাদের তদ্রূপ অন্য কোন অযোগ্যতা হইয়াছে বলিয়া স্থির হয়, বড়োদায় অপরাধী বালকবালিকাদের তাহা হয় না।

বালকবালিকাদিগকে মাদক বিক্রয় নিষেধ। বড়োদার মহারাজা আর একটি অতি প্রয়োজনীয় নিয়ম জারী করিয়াছেন। কোন বালক বালিকাকে কোন আকারে কোন প্রকারের মদ্য বা তামাক বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শিশুশ্রম নিষেধ। বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোন বালক বা বালিকাকে কোন কারখানাতে বা বিপৎসঙ্কুল ব্যবসায়ে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পাল্যপালক নিবন্ধ। পিতৃমাতৃহীন বা কেবল পিতৃহীন বালকবালিকাদের বিষয় রক্ষার জন্য বড়োদায় যে ব্যবস্থা আছে তাহার নাম পাল্যপালক নিবন্ধ। এই আইন অনুসারে, মালিকদের তদ্রূপ ইচ্ছা হইলে, ১৫০০ ও তদূর্দ্ধ টাকার সম্পত্তি রাজসরকারের তত্ত্বাবধায়কতার অধীন হইতে পারে। দেওয়ান বলেন যে তিনি ভারতবর্ষের আর কোথাও এত অল্প আয়ের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের সরকারী ব্যবস্থা আছে বলিয়া অবগত নহেন।

বিবাদভঞ্জন। বড়োদা রাজধানীতে এবং ২৫টি তালুকায় ২০৬ জন বিবাদভঞ্জক (conciliator) নামক কর্ম্মচারী আছেন। সাধারণ আদালতে মোকদ্দমা না করিয়া লোকে ইঁহাদের মধ্যস্থতায় বিবাদ নিষ্পত্তি করাইতে পারে। এই নিয়ম এখনও রাজ্যের সর্ব্বত্র জারী করা হয় নাই। ১৯১৩-১৪ সালে এই মধ্যস্থেরা ১২৩৪৪টি বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছিলেন, এবং ৭৭৬টি তাঁহাদের বিবেচনাধীন ছিল।

বাঙ্গলা ও বড়োদা।

সমগ্র বড়োদা রাজ্যের লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ ৩২ হাজার ৭ শত ৯৮। বাংলাদেশের মৈমনসিংহ, মেদিনীপুর, প্রভৃতি জেলার লোকসংখ্যা ইহা অপেক্ষা অধিক। বড়োদার প্রজাদের উন্নতির জন্য যত শিক্ষালয়, লাইব্রেরী, মিউজিয়ম, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আছে, তাহা বঙ্গের এই-সকল জেলার প্রত্যেকটিতে আছে কিনা, প্রত্যেক জেলার লোকে অনায়াসেই তাহা স্থির করিতে পারিবেন। কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আরও কয়েকটি উল্লিখিত হইতেছে।

চাষের উন্নতি। বাংলাদেশে চাষের উন্নতির কোন সরকারী চেষ্টা হয় না, এমন নয়। কিন্তু বড়োদা একটি জেলার সমান; তাহার সমকক্ষ হইতে হইলে বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় বড়োদার মত বিস্তৃত সুশৃঙ্খল চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

বড়োদার চারিটি জেলায় ৭৪ জন অবৈতনিক পত্রলেখক ও সাহায্যকারী আছেন। তাঁহাদের সাহায্যে নানাবিধ উৎকৃষ্ট লাঙ্গল ও অন্যান্য চাষের যন্ত্র প্রচলিত করা হয়।

কৃষি সমিতি। "কাদী প্রান্ত খেদৎ সভা" একটি চলিষ্ণু কৃষি প্রদর্শনী ও পরীক্ষালয়ের ব্যবস্থা করেন। ইহা নানা স্থানে দেখাইয়া লইয়া বেড়ান হয়, ফলে ১৭৮টি উৎকৃষ্ট যন্ত্র লোকে চাহিয়াছে। এই সভা বাছাবাছা বীজ ও ভাল সার এবং নানাপ্রকার কৃষিবিষয়ক ১৪ রকমের পত্রী (leaflet) বিতরণ করিয়াছেন। মেহসানাতে একটি বীজ-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে, এবং একটি ছোট কৃষি মিউজিয়ম নির্ম্মিত হইতেছে।

পেট্‌লাড ও নবসারীতেও এইরূপ কৃষিসমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

তদ্ভিন্ন নানাস্থানে কৃষি প্রদর্শনী ও পরীক্ষাক্ষেত্র দ্বারা নূতন নূতন শস্যমূলাদির চাষ ও চাষের প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

"বড়োদ্রা খেতীবাড়ী ত্রিমাসিক" নামক পত্রিকার তিন হাজার খানা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। অন্যান্য চেষ্টা স্থানাভাবে উল্লিখিত হইল না।

ইটের কারখানায় আধুনিক উন্নত প্রণালীতে কাজ হওয়ায় এখন ২৫ লক্ষের যায়গায় বৎসরে ৬০ লক্ষ ইট প্রস্তুত হইতেছে।

কাঠের আসবাব প্রস্তুত করিবার জন্য একটি সরকারী কারখানা আছে। ধাতু-পাত্র নির্ম্মাণের এবং অন্যবিধ আরও সরকারী কারখানা আছে।

কলাভবন ছয়টি স্কুলের সমষ্টি। ইহাতে চিত্রাঙ্কণআদি সুকুমার শিল্প ব্যতীত নানা প্রকার কারুকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে সিবিল এঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, কাপড় ও সুতা রঙ্গান, কাপড় ও সুতা ধোলাই, ছিট প্রস্তুত করা, বস্ত্রবয়ন, এবং বাণিজ্যও শিক্ষা দেওয়া হয়।

বড়োদা মিউজিয়মে প্রাণিবিজ্ঞান, ও অন্যান্য বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য নানাপ্রকার নমুনা সংগৃহীত আছে। তা ছাড়া নানা শিল্পদ্রব্যও আছে, যাহা দেখিয়া কলাভবনের ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করে। প্রাথমিক পাঠশালার ছাত্রছাত্রীদিগকে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরা মিউজিয়মে লইয়া গিয়া দ্রষ্টব্য জিনিষগুলির বিষয়ে উপদেশ দেন। তাহাতে তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও আনন্দ দুই-ই হয়। এক বৎসরে ৩০০৭৫০ অর্থাৎ প্রত্যহ ৮২৪ জন মিউজিয়ম দেখিয়াছে; এবং মিউজিয়মের জন্য ২২২১৮ টাকা খরচ হইয়াছে।

বড়োদা রাজ্যে ২৭টি ছাপাখানা আছে। কলিকাতার বাহিরে বোধ হয় ঢাকা জেলায় এতগুলি ছাপাখানা থাকিতে পারে। আর কোন জেলায় নাই। বড়োদায় ৯ খানি খবরের কাগজ ও ১৮ খানি সাময়িক পত্রিকা আছে। বাংলাদেশের কোন জেলায় এতগুলি কাগজ আছে কি? বড়োদায় "সয়াজী বিজয়" নামক সংবাদপত্রের কাটতি ৪০০০। বঙ্গে মফঃস্বলের কোন কাগজের এত কাটতি নাই। বড়োদার ১৯১৩-১৪ সালে ২৮১ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। ঢাকার কথা ঠিক জানি না, কিন্তু বঙ্গের আর কোন জেলায় এক বৎসরে এতগুলি বহি প্রকাশিত হয় নাই, নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

বড়োদায় উন্মাদগ্রস্তদের জন্য আশ্রম এবং কুষ্ঠরোগীদের আশ্রম আছে।

বড়োদা স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে জন্মমৃত্যুর রেজিষ্টরী, বসন্তনিবারক টীকা দেওয়া, প্রভৃতি কাজ ত হয়ই, অধিকন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানাস্থানে বক্তৃতা দেওয়া হয়। ম্যাজিক লণ্ঠনের দ্বারা ছবি দেখাইয়া এই-সকল বক্তৃতার বিষয় শ্রোতা ও দর্শকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

পরলোকগত সার ফিরোজ শাহ্ মেহ্‌তা।

সত্তর বৎসর বয়সে বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক সার্ ফিরোজশাহ মেহেরবাঞ্জী মেহ্‌তা দেহত্যাগ করিয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ লোক বোম্বাইয়ে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে কেহ রহিল না। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নাওরোজী অবসর লইয়াছেন; তাঁহার কথা ধরিতেছি না। সার্ ফিরোজশাহ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের

রাজনীতি-ক্ষেত্রে, বোম্বাই সহর ও প্রেসিডেন্সীর শিক্ষাক্ষেত্রে এবং বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটীর সমুদয় ব্যাপারে প্রভূত উৎসাহ, সাহস ও বুদ্ধিমত্তার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। সভাস্থলে তর্কবিতর্কের সময় বিরোধী এংলো-ইণ্ডিয়ান-দিগকে মুখের মত জবাব দিতে তাঁহার মত কোন ভারতীয় নেতা পারিতেন না। নেতৃত্ব-শক্তি তাঁহার খুব ছিল। আর কোন প্রদেশে এরূপ নেতা কেহ নাই।

আমরা কি বিনাবেতনে শিক্ষা পাই ?

এংলো-ইণ্ডিয়ানরা মধ্যে মধ্যে বিদ্রূপ করিয়া বলেন যে ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্ট প্রায় বিনা ব্যয়ে ভারতবাসীদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সম্প্রতি বিলাতের অক্সফর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত The Oxford Survey of India নামক পুস্তকেও এই কথা লেখা হইয়াছে। * এ কথা যদি সত্য হইত, তাহা হইলেও লজ্জার বিষয় হইত না; কারণ গবর্ণমেণ্ট আমাদেরই প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে সকল রকমের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, ইংরেজেরা দয়া করিয়া নিজের দেশ হইতে টাকা আনিয়া আমাদের জন্য ব্যয় করেন না। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। ১৯১৩-১৪ সালে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার জন্য যত ব্যয় হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৫৫৲ টাকা সরকারী, এবং শতকরা ৪৫৲ টাকা ছাত্রদত্ত বেতনাদি হইতে প্রাপ্ত। সরকারী ব্যয়ের মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে প্রাপ্ত টাকা আছে, এবং ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহ হইতে প্রাপ্ত টাকাও আছে। সমগ্র ভারতবর্ষে গড়ে সরকারী ব্যয় শতকরা যত হয়, বাংলা দেশে তাহা অপেক্ষা অনেক কম। ১৯১৩-১৪ সালে বাংলাদেশে মোট শিক্ষার ব্যয় হইয়াছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫৯৫৲ টাকা। ইহার মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা বেতন দিয়াছিল ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৭০ টাকা, চাঁদা প্রভৃতি হইতে পাওয়া গিয়াছিল ৩৬,৩৪,৭৬৩, প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে পাওয়া গিয়াছিল ৬৪,৯৯,৩৩৬ এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডগুলি দিয়াছিল ২৩,৯২,৪২৬। অতএব দেখা যাইতেছে সরকারী ব্যয় মোট ৮৮,৯১,৭৬২ টাকা, এবং ছাত্রদত্ত বেতনাদি হইতে প্রাপ্ত ১,৩১,৮৪,৮৩৩। গবর্ণমেণ্ট যত দিয়াছেন ছাত্রেরা বেতনে তাহার দেড়গুণ দিয়াছে, এবং মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক-বোর্ডসমূহ হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছে সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা প্রভৃতি বাবদে তাহার দেড়গুণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব আমরা যে বিনামূল্যে শিক্ষা পাই নাই, তাহা প্রমাণ করিতে আর চেষ্টার প্রয়োজন নাই।

* "All State guided education" "is practically free."

ভারতে শিক্ষাবিস্তারের পরিমাণ।

ভারত গবর্ণমেণ্ট "ভারতবর্ষে ১৯১৩-১৪ সালে শিক্ষা" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে ১৯১১-১২, ১৯১২-১৩, এবং ১৯১৩-১৪ সালে যথাক্রমে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবাসীর মধ্যে শতকরা ২.৭,২.৮, ৩.০ জন শিক্ষা পাইতেছিল। ঐ পুস্তকখানি হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে বর্ত্তমান বড় লাটের আমলে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততর বেগে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে। তাহাতেও দুই বৎসরে শতকরা ৩—২.৭ অর্থাৎ শতকরা .৩ বাড়িয়াছে। অতএব বৎসরে .১৫ বাড়িয়াছে। শিক্ষার বিস্তার যে হইতেছে ইহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও খুব বেশী পরিমাণে ও দ্রুততর বেগে শিক্ষা বিস্তার না হইলে সভ্যদেশ-সকলের সমকক্ষ হইতে আমাদের বহু বহু বৎসর লাগিবে।

ব্রিটিশ ভারতে সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৩ জন মাত্র ছাত্রছাত্রী; ত্রিবাঙ্কুড়ে ৬.৮ জন, বড়োদায় ১১.৩১ জন, জাপানে ১৫, আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে ২১.২২ এবং তথাকার মিসিসিপি রাষ্ট্রে ২৭.২৮। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ভারতে বর্ত্তমান বড়লাটের আমলে বৎসরে .১৫ বাড়িতেছে। যদি ভবিষ্যতে এইরূপই বাড়ে, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ের ত্রিবাঙ্কুড়ের সমান হইতে আমাদের আরও ২৫।২৬ বৎসর, বড়োদার সমান হইতে আরও ৫৫।৫৬ বৎসর, জাপানের সমকক্ষ হইতে আরও ৮০ বৎসর, আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের (U. S. A.) সমান হইতে ১২২ বৎসর এবং মিসিসিপির সমকক্ষ হইতে ১৬৩ বৎসর লাগিবে। কিন্তু যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট কম বই বেশী খরচ করিবেন না।

তাহা হইলে আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার সভ্যদেশ-সকলের মত কবে হইবে বলা অসম্ভব। গবর্ণমেণ্টের উপর আমাদের হাত নাই। কিন্তু নিজেদের উপর আছে। অতএব দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

জাপানে ও ভারতে ছাত্রসংখ্যা।

জাপানের লোকসংখ্যা মোটামুটি ৫ কোটি, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা মোটামুটি ২৩ কোটি। জাপানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোটামুটি ৭৮ লক্ষ ৯৩ হাজার; ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোটামুটি ৭৫ লক্ষ ১৮ হাজার।

বঙ্গে ম্যালেরিয়া জ্বর।

১৯১৪ সালে বাংলা দেশে শুধু জ্বরে ১০,৬১,০৪১ জন লোক মারা পড়িয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর ৯,৬৫,৫৪৮ জন মারা গিয়াছিল। অর্থাৎ গত বৎসর কেবল জ্বরেই ১ লক্ষ লোক বেশী মরিয়াছে।

ভারতবর্ষের ঋতুপর্য্যায় ও ভাগ্যবিপর্য্যয়।

য়ুরোপখণ্ডের সভ্যতা আফ্রিকার ও এশিয়ার সভ্যতার অনুজ। প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র ছিল—আসিরিয়া, কালডিয়া, মীশর, চীন, ভারতবর্ষ। চীন ব্যতীত ঐ দেশগুলির সবই গ্রীষ্মপ্রধান। আধুনিক সভ্যতায় অগ্রসর সমস্ত দেশই শীতপ্রধান। এই তথ্য হইতে অনেকে এই সিদ্ধান্ত অবধারণ করিয়াছেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সভ্যতার পরিণতি কতকদূর পর্য্যন্ত হইয়াই থামিয়া যায়; ক্রমবর্দ্ধমান সভ্যতা পূর্ণতার জন্য শীতপ্রধান বা শীতল ঋতুর দেশের অপেক্ষা রাখে। অপর পক্ষে ইহাও দেখা যায় যে, অতি শীতের দেশও সভ্যতার পরিণতির পক্ষে অনুকূল নয়—তাহা হইলে মেরুসন্নিহিত দেশের এস্কিমো কি সাইবেরীয় লোকেরা আদিম অসভ্য অবস্থাতেই থাকিয়া যাইত না। অতএব সিদ্ধান্ত এই স্থির হইতেছে যে সভ্যতার ও বুদ্ধির চরম বিকাশ নাতিশীতোষ্ণ দেশেই হইতে পারে, অন্যত্র নহে।

এই সিদ্ধান্ত কিন্তু বিচার-সহ নহে। আসিরিয়া বা কালডিয়ার সভ্যতা লুপ্ত হইয়াছে বটে; মীশর ও ভারতবর্ষের সভ্যতা সুষুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে বটে; কিন্তু ভারতবর্ষের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের প্রাণধারা একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায় নাই। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের লৌকিক আবশ্যকতা যতই অল্প হোক না কেন, তাহা যে বুদ্ধি বিকাশের চরম পরিচয় তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপ আমেরিকায় যে বিজ্ঞান ও দর্শনের নব নব দিকের উদ্ভাবনা চলিতেছে, তাহা হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাবধারা যে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল তাহা স্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান ভারতবর্ষও একেবারে বিজ্ঞান ও দর্শনের নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনের বীজহীন নহে; যে কয়েকজন মনীষী ভারতবর্ষের বিবিধ অসুবিধা ও বাধার মধ্যেও আপনাদের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় দিয়া প্রাচীন মহর্ষিদিগের ভাবধারাকে উত্তরপুরুষের নিকট ভগীরথের ন্যায় বহন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা এই সিদ্ধান্তকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ঋতুর বাধা অলঙ্ঘ্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এইরূপ জগৎজয়ী প্রতিভার উদ্ভবকে নিয়মের প্রতিপ্রসব বলিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই, কারণ দেখা যাইতেছে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও বাধার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর বুদ্ধিবিকাশ ও প্রতিভা-স্ফুরণের নব নব পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

মানুষের মনের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব খুব আছে। কিন্তু প্রকৃত জীবন্ত মানুষ সেই প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়া নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়াই মানুষের বাহাদুরী। জীবন্ত মানুষ যে শুধু পাশ্চাত্য শীতপ্রধান দেশেই আছে, আমাদের দেশে নাই বা হইতে পারিবে না, এমন কোনো বোঝাপড়া বিধাতার সঙ্গে ত হয় নাই। তথ্য যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, মানুষ সকল দেশেই সমান, মানুষে যাহা একদেশে করিয়াছে অপর দেশের মানুষেও তাহা করিতে সক্ষম। ভারতবর্ষে যখন সভ্যতার প্রথম বিকাশ ও পরিণতি হয়, তখন য়ুরোপ বর্ব্বর অবস্থায় ছিল; তখন যদি ভারতবর্ষের লোকেরা সিদ্ধান্ত করিত যে শীতে মানুষের বুদ্ধি আড়ষ্ট হইয়া যায়, শীতপ্রধান দেশ বুদ্ধিস্ফূর্ত্তির অনুকূল নহে, তাহা হইলে তাহা যেমন ভ্রান্ত হইত, য়ুরোপীয়দের এ সিদ্ধান্তও তেমনি ভ্রান্ত যে গ্রীষ্মে চিন্তাশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা বিকাশ হইতে পারে না।

যদি বা য়ুরোপীয় সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তবুও ভারতবর্ষের হতাশ হইবার কারণ নাই। ভারতবর্ষের হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতের ক্রোড়ে বিস্তৃত দেশ রহিয়াছে যেখানকার ঋতু নাতিশীতোষ্ণ। সেই-সব দেশ এখন হয় পতিত, নয় অসভ্য অনুন্নত লোকের বাসভূমি হইয়া আছে; এই ব্যবস্থাই যে চিরকাল বজায় থাকিবে তাহার কোনো কথা নাই; সমতল দেশের শিক্ষিত লোকেরা সেইসব দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবেন; বিদ্যালয় বীক্ষণাগার মানমন্দির প্রভৃতিতে সেইসব স্থান ছাইয়া ফেলিতে হইবে; সমতল দেশের ছাত্র ছাত্রী দলে দলে সেই দেশে গিয়া থাকিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নিজের দেশে ফিরিয়া নবজীবন সঞ্চার করিতে থাকিবেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিদের তপোবন ছিল ঐ রকম প্রদেশেই; ভারতের সেই পুরাতন তপোবনে আমাদিগকে নূতন করিয়া লৌকিক সিদ্ধিলাভের জন্যও তপস্যা করিতে হইবে। ভারতের, বিশেষত বঙ্গের, সমতলক্ষেত্র ক্রমশ ম্যালেরিয়ার বিষে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে; সুতরাং দেশের ভবিষ্যৎ আশার পাত্রপাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদিগকে ঐরূপেই করিতে হইবে।

সংবাদপত্রে প্রকাশ কাশীমবাজারের বিদ্যোৎসাহী বদান্য মহারাজা বাহাদুর কলিকাতায় একটি সাশ্রম মহাপাঠশালা প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছেন। আমাদের অনুরোধ মহারাজা সেই মহাবিদ্যালয়টি কোনো শীতল ও স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করুন। ইহা দেশের মহৎ কল্যাণের কারণ ও অপরের নিকট দৃষ্টান্ত হইবে।

ভারতীয় আবহ বিভাগের বাৎসরিক বিবরণীতে কাশ্মীরে জ্যোতিষ আলোচনার বিশেষ সুবিধার কথা আলোচিত হইয়াছে। সরকারী অভিজ্ঞতার ফল আমাদের তৎপরতার সহিত গ্রহণ করা উচিত।

জাগুক আমাদের সকলকার হৃদয়ে সেই পরিমাণ দেশ-প্রীতি, যাহাতে মানুষকে উদ্যোগী, নূতন পথে যাইতে সমুৎসুক, এবং স্বার্থত্যাগী পরোপকারব্রতী করে। আমাদের আর কুণো হইয়া প্রাচীনের মোহে বদ্ধ থাকিবার সময় নাই। বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে গা ঝাড়া দিয়া সকল আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মী হইয়া উঠিতে হইবে, নহিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

আমাদের স্বায়ত্তশাসন চাই।

সর্ব্বং আত্মবশং সুখং! আমার ঘরের অভাব অসুবিধা কোথায় কতটা তাহা আমি যেমন বুঝিতে পারি, পরে তাহা কখনই তেমন পারে না—তা সে পর আমার যতই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিতৈষী হোক। আমাকে যদি পরের ব্যবস্থায় ঘর করিতে হয় তবে আমাকে দুঃখ পাইতেই হইবে, সে দুঃখ পাওয়া অনিবার্য্য।

ইংরেজ প্রায় দেড় শত বৎসর আমাদের দেশে রাজত্ব করিতেছেন; ইংরেজী আমলে আমরা শিক্ষিত হইয়া দেশ বিদেশের ভাবধারার সহিত যোগযুক্ত হইয়াছি; ইংরেজী ইতিহাসের নজির দেখিয়া প্রজাশক্তির স্বত্ব দাবী করিতে শিখিয়াছি; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সুবিধার আমদানীতে রেল টেলিগ্রাফ ডাকঘরের মারফতে সমস্ত ভারতবর্ষকে অখণ্ড ও আত্মীয় বলিয়া বোধ করিতে পারিতেছি; কিন্তু বর্ত্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা যেরূপ তাহাতে এই মেয়েলী প্রবচনটিই মনে পড়ে যে—ঘরসর্ব্বস্ব তোর, চাবিকাঠিটি আমার! ইংরেজ দৃষ্টান্তে ও বাক্যে আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন লাভে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভারতবাসীর কিছুই হাত নাই; ভারতের ব্যবস্থা করেন যাঁহারা তাঁহারা ভারতবাসী ত নহেনই, ভারতের সহিত পরিচয় তাঁহাদের অল্প, সুতরাং প্রীতিও অত্যল্প। ভারতসচিব যিনি, তিনি কখনো ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন না, ভারতের সম্বন্ধে অন্যপ্রকারেও জ্ঞান লাভ করিবার ঔৎসুক্য বা গরজ তাঁহার বড় একটা কখনো দেখা যায় না, পার্লামেন্টে কোনো বিষয়ে তাঁহাকে কেহ কিছু প্রশ্ন করিলেই তিনি নিজের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাধ্য হন; যাঁহারা রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া এদেশে উপস্থিত থাকিয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করিতে আসেন, তাঁহাদেরও অনেকে নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বে ভারত সম্বন্ধে উদাসীনই থাকেন, নির্ব্বাচিত হইয়াও যে খুব দরদ দেখান তাও নয়, আর ভারতের সহিত পরিচিত হইতে না হইতে তাঁহাদের প্রবাস-নির্দ্দিষ্ট সময়ের পাঁচ বৎসর ফুরাইয়া যায়। প্রকৃতভাবে যাঁহারা এদেশ শাসন করেন তাঁহারা সিভিলিয়ান—ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে সেক্রেটারী পর্য্যন্ত। ইহাঁরা এমনি

প্রভুত্বপ্রিয় দলবদ্ধ প্রাণী যে ভারতবাসীদিগকে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় শক্তি একটুও দিবার কথা উঠিবামাত্র তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া প্রতিকূল আচরণ করেন। ইহাঁরা যতদিন এদেশে থাকেন চোটাইয়া প্রভুত্ব করেন, এবং যখন দুই জেব গরিব ভারতের টাকায় ভর্ত্তি করিয়া দেশে গিয়া বসেন তখনও তাহাঁদের মরণ পর্য্যন্ত ভারতকেই ভরণ-পোষণ করিতে হয়।

এ রকম ব্যবস্থায় ভারতের অবস্থা যে দিন দিন কোন কোন দিকে অবনত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। এতদিন ধরিয়া ব্যবসাদার ইংরেজ জাতির অধীনে থাকিয়াও আমাদের দেশে দেশীয়-দের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসা বাণিজ্যের বেশী উন্নতি হইতে পাইল না, বরং আমাদের গরিবের ঘরে যাহাও বা ছিল তাহাও একে একে কলকারখানার প্রতিযোগিতায় লোপ পাইয়াছে। তাহাতে ইংরেজ জাতিরই যে ষোল আনা সুবিধা হইয়াছিল তাহা নয়, কারণ এখন দেখা যাইতেছে যে বাণিজ্যের ক্ষেত্র অনেকটা জার্ম্মানীর দখলে ছিল এবং এক্ষণে জার্ম্মানীকে অপসৃত দেখিয়া জাপান সূচ হইয়া ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে—এবং ইহারই মধ্যে সেই সূচ প্রায় ফাল হইয়া উঠিল।

ভারতবাসীরা ইংরেজদের উপনিবেশে কুলির খাটুনি খাটিয়া কত জাতের লোকের ধনী হইবার পথ করিয়া দিতেছে, কিন্তু সেইসব উপনিবেশে ভারতবাসীর দুর্দ্দশা অপমানের অন্ত নাই; কুলি হইয়া ছাড়া অপরভাবে ভারতবাসীদের সে-সব দেশের মাটি মাড়াইবার হুকুম নাই। সেইসব অপমান অত্যাচার প্রতিকার করিবার ক্ষমতা ভারতগভর্মেণ্টের আছে বটে, কিন্তু ভারতগভর্মেণ্ট মানে ত ভারতবাসী নহে, সুতরাং তাঁহাদের আঁতে ঘা না লাগাতে প্রতিকারের বিশেষ কোনো তাগাদা হয় না। লর্ড হার্ডিঙের ন্যায় সহৃদয় রাষ্ট্রনায়কের হৃদয় এক-একবার ব্যথিত হইয়া ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিতে চাহিলেও তাহা বিরুদ্ধ পাকচক্রে শীঘ্র ফলপ্রসূ হয় না। নহিলে যে উপনিবেশীরা ভারতবাসীকে অপমান করে, তাহারা ভারতবর্ষের প্রচুর অর্থে পুষ্ট হইয়া ভারতবর্ষে শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভুত্ব করিতে পারিত না।

এইসব নানা কারণে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য স্বায়ত্ত হওয়া উচিত। এই দাবী কংগ্রেসের সৃষ্টিকাল হইতে প্রতি বৎসর ক্রমাগত হইয়া আসিতেছে; এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ ফলও হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ গতিতে অগ্রসর হইলে পূর্ণ অধিকার পাইতে বহু বিলম্ব ঘটিবে। আমরা আপনার ঘর আপনারা সামলাইব, তাহার জন্য অপেক্ষা কিসের? স্বায়ত্তশাসন আমাদের আজ হইতেই চাই; বিলম্বে আমাদের নানারূপ ক্ষতি ও অসুবিধা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে বিধিসঙ্গত যতবিধ উপায় আছে সমস্তই আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠিত আইন মান্য করিয়া আমাদিগকে প্রকাশ করিতে হইবে যে স্বায়ত্তশাসনের জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছি, আমাদের উহা নহিলে নয়, আমাদের উহা চাইই চাই।

এই আন্দোলন সুসঙ্গত উপায়ে করিবার জন্য শ্রীমতী আনী বেশান্ত Home Rule League বা স্বায়ত্তশাসন-মণ্ডলী স্থাপন করিতেছেন; কংগ্রেসে স্বায়ত্তশাসনের দাবী দশটা ছোটখাটো দাবীর সঙ্গে আপনার বিশিষ্টতা ও প্রাধান্য হারাইয়া ফ্যালে; স্বায়ত্তশাসন-মণ্ডলীর দাবী একমাত্র স্বায়ত্তশাসন বলিয়া উহা স্পষ্ট ও প্রধান হইয়া থাকিবে। কংগ্রেসে নানা মতভেদে মুসলমান ও স্বদেশ-ব্রতী (Nationalist) দল যোগ দিতে ইতস্তত করেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই যখন স্বদেশে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠা চাহেন তখন তাঁহাদের কাহারই স্বায়ত্তশাসন-মণ্ডলীতে যোগ দিবার পক্ষে বাধা হইবে না, সুতরাং এই এক বিষয়ে এই মণ্ডলী কংগ্রেস অপেক্ষা বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই মণ্ডলীর সাফল্য কামনা করি, এবং দেশবাসী সকলকে ইহার অনুকূল ও সমর্থক হইতে অনুরোধ করি। সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ ও সার কৃষ্ণ-গোবিন্দ গুপ্ত ভারতবর্ষকে পরামর্শ দিয়াছেন যে কিরূপ ধরণের স্বায়ত্তশাসন আমরা চাই তাহা স্থির করিয়া একটা বিধিবদ্ধ আবেদন মুসাবিদা করা হোক, যুদ্ধ থামিলেই তাহা রাজ-দরবারে পেশ করিতে হইবে। কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ মিলিয়া শীঘ্র ইহার ব্যবস্থা করুন।

সংপ্রতি মহামান্য বড়লাট লর্ড হার্ডিং ভারতের ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে তাহার আভাষ দিয়া বলিয়াছেন—ইংলণ্ড

এদেশকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্গ স্বাধীনতার আদর্শ ও আত্মসম্মানবোধ শিখাইয়াছে; এখন শুধু ভারতবর্ষের বৈষয়িক দিকে দৃষ্টি রাখিলেই ইংলণ্ডের চলিবে না, যে উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা ইংলণ্ড নিজে ভারতবর্ষের মনে নিষিক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহারও উন্নতি ও প্রতিপালন করিয়া তাহাকে সফল করিয়া তুলিতে হইবে ইংলণ্ডকেই। সুতরাং ইংলণ্ডের যে-সকল সন্তানের হাতে ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধানের ভার ন্যস্ত আছে তাঁহাদিগের সম্মুখে তাঁহাদের পূর্ব্বজগণের অপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে—তাঁহাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষকে আপন পায়ে দাঁড়াইতে দিতে হইবে, যে ক্ষমতা এতদিন তাঁহারা পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন তাহা ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া ভারতবাসীর হাতে দিতে হইবে, সুতরাং ইংলণ্ডের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য অতীত অপেক্ষা ভবিষ্যতে গুরুতর। ভারতবর্ষও চরিত্রে দৃঢ় এবং আত্মমর্য্যাদায় বলিষ্ঠ হইয়া ইংলণ্ডের সহিত প্রীতির ও কৃতজ্ঞতার বন্ধনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত মিত্র হইয়া উঠিবে, কেবলমাত্র বিশ্বাসী ভৃত্য হইয়াই আর থাকিবে না। এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই ইংরেজ রাজ-পুরুষদের চলিতে হইবে, এবং এই উদ্দেশ্য যিনি যত বেশী সফল করিয়া তুলিতে পারিবেন, তিনি তত বেশী ইংলণ্ডের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।—লর্ড হার্ডিঞ্জের এই কথা তাঁহার পূর্ব্বজ লর্ড হেষ্টিংস ও লর্ড মেকলের উক্তির পরিপোষক, এবং আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সমর্থক।

সুতরাং রাজপক্ষে ও প্রজাপক্ষে কোথাও কোনো বিরোধ নাই। আমরা যাহা চাহি, তাঁহারাও তাহা দিতে প্রস্তুত; এই যুদ্ধের দুঃসময়ে আমাদের ধনপ্রাণ উৎসর্গের দ্বারা আমাদের দাবী বলবত্তর হইয়াছে। এখন আমরা আগ্রহ দেখাইলেই অভীপ্সিত লাভে বিলম্ব হইবে না।

আমাদের প্রধান অভাব কিসের।

আমাদের দেশের প্রধান অভাব স্বায়ত্তশাসনের। স্বায়ত্তশাসন থাকিলে আমরা চেষ্টা করিয়া অপর অভাব সহজেই দূর করিতে পারিতাম।

তাহার পরই দেখি আমাদের দেশের প্রধান অভাব শিক্ষার। আমাদের দেশের মোটামুটি শতকরা ৯৪ জন লোক নিরক্ষর; পুরুষদের মধ্যে কিঞ্চিৎ শিক্ষাবিস্তার হইলেও মেয়েরা একেবারে নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতা ও অজ্ঞতার মধ্যে ডুবিয়া আছে—অথচ তাহারাই সন্তানের জননী ও মাতা। প্রায় সকল সভ্য দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা সরকারী ব্যয়ে নির্দ্দিষ্ট বয়সের ছেলেমেয়েদের দিবার ব্যবস্থা আছে—নাই শুধু আমাদের দেশে। মহাত্মা গোখলে বে-খরচা শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভারতবাসীর প্রাধান্য না থাকায় তাহা পণ্ড হইয়া যায়। স্কটলণ্ডে ৫ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে সকলেই সরকার হইতে বাধ্য এবং ঐ শিক্ষা সরকারী খরচায় দেওয়া হয়; সিংহলে ও আসামে দেশভাষায় শিক্ষালাভ বেখরচায় করা যায়; বড়োদা প্রভৃতি কোনো কোনো দেশী রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পাইতে বেতন দিতে হয় না; মালাক্কা, পেনাং, মরিসাস দ্বীপ, কানাডা, নিউ সাউথ ওয়েলস, ভিকটোরিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলণ্ড, আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ কাফ্রিদের মধ্যে, আরজেণ্টাইন রিপাবলিক্, বসনিয়া, হের্জিগবিনা, বেলজিয়ম, বুলগেরিয়া, বলিভিয়া, ব্রেজিল, চিলি, কষ্টারিকা, কলম্বিয়া, ডেনমার্ক, ইকোয়েডর, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, গ্রীস, গোয়াটিমালা, হেয়টি, হণ্ডুরাস, ইটালী, মেক্সিকো, মণ্টিনিগ্রো, পানামা, পারাগুয়ে, পেরু, রুমানিয়া, সালভাডর, সাণ্টো ডমিঙ্গো, সার্ভিয়া, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ভেনেজুয়েলা, জাপান, তুর্কী প্রভৃতি জগতের নানান দিকের নানান দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা দেশের ছেলেমেয়েদের সরকারী খরচে দেওয়া হয়; এবং অধিকাংশ দেশেই সেই শিক্ষা সকল ছেলেমেয়েকেই পাইতে বাধ্য করা হয়। সম্প্রতি ভারতবর্ষের মহীশূর, আউন্ধ, ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে। অনেক দেশে ছাত্রছাত্রীদের বই কাগজ কলম ও স্কুলের জলখাবার সরকারী খরচেই জোগানো হয়। আমাদের ভারতবর্ষ সৃষ্টিছাড়া হইয়া আছে। তাহার কারণ ইহা নয় যে আমাদের দেশে শিক্ষার আবশ্যক নাই বা শিক্ষালাভের আগ্রহ নাই বা সরকারী ভাণ্ডারে অর্থ নাই; তাহার কারণ এই যে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা

আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। সুতরাং স্বায়ত্তশাসন পাইলেই এ সমস্তারও সহজ মীমাংসা হইয়া যাইবে। অতএব স্বায়ত্তশাসন আমাদের চাই।

আমাদের বল ও বীর্য্যের অভাব বলিয়া ইংরেজেরা আমাদিগকে ধিক্কার দিয়া থাকেন। ইহা জলে নামিতে না দিয়া সাঁতার না শিখিতে পারার জন্য নিন্দা করার মতন। আমাদিগকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হয় না, স্বেচ্ছাসৈনিক হইতে দেওয়া হয় না, কুস্তির আখড়ায় কসরৎ করিলে টিকটিকি পুলিশের কু-নজর লাগে; এমন অবস্থায় আমাদের বলবীর্য্য সাহসের চর্চ্চা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? বলবীর্য্য সাহস অনুশীলন- ও চর্চ্চাসাপেক্ষ। সুতরাং এক্ষেত্রেও উন্নতি করিতে হইলে আমাদের স্বায়ত্তশাসন পাওয়া আবশ্যক।

বল বীর্য্য সাহস থাকে সুস্থ শরীর ও মন যাহার। আমাদের মন শাস্ত্র সংহিতা পাঁজি হাঁচি টিকটিকি গুরু পুরোহিত দৈবজ্ঞ পুলিশ হাকিম আইন প্রভৃতির বিরাট চাপে একেবারে চেপ্টা হইয়া আছে; দেহ আমাদের ম্যালেরিয়ায় অনাহারে অকাল-পিতৃত্ব-মাতৃত্বে বালক-পিতা বালিকামাতার সন্তান হইয়া জন্মানতে একেবারে জরায় জর্জ্জরিত হইয়াই আছে; অজ্ঞানে ডুবিয়া থাকাতে এসকলের প্রতিকারও করিতে চাহি না, পারি না, কি করিয়া করিতে হয় জানিও না। সুতরাং এই অভিশপ্ত দশা হইতে পরিত্রাণের জন্য প্রচুর ও অবাধ শিক্ষাবিস্তার চাই, মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবার জন্য মনে সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বায়ত্তশাসন চাই।

জাপান গভর্মেণ্ট দেশকে ধনশালী ও বাণিজ্যপটু করিবার জন্য সরকারী খরচায় দেশময় রেশমের পশমের কার্পাসের পাটের কাপড় প্রভৃতি বুনিবার কল, সিমেণ্ট কাচ কাগজ সাবান এসেন্স পেন্সিল প্রভৃতি প্রস্তুতের কল, টাইপ-ঢালাইয়ের কারখানা, রঙের কারখানা প্রভৃতি, এবং আদর্শ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া দেশকে ঐসব শিল্পে ও কারবারে তালিম করিয়া তুলিতেছেন। প্রথমে য়ুরোপ হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া কাজ আরম্ভ করাইয়া যেই দেশী লোক শিক্ষিত হইয়া দক্ষ হইয়া উঠে অমনি তাহার হাতে কারখানার ভার দিয়া বিদেশীকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। জাপানীরা এক্ষণে সকলবিধ কারবারে নিজেরাই পটু হইয়া উঠিয়াছে; নিজেরা রেললাইন পাতিতেছে, ইঞ্জিন গাড়ী গড়িতেছে, জাহাজ গড়িতেছে এবং গভর্মেণ্টের সাহায্যে সস্তা ভাড়ায় দেশের মাল বিদেশে লইয়া গিয়া অর্থ আহরণ করিয়া দেশকে ধনী করিয়া তুলিতেছে। আমাদের স্বায়ত্তশাসনে থাকিলে আমরাও জাপানীদের ন্যায় ব্যবস্থা করিতে পারিতাম।

যে দেশের গভর্মেণ্ট, সেই দেশের কল্যাণ ও উন্নতি করাই সেই গভর্মেণ্টের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও গভর্মেণ্টের দ্বারা আমাদের পূর্ণ কল্যাণ সাধন করাইতে হইলে গভর্মেণ্ট আমাদের স্বায়ত্ত হওয়া চাই। রাজপক্ষ ও প্রজাপক্ষ এক্ষণে একমত হইয়া সেই পথেই দ্রুত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীর প্রবেশ নিষেধ।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতবাসী নিঃস্বার্থ ভাবে পরের জন্য ধনপ্রাণ অকাতরে উৎসর্গ করিতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবাসীর কোনো স্থান নাই—ভারতবর্ষ অধীন রাজ্য, Dependency, উপনিবেশীরা তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাহাদের দেশের মাটি ভারতবাসীকে মাড়াইতে দ্যায় না; ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী বলিলেন যখন যুদ্ধের সন্ধি হইবে তখন উপনিবেশগুলির পরামর্শ লওয়া হইবে; ভারতবর্ষের নাম হইল না, ভারতবর্ষ সেক্ষেত্রেও কেউ নয়। উপনিবেশগুলির সচিব যুদ্ধের পরে উপনিবেশগুলি সাম্রাজ্যসংরক্ষণের সহায়তা করিয়া কি কি নূতন অধিকার পাইবে তাহার আলোচনা করিতেছেন; ভারতসচিব নীরব। কিন্তু পাছে ভারতবাসী একটা হৈচৈ করিয়া গভর্মেণ্টকে বিব্রত করে তাই সকল ইংরেজ মিলিয়া আমাদিগকে বুঝাইতে লাগিল যে তোমরা চুপ করিয়া থাক, সব ঠিক হইয়া যাইবে, তোমাদের অতিভক্তি দেখিয়া সকলের তাক্ লাগিয়া গিয়াছে—তোমাদের আমরা যে টেরা চোখে দেখিতাম তেমন করিয়া আর দেখিব না—angle of vision বদল হওয়াতে এখন সামনাসামনি সোজাসুজিই দেখিব।

কিন্তু সম্প্রতি খবর আসিয়াছে—

Intimation has been received that prohibition issued by the Canadian Government against the landing of artisans and skilled or unskilled labourers at the ports of entry in British Columbia has been further extended to 31st March 1916 and Government of India have issued a warning notice accordingly.

অর্থাৎ, কানাডা গভর্মেণ্ট জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষের দক্ষ বা অদক্ষ কোনো কারিগর বা মজুর ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় পা দিতে পারিবে না বলিয়া যে নিয়ম প্রচার ছিল, তাহার মেয়াদ ১৯১৬ সালের ৩১ মার্চ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইল। ভারতগভর্মেণ্টও তাহাই বিনা ওজর আপত্তিতে মানিয়া লইয়া ভারতবাসীকে জানান্ দিবার জন্য নোটিশ প্রচার করিয়াছেন।

ভারতগভর্মেণ্টের উচিত কানাডা প্রভৃতি দেশের কোনো লোক বা জাহাজ বা মালপত্র এদেশে আসিতে না দেওয়া। তাহা হইলেই ভারতের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা পায় এবং অন্যায়ের প্রতিকার হইতেও বিলম্ব লাগে না। লর্ড হার্ডিং কতক চেষ্টা করিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ করিবে কে? লর্ড হার্ডিং ইহার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া গেলে ভারতবাসী তাঁহার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিত।

রাষ্ট্রদ্রোহীদের উপদ্রব।

সম্প্রতি উপরাউপরি ময়মনসিংহে ও কলিকাতায় রাষ্ট্রদ্রোহীদের গুলিতে পুলিশের দুজন কর্ম্মচারী খুন হইয়াছে। এইসব রাষ্ট্রদ্রোহীরা মনে করে যে এমনি করিয়া রাজপক্ষকে ভয় দেখাইয়া দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। এ ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়; সুতরাং আমাদের দেশের যুবকদের মন হইতে ঐ কুসংস্কার দূর করা উচিত। যাহারা এইসব অপকর্ম্ম করিতেছে তাহাদের জীবন যদি দেশের প্রকৃত সেবায় উৎসর্গিত হয়, তবে দেশের সমস্ত লোক তাহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতে বেশী দিন লাগে না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেসব লোক সামান্য কষ্টস্বীকার করিয়া স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশকে অনুভব করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ও কথায় দেশে কি প্রাণশক্তিরই না সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং আমাদের অনুরোধ যেসমস্ত যুবক দেশমাতৃকার সেবা করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে সত্য ও ন্যায়ের সেবক আগে হইতে হইবে—ভগবান্ ও ধর্ম্মকে তাঁহাদের চালক করিতে হইবে।

অপরপক্ষে এই-সমস্ত অনাচার অত্যাচার নিবারণের জন্য গভর্মেণ্টের সহিত প্রজাসাধারণের সহযোগিতা করা আবশ্যক। তাহার জন্য যদি নিজেদের কিছু অসুবিধা স্বীকার ও স্বত্ব স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে হয় তাহাও করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, দমন অবলম্বনীয় অন্যতম উপায় হইলেও, দমনই একমাত্র অপ্রীতি ও অসন্তোষের প্রতিকার নয়, অপ্রীতি ও অসন্তোষের কারণ দূর করাই যথার্থ প্রতিকার। যুবা বয়সে বলসাধ্য সাহসিক কার্য্যের প্রতি ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক; অন্যদেশের যুবারা লড়াইএ যায়, সমুদ্রচারী জাহাজে কাজ পায়; আমাদের দেশের যুবাদেরও সে পথ খোলা থাকা উচিত।

বাংলার পুলিশ।

১৯১৪ সালের গভর্মেণ্ট পুলিশ-শাসন-বিবরণীতে কর্তৃপক্ষ এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে পুলিশকে যত-কিছু প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করিতে হয়, তাহার মধ্যে জনসমাজের সহানুভূতির অভাবই প্রধান। ইহার কারণ, পাশ্চাত্যদেশের পুলিশ যেমন সে-দেশের লোকদের বিশ্বাসভাজন হইয়াছে, এদেশের পুলিশ কৃতকর্ম্মের দ্বারা এদেশের লোকের মনে তেমন বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে নাই। গভর্মেণ্ট পক্ষের এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য; লোকে মনে করে পুলিশকে সাহায্য করিতে গিয়া আমি হয়ত পুলিশের কোপে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইব—তার চেয়ে দূরে থাকাই ভালো। পুলিশের অনেক কর্ম্মচারীও লোকের উপর অন্যায় ও অনাবশ্যক জুলুম করিয়া, ঘুষ আদায় করিয়া, মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়া, প্রভুত্ব ফলাইয়া দেশের লোকের নিকট অশ্রদ্ধেয় ও ভয়ের পাত্র হইয়া আছে। তাহাদের মতিগতি সংশোধিত না হইলে তাহারা কখনই জনসমাজের প্রীতি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া কর্ম্মদক্ষতা দেখাইতে পারিবে না।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা বন্ধ

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে ভারতপ্রবাসী ইংরেজরা আমাদের

সাবধান করিয়াছিল—খবরদার! এসময় তোমরা কোনো রকম দাবীদাওয়া করিয়া গভার্মেণ্টকে বিব্রত করিয়ো না। আমাদের আদর্শ—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের গোপাল, তাই আমরা গোপালের ন্যায় সুবোধ হইয়া যে যাহা বলে তাহাই শুনি এবং যাহা পাই তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি। কিন্তু আমরা নানা কারণে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাহার একটি এই যে সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগী পরীক্ষা আপাতত বছর চারেকের জন্য স্থগিত হইয়া গেল। সিকি অংশ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে বলা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা নূতন আইনে বিধিবদ্ধ হইবে না। আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী কতকগুলি নিয়ম সিভিল সার্ভিস্ কমিশনারেরা প্রণয়ন করিবেন; তাহাতে ঐ কথা থাকিবে বলা হইতেছে।

প্রতিযোগী পরীক্ষায় যোগ্যতমের নির্ব্বাচন হয়, অযোগ্য আশ্রিত-অনুগতদের দয়া করিবার সম্ভাবনা থাকে না। পরীক্ষা তুলিয়া দিয়া কর্ত্তাদের নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করিলে তাঁহাদেরই পরিচিত আশ্রিত অনুগত লোকেদের চাকরি পাওয়া সহজ হইয়া উঠিবে। কর্ত্তারা সকলেই ইংরেজ; তাঁহারা নির্ব্বাচন করিবেন স্বদেশী স্বজাতির লোকদেরই, ভারতবাসীরা প্রায় বাদ পড়িয়াই যাইবে। ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য যখন আমরা ভারতবাসীর দ্বারাই চাহিতেছি, সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা কেবলমাত্র ভারতে, অন্ততপক্ষে বিলাতে ও ভারতে উভয়ত্র চাহিতেছি, তখন সেই পরীক্ষা একেবারে তুলিয়া দেওয়া মানে ঘড়ীর কাঁটা অনেকখানি পিছাইয়া দেওয়া।

সত্য বটে এখন অনেক পরীক্ষার্থী যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন। যাঁহারা স্বদেশের জন্য রক্তপাত ও প্রাণ তুচ্ছ করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি সুবিচার করা উচিত। কিন্তু শুধু তাঁহাদের বেলাই পরীক্ষায় অল্প নম্বর পাইলে পাশ করিবার বা কেবল তাঁহাদিগকেই নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিলেই সকলকার প্রতি, বিশেষত ভারতবর্ষের প্রতি, সুবিচার করা হইত। যে দুচার বৎসর যোগ্যতম লোক না পাওয়া যাইত সে কয়েক বৎসর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মুন্সেফ সবজজ প্রভৃতির স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে পদোন্নতি করিয়া দিয়া দেশের বিচার ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করাইলে সুসঙ্গত ও উচিত কার্য্য হইত। রাজনৈতিক কারণে ইংরেজ কর্ম্মচারীও রাখা দরকার বোধ করিলে যাঁহারা প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন বা যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে রত বলিয়া নির্ব্বাচিত হইতেন তাঁহাদের দ্বারাই তৌল বিশেষ রকমে ভারী করিয়া রাখা যাইত। এখন সিভিল সার্ভিসে ভারতবাসীর সংখ্যা অতি সামান্যই আছে; সুতরাং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মুন্সেফ সবজজদের কয়েকজনের পদোন্নতি করিয়া সিভিল সার্ভিসে ভর্ত্তি করিলে ভারতীয়ের প্রাধান্য হইবার আশঙ্কা থাকিত না। সুতরাং এই নব ব্যবস্থা কোনো চিন্তাশীল ভারতবাসী নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিতে পারে না; ইহাতে ভারতবাসী মাত্রেই ক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট হইবার কথা।

মহাত্মা সার হেনরী কটন।

মহাত্মা সার হেনরী কটনের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। বৃদ্ধ হইলেও ঐ বয়স য়ুরোপীয়দের পক্ষে খুব বেশী নয়, উহারও অধিক বয়সে অনেক মনীষী বাঁচিয়া থাকিয়া বহু কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। বিশেষত ভারতবর্ষের বন্ধু কটনের শতায়ু হইলেও তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সন্তপ্ত হইতাম, কারণ ভারতের বন্ধুর সংখ্যা কম। কটন সাহেব ভারতবর্ষের স্বায়ত্ত ও অগ্রসর রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আসামের কুলিদের দুঃখ লাঘব করিতে গিয়া চা-ওয়ালা সাহেবদের বিরাগভাজন হন; ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে ভারতবাসীর যে ন্যায্য জন্মগত অধিকার আছে, তাহা সমর্থন করিয়া তিনি গভর্মেণ্টের বিরাগভাজন হন; তাহার ফলে তাঁহার ন্যায় সাধুপ্রকৃতির মনস্বী ছোটলাট হইবার সুযোগ পান নাই, আসামের চীফ কমিশনরের পদে থাকিতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে—আর্ত্ত প্রপীড়িত লোকদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছেন; কিন্তু মহাকালের মন্দিরে বিচারের ভার রাখিয়া তিনি নিন্দা বিরাগ উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক যিনি মনুষ্যত্বের অধিকারী তিনি ন্যায়ধর্ম্ম পালন করিয়া মহাকালের কোলে অমর হইয়া বিরাজ করেন। মহাত্মা কটন ভারতবাসীর চিরস্মরণীয়।

ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার।

বিলাতে শ্রীমতী ফসেট একটি আবেদনকারী দলের মুখপাত্র হইয়া ভারতসচিব শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনকে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। ভারতসচিব বলেন যে ভারতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যক আছে বটে কিন্তু ভারতে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা খুব বুঝিয়া সুঝিয়া করিতে হইবে এবং ভারতবাসীরা নিজেরা যখন তাহা চাহিতেছে না তখন হঠাৎ এসম্বন্ধে তিনি কিছু করিতে স্বীকার করিতে পারেন না; তিনি কোনো মন্তব্য না করিয়া ভারতগভর্মেণ্টের কাছে এই আবেদন পাঠাইয়া দিবেন, এবং স্থানীয় কর্ত্তারা যাহা ভালো বুঝিবেন করিবেন। অধিকন্তু সম্প্রতি একজন "নেটিভের" হাতে শিক্ষাব্যবস্থার ভার দেওয়া হইয়াছে, তিনি কি করেন তাহাও দেখিবার বিষয় বটে।

"নেটিভ" শ্রীযুক্ত শঙ্করন্ নায়ার মহাত্মা গোখলের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়া দেশের সকল বালকবালিকার বেখরচায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তুলিতে পারিলে ভারতসচিবের দেখিবার মতন একটা ব্যাপার হয় এবং ভারতবাসীরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। ভারতসচিব বলিয়াছেন যে আমরা যাহা চাহি নাই, তাহা তিনি কি করিয়া দিবেন! আমরা কি সিভিল সার্ভিস প্রভৃতি প্রতিযোগী পরীক্ষার বিলোপ চাহিয়াছিলাম, বাংলা বিভাগ চাহিয়াছিলাম, বা জেলা বিভাগ চাহিতেছি, প্রেসের কণ্ঠরোধকারী আইন চাহিয়াছিলাম, অস্ত্র আইন চাহিয়াছিলাম, বা অপরাধ প্রমাণ না হওয়া সত্ত্বেও অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিলাম? এসকল আমরা না চাহিতেও হইয়াছে। কিন্তু চাহিয়াও পাইতেছি না—অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার, মন খুলিয়া কথা বলিবার ও লিখিবার অধিকার, ইংরেজদের সহিত রাষ্ট্রকর্ম্মে সমতা, উপনিবেশে মানুষের অধিকার, বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্য, এবং দেশে স্বায়ত্তশাসন। যদি না চাহিলে না পাওয়া যায়, তবে এই কথা মনে রাখিয়া আমরা জোর করিয়া দাবী করিতে প্রস্তুত হইব।

স্ত্রীশিক্ষা যে আমাদের চাই, তাহার যে কতখানি আবশ্যক তাহা শুধু নূতনপন্থীরাই বলিতেছে না, সনাতনপন্থীরাও এ বিষয়ে একমত। বঙ্গে মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠা তাহার অন্যতর প্রমাণ। গৃহস্থ পত্র হিন্দুমতের পোষক; তাহা হইতে কষ্টিপাথর বিভাগে উদ্ধৃত প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে গৃহস্থের লেখক কেমন জোর করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার চাহিয়াছেন। আমরা ত বার বার করিয়া এই কথা বলিয়া আসিতেছি। এখন দেশের সমবেত দাবী করা দরকার হইয়াছে।

কলিকাতায় স্ত্রীলোকের মৃত্যুর আধিক্য।

কলিকাতার স্বাস্থ্যপর্য্যবেক্ষক সরকারী রিপোর্টে দেখাইয়াছেন যে কলিকাতায় স্ত্রীলোক মরে হাজারকরা ৩৮.৫ আর পুরুষ মরে ২৩.৫; এবং স্ত্রীলোকদের মৃত্যুর কারণ প্রায়ই যক্ষ্মা ও ক্ষয়রোগ। জগতের অপর সর্ব্বত্র স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের মৃত্যুসংখ্যা বেশী—কারণ পুরুষ অনেক বিপদসঙ্কুল কার্য্যে নিযুক্ত হয়, শ্রমসাধ্য কাজ তাহাদিগকেই বেশী করিতে হয়, জীবনসংগ্রামে তাহাদিগকেই বুক দিয়া লড়িতে হয়। এই সাধারণ সূত্রের ব্যতিক্রম কলিকাতায় কেন হইল তাহার কারণ স্বাস্থ্যপর্য্যবেক্ষক এই দেখাইয়াছেন যে, কলিকাতার মেয়েরা ঘিঞ্জি গলির আলো-বাতাস-শূন্য উচ্চ-প্রাচীর-ঘেরা বাড়ীর পশ্চাৎদিকে অন্দর মহলে থাকে, সমস্ত দিন তাহাদের নীচের স্যাঁতা রান্নাঘরে ধোঁয়ার মধ্যে কাটাইতে হয়, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে তাহাদিগকে সযত্নে অবরুদ্ধ করিয়া পর্দ্দার আড়ালে রাখা হয়, তাহাতে আলো বাতাসও তাহাদের মুখ দেখিতে পায় না, ছাদে বা বারাণ্ডায় উঠা বা বাহির হওয়া ত কল্পনারও কল্পনা করিবার সাধ্য নাই। ইহার ফলে বেচারীদের দেহ ভাঙিয়া পড়ে ও যক্ষ্মা ও ক্ষয়রোগ শীঘ্রই তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া বাবুদিগের নূতন বন্দিনী ও নগদ দক্ষিণা লাভের বিশেষ সুযোগ করিয়া দিয়া যায়!

আমাদের আরো মনে হয় অবরোধ প্রথা ছাড়া অকাল-মাতৃত্ব, বাল্যমাতৃত্ব ও অল্পাহার স্ত্রীলোকের অধিক মৃত্যুর অন্যতম কারণ। বাবুরা সমস্ত উৎকৃষ্ট খাদ্য খাইয়া ভুঁড়ির পরিধি বৃদ্ধি করেন, গৃহলক্ষ্মীদের স্বাস্থ্য পুষ্টি রক্ষার উপযুক্ত খাদ্য তাঁহাদের জুটিতেছে কি না সে দিকে লক্ষ্য রাখেন না। মেয়েরাও আশৈশব অবহেলা পাইয়া এমন অভ্যস্ত এবং

এমন স্বাস্থ্যতত্ত্ব-অনভিজ্ঞ যে তাহারা বিনা প্রতিবাদেই পলে পলে মরিতে থাকে। সকলে একসঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে ইহার প্রতিকার সহজে হইতে পারে।

অতএব আমাদের বাসপ্রথা, জীবনযাত্রাপ্রণালী, বাল্য-বিবাহ, অবরোধ শীঘ্র পরিবর্তন করিয়া ফেলা দরকার। তাহা করা সহজ হইয়া যাইবে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে। শিক্ষার আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

মহারাজা হোলকারের বদান্যতা।

মহারাজা হোলকার বড়লাট বাহাদুরের হাতে এক-লক্ষ টাকা দিয়া য়ুরোপে যুদ্ধপীড়িত লোকদের বা অমনি-ধারা অপর কোনো সৎকার্য্যের সাহায্যে ঐ টাকা খরচ করিতে বলিয়াছেন। যাঁহার প্রাণ দুঃখীর কষ্টে ব্যথিত হয় তিনি মহাত্মা। যাঁহার প্রাণ স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশের লোকের জন্যও কাতর হয়, তাঁহার উদারতা আরো মহৎ। মহারাজা হোলকার ও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণকারী অপর ধনীরা যখন বিদেশের জন্য এত ব্যাকুল, তখন স্বদেশের অনশন অশিক্ষা অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দূর করিবার বেলাও তাঁহারা এমনই মুক্তভাণ্ডার হইবেন; আশা করি।

পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা।

পূর্ব্বে পুষ্করিণী বা কূপ প্রতিষ্ঠা করা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করা পুণ্যকর্ম্ম ছিল। এখন লোকের সঙ্গতিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। জলাভাবে দেশ রোগে ও দুর্ভিক্ষে মুমূর্ষু হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্দ্দিনে বাংলা গভর্মেণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাতে সেস আদায়ের টাকা ন্যস্ত করিয়া জেলায় পল্লীতে পল্লীতে জলাশয় সংস্কার ও প্রতিষ্ঠা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাতে দেশের জলাভাব দূর হইয়া স্বাস্থ্য ও অন্ন সুলভ হইবে; মজুরেরা কর্ম পাইয়া খাইয়া বাঁচিবে। এই সদনুষ্ঠানের জন্য গভর্মেণ্ট প্রজাসাধারণের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করিলেন; প্রজার দুঃখ দূর করাই গভর্মেণ্টের মুখ্য কর্ত্তব্য।

জীববলি বন্ধ।

দেবতার পূজায় জীববলি দেওয়ার মতন এমন পরস্পর-বিরোধী কাণ্ড আর কিছু হইতে পারে না। জীববলি যত রকম দার্শনিক কুতর্ক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া সমর্থন করা যাক না কেন, উহা যে নিষ্ঠুরতা, তামসিকতা ও আধ্যাত্মিক বিকাশের বিরোধী তাহা একটু বিচার করিয়া চিন্তা করিলেই স্পষ্ট হয়। প্রবাসীতেই বহু পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত পাঁতি প্রকাশিত হইয়াছিল যে উহা অশাস্ত্রীয় সুতরাং অধর্ম্ম্য। সুসংবাদ যে ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে এবার দশহরা (শারদীয় পুজা) উপলক্ষে জীববলি বন্ধ হইয়াছে। বোম্বাইএর জীবদয়াপ্রসারক মণ্ডলী সংবাদ দিয়াছেন—কাদি জেলার ১৩০০ গ্রামে; ঝালোড়, শিবগড় প্রভৃতি রাজপুতানার ৭৮৪ গ্রামে; ফিরোজপুর, বিকানীর, কানপুর, অম্বালা, ছোট উদয়পুর, তীরলা, দিল্লি, হায়দরগড়, যসোড়া প্রভৃতি নগরে; ১২৫টি দেশীয় মিত্ররাজ্যে; বড়োদা, কাশ্মীর, জুনাগড়, আলোয়ার, ভরতপুর, জামনগর, ভবনগর, খয়েরপুর, জোওাল, রাধনপুর, মণ্ডি, ধ্রাঙ্গধরা, বঙ্কানের, মোর্ভী, রাজকোট, বাঁশদা, পোরবন্দর, লিমড়ী, লুনাওাড়, কিষণগড়, কুশলগড়, পালানপুর, সাচীন, লখতার, ধরমপুর প্রভৃতি রাজ্যে;—জীববলি নিবারিত হইয়াছে।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যভঙ্গ।

বোম্বাই মিউনিসিপালিটি শহরের স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য ডাক্তার ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রিপোর্টে প্রকাশ শতকরা ২৫ জন ছাত্র পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে জীর্ণ হইতেছে; শতকরা ৮৩ জনের প্লীহা বর্দ্ধিত; যক্ষ্মা ও ক্ষয়রোগও আছে; মোট ৫৯৩৭ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৭২৫ জনের চক্ষু রোগদুষ্ট; এবং ২৩৫০ জনের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়; অর্থাৎ শতকরা ৪০ জনের চক্ষু পীড়াগ্রস্ত; শতকরা ৩০ জনের দাঁত পোকাখেকো।

বঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের অবস্থাও এইরকম। ইহার প্রতিকারের উপায় মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও গভর্মেণ্টের করা উচিত। যেখানে সম্ভব পাঠনা খোলা জায়গায় গাছের তলায় হইবে, সকাল বিকাল স্কুলের কাজ হইবে; স্কুলে ছেলেমেয়েদের পুষ্টিকর উত্তম খাদ্য খাইতে দেওয়া হইবে; ডাক্তার ইন্সপেক্টর মধ্যে মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা করিবেন; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক রীতিনীতির অনুকূল পরিবর্তন আবশ্যক।

নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা

আমার　নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা
　　এসহে গোপনে
আমার　স্বপন-মাঝে দিশাহারা!
ওগো　অন্ধকারের অন্তরধন
　　দাও ঢেকে মোর পরাণমন,
আমি　চাইনে তপন চাইনে তারা,
ওগো　নিশীথ রাতের বাদল-ধারা!

যখন　সবাই মগন ঘুমের ঘোরে
　　নিয়োগো, নিয়োগো
আমার　ঘুম নিয়োগো হরণ করে!
আমার　একলা ঘরে চুপে চুপে
　　এসো কেবল সুরের রূপে,
　　দিয়োগো, দিয়োগো
আমার　চোখের জলের দিয়ো সাড়া,
ওগো　নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাতে ও সকালে

কাল　রাতের বেলা গান এল মোর মনে
　তখন তুমি ছিলেনা মোর সনে।
　　যে কথাটি বলব তোমায় বলে'
　　কাট্‌ল জীবন নীরব চোখের জলে
　　সেই কথাটি সুরের হোমানলে
　　　উঠল জলে একটি আঁধার ক্ষণে।
　　　তখন তুমি ছিলেনা মোর সনে॥

　ভেবেছিলেম আজকে সকাল হলে
　সেই কথাটি তোমায় যাব বলে।
　　ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে,
　　পাখীর গানে আকাশ গেল পূরে,
　　সেই কথাটি লাগ্‌ল না সেই সুরে
　　　যতই প্রয়াস করি পরাণপণে।
　　　তখন তুমি ছিলে আমার সনে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিতার ভাষা ও ছন্দ

বাঙ্গালীরা যখন কেবল কয়েকটি হিন্দী শব্দ শিখিয়া কথা কহিতে বসেন, তখন কাশী-কোশলের লোকেরা কথাগুলি ঠিক বুঝিতে পারে না; কারণ কথার টান এবং পদের ঝোঁক, হিন্দীরীতির অনুরূপ হয় না। খাঁটি ওড়িয়া ধরণে "মাছ-অ" উচ্চারণ না করায় একজন বাঙ্গালীর ওড়িয়া চাকর বুঝিতে পারে নাই যে তাহাকে মাছ কিনিতে বলা হইয়াছিল। টান (accent) এবং ঝোঁক (emphasis) বিশুদ্ধ না হইলে আমাদের ইংরেজি কথা ইংরেজেরা বুঝিতে পারে না। টান এবং ঝোঁক ঠিক না রাখিলে সাধারণ বিদ্যা-উপার্জ্জনে বাধা হয় না, কিন্তু পদ্যের রস সম্পূর্ণ অনুভূত হইতে পারে না। টান হইল শব্দের প্রাণ, এবং কথার ঝোঁক হইল বাক্যের গতি। যেখানে শব্দ প্রাণহীন, এবং বাক্যটি গতিশূন্য, সেখানে ভাষার জড়ত্ব জন্মে। শব্দের accent বা টান পূর্ণ মাত্রায় ঠিক না রাখিলে ইংরেজি পদ্যে শব্দ ও পদ-যোজনা হইতে পারে না; এবং যথাস্থানে ঝোঁক বা emphasis না দিলে অর্থবোধে গোলযোগ ঘটে।

আমাদের ব্যাকরণে এবং অলঙ্কারে accent এবং emphasis শব্দের অনুরূপ শব্দ পাই না বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় উহাদের অস্তিত্ব নাই মনে করিয়া থাকি। বৈদিক ভাষা কথা কহিবার ভাষা ছিল; উহাতে উদাত্তাদি ক্রমে কথার টান এবং ঝোঁক দিবার প্রথাও ছিল। বৈদিক ছন্দে যে কোথাও কোথাও হ্রস্ব আ এবং হ্রস্ব এ উচ্চারণ করিতে হইত, তাহা পদপাঠ দেখিলেই অনেকে বুঝিতে পারিবেন। অতিশয় কৃত্রিমতার বাঁধনে পড়িয়া সংস্কৃত নামে প্রসিদ্ধ ভাষাটি আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে; এবং উহাতে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ চিরস্থায়ী নিয়মে বাঁধা; এইজন্যই সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণে ও অলঙ্কারে কথার টান এবং ঝোঁক বুঝাইবার জন্য কোন শব্দ নাই। আমাদের ভাষার প্রকৃতি অনুশীলন করিয়া আমরা ব্যাকরণ রচনা করি না বলিয়া, এবং বাঙ্গলা ভাষাকে সংস্কৃতের শিশুরূপে ভুল করি বলিয়া, সংস্কৃতের নজীরে বাঙ্গালাকে আড়ষ্ট ভাষা মনে করিয়া থাকি।

Emphasis বা ঝোঁক, ভাব হইতে উৎপন্ন হয়; ভাবশুদ্ধ করিয়া পড়িলেই ঝোঁক পড়িয়া থাকে। ঝোঁকের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না বটে, কিন্তু ছন্দের কৃত্রিমতায় যে উহা নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা পরে দেখাইতেছি। কথার টান, শব্দগুলিতে প্রকৃতিসিদ্ধ; উচ্চারণ করিতে হইলেই উহাকে অবলম্বন করিতে হয়। যদি ছন্দের খাতিরে ক-ল-ম-অ উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ শব্দটি কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না; যদি ঐ শব্দটির আগাগোড়া স্বরান্ত উচ্চারণ না হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত স্থানে টান দিয়া উচ্চারণ করিলে ঠিক অর্থবোধ হইবে,—অর্থাৎ প্রথম অক্ষরে টান দিয়া উচ্চারণ করিলে গাছের কলম বুঝিব এবং শেষদিকে অল্প একটু টান দিলে লেখনী বুঝিব। থ অক্ষরটিতে যদি টান না পড়ে এবং শব্দের শেষে থাকে, তাহা হইলে উচ্চারণে ত-এর মত শুনায়। একজন বাঙ্গালী যখন তাহার মাথার অসুখের জন্য ছুটি চাহিয়াছিল, তখন একজন ইংরেজ বলিয়াছিলেন,—"তোমার মাতার অসুখ করিয়াছে, তুমি ছুটি পাইবে না।" মা অক্ষরের পর বাঙ্গালী অবশ্যই দীর্ঘ টান দিয়াছেন, কিন্তু টানের প্রভেদ না জানায় ইংরেজটি অর্থ বুঝিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা উচ্চারণের অনুরূপ না করিয়া যদি শব্দ-যোজনা করা যায় এবং সংস্কৃতের হিসাবে প্রতি অক্ষর স্বতন্ত্রভাবে পড়া যায়, তাহা হইলে পদ্যরচনা অত্যন্ত দোষযুক্ত হয়। সংস্কৃতে অক্ষর অর্থে বর্ণও বটে, একটি syllable বা পদও বটে; "অক্ষর" কথাটিতে সংস্কৃতে তিনটি syllable বা পদ আছে, কিন্তু বাঙ্গলায় উহাতে অ + ক্ষর্ এই দুইটি পদ আছে মাত্র। শব্দের প্রাকৃতিক উচ্চারণে যদি গোলযোগ না ঘটে, তাহা হইলে অক্ষর গুণিয়া পদ্যের চরণ ঠিক করা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ স্থলে যদি পদ্যের চরণটি বর্ণমালার সংখ্যায় পরিমিত, না বলিয়া, পদের মাত্রা-সংখ্যায় অর্থাৎ syllable-সংখ্যায় পরিমিত বলি, তাহা হইলে সকল গোলযোগ চুকিয়া যায়। একটি তের মাত্রার চরণে তেরটি অক্ষরও থাকিতে পারে, অনেক অধিক অক্ষরও থাকিতে পারে; আমি একটি তের অক্ষরের চরণে বাইশটি অক্ষর বসাইয়া কথাটি সুবোধ্য করিতেছি। উদাহৃত চরণে অষ্টম syllable-এর পর বিরাম বুঝাইবার জন্য দুইটি ছত্র করিয়া ভাঙ্গিয়া লিখিতেছি; প্রথমে যে তের অক্ষরের চরণটি এইরূপ:—

তুমি অতি শিশু ছেলে
কোথা যাও একাকী?

এখন দেখুন যে ঠিক ঐ ছন্দ বজায় রাখিয়া এবং আটটি মাত্রার পর বিরাম দিয়া বাইশ অক্ষরের একটি চরণ সৃষ্টি করা চলে; উচ্চারণের হিসাবে পড়িলে এই বাইশ অক্ষর তেরটি অক্ষর বা মাত্রায় পরিণত হইবে, যথা—

আশ্বিন মাসের ভোরের বেলায়
বাগান তখন ফুল-পরা।

ইহার অন্য চরণটিও প্রয়োজনের হিসাবে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

সতেজ শ্যামল তরুর তলায়
গঙ্গা ছিল কূল ভরা।

লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে কোনদিকে কিছু গোল না থাকিলেও, বাইশ অক্ষরের একটি চরণের সহিত কুড়ি অক্ষরের একটি চরণ যোজিত হইয়াছে।

ভাষার স্বাভাবিকতা রাখিতে গেলে যে মাত্রা ধরিয়া চলিতে হয়, এবং উচ্চারণ যে টানের উপর নির্ভর করে, তাহা শেষোদ্ধৃত চরণদ্বয় হইতে সুস্পষ্ট হইবে। শব্দের উচ্চারণ বজায় রাখিয়া, অর্থাৎ অক্ষর না গুণিয়া মাত্রা ধরিয়াই যে প্রাচীনকালে কবিতা এবং গান রচিত হইত, তাহা অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। গোড়ায় যাঁহারা কবিতা ও গান রচনা করিয়া ভাষা সাহিত্যের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা অধ্যাপক-পণ্ডিতশ্রেণীর লোক ছিলেন না। টোলের উপাধি গর্ব্বিতেরা দেশের ভাষায় কিছু রচনা করা কিংবা বাঙ্গলা-সাহিত্য পড়া, অতি অপবিত্র ও লজ্জাজনক কাজ মনে করিতেন। যাঁহারা "টুলো" নিয়মের জালে বাঁধা পড়েন নাই, বরং সাধারণ শ্রেণীর লোকের মনের ভাব এবং কর্ম্মাদির প্রতি যাঁহাদের সহানুভূতি ছিল, তাঁহাদের হাতেই আমাদের ভাষা-সাহিত্য প্রথমে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। মাঠের চাষা এবং নৌকার মাঝি যে সুরে গান গাহিত, সামাজিক এবং পারিবারিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পুরুষ এবং নারীরা আচরণীয় নীতির উপদেশ দিতে গিয়া যে ছন্দে ছড়া বাঁধিতেন, সেই সুর এবং সেই ছন্দ অনুসরণ করিয়াই, আদি কবিগণ

সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। এই জন্যই কথা কহিবার সময় স্বাভাবিক ভাবে শব্দগুলিতে যেখানে যেরূপ "টান" বা ঝোঁক থাকে, কবিতায় ও গানে তাহা কদাচ নষ্ট হইত না।

যাঁহারা পল্লীগ্রামে জন্মেন নাই, অমার্জ্জিতরুচি সাধারণ শ্রেণীর লোকের সংসর্গে আসেন নাই, এবং কদাচিৎ সহরের কোন মুদির দোকানে সেকালের রামায়ণাদি পাঠের নমুনা পাইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রাচীনকালের পদ্য এবং গান রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং কবিতা পড়ার রীতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকা আশ্চর্য্য নহে। কোন সাহিত্য-রথী ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছেন যে দাশরথি রায়ের পাঁচালী এবং সেকালের রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি নাকি ব-র-ক-ধ-ঝ উচ্চারণে পড়িতে হয় এবং ইহাতে নাকি শব্দের মাত্রা এবং টান উপেক্ষিত হইয়াছে। তিনি একথাও লিখিয়াছেন, যে, সেদিন পর্য্যন্ত নাকি তিনি এবং দেশের সকল কবিতা-লেখকই শব্দের যথার্থ উচ্চারণ বিকৃত করিয়া পদ্য লিখিতেছিলেন এবং অল্প দিন হইল তিনি নিজে এখন স্বাভাবিক পন্থার নূতন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া, এ দেশের অন্য লেখকেরাও তাঁহার পথ অনুসরণ করিতেছে। কথাগুলি বিচার করিয়া দেখিতেছি। প্রাচীন রামায়ণে পাই :—

"অতিকায় পড়ে রণে রাবণ চিন্তিত
জোড়-হাতে বাপের-আগে কহে ইন্দ্রজিৎ।"

কোন মুদির দোকানেই যে "চিন্তিত" শব্দটি পড়িবার সময় দীর্ঘ করিয়া "অ" কিংবা 'এ' উচ্চারণ করিতে পারে না, মিলের ইন্দ্রজিৎ তাহার প্রমাণ। 'হাতে' এবং 'আগে' যে ভাবে 'জোড়' এবং 'বাপের' সহিত মিলিত আছে, তাহাতে জো-ড় এবং বা-পের উচ্চারণ করিবার সাধ্যই থাকে না। রামায়ণ এবং পাঁচালি পাঠ অনেক শুনিয়াছি, এবং দাশরথি রায় প্রভৃতির গ্রন্থ অনেকবার পড়িয়াছি; উঁহারা যে অক্ষর গুণিয়া চলিতেন না এবং উচ্চারণের হিসাবে মাত্রা অনুসরণ করিতেন, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি। যাহা হউক কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

"বাইরে মোচার খাল   খাল লেগে বানরের গাল
আপনার গাল আপনি চড়াচড়ি।"

অথবা—

"এখনকার বৈষ্ণবের ধারা   যত বেটারা ধুমড়ি-ধরা
ভজন নেইক ভোজন ছত্রিশ জেতে।"

অথবা—

"দিদি গো শোন শোন বাণী   বড় দুঃখ দিল ভবানী
দশ বছরে হয়েছিল বিয়ে;
একাদশে মরেছে পতি   অমনি একাদশীতে ব্রতী
বিয়ে বিয়ে চল্লিশ গেল বয়ে।"

গুপ্ত কবি যেখানে রেক্তা প্রভৃতি দেশী ছন্দে অথবা কবির সুরে পদ্য লিখিয়াছেন, সেখানকার ত কথাই নাই, অন্যত্রও তাঁহার কবিতা ব-র-ক-ধ-ঝ করিয়া পড়িতে হয় না।

"নানার কি নানাকেলে রাজ্য গেলে
তাতেই এত জারি।"

অথবা খাঁটি কবির সুরে লিখিত—

"মাগো ভিক্টোরিয়া করগো মানা!
আর যেন তোর রাঙ্গা ছেলে চোখ্ রাঙে না।
মা তুমি কল্পতরু,   আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি শিং-বাকান, কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস;
যেন রাঙ্গা আমলা,   তুলে মামলা
আমাদের গামলা ভাঙ্গে না;
ভুষি পেলেই খুশী হব ঘুসি খেলে বাঁচব না।"

কবির গান গাহিবার সময় যে উচ্চারণ-আনুযায়ী ছন্দে গাহিতে হয়, তাহাও স্মরণ করাইয়া দিতেছি। প্রাচীন ছন্দ ছাড়িয়া যেখানে নূতন ধরণের ত্রিপদী অবলম্বিত হইত সেখানেও যে উচ্চারণ-বিভ্রাট ঘটিত না, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি—

"শোকে শীর্ণ কলেবর   কহে বীর বৃকোদর
অর্জ্জুনেরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কি কব তোমারে পার্থ,   সকলই হইল ব্যর্থ,
প্রাণপাখী গেছে ফাঁকি দিয়া;
কহিতে না পারি আর   অভিমন্যু-সমাচার
রসনায় রস নাহি আর,
শুকায়েছে ওষ্ঠাধর   বদনে না সরে স্বর,
কলেবর কাঁপে অনিবার।
দ্রোণ কর্ণ দুঃশাসন   অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন
কৃপাচার্য্য জয়দ্রথ বীর
মিলে এই সপ্তজনে   তব অভিমন্যু-ধনে
নিধন করেছে মেরে তীর।"

বিশেষ অবস্থার ফলে স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই কবিতাগুলি উদ্ধৃত করিলাম; ক্বচিৎ এক আধটুকু পাঠান্তর ঘটিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ ঠিক আছে মনে করিতেছি।

প্রাচীনকালে বাঙ্গালাদেশে যে গানের সুর ছিল, তাহাতে উচ্চারণ-অনুসারেই শব্দগুলি সুরে ভাঁজিতে হইত এবং কোন শব্দকে গানে বিচ্ছিন্ন করা চলিত না। এখন যদি কেহ রামপ্রসাদী কিংবা বাউল সুরে গান রচনা করেন তবে তাঁহাকে দায়ে ঠেকিয়া দেশী উচ্চারণ রক্ষা করিয়া শব্দ-যোজনা করিতে হইবে। মৈথিলী ধরণের অনুকরণ করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবিরা অনেক স্থলে অস্বাভাবিক রকমে হসন্ত উচ্চারণ তুলিয়া দিয়াছিলেন, এবং কীর্ত্তন গাহিবার সময় এমনভাবে পদ বিচ্ছিন্ন করিতেন, যে, সহজে অর্থবোধ হইত না। কীর্ত্তনের সুর বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন হইলেও বৈষ্ণবদের পদচ্ছেদরীতি, জনসাধারণের কাছে নূতন বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। এই জন্যই লোকে উপহাস করিয়া রাধার ঘাঘরা প্রভৃতি লইয়া অনেক লালিকা রচনা করিয়াছিল। ভারতচন্দ্র অনেক পণ্ডিতী-ছন্দের অবতারণা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যেখানেই তিনি দেশী সুরে গান করিয়া কবিতার ধূয়া লিখিয়াছেন, সেইখানেই পরিপূর্ণ দেশী-নিয়ম রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্নদামঙ্গলের—

"আই আই আই ঐ বুড়া কি এই গৌরীর বর লো
বিয়ের বেলা এয়োর মাঝে হ'ল দিগম্বর লো।"

খাঁটি উচ্চারণ বজায় রাখিয়া গাহিতে হয়। দাশরথি রায়ের "ননদিনী বল নাগরে" প্রভৃতি গানে সুরের খাতিরে শব্দ-বিকৃতি ঘটে না; কিন্তু যেখানে ঝাঁপতাল প্রভৃতিতে সুরের ঝোঁক রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে উচ্চারণ বজায় রাখিতে পারেন নাই, এবং আমাদিগকে "বসিলে-ন, মা হে-ম-বরণী" প্রভৃতি উচ্চারণে গান শুনিতে হয়। এ দোষ একালেও কেহ পরিহার করিতে পারেন নাই। স্বয়ং শব্দ-কুশলী সঙ্গীতনিপুণ কবিকুলতিলক রবীন্দ্রনাথও উচ্চঅঙ্গের তালে, শব্দের স্বাভাবিকতা রাখিতে পারেন নাই। আমাদিগকে পড়িতে হয় এবং গানে শুনিতে হয়—

"আ-রতি করে চন্দ্র ত-প-ন,
দে-ব মা-ন-ব বন্দে চ-র-ণ।"

সহজ সুরতালে রচিত অনেক গানেও শব্দগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া উচ্চারিত হয়।

অমর মধুসূদন খাঁটি দেশী ছন্দে কবিতা লেখেন নাই, এবং তাঁহার মহাকাব্যে যথেষ্ট সংস্কৃতশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তবুও কুত্রাপি তাঁহার রচনা ব-র-ক-ধ-ঝ করিয়া পড়িতে হয় না; সর্ব্বত্রই টান এবং ঝোঁক অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কবিবর হেমচন্দ্রের সম্বন্ধেও ঐকথা; তবে তিনি দেশী মাত্রা-ছন্দে "বাজিমাৎ," "হায় কি হ'ল" প্রভৃতি লিখিয়াছেন। তাঁহার "ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়" কবিতার নূতনত্বে পাঠকেরা যখন উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং অনেকেই যখন উদ্দীপনা-ব্যঞ্জক কবিতা ও গান রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন আমাদের কবিকুলগৌরব রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়স্ক ছিলেন; তিনি তখন হেমচন্দ্রের নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন,—

"ভা-রত রে তব কলঙ্কিত পরমাণু-রাশি
যত দিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি।" ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথের রচনায় সকল সময়ই উচ্চারণের অনমুরূপ অনেক স্বরান্ত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাইত, কিন্তু উহাতে কয়েকটি কারণে মাধুরী নষ্ট হইত না বা হয় না। শব্দের লালিত্য এবং ঝঙ্কারে উঁহার সকল রচনাই এমন গানের মত হইয়া উঠে, যে, এক-একটি কবিতার দু চারিটি স্থানের অপ্রাকৃতিক উচ্চারণ সহজে ধরা পড়ে না।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল চিরদিনই পূর্ণ মাত্রায় শব্দের মাত্রা ও টান বজায় রাখিয়া কবিতা রচনা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। যে-কোন কারণেই হউক, যখন এদেশের কবিগণের মধ্যে ঐ রীতি একটু অনাদৃত হইতেছিল, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার কবিতাগ্রন্থের ভূমিকায় মাত্রা-ছন্দের স্বাভাবিকতা এবং মনোহারিতার বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার হাসির গানগুলি ত উচ্চারণের মত গীত না হইলে কদাচ মনোহর ও প্রাণস্পর্শী হইতে পারে না। গত বিশ বৎসর ধরিয়া তিনি অন্যান্য যে সকল গান রচনা করিয়াছিলেন সেগুলিতেও এরূপভাবে শব্দ-যোজনা করিতে চেষ্টা করিতেন যাহাতে শব্দের উচ্চারণগুলি সুরের গতি-বিভ্রমের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ থাকে। তিনি যখন লিখিয়াছিলেন—"মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।"—তখন পড়িবার সময় ভাব অনুসারে "কি"র উপরে যে ঝোঁকটুকু পড়ে, গানের সুরেও কৌশল করিয়া সেই স্থানে সেই ঝোঁকটুকুও রাখিয়া দিয়াছেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম।

কথায় টান এবং ঝোঁক রক্ষা করিয়া কবিতা এবং গান রচনাই যে আমাদের দেশের চিরন্তন প্রথা, এবং মধ্যে মধ্যে যে কেবল ঐ রীতির কচিৎ ব্যভিচার লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই দেখাইলাম। শব্দের লালিত্য এবং ঝঙ্কারে যদি সকলেই কবি রবীন্দ্রনাথের মত মোহ সৃষ্টি করিতে পারিতেন, তবে হয়ত অপ্রাকৃতিক স্বরান্ত উচ্চারণ অবলম্বন করিয়াও আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন,– এবং সকল কবিরই "কু-সু-ম-রথে ম-ক-র-কেতু, উড়িত মধু-পবনে।" কিন্তু প্রতিভায় যাহা সুলভ, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিতে পারে না।

যদি কেবল কোমল সৌন্দর্য্যের তোড়া বাঁধিয়া রাখা যায়, এবং একটি একটি করিয়া ফুলগুলির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপের প্রয়োজন না হয়,—যদি কবিতার চরণের প্রত্যেক শব্দকেই জীবন্ত রাখা না যায় এবং সমস্ত চরণটি একটা লালিত্যের ঝঙ্কারে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা কবিতায় যত খুসী প্রাণহীন স্বরান্ত শব্দ বসাইতে পারা যায়। অর্থাৎ খাঁটি সংস্কৃত ছন্দে কবিতা লিখিতে গেলে কবিতাটিকে প্রায় গানের মত করিয়া তুলিতে হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯১ পর্য্যন্ত, আমি সর্ব্ববিধ সংস্কৃত ছন্দে পদ্য লিখিয়া শিক্ষানবিশী করিয়াছি; এবং সে সময়কার অনেক রচনা "যুগপূজা" এবং "ফুলশর" গ্রন্থে মুদ্রিত করিয়াছিলাম। আমি এই পরীক্ষায় বুঝিয়াছি যে সংস্কৃত অক্ষরছন্দে রচনা করিলে কদাচ সুপাঠ্য পদ্য রচিত হয় না। গণছন্দের সম্বন্ধেও ঐ কথা,—যদিও প্রাকৃতভাষার আর্য্যা, গীতিকা প্রভৃতি ছন্দ ধার করিয়া সংস্কৃতে গান রচিত হইত। অক্ষর-ছন্দ এবং মাত্রাছন্দ অনুপযোগী হইলেও মাত্রাছন্দ সম্পূর্ণ অনুপযোগী নহে। বিবেচনা করিয়া লিখিতে পারিলে খাঁটি সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তে পদ্য লেখা যাইতে পারে। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে যখন জয়দেবের ব্যবহৃত সমস্তগুলি মাত্রাছন্দেই কবিতা রচনা করিয়াছিলাম, তখন শব্দগুলি খাঁটি সংস্কৃত হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদে যোজনা করিয়াছিলাম ; যথা—

> ফুটিল নবপুষ্প বনপল্লবদল ছায়িয়া,
> সুরভি বন পবন অতি তাহে ;
> বিহগগণ কুসুম-নত পবন-পরিচালিত
> শ্যামতরু-শাখ-পরে গাহে। ইত্যাদি

কিন্তু দেখিয়াছি (এখানে কেবল দৃষ্টান্তের জন্য একটি ছন্দের উল্লেখ করিলাম) যে, বাঙ্গালা শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া (কবি রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য যুক্তবর্ণ ব্যবহার না করিয়াও) ঐ মাত্রাছন্দে পদ্য রচনা করিলে, পড়িতেও গোল হয় না এবং সুরও বজায় থাকে। যথা :—

> এখনও কি আসে উষা, সে সোনালি সুষমায়
> সাজায়ে শ্যামল দেহ শরতের ? ইত্যাদি।

যে কবিতাটির চরণ উদ্ধৃত করিলাম, সেটি দীর্ঘ কবিতা ; এবং উহাতে যুক্তাক্ষর না দিয়া কিংবা হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ না করিয়া সর্ব্বত্রই সুর বজায় রাখিয়া পড়া চলে। বাঙ্গালা ভাষার এমন একটি নমনীয়তা আছে, যাহাতে নানা রকমের ছন্দে বাঙ্গালা উচ্চারণ বজায় রাখিয়া কবিতা লেখা চলে, এবং সম্পূর্ণরূপে সাত আটটি সংস্কৃত মাত্রাছন্দ ব্যবহার করিলে ক্ষতি হয় না। গীতগোবিন্দ গ্রন্থখানি অনুবাদ করিবার সময় মূলের মাত্রাছন্দগুলি যেখানে যেখানে বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রাখিয়াছি, সেখানে কোথাও হ্রস্ব দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয় না। অথচ ছন্দ ও সুর পরিপূর্ণ বজায় আছে।

কথা হইল এই যে পদ্যে বাঙ্গলা ভাষার শব্দগুলির টান এবং ঝোঁক সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে হইবে। নহিলে পদ্য অত্যন্ত অস্বাভাবিক হইবে। বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন দেশজ ছন্দ ছাড়া নূতন নূতন ছন্দ এবং সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত অবলম্বন করিলেও যে শব্দের টান এবং ঝোঁক নষ্ট হয় না, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিলাম। ছন্দ এবং ঝঙ্কারের খাতিরে কদাচ অস্বাভাবিকরূপে স্বরান্ত উচ্চারণ প্রবর্ত্তন করা চলে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কিছুদিন হইতে নানা প্রবন্ধে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম হইতে আসে নাই, আর্য্যদের নিকট হইতে এ-সব পাওয়া যায় নাই, এ-সব আর্য্যমত নহে। তিনি সাঙ্খ্যকেও আর্য্যমত বলিতে সম্মত নহেন। তিনি যদি উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগে নিজের এই-সমস্ত উক্তিকে সমর্থন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইত; কিন্তু বস্তুত তিনি তাহা করেন নাই। তাঁহার আলোচনা নিতান্ত ভাসা-ভাসা, এবং উপরের আবরণমাত্র স্পর্শ করিয়াছে, ভিতরে কিছুই প্রবেশ করে নাই। তাঁহার উক্তির আলোচনা নানা পত্রিকায় হইতেছে, ইহা সুলক্ষণ। ব্রাহ্মণ-পত্রিকায় (জৈষ্ঠ, ১৩১২) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন স্মৃতিতীর্থ, এবং প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁহার উক্তির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু আরও প্রচুর বলিবার রহিয়াছে, ইঁহাদের উপন্যস্ত প্রমাণকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিতে পারে এরূপ বচন-প্রমাণ আরো আছে। আমি আর পুঁথী বাড়াইব না, ইঁহারা যাহা ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাহাই দেখাইব; কিন্তু তাহাও সমস্ত বিষয়ে নহে, প্রধানত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম সম্বন্ধেই আমি আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য এই দুই ধর্ম্মের ও আর্য্যধর্ম্মের বাহ্য ও আন্তর উভয় প্রকৃতি যতদূর ও যেরূপ ভাবে আলোচনা করা উচিত ছিল, তিনি তাহা করেন নাই। তিনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের তত্ত্ব বা দর্শন-সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করেন নাই; যাহা করিয়াছেন তাহা কেবল কয়টি বাহ্য আচারের কথা লইয়া, এবং ইহাও ঠিক হয় নাই।

বৌদ্ধদের ভিক্ষুধর্ম্ম ও জৈনদের যতি-ধর্ম্ম উভয়ই আর্য্য-দের; অথবা আরো স্পষ্ট কথায় বলিতে হইলে বলিব, বেদ-পন্থীদের ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই ত্রিবিধ আশ্রমের আদর্শে ও প্রধান-প্রধান বিধি-বিধানে আচার-নিয়মে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত। অবশ্য ঐ দুই ধর্ম্মের যাহা বিশেষত্ব আছে, তাহার অনুকূলভাবে প্রয়োজনানুসারে ঐ-সকল বিধি-বিধান ও আচার-নিয়ম-সমূহের স্থানে স্থানে কতক পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্জ্জিতও হইয়াছে, আবার কতক নূতন নূতনও উদ্ভাবিত হইয়াছে।

বেদপন্থীদের ব্রহ্মচারীকে (১) প্রাণিহিংসা করিতে হয় না (গৌতম. ১.২.২৫), (২) অদত্তদ্রব্য গ্রহণ করিতে হয় না (ঐ), (৩) ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয় (আপ. ১.১.২.২৬), (৪) সত্যবাদী হইতে হয়,—মিথ্যা বলিতে হয় না (বৌধা. ১.২.২১), এবং (৫) মদ্যপান করিতে হয় না (গৌতম. ১.২.২৫)। * এইরূপ আরো নিয়ম আছে।

উল্লিখিত পাঁচটি নিয়মের সহিত বৌদ্ধদের পঞ্চশীল অথবা পঞ্চশিক্ষাপদের কোনো ভেদ নাই, একই কথা। পঞ্চ শিক্ষাপদ এই:—(১) প্রাণাতিপাত হইতে বিরত থাকিতে হইবে, (২) অদত্তাদান হইতে বিরত থাকিতে হইবে, (৩) অব্রহ্মচর্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে, (৪) মৃষাবাদ হইতে বিরত থাকিতে হইবে, এবং (৫) সুরা-মৈরেয়-মদ্য-পান হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

জৈন পঞ্চব্রতের প্রথম চারিটি ব্রত এবং বেদপন্থী ও বৌদ্ধদের পূর্ব্বোক্ত প্রথম চারিটি নিয়মও একই। পঞ্চব্রত (তত্ত্বাধিগমসূত্র, ৭.১.১৩ ১৭; উবাসগদসা, ১৭ পৃঃ) এই—(১) প্রাণাতিপাত হইতে বিরত থাকিতে হইবে, (২) মৃষাবাদ হইতে বিরত থাকিতে হইবে, (৩) অদত্তাদান হইতে বিরত থাকিতে হইবে, (৪) এবং অব্রহ্ম হইতে বিরত থাকিতে হইবে। †

বৌদ্ধদের পঞ্চশীল ও জৈনদের পঞ্চব্রত উপাসক বা শ্রাবক অর্থাৎ গৃহস্থ এবং ভিক্ষু বা যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসী উভয়কেই গ্রহণ করিতে হয়। গৃহস্থেরা গ্রহণ করিলে চতুর্থ নিয়মটির এই তাৎপর্য্য যে, ব্যভিচার করিবে না।

* এ সম্বন্ধে বেদপন্থীদের সুপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আরও ভূরি-ভূরি প্রমাণ তুলিতে পারা যায়, অনাবশ্যক বোধে তাহা করিলাম না।

† পঞ্চম ব্রত হইতেছে, অপরিগ্রহ অর্থাৎ গৃধ্নুতা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। ইহাও সুপ্রসিদ্ধ যে, জৈনধর্ম্মে মদ্যপান ও মাংসভোজন একবারে নিষিদ্ধ।

এই জন্যই জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রে গৃহস্থগণের বিষয়ে ঐ নিয়মটিকে স্ব দা র স ন্তো ষ বলা হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীরা এই শীল বা ব্রত গ্রহণ করিলে চতুর্থ নিয়মের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত হয় বুঝিতে হইবে।

বৌদ্ধগণের (ভিক্ষুদের সম্বন্ধে) অ ষ্ট শী লে র মধ্যে রহিয়াছে যে, (৭) নৃত্য, গীত, বাদিত্র প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ দর্শন হইতে বিরত থাকিতে হইবে, এবং (৮) মাল্য, গন্ধ, বিলেপন-ব্যবহার ও অলঙ্কার-ধারণ হইতে বিরত থাকিতে হইবে। বেদপন্থীর ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মে এই উভয়ই বিধান রহিয়াছে (বৌধায়ন, ১.২.২৫ দ্র:—গোভিল, ৩.১.১২, খাদির, ২.৯)।

বেদপন্থীর সমস্ত আশ্রমেই ব্রহ্মচর্য্যের বিধান আছে। যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে কোন আশ্রমীরই সিদ্ধি হয় না। বুদ্ধদেব স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়া বার-বার বলিয়াছেন—"চরথ ভিক্‌খবে ব্রহ্মচরিয়ং সম্মা দুক্‌খস্‌স অন্তকিরিয়ায়"—ভিক্ষুগণ সম্যগ্‌রূপে দুঃখের ধ্বংসের জন্য ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর! জৈনধর্ম্মেও এইরূপ অসকৃৎ ব ম্ভ চে র ং অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের বিধান ও বর্ণনা বেদপন্থীর মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়েই সবিস্তর ভাবে রহিয়াছে।*

এইবার একটু ভিতরে প্রবেশ করা যাউক। প্রধানত নিম্নলিখিত তত্ত্ব বা চিন্তার উপর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে:—(১) আর্য্য সত্যচতুষ্টয়—(ক) দুঃখ, (খ) দুঃখের কারণ, (গ) দুঃখের নিরোধ, ও (ঘ) দুঃখ নিরোধের পথ; (২) দুঃখবাদ; (৩) মজ্ঝিমা পটিপদা বা মধ্যম পথ; (৪) অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা ভাবনা; (৫) ক্লেশের মূল অবিদ্যা; (৬) তৃষ্ণাক্ষয়ই নির্ব্বাণ; (৭) বৈদিক যাগযজ্ঞে অনাস্থা, (৮) অনীশ্বরবাদ, (৯) কর্ম্মবাদ, (১০) মৈত্রী-ভাবনা, ইত্যাদি। আমি বৌ দ্ধ ধ র্ম্মে র প্র তি ষ্ঠা নামে এক প্রবন্ধে (গৃহস্থ ভাদ্র, ১৩২০)† দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির একটিও বুদ্ধদেবের নিজের উদ্ভাবিত নহে, সমস্তই বেদপন্থীদের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় "মধ্যমা প্রতিপৎ" বা মধ্যম পথকেই "বৌদ্ধধর্ম্মের মজ্জা, সার, নিগূঢ় কথা, উপনিষৎ" বলেন। আমরা দেখিতেছি যদি জৈন ধর্ম্মের ইহাই উপনিষৎ হয়, তবে তাহা অ.ত যৎসামান্য, কিছুই নহে বলিলেও চলে। আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি, কেবল ঐমাত্র উপনিষৎ গ্রহণ করিয়া কখনই পৃথিবীর এত লোক ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। এ কথা সত্য বটে, ভারতে সেই সময়ে এক দিকে, সংসারের সাধারণ জনসমাজ যেমন প্রায়ই ভোগাসক্ত হয়, সেইরূপই ছিল, এবং অপর দিকে এক দল কঠোর তপস্বীও ছিলেন। কিন্তু সকলেই যে, ঐরূপ কৃচ্ছ্র তপস্যা করিতেন তাহা কখনই নহে। বিশেষত, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ পথটি বুদ্ধদেবের নিজের আবিষ্কৃত নহে, বেদপন্থীরাই তাহা পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে * একটি শ্রুতি আছে, এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও গীতার (৬.১৬) অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ সাধকের মিত পান-ভোজনাদির আবশ্যকতা-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

> "যদ্বু হ বা আত্মসম্মিতমন্নং তদবতি, তন্ন হিনস্তি;
> যদ্ ভূয়ো হিনস্তি তদ্, যৎ কনীয়ো ন তদবতি।"

ইহার অর্থ এই, যে, নিজের পরিমাণ-মত অর্থাৎ পরিমিত অন্ন রক্ষা করে, তাহা পীড়ন করে না; অধিকতর অন্ন আহার করিলে তাহা পীড়াকর হয়, এবং অল্পতর আহার করিলে তাহাতে শরীর রক্ষা হয় না।†

আপস্তম্ব (২.৯.১৩) ও বৌধায়ন (২.৭.২৩-২৪) স্পষ্ট বলিয়াছেন ব্রহ্মচারীর উপবাসে কখনো সিদ্ধি হয় না।

---

* বৌদ্ধধর্ম্মে প্রধানত বেদপন্থীরই ধর্ম্মের নিয়মসমূহকে আদর্শ বা অবলম্বন করা হইয়াছে, ইহা সবিস্তর ভাবে আমার প্রা তি মো ক্ষে র ভূমিকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

† এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত প্রমাণাবলীর দুই-একটি ("বৈদিক যাগযজ্ঞ ও বেদের প্রামাণ্য" অংশে) ঠিক হয় নাই দেখিতে পাইয়াছি।

* পুস্তক নিকটে না থাকায় স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না।

† শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন 'ভোগও করিবে না কঠোরও (?) করিবে না, তবে করিবে কি? অশ্বঘোষ বুদ্ধের মুখে বলাইয়াছেন—"আহারঃ প্রা ণ যা ত্রা য়ৈ ন ভোগায় ন দৃপ্তয়ে।"' বেদপন্থীর প্রাচীন বহু বহু গ্রন্থে এ কথা আছে। আপস্তম্ব (২.৯.২২.১০—১১) বানপ্রস্থ-সম্বন্ধে বলিতেছেন—"শিলোঞ্ছেন বর্ত্তয়েৎ। ন চাত ঊর্দ্ধং প্রতিগৃহ্লীয়াৎ।" বৌধায়ন (মহীশূর, ২ ১০.৫২, নির্ণয়সাগর-স্মৃতিসমুচ্চয়ে, ২ ১০.৬৬) আরো স্পষ্ট বলিয়াছেন—আহারমাত্রং ভুঞ্জীত কেবলং প্রা ণ-যা ত্রি ক ম্।" বসিষ্ঠ (১০.১৬)—"প্রা ণ যা ত্রি ক মা ত্রঃ স্যাৎ।"

গৃহস্থেরও সম্বন্ধে এই কথা। পরিমিত আহার করিতেই হইবে।

এখানে আরো কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন কামসুখাসক্তি ও আত্মাকে ক্লেশ-প্রদান, এই উভয়ই ত্যাগ করিয়া মধ্যম পথ অবলম্বন করিতে হইবে। এই মধ্যম পথটি কি? বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, ইহা আর্য্য আষ্টাঙ্গিক পথ, যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, ও সম্যক্ সমাধি। ইহাদের মধ্যে এমন কিছু কি নূতন কথা আছে, যাহা বেদপন্থীর ধর্ম্মে বা শাস্ত্রে নাই?

অতএব ইংরেজী-ইতিহাস হইতে সাধারণে প্রচলিত মধ্যম পথকে ছাড়িয়া বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের অপর কোন বিশেষত্বকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। আমি যাহা বুঝিয়াছি বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব-নামক প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, ১ম বর্ষ) বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এখন একবার জৈন ধর্ম্মের দিকে দেখা যাউক। শাস্ত্রী মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন জৈনেরা নগ্ন থাকেন। কিন্তু কেবল তাঁহারাই নহেন, বেদপন্থীদেরও পারিব্রাজকগণের মধ্যে এইরূপ আচারের প্রমাণ পাওয়া যায়। আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে (২.৯.২১.১১—১২) উক্ত হইয়াছে:—

"তস্য মুক্তমাচ্ছাদনং বিহিতম্।"
সর্ব্বতঃ পরিমোক্ষমেকে।"

বৈখানস-ধর্ম্মপ্রশ্নে (১.৫):—

পরমহংসা নাম...সাম্বরা দিগম্বরা বা।"

জৈনেরা যে, আবার এক বা একাধিক চীবরও ধারণ করেন, আচারাঙ্গসূত্রে (২.৫.১, বস্ত্রৈষণা) তাহার বিবিধ বিধান রহিয়াছে।

শাস্ত্রী মহাশয় জৈন সাধুগণের স্নান না-করা, ও মল-ধারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ঠিক; কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার সূক্ষ্ম বীজ বেদপন্থীদের ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের মধ্যে আছে, তাহা হইতেই জৈন যতিধর্ম্মে প্রকাণ্ড বৃক্ষের জন্ম হইয়াছে। গোভিলগৃহ্যসূত্রে ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে (৩.১.২০):—

"স্নানম্।"

পূর্ব্ব সূত্র (:৬) হইতে "বর্জ্জয়" পদ অনুবৃত্ত হইতেছে। অতএব ইহার অর্থ—স্নান ত্যাগ কর। গৌতমও (১.২.১৯) বলিয়াছেন:—

'বর্জ্জয়েন্ মধুমাংস...স্নান-দন্তধাবন...।"*

গা না ধুইবার কথা আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে (১.১.২ ১৩) আছে:—

"অঙ্গানি ন প্রক্ষালয়ীত।"

ইহার প্রতিবিধানও পর সূত্রে (১৪) আছে, অশুচি দ্রব্য লাগিলে ধুইতে পারা যায়।

প্রসঙ্গত আর একটা বলিয়া লই। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন "খাট ছাড়া আর্য্যগণের শয়ন হইত না।" আমরা দেখিতেছি সময়ে-সময়ে ব্রতবিশেষে ধর্ম্মবিশেষে তাঁহারা খাট ছাড়িয়া নীচে শুইতেন। খাদিরগৃহ্যসূত্রে (২.১০) ব্রহ্মচর্য্য-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে:—

"অধঃসংবেশী।"

অর্থাৎ নীচে শুইবে।

টীকাকার রুদ্রস্কন্দ বলিতেছেন এই নিয়মটি "খট্বাদি-নিষেধকঃ।" যাজ্ঞবল্ক্যের (১.৩৩) অপরার্কটীকায় যমের নামে এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে:—

"খট্বাসনঞ্চ শয়নং বর্জ্জয়েদ্ দন্তধাবনম্।
স্বপেদেকঃ কুশে যে ব......।" †

বসিষ্ঠ-ধর্ম্মশাস্ত্রেও (৭.১১) উক্ত হইয়াছে:—"খট্বাশয়ন-দন্তপ্রক্ষালন...বর্জ্জী।" আবার পরিব্রাজক-ধর্ম্মে (ঐ, ১০.৮) স্থণ্ডিলশায়ী হইবার বিধি আছে।

এ-সব বাহিরের কথা; জৈনদের ভিতরের কথা দেখা যাউক। জৈনগণের পঞ্চব্রতের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে (৭.১) ইহা এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে:—

"হিংসাঽনৃতস্তেয়াব্রহ্মপরিগ্রহেভ্যো বিরতির্ব্রতম্।"

অর্থাৎ এইগুলিকে ব্রত বলে:—

* অন্যান্য সূত্রগ্রন্থে (আপ. ১.১.২.৩০; বৌধা. ১.২.৪০—৪১) অল্প-স্বল্প স্নানের বিধি আছে দেখিয়া ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়া থাকেন যে, খুব সুখসম্ভোগ করিয়া স্নান করিবে না, ডুবিবে আর উঠিবে,—"দণ্ডবৎ প্লবনম্।"

† আপস্তম্ব-প্রভৃতির (আপ. ১.১.২.২১; গৌতম. ১.২.২৬) নীচে শুইবার নিয়মটি ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১। অহিংসা

২। সত্য

৩। অস্তেয়

৪। অমৈথুন

৫। অপরিগ্রহ (= ত্যাগ = অনাসক্তি)

বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে (২.১০.৪১) ঠিক এই পাঁচটিকেই এবং একই ক্রমে ব্র ত ই বলা হইয়াছে :—

"অথেমানি ব্র তা নি ভবন্তি—

১। অহিংসা

২। সত্যম্

৩। অস্তৈন্যম

৪। মৈথুনস্য চ বর্জ্জনং

৫। ত্যা গ ইত্যেব।"

পাতঞ্জল-যোগসূত্রে (২.৩০) এই কয়টিকেই য ম-নামক যোগাঙ্গে পরিগণিত করা হইয়াছে :—

"অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাযমাঃ।"

জৈনধর্ম্মে এই অহিংসাদি ব্রতকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে, (১) অ ণু ব্র ত, অর্থাৎ স র্ব্ব তো ভা বে অহিংসাদি পালন না করিয়া তাহার একদেশ পালন করা; এবং (২) ম হা ব্র ত, অর্থাৎ স র্ব্ব তো ভা বে অহিংসাদি পালন করা (তত্ত্বাধিগমনসূত্র, ৭২)। ইহাও বেদপন্থীর প্রাচীন যোগসূত্রে (২.৩১) রহিয়াছে, এবং ম হা ব্র ত শব্দেই ইহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে। নির্দিষ্ট বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের (২.১০.৪১) ব্যাখ্যাকার গোবিন্দস্বামীও অহিংসা-প্রভৃতিকে ম হা ব্র ত ই বলিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মেও (তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র, ৭.১১) মৈত্রী, প্রমোদ (= মুদিতা), কারুণ্য (= করুণা) ও মাধ্যস্থ (= উপেক্ষা) ভাবনার বিধান রহিয়াছে। ইহা বেদপন্থীর ধর্ম্মে বহুকালই হইতে রহিয়াছে (উল্লিখিত "বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; গৃহস্থ, ভাদ্র, ১৩২০)। পাতঞ্জল-দর্শনেও (১.৩৩) রহিয়াছে :—

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং⋯ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।"

জৈন ধর্ম্ম বলে (তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র,৬.১)—কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্মের নাম যো গ। যেমন হিংসা; ইহা একটি কায়িক অর্থাৎ শারীরিক কর্ম্ম; এই হিংসা একটি যোগ। এই যোগ আ স্র ব নামে কথিত হয় (ঐ, ৬.২), কেননা, জল যেমন প্রণালী বা নালা দিয়া সরোবরের মধ্যে বহিয়া আসে, এই যোগ দ্বারা আত্মাতেও সেইরূপ কর্ম্ম বহিয়া আসে। মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি (ঐ, ৮.১) থাকিলেই এইরূপ হয়। এইরূপ হইলে জীবের বন্ধ হইয়া থাকে। এই আস্রবের নিরোধের নাম সং ব র অর্থাৎ সংযম। এই সং ব র করিতে হইলে, বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত যোগ অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও বাচিক কর্ম্মকে, নিগ্রহ অর্থাৎ তাহাদের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিতে হয় (সর্ব্বার্থসিদ্ধি, ৯.৪)। ইহারই পরিভাষিক নাম গু প্তি (= রক্ষা)।

বৌদ্ধধর্ম্মে এই সংবর খুবই প্রসিদ্ধ—

"কায়েন সংবরো সাধু সাধু বাচায় সংবরো।

মনসা সংবরো সাধু সাধু সব্বত্থ সংবরো।"

ধম্মপদের (ভিক্খুবর্গ, ২) এই গাথাটি অনেকেই জানেন। ই ন্দ্রি য় গু ত্তি (= ০ গুপ্তি) কথাও বৌদ্ধধর্ম্মে (ঐ, ১৬) সুপ্রচলিত।

বেদপন্থীর ধর্ম্মে এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের কথা বিশেষ করিয়া প্রমাণ-প্রয়োগে বলিবার কোনো আবশ্যকতা নাই, কেননা ইহা বালকেরও জানা কথা।

সংবর-সিদ্ধির জন্য জৈনধর্ম্মে যে-সকল ধর্ম্ম * ও অনু-প্রেক্ষা বা চিন্তার কথা † বলা হইয়াছে, তৎসমুদয় বেদপন্থীর ধর্ম্মে ও দর্শনে অতি প্রসিদ্ধ।

জৈনধর্ম্মে মুক্তিপ্রার্থীকে ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, গ্রীষ্ম ইত্যাদি বাইশটি বিষয় সহ্য করিতে হয় (ঐ, ৯.৮)। ইহা-দিগকে প রী ষ হ বলা হইয়া থাকে। দংশ-মশকাদির দংশন সহ্য করাও অন্যতম পরীষহ। বেদপন্থীর ধর্ম্মেও ইহা বহুপূর্ব্বে বিহিত হইয়াছে দেখা যায় :—

"ন দ্রুহ্যেদ্ দং শ ম শ কা ন্ হি ম বা ন্ তাপসো ভবেৎ।"

বৌধায়ন, ৩.৩.১৯।

বেদপন্থীর প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে এইরূপ শত-শত জ্ঞান-দর্শন আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা ও রীতি-নীতি

---

* ক্ষমা, মার্দব, আর্জ্জব, শৌচ, সন্তোষ, সত্য, সংযম, তপঃ, ত্যাগ, আকিঞ্চন্য ও ব্রহ্মচর্য্য। তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র, ৯.৬।

† অনিত্য, অশরণ, সংসার, ইত্যাদি দ্বাদশটি। ঐ, ৯.৭

দেখিতে পারা যায়। এই-সমস্তকেই মূল করিয়া বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্ম্মেরই সন্ন্যাসিগণের বিধি-নিষেধ প্রণীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনানুসারে ইহাদের কতক পরিবর্জ্জিত বা পরিগঠিতও হইয়াছে। জ্যাকবি (Jacobi) সাহেব জৈনসূত্রসমূহের ভূমিকায় (Sacred Books of the East Series, Vol. XXII, Part I. pp. xxv xxix) গৌতম ও বৌধায়ন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বহু নিয়ম তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ-সমস্ত হইতেই জৈন ও বৌদ্ধদের নিয়মাবলী রচিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা এগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম না, অনুসন্ধিৎসু পাঠক অনায়াসে সেইস্থানে দেখিতে পাইবেন।

জ্যাকবি (Jacobi) সাহেব এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

Our foregoing inquiry suggests where we have to look for the originals of the monastic orders of the Jainas and Buddhists. *The Brahmanic ascetic was the model, from which they borrowed many important practices and institutions of ascetic life.* This observation is not an entirely new one. Prof. Max Muller has already, in his Hibbert Lecture (p. 351) started a similar opinion; likewise Professor Buhler, in his translation of the Baudhayana Sutra (*passim*); and Prof. Kern in his History of Buddhism in India. In order to show to what extent the life of Jaina monks is but *an imitation of the life of the Brahmanic ascetics*, I shall now compare the rules given to the latter in Gautama's and Baudhayana's law-books with the rules for Jaina monks."—Jaina Sutra, (S. B. E.) Part I. p. xxv.

"From the comparison which we have just instituted between the rules from the Brahmanic ascetic and those for the Jaina monk, it will be apparent that *the latter is but a copy of the former.*" *Ibid.*

আরো একটা কথা ভাবিবার দেখা উচিত। পরিব্রাজক, ভিক্ষু বা মুনির কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের গৃহস্থগণের সামাজিক ব্যবস্থা, ক্রিয়াকাণ্ড, আচার-ব্যবহার কিরূপ ছিল? বেদপন্থীদের যেমন সন্তানের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুপর্য্যন্ত জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ ইত্যাদি কার্য্যকলাপ ও আনন্দ-উৎসব প্রভৃতি আছে, বৌদ্ধ ও জৈন গৃহস্থের এরূপ কিছু কি নাই? থাকিলে তাহা কিরূপ? কোন্ আদর্শে তাহা চলে? পূর্ব্বেই বা তাহা কিপ্রকার ছিল? বিবাহবিধি কিরূপ ছিল? তাহার সম্বন্ধবিচার কিরূপ ছিল? তাহাদের দায়ভাগের নিয়ম কিরূপ? ধর্ম্মাধিকরণ বা বিচারালয়ের আবশ্যক বিধি-ব্যবস্থা কিরূপ? *

এই সমস্ত বিষয় বৌদ্ধদের কিরূপ কি ছিল বা এখনো আছে, জানিতে পারি নাই; পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন ত খুব ভাল হয়। কিন্তু জৈনদের সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাইয়াছি, যেমন সন্ন্যাসীদের তেমনি গৃহস্থদেরও আচার ব্যবহার প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহে জৈনগণ সম্পূর্ণভাবে বেদপন্থীদের অনুকরণ করিয়াছেন। অনুকরণ বলা ঠিক নহে, কেননা তাহা অনুকরণ নহে, একই নিয়মে চলিতেছেন, ইহাই বলা ঠিক। কিছু কিছু পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন ও সংযোজন ভিন্ন দুই সমাজকে একই বোধ হয়। পাঠকগণ জৈনদের আদিপুরাণ দেখিবেন। শ্রীমদ্ বিজয়ানন্দ সূরি (আত্মারামজী) বিরচিত সুবৃহৎ তত্ত্বনির্ণয়প্রাসাদ, ও জৈনমিত্রের সম্পাদক ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদজীর সঙ্কলিত গৃহস্থধর্ম্ম দেখিলেও অনেকে বুঝিতে পারিবেন। উভয় গ্রন্থই সরল হিন্দীতে লিখিত। †

এককালে অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গ-মগধ অনার্য্য দেশ ছিল সত্য, কিন্তু চিরকালই এরূপ ছিল না। রমাপ্রসাদ বাবু এ সম্বন্ধে কিছু উত্তর দিয়াছেন। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বে ও তৎসময়ের মগধদেশের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহাতে তাহাকে আর্য্য বা অনার্য্য দেশ বলিয়া মনে হয়? না হয় তর্কের খাতিরে ধরিয়াই লইলাম জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের

* সেদিন মহামনস্বী শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় আমার নিকটে কথাপ্রসঙ্গে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছিলেন।

† ত্রিবর্ণাচার নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, (শীতলপ্রসাদজী ইহা হইতে অনেক গ্রহণ করিয়াছেন), জৈনহিতৈষী মাসিকে দক্ষতার সহিত ইহার অপ্রামাণ্য দেখান হইয়াছে।

দায়ভাগ-সম্বন্ধে বেদপন্থীদেরও নিজের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। জৈনদেরও সহিত বেদপন্থীদের অনেক ভেদ দেখা যায়, এবং অভেদও দেখা যায় অনেক। ভদ্রবাহুসংহিতা, বর্দ্ধমাননীতি ও অর্হন্নীতি পুস্তকে জৈনদের দায়ভাগের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি সময়ে সময়ে বিচারালয়েও ইহাদের প্রামাণ্যে বিবাদ মীমাংসা করা হইয়া থাকে। সেদিন জৈনমিত্রে (ভাদ্রপদ, কৃষ্ণ ২, ২৪৪১) দেখিলাম বিচারক (শ্রীযুক্ত যুগমন্দরলাল জৈন, এম্-এ ব্যারিষ্টার) ঐ-সকল গ্রন্থের প্রামাণ্যে একটি জৈন বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

উৎপত্তির সময়ে মগধ অনার্য্যদেশ ছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অনার্য্যদেশে আর্য্যমত, বা আর্য্যদেশে অনার্য্যমত কি কখনই কোনোরূপে উৎপন্ন ও প্রচলিত হইতে পারে না? আবার আর্য্যদেশেও কোনো কোনো অনার্য্যব্যবহার, এবং অনার্য্যদেশেও কোনো কোনো আর্য্যব্যবহার কি থাকিতে পারে না?

বেদপন্থীদের এক বৈদিক ধর্ম্মই ঘুরিতে-ঘুরিতে ফিরিতে-ফিরিতে নানা পৌরাণিক মতে ফুটিয়া উঠিয়া নানা নাম ধারণ করিয়াছে। এই-সকল মতের বহুবিষয়ে পরস্পর অভেদের ন্যায় ভেদও প্রচুর, এবং পরস্পরকে আক্রমণ করিতেও অনেকে পটু। কাহাকেও অবৈদিক বলিয়া অবজ্ঞা করিতেও ইহারা পরাঙ্মুখ হয় না। বেদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইতেও কেহ কেহ নিরস্ত হয় না। অথচ ইহারা সকলেই বেদপন্থীদের মত বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, আর্য্যমত বলিয়াই গৃহীত হইতেছে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মও বৈদিক ধর্ম্মের ঐ নানামতের এক-একটি। ইহাই আমাদের মনে হয়। এবং সেই জন্যই আ র্য্য ম ত বলিয়া ইহাদিগকে গ্রহণ করিতে কোনো বাধাই আমরা দেখিতে পাই না।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বুদ্বুদের খেলা

বুদ্বুদের খেলা জিনিষটি খুব চমৎকার। ইহা দর্শক ও প্রদর্শক উভয়কেই মুগ্ধ করিয়া দেয়। এই খেলা দেখান খুবই সোজা; কয়েক আনা খরচ করিলেই ইহার যন্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায়। খেলা দেখাইবার ঘরে যদি বায়ুর প্রবাহ কিছু কম হয়, এবং গরম বেশী না হয়, তাহা হইলে নিয়ম মত সমস্ত কার্য্য করিয়া গেলে অকৃতকার্য্য হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

বুদ্বুদ উঠিবার সময় যাহাতে সবগুলি একসঙ্গে না মিশিয়া যায় সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে একটা বড় থালার দরকার। টেবিল হইতে গ্যাসের নলের মুখ পর্য্যন্ত পৌছায় এত বড় একটা রবারের নল আনিয়া গ্যাসের আলোর যে অংশ হইতে শিখা বহির্গত হয় তাহা খুলিয়া ফেলুন এবং সেই স্থানে নলের একটি মুখ বসাইয়া দিন। এই সামান্য যন্ত্রের

বুদ্বুদের সাপ ডিম দেখিয়াছে।

বুদ্বুদের সাপ ডিমে ছোঁ মারিতে যাইতেছে।
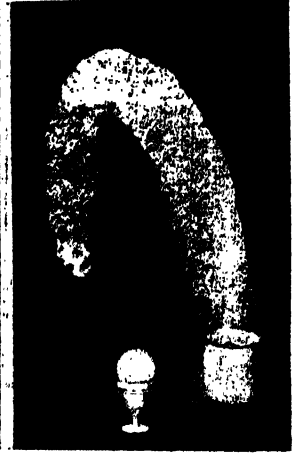
বুদ্বুদের সাপ ডিম গিলিতেছে। বুদ্বুদের সাপ ডিম গিলিয়া উদরস্থ করিয়াছে।

সাহায্যে আশ্চর্য্য ও অভিনব ভেল্কিবাজি দেখান যায়। এই সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি জিনিষেরও দরকার হয়:—

(১) গ্যাসের মাপ করিবার পেয়ালা।

(২ ফুঁ দিয়া বুদ্বুদ করিবার নল।

(৩) বুদ্বুদ রাখিবার একটি উচ্চ আধার।

(৪) গ্যাসের প্রবাহ কম বেশী করিবার জন্য স্প্রিংএর চিম্‌টে।

(৫) বড় বড় বুদ্বুদ করিবার চোঙ্গ ও কাচের নল। এই সঙ্গে ইহাদের ছবিও দেওয়া গেল।

একটা এনামেলকরা পেয়ালার ঢাকনির উপরকার পেরেকটা খুলিয়া ফেলিয়া ফুটোটা দরকার-মত বড় করিয়া তাহাতে একটি ধাতুনির্ম্মিত নল বসাইয়া দিন। তাহার পর নলটিকে বাঁকাইয়া তাহার একটি মুখ পেয়ালার তলদেশ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে: অন্য মুখটি গ্যাসের নলে সংলগ্ন রবারের নলে আচ্ছাদিত থাকিবে। এইবার একটা বড় পাত্রে খানিকটা ফোটান কিম্বা মিঠা জল লইয়া (ধাতু-মিশ্রিত জল হইলে চলিবে না) তাহাতে ছুরি দিয়া চাঁছিয়া চাঁছিয়া অনেকটা সাবানের গুঁড়া ফেলুন। ইহাকে পনের মিনিট আন্দাজ স্থির ভাবে রাখিয়া দিলেই সব সরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়া গেল।

বাজিকরদের মত দর্শকদের কৌতূহল ও বিস্ময় উৎ-পাদন করিবার জন্য প্রত্যেক খেলার সঙ্গে সঙ্গে অনেক অদ্ভুত বুলি আওড়াইতে পারিলে খেলা আরও জমে ভাল।

পেয়ালাটা সাবান-জলে অর্দ্ধেক ভর্ত্তি করিয়া গ্যাস ছাড়িয়া দিন। অমনই পেয়ালার ভিতর হইতে পেয়ালার মত মোটা একটা ফেনার থাম উঠিবে। গ্যাসের প্রবাহ অবাধে বহিলে ইহা যথেষ্ট লম্বা হয়। কিন্তু নল ফুটা হইয়া সন্ধিস্থল দিয়া বাষ্প বাহির হইয়া গেলে, ফেনস্তম্ভের উর্দ্ধে গমন অপেক্ষা পতনেরই সম্ভাবনা বেশী। সব ঠিক-মত চলিলে এক যাদুময় সর্পের উৎপত্তি হইয়া দর্শকদিগকে চমকিত করিয়া দিবে। পেয়ালার মধ্যস্থিত ধাতুময় নলটিকে এদিক্ ওদিক্ নাড়িয়া সাপের আকৃতিরও অনেক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন করা যায়। একটা স্বতন্ত্র পাত্রে আরও খানিকটা ফেনা করিয়া ভিজা হাতে সেটা সাপের চূড়ার উপর রাখিয়া দিলে মাথাটা আরও একটু ভারি এবং বাস্তব ধরণের হয়। পাখার সাহায্যে মাথাটাকে বেশ দোলান যায় এবং দর্শকদের দুই চারিটা নমস্কারও করান যায়। সাপটা খুব বেশী লম্বা হইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই যদি গ্যাসের প্রবাহ থামাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা কিছুক্ষণ সেই ভাবেই থাকিয়া যাইবে; কিন্তু যদি বাড়িয়া চলিতে থাকে তবে ক্রমশঃ মাথাটা হাল্‌কা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং ঘুরিতে ঘুরিতে শূন্যে উড়িয়া যাইবে, তারপর কিছুক্ষণ ঘরের ছাদের কাছে ছুটাছুটি করিয়া মিলাইয়া যাইবে। কখন কখন ছাদে ঠেকিবামাত্র কতকগুলি ছোট ছোট বুদ্বুদ ভাঙ্গিয়া এক ফোঁটা জল হইয়া যায়। এই জলের ভারে বাকিটা নীচের দিকে নামিয়া পড়ে। দর্শকগণ হাত বাড়াইয়া ধরিতে না ধরিতে জলবিন্দু মাটিতে পড়িয়া যায়, আর সাপটা আবার হাত ছাড়া হইয়া উড়িয়া যায়। ঘরটি অন্ধকার করিতে পারিলে এই দৃশ্যের একটু পরিবর্ত্তন হয়। পেয়ালা হইতে সাপটা উঠিবার সময় তাহার গায়ে আগুন ধরাইয়া দিলে গ্যাস জ্বলিয়া উজ্জ্বল অগ্নিময় সর্প শূন্যে আঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটিতে থাকিবে। আগুনের কাছে কোন পর্দ্দা বা কাপড় না থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা নাই।

তাহার পর দর্শকদের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া কাজের সাহায্য করিতে বলিতে পারেন। তিনি যদি চুরুট খান তবেই কাজটা হইবে। চুরুটে একটান দিয়া সেই ধোঁয়া-সুদ্ধ মুখ সাবান-গোলা জলে ডুবানো নলে লাগাইয়া ফুঁ দিয়া একটা বুদ্বুদ করিতে হইবে; এই বুদ্বুদটা অনেকটা ডিমের মত দেখিতে হইবে। ডিমটি একটা ডিমের আধারে রাখুন।

দর্শকদের তখন ডাকিয়া বলিতে পারেন, "ওগো তোমরা কখন সাপকে ডিমের লোভে ঘুরতে দেখেছ?" এইবার পূর্ব্বের মত একটা সাপ করিয়া নল ও পাখার সাহায্যে তাহাকে ডিমের চারিধারে নাচাইয়া লইয়া বেড়ান। সাপটা উড়িয়া গেলে বলুন, "এ সাপটা ডিম ভালবাসে না; এইবার একটা ডিম-খেকো সাপ বেরোবে।" আর-একটা সাপ করিবার সময় বন্ধুর সাহায্যে একটা বুদ্বুদের ডিম করিয়া বুদ্বুদের সাপের শরীরের মধ্যে ফেলিয়া দিলে সেটা সেইখানেই থাকিয়া যাইবে।

দুইটা পেয়ালার সাহায্যে দুটি থাম করিয়া সেই দুটিকে মিশাইয়া দিলে বেশ খিলান হয়। থামের গায়ের বুদ্বুদগুলি বড় করিতে হইলে নলের মুখটা পেয়ালার তলায় ঠেকাইয়া না রাখিয়া ঠিক সাবান-জলের উপরে রাখিতে হয়।

এইবার একটি নূতন রকমের পিং-পং (ping-pong)

বুদ্বুদের খিলান তিন ফুট উচ্চ।

বুদ্বুদের স্তম্ভ।

খেলার সৃষ্টি করা হইবে। কাচের নল দিয়া একটি বুদ্বুদ করিয়া কাহারও জামার আস্তিনের কড়া কফের উপর ফেলিয়া দিন। বুদ্বুদটা লাফাইয়া বেড়াইবে; ইহাকে এক হাত হইতে আর এক হাতে চালান্ করাও যায়।

তারপর দুটি বুদ্বুদ মেশানর খেলা। টেবিলের উপর একটি পশমী কাপড় পাতিয়া তাহার উপর একটি বুদ্বুদ ফেলুন, তাহার পাশে তামাকের ধোঁয়ায় পূর্ণ আর-একটা বুদ্বুদ ফেলুন। এইবার আস্তে আস্তে কাপড়খানা তুলিয়া ধরিয়া দুটি বুদ্বুদকে এক জায়গায় আনিয়া ফেলিলে সেগুলি মিশিয়া একটি বড় বুদ্বুদ হইয়া যাইবে। তাহার ভিতরে ধোঁয়াটা কিছুক্ষণ মেঘের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে নীচের দিকে থিতাইয়া বসিয়া পড়িবে।

এই বুদ্বুদগুলিতে গ্যাসের কোন প্রয়োজন হয় না, মুখের ফুঁয়েই কাজ চলে। কিন্তু পেয়ালার দুটি মুখ করিয়া স্প্রিংএর ছিপি দিয়া দিলে গ্যাস ও হাওয়া উভয়ের সাহায্যে আর-একরকম খেলা দেখান যায়। প্রথমে মুখ দিয়া একটি বুদ্বুদ করিয়া তাহাকে ভাসাইয়া রাখিবার মত একটু গ্যাস ছাড়িয়া দিলে নল সরাইয়া নিলেও সেটি শূন্যে ভাসিয়া থাকিবে। কোটের আস্তিন দিয়া দিয়া সামান্য একটু ধাক্কা দিলে কিম্বা পাখার বাতাস দিলে ইহাকে যে-কোন স্থানে রাখা যায়, ঘরের মধ্যে দৌড় করানও যায়। টেবিলের চারিদিকে সকলে ঘিরিয়া বসিয়া মাঝখানে টেবিলের দুই এক ইঞ্চি উপরে অনেকগুলি বুদ্বুদ করিয়া সকলে মিলিয়া ধীরে ধীরে ফুঁ দিলে বেশ একটা খেলা হয়। দুটিতে ধাক্কা লাগিলে একটা হইয়া যায়। কয়েকটা ধোঁয়ার বুদ্বুদ থাকিলে আরও সুন্দর হয়। এই রকম বুদ্বুদের মালার মত করিয়া কাহারও কেশগুচ্ছের উপর ফেলিতে পারিলে মণিমালার অলঙ্কারের ন্যায় শোভা হয়।

বুদ্বুদগুলি যাহাতে সহজেই নলের মুখ হইতে ছাড়িয়া যায়, সেইজন্য বাঁকা মুখের নল ব্যবহার করা উচিত। আধ ইঞ্চিরও কম ব্যাসের একটি বাঁকান কাচের নল কর্কের মধ্যে বসান, সেই কর্কটি আবার আর-একটি সূক্ষ্মাগ্র নলের বড় মুখে লাগাইয়া এবং এই শেষোক্ত নলের
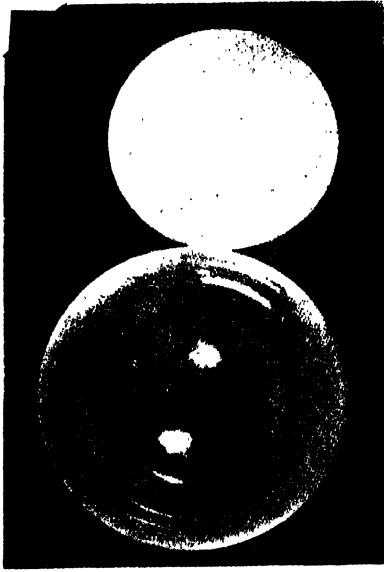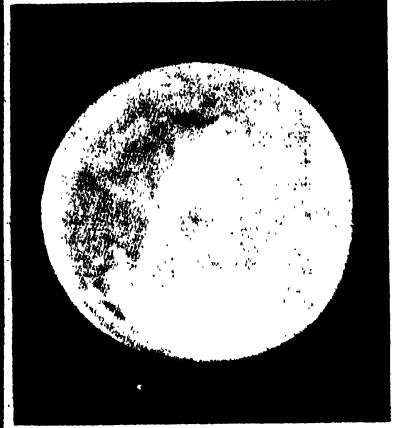
ধোঁয়া-ভরা বুদ্বুদের সঙ্গে পরিষ্কার বুদ্বুদের মিলন।

ধোঁয়া-ভরা বুদ্বুদ পরিষ্কার বুদ্বুদটিকে অর্দ্ধগ্রাস করিয়াছে।

ধোঁয়া-ভরা বুদ্বুদ পরিষ্কার বুদ্বুদটিকে গ্রাস করিয়াছে।

বুদ্বুদের বেলুন।

বুদ্বুদ তৈয়ারির তোড়জোড়।

বুদ্বুদের ফানুস।
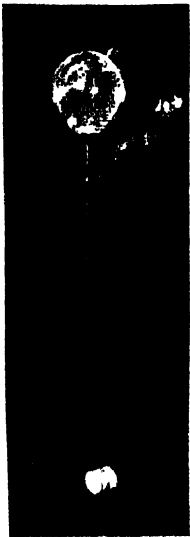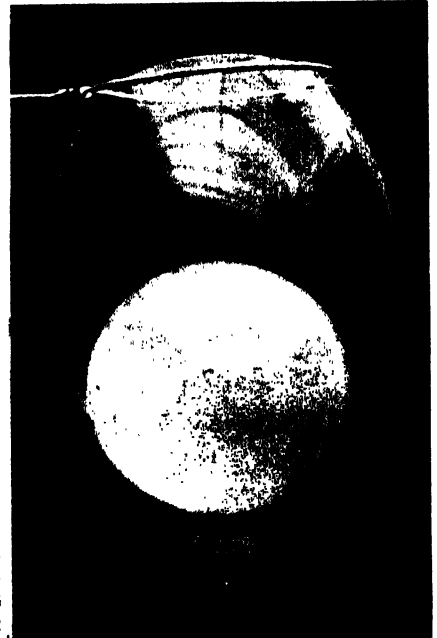
সরু মুখটি গ্যাস-বহ রবারের নলে লাগাইয়া কিম্বা মুখের ফুঁ দিয়া বুদ্বুদ করিতে হয়। কর্কটি খুলিয়া ফেলিলে বড় মুখটি দিয়া বুদ্বুদ বাহির হইতে পারে। মুখের জল যাহাতে বুদ্বুদের মধ্যে না ঢুকিয়া যায় সেই জন্য বড় মুখটি কাছে একটা কাচের ফানেল আটকান থাকে।

তারের আংটা দিয়া আর-একরকম খেলা হয়। এক

উঁচু দাঁড়ে তারটা লাগাইয়া তাহার উপর গ্যাসে পূর্ণ একটা বুদ্বুদ ফেলুন; তাহার পর একটির উপর আর একটি করিয়া আরও আট দশটি বুদ্বুদ ইহার উপর ফেলুন। তখন সেগুলি দুলিয়া দুলিয়া ঘুরিতে থাকিবে।

একটা হাল্কা তারের ফাঁস করিয়া তাহার নীচে একটা রেশমের রিল লাগাইয়া দিন। এই আংটার উপর একটা গ্যাসের বুদ্বুদ ফেলিয়া ক্রমাগত সুতায় ঢিলা দিতে থাকুন। ছাদের কাছে পৌঁছিলে এই অভিনব বেলুনটি ধীরে ধীরে নামাইয়া লউন।

একটা ঝোলান বুদ্বুদ ফুটা করিয়া তাহার ভিতর আর একটা বুদ্বুদ ফেলিতে পারিলে খুব চমৎকার হয়। তারের আংটাটা আনিয়া তাহাকে সাবান-জলে বেশ করিয়া ভিজাইয়া রাখুন, তারপর বাঁকা কাচের নলটা খানিক দূর পর্য্যন্ত ভিজাইয়া লইয়া তাহা দিয়া আংটার তলার দিকে একটা বুদ্বুদ লাগাইয়া দিন। নলটা আবার জলে ডুবাইয়া তাহার মুখের কাছের জলটুকু ঝাড়িয়া ফেলিয়া বুদ্বুদটা উপর দিক দিয়া ফুটা করিয়া তাহার ভিতর আর একটি বুদ্বুদ করুন। তাহার পর সামান্য একটু নাড়া দিয়া নলটা ছাড়াইয়া নিন। এখন ছোট বুদ্বুদটি বড়টির ভিতর বেশ ভাসিতে থাকিবে। বুদ্বুদের তলার জলের ভারে দুইটি যাহাতে ঠেকাঠেকি হইয়া না যায়, সেইজন্য প্রথম বুদ্বুদের তলায় একটা তারের আংটি ঝুলাইয়া দিতে হয়।

যে জিনিষ সচরাচর বড় হয় না তাহাকে প্রকাণ্ড বড় দেখিলে লোকে সহজেই মুগ্ধ হয়। খেলার অবসানে দুটি ছোট ছেলেকে দিয়া বেশ বড় একটা বুদ্বুদ করা যায়। একটা লম্বা-গলাওয়ালা ফানেল্ দিয়া অনায়াসে বার ইঞ্চি ব্যাসের জলবিম্ব করা যায়। দুটি ছেলের হাতে এইরূপ দুটি যন্ত্র দিয়া তাহাদের কয়েক হাত দূরে দূরে দাঁড় করাইয়া দিন। একটা বুদ্বুদ আর-একটার উপর সামান্য একটু চাপ দিলেই দুটিতে মিলিয়া ইহাদের দ্বিগুণ একটা প্রকাণ্ড বুদ্বুদ হইবে।

এই রকম আরও অনেক খেলা অনায়াসেই আবিষ্কার করা যায়। ইহা ছোট ছোট বালকবালিকাদের খুব আমোদ দিতে পারে।

শ্রীশান্তা চট্টোপাধ্যায়।

সেখ আন্দু

(১১)

পথে চলিতে চলিতে আন্দু তাহার জীবনের হিসাব-নিকাশ আগাগোড়া মিলাইয়া, ঠিকের ঘরে জমা দিয়া দেখিল, আজ একটা বিভীষিকাময় বিয়োগের ভুল, মিলিয়া জমার ঘরে উঠিয়াছে! এত দিনে একটা দ্বন্দ্ব অমূলক বলিয়া ধরা পড়িল! আন্দুর ব্যথা-ভারাক্রান্ত শৈত্য-জমাট চিত্ত আজ সুদীর্ঘ কালের পর, মৃদু তরঙ্গ-লহরীতে নির্ভাবনায় ধীর প্রশান্ত আবর্ত্তন আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সেই কলিকাতার তরুণীর দুর্ভাগ্য-স্মৃতিটা মনে পড়িয়া তাহার চিত্তের অন্য প্রান্তে বিষাদের ঘন-গাম্ভীর্য্য অনুভূত হইতে লাগিল, আহা সে বেচারীদের আজ কি দিন!

আন্দু মেলাস্থলে আসিয়া সহকর্ম্মীগণের খোঁজ লইল।

পুলিশের লোকেরা তখন লাল পাগড়ীর জোরে স্থানটা খুব জাঁকাইয়া তুলিয়াছে। গোটাকতক মজুর ধরিয়া মাটীর উপর ছাই ছড়াইয়া তাঁবু খাটান হইতেছে। দোকানদার-গণ, তালপাতার টাটের নীচে চাঁচের আড়াল তুলিয়া, চৌকী বেঞ্চি পাতিয়া, দোকান সাজাইয়াছে। লাল পাগড়ী নীলকুর্ত্তি ও মোটা বুট পায়ে দিয়া, অত্যন্ত গ্রামভারি চালে, পুলিশের লোকেরা দোকানে দোকানে বাহার দিয়া বসিয়া শাসন করিয়া মর্য্যাদা আদায়ের পন্থা খুঁজিতেছে। আন্দুকে দেখিয়া পুলিশ-মহলে একটু চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল।

তাঁবুর কাছে একটা পানের দোকানে বসিয়া আন্দু মজুরদের কাজ দেখিতে লাগিল, রামলাল তেওয়ারী মহা কর্ত্তৃত্ব-আস্ফালনে তাহাদের খাটাইতেছে।

আন্দু একজন মজুরকে ডাকিয়া দু পয়সার চিনি কিনিতে দিল—পথে জলঝড়ে ভিজিয়াছে, একটু চা খাইবে।

মজুরটা চিনি আনিয়া দুটি পয়সা বখশিস লইয়া চলিয়া গেল। রামলাল দূর হইতে বক্র দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁবুর ওপাশে সরিয়া গেল, মজুরটাও মুগুর লইয়া খুঁটি পুঁতিবার জন্য ঐ দিকে গেল।

চা প্রস্তুত হইল। হিন্দুস্থানী পানওয়ালার বালক পুত্রকে

আর আদর করিয়া খানিকটা চা ঢালিয়া দিয়া সবেমাত্র বাটি মুখে তুলিতেছে, এমন সময় তাঁবুর ওদিকে কিসের গোল উঠিল, আন্দু চায়ের বাটি নামাইয়া ছুটিয়া গেল।

রক্তচক্ষু রামলাল, বাঘের মত উগ্র চেহারায় সেই মজুরটাকে রুলের দ্বারা পিটাইতেছে। মজুরটা হীনবল নয়, সে যদি রামলালের ব্যবহারের প্রত্যুত্তর দেয় তো, তাহাকে ইচ্ছা করিলে রীতিমত তালিম করিয়া দিতে পারে, কিন্তু রামলালের মাথায় যে দরিদ্রের মৃত্যু-বিভীষিকার মত লাল পাগড়ী! সে শুধু প্রহার আটকাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া, স্থানে অস্থানে রুলের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া 'দোহাই হুজুর' হাঁকিতেছে!

ছুটিয়া আসিয়া আন্দু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মস্তকের রক্তপ্রবাহে অগ্নিস্রোত গর্জ্জিয়া উঠিল!—আন্দুর একবার মনে হইল এই মুহূর্ত্তে শোণিতোন্মাদ দানবের মত এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখিয়া সমুদ্যত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মুহূর্ত্তে মনে হইল এই অল্পদিন আগে রামলালের পুত্রবিয়োগ হইয়াছে; দুশ্চরিত্র রামলাল মুমূর্ষু পুত্রকে দেখিতে পর্য্যন্ত যায় নাই, তবু হাজার হোক বাপ ত! রামলালের পুত্র-শোকসন্তপ্তা, স্বামীর পরিত্যক্তা, অভাগিনী পত্নীর কথা আন্দুর মনে পড়িল। রামলালের শরীরে চর্ম্ম নাই, এ প্রহার তো মারিলে তাহাকে লাগিবে না,—বাজিবে যে অপরকে!—হায় রামলাল হতভাগ্য! কাল না তুমি পুত্র হারাইয়াছ?—আজ তোমার এই নিঃশঙ্ক পাশবিক ঔদ্ধত্য!—জানি না রামলাল মানবাকৃতির আবরণে কি নিষ্করুণ পৈশাচিকতায় পরমেশ্বর তোমার অন্তর গঠন করিয়াছিলেন! আন্দু রামলালকে সৎপথে থাকিতে পরামর্শ দেয়, আন্দুকে দেখিয়া রামলালকে দুষ্কর্ম্ম করিবার সময় সমীহ করিয়া চলিতে হয়, তাই আন্দুর উপর রাম-লালের রাগ। রামলাল প্রবলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাহত হইয়া দুর্ব্বলের উপর আড়ির ঝাল মিটাইল! এ প্রহার ত মজুরকে হয় নাই, আন্দুকে হইয়াছে,—আন্দু পাথরের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বাধা দিল না।

দুই তিন জন মজুর দুই চারি ঘা খাইয়া, সেই লোকটাকে টানিয়া ছাড়াইল। সে ব্যাঘ্রগ্রাসমুক্ত ছাগশিশুর ন্যায় উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, আন্দুর ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বুকের রক্ত ঢালিয়া তাহার অঙ্গের বেদনা মুছিয়া লয়। ক্ষোভে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছিল।

পিছনে রোষে উত্তেজিত রামলালের চীৎকার শোনা গেল,—"পয়সা নিয়ে খাট্‌ছিস্, না অমনি! এক লহমার জন্যে আড়াল হয়েছি আর অমনি ফাঁকী!—"

আন্দু এবার নিঃসংশয়ে বুঝিল, কেবল চিনি আনিবার অপরাধেই নিরপরাধ বেচারী প্রহৃত হইল! আন্দুর বক্ষের সমস্ত শিরাগুলা যেন গভীর বেদনায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; হায় কি কুক্ষণেই সে চিনি আনিতে পয়সা দিয়াছিল!—রামলালকে আন্দু সৎপথে থাকিয়া মানুষ হইতে উপদেশ দিত, তাই আন্দুর উপর রামলালের আড়ি। কাপুরুষ রামলাল তাহার উপর ঝাল ঝাড়িবার জন্য মারিল গরীব মজুরকে। রামলাল তাহাকে পিটাইল না কেন?

জীবনের অসংখ্য ত্রুটীতে রামলালের আকণ্ঠ পূর্ণ; কাজেই সে পরের ক্ষুদ্র ত্রুটী মার্জ্জনা করিবে, কোন শক্তিতে? দাসত্বের হীনতায় তাহার মনুষ্যত্ব পিষিয়া গুঁড়াইয়া গিয়াছে, তাই বুঝি সে, এতটুকু প্রভুত্বের সুযোগ পাইবামাত্র, পশুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বসিল! অনেক-গুলা কঠিন কথা আন্দুর ঠোঁটের কাছে আসিয়া জমিয়াছিল—সে আর দাঁড়াইল না।

মেলার বাহিরে একটা দোকানে কতকগুলা লোক জমিয়া সেই মজুরটাকে সান্ত্বনা দিতেছিল। লোকটা তখনো প্রহারের বেদনায় রোদন করিতেছে। আন্দু দোকানে ঢুকিয়া কিছু খাবার কিনিয়া, তাহাকে ডাকিয়া লইয়া দোকানের বাহিরে আসিল; এত লোকের সামনে রাম-লালের গ্লানি লইয়া কুৎসা করিতে তাহার ঘৃণা বোধ হইল।

লোকটাকে লইয়া একটু নিভৃত স্থানে আসিয়া তাহাকে খাবারগুলি দিয়া পকেট হইতে দুটি টাকা লইয়া তাহাকে দিল,—তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া স্নেহময় কণ্ঠে তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিল। আন্দুর সহৃদয়তায় সে আকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, আন্দুও চোখের জল রাখিতে পারিল না।

সে কাঁদিয়া বলিল "হুজুর খুঁটীতে তাঁবুর রশা বাঁধছিলুম, আমাকে তিনি এসেই জুতোর গুঁতো দিয়ে বল্লেন 'গাঁজা কিনে আন।'—আমি বল্লুম, রশায় গাঁট দিয়ে যাচ্ছি হুজুর। বস্ আর কথা নেই,—অমনি রুল উচিয়ে—"

আন্দু আর শুনিতে পারে না, সে তাড়াতাড়ি তাহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের উপদেশ দিয়া নিজে ফিরিয়া চলিল।

লঙ্কামরিচের গুঁড়া নাকে চোখে লাগিলেই অসহ্য জ্বালা ধরে।—আন্দু ভাবিতে ভাবিতে চলিল, সে কি করিয়া এই ঘটনার গরল মনের মধ্যে চাপিয়া, রামলালের সামনে অন্তের সহিত প্রসন্ন মুখে কথা কহিবে? এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের একটি শিখায় সে যদি অসাবধানে ফুঁ দিয়া ফেলে, তাহা হইলে রামলালের পদচ্যুতি অনিবার্য্য! কিন্তু তাহার অনাদৃতা পত্নী!—সে যে এই স্বামীর অশ্রদ্ধার অনামন্ত্রিক দানের উপর নির্ভর করিয়া কাচ্চা বাচ্চা লইয়া কোনো রকমে বাঁচিয়া আছে! হায় দুর্দ্দৈব।

আন্দু আসিয়া দেখিল ছোটবাবু আসিয়াছেন, তিনি আন্দুকে দেখিয়াই বলিলেন "কোথা ছিলে এতক্ষণ?—"

আন্দু হঠাৎ বিষম খাইয়া বলিল "উঃ! পাঁজরটা টেনে ধরেছে!"

ঘটনাটা ছোটবাবুর কানেও উঠিয়াছিল, তিনি আন্দুকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আন্দু 'বিশেষ কিছু নয়' বলিয়া উড়াইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। রামলাল আন্দুর দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

পরদিন যত বেলা হইতে লাগিল, মেলাস্থানে ততই লোক বাড়িতে লাগিল; দ্বিপ্রহরের পর জনতা এরূপ বেশী হইয়া উঠিল, যে, স্বয়ং ছোটবাবু বাহির হইয়া শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

ইতর লোকেরা মদে রাঙিয়া উঠিল। পুলিশমহলেও এই সূত্রে উৎসাহের ঝাঁক বাড়িতেছে দেখিয়া, শঙ্কাকুল আন্দু ছোটবাবুর শরণাপন্ন হইল। ছোটবাবু সমস্ত জমাদারগণকে একত্র করিয়া কঠিন স্বরে সাবধান থাকিতে হুকুম দিলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে, ছোটবাবু আন্দুকে বলিলেন—"মিঞা, তুমি পোষাক না পরেই বেরিয়ে যাও।"

সূর্য্যরশ্মির শক্তি-হ্রাসের সহিত জনস্রোতের শক্তি প্রবল হইয়া উঠিল, দলে দলে লোকজন আসিতে লাগিল,—তাজিয়া গাড়ী ঘোড়ায় চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিল, পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াও ইতস্ততঃ ঘুসাঘুসি চড়চাপড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রহসন ঘটিতে লাগিল। ছোটবাবু অস্থির হইয়া, চারিদিকে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে লাগিলেন, আন্দু বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া ছোটবাবুর আদেশমত, পাহারার উপর পাহারা দিয়া যখন দেখিল জনতার অসম্ভব হুড়াহুড়ি বাঁধিয়াছে, তখন সে আর নিশ্চিন্ত থাকা অকর্ত্তব্য বিবেচনায়, নিজের লাল পাগড়ী আনিতে তাঁবুর দিকে চলিল।

সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমানরমণীগণ গাড়ী পাল্কী করিয়া কারবালা-ক্ষেত্রে আসিয়াছেন। সেইসব গাড়ী প্রভৃতি রাখিবার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান মেলার বাহিরে স্বতন্ত্র স্থানে ছিল। আন্দু দূর হইতে দেখিল, একখানা ভাল চক্‌চকে রুদ্ধ গাড়ী বলিষ্ঠ-যুগলাশ্ব-সংযোজিত হইয়া মেলার জনতরঙ্গে নামিয়া বিষম হুলুস্থুল উৎপাদন করিয়াছে। ঘোড়ার মুখ হইতে লোকেরা ঠেলাঠেলি করিয়া হটিয়া পথ করিয়া দিতেছে, সেই ভিড়ে অনেকে সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গিয়া হাত পা কাটিয়া, ছালচামড়া ছিঁড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। গাড়ীখানা অবাধে লোক-লহরী মথিত করিয়া, মেলার মধ্যে ছুটিয়া আসিতেছে, গাড়ীর উপর হইতে দুই পার্শ্বে ভিড়ের উপর মধ্যে মধ্যে নির্ম্মম ভাবে চাবুক বর্ষিত হইতেছে—জনতা কোলাহল করিয়া বিষম গোল বাঁধাইয়াছে। আন্দু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া পায়ের ভরে যতদূর সম্ভব উঁচু হইয়া খুব ভাল করিয়া দেখিল,—দেখিল, গাড়ীর উপর একজন "লাল পাগড়ী!"

আন্দুর চক্ষু স্থির হইল, এ কার গাড়ী? কিন্তু যাহারই গাড়ী হোক, চালকের দুঃসাহসিকতায় সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় গাড়ীর উপর হইতে বর্ষিত চাবুকের প্রভাবে, জনতার ঠেলায় এক বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। আন্দুর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; সে ছুটিয়া বৃদ্ধের কাছে আসিল; তখন তাহাকে দুই তিনজনে ধরিয়া তুলিয়াছে। আন্দু সেখানে আর দাঁড়াইল না, তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া সিংহবিক্রমে লাফাইয়া

ঘোড়ার রাশ ধরিয়া গাড়ী থামাইল। চকিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল, লাল পাগড়িওলা লোকটি আর কেহই নহে, তাহারই প্রিয়তম সুহৃদ্ রামলাল তেওয়ারী!

ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে, পূর্ব্ব-সঞ্চিত যে অচঞ্চল নিঃশব্দ উত্তাপ, মর্ম্মকে উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সহসা উদ্দাম বেগে জ্বলিয়া উঠিল, আব্দুর ইচ্ছা হইল রক্ষ-বিক্রমে রুখিয়া, গাড়ীর উপরকার নির্ম্মম বর্ব্বরগুলোর মুণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলে!—কোচম্যানকে কঠোরস্বরে বলিল "ফেরাও গাড়ী!"

গাড়ীর ছাদে উপবিষ্ট রামলাল, আব্দুর সেই বিকৃত কণ্ঠস্বর ও প্রকাণ্ড পাগড়ীতে তাহাকে হঠাৎ চিনিতে পারিল না, স্বভাবসুলভ কর্ত্তৃত্বে তাড়না করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল "আরে হাটো হাটো,—হাঁকাও গাড়ি সাম্‌নে!" আব্দু তীব্র স্বরে বলিল "চোপ্‌রও!"

গাড়ীর ছাদের উপর কোচম্যানের পিছনে চাবুক লইয়া যে ব্যক্তি বসিয়া মনুষ্য হটাইয়া ঘোড়ার রাস্তা পরিষ্কার করিতেছিল, তাহার বয়স বোধ হয় বছর কুড়ি। মাথায় প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা চুলে তিন ইঞ্চি খাড়া উঁচু আধা-আলবার্ট আধা-ঢেউখেলানো ফ্যাসানের টেড়ি। গায়ে চাকরদের সাদা চাপকান, পায়ে জুতা, মস্তকটির মাঝখানে পাতলা টুপি তেরছা করিয়া বসানো, বোধ হয় টেড়ির খাতিরে। লোকটার মেজাজ সুরায় সরগরম ছিল, চাবুকটা শূন্যে ঘুরাইয়া, মত্তভাবে বলিল "তুমি কেহে মশাই? দেখছ না গাড়ীতে পুলিশ রয়েছে!"

আব্দু বজ্রদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল,—মুহূর্ত্তে তাহার প্রচণ্ড ভুজদণ্ডের অভ্যন্তরে, চপেটাঘাতসূচক, প্রবল বিদ্যুৎঝঞ্জনা বহিয়া গেল; হাতের বেতটা দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া ঘোড়ার মুখ ধরিয়া সবলে টানিয়া ফিরাইল, গাড়ী-বানকে পুনশ্চ বলিল "হাঁকাও গাড়ী"—

পিছনে খটাপট্ শব্দ হইল; আব্দু চাহিয়া দেখিল, প্রকাণ্ড লাল ঘোড়ার উপর আল্‌পাকার সাহেবী পোষাক পরা, মাথায় লাল রংয়ের বনাতের, গেলাসের মত সরু উঁচু, কাল রেশমের থুপী দেওয়া, সম্ভ্রান্ত মুসলমানীধরনের টুপি পরা, সৌখীন চাবুক-চুরুট-ধারী এক যুবক! ঘোড়ার লাগাম টানিয়া তিনি উগ্রভাবে বলিলেন—"ব্যাপার কি?" ইনিই গাড়ীর মালিক!

টেড়িওলা লোকটা হর্ষোৎফুল্ল মুখে চেঁচাইয়া বলিল "আইয়ে খোদাবন্দ, ই বদ্‌মাস্ গুণ্ডা বহুৎ হায়রান্ কিয়া!—"

খোদাবন্দ ঘোড়া লইয়া আগাইয়া আসিলেন। ইনি স্থানীয় জমীদারের পুত্র,—এবং তাঁহার শ্বশুরও এখন সহরের সবডিপুটী, সুতরাং চোখ পাকাইয়া, চাবুক উঁচাইয়া, প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "ছোড় দেও উল্লুক!"

আব্দুর অন্তর জলিয়া যাইতেছিল, সে আত্মদমন করিতে না পারিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল "কভি নেই, হিঁয়া গাড়ী নেই চালানে দেঙ্গে।"

গাড়ীর মধ্যে স্ত্রীলোকদের অলঙ্কার-শিঞ্জন, অস্ফুট অসন্তোষগুঞ্জন, এবং শিশুর ভয়ব্যাকুলিত ক্রন্দন যুগপৎ শোনা গেল। চাবুক-চুরুট-ওলা যুবক বিষম উত্তেজিত হইয়া ধৈর্য্য হারাইলেন, "কেঁও বে রাস্কেল্, নেই ছোড়ো গে" বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে হাতের চাবুকটা দিয়া আব্দুর গ্রীবার চর্ম্মে তীব্রভাবে আঘাত করিলেন। আব্দু যেন ইহাই খুঁজিতেছিল, মুহূর্ত্তে সে ভীষণ বেগে লোকটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, হাত হইতে চাবুক কাড়িয়া, মুখে এক ঘুসি বসাইল, আহত যুবকের দন্তচ্যুত চুরুট, ছিট্‌কাইয়া গাড়ীর চাকার কাছে পড়িল! অপমানিত বিপন্ন যুবক গুণ্ডার স্পর্দ্ধিত বিক্রমে নিরুপায় হইয়া রামলালের প্রতি চাহিয়া ইংরেজী ধমক দিলেন, "ইউ আর ডুইং ইওর ডিউটী বাই দিস্ মিন্‌স্?—ননসেন্স পুলিশ!—কাম্ ইন্!—"

এতক্ষণে রামলাল আব্দুকে চিনিল। যুবকের আহ্বানে দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া, ত্রস্তে গাড়ী হইতে নামিয়া, আব্দুর প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া, নিঃশব্দে ভিড়ে মিশিয়া গেল!—প্রধান নির্ভর রামলাল তেওয়ারীর নির্লজ্জ বিশ্বাস-ঘাতকতা দেখিয়া সেই টেড়িওলা চাবুকধারী খানসামা-পুঙ্গব তাড়াতাড়ি চাবুক হাতে নামিয়া অসহায় প্রভুর পশ্চাতে সাহায্যের জন্য দাঁড়াইল,—মুহূর্ত্তে প্রভুভৃত্য এক সঙ্গে নবোদ্যমে গর্জ্জিয়া আব্দুর উপর পড়িল,—আব্দু প্রথমেই পিছু হটিয়া প্রভুর আক্রমণ ব্যর্থ করিতেই—ভৃত্যের চাবুক আসিয়া মাথা ডিঙ্গাইয়া তাহার পৃষ্ঠে পড়িল! তত্‌ক্ষণে প্রভুর ঘুসি তাহার নাকের কাছাকাছি পৌঁছিল। আব্দু ঘুসিসুদ্ধ হাতখানা বজ্রপেষণে টিপিয়া ধরিয়া এক

হেঁচকায় তাহাকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া যুবকের আল-পাকার-পায়জামা-শোভিত উরুদেশে কঠিনভাবে জুতার ধূলিলাঞ্ছিত চমৎকার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিল! পাদুকা-ঘাতের বেগে তিনি তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইলেন!

ইত্যবসরে ভৃত্যের চাবুক আরো দু'বার আব্দুর পৃষ্ঠে পড়িয়াছিল; আব্দু এইবার প্রভুর সৎকার করিয়া, ভৃত্যের দিকে ছুটিল,—টেড়ির চাকচিক্যের মূল্য যতই হৌক, লোকটার শরীরে শক্তি একপয়সারও ছিল না। আব্দু তাহার ঘাড় ধরিয়া নীচু করিয়া তাহারই চাবুক লইয়া, নির্দ্দয়ভাবে তাহার পৃষ্ঠে উপর্য্যুপরি বসাইয়া তাহার দুর্ব্বল পীড়নের সমস্ত দেনা সুদসুদ্ধ শোধ করিয়া দিল!

জনতার ভয়ঙ্কর কোলাহলে মেলাসুদ্ধ পুলিশ ভাঙ্গিয়া যে যেখানে ছিল সেই দিকে ছুটিয়া আসিল; আব্দুর সেরূপ মূর্ত্তি আর কেহ কখনো দেখে নাই। তাহারা হল্লা করিয়া আসিতে আসিতে, আব্দু আপনার প্রহারের আকাঙ্ক্ষাটি পরিপূর্ণরূপে মিটাইয়া লইয়া, লোকটাকে অত্যন্ত সহজে আপনিই ছাড়িয়া দিল,—তাহার পর কেহ সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই নিঃশব্দে গিয়া ভূপতিত ডেপুটী-জামাতার হাত ধরিয়া তুলিয়া বিনীত ভাবে বলিল,—"মাপ করবেন মশাই, নিতান্ত উত্যক্ত হয়েই আপনাদের আচরণের প্রত্যুত্তর দিয়েছি, না হলে, এমন অনর্থক কষ্ট আমি কাউকে দিই না।"

অদ্ভুত স্বভাবের আব্দুর অপূর্ব্ব ভাববৈচিত্র্যে পরিচিত অপরিচিত সকলেই অবাক;—অপর কনেষ্টবলেরা সকলে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "হয়েছে কি?"

আব্দু পাগড়ীটা খুলিয়া আরক্ত মুখের স্বেদবিন্দু মুছিয়া, গাড়ীর পাশে ঘাসের উপর পাগড়ীর কাপড় বিছাইয়া বসিল; যেন কিছুই হয় নাই, এমনি নিশ্চিন্ত ধৈর্য্যে বলিল "ছোট বাবু আসুন।"

ক্ষণপরেই ভিড় ঠেলিয়া খাকি রংয়ের পোষাকপরা ছোট-বাবু দেখা দিলেন।—বিস্ময়-উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন "জমা-দার!—তুমি? হয়েছিল কি?"

আব্দু উঠিয়া অভিবাদন করিল, একবার চারিদিক চাহিয়া লালপাগড়ী-পরা সকল মুখগুলা দেখিয়া লইল, তারপর উচ্চকণ্ঠে বলিল, "রামলাল তেওয়ারীকে তলব করুন, সেই প্রধান সাক্ষী।"

বিস্মিত ছোটবাবু বলিলেন "কোথায় সে?"

চারিদিকে "রামলাল রামলাল" রবে একটা হাঁকা-হাঁকি পড়িয়া গেল। অনেক সন্ধানে, অনেকদূর হইতে রামলালের সাড়া পাওয়া গেল, সে শুষ্ক ভীতমুখে আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। ছোটবাবু বলিলেন "হয়েছিল কি?"

রামলাল চকিত নেত্রে সকলের পানে চাহিল। দেখিল ডিপুটী-জামাতা, রুমালে উরুর ধূলা ঝাড়িয়া, নতমুখে দ্রুত-কম্পিত নিঃশ্বাসে হাত মুছিতেছেন; আর আব্দু স্থির দৃষ্টিতে রামলালের পানে চাহিয়া আছে। রামলাল বুঝিল জানি না বলিলে আজ পরিত্রাণ নাই! সে ম্লান মুখে রুদ্ধ স্বরে যাহা জানিত সব বলিল,—অবশেষে একটুখানি খোঁচা দিয়া বলিল, "জমাদার পোষাক পরে না আসাতেই তো এত গোল হল। জমাদারকে কেউ চিন্‌তে পারেনি, মনে করেছিল, ও একটা বাজে গুণ্ডা!"

রুষ্টস্বরে ছোটবাবু বলিলেন—"গাড়ী ভিড়ে নামাতে হুকুম দিয়েছিল কে? তুমি?"

রামলালের বক্ষ দুরুদুরু করিয়া উঠিল, বলিল "আজ্ঞে ডিপুটী সাহেবের জামাইয়ের হুকুমে আমি পাছে ভিড়ে কিছু গোলমাল হয় বলে গাড়ীতে ছিলুম"—

বজ্রনিনাদে ধমক দিয়া আব্দু বলিল "চোপ্‌রও মিথ্যা-বাদী, পাছে গোলমাল হয় বলে? দু-পাশে চাবুক চালিয়ে রাস্তা সাফ করবার হুকুম দিয়েছ তুমি—আমি আপনি শুনেছি,—কত লোকের পিঠে চাবুকের দাগ পড়েছে দেখ দেখি,—"

রামলাল এতটুকু হইয়া গেল, জনতার মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল, চাবুকের জ্বালায় যাহাদের পিঠ এখনো জ্বলিতেছিল, তাহারা প্রমাণ দিতে প্রস্তুত; ছোটবাবু সে-সব কথায় কর্ণপাত করিলেন না, বিরক্ত স্বরে বলিলেন "বেশ কথা, তুমি এমন মারামারির হাঙ্গামা দেখেও এখান থেকে পালালে কি বলে?"—

রামলাল চুপ করিয়া রহিল।

ছোটবাবু কঠিনস্বরে বলিলেন "তুমি পাগড়ী পরে' পাগড়ীর জোরে বে-আইনী কাজ করেছ, খুব বাহাদুর তো!"—

এমন সময়ে দূরে আবার ভিড়ে গোলমাল শুনা গেল, তাহারা চাহিয়া দেখিল, অশ্বপৃষ্ঠে বড়বাবু আসিতেছেন। ছোটবাবু অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া ডিপুটী-জামাতাকে তদবস্থায় দেখিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চমকিত ব্যগ্রতায় বলিলেন "দিলদার সাহেব, হয়েছে কি ?"

ছোটবাবু সংক্ষেপে সব বলিলেন। বড়বাবু অকস্মাৎ উগ্রভাবে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন "তা জানানাগাড়ীখানা আটক করে রেখেছ কেন ?"

ছোটবাবু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "আমি ত আটকাইনি,—ওরাই মদের ঝোঁকে মারামারি করে সব জড়ভরত হয়ে দাঁড়িয়েছে,"—ডিপুটী জামাতার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এই ভদ্রলোককে আমি এখনো কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে সাবকাশ পাইনি, কেবলমাত্র আন্দুর আর রামলালের—"

বড়বাবু ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "খুব হয়েছে, এঁর আর সওয়াল জবাবে কাজ কি ?—আন্দু যখন বলেছে তখন আর অপর পক্ষের কথা শোনবার দরকার কি ?—আন্দুর কথাই বেদবাক্য !—"

আন্দুর নামে শ্লেষ ছোটবাবুর অসহ্য হইল। তখনই কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইতেছিলেন,—আন্দু সেলাম করিয়া বলিল "হুজুর তাঁবুতে—

বড়বাবু ক্রুদ্ধ মুখখানা ফিরাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন "গাড়ী নিয়ে তোমরা বাড়ী যাও। দিল্‌দার সাহেব, ঐ খানসামাটাকে নিয়ে একবার তাঁবুতে আসুন। সেইখানেই একটু দরকার আছে।—"

(২২)

তুলার বস্তায় আগুন লাগিলে তাহা দাউ দাউ করিয়া না জ্বলিলেও গুমিয়া গুমিয়া যেটুকু পোড়ে সেটুকু নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়। এই ব্যাপারটা লইয়া, সম্পর্কীয় নিঃসম্পর্কীয়—চারিদিকের জনসমাজে এমনি একটা নিগূঢ় রহস্যের আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, যে, বাহিরের দিক হইতে সেটা স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া উঠা কঠিন; একজন সম্ভ্রান্ত জমীদারের পুত্র, একজন গণ্যমান্য ডিপুটীর জামাতা,—তাঁহাকে প্রকাশ্য মেলায় একজন নগণ্য পুলিশের জমাদার সর্ব্বসমক্ষে পদাঘাত করিয়াছে,—কি দুর্জ্জয় ব্যঙ্গসংবাদ!—চারিদিকের উচ্চ উৎসাহব্যঞ্জক দৃষ্টির তীক্ষ্ণ ধিক্কার হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য আন্দু নতশিরে গৃহকোণে আশ্রয় লইল।—সে যেন শুধু হুজুগের ক্ষুধায় সিদ্ধির নেশা ঢালিয়া, তাহাকে পূর্ণমাত্রায় চম্‌চমে করিয়া তুলিয়াছে।—সকলেরই এমনিতর ভাব! প্রতি মুহূর্ত্তে আন্দুর মনে হইতে লাগিল,—এখনই চাকরী ছাড়িয়া দিই,—কিন্তু সে যে এখন দোষের শৃঙ্খলে বাঁধা,—সে শাস্তি না লইয়া কি করিয়া আপনাকে নিষ্কৃতি দিবে।—

এদিকে এই ব্যাপারে আন্দুকে মধ্যে রাখিয়া বড়বাবুর সহিত ছোটবাবুর এমনি ঘোরতর মনোমালিন্য সংঘটিত হইল,—এবং সেই সংঘাতে, উভয় পক্ষের মধ্যে দোদুল্যমান আন্দু, এমনি নিপীড়িত হইয়া উঠিল, যে বলিবার নহে। বিশেষতঃ ডিপুটীবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ সৌহৃদ্য থাকায়, বড়বাবু যতদূর রুষ্ট হইবার, তাহা হইলেন। তিনি আন্দুকে লক্ষ্য করিয়া আক্রমণে উদ্যত হইলেই ছোটবাবু আন্দুকে সরাইয়া স্বয়ং লাড়িতে লাগিলেন।—শেষফল যাহা হইবার তাহাই হইল, আন্দুকে মধ্যে রাখিয়া উভয়েই পরস্পরের প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিলেন,—মনে রহিল বিদ্বেষের ধূমায়িত অগ্নি—রসনায় রহিল, সুসম্বদ্ধ আইনের কঠিন দোহাই!

কয়দিন এই ভাবে কাটিল। শীকারগঞ্জ হইতে যথাসময়ে সকলেই ফিরিয়াছেন। ডিপুটী-জামাতা পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত উল্লেখে মানহানির মামলা উত্থাপন করা অপমানজনক বুঝিয়া, সে সম্বন্ধে নিরস্ত হইলেন, এবং ভৃত্যটির প্রহারের অভিযোগেও বিশেষ ফল হইবে না বুঝিয়া দুর্বৃত্ত জমাদারকে দণ্ডিত করিবার পরামর্শের জন্য বড়বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। কিন্তু সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল, বড়বাবু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন সাহেব আন্দুকে ডাকিয়া নিজের কামরায় লইয়া গিয়া মেলার ব্যাপারটা কি সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। আন্দু অকপটে আদ্যোপান্ত সমুদায় বলিয়া গেল। সাহেব সমস্ত শুনিয়া মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে চশমার ভিতর হইতে চোখ দুইটি তুলিয়া, মুখখানি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিলেন—"অলরাইট্ ম্যান্,—যুবক, আমি এ ক্ষেত্রে তোমায় কোন কথা বলিতে

ইচ্ছা করি না, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য বলিতেছি—হট্ ব্রেন্, এবং মিলিটারী মেজাজ লইয়া শান্তিরক্ষার কাজ যে চলে না, এটা অবশ্য তুমি মনে রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন করিবে!"

আন্দু হাসিয়া বলিল, একথা তাহার খুবই স্মরণ আছে, তবে কার্য্যক্ষেত্রে যখন ঘটনাপ্রবাহ ন্যায়ের এবং সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছিল তখন সে বাধ্য হইয়া শক্তিপ্রকাশে বাধা দিয়াছিল; অবশ্য সে জানিত যে এ জন্য তাহাকে ভবিষ্যতে দণ্ডিত হইতে হইবে, কিন্তু তথাপি সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে নিরস্ত হয় নাই।

সাহেব বলিলেন—নিশ্চয়ই নহে। লাল চোখ দেখাইয়া প্রতিপদে পরের সৎসাহস খর্ব্ব করাও তাঁহার প্রকৃতি নহে, তবে সকলেরই একটা সীমা আছে, এইটুকু তিনি আন্দুকে বুঝাইতে চাহেন।

কেবল মাত্র মুখের তোড়ে, কি হাতের জোরে যে সাহস নামক বস্তুটা পৃথিবীর বাজারে সম্তাদরে বিকায় না, এবং সহিষ্ণুতা-জিনিসটাও যে সময়-বিশেষে ভীরুতার নামান্তর রূপে প্রতিপন্ন হয়, আন্দু তাহা ভালরকম জানিত। সুতরাং সে সাহেবকে সেলাম করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল।

আন্দু অনেক রাত্রে ছোটবাবুর বাসায় গিয়া তাহার উর্দ্দি ফিরাইয়া দিয়া আসিল। তখন তিনি শয়ন করিয়াছেন। আন্দু চাকরের জিম্মায় রাখিয়া আসিল। চাকরটা নিদ্রাভঙ্গে বিরক্ত হইয়া বলিল "আজ কেন?"

আন্দু গম্ভীরভাবে বলিল, "হাঁ আজই!"

পরদিন কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া আন্দু একেবারে ইস্তফা-পত্র লিখিয়া সাহেবের কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব খুব ব্যগ্রতার সহিত তাহাকে পুনঃ পুনঃ চাকরী ছাড়িতে নিষেধ করিলেন। আন্দু সবিনয়ে নিতান্ত শান্তভাবে প্রতিবাদ করিয়া হাস্যমুখে বলিল, "না সাহেব, পুলিশের কাজ আমার দ্বারা হবে না।"

সাহেব দুঃখিত হইলেন, সে যুদ্ধ-বিভাগে অতঃপর কাজ লইবে শুনিয়া, স্বেচ্ছায় একখানি প্রশংসাপত্র দিলেন। আন্দু অভিবাদন করিয়া বাহিরে আসিল। তারপর যথাকর্ত্তব্য সমাপন করিয়া থানার সহিত সমস্ত সম্পর্ক উঠাইয়া সহরের প্রান্তে আসিয়া একখানি ছোট একতলা ঘর ভাড়া লইল, আহারাদির বন্দোবস্ত নিকটস্থ হোটেলে করিল। এইবার সে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ!

এবার হাইদরাবাদের যোদ্ধামহাশয়কে নিজেই পত্র লিখিল। দাদাজীর কাজে গেল না, পাছে তিনি আন্দুকে নিজের বাড়ীতে আনিবার জন্য কোনরূপ পীড়াপীড়ি করেন বলিয়া। স্বাবলম্বী হইয়া, এবার সে দৈন্যের দায়ে পরের মুখ চাহিবে না, ইহাই ঠিক করিল। সমস্ত জগতের মধ্যে সমগ্র বিপদের মধ্যে, এবার সে ঔদাসীন্যের আশ্রয়ে খুব নির্ভীকভাবে অবস্থান করিবে, কাহাকে তাহার ভয়? নিজের জন্য কেহ কখনো ভাবে না, ভাবে পরের জন্য; তাহার যখন কেহই নাই, তখন সে ত একেবারে নিশ্চিন্ত, পরমেশ্বর যাহা করেন তাহা ভালর জন্যই। ভাগ্যে সে বিবাহ করে নাই!

আন্দু যখন কাহাকেও কিছু দান করিত, তখন হাতে রাখিয়া করিতে পারিত না, সুতরাং কয়েক দিনের মধ্যেই হাতটি প্রায় খালি হইয়া আসিল। ওদিকে হাইদরাবাদের সেই কর্ম্মকুশল যোদ্ধামহাশয় দশ বারো দিনেও পত্রের উত্তর দিলেন না। আন্দুরও তাহাতে যে আগ্রহ খুব বেশী ছিল, এমন কথা বলিতে পারা যায় না; হয় হবে,—না হয় না হবে,—তাহার ভাবখানা ঠিক এই রকম ছিল। সে ডোমপাড়ায় গিয়া মহা উৎসাহে ডোমযুবকদিগের সহিত মিলিয়া ঝুড়ি, চাঙ্গারী, চাঁচ, স্থপ, বুনিয়া, বনে বনে তাহাদের সহিত কটাশ্ উব্বিড়াল শীকার করিয়া, ছুটোপাটি করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। অবশ্য উব্বিড়াল-মৃগয়ায় তাহার যে অত্যন্ত আমোদ ছিল সেটা মনে করিতে পারা যায় না; সে শুধু এই নীচ সম্প্রদায়ের বে-আব্রু জীবনের সহিত মিশিয়া দাসত্বের কেতা-দুরস্ত আদবকায়দা-আবদ্ধ আড়ষ্ট নির্জ্জীব জীবনটা, গরীবের আব্‌হাওয়ায়, প্রাণের সজীব স্বাধীনতায়, নূতন করিয়া সুধ্‌রাইয়া লইতে আসিল; সে মনে মনে খুব জোর করিয়াই বলিল,—দম্ভের চেয়ে দীনতাই সুন্দর, লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে লক্ষ্মীছাড়ার সংসর্গই নিরাপদ; লক্ষ্মীমন্তের সংসর্গে মিশিতে গেলেই পায়ে মাথায় নিরন্তর বাধিতে থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

চীনদেশে ভারতবর্ষের প্রভাব

(চীনের প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য)

নান-চাও-ইয়ে-শীঃ অর্থাৎ দক্ষিণাঞ্চলের রাজাদিগের ইতিবৃত্ত।

বর্ত্তমান চীনসাম্রাজ্যের ভিত্তি বোধ করি এই প্রদেশ (ইউনান) হইতে আরম্ভ হইয়া থাকিবে। অতি সুদূর প্রাচীনকালে আয়ু (Ah-yu, পুরুরবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল আয়ু,—বিষ্ণুপুরাণ ৪,৮) নামক একজন রাজা ভারতবর্ষের মলিচিয়া (Mo-li-chei, মৌর্য্য ?) রাজ্য হইতে এদেশে আইসেন। রাজা আয়ুর এক পুত্র ছিল, তাঁহার নাম ছিল তি-মঙ্গ (Ti-mong)। তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে করিয়া এই প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অভিলাষে আসিয়াছিলেন। কালক্রমে তি-মঙ্গের নয়টি পুত্র জন্মে; এই পুত্রগণের এক-একজন কালক্রমে এক-একটি জাতির পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রথম পুত্র মঙ্গ-কু-ফু (Mong-Cu-Fu) ষষ্ঠ রাজ্যের (Sixth kingdom) রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, কিন্তু এই রাজ্য যে কোথায় ছিল তাহা আমি নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ। দ্বিতীয় পুত্র মঙ্গ-কু-লাইন (Mong-Cu-Lion) ঠু-ফান (Tu-Fan) বা তিব্বতীয় জাতির পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তৃতীয় পুত্র মঙ্গ-কু-লো (Mong-Cu-Lo) হান রেন বা চীনজাতীয় লোকের আদিপুরুষ ছিলেন। চতুর্থ পুত্র মঙ্গ-কু চাও (Mong-Cu-Chow) মানসী (Man-Tsi) জাতীয় লোকের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। পঞ্চম পুত্র মঙ্গ-কু-টু (Mong-Cu-Tu) মঙ্গলী (সম্ভবতঃ মঙ্গোলিয়ান) জাতির আদিপুরুষ ছিলেন। ষষ্ঠ পুত্র মঙ্গ-কু-টো (Mong-Cu-To) সিংহরাজ্যের (সম্ভবতঃ শ্যাম জাতির) পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। সপ্তম পুত্র মঙ্গ-কু-লোন (Mong-Cu-lon) আনামীদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। অষ্টম পুত্র মঙ্গ-কু-সং (Mong-Cu-Song) ইউ-নান প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসীগণের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। নবম পুত্র মঙ্গ-কু-ইউয়ে (Mong-Cu-Yueh) পা-ঈ বা সানজাতির পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। মিঃ ইয়াং চাই, চাও (chao) শব্দের অর্থ Prince বা রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই চীনের ভিন্ন ভিন্ন সম্রাটবংশের রাজত্বকালে এই প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইত, যথা :—

খ্রীঃ পূঃ ১১২২—২৪৬ বৎসরকাল যাবত চাও রাজবংশের শাসনকাল; ইহার নাম ছিল শান-ছান (Shan-Tsan), পে-য়াই (Peh-ai), কোয়েন-আর, (Kwen-erh) এবং টিয়েন (Tien)। হান রাজবংশের সময় খৃঃ পূঃ ২২১ পর্য্যন্ত; ইহার নাম ছিল সি-নান-ঈ (Sinan ih) এবং পে-ছে (Peh-Tsi)। শেষ হান বংশের কাল খ্রীঃ ২২১ পর্য্যন্ত; ইহাকে চিয়েন-নিং (Chien-ning) বলিত। ছিন-সং-লিয়াং (Tsin-son-leaing) এবং চেন (Chen) রাজবংশের সময়ে, খৃঃ ২৬৫ হইতে ৬১৮ খৃঃ পর্য্যন্ত, ইহাকে যথাক্রমে নিং-চাও (Ning-chow) এবং স্যোয়ে-কোয়েন-চাও (Swie-kwen-chow) বলিত। ৬৮৪ খৃঃ সম্রাট ওয়েন ছং (Wen-Tsong) ইহাকে শান-ছান-ফু (Shan-Tsan-Fu) আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ৯৬০ খ্রীঃ হইতে ১২২৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সুং (Sung) রাজবংশের সময়ে ইহার নাম হইয়াছিল নান-চাও (Nanchow)। ১২৮০ খৃঃ হইতে ১৩৬৮ খৃঃ পর্য্যন্ত টিয়েন (Tien) রাজবংশের সময়ে এই প্রদেশ চোং-কিন (Chong-kin) নামে অভিহিত হইত। মিং রাজবংশের সময়ে ইহার নাম হইল ইউ-নান (Yunnan)। এই নাম এখনও বাহাল আছে। এই প্রদেশের বর্ত্তমান নামের উৎপত্তি এই প্রকারে হইয়াছিল—একদা ৬৬০ খৃঃ কোন ব্যক্তি রাজা-মঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ (Grand Secretary) চাংকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "মহাশয়ের সম্মানিত দেশটি কোথায় ?" তাহার উত্তরে—চাং মহাশয় বলিয়াছিলেন যে "আমার হতভাগ্য দেশটি ইউ-নানে অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন দক্ষিণাঞ্চলে।" সেই হইতে এই প্রদেশ ইউ-নান নামে পরিচিত।

রাজ্যের আয়তন—এই প্রদেশের যে অঞ্চল ছয়জন রাজা কর্তৃক শাসিত হইত তাহার পরিমাণ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ৪০০০ লি এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ২৯০০ লি বিস্তৃত ছিল। * জেনেরাল ওয়াং-কোয়ে (Wang-

* ইংরেজী এক মাইল চীনের তিন লির প্রায় সমান।

kwie) ছি-ছোয়ান প্রদেশে শান্তিস্থাপন করিয়া ইউনান প্রদেশের এক মানচিত্র সংগ্রহ করিয়া ৯১৮ খ্রীঃ সম্রাট কাই-পাওর (Kai-pao) সম্মুখে উপস্থিত করিয়া ইউ-নান ও ছি-ছোয়ান প্রদেশের মধ্যে সীমা নির্দ্ধারণ করার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করেন। সম্রাট তাঁহার শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত কুঠার দ্বারা ইয়াং-ছি নদীর উত্তরাংশ টা-টু (Ta-tu) নদীকে এই দুই প্রদেশের মধ্যে সীমান্ত-চিহ্নরূপে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "এই নদীর অপর পারস্থ সমস্ত রাজ্য নান-চাও বা দক্ষিণাঞ্চলের রাজাদের রাজ্য বলিয়া গণ্য।"

অন্তর্গত খণ্ড রাজ্য—সর্ব্বপ্রথম কখন যে এই-সকল রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহার কোন তারিখ উল্লেখ নাই। রাজা মঙ্গ-সের (Mong-sheh) এলাকার সীমা ছিল য়ুং-ছাং-ফু (Yung-chang-fu) হইতে ইয়া-চাও (Ya-chow) পর্য্যন্ত। ইঁহার রাজ্য অপর পাঁচ রাজার রাজ্যের দক্ষিণে স্থাপিত ছিল। রাজা টেন-শিং (Prince Ten-Shing) টেন-ছোয়ান-চাও (Ten-Chwan-chow) নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেন; রাজা টিইয়ে-চের (Tieh-cheh) রাজধানী ছিল লি-কিয়াং-ফু (Li-kiang-Fu); রাজা মং-শী (Mong-Shi) (Ming-Yuen-Fu) মিং-ইউয়েন-ফুতে অবস্থিতি করিতেন। এই সহর এখন ছি-ছোয়ান প্রদেশের অন্তর্গত। রাজা লাং-খোং (Lang-kong) লাং-খোং-শিয়েন নামক নগরে অবস্থিতি করিতেন। এই-সকল রাজাদের বংশধরগণ ৭৩১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই-সকল অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। এই সময়ে টালীর রাজা পী-ল-কো (Pi-lo-ko) দুষ্টবুদ্ধি ও হিংসাপরবশ হইয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া অপর রাজাদিগকে সপুত্রঅগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত করিয়া হত্যা করেন। এই ঘটনা পরে বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইবে। সাঁয়ত্রিশ প্রকার মানসী (Man-Tsie) জাতীয় লোক এই প্রদেশের দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তে বাস করিত।

শাসনপ্রণালী (Government)—আইন প্রণয়ন, শাসন ও সৈনিক বিভাগের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য আট জন মন্ত্রী দ্বারা গঠিত এক সভা ছিল। নয় জন কার্য্য-নির্ব্বাহক কর্ম্মচারী (executive officer); মাণ্ডারিন কর্ম্মচারীগণের উপর একজন সভাপতি (President): জনসংখ্যাগণনার জন্য একজন কর্ম্মচারী; সৈনিক নীতি ও যুদ্ধকৌশল-শিক্ষার জন্য একজন উপদেষ্টা (Military instructor); জজ, পূর্ত্তবিভাগের কার্য্যের জন্য এবং বাণিজ্য বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য কমিশনার (Commissioner of Board of Trade), সরকারি শস্য-বিভাগের তত্ত্বাবধানের জন্য তিন জন কর্ম্মচারী; অশ্ব-সকলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট; গো-মহিষাদির সুপারিনটেণ্ডেণ্ট; রাজ্যের সকল সৈন্যের উপর একজন সেনাপতি (Commander-in-chief) এবং একজন কমিশরিয়াট অফিসার বা রসদবিভাগের কর্ম্মচারী ছিল। সমস্ত রাজ্যটি আটজন শাসনকর্ত্তার অধীনে আটটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। ইউং-ছাং-ফু (Yung-chang-fu) লি-চিয়াং-ফু (Li-kiang) প্রভৃতি সহরগুলি সেই-সকল গবর্ণরগণের অধীনস্থ রাজ্যের প্রধান নগর ছিল। হোয়ে-লী চাও (Hwie-li-cheo) এবং তোং-হাই-শিয়েন (Tong-hai-sien) নামক স্থানে এক-একজন ব্রিগেড্ জেনেরাল অবস্থান করিত। পঁয়ত্রিশ জন সৈনিক কর্ম্মচারী টালি-ফুর (Tali-fu) পূর্ব্বাঞ্চলে নানা স্থানে অবস্থান করিত। টালিফুর পশ্চিমাঞ্চলে মাত্র দু-জন সৈনিক কর্ম্মচারী বাস করিত। ইহাদিগকে অসীম বীরত্ব বা অসাধারণ কার্য্যসম্পন্নের জন্য রাজসরকার হইতে বহু মূল্যবান পরিচ্ছদ পুরস্কার-স্বরূপ প্রদত্ত হইত।

প্রাচীন চীনসাম্রাজ্য ছয়টি উপরাজ্যে বিভক্ত ছিল—(১) শান-ছান, ইহার কোনো অস্তিত্বপ্রমাণ এখন পাওয়া যায় না। (২) পেঃ-আই, ১৭৫০ খৃঃ সম্রাট শিয়েন-লিং কর্ত্তৃক এই স্থানের নাম হয় হুং-আই। ইউনান-ফু ও টালি-ফুর মধ্যে রাস্তার পার্শ্বে, টালিফু হইতে দুই দিনের পথ দূরে, এক উপত্যকার উপর হুং-আই স্থাপিত। ইহা এখন ১৫০ শত ঘর লোকের এক ক্ষুদ্র বসতিতে পরিণত হইয়াছে। (৩) কোয়েন-মি, এক্ষণে টিয়েন নামে পরিচিত। (৪) টিয়েন, ২০ খৃষ্টাব্দে এখানকার রাজা গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের রাজাদের আদেশে এখানে প্রচারিত ও গৃহীত হয়। (৫) পে-ছি, এই রাজ্যের লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। ভারতীয় রাজাগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম এই প্রদেশে প্রচারিত হয়। চীনসম্রাট মিং-টী (Ming-ti) ৬৬ খৃঃ

দূত প্রেরণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক আনিয়া চীনরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের বহু পূর্ব্বে, ভারতীয় রাজাগণ কর্তৃক এই ধর্ম্ম ইউনান প্রদেশে প্রচারিত ও চলিত হয়। এই রাজ্য সম্বন্ধে এক জনশ্রুতি আছে এই :—এই রাজ্যস্থাপনের পূর্ব্বে অতি প্রাচীন ভারতীয় রাজবংশের এক কুমার ভ্রমণকালে মেঘাবৃত হইয়া ঊর্দ্ধে নীত হন এবং তথায় স্বর্গীয় এক দেবকুমারীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহে তাঁহার তিন পুত্র জন্মে। প্রথম পুত্রের নাম চীনমা বা স্বর্ণ-অশ্ব, দ্বিতীয় পুত্রের নাম বা মণি-কুক্কুট এবং তৃতীয় পুত্রের নাম পে-ফান (Peh-fan) বা শ্বেত-তণ্ডুল—কেননা ইনি গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন, কেবল সাদা ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। তিনি টালি-ফু সহরে বাস করিতেন। এই রাজকুমারদিগের স্মৃতিচিহ্ন এখনও টালিফুতে আছে। টালি-ফুর লোকের নিকট ইনি তণ্ডুলভোজী শ্বেত-রাজা নামে পরিচিত ছিলেন। টালি-ফু সহরের নগর-প্রাচীরের উত্তর দরজা হইতে ৪ মাইল দূরে টি-শী পর্ব্বতের পাদদেশে সোয়াং-ইউয়েন গ্রামের পশ্চাৎ-ভাগে এক গিরিগুহার মুখে এই শ্বেত রাজার সমাধি স্থাপিত আছে। শ্বেত রাজার রাজপুরী সদর রাস্তার ধারে ছিল; টালিফুর অধিকারের পর গবর্ণর ছেন (Tsen) এই রাজবাটী ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার মালমসলা দ্বারা কনফুসিয়ান ধর্ম্মের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। চীনা বৎসরের তৃতীয় চান্দ্র মাসের ১৬ তারিখে প্রতি বৎসর প্রায় দুই শত সৈন্য তাহাদের সর্দ্দারের ও অন্যান্য কর্ম্মচারী-গণের সম্মুখে তিনবার বন্দুক আওয়াজ করিয়া এই শ্বেত-রাজার আত্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে, তাহার কারণ লোকের বিশ্বাস এই রাজার আত্মা অসন্তুষ্ট থাকিলে প্রজা-গণের মাঝে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া রাজ্যে অশান্তি উৎ-পাদন করিতে পারে। এই সময়ে এখানে এক প্রধান মেলা বসিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত হিন্দুরাজার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের স্মৃতিচিহ্ন ইউনান-ফু সহরের পশ্চিমে দুইটি পর্ব্বতের নামে রক্ষিত হইয়াছে। একটির নাম চীন মা বা স্বর্ণ-অশ্ব, অপরের নাম মণিকুক্কুট। এই-সকল কুমারদিগের অপর নাম, যথাক্রমে (১) ভুবন (Fu-pan) (২) যুবন্ত (Yuenteh) এবং (৩) সীত (Cite)। কি কারণে উক্ত রাজার পুত্রদিগের এইপ্রকার নামকরণ হইল তাহার প্রবাদ এই :—একদা রাজা যখন ইউনান-ফু সহরে বাস করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার একটি সুন্দর রক্তাভ কটা বর্ণের অশ্ব ছিল। ভুবন ও যুবন্ত উভয়েই এই অশ্বপ্রার্থী হইলে তাঁহা-দের পিতা উভয়ের বিবাদ মীমাংসার জন্য ঘোড়াটি ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন যে "যে এই অশ্বকে ধরিতে পারিবে, ইহা তাহারই হইবে।" ভুবন* এই অশ্ব পূর্ব্বপ্রান্তস্থ পর্ব্বতের উপর ধরিতে সমর্থ হয়। এই ঘটনার পর হইতে এই পর্ব্বতকে স্বর্ণ-অশ্ব-পর্ব্বত কহিয়া থাকে। একদা যুবন্ত এবং ভুবন পশ্চিমস্থ পর্ব্বতের উপর ভ্রমণকালে গ্রামের মধ্যে একটি অতি সুন্দর পাখী দেখিতে পান, তাহাকে তাঁহারা মণি-কুক্কুট বলিয়া চিনিতে পারেন। সেই হইতে এই পর্ব্বতের নাম হইয়াছে মণি-কুক্কুট পর্ব্বত। ইহার পর রাজা আয়ু এই তিন পুত্রের পিতা, ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার পুত্রগণ ইউনান প্রদেশে অবস্থিতি করেন। তিনি ভারতবর্ষে পৌছিয়া তাঁহার শ্যালককে কতকগুলি সৈন্যসহ তাঁহার পুত্রদিগকে দেশে ফিরিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রেরণ করেন। যখন এই দল ইউংচ্ছাং-ফু (Youngching-Fu) সহরে উপস্থিত হন, তখন পর্ব্বতস্থ অসভ্য জাতীয় লোক-সকল তাঁহাদের গতিরোধ করিলে তাঁহারা ভারতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। রাজার তিন পুত্রই ইউনান প্রদেশে দেহত্যাগ করেন। অতঃপর রাজা তাঁহার পুত্রত্রয়ের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ এই তিন পর্ব্বতের দেবতাস্বরূপ তাঁহাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট সুয়েন-টি (Suin-Ti) এই আখ্যান শুনিয়া ৭৩ খৃঃ এই তিন রাজকুমারের আত্মার পূজার্থ এক কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করেন।

বর্ত্তমান মিন-চিয়া বা -কিয়া জাতীয় (Min Kia) লোক এই পে-ছি রাজ্যের লোক। তাহাদিগকে পে-আর-ট্রী (Peh-errh-tri) বলে। উপরে যে রাজা আয়ুর কথা বলা হইল তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত আয়ুর মিত্র (মিতা) হইবেন।

(৬) চিয়েন-নিং, চিয়েং-নিং সহর রাজা চাং নিজে

---

* ক্লার্ক সাহেবের পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে সীত এই অশ্ব ধরে। কিন্তু সীত ত এই অশ্ব প্রার্থনা করে নাই; ভুবন ও যুবন্ত চাহিয়াছিল; ভুবনই উহা ধরে, কারণ উঁহারই নাম চীন-মা বা স্বর্ণ-অশ্ব।

নির্ম্মাণ করেন। এই পুরাতন সহরের বর্ত্তমান নাম মি-টু (Mi-tu), ইহা হুং-আই হইতে দশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। রাজা চাং, মারকুইস চুকো তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করায়, স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহার রাজধানীতে এক লৌহস্তম্ভ স্থাপন করেন। এই স্তম্ভ ধ্বংস করিয়া রাজা শিলং ৮৭০ খৃঃ তাহার স্থানে আর-একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। মিটু (Mi-tu) নামক স্থানে টিয়ে-কু-মিয়াও (Tieh-Cu Miau) নামক মন্দিরে উহা অদ্যাবধি রক্ষিত আছে। এই স্তম্ভ ৮ ফুট উচ্চ এবং ২ ফুট পরিধিবিশিষ্ট। বিদ্রোহী মুসলমানদলপতি টু-ওয়েন-শিন ইহাকে ধ্বংস করিতে মনস্থ করিয়াছিল কিন্তু কোন কারণ-বশতঃ এই কার্য্য হইতে বিরত হয়।

কিছুকাল পরে রাজা চাং তাঁহার রাজধানী চেন-কিয়াং-ফু (Chan Kiang-Fu) নগরে সরাইয়া লন। ইনি বত্রিশ পুরুষের আদি পুরুষ ছিলেন। এই বংশের সপ্তম পুরুষে চাং-লো-চিন (Chang-lo-Chin) সি-লু-লো (Si-lu-lo) নামক হিন্দুবংশের এক ব্যক্তিকে মং-ছোয়া সহরে দেখিতে পান। এবং সি-লু-লোর সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন। তি-মং রাজ্যের সর্ব্বপ্রথম নরপতি হইয়াছিলেন সি-লু-লো।

রাজবংশের তালিকা

(১) তা-মঙ্গ রাজবংশের তের পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করেন। রাজা সি-লু-লো তি-মঙ্গের পঞ্চম পুত্র মঙ্গ-ফু-টোর ষড়ত্রিংশ বংশধর। তাঁহার পিতার নাম সে-পাং (Sheh-Pang)। ইউং-চ্ছাং-ফু সহরে প্রায় ৬১৬ খৃঃ তাঁহার জন্ম হয়। কোন উপদ্রবের জন্য সপরিবারে তিনি তথা হইতে মং-ছোয়া-টিং সহরে গিয়া বাস করিয়া ওয়ে-পাও পর্ব্বতের নিকট কৃষিকার্য্য অবলম্বন করেন।

একদা এক বৃদ্ধ বৌদ্ধ-ভিক্ষু তাঁহার বাড়ীতে আগমন করিয়া কিছু তণ্ডুল ভিক্ষা চান। তাঁহার পত্নী নিজেদের অন্ন হইতে ভিক্ষুকে কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান করেন। গৃহিণী অতঃপর কন্যার সহিত ক্ষেত্রে গমন করিলে দেখিতে পান যে উক্ত ভিক্ষু তথায় এক বৃহৎ শৈলখণ্ডের উপর অতি আশ্চর্য্য ভাব ধারণ করিয়া ধ্যানমগ্নভাবে বসিয়া আছেন। সেই শৈলখণ্ড

টেঙ্গিয়ের পাদরী রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত জে ও ফ্রেজার।
ইনিই প্রথম হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্বের সন্ধান দেন।

এখনও বিদ্যমান আছে এবং লোকে এখনো এই উপাখ্যান আলোচনা করিয়া থাকে।

এই সময় হইতে সি-লু-লোর অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। তিনি রাজকীয় সৈন্যের কাপ্তান-জেনেরাল নিযুক্ত হন এবং কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করেন। তাঁহার জীবনে কতকগুলি এমন আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে যাহা দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে তিনি এক সময়ে একজন গণ্যমান্য লোক হইবেন। ৬৪৯ খৃঃ ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি এই তা-মঙ্গ বংশের প্রথম রাজা হন। তিনি মং-ছোয়া সহরের ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তাঁহার স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করিয়া তথায় এক নূতন নগর স্থাপন করেন। ৬৫৪ খৃঃ তিনি তাঁহার পুত্র চ্ছেন-জেনকে (Chein-Jen) সম্রাট ইউং-হোইর (Yong-hwei) নিকট প্রেরণ করেন। সম্রাট তাঁহাকে আদরে গ্রহণ করিয়া এক প্রস্থ মূল্যবান পরিচ্ছদ তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। এবং হোং-আই নগরে তাঁহাকে এক সরকারী পদে নিযুক্ত করেন।

চীনের টালিফু সহরের হিন্দুমন্দির।

তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া অপর পাঁচজন রাজাকে সপুত্র নিমন্ত্রণ করিয়া মংহোয়া সহরে উপনীত হইতে অনুরোধ করেন। তথায় তাঁহাদের ভারতীয় পূর্ব্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে চীন বৎসরের ৬ষ্ঠ চান্দ্র মাসের ৭৩১খ্রীঃ ২৪শে তারিখে উৎসবের আয়োজন করেন। তিনি এই উৎসব-কার্য্য সম্পন্নের জন্য দেবদারুকাঠের এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। তিনি নিমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গে অপর রাজাদিগকে ভয়-প্রদর্শন পূর্ব্বক জানাইয়াছিলেন যে যিনি এই উৎসবে যোগদান না করিবেন, তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। টেনছোয়ান-চাও নগরের রাজা উ-ছেন (U-Tsen)

সি-লু-লো রাজ-উপাধি-ধারণের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত শৈলখণ্ডের নিকট একদা গিয়া বলিয়াছিলেন যে "আমার যদি উচ্চপদ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে, এই প্রস্তরখণ্ডকে আমার তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ড করিতে সমর্থ হইব।" ফলতঃ যে কথা সে কার্য্য। তিনি যে তাঁহার তরবারি দ্বারা উক্ত প্রস্তরখণ্ড কর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য-স্বরূপ এখনও তাহাতে তিন ইঞ্চি গভীর চিহ্ন আছে। রাজা সি-লু-লো ৬৭৪ খৃঃ ২৬ বৎসর রাজত্বের পর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। (২) তাঁহার পুত্র ছেনজেন, তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। ৩৯ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ৭১২ খৃঃ তিনি পরলোক গমন করেন, এবং (৩) তাঁহার পুত্র ছেন-লো-পী (Chen-lo-pi) তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। ১৬ বৎসর রাজত্ব করার পর ৭২৯ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। (৪) তাঁহার পুত্র পী-লো-কো (Pi-lo-ko) তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৩১ বৎসর। তাঁহার পরের অপর পাঁচজন রাজার ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

চীনের টালিফু সহরের ত্রিচূড় হিন্দুমন্দির।

প্রথমতঃ যাইতে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে স্বীকৃত হন। তদীয় পত্নী ছি-শান (Tsi-Shan) এই নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাঁহার স্বামীকে এক লৌহবলয় হস্তে ধারণ করিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলে সমবেত হইয়া পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া পানাহার ও উৎসবাদিতে মত্ত হন। পী-লো-কো তাঁহা-দিগকে এত সুরাপান করাইলেন যে তাঁহারা নেশায়
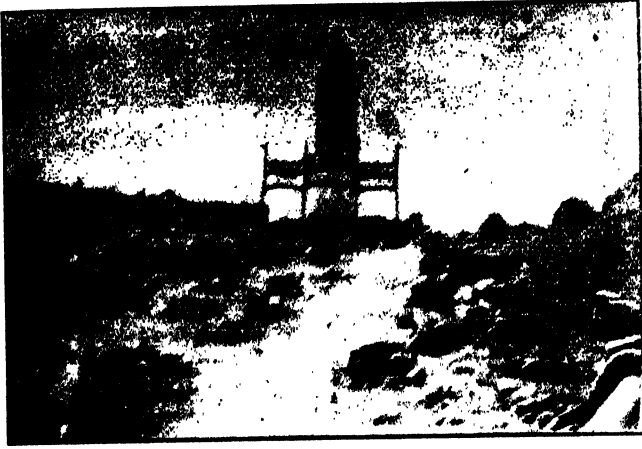
চীনের টালিফু সহরের একচূড় হিন্দুমন্দির।

৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে টে-ইউয়েন-ছেন নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটে। এই উভয় ঘটনা উপলক্ষে প্রতিবৎসর উৎসব হইয়া থাকে। ষষ্ঠ মাসের ২৪শে তারিখে যে অগ্ন্যুৎসব হইয়া থাকে তাহাকে হো-পা-চিয়ে (Ho-pah-chieh) বলে, এই উৎসব ইউনান প্রদেশ ভিন্ন চীনের অপর কোথাও হয় না। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে কৃষকেরা মশালহস্তে তাহাদের ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করে। কোন কোন গ্রামে খড় দ্বারা মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া কাগজের নিশান উড়াইয়া দিয়া সায়ংকালে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া উৎসব করিয়া থাকে। অগ্নি-সংযোগ করিবার

অভিভূত হইয়া অসাড় হইয়া পড়িলেন। সূর্য্য অস্তমিত হইলে তাঁহার আদেশ-মত সৈন্য দ্বারা মণ্ডপ পরিবেষ্টিত হইল, এবং তাহাতে অগ্নিপ্রদান করায় রাজাগণ সপুত্র অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন।

অতঃপর পী-লো-কো হত রাজাদিগের দগ্ধ অস্থিসকল লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাদের পত্নীদিগকে সংবাদ পাঠান। ইঁহাদের পত্নীগণের মধ্যে মাত্র ছি-শান তাঁহার মৃত স্বামীর হস্তের লৌহবলয় দেখিয়া স্বামীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, অপর কেহ তাঁহাদের স্বামীর দেহাবশিষ্ট চিনিতে পারেন নাই। ছি-শান তাঁহার স্বামীর দগ্ধ দেহের অবশিষ্ট লইয়া গিয়া সমাধি দেন।

ছি-শান পরমা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া পী-লো-কো তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। এবং তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। ছি-শান এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার নগর প্রাচীরের দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ দেন। অতঃপর সমবেত প্রজামণ্ডলীর সম্মুখে বলিলেন যে "আমি কি আমার স্বামীর নিষ্ঠুর হত্যার কথা ভুলিতে পারি? কখন না।" পী-লো-কোর সৈন্যগণ নগর অবরোধ করায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইল। তিনি স্বামীহন্তার হাতে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা আত্মহত্যা করা শ্রেয় বোধ করিলেন। চীনাবৎসরের ৭ম মাসের ২৩শে তারিখে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। টেন-চ্ছোয়ান-চাও নগরের

চীনের টালিফু সহরের হিন্দুমন্দির।

পর অল্পবয়স্ক বিবাহিত লোকেরা কাড়াকাড়ি করিয়া সর্ব্বোপরিস্থ নিশানটি লইবার জন্য ব্যগ্র হয়, কেননা তাহাদের বিশ্বাস এই যে, যে ঐ নিশানটি লইতে পারিবে, সেই বৎসরের মধ্যে তাহার পুত্র জন্মিবে। টালি সহরের

চীনের টালিফুসহরের নগরপ্রাচীরের তোরণ।

লোকে বাঁশের গুচ্ছ দ্বারা মশাল প্রস্তুত করিয়া বাড়ীর চতুর্দ্দিকে দৌড়িয়া বেড়ায়। তাহারা মনে করে যে এই কার্য্য দ্বারা আগামী বৎসরের উৎসব পর্য্যন্ত পরিবারমধ্যে কোন ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারিবে না। কোন বন্ধুকে সম্মান দেখাইতে হইল এই প্রজ্বলিত মশাল দ্বারা হাওয়া করিয়া থাকে। টালি-ফু হ্রদের ধারের গ্রামসকলের লোক ৭ম মাসের ২৩শে উৎসব করিয়া সতী ছি-শানের মহৎদৃষ্টান্ত ঘোষণা করিয়া থাকে।

পী-লো-কো টালিফু ও ইউনান প্রদেশে অনেকগুলি নগর নির্ম্মাণ করেন। বিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ৭৪৯ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র কো-লো-ফোং (Ko-lo-Fong) তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এই সমস্ত প্রদেশে চীনসম্রাটের অধিকার বহুদিন পর্য্যন্ত নাম মাত্র ছিল। হিন্দু রাজা কো-লো-ফোং বহুবার চীনের সম্রাটকে পরাজিত ও অপদস্থ করেন।

কো-লো-ফোং সম্রাটের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এক প্রকাণ্ড প্রস্তরফলক স্থাপন করেন। চোন-হুই নামক ব্যক্তি লিপির মুসাবিদা করেন এবং প্রস্তরের উপর লেখেন উ-শী। ক্লার্ক সাহেব বলেন যে তিনি যত প্রস্তর-ফলক দেখিয়াছেন এই ফলক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই ফলক শিয়া-কোয়ান হইতে টালি যাইতে রাস্তার ধারে, প্রায় তিন মাইল দূরে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে স্থাপিত। ইহা এখন ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা ১৪ ফুট লম্বা এবং ২ ফুট পুরু প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার উভয় পৃষ্ঠে লেখা আছে, তবে অনেক অক্ষর এখন আর স্পষ্ট দেখা যায় না। ইহাকে নাল-চাও-পেই বা দক্ষিণাঞ্চলের সকল রাজাদিগের স্মৃতিচিহ্ন বলে।

এই বংশের ত্রয়োদশ পুরুষ ২৫৫ বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করেন।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় রাজবংশের রাজত্ব এই হইতেই শেষ। হিন্দুরাজবংশের রাজাগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া যে রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, তাহা যদিও বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসকার্য্য দ্বারা রাজসরকারের ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, তথাপি রাজ্যশাসন-প্রণালী পূর্ব্ববৎ স্বাধীনভাবেই ছিল। এই রাজ্যের শেষ হয় মোগল অধিকারের পর। কুবলাই খাঁ এই প্রদেশ জয় করিয়া চীনসাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পরবর্ত্তী রাজাদের ধমনীতেও প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ভারতীয় নৃপতিগণের রক্ত প্রবাহিত ছিল।

পাঠকেরা ইউনান-প্রদেশের হিন্দুরাজাদের নাম দেখিয়া চিনিতে পারিবেন না যে তাঁহারা হিন্দু বা ভারতবর্ষীয় ছিলেন। কিন্তু দেশ-ভেদে শব্দ এমন বিকৃত হইয়া পড়ে যে তাহার রূপ দেখিয়া চেনা দুষ্কর হয়। চীনে ব্রাহ্মণ শব্দের উচ্চারণ ব্রোমেন; শাক্যমুনি -শীর্চ্য-ম্যুনি হইয়াছে। আমার নাম চীনাদের কাছে কুং-শীর-হৌ।

এই প্রদেশে খৃষ্টজন্মের সমসমকাল হইতে দশ শতাব্দী কাল হিন্দুবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার সাক্ষ্যরূপে বহু হিন্দুমন্দির ও দেউল এখনও বর্ত্তমান আছে। রাজা ফং-য়োঃ ৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিচূড়মন্দিরের সংস্কার করেন; টালিফুর নিকটে ইহ্-তা-ছে বা একচূড় মন্দির সংস্কৃত-লিপি-খোদিত ইষ্টকে তৈয়ারি।

হিন্দুরাজা ইয়ং-সিয়া-ইঃ ৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউনানফু সহর প্রাচীরে বেষ্টিত করেন। ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুরাজা পি-লো-কো টালিফু সহর প্রাচীরে বেষ্টিত করেন।

আমি ছুটির দরখাস্ত করিয়াছি। ছুটি পাইলে স্বয়ং হিন্দুপ্রাধান্যের তীর্থভূমি পর্য্যটন করিয়া স্বচক্ষে সমস্ত হিন্দুকীর্ত্তি ও হিন্দুরাজত্বের সাক্ষ্য দর্শন করিব মনস্থ করিয়াছি।

টেঙ্গিয়ে, চীন।　　শ্রীরামলাল সরকার।

তাঞ্জোর—চোলবংশের প্রাচীন রাজধানী

দক্ষিণভারতের ইতিহাসের মালমসলার অনুসন্ধানে যাঁরা প্রবৃত্ত তাঁদের জন্য এদিকে খুব বিস্তৃত ক্ষেত্রই রহিয়াছে। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছেন বটে, তবু এখনো এমন একজন লোকের দরকার যিনি

তাঞ্জোর দুর্গের এক কোণ।

গোপুরম।

বিচিত্র কাহিনী ও কিম্বদন্তীর দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্যটি আবিষ্কার করিবেন। কাবেরীর তীরবর্ত্তী তাঞ্জোরের সুবৃহৎ নগরীটিতে উপস্থিত হইবামাত্র চারিদিকে পুরাকালের জাগ্রত স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখিয়া মনে হয় যেন সেই সুদূর ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এককালে এগুলির কি গৌরব ও গরিমার দিন গিয়াছে, তাই আজ তাহা আবার প্রাচীনের বিচিত্র দৃশ্য- ও ঘটনাপরম্পরায় অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠে। তাঞ্জোরের সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক তথ্যগুলি নির্দ্ধারণ করা দুরূহ এবং উহার অনেক বিষয় বিশেষজ্ঞ ব্যতীত আর কাহারো নিকট আদরণীয় হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা এই প্রাচীন অবশ্যদর্শনীয় স্থানটির মোটামুটি ইতিহাস এইখানে সংক্ষেপে বলিব।

তাঞ্জোরের সহিত চোলবংশেরই সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কারণ তাঞ্জোরের যা-কিছু কীর্ত্তি ও প্রতিপত্তি প্রায় সবই চোলদের সময়েই। কিন্তু দশম কি একাদশ শতাব্দীর

দুর্গের বহিঃপ্রাকার।

পূর্ব্বেকার চোলদের কোনো ইতিহাস বড়-একটা পাওয়া যায় না। দু-একজন ঐতিহাসিকের ঐকান্তিক গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারতে তাঞ্জোরের প্রভাব প্রতিপত্তি ও চোলবংশের আরো অনেক অনাবিষ্কৃত নূতন জিনিস বাহির হইতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প হইলেও অন্তত কতকগুলি বিষয় আমরা ঠিক বলিয়া অবাধে ধরিয়া লইতে পারি। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভের গ্রীক-ঐতিহাসিকদের লেখায় চোলদের উল্লেখ দেখা যায়। তখন তাহাদের রাজধানী ত্রিচিনপল্লীর নিকটে ছিল। তাহার পর আরো দুটি স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর অবশেষে তাঞ্জোরে রাজধানী স্থাপিত হয়। মুসলমানদের সময়ে মালিক কাফুরের আক্রমণের দ্বারা চোলাবংশ খুব একটা আঘাত পায়, কিন্তু তাহারও অনেক দিন পরে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগর দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য লাভ করে। কিছুকাল ধরিয়া এই দুটি শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকে। অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে চোলগণ বিজয়নগর-রাজ্যকে প্রধান স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। কেউ কেউ বলেন যে চোল ও পাণ্ড্যদের মধ্যে বিবাদই ইহার কারণ এবং এই কলহে পাণ্ড্যরা বিজয়নগরের রাজাকে পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করে। বিজয়নগর পাণ্ড্যদের সাহায্যের জন্য প্রতিনিধি পাঠান ও তাহার পর হইতেই চোলদের শক্তিতে ভাঙন ধরিতে সুরু করে। চারজন নায়ক পর্য্যায়ক্রমে এখানে বিজয়নগর-রাজের প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন---অবশেষে শেষ প্রতিনিধি মদুরার নায়ক কর্ত্তৃক নিজের দুর্গের মধ্যেই আক্রান্ত হন। নায়ক যখন দেখিলেন যে জয়ের আশা বৃথা, কথিত আছে, প্রাসাদে আগুন লাগাইয়া তখন তিনি পুত্রগণের সহিত তরবারি হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া ঝাঁপ দেন ও বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণপাত করেন।

এ পর্য্যন্ত তাঞ্জোরের প্রাচীন কথাই বলা হইল।

তাঞ্জোরের রাজপ্রাসাদ।

এখনো ইহার সহিত ইংরেজের সংস্রবের কথা বলিতে বাকী আছে। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোরের সিংহাসনচ্যুত রাজার সাহায্যের জন্য যখন একদল সৈন্য পাঠান হয় তখন হইতেই ইহার সূত্রপাত। এই রাজাই সেই বীর নায়কের পুত্র। কিন্তু এ চেষ্টা বৃথাই হইয়াছিল। পরে মান্দ্রাজগভর্ণমেণ্ট যখন আর্কটের নবাব মহম্মদ আলির সহযোগে তাঞ্জোরের রাজাকে ঋণ পরিশোধ বা করদান এমনই কি একটা বিষয়ে বাধ্য করিবার জন্য অভিযান করেন—তাহারই ফলে তখন তাঞ্জোর ইংরেজের হস্তগত হয়। পরে উহা তাঞ্জোরের রাজাকে ফিরাইয়া দিলেও আসলে মহারাষ্ট্ররাই তখন উহার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রহিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঞ্জোরের দুর্গটি ইংরেজ আপনার দখলে লইয়া উহাতে সৈন্য সমাবেশ করেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে কিছু টাকা তাঞ্জোরের রাজাকে দেওয়া হইত। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সরভোজী তাঞ্জোর রাজ্য ইংরেজকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তাহার পরেই উহা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ঐ সন্ধিপত্র-অনুসারে ইংরেজ কোম্পানী তাঞ্জোরের রাজাকে রাজস্বের পঞ্চমাংশ পাঁচ লক্ষ পচিশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়। ১৮৩০ সালে রাজা সরভোজীর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র শিবাজী রাজা হন। ১৮৫৫ সালে তিনি অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। তখন রাজবংশের বিলোপ হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হয় ও সমস্ত রাজকীয় প্রভাব প্রতিপত্তি লোপ করিয়া দেওয়া হয়। তবে রাজার আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল এবং রাজার নিজস্ব যা-কিছু সম্পত্তি সমস্তই তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কিছু কাল তাঞ্জোরের Political Resident, রাষ্ট্রনায়কের দ্বারাই উহার শাসনকার্য্য চলিতে থাকে। পরে উহার শাসনভার একজন কালেক্টরের হাতে দেওয়া হয়। তাঞ্জোরকেই তিনি তাঁহার সদর কর্ম্মস্থান করেন।
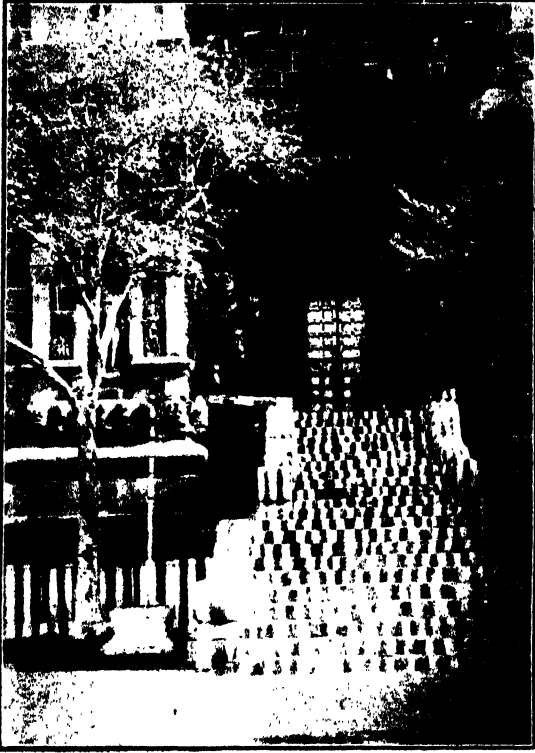
বিমানে যাইবার সোপান।

তাঞ্জোর যে অনেক দিন ধরিয়া রাষ্ট্রীয় ও সাহিত্য-শক্তির কেন্দ্র ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এখানকার মন্দির ও প্রাসাদের গায়ের অতুল্য কারুশিল্প দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে ভারতের স্থাপত্য এককালে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। যে বিপুল দেউলটির ফার্গুসন এত প্রশংসা করিয়াছেন—সেটি স্বতই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফার্গুসন এটিকে ভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দির বলিয়া প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে "এই মন্দিরটি একটি অতি সুগঠিত পদ্ধতি-অনুসারে আরম্ভ করা হইয়াছে ও বরাবর সেটি সুন্দরভাবে রক্ষা করা হইয়াছে। ইহার দুটি আঙিনা আছে; একটি ২৫০ ফুট সমচতুষ্কোণ। এটি ছোট ছোট দেবতাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ফরাশীরা এটিকে দুর্গে পরিণত করেন ও অস্ত্রাগাররূপে ব্যবহার করেন। সেই হইতে আর এটি দেবতার উদ্দেশ্যে কখনো ব্যবহৃত হয় নাই। আসল মন্দিরটি একটি সুসমঞ্জস আঙিনার মাঝখানে অবস্থিত। এটি লম্বে ৫০০ ফুট, প্রস্থে তাহার অর্দ্ধেক। তোরণদ্বার ও মন্দিরের মাঝখানে নন্দী-বৃষের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এটিও একটি বিশেষ উৎকৃষ্ট দেউল হইলেও ভিতরের আঙিনার প্রান্তে অবস্থিত বিমানটিকে ছাড়াইয়া উঠিবার মত অতটা নহে।" এই বিপুল বিমানটি ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যার একটি অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন। ইহার ভিত্তি-ভূমিটি ৮৪ ফুট সমচতুষ্কোণ এবং নীচের দিকটা দুতালা উঁচু এবং অতি সাধাসিধাভাবে গঠিত।

সুব্রহ্মণ্যদেবের মন্দির।

এই পত্তনভূমির উপর দেউলটি তেরো তালা পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া গিয়াছে—এবং ইহার নীচ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত ১৯০ ফুট। চূড়ার উপর একটি বিপুল পাথর। কথিত আছে যে এটি একটি পাঁচমাইল লম্বা হেলানো সমতলের উপর দিয়া
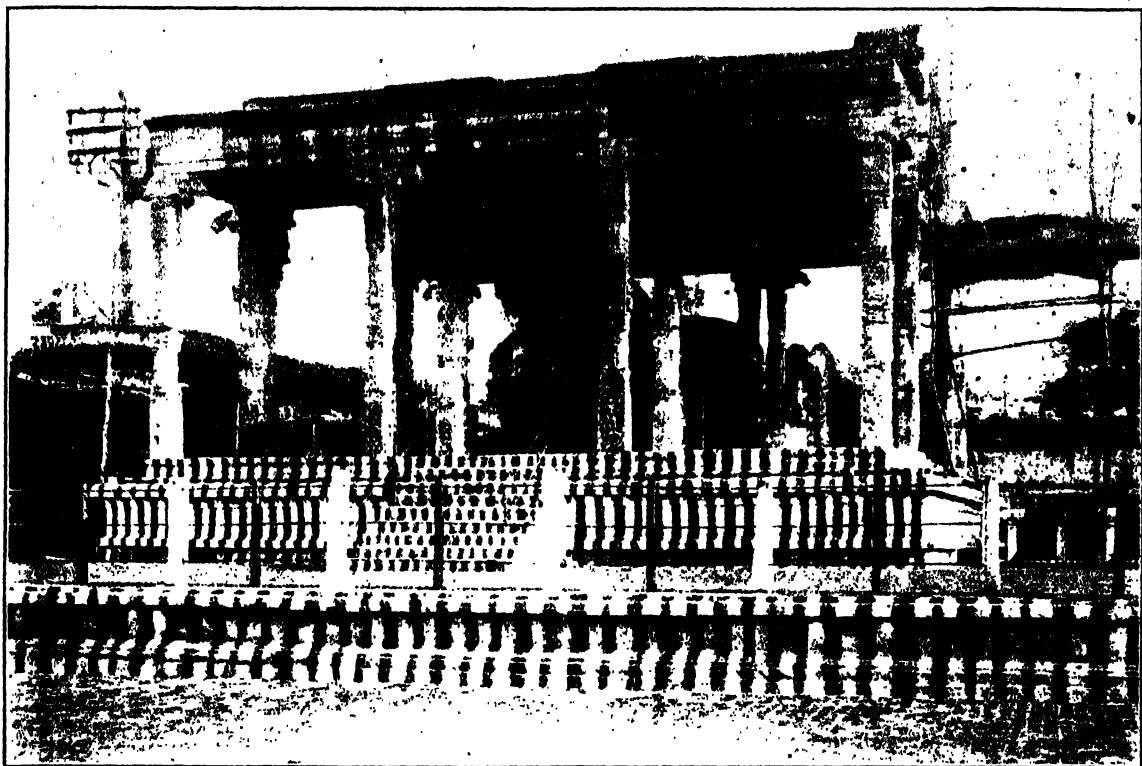
নন্দী-বৃষের মন্দির।

টানিয়া মন্দির-চূড়ায় উঠানো হইয়াছে। কারুশিল্পে মন্দিরটি অন্যান্য গোপুরমের উপর আপনার উৎকর্ষের ধ্বজা উড়াইয়া বিপুল গাম্ভীর্য্যে ও মহত্ত্বে দাঁড়াইয়া আছে।

এই মন্দিরে শিবলিঙ্গের পূজা হয়। তাহার চিহ্ন মন্দিরের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভবতঃ বাহিরের গোপুরমটি পরে গঠিত—ষোড়শ শতাব্দীতে যখন বৈষ্ণবধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল ও তাহার সহিত অনেক উপকথা ও কাহিনীর সংমিশ্রণ হইয়া গিয়াছিল—তখনকার। আসল মন্দিরটি সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়া একাদশে সমাপ্ত হয়। এই বিপুল গোপুরমের নিকটে সুব্রহ্মণ্য-মন্দিরটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। প্রাচীরগুলি চমৎকার কারুশিল্পে খচিত। এখানে একটি কৌতূহলজনক বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। গোপুরমের সবই বৈষ্ণবধর্ম্মের, কিন্তু ভিতরকার প্রাঙ্গণের সবই শৈবধর্ম্মের বিষয়ীভূত জিনিস। ফার্গুসন এই মন্দিরটির বর্ণনায় বলিয়াছেন যে "এটি দক্ষিণভারতের কারুশিল্পের আশ্চর্য্য নিদর্শন।" যখন তিনি প্রথমে এই মন্দিরটি দেখেন তখন এটিকে বৈষ্ণব মন্দির বলিয়া তাঁহার ধারণা হয়, কিন্তু পরে তিনি বুঝিতে পারেন যে এটি শুধু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিপুল উদারতার নিদর্শন। যেসময়ে ধর্ম্মের এক অঙ্গের সহিত আর-এক অঙ্গের বিরোধ ছিল না, এই মন্দিরটি সেই সময়কার। মন্দিরটি ছোট হইলেও বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার মত বটে।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সেনাপতি লালী যখন তাঞ্জোর অবরোধ করেন তখন মন্দিরের উপর কামানের গোলা বর্ষিত হয়। তাহার চিহ্ন আজও বর্ত্তমান আছে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজেরা এই নগর অবরোধ ও অধিকার করে। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া মন্দিরটি সেনানিবাসরূপে ব্যবহৃত হয়। পরে রাজা সরভোজী মন্দিরটি পুনরায় পবিত্র করিয়া দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

তাঞ্জোরের দুর্গ এখন সজ্জা-সরঞ্জামহীন। ব্রীটিশদের দুর্গটি দান করিবার অনেক দিন পর পর্য্যন্তও এটি তাঞ্জোরের
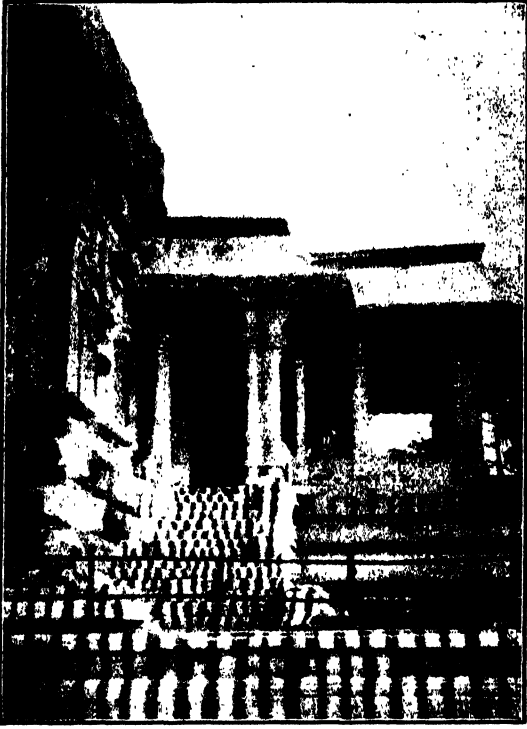
নন্দীশ্বরের মন্দির।

রাজাদের হাতেই ছিল। রাজপ্রাসাদটিও দেখিবার মত জিনিস বটে। তবে সেটি কতকটা মদুরার প্রাসাদের নকলে তৈরী—কিন্তু উহার মত অত উৎকৃষ্ট না। সতের খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্কজীর দ্বারা এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। কারুশিল্প প্রভৃতি মদুরা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। এটি এখনো তাঞ্জোরের রাজার পরিজনদের হাতেই আছে।

তাঞ্জোরে দেখিবার মত আরো অনেক জিনিস আছে। নিকটস্থ প্রকাণ্ড একটি পুষ্করিণীর কি বিশেষ একটা গুণ আছে বলিয়া প্রকাশ এবং তাহাতে কাহাকেও স্নান করিতে দেওয়া হয় না। নিকটস্থ ছোট গীর্জ্জা-ঘরটিতে পাথরের ফলকে বিখ্যাত মিশনরী শোওর্টজের কার্য্যাবলীর কথা লিখিত আছে। ইনি এই জেলায় অনেক দিন ধরিয়া কার্য্য করেন। নগরে অনেক সুন্দর সুন্দর পিতলের বাসনের দোকান আছে এবং রেশম ও কার্পেটের কারখানাও অনেক আছে। নগরের বাহিরে চারিদিকে খালের জাল—এবং ইহারই ধারে ধারে কতকগুলি উর্ব্বর ধানের জমি প্রচুর শস্য উৎপন্ন করে। যাঁরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ভালোবাসেন এবং সেই সময়কার ঘটনাবলী জানিতে উৎসুক, তাঞ্জোরে তাঁহারা আনন্দের অনেক জিনিসই পাইবেন।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

মনের বিষ

[তাম্রলিপ্তি নগর তখন মহামারীতে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। একদিন প্রভাতে শ্রেষ্ঠী হেমরাজ বেড়াইতে বাহির হইয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া সন্ন্যাসী কৃপাশরণ তাঁহাকে জীবন্ত সমাহিত করেন।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেবল স্বপ্ন, কেবল বিভীষিকা! কি তাহা, কেমন তাহা, স্মরণে নাই। শুধু আজিও তাহা মনে হইলে, আতঙ্কে বক্ষের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। মৃত্যু, সে যন্ত্রণা অপেক্ষা সুখের। সেই বুঝি জীবন্ত নরক,—প্রেতভূমি। প্রেতপুরীর কারাগারে আমার দেহখানি রাখিবার মত স্থানটুকুতে আমি বন্দী; চতুষ্পার্শ্বে অভেদ্য প্রাচীর! যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছি,—কখন এপাশ, কখন ওপাশ; বক্ষে পাষাণ-ভার; দৃঢ় প্রেতহস্ত সবলে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে; দম বন্ধ হইয়া প্রাণ যায়। প্রাণপণে পরিত্রাণের জন্য অবিরত চেষ্টা করিতেছি,—আর রক্ষা নাই! অবশেষে বহু চেষ্টা, বহু শ্রমের পর বিধাতা যেন সদয় হইলেন। জাগ্রত হইলাম,—মোহ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। চেতনা পাইলাম। হায়! ভগবান! কোথায় আমি? আমার পীড়ার কথা স্মরণ হইল। কোথায় সে মহাত্মা? কোথায় ত্রিবিক্রম? আমার জন্য তাহারা কি করিয়াছে? এ কোথায় আনিয়াছে? আমি ত মরিয়াছিলাম! সেই মহাত্মার ঔষধ কি এতক্ষণে ক্রিয়া করিল! ক্রমে বুঝিতে পারিলাম,—আমি কঠিন শয্যায় শয়ন করিয়া আছি। তাহারা কি আমার মস্তকের নিম্ন হইতে উপাধানটি পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে? কেন? কিসে আমার শ্বাস রোধ করিতেছে? বায়ু—বায়ু—বায়ু বিনা প্রাণ যায়। হস্ত উত্তোলন করিলাম,—এ কি! একটা কঠিন বস্তুতে হস্ত বাধা প্রাপ্ত হইল। স্পর্শের

দ্বারা বুঝিলাম, আমার চতুষ্পার্শ্বে কাষ্ঠপ্রাচীর। সত্য বিদ্যুতের মত মুহূর্ত্তে আমার মনে দেখা দিল! তবে কি আমি প্রোথিত—জীবন্ত অবস্থায় সমাহিত? এ কাষ্ঠ-কারাগার নিশ্চয়ই শবাধার। কি ভয়ানক! আমার তৎকালের মনের অবস্থা বর্ণনার ভাষা নাই। আতঙ্কে, আশঙ্কায়, নৈরাশ্যে, অসহায় অবস্থায় আমাকে উন্মত্ত করিয়াছিল। উন্মত্তের ন্যায়ই সজোরে মুষ্ট্যাঘাতে শবাধার উন্মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। আমার নিষ্ফলতা আমাকে অধিকতর দুর্দ্ধর্ষ ক্রোধান্ধ করিতেছিল। হস্ত পদ সমভাবে প্রাণপণ বলে ছুড়িতেছিলাম। অবশেষে কড়াৎ করিয়া শবাধারের একপার্শ্ব ভাঙ্গিয়া গেল। অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া শবাধার হইতে বহির্গত হইলাম। দেহ ঘর্ম্মাক্ত,— অত্যন্ত হাঁপাইতেছিলাম। আবার এখন নূতন চিন্তা, প্রাণান্তক আশঙ্কায় আমাকে অবসন্ন করিল। শবাধার হইতে মুক্তিলাভ করিলাম যেন, মৃত্তিকায় যদি প্রোথিত হইয়া থাকি তবে শবাধার যে, সমাধিগহ্বরও তাহাই, উভয়ই তুল্য। ভূগর্ভে আহার পানীয় বায়ুর অভাবে, এ ঘোর নরকে মৃত্যু আমাকে তিলে তিলে গ্রাস করিবে! কি শোচনীয় মৃত্যু! কি কঠোর শাস্তি! আবার ক্ষিপ্তপ্রায় হইলাম। দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলাম; পড়িয়া গেলাম, প্রস্তরপ্রাচীরে আমার মস্তক ঠেকিল। আঘাত পাইলাম, কিন্তু আশান্বিত আবিষ্কারে আমার বেদনা পরীক্ষার অবসর ছিল না। আমি তবে মৃত্তিকায় প্রোথিত নহি, প্রস্তর-নির্ম্মিত কোন সমাধি-গুম্ফায় সমাহিত। হে ঈশ্বর! দেহে জীবন থাকিতে কোন আকস্মিক ঘটনার বলেও ইহা কি উন্মুক্ত হইবে না? পূর্ব্ব ঘটনা একে একে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলাম। আমি পীড়িত হইয়াছিলাম। হয় ত আমি অসহ্য যন্ত্রণায় অজ্ঞান হইয়াছিলাম,—নাড়ীর গতি থামিয়া গিয়াছিল। তাহারা আমাকে মৃত স্থির করিয়া জীবন্ত সমাহিত করিয়াছে! নগরবাসীর মনের যে অবস্থা, মারীগ্রস্ত দেহকে সত্বর অপসারিত করিয়া সংক্রামক রোগ-বীজ হইতে পরিত্রাণ পাইবার যে চেষ্টা, তাহাতে ধীরভাবে স্থিরচিত্তে আমার শেষপরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছিল কি না সন্দেহ। এই শবাধারই তাহার অন্যতর প্রমাণ। তাড়াতাড়ি কোন ক্রমে কয়েকখানি পাতলা তক্তা একত্র করিয়া কয়েকটি তারকাঁটার সাহায্যে শবাধার নির্ম্মিত হইয়াছে। ধন্য ঈশ্বর! সুদৃঢ় শবাধার হইলে আমার দশা কি হইত! তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু আমি এখন কোথায়? সেই মহাত্মাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম আমি শ্রেষ্ঠী-পরিবারের একমাত্র সন্তান। তিনি খুব সম্ভব তাঁহার শেষ কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখেন নাই। শ্রেষ্ঠী-বংশের সমাধিগুম্ফায় আমাকে সমাহিত করিয়াছেন। এখনও তাই আমি নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারিতেছি। শ্রেষ্ঠী-সমাধি-গুম্ফা! পিতার শব, মহা সমারোহে সমাহিত করিতে আর একদিন এখানে আসিয়াছিলাম। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই এখানে মহানিদ্রায় নিদ্রিত! তাঁহাদের কথা স্মরণ হইয়া ভক্তির উদ্রেক হইল না:—ভয়ে শরীরের প্রতিলোম দণ্ডায়মান হইল। অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব আমার চতুষ্পার্শ্বে অনুভব করিতে লাগিলাম; তাহাদের শীতল নিশ্বাসের স্পর্শে আমার হৃদয়-শোণিত জল হইয়া গেল। প্রেতকুল! ঐ যে হা হা করিয়া হাসিতেছে! কি বিকট মূর্ত্তি! মাংসহীন কঙ্কালদেহ! চক্ষুহীন অক্ষিকোটর হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে! ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। মার কথা মনে হইল।—মা—মা! তুমিও না এখানে?—স্নেহময়ি! অসহায় সন্তানকে কোলে তুলিয়া লও; রক্ষা কর মা!

ঢং ঢং ঢং—এক, দুই, তিন, চারি—বারটা! মন্দিরের ঘড়িতে বারটা বাজিল। বেলা দ্বিপ্রহর, না রজনী? প্রাতে আমি পীড়িত হই। দিবসের মধ্যেই বোধ হয়, আমার সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছিল। রজনীর দ্বিপ্রহর হইবে। বহির্জগতের ঘণ্টাধ্বনি পাতালে প্রবেশ করিয়া আমার মনকে জগতের দিকে টানিয়া লইয়া গেল। মনে হইল, এখনও আমি জগতের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ-বিরহিত নহি। একটু যেন শান্ত হইলাম। কোন দিনই আমার স্নায়ু দুর্ব্বল নহে, অবস্থা আমাকে ভীরু করিয়াছে। সাহস সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলাম। বিবিধ প্রকারে মনকে প্রবোধ দিলাম। নতজানু হইয়া করজোড়ে উচ্চস্বরে ডাকিলাম, "মঙ্গলময় পিতা! দয়াময় ভগবান! বিশ্বজগতকে তুমি রক্ষা করিতেছ। অধম সন্তানকে ক্ষমা কর,—রক্ষা কর প্রভু!"

'পিউ কাঁহা' বলিয়া পাপিয়া পাখী গাহিয়া উঠিল। আমার চিরপরিচিত স্বর! তাহার মাধুর্য্যে সকল বিপদ ভুলিয়া গেলাম। স্বর্গের বাণী—প্রাণের আশ্বাস সে স্বর বহন করিয়া আনিল। সেই সঙ্গে আর একটি পাপিয়ার কথা স্মরণ হইল। নীলা—নীলা আমার প্রাণের নীলা! এতক্ষণ কি আমার মৃত্যুসংবাদ তাহার নিকট পৌঁছিয়াছে? না জানি সে শোকে কত কাতর হইয়াছে! তাহারও প্রাণ এই পাপিয়ার মত এমনি করিয়া 'পিউ কাঁহা' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে! তাহার আজ কি কষ্ট! নীলার একখানি ক্ষুদ্র চিত্র আমার বক্ষে সর্ব্বদা থাকিত। মৃতের দেহ হইতে নিশ্চয় তাহা স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বক্ষে হস্ত বুলাইয়া দেখিলাম: না—তাহা যেমন ছিল, তেমনি আছে। মারী রোগীর অভিশপ্ত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করান হয় নাই। যে বেশে ছিলাম, সেই বেশেই সমাহিত হইয়াছি। ফলকটি হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলাম,—তাহাতে আমার প্রিয়তমার চিত্রের পার্শ্বে কন্যার আলেখ্য বিরাজ করিতেছে। এ নরকেও তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করে নাই!

পরিজনের কথা স্মরণ হইবা মাত্র বাঁচিবার ইচ্ছা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। কি করিলে রক্ষা পাই—কে আমাকে উদ্ধার করিবে! পাপিয়া তেমনি স্বরে গাহিতেছিল 'পিউ কাঁহা'। তাহার স্বর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। নিশ্চয় সেই দেবদূত গুম্ফার অতি নিকটে কোনও বৃক্ষে বসিয়া সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিতেছে। মনে পড়িল পিতার সমাধির কালে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া এই সমাধি-অঙ্গনে উপনীত হইয়াছিলাম। কিন্তু কোথায় সে সোপান? সূচীভেদ্য অন্ধকার; সোপান কিরূপে আবিষ্কার করিব? অতি কষ্টে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিতে লাগিলাম। কতবার হুঁচোট খাইলাম বলিতে পারি না। অবশেষে একটা উচ্চ বস্তু হাতে বাধিল। আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "এই যে সিঁড়ি।" সোপান কোথায়? সোপান কি এত উচ্চ হয়? হস্ত বুলাইয়া বুঝিলাম—কি যেন একটা কোমল বস্তু। মৃতদেহ নয় ত? শরীর শিহরিয়া উঠিল। পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইলাম। শব! পরক্ষণেই মনে হইল, শব হইলেই বা আমার ক্ষতি কি। কিসের ভয়? এখন আমি নিজে শব ব্যতীত আর কি! না, শব নয়—মৃতদেহ কেন এরূপ ভাবে পড়িয়া থাকিবে? শব শবাধারে রক্ষিত থাকে। শব নয়—হয়ত শবাধার; কোমল বস্তুটি বোধ হয় তাহার মকমলের আবরণ। সাহস পাইলাম। আবার পথ খুঁজিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সহসা একটা পেচক বিকট চীৎকার করিল। চমকিয়া উঠিলাম, ভীত হইলাম না। আমার তাৎকালীন অবস্থায় পেচকের স্বরেও সাহস দিতেছিল, মুক্তির আশ্বাস দিতেছিল। মাথার উপর দিক হইতে সে স্বর আসিতেছিল। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; দেখিলাম,—চন্দ্রকরোজ্জ্বল মেঘরাশি সুদূর গগনে ভাসিয়া যাইতেছে। গুম্ফার গম্বুজের পার্শ্বে বায়ুপ্রবেশের জন্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল, তাহার ভিতর দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছিল। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে কি আনন্দের আবির্ভাব হইল, ভগবান জানেন; মুগ্ধ প্রাণে অনিমেষ নেত্রে, বিভোর হইয়া মেঘের খেলা দেখিতেছিলাম। কতক্ষণ জানি না। ধীরে ধীরে গবাক্ষ-পথ দিয়া চন্দ্রকর, বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত, গুম্ফার মধ্যে প্রবেশ করিল। আলোক অতি ক্ষীণ; অমন দুর্ভেদ্য অন্ধকার দূর করা তাহার সাধ্যাতীত। তবুও যে স্থানে আলোক পতিত হইয়াছিল, তথায় শত বাধা অতিক্রম করিয়াও ছুটিয়া চলিলাম। সোপানশ্রেণীতে আমার পা ঠেকিল। জগদীশ, রক্ষা করিলে! অতি সন্তর্পণে এক-একটি সোপান-বেদিকা অতিক্রম করিয়া গুম্ফাদ্বারের প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলাম। ইহারই বহিঃপ্রাচীরে গুম্ফাদ্বার। চন্দ্রকর সেই স্থানে পতিত হইয়াছে। দ্বারে সজোরে আঘাত করিলাম। লৌহদ্বার রুদ্ধ! নিরাশায়, ক্রোধে নিজের দেহ নিজেই ছিন্ন ভিন্ন করিতে ইচ্ছা হইল। নিরুপায়! প্রাণপণে চীৎকার করিলাম; আমার স্বর প্রতিধ্বনিরূপে আমারই নিকটে ফিরিয়া আসিল। অবসন্ন দেহে, ক্ষুণ্ণ প্রাণে বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ সে ভাবে কাটিয়াছিল জানি না। সহসা একটি শুভ্র বস্তুর উপর দৃষ্টি পতিত হইল। চন্দ্রকিরণে তাহা উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। তুলিয়া লইলাম; কতকগুলি মোমবাতি। যাহারা সমাহিত করিতে এই অন্ধকার গুম্ফায় নামিয়াছিল তাহারা ফেলিয়া গিয়াছে। মোমবাতি হস্তে লইয়া চকমকির কথা মনে হইল। হাতড়াইতে হাতড়াইতে

সেইখানে চকমকিও পাইলাম। বড় আনন্দ হইল, প্রকাণ্ড রাজ্যলাভ করিলেও বোধ হয় কেহ অত সুখ অনুভব করে না। মোমবাতি ধরাইলাম। আলোক,—প্রাণের আশা, হৃদয়ের বল,—স্বর্গীয় সুধা! অতক্ষণ সূচীভেদ্য অন্ধকারে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগের পর আলোক পাইয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। আমার স্বাভাবিক সাহস ফিরিয়া আসিল। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম। পরিত্রাণের পথ নাই। সম্মুখে লৌহদ্বার,—বহির্ভাগ হইতে বন্ধ। তাহাতে নিরাশ না হইয়া মনকে প্রবোধ দিলাম। দিবস হোক, উপায় আপনি হইবে। কোন কঠিন বস্তুর সাহায্যে লৌহ-কপাটে আঘাত করিব। লৌহপত্রের উচ্চ শব্দে, সমাধি-রক্ষক, সমাধি-উদ্যানের মালী বা অন্য কাহাকেও কি আকৃষ্ট করিতে পারিব না। অদৃষ্ট-দোষে তাহাও যদি না পারি, শবাধারের লৌহ-শলাকা দিয়া প্রাচীর ভেদ করিব। বাতি হস্তে লইয়া উঠিলাম। সময় বৃথা নষ্ট করিয়া কি হইবে। কিন্তু একটি ঔৎসুক্য অনেকক্ষণ হইতে মনে জাগিয়াছিল, কিরূপ শবাধারে সমাহিত হইয়াছিলাম, তাহার উপরে কি লেখা ছিল, তাহা দেখিবার বটে। সাধ করিয়া আবার সেই প্রেতভূমিতে, বিভীষিকার রাজ্যে ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলাম।

ঔৎসুক্য-মাদকতা মানুষকে উন্মত্ত করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আবার সমাধি-প্রাঙ্গণে, মৃতের মধ্যে আসিয়া দাড়াইলাম। মনুষ্যের আগমনে, আলোক দেখিয়া, অন্ধকারের, পাতালের প্রাণীরা ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কয়েকটি ইন্দুর আমার পায়ের নিকট দিয়া দৌড়াইয়া গেল। ছুঁচার দল চিকচিক শব্দে পলায়নপর হইল। চামচিকার দল ইতস্তত উড়িতে লাগিল। প্রেত-গণও বোধ হয় সেই সঙ্গে জাগ্রত হইয়াছিল।

দেখিলাম আমারই মৃত্যু-চিহ্ন শবাধারটি ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহা দর্শনমাত্র শরীর কাঁপিয়া উঠিল। কি ভীষণ যন্ত্রণা তাহাতে ভোগ করিয়াছি। শবাধারের চতুষ্পার্শ্বে অনেকখানি স্থান কর্ষিত হইয়াছে যেন। বুঝিলাম, মুক্তিলাভের জন্য কি অমানুষিক চেষ্টা, সাধ্যাতীত আস্ফালন আমাকে করিতে হইয়াছিল। শবাধার পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, উহা অতি সাধারণ দেবদারুকাষ্ঠের বাক্স; কারুকার্য্যের তাহাতে লেশ মাত্র নাই। উপরে কেবল লেখা আছে, "শ্রেষ্ঠী হেমরাজ"।

নিকটেই পিতার শবাধার—কত যত্নে, কত অর্থ ব্যয়ে প্রধান প্রধান শিল্পীর দ্বারা বহুমূল্য কাষ্ঠে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু কোথায় এখন তাহার সৌন্দর্য্য? মৃত্তিকার শৈত্যে, কীটের অত্যাচারে তাহা শ্রীহীন হইয়াছে। তাহার পার্শ্বে আমার স্নেহময়ী মাতৃদেবীর শবাধার। স্বর্গের দেবী আজ কত বৎসর হইল স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্নেহময়ী মূর্ত্তি এখনও আমার স্মৃতিপটে অস্পষ্ট ভাবে জাগ্রত রহিয়াছে। মা আমার! তোমারই শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে প্রথমে জগতের আলোক দর্শন করিয়াছিলাম; তোমার স্নেহে এ জীবন; আজ কি মা তোমার ক্রোড়েই তাহার শেষ হইবে? ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মাতার শবাধারের নিকট নতজানু হইয়া বসিলাম। মাতৃ-উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম। ডাকিলাম, "কোথায় আছ, মা আমার! সেই শৈশবকালে ছাড়িয়া গিয়াছ, এতদিনেও কি একবার অধম সন্তানকে মনে পড়ে না।" চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। তাহা মোচন করিলাম। উঠিতে যাইতেছি, এমন সময় অতর্কিত ভাবে, একটি অতি উজ্জ্বল বস্তুতে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। মোমবাতির আলোক তাহাতে পতিত হইয়া আলোকরশ্মির বিচ্ছুরিত জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, স্থানটি উজ্জ্বল প্রভায় দীপ্তিমান হইয়াছে। দ্রব্যটি কি দেখিবার জন্য নিকটে গেলাম। হীরক! সুনির্ম্মল হীরকে নির্ম্মিত একটি মল্লিকা ফুল, কয়েকটি ডিম্বাকৃতি নিটোল মুক্তা তাহাতে সংযুক্ত আছে। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলাম,—এরূপ মূল্যবান অলঙ্কার কিরূপে এখানে আসিল। নিকটেই দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড শবাধার। তাহার ডালাটি আল্গা। শবাধারের ডালা আল্গা! কারণ কি? শবাধার কেহ উন্মুক্ত রাখে না। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহার উপরে কিছু লেখা নাই। সম্ভ্রান্ত বংশের শব; তাহার পরিচয় লিপিবদ্ধ না করিয়াই সমাহিত করা হইয়াছে, কেমন কথা। সন্দেহ হইল। ঔৎসুক্য জন্মিল,—এরূপ দীর্ঘাকৃতি, আমার পূর্ব্বপুরুষ কে ছিলেন, দেখিতে হইবে। প্রকাণ্ড শবাধারের ডালা উন্মোচন

করিলাম। মোমবাতি তুলিয়া ধরিলাম। বিপুল বিস্ময়ে আমার অস্তিত্ব ভুলিয়া গেলাম। কোথায় ভীতি-উৎপাদক নরকঙ্কাল দেখিব বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহা না হইয়া এ কি অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যরাশি! কোনো রাজ্যেশ্বরও তাহা লাভ করিতে পারিলে নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন! পঞ্চাশটির অধিক সুবৃহৎ তোড়া স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ। কতকগুলি মুদ্রা ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। পার্শ্বে কয়েকটি শূন্য থলিয়া। মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া স্থানান্তরিত করিলাম। তাহার নীচে অলঙ্কাররাশি! সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত। হার, বাজু, মুকুট, অঙ্গুরী, নানাবিধ অলঙ্কার! বহুমূল্য রত্নস্তূপ—মণি, মাণিক্য, হীরক, মরকত, পদ্মরাগ, নীলকান্ত, চুনী, পান্না,—তাহার কোনটি বা মণিকার কর্ত্তৃক পরিমার্জ্জিত, কোনটি বা স্বাভাবিক অবস্থায় অবিকৃত। সকলগুলিই শ্রেষ্ঠত্বে সমকক্ষরহিত। তৎপার্শ্বে বিবিধ প্রকারের রেশম, পশম, মকমল প্রভৃতির কারুকার্য্যখচিত মূল্যবান বস্ত্রাদি। কর্পূর প্রভৃতি কীটনিবারক মসলার সাহায্যে সেগুলি সুরক্ষিত অবস্থায় পরিপাটী করিয়া রাখা হইয়াছে। ধাতুদ্রব্যের মধ্যে কয়েকখানা থালা, বাটি ইত্যাদি, কোনটি স্বর্ণের, কোনটি রৌপ্যনির্ম্মিত, শিল্পকলায় অদ্বিতীয়! মণিমুক্তাখচিত কয়েকখানি দর্পণ; হস্তীদন্তের নানাবিধ সামগ্রী। আরও কত কি মূল্যবান দ্রব্যে সিন্ধুকটি পূর্ণ! সিন্ধুক নয়, যেন উপন্যাসে বর্ণিত দৈত্যের ধনাগার! সেই ধনাগারের অধিকারী আজ আমি! এই অতুল, অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য সমস্তই আমার! আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। ক্ষণেকের তরে বিস্মৃত হইয়া রহিলাম—কি অবস্থায় আমি নিপতিত। আত্মদশা আবার স্মরণ হইল। এত ধন,—এত ঐশ্বর্য্যে আমার কি উপকার! হায়! ঐশ্বর্য্য! জীবনের সহিত তোমার সম্বন্ধ। বৃথা তোমার অহঙ্কার! যাহার জীবন নাই, তাহার কাছে তোমার কিছুই মূল্য নাই! হীরক ও মৃত্তিকায় তাহার নিকট বিভেদ কি?—তুল্য! আমি আমার সেই অমূল্য জীবন হারাইতে বসিয়াছি। আমার আর কি আছে! ক্ষোভে দুঃখে বসিয়া পড়িলাম।

ধমনীতে একবিন্দু রক্ত থাকিতে আশার বুঝি শেষ নাই। দুর্দ্দশার দুস্তর সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছি; আশা তথাপি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। আশা বলিল "কে বলে তোমার জীবনের শেষ! বিপদ হইতে উদ্ধারের কি পথ নাই? অবশ্য আছে।" আবার উঠিয়া সেই অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যরাশি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলাম; সেগুলি এখন আমারই। সিন্ধুকের ডালায় একটা রক্ত-চিহ্নের উপর দৃষ্টি পড়িল। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, রক্তচিহ্ন নহে, রক্তবর্ণে অঙ্কিত একখানি ছোরার প্রতিকৃতি। মনে পড়িল, এই সাংকেতিক চিহ্ন চোড়গঙ্গ রুদ্রদামের। ত্রাসে কাঁপিতে লাগিলাম। চোড়গঙ্গ সুপ্রসিদ্ধ দুর্দ্দান্ত দস্যু। রাজা পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে শঙ্কিত। তাহাকে ধরিবার জন্য লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। প্রায় প্রতি দিন তাহার অসমসাহসিকতার সংবাদ, অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া আসিয়াছি। এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার কেশ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই দস্যুর, নরঘাতকের এই ঐশ্বর্য্য। আমার জীবনও যে ঐ তরবারির আঘাতে শেষ না হইবে কে বলিবে! ভয়ে অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল!

আবার আশা। কতক্ষণ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আশায় হৃদয় বাঁধিলাম। চোড়গঙ্গ রুদ্রদাম? তাম্রলিপ্তিতে যাহার মস্তকের জন্য লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে, সে এ প্রদেশে এখন কোথায়? নিশ্চয় সে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া চোল রাজ্যে পলায়ন করিয়াছে। পলায়নের কালে তাড়াতাড়ি এ অতুল ধনরাশি সঙ্গে লইতে পারে নাই। কয়েক থলিয়া স্বর্ণমুদ্রা মাত্র, বোধ হয়, লইতে পারিয়াছে। সিন্ধুকের বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার প্রমাণ। তাহা না হইলে, মাত্র কয়েকটি থলিয়া খালি কেন, সিন্ধুকের ডালা খোলা কেন? হীরক-মল্লিকাই বা কেন মৃত্তিকায় পড়িয়া থাকিবে? এ-সকল অতি ব্যস্ততার নিদর্শন। ভাবিতে লাগিলাম, চোড়গঙ্গ কি করিয়া এ-সকল এখানে আনয়ন করিল। গুম্ফার একটি ব্যতীত দ্বিতীয় প্রবেশ-পথ নাই! তাহাও সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকে। আমার প্রাসাদে থাকে দ্বারের চাবি, দ্বিতীয় চাবি থাকে সমাধিরক্ষকের নিকট! তবে কি সমাধিরক্ষক চোড়গঙ্গের লোক! কি ভয়ানক! কিম্বা সেই ধূর্ত্তচূড়ামণি দস্যু, মৃতের সমাধিদান করিবার ছলে সিন্ধুকটি শবাধাররূপে রক্ষকের চক্ষে ধূলি দিয়া এখানে রাখিয়া গিয়াছে। তাহা হইলেই বা কেন অন্য বংশের শব আমার পারিবারিক গুম্ফায় সমাহিত হইবে?

তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতেছি; সহসা বাতি নিবিয়া গেল। চমকিয়া উঠিলাম; বাতি নিবাইল কে? চোড়গঙ্গ, না, প্রেত? ভয়ে কাঁপিতেছি আর চতুর্দ্দিকে চাহিতেছি। দেখি—প্রাচীরগাত্রে অতি সূক্ষ্ম আলোকরেখা। এও কি ইন্দ্রজাল! আবার বাতি জ্বালিলাম। বাতির জ্যোতিতে প্রাচীরগাত্রের আলোক অদৃশ্য হইল। বাতি আবার নির্ব্বাপিত করিলাম। প্রাচীরে আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিল। আলোক লক্ষ্য করিয়া প্রাচীরসন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। শীতল বায়ু গাত্র স্পর্শ করিল; বুঝিলাম, আমার বাতি কিসে নিবিয়াছিল। মোমবাতি জ্বালিয়া প্রাচীর পরীক্ষা করিলাম। প্রাচীরে একটি সূত্রবৎ ছিদ্র। আমার যতদূর সাধ্য জোরে সে স্থানে আঘাত করিলাম। নাতিবৃহৎ একখণ্ড কাষ্ঠ বহির্দিকে খসিয়া পড়িল। তখন ঊষা,—পূর্ব্বগগনে স্বর্ণ-আভা দেখা দিয়াছে। সেই সঙ্গে পরমকারুণিক পরমেশ্বর দীন সন্তানের উদ্ধারের জন্য নরক-গহ্বরে স্বর্গের আলোক প্রেরণ করিয়াছেন! একে একে চারিখণ্ড কাষ্ঠ স্থানচ্যুত করিলাম। মনুষ্যের গমনাগমনের উপযুক্ত একটি ছিদ্রপথ উন্মুক্ত হইল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া ছিদ্রপথে কোমল ঘাসের উপর লাফাইয়া পড়িলাম। আমি মুক্ত, স্বাধীন! মস্তকের উপরে আমার অনন্ত আকাশ! সম্মুখে সুপ্রসারিত বেলাভূমি; সুবিস্তৃত উপসাগর। ঊষার আলোকে প্রকৃতি হাসিতেছে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। চোড়গঙ্গকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। হোক সে নরঘাতক দস্যু, সমাজের মারী, আমার নিকট সে আজি জীবনদাতা দেবতা। যাহার প্রসাদে জীবন, স্বাধীনতা, নীলার প্রেম পুনরায় ফিরিয়া পাইলাম, সে আমার পরম প্রীতির পাত্র, প্রকৃত বন্ধু। তাহার অপকার আমার জীবন থাকিতে হইবে না।

নীলা! প্রিয়তমা! না জানি আমার বিরহে কত কাতর হইয়াছ; কিন্তু যখন জানিবে প্রিয়ে, সে বিরহ চিরবিচ্ছেদ নহে, কি আনন্দে তোমাকে অভিভূত করিবে! পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সহস্রগুণে প্রেমবন্ধনে আমরা বদ্ধ হইব; তোমার অমৃতময় প্রেমে আমি অদ্যকার এই অসহ্য কষ্ট বিস্মৃত হইব। আমার নিদারুণ যন্ত্রণার কাহিনী শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই তোমার নয়নে মুক্তাবিন্দু দেখা দিবে। আমি কিন্তু কাঁদিব না, আজ আমার আনন্দের দিন! চম্পা, প্রাণের চম্পা! পিতা তোমার মরে নাই। তোমার হাস্য দেখিবার জন্য সে জীবিত আছে। গোবিন্দ, প্রাণের বন্ধু! মৃত বন্ধুকে ফিরিয়া পাইয়া কি আনন্দই তুমি লাভ করিবে! এত সত্বর সে আনন্দ আমি তোমাদিগকে দিতেছি না। দেখিব আগে, পরমাত্মীয়ের বিয়োগে আত্মীয়গণ কিরূপে শোক করে। সুযোগ পাইয়াছি. প্রেমের পরিমাণ না করিয়া ছাড়িব না। ছদ্মবেশে দেখিব, তোমরা আমাকে কে কেমন ভালবাস। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিতেছি না। নিষ্ঠুর আমি। প্রিয়জনের দুঃখ দেখিয়া আমার আনন্দ! কিন্তু আজ যে প্রেমের পরীক্ষা!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সমাধি-গুম্ফায় পুনঃ প্রবেশ করিলাম। সেই ভীষণ স্থান এখন আমার নিকট আনন্দ-আলয়! ধনরত্ন যথাস্থানে সজ্জিত করিয়া রাখিলাম। কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা, কয়েকটি শ্রেষ্ঠরত্ন সঙ্গে লইলাম। হীরকমল্লিকাটি প্রিয়তমার উপযুক্ত উপহার, আমার পরিত্রাণের পথপ্রদর্শক, তাহা পরিচ্ছদের নিম্নে বক্ষে ঝুলাইলাম। সিন্ধুকের ডালা উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া একটি শবাধার টানিয়া আনিয়া তাহার উপর স্থাপন করিলাম। সেই কাষ্ঠ কয়েকখানি কুড়াইয়া লইয়া অতি সাবধানে ছিদ্রপথ বদ্ধ করিয়া দিলাম। গুম্ফার বর্ণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাষ্ঠফলকগুলি চিত্রিত; সহজে উহার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি হইবার নহে। গুম্ফাগাত্রলম্বিত লতার দ্বারা স্থানটি ঢাকিয়া দিলাম। এখন রুদ্রদাম ব্যতীত অন্যে কে আর আমার এই অগাধ অর্থের সন্ধান পাইবে?

দিবস হইতে আর বিলম্ব নাই। তাড়াতাড়ি সকল কার্য্য শেষ করিয়া সমাধিভূমি পরিত্যাগ করিলাম। রাস্তা ধূলিময়: চলিতে বড় কষ্ট হইতেছিল। শরীর অবসন্ন; প্রচণ্ড সূর্য্য-তাপে মস্তক ঝাঁঝাঁ করিতেছে। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা এতক্ষণ স্মরণে ছিল না! এখন তাহাতে কাতর করিল। পরিচ্ছদ একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন অপরিষ্কার। পরিচিত কেহ আমাকে দেখিলে কি ভাবিবে। আমার মৃত্যুসংবাদ বোধ হয় নগরে প্রচারিত হইয়াছে। প্রকাশ্যভাবে নগরে প্রবেশ করিতে কেমন

দ্বিধা বোধ হইতেছিল। উপসাগরের উপকূলের অভিমুখে চলিলাম। সেখানে আমার পরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা অতি কম। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, উপকূলে উপস্থিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া লবণাক্ত সাগরবারি সুস্বাদু পানীয়ের ন্যায় পান করিলাম। অবস্থা মানুষকে এমনি করে।

বেলাভূমির অব্যবহিত উপরেই ধীবরগণের কুটীর-শ্রেণী; কয়েকখানি অতি সাধারণ দোকান; একটা কদর্য্য পান্থ-শালা। পান্থশালায় প্রবেশ করিয়া এক পাত্র সরবৎ পান করিলাম আমার টাকা রাখিবার ছোট থলিটি আমার সহিত সমাহিত হইয়াছিল; তাহা হইতে একটি রৌপ্য-মুদ্রা বাহির করিতে গিয়া একটা স্বর্ণমুদ্রা হোটেলরক্ষকের হাতে দিয়া ফেলিলাম। সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। বলিল "ভাঙানি অবশিষ্ট টাকা শীঘ্র আনিয়া দিতেছি।"

বলিলাম "তোমার পানীয়ের মূল্য। অবশিষ্ট টাকা কিসের?"

সে ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বলিল "মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। আমি চিনিতে পারি নাই। আপনার মঙ্গল হোক।" তাহার ভয়ের কারণ অনুভব করিলাম। আমাকে বোধ হয়, সে রুদ্রদামের দলভুক্ত কেহ মনে করিয়া থাকিবে। ধীবরগণ দস্যুদলকে মান্য করিয়া চলিত। সেজন্য তাহারা শান্তিরক্ষক কর্ত্তৃক কয়েক বার লাঞ্ছিতও হইয়াছিল, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না।

দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া পান্থশালা পরিত্যাগ করিলাম। সম্মুখেই একটি পুরাতন পোষাকের দোকান। জনৈক কদাকার বৃদ্ধ তাহার দ্বারে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "এক প্রস্থ পোষাক দেখাও ত? ভাল মন্দ লইয়া আমার আপত্তি নাই, খুব পরিষ্কার হওয়া চাই।"

বৃদ্ধ আগ্রহের সহিত বলিল, "পরিষ্কার? সে বিষয় আমাকে বলিতে হইবে না। আমার পুরাতন পোষাকের দোকান বটে, জিনিষ সকলই নূতনের মত। খারাপ জিনিষ আমি রাখি না মহাশয়!"

আমি বৃদ্ধের দোকানদারীর ভণিতা শুনিয়া হাসিয়া বলিলাম, "বেশ, জিনিষ ভাল হইলেই ক্রেতার লাভ। এই মহামারীর দিনে পুরাতন পোষাকের ত অভাব নাই।"

"অভাব? কত ভাল ভাল পোষাক ভাগাড়ে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে; কয়টার খোঁজ রাখা যায় বলুন? তবু যা আমাদের হাতে আসে, তাই যথেষ্ট! ক্রেতা কৈ? সস্তা দামে এখন সব ছাড়িয়া দিতে পারিলে বাঁচি! সস্তার বাজারে দু চার প্রস্থ কিনিয়া রাখুন!"

"একটাই দেখাও আগে; অন্য কথা পরে। সকলি কি তোমার মারী রোগীর পোষাক?"

বৃদ্ধ হাহা করিয়া হাসিয়া বলিল "কেন, ভয় পাইলেন নাকি? দিনরাত লোকে যমের বাড়ী যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও জীবনের মায়া কাটে না। বৃদ্ধ আমরা,—মরণের দ্বারে এক পা বাড়াইয়া আছি। আপনার আমার আর মৃত্যু বলিয়া ভয় করিয়া ফল?"

বৃদ্ধ বলে কি?—'আপনার আমার'—আমিও যেন উহার মত বৃদ্ধ। লোকটার চক্ষের জ্যোতি একেবারে গিয়াছে দেখিতেছি। আমি তাহার বাক্যের অযথা প্রতিবাদ না করিয়া বলিলাম "মারীর ভয় আমার নাই বাপু। এই দুদিন পূর্ব্বেই আমি মারী হইতে উঠিয়াছি। মারীর বিষ লইয়া অন্যের নিকটে যাইতেই আমার ভয়। তবে কি তোমার মারী রোগীর পোষাক ভিন্ন অন্য পোষাক নাই?"

"যথেষ্ট আছে। আজ মারী উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই কি আমি নূতন দোকান খুলিয়া বসিয়াছি? কথায় কথা বলিতেছিলাম। আয়ু থাকে যদি মারে কে। এই ত আপনিই বলিলেন, মারী হইয়াও বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। বুড়াগুলাকে মারী লইবে কেন? ও রাক্ষসী চায় তরতাজা যুবকের হাড় চিবাইতে। দেখুন না আপনি,—দোষ লইবেন না মহাশয়,—মহাযাত্রার পথে দাঁড়াইয়া আছেন, বয়স হইয়াছে, ধরুন—খুব বেশী দিন বাঁচিলেও কত দিন আর! তা আপনাকে ধরিয়াই ছাড়িয়া দিল। আর দেখুন, মহাশ্রেষ্ঠী হেমরাজ, কি শরীর ছিল তাঁর, বয়সই বা কি! দেখিতে না দেখিতে মারী রাক্ষসী তাঁকে গ্রাস করিল। আমাদের অদৃষ্ট!—নইলে কি এমন দুর্ঘটনা ঘটে!"

আমি বিস্ময় দমন করিয়া বলিলাম, "বটে! মহাশ্রেষ্ঠী হেমরাজ কে ছিলেন?"

বৃদ্ধ বিস্ময়ের স্বরে বলিল "আপনি নিশ্চয়ই তাম্রলিপ্তিতে নবাগত ; নইলে এ প্রশ্ন করিতেন না। এ নগরে শ্রেষ্ঠী হেমরাজের নাম কে না জানে। শুধু ধনী বলিয়া নয় ; অমন দরিদ্রের বন্ধু আর কে ছিল !"

"আমার দুর্ভাগ্য, এমন মহাশয় ব্যক্তির নাম শুনি নাই। তাঁর মৃত্যু হইল কি রকমে ?"

বৃদ্ধ আমারই মৃত্যুকাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়া আমার নিকট বর্ণনা করিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মহাশয়, যিনি গিয়াছেন, বাঁচিয়াছেন ; অনন্ত স্বর্গে তাঁর নিশ্চয় স্থান হইবে। সংসার হইতে যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভাল। বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত অমন মহাত্মাকেও দুঃখ পাইতে হইত !"

আমি বলিলাম, "কেন ?"

বৃদ্ধ ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "কি আর বলিব, মহাশয়! বড় ঘরের বড় কথা ; শ্রেষ্ঠিনী অমানুষ। শ্রেষ্ঠী হেমরাজ সর্ব্ববিষয়ে বুদ্ধিমান ছিলেন বটে, কিন্তু ভুল করিয়াছিলেন তাঁহার বিবাহব্যাপারে। যাঁহাকে জীবন-সঙ্গিনী করিয়াছিলেন, তিনি কোন বিষয়েই শ্রেষ্ঠীর যোগ্য নন। শ্রেষ্ঠিনীর হৃদয় বলিয়া কিছু আছে কি না আমার সন্দেহ হয়। হাজার বুদ্ধিমান হোন, শ্রেষ্ঠী যুবক ত বটে। রমণীর সৌন্দর্য্যে, যুবতীর মৌখিক প্রেমে মুগ্ধ না হয় এমন যবক আর কয়টি মিলে ?"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল। হেয়তম পিশাচ, বলে কি! আমারই নিকট আমারই প্রিয়তমার অকারণ নিন্দা। আমি এখনও মৃত, নতুবা সেই দণ্ডেই নরাধম নিন্দুকের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিতাম। অতি কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া বলিলাম, "শ্রেষ্ঠিনী তোমার এমন কি করিয়াছেন যে তুমি তাঁহার বিরুদ্ধে এত কথা বলিতেছ ? তাঁহার স্বামী জীবিত থাকিলে এ-সকল বলিতে সাহস করিতে কি ?"

"তা ঠিক মহাশয়। অর্থ ও স্বামী এই দুইই এ-সকল অসার স্ত্রীলোকগুলাকে সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিতেছে। তাহা না হইলে দিনরাত কেলেঙ্কারীর কথা শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইয়া যাইত। তাঁহার স্বামী কেন ? আপনি যুবক হইলেই এ-সকল কথা বলিতে সাহস করিতাম না। মহাশয়ের বয়স হইয়াছে ;—এক মাথা পাকা চুলের নীচে যে মস্তিষ্ক, তাহাতে বোধ হয়, অসার প্রেম-ব্যাধির স্থান নাই ! তাই কথায় কথা পাড়িয়াছি !"

আমার পাকা চুল ! বৃদ্ধ আমি ! বার বার বৃদ্ধ আমাকে ওকি বলিতেছে! তাহারই চক্ষের ভ্রম, না সত্য সত্যই আমি অসহ্য যন্ত্রণায় বৃদ্ধের ন্যায় হইয়াছি ! চিন্তাটি মনে উদয় হইবামাত্র মন যেন কেমন হইয়া গেল। প্রিয়তমার অপবাদ শ্রবণে ও নিজের শারীরিক সমস্যায় আমাকে বড় কাতর করিল। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "বাজে কথা ছাড়িয়া যাহা চাহিতেছি তাহাতে মনোযোগ দাও বাপু ! পোষাক আমার দরকার, তাই দেখাও। অত বাজে কথায় কাজ কি আমার !"

বৃদ্ধ উত্তেজিত হইয়া বলিল "কত পোষাক লইবেন, লউন না ! লোকে বলে আমি পাগল ! বলিবেই ত ! আমার মত ত আর সকলে ভোগে নাই। ভুগিলে বুঝিত কে পাগল। একদিন স্ত্রীলোকের যে মনোমোহন চাহনি জীবনের আনন্দ ছিল, এখন তাই বিদ্যুতের অগ্নি ;— আমাকে তাহা পোড়াইয়া ছারখার করিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই চাহনি-আমি যে রমণীর নয়নে দেখিয়াছি, তাহাকে কি আমি আর প্রশংসা করিতে পারি ? হোক না সে রাজরাণী ? হৃদয় তাহার কি আমি ত জানি। আমার আর সে ভুল হইবার নয়। শ্রেষ্ঠিনীর চক্ষে সেই জ্বালা ! শ্রেষ্ঠী হেমরাজ পুণ্যাত্মা, সৌভাগ্যবান, তাই তিনি সময় থাকিতে স্বর্গে গিয়াছেন !"

অসহ্য। বৃদ্ধকে ক্ষমা করা অসম্ভব হইল। হস্তের পোষাক বিরক্তির সহিত ছুড়িয়া ফেলিলাম ; বলিলাম, "শ্রেষ্ঠী হেমরাজের জন্য তোমার খুব সহানুভূতি দেখিতেছি। তিনি তোমার এই সহানুভূতি উপভোগের সুযোগ পাইলে সুখী হইতেন কিনা সন্দেহ !"

বৃদ্ধ আপন ভাবে মত্ত ; সে আমার বিরক্তি লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি কি বুঝিবেন,—এ সহানুভূতি কেন ; যে, যে-আগুনে পুড়িতেছে, অন্যকে সে আগুনের নিকটে আসিতে দেখিলে স্বভাবতই ভীত হয়, সাবধান করিবার প্রবৃত্তি জন্মে ; সাধ করিয়া কি সহানুভূতি আসে ? সংসারের সকল ভুলিয়া প্রাণমন দিয়া

তাহাকে ভাল বাসিয়াছিলাম,—সেই আমার এদশা করিল,—সে যে মায়াবিনী,—আমার স্ত্রী ছিল না,—ছিল রাক্ষসী। আমার হৃদ্‌পিণ্ড স্বহস্তে ছিঁড়িয়া বক্ষের রক্ত পান করিয়াছে! তাহারই সঙ্গে শ্রেষ্ঠিনীর সেই সাদৃশ্য,—তেমনি হৃদয়-প্রাণহারী চাহনি, হৃদয়ও তাহার তেমনি নিৰ্ম্মম। একদিন শ্রেষ্ঠিনীর গাড়ীর চাকায় পড়িয়া একটি বালক মৃতপ্রায় হইয়াছিল। নিষ্ঠুর রমণী, সে দুর্ঘটনায় একটুও বিচলিত বা ব্যথিত হইল না! অবজ্ঞায় গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। দরিদ্রেরা যেন ধনীর হস্তে পশুর মত মরিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে! সেই দিন, শ্রেষ্ঠিনীর চক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিলাম,—সেই সুন্দর নয়নের অন্তরালে আমারই বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর ন্যায়, শয়তানী চাহনি! লোকে হেমরাজের মৃত্যুতে শোক করিতেছে; আমি ভুলিয়াও দুঃখ করি নাই; আমি জানি, তিনি জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে স্ত্রী হইতে কি মহা কষ্ট ভোগ করিতে হইত। সরল যুবক,—বিশ্বাস না হারাইতে, সন্দেহ করিবার সূত্র না পাইতেই, মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, সেই তাঁহার জীবনের মঙ্গল। সে দিন যদি তিনি সঙ্গে থাকিতেন, তাহা হইলে কি অসহায় আহত বালককে ও-অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে পারিতেন? না—নিশ্চয়ই না। স্বামী ও স্ত্রীতে কত তফাৎ,—ইহাদের মধ্যে কি প্রেম হইতে পারে?"

লোকটা প্রকৃতই উন্মাদগ্রস্ত। স্ত্রীর দ্বারা প্রতারিত হইয়া বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া গিয়াছে। প্রথমে তাহার উপর মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হইয়াছিল, এখন দয়া হইল। নিজের ভাবে, সে আর সংসারকে বিশ্বাস করিতে পারে না। তাই ত ভাবিতেছিলাম, নীলা কখনো অমন নিষ্ঠুর হইতে পারে না। হয়ত কোন কারণে সে তখন নিজে বালকের যত্ন লইতে পারে নাই; মনের অবস্থা হয় ত সে দিন তাহার ভাল ছিল না; কিংবা কোন দরকারী কার্য্যের জন্য তখনি তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইয়াছিল; বৃদ্ধ তাহার কার্য্যকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আপনার ভাবে এত গুরুতর করিয়া দেখিয়াছে! কিন্তু নীলা কেন সে দিনের ঘটনা আমাকে বলে নাই! বোধ হয় নিজের অসাবধানতায় লজ্জিত হইয়াছিল; নহিলে কেন আমার নিকট তাহা গোপন করিবে।

বৃদ্ধের বাক্যে তীব্রতা ছিল, আমি তাহা অন্যভাবে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেও, মন খারাপ না হইয়া গেল না। আমি উত্যক্ত হইয়া বলিলাম, "তুমি গল্পই করিবে, না পোষাক দেখাইবে? আমার সময় বৃথা নষ্ট করিবার সুবিধা একেবারে নাই। এত দেরী করিলে আমাকে অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইতে হইবে!"

বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া বলিল "মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। বৃদ্ধ বয়সের দোষই ঐ, কথাটা মনে উঠিলে চাপিতে পারি না; অনুগ্রহ করিয়া দোষ লইবেন না। এই লউন পোষাক, যেমনটি চান ঠিক তেমনই এই,—একবারে নূতন, পরিষ্কার; বেচারী দুই দিনও পরে নাই। হতভাগা, মিছামিছি প্রাণ দিল। প্রেম-ব্যাধির পরিণামই ঐ। মেয়েটাকে কতই না সে ভাল বাসিত। বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুই জনের বিবাহ হইবে—সব পাকা কথা! বিবাহের কড়ি জোগাইতে বিদেশে গিয়াছিল। কত আশা,—কত পরিশ্রম—ফল তার শেষে এই। সে কি ভাবিতে পারিয়াছিল, অত সাধের প্রণয়িনী—অত প্রেমলীলার পরেও, দুই দিনের অদর্শনেই তাহাকে এমন করিয়া ভুলিয়া যাইবে! কত আশা, কত সুখকল্পনা বুকে করিয়া সে দেশে ফিরিয়াছিল। তাহার সখের প্রণয়িনী তখন পরহস্তগত,—ভদ্রতার খাতিরেও সে তাহার সঙ্গে একটা কথা বলে নাই। হতভাগা, সেই অভিমানে প্রাণ দিল। আত্মহত্যা করিল, নিজেই নরকে গেল। তাহার শাস্তি হইল কি? সে ত মনের সাধে আনন্দ করিয়া ফিরিতেছে!"

বুঝিলাম গুরুতর আঘাতে বৃদ্ধের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। তাহার কেবল কথায় কথায় আত্মকাহিনীর আভাষ। তাহার বাক্যের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পোষাকটা আমার পছন্দসই; প্রবালসংগ্রহকারী নাবিকের পোষাক। তাহাতে রহস্য বেশ জমিয়া উঠিবে; সে পোষাকে নীলাও আমাকে চিনিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাম কত?"

"দুই দিনারে কিনিয়াছি, চার দিনার দিবেন।"

ছয় দিনার তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম, "চার দিনার পোষাকের দাম; বাকী দুই দিনারে পোষাক পরিবর্ত্তনের জন্য একটা নিরালা স্থান পাইব কি?"

বৃদ্ধ এক এক করিয়া মুদ্রা কয়েকটি গণিয়া লইল। উত্তরীয়ে বাঁধিয়া বলিল, "আমি কি জানি না, কোন ভদ্রলোকই প্রকাশ্যে পোষাকপরিবর্ত্তনের ইচ্ছা করেন না।" একটি অপ্রশস্ত কক্ষের দ্বার সত্বর উন্মোচন করিয়া বলিল, "আসুন মহাশয়, দেখুন। আশা করি, এ স্থানটি আপনার অপছন্দ হইবে না। আমার শয়ন-কক্ষ এটি। দ্বিগুণ মুদ্রা দিলেও অন্য ক্রেতাকে এ ঘরে প্রবেশ করিতে দিতাম না। বুড়ায় বুড়ায় অন্য কথা! এ বয়সের শয়নঘরে গোপনীয়ই বা কি আছে! এই যে আয়নাখানা দেখিতেছেন, এখানা সেই হতভাগীর,—আমার প্রথম বয়সের প্রেম-উপহার। তাহার সকল স্মৃতি নষ্ট করিয়াছি, রাখিয়াছি কেবল এইখানি! সে কি দিনই গিয়াছে!"

বৃদ্ধ নমস্কার করিয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিল! কক্ষটি সংকীর্ণ হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সজ্জিত। সম্মুখেই সেই দর্পণ। দর্পণখানি কারুকার্য্যে শোভিত, মূল্যবান। তাহা দেখিয়া মনে হইল, সত্যই বৃদ্ধ যৌবনে প্রেমিকার জন্য পাগল হইয়াছিল। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। একি! এই কি আমার প্রতিচ্ছবি! একরাত্রে আমার চেহারার এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! নিজের চেহারা নিজেই চিনিতে পারিতেছি না। চক্ষু কোটরগত—নিষ্প্রভ, কোলে কালিমা! ভ্রূযুগল শ্বেত; ললাটে অসংখ্য বক্র রেখা; গণ্ডদ্বয় ভাঙ্গিয়া চুয়ালে লাগিয়াছে! চর্ম্মও যেন শিথিল। মস্তকে কেশরাশি তুষারের ন্যায় ধবল—আমি যৌবনে বৃদ্ধ! কে বলিবে আমি সেই হেমরাজ! পিতা বর্ত্তমান থাকিলে, তিনিও বোধ হয় এরূপ কাশকেশ লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ হইতেন না। আপনার মূর্ত্তি দেখিয়া মন একবারে দমিয়া গেল। নীলা আমার এ দশা দেখিয়া কি ভাবিবে! আমাকে চিনিতে পারিবে কি? যুবতীর চক্ষে বৃদ্ধের বেশ কখনই আনন্দপ্রদ হইবে না। হায়! আমার একি হইল! চক্ষের জল ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। শুষ্ক গণ্ডে উষ্ণ অশ্রুধারা অনুভব করিয়া চমকিয়া উঠিলাম। কি! আমি স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিতেছি! ধিক্ হেমরাজ! তুমি না একদিন প্রেমের বড়াই করিয়া বলিয়াছ,—মরিলেও তোমাদের অবিনশ্বর প্রেম অবিকৃত থাকিবে। এই কি তাহার পরিচয়? কেশের বর্ণে আসে যায় কি? হৃদয় যদি অবিকৃত থাকে, প্রাণ যদি সরস হয়, তবে দৈহিক পরিবর্ত্তনে কিসের আশঙ্কা? প্রিয়তমা হয়ত আমার অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে বিমর্ষ হইবেন, কিন্তু যখন জানিতে পারিবেন, ও-বৃদ্ধত্ব আমার কি মহা কষ্টের পরিণাম, তাঁহার হারাধন আমি, মৃত্যুর মুখ হইতে কি ভাবে ফিরিয়া আসিয়াছি,—নিশ্চয় তাঁহার আনন্দের অবধি থাকিবে না; তিনি তাঁহার অসীম অনাবিল প্রেমপ্রবাহে আমার সকল কালিমা ধৌত করিয়া দিবেন। তখন আমার কি উল্লাস! সত্যই আমার নবজীবন!

প্রিয়ার চিন্তায় মন প্রফুল্ল হইল। তাড়াতাড়ি পোষাকটা পরিয়া লইলাম। প্রবালসংগ্রহকারী ধীবরের পোষাক আমাকে মন্দ মানাইল না। সেও এক নূতনত্ব! মনে মনে বলিলাম, জীবন-নাটকের এ অঙ্ক দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতে পারিব কি? সহিষ্ণুতাকে সহায় করিয়া এ সুযোগে বুঝিতে হইবে—প্রেয়সীর আমার কত ভালবাসা!

শিষে প্রেমসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। বৃদ্ধ আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "পোষাকটায় কি সুন্দর মানাইয়াছে আপনাকে। মুখ দেখিয়া কে বলিবে, আপনার এ বয়স! বয়সকালে না জানি মহাশয় কত সুশ্রী ছিলেন। বয়সেও আপনার যৌবনের লাবণ্য মুছিয়া ফেলিতে পার নাই। মনটাও দেখিতেছি তেমনি কাঁচা। শিষে এমন মিষ্ট গান যুবকের মুখেও শুনি নাই। মহাশয়, কোনো প্রেমিকার উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন কি?"

বৃদ্ধের বাক্যে মনে মনে হাসিলাম; বলিলাম, "হাঁ।" সে উন্মত্তের ন্যায় হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল: বলিল, "ভাল ভাল, দেরী করিবেন না আর। দৌড়িয়া যান। আপনার প্রিয়তমা আপনার বক্ষের রক্ত পান করিতে উদ্বেলিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছে। সাবধান! তাহার বাক্জালে বদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইবেন না যেন,—তাহারই প্রাণ লওয়া চাই!"

উন্মত্তের প্রলাপবাক্যের উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু যাই কোথায়? তখনও সন্ধ্যা হইবার অনেক দেরী; দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে মাত্র। দিবা অতি দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সন্ধ্যার

পূর্ব্বে গৃহে ফিরিব না স্থির করিয়াছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকিয়া আমার স্ত্রীর বিরহক্লিষ্ট ব্যথিত বদন অলক্ষ্যে লক্ষ্য করাই আমার তখনকার প্রধান সঙ্কল্প। মিলনের জন্ম প্রাণ অস্থির। আমাকে সে কষ্টও সহ্য করিতে হইবে। লক্ষ্যহীন ভাবে নগরের কতিপয় প্রসিদ্ধ রাস্তায় ঘুরিতে লাগিলাম। কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল না। রাস্তাগুলি জনহীন; মহামারীর দুর্দ্দান্ত প্রতাপ বক্ষে প্রকটিত করিয়া শ্মশানের ন্যায় পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে শব। একস্থানে দেখিলাম,—একটি সদ্য মৃত ব্যক্তিকে চিতায় স্থাপন করা হইতেছে। ঝটিত তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। মৃতব্যক্তির বন্ধুগণকে বলিলাম, "দেখুন, দেখুন, বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন—প্রাণটা একবারে বাহির হইয়াছে কিনা। হয় ত এখনো জীবিত আছে।"

তাহারা আমার বাক্যে কর্ণপাত করিল না। হয় ত আমাকে শোকগ্রস্ত উন্মত্ত ভাবিয়া থাকিবে। উন্মত্তেরই মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মধ্যাহ্ন-রবির খরতাপে আমার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল; পদ আর দেহভার বহন করিতে পারে না। আবার বুঝি সেই দশা হয়। একটা আশ্রয়ের কথা মনে হইল, ত্রিবিক্রমের পান্থশালা, আমার মৃত্যুভূমি। সেখানে গেলে, আমার মৃত্যু ও সমাধির যথাযথ বিবরণ ত্রিবিক্রমের নিকট শুনিতে পাইব: অবশিষ্ট বেলাটুকুও সেই সুযোগে কাটিয়া যাইবে। ত্রিবিক্রমের পান্থশালার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। পান্থশালা নীরব। আমার সেই রোগশয্যা, মৃত্যু-খট্বা শূন্য পড়িয়া আছে। ত্রিবিক্রম জানালার সম্মুখে উদাসনেত্রে বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল "মহাশয়ের খাদ্যের প্রয়োজন আছে কি?"

আমি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলাম, "ধন্যবাদ। এ সময় কিছু পাওয়া যাইবে কি?"

ত্রিবিক্রম পাত্র পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল, "আপনি বোধ হয় দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর এই দেশে ফিরিতেছেন? প্রবাল এবারে পর্য্যাপ্ত পাওয়া গিয়াছে শুনিয়াছি।"

আমি তাহার কথার কি উত্তর দিব, ক্ষণেকের জন্য স্থির করিতে পারিলাম না। পরে মস্তক সঞ্চালন করিয়া উত্তর দিলাম। বলিলাম, "তাম্রলিপ্তিতে দেখিতেছি, বড় দুর্দ্দিন। মারী কি একটুকুও কমে নাই?"

ত্রিবিক্রম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আর কমিবে! মধুভাণ্ডে মক্ষিকার ন্যায় রোজ রোজ কত লোক মরিতেছে। এই কালই এখানে,—হা! ঈশ্বর!"

"কাল এখানে কি হইয়াছে?"

"মহাশ্রেষ্ঠী হেমরাজকে কি জানিতেন না। অত বড় ধনী—সামনে যে এই খট্বাখানা দেখিতেছেন, ইহার উপরই কাল মারীতে তাঁহার জীবন শেষ হইয়াছে। তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, আর ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না; দরিদ্র পথিকের মত আমার দ্বারে প্রাণ হারাইলেন। প্রাতঃকালে পীড়িত হইয়াছিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সব শেষ; এমন ভয়ানক মারী। অতি সাধারণভাবে তাহাকে সমাধি দেওয়া হইল। তাহাও হইত না, যদি মহাত্মা কৃপাশরণ না থাকিতেন। হায়! মৃত্যুর নিকট ধনী দরিদ্র নাই। ধনী হেমরাজও যে পথে, আজ মহাত্মা কৃপাশরণও সেই পথে।"

আমি উদ্বেগে আত্মহারা হইয়া বলিলাম, "মহাত্মা কৃপাশরণ! মারী রোগীর যিনি অক্লান্ত সেবাশুশ্রূষা করিতেন—তিনি?"

ত্রিবিক্রম আর্দ্র কণ্ঠে বলিল "হাঁ মহাশয়, তিনি। তিনিই মারীরোগে আক্রান্ত শ্রেষ্ঠী হেমরাজকে অজ্ঞান অবস্থায় আমার কুটীরে আনিয়াছিলেন। কে জানিত, তাঁহারও এত শীঘ্র ডাক পড়িবে?"

"অ্যাঁ! তিনি তবে কি নাই! কে বলিল, তিনি মারা গিয়াছেন? তুমি কি নিজে দেখিয়াছ?"

ত্রিবিক্রম অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল "তিনি মরেন নাই, স্বর্গে গিয়াছেন। পরের সেবায় অন্যে আর অমন করিয়া কে প্রাণ দিবে! এ দুর্দ্দিনে তিনি রোগীর জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা মানুষের সাধ্য নহে। তিনি দেবপুত্র ছিলেন, তাঁহার পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছেন। শ্রেষ্ঠী হেমরাজের মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠীকে তাঁহার পারিবারিক সমাধি-গুম্ফায় সমাহিত করিবার জন্য মহাত্মাকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। শবকে সমাধিগ্রস্ত করিবার সময়ই বোধ

হয় মারীবীজ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করে; সমাধিপ্রাঙ্গণেই তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল। তবুও তিনি নিজে যাইয়া শ্রেষ্ঠীর অঙ্গের হার অঙ্গুরী ইত্যাদি যাহা যাহা মূল্যবান বস্তু ছিল, শ্রেষ্ঠিনীকে দিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠিনী তাঁহার নিকটই স্বামীর মৃত্যুসংবাদ প্রথম শুনিতে পান।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "শ্রেষ্ঠিনী বোধ হয় স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে অত্যন্ত অধীর হইয়াছিলেন?"

ত্রিবিক্রম বলিল "সে সংবাদ আমি জানিব কি করিয়া মহাশয়? জানিবার আগ্রহও আমার নাই। শুনিয়াছি শ্রেষ্ঠিনী নাকি স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে ক্ষণেকের জন্য মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন। ও সকল মূর্চ্ছার মূল্য নাই! আজকালের মেয়েদের—বিশেষ বড়ঘরের ও-সকল সখের ব্যাধি। তাঁহারা হাসিতে কাশিতে মূর্চ্ছা যান। আমরা গরীব, ও-সকল সংবাদে কাজ কি বলুন? মহাত্মা কৃপাশরণ যে আমাদের ছাড়িয়া গেলেন, এই মহাদুঃখ! গরীবের অমন বন্ধু আর হইবে না,—তিনি রোগীর শিয়রে দাড়াইলে রোগীর যেন অর্দ্ধেক কষ্ট তখনই চলিয়া যাইত! হা, ভগবান! কাল সন্ধ্যায় তিনি আমার এখানে, আজ তিনি কোথায়? বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, তিনি মরিয়াছেন!"

অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলাম। আহারের প্রবৃত্তি আমাকে পরিত্যাগ করিল। পাত্রের খাদ্য যেমন ছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল। কেবল মনে হইতেছিল, আমার জীবন রক্ষা করিতে গিয়া সেই মহাত্মার প্রাণ নষ্ট হইল। কেন আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল? আমি মরিলে জগতের আর কি ক্ষতি ছিল? কৃপাশরণ আজ জীবিত থাকিলে কত জীবন রক্ষা পাইত।

চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। ত্রিবিক্রমের প্রশ্নে চমকিয়া উঠিলাম। ত্রিবিক্রম বলিল, "খাদ্যগুলি কি তবে ভাল হয় নাই? না, আপনার ক্ষুধা নাই?"

আমি বলিলাম "কি আর বলিব। তাম্রলিপ্তিতে পদার্পণ করিয়াই কেবল শুনিতেছি পীড়িতের আর্ত্তনাদ, আর মৃত্যুকাহিনী! ইহাতে কি আর ক্ষুধা থাকে, না, কিছু ভাল লাগে?"

"বলিয়াছেন ঠিক! কিন্তু কি করিবেন বলুন। জন্ম-মৃত্যুতে মানুষের আর হাত কি আছে। সকলই তাঁহার ইচ্ছা,—তিনিই আমাদের ভরসা!"

ত্রিবিক্রমের সময়োচিত আধ্যাত্মিক উক্তিতে মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। উদাস প্রাণে বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখি,—আমার প্রিয়তম বন্ধু গোবিন্দ ধীর পদে চলিয়াছেন। ইচ্ছা হইল দৌড়াইয়া যাইয়া বন্ধুকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করি, বলি, "প্রিয়তম, আমি মরি নাই,—যমালয় হইতে তোমার স্নেহ-ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছি।"

আসন হইতে উঠিলাম কিন্তু অগ্রসর হইতে পারিলাম না। একটি বিসময় চিন্তা আমাকে ফণিনীর ন্যায় দংশন করিল। কৈ গোবিন্দর বদনে শোকচিহ্ন কোথায়? কে বলিবে, মাত্র কল্য তাহার প্রিয়তম বন্ধুর বিয়োগ হইয়াছে? বদন তাহার হাস্যময়; দস্তুর মত সাজসজ্জা করিয়া হেলিয়া দুলিয়া সে চলিয়াছে। দিব্য পোষাক, বক্ষে সুন্দর করবীগুচ্ছ। এই কি শোকচিহ্ন? এত শীঘ্র মানুষ মানুষকে ভুলিতে পারে! মনে বড় ব্যথা পাইলাম; কিন্তু ইহা ক্ষণকালের জন্য! পর মুহূর্ত্তেই মনে হইল, আমরা নিজের ভাবে লোকের বাহ্যিক ব্যবহার তুলনা করিয়া কত ভুল করি! বন্ধুর বক্ষে করবী, তাহাতে হইয়াছে কি? হয়ত আমার প্রিয়তমা অবোধ কন্যা করবীগুচ্ছটি তাহাকে উপহার দিয়াছে। তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য গোবিন্দ উহা বক্ষে পরিয়াছে। বস্তুতঃ উহা অবোধ চম্পার সুখচিহ্ন, বন্ধুর পক্ষে শোক-চিহ্ন ব্যতীত আর কি? বন্ধু এখনও শোকচিহ্ন ধারণ করে নাই, হয়ত ঘটনাক্রমে ধারণের সুযোগ হয় নাই! বাহ্যিক চিহ্ন হৃদয়ের চিহ্ন নহে, সমাজের কৃত্রিম শোকধ্বজা!

গোবিন্দ আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। আমি বিশ্রামের উপলক্ষ্য করিয়া ত্রিবিক্রমের হোটেলে অশান্ত হৃদয়ে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সময় আর কাটে না।

দিনের আলোক প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল। আমি উঠিলাম। ত্রিবিক্রমকে বলিলাম, "আমার খাদ্যের জন্য কত দিতে হইবে?"

"এক মুদ্রা। মহাশয় কিইবা খাইয়াছেন,—যাহা দিয়াছি, তাহা ত পড়িয়াই আছে!"

"খাই না-খাই, যাহা দিয়াছ, তাহার দাম লইবে না কেন? ঠিক বল কত দিব?"

এক মুদ্রার বেশী সে কিছুতেই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা তাহার হস্তে অকিঞ্চিৎকর মুদ্রাটি দিয়া, তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। ত্রিবিক্রম আমার বিপদের বন্ধু; তাহার ঋণ কি আমি জীবনে শোধ করিতে পারিব!

(ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

কষ্টিপাথর

দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা।

নবপত্রিকায় লাগে কলাগাছ, গুঁড়িকচুর গাছ, হলুদগাছ, জয়ন্তীর ডাল, বেলের ডাল, দাড়িম গাছ, অশোকের ডাল, মানকচুর গাছ ও ধানের গাছ। দুর্গার যেমন অধিবাস করিতে হয় তেমনি এই নয়টি গাছেরও অধিবাস করিতে হয়। তখন এ গাছগুলি আর গাছ থাকেন না—দেবতা হইয়া যান। কলাগাছ হন ব্রহ্মাণী; কচু হন কালিকা; হরিদ্রা হন দুর্গা; জয়ন্তী হন কার্ত্তিকী; বেল হন শিবা; দাড়িম হন রক্তদন্তিকা; অশোক হন শোকরহিতা; মানকচু হন চামুণ্ডা; আর ধান হন লক্ষ্মী। দুর্গার পূজা আরম্ভ হয় সপ্তমীর দিন, আর বোধন হয় ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার সময়। নবপত্রিকাকেই লোকে 'কলাবৌ' বলে। কিন্তু গণেশের পাশে বসেন বলিয়া নবপত্রিকাকে লোকে গণেশের 'কলাবৌ' বলে কিন্তু ইনি গণেশের বৌ নন।

নবপত্রিকায় যে নয়টি দেবী আছেন, সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিন দিনই ষোড়শোপচারে তাঁহাদের পূজা করিতে হয়। তবে মানকচুর দেবতা যে চামুণ্ডা তাঁহার একটা বিশেষ পূজা আছে তাহার নাম 'সন্ধিপূজা'। সন্ধিপূজায় অন্য কোন দেবতার অধিকার নাই, কেবল চামুণ্ডারই অধিকার। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণেই সন্ধিপূজা হয়।

বিসর্জ্জন হইয়া গেলে স্বতন্ত্রভাবে নবপত্রিকার বিসর্জ্জন করিতে হয়।

দুর্গার বসন্তকালে পূজা হইত, রামচন্দ্র শরৎকালে সেই পূজা আরম্ভ করেন, ইহাই আমাদের দেশের সংস্কার। এ সংস্কারের কি মূল তাহা জানি না। বাল্মীকি রামায়ণে, 'কৃত্তিবাসের' রামায়ণে, তুলসীদাসের রামায়ণে, রামরসায়নে নাই—আছে কেবল কৃত্তিবাসে। চণ্ডীতে এ পূজা শরৎকালের পূজা বলিয়াই বর্ণনা আছে। আসল কথা হইতেছে যে বহুকাল ধরিয়া শরৎকালে একটি মহাপূজা হইত। আমার মনে হয় সেটি 'নবপত্রিকা' পূজা। মেধস ঋষির কথা শুনিয়া সুরথরাজা মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। সে মূর্ত্তি যে কি তাহা ঋষি বলেন নাই। সে মূর্ত্তি দশভুজা—কি না—তাহা আমরা জানি না—সে মূর্ত্তির সহিত লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ থাকিতেন কি না—তাহাও আমরা জানি না। তবে শারদীয়া পূজায় মূর্ত্তি-পূজা এই আরম্ভ।

আমাদের এই দুর্গোৎসব বেশী দিনের নহে। ডাকিনী শাকিনীর পূজা খৃষ্টীয় আট শতকের পূর্ব্বে ছিল বোধ হয় না। কারণ মহাযান ও মন্ত্রযানের পরে বজ্রযান সহজযান ও কালচক্রযানেই ডাক ডাকিনী শাক শাকিনী প্রভৃতি উপদেবতার পূজার কথা পাওয়া যায়। দুর্গোৎসবের পুঁথি খুঁজিতে গেলেও আমরা দেখিতে পাই যে আমরা দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যে প্রাচীন পুস্তক পাইয়াছি তাহা মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির লেখা। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি তাঁহার গ্রন্থে মাধবাচার্য্যের মত উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে ১৩৫০-এর পূর্ব্বে ফেলা যায় না। তিনি তাঁহার পুস্তকে দুর্গোৎসব সম্বন্ধে জিকন ও ধনঞ্জয়ের মত তুলিয়াছেন। জিকন ও ধনঞ্জয় এগার শতকের লোক হইতে পারেন, কারণ দ্বাদশ শতকের দায়ভাগকার জীমূতবাহন জিকনের মত উদ্ধার করিয়াছেন। রায়মুকুট ১৪৩১ খৃঃ অব্দে তাঁহার পুস্তকাদি লেখেন, তিনি কিন্তু দুর্গোৎসবের কথা বলেন নাই। তাঁহার স্মৃতির পুস্তকে বরং জগদ্ধাত্রী পূজার কথা আছে, কিন্তু দুর্গোৎসবের কথা নাই। তাহাতে বোধ হয় সে সময়ে দুর্গোৎসবের এত প্রচার হয় নাই। রঘুনন্দন ১৬ শতকের প্রথম অর্দ্ধে তাঁহার 'তত্ত্ব' রচনা করেন। তিনি তিথি-তত্ত্বের মধ্যে দুর্গোৎসবের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতেও নবপত্রিকা পূজার খুব বাহুল্য আছে। রঘুনন্দনের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত দুর্গোৎসব খুব চলিয়া আসিতেছে। ইংরেজীশিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনেকে মনে করিতেন দুর্গোৎসব অবশ্যকর্ত্তব্য। সকল ব্রাহ্মণের বাড়ীই দুর্গোৎসব হইত। রঘুনন্দন বলিয়া গিয়াছেন প্রতি বৎসরই দুর্গাপূজা করিতে হইবে।

দুর্গোৎসবের প্রধান কার্য্য নবপত্রিকা পূজা। মাটির ঠাকুর গড়িয়া তিন দিন পূজা করিয়া পরে বিসর্জ্জন দেওয়া কেবল বাঙ্গলাতেই আছে, আর কোন দেশে নাই। কিন্তু নবরাত্র-পালন ও নবপত্রিকা পূজা অনেক দেশে হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কল্পারম্ভ হয়—অপর পক্ষের নবমীতে, নয়, দেবীপক্ষের প্রতিপদে, না হয়, দেবীপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে প্রতিপদ হইতে নয় দিন পূজা অর্চ্চনা হয়। এইজন্য উহাকে 'নবরাত্র' বলে। উহাতেও নবপত্রিকার পূজা করিতে হয়। সুতরাং শরৎকালে নবপত্রিকার পূজাটা অনেক দেশেই আছে এবং সেইটাই ঠিক শারদীয়া পূজা।

অতি প্রাচীনকালে ঋতুপরিবর্ত্তনের সময় লোকে একটা-না-একটা উৎসব করিত। মন্দ ঋতু হইতে যখন ভাল ঋতু আসে তখন উৎসবের মাত্রাটা বাড়িয়া যায়। বর্ষা একটা মন্দ ঋতু, কেননা বর্ষার লোকে ঘরের বাহির হইতে পারে না, একগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাওয়া দুর্ঘট হয়, অনেক সময় বাড়ীর বাহির হওয়া যায় না। বৌদ্ধেরা আপন আপন বিহারে আবদ্ধ থাকিতেন। ব্রাহ্মণদেরও মতে নারায়ণ এই সময় শুইয়া থাকেন। রাজারাজড়ার বিজয়যাত্রা বন্ধ হইয়া যাইত। সুতরাং বর্ষা যে মন্দ ঋতু ও কষ্টকর ঋতু সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাতে আবার বর্ষাকালে খাওয়া-দাওয়ার জিনিস পাওয়া যায় না।

বর্ষা ঋতু চলিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল, লোকে সূর্য্যদেবের মুখ দেখিতে পাইল, পথের কাদা শুকাইয়া আসিতে লাগিল। নানারূপ তরিতরকারী তৈয়ার হইতে লাগিল। বাঙ্গলায় একটা অসাধারণ খাদ্য খেজুর গুড় এই সময় হইতে জন্মিতে থাকে। আউশ ধান্য উঠিয়া গিয়াছে, আমন্ ধান ফুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ত একটা মস্ত উৎসবের সময়।

কিন্তু কি লইয়া উৎসব করিবে। প্রাচীনকালের লোকেরা ত আর ঠাকুর গড়িতে পারিত না, কুম্ভকার-শিল্পের ত তখন তত উন্নতি হয় নাই। তাহারা গাছপালা লতাপাতা লইয়াই উৎসব করিত। সকল দেশেই গাছপালা লতাপাতা লইয়া উৎসব আছে। আর এদেশের প্রাচীন

লোকে নয়টি গাছ লইয়া উৎসব করিত, শরৎকালেই এই নয়টি গাছে খুব পাতা বাহির হয়। এই নয়টি পাতা একত্র করিয়া অপরাজিতা লতায় বাঁধিয়া তাহা লইয়া লোকে যে উৎসব করিবে তাহার আর বিচিত্র কি?

এখন কথা হইতেছে যে যদি নবপত্রিকা পূজাই দুর্গোৎসবের আসল পূজা হয়, তাহা হইলে বাসন্তী পূজাকে শরতে আনিয়া যে দুর্গোৎসব হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে, সেটা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আর কৃত্তিবাস যে বলিয়া গিয়াছেন, বসন্তকালে দেবীর যে পূজা ছিল তাহাই রামচন্দ্র শরৎকালে করিয়াছেন একথাই কিরূপে সম্ভবপর হয়? নবপত্রিকার অনেক পত্রই ত বাসন্তী পূজার সময় পাওয়া যায় না। যাহারা বাসন্তী পূজা করেন তাঁহারাই জানেন নবপত্রিকা সংগ্রহ করিতে কি বেগ পাইতে হয়।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, অতি প্রাচীনকালের লোকে সর্ব্বত্রই দেবতা বা Spirit দেখিতে পাইত। তাহারা মনে করিত, জগতের সকল বস্তুতেই অদৃশ্য অপ্রত্যক্ষ দেবতা বাস করেন। এই যে গাছপালা গজায়, উহার ফুল ফুটে, ফল হয়, এ সবই দেবতার খেলা। প্রথম প্রথম তাহারা গাছপালাকেই দেবতা বলিত। তাহার পর তাহাদের মনে হইল যে, গাছপালা ত দেবতা হইতে পারে না, উহা জড়পদার্থ; কোন দেবতা উহার মধ্যে আছেন। তাহারা গাছপালার নামেই ঐ দেবতার নাম দিত। আমাদের ও অন্য প্রাচীন গ্রন্থে "বৃক্ষাভিমানিনী দেবতা" "পর্ব্বতাভিমানিনী দেবতা" প্রভৃতি অভিমানিনী দেবতার নাম পাওয়া যায়। ক্রমে যখন আরও মাথা পরিষ্কার হইল, জগতে কার্য্যকারণভাবের উদ্বোধ হইল, তখন "অভিমানিনী দেবতা" আর পছন্দ হইল না। দেবতা গাছ বলিয়া আপনাকে মনে করেন—এই ত অভিমানিনী দেবতার মানে—ইহা তাঁহাদের অসঙ্গত বোধ হওয়ায় তাঁহারা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিলেন। দেবতারা আপনাদের গাছ বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু গাছের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে একজন দেবতা আছেন—তিনিই হইলেন গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অতিপ্রাচীনেরা বর্ষার পর শরৎ আসিলেই, শরতের ভাল ভাল গাছপালা তুলিয়া, তাহাই লইয়া উৎসব করিতেন, মনে করিতেন ইহাতে শরৎ প্রসন্ন হইবেন, আমরা আনন্দে থাকিব, শরতের সহিত আমাদের বেশ একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়া যাইবে। কিন্তু ক্রমে যতই তাঁহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল, ততই দেখিতে লাগিলেন যে গাছপালা পূজা করিয়া আর কি হইবে? পুরোহিত ঠাকুরেরা সর্ব্বত্রই আছেন। তাঁহারা অমনি বলিয়া দিলেন যে উহা ত আর গাছপালার পূজা নয়, উহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের পূজা। গাছপালা দেবতাগণের বিভূতি। সেই সময়ে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবীর কল্পনা হইল।

অতি প্রাচীনেরা দেবতার সহিত তাঁহার বিভূতির কিরূপ মিল দেখিতেন আমরা তাহা জানি না। আমাদের সে চক্ষু নাই। তাহার পর আবার তাঁহারা যে বিভূতির যে দেবতা করিয়াছিলেন আজও যে সেই বিভূতির সেই দেবতা ঠিক আছেন তাহা বিবেচনা হয় না। কারণ পুরোহিত মহাশয়েরা অনেক বার পূজার সংস্কার করিয়াছেন। গ্রন্থকার মহাশয়েরা অনেক নূতন নূতন পদ্ধতি লিখিয়াছেন। সাত নকলে যে আসল খাস্তা হইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমার এক-একবার বোধ হয় যে শুম্ভ নিশুম্ভ বধকালে দেবী যে অষ্টনায়িকা ও চামুণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরিণামে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা জোর করিয়া বলিবার যো নাই। কারণ অষ্ট-নায়িকার নাম—ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, ঐন্দ্রী, দেবী দুর্গা নিজে। চামুণ্ডা তাহার উপর। কিন্তু দুর্গোৎসবের পদ্ধতিতে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবতার নাম ব্রাহ্মী, কালিকা, দুর্গা, জয়ন্তী, কার্ত্তিকী, শিবা, রক্তদন্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা ও লক্ষ্মী। দুর্গোৎসবের পদ্ধতি যে দেবীমাহাত্ম্যের উপরই নির্ভর করে সে বিষয়ে সন্দেহ অতি কম। সুতরাং দেবীমাহাত্ম্যের সহিত যেখানে পদ্ধতির অমিল সেখানে পদ্ধতির মধ্যেই কিছু গোল আছে বলিয়া মনে হয়। নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের মূর্ত্তি গড়া হয় না, কিন্তু বোধ হয় ঐ অধিষ্ঠাত্রীদের সহিত দুর্গার পরিবারের মিল করাইয়া দুর্গোৎসবের মৃণ্ময় মূর্ত্তিসকল গড়া হয়। এই-সকল মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে কখনও বা দেবতা নিজে থাকেন, কখনও বা তাঁহার শক্তি থাকেন, কখনও বা দুইই থাকেন। চালচিত্রে শিব থাকেন। তাঁহার শক্তি দুর্গা—দুর্গোৎসবের প্রধান দেবতা। কার্ত্তিকেয়ী শক্তি, তাঁহার দেবতা কার্ত্তিক, তিনি নিজে থাকেন তাঁহার শক্তি থাকে না। বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, তিনি দুর্গার ডাহিনে থাকেন। ব্রহ্মাণীর আর এক নাম সরস্বতী, তিনি দুর্গার বামে থাকেন। পুরাপুরি নয়টি দেবী না থাকিলেও, উহাদের চারিটি যে দুর্গোৎসবের মূর্ত্তিতে আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা দুর্গোৎসবের মূর্ত্তিগুলিকে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রীগণের মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিয়া লইতে পারি। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ যদিও আপাত দৃষ্টিতে বেশ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে হয়, যদিও পদ্ধতিকারেরা উহাদিগকে আবরণ দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা দেবী হইতে ভিন্ন নহেন। কারণ বিসর্জ্জনের সময় সমস্ত আবরণ-দেবতাকে দুর্গাশরীরে লয় করিয়া তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। দুর্গামাহাত্ম্যেও আছে।

এই যে শারদীয়া পূজা ইহা অতি প্রাচীনকালের একটি শরৎকালের উৎসব। এই উৎসব শরৎকালের গাছপালা লইয়াই হইত। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ গাছপালা লইয়া উৎসব আছে। 'আম্‌পলজি'র পুস্তক পড়িলে দেখা যাইবে পৃথিবীর নানাস্থানে শীতের প্রারম্ভে এইরূপ গাছপালা লইয়া উৎসব হইয়া থাকে। ক্রমে সেই গাছপালার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হন। ক্রমে সেই দেবতাগণের মূর্ত্তি হইল। এমন সময়ে দুর্গামাহাত্ম্য নামক পুস্তকের উৎপত্তি হইল। দুর্গামাহাত্ম্যের সহিত মিলাইয়া নয় মূর্ত্তি হইতে ছোটখাট মূর্ত্তি বাদ দিয়া বড় বড় মূর্ত্তি দিয়া উৎসবের প্রতিমা গড়া হইল। ক্রমে সে-সকল মূর্ত্তি এক মূর্ত্তিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল; তিনিই প্রধান মূর্ত্তি—তিনিই দুর্গা। তিনিই—দশভুজা। গাছপালার পূজা ক্রমে ব্রাহ্মণদের হাতে পড়িয়া অদ্বৈতে পরিণত হইল।

(নারায়ণ, কার্ত্তিক)   শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

*

* *

ভাটিয়াল গান।

(১)

কালা রে মোর মনোহর
তুমি আমার রসের গুণনিধি।
এক রূপ গুণ দিয়া সৃজিলেক বিধি।
এ মেঘ-আঁধার রাত্রি, কেহ নাহি সাথে,
একেলা আসিছ বন্ধু, পরাণ লইয়া হাতে।
বন্ধু এ মেঘ-আঁধার রাত্রি, বিজলির ছটা,
ধীরে ধীরে বাড়াইও পাও, পিছল হইছে বাটা।

এই গানের রচয়িতা সৈয়দ আলাদ্দিন। ইনি একজন মুসলমান বৈষ্ণব কবি।

(২)

হৃদি দহিছে রে—আমার তাপিত হৃদয় দহিছে রে,—
হৃদি দহিছে দহিছে দহিছেরে বন্ধুর লাগিয়া।
ওগো আমি যদি (ওগো সখী, প্রাণসখী গো)
মাটি হইতাম—বন্ধুর চরণে লাগিয়া রহিতাম।
ওগো আমি যদি (ওগো সখী, প্রাণসখী গো)
চন্দন হইতাম—বন্ধুর অঙ্গেতে মিশিয়া রইতাম।
ওগো আমি যদি (ওগো সখী, প্রাণসখী গো)
কাজল হইতাম—বন্ধুর চক্ষেতে লাগিয়া রহিতাম।

(৩)

মুরসিদ আমার বানিযারে সাধ কর বাপার,
বিনা পাল্লায় বিনা ডাণ্ডি তুলেছে সংসার।
পুষ্করিণীর চারি পাধে নানা পক্ষীর বাস,
আরে ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে, ঐ আল্লার তামাস।
আল্লা রইল হালে রে রছুল পয়গম্বর,
আরে ডাইন চৌখে কি কইতে পারে বাও চৌখের খবর?
এই লহর দরিয়ার মধ্যে বিষম যমের থানা,
নেকি বান্দা পার হইবে, বদি যাইতে মানা, (ভাই ফিরে না!)।
কমল মগদে বলে এ তনু আপ্‌ না,
ভুখারে দিও ভাত, তিয়াইসারে পানি,
নেংটারে দিও বস্ত্র বেহেস্তের নিশানী।

মুরসিদ্‌ = গুরু। বাণিয়া = বণিক। পাল্লা = তুলপাত্র। নেকি (নেক্‌) = ধার্ম্মিক। বান্দা = সৃষ্ট জীব, লোক। বদি = পাপী। কমল মগদ = একজনের নাম। বেহেস্ত = স্বর্গ।

(৪)

আরে কোহিলা না ডাহিও আর
বন্ধু গিছুন যদ্দ, ডাহ কোহিল হস্ত,
হিন যদি ডাহ কোহিল, মোর মাথাটি খাও।
বন্ধু গিছুন বিদেশং, খবনা লিখুন ছমাসং রে,
আরে বন্ধুর লাগি মোর কলিজা জ্বলি জ্বলি যায়!

(প্রতিভা, ভাদ্র) শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

*
* *

বর্ত্তমান বঙ্গের পল্লী-সমাজ।

আমাদের দেশ কতকগুলি পল্লীগ্রামের সমবায়। সুতরাং পল্লীসমাজই দেশের ভিত্তি অথবা জীবনীশক্তি। পল্লীসমাজ একই মন্ত্রে উজ্জীবিত, একই ঝঙ্কারে নিনাদিত, একই নিয়মে নিয়মিত হইলে দেশটিও জগদ্বাসীকে স্বীয় উন্নতি-মাধুর্য্যে বিমোহিত করিতে পারে। বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা কেবল ভূমিতেই পর্য্যাপ্ত নহে, বঙ্গীয় ফল জল সম্ভোগে বঙ্গাধিবাসীর মস্তিষ্কও তদনুরূপ উর্ব্বরতা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক, বাঙ্গালীর বুদ্ধি, বাঙ্গালীর বীর্য্য, বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্য তখনও ছিল এখনও আছে; তবে তাহা ব্যবহার-অভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর তেজ আছে, বীর্য্য আছে; কিন্তু তাহা আপনার অমঙ্গলের জন্য। বাঙ্গালীর হৃদয় আছে, তাহা কাম ক্রোধাদি রিপুনিচয়ের দাসত্বের জন্য। বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্য আছে কিন্তু তাহা স্বার্থপরতার সেবার জন্য। বাঙ্গালীর প্রীতি স্নেহ মমতা আছে, কিন্তু পরাক্রমশালীর জন্য। খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্যসত্ত্বেও, বঙ্গবাসী অধিকাংশ স্থলে খাদ্যহীন, ফলতঃ ভূমণ্ডলে এমন বৈভবপূর্ণ দেশ দারিদ্র্যপীড়িত হইতে দৃষ্ট হয় নাই। তাহাদের জলপূর্ণ দীর্ঘিকা আছে, সুবৃহৎ জলাশয় আছে, কিন্তু তাহাতে পানীয় জলের সম্পূর্ণ অভাব। নিজের অবহেলাবশতঃ তাহারা পুষ্করিণীর জল দূষিত ও দুর্গন্ধময় করিয়া তোলে।

অধিকাংশ পল্লীতেই রাস্তাঘাটের সুবন্দোবস্ত নাই। পথ-পার্শ্বস্থ বৃক্ষের পত্রাদি গলিত হইয়া বৎসরের প্রায় সমস্ত সময়ই উহা নিকৃষ্ট অবস্থায় পতিত থাকে। বায়ু দূষিত হয়। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ অচিরে অসংখ্য লোকের মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ইহাতেই সামাজিক ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত বৈষম্য স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে। এক্ষণে মানুষ আছে কিন্তু মনুষ্যত্ব নাই, বিদ্যালয় আছে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানলাভে অনুরাগ নাই, ভক্তি নাই, ব্রতসাধনে দৃঢ়তা নাই। এক্ষণে লোকের ধ্যানের বস্তু জ্ঞান নহে, পৃথিবীর সুবর্ণরাশি; তপস্যার ধন এজগতের সম্পদ্‌ভাণ্ডার, স্বকীয় আধিপত্য—স্বকীয় প্রতিপত্তি।

এক্ষণে পরের দুঃখে মানুষের হৃদয় কাঁদিয়া উঠে না, পতিতকে দেখিয়া উত্তোলনার্থ মানুষের হস্ত প্রসারিত হয় না, ক্ষুধিতের মুখে এক মুষ্টি অন্ন তুলিয়া দিতে তাহাদের প্রাণ-দেবতার কিরূপ বিরক্তিব্যঞ্জক নাসাকুঞ্চন।

প্রকৃত নীতিশিক্ষার অভাবই ইহার প্রধানতম কারণ। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে স্ত্রী-শিক্ষার অভাবই নীতিশিক্ষাভাবের অন্যতম কারণ। কেননা গৃহই আমাদের নীতি-শিক্ষা-লাভের প্রকৃত বিদ্যামন্দির, এ বিষয়ে মাতাই আমাদের যথার্থ শিক্ষয়িত্রী।

ফলতঃ যতদিন বঙ্গমহিলা অজ্ঞান-অবগুণ্ঠনে তাহাদের আনন আবৃত করিয়া রাখিবে ততদিন বঙ্গে মঙ্গলের আশা সুদূর পরাহত। বঙ্গবাসী যেরূপ অসংযতেন্দ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, যেরূপে ফণীহারকে মণিহার বলিয়া গলদেশে ধারণ করিতেছে, এরূপ সময়ে বিদুষী বঙ্গজননী ব্যতীত অন্য কেহ এই দুর্নিবার স্রোতের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কারণ আমরা যতই করিতে প্রয়াস পাই না কেন অন্তর্জগতে প্রবলতা লাভ করিতে না পারিলে বহির্জগতে অপ্রতিহত গতির সমক্ষে বালির বাঁধ মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইবে। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সহজবোধ্য।

আমরা সমাজ-সংস্কারার্থ যতই উপায় অবলম্বন করি না কেন, যতই বিভিন্ন সম্প্রদায় করি না কেন, যতই স্কুল কলেজ-স্থাপন, রাস্তা-ঘাট-নির্ম্মাণ, জলাশয়াদি-খনন, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি রোধ, বিধবা-বিবাহ-প্রচলন, পণপ্রথা-নিবারণ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন এবং অন্যান্য বহুবিধ মঙ্গলকর অনুষ্ঠান যতই করি না কেন, তাহা নিষ্ফলতায় সমাপ্ত হইবে। অন্তর্জগত নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইলে তবে বাহিক কর্ম্মের সাফল্য লক্ষিত হইবে। সুশিক্ষিতা বঙ্গজননীই এস্থলে একমাত্র ফলপ্রদ ঔষধরূপে ব্যবস্থাপিত হইতে পারে।

কতিপয় দূরদর্শী বঙ্গবীরের চক্ষে দেশের এই মহান অভাব অনুভূত হইয়াছিল এবং তাঁহাদেরই উদ্যমে বঙ্গে কতিপয় স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! কয়টি পূর্ণশিক্ষিতা রমণী ঐ সমুদয় বিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বঙ্গের গৃহ আলোকিত করিয়াছে? সুতরাং বঙ্গের শিক্ষাস্রোত ফিরাইতে হইবে। শিক্ষা বহির্মুখিনী হইয়া শুধু বহির্জগতেই চক্ষুর বিকাশ করিতেছে। এবং অন্তর্জগৎ ক্রমে মলিন ও মলিনতর হইয়া সমাজের জীবনীশক্তি ধ্বংস করিতে চলিয়াছে।

মনুষ্যত্বই ব্যক্তিগত জাতিগত অথবা বিশ্বগত উন্নতির একমাত্র সুগম ও সুনিশ্চিত পন্থা। "বাঙ্গালী মুখে দড়" এই অপবাদ আমাদিগকে ঘুচাইতে হইবে। নিজে করিতে হইবে এবং নিজের কৃতকার্য্যতা অন্ধ বাঙ্গালীর চক্ষের উপর ধারণ করিতে হইবে। অতঃপর বক্তৃতায়

উদ্বুদ্ধ করিয়া আপন পথানুসারী করিতে হইবে। তাহা হইলেই সভাসমিতির উদ্দেশ্য সার্থক হইতে পারে। এজন্যই আপনি কৃষিকর্ম্ম করিয়া প্রতিগৃহে কৃষিবিদ্যা প্রচার কর; "বাঙ্গালার মাটিতে আবার সোণা ফলিয়া উঠুক"। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের হস্তেই সমাজ; তাহারা সমাজকে ভাঙ্গিতে, গড়িতে অথবা ইচ্ছানুরূপ ছাঁচ ফলাইতে পারে। কারণ শিক্ষিতসমাজ দেশকে যেরূপ ভাব প্রদর্শন করিবে দেশও তদ্রূপ অনুকরণ করিবে। বঙ্গে বর্ত্তমান জড়ত্বের প্রভাবও শিক্ষিতসমাজ কর্ত্তৃক আনীত। অতএব আমাদিগকে স্বয়ং প্রত্যেক স্বদেশহিতকর কর্ম্মে ব্রতী হইয়া হতাদর কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতির প্রকৃত মর্য্যাদাজ্ঞান পুনরায় বঙ্গহৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে হইবে।

সর্ব্বোপরি সমাজে সংযম-শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। সুতরাং যাবতীয় হিতকর অনুষ্ঠানে শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে অগ্রণী হইতে হইবে। দুঃসময়ের উপায়স্বরূপ গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া লোককে সঞ্চয়শীল করিতে হইবে। প্রতি গ্রামের যাতায়াতের রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ ও সংস্কার এবং স্বাস্থ্য-মঙ্গলকর বিশুদ্ধ জলাধার প্রভৃতি খনন করিয়া লোকের কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিকাশসাধন করিতে হইবে। শিক্ষার্থ স্থানে স্থানে নীতি-পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া লোকের সৎকার্য্য-প্রবৃত্তি আনয়ন করিতে হইবে।

মানব-জীবনের ভিত্তি শৈশবকাল। শৈশবকালই শিক্ষালাভের প্রকৃত সময়। সুতরাং শিশুকে যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য নিয়মানুসারে রক্ষা করিতে হইবে।

সন্তানগণ যাহাতে সুস্থ ও সবল হয় তন্নিমিত্ত তাহার পিতামাতাকেও সুস্থ ও সবল হইতে হইবে। অপরিণত বয়সে পরিণীত ব্যক্তির সন্তানাদি প্রায়ই প্রত্যেক দিকেই অপরিণত হয়। অতএব স্বদেশের মঙ্গলেচ্ছু মাত্রকেই বাল্য-বিবাহ বর্জ্জন করিতে হইবে। নির্দ্দোষ সন্তানলাভহেতু মাতাপিতাকে পূর্ব্বেই নির্দ্দোষ হইতে হইবে।

শিশুর যাহাতে বিলাসস্পৃহা বৃদ্ধি পাইতে না পারে তজ্জন্য আহারে বিহারে, পরিচ্ছদভূষণে ফলতঃ সর্ব্বপ্রকারে শিশুর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার পূর্ব্বে শিশুকে স্বাভাবিক শোভা উপভোগ করিতে হইবে। নির্ম্মল বায়ু, সুবিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র, সুবৃহৎ জলাশয় সমুচ্চ বৃক্ষ ও চন্দ্রোদ্ভাসিত আকাশে শিশু যাহাতে ভগবানের করুণা উপলব্ধি করিতে পারে তজ্জন্য মাতাপিতা ও অন্যান্য গুরুজনকে তদ্বিষয়ক সরল প্রশ্ন করিতে হইবে। সেই সৌন্দর্য্য-সাগর হইতে আগত শিশু এই সৌন্দর্য্য-সম্পদ উপভোগ করিতে পারিলে তাহার বিস্মৃতপ্রায় ভগবৎ-প্রেম পুনরায় হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে।

দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান সভ্যতাযোগে স্ত্রীসুলভ কোমলতা কমনীয়তা পুরুষহৃদয় আক্রমণ করিয়া অসংখ্য অনর্থের নিদান হইয়াছে। "আমরা ছেলেপিলের যেরূপ নামকরণ করিতেছি অর্থাৎ কাহাকেও রমণীমোহন, কামিনীরঞ্জন, ননীগোপাল প্রভৃতি নাম দিতেছি ইহাতে আমাদের শরীর ও মন দুর্ব্বল হইয়া যেন মেয়েলী রকমের হইয়া পড়িতেছে।" বাস্তবিকই অধিকাংশ স্থলে বঙ্গীয় পুরুষ সন্তানসন্ততি-প্রতি আদর বা প্রশ্রয়ের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে; যে ব্যক্তি অতি দরিদ্র, হয়ত কঠোর পরিশ্রমে উদরপূর্ত্তির সংস্থান করিতেছে সেও আপনার প্রাণপ্রিয় ননীর পুতুলের আহার ভূষণের নিমিত্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া শৈশবেই তাহাকে বাবুয়ানা বা বিলাসপ্রিয় করিয়া তুলিতেছে। যতদিন তাহারা এতাদৃশ অপত্যস্নেহের বিষম পরিণাম উপলব্ধি না করিবে, যতদিন সন্তানগণ অন্যায় প্রশ্রয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ততদিন বঙ্গসমাজের অভ্যুত্থানাশা আকাশে অট্টালিকানির্ম্মাণবৎ ব্যর্থ হইবে।

এক্ষণে কতিপয় কর্ত্তব্য-প্রণালীর উল্লেখ করিয়া আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার করা হইবে।

(১ম) শিক্ষা সম্বন্ধে—উদ্দেশ্য শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক উন্নতি—

১। শৈশবেই শারীরিক উন্নতির নিমিত্ত স্বাস্থ্যকর ক্রীড়ায় যোগদান করিবার প্রবৃত্তি শিশুহৃদয়ে জাগাইতে হইবে।

২। বিদ্যালয়ে ব্যায়াম ও অন্যান্য অঙ্গচালনাদি, পরীক্ষার অঙ্গ হইবে। সে বিষয়ে পাশ না হইলে তাহাকে উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে না। এজন্য উৎসাহজনক পুরস্কারাদি ঘোষণা করিতে হইবে।

৩। প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম শিক্ষাদানার্থ অতিরিক্ত বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে।

৪। ছাত্রদের বেতন সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াই হউক বা অন্য উপায়ে স্কুলে ছাত্রদের জলযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। দূর হইতে আগত ছাত্রদের সুবিধার জন্য, যাহাতে তাহারা ছুটির পর ব্যায়াম করিতে পারে তজ্জন্য স্কুলের কার্য্য অপেক্ষাকৃত কিছু পূর্ব্বে আরম্ভ করা হইবে।

৬। সম্ভবপর হইলে মধ্যে মধ্যে শিক্ষক মহাশয়কে অথবা অন্য তত্ত্বাবধায়ককে ছাত্রদের বাটীর আহার বিহার পাঠাগার ও অপরাপর বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব অবগতির চেষ্টা করিতে হইবে।

(২য়) মানসিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে—

১। বিদ্যালয়ের পাঠ পুনঃ কার্য্যের অনুশীলনে প্রদর্শন করিতে হইবে। দেখিতে হইবে উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার চেষ্টা হইতেছে কি না।

২। অন্ততঃ মাসিক একদিন নৈতিক শিক্ষাসমিতি আহুত হইবে।

৩। প্রতি গ্রামে সাপ্তাহিক সাহায্যসমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(ক) সমিতির একজন সম্পাদক থাকিবে। সেই সম্পাদক সচ্চরিত্র হইবে ও শিক্ষকসভাকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে।

(খ) সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে দৈনিক বিবরণী লিখিতে হইবে।

(গ) কর্ত্তব্যবীর ফ্রাঙ্কলিনের ডাইরী অনুসারে উক্ত পুস্তক গঠিত হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক সভ্যকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

(ঙ) নির্ব্বাচিত সম্পাদক তাহাদের ডাইরী দেখিয়া প্রত্যেকের দৈনিক উন্নতি লক্ষ্য করিবেন এবং সদ্বিবেচনানুযায়ী উপদেশ দিবেন। সম্পাদক প্রাণান্তেও কাহারও দোষ বা অভাবাদি অন্যের নিকট প্রকাশ করিবেন না।

(চ) মাসিক সমিতিতে কেবল সম্পাদক ও অন্যান্য নীতিজ্ঞ ব্যক্তি বা শিক্ষকই উপস্থিত থাকিবেন। সম্পাদক তাঁহাদের নিকট আপন আপন পল্লীর বিবরণী পুস্তক প্রদান করিবেন এবং উপস্থিত ব্যক্তি প্রত্যেক স্থলে আপনাদের মন্তব্য লিখিয়া প্রকাশ করিবেন এবং প্রতিযোগিতার জন্য কোন পল্লীর কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক হইতেছে তাহা সভাতে সর্ব্বসম্পাদক সমীপে জ্ঞাপন করিবেন। ইহাতে আপন আপন পল্লীর উন্নতি-পিপাসা জাগাইয়া তুলিবে।

(ছ) বৎসরের শেষে যে পল্লী শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহাতে উৎসাহ বৃদ্ধিকর পুরস্কারাদি প্রদান করিবেন।

(জ) এতদ্ব্যতীত প্রতি পল্লীর সম্পাদককে যতদূর সম্ভব দেখিতে হইবে সভ্যগণ প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতেছে কি না।

(ঝ) প্রত্যেক ছাত্রকে প্রাকৃতিক শোভা প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(ঞ) প্রতি পল্লীতে ধর্ম্ম ও নীতি-পুস্তকাগার স্থাপন করিতে হইবে অথবা স্কুল লাইব্রেরী হইতে ছাত্রগণকে ঐরূপ পুস্তক ধার দিতে হইবে।

(ট) প্রত্যেক ছাত্রকে যতদূর সম্ভব ব্রহ্মচর্য্য-নিয়মানুসারে কার্য্য করাইতে হইবে।

(ঠ) প্রত্যহ ভক্তিলাভের উপায়স্বরূপ কতক্ষণ নির্জ্জনে আরাধ্য দেবতার নিকট ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিতে হইবে। পুষ্প-চন্দনাদি প্রদানে নিত্য-নৈমিত্তিক পূজায় যতদূর সম্ভব যোগদান করিতে হইবে।

(ড) তাহাদিগকে সৎ সংসর্গে ও সদ্ভাবে জীবন যাপনের পন্থা করিয়া দিতে হইবে।

(ঢ) ধনীদরিদ্র সকলকেই বিলাসসামগ্রী চক্ষুর অন্তরাল করিতে হইবে।

(ণ) তাহাদিগকে ক্রমশঃ ত্যাগ শিক্ষা দিতে হইবে।

(ত) রঙ্গালয় অথবা সাধারণ নাটকাভিনয় হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখিতে হইবে।

ফলতঃ তাহাদিগকে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য-নিয়মে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অঙ্গ—"সংযম-শিক্ষা"।

(৩য়) যুবক-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য।

১। বর্ত্তমান সংসারী লোকের একটি ধারণা আছে, মানুষ উচ্চশিক্ষা লাভ করে শুধু অর্থ প্রতিপত্তি ও সুখসম্ভোগের জন্য। এজন্য জীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া পার্থিব প্রতিপত্তির অন্বেষণেই মন প্রাণ সমর্পণ করে। শিক্ষিত সম্প্রদায়কে প্রথমতঃ এই ভ্রান্ত সংস্কার দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। এজন্য তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষিত ও ধনী-সন্তান হইলেও জীবনের প্রকৃত উজ্জ্বল চরিত্র ও মহৎ উদ্দেশ্যের আদর্শ হইয়া তাহা লোকের হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে।

২। সমাজ-সংস্কারে শিক্ষিত ধনবান ব্যক্তিকে অগ্রণী হইতে হইবে।

৩। শিক্ষিত-সমাজকে কৃষিক্ষেত্রে, বাণিজ্য-ব্যাপারে ও শিল্পের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইতে হইবে। নতুবা সভাসমিতি আহ্বান করিয়া যদি শিক্ষিত সমাজ,—কেহ জজ, কেহ ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ ব্যারিষ্টার, কেহ উকিল, কেহ বা অন্যান্য উচ্চপদ কর্ম্মচারীরূপে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সামান্য পরিমাণেও দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে না।

৪। শিক্ষিত সমাজকে সংযমী হইতে হইবে, ধার্ম্মিক হইতে হইবে, পর-সেবক হইতে হইবে।

৫। প্রত্যেক পরগণায় একটি বাৎসরিক সমিতি আহ্বান করিয়া প্রতি বৎসরের ফলাফল আলোচনা করিতে হইবে।

৬। প্রত্যেক পরগণায় ত্রৈবার্ষিক কি পাঞ্চবার্ষিক প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে শ্রমজাত পদার্থনিচয়ের প্রদর্শন হইবে ও পুরস্কারাদি প্রদানে উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইবে।

৭। প্রত্যেক পল্লীর শিক্ষিত লোককে নিঃস্বার্থভাবে আপন পল্লীর রাস্তাঘাট, জলাশয়-খনন ও সংস্কার, ও সাধারণের উপকারার্থ অন্যবিধ অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৮। প্রত্যেক পল্লীতে অন্ততঃ একজন সুযোগ্য ডাক্তারের বন্দোবস্ত হইলে বিশেষ মঙ্গল হয়; অগত্যা প্রত্যেক তিন চারি পল্লীতে একখানি সরকারী ডাক্তারখানা বিশেষ আবশ্যকীয়।

৯। বাল্যবিবাহ-রোধ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির প্রচার করিতে হইবে।

১০। যাহাতে প্রতিগ্রামে কলহ বিবাদ হ্রাস হয়, যাহাতে লোককে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না হয়, যাহাতে লোক অমিতাচারে মদ্যপানাদি ও অন্যান্য অসদ্ব্যবহারে অর্থশ্রাদ্ধ না করে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

১১। উৎকোচ গ্রহণ, অপরিমিত সুদে কর্জ্জ-প্রদান এবং অন্যান্য অন্যায় উপায়ে অর্থ-গ্রহণ নিবারণ করিতে হইবে। বহু-বিবাহ ও বিবাহের যৌতুক নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১২। দেশবাসীদিগকে মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়শীল করিবার জন্য স্থানে স্থানে ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন করিতে হইবে।

১৩। গো মহিষাদি গৃহপালিত জন্তুর আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে হইবে।

১৪। শিল্পাদি শিক্ষার জন্য লোক বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে। এবং বিদেশ-প্রেরিত পরার্থপর দেশসেবককে নিঃসঙ্কোচে সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক-একটি লাইকার্গাস হইতে হইবে।

১৬। প্রত্যেক বঙ্গহিতৈষীকেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'ভারতের বাহ্য সম্পদ ও উন্নতি কেবল মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।' প্রাচীন-কালে তাহাই হইয়াছিল। এখনই বা বাঙ্গালীর না হইতে পারিবে কেন? ভারতের মন্ত্রশিষ্য জাপানবাসীর হইতেছে ত।

(গৃহস্থ, আশ্বিন) শ্রীরমণীমোহন চৌধুরি বি, এল,

*
* *

কুসংস্কার

"In all superstition wise men follow fools."—Bacon,
"Automatism telligence turns conduct
into stupid idolatry."

১। কুসংস্কারের স্থান

সামাজিক রীতিনীতি দ্বিবিধ আজ্ঞাধীন—এক নির্দ্দিষ্ট শাসকের আজ্ঞা, যেমন শাস্ত্রাজ্ঞা, রাজাজ্ঞা প্রভৃতি; আর এক অনির্দ্দিষ্ট শাসকের আজ্ঞা যেমন লোকাচার, মানসম্ভ্রম জ্ঞান, ন্যায়ান্যায় বিবেচনা, স্বাভাবিক নিয়ম প্রভৃতি। এ সকলের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট শাসকাজ্ঞা মাত্রে অর্থাৎ প্রকৃত শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা, রাজাজ্ঞা, এবং স্বাভাবিক নিয়মাবলী প্রভৃতির শক্তি, সাধারণ হ্রাসবৃদ্ধিহীন, অপরিচ্ছিন্ন ও সমভাব; কিন্তু, লোকাচার প্রভৃতি অবশিষ্ট অনির্দ্দিষ্ট শাসকাজ্ঞার (অর্থাৎ যাহাদের উৎপত্তিকারণ চাক্ষুষ গোচর নহে) শক্তি নিয়মবিগর্হিত, নানাবিধ, ব্যক্তিগত ও স্বতন্ত্র। আবার সমাজগত বা জাতিগত কোন কোন রীতিনীতি রাজশাসনাজ্ঞাধীন হওয়ায় প্রথম অবস্থাপন্ন হইয়াছে। ঐ দ্বিতীয়বিধ অনির্দ্দিষ্ট শাসকাজ্ঞাজনিত রীতিনীতির মধ্যেই কুসংস্কার বিদ্যমান থাকিতে পারে।

২। শাস্ত্র ও কুসংস্কার

প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রপাদপে বহুতর কুসংস্কার আগাছা পরগাছা আশ্রয়লাভ করিয়া স্থানে স্থানে ধর্ম্মপাদপকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিয়াছে, স্থানে স্থানে তাহারা নিজেরা ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া সরল মানবের মনে ভ্রম উৎপাদন করিতেছে।

অনেক প্রাচীন মত পুরাকালে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য ছিল তখন তাহা কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইত না; এক্ষণে, কিন্তু জ্ঞানাধিক্যে ন্যায়বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করা কুসংস্কার। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিধিনিষেধ সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম পালন করিলে কুসংস্কার হইতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন—

(১) যে-সকল কার্য্যের পারত্রিক ভিন্ন ঐহিক কোন ফল দেখা যায় না তাহা নিরর্থক অতএব ত্যাজ্য।

(২) হানিকর নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য সকল সময়ই ত্যাজ্য।

(৩) ন্যায় বিচারসিদ্ধ কার্য্য করণীয়।

৩। অসভ্য সমাজে কুসংস্কার

এই কুসংস্কার নামক মহৎ সামাজিক অনিষ্ট ও লৌকিক দোষ প্রায় সকল সমাজেই অল্পাধিক বিদ্যমান; অসভ্য সমাজেই ইহা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় কুসংস্কার অসভ্যতার আনুসঙ্গিক চিহ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

এইরূপ কুসংস্কার ব্যক্তিগত জাতিগত ও সমস্ত সমাজগত এই ত্রিবিধ-ভাবে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। আচার ব্যবহার রীতিনীতি বিশ্বাস বিষয়ের অস্বাস্থ্য মাত্রকেই কুসংস্কার সংজ্ঞা দেওয়া যায়। কুসংস্কারের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধেও নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এক এক সমাজে এক এক ধরণের কুসংস্কার অধিক পরিমাণে বিদ্যমান; এক এক মণ্ডলীর এমন কি এক এক মানবের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন কুসংস্কার আছে।

৪। কুসংস্কারের উৎপত্তি

(ক) অজ্ঞান হইতে।

(খ) ভবিষ্যৎ জানিবার ইচ্ছা হইতে।

(গ) তুলনা দ্বারা সুনীতি হইতে কুনীতির সৃষ্টি।

সুনিয়ম হইতেও প্রসঙ্গক্রমে অনেক সময়ে কুনিয়মের আবির্ভাব হয়। শাস্ত্রোক্ত অনেক বিধি নিষেধ প্রভৃতির কারণ সাধারণের বোধগম্য নহে, তাহারা কল্পিত কারণ প্রদর্শন করে। তৎপরে তুলনা দ্বারা ঐ কল্পিত কারণের অন্যান্য নিরর্থক ফল উহার সহিত সংযুক্ত করা হয় কিম্বা উক্ত সুনিয়মের অনুরূপ যে কোন কার্য্যকে একত্র করিয়া বহুবিধ বিধি-ব্যবস্থা নিয়মাদির সৃষ্টি করা হয়, ইহার অধিকাংশই কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(ঘ) অপরের উপর প্রভুত্ব-বিস্তার আশায় বা স্বার্থসিদ্ধির মানসে।

অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য, জনসাধারণের নিকট প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিবার মানসে স্বার্থসিদ্ধি করণার্থে পুরোহিত ধর্ম্মযাজকাদি অনেক স্বকপোলকল্পিত কুসংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন, শিক্ষা ও প্রশ্রয় দিতেছেন। ফলশ্রুতি ভয়প্রদর্শন নানাবিধ তীর্থের গল্প ও করণীয় অধিকাংশ এই অর্থে সৃষ্ট। রাজবিপ্লব বা ধর্ম্ম-বিপ্লবের সময় অনেক যথেচ্ছাচারিতার উদ্ভব হয় তজ্জন্য ঐ সময়ে বা কোন দৈব দুর্ঘটনার সময়ে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত এইরূপ অনেক কুসংস্কার সৃষ্টি করে।

(ঙ) স্তুতিবাদক ও কবিদিগের সৃষ্টি।

আর এক প্রকার কুসংস্কার সৃষ্ট হইয়াছে। স্তুতিবাদক কবি-দিগের বর্ণনায়। বাদসা সেকন্দর আপনাকে জুপিটর এমনের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন। তচ্ছ্রবণে পরবর্ত্তী কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন, কিরূপে জুপিটর সেকেন্দরের মাতাকে বিবাহ করেন, কিরূপে সেকেন্দরের জন্ম হয় প্রভৃতি। এইরূপে অধিকাংশ পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সৃষ্টি হইয়াছে;—যেমন, কবি কালিদাস সরস্বতী দেবীর বরপুত্র।

ধর্ম্ম ও কুসংস্কার

এইরূপে সঠিক ধর্ম্মজ্ঞান উৎপত্তির বহু পূর্ব্বে ভূতাদিগত কুসংস্কার সৃষ্ট হয়, পরে এইরূপ কুসংস্কার সমষ্টিই একপ্রকার ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় (Fetisism); ইহা অসভ্য সমাজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কুসংস্কার। বিপরীত পক্ষে আবার প্রকৃত ধর্ম্মে ক্রমে শাস্ত্রীয় পণ্ডিত ও পুরোহিত-গণের অত্যাচারে অনেক কুসংস্কার সংযুক্ত করিয়া সেগুলিকে ধর্ম্মের অংশীভূত করা হইয়াছে।

কুসংস্কারের বিভাগ

তাহা হইলে বুঝা গেল কুসংস্কার প্রধানতঃ ত্রিবিধ;—(১) শাস্ত্রীয় বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কুসংস্কার-রাজ্য—ইহা প্রবল-প্রতাপ-সম্পন্ন, মহা অনিষ্টকর ভ্রমোৎপাদক। (২) সামাজিক এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞানার্জ্জনোদ্দেশে জ্যোতিষ ও ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধীয় কুসংস্কার-রাজ্য—ইহাও শক্তিশালী, চিত্তবিমর্ষকারী, ক্ষতিকারক। (৩) মেয়েলী সমাজের অশেষবিধ কুসংস্কার—ইহা নিরর্থক, অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যাস্পদ। যেমন রোমান-দিগের সপ্ত সংখ্যা, ইংরাজদিগের ত্রয়োদশ, আমাদিগের তিন শক্র, হাঁচি, টিকটিকির বিষয়, পশ্চাতে আহ্বানাদি, পূর্ণকুম্ভ শূন্যকুম্ভ প্রভৃতি কতবিধ রকমের শত শত বদ্ধমূল কুসংস্কার। যে-সকল দ্রব্যাদি স্বতঃ মনের প্রফুল্লতা নষ্ট করে তাহা বর্জ্জনীয়; ইহার অনেকগুলি আমাদিগের মনকে পূর্ব্ব হইতে তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া মনের প্রফুল্লতা হরণ করিয়া কুফল আনয়নের সাহায্য করে।

৫। কুসংস্কারের শক্তি এবং ফলাফল

কুসংস্কারের উৎপত্তি যাহাই হউক না কেন প্রবল প্রতাপ অখণ্ডনীয়। ন্যায়ানুগ-বিচারশাসিত মানব-মনও ইহার প্রতাপে পরাজিত। কদভ্যাস! সম্পূর্ণ নিরর্থকতা উপলব্ধি হওয়া সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ অযুক্তিকর বলিয়া ধারণা হইলেও, একেবারে সম্বন্ধহীনতা দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কি এক অদৃশ্য বলের বশবর্ত্তী হইয়া, কি এক অব্যক্তভয়ের অধীন হইয়া মানব-মন ক্রীতদাসের ন্যায় ঘৃণিত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। হইতে পারে দৈনিক মাসিক বা বার্ষিক ঘটনাপর্য্যায় কখন কোন দুর্ঘটনা ঐ কুনিমিত্তের দিবসে মাসে বা বর্ষে ঘটিয়া থাকিবে; সে ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটনার নিজ স্রোতেই ঘটিয়াছে, কুনিমিত্তের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই কারণ ঐরূপ দুর্ঘটনা কুনিমিত্তবিহীন হইয়াও অনেকবার ঘটিয়াছে। কিন্তু কুসংস্কার-তমসাচ্ছন্ন মন ঐ সম্মিলন দিবস মাস বা বর্ষ তীক্ষ্ণভাবে স্মরণ করিয়া রাখে, অমিলনের সংবাদ আদৌ রাখে না, কেহ তর্ক করিলে ঠিক তারিখ মাস ও বর্ষের উল্লেখ করিয়া নিজ মতের যুক্তি প্রদর্শন করে।

এই কুসংস্কার-তমসাচ্ছন্ন মানস কখনও কোন ঘটনা—এমন কি একটি বৃক্ষপত্র পতন, একটি জন্তুর রব সাধারণ নির্ম্মল দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না; তাহার দৃষ্টিতে সকলই ভয়ের আধার, মনসঙ্কোচনকারী। ক্রমে মনের স্বাস্থ্য হারাইয়া ঐরূপ লোকেরা প্রত্যেক দ্রব্য কেবল মন্দভাবে দর্শন করে অর্থাৎ উহারা pessimists হইয়া দাঁড়ায়।

কদভ্যাস লৌকিক জীবনে যে কুফল প্রসব করে, কুসংস্কারও সামাজিক জীবনে সেইরূপ কুফল প্রসব করে, কারণ কুসংস্কার সমাজের কদভ্যাস। অতএব কুসংস্কার দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা। কেবল দুঃখভোগ নয়, নিরুৎসাহে কার্য্যহানি, সুযোগাহরণে বিলম্ব করায় দারিদ্র্য, কলুষিত নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি কতবিধ কুফল ইহা হইতে উৎপন্ন। অনেকে বলেন হিন্দুদিগের শাসনকালের শেষ সময়ের কুসংস্কারাধিক্য তাহাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

৬। কুসংস্কারের নিরাকরণ

সমূলে শাখাপ্রশাখার সহিত একেবারে উন্মূলন করা ভিন্ন অন্য গতি নাই। যদি তাহার সহিত দুই একটি ভাল প্রয়োজনীয় লতাও ধ্বংস হয় তাহা বরং একক্ষেত্রে, ভাল, সেগুলি আবার বসাইয়া লওয়া যাইবে; কুসংস্কারের কিন্তু মূল থাকিলেই আবার বৃদ্ধি পাইবে। সমূলে উৎপাটন—সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা—যাহা হয় হউক, শাস্ত্রভয় করিও না।

অবশ্য যাহার কারণ বা উদ্দেশ্য বোধগম্য তাহা ত্যাগ করার প্রয়োজন নাই। অনুজ্ঞার অক্ষর অপেক্ষা অর্থের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাহা বিচার-সঙ্গত, অর্থযুক্ত, বিবেকানুমোদিত হইবে তাহাই পালনীয়, কেবল মাত্র অনুজ্ঞা আছে, ফলশ্রুতি আছে, না করিলে অমুক দোষ হয়, সেই ভয়ে কখনই উহা পালন করা উচিত নহে।

আমাদের অন্তরে দ্বিমুখীন বিচার উপবিষ্ট—নীতিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা; একটী আভ্যন্তরিক দৃষ্টি, অপরটি ভবিষ্য বাহিক দৃষ্টি, একটি স্বতঃজ্ঞান (Instinct) অপরটি প্রামাণ্য জ্ঞান (Experience)। অন্তরস্থ বহুবিধ সংবৃত্তির সমবায়ের বিচার-ফলই কর্ত্তব্যজ্ঞান। কর্ত্তব্যজ্ঞান স্বতঃনীতিজ্ঞান ও প্রামাণ্য জ্ঞানের উপর অধিষ্ঠিত। আভ্যন্তরিক জ্ঞান বাহিক আকার ধারণ করিতে অনেকাংশে দেশ-কাল-পাত্র-গত বিকারপ্রাপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। নীতি অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিশোধিত হইয়া নূতন নীতি সৃষ্টি করে। অতএব ন্যায়ান্যায় কোনও অবিচলিত চিরস্থায়ী এক সত্য নহে। আমরা বিবেকবিচারে সমস্ত নীতিশাস্ত্র বিচার করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিব, নচেৎ ভ্রমসঙ্কুল পথে পতিত হইব; তবে আমরা নিজে যেন নিজেকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা না করি।

কুসংস্কার মাত্রেই অযুক্তিকর, উন্নতির অন্তরায়, হানিকর বা বৃথা। ইহাদের ফলাফল বিশেষরূপে বিচার করা কর্ত্তব্য; যাহাতে কোন উপকারিতা দেখা যায় না তাহা পালনীয় নহে; কল্পিত বা পারলৌকিক হিত উপকারিতা নহে। ফলভয় সম্পূর্ণ অলীক। যাহারা এ সকলের প্রশ্রয় দেয় তাহাদিগকে পর্য্যন্ত ক্রুরভাবে উপহাস করা কর্ত্তব্য। মন নিরানন্দময় উৎসাহহীন বিচলিত করিবার এইগুলি অন্যতম কারণ তজ্জন্য ইহা হইতে যাহা কিছু কুফল ফলিতে পারে। অতএব চলিত কথায় যে বলে,—"যাহার নাই উত্তর পুব, তার মনে সদাই সুখ" অনেকটা সত্য। এরূপ নিরর্থক সংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়া অন্যায় ও পাপ-মধ্যে গণ্য করা যায়। এবম্প্রকার সহস্র সহস্র কুসংস্কার আবর্জনা স্মৃতি হইতে নির্ম্মল ঐশ্বরিক বিশ্বাসস্রোতে সাবধানে প্রক্ষালন করিলে মানসক্ষেত্র স্বচ্ছ করিতে পারিলে আর ঐ সকল ঘটনায় মন মলিন হইতে পারে না বা মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হয় না। কার্য্যের ফলাফল অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কারণের উপর নির্ভর করে, ততক্ষণ সেই সকলের চর্চ্চা করা শ্রেয়স্কর। শাস্ত্র-ভয়, সমাজ-ভয়, লোকলজ্জা, ফলভয়, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া বিবেকবিচার সঙ্গে লইয়া দৃঢ়রূপে অগ্রসর হও, সন্দেহস্থলে বিশেষ বিচার কর, অদ্য এই মুহূর্ত্ত হইতে যাহা কেন হউক না আমি কুসংস্কারে বিশ্বাস চিরতরে ত্যাগ করিলাম।

উপসংহার, ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার

এক্ষণে এক কুসংস্কার ত্যাগ করিতে গিয়া আমরা যেন অপর কুসংস্কারে পতিত না হই। কুসংস্কার আছে বলিয়াই যেন আমরা শাস্ত্রে ও ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করি, কিম্বা যেন একেবারে নাস্তিক হইয়া না দাঁড়াই। কুসংস্কার ধর্ম্মে সমাজে ও লৌকিক জীবনে এই তিন অবস্থায় বিদ্যমান আছে। আমাদিগের একমাত্র প্রার্থনা ভগবানের নামে সুস্থ মনোবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সদসৎ বিচার পূর্ব্বক এই চিরানিষ্ট-উৎপাদক ত্রিধা কুসংস্কারের হস্ত হইতে প্রত্যেকেই উদ্ধার হইতে নিয়ত চেষ্টা করুন—নিজকে নিজে ফাঁকি না দিয়া কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করুন অর্থাৎ নিজের মনের দৌর্ব্বল্য বৃথা কাল্পনিক যুক্তিদ্বারা আবরিত করিতে চেষ্টা না করিয়া কার্য্য করুন, তাহাতে নিজ আত্মার ও সমষ্টি সমাজের বিশিষ্ট উপকার হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

(গৃহস্থ, আশ্বিন) শ্রীরামচন্দ্র মিত্র বি, এল।

প্লেটোর এয়ুথ্যুফ্রোন *

(অথবা পুণ্য-পরীক্ষা)

এই কথোপকথনের ব্যক্তিগণ—এয়ুথ্যুফ্রোন, সোক্রাটীস।

এয়ুথ্যুফ্রোন—হে সোক্রাটীস, আবার নূতনতর কি ঘটিয়াছে, যে তুমি ল্যুকেইওনের (Lyceum) জনসংঘ ত্যাগ করিয়া এখানে, প্রধান বিচারপতির দ্বারদেশে, কথা-বার্ত্তা বলিয়া কালাতিপাত করিতেছ? না, আমার মত তোমারও তাঁহার নিকটে অভিযোগ করিবার কিছু উপস্থিত হইয়াছে?

সোক্রাটীস—হে এয়ুথ্যুফ্রোন, আমি অভিযোক্তা নই, অভিযুক্ত। আমার মোকদ্দমাটা দেওয়ানী নয়, আথীনীয়েরা ইহাকে বলে ফৌজদারী।

এয়ুথ্যুফ্রোন—কি বলিতেছ? তবে তোমার বিরুদ্ধে কেহ অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে? তুমি যে অপর কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ, ইহা ভাবি-তেই পারি না।

সোক্রাটীস—নিশ্চয়ই নয়।

এয়ু—তবে অপরে তোমাকে অভিযুক্ত করিয়াছে?

সোক্রা—হাঁ।

এয়ু—সে কে?

সোক্রা—হে এয়ুথ্যুফ্রোন, আমি নিজেও যে সে লোক-টিকে বড় জানি, তা নয়; আমার বোধ হয় সে কোনও অজ্ঞাত নবযুবক, তবে শুনিতে পাই, তাহার নাম মেলী-টস। তাহার গোত্রটা নাকি পিটুথেয়ুস—যদি পিটুথেয়ুস গোত্রের মেলীটস বলিয়া কাহাকেও তোমার মনে থাকে; লোকটা দীর্ঘকেশ, বিরলশ্মশ্রু ও বক্রনাস।

এয়ু—আমি তাহাকে জানি না, সোক্রাটীস। আচ্ছা, সে তোমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে?

সোক্রা—কি অভিযোগ? আমার বোধ হয়, অভি-যোগটা তুচ্ছ নয়। কেননা, এমনতর একজন নবযুব-কের পক্ষে এতবড় একটা বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একটা অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার নহে। কারণ, সে বলে,

* মূল গ্রীক হইতে অনুবাদিত।

সে জানিতে পারিয়াছে, যুবকেরা কিরূপে উন্মার্গগামী হইতেছে ও কাহারা তাহাদিগকে উন্মার্গগামী করিতেছে। সুতরাং সে নিশ্চয়ই জ্ঞানীলোক হইবে। সন্তান যেমন মাতার নিকটে অভিযোগ করে, সেইরূপ সে আমার অজ্ঞানতা উপলব্ধি করিয়া, পুরীসমীপে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছে, যে, আমি তাহার সখাদিগকে বিপথগামী করিতেছি। আমার মনে হয়, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শুধু এই লোকটিই বিশুদ্ধ প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। কেননা, বিশুদ্ধ প্রণালীটি এই, যে, যেমন সুবুদ্ধি কৃষক প্রথমে চারাগাছগুলিকে যত্ন করে, পরে অপরগুলিকে দেখে, তেমনি যুবকেরা কিরূপে যতদূর সম্ভব ভাল হইতে পারে, সর্ব্বপ্রথমে তদ্‌বিষয়েই যত্নবান্ হইতে হইবে। বোধ হয় মেলীটসও সেইরূপ প্রথমে আমাদিগকে দূরীভূত করিতেছে, কেননা, সে বলে, আমরা যু্বকদিগকে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই বিপথগামী করিতেছি; স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ইহার পরেই সে বয়োজ্যেষ্ঠগণের প্রতি মনোনিবেশ করিবে, এবং এইরূপে নগরের ভূয়িষ্ঠ ও পরিপূর্ণ কল্যাণের কারণ হইয়া উঠিবে। সে যে প্রণালীতে কার্য্য আরব্ধ করিয়াছে, তাহাতে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

এয়ু—সোক্রাটীস, আশা করি, তাহাই হইবে, কিন্তু আমার ভয় হয়, ইহার বিপরীতই বা ঘটে। আমার বোধ হইতেছে, সে তোমার অনিষ্ট করিতে যাইয়া নগরের মুলোচ্ছেদ করিতে বসিয়াছে। কিন্তু আমাকে বল, তুমি এমন কি করিতেছ, যাহাতে সে বলে যে তুমি যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছ?

সোক্রা—সখে, তাহা শুনিতে বড়ই অদ্ভুত। সে বলে যে আমি দেবতা সৃষ্টি করিতেছি; এই জন্য সে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে যে আমি নূতন দেবতা সৃষ্টি করিয়াছি ও পুরাতন দেবতায় বিশ্বাস করি না।

এয়ু—বুঝিতে পারিতেছি, সোক্রাটীস; তুমি কি না বল যে তুমি সময়ে সময়ে দৈববাণী শুনিতে পাও, এই জন্য। সেই জন্যই সে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে যে তুমি একটা নূতন কিছু রচনা করিয়াছ, এবং সেই জন্যই তোমার প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে সে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়াছে; কেননা, সে জানে যে এই প্রকার বিষয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা অতি সহজ। এই দেখ না, আমি যখন লোকসমাজে দৈববিষয়ে কিছু বলি, ও অনাগত ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদিগকে ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনাই, তখন তাহারা আমাকে পাগল বিবেচনা করিয়া উপহাস করে। তবু তো আমি যত ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছি, সমস্তই সত্য হইয়াছে; কিন্তু তাহারা আমাদের মত সকলকেই ঈর্ষা করে। যাক, তাহাদিগের সম্বন্ধে ভাবিবার প্রয়োজন নাই; নির্ভয়ে তাহাদিগের সম্মুখীন হওয়াই কর্ত্তব্য।

সোক্রা—সখে এয়ুথ্যুফ্রোন, উপহাসভাজন হওয়া বোধ করি বড় বেশী একটা কিছু নয়। আমার তো বোধ হয়, যে, একজন যত বুদ্ধিমানই হউক না কেন, সে যতক্ষণ নিজের বিদ্যা অপরকে না শিক্ষা দেয়, ততক্ষণ আথীনীয়েরা তাহাকে বড় গ্রাহ্য করে না। কিন্তু যখন তাহারা মনে করে যে সে অপরকেও নিজের মত করিয়া তুলিতেছে, তখনই তাহারা ক্রুদ্ধ হয়, তা', তুমি যেমন বলিতেছ, ঈর্ষ্যাবশতঃই হউক, কি অপর কারণেই হউক।

এয়ু—এক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তাহাদের মনের ভাব কি, তাহা পরীক্ষা করিতে আমি বড় লালায়িত নই।

সোক্রা—না, কেনই বা লালায়িত হইবে। তাহারা হয়তো ভাবে যে তোমাকে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তুমি নিজের বিদ্যা অপরকে শিক্ষা দিতেও ব্যস্ত নও। কিন্তু আমার ভয় হয় যে আমি মানুষের সঙ্গ ভালবাসি বলিয়া তাহারা বা আমাকে তোমার বিপরীতই বিবেচনা করে; কেননা, আমি সকল বিষয়েই সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করি; সেজন্য যে শুধু বেতন গ্রহণ করি না, তাহা নহে, বরং যদি কেহ আমার কথা শুনিতে চায়, তবে তাহাকে আহ্লাদের সহিত অর্থ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। সুতরাং এই মাত্র যেমন বলিতেছিলাম, তাহারা যদি আমাকে শুধু পরিহাস করিত—যেমন তুমি বলিতেছ তোমাকে তাহারা পরিহাস করে—তবে বিচারালয়ে হাস্য-পরিহাস ও রঙ্গতামাসায় সময় অতিবাহিত করা অপ্রীতিকর হইত না; কিন্তু যদি তাহারা এ বিষয়ে প্রকৃতই দৃঢ়নিশ্চয় হয়, তবে ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা তোমার মত দৈবজ্ঞ ব্যতীত অপর সকলের পক্ষেই তমসাবৃত।

এয়ু— সোক্রাটীস, আমার কিন্তু বোধ হয়, ব্যাপারটা কিছুই দাঁড়াইবে না; তুমি এই বিচার-সংগ্রামে সফলকাম হইবে, এবং আমার মনে হয়, আমিও আমার মোকদ্দমায় জয়লাভ করিব।

সোক্রা—ওহে এয়ুথ্যুফ্রোন, তোমার মোকদ্দমাটা কি? তুমি অভিযোগ করিয়াছ, না অভিযুক্ত হইয়াছ?

এয়ু—আমি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি।

সোক্রা—কাহার বিরুদ্ধে?

এয়ু—যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি বলিয়া লোকে আমাকে পাগল মনে করিতেছে।

সোক্রা—সে কি? তুমি তবে এমন লোকের পশ্চাতে লাগিয়াছ, যাহার পাখা আছে?

এয়ু—না উড়িয়া পলায়ন করিবে, সে সম্ভাবনা সুদূরে; কেননা, লোকটি অতি বড় বৃদ্ধ।

সোক্রা—সে কে?

এয়ু—আমার পিতা।

সোক্রা—ওহে সাধু, সে তোমার পিতা?

এয়ু—হাঁ, নিশ্চয়ই।

সোক্রা—তুমি কেন অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ? অপরাধটা কি?

এয়ু—হত্যার অপরাধ, সোক্রাটীস।

সোক্রা—ও হরি! হে এয়ুথ্যুফ্রোন, কিরূপে ধর্ম্মপথে চলিতে হয়, সাধারণ লোকে তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়ই অজ্ঞ। কেননা, আমি তো বিবেচনা করি না, যে, যে-সে লোক তোমার মত এমন একটি ধর্ম্মানুগত কাজ করিতে পারিত; যে ব্যক্তি জ্ঞানে সত্য সত্যই বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এ কেবল তাহারই কর্ম্ম।

এয়ু—ঠিক্ কথা, সোক্রাটীস, বহুদূরই বটে।

সোক্রা—যাহাকে তোমার পিতা হত্যা করিয়াছেন, সে তোমাদেরই পরিবারের লোক? অথবা তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; কেননা, অপর কেহ হইলে তুমি কখনই তাঁহার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনিতে না।

এয়ু—হে সোক্রাটীস, তুমি যে ভাবিতেছ, হত ব্যক্তি আমাদের আত্মীয় কি অনাত্মীয়, এই উভয়ে কিছু পার্থক্য আছে, এটি হাসির কথা; তোমার শুধু দেখা কর্ত্তব্য যে হত্যাকারী ন্যায়ানুসারে হত্যা করিয়াছে, কি অন্যায়মত হত্যা করিয়াছে; যদি ন্যায়ানুসারে করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কিছু বলিও না; কিন্তু যদি তাহা না হয়, তবে হত্যাকারী যদিও তোমার সহিত নিত্য একই গৃহে বাস ও একত্র ভোজন করে, তথাপি তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে। তুমি যদি জানিয়া শুনিয়াও এমন লোকের সহবাস কর এবং অভিযোগ আনয়ন করিয়া দণ্ডদ্বারা তাহাকে ও আপনাকে শোধন না কর, তবে পাপ উভয় স্থলেই সমান। এখন, ঐ হতব্যক্তি আমার একজন বেতনভোগী ভৃত্য ছিল, এবং নাক্সসে আমাদের যে কৃষিক্ষেত্র আছে, তথায় আমাদের জন্য কৃষিকর্ম্ম করিত। সে মত্তাবস্থায় আমাদের একজন ক্রীতদাসের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে হত্যা করে। তখন আমার পিতা তাহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাহাকে একটা পরিখায় নিক্ষেপ করেন, এবং কি করা কর্ত্তব্য, দৈবজ্ঞকে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এখানে একজন লোক পাঠাইয়া দেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি ঐ হস্তপদবদ্ধ লোকটার কোন সংবাদই লইলেন না; 'ও হত্যাকারী, ও মরিলেই বা কি আসিয়া যায়,' এই ভাবিয়া তিনি কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন; এবং ফলেও তাহাই হইল। দৈবজ্ঞ হইতে লোক ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই সে ক্ষুধা শীত ও তাহার শৃঙ্খলের যন্ত্রণায় মরিয়া গেল। কিন্তু এক্ষণে আমার পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সকলে এই জন্য আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন যে আমি আমার পিতার বিরুদ্ধে ঐ নরহত্যাকারীকে হত্যার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি। তাহারা বলে যে তিনি লোকটাকে মোটেই হত্যা করেন নাই; আর যদিই বা তিনি তাহাকে লক্ষবার হত্যা করিতেন, তথাপি—ঐ মৃত লোকটা তো ছিল নরঘাতী—সুতরাং আমার এমনতর লোকের সম্পর্কে হস্তার্পণ করা উচিত নহে। কারণ, পুত্র হইয়া পিতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনয়ন করা পাপ। হে সোক্রাটীস, পুণ্য ও পাপ সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিধি কি, তদ্বিষয়ে তাহারা এমনই অজ্ঞ।

সোক্রা—হে এয়ুথ্যুফ্রোন, তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যে তুমি কি বিবেচনা কর যে তুমি ঈশ্বরের বিধি এবং পাপ ও পুণ্যের তত্ত্ব এমন সূক্ষ্মরূপে অবগত হইয়াছ যে তুমি

এই উপস্থিত ব্যাপার যেমন বর্ণনা করিলে, তাহাতে তোমার এমন আশঙ্কা হইতেছে না যে তোমার পিতার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইয়া হয় তো তুমি নিজেই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতেছ ?

এয়ু—হে সোক্রাটীস, আমি যদি এই-সমুদায় তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে নাই জানিতাম, তবে আর আমার দ্বারা জগতের কি উপকার হইত, এবং এয়ুথ্যুফ্রোন ও অন্য লোকের মধ্যে পার্থক্যই বা কি থাকিত।

সোক্রা—তবে, হে অদ্ভুতকর্ম্মা এয়ুথ্যুফ্রোন, আমার পক্ষে শ্রেয় এই যে আমি তোমার শিষ্য হইব, এবং মেলীটস যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে তাহার বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উহা প্রতিরোধ করিয়া বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাহাকে আহ্বান করিব। আমি তাহাকে বলিব যে আমি এত কাল দৈববিষয়ক জ্ঞান বহুমূল্য মনে করিয়া আসিতেছি; এখন সে বলিতেছে, যে, আমি ধর্ম্মবিষয়ে বাচালের মত যাহা-তাহা বলিয়া ও নূতন মত প্রবর্ত্তিত করিয়া অপরাধী হইতেছি। কিন্তু আমি তো তোমারই শিষ্য হইয়াছি। অতএব (আমি বলিব), "হে মেলীটস, যদি তুমি স্বীকার কর যে এয়ুথ্যুফ্রোন জ্ঞানী, এবং সে এই-সকল তত্ত্ব স্বরূপতঃ অবগত আছে, তবে আমার সম্বন্ধেও তাহাই ভাব, এবং তোমার অভিযোগ প্রত্যাহার কর। যদি তাহা না কর, তবে আমার পূর্ব্বে আমার গুরুর নামে অভিযোগ উপস্থিত কর, যেহেতু তিনি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে অর্থাৎ আমাকে ও তাঁহার পিতাকে কুপথে লইয়া যাইতেছেন; তিনি আমাকে মন্দ করিতেছেন উপদেশ দ্বারা, নিজের পিতাকে মন্দ করিতেছেন তিরস্কার ও দণ্ডদ্বারা।" কিন্তু যদি সে আমার কথা গ্রাহ্য না করে ও আমাকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি না দেয়, কিংবা আমার পরিবর্ত্তে তোমাকে অভিযুক্ত না করে, তবে পূর্ব্বে তাহাকে যাহা বলিয়াছি, বিচারালয়ে সে-সমুদায় বিবৃত করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প হইবে।

এয়ু—হাঁ, হাঁ, সোক্রাটীস, যদি সে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে প্রয়াসী হয়, তবে তাহার অভিযোগের কোথায় ত্রুটি আছে, তাহা বোধ করি আমি ধরিতে পারিব,-এবং বিচারালয়ে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য বহুলরূপে উপস্থিত হইবে।

সোক্রা—হাঁ, প্রিয় সুহৃৎ, ইহা জানিয়াই তো আমি তোমার শিষ্য হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি; আমি জানি যে এই মেলীটস, এবং অপর সকলেও, তোমাকে মোটেই দেখে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু আমাকে সে সহজে ও সূক্ষ্মভাবে দেখিয়া ও বুঝিয়া ফেলিয়াছে, এবং এই জন্যই আমার বিরুদ্ধে ধর্ম্মভ্রষ্টতার অভিযোগ আনিয়াছে। অতএব দোহাই দেবতার, তুমি এইমাত্র যাহা উত্তমরূপে অবগত হইয়াছ বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করিয়াছ, এক্ষণে আমার নিকটে তাহা বিবৃত কর। হত্যা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলিতে তুমি কি মনে কর? সমুদায় কর্ম্মেই পুণ্য এক ও অভিন্ন, এবং পক্ষান্তরে পাপ সর্ব্বত্রই পুণ্যের বিপরীত। যাহা কিছু পাপদুষ্ট বলিয়া পরিগণিত, সে সমুদায়ের মধ্যেই পাপদোষ বর্ত্তমান; সুতরাং পাপ সর্ব্বত্রই এক ও অভিন্ন, এবং উহার একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে। কেমন, ইহাই কি সত্য নহে?

এয়ু—হাঁ, সোক্রাটীস, সম্পূর্ণরূপে সত্য।

সোক্রা—তবে বল দেখি, তোমার মতে পাপ কি এবং পুণ্যই বা কি?

এয়ু—আচ্ছা, বলিতেছি। আমি যাহা করিতেছি, তাহাই পুণ্য—অর্থাৎ যদি কেহ নরহত্যা, দেবমন্দিরে চুরি কিংবা এইরূপ অপর কোনও অপরাধ করে—সে পিতা হউক, বা মাতা হউক অথবা অপর যে কেহ হউক না কেন—তাহাকে অভিযুক্ত করাই পুণ্য, এবং তাহা না করাই পাপ। তুমি দেখ না, সোক্রাটীস, ইহাই যে বিধি, আমি তোমাকে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দিতেছি; ইতঃপূর্ব্বে আমি অপরকেও এই প্রমাণ দিয়াছি; আমি দেখাইয়াছি যে, যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে—সে যে-কেহ হউক না কেন—তাহাকে ছাড়িয়া না দেওয়াই ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য। কারণ, এই-সকল লোক জেয়ুসকে দেবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ বলিয়া বিবেচনা করে, এবং তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে যে তাঁহার পিতা খ্রনস আপনার সন্তানদিগকে অন্যায়রূপে গ্রাস করিয়াছিলেন বলিয়া জেয়ুস তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন; এবং আবার

এই খ্রনসই এবম্বিধ কারণেই আপনার পিতার লিঙ্গচ্ছেদ করিয়াছিলেন। অথচ ইহারাই আমার প্রতি এইজন্য ক্রুদ্ধ হইয়াছে যে আমার পিতা অন্যায়াচরণ করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি। সুতরাং এইরূপে তাহারা দেবগণের স্থলে এক কথা, এবং আমার স্থলে তাহার বিপরীত কথা বলিতেছে।

সোক্রা—হে এয়ুথ্যুফ্রোন, এইজন্যই না আমি অভিযুক্ত হইয়াছি যে যখন কেহ দেবগণের সম্বন্ধে এই প্রকার বলে, তখন আমি তাহা বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করি? বোধ হয় এই হেতু লোকে আমাকে অপরাধী বলিয়া থাকে। এখন, তুমি এই-সকল তত্ত্ব উত্তমরূপে অবগত আছ; সুতরাং তুমিই যদি এই সমুদায় উপাখ্যান সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে যে আমাকেও বাধ্য হইয়া তোমার সহিত একমত হইতে হইবে। কারণ, যখন আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি যে আমি এই-সকল বিষয়ে কিছুই জানি না, তখন আমি আর কি বলিব? কিন্তু, প্রণয়-দেবতার দোহাই, আমাকে বল দেখি, তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর যে এই ব্যাপারগুলি বাস্তবিকই এইরূপ ঘটিয়াছিল?

এয়ু—হাঁ, সোক্রাটীস; এবং এগুলি অপেক্ষাও আশ্চর্য্যতর ব্যাপার, যাহা সাধারণ লোকে জানে না।

সোক্রা—তাহা হইলে তুমি সত্য-সত্যই বিশ্বাস কর যে দেবগণের মধ্যে যুদ্ধ, বিগ্রহ, ঘোরতর বিদ্বেষ ও এইপ্রকার অপর বহুবিধ ব্যাপার রহিয়াছে: কবিগণ এই-সমুদায় বর্ণনা করিয়াছেন, এবং নিপুণ চিত্রকরগণ আমাদিগের দেবমন্দিরে উহার ও অন্যান্য দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; বিশেষতঃ পান্‌আথীনীয় মহোৎসবে যে পরিচ্ছদ আক্রপলিসে নীত হয়, তাহা এই প্রকার চিত্রে পরিপূর্ণ। হে এয়ুথ্যুফ্রোন, আমরা কি বলিব, যে, এই-সমুদায় সত্য?

এয়ু—হাঁ, সোক্রাটীস; এবং শুধু তাহাই নহে; আমি এইমাত্র যেমন বলিতেছিলাম, যদি তুমি চাও, আমি দেবগণের সম্বন্ধে আরও কত উপাখ্যান তোমাকে বলিব, যাহা শুনিয়া, আমি বেশ জানি, তুমি বিস্মিত হইবে।

সোক্রা—তাহা আশ্চর্য্য বোধ করি না। কিন্তু সেগুলি তুমি অবসরমত অন্য সময়ে বিবৃত করিও। এইমাত্র তোমাকে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহারই স্পষ্টতর উত্তর দিতে চেষ্টা কর। কেননা, হে বন্ধো, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পুণ্য কি? তুমি এখনও আমাকে তাহা সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যা কর নাই। তুমি কেবল আমাকে বলিতেছ যে তুমি যাহা করিতেছ, অর্থাৎ তুমি যে আপনার পিতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনিয়াছ, তাহাই পুণ্যকার্য্য।

এয়ু—হে সোক্রাটীস, সে তো সত্য কথাই বলিয়াছি।

সোক্রা—হইতে পারে। কিন্তু, হে এয়ুথ্যুফ্রোন, তুমি তো বল যে পুণ্যকার্য্য আরও অনেক প্রকার আছে।

এয়ু—আছে বৈ কি।

সোক্রা—তবে স্মরণ রাখিও, যে আমি তোমাকে এমত অনুরোধ করি নাই, যে, বহুবিধ পুণ্যকার্য্যের মধ্যে তুমি একটি বা দুইটি আমাকে বুঝাইয়া দাও; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে পুণ্যের সেই স্বরূপটি কি, যাহাতে সকল পুণ্যকর্ম্ম পুণ্য হইয়াছে? কেননা, তুমি বোধ হয় বলিয়াছ যে এমন একটি স্বরূপ আছে, যাহাতে সকল পুণ্যকর্ম্ম পুণ্য ও পাপকর্ম্ম পাপ হইয়াছে; না তোমার তাহা স্মরণ হইতেছে না?

এয়ু—হাঁ, আমার স্মরণ আছে।

সোক্রা—তাহা হইলে, সেই স্বরূপটি কি, আমাকে বুঝাইয়া বল, যাহাতে আমি সেইটিকে আদর্শরূপে নয়নপথে রাখিয়া ও মানদণ্ডরূপে ব্যবহার করিয়া বলিতে পারি, যে, তুমি বা অপরে যে-সকল কার্য্য করিতেছ, তন্মধ্যে যাহা ইহার অনুরূপ, তাহা পুণ্য, যাহা ইহার অনুরূপ নহে, তাহা পুণ্য নহে।

এয়ু—আচ্ছা, সোক্রাটীস, যদি তুমি ইহাই চাও, তবে আমি তোমাকে তাহা বলিব।

সোক্রা—হাঁ, আমি চাই বই কি।

এয়ু—তবে, যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহাই পুণ্য, ও যাহা প্রিয় নহে, তাহাই পাপ।

সোক্রা—চমৎকার, এয়ুথ্যুফ্রোন; যেমনটি উত্তর তোমার নিকটে চাহিয়াছিলাম, এক্ষণে ঠিক্ সেইরূপ উত্তর দিয়াছ; তবে, উত্তরটি সত্য কি না, আমি এখনও জানি না; কিন্তু তুমি যাহা বলিলে, তাহা যে সত্য,

তাহা তুমি নিশ্চয়ই আমাকে খুব বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবে।

এয়ু—অবশ্যই দিব।

সোক্রা—তবে এস, আমরা কি বলিতেছিলাম, পরীক্ষা করিয়া দেখি। যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহা পুণ্য, ও যে মানুষ দেবগণের প্রিয়, সে পুণ্যবান্; পক্ষান্তরে যাহা দেবগণের অপ্রিয়, তাহা পাপ, ও যে মানুষ দেবগণের অপ্রিয়, সে পাপী; কিন্তু পাপ ও পুণ্য এক নহে, বরং তাহারা পরস্পরের একান্ত বিপরীত; কেমন আমরা ইহাই বলিতেছিলাম কি না?

এয়ু—হাঁ, নিশ্চয়ই।

সোক্রা—এবং আমার বোধ হয় একথা ঠিকই বলা হইয়াছিল।

এয়ু—হাঁ, সোক্রাটীস, আমিও বিবেচনা করি যে একথাই বলা হইয়াছিল।

সোক্রা—হে এয়ুথ্যফ্রোন, একথাও কি বলা হয় নাই যে দেবতারা আপনা-আপনি কলহ করেন, বিরোধ করিয়া পরস্পরের মধ্যে দল সৃষ্টি করেন, এবং একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকেন?

এয়ু—হাঁ, বলা হইয়াছে।

সোক্রা—কিন্তু, হে পুরুষোত্তম, কোন্ বিষয়ের মতভেদ বিদ্বেষ ও ক্রোধ উৎপাদন করে? আমরা এইরূপে বিষয়টি পরীক্ষা করি—দুইটি সংখ্যার মধ্যে কোন্‌টি বড়, এই সম্বন্ধে যদি তোমার ও আমার মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়, তবে সেই মতভেদ কি আমাদিগকে পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষপরায়ণ করিয়া তুলিবে? না, আমরা অবিলম্বে গণনা করিয়া এই বিরোধের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইব?

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—তেমনি, দুইটি বস্তুর মধ্যে কোনটি বৃহত্তর ও কোনটি ক্ষুদ্রতর, এই বিষয়ে যদি আমাদের মতভেদ ঘটে, তবে আমরা অবিলম্বে বস্তুদুটিকে মাপিয়া বিরোধ হইতে নিবৃত্ত হইব?

এয়ু—হাঁ, একথা ঠিক্।

সোক্রা—আর, দুইটি বস্তুর মধ্যে কোনটি গুরুতর ও কোনটি লঘুতর, এই বিরোধের মীমাংসা, আমি বোধ করি, আমরা বস্তু দুটি ওজন করিয়াই করিতে চাহিব?

এয়ু—তা' নয় তো কি?

সোক্রা—তবে কোন্ বিষয়ের মতভেদ লইয়া ও কোন্ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অসমর্থ হইয়া আমরা পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠিব? তুমি হয় তো সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছ না। কিন্তু আমি যাহা বলি শুন। এই প্রশ্নগুলির লক্ষ্য—ন্যায় ও অন্যায়, ভাল ও মন্দ, মহৎ ও ঘৃণার্হ। এখন এইগুলিই কি সেই-সকল বিষয় নয়, যাহার সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিলে ও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে তুমি ও আমি এবং অপর সমুদায় মানুষ পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠি? এবং যখনই আমরা পরস্পরের শত্রু হইয়া উঠি না কেন, ইহাই তাহার কারণ?

এয়ু—হাঁ, সোক্রাটীস, মতভেদ এইরূপই বটে, এবং উহা এই প্রকার বিষয়েই ঘটিয়া থাকে।

সোক্রা—আচ্ছা, তাহা হইলে, হে এয়ুথ্যফ্রোন, যদি দেবতারা কখনও কোনও বিষয়ে কলহ করেন, তবে তাঁহারা কি এই প্রকার বিষয়েই কলহ করেন না?

এয়ু—ইহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

সোক্রা—পুনশ্চ, হে ভদ্র এয়ুথ্যফ্রোন, তোমার কথা অনুসারে দেবতাদিগের মধ্যে একজন এক বিষয়, অপরে অপর বিষয় ন্যায্য বিবেচনা করেন; এবং ভাল ও মন্দ, মহৎ ও ঘৃণার্হ সম্বন্ধেও এইরূপ। কারণ, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি এই-সকল বিষয়ে মতভেদ না থাকিত, তবে কখনও পরস্পরের মধ্যে দলভেদ ঘটিত না। কেমন, তাই নয় কি?

এয়ু—তুমি ঠিক্ বলিতেছ।

সোক্রা—অপিচ, তাঁহারা প্রত্যেকেই যাহা ভাল ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, তাহাই ভাল বাসেন, এবং যাহা এগুলির বিপরীত, তাহা ঘৃণা করেন?

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—কিন্তু, তুমি বলিতেছ, যে তাঁহারা একজন যাহা ন্যায্য বিবেচনা করেন, অপরে তাহা অন্যায় মনে করিয়া থাকেন এবং এই-সকল বিষয়ে বিবাদ করিয়া

তাঁহারা দলসৃষ্টি করেন ও পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া থাকেন; কেমন, কথাটা ঠিক্ কি না?

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—আবার দেখা যাইতেছে যে দেবগণ একই বস্তু ভাল বাসেন ও ঘৃণা করেন, এবং একই বস্তু দেবগণের প্রিয় ও অপ্রিয়।

এয়ু—এই প্রকারই বোধ হইতেছে।

সোক্রা—হে এয়ুথ্যফ্রোন, এই যুক্তি অনুসারে পাপ ও পুণ্যও একই দাঁড়াইবে।

এয়ু—তাহাই তো মনে হয়।

সোক্রা—তাহা হইলে কিন্তু, হে বিচিত্রবুদ্ধে, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি এখনও তাহার উত্তর দাও নাই। কেননা, আমি তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করি নাই যে কিরূপে একই বস্তু যুগপৎ পাপ ও পুণ্য হইতে পারে; কিন্তু ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে যাহাই কেন দেবগণের প্রিয় হউক না তাহাই আবার তাঁহাদিগের অপ্রিয়। সুতরাং, হে এয়ুথ্যফ্রোন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে তুমি এক্ষণে তোমার পিতাকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে যাহা করিতেছ, তাহা জেয়ুসের অতি প্রিয় কার্য্য, কিন্তু ক্রনস ও ঔরানসের পক্ষে ঘৃণার্হ এবং তাহা হীফাইষ্টসের প্রিয়, কিন্তু হীরার অপ্রিয়; এবং যদি অপর কোনও দেবগণের মধ্যে এই বিষয়ে পরস্পরের মতভেদ হয়, তবে তাঁহাদিগের পক্ষেও এই একই কথা।

এয়ু—কিন্তু, সোক্রাটীস, আমি বিবেচনা করি যে এবিষয়ে দেবতাদিগের মধ্যে পরস্পরের মতভেদ হইতেই পারে না, যেহেতু, যদি কেহ অন্যায়রূপে কাহাকেও হত্যা করে, তবে তাহাকে যে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, এ প্রকার মত তাঁহারা কখনও পোষণ করেন না।

সোক্রা—সে কি কথা, এয়ুথ্যফ্রোন? যদি কোনও লোক অন্যায় করিয়া কাহাকেও হত্যা করে কিংবা অপর কোনও অন্যায় কর্ম্ম করে, তবে তাহাকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, এ সম্বন্ধে তুমি মানুষের মধ্যে কখনও বাক্‌বিতণ্ডা শুনিতে পাও নাই?

এয়ু—না, লোকে এরূপ বাক্‌বিতণ্ডা হইতে কখনও বিরত হয় না, অন্যত্রও নয়, ধর্ম্মাধিকরণেও নয়; কারণ, তাহারা অন্যায় কর্ম্ম করিয়া দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্যে না করে এমন কাজ নাই, ও না বলে এমন কথা নাই।

সোক্রা—হে এয়ুথ্যফ্রোন, তাহারা কি স্বীকার করে যে তাহারা অন্যায়াচরণ করিয়াছে, অথচ যুগপৎ একথাও বলে যে তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে?

এয়ু—না, তাহা কখনও নহে।

সোক্রা—তাহা হইলে, তাহারা যে সবই করে ও বলে, একথা ঠিক নয়; কেননা, আমি বোধ করি যে তাহাদিগের এমন বলিবার বা তর্ক করিবার সাহস নাই যে যদি তাহারা অন্যায় কর্ম্ম করে, তথাপি তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু আমার মনে হয় যে তাহারা বলে, যে, তাহারা অন্যায় কিছুই করে নাই। কেমন?

এয়ু—তুমি ঠিক্ কথাই বলিয়াছ।

সোক্রা—তবে তাহারা এবিষয়ে বাক্‌বিতণ্ডা করে না, যে, অন্যায়াচারীকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তাহারা বোধ করি এই বিষয়েই তর্ক বিতর্ক করে, যে, কে অন্যায়াচরণ করিয়াছে, কি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছে এবং কখন করিয়াছে।

এয়ু—তুমি যথার্থ বলিয়াছ।

সোক্রা—তবে, তোমার কথা অনুসারে, যখন দেবতারা ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে কলহ করেন, তখন তাঁহাদিগের সম্পর্কেও কি ঠিক এই কথা খাটে না? তাঁহাদিগের মধ্যেও এক পক্ষ বলেন, যে, অপর পক্ষ অন্যায় করিয়াছে, এবং অপর পক্ষ বলেন, যে, না, তাঁহারা অন্যায় করেন নাই? কেননা, হে বিচিত্রবুদ্ধে, দেবতা কিংবা মনুষ্যের মধ্যে কেহই এমন কথা বলিতে কখনও সাহসী হয় না, যে, অন্যায়াচারীকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

এয়ু—হাঁ, সোক্রাটীস, মূল আলোচ্য বিষয় ধরিতে গেলে কথাটা সত্যই বলিয়াছ।

সোক্রা—হে এয়ুথ্যফ্রোন, আমি বিবেচনা করি, যে, মানব ও দেবতা—যদি দেবতারা বাক্‌বিতণ্ডা করেন—যাঁহারাই বাক্‌বিতণ্ডা করুন না কেন, তাঁহারা প্রত্যেক স্থলেই বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন।

যখনই কোনও কর্ম্ম সম্বন্ধে মতবিরোধ উপস্থিত হয়, এক পক্ষ বলে যে কর্ম্মটি ন্যায্যরূপেই কৃত হইয়াছে, অপর পক্ষ বলে যে উহা অন্যায়রূপে করা হইয়াছে। কেমন, কথাটা ঠিক্ কি না?

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা।—তবে এস, হে প্রিয় এয়ুথ্যুফ্রোন, যাহাতে আমি স্পষ্টতররূপে জানিতে পারি, এই অভিপ্রায়ে আমাকেও বুঝাইয়া বল দেখি যে তোমার কি প্রমাণ আছে যে দেবতারা সকলেই বিবেচনা করিতেছেন যে ঐ লোকটি অন্যায়রূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে? ঘটনাটা তো এই—সে একজন ভৃত্যকে হত্যা করিয়াছিল, এজন্য হতব্যক্তির প্রভু তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন; এবং তাহার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, দৈবজ্ঞগণ হইতে তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ পাইবার পূর্ব্বেই সে বন্ধন-যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করে। এমনতর লোকের হত্যার জন্য কি পুত্রের পক্ষে পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা ও তাহাকে দণ্ডিত করিতে প্রয়াসী হওয়া উচিত? এস, আমাকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা কর, যে দেবতারা সকলে তোমার এই কার্য্যটিকে নিঃসন্দেহ উচিত মনে করিতেছেন। যদি তুমি আমাকে তাহা যথোপযুক্তরূপে বুঝাইয়া দিতে পার, তবে আমি জ্ঞানের জন্য তোমার গুণকীর্ত্তন করিতে কখনই বিরত হইব না।

এয়ু—কিন্তু, সোক্রোটীস, সেটি বোধ করি অল্প আয়াসের কর্ম্ম নহে, যদিচ আমি তোমাকে খুব স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিতে পারি।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

পঞ্চশস্য

শহরের বহর—

এবেনেজার হাওার্ড নামক একজন ইংরেজ শহর-পত্তন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলেন যে আদর্শ শহরে ৩১ হাজার লোকের বেশী জনসংখ্যা থাকা উচিত নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে নিকটে আর একটি নূতন শহরের পত্তন করা উচিত। প্রত্যেক শহরে ৬ হাজার একার জমি থাকিবে; তাহার অর্দ্ধেক জুড়িয়া শহরের বাড়ী ঘর রাস্তা ঘাট থাকিবে, এবং বাকী অর্দ্ধেকে চাস আবাদ চলিবে। ইংলণ্ড বড় শহরের অপকারিতা যুদ্ধের সময় বার বার বুঝিতে পারিয়াছে। বংশানুক্রমে শহরের ঘিঞ্জি পাড়ায় বাস করিলে লোকের বল বীর্য্য স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। তাহারই প্রতিকারের জন্য হাওার্ডের চেষ্টায় ইংলণ্ডে শহর-বাগ (Garden City) পত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে—সকলেই ফাঁকা হাতাওয়ালা বাড়ীতে বাস করিবে, ভ্রমণের জন্য উদ্যান, খেলার জন্য ময়দান প্রত্যেক পাড়াতেই থাকিবে। বড় বড় কারখানাগুলিকেও এইরূপে বাগান-ঘেরা শহরে পরিণত করা হইতেছে। হাওার্ডকে সমর্থন করিয়া আমেরিকার এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড কণ্ট্রাকটিং কাগজে অধ্যাপক স্মীথ বলিয়াছেন—বড় শহর পত্তন করা ভুল; কারণ মানুষের রুচি অবস্থা ব্যবসা প্রভৃতির প্রকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী-ঘর রাস্তা পাড়া অদল বদল করা দরকার হয়; সে-ক্ষেত্রে ছোট শহরে পরিবর্ত্তন যত সহজ ও সস্তা, বড় শহরে তেমন নয়। বড় শহরে লোকের অভাব অসুবিধা দূর করা, শহর সাফ রাখা, স্বাস্থ্য বজায় রাখা মিউনিসিপালিটির পক্ষে কঠিন; ছোট শহরে সুসাধ্য।

* * *

যুদ্ধ-কোলাহল রোধ করিবার কানের ছিপি—

যে যোদ্ধা যুদ্ধ-কোলাহল শুনিবার ভয়ে কানে ঢাকা দিত তাহাকে আদিম কাল হইতে গত শতাব্দী পর্য্যন্ত ভীরু কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করা হইত। কিন্তু যুদ্ধাস্ত্রের ঝঞ্ঝনা এখন এমন বিকট হইয়া উঠিয়াছে যে যোদ্ধারা কানে চাপা না দিলে কানের পটহ ছিঁড়িয়া একেবারে কালা হইয়া যায়। এ মা.ক নামক এক ব্যক্তি কোলাহল রোধ করিবার কানের ছিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে কানের পটহের উপর কামান আওয়াজের বাতাসের হঠাৎ গুরু চাপ লাগিতে পায় না; অথচ
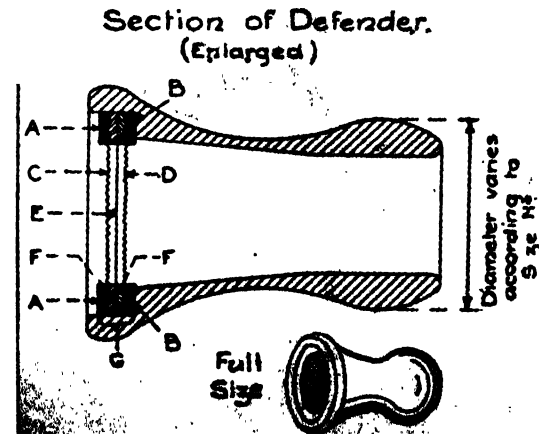
যুদ্ধ-কোলাহল রোধ করিবার কানের ছিপি।

অতি ক্ষীণ শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়। এই ছিপি এবনাইটে তৈয়ারি, তামাক খাবার কল্কের ন্যায় আকার; এক দিকটা গোলালো, খুব পালিশ করা, কানের ফুটোর মধ্যে খাপেখাপে বসিয়া যায়—বিভিন্ন লোকের কানের ফুটোয় যাহাতে ফিট হইয়া লাগে তাহার জন্য পাঁচ রকম বড় ছোট আকারে তৈয়ারি করা হয়। ছিপির মাঝখান দিয়া এফোঁড় ওফোঁড় একটা ফুটো থাকে, সেই ফুটো কানের মধ্যে যে গোলালো দিকটা থাকে সেখানে সিকি ইঞ্চি হইতে ক্রমশ বড় ফাঁদালো হইয়া বাহিরে মুখের দিকে ½ ইঞ্চি হয়। ছিপির বড় ফুটোর মুখের

কাছে; প্রথমে একটা চ্যাপ্টা-গোল লোহার ও চামড়ার চাকতি B, তারপর সরু তারের জালের চাকতি I, তারপর আবার চামড়ার চাকতি F, তারপর অতি পাতলা একটা পটহ, তারপর চামড়ার চাকতি 3,F, তারপর আবার জালতি, এবং সব উপরে চামড়ার চাকতি পরপর বসানো থাকে; পটহ ও জালগুলিকে স্ক্রু-প্যাঁচ কষিয়া টান করিয়া রাখিবার জন্য ও আঁট করিবার জন্য চামড়ার চাকতি দেওয়া হয়। এই ছিপি দুই কানে গুঁজিয়া দিলে সামান্য শব্দে যে বায়ুতরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছিপির পটহ তরঙ্গিত হইয়া সেই শব্দই কানের পটহে পৌঁছাইয়া দেয়; তাহাতে অল্প শব্দ শোনার কোনো ব্যাঘাতই হয় না। কিন্তু বিষম শব্দ হইলেই তাহার বায়ুতরঙ্গের গুরুচাপে ছিপির পটহ জালতির গায়ে আঁটিয়া যায়, তাহাকে কোনো তরঙ্গ উৎপন্ন হইতে না পারাতে কানের মধ্যে কোনো শব্দ পৌঁছে না, কানের পটহ বাঁচিয়া যায়।

* * *

অন্তর্জলী জাহাজ ধরা ফাঁদ—

সায়ান্টিফিক আমেরিকান কাগজে এক ব্যক্তি অন্তর্জলী জাহাজ ধরিবার ফাঁদের সম্ভাবনা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বাল্যকালে ফাঁদ পাতিয়া মোল মাছ ধরিতেন, তারের ফাঁশ করিয়া ভাসন্ত মাছের সামনে আস্তে আস্তে ডুবাইয়া কোনো রকমে মাছের কানকোতে আটকাইয়া দিতে পারিলেই মাছ কাবু হইয়া যায়। ইহা মনে পড়াতে তাঁহার মনে হইল যে জলের তলে যদি বড় বড় তারের ফাঁশ ও জাল ছড়াইয়া রাখা যায় তাহা হইলে অন্তর্জলী জাহাজ তাহাতে জড়াইয়া অকেজো হইয়া

অন্তর্জলী-জাহাজ ধরা ফাঁদ।

পড়িতে পারে চাই কি। সায়ান্টিফিক আমেরিকান এই উপায় উৎকৃষ্ট বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। শত শত তারের ফাঁশ জলে ছাড়িয়া দিলে স্রোতে এদিক ওদিক ভাসিয়া বেড়াইবে; অন্তর্জলী জাহাজের দৃষ্টিগম্ব দিয়া উহাদের অস্তিত্ব ধরা যাইবে না; সুতরাং অন্তর্জলী জাহাজ আর নির্ভয়ে ধ্বংসকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিতে পারিবে না। তারের ফাঁশের সঙ্গে পোন্-ইঞ্চি মোটা ১০০ ফুট লম্বা দড়ির অনেকগুলি ফাঁশ সংলগ্ন থাকিবে; অন্তর্জলী-জাহাজ তারের ফাঁশে আটক না পড়িলেও দড়ির ভাসন্ত ফাঁশে চাকা পাখা হাল জড়াইয়া গিয়া অকর্ম্মণ্য হইবে, এবং তারের ফাঁশের মাথায় এমন একটা বিস্ফোরক থাকিবে যে তারে টান পড়িলেই তাহা জ্বলিয়া উঠিয়া বা ঘন ধোঁয়া হইয়া দশ মাইল দূরের জাহাজদেরও রাত্রে ও দিনে জানাইয়া দিবে—মা ভৈঃ! জলদস্যু জালে পড়িয়াছে। এই ফাঁদে ভাসন্ত-জাহাজের কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই।

* * *

পগার-যুদ্ধ—

বর্ত্তমান যুদ্ধে পগার কাটিয়া তাহার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া শত্রুধ্বংস করা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ-কাল যেরূপ বিবিধ মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ময়দানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে গেলে ক্ষণকালও তিষ্টিতে পারা যায় না। কিন্তু উভয় পক্ষই যদি পগারের মধ্যে ঘাপ্‌টি মারিয়া বসিয়া থাকে তবে ত যুদ্ধের শেষ হয় না। তাহার জন্য নিজেদের শেষ পগারের পিছন হইতে লম্বা পাল্লার কামান দাগিয়া বিপক্ষের পগারের সামনের আড়াল ভাঙিয়া ফেলিতে আরম্ভ করে; কামানের গোলা নিজের পগার ডিঙাইয়া শত্রুর পগারের সামনের আড়াল ভাঙিয়া দেয়। প্রথম পগারের আড়াল ভাঙা হইলেই দ্বিতীয় পগারকে আক্রমণ করে আর সেই সময়ে নিজেদের পগারের সৈন্যেরা উপরে উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া আড়াল-ভাঙা পগারের শত্রুসৈন্যদের সহজেই বধ করে, পিছনের পগার হইতে শত্রুসৈন্য আসিয়া সাহায্য করিতে পারে না; যতক্ষণে প্রথম পগারের সৈন্য ধ্বংস হয়, ততক্ষণ দ্বিতীয় পগারের আড়াল ভাঙা চলে। আড়াল ভাঙা ও প্রথম পগারের সৈন্যধ্বংস শেষ হইলেই দ্বিতীয় পগারের শত্রুসৈন্যদের আক্রমণ করিয়া তাহাদেরও সবাই শেষ করিয়া ফালে। এইরকম কৌশলে ইংরেজ ও ফরাসী জার্ম্মানীর পগার দখল করিতেছে। জার্ম্মানী এই উপায়ে না পারিয়া তরল আগুনের স্রোত ও বিষাক্ত গ্যাসের মেঘ ছাড়িয়া দিয়া হারা পগার ফিরিয়া দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে।
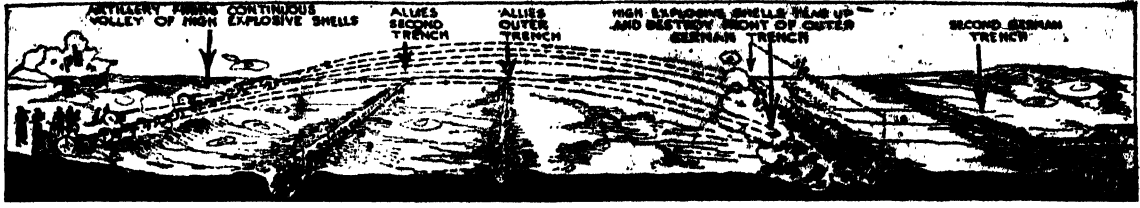
পগার-যুদ্ধে বিপক্ষের প্রথম শ্রেণী পগার ধ্বংস।
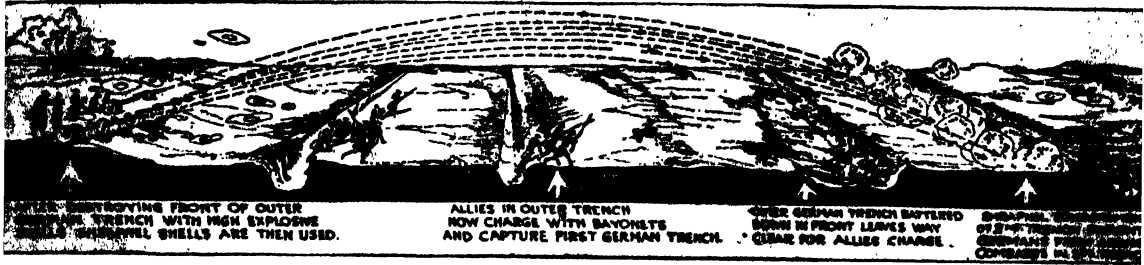
পগার-যুদ্ধে বিপক্ষের প্রথম-শ্রেণী পগার ধ্বংস করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে গোলা বর্ষণ ও সৈন্য দ্বারা প্রথম শ্রেণী আক্রমণ।

তরল আগুনের স্রোত ও বিষাক্ত গ্যাসের মেঘ।

শান্তির শতবার্ষিকী—

আমেরিকার যুক্তরাজ্য স্বাধীন হইবার পর ইংরেজী-ভাষী জাতির মধ্যে যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, আমেরিকা সেই অখণ্ড নিরুপদ্রব শান্তির শতবার্ষিক উৎসব করিতেছে। আমেরিকা মানেই নূতন কিছু। এই উৎসবে ম্যাসাচুসেটস প্রদেশে থিয়েটার হয়, খোলা মাঠে; থিয়েটারের যবনিকা হইয়াছিল ষ্টিম বা জলের ভাপরা। মেঠো ষ্টেজের সামনে একটা লম্বা নলের অসংখ্য ছিদ্রমুখ দিয়া ষ্টিম ছাড়া হইয়াছিল, এবং তাহার পশ্চাতে বিচিত্র রঙের বিদ্যুতের আলো বাড়াইয়া কমাইয়া রং বদলাইয়া জ্বালা হইতেছিল. সেই আলো ষ্টিমের উপর পড়িয়া রঙিন পর্দ্দা সৃষ্টি করিতেছিল, তাহার পশ্চাতে অভিনেতারা দৃশ্যবিন্যাস ও বেশবিন্যাস সারিয়া প্রস্তুত হইয়া লইতেছিল।

এই উৎসব স্মরণীয় করিবার জন্য শিকাগো শহরে একটি স্মারিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার বিষয়—"কাল-স্রোত," উহা প্রস্তরে তক্ষিত, রচয়িতা লোরাডো টাফ্‌ট্‌। ইহাকে "মর্ম্মরস্বপ্ন" বলা হইয়াছে। এই "কাল-স্রোত" তক্ষিত স্মারিকায় দেখানো হইয়াছে যে জনস্রোত চলিয়া যাইতেছে—কাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছে! মেটারলিঙ্কের "দৃষ্টিহারা" নামক নাটকে যে ভাবটি সূচিত হইয়াছে, ডবসন যেমন বলিয়াছেন—

> Time goes, you say ? Ah no.
> Alas ! time stays. We go !
> যাচ্ছে সময়, বলছ তুমি ? আহা না !
> কাল সে অচল, চলছি মোরা একটানা !—

সেই ভাবটিই টাফ্‌টের ভাস্কর্য্যে ব্যক্ত হইয়াছে। মানুষের জীবনপ্রবাহ যেন সাগরের অফুরান ঢেউএর মতন; সেই ইঙ্গিতটি সমস্ত ভাস্কর্য্যটিকে ঢেউএর রূপ দিয়া বুঝানো হইয়াছে. ভাস্কর্য্য-মূর্ত্তির দু জায়গায় এই ঢেউ খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—প্রথম যেখানে যৌবন কালের প্রবাহের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আর যেখানে বার্দ্ধক্য কালের প্রবাহে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া দিতেছে। এই "কাল-স্রোতের" সম্মুখে আর-একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে—তাহার বিষয় "সৃষ্টির নির্ঝর"—উহাও টাফ্‌ট্‌ তক্ষণ করিতেছেন। "কালস্রোত" গড়িতে ১লক্ষ ৬০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে, সমস্ত স্মারিকাটি সম্পূর্ণ করিতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা পড়িবে। এই টাকাটা শিকাগোর একজন ধনী মৃতাত্মার দানে দিয়া গিয়াছেন।

চাব।

কাল-স্রোত। লোরাডো টাফ্‌ট্‌ অঙ্কিত।

আহারে জাতিগত বিশিষ্টতা

কাল-স্রোতের ঢেউ। লোরাডো টাফ্‌ট্‌ অঙ্কিত আত্মিক ভাবদ্বয়ের একাংশ।

জগতের সকল জাতিই দশজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আহার করিতে ভালবাসে। আমাদের নিমন্ত্রণের বৈঠকে এবং সাহেবদিগের ফিষ্টে সর্ব্বত্র তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মালদিভিয়া নামক দ্বীপবাসীদিগের রুচি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিভৃত কোণে যাইয়া একাকী খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। ভোজনকালে কেহ তাহাদিগকে না দেখিতে পায় এজন্য তাহারা সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে।

যখন সভ্যতা ও সমাজ মানবের অজ্ঞাত ছিল, সেই আদিম অবস্থায় মানুষ গোপনে আহার করিত, কারণ তদপেক্ষা সবল অপর কেহ আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে পারে, তৎকালে এজন্য তাহাকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। ইহা ছাড়া ভুতুড়ে মেয়েমানুষের ভয়ও তাহাদের যথেষ্ট ছিল। পাছে কেহ অসদভিপ্রায়ে আসিয়া তাহাদের খাদ্যে যাদুমন্ত্র আওড়াইয়া রাখিয়া যায় অসভ্যেরা এ ভয়ও কম করিত না। অনেকের মতে মালদিভিয়ানদিগের এই রীতি মানবের সেই পূর্ব্ব সংস্কারের জের। অদ্যাপি তাহারা তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

কেহ কেহ আবার মালদিভিয়াদ্বীপবাসীগণের নির্জ্জন-ভোজন প্রিয়তার আর-একটা যুক্তি বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মালদিভিয়ানেরা আপনার অপেক্ষা বংশে মর্যাদায় এবং অর্থে নিকৃষ্টতর ব্যক্তির সহিত আহার করিতে রাজি নহে। উচ্চনীচ বিচার করা সর্ব্বত্র সহজ হয় না, এজন্য তাহারা এই অসামাজিক প্রথা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, ফিলিপাইনদ্বীপবাসীরা অতিমাত্রায় মিশুক। যদি কদাচিৎ কোন ব্যক্তির ভোজন করিবার সঙ্গী না জুটে তাহা হইলে সে রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হয় এবং সেখান হইতে যাহাকে পারে একজনকে ধরিয়া লইয়া আসে। তাহাদের ক্ষুধার আগুন যতই প্রখর হউক না কেন, অতিথিকে না খাওয়াইয়া তাহারা কিছুতেই উদরপূর্ত্তি করিবে না।

সুন্দর চকচকে ঝকঝকে পালিশ-করা টেবিলের উপর মনোরম কারুকার্য্যখচিত সিল্কের কার্পেট বিছাইয়া চীনারা আহার করিতে বসে। তাহারা কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতে জানে না। প্রত্যেকে দুইটি করিয়া হাতীর দাঁতের অথবা আবলুসের কাঠি লয় এবং অত্যন্ত নিপুণতার সহিত তদ্দ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে।

ওটাহেইটিয়ানেরা মিশুক প্রকৃতির লোক। তাহাদের আচার ব্যবহার বেশ ভদ্র। কিন্তু তাহারা পৃথক পৃথক ভোজন করিয়া থাকে। আহারের সময় হইলে একটি পরিবার ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, এমন কি স্বামীস্ত্রীও পৃথকভাবে আপন আপন ঝুড়ি লয় এবং একে অপর হইতে সাত আট হাত অন্তর পরস্পরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া নীরবে ভোজনে প্রবৃত্ত হয়।

অনেক অসভ্য জাতিকে আহারকালে পানীয় গ্রহণে বিরত থাকিতে দেখা যায়। বোধ হয়, সর্ব্বত্র পানীয়ের সদ্ভাব না হওয়াতে ইহারা ভোজনকালে সর্ব্বদা তাহা সংগ্রহ করিতে পারিত না। কালক্রমে ইহা এরূপ একটি জাতি-গত রীতি অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে যে এখন প্রচুর পানীয় নিকটে থাকিলেও ইহারা সে রীতির ব্যতিক্রম করে না। ব্রেজিলরাজ্যের আদিম নিবাসীগণ যখন ভোজন করিবে তখন পানীয় স্পর্শও করিবে না, আবার পানীয় গ্রহণকালে ভোজ্য দ্রব্য নিকটে আনিবে না।

যখন ভদ্রতা কিংবা সভ্যতা মানবের অজানিত ছিল, তখন গৃহাগত বন্ধুবর্গ ও অভ্যাগতের প্রতি তাহার প্রকৃত ভক্তিভাব আছে কিনা ইহার পরীক্ষা দিতে যাইয়া মানুষকে বড় বেগ পাইতে হইত। অতিথির উৎকট অনুরোধে পড়িয়া তাহাকে নানারূপে উত্যক্ত হইতে হইত। আমেরিকার অধিকাংশ আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে এই রীতি আছে যে, গৃহস্বামীকে অবিরত তাহার অতিথিদিগকে খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণার্থ অনুরোধ করিতে হয় কিন্তু বেচারা নিজে জলবিন্দুও গ্রহণ করিতে পারে না। নবফরাসীতে গৃহীকে অভ্যাগতের মনস্তুষ্টি-হেতু অবিশ্রান্ত গান গাহিতে গাহিতে ক্লান্ত হইতে হয়।

সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বন্ধুবান্ধবের প্রতি বিশ্বাস-ভাব দেখাইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতে লাগিল। তখন ভদ্রতার প্রধান অঙ্গ হইল আত্মীয়তা। শুনা যায়, চীনদেশের গৃহস্বামী ভদ্রতার অনুরোধে অভ্যাগতকে আহারে বসাইয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, এবং এইরূপে তাঁহাদিগকে আত্মীয়তার চূড়ান্ত প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।

বর্ব্বরজাতির মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন করিবার যে সমস্ত অদ্ভুত রীতি প্রচলিত আছে তাহা অবগত হইবার জন্যও মানুষের যথেষ্ট আগ্রহ জন্মিতে পারে। তাতার-দেশবাসী বন্ধুকে মদ্যপানার্থ অনুরোধ করিতে হইলে তাহার কান ধরিয়া টানিতে হয়। যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সে যখন মুখ ব্যাদান করে তখন পার্শ্বস্থ সকলে মিলিয়া হাততালি দেয় ও বন্ধুকে ঘিরিয়া নাচিতে থাকে।

কিন্তু কামস্কট্‌কাবাসীদিগের বন্ধুত্বস্থাপনরীতি সর্ব্বাপেক্ষা হাস্য-উদ্দীপক। পরস্পর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে অভিলাষী হইলে একব্যক্তি অপরব্যক্তিকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসেন। তৎপর তাঁহারা উভয়ে উলঙ্গদেহে একটি কক্ষে প্রবেশ করেন, সে ঘর পূর্ব্ব হইতেই ভীষণ ভাবে উত্তপ্ত করা থাকে। তথায় নিমন্ত্রিত বন্ধুর সম্মুখে আহার্য্য পরিবেষিত হয়। এদিকে বন্ধু যখন তাহা গলাধঃকরণ করিতে থাকেন, ওদিকে গৃহস্বামী তখন কক্ষটি যাহাতে উত্তমরূপে উত্তপ্ত হইতে পারে তজ্জন্য ব্যস্ত রহেন। নবাগতকে প্রথমতঃ গৃহের তীব্র উত্তাপ সহ্য করিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সম্মুখের স্তূপীকৃত খাদ্য গলাধঃকরণ করিতে তিনি বিব্রত হইয়া পড়েন। বারংবার বমন করা সত্ত্বেও তিনি সহজে হার মানিতে চাহেন না। পরিশেষে তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় এবং ব্যাপারটি তখন নিষ্পত্তির দিকে যায়। তিনি কয়েকটি কুকুর অথবা কিছু বস্ত্র উপঢৌকন দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তাঁহার নিষ্কৃতি লাভ হয়, নতুবা গৃহস্বামী তাঁহাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে মারিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতে থাকেন—জীবন-সংশয়ে পড়িয়া আগত বন্ধুকে বাধ্য হইয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে হয়। নিমন্ত্রিত বন্ধুরও তাঁহার নবীন সখাকে স্বগৃহে পাল্টা নিমন্ত্রণ করিবার অধিকার আছে। যদি তিনি তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত না হন তাহা হইলে তাঁহাকে বন্ধু-প্রদত্ত উপহার ফিরাইয়া দিতে হয়, নচেৎ যে কক্ষটিতে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয় তাহার অধিকার তিনি লাভ করিতে পারেন না—যে পর্য্যন্ত তিনি প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহের প্রতিদান না করিবেন সে পর্য্যন্ত সখ্যের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বন্ধুটিই কক্ষের অধিকারী রহেন।

কামস্কট্‌কাবাসীদিগের এই অদ্ভুত রীতিরও একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। ইহা দ্বারা নাকি যাহার সহিত সখ্য স্থাপন করা যাইতেছে তাহার পরীক্ষা করা হয়। আগুন ও খাদ্যের অত্যাচার হইতে কামস্কট্‌কাবাসীরা বুঝিতে চায় যে, তাহার বিপদে, বন্ধু তাহার জন্য কতটা ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন এবং কি পরিমাণ উদার হইয়া স্বার্থত্যাগের দ্বারা স্বীয় বন্ধুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা এই বিষয়টির এমন দার্শনিক ব্যাখ্যা দান করেন তাঁহারা যদি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন তাহা হইলে দেখিতেন ইহা একটা অর্থশূন্য জাতীয় রীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কামস্কট্‌কাদেশের আতিথেয়তার রীতিটিও মন্দ কৌতুকাবহ নহে। কোন অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে গৃহস্বামী তাঁহার পুরোভাগে হাঁটু গাড়িয়া বসেন এবং একটি সামুদ্রিক জন্তুর খানিকটা মাংস অতিথির মুখের মধ্যে ঠেলিয়া দেন। তারপর তিনি "এই" "এই" বলিয়া একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠেন এবং মাংসের যে অংশটুকু অতিথির মুখের বাহিরে ঝুলিতে থাকে তাহা কাটিয়া লইয়া রাক্ষসের মত ব্যগ্রভাবে নিজের মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গিলিয়া ফেলেন।

ফরাসীদেশেও প্রাচীনকালে রাজকীয় ভোজকে জাঁকাল করিবার উদ্দেশ্যে একটা অসম্ভাবিধি পালন করা হইত। রাজারা রাজ্যাভিষেকের পরে যখন ভোজে বসিতেন তখন অমাত্যগণ তাঁহাদিগকে অশ্বে আরোহণ করিয়া পরিবেষণ করিতেন।

হাঁচির স্বস্তিবাচন—

হাঁচিবার পর স্বস্তিবচন-প্রয়োগের বিধি জগতের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে এই স্বস্তিকার্য্য করা হইয়া থাকে। এই রীতিটার উৎপত্তির মূল কি ইহা জানিবার জন্য অনেকের মনেই উৎসুক্য জন্মিয়া থাকে।

ফাদার ফেজু (Feyjoo) বলেন, অনেক ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগের বিশ্বাস, পোপ গ্রেগরী কর্ত্তৃক এই রীতিটি সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হইয়াছে। একবার দেশের মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের মড়ক লাগিয়া যায়, হাঁচি তাহার একটা প্রধান উপসর্গ ছিল। অধিকাংশ আক্রান্ত ব্যক্তিই এই ভীষণ ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। সেণ্ট গ্রেগরী নাকি সেই সঙ্কটকালে কেহ হাঁচিলে তাহার প্রতি একটি সংক্ষিপ্ত স্বস্তিবচন প্রয়োগ করিতে হইবে এই বিধি খৃষ্টীয় জগতের সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত করেন।

হিন্দুদিগের মধ্যে "জীব" শব্দ উচ্চারণ করিয়া হাঁচির স্বস্তিবাচন-পদ্ধতি বিদ্যমান আছে।

ইহুদীরা সকল বিষয়ের মূলেই কোন-না-কোন একটা গল্পের অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করে। তাহারা বলে, জ্যাকোবের জন্মিবার পূর্ব্বে মানুষ জীবনে একবার করিয়া হাঁচিত, এবং সেই হাঁচির অব্যবহিত পরেই তাহার জীবনবায়ু বহির্গত হইত। তাহারা আরও বলে যে, জ্যাকোবই সর্ব্বপ্রথম স্বাভাবিক মৃত্যুতে মরিয়াছিলেন। তাঁহার এই মৃত্যুর আনন্দস্মৃতি চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য প্রত্যেক দেশের রাজা, মহারাজের এই নিয়ম করেন যে তাঁহাদের প্রজাবর্গকে হাঁচিবার পর এক-একটি স্বস্তিবচন প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা তদ্দেশীয় প্রাচীন আখ্যানমূলক শাস্ত্রের একটা গল্প ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে ইহা হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায়, যে, তৎকালেও মানুষের মনে এই সার্ব্বজনীন সংস্কারের তত্ত্বান্বেষণ-হেতু কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইত।

আরিষ্টটলের (Aristotle) মত প্রবীণ পণ্ডিতও এই রীতির সম্বন্ধে একটা অর্থহীন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহাতে মানুষের বুদ্ধি ও প্রতিভার আধার মস্তিষ্কের, যে বায়ু নিকটস্থ ব্যক্তিবর্গের আশীর্ব্বাদ দ্বারা পূত নহে তাহা বাছিয়া ধরিবার তীক্ষ্ণ শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, রীতিটা যে পোপ গ্রেগরীরও বহুপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ফ্রেঞ্চ একাডেমী দেখাইয়াছেন, আমেরিকা যখন আবিষ্কৃত হয় তখন তথায় আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে এ রীতির প্রচলন ছিল। বহুপ্রাচীন কাল হইতে মানুষ হাঁচিয়া অপরের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া আসিতেছে।

মোনোমোটাপা (Monomatapa) রাজ্যের কোন রাজা হাঁচিলে তাহার রাজ্য-মধ্যে একটা বিরাট হুলুস্থুল পড়িয়া যাইত। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। রাজা যখন হাঁচিতেন তখন রাজার পার্শ্বচরেরা উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেন। সে ধ্বনি নিকটবর্ত্তী কক্ষে পৌঁছিলে যাহারা তথায় থাকিত তাহারাও তদ্রূপ চীৎকার করিয়া রাজার স্বস্তিবাচন করিত। এইরূপে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে, গৃহ হইতে গৃহান্তরে, স্থান হইতে স্থানান্তরে এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান চলিত। ক্রমে সমগ্র রাজ্যমধ্যে তাহা ছড়াইয়া পড়িত। একাধারে রাজভক্তির ও রাজ-প্রভুবাদের কি চূড়ান্ত নিদর্শন!

সেন্নার (Sennar) প্রদেশের রাজা হাঁচিবামাত্র তাঁহার পারিষদেরা তাঁহার দিকে পিঠ ফিরাইয়া দণ্ডায়মান হইতেন এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের দক্ষিণজানুতে খুব জোরে এক চাপড় মারিয়া তাঁহার স্বস্তিক্রিয়া করিতেন।

প্রাচীনকালে হাঁচির দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করা হইত। হাঁচির এ গৌরবজনক পদবী আমাদের দেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। দক্ষিণ-দিকের হাঁচি মঙ্গলসূচক মনে করা হইত। প্লুটার্ক (Plutarch) তাঁহার থেমিষ্টোক্লেশের (Themistocles) জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে যুদ্ধের প্রারম্ভে হাঁচি পড়িলে যুদ্ধে জয়লাভ হইবে বুঝা যাইত। ক্যাটুলাস (Catullus) তাঁহার একটি প্রণয়মূলক কবিতায় (Acme and Septumas) লিখিয়াছেন যে, বামদিকের হাঁচি মদনদেবের অনুগ্রহ ব্যক্ত করে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

দুর্ভিক্ষে নারীর কর্ত্তব্য

একলা থাকা পৃথিবীর মানুষের অভ্যাস নয়। মানুষ যখন মানুষ নামের যোগ্যই ছিলনা, তখন সে কতকটা একলা থাকিত বটে, কিন্তু অল্পদিনেই দেখিল যে সে-অবস্থাটা তত সুবিধার নয়। তখনই সে স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সংসার বাঁধিতে আরম্ভ করিল। বনের পশুদের সঙ্গে পশু হইয়া থাকিবার জন্য যে তাহার সৃষ্টি হয় নাই একথা তাহার মনই তাহাকে বলিয়া দিল। সে পশু অপেক্ষা উচ্চতর জীব, কাজেই তাহার ধর্ম্মও পশু-ধর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম। আপনাকে লইয়া থাকিলেই তাহার চলিবে না; সে শুধু নিজের জন্যই সৃষ্ট নয়। আপনার ও সঙ্গে সঙ্গে অপর দশজনের জন্যও তাহাকে জীবন ধারণ করিতে হয়। আবার সেই অপর দশজনেও অনেক দিক দিয়া সেই একটি লোকের জন্য জীবন ধারণ করে। এক পরিবারের মধ্যে পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী, অনেকেই থাকেন। তাঁহাদের কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে অপরের গলগ্রহ বলা যাইতে পারে না। ক্ষুদ্রতম যে শিশু, সেও পরিবারের কিছু-না-কিছু কাজে লাগে। যে শিশু হাঁটিতে শিখে নাই, কথা বলিতে শিখে নাই, সে পরিবারস্থ লোকদিগকে তালুক মুলুক কিনিয়া কিম্বা অন্নবস্ত্র জোগাইয়া দেয় না বটে, কিন্তু সেও খুব বড় কাজ করে। সে সকলকে আনন্দবিতরণ করে এবং আপনার অজ্ঞাতসারেই অনেককে অনেক শিক্ষা দান করে। আর একদিক দিয়া দেখিতে গেলে যাঁহাদিগকে আমরা পরিবারপালক সংসারের মাথা, গৃহের কর্ত্তা প্রভৃতি অনেক উপাধি দিই তাঁহারাও সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল নহেন। সংসারের দশজনের সাহায্য তাঁহার খুবই দরকার আছে। তিনি মাথা হইলেও, হাত পা, চক্ষু কর্ণ এ-সব না লইয়া তাঁহার চলে না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে আমাদের মধ্যে একেবারে আত্মনির্ভরশীল কিম্বা সম্পূর্ণ পরগলগ্রহ খুব কম লোকই হয়।

পরিবারকে বাড়াইয়া দেখিলেই ক্রমে পাড়া, গ্রাম, সহর ও দেশে আসিয়া পড়িতে হয়। এখন আর পুরাকালের মত নিজের কিম্বা কেবলমাত্র নিজ পরিবার-পরিজনের সাহায্যে দিন চলে না। সকলই পরের সাহায্যে। এক ঘটী জল আনিতে হইলেও অন্যকে চাই, ঘটীটি অন্যে গড়িয়া দিবে, পুকুরটা অন্যে কাটিয়া দিবে, তবে আমার জল আসিবে। এই অন্য লোকগুলি যে একেবারে নিঃস্বার্থভাবে আমার কাজ করিয়া দেয় আর আমি স্বার্থপরের মত তাহাদের উপকার লই তাহা নয়। তাহারা যেমন আমাদের করে, আমরাও তেমনই তাহাদের করি।

সুতরাং এই যে প্রায় সমস্ত বাংলা দেশ জুড়িয়া এবং বাংলার বাহিরেও অনেক জায়গায় দুর্ভিক্ষের হাহাকার-ধ্বনি উঠিয়াছে, ইহাতে আপাততঃ আমাদের ক্ষতিটা খুব বড় করিয়া দেখা না দিলেও, ক্ষতিটা খুব বড়ই হইবে। আমাদের মধ্যে এই যে কয়জন খাইতে পরিতে পাইতেছি, তাহারাই শুধু আমরা নই, আমরা বলিতে আরও অনেক বেশী বুঝায়। এই অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ জীর্ণ বঙ্গবাসীরা আমাদেরই ভাই বোন। আমাদের পরিবারের অর্দ্ধেক কি সিকি লোকও যদি না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের যে ক্ষতি তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। অবশ্য দেশের লোককে ঘরের লোকের

মত করিয়া দেখিতে এখনও আমরা শিখি নাই, কিন্তু এই রকম দেখিতে পারাটা যে উন্নত হৃদয়ের পরিচায়ক, তাহা আমরা সকলেই বোধ হয় জানি। কাজের বেলা আমরা ঘর ছাড়িয়া পরের দিকে বড় যাই না বটে কিন্তু যে যায় তাহার খুবই প্রশংসা করি। বাড়ীতে নূতন বউ আসিয়া নিজের সুখটি লইয়া বসিয়া থাকিলে সকলেই চটিয়া যায়; কিন্তু সে শ্বশুর, শাশুড়ী, দেওর, ভাসুর, সকলের জন্য আপনার স্বার্থ বলি দিলেই খুবই খুসী হইয়া উঠি। তাহার উপর সে যদি পাড়াপড়সীর ও যত্ন করে তাহা হইলে ত ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। কিন্তু সব থেকে প্রশংসা হয় কখন? যে মানুষ আমার উপকার কখনও করে নাই, যাহার পক্ষে আমার উপকার করা সম্ভবও নয়, উপরন্তু যে আমার অপকারই করে, তাহার যখন আমি উপকার করি তখনই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা হয়। এমন লোকের উপকার মানুষে করে কেন? এখানে ত দেনা পাওনার কোন কথা নাই। কিন্তু মানুষের হৃদয় সব সময় অত বিচার করিয়া চলে না। তাহার শরীরের মধ্যে একটি এমন অশরীরী আছে, যাহাকে না মারিলেও, না ছুঁইলেও, তাহার বেদনা লাগে, কেবল শোক দুঃখের দর্শনই সেই অশরীরীকে এতটা আঘাত দেয়, যে, সে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না। পরের ব্যথা দূর করিয়া সে আপনার ব্যথা ঘুচায়। পরিবারের লোক অনাহারে মরিলে ক্ষতি হয় বলিয়াছি বটে, কিন্তু ওই ক্ষতিটুকু বিবেচনা করিয়াই লোকে শোক করে না, তাহার ব্যথা লাগে বলিয়াই সে কাঁদে। এই যে আমাদের অন্তরতর অন্তরতম, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন বটে, কিন্তু তবুও আমরা সকলেই পরের দুঃখে দুঃখী হই না। আমাদের হৃদয় নিদ্রিত বলিয়াই আমরা বেদনা বোধ করি না। কিন্তু আর কতকাল ঘুমাইয়া কাটিবে? হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে যিনি নিদ্রিত আছেন, তাঁহাকে জাগাইতে হইবে। জাগাইয়া জগতের পানে চাহিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপে সেই গোপন দেবতার পূজা হইবে। আমরা শুনিয়াছি, "পূজা মানে আপনাকে নিবেদন করিয়া দেওয়া; জগৎজননীর সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করা। জগৎজননীর সেবা তখনই প্রকৃত ও সার্থক হয় যখন আমি আপনাকে জগৎবাসীর সেবায় উৎসর্গ করি। মানুষের দুঃখের অন্ত নাই, অভাবের শেষ নাই। কায়মনে এই-সব অভাব ও দুঃখ অপনোদনের চেষ্টা করাই সেবার উদ্দেশ্য।"

পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে ও বাঁকুড়া জেলায় এবার ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আপনারা সকলেই জানেন। বাঁকুড়া হইতে একজন স্বেচ্ছাসেবক লিখিয়াছেন:—

"আমি সাধারণব্রাহ্মসমাজের তরফ হইতে এখানে দুর্ভিক্ষের কার্য্যে আসিয়াছি। দ্বারকেশ্বর নদের দক্ষিণদিকের অনেকগুলি গ্রাম দেখিয়াছি। যে পরিমাণে সাহায্য আসিতেছে তাহাতে অধিকদিন গরীব লোকদিগকে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে না। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং তাহা না পাইলে অনেক লোক মারা যাইবে। দুর্ভিক্ষ এখনও তেমনভাবে দেশ আক্রমণ করে নাই। আগামী মার্চ্চমাসে দেশের অবস্থা ভীষণতর হইবে। এদিকের মহাজনেরা চাষাদের রক্ষার কোন চেষ্টাই করিতেছে না, অনেকে আবার উচ্চহারে টাকা ধার দিয়া নিরন্ন প্রজার সামান্য জমীটুকুও দখল করিয়া লইতেছে। দ্বারকেশ্বরের দক্ষিণ-দিকের কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের বাউরী বাগদী ইত্যাদি-দের কষ্ট ভয়ানক হইতেছে। তবে বেলে ও কালপাথর নামক দুইটি গ্রামের অবস্থা চোখে দেখা যায় না। এখানকার কঙ্কালসার বালকবৃদ্ধের চেহারা দেখিলে চোখের জল রাখা যায় না। কয়েকদিন আগে একস্থানে দেখিলাম কয়েকজন লোক কচি ঘাস সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আজ তিন দিন তাহারা প্রায় একমুষ্টি ভিক্ষাও পায় নাই—আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা সিদ্ধঘাস খাইতে বাধ্য হইয়াছে। সে দিন বাঁকুড়ার সীমানা মহেশ-পুরে গিয়াছিলাম—সেখানে একটি কলু না খাইতে পাইয়া বড়গা যাইতেছিল, পথে মারা গিয়াছে। মহেশনার কাছা-কাছি গ্রামগুলিতে গরীবলোকদের মধ্যে দু-এক জনের অবস্থা ভয়ানক। কিন্তু এই-সমস্ত গ্রামে চাষাদের বড় কষ্ট হইতেছে। তাহারা ভিক্ষা করিতে পারে না—কাজ পাইলে খাটিয়া খাইতে পারে—কিন্তু তাহাও আজকাল পাওয়া যাইতেছে না। এই চাষাদের বাঁচাইবার জন্য কোনও বন্দোবস্ত এখনও হয় নাই। কিন্তু শুনিলাম গবর্ণমেন্ট ইহাদের জন্য কাজের বন্দোবস্ত করিতেছেন।

বন্দোবস্ত শীঘ্র হওয়ার প্রয়োজন। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে আমাদের সাহায্য করিতেছেন—আবার অনেকে করিতেছেন না। গৃহস্থদের সাহায্য আমরা প্রচুর পাইতেছি। লক্ষাশূলের জমীদার বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন ও তাঁহার আত্মীয়গণ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হইতেছে মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকদের, তাহারা ভিক্ষা করিতেও পারে না—আর খাটিয়া খাইতেও পারে না! নীরবে তারা সমস্ত সহ্য করিয়া আছে। ইহাদের অযাচিত ভাবে সাহায্য না করিলে ইহারা অশেষ কষ্ট ভোগ করিবে। সামনে শীতকাল—শীতবস্ত্র ক্রয় করিবার অর্থ কাহারও নাই, এমন কি অনেকে ঘরের ঘটীবাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছে। শীতবস্ত্র অভাবে অনেকে মারা পড়িতে পারে। যদি দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ পুরানো শীতবস্ত্র দান করেন তবে বড়ই ভাল হয়। অন্নকষ্টের উপর শীতের কষ্ট সহ্য করা অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।"

বেঙ্গলী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, যে, বাঁকুড়ায় যে-সকল ভদ্রলোক দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অর্থাভাবে কার্য্যক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। যে অর্থ ছিল তাহা ব্যয় হইয়া গিয়াছে; যাঁহারা একবার কিছু দিয়াছেন, তাঁহারা আর কিছু দিতেছেন না। কিন্তু ক্ষুধিতের ক্ষুধা ত একবার খাইয়া চিরকালের মত নিবারিত হইতে পারে না। সারা বৎসর অন্ন না পাইলে এবৎসর তাহাদের জীবন ধারণ সম্ভব নহে। বেঙ্গলী বলিতেছেন, এই পূজার সময়ে ধনী লোকেরা স্বাস্থ্য ও আনন্দ লাভের জন্য নানা স্থানে গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, দরিদ্রের দুঃখের দিকে তাঁহারা কখনও চাহিয়া দেখেন না, আজও দেখিতেছেন না।

এই যে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, ইহা অনেকে ধারণাই করিতে পারেন না; তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতেছেন না বলিয়া এই ভীষণ সত্যকে তাঁহারা তেমন করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন না। কিন্তু সত্য যতই ভীষণ হউক তাহা সত্য,—জীবনের মত সত্য, মৃত্যুর মত সত্য। যাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন তাঁহারা অনেকে সেই দুঃখ মোচন করিতে অগ্রসর হইতেছেন, আবার অনেকে ক্ষণিক সহানুভূতি করিয়া অপরের দুঃখে বেশীক্ষণ কষ্ট না পাইয়া আমোদে তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন।

রমণীরা জগৎজননী, জগৎবাসীর দুঃখে মাতার মত তাঁহাদের প্রাণই আগে ব্যথিত হইয়া উঠে। আজ দেশবাসীর দুঃখে আমাদের হৃদয় কি কোন প্রকার সাড়াই দিবে না। শ্রাবস্তিপুরে যখন মহা অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, তখন মানবদুঃখকাতর ভগবান্ বুদ্ধ আপনার ভক্তগণকে দুর্ভিক্ষপীড়িতের ভার লইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তখন লক্ষপতি ক্রোড়পতি যত ধনী মহাজন সকলেই আপনার সামর্থ্যের অভাব ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা কার্য্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এই বিষম ভারের সহিত আপনাদের শক্তির তৌল করিয়াছিলেন। এই মাপ-জোখেই তাঁহারা ভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়ার মাতৃহৃদয় বাহিরের হিসাব করিল না। তাহার শক্তিতে কুলাইবে কি না একথা তাহার হৃদয়ে উদিতই হইল না। সে আপনার ভিক্ষাপাত্র হস্তে করিয়া বলিল,

"ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা,
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।"

আমরা সুপ্রিয়ার মত করিয়া দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা মিটাইতে যদি না পারি, তবে তাহার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিবার চেষ্টা যেন করি। ভগবান নানা বেশে ভক্তের হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হন, আজ তিনি ভিক্ষুক-বেশে উপস্থিত; কোনও দুয়ার হইতে যেন তাঁহাকে রিক্ত হস্তে ফিরিতে না হয়। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন আপনারা অনেকেই ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, আজ তাঁহার আর্ত্ত মুমূর্ষু সন্তানগণকে অন্নদানে রক্ষা করুন, ইহাতেই তাঁহার প্রিয়-সাধন হইবে। তাঁহার ভাণ্ডার আপনাদের সকলেরই ঘরে, সে ভাণ্ডার-দ্বার আজ উন্মুক্ত হউক।*

শ্রীশান্তা চট্টোপাধ্যায়।

---

* কোন নারীসভায় পঠিত।

আলোচনা

কপিলবস্তু না কপিলবাস্তু।

ভাদ্রমাসের "প্রবাসী" পত্রে (৬৩৮ পৃ.) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "কিন্তু আষাঢ়ের প্রবাসীতে পুরাবৃত্ত আলোচনায় (৪১২পৃ.) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় মহাযানীয় মহাবস্তু নামক গ্রন্থের বচন তুলিয়া বলিতে চাহেন কপিলবস্তু শব্দই ঠিক, কপিলবাস্তু ঠিক নহে। পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় দেখা যাইবে, উভয়ই চলিতে পারে, কিন্তু কপিলবাস্তু লেখাই সঙ্গততর।" কোন্ কোন্ গ্রন্থে "কপিলবস্তু" আছে শাস্ত্রীমহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং পণ্ডিত ব্যক্তির ন্যায় মহাযানীয় গ্রন্থসমূহের অনুবাদ কপিলবস্তু যে ভ্রমপূর্ণ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া "কপিলবাস্তু লেখাই সঙ্গততর" বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন। আমি পণ্ডিত নহি, সুতরাং মহাযানীয় সংস্কৃতগ্রন্থের ভাষাগত ভ্রম-সংশোধনের আমার যোগ্যতা নাই, এবং স্কুলের বালকের রচনার ন্যায় অত প্রাচীনকালের রচনাকে যদৃচ্ছা শোধন করিয়া যে ইতিহাস পড়া যাইতে পারে একথাও আমার মনে উদিত হয় নাই। আমি কপিল-বস্তুকে সংজ্ঞাশব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করেন সেই মহাবস্তুর পাঠ এবং নিরুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি। শাস্ত্রীমহাশয়ের লেখা পাঠ করিয়া মনে হয় তাঁহার মতে মহাবস্তু, দিব্যাবদান, ললিতবিস্তর আদি মহাযানীয় তথা-কথিত সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থগুলি পালিগ্রন্থের অনুবাদ এবং কপিলবস্তু পালি কপিলবত্থুর অশুদ্ধ অনুবাদ; "খাঁটি অনুবাদ হইবে কপিলবাস্তু।" কিন্তু মহাবস্তু, দিব্যাবদান প্রভৃতি গ্রন্থ যে পালিগ্রন্থের অনুবাদ তাহার প্রমাণ কি? শাস্ত্রী-মহাশয় মূল পালি মহাবস্তু বা দিব্যাবদানের সন্ধান পাইয়াছেন কি? আর যদি না পাইয়া থাকেন, তবে কোন্ প্রমাণের বলে এত প্রকাণ্ড একটা সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতে সাহস পাইলেন তাহার উল্লেখ করা উচিত ছিল। মূল পালি মহাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু সংস্কৃত মহাবস্তুর অংশবিশেষের সহিত পালিপিটকের অংশবিশেষের বস্তুগত সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দীঘ-নিকায়ের অন্তর্গত মহাগোবিন্দীয় সুত্তন্ত এবং মহাবস্তুর অন্তর্গত —মহাগোবিন্দীয় জাতকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শাস্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি মহাগোবিন্দীয় জাতককে মহাগোবিন্দীয় সুত্তন্তের অনুবাদ বলিতে প্রস্তুত আছেন? গৌতমবুদ্ধের পিতার নাম বা তাঁহার জন্মস্থানের নাম সংজ্ঞাশব্দ। সংজ্ঞাশব্দের আদিম আকৃতি নিরূপণ করিবার জন্য ব্যাকরণাদির আশ্রয় না লইয়া প্রাচীনতম গ্রন্থনিচয়ে ঐ শব্দের যে আকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা লেখাই সঙ্গততর। "সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিদ্‌গণ" এবং "খাঁটি সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থের" রচয়িতাগণ যে হিসাবে অশুদ্ধ "শুদ্ধোদন" স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, আমি বাঙ্গলার শাস্ত্রীমহাশয়গণকেও সেই হিসাবে "কপিলবস্তু" প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছি। অবশ্যই বৌদ্ধকবিকুলচূড়া অশ্বঘোষ যদি কপিলবস্তু এবং কপিলবাস্তু এই উভয় পদ ব্যবহার করিয়া থাকেন তবে বলিতে বাধ্য হইব "উভয়ই চলিতে পারে।" কিন্তু অশ্বঘোষের পক্ষে এইরূপ বিরোধী পদ প্রয়োগকল্পনা সঙ্গত কি? শাস্ত্রীমহাশয় যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে আছে "কপিলস্য বস্তু" এবং সৌন্দরনন্দে আছে "কপিলবাস্তু।" বুদ্ধচরিতের সম্পাদক কাউয়েল সাহেব এবং তাহা অক্‌স্ফর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস হইতে প্রকাশিত। সৌন্দরনন্দ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কিরূপ অসাবধানতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় স্বয়ংই ১৯১৪ সালের বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং সৌন্দরনন্দের প্রকৃত পাঠ কপিলবস্তু না কপিলবাস্তু এ বিষয়েও শাস্ত্রীমহাশয়কে একটু অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি।

শাস্ত্রীমহাশয় কপিলবস্তু-প্রসঙ্গে আরও দু একটি কথা বলিয়াছেন যাহা প্রমাণ-বিরোধী বলিয়া মনে করি। (১) দিব্যাবদান যে মহাযানীয় গ্রন্থ এ কথার প্রমাণ কি? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ চৈনিক ত্রিপিটক আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে দিব্যাবদান হীনযানীয় সম্প্রদায়-বিশেষের বিনয়পিটক হইতে আহৃত উপাদান লইয়া গঠিত (পেট্রোগ্রাড হইতে প্রকাশিত অবদানশতকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। (২) শাস্ত্রী-মহাশয় কেন যে মহাবস্তুকে "মহাযানীয়" বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মহাবস্তু-অবদানের গোড়াতেই কথিত হইয়াছে ইহা মধ্যদেশীয় মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের লোকোত্তরবাদিগণের বিনয় পিটক। এই লোকোত্তরবাদিগণ হীনযানীয় ১৮টি সম্প্রদায়ের অন্যতম। লোকোত্তর-বাদিগণ সম্বন্ধে অনেক কথা এই ভাদ্রসংখ্যার প্রবাসীতে উদ্ধৃত (৬০৯-৬১০ পৃ.) "মহাযান কোথা হইতে আসিল" প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। এই প্রবন্ধে লেখক লিখিয়াছেন, "এই সভায়ই (কণিষ্কের জলন্ধরের মহাসভায়) মহাসাঙ্ঘিকেরা মহাযানরূপে পরিণত হয়, কারণ মহাসাঙ্ঘিক ও মহাযানে অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।" প্রকৃত প্রস্তাবে যে সম্প্রদায়ের পরিণাম মহাযান তাহা বৈতুল্য বেতুল্যক নামে পরিচিত ছিল। মহাযান সূত্রগুলি বৈপুল্যসূত্রনামে পরিচিত। এই বৈপুল্য বৈতুল্য-সংজ্ঞার রূপান্তর মাত্র। ১৯০৭ সালে কার্ণ (H. Kern) এই তথ্য প্রচার করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজ ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন (Journal of the Royal Asiatic Society 1907, pp. 432-434). "মহাযান কোথা হইতে আসিল?" এই প্রবন্ধের লেখক বৈতুল্য উপেক্ষা করিয়া থাকিলেও মহাসঙ্ঘিক মত যে মহাযান হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "মহাসাঙ্ঘিক হইতে মহাযান হইতে তিন শত বৎসর লাগিয়াছিল।" কিন্তু তাঁহার আর-একটি কথা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন, "মহাসঙ্ঘিকদিগের একখানি মাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে ও প্রকাশিত হইয়াছে—সেখানি মহাবস্তু-অবদান। এইখানি যে কি ভাষায় লেখা তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। মহাবস্তু-অবদানের ভাষা মিশ্রভাষা। এ ভাষায় 'বাস্তু' 'বস্তু' হইয়া যায়, তাই যেখানে অশ্বঘোষ কপিলবাস্তু লিখিয়াছেন, সেখানে 'মহাবস্তু অবদানে' 'কপিলবস্তু' লেখা আছে।" যদি মহাবস্তু-অবদানের পূর্ব্বে রচিত কোনও পুস্তকে "কপিলবাস্তু" পাঠ পাওয়া যায় তবেই বলা যায় যে "মহাবস্তু অবদানে"র ভাষায় বাস্তু বস্তু হইয়া গিয়াছে। নতুবা এরূপ বলা যাইতে পারে না। বাস্তু এবং বস্তু উভয়ই সংস্কৃত শব্দ। মহাবস্তু অবদানের ভাষায় বস্তু সর্ব্বত্র ছদ্মবেশী 'বাস্তু' মাত্র, একথা বলা যাইতে পারে না, কারণ গ্রন্থের নামেই 'বস্তু' শব্দ নিজমূর্ত্তিতে বিদ্যমান। 'মহাবস্তু' কাটিয়া 'মহাবাস্তু' পাঠ করিতে বোধ হয় কেহই রাজি হইবেন না।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

* * *

টোল ও পাঠশালা।

প্রবাসী মডার্ণরিভিউয়ের প্রতি সংখ্যাতেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে-সকল মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহাতে দেখা যাইতেছে যে দেশের লোক-সংখ্যার অনুপাতে কি বিদ্যালয়ের সংখ্যা, কি ছাত্র-সংখ্যা, এই উভয় বিষয়েই আমরা সকল সভ্যদেশের বহু পশ্চাতে আছি। অথচ শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ বলেন যে কোন বিদ্যালয়েই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার

অধিক ছাত্র পড়িতে পাইবেন না। কোন ক্লাসে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক ছাত্র পড়িতে পাইবেন না। এই-সকল নিয়ম আমাদের এই দরিদ্র দেশের পক্ষে বড়ই কঠিন ও অনুপযোগী।

যে-সকল বিদ্যালয়ের সহিত গভর্মেণ্টের সংস্রব আছে তথায় শিক্ষালাভ ব্যয়সাধ্য এবং দিন দিন অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিতেছে। নিম্নশ্রেণীর শিশুছাত্রদিগের জন্যও প্রতি বৎসর যে-সকল পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট হয় অনেক দরিদ্র অভিভাবক তাহার মূল্য সংগ্রহ করিতে পারেন না। এক পাঠ্যপুস্তকের ভারেই শিশুও মারা যাইতেছে; শিশুর অভিভাবকেরাও মারা যাইতেছেন। ছাত্রবেতন পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়ান হইয়াছে ও হইতেছে। যে-সকল ছাত্রের বাস বিদ্যালয় হইতে দূরে তাহাদের বোর্ডিংয়ের ব্যয় আছে। ইহার উপর প্রাইভেট টিউশনের উপদ্রব আছে। উপদ্রব এই জন্য বলিতেছি যে অভিভাবকদিগকে প্রাইভেট টিউটর রাখিতে বাধ্য করিবার জন্য অনেক শিক্ষক বিদ্যালয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন না। এ বিষয়ে আমরা ভুক্তভোগী।

যে বিদ্যালয়ের সহিত গভর্মেণ্টের সংস্রব থাকিবে এরূপ নূতন বিদ্যালয় স্থাপন এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। গভর্মেণ্টের প্ল্যান্-মত গৃহ নির্ম্মাণ বিশ ত্রিশ হাজার টাকার কম খরচে হয় না। বেঞ্চ, ডেস্ক, ইত্যাদি আসবাবের ব্যয়ও কম নহে।

শিক্ষার পথ যেন ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতেছে।

গভর্মেণ্টের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিলে এই বিষম সমস্যার সমাধান হইবে না। গভর্মেণ্টের আয়ের যে অংশ শিক্ষালাভের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অপ্রচুর। আমরা ইচ্ছা করি বটে যে অন্যান্য বিভাগের ব্যয় সংকোচ করিয়া শিক্ষাবিভাগে আরও অধিক ব্যয় করা হউক কিন্তু আমাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে বোধ হয় না।

গভর্মেণ্টের নিকট শিক্ষার বিস্তারের জন্য যেরূপ আবেদন করা হইতেছে তাহা চলুক; কিন্তু গভর্মেণ্টের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া আমরা নিজে চেষ্টা করিলেও অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারি ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

এই শিক্ষাবিস্তারের সহজ উপায় টোল ও পাঠশালা স্থাপন। আমরা চতুষ্পাঠী অর্থে "টোল" শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। যেখানে বিনা বেতনে ছাত্রেরা বিদ্যালাভ করিবে তাহাকেই "টোল" বলিব। ইহাকে বাঙ্গলা টোল বলুন বা একটা নূতন নাম গড়িয়া লউন তাহাতে আপত্তি নাই, জিনিসটা কি বুঝিলেই হইল।

বোধ হয় পূর্ব্বেকার টোলের অধ্যাপকদের ন্যায় এই-সকল বাঙ্গালা-টোলের অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে বিদ্যাদানের সহিত অন্নদান করিতে পারিবেন না। অন্ততঃ দেশকাল বিবেচনা করিয়া এইরূপ মনে হয়। যদি তাঁহারা অন্নদান করিতে না পারেন, কেবল বিদ্যাদানই করুন। ছাত্রেরা যদি ঘরের খাইয়া বিনা বেতনে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পায় এ দুর্দ্দিনে সে লাভ বড় কম নহে।

পাঠশালার শিক্ষকেরা ছাত্রদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বেতন লইবেন। তাঁহারা যদি শিক্ষাদানে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন তাঁহাদের আরও বৃদ্ধি হইবার আশা আছে। পুরাতন পাঠশালার শিক্ষকের ন্যায় যদি এই-সকল পাঠশালার শিক্ষকেরা নগদ বেতনের পরিবর্ত্তে সিধা আদি লয়েন তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

আমাদের এই-সকল টোল ও পাঠশালায় জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ছাত্রকেই লইতে হইবে।

এই-সকল টোল ও পাঠশালায় সকল বিষয়েরই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আপাততঃ যদি কেবল লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিখান হয় তাহা হইলেও অল্পদিনেই দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার অনেকদূর অগ্রসর হইবে।

আমাদের দেশের অনেক পল্লীগ্রামেই স্কুল নাই, স্কুল চলিতেও পারে না। কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামেও একটি টোল বা পাঠশালা চলিতে পারে। যেখানে তাহাও চলিবে না, সেখানে দুইটি বা তিনটি পল্লীগ্রামের জন্য একটি টোল বা পাঠশালা স্থাপিত হইতে পারে।

এই-সকল টোল ও পাঠশালায় যেরূপ শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে সেইরূপ শিক্ষা দিবার উপযুক্ত অনেক ব্যক্তি দেশে পাওয়া যাইতে পারে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। নাই কেবল উৎসাহ ও উদ্যম।

অনেক পল্লীগ্রামেই মধ্যবিত্ত অবস্থার এরূপ ব্যক্তি আছেন যাঁহারা কোন ব্যবসায় বা চাকরী করেন না। চাষের আয় হইতে অথবা পৈতৃক সম্পত্তির অন্য প্রকার আয় হইতে ইঁহাদের সংসার চলে। ইঁহাদের অবসরের অভাব নাই। এই অবসরকাল তাসপাশা খেলায় বা দিবা-নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। ইঁহারা অনায়াসে একটি টোল বা পাঠশালা চালাইতে পারেন। তাহাতে দেশের উপকার হইবে। তাঁহাদের নিজেরও অনুপকার হইবে না।

আমাদের দেশে অনেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি আছেন যাঁহারা একটি স্কুল চালাইতে পারেন; বারোয়ারীর চাঁদা হইতে আরও সহজে প্রায় সর্ব্বত্রই টোল বা পাঠশালা স্থাপিত হইতে পারে।

আমাদের দেশে অনেক যুবক সামান্য বেতনের চাকরীর জন্য লালায়িত। যদি তাঁহাদিগকে পাঠশালার শিক্ষক করা হয় তাহা হইলে তাঁহাদের হাহাকার ঘুচিবে, দেশেরও উপকার হইবে।

এই-সকল টোলের ও পাঠশালার ব্যয় অতি অল্পই হইবে। কোন বড়লোক বা গৃহস্থের বৈঠকখানায় অথবা বারোয়ারী ঘরে ছাত্র ও শিক্ষকদের স্থান হইতে পারে। রৌদ্র ও বৃষ্টির সময় ব্যতীত গাছ-তলাতেও তাঁহারা বসিতে পারেন। বেঞ্চ, ডেস্কের দরকার নাই। ছাত্রেরা তালপাতার আসন বা ঐরূপ স্বল্প মূল্যের আসনে বসিবে। যদি পুনরায় পাততাড়ি চালাইতে পারা যায় কাগজের খরচ কমিবে। কেবল সুনির্ব্বাচিত অল্পসংখ্যক পুস্তকের জন্য কিছু খরচ অবশ্য হইবে।

আমাদের এই গরীব টোল ও পাঠশালায় গভর্মেণ্ট-স্কুল-ইনস্পেক্টর-দিগের পদধূলি পড়িবে কি না বলা যায় না। যদি পড়ে আমাদের সৌভাগ্য। না পড়ে তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু গভর্মেণ্টের কোন সাহায্যের বিনিময়ে আমাদের গরীবানা চা'ল ছাড়া হইবে না। বলদ দ্বারাই আমাদের চাষ করিতে হইবে। হাতী দ্বারা চাষ করা আমাদের পোষাইবে না।

বলা বাহুল্য আমাদের টোল ও পাঠশালার ছাত্রেরা ডাক্তার উকীল বা হাকীম হইতে পারিবে না। গভর্মেণ্টের কোন চাকরীও পাইবে না। যাঁহারা সে আশা করেন তাঁহাদিগকে এক্ষণকার প্রচলিত স্কুলে প্রবেশ করিতে হইবে।

স্বর্গীয় গোখ্‌লে মহোদয় রাজশাসনের দ্বারা যাহা করিতে চাহিয়া-ছিলেন যদি আমরা নিজচেষ্টায় তাহার লক্ষাংশের একাংশও করিতে পারি তাহা হইলে আমরাও ধন্য হইব এবং আমাদের জন্মভূমিও ধন্য হইবে, এই আশায় আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব প্রবাসীর পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত করিলাম।

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী কাব্যবিশারদ।

* * *

বিহার ও উড়িষ্যায় বাঙালীর শিক্ষা।

গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে বিবিধ-প্রসঙ্গের মধ্যে বিহার ও উড়িষ্যার প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি গভর্মেণ্টের অসমান ব্যবহারের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ঐ বিষয়ে আমার দুই চারিটি কথা বলিবার আছে।

পৃথিবীর সকল মানুষকে সমান চক্ষে দেখা চরম আদর্শ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের বর্ত্তমান প্রবৃত্তি যেরূপ তাহাতে মুখে যেই বা বলুন কেহ সমান চক্ষে দেখেন বলিলে বিশ্বাস করা একরূপ অসম্ভব। আমরা ভারতবর্ষের অন্ত অংশের লোকদিগকে ভারতবর্ষের বাহিরের লোক-সকলের চেয়ে বেশি আপনার মনে করি সত্য, কিন্তু ঠিক বাঙ্গালীর মত আপনার মনে করিতে এখনও শিখি নাই। সেইরূপ বিহার বা উড়িষ্যার লোকেরা বাঙ্গালীকে ঐ অংশের প্রবাসীই হউন বা নাই হউন, ঠিক আপনার লোক বলিয়া মনে করে না।

বরং বাঙ্গালীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বেশি পরিমাণে প্রচলিত হওয়ায় ও সম্ভবতঃ বাঙ্গালীরা অপেক্ষাকৃত বেশি বুদ্ধিমান বলিয়া বিহার ও উড়িষ্যার অধিকাংশ রাজকর্ম্মচারী বাঙ্গালী; অধিকাংশ বড় উকীল, বড় ডাক্তার প্রভৃতি বাঙ্গালী হইয়া এখন বাঙ্গালীর উপর একটু বিদ্বেষভাব বেশ আসিয়া পড়িয়াছে। বিহারী ও উড়িয়ারা এখন বাঙ্গালীর সঙ্গে নিজের প্রদেশের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা (free competition) চায় না।

বিহারী ও উড়িয়াদিগের মধ্যে বাঙ্গালীদের মত শিক্ষা এখনও বিস্তৃত হয় নাই ইহা জানা কথা, আর বিবিধপ্রসঙ্গে যে-সব তালিকা (Statistics) দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও কতক প্রমাণ হয়। পরীক্ষার ফলের উপর বৃত্তি দেওয়ার একটি উদ্দেশ্য—সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর চেয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। কেবলমাত্র অবনত জাতির (submerged classes) জন্ম বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইলে আমরা সকলেই বোধ হয় খুব অনুমোদন করি। যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে খাস বিহারী ও খাস উড়িয়ারা শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙ্গালীর চেয়ে পিছাইয়া আছে তবে তাদের জন্ম বিশেষ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইলে আপত্তি করাটা আমার মতে যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। সেইরূপ বাঙ্গালী ডাক্তার ও বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারের তুলনায় খাস বিহারী ও উড়িয়া ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা নগণ্য বলিলেই হয়। কাজেই বিহারে ও উড়িষ্যায় এই-সকল বিষয় শিক্ষা দিবার স্থানে প্রথম প্রবেশের অধিকার বিহারী বা উড়িয়ার থাকা অন্যায় বলা যায় কি করিয়া।

আমাদের যখন ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থ থাকে তখন অপর ব্যক্তি বা অপর জাতি কি বলে বা কি চায় সে বিষয়ে বড় লক্ষ্য করি না। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে বিহারী বা উড়িয়ারা বাঙ্গালীদের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতা চায় না। আমরা ইহাও বলি যে শাসিতদিগের মতানুযায়ী শাসন করাই আদর্শ। তাহা হইলে বিহারী ও উড়িয়াদিগের মতানুযায়ী কার্য্য করায় গভর্মেণ্টকে দোষ দেওয়া যায় না।

অবশ্য প্রবাসী বাঙ্গালীরা বিহার ও উড়িষ্যায় শাসিতদিগের মধ্যে। তাহাদের মত উপেক্ষা করা উচিত নয়। তবে প্রজাতন্ত্রের (democracy র) বর্ত্তমান নিয়মে বেশী লোকে যাহা চায় তাহাই করা হয়। এ ক্ষেত্রে গভর্মেণ্ট প্রজার মত (plebiscite) লইয়া এই-সব নিয়ম করিয়াছেন এরূপ পাগলের কথা বলিতেছি না, আমার বক্তব্য—বিহারী ও উড়িয়াদিগের আত্মশাসনের (Self-government) ক্ষমতা থাকিলে গভর্মেণ্ট যাহা করিতেছেন তাহারাও তাহাই করিত। সেইরূপ আবার বাঙ্গালা দেশে বিহারী ও উড়িয়া কুলি-মজুর চাকর-বাকর সম্ভবতঃ এখনকার মত অবাধে আসিতে পারিত না। অষ্ট্রেলিয়াতে শ্রমজীবীর দল প্রবল হওয়ায় ঐ দেশে লোকের আমদানি কমিয়া গিয়াছে। এই-সব কার্য্য আমি অনুমোদন করি পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া যেন না মনে করেন—মানুষের বর্ত্তমান প্রবৃত্তি যেরূপ তাহাতে তাহারা এইরূপ কার্য্যই করে, ইহাই দেখান মাত্র আমার উদ্দেশ্য।

জাতি বা ধর্ম্ম অনুসারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন (Communal representation) প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি না, কেননা জাতি বা ধর্ম্ম অনুসারে চাকরী পাওয়া ছাড়া স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এদেশে জাতি বা ধর্ম্ম-বিশেষ স্বতন্ত্র প্রতিনিধি চান। অপর পক্ষরা চান না বলিয়া তাঁহাদের দাবি অগ্রাহ্য করিতে বলেন। সেটা ন্যায্য বলিয়া মনে হয় না। ক্রমে আপনা হইতেই এই দাবি কমিয়া আসিবে। প্রথম সকল মুসলমানই এই দাবি করিতেন, এখন জন কয়েক মুসলমান নেতারা বুঝিয়াছেন যে Communal representation দূরদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ভাল নয়।

আমি একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। যখন বঙ্গ-বিচ্ছেদ রহিত হয় তখন আমার এক বিশেষ শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলেন "কাগজওয়ালারা, দেশের বড় ছোট সবাই খুব বাহাবা দিচ্চে। কিন্তু আমাদের সর্ব্বনাশ হ'ল তা কেউ দেখ্‌চে না। এক তো ক'লকাতা কাণা হয়ে যাবে, আমাদের এত বাঙ্গালী বিহারে ও উড়িষ্যায় চাকরি-বাকরি করে খাচ্চে, তাদের রুটী মারা যাবে।" কলিকাতা কাণা হইবে না তখন বলিয়াছিলাম, এখনও তো হয় নাই। দ্বিতীয় কথার জবাবে বলি, "বিহারে ও উড়িষ্যাতে বাঙ্গালীর ব্যবসা বাণিজ্য করার কোন অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না, সরকারী চাকরি খুব কমিয়া যাইবে বটে।" "এখন বিহারে ও উড়িষ্যায় শিক্ষিত লোকের অভাব বলিয়াই এত বাঙ্গালীকে সেখানে চাকরি করিতে হয়। বাঙ্গালার মত সেই-সব প্রদেশেও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িলে সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষে খুব মঙ্গলের বিষয়। কিছু কাল পূর্ব্বে সমস্ত উত্তর ভারতে কত বাঙ্গালী কি গভর্মেণ্টের অধীনে কি দেশীয় রাজ্যে কত উচ্চ কর্ম্ম করিতেন, এখন তাঁহাদের সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে, সেই-সব দেশের লোকই ঐ-সব উচ্চ কর্ম্মের উপযুক্ত হইয়াছেন। কেবল বাঙ্গালীদের স্বার্থ দেখিতে গেলে খারাপ হইয়াছে বটে কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের স্বার্থ দেখিতে গেলে খুব আহ্লাদের বিষয় মনে করি। বোধ হয় এখন বাঙ্গালীর ক্ষেত্র বড় চাকরি করা নয়, দেশের Industrial developmentই কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে বোম্বাইবাসীরা বাঙ্গালীদের অনেক দূরে ফেলিয়া গিয়াছে"।

১৩ই আশ্বিন, ১৩২২ সন। প্রবাসীর একজন পাঠক।

সম্পাদকের মন্তব্য।

পত্রপ্রেরক মহাশয় বলিতেছেন যে পরীক্ষার ফলের উপর ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়ার একটি উদ্দেশ্য সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর চেয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। এইরূপ বৃত্তি কোন কোন স্থলে দেওয়া হয় বটে। কিন্তু সাধারণ ছাত্রবৃত্তিগুলি পরীক্ষায় পারদর্শিতা অনুসারে শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে, ধনী নির্ধন অগ্রসর পশ্চাৎপদ, সকল শ্রেণীর ছাত্রকে দেওয়া হয়। সুতরাং এই ছাত্রবৃত্তি দানের ব্যবস্থার মধ্যে লেখক মহাশয়ের উল্লিখিত উদ্দেশ্য কি পরিমাণে বিদ্যমান আছে বলিতে পারি না।

বিহারী ও ওড়িয়া ছাত্রদের জন্য বিশেষ বৃত্তি বিহার গবর্নমেণ্ট যত ইচ্ছা রাখুন; তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে যেমন আছে তেমনই কতকগুলি সাধারণ বৃত্তি বিহার এবং উড়িষ্যাতেও থাকা চাই, যেগুলি পারদর্শিতা অনুসারে বিহার ও উড়িষ্যাবাসী বিহারী ওড়িয়া বাঙ্গালী পঞ্জাবী হিন্দুস্থানী আদি যে কোন শ্রেণীর ছাত্র পাইতে পারিবে।

ডাক্তারী বা এঞ্জিনীয়ারিং বা সাধারণ শিক্ষা-মন্দিরে প্রথম প্রবেশের অধিকার বিহারী ও ওড়িয়ার থাকা আমরাও বাঞ্ছনীয় মনে করি; আমরা ইহা চাই না যে অন্যান্য প্রদেশ হইতে ছাত্রেরা আসিয়া শিক্ষালয়ের সমুদয় স্থান জুড়িয়া বসে, এবং বিহার উড়িষ্যার বাসিন্দা ছাত্রেরা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু আমরা বিহারী ও ওড়িয়া কথাগুলি ব্যাপক অর্থে গৃহীত হওয়া ন্যায়সঙ্গত ও একান্ত আবশ্যক মনে করি। নতুবা বিহার ও উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী ছাত্রেরা যাইবে কোথায়? যে প্রদেশে তাহারা বাস করে সেখানে শিক্ষা পাইবে না, অন্য প্রদেশে গেলে সেখানেও তাহারা উৎকৃষ্ট শিক্ষালয়গুলির অধ্যক্ষদিগের দ্বারা গৃহীত হইবে না। কারণ, সকলেই জানেন বাঙ্গালা দেশের কলেজগুলিতে শিক্ষার্থী সমুদয় বাংলাবাসী ছাত্রের স্থান হয় না। তাহারা কি তবে ধোবী কা কুত্তা, না ঘাট্‌কা, না ঘরকা? আর অন্য প্রদেশে গেলে যদিই বা তাহারা শিক্ষালয়ে স্থান পায়, তাহা হইলেও আপনাদের বাসস্থান হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে ছাত্রাবাসে রাখিয়া সন্তানকে পড়াইবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অধিকাংশ পিতামাতাই পারেন না।

ইহাও বিবেচ্য যে বিহার-উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীরাও বিহারী-ওড়িয়াদের মত রাজকোষে কর দেয়। যে প্রজা কর দেয়, তাহার বিনিময়ে সে রক্ষিত হয়, শিক্ষালাভের সুবিধা পায়, এবং অন্যান্য অধিকার লাভ করে। বিহার-উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী ঐ প্রদেশের গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দেয়। তবে তাহারা শিক্ষালাভ সম্বন্ধে কেন অসুবিধা ভোগ করিবে?

বিহার-উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীরা শিক্ষায় অগ্রসর বলিয়া যদি তাহাদিগকে অসুবিধায় ফেলা ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা হইলে কেহ ত এরূপ তর্কও করিতে পারে, যে, যেহেতু বিহারের কায়স্থরা শিক্ষায় ও রাজকার্য্যলাভে অন্যান্য শ্রেণীর লোক অপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছে, অতএব ছাত্রবৃত্তি তাহারা পাইবে না, শিক্ষালয়েও তাহারা ভর্ত্তি হইতে পাইবে সর্ব্বশেষে, স্থান থাকিলে; এবং চাকরীতে তাহাদের দাবী বিবেচিত হইবে অন্যান্য শ্রেণীর প্রার্থী না থাকিলে। সত্য, বিহার উড়িষ্যাবাসী ছাত্রদের পিতামাতা বা পিতামহ পিতামহী বা আরও দূরতর পূর্ব্বজগণ বাঙ্গলাদেশ হইতে আগত। কিন্তু বাঙ্গলাদেশ হইতে আসাটা ত পাপ নয়। এরূপ বিচার করিতে হইলে, সকল ছাত্রেরই পূর্ব্বপুরুষ কতদিন আগে কোন্ প্রদেশ হইতে বিহার উড়িষ্যায় আসিয়াছে, তাহা স্থির করিয়া, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ যত আগে আসিয়াছে, কালের ক্রম অনুসারে তাহাদিগের ভর্ত্তি হইবার অধিকার তত বেশী, এই নিয়ম অনুসারে কাজ করিতে হয়। কিন্তু তাহা অসাধ্য।

স্বশাসক দেশসমূহে শাসিতদের মত অনুসারে কাজ হইয়া থাকে বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া অধিকাংশের মতে অন্যায় কার্য্য বা ব্যবস্থা হইলে তাহা আমরা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লই না। বৃটিশ উপনিবেশসকলে আমাদিগকে যাইতে দেয় না; কিন্তু তাহা আমরা মানিয়া লইতেছি না। বিহার উড়িষ্যা স্বশাসক হইয়া যদি প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদের অসুবিধায় ফেলে তাহা হইলে তখনও আমরা তাহা অন্যায় বলিব এবং প্রতিকারের চেষ্টা করিব। তা ছাড়া তখন আমরাও স্বশাসক হইব, এবং তখন কেহ কোথাও বাঙ্গালীকে অসুবিধায় ফেলিলে আমরাও বঙ্গপ্রবাসী সেই প্রদেশের লোককে তত্তুল্য অসুবিধায় ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া প্রতিকার করিতে পারিব। এখন বিহার-উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীকে অসুবিধায় ফেলিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বিহারী বা ওড়িয়াকে অসুবিধার ভয় দেখান না; চাকরবাকর ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক ভিন্নপ্রদেশ হইতে বাংলায় আসিয়া শিক্ষা লাভ ও অর্থ লাভ করে।

বাঙ্গালীরা নির্দ্দোষ, নিঃস্বার্থ, তাহাদের বসুধৈব কুটুম্বকম্, ইহা আমরা মনে করি না, এবং এমন কথা কখন বলিও নাই। কিন্তু বাঙ্গালী অন্য প্রদেশের লোকেরও আদর করিয়া থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে তিনজন ভিন্নপ্রদেশবাসী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং বাঙ্গালীর প্রদত্ত টাকা হইতে বেতন পাইতেছেন। বাঙ্গালী নিতান্ত স্বার্থপর ও আত্মম্ভরী হইলে ভাল-মন্দের বিচার না করিয়া বাঙ্গালী অধ্যাপকই নিযুক্ত করিত; এবং ইহাও সত্য নহে যে এই তিনজন অধ্যাপকের কাহারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী অধ্যাপক কেহ ছিলনা বা নাই।

বাঙ্গালীর কাজ এখন আর ভিন্নপ্রদেশে চাকরী খোঁজা নহে, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে শিল্পআদির উন্নতির চেষ্টা করা তাহাদের কর্ত্তব্য, ইহা আমরা মানি; কিন্তু তা বলিয়া তাহাদিগকে কোন প্রদেশে শিক্ষার সুবিধা হইতে বা চাকরী হইতে বঞ্চিত করা আমরা ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। প্রবাসী বাঙ্গালীরা এখন শিক্ষায় অগ্রসর আছে। কিন্তু শিক্ষার সুযোগ না থাকিলে তাহারা আর এক পুরুষের মধ্যেই খুব পিছাইয়া পড়িবে। তখন বোধ করি অনুন্নত পশ্চাৎপদ শ্রেণীর লোক বলিয়া তাহাদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করার বিরুদ্ধে লেখক মহাশয়ের বা অন্য কাহারও আপত্তি হইবে না।

প্রকৃত কথা এই যে প্রত্যেক প্রদেশেই জাতিধর্ম্মশ্রেণী-নির্ব্বিশেষে সমুদয় শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা উচিত। যতগুলি শিক্ষালয় আছে, তাহার দশগুণ হইলে তবে ঠিক হয়। যথেষ্ট বিদ্যালয় নাই বলিয়াই কাহার দাবী আগে, কাহার পরে, এরূপ বিচার করিতে হয়। যথেষ্ট বিদ্যালয় থাকিলে এরূপ বিচার করা অনাবশ্যক হইবে। সুতরাং সকল প্রদেশে প্রাথমিক হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিধ শিক্ষালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

বাস্তবিক শ্রেণী বা জাতি বা ধর্ম্ম ধরিয়া শিক্ষার দাবীর বিচার করা নিতান্ত অসঙ্গত। পাঁচ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়ে যে জাতির, শ্রেণীর, বা ধর্ম্মেরই হউক, সে অশিক্ষিত। সমুদয় দেশবাসীর উপর, দেশের রাজশক্তির উপর তাহার এই দাবী আছে যে সে সম্পূর্ণ শিক্ষার সুযোগ পাইবে। এই দাবী অগ্রাহ্য করা অধর্ম্ম; অগ্রাহ্য যিনিই করুন তাহাতে আসিয়া যায় না, পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের বন্দোবস্ত যথেষ্ট পরিমাণে হউক; কিন্তু অগ্রসর শ্রেণীর সন্তানদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহা করা উচিত নয়। অগ্রসর শ্রেণীর কাহারও গৃহে জন্মগ্রহণ করা একটা অপরাধ নহে যে তজ্জন্য অগ্রসরদের সন্তানদিগকে শিক্ষাবিষয়ে অসুবিধা ভোগরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

দেশের কথা

পূজাবকাশে মফঃস্বলের অল্পসংখ্যক কাগজই আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এক সংবাদ, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, অনশনে মৃত্যু ইত্যাদি। আজকাল বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের কথাই বেশী শোনা যাইতেছে। দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের সাহায্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমিতি বাঁকুড়ায় কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন, ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর নাম উল্লেখযোগ্য। গভর্মেণ্ট তাগাবী ও কৃষি-ঋণ প্রদান আরম্ভ করিয়াছেন। সেই অর্থে কৃষকেরা বীজ আদি খরিদ করিয়া জমীতে গোধূম, যব, ছোলা প্রভৃতি জন্মাইবার প্রয়াস পাইতেছে। কৃষিজীবীদের স্থায়ী জলকষ্ট দূর

করিবার জন্য গভর্মেণ্ট আরও ৫৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। সেই টাকায় জেলাবোর্ড এমন কতকগুলি বাঁধ ও দীর্ঘিকা খনন করাইবার চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে অনেক কর্ষিত ভূমিতে জলসেচন হইতে পারে। "বাঁকুড়া-দর্পণে" প্রকাশ—

বাঁকুড়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কুক সাহেব এবং অনারারী সেক্রেটারী মহাশয় জেলার মধ্যে যে-সকল অংশে অজন্মা অধিক সেই-সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা যে প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন সেই প্রণালীতে কার্য্য চলিলে কোন দুঃস্থ ব্যক্তি সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে না। কার্য্যক্ষম ব্যক্তি কার্য্য পাইবে এবং যাহারা নিতান্ত অক্ষম তাহারা নিম্নলিখিত হারে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে।

বয়স্ক পুরুষ দৈনিক /১৫, স্ত্রীলোকগণ /৫, ও বালক-বালিকা-গণ ১৫ হিসাবে সাহায্য পাইবে। এক এক থানায় যতগুলি পঞ্চায়েতের ইউনিয়ন আছে প্রত্যেক ইউনিয়নে এক-একটি সাহায্য-কেন্দ্র গঠিত হইতেছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে এক-একটি সব-কমিটী গঠিত হইতেছে। এক এক কেন্দ্রের পঞ্চায়েতগণ ও স্থানীয় ২।৩ জন ভদ্রলোক ঐ সব-কমিটীর সভ্য নিযুক্ত হইতেছেন। উক্ত সব-কমিটীর সভ্যগণ তাঁহাদের মধ্যে একজনকে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিবেন। জেলা-বোর্ড রিলিফ সংক্রান্ত যে-সকল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইবার ভার দায়িত্বপূর্ণ এক-একজন রাজকর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। কোন থানায় কোন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কোন থানায় কোন সব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কোন থানায় আর কোন কর্ম্ম-চারী। ম্যাজিষ্ট্রেট কুক সাহেব সাহায্যদান ও বিবিধ বিষয়ে প্রজার মঙ্গল সাধনার্থ দিবারাত্র যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি ইহারই মধ্যে রিলিফ কমিটীর সেক্রেটারী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ইন্দপুর, ওন্দা, জয়রামপুর ও সোনামুখী পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। প্রত্যেক থানার এলেকায় যতগুলি ইউনিয়ন আছে সর্ব্বত্রই এক-একটি সব-কমিটী গঠিত হইয়াছে ও সাহায্য বিতরণ চলিতেছে।

সরকারী কৃষি বিভাগের কয়েকজন লোক দার্জ্জিলিং হইতে আলুর বীজ লইয়া বাঁকুড়ায় আসিয়াছেন। বীজ আদি ক্রয় করিবার জন্য কৃষকগণকে কৃষি-ঋণও প্রদান করিতেছেন কিন্তু বাঁধ ও পুষ্করিণীসমূহ জলে পূর্ণ না হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ মাত্রায় সফলতা লাভ করিবে না; তবে যেখানে জলাশয়ে জল আছে সেখান-কার কৃষককুলের যথেষ্ট মঙ্গলসাধন হইবে।

কলিকাতার বহুবাজার-দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-ভাণ্ডার হইতে রামকানালীর জমিদার মহাশয়ের নিকট কিছু টাকা প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত জমিদার মহাশয় সেই টাকায় গঙ্গাজলঘাটী থানার অন্তর্গত জামবেদে, গোপালপুর, কাঁটাবনি, গোপীনাথপুর, উধরাডিহি, তেঁতুলিয়াডাঙ্গা, বীর অভিরামপুর ও পীড়রাবনি গ্রামের দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে সাহায্য দান আরম্ভ করিয়াছেন।

"নীহার" সংবাদ দিয়াছেন কাঁথি মহকুমায় অনাহারে অনেকে মারা যাইতেছে। সেখানে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত, হাট বাজার লুট হইতেছে। লুণ্ঠনকারীদের প্রায় সকলেই মুসলমান। "অন্নকষ্টের দিনে লুটপাট করিলে তাহাদের কোনো সাজা হইবে না" এই মিথ্যা কথা রাষ্ট্র করিয়া সকলকে লুণ্ঠনকার্য্যে উত্তেজিত করিতেছে। শতকরা প্রায় ৯০ জন লোক অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম কাঁথির কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীদের সাহায্যের জন্য প্রায় দেড় শত খানি বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

মফঃস্বলের কয়েকখানি সংবাদপত্রে "প্রজার সহিত জমির সম্বন্ধ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম—

প্রজাই জমির একপ্রকার হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা, অর্থাৎ যে জমি শস্য উৎপাদনের যোগ্য হইয়াছে প্রজাই তাহার একমাত্র কর্ত্তা, প্রজাই জমির জঙ্গল কাটিয়াছে, প্রজাই জমিকে সমতল ও সারবান্ করিয়াছে, জমির জন্য ভবিষ্যতের আশায় দুঃখী প্রজা কত কষ্ট কত অসুবিধাই না ভোগ করিয়াছে; এরূপক্ষেত্রে ধর্ম্ম ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে জমি হইতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সম্বন্ধে খাস দখল বা সর্ব্বপ্রকার হস্তান্তর যাহা কিছু স্বার্থ বা সুবিধা হয়, বা হইবার সম্ভাবনা আছে, প্রজাই তাহার একমাত্র অধিকারী হইতে পারে। রাজা রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য জমির উৎপন্নের কিঞ্চিন্মাত্র অংশ পাইয়া তাহাই তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য বিবেচনায় চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট হইয়া আসিতেছেন। হিন্দু রাজত্ব আমলে মন্বাদি ঋষির ও মুসলমান বাদসাগণের সময় হইতে মুসলমানি ধরা অনুসারে এই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। তবে আদায়ের পক্ষে সুবিধা অসুবিধা বিবেচনায় উৎপন্ন শস্যের অংশের পরিবর্ত্তে, কালক্রমে তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া, তাহাই রাজস্ব-রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। উক্ত রাজস্ব ভিন্ন জমি সংক্রান্ত অন্য কোন স্বত্ব ও স্বার্থ সম্বন্ধে রাজার কোন প্রকার সংস্রব থাকিতে পারে না। জমিদার রাজার তহশীলদার মাত্র, তবে পূর্ব্বে অস্থায়ী ছিলেন, এখন স্থায়ী হইয়াছেন। রাজা স্বয়ং আপনাকে যে স্বার্থের অধিকারী করিয়া সন্তুষ্ট আছেন, জমিদার কখনও তদপেক্ষা অধিকতর স্বার্থের দাবী করিতে পারেন না।

যখন গবর্ণমেণ্টের খাস মহলসমূহের প্রজাগণ স্বচ্ছন্দে ও অবাধে স্ব স্ব জমি জমা সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপে যথেচ্ছরূপে হস্তান্তর করিয়া আসিতেছে, তখন জমিদারের জমিদারী এলাকার প্রজাগণ যে সেই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিবে ইহা কখনই ধর্ম্ম ন্যায় ও যুক্তিমূলক নহে, সুতরাং আইনমূলক হইতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আমলে দেশের লোকসংখ্যা কম ছিল, রপ্তানি ছিল না, প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত,—এই-সকল কারণে, শস্যের মূল্য অত্যন্ত সুলভ ছিল। সুতরাং জমি জমার তাদৃশ মূল্য ছিল না। শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। তাই জমিদারের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং এই জন্যই জমিদার পক্ষ স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে প্রজাপক্ষের সম্পূর্ণ হানি ও সর্ব্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যদি জমি জমায় প্রজাগণের অবাধ বন্ধ বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তরের ক্ষমতা, আইনের বলে অন্যায়-রূপে লুপ্ত হয়, তবে অভাবের সময় দরিদ্র দুঃখী প্রজাগণ কি প্রকারে সাময়িক অভাবের দায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে? হয়ত, এরূপ অনেক ক্ষেত্র উপস্থিত হইবে যাহাতে জমি জমা আদৌ আবাদ ও রক্ষা হইয়া উঠিবে না। জমিতে প্রজার সম্পূর্ণ স্বত্ব সামিত্ব অধিকার না থাকিলে তাহার মমতা জন্মিতে পারে না। এবং ইহাও স্থির নিশ্চয় যে, প্রজার যত্ন পরিশ্রম বা উদ্যোগ ভিন্ন কখনই জমির উন্নতি সাধন

হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় জমিদারগণ আপন স্বত্ব অর্থাৎ জমিদারী খাস খামার ও নিজ জোত আদি স্থানীয় ও ভিন্ন স্থানীয় মহাজন ও খরিদ্দারগণ হস্তে বন্ধক বিক্রয়াদি হস্তান্তরের দ্বারায় আপন আপন অভাব মোচন করিয়া আসিতেছেন। আর দুঃখী অভাবগ্রস্ত প্রজাগণ স্ব স্ব জমি জমা রক্ষার জন্য কি সাময়িক অভাবসমূহের মোচন জন্য, তাহাদের জমাই স্বত্ব আদৌ বন্ধক দিতে বা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না? ইহা কতদূর ধর্ম্ম ন্যায় ও যুক্তি-সঙ্গত তাহা প্রজাপালক গবর্ণমেণ্টের ও দেশের মহাত্মাগণের সহজেই বোধগম্য।

বাংলা দেশের কৃষকেরা প্রতিদিন দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়াই করিয়া জীবনধারণ করে। তাহারা এমনই দরিদ্র। তার উপর যারা ক্ষেত্রে পাট জন্মাইয়াছিল, যুদ্ধারম্ভ হইবার পর জার্ম্মেনি, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি স্থানে পাট রপ্তানি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের বাড়ীতে পাট গাদা হইয়া পড়িয়া ছিল। আজকাল অতি অল্প মূল্যে পাট বিক্রয় হইতেছে। সে-সম্বন্ধে "চারুমিহির" লিখিতেছেন—

হঠাৎ পাটের মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। কি জন্য এই মূল্য হ্রাস হইয়াছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে পাটের জিনিষ কিম্বা পাট এ দেশ হইতে অন্য দেশে বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করা যাইবে না। গবর্ণমেণ্ট পাটের জিনিষ ক্রয় করিয়া বিলাতে প্রেরণ করিবেন। তথা হইতে তাহা প্রয়োজনমত অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইবে। এই ব্যবস্থা দ্বারা পাটের কলওয়ালাদের বিস্তর লাভ হইবে সন্দেহ নাই। বিলাতের ব্যবসায়ীগণেরও বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের কৃষকগণই এই ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

দেশের সেবা যাঁহারা করিবেন তাঁহাদিগকে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি যাহাতে ঘটে সে-বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমাদের পল্লীগুলি নানা রোগদুষ্ট, সংস্কারাভাবে হতশ্রী। কি করিলে পল্লীসংস্কার সম্ভবপর হয় তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও শিক্ষাসাপেক্ষ। "২৪ পরগণা বার্ত্তাবহে" প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

ঢাকা মুন্সীগঞ্জের ডাক্তার কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি ও পল্লী-সংস্কার বিষয়ে বহুদিন হইতে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং পল্লীর উন্নতি সাধন বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। সংপ্রতি বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর পল্লীর সংস্কার বিষয়ে তাঁহার অভিমত জানিবার জন্য তাঁহাকে দার্জিলিঙ্গের প্রাসাদে আহ্বান করিয়াছিলেন।

নারী করুণাময়ী। স্নেহ ও সেবা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার মজ্জাগত। তা তিনি যে অবস্থার নারীই হউন না কেন। মফঃস্বলের অনেকগুলি কাগজে প্রকাশিত নিম্নলিখিত অসাধারণ দানের সংবাদটি আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিবে—

ঢাকার জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়ের পাচিকা কিরণশশী দাসী সারা জীবনে যে এক সহস্র টাকা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ঢাকা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি সেবাশ্রমে মাসিক এক টাকা চাঁদা দিতেও সম্মত হইয়াছেন।

"ত্রিপুর-হিতৈষী"তে রাজবাড়ীর নিম্নলিখিত দানের সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে—

ত্রিপুরা রাজ ষ্টেট হইতে কুমিল্লা সদর দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে ৫০০৲ টাকা দান করা হইয়াছে। ত্রিপুরার রাজবংশ চিরদিনই দানশীলতার জন্য বিখ্যাত। বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুরার দানে ত্রিপুরা ব্যতীত অন্যান্য স্থানই অধিকতর উপকৃত হইতেছে। Charity begins at home কিন্তু এখন উহা বাড়ী ছাড়িয়া অন্যান্য জিলায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। তাই বাড়ীতে এখন হাহাকার।

আমাদের দেশের "অচলায়তনের" দেয়াল বিপুল ও বহুবিস্তৃত। সেই সনাতন দেয়ালে কোথাও একটু ছিদ্র হইয়া গিয়া বাহিরের যেটুকু আলো প্রবেশ করে সেইটুকুই লাভ। "চারুমিহির" একটি সুসংবাদ দিয়াছেন—

দীননাথ দাস জাতিতে মুচী, নিবাস কলিকাতায়। সে নিজ ব্যবসা করিয়া বহু অর্থ সঞ্চিত করিয়াছে। দীননাথ ধার্ম্মিক লোক। ধনদ্বারা নিজ বিলাসিতা বৃদ্ধি না করিয়া সে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছে এবং তাহাতে নিত্য সেবা, পূজা, এবং দরিদ্র ও অতিথিগণের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক গোস্বামীগণ দীননাথের এই মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কোনও কোনও গোস্বামী ও অনেক গোঁড়া ব্রাহ্মণ এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সমাজে নির্য্যাতন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হয় নাই। হিন্দুসমাজের বহু সাম্রন্ত ভদ্রলোক এই জন্য সভা আহ্বান করিয়া উভয়পক্ষের বাদানুবাদ শ্রবণ করেন এবং দীননাথের সহিত মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপনে যে সকলেই যোগদান করিতে পারেন তাহা অবধারণ করেন। তৎপরে দীননাথের মন্দিরে দীননাথ ও তাহার স্বজাতীয়ের সহিত একত্র হইয়া কলিকাতার বহু উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সংকীর্ত্তনাদি কার্য্য করিতেছেন।

"চারুমিহিরে" প্রকাশ টাঙ্গাইল উপবিভাগের প্রায় সর্ব্বত্র ওলাউঠা রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ওলাউঠা ও অন্যান্য নানাবিধ রোগ শুধু টাঙ্গাইল কেন বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলাতেই বর্ত্তমান। "চারুমিহির" বলেন অন্ততঃ আহার ও পানীয় সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মগুলি মুদ্রিত করিয়া যদি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচার করেন তাহা হইলেও অনেক উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। আমরাও তাই মনে করি।

ব্রাহ্মসমাজ

(বরিশালে ব্রাহ্মসম্মিলনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ)

যে কোন জিনিষই হউক, তাহার প্রয়োজনীয়তার উপর তাহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আমাদের এই যে ব্রাহ্মসমাজ, ইহার স্থায়িত্বও ইহার প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে। যদি কোন অভাব পূরণ করা ইহার কার্য্য হয়, তবে জগতে সে অভাব যতদিন আছে ততদিন এ সমাজেরও আবশ্যকতা আছে।

সে অভাবটি কি, তাহা আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য।

ইহার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে পর্য্যায়ক্রমে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া এই সমাজ চলিয়া আসিয়াছে।

প্রথম অবস্থা ধর্ম্মসংস্কারের অবস্থা। মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়ের কথা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে যখন কর্ম্মকাণ্ড-পরিপূর্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী বহুশাখা-বিভক্ত প্রচলিত পুরাতন ধর্ম্ম ও সমাজ অসম্পূর্ণ পাশ্চাত্যশিক্ষার নূতন প্রচারে ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রবল সবেগ আঘাতের ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িতেছিল, এবং যখন অপর দিকে মুসলমানধর্ম্ম ও সমাজ স্বীয় উদার সার্ব্বভৌমিক মতগুলিকে কার্য্যক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, সাম্প্রদায়িক বিবাদে ব্যস্ত ছিল, তখন রাজা রামমোহন রায় প্রচলিত পুরাতন ধর্ম্মের সংস্কারের তীব্র উদ্দীপনা প্রাণে অনুভব করেন এবং তদুদ্দেশ্যেই এই ধর্ম্মসমাজ স্থাপন করেন।

প্রথম যুগ ধর্ম্মসংস্কারের যুগ। তখন ইহাকে বেদান্তধর্ম্ম বা ঔপনিষদিক ধর্ম্ম বা ব্রহ্মসূত্রের ধর্ম্ম বলা হইত। ঔপনিষদিক ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য রাজা রামমোহন মহাত্মা শঙ্করের নির্দ্দিষ্ট মত অনুসরণ করেন। সমাজে সঙ্গীত ও গায়ত্রী-মন্ত্র সহযোগে পরমেশ্বরের গুণের ব্যাখ্যা করা হইত, এবং উপনিষৎ হইতে শ্লোক, ও মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের স্তুতিও পাঠ করা হইত। এক বিষয়ে শঙ্করের সহিত রাজার মতের বিশেষ পার্থক্য ছিল। শঙ্করের মতে ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী, রাজার মতে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় গৃহী হইবেন। রাজা নিজে পুরাতন সমাজের অনেক দোষ সংস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময় ব্রাহ্মসমাজ কোন সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

এই প্রকার সামাজিক উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত করিতে রাজা বৌদ্ধ খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান উপাসনাপদ্ধতি হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমবেত উপাসনা বৌদ্ধ মুসলমান ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাণ। উপাসনায় সঙ্গীতের সাহায্য, বৌদ্ধ খৃষ্টীয় ও তৎকাল-প্রচলিত তান্ত্রিক চক্রাদির উপাসনা-পদ্ধতি হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

তৎকালে এই নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজদ্বারা যে যে কার্য্য সাধিত হয়, তাহা ইতিহাসের বিষয়; সকলেই তাহা অবগত আছেন, পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। তবে রাজার আশা তাঁহার সময়ে পূর্ণ হয় নাই, ভবিষ্যতে তাহা পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার সময় যে প্রতিমা গঠিত হইয়াছিল, ভবিষ্যতে পূজ্যপাদ শ্রীমহর্ষিদেব তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতের কেন, সমস্ত জগতের যে অসীম অনন্ত সার্ব্বজনীন আশ্রয়ের জন্য রাজা অবিরত সাধনা করিয়াছিলেন, মহর্ষি ভবিষ্যতে তাহা পরমানন্দের সহিত লাভ করিয়াছিলেন এবং আমাদের সকলের জন্য, সমস্ত নরনারীর জন্য তাহা রাখিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় যুগ প্রাণপ্রতিষ্ঠার যুগ। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় আমাদের গুরুদেবের যে ব্যাকুলতা, যে ভগবদ্‌ভক্তি, যে কঠোর সাধনা, যে তপজপ, যে ত্যাগ, যে একাগ্রতা, যে নিষ্ঠার প্রমাণ নিহিত আছে, তাহা অনন্তকাল ধর্ম্মবিকাশের ইতিহাসে উজ্জ্বল বিদ্যুতের অক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের ধর্ম্মের এই প্রাণ সকল জীবনের উৎস—প্রাণময় সেই অমৃতের প্রস্রবণ হইতেই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ভারতীয় সেই ঋষিগণ তাঁহার পথপ্রদর্শক। এই যুগ সমস্ত জগতের নরনারীর অসীম আশা ও ভরসার যুগ। যে উপায়ে তাঁহারা পৃথিবীর ধূলিরাশি ছাড়িয়া অনন্তের দিকে তাঁহাদের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, ও ভরসাকে ধাবিত করিতে পারেন—নূতন ভাবে, সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তের সাহায্যে, তাঁহারা এই যুগে, তাহার

শিক্ষা পাইয়াছেন। নূতন ভাবে তাঁহারা গম্ভীর আহ্বান শুনিয়াছেন—

শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—বেদাহমেতম্ পুরুষং মহান্তম্।
ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

তৃতীয় যুগ ফল। এই দ্বিতীয় যুগের অবশ্যম্ভাবী মহর্ষিদেবের গভীর আধ্যাত্মিকতা শত শত ধর্ম্মপ্রাণ যুবকের প্রাণকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তৃতীয় যুগে তাঁহারাই কর্ম্মী। আধ্যাত্মিকতার স্রোত পূর্ব্বযুগ হইতে প্রবাহিত হইয়া ক্রমেই অধিকতর প্রসার, গভীরতা ও প্রবলতা লাভ করিতে লাগিল। ক্রমে সাধকদিগের সকল কার্য্যে ইহার প্রভাব দেখা গেল। সমাজসংস্কার করিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা দল বাঁধিয়া, সভাসমিতি করিয়া, সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হন নাই। প্রত্যুত সত্যম্‌জ্ঞানমনন্তমের সাধকেরা বর্ণভেদ, নারীদিগের অবরোধ, তাহাদের ন্যায্য অধিকার লোপ, প্রভৃতি বৈষম্য সমাজে দেখিয়া কোনরূপেই উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। প্রতিবিধানের চেষ্টা না করিলে তাঁহাদের নিজের চক্ষে তাঁহারা হীন হইতেন। সমাজসংস্করণ বিধি তাঁহাদের জীবন্ত আধ্যাত্মিক সাধনার সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ। সেই সত্যম্‌জ্ঞানমনন্তম্‌কে যাঁহারা মানবাত্মার আশ্রয় বলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছে সমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা অতি লঘু ব্যাপার; কিন্তু লঘু হইলেও তখন তাহার আবশ্যক ছিল। অবস্থাও অনুকূল হইয়াছিল।

সংসারের অধিকাংশ মানব সাধনা-ও-চিন্তালভ্য ধর্ম্মের কথায় বেশী মন দিবার সময় পান না। কিন্তু প্রচলিত সমাজের দোষ ত্রুটি অনেকেরই দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই জন্য যখন কেশবচন্দ্রের সহকর্ম্মী ও সহধর্ম্মীগণের সংস্কারকার্য্য দীপ্ত কামানের গোলার ন্যায় প্রচলিত সমাজের কম্পিত প্রাচীরে প্রবল আঘাত করে, তখন সহস্র সহস্র লোক এই সংস্কারকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং সাধ্যমতে নিজে নিজে ইহার অনুসরণও করিয়াছেন। ইহাঁদের অনেকেই বহির্বৃত্তের লোক, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের কার্য্যের মূলে সেই সত্যম্‌জ্ঞানমনন্তম্ মাত্র। কোন দুর্গমধ্যস্থিত মঠ, গৃহচূড়া, স্তম্ভ প্রভৃতি সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া যেমন দূর হইতে দর্শকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, কিন্তু বাস্তবিক দুর্গের সকল বলের আধার তাহার ভিত্তির সহিত ভূমিতে নিহিত হইয়া মানবদৃষ্টির অগোচর থাকে, সেইরূপ আমাদের তৎকালীন সংস্কারগুলি দূরস্থিত দর্শকের দৃষ্টিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিলেও, আমাদের প্রকৃত বলের উৎস তাঁহাদের দৃষ্টির আয়ত্ত হয় নাই।

এই সময় কয়েকটি সামাজিক প্রশ্ন সকলেরই মনকে আকৃষ্ট করে। বিবাহ ও আহারে জাতিভেদ, স্ত্রীশিক্ষার অভাব ও মহিলাদিগের অবরোধপ্রথা এবং বাল্যবিবাহ ও বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ নিষেধ,প্রভৃতি প্রশ্নগুলি আমাদের দেশের পক্ষে বড়ই গুরুতর হইয়া পড়িয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারকেরা নিজ নিজ মতানুসারে এইগুলির মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষার বহুবিস্তারে ভারতসন্তানের বহুকালের শৃঙ্খলিত ও কারাবদ্ধ চিন্তাশক্তি উন্মুক্ত হইয়া নূতন আলোক, নূতন স্বাধীনতা, নূতন বল প্রাপ্ত হইল। সকল দিকেই প্রসারের চেষ্টা দেখা গেল। কোন সমাজের বা ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার লোপ করিয়া রাখা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া, ব্রাহ্মের কেন, অনেকেরই প্রতীয়মান হইল। এক সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী মহান ঈশ্বর সকলের পিতা, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল মানব তাঁহার সন্তান, প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার তাঁহার প্রাপ্য—ব্রাহ্মসমাজ এ প্রদেশে সর্ব্বপ্রথমে এই মত কার্য্যে পরিণত করেন। শিক্ষিত সমাজের সহানুভূতি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইল। গত ৫০ বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষিত ভারতবাসীর অগ্রণী ও আদর্শ হইয়া আছেন। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ নিবারণ, অস্পৃশ্য জাতিগণের দুরবস্থা নিবারণ, প্রভৃতি সৎকার্য্য কোন কোন সভাসমিতি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে; এ-সকল দেখিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হয়। আমরা বিশ্বাস করি, যে, এই-সকল সৎকার্য্যসূত্রে অনুষ্ঠাতারা মহান ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও সকল মানবের ভ্রাতৃত্ব, বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারানুষ্ঠানগুলির মূল ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে, কর্ম্মীদিগের প্রাণের রক্তমাংসে নিহিত। এইজন্য সংখ্যায় নগণ্য হইয়াও এই সমাজ এত প্রচণ্ড বলে পুরাতন সমাজের দুর্ভেদ্য দুর্গকেন্দ্র সকলও ভেদ করিতে পারিয়া-

ছেন। আমাদের সংখ্যার সহিত আমাদের কার্য্যের পরিমাণের তুলনা করিয়া চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কিন্তু সকল বলের যিনি প্রস্রবণ স্বরূপ, তিনিই আমাদের বলবিধাতা। তাঁহার কার্য্য তিনিই করিতেছেন। আমরা যদি কেবল ফলাফল চিন্তা করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিসামর্থ্যের সহিত অনুষ্ঠেয় কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইতাম, তাহা হইলে আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যও আমাদের শক্তি অপেক্ষা আরও ক্ষুদ্র হইত। শক্তিবিধাতা সত্যস্বরূপ মহান ঈশ্বর তাঁহার ভাণ্ডার হইতে সৎকার্য্য করিবার জন্য বিশ্বাসের বিনিময়ে অজস্র অসীম শক্তি কর্ম্মীদিগকে ঋণ দেন। আমাদের কার্য্য তাঁহারই শক্তির নিদর্শন।

সমাজসংস্কার আমাদের কিছুদিনের কর্ত্তব্য হইলেও ইহা আমাদের ধর্ম্মের একমাত্র অঙ্গও নহে, সর্ব্বপ্রধান অঙ্গও নহে। এ কার্য্যবিধি অস্থায়ী, দুদিনের জন্য।

প্রথমতঃ—যদি কোন বাহিরের সমালোচক বলেন যে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারকার্য্যতালিকা মুসলমান সমাজ ও খৃষ্টীয় সমাজ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তবে তাঁহার কথা খণ্ডন করিয়া উত্তর দেওয়া সহজ হইবে না। বিবাহ এবং আহারে জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, চিরবৈধব্য, অবরোধ-প্রথা,—ইহার কোনটিই খৃষ্টীয় সমাজে নাই এবং অবরোধ-প্রথা ভিন্ন অন্য কোনটিই মুসলমান সমাজেও নাই।

দ্বিতীয়তঃ—একে একে পুরাতন সমাজ হইতেও এ-সকল বালাই দূর হইয়া যাইতেছে। আর্থিক ও সামাজিক নানা-প্রকার কারণে বাল্যবিবাহ-প্রথা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। বাল্যবিবাহ ও চিরবৈধব্য যে আর অধিক দিন সমাজকে প্রপীড়িত করিবে না, তাহার অন্যতম নিদর্শন—সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ও রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কন্যার বিবাহের পর পুরাতন সমাজের দুই সমান অংশে বিভাগ।

এখন এরূপ বিবাহানুষ্ঠানে কেহ সমাজের পরিত্যক্ত হইবেন না, দুই ভাগের এক ভাগে পড়িবেন মাত্র। বিনা চেষ্টায় অবরোধ-প্রথা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। স্ত্রীশিক্ষা এখন সকল সমাজের সকলেরই বাঞ্ছনীয় বস্তু। বিভিন্ন জাতির স্পর্শদোষ এ প্রদেশে নাই। অন্নগ্রহণ-দোষও আর এখন গ্রাহ্য নহে। জাতিভেদ কেবল মাত্র বিবাহ লইয়া এক কোণ সামলাইয়া নিজ দুর্গকবাটে অর্গল বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু একালে দুর্গ হইতে যুদ্ধ চলে না, দুর্গরক্ষারও উপায় নাই। অভাবনীয় ও অচিন্ত্যনীয় দিক ও দূর হইতে কল্পনারও অতীত বেগে পর্ব্বতপ্রমাণ প্রকাণ্ড গোলাগুলি দিবারাত্রি তাহাকে বিধ্বস্ত করিতেছে। ভিতর হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর প্রবর্ত্তিত হিন্দু-বিবাহ-বিলের ন্যায় কত আঘাত তাহাতে ভূমিকম্প উৎপাদন করিতেছে। বহুদিন আর এ প্রথা চলিবে না।

আরও দেখা যাইতেছে যে, সংস্কারকদিগের বিনা চেষ্টাতেই কেবল শিক্ষাবিস্তারে ও ঘটনাপরম্পরায় ঘাতপ্রতি-ঘাতে অনেক স্থলে এই-সকল পুরাতন আচার-ব্যবহারগুলি একে একে খসিয়া পড়িতেছে। এরূপ আশা করাও অসঙ্গত নহে যে আর কিছুদিন পরে পুরাতন সমাজের কুপ্রথাগুলির সংস্কারের জন্য ব্রাহ্মসমাজকে অধিক সময় বা শক্তি ব্যয় করিতে হইবে না। ইহা আমাদের পক্ষে বড়ই আনন্দের কথা যে, যে-সকল বিষয় লইয়া ব্রাহ্মসমাজ গত ৫০ বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও পুরাতন সমাজে ক্রমে ক্রমে গৃহীত হইতেছে।

এখন এমন সময় আসিয়াছে যখন আমরা আমাদের জীব-নের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতে পারি। এই ভারতের এক কোণে, এই বিজ্ঞানাঢ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, এই পুরাতন, মাধ্যকালিক, এবং আধুনিক সভ্যতার ত্রিধারা-সঙ্গমে, কেন এবং কি উদ্দেশ্যে ধর্ম্মের এই স্রোত প্রবাহিত হইল? এই নগণ্য, তুচ্ছ, লুপ্তসর্ব্বস্ব, কল্পনাপ্রবল কর্ম্মাক্ষম বাঙ্গালীর প্রাণই বা ইহার প্রথম আন্দোলনের পদার্থ হইল কেন? আমাদের মাতৃভূমির তাৎকালিক অবস্থায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অমৃত প্রস্রবণের প্রকাশ যে হইল, ইহা কি একবারেই অর্থশূন্য, না ইহার কোন অর্থ আছে?

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপ-খণ্ডের সকল দেশেই যে মহৎ পরিবর্ত্তনগুলি সংঘটিত হয়, তাহার ফলাফল সমস্ত জগৎ ভোগ করিয়াছে। ইউরোপে ইহা নব অভ্যুদয় নামে পরিচিত। ইহার স্রোতে কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি শিল্প, কি সাহিত্য, সবই

ভাঙিয়া আবার নূতন ভাবে গড়িয়াছে। এই স্রোত প্রথমে বহিল নূতন আবিষ্কারে। উপর্য্যুপরি শত শত আবিষ্কার—ভূগোলে আবিষ্কার, খগোলে আবিষ্কার, ইতিহাসে আবিষ্কার, বিজ্ঞানে আবিষ্কার, জড়বিজ্ঞানে আবিষ্কার, জীববিজ্ঞানে আবিষ্কার, মনোবিজ্ঞানে আবিষ্কার, রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতিতে আবিষ্কার। শত শত আবিষ্কারের লক্ষ লক্ষ আলোকরশ্মি একই সময়ে মানবের দৃষ্টিশক্তিকে ঝলসিয়া দিল—চিরমূক স্ফীংক্স্-স্বরূপ প্রকৃতির মুখ হইতে প্রথম লক্ষ লক্ষ বাণী মানবের কর্ণকুহরে ঝঙ্কারিত হইল। কিন্তু আবিষ্কারে সব শেষ হয় না। আবিষ্কৃত সত্যগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয় এবং গবেষণাকারীর ধীশক্তি সহকারে তাহা হইতে নানা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হয়। এই-সকল সিদ্ধান্ত যথাসম্ভব প্রামাণিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অনেক সময় এই সিদ্ধান্তগুলি সমসাময়িক ধর্ম্ম ও সমাজে প্রচলিত মতসমূহের অনুকূল হয় না। ইউরোপের নব জাগরণের যুগে আবিষ্কারের পর আবিষ্কার আসিয়া প্রচলিত বিশ্বাসগুলিতে আঘাত করিল। প্রমাণ হইল যে পৃথিবী গোল, ঘুরিতেছে, ও সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রমাণ হইল যে সৌরজগতে গ্রহউপগ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রমাণ হইল যে পৃথিবী অনেক যুগযুগান্তর ধরিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। প্রমাণ হইল যে জীবজগতে ক্রমবিকাশের নিয়ম অনুসারে আশ্চর্য্য উন্নতি চলিতেছে। এই-সকল সত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনের উপর প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভাব কমিয়া গেল। অগ্র পশ্চাৎ ভাবিবার সামর্থ্য লোকের ছিল না। কিন্তু এই-সকল আবিষ্কারের ফলে প্রথমে মনীষীগণের পর্য্যবেক্ষণ ও মনোনিবেশ করিবার শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইল। এবং পরে তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ ও মনোনিবেশের ফলস্বরূপ আবিষ্কৃত সত্যগুলি শ্রেণীবিভাগ করিতে করিতে, যথাস্থানে সাজাইতে সাজাইতে, নূতন উদ্ভাবনী কল্পনার আবির্ভাব হইল। বিজ্ঞানের চর্চ্চায় কল্পনা-শক্তির বিশেষ বিকাশ হইল। কিন্তু ইহা হইতে লোকের মনে নানা প্রকার ভ্রম সন্দেহ অবিশ্বাস প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ভ্রম এই হইল, যে, বিজ্ঞানের ক্ষমতার যে সীমা আছে, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা কিছুদিনের জন্য ভুলিয়া গেলেন। বিজ্ঞান যে সকল জিনিষের বা ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে পারে না, ইহা তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। প্রকৃত পক্ষে মানব-মনের বর্ত্তমান অবস্থায় বিজ্ঞান বিশ্বরাজ্যের যে পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারে তাহার একটি সীমা আছে। তাহার বাহিরে আর বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান চলে না। হার্বার্ট স্পেন্সার এই দুই রাজ্যকে জ্ঞেয় এবং অজ্ঞেয় নাম দিয়াছেন। কোন অঙ্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ইহাকে $x = \sqrt{-1}$ এই চিহ্ন দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন।

লর্ড কেলভিন ১৮৯৬ সালে তাঁহার অধ্যাপকতার পঞ্চাশ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বলেন—"গত ৫০ বৎসর কাল বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া যে ফল পাইয়াছি তাহা একটি মাত্র কথাতে প্রকাশ করিতে পারি, সে কথাটি—'অসিদ্ধি', 'নিষ্ফলতা'। যেদিন আমি প্রথম ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি সেদিন যাহা জানিতাম,—বৈদ্যুতিক বল, ঈথর, বিদ্যুৎ, জড়পদার্থ, বা রাসায়নিক আকর্ষণ, প্রভৃতি বিষয়ের আমি তদপেক্ষা এক বর্ণও বেশী জানি না।"

লর্ড কেলভিন সূক্ষ্ম অণুপরমাণুগুলির পরিমাণ নির্ণয়ার্থ আজীবন গবেষণা করিয়াছেন। তিনি ইহাতে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ও যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা অমূল্য। কিন্তু তাঁহার নৈরাশ্যে একটি কথা মনে হয়, যে, বিজ্ঞান অনধিগম্য লক্ষ্যকে পাইতে ইচ্ছা করেন। "পরমজ্ঞান" বিজ্ঞান-জ্ঞানের চরম সীমার অতীত হইয়া এখনও আছে, অনন্তকালে বিজ্ঞানের অনন্ত উন্নতির পরেও থাকিবে। আজি বিজ্ঞানের যে অবস্থা আছে ও সহস্র বৎসর পরে তাহার যে অবস্থা হইবে, ইহার তুলনা কল্পনায়ও আয়ত্ত করা যায় না। বস্তুতই কল্পনাদেবী অগ্রে অগ্রে ক্ষুদ্র দীপ হস্তে নূতনরাজ্যে যতই অগ্রসর হইবেন, বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ শক্তি ততই নূতন রাজ্য আয়ত্ত করিবে। কিন্তু সে-সকল কেবল জগতের একপিঠ; অর্থাৎ কেমন করিয়া (how) ঘটনাগুলি ঘটিতেছে এইদিকমাত্র। কিন্তু অন্য পিঠে—অর্থাৎ "কেন" (why) ঘটিতেছে একথার উত্তর দিবার শক্তি বিজ্ঞানের নাই।

প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় এই "কেমন করিয়া"র রাজ্য যত প্রসারিত হয়, "কেন" তত অধিক জটিল হইয়া উঠে। সুতরাং যতই বিজ্ঞান-সাহায্যে মানবের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে, ততই পরমজ্ঞানের তুলনায় মানব নিজ জ্ঞানকে আরও অধিক ক্ষুদ্র মনে করিবে।

লর্ড কেলভিন নিরাশ না হইয়া বিজ্ঞান কিরূপে তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া জগৎকে "জ্ঞানের" রাজ্যের দিকে অগ্রসর করিতেছে—ইহা ভাবিয়া উৎসাহিত ও আনন্দিত হইতে পারিতেন। বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান মানবমনকে অনন্তকাল হাত ধরিয়া পরমজ্ঞানের দিকে অগ্রসর করিবে। যখন পশ্চিম দেশের এই অবস্থা, ভারতে তখন প্রথম ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হইয়াছিল। লোকে যেই শিক্ষিত হইল, অমনি আমাদের পুরাতন ধর্ম্ম ও সমাজের দোষগুলি অগ্রে তাহাদের দৃষ্টিতে পড়িল। এই সমাজের যে কিছুই ভাল ছিল না, এমন নহে। কিন্তু দোষের সহিত গুণ মিশাইয়া থাকিলে তাহাদিগকে পৃথক করা বড় কঠিন হইয়া উঠে। নূতন শিক্ষিত হিন্দুসন্তানের প্রাণে নব আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। এক লীলাভূমিতে, প্রচলিত হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান এই তিন ধর্ম্মের পরস্পরের অনুগামী সহগামী ও বিরুদ্ধগামী নানা স্রোতের মধ্যে বঙ্গসমাজ পতিত হইল। অনেক জিনিষ ভাঙ্গিয়া গেল। পুরাতন ধর্ম্ম ও সমাজের উপর বিশ্বাস অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির মন হইতে অন্তর্হিত হইল। এই অরাজকতার মধ্যস্থল হইতে রাজা রামমোহন রায় ভগীরথের ন্যায় জগতের আশাস্বরূপিণী পতিতপাবনী আমাদের এই ধর্ম্ম-সুরধুনীকে লইয়া শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন। পরমেশ্বরের এই করুণাস্রোত যে কি মহৎ কার্য্য করিতে জগতে নামিয়াছে, তাহা কল্পনা করিবার শক্তিও আমাদের নাই।

মানবের প্রাণে পরব্রহ্মের পূজা এইরূপ নূতন ভাবে এই বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। মুক্তির এই পথ যে নূতন আবিষ্কৃত হইল তাহা নহে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জগতে ইহা প্রকাশিত থাকিলেও গত শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার লোকের দৃষ্টির সম্মুখে ধরিবার আবশ্যক হইয়াছিল। এই সময়ের সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ প্রভৃতির হস্ত হইতে মানবকে রক্ষা করিবার জন্য আবার বলিবার আবশ্যক হইয়াছিল, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"। এবার শুধু ভারতের নয়, সমস্ত জগতের অধিবাসীগণের আত্মার কর্ণে সত্যম্জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতম্ এই মন্ত্র দিবার আবশ্যক হইয়াছিল। উপনিষদের কাল হইতে বহুযুগের পরে রাজর্ষিও, মহর্ষিদের "সত্য"কে, সেই "এক"কে, জীবন দিয়া চাহিয়াছিলেন, এবং লাভও করিয়াছিলেন, এবং মানবের জীবন সেই "সত্য জ্যোতির্ম্ময় দেবতাকে" কি করিয়া প্রাণের গভীর স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়, তাহাও নূতন করিয়া শিখাইয়া দিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠা ও পূজার উপরই মানবের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "সকল শক্তির যেখানে মধ্যবিন্দু ও প্রাণের যেখানে কেন্দ্র, সেখান থেকে জীবনধারা লাভ করিতে না পারিলে মানব বাহিরের চেষ্টায় মুক্তি পায় না।"

প্রত্যেক মানবের প্রাণে পরমাত্মার এই প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের জগতে আবির্ভাব। এই মুখ্য উদ্দেশ্য কোন দেশকালের অধীন হইতে পারে না। যেখানে মানব আছে, সেখানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্যক্ষেত্র। সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার বা শিক্ষাবিস্তার, পরসেবা, প্রভৃতি কার্য্য যেখানে এবং যতক্ষণ এই মহৎ উদ্দেশ্যের অনুকূল সেখানে ততক্ষণই আমাদের অনুষ্ঠেয়; সে-সকল কার্য্য যদি সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যস্বরূপের সিংহাসন বসাইবার বেদী প্রস্তুত করে, তবেই তাহা আমাদের কর্ত্তব্য। অন্য কোন লক্ষ্যে আমাদের বল নিয়োগ করিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। গৌণ লক্ষ্যগুলি চিরদিনই আপেক্ষিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কিন্তু অন্তরাত্মায় পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা মানবের পরম ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের চরম লক্ষ্য। অন্য সকল লক্ষ্যই ইহার অন্তর্গত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ কার্য্যের শেষ হইতে পারে না। প্রত্যেক মানবাত্মাকে নূতন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। যতদিন মানবজাতি অথবা তাহাদের ন্যায় অন্য কোন ধীশক্তিসম্পন্ন জীব জগতে থাকিবে, ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত থাকিবে।

এখন দেখা যাউক আমরা এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্যক্ষেত্র, প্রারম্ভ হইতেই ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া যে আমাদের ক্ষুদ্র মণ্ডলী

আছে, তাহার বাহিরে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের সমাজসংস্কারের কার্য্যবিধি যেমন এক-একটি করিয়া প্রায় সমস্তই পুরাতন সমাজে গৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে, আমাদের আধ্যাত্মিক পূজাও সেইরূপ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। ইহার একটি বিশেষ কারণও এই যে, এই উন্মুক্ত আত্মায় পরমাত্মার পূজা আমাদের এই জাতির মানসিক গঠনের বিশেষ উপযোগী, এবং আমাদের পুরাকালের সেই ঋষি পিতৃপিতামহগণের নিজস্ব ধন। সুতরাং দিন দিন আমাদের সম্মুখে নূতন নূতন সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। যতই চতুর্দ্দিকে লোকশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, ততই ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্ষেত্র হইতে বনজঙ্গল দূর হইয়া তাহা চাষের উপযুক্ত হইতেছে। আমাদের সমসাময়িক বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি যে-সকল কার্য্য করিতেছেন, তাহাও ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুকূল হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা ও ধর্ম্ম লইয়া যতই আলোচনা হয়, ততই আমাদের সুবিধা; কেননা সকল ধর্ম্মমতের মধ্যেকার কালিমা জ্বালাইয়া দিলে তাহাতে যেটুকু বিশুদ্ধ স্বর্ণ নিহিত আছে, তাহা আমাদের চরম লক্ষ্যের সহিত এক। আলোচনাকে ভয় করিবার আমাদের কিছুই নাই। খৃষ্টীয় যাজকের ন্যায় বলিতে হইবে না—"এ ঘটনা সত্য হইতে পারে না—কেননা ইহা ধর্ম্মপুস্তক-বিরুদ্ধ"—অথবা খৃষ্টীয় রাজশক্তির ন্যায় রজার বেকন প্রভৃতি সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণকে কারাবদ্ধ করিবার আবশ্যক হইবে না। বিজ্ঞানালোচনা হইতে আমাদের ভয় করিবার কিছুই নাই। যতই বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইবে, ততই একেশ্বরবাদের পথ পরিষ্কৃত হইবে। বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মে বিবাদ, ইহা আমাদের ধর্ম্মের কথা নহে। আমাদের ধর্ম্মের প্রধান বাহু মন্ত্র, প্রধান বাহু বল, বিজ্ঞান। যতই নূতন নূতন সত্য মানবের জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিবে ততই আরও অধিক নূতন নূতন সত্য জানিবার জন্য মানব ব্যস্ত হইবে; অনন্ত কাল, সত্যস্বরূপের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে সত্য আহরণ করিলে অনন্তের জন্য পিপাসাই বাড়িবে। বিজ্ঞানের রাজ্য ধর্ম্মরাজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু কেবল বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা আমরা যে সকল বস্তুর বা ঘটনার অস্তিত্বের একটা বিশদ ব্যাখ্যা পাইলাম, ইহা মনে কল্পনাও ভ্রম। সত্যস্বরূপের কৃপায় সাক্ষাৎ ভাবে মানব অনেক সত্য লাভ করিয়াছে ও ভবিষ্যতেও করিবে, সর্ব্বত্র বিজ্ঞানের সাহায্যের আবশ্যকও হইবে না। কবিতা, কলাবিদ্যা, প্রকৃতির ধ্যান ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সুইনবর্ন, র‍্যাফেল, এমার্সন, প্লেটো, সক্রেটিস প্রভৃতি কত দেব-আত্মাকে সত্যরত্নে ভূষিত এবং ভক্তিধারায় প্লাবিত করিয়াছে, তাহা কে বলিবে। ভগবৎকৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করা গল্প নহে।

আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে ভগবৎকৃপায় যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে সত্য আহরণ করিতেছেন এমন মনীষী কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ও অন্যান্য ভক্তগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন। এখানে জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চ্চালব্ধ রত্নগুলি, রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত মাণিক্য ও ব্রজেন্দ্রনাথের দার্শনিক গবেষণা শোধিত মণিগুলির সহিত একহারে গ্রথিত হইতেছে। দশদিক দিয়া ভক্তিস্রোতে সত্যরত্ন মানবের অধিকারে আসিতেছে। ধন্য আমরা যে এ যুগ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া গেলাম। ধন্য মহান ঈশ্বর যে তিনি জগতে এই সুদিন আনিয়া দিয়াছেন। এই মহাধর্ম্ম এই সত্যগুলিকে একত্র করিয়া তদুপরি নিজ সিংহাসন স্থাপিত করিবে।

কিন্তু "সত্য" চিরদিনই সাধক চান, নতুবা তাঁহার স্বর্গীয় গৌরব রক্ষা করিবে কে? যে কোন ক্ষেত্রই হউক না কেন, কোথাও সকল মানব একেবারে সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই সত্যগ্রাহী এবং সত্যবিমুখ এই দুই সম্প্রদায়ে লোক বিভক্ত হইয়া পড়ে। এতদিন কতকগুলি আপেক্ষিক 'সত্য' লইয়া সমাজসংস্কারক ও তদ্বিপরীত এই দুই সম্প্রদায়ে বঙ্গসমাজ বিভক্ত হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে সে সত্যগুলি ক্রমে ক্রমে পুরাতন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। কিন্তু এখন নূতন নূতন কার্য্যক্ষেত্র আবার দৃষ্টিপথে পড়িতেছে। অবিশ্বাস, সন্দেহবাদ, অজ্ঞেয়বাদ—এ-সকল ত পুরাতন মানবশত্রু; এখন ইহারা নূতন কার্য্যতৎপরতার সহিত মানব-হৃদয়কে আক্রমণ করিতেছে। নানাপ্রকার সামাজিক প্রশ্ন, যথা পানদোষ, চরিত্রহীনতা, ইত্যাদি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বৃদ্ধির সহিত, নূতন বল আহরণ করিতেছে। জাতিগত বৈষম্য দূর

হইতেছে, কিন্তু ধন-সম্পদগত বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সর্ব্বোপরি বিজ্ঞানের অপব্যবহারে অপরিসীম ক্ষমতা লাভ করিয়া কত কত জাতির ধন-ও-প্রভুত্ব-লিপ্সা আরও কত কত জাতিকে অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছে। নরহত্যা, ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা, পরস্বাপহরণ—এ-সকল শক্তির দোহাই দিয়া সমাজে চলিয়া যাইতেছে।

এখন সাধকেরা সম্প্রদায় গঠন না করিলে তাঁহাদের উপায় কি? জীবতত্ত্বের একটি নিয়ম এই যে যখনি কোন কোষ অনিষ্টকারী ও অশুভ আবেষ্টনের মধ্যে পতিত হয়—তখনই তাহার রক্ষার্থ একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আবির্ভাব হয়, তাহার ভিতর ঐ কোষের পুষ্টিসাধন হয়। সম্প্রদায় গঠন কতক আত্মরক্ষার্থ, কতক সত্যের দ্বারা আমাদের আত্মার পুষ্টিসাধনের জন্য। কার্য্যক্ষেত্রে বদ্ধ সম্প্রদায় হওয়ার সুবিধা অনেক। উহাতে কর্ত্তব্যগুলি স্পষ্টভাবে আকার গ্রহণ করিয়া আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, এবং আমাদের কার্য্যক্ষমতাও অনেক বর্দ্ধিত হয়। সমবেতভাবে কার্য্য না করিলে অনেক অনুষ্ঠান সম্ভব নহে।

কিন্তু ইহাতে যে বিপদ নাই, তাহাও বলা যায় না। সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্য্য করিতে করিতে সম্প্রদায়ের বাহিরের লোকের উপর সহানুভূতি কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আমাদের হৃদয়ের এত প্রসার চাই, যে, সমস্ত মানবকেই আপনার করিয়া লইতে পারি। যেমন আমার গৃহে মদ্যপায়ী দুশ্চরিত্র সন্তান হইলে আমি নয়নের অশ্রুর দ্বারা উপদেশ বা শাসনকে কোমল করিয়া লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হই, তেমনই সত্যসেবক সম্প্রদায় প্রেম-প্রার্থনা-সমবেদনা-পূর্ণ অশ্রুদ্বারা তাঁহাদের উপদেশকে কোমল করিয়া সত্য-বিমুখ ব্যক্তিদিগের নিকট উপস্থিত হইবেন। প্রাণে যদি প্রেম থাকে তবে সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ অপবাদেও জগতের কোন অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু যদি সে প্রেম আমাদের না থাকে, তবে আমরা সত্যলাভ ও সত্যপ্রচারের অযোগ্য।

পুরাতন সংস্কারের কার্য্যে একটু বিশ্রামের সময় আসিলেও নূতন নূতন কার্য্যক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে আসিতেছে। আবার এ-সকল ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার প্রয়োজন যখন চলিয়া যাইবে, তখন আরও কত কি নূতন প্রশ্ন ও

মনোবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী

ভারতবাসী পদার্থ-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী দেখিয়াছেন, রসায়নের ল্যাবরেটরীর পরিচয় পাইয়াছেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরীক্ষালয়ের অস্তিত্বও অবগত আছেন। প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধীয় নানা বিদ্যার জন্য আমাদের দেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ পরীক্ষা-গৃহ অথবা বিজ্ঞান-শালা আছে। কিন্তু চিজ্জগৎ সম্বন্ধীয় বিদ্যা আলোচনা করিবার জন্যও যে "experiment" অর্থাৎ নানাবিধ পরীক্ষা চলিতে পারে তাহা ভারতবাসীর ভালরকম জানা নাই। Experimental Psychology, Physiological Psychology, Psycho-physics ইত্যাদি নাম আমাদের দেশে সুপ্রচলিত হয় নাই। এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ভাসা-ভাসা ধারণা মাত্র আছে। ভারতবর্ষের ত কথাই নাই—বিলাতেও এই বিদ্যার চর্চ্চা বেশী হয় না। অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার গোড়াপত্তন পড়িয়াছে মাত্র। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল তাঁহার Psychological Laboratory অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের বীক্ষণাগার দেখাইবার সময়ে লজ্জিত হইতেছিলেন। বস্তুতঃ বিদ্যাটা নিতান্তই নূতন। আধুনিক জগতের অন্যান্য বিজ্ঞানসমূহের ন্যায় পরীক্ষা-সিদ্ধ মনোবিজ্ঞানও জার্ম্মানিতেই বিশেষ পুষ্ট হইয়াছে। জার্ম্মান পণ্ডিতগণের শিষ্যেরা আমেরিকায় এই বিদ্যা আমদানী করিয়াছেন। হার্ভার্ডে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষালয় পঁচিশ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক জেম্‌স্ ইহার প্রবর্ত্তক ছিলেন।

মাপ-জোক, গণনা, তালিকা, তথ্যসংগ্রহ, তথ্যতুলনা ইত্যাদি প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাকৃতিক জগতের সত্য-গুলি আলোচিত হয়। ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান, তড়িৎবিজ্ঞান ইত্যাদি জড়জগৎ সম্বন্ধীয় সকল বিদ্যায়ই এই-সমুদয় আলোচনাপ্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। গোলমেলে ধোঁয়াটে বা অস্পষ্ট ধারণা-সমূহ এই উপায়ে বিজ্ঞানরাজ্য হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে বহিষ্কৃত হইয়াছে। স্থূলজগতের বিদ্যাগুলি ক্রমশ "exact science" অর্থাৎ মাপ-জোক-সমন্বিত, পরিমাণ-নিয়ন্ত্রিত, গণিত-শাসিত, স্থিরসিদ্ধান্তমূলক বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।

মনোরাজ্যের বৈজ্ঞানিকেরাও এইসকল প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিজ্জগতের তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করিতে চাহেন। মানুষের চিন্তাগুলি কখন্ কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থা বা আকার গ্রহণ করে তাহা বুঝিবার জন্য ইঁহারা চেষ্টা করেন। এই নিমিত্ত মানবের স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, কল্পনাশক্তি, ইত্যাদি লইয়া নানা প্রকার "পরীক্ষা" বা experiment করা হয়। এই-সকল পরীক্ষার ফল নিয়মিতরূপে রক্ষিত হইয়া থাকে। স্থূলজগতের তথ্যসংগ্রহের ন্যায় মনোজগতের Statistics বা তালিকা-সংগ্রহ আজকাল দার্শনিকগণের অন্যতম লক্ষ্য। পরে এই সংখ্যাতালিকার উপকরণ লইয়া গণিত-বিদ্যার প্রয়োগ করা হয়। এই উপায়ে Physics বা পদার্থ-বিজ্ঞান, Botany বা উদ্ভিদবিদ্যা, Geology বা ভূবিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যার ন্যায় Psychology বা মনস্তত্ত্ব ক্রমশঃ exact science বা নির্দ্দিষ্টবিজ্ঞানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মনস্তত্ত্ব দার্শনিকের রাজ্য হইতে বৈজ্ঞানিকের রাজ্যে আসিয়া পড়িতেছে। শিক্ষাপ্রচারকগণ, চিকিৎসাব্যবসায়িগণ, ব্যবসায়ের ধুরন্ধরগণ এবং রাষ্ট্রের পরিচালকগণ এই নূতন Experimental Psychology পরীক্ষাসিদ্ধ মনস্তত্ত্ব বিদ্যার ফলসমূহ গ্রহণ করিয়া মানবজীবনকে নানা উপায়ে উন্নত ও সুখময় করিতে পারিয়াছেন। প্রতিদিনকার উঠা-বসায় এবং চলা-ফেরায় এই পরীক্ষাসিদ্ধ, গণিত-নিয়ন্ত্রিত মনোবিজ্ঞান কাজে লাগিতেছে।

অধ্যাপক জেমস্ তাঁহার দর্শনচর্চ্চায় জগতের কোন তথ্যই বাদ দিতেন না। মানুষের পাগ্‌লামি, আবল-তাবল বকা, যাদুগিরি, mesmerism hypnotism বা সম্মোহন হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, যোগ, ধ্যান ইত্যাদি বিজ্জগৎসম্বন্ধীয় সকল তথ্যই জেমসের দর্শনালোচনায় স্থান পাইত। কাজেই জার্ম্মানির উদীয়মান নব্যবিজ্ঞান তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এই বিদ্যা সম্বন্ধে জেমস্ তাঁহার "Principles of Psychology"তে বলিতেছেন :—

Within a few years, what one may call a microscopic Psychology has arisen in Germany, carried on by experimental methods, asking of course every moment for introspective data, but eliminating their uncertainty by operating on a large scale and taking statistical means. * * * Their success has brought into the field an array of experimental Psychologists, bent on studying the elements of mental life, dissecting them out from the gross results in which they are embedded, and as far as possible, reducing them to quantitative scales. * * * The mind must submit to a regular siege, in which minute advantages, gained night and day by the forces that hem her in, resolve themselves at last into her overthrow. There is little of the grand style about these new prism, pendulum and chronograph philosophers. They mean business, not chivalry. What generous divination and that superiority in virtue which was thought by Cicero to give a man the best insight into nature have failed to do, their spying and scraping, their deadly capacity and almost diabolic cunning, will doubtless some day bring about. * * * The experimental method has quite changed the face of the science, so far as the latter is a record of the mere work done."

অর্থাৎ, অল্পদিনের মধ্যে জার্ম্মানীতে এমন একটি অণুপরিমাণ মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে যাহা প্রতিপদে মনোভাব বিশ্লেষণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া করিয়া প্রমাণের সংখ্যা-বাহুল্যের উপর নির্ভর করিয়া তবে সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হয়। এইরূপে সেদেশে একদল পরীক্ষাপ্রামাণ্য মনস্তত্ত্ববিদেরও আবির্ভাব হইয়াছে ; যাহারা আবর্জ্জনা বর্জ্জন করিয়া খাঁটি তত্ত্বের দানাটি খুঁটিয়া বাহির করিতে বদ্ধপরিকর। মনকে প্রতিমুহূর্ত্ত পাহারা দিয়া রাখিয়া তাহার সমস্ত প্রচ্ছন্ন ভাবগতিক একটু একটু করিয়া ধরিয়া মনকে কাবু করিয়া আয়ত্তাধীন করাই এইসব অবরোধকারীদের কাজ। এইসব নূতন বৈজ্ঞানিকদের কার্য্যে আড়ম্বর কিছুমাত্র নাই ; তাহারা আসর জাঁকাইয়া বীরত্ব ফলাইতে চাহে না, তাহারা চাহে কাজ। সিসেরো মনে করিতেন যে মানুষ গুণে গরিষ্ঠ ও ধ্যানে নিষ্ঠ হইলে প্রকৃতিরহস্যে তাহার অনুপ্রবেশ ঘটে ; কিন্তু সেইসব গুণ যাহা জানিতে পারে নাই, এই নববৈজ্ঞানিকদের প্রকৃতির দুয়ারে আড়িপাতা ও ধূর্ত্ত গোয়েন্দাগিরিতে তাহা একদিন নিশ্চয় ধরা পড়িয়া যাইবে। পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা বিজ্ঞানের চেহারা একদম বদলাইয়া গিয়াছে, কারণ পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ মানে, কৃত কর্ম্মের খাঁটি পরিচয়—কল্পনা বা গোঁজামিল নহে।

জেমস্ এই পরীক্ষাপ্রণালী এবং যন্ত্রাদি-নিয়ন্ত্রিত মনোবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত ছিলেন। তিনি এই বিভাগে স্বয়ং বেশী জ্ঞান দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু জার্ম্মানী হইতে একজন উদীয়মান বিজ্ঞানসেবীকে হার্ভার্ডে লইয়া আসেন। তাঁহার নাম মুন্‌ষ্টারবার্গ। ইনি বর্ত্তমানকালে এই বিদ্যার অন্যতম ধুরন্ধর। মুন্‌ষ্টারবার্গ এখনও হার্ভার্ডের Experimental Psychology বা পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান বিভাগের কর্ত্তা।

জগতে আপনা-আপনি যাহা ঘটিয়া থাকে সেই সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহকে Observation বা পর্য্যবেক্ষণ বলা হয়।

বৃষ্টি হইল বা তুষারপাত হইল, ফুল ফুটিল অথবা চাঁদ উঠিল, কিম্বা কলেরায় লোক মারা গেল অথবা এঞ্জিনের বলে গাড়ী টানা হইল—এই-সকল ঘটনার অনুরূপ অসংখ্য ঘটনা দিনরাত ঘটিতেছে। কিন্তু কখন কোন্ ঘটনা ঘটিবে তাহা ত জানা নাই। কাজেই বিজ্ঞানসেবীরা এইরূপ অনিশ্চিতভাবে ঘটনা পর্য্যবেক্ষণের জন্য বসিয়া থাকেন না। তাঁহারা কৃত্রিম উপায়ে নানা পন্থা অবলম্বন করিয়া ঘটনা ঘটাইয়া থাকেন। এইরূপ 'ঘটান'র নাম Experiment বা পরীক্ষা করা। আমি ঠাণ্ডাগৃহে বসিয়া আছি। এক্ষণে আমার হস্তপদ ইত্যাদির এক প্রকার অবস্থা দেখিতে পাইতেছি—আমার চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, ক্রিয়াশক্তি সবই এক বিশেষ অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু আমি হয়ত উত্তাপের নানা প্রকার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহি। কবে ঘর গরম হইবে কে জানে? ঠাণ্ডাদেশে ঘর কোন দিনই ত গরম হইবে না। তবে কি আমি উত্তাপের প্রভাব বুঝিবার সুযোগ পাইব না? বৈজ্ঞানিকেরা এই-সকল অসুবিধা নিবারণ করিবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে নানা ঘটনার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কৃত্রিম উপায়ে তথ্যলাভ করিবার জন্যই পরীক্ষালয়, বিজ্ঞানশালা, যন্ত্রগৃহ অথবা ল্যাবরেটরীর আবশ্যক হয়। মনোবিজ্ঞানের সেবকেরা নানা-প্রকার মনোভাব পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নানাবিধ যন্ত্র হাতিয়ার কলকব্জা ইত্যাদির উদ্ভাবন করিয়াছেন। শিশুর চিত্ত, পাগলের চিত্ত, অপরাধীর চিত্ত, ডাকাইতের চিত্ত, পশুর চিত্ত, খরগোসের চিত্ত ইত্যাদি নানা শ্রেণীর চিত্ত এই-সকল পরীক্ষালয়ে পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। আমাদের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদসম্বন্ধে জীবনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া এই ধরণেরই কতকগুলি নূতন নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইঁহার পরীক্ষালয়ও Experimental Psychology অর্থাৎ পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষালয়েরই অনুরূপ। হার্ভার্ডে মুন্‌ষ্টারবার্গ যে বিদ্যার অনুশীলন করিতেছেন জগদীশচন্দ্রও কলিকাতায় সেই বিদ্যারই অন্যতম বিভাগে যন্ত্র চালাইতেছেন। বর্ত্তমান জগতে যন্ত্র-চালিত পরীক্ষা-ফলিত গণনাসিদ্ধ বিদ্যার যুগ।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ হইতে Harvard Psychological Studies নামক পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে। ইহাতে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষালয় বা যন্ত্রসমূহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে:—

The laboratory has always sought to avoid one-sidedness, and this the more as it was my special aim to adjust the selection of topics to the personal equations of the students, many of whom came with the special interests of the physician, the zoologist, the artist, the pedagogue and so on. My own special interests may have emphasised those problems which refer to the motor functions and their relations to attention, apperception, space-sense, time-sense, feeling, etc. At the same time I have tried to develop the psychological-aesthetic work, which has become more and more a special branch of our laboratory, and there has been no year in which I have not insisted on some investigations in the fields of association, memory and educational psychology.

On the other hand, in a happy supplementation of interests, Dr. Holt has emphasised the psychology of the senses, and Dr Terkes has quickly developed a most efficient experimental department of animal psychology.

অর্থাৎ পরীক্ষাগার এক-পেশেমি ঘুচাইয়া দ্যায় এবং যে বিষয়ে যে অনুরক্ত তাহাকে তাহার রুচি অনুযায়ী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ দ্যায়। এই পরীক্ষাগারে যাহাতে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুসন্ধান হয় তাহার চেষ্টা করা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতর প্রাণীর মনস্তত্ত্বের বিচার ও সম্যকও নির্দ্ধারিত হইতে থাকে।

এই পত্রিকার সম্পাদক মুন্‌ষ্টারবার্গ। মুন্‌ষ্টারবার্গ আমাকে ল্যাবরেটরীর সকল গৃহে লইয়া গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলিতেছে—এইজন্য প্রায় কুঠরীতেই ছাত্র দেখিতে পাইলাম না। অল্পসময়ের ভিতর মুন্‌ষ্টারবার্গ যন্ত্রগুলির কার্য্য বুঝাইয়া দিলেন। যন্ত্রের জন্য একটা গুদামঘর আছে, সেখানে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দোকান হইতে কিনিয়া রাখা হয়। কিন্তু মুন্‌ষ্টারবার্গ এই গুদামঘরের (instrumentarium) বেশী গৌরব করেন না। ইনি ইহাঁদের নিজ উদ্ভাবিত যন্ত্রের বিশেষ উল্লেখ করিলেন। যখন যেরূপ আবশ্যক হয় তখন সেইরূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা আছে। এই কারখানা সম্বন্ধেই মুন্‌ষ্টারবার্গ বিশেষ গৌরব করেন। আমাদের জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলিও তাঁহার নিজ পরিচালিত ক্ষুদ্র কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছে। এবার ইয়োরোপে জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রগুলি দেখিয়া বিজ্ঞানসেবী মাত্রেই বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন। মুন্‌ষ্টারবার্গ তাঁহার কারখানা সম্বন্ধে বলেন:—

"The place of the laboratory which we appreciate most highly is not the instrument-room but the workshop, in which every new experimental idea can find at once its technical shape and form."

পরীক্ষাগারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে ঘরটিকে আমরা বেশী সমাদর করি তাহা যন্ত্রাগার নহে, পরন্তু কারখানা-ঘর; সেখানে প্রত্যেক পরীক্ষা-উদ্বোধক ভাব আকার পাইয়া উঠিবার অবকাশ পায়।

বলাবাহুল্য যাঁহারা জগতে নূতন নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে অগ্রসর হন তাঁহাদিগকে বাজারে প্রচলিত জিনিষপত্র এবং সুপরিচিত যন্ত্রাদির উপর নির্ভর না করিয়া নিজ অভিপ্রায়মত সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। পথ-প্রদর্শক মাত্রেরই এইরূপ অভিজ্ঞতা।

একটা জটিল যন্ত্র দেখাইয়া মুন্‌ষ্টারবার্গ বলিলেন—"ছাত্রেরা কাজ করিতে করিতে অনেক যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদলাইতে বাধ্য হইয়াছে। নূতন নূতন কলের আবিষ্কার এই উপায়েই হইয়া থাকে।" রেলওয়ে সিগ্ন্যালের দ্বারা কুলী বা কর্ম্মচারীর উপর কিরূপ প্রভাব প্রসারিত হয় তাহা পরীক্ষা করিবার একটা কল দেখিলাম। একটা যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম ও ক্লান্তি মাপিবার এবং জীবনে তাহার প্রভাব বুঝিবার আয়োজন হইয়াছে। একজন পি-এইচ্ ডি উপাধিপ্রার্থী ছাত্র এই বিষয়ে মৌলিক অনুসন্ধান করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেছে। ল্যাবরেটরীর কোন কোন ঘরে তড়িৎশক্তির কারখানা, ফটোগ্রাফে ছবি তুলিবার সরঞ্জাম ইত্যাদি দেখিলাম।

আলোক-বিষয়ক যন্ত্রাদি ব্যতীত শব্দবিষয়ক যন্ত্রাদি কতকগুলি গৃহে দেখিতে পাওয়া গেল। কয়েকটা ঘর দেখাইয়া মুন্‌ষ্টারবার্গ বলিলেন—"এগুলি Sound-proof অর্থাৎ বাহিরের আওয়াজ কোন মতেই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সুতরাং গৃহে বসিয়া আপনি ইচ্ছামত যে-কোন প্রকার শব্দের প্রভাব পরীক্ষা করিতে পারেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই যে ল্যাবরেটরী-গৃহগুলি দেখিতেছি—সাধারণ পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতেও এই ধরণের যন্ত্রাদি থাকে না কি? তাহা হইলে Physics বা পদার্থবিজ্ঞানে এবং Psychology বা মনোবিজ্ঞানে প্রভেদ কোথায়?"

মুন্‌ষ্টারবার্গ বলিলেন—"আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। এই জন্যই আমরা হার্ভার্ডে মনোবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীগুলির সঙ্গে মিলাইয়া ফেলি নাই। পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানকে আমরা দর্শনেরই এক অঙ্গ বিবেচনা করিতেছি। এইজন্য দর্শনভবনের (Emerson Hall) সঙ্গে Psychological Laboratory বা মনোবিজ্ঞানের বীক্ষণাগারকে একসঙ্গে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। আমরা মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রণালীগুলি অবলম্বন করিব—কিন্তু মনোবিজ্ঞানকে স্থূল জগতের বিদ্যায় পরিণত হইতে দিব না।"

১৯০৫ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-ভবন "এমার্সন-হল" নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে দর্শনের সঙ্গে Experimental Psychology বা পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছিল। সেই সময়ে মুন্‌ষ্টারবার্গ বলেন—

Of course, on the surface a psychological laboratory has much more likeness to the workshop of the Physicist. But that has to do with externalities only. The psychologist and the physicist alike use subtle instruments, need dark rooms, and sound-proof rooms and are spun into a web of electric wires.

And yet the physicist has never done anything else than to measure his objects, while I feel sure that no psychologist has ever measured a psychical state. Psychical states are not quantities, and every so-called measurement thereof refers merely to their physical accompaniment and conditions. The world of qualities, in which one is never a multiple of the other, and the deepest tendencies of physics and psychology are thus utterly divergent.

বাহ্যতঃ পদার্থবিজ্ঞানের ও মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের একটা সাদৃশ্য আছে; কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান মাপজোক পরিমাণের ব্যাপার, এবং মনোবিজ্ঞান গুণবৈচিত্র্য ও ভাববৈচিত্র্যের লীলা নির্ণয়ের ব্যাপার; সুতরাং দুটা ভিন্নমুখ বিদ্যা।

মুন্‌ষ্টারবার্গ বলিলেন—"কলকব্জা, যন্ত্রহাতিয়ার না হইলে কি পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন চলে না? এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলির জন্য যন্ত্রাদির আদৌ কোন আবশ্যকতা নাই। হার্ভার্ডের কয়েকজন পি-এইচডি উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্র কোন যন্ত্রের সাহায্য না লইয়াই মনস্তত্ত্বের পরীক্ষাসিদ্ধ ফল আলোচনা করিয়াছিল। স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, শিল্পজ্ঞান, সৌন্দর্য্যবোধ, ভাবসাহচর্য্য ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা experiment বা পরীক্ষা করিতেছিল।"

মুন্‌ষ্টারবার্গ তাঁহার গুরু অধ্যাপক উণ্ডের (Wundt) নিকট হইতে একখানা পত্র পাইয়াছিলেন—

I am especially glad that you affiliated your new psychological laboratory to philosophy, and that you did not migrate to the naturalists. There seems to be here and there a tendency to such migration, yet I believe that psychology not only now, but for all time belongs to philosophy; only then can psychology keep its necessary independence.

তুমি যে তোমার মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার দর্শনশাস্ত্রবিভাগের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছ, ইহাতে আনন্দিত হইলাম; মনোবিজ্ঞানকে পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করার একটা ঝোঁক মাঝে মাঝে দেখা যায়; কিন্তু মনোবিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান অপেক্ষা দর্শনশাস্ত্রেরই অধিকতর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

উণ্ড জার্ম্মানির লাইপজিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইঁহার শিষ্যেরাই যুক্তরাষ্ট্রের নানা কেন্দ্রে পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের প্রচারক হইয়াছেন। ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের "শিক্ষা-বিজ্ঞান"-প্রচারক ও মনস্তত্বজ্ঞ প্রেসিডেণ্ট ষ্ট্যান্‌লি হল, উণ্ডের শিষ্য। মুন্‌ষ্টারবার্গ এবং ষ্ট্যান্‌লি হলের ন্যায় কলাম্বিয়া, ইয়েল, শিকাগো, পেন্‌সিলভ্যানিয়া, কর্ণেল, জন্‌স্‌হপকিন্‌স্‌ এবং ওয়াশিংটন ইত্যাদি কেন্দ্রের মনোবিজ্ঞান-ল্যাবরেটরীর পরিচালকেরাও উণ্ডের শিষ্য। Experimental Psychology বা পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানে উণ্ডের স্থান সম্বন্ধে মার্জ (Merz) তাঁহার History of European Thought in the Ninteenth Centuryতে লিখিয়াছেন—

We are indebted to Prof. Wundt of Leipzig for a complete and exhaustive examination of the new province of exact science. He enlarged its boundaries taking in the ground covered by Latze's medical psychology as well as by Helmhotz's physiology of hearing and seeing; added a large number of measurements of his own, some of them quite original, such as those referring to the time-sense, many of them in confirmation and extension of Fechner's collection of facts; invented new methods and new apparatus; brought the whole subject into connection with general physiology, as also with the more exclusively introspective psychology of the older, notably the English and Scottish, schools; and pointed to the necessary completion which these investigations demand from the several neighbouring fields of research. Through his labour "physiological psychology" as an independent science has for the first time become possible.

এই বিজ্ঞানকে নূতন ভাবে তথ্যমূলক প্রমাণভিত্তির উপর স্থাপন করার জন্য লাইপজিগের অধ্যাপক উণ্ডের নিকট আমরা ঋণী। তিনি পূর্ব্বগামী পণ্ডিতগণের পরীক্ষাফল ও জ্ঞান নিজের গবেষণায় নূতনতর ও বর্দ্ধিত করিয়া শারীর-মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করিয়াছেন।

সুতরাং উণ্ড এই নব্য বিদ্যার জন্মদাতা ও পিতাস্বরূপ। জার্ম্মান পণ্ডিত ফেক্‌নারকে (Fechner) ইঁহার পিতামহ বলা যাইতে পারে। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত তাঁহার Psychophysics গ্রন্থে শরীর ও মনের পরস্পর সম্বন্ধ মাপজোকের সাহায্যে প্রথম আলোচিত হইয়াছিল। ইনি এই বিদ্যার নাম-করণের জন্যও দায়ী। মার্জ তাঁহার ইয়ুরোপীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে লিখিতেছেন -

Herbart's attempt to submit psychical phenomena to the exact methods of calculation had failed through the want of a measure for psychical quantities. Latze had suggested the idea of a psychophysical mechanism, i. e., a constant and definite connection between inner and outer phenomena, between sensation and stimulus. E. H Weber in his important researches on 'Touch and Bodily Feeling' had made a variety of measurements of sensations, and shown that in many cases stimuli must be augmented in proportion to their own original intensity in order to produce equal increments of sensation. These observations lent themselves to an easy mathematical generalisation. Fechner was the first to draw attention of philosophers to the existence of this relation in a variety of instances, and collected a large number of fact to prove its general correctness He conceived the idea of measuring sensations by their accompanying stimuli, a mode of measurement based upon that relation, which under the name of Weber's law or formula, he introduced as a general psychophysical proposition.

হার্বার্ট মনের ব্যাপারগুলিকে মাপজোক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মাপিবার উপায় না থাকাতে সফল হন নাই; লট্‌সে বাহির ও অন্তরের ব্যাপারের মধ্যে যোগ নিত্য বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিলেন; ওএবার অনুভূতির বিবিধ পরিমাণের দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে সাড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে উত্তেজকেরও পরিমাণ সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক; ফেকনার উহা বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা গণিতসিদ্ধ প্রমাণ দিয়া সত্য প্রতিপন্ন করেন, এবং উত্তেজকের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া সাড়ারও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি ওএবারের নিয়ম মনোবিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ভারতবর্ষে যাঁহারা অন্ততঃ Sully's Psychology বা সালীর মনোবিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা (Weber) ওএবারের নিয়ম অবগত আছেন। পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ মার্জ-প্রণীত ইতিহাস-গ্রন্থের On

the Psycho-physical View of Nature অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

মুন্‌ষ্টারবার্গ বলিলেন—"একটি বাঙ্গালী ছাত্র দর্শন-বিভাগে চারিপাঁচ বৎসর কাল শিক্ষালাভ করিতেছে। এই বৎসর সে পি-এইচডি উপাধি লাভ করিবে। আমার সঙ্গেও সে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছে।" ইনি আর একটি ছাত্রের কথা বলিলেন। সে জাপানী—শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাশ করিয়া হার্ভার্ডে Animal Psychology বা ইতর প্রাণীর মনস্তত্ত্ব শিখিতেছে। এই বিদ্যা experimental psychology বা পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের এক বিভাগ।

মনোবিজ্ঞান দ্বিবিধ—পশুচিত্তের বিজ্ঞান এবং মানবচিত্তের বিজ্ঞান। মুন্‌ষ্টারবার্গ বলিলেন—"অধ্যাপক ইয়ার্কিস পশুচিত্তের বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। ইতরজীবের চেতনা, বুদ্ধি, স্মৃতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা ইহাঁর কার্য্য। মানবচিত্তের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সঙ্গে পশুচিত্তের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার তুলনা-সাধনও ইনি করিয়া থাকেন। এই তুলনাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান বা Comparative psychologyও হার্ভার্ডে শিখান হইয়া থাকে। কিন্তু ইয়ার্কিস্ ছয়মাস মাত্র হার্ভার্ডে থাকেন। অন্য ছয়মাস ইনি ক্যালিফর্ণিয়ায় অধ্যাপনা করেন। এখন তিনি এখানে নাই। যাহা হউক—তাঁহার বিজ্ঞানালয় আপনাকে দেখাইতেছি।"

পাখী, বানর, খরগোশ, ইঁদুর, সাপ, বিড়াল, ব্যাঙ্ ইত্যাদি নানাবিধ ইতর জীব দেখিলাম। এমার্স্‌ন হলের সর্ব্বোচ্চ তলে এই চিড়িয়াখানা অবস্থিত। এক ঘরে জাপানী ছাত্র ইঁদুরের স্বভাব ও মেজাজ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছে। দুই প্রকারের ইঁদুর খাঁচার ভিতর রহিয়াছে—এক জাতি ভ্রাতা ও ভগ্নীর যৌনসম্বন্ধে উৎপন্ন, অপর জাতি অন্য ভাবে উৎপন্ন। এই দুই জাতীয় ইঁদুরের বংশধরগণ ভিন্ন ভিন্ন ধরণের চরিত্র প্রদর্শন করে কি না ইহাই অনুসন্ধান ও পরীক্ষার বিষয়। এ বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কেহই কোনরূপ ফল পান নাই। জাপানী ছাত্রই প্রথম হাত দিয়াছে। অধ্যাপকও এই কার্য্যে কোনরূপ সাহায্য করিতে অসমর্থ।

Comparative Psychology বা তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রেরা এই বৎসর নিম্নলিখিত বিষয় লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছে—

1. Colour-vision in a ring-dove.
2. Multiple choice responses of albino rats of outbred and inbred strains.
3. Delayed Reaction in albino rats.
4. Temperamental Differences in out-bred and in-bred strains of albino rats.

অধ্যাপক ইয়াকিস (Yerkes) প্রণীত Introduction to Psychology গ্রন্থে Normal Psychology, Abnormal Psychology, Adult Psychology, Child Psychology, Human Psychology, Plant and Animal Psychology, Individual Psychology এবং Group or Collective Psychology—এক কথায় নানাবিধ চিত্তের তুলনামূলক বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। (Morgan) মর্গানের Introduction to Comparative Psychologyও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

দিদিমার গল্প

আজ নয়, কাল নয়। সে অনেক দিনের কথা। সে দিদিমাদের, কি দিদিমাদের দিদিমার আমলের কথা। তখন এদেশে বড় রাক্ষসের ভয় ছিল। রাক্ষসেরা মানুষ খেত, গরু খেত, ঘোড়া-শালের ঘোড়া খেত, হাতী-শালের হাতী খেত। তাদের গায়ে যেমন বল, উদর তেম্‌নি বড়, আবার পরিপাক-শক্তি তেম্‌নি ভয়ানক। এই রাক্ষসের উদরে যে কত রাজা, কত রাণী, কত দেওয়ান, কত মন্ত্রী, কত লোক লস্কর আছে, তার আর সংখ্যা হয় না। এই রাক্ষসের দাপে কত রাজার রাজ্য ছারখার হয়েছে, কত সাজানো পুরী শ্মশান হয়েছে, তার সুমার নাই। কিন্তু সে কালের দিদিমারা আর একালের দক্ষিণারঞ্জন বাবু এই রাক্ষসের জীবন মরণের একটি অতি সহজ সন্ধান ঘরে ঘরে বলে দিয়েছেন। উপায়টা খুবই সোজা। বীচামের বড়ি হজম করার চেয়েও সহজ।

এক অজানা অচেনা দেশের একটা সোনার রাজপুরী, কি একটা পরশ-পাথরের অট্টালিকার ভিতর একটা

আদ্দিকালের বুড়া রাক্ষসী আছে। তার কাছে হয় একটা ডালিম ফল, না হয় একটা খাঁচায়-পোরা টিয়া পাখী আছে। সেটা হচ্চে ঐ রাক্ষসের প্রাণ। ঐ ফল কি পাখীটা যদি একবার হাতে পাও, তবে রাক্ষসটার আর রক্ষা নাই। ফলটি যদি রাক্ষসের প্রাণ হয়, তবে তাকে দুখানা করে ফেল, অমনি রাক্ষসটা আপনা থেকে দুখানা হয়ে যাবে। আর যদি পাখীটা রাক্ষসের প্রাণ হয়, তবে তার পা ভেঙ্গে দিলে রাক্ষস খোঁড়া হয়ে যাবে, পাখীর ডানা কেটে দিলে রাক্ষসের হাত খসে পড়বে, আর যদি ঐ ফল কি পাখীটাকে আগুনে ফেলে দিতে পার, তবে জলের ভিতর ডুবে থাক্‌লেও রাক্ষস আপনা-আপনি পুড়ে ছাই ভস্ম হয়ে যাবে।

এই যে এত বড় একটা আসর-জমানো গল্প, যার সম্পাদক স্বয়ং দিদিমা-কোম্পানি আর প্রকাশক আমাদের মতন লেখকেরা, এটা কি একেবারে মিথ্যা, ভূয়া কথা? তা হতেই পারে না। ছেলেবেলা এই গল্প শোন্‌বার জন্য কত আগ্রহ ছিল! ছেলেদের মনের টান, সত্যের দিকে। কথাটা যদি মিথ্যাই হবে, তবে তার জন্য ছেলেদের প্রাণ এত নেচে উঠে কেন? ছেলেবেলা এমন গল্পকে কেউ মিথ্যা মনে করে না। বয়স একটু বেশী হলে বেন, মিল, ও পি কে রায়ের চাপে পড়ে গল্পটা মিথ্যা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি কথাটা পুরাপুরি মিথ্যা হতেই পারে না। মিথ্যা যে হতেই পারে না তার প্রথম প্রমাণ—এটা দিদিমার কথা; তার উপর আরও অকাট্য প্রমাণ এই যে—যে-সকল ছেলের মগজের ভিতর বেন, মিল্ কি রায় উঁকি মার্‌বার অবসর পান নাই, তারা সকলেই এটাকে সত্য বলে মনে করে।

কোলব্রুক সাহেব থেকে আরম্ভ করে রমেশ দত্ত পর্য্যন্ত সকলেই বলেছেন যে এই রাক্ষস আর কেউ নয়, এ আমাদের দেশের কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্য লোক। এইসব লোকের উৎপাতে কত রাজার রাজ্য শ্মশান হয়েছে, কত প্রজার ধন প্রাণ ছারখার হয়েছে, তার গণনা কে কর্‌তে পারে? এদের দাপটে নগর বন হয়েছে, রাজপুরী শ্মশান হয়েছে, দেবালয় ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। আর এদের ভোজন শক্তি খুবই বেশী। তার প্রমাণ এই যে এখনও ডাক্তার সরকার সর্ব্বাধিকারী থেকে আরম্ভ করে চুনা খয়রা ডাক্তার পর্য্যন্ত বছর বছর হাজার হাজার লোককে ক্ষুধাবৃদ্ধি হবার জন্য এই রাক্ষসদের দেশে চেঞ্জে পাঠাচ্ছেন। কল্‌কেতার কলের জলে এক ছটাক বালাম চালের ভাত যে রোগী হজম কর্‌তে পারে না, দুমাস রাক্ষসদের দেশের জল বাতাসে তার শরীর এমনি হয়ে যাচ্ছে যে ফিরে গিয়ে টিনের ঘিয়ে পাক্‌করা দোকানের কচুরি সিঙ্গেড়া পর্য্যন্ত তার হজম হচ্চে। কাজেই রাক্ষসেরা যে হাতী ঘোড়া খেয়ে হজম করবে সে আর বেশী কথা কি?

এই-সব রাক্ষসেরা লোকালয়ে কেবল উৎপাত উপদ্রব কর্‌তে আসত। তাদের আসল বাস ছিল বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে: এক কথায়, অনেক দূরে অজানা অচেনা দেশে। আর তাদের ঘর বাড়ী, যা কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই, সেটা যে তাদের গায়ের বলের ওজনে খুব একটা প্রকাণ্ড রাজপুরী হবে, তাতে কোন্ বুদ্ধিমান লোক সন্দেহ করবে? যে-সব পাহাড়-পর্ব্বতে রাক্ষসদের বাস, সেখানে আগে হীরা পাওয়া যেত, এখনও কেউ কেউ বলেন সোনা আছে। তাই যদি হয়, তবে রাক্ষসেরা তাদের ঘরবাড়ী সোনা কি পরশ-পাথর দিয়ে না গড়বে কেন? তার পর রাক্ষসেরা যখন লোকালয়ে উৎপাত করতে আস্‌ত, তখন বাড়ীতে থাকত কেবল অক্ষম বুড়া-বুড়ীর দল। তারাই হচ্চে সেই আদ্দিকালের ঘরজাগানো বুড়া রাক্ষসী।

এই পর্য্যন্ত দিদিমার গল্প না হয় কতক কতক করোবর (corroborate) হয়ে গেল। কিন্তু তার পরেই ত জিজ্ঞাসা হবে, রাক্ষসের সেই ঘরে-থাকা প্রাণের কথা। সে কথার জবাব কিন্তু রাক্ষসদের দেশে না গেলে পাওয়া যাবে না। সে কথা ত দিদিমারা বলেই রেখেছেন। যাই হোক্ রাক্ষসদের অজানা অচেনা দেশের অছিন্ অভিন্ পুরী এখন আর তত অজানা নাই। আর রাক্ষসদের দেশে যাবার জন্য পবননন্দনের মত তুড়িলাফ দেবারও দরকার হয় না। ইংরেজের অনুগ্রহে আজ ঐ রাক্ষসদের দেশের এক ধার দিয়েই আই রেলের গাড়ী ছুট্‌ছে। আর বি এন রেলপথ, সে ত তাদের দেশের পাহাড় পর্ব্বত ভেঙ্গে দিয়ে দেশের বুকের ওপর দিয়ে ৩০ করে গাড়ী ছুটাচ্ছে,

এখন আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার জন্যে রাজপুত্তুরকে হটরে বেড়াতে হয় না, এখন গরিবের পুত্তুরও অনায়াসে রাক্ষসের পুরীতে যেতে পারে। রাক্ষসের বংশধরদের সন্ধান পেলে, তারা কেউ বলচে আমি কোল, কেউ বলচে আমি ভীল, আবার কেউ বলচে আমি সাঁওতাল।

রাক্ষসদের ঘরের সন্ধান লও, দেখতে পাবে আমাদের দিদিমারা যেমন এখনকার লেখকদের হাতে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে পেন্সন্ নিয়েছেন্, আদ্দিকালের বুড়া রাক্ষসীও তেম্নি ছেলেপুলেদের হাতে জীবন-মরণের সন্ধান ছেড়ে দিয়ে নিজেরা গা-ঢাকা দেবার জোগাড় করেছে।

রাক্ষসেরা এখন অনেকে আমাদের বুলি শিখেছে, বিশেষতঃ পীনালকোডের সঙ্গে তাদের হাড়ে হাড়ে পরিচয় হয়ে গেছে। কাজেই তাদের সঙ্গে কথা কহা এখন আর বড় কিছু বেশী কথা নয়। এখন এই রাক্ষসদের জিজ্ঞাসা কর—তোমাদের গোত্র কি?

অমনি কেউ বলবে—আমার গোত্রের নাম কেশুরিয়া, আমাকে কেশুরমূল খাইতে নাই। কেশুর আমার পক্ষে বড পবিত্র জিনিস। আমাদের আদি পুরুষের জীবন মরণ, সৌভাগ্য দুভাগ্য, সুখ দুঃখের সঙ্গে এই কেশুরের এক অছিন্ অভিন্ (অচ্ছেদ্য, অভেদ্য) বাঁধন ছিল। আমার বংশের উপর এই কেশুরের প্রভাব বড় কম নয়। বাস্তবিক এই কেশুরিয়া গোত্রের লোকে বিশ্বাস করে যে কেশুর নিয়ে তাতে মন্ত্র তন্ত্র করে কোন কিছু করলে এই গোত্রের লোকের ঘোর অনিষ্ট করা যাবে। সেইজন্য পূর্ব্বে তারা নিজেদের গোত্র পরকে জানতে দিত না, পাছে কোন দুষ্ট লোক কিছু মন্ত্র তন্ত্র করে।

এই রকম এই অনার্য্যদের ভিতর নানা রকম গোত্র আছে। যার গোত্র ডুমরিয়া সে ডুমুর খাবে না, ডুমুর-তলা দিয়ে যেতে হলে ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে চলে যাবে। সে জানে ডুমুরের সঙ্গে তার জীবন মরণ, সুখ দুঃখের এক গাঢ় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ মলেও যাবার নয়। বাঁশয়ার গোত্রের লোক বাঁশ কাটবে না। যত দূর সম্ভব বাঁশ স্পর্শ পর্য্যন্ত করবে না। সেটা তার অতি পবিত্র জিনিস।

আরও গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে কাহারও গোত্র—

টিরকি	(অর্থাৎ)	ইঁদুরছানা
এক্কা	...	কচ্ছপ
চিড্রা	...	কাঠবিড়াল
কিস্পাটা	...	শূকরের অন্ত্র
লাক্ড়া	...	নেকড়ে বাঘ
বাঘ	...	বড় বাঘ
গীড	...	পাতি হাঁস
খ্যাপা	...	পাগলা কুকুর
মিঞ্জি	...	বান্মাছ
আর্গো	...	বড় ইঁদুর
মুরখা	...	নীল গাই
বেস্রা	...	শিক্রা পাখী
হেম্রণ	...	সুপারি
শাঁখ	...	শাঁখা
কাড়া	...	মহিষ
সালঋষি	...	সাল মাছ
লেং	...	ব্যাঙের ছাতা
টুমুরং	...	লাউ
নাগ	...	সাপ
মাণ্ডী	...	এক প্রকার ঘাস
হাঁসদা	...	বন হাঁস
ইত্যাদি		ইত্যাদি

এই-সব গোত্রের লোকে আপন গোত্রের নামের জিনিষ কি প্রাণীকে বড় ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে পালন করে। তারা কিছুতেই এদের কোন রকম অনিষ্ট করবে না। অপরের হাতে যথাসাধ্য এদের কোন অনিষ্ট হতে দেবে না। তারা জানে যে এইসব জিনিস কি প্রাণীর সঙ্গে তাদের অন্তরাত্মা এমন একটা অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা আছে যে সে বাঁধন কিছুতেই নড়চড় হবার নয়। এইসব প্রাণী কি জিনিসের ভাল-মন্দের সঙ্গে তাদের জীবন মরণ, সুখদুঃখের একটা শক্ত বাঁধন চিরকাল আছে ও থাকবে। কু হোক, সু হোক এ একটা তাদের দৃঢ় সংস্কার। দু-শ বছর কি তারও আগে যখন রাক্ষসদের আদিম ভাব আরও প্রবল ছিল,

তখন তারা বিশ্বাস করত যে এই সব জিনিস নিয়ে একটা কোন কিছু তুকতাক করলে তাদের একটা আপদ বিপদ হবেই হবে। আর তাদের সে রকম মনে কর্‌বার বিশেষ দোষই বা কি? এখনও ত এম্‌-এ বি-এ পাস্‌করা কত লোক আছেন, যাঁরা আপনাদের রাশনাম, কি জন্মের নক্ষত্র অপরের কাছে বল্‌তে সাহস করেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ঐটি পেলে দুষ্ট লোকে মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক করে তাঁদের একটা ঘোর অনিষ্ট কর্‌তে পারে। তা যদি হয়, তবে অশিক্ষিত অনার্য্য জাতিরা যে তাদের গোত্র পরের কাছে গোপন কর্‌বে তা' আর বিচিত্র কি?

তারপর গ্রহশান্তির জন্য এখনও আমরা পুরুতঠাকুর কি গ্রহাচার্য্যের ঘরে কত তন্ত্র মন্ত্র যাগযজ্ঞ করে থাকি। তা' ছেলেপিলে লড়াই কর্‌তে গেলে যদি ঘরজাগানো বুড়া রাক্ষসী তার অছিন্ অভিন্ রাজপুরীর ভিতর সোনার দীপে ঘৃত জ্বালিয়ে গোত্রের কর্ত্তা শাতিহাঁস কি বাণ মাছের পূজা করে, ছেলেপিলেদের গ্রহবৈগুণ্য দূর কর্‌বার জন্য যদি কোন-কিছু করে, তা সেটা ত বড় বেশী কথা নয়। আর মানুষের দল কোন গতিকে রাক্ষসের জীবন মরণের এই সন্ধানটুকু পেলে তা নিয়ে মন্ত্র তন্ত্র করত, অন্ততঃ পুরুত ঠাকুরের কিছু খাদ্যের সংস্থান করে দিত, সেও খুব সম্ভব ও সঙ্গত কথা।

তা এই-সব দেখে সাহেবরা বলেন যে ঐসব জীব বা জিনিস রাক্ষসদের টোটেম্ বা বংশচিহ্ন। তাঁরা বলেন শুধু এদেশে কেন, অষ্ট্রেলিয়া দেশে পর্য্যন্ত অনার্য্য জাতির এই রকম টোটেম বা বংশচিহ্ন আছে। তা যাই হোক, টোটেমই হোক, আর গোত্রই হোক, দিদিমার গল্প যে মিথ্যে নয় সেকথা ঠিক।

পুরুলিয়া। শ্রীহরিনাথ ঘোষ।

I. E. F. "B"র সহিত য়ুরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত বাঙালীর দল:
সতীশচন্দ্র ঘোষ, আবদুল রব্বানি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বিনয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরপতি বসু, প্রমোদকুমার ঘোষ, বরদাচরণ রায়, আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়,
জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ললিতমোহন বসু।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
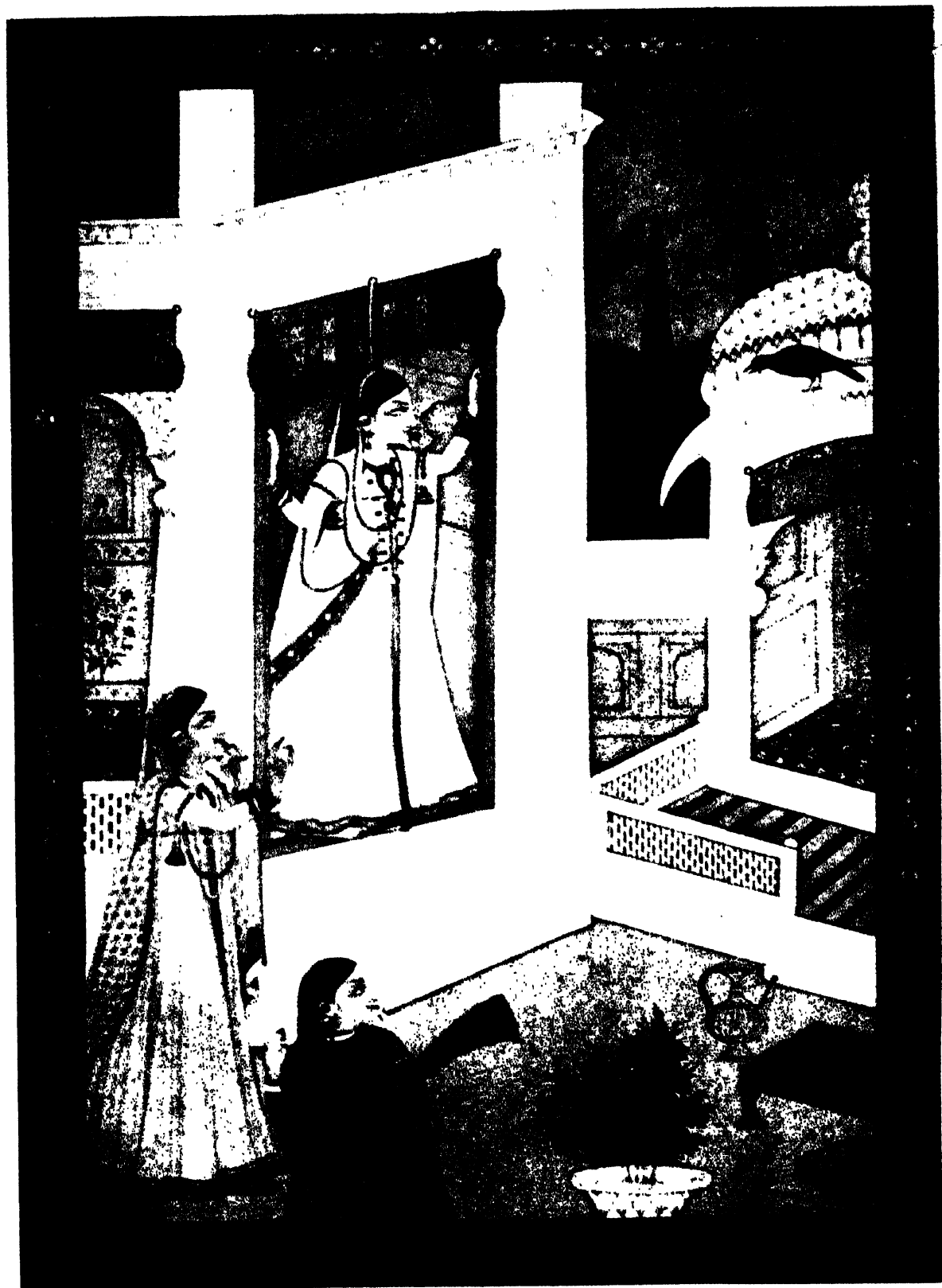
প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩২২

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শিশুর প্রাণরক্ষা।

দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি সুস্থ সবল সুশিক্ষিত মানুষ। কোন দেশের জমী খুব উর্ব্বরা হইতে পারে, উহার মাটীর নীচে কয়লা, লোহা ও নানা রকমের মূল্যবান্ ধাতু থাকিতে পারে। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ না থাকিলে মাটীর উপর ও নাচে হইতে ধন উৎপাদন ও আহরণ করে কে? আমাদের দেশের ধনে কত বিদেশী জাতি ধনী হইতেছে, কিন্তু আমরা অনাহারে শীর্ণ হইতেছি। জড় পদার্থও কিন্তু শ্রেষ্ঠ ধন নয়। মানুষের হৃদয়-মনের শক্তি ও তাহার দ্বারা সৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য, শিল্প, প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য। কিন্তু এই প্রকার বিত্তও সুস্থ সবল সুশিক্ষিত মানুষ ভিন্ন সম্ভবে না। সেইজন্য মানুষের প্রাণরক্ষা করা সকলের গোড়ার কাজ। এই কাজ করিতে গিয়া প্রথমেই দেখা দরকার যে দেশে যত শিশু জন্মে, তাহাদের মধ্যে কতগুলি শৈশবে মারা পড়ে, আর কতগুলিই বা বড় হয়। শিশু বলিতে ১ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশু বুঝিতে হইবে।

সমুদয় ভারতবর্ষে যত শিশু জন্মে, গড়ে এক বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই, তাহাদের মধ্যে শতকরা ২৯টি মারা পড়ে। পশ্চিম-বঙ্গে শতকরা ২২, উত্তর-বঙ্গে ২১, এবং পূর্ব্ব-বঙ্গে ১৮টি এক বৎসর বয়স হইবার আগেই মারা যায়। অন্য জায়গা অপেক্ষা কলিকাতায়, প্রসব করাইবার জন্য ভাল ধাত্রী আছে; এখানে চিকিৎসার সুবিধাও অন্য জায়গা অপেক্ষা ভাল, সহরের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টাও বেশী (কিন্তু ভাল দুধের অভাব আছে); তথাপি এখানে শতকরা ৩১টি শিশু এক বৎসরের হইবার আগে মারা পড়ে; জলপাইগুড়িতে ২৭, বর্দ্ধমানে ও দিনাজপুরে ২৪, ত্রিপুরা ও মানভূমে ১৬, নোয়াখালিতে ১৫ এবং সিংভূমে ১৩। ১৯১১ সালের সেন্সস রিপোর্টে এইরূপ লেখা আছে।

গত মাসে বঙ্গের ১৯১৪ সালের স্বাস্থ্যবিষয়ক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় বঙ্গে ১৯১৪, ১৯১৩ এবং ১৯১২ সালে যথাক্রমে ৩৪০০১২ (শতকরা ২২.১৪), ৩২০৬৬২ (শতকরা ২০.৯৫), ও ৩৩৯৭৭৯ (শতকরা ২১.২৩) টি শিশু মারা পড়ে। সুতরাং মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে দেখা যাইতেছে। ১৯১৪ সালে বীরভূম জেলায় শতকরা ৩০.৭৭টি শিশু, নদীয়ায় ৩০.৩৬, পাবনায় ২৮.২৮, কলিকাতায় ২৮.২৭, মুরশিদাবাদে ২৭.৮৫, দিনাজপুরে ২৫.০৭, জলপাইগুড়িতে ২৪, যশোহরে ১৯.৯৬, ত্রিপুরায় ১৫.৬১, এবং নোয়াখালীতে ১৪.৪১টি মরিয়াছিল। ১৯১৪ সালে তাহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বেশী শিশু মরিবার প্রধান কারণ, সাধারণ লোকদের দারিদ্র্য ও জননীদের অজ্ঞতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তা ছাড়া, ঐ বৎসর সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে শিশুদের প্রাণরক্ষা করিতে

হইলে দেশের দরিদ্রতা দূর করিতে হইবে, জননীদিগকে শিশুপালন শিক্ষা দিতে হইবে, এবং সাধারণ ভাবে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে।

বিদেশের খবর না লইয়াও দেখা যাইতেছে যে বঙ্গের কোন যায়গায় বা শতকরা ১৩টি শিশু মরে, আবার কোথাও বা শতকরা ৩১টি মরে। ইহাও জানা কথা, যে, সভ্য দেশ-সকলে শিশুদের প্রাণরক্ষার জন্য যত চেষ্টা হইয়াছে, আমাদের দেশে সেরূপ কোথাও হয় নাই। সুতরাং ইহা আশা করা অসঙ্গত নহে যে চেষ্টা করিলে বঙ্গে সর্ব্বত্র শিশুর মৃত্যুসংখ্যা কমাইয়া শতকরা ১৩ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কোন কোন স্থানে শতকরা ১৮টি শিশুর প্রাণরক্ষা হয়, এবং সমগ্র বঙ্গে গড়ে শতকরা ৯টি, অর্থাৎ, ১৯১৪র হিসাব অনুসারে. বার্ষিক ৩০৬০০ শিশুর জীবনরক্ষা করা যাইতে পারে। যত শিশু মারা যায়, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কত প্রতিভা, কত ভিন্ন ভিন্ন রকমের শক্তি লোপ পায়, কে বলিতে পারে?

এখানে একটা আপত্তি উঠিতে পারে, দেশে এমনি যত লোক আছে, তাহারাই খাইতে পায় না; আবার কতকগুলা শিশুকে বাঁচাইয়া বড় করিবার দরকার কি? কিন্তু আমরা ত শুধু বাঁচাইতে বলিতেছি না। সকলকে সুস্থ সবল রাখিয়া সুশিক্ষিত করিতে বলিতেছি। আমাদের দেশের ধনে কত জাতি ধনী হইতেছে। দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য জন্মিলে আরও বহু কোটি লোক আমাদের দেশে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে।

বিদেশে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা।

এক বৎসর বয়স হইবার আগে অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনা সহরে শতকরা ১৭টি, বার্লিনে ১৫.৫, গ্লাসগোতে ১৪, নিউ ইয়র্কে ১২.৫, পারিসে ১২, লণ্ডনে ১০.৩৩, এবং ষ্টকহল্মে ও ক্রিশ্চিয়ানিয়ায় ৮·৭৫টি শিশু মারা পড়ে। ইহা ১৯ ০ সালের কথা, এখন আরও উন্নতি হইয়াছে। নিউ ইয়র্কে ১৯১০এ ১২.৫ মরিয়াছিল, ১৯১২তে ১০.৫ মরে; ২ বৎসরে মৃত্যুর হার শতকরা ২ কমিয়াছে। নিউ জীল্যাণ্ড দ্বীপে শিশুর প্রাণরক্ষার চেষ্টা যেরূপ সফল হইয়াছে, এমন আর কোথাও নয়। তথায় ১৯০২য়ে এক বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৮.৩, ১৯১২তে উহা হয় ৫.১। নিউ জীল্যাণ্ড দ্বীপের ডানেডিন্ সহরে আবার যাহা হইয়াছে, তাহা অতুলনীয়। সেখানে ১৯০০ হইতে ১৯০৭ পর্য্যন্ত ৭ বৎসর ধরিয়া এক বৎসরের কম বয়সের শিশু মরিত বার্ষিক শতকরা ৮টি। ১৯১১তে উহা কমিয়া হয় ৪। ১৯১২তে হয় ৩.৮।

বিদেশীরা কিরূপে এমন আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা আগামী সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে সংক্ষেপে লিখিব।

বঙ্গে জন্মমৃত্যু।

১৯১৪ সালে বাঙ্গালা দেশে ১৫৩৫২৮১টি শিশু জন্মে, এবং ১৪৩১২৮৯ জন মানুষের মৃত্যু হয়। তাহার আগের বৎসর ১৩৩১৮৬৮ জন মরিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দেশের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে। ১৯১৩ ও ১৯১৪তে হাজার-করা ২৯.৩ এবং ৩১.৫ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্ম, মৃত্যু, ও শৈশব-মৃত্যুর হার হাজারকরা ১৯১৪ সালে কত হইয়াছিল, তাহা নীচে দেওয়া গেল।

প্রদেশ	জন্মের হার	মৃত্যুর হার	শৈশব-মৃত্যুর হার
যুক্তপ্রদেশ	৪৪.৯৩	৩৩ ৪৬	২৩৩.৪৭
বোম্বাই	৩৭.৪৩	২৯.৪৮	১৯৩.৮০
মান্দ্রাজ	৩৩.৪৯	২৪.৯৫	১৯৬.৫১
বাংলা	৩৩.৮৬	৩১.৫৭	২২১.৪৬
বিহার ও উড়িষ্যা	৪২.৩৮	২৮.৩২	১৭১.২২
আসাম	৩২ ৯৪	২৪ ৬৬	১৮৯ ৪৯
মধ্যপ্রদেশ	৫১.৩৭	৩৬.৬৯	২৬৩.৮৯
পঞ্জাব	৪৬.২৮	৩১.৯৬	২১০.১২
ব্রহ্মদেশ	৩৫.৪০	২৪.১৩	২১৬.৩৬
উঃ পঃ সীমান্ত	৩২.৬৮	২৫.৭৫	১৮৬ ৬৫

জন্মের হার হইতে মৃত্যুর হার বাদ দিলে দেখা যায় ১৯১৪ সালে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হারে লোক বাড়িয়াছিল মধ্যপ্রদেশে (হাজারকরা ১৪.৬৮), পঞ্জাবে (হাজারকরা ১৪.৩২), ও বিহার-উড়িষ্যায় (হাজারকরা ১৪.০৬), এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম ও অত্যন্ত কম (হাজারকরা ২.২৯) বাড়িয়াছিল বঙ্গে।

ব ঙ্গর বিস্তর জেলায় বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে ১৯১৪তে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। কোন্ জেলায় হাজারকরা কত বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে, তাহা লিখিতেছি। প্রথমে

বৃদ্ধির কথা বলি। মেদিনীপুর ৪.৬৫, হাবড়া ১.৯৫, চব্বিশ-পরগণা ৪.৩৯, যশোহর ৩.২৯, খুলনা ১৬.৭৩, রাজসাহী .৬৬, দিনাজপুর ৪.৬৯, জলপাইগুড়ী ২.০৩, রংপুর ৫.৯২, বগুড়া ২.৯১, মৈমনসিং ১০.২২, বাখরগঞ্জ ৮.৭১, চট্টগ্রাম ৭.৩০ নোয়াখালি ১৫.৯৯, ত্রিপুরা ১১.৯৬। অতঃপর হ্রাসের কথা। বর্দ্ধমান ৮.৫৩, বীরভূম ১২.১০, বাঁকুড়া ৮.৪৮, হুগলী ৩.৮৯, কলিকাতা ৮.৯৮, নদীয়া ১৩.৪৪, মুর্শিদাবাদ ১০.১৭, দার্জিলিং ৪.০৩, পাবনা ১২.১১, মালদহ ২.৯০, ঢাকা ১.২২, ফরিদপুর .৮২। মোটের উপর রাজসাহী বিভাগে হাজার-করা .৬৪, ঢাকা বিভাগে ৫.১৬, এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ১১.৮২ জন মানুষ বাড়িয়াছে। অন্যদিকে বর্দ্ধমান বিভাগে ২.৪৯, এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগে .৪৬ কমিয়াছে। বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর জেলাগুলির নাম পরে পরে লিখিতেছি; মনে রাখিতে হইবে, যে, সমস্ত জেলার কথা বলা হইতেছে, এক একটি সহরের কথা নহে:—মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম মালদহ, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, পাবনা, রাজসাহী, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, ফরিদপুর, ঢাকা, রংপুর, হুগলী, যশোহর, চট্টগ্রাম, হাবড়া, বগুড়া, কলিকাতা, বাখরগঞ্জ, মেদিনীপুর, নোয়াখালী, খুলনা, চব্বিশ-পরগণা, ত্রিপুরা এবং মৈমনসিং। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ১৯১৪ সালে সকলের চেয়ে অস্বাস্থ্যকর ছিল মুর্শিদাবাদ জেলা এবং সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর জেলা ছিল মৈমনসিং। ক্লাইব ১৭৫৭ সালে মুর্শিদাবাদ প্রবেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"This city is as extensive populous and rich as the city of London, with this difference that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last city ;" "এই নগর লণ্ডনের মত বিস্তৃত জনাকীর্ণ ও ধনশালী; প্রভেদ এই যে ইহাতে লণ্ডনের ধনীদের চেয়ে অসংখ্য গুণে ধনী অনেক লোক আছে।" ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে মুর্শিদাবাদ পূর্ব্বে এত অস্বাস্থ্যকর ছিল না; কারণ অস্বাস্থ্যকর যায়গায় রাজধানী স্থাপিত হয় না, এবং উহা ধনীদেরও বাসস্থান এবং বাণিজ্যের কেন্দ্র হয় না। মুর্শিদাবাদের অবনতি কেন হইল? বাঁকুড়া খুব স্বাস্থ্যকর বলিয়া বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু এখন উহা সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর পাঁচটি জেলার মধ্যে একটি। কারণ, রেল-বিস্তার, লোকের দরিদ্রতা ও অজ্ঞতা। আরও একটা রেল-লাইন শীঘ্র খুলিবে। তাহাতে ম্যালেরিয়া বাড়িয়া জেলার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হইবার কথা।

কেবল কতকগুলা সংখ্যা পাঠকদের কাছে নীরস ও অপ্রীতিকর মনে হইতে পারে। কিন্তু এই-সব জীবন-মরণের কথা বলিতেই হইবে। মানুষগুলাই যদি মরিয়া গেল, তাহা হইলে সরস কবিত্বপূর্ণ কথা, উচ্চ উচ্চ আদর্শের কথা, গভীর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা, শুনিবে কে, আর বলিবেই বা কে? তথাপি, এবার এখানেই থামি। কোন্ রোগে বঙ্গদেশকে ও কোন্ কোন্ জেলাকে কিরূপ উৎসন্ন করিতেছে, তাহা ভবিষ্যতে বলিব। আপাততঃ স্বদেশপ্রেমিক ভাবুন, সমস্ত দেশের, অন্ততঃ তাঁহার নিজের জেলার স্বাস্থ্য কেমন করিয়া ভাল করা যায়, এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা, এবং উপায় নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন করুন।

অজন্মা, খাজনা আদায় ও দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গলা দেশের জমীর খাজনা আদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে ১৯১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দের যে রিপোর্ট সম্প্রতি বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়:—

"The majority of the people in the Burdwan Division look to agriculture as their principal means of livelihood. The weather conditions during the year were not favourable to agriculturists, as the rains ceased abruptly in September and so the outturn of the crops was below normal. The cultivators were, however, compensated to a certain extent by the high prices of food grains which ruled throughout the year.

"বর্দ্ধমান বিভাগের অধিকাংশ লোকের জীবনধারণের প্রধান উপায় কৃষি। এ বৎসর বারিপাত আদি আকাশিক অবস্থা চাষীদের অনুকূল ছিল না; সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ বৃষ্টি থামিয়া যাওয়ায় সাধারণতঃ যেরূপ শস্য হয়, তার চেয়ে কম হইয়াছিল। কিন্তু সম্বৎসর শস্যের দর চড়া থাকায় কৃষকদের কিছু ক্ষতিপূরণ হইয়াছিল।"

এবৎসর বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যার্থ বাঁকুড়ায় যে সরকারী সাহায্যদান কমিটি হইয়াছে, তাহার সাহায্যপ্রার্থনাপত্র কোন কাগজে জজসাহেবের, কোন কাগজে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষরসহ ছাপা হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে:—

"The distress is the more acute on account of previous bad seasons. In 1913 a large area in the northern portion of the District was devastated by the great Damodar flood. Last year the rains ceased early in September and the yield was very poor in most parts."

"ঋতুর অবস্থা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর ভাল না হওয়ায় লোকের কষ্ট আরো বেশী হইয়াছে। ১৯১৩ সালে দামোদরের প্রচণ্ড বন্যায় জেলার উত্তরাংশের বহুস্থান অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গত বৎসর সেপ্টেম্বরের গোড়ায় বৃষ্টি থামিয়া যাওয়ায় জেলার অধিকাংশ স্থলে ফসল খুব কম হইয়াছিল।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে গত দুই বৎসর বাঁকুড়া জেলায় শস্যনাশ অজন্মা হইয়াছিল। বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলাতেও গড়-পড়তা যাহা হয় তাহা অপেক্ষা গত বৎসর কম ফসল হইয়াছিল, প্রথম-উদ্ধৃত সরকারী উক্তি-তেই তাহা দেখিতে পাইতেছি। ১৯১৩তে বর্দ্ধমান জেলাও বন্যায় লণ্ড-ভণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু এ-সকল সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গলা দেশে ১৯১৪-১৫ সালে যে তিনটি জেলায় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক খাজনা (বকেয়া আদায় সমেত) ষোল আনা অপেক্ষাও বেশী আদায় হইয়াছিল, তন্মধ্যে বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান দুটি; অপরটি দার্জ্জিলিং: বাঁকুড়ায় শতকরা ১০৪.৯, বর্দ্ধমানে ১০৪.০৬ এবং দার্জ্জিলিঙ্গে ১০১.৮। বাঁকুড়া যে সর্ব্বাপেক্ষা গরীব জেলা, তাহা সকলেই জানে। এই গরীব জেলায় উপর্য্যুপরি দুবৎসর, এবং এই বৎসর লইয়া তিনবৎসর অজন্মা হইয়াছে। তাহাতেও কিন্তু এখান হইতেই গবর্ণমেণ্টের আদায় সকল জেলা অপেক্ষা ভাল হইয়াছে। ইহা কেমন করিয়া হইল জানিতে ইচ্ছা করে। খুব চাপ না দিলে ত উপবাসী বা অর্দ্ধ উপবাসী লোকদের নিকট হইতে টাকায় ১৭ আনা খাজনা আদায় হয় না। এখন ত দুর্ভিক্ষে মানুষ মরিতেছে। এখনও গবর্ণমেণ্ট সমস্ত জেলায় বা উহার অধিকাংশ স্থানে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া কোন কাগজে দেখি নাই। যাঁহারা দেশ-শাসন-যন্ত্র চালান, তাঁহারা সকল সময় দেখিতে পান না, যে, যন্ত্রের কোন্ চাকায় কাহার কোন্ অঙ্গ পিষিয়া যাইতেছে। এই জন্য আমাদিগকে এই-সকল অপ্রীতিকর কথা লিখিতে হয়। লর্ড কারমাইকেল ও তাঁহার মন্ত্রীদের দৃষ্টি এই দিকে পড়া দরকার।

গবর্ণমেণ্ট খাস্‌মহলে শিক্ষার সঙ্কোচ।

১৯১৪-১৫র ভূমিকরবিষয়ক রিপোর্টে আরও একটি হাসি-কান্নাজনক খবর দেখিতে পাইলাম। গবর্ণমেণ্ট খাস্‌মহল-গুলিতে স্কুল এবং ছাত্রসংখ্যা দুই কমিয়াছে। বাখরগঞ্জ জেলায় ২০টি স্কুল কেন উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার এই কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

"In the district of Bakarganj 20 schools were abolished owing to the teachers being poorly paid." "শিক্ষকেরা খুব অল্প বেতন পাইত বলিয়া স্কুলগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

অর্থাৎ কিনা যথেষ্ট খাদ্যের অভাবে যদি তোমার বলদগুলি ভাল করিয়া লাঙ্গল দিতে বা গাড়ি টানিতে না পারে, এবং গাভীগুলি দুধ না দেয়, তাহা হইলে খাদ্য না বাড়াইয়া, গোশালাটি ভাঙ্গিয়া ফেল, বলদ ও গাভীগুলিকে তাড়াইয়া দাও; তাহা হইলে চাষও হইবে ভাল, দুধও প্রচুর পরিমাণে পাইবে।

শুনিতে পাই টাকার অভাবে শিক্ষা বিভাগে কত-কি কাজ হইতে পায় না। স্কুল উঠাইয়া দিবার কারণ সম্ভবতঃ এইরূপ কিছু একটা কথিত হইবে। কিন্তু ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত ১৯১৩-১৪র শিক্ষাবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে ঐ সালে বাংলা গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত দুই কোটি সাতাশহাজার টাকা খরচ করিতে পারিতেন; কিন্তু খরচ করিয়াছিলেন মোটে ৮৮ লক্ষ ৯২ হাজার। সুতরাং টাকার অভাব বোধ হয় কারণ নয়। বন্দোবস্তের ত্রুটি বা অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে।

বাঙ্গালী পালোয়ান।

শ্রীযুক্ত তারাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রবাসী বাঙ্গালী। তাঁহার জন্মস্থান ঢোলপুর। তাঁহারা দুই তিন পুরুষ পশ্চিম-প্রবাসী। তারাচরণ বাবু শক্তিশালী, সুপুরুষ; ঐ অঞ্চলে তিনি বিখ্যাত পালোয়ান বলিয়া পরিচিত। সম্প্রতি সিমলায় ভারতের প্রসিদ্ধ পালোয়ানদের প্রতিযোগী কুস্তি-খেলা হয়; পাটিয়ালা ও ঢোলপুরের মহারাজা এই মল্ল-যুদ্ধের সকল ব্যয় বহন করেন ও মধ্যস্থতাও করেন। সেই মল্লযুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মল্ল বলিয়া

স্বীকৃত শিখ পালোয়ান হরদয়াল সিংহকে বাঙ্গালী তারাচরণ বাবু পরাজিত করিয়া পাটিয়ালার মহারাজার প্রদত্ত দশ হাজার টাকার পারিতোষিক লাভ করেন; কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহাকে একজোড়া উৎকৃষ্ট দোশালা উপহার দেন। এই কুস্তি জেতাতে তারাচরণ বাবু ঢোলপুরের মহারাণা কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহার এডিকং বা শরীর-রক্ষী ও প্রাইভেট সেক্রেটারী বা খাস মুন্সি নিযুক্ত হইয়াছেন। তারাচরণ বাবু কেবল বলচর্চ্চাই করেন নাই, বিদ্যাচর্চ্চাও করিয়াছেন। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন।

চীনে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা।

মাঞ্চুরা খাঁটি চীনে নয়, তাহারা চীন জয় করিয়া চীনেই বাস করিয়া চীনে রাজত্ব করিতেছিল। চীনারা মাঞ্চু রাজাকে অপসৃত করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

এশিয়াখণ্ডে স্বাধীন জাতিদের মধ্যে জাপান প্রধান। পারস্য ও চীনকেও রাজ্যসংস্কারে উদ্যোগী দেখিয়া এশিয়ার প্রাণে আনন্দ ও আশা জাগিয়াছিল, যে, এইবার য়ুরোপ ও এশিয়ার বলসাম্য হইতে পারিবে।

কিন্তু পুরাতনপ্রিয় একদল লোক সকল দেশেই থাকে। চীনের প্রাচীনপন্থীরা চীনে আবার রাজশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা যে প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি রাষ্ট্রনায়ক য়ুআন-শী-কাইকেই রাজা করিবে—ইহারা য়ুআন-শী-কাইএর ধামাধরা দলও হইতে পারে, তাঁহারই প্ররোচনায় হয় ত আন্দোলন জুড়িয়া দিয়াছে। যাহাই হোক, জাপানের প্রতিনিধি চীন গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দ্যান যে এ সময় কোনো পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া প্রাচ্য দেশে উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া শান্তি নষ্ট করা দেশহিতৈষীর উপযুক্ত কাজ হইবে না। জাপান-প্রতিনিধির বাক্য ইংলণ্ড-প্রতিনিধি ও রুষ-প্রতিনিধি সমর্থন করেন। আমেরিকার দেশনায়ক উইলসন, পরদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বলিয়া কোন মত প্রকাশ করেন নাই।

চীন গবর্মেণ্ট অর্থাৎ য়ুআন-শী-কাই ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাহার উত্তর দিয়াছেন যে একদল লোক যখন রাজপদ প্রতিষ্ঠার সমর্থন করিয়া একটা প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উপস্থিত করিতে চাহিতেছেন তখন তাহার বিচার আলোচনা করিতে না দিলেই বরং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে। পাঁচটি প্রদেশের অধিকাংশ লোকের মত যে Constitutional Monarchy বা নিয়মতন্ত্র রাজপদ প্রতিষ্ঠিত হোক, তাহাদের বিরোধী দল সংখ্যায় অল্প। যাহারা রাজপদ পুনঃ-প্রতিষ্ঠার অতিবিরোধী তাহাদিগকে চীনা আইনে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করাতে তাহারা পলাতক! সুতরাং রাজপদ প্রতিষ্ঠায় গোলমাল কিছুই হইবে না!

এক্ষণে য়ুরোপ ও জাপান এ সম্বন্ধে কি বলেন তাহা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক আছি। শাসনপদ্ধতির শ্রেষ্ঠ পরিণতি প্রজাতন্ত্র; তাহা ত্যাগ করিয়া আবার একের প্রভুত্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে চীনের সর্ব্বনাশ হওয়া অসম্ভব নয়!

ইহা লিখিত হইবার পর দৈনিক কাগজে দেখিলাম যে রয়টার নিউইয়র্ক হইতে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন যে তথাকার এসোসিয়েটেড্ প্রেসের পেকিংস্থিত সংবাদ-দাতা খবর পাঠাইয়াছেন যে য়ুআন চীনসাম্রাজ্যের সিংহাসন পরিগ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছেন।

শীত ও অনাহার।

কিন্তু কাহাকেই বা বলি। এই যে আমাদের দেশে হাজার হাজার গ্রামে কত লক্ষ লোক অনাহারে, অল্পাহারে, কদাহারে দিন কাটাইতেছে, দারুণ শীতে কষ্ট পাইতেছে, অনেকে মারা পড়িতেছে, ইহাতে কি আমাদের সকলের দয়া হইতেছে? আমরা কি প্রত্যেকে ২টা করিয়া পয়সা দিয়াও এক একজন স্বদেশবাসীর এক দিনের জন্যও জীর্ণ দেহে ক্ষীণ প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছি? মানুষের প্রাণটা আমাদের দেশে বড় তুচ্ছ, বড় সস্তা। যে দেশে অতি অল্পসংখ্যক মানুষ কোন মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করে, যে দেশে সমগ্র জাতির এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনের যে উচ্চ লক্ষ্য ও মহৎ কর্ত্তব্য আছে সে ধারণাও নাই, সেখানে এইরূপই হয়। কারণ, এখানে বাঁচিয়া থাকাতেই বা কাহার কি লাভ, মরিলেই বা কাহার কি ক্ষতি? তাহা হইলেও, আমরা খুব তুচ্ছ হইলেও নিজের প্রাণটির মায়া কেহ ছাড়িতে পারি না। অপরের প্রাণকেই তুচ্ছ ও সস্তা মনে হয়।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী ও শিশু।

পাশ্চাত্যদেশের লোকদিগকে আমরা অনেকে বলি ধর্ম্মভাববিহীন, আধ্যাত্মিকতাশূন্য। কিন্তু বেলজিয়মের ৮০ লক্ষ নিরুপায় লোকের অন্নবস্ত্র যোগাইবার জন্য নিকটবর্ত্তী ইংলণ্ড হইতে ত সাহায্য যাইতেছেই, সুদূর আমেরিকা হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া খাদ্য যাইতেছে। নিরাশ্রয় অনাথ বেলজিয়ানদের ছবি অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু কেহই শীর্ণ, নগ্ন, কঙ্কালসার নহে। ধর্ম্মভাববিহীন, আধ্যাত্মিকতা-শূন্য পাশ্চাত্যেরা তাহা হইতে দেয় নাই। বেলজিয়মকে সাহায্য করা সম্বন্ধে আমেরিকার ক্রিশ্চিয়ান রেজিষ্টার নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র লিখিতেছেন :—

The coming winter will bring even greater strain than the last; for, while we settle down with benumbed sensibility, the sufferings of this awful time are ever keen, and extend over a wider and wider range. The giving, therefore, which every one must prepare is the giving in excess of ability. Most giving is measured by what one has after he has got all his wants satisfied. Rarely does giving spring from self-denial, the real diversion of expenditure from self to others. But this is the only giving which binds the world closer, and yields the giver the best returns. The prevention of waste, the exercise of more careful economy, the omission of easy and needless expenditure, would yield to almost every one a fund for sympathy. To do without things we need in order to supply the greater need of others would keep the fund large, and to many people would open a new world of satisfaction.

এই কাগজখানির সম্পাদক তাঁহার দেশ হইতে সুদূর-বর্ত্তী বিদেশী বেলজিয়ানদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকটবর্ত্তী দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে আমরা যেন অনুভব করিতে পারি। আমরা যেন অন্তরের সহিত বলিতে পারি—

"শীতে আমরা যখন অসাড় ও আড়ষ্ট হইয়া পড়িব,

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত বালকবালিকা।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ কমে নাই; অধিকন্তু শীত পড়ায় এখন অন্নাভাবের উপর পরিধান বস্ত্রের, শীত বস্ত্রের, ও লেপ কম্বলের অভাব তীব্ররূপে অনুভূত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন, বাঁকুড়ায় ৫ লক্ষের উপর লোক বিপন্ন। প্রত্যেক মানুষের খাই-খরচ মাসে এক টাকা ধরিলেও মাসে ৫ লক্ষ টাকা চাই; কিন্তু সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন মোটে সওয়া পাঁচ লক্ষ। অতএব আমাদিগকে মুক্তহস্ত
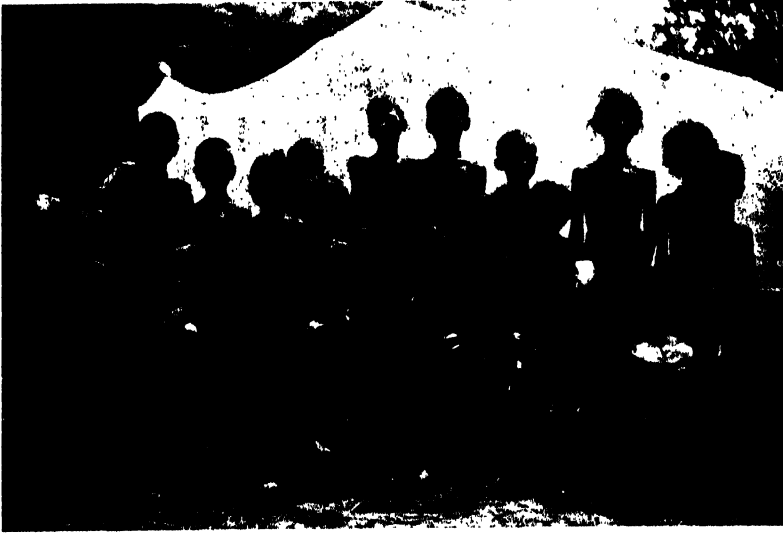
তখন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকেরা অতি তীব্র ভাবে যাতনা অনুভব করিবে, এবং এই কষ্ট ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর অনুভব করিতে থাকিবে। অতএব, সকলকে যেরূপ দানের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহা হইতেছে সাধ্যের অতিরিক্ত দান। দাতার নিজের সমুদয় অভাবপূরণ করিয়া যাহা বাকী থাকে, অধিকাংশ দান তাহার দ্বারা পরিমিত হয়। আপনাকে সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া যাহা দেওয়া হয়, এরূপ দান অল্পই দেখা যায়। উহার অর্থ, নিজের জন্য যাহা ব্যয়িত হইত পরার্থে তাহা ব্যয় করা। কিন্তু এইরূপ দানের দ্বারাই মানবজাতিকে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বদ্ধ করে, এবং দাতাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিদান আনিয়া দেয়। অপব্যয় নিবারণ, অধিকতর সাবধানতার সহিত মিতব্যয়িতা অবলম্বন, এবং অনাবশ্যক ও অনায়াসঃব্যয় না করিলে, দুঃখীর দরদে দরদী হইবার মত অর্থ প্রায় সকলেরই থাকিতে পারে। আমাদের চেয়ে যাহাদের অভাব গুরুতর, তাহাদের অভাব মোচনের জন্য আমাদের নিজের অভাব পূর্ণ করিতে বিরত থাকিলে, অপরের সাহায্যার্থ অর্থ আরো বেশী হইবে, এবং অনেকের নিকট নূতন আনন্দময় জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।"

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত বালকবালিকা।

হইতে হইবে। যাহারা দেশবাসীর বেদনায় ব্যথিত হইয়া বাঁকুড়া সম্মিলনের সাহায্যভাণ্ডারে প্রবাসী সম্পাদককে টাকা পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের দান বিজ্ঞাপনীতে স্বীকৃত হইল। যে পর্য্যন্ত নিরন্ন বস্ত্রহীন লোকদের অবস্থা তাহাদের চিরন্তন দুর্দ্দশা অপেক্ষা মন্দ থাকে, ততদিন ভিক্ষার জন্য হাত বাড়াইয়া রহিলাম।

"নিরপেক্ষ সম্পাদক।"

ইউরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধে যে-সকল দেশ কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই, সেখানেও সম্পাদকদিগকে খুব হুসিয়ার থাকিতে হইতেছে। বেশী মন খুলিয়া কিছু বলিলে এক বা অন্য পক্ষ ক্রুদ্ধ হইতে পারে, এবং তাহাতে নিরপেক্ষ দেশকে যুদ্ধের আবর্ত্তের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইতে পারে। সেটা কম বিপদের কথা নয়। কারণ, এই যুদ্ধে ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতিগুলি লিপ্ত হইয়াছে; যাহারা বাকী আছে, তাহাদের কোন কোনটি জ্ঞানে, সভ্যতায়, বাণিজ্যে নিকৃষ্ট না হইলেও সামরিক শক্তিতে প্রবল নহে।

আজকালকার আদর্শ সম্পাদকের জীবন্ত চিত্র।

এই "নিরপেক্ষতার সময়ে"র "আদর্শ সম্পাদকে"র একখানা ব্যঙ্গচিত্র স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের একখানা কাগজে বাহির হইয়াছে। আমরা তাহার প্রতিলিপি দিলাম। সম্পাদকের চোখে ঠুলি দেওয়া হইয়াছে, কানে ছিপি আঁটা হইয়াছে, মস্তিষ্কে চিন্তা বন্ধ করিবার জন্য, বা চিন্তার ফলের প্রকাশ নিবারণের জন্য,'মাথায় শক্ত বাঁধন দিয়া তাহা যাহাতে খুলিয়া না যায় তজ্জন্য তাহাতে তালা লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এসব সত্ত্বেও যদি সম্পাদকপ্রবর কিছু বলিয়া বসেন, এইজন্য তাঁহার মুখে ছিপি আঁটা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি, তাঁহার পশ্চাতে দুজন সান্ত্রী তলোয়ার খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে; কি জানি যদি ইসারা ইঙ্গিতে সম্পাদক ভায়া মনের ভাব কিছু ব্যক্ত করিয়া বসেন।

মনে হইতেছে, ছবিটা ছাপিয়া ভাল করিলাম না। হয়ত পাইয়োনীয়ার, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, ইংলিশম্যান, প্রভৃতির সম্পাদকেরা ভারতবর্ষীয় দেশী সম্পাদকদিগের জন্যও এইরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিতে পারেন। কারণ, আমরা এখনও "আদর্শ সম্পাদকে" পরিণত হই নাই।

জিজ্ঞাসুর আদর।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে প্রত্নতত্ত্ব ও অন্য নানা বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য বিহার-উড়িষ্যা গবেষণা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা তথাকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাঁচির উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়, এম্ এ, বি এল্। তিনি উহার

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

ত্রৈমাসিক পত্রিকারও সম্পাদক। ইহার প্রথম সংখ্যা নানা নূতন তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছে। শরৎ বাবু সমিতির নৃতত্ত্ব বিভাগেরও সম্পাদক। তিনি ছোটনাগপুরের অন্যতম আদিম-অধিবাসী মুণ্ডা এবং ওরাওঁদের সম্বন্ধে

অনেক গবেষণা করিয়া দুখানি সুন্দর বহি লিখিয়াছেন। এই দুই গ্রন্থে লিখিত অনেক বিষয় প্রবাসীতে বর্ণিত হইয়াছিল। এই গবেষণার কাজ করিতে গিয়া তাঁহার ওকালতী ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। সম্প্রতি নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার সুবিধার জন্য বিহার-উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট বিহার-উড়িষ্যা গবেষণা সমিতির নৃতত্ত্ব বিভাগের সম্পাদকের জন্য বার্ষিক ৩০০০৲ টাকার বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। শরৎ বাবু ঐ বিভাগের সম্পাদক বলিয়া তিনি ঐ টাকা পাইবেন। তাহাতে তাঁহার কিছু ক্ষতিপূরণ হইবে। এই উৎসাহ দানের জন্য বিহার গবর্ণমেণ্ট প্রশংসার যোগ্য।

শরৎ বাবুর সম্বন্ধে একজন বন্ধু লিখিয়াছেন :—

"এ দেশের বুনো অসভ্যদের রীতিনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ রাজপুরুষেরা অনেক সময় যখন তাহাদের প্রতি অন্যায় বিচার করিতেন, তখন তাঁহার প্রাণ এই অসভ্যদের জন্য কাঁদিয়া উঠিত এবং তিনি ইহার প্রতিবিধানের উপায় খুঁজিতেন। এইরূপে তিনি নীরবে মুণ্ডা ও ওরাওঁ জাতির ইতিহাস ও অন্যান্য তথ্য সঙ্কলনে নিযুক্ত হইলেন। সর্ব্বদা এই গবেষণায় আপনাকে নিমজ্জিত রাখিয়া পর্ব্বতে বনে ও গ্রামে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইংরেজ রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিতে এই অসভ্য জাতিদিগকে আনিবার জন্য তিনি ১৯১২ সালে "মুণ্ডা ও তাহাদের দেশ" এবং ১৯১৫ সালে "ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতি" নামক দুইখানি ইংরেজী গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

"বিদেশে ও স্বদেশে বিদ্বৎসমাজ উক্ত দুই পুস্তকের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। এখনও তিনি এই প্রৌঢ়বয়সে যুবার মত উৎসাহে তাঁহার ছুটীর দিনগুলি গ্রামে গ্রামে পর্ব্বতে পর্ব্বতে মানবতত্ত্বের গবেষণায় অতিবাহিত করিয়া প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ ও লৌহযুগের মাল-মসলা সংগ্রহে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে এবং কি গ্রীষ্মে কি শীতে অসভ্যদের কুঁড়ে ঘরের আশে পাশে, গভীর বন জঙ্গলের মধ্যে এবং নির্জ্জন গিরিকন্দরে কত রজনী মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া বিপদসঙ্কুল স্থানে কাটাইতে হইয়াছে।

"ধূমকুড়িয়াতে অসভ্যেরা রাত্রিকালে গভীর অরণ্যানীর মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া নানারূপ তন্ত্রাচার করে। ইহা তাহাদের অতি গোপনীয় বিষয়। বাহিরের কেহ আসিয়াছে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবধ পর্য্যন্ত করিতে পারে। অসভ্যদের ধূমকুড়িয়ার বিষয় জানিবার জন্য তাঁহাকে রাত্রিকালে কখনও উচ্চ বৃক্ষের উপর, কখনও গভীর অরণ্যানীর মধ্যে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া লুক্কায়িত থাকিয়া দেখিতে ও শুনিতে হইয়াছে।

"রাঁচীতে খৃষ্টান মুণ্ডা ও ওরাওঁদের জন্য অনেক বোর্ডিং ও স্কুল রহিয়াছে। কিন্তু অখৃষ্টান মুণ্ডা ও ওরাওঁদের জন্য কোন বোর্ডিং বা স্কুল নাই। তিনি এই অভাব দূরীকরণের চেষ্টায় আছেন এবং এক্ষণে একটি ছোট ছাত্রনিবাস ও তৎসংলগ্ন একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। ছাত্রনিবাসে এক্ষণে ৬০ জন অখৃষ্টান মুণ্ডা ও ওরাওঁ ছাত্র রহিয়াছে এবং প্রাইমারী স্কুলে দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। ছাত্রনিবাসের অনেক বালক রাঁচীর গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ও অন্যান্য স্কুলে পড়ে।"

মৃত্যুর কারণ নিরূপণ ক্ষমতার অভাব।

মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে এইরূপ খবর দেখা যায় যে আমাদের দেশের কোন একটি লোক ইংরেজ বা ফিরিঙ্গীর পদাঘাতে বা মুষ্ট্যাঘাতে প্লীহা ফাটিয়া মরিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি সিন্ধুদেশে করাচী সহরে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। আসামীর নাম কেনী; মৃত মানুষটির নাম তাজদীন। দুজনেই রেলের কর্ম্মচারী। জজের রায়ে প্রকাশ, কেনী যখন এঞ্জিনের চালায় ছিল, তখন তাজদীন সেখানে একটি ল্যাম্প আনিতে যায়। কেনী বলে, ল্যাম্পম্যান (মশালচী)-কে ডাক, সে ল্যাম্প দিবে। তাজদীন বলে, আমি পয়েণ্টস্‌ম্যান, ল্যাম্পম্যানকে ডাকা আমার কাজ নয়। তাহাতে কেনী রাগিয়া তাহাকে লাথি মারে। লাথির চোটে লোকটির প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যু হয়। কেনীর দণ্ড হয় ৫০৲ টাকা জরিমানা, কিম্বা ১৫ দিন সশ্রম কারাবাস। সে জরিমানা দিয়াছে। মায়না-কারী ডাক্তারের মতে "the deceased had an abnormally enlarged spleen and the slightest force would have ruptured it and caused death." "মৃত ব্যক্তির প্লীহা অসামান্য রকম বর্দ্ধিতায়তন ছিল; সামান্য আঘাতেই

তাহা ফাটিয়া মৃত্যু হইবার কথা!” তাতে আর ভুল কি? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রকারের বিশাল প্লীহা-যুক্ত লোক সমগ্র ভারতে অনেক আছে; তাহারা চাষবাস, দাঙ্গা মারামারি, মাথা ফাটাফাটি, কত-কি করে, কিন্তু প্লীহা ফাটিবার মত “সামান্য আঘাত” অবিবেচক ইংরেজ বা ফিরিঙ্গীর লাথি বা ঘুষি ভিন্ন আর কোন পদার্থ হইতে ক্বচিৎ পায়। আমাদের এই ধারণা ভুল হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ ধারণা দেশী লোকদের বোধ হয় সকলেরই আছে। তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের একটি তালিকা প্রকাশ করা উচিত যে কোন একটা বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষে এপর্য্যন্ত কত লোক প্লীহা ফাটিয়া মরিয়াছে, এবং তন্মধ্যে কত লোকের প্লীহা অবিবেচক ইংরেজ ফিরিঙ্গীর আঘাতে, কত লোকেরই বা অন্যবিধ আঘাতে ফাটিয়াছে। প্লীহা ফাটিয়া মরিলে বিশেষ কোনরূপ লাভ হয় কি না জানি না; কিন্তু তাহা না হইলে ভারতবাসীদের ঐ রূপে মরিতে পছন্দ করিবার কোন কারণ নাই। তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি থাকিলে নিশ্চয়ই মরিবার আরো অন্য উপায় আবিষ্কৃত হইত। যে সব ডাক্তার মায়না করে, তাহাদেরও মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করিবার শক্তি বোধ হয় কম। নতুবা সেই এক-ঘেয়ে প্লীহাফাটার কথা শুনিতে হয় কেন? আরো ত অনেক কারণে মৃত্যু হইতে পারে? আরো দু-একটা কারণ নির্দ্দিষ্ট হইলে একটু বৈচিত্র্যও হয়। স্বীকার করা যাক্‌, যে (১) এইরূপ প্রত্যেক দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত ইংরেজ বা ফিরিঙ্গী খুন করিবার উদ্দেশ্যে আঘাত করে না, (২) যে ডাক্তার মায়না করে, তাহার সত্য সত্যই বিশ্বাস যে প্লীহা ফাটিয়াই মানুষটি মরিয়াছে, (৩) বাস্তবিকও প্লীহা ফাটিয়াই হতভাগ্য মানুষটি মরিয়াছে, এবং (৪) জজেরও প্রকৃত ধারণা তাই; তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, যে, ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীরা ত সবাই খবরের কাগজ হইতে এইরূপ দুর্ঘটনার বিষয় অবগত আছে যে অনেক ভারতবাসীর প্লীহা বড় ও অত্যন্ত ঠুন্‌কো, তবে তাহাদের মধ্যে গোঁয়ার লোকেরা কেন ভারতবাসীদের পেটে আঘাত করা সম্বন্ধে সাবধান হয় না? আঘাত না করাই ত উচিত; করিলেও পেটে আঘাত না করিয়া শরীরের অন্যত্র আঘাত করিলেও ত চলে? তাহারা ভারতবাসী-মানুষের প্রাণটাকে অত তুচ্ছ কেন মনে করে? আইনেও এইরূপ আছে যে খুন করিবার উদ্দেশ্য না থাকিলেও যদি আসামীর এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে এরূপ আঘাতে মানুষ মরিতে পারে, এবং সেইরূপ আঘাতে বাস্তবিকই আহত মানুষটি মরিয়া যায়, তাহা হইলেও খুনের অপরাধে তাহার ফাঁসী হইতে পারে। ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। সুতরাং ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীরা যে জানে, যে এরূপ আঘাতে ভারতবাসীদের মৃত্যু হইতে পারে, তাহা ধরিয়া লওয়া কোনও জজের পক্ষে অযৌক্তিক হইতে পারে না। এইরূপ বিশ্বাস অনুসারে এই প্রকার অপরাধী-দের ফাঁসীর বা যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের হুকুম দেওয়াও কোন জজের পক্ষে যুক্তি ন্যায় বা আইনবিরুদ্ধ নহে। ক্ষোভের বিষয় এ-পর্যন্ত কোনো জজের এরূপ ন্যায়পরায়ণতা দেখা গেল না। জজেরা উপযুক্ত শাস্তি দিলে গোঁয়ারদের অসাবধানতা কবে দূর হইয়া যাইত। ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে গুরু-তর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আইন বদলাইয়া বা অন্য যে কোন প্রকারে হউক, এইসব মোকদ্দমায় আসামীদের যাহাতে যথেষ্ট শাস্তি হয়, তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। দেশের লোকেরও এই-সব দুর্ঘটনা এবং বিচারবিভ্রাট গা-সওয়া হইয়া যাইতেছে। তাহা কখনই হইতে দেওয়া উচিত নয়। মানুষের প্রাণ অমূল্য জিনিষ, তাহা যে জাতি বা যে শ্রেণীর মানুষেরই হউক। যে নিহত হয়, সে শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, সাদা কাল, যেরূপই হউক, মানুষ-খুন অতি পৈশাচিক অপরাধ। ইহা নিবারিত হওয়া চাই। মানুষের জীবন তুচ্ছ ও সস্তা হইলে চলিবে না।

[ইহার পর বিবিধ প্রসঙ্গের “শীত ও অনাহার” শীর্ষক প্রসঙ্গ পড়িবেন।]

শ্রীযুক্ত ডাক্তার জীবরাজ মেহতা।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার জীবরাজ মেহ্‌তা বোম্বাই মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হন, এবং বহুসংখ্যক পুরস্কার ও পদক প্রাপ্ত হন। স্বর্গীয় জামসেদজী নাসেরওয়াঞ্জী তাতা মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত একটি

শ্রীযুক্ত ডাক্তার জীবরাজ মেহতা, এম্ ডি (লণ্ডন)।

বৃত্তি লইয়া তিনি লণ্ডনে চিকিৎসা শিক্ষা সমাপন করিতে যান। লণ্ডনের এম্ ডি অতি কঠিন পরীক্ষা। তিনি এই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তদ্ভিন্ন তিনি এম্ আর্ সি পি হইয়াছেন। তিনি যে কেবল পড়াশুনাই উত্তমরূপে করিয়াছেন, তাহা নয়। ভারতবাসীদের এবং ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের কল্যাণার্থ নানা প্রচেষ্টায় তিনি উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন। ডাক্তার মেহ্ তা সম্প্রতি বোম্বাই ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বঙ্গে বাংলা শিক্ষার অবনতি।

১৯১৪-১৫ সালের শিক্ষাবিবরণীতে লেখা হইয়াছে, যে নিম্নতম শ্রেণীর পাঠশালা ব্যতীত আর সমুদয় বাংলা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও তাহাদের ছাত্রসংখ্যা কমিয়াছে; লোকে শুধু-বাংলা সন্তানদিগকে শিখাইতে চায় না। একথা এই প্রথম লেখা হয় নাই। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হর্ণেল সাহেব আগে আগেও এইরূপ কথা লিখিয়াছেন। আগে জনসাধারণ শুধু-বাংলা শিক্ষা চাহিত, এখন চায় না, ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু কেন চায়না, তাহার কারণ নির্দ্ধারিত হওয়া চাই। তাহার কি চেষ্টা হইয়াছে জানা দরকার। আর, লোকেরা যদি বাংলার সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প ইংরেজীও শিখিতে চায়, তাহা হইলে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া মোটের উপর যাহাতে বৎসরের পর বৎসর ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে থাকে, সে চেষ্টা করা শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের একান্ত কর্ত্তব্য। শুধু বাংলা শিক্ষায় লোকের অনুরাগ বাড়ে নাই (Purely vernacular education has failed to advance in public favour) বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। বাংলা শিক্ষার আদর যাহাতে বাড়ে, তাহার চেষ্টাও করা চাই, এবং যদি লোকে কিছু ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা চায়, তাহাও করা কর্ত্তব্য। এই ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত উপাসনী নামক একজন দেশী সভ্য প্রস্তাব করেন যে নিম্নতম দেশভাষাশিক্ষার পাঠশালা ছাড়া আর সব দেশভাষা-শিক্ষালয়ে অল্পস্বল্প ইংরেজী শিখাইবার ব্যবস্থা করা হউক। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বাঙ্গলা দেশেও ব্যবস্থাপক সভায় কোন সভ্য এইরূপ প্রস্তাব করিলে ভাল হয়। আমরা অনেক দিন হইতে বাংলা পাঠশালা ও বিদ্যালয়গুলির হ্রাস ও অবনতির প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ইংরেজী যাহাদের উপজীব্য ও প্রণম্য এবম্বিধ নেতাদের নজর এদিকে ভাল করিয়া এখনও পড়িল না।

অথচ শিক্ষার বাহন বাংলাকেই উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে করিতে হইবে। বিদেশী ভাষা শিখিতে সকলে ভাল করিয়া পারে না। মনে পড়িতেছে আমরা যখন ১১।১২ বৎসরের, সে সময়ে আমাদের সঙ্গে ভৈরব নামে একটি ছেলে পড়িত। সে ইংরেজীতে বড় বেশী কাঁচা ছিল। কিন্তু বাংলা করিয়া বুঝাইয়া দিলে এণ্ট্রেন্স ক্লাসের ছেলেদেরও শক্ত শক্ত অঙ্ক কষিয়া দিত। এখন মনে পড়িতেছে না, বাল্যবন্ধু ভৈরবের শিক্ষা কতদূর অগ্রসর

হইয়াছিল। সম্ভবতঃ প্রবেশিকা পাশ করাও তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু সে যদি এমন কোন দেশে জন্মিত যেখানে বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ-রূপ দুর্ভাগ্য অধিবাসীদিগকে কাবু করে নাই, তাহা হইলে খুব সম্ভবতঃ সে একজন ভাল গণিতজ্ঞ হইতে পারিত। এইরূপ আরও কত ছাত্র ছাত্রী কেবল বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষমতা কম বলিয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

রাজপ্রতিনিধির মত।

কয়েক দিন হইল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় দেশভাষাকে শিক্ষার বাহন করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ৮।৯ মাস পূর্ব্বে এ বিষয়ে পঞ্জাবের ইংরেজী দৈনিক পঞ্জাবীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে যে-সব মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, এবার প্রবাসীতে প্রধানতঃ তাহাই করিয়াছি।

গবর্ণরজেনারেল লর্ড হার্ডিং মহোদয় লাহোরের পশুচিকিৎসা কলেজের নূতন অট্টালিকার দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন :—

"এই কলেজের প্রধান শিক্ষনীয় বিষয়গুলি দেশভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং উচ্চতম শিক্ষা মাত্র ইংরেজীতে দেওয়া হয়, এই সংবাদ আমার ভাল লাগিয়াছে।"

লাহোরে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মল্লক্রীড়া।

লাহোরে সম্প্রতি প্রবাসী বাঙ্গালীদের মল্লক্রীড়া হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেক শিক্ষিত অগ্রণীও যোগ দিয়া বয়ঃকনিষ্ঠদের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছিলেন। সার্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। মোটা মানুষদের দৌড়, তিন-ঠ্যাঙ্গে দৌড়, প্রভৃতি অনেক রকম মজার দৌড় হইয়াছিল।

সর্ব্বত্র এইরূপ হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় কোথাও কোথাও আগে যাহা হইত, এখন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদে বাঙ্গালী সমিতির বার্ষিক উৎসবে নানা প্রকার মল্লক্রীড়া, লাঠিখেলা, কবিতা আবৃত্তি, মহিলাদের শিল্পকার্য্য প্রদর্শন, প্রভৃতি হইত। শুনিতে পাই, এখন আর তাহা হয় না।

মহীশূরের সাবানের ব্যবসায়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি এ, পূর্ব্বে কলিকাতার একটি সাবানের কারখানার পরিচালক ছিলেন। তিনি মহীশূর-রাজ কর্ত্তৃক ঐ রাজ্যে প্রাপ্তব্য চর্ব্বি ও তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত করা যায় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়া সুখী হইলাম যে তিনি "সান্ লাইট্" সাবানের মত সাবান প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে মহীশূর রাজ বাঙ্গালোরে একটি সাবানের কারখানা স্থাপন করিবেন।

যুদ্ধ ও আইনভঙ্গ অপরাধ।

ইংলণ্ডের জেল-সকলের সম্বন্ধে ১৯১৪-১৫ সালের একটি রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ঐ বৎসর তাহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ফৌজদারী আদালতে ৩৭৩২০ জন কম লোকের শাস্তি হয়। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে ঐ বৎসর লোকে পূর্ব্ব বৎসরের বার আনা পরিমাণ আইন-ভঙ্গ করিয়াছিল। কয়েদীর সংখ্যাও ১৩৫৮০ হইতে কমিয়া ৯১৮৮ হইয়াছিল। এই যে অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা হ্রাস ইহা পুরুষদের বেলাতেই স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল। রিপোর্টে হ্রাসের তিনটি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে :—

(১) ছোট ছোট অপরাধ করিতে অভ্যস্ত অনেক দাগী লোক সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে।

(২) মদ বিক্রী দিনের মধ্যে যত ঘণ্টা পূর্ব্বে হইতে পারিত, এখন তাহা অপেক্ষা কম সময়ের জন্য মদের দোকানগুলা খোলা থাকায়, পূর্ব্বের মত বেশী লোকে মাতাল হইয়া আইন ভঙ্গ করে না।

(৩) অনেক মজুর কারীগর যুদ্ধ করিতে চলিয়া যাওয়ায় তাহাদের স্থান পূরণের জন্য মজুর কারীগরের প্রয়োজন অনেক বেশী হইয়াছে। যুদ্ধের গোলাগুলি সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার জন্যও খুব বেশী মজুর কারীগরের প্রয়োজন হওয়ায়, লোকে অপেক্ষাকৃত সহজে বেশ মোটা মজুরীতে কাজ পাইতেছে। বেকার লোক প্রায় না থাকায় আইন ভঙ্গ করে কে?

অনেক কয়েদীকে সৈন্য করিয়া পাঠান হইয়াছে; তাহাদের অধিকাংশেরই ব্যবহার সন্তোষজনক হইয়াছে।

আমরা অনেকবার বলিয়াছি, দেশে "ভদ্রশ্রেণীর" বা অন্য লোকদের দ্বারা ডাকাতি এবং অন্যবিধ অপরাধ কমাইতে হইলে তাহাদিগকে আইন-সঙ্গত সাহসের কাজ দিলে এবং তাহাদের বেকার অবস্থা ঘুচাইয়া রোজগারের পথ খুলিয়া দিলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। ইংলণ্ডে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় আমরা ঠিকই বলিয়াছি।

ইংলণ্ডে সম্পাদকের উপার্জ্জন।

ইংলণ্ডে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক কাগজের সম্পাদকেরা কিরূপ বেতন পান, বা উপার্জ্জন করেন, জানি না। তবে পূর্ব্বে একখানি ত্রৈমাসিকের সম্পাদক কিরূপ বেতন পাইতেন, তাহা সম্প্রতি আমাদের চোখে পড়িয়াছে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্কটের দৌহিত্র লক্‌হার্ট ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কোয়ার্টার্লী রিভিউ নামক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পত্রখানি এখনও যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। লক্‌হার্ট বার্ষিক ১০০০ পাউণ্ড বা ১৫০০০, টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তদ্ভিন্ন, তিনি কোন প্রবন্ধ লিখিলে তাহার জন্য স্বতন্ত্র দক্ষিণা পাইতেন।

আমাদের দেশে অ-সম্পাদকেরা ও হিংসুটে সম্পাদকেরা কোন কোন সম্পাদকের অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিয়া ম্রিয়মাণ হন বটে; কিন্তু বিলাতী ত্রৈমাসিকের চারিটি সংখ্যা বৎসরে বাহির করিবার জন্য ৯০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ সম্পাদককে যে বেতন দেওয়া হইত, আমাদের দেশে কোন দৈনিক কাগজেরই দেশী সম্পাদক বর্ত্তমানেও তাহার এক-তৃতীয়াংশ বেতন পান না; মাসিকপত্র-সম্পাদকের ত কথাই নাই।

ডাকাতী ও অস্ত্র আইন।

দেশী খবরের কাগজে অনেকবার লেখা হইয়াছে যে সশস্ত্র ডাকাতী নিবারণ করিতে হইলে অস্ত্র আইন পরিবর্ত্তিত বা রদ করিয়া লোকদের অস্ত্র পাইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। তাহার উত্তরে পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল তাঁহার গত বৎসরের রিপোর্টে বলিতেছেন যে দেশের লোকেরা এমন কাপুরুষ ও অসাড় বা উদাসীন যে তাহাদের অস্ত্র থাকিলেও তাহারা ব্যবহার করে কচিৎ। তিনি বলেন যে কয়েকটি ডাকাতীর তদন্তে এইরূপ জানা গিয়াছে, যে, যে বাড়ীতে ডাকাতী হইতেছে, তাহার খুব নিকটেই অস্ত্র ছিল, কিন্তু কেহ ব্যবহার করে নাই। "ধরাইল (Dharail) ডাকাতীতে একটি বন্দুকের মালিক তাহা লইয়া বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে পলাইয়া যায়। সে যে টোটাগুলি ফেলিয়া যায় ডাকাতরা তাহা আত্মসাৎ করে।"

পুলিসের কর্ত্তা আমাদিগকে কাপুরুষ বলিতেছেন, এবং বলিতেছেন যে আমাদিগকে অস্ত্র দিয়া লাভ কি? চোর তাড়াইতে ত আমরা পারিবই না, অধিকন্তু চোরেরা আমাদের অস্ত্রগুলি লইয়া পলাইবে। কিন্তু তিনি যেমন তাঁহার কথার সমর্থনের জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, তেমনি তাহার বিপরীত দৃষ্টান্তও ত আছে; সশস্ত্র ও নিরস্ত্র পুরুষেরা, স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত, ডাকাতদের সঙ্গে লড়িয়াছে, ডাকাত তাড়াইয়াছে, এরূপ ত গত কয়েক মাসের মধ্যেই কয়েক স্থলে ঘটিয়াছে। অস্ত্রহীন লোকে ডাকাতদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া হত ও আহত হইয়াছে, ইহাও ত ঘটিয়াছে। অস্ত্র আইনের খুব কড়াক্কড় সত্ত্বেও এখনও দেশে বাঘ শিকার করিবার লোক রহিয়াছে। অথচ পুলিসের কর্ত্তা মহাশয় দেশের সব লোককে কাপুরুষ বলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অনুচররা ডাকাত ধরিবার ও তাড়াইবার জন্য বেতন পান; কিন্তু তাঁহারা এ কাজে বেশী সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি উল্টা রাগিয়া বলিতেছেন, "তোমরা কাপুরুষ, ডাকাতদের গুলি কর না কেন?" কথাটাতে রস আছে।

যে লোকটি নিজের বন্দুক লইয়া, টোটাগুলি ফেলিয়া, পলাইয়াছিল, সে কি অবস্থায় পলাইয়াছিল জানি না। কিন্তু সংখ্যায় অধিক সশস্ত্র ডাকাত দেখিয়া পলাইয়া থাকিলে, সে, বৃহত্তর সৈন্যদলের সম্মুখ হইতে ক্ষুদ্রতর যে-সব সৈন্যদল হটিয়া যায় এবং কখন কখন বন্দুক কামান গোলাগুলি ফেলিয়া যায়, তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট আচরণ করে নাই।

দেশের লোকদের উদাসীনতা ও অসাড়তা থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার জন্য অন্ততঃ আংশিক ভাবে দায়ী গবর্ণমেণ্ট। দেশের সমুদয় দায়িত্বপূর্ণ কাজ সরকারের

লোকের হাতে, প্রজারা কেবল শাসিত হয়, স্বায়ত্তশাসন কথার কথা মাত্র, কার্য্যতঃ কিছুই তাহাদের স্বায়ত্ত নহে। এ অবস্থায় চোর ডাকাত তাড়ান, ধরা, মারা, এসবও যদি তাহারা কেবলমাত্র সরকারের লোকেরই কাজ মনে করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। অর্থ পাইবেন সরকারের লোকেরা, ক্ষমতা থাকিবে সব তাঁহাদের হাতে; কিন্তু বিপদ্‌পূর্ণ সরকারী কর্ত্তব্যটি যদি বেসরকারী লোকেরা না করে, তাহা হইলে তাহারা হইবে কাপুরুষ, অসাড়, উদাসীন। যাহা হউক, কথা কাটাকাটি করিয়া কেহ কখন কাপুরুষতার অখ্যাতি দূর করিতে পারে নাই। সুতরাং সে চেষ্টা করিব না। বাস্তবিকও আমরা মনুষ্যত্বে হীন; নতুবা আমাদেরই প্রদত্ত অর্থে পুষ্ট কর্ম্মচারীর গালি খাইতে হইবে কেন? বৈধ উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেশের সমস্ত কার্য্যভার নিজ হস্তে লইতে পারিলে এ দুর্দ্দশা ঘুচিবে, তর্কের দ্বারা ঘুচিবে না।

আমাদের কাপুরুষতা না হয় মানিয়া লইতেছি, কিন্তু আমাদের দু একটা প্রশ্নের উত্তর ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার কথা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে বাঙ্গালীদিগকে যে অস্ত্র দেওয়া হয় না তাহা এই সন্দেহে নহে যে তাহারা রাজদ্রোহ করিতে পারে, কারণ তাহারা কাপুরুষ, ভীরু, অস্ত্রব্যবহারে অসমর্থ; কিন্তু এইজন্য অস্ত্র দেওয়া হয় না যে তাহাদিগকে অস্ত্র দিয়া লাভ নাই, বরং এই অনিষ্ট হইবে যে ডাকাতরা অস্ত্রগুলি কাড়িয়া লইয়া গিয়া, দেশবাসীর উপর আরও অত্যাচার করিবে। এই অনুমান যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, গত শতাব্দীতে যখন অস্ত্র আইন জারী হয়, তখন বাঙ্গালীদের কাছে যত অস্ত্র ছিল, তাহার অধিকাংশ তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছিল কেন? তখন ত তাহাদের নিকট হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইবার জন্য রাজনৈতিক ডাকাত ছিল না; এবং তখনও বাঙ্গালী ভীরু ছিল, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে রাজদ্রোহ করিতে সমর্থ বা অভিলাষী বলিয়া নিশ্চয়ই সন্দেহ করেন নাই। তাহা হইলে কি কারণে এই ভীরু কাপুরুষদের উপর গত শতাব্দী হইতে অস্ত্র আইন জারী হইয়াছে, তাহা হিউজ্-বুলার সাহেব বলিয়া দিলে বাধিত হইব। আর তখন যদি বাঙ্গালী কতকটা সাহসী ছিল বলিয়া সন্দেহভাজন ছিল, তাহা হইলে এখন এত ভীরু কেমন করিয়া হইল তাহাও জানাইলে বাধিত হইব।

আর একটি প্রশ্ন আছে।

রিপোর্টের ৩৫ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালী হিন্দু পুলিস কর্ম্মচারীদের প্রশংসা আছে; "the conduct of these men has been exemplary. Some have given their lives for the British Government, while many have suffered bitter social persecution;" "এই লোকগুলির আচরণ আদর্শস্থানীয়। কেহ কেহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য প্রাণ দিয়াছে, এবং অনেকে দারুণ সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে।" বাঙ্গালী পুলিস কর্ম্মচারীদের সাহস বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। আমাদের প্রশ্ন, এই যে সাহস, তাহা কোথা হইতে আসিল? এই পুলিস কর্ম্মচারীরা কাপুরুষ অসাড় বাঙ্গালী জাতিরই ত লোক। আমাদের উত্তর এই, যে, সাহসী ও ভীরু লোক সব জাতিতেই আছে; সুযোগ, শিক্ষা, উৎসাহ প্রাপ্তি অনুসারে মানুষ সাহসী হয়, তদভাবে, বা তাহার বিপরীত অবস্থায় ভীরু হয়। শত বৎসর পূর্ব্বে বেলজিয়ানরা ভীরু বলিয়া "Belgian Valour" একটা বিদ্রূপের বিষয় ছিল। এখন তাহারা কেমন সাহস দেখাইতেছে! স্বাধীনতা, শিক্ষা, সুযোগ, উৎসাহ পাইয়া তাহারা এরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালী পুলিস কর্ম্মচারীরাও সুযোগ, শিক্ষা ও উৎসাহ পাওয়ায় সাহস দেখায়। পক্ষান্তরে অন্য বাঙ্গালীর বলিষ্ঠ দেহ দেখিলে, কুস্তীর আখড়া দেখিলে অমনি পুলিসের খাতায় আঁচড় পড়ে। আমরা জানিতে চাই, এইরূপ বাঙ্গালীদের সাহসে উৎসাহ গবর্ণমেণ্ট কখন্, কবে, কি প্রকারে, কত বার দিয়াছেন? শত শত বাঙ্গালী যুবক যে যুদ্ধে যাইতে চাহিয়াছিল, কেন তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া হইল না? দুর্বুদ্ধি বশতঃ তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ভীরুতা বা রাজদ্রোহ করিলে, লক্ষ লক্ষ দেশী সিপাহীর মধ্যে মারা পড়িত মাত্র; আর কাহারও কোন ক্ষতি হইত না। রাষ্ট্রীয়অধিকারশূন্য জাতিকে ভীরু বলা সহজ, তাহাতে কোন বাহাদুরী নাই; কিন্তু বাহাদুরী আছে যাহাকে ভীরু মনে কর, তাহাকেও সাহসী করিয়া তোলায়। এই মহৎ প্রয়াস গবর্ণমেণ্ট

করুন। সাহসীর মধ্যে সাহসীতম বলিয়া অভিহিত মার্শ্যাল নে, মহাবীর গর্ডন, নিজ নিজ ভীরুতার উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তথাপি তাঁহারা বীর হইয়াছিলেন কি প্রকারে ?

যাহা হউক আমরা বাঙ্গালী পুলিশ কর্ম্মচারীদের সাহসের যে কারণ বলিয়াছি, তাহা বোধ হয় হিউজ্-বুলার সাহেব ঠিক্ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। কারণ তিনি বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের প্রশংসার ঠিক্ নীচেই, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, লিখিয়াছেন, "I would like to add a word of acknowledgment to the British officers whose pluck and devotion to duty has been such a good example to these men." "যে-সকল ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর সাহস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এই লোকগুলিকে [অর্থাৎ বাঙ্গালী পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে] এমন সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, সংক্ষেপে তাহাদের গুণের কথা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি।" যে ভাবে ও যেস্থলে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, পুলিসের ইন্স্পেক্টর-জেনারেল মহাশয়ের মতে বাঙ্গালীরা ইংরেজদের সাহস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়াই সাহসী হইয়াছে ; তাহারা নিজে নিজেই সাহসী হইয়াছে, এরূপ প্রশংসা তাহারা পায়, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাই তাড়াতাড়ি ইংরেজ কর্ম্মচারীদের প্রশংসা অস্থানে জুড়িয়া দিয়াছেন। ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ পুলিশ কর্ম্মচারীরা যে সাহসী তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বিপ্লবপ্রয়াসীদের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে বা তাহাদিগকে ধৃত করিতে গিয়া বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরাই "ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের জন্য প্রাণ দিয়াছে," ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সেরূপে প্রাণ দিবার উপলক্ষ ঘটে নাই। এইজন্য মনে এই প্রশ্ন উঠিতেছে যে যাহারা প্রাণ দেয় নাই, তাহারা কিরূপে সেই-সব লোকের আদর্শস্বরূপ হইল যাহারা প্রাণ দিয়াছে। ব্রিটিশ কর্ম্মচারীরা প্রাণ দিতে পরাঙ্মুখ বা পশ্চাৎপদ নহে ; তাহারা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলালের মত মহৎ উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া চলে না। কিন্তু অপরকে প্রাণ দেওয়া শিখাইতে হইলে অন্ততঃ ২।৪ জনকেও নিজেদের প্রাণ দিতে হয়। সেরূপ অবস্থা এখন তাহাদের হয় নাই, তখন ইহা মনে করা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না যে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের সাহস কোন স্বাভাবিক গুণেরই বিকাশ মাত্র, দৃষ্টান্তের ফল নয় ; এবং এই স্বাভাবিক গুণের বীজ অধম বাঙ্গালী জাতিরও প্রাণে আছে।

যাহা হউক, বাঙ্গালী কাপুরুষ হউক বা না হউক, দেশের লোকের প্রাণ ও ধন রক্ষা করা যখন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, এবং, যে দেশ অরাজক ছিল এবং যথায় ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না তথায় শান্তি, শৃঙ্খলা ও ধন প্রাণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন দাবী করেন, তখন অস্ত্রহীন বা অস্ত্র থাকিলেও অস্ত্র ব্যবহারে অসমর্থ প্রজাপুঞ্জকে অভয় দিবার জন্য রাজপুরুষেরা সমুচিত ব্যবস্থা করুন। আমরা দেশের লোককে অস্ত্র দিতে বলিয়াছি, তাহা রাজকর্ম্মচারীদের অভিপ্রায় নয়। সুতরাং যাহা কিছু করিবার তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে বোধ হয় ; দেশের লোক বিনা অস্ত্রে ডাকাতী দমন করিতে পারিবে না, যদি ও ধনেপ্রাণে তাহারাই মরিতেছে। ষ্টেট্স্‌ম্যান্ কাগজ লিখিয়াছে বটে যে নিরস্ত্র বাঙ্গালীরা যদি সশস্ত্র ডাকাতদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের সঙ্গে লড়িতে পারে, তবেই তাহাদের ভীরুতার অখ্যাতি দূর হইবে। সাহস দেখাইবার ইহাই যদি একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা হয়, তাহা হইলে আমেরিকা, জাপান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, রুশিয়া, সর্ব্বত্র গোলাগুলি শেল্ বারুদ কামান রাইফল্ নির্ম্মাণ করিবার শত শত কারখানা দিনরাত চলিতেছে কেন ? বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করিয়া সকলে সাহস দেখাইলেই ত চলে ? ষ্টেট্স্‌ম্যান নিজে আগে দৃষ্টান্ত দেখাইলে ভাল হয়।

স্বদেশী ঘড়ী।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোঙ্কণ প্রদেশে মাল্‌ওান নামক স্থানে শিবরাম দাদাবা মিস্ত্রী নামে একজন সূত্রধর বহু অর্থব্যয় ও অবিরত পরীক্ষার পর একটি ঘড়ীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। শিবরাম বিদেশে যান নাই, কোন পাশ্চাত্য কারিগরা শিক্ষা পান নাই। তিনি নিজেই ঘড়ীর প্রায় সমস্ত অংশ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং নির্ম্মাণ করিবার সমুদয় যন্ত্রও প্রস্তুত করিয়াছেন। কেবল স্প্রিং প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আপাততঃ কোন মূলধনী যদি তাঁহাকে সুইট্জারল্যাণ্ড হইতে স্প্রিং আমদানী করিবার টাকা দেন, এবং ঐ দেশ হইতে কাহাকেও স্প্রিং নির্ম্মাণ শিখাইয়া আনেন, তাহা হইলে দেশে একটি স্থায়ী কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। স্প্রিঙ্গের কারবার খুব লাভজনক। ২০ টাকার ভাল ইস্পাতে ২০০০ টাকার স্প্রিং হইতে পারে। শিবরাম ১৫।২০ টাকার যেসব ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, সেগুলি দেখিতে সুন্দর, এবং বেশ কাজ দেয়। এই ঘড়িগুলি পকেট ঘড়ী নয়, বাজা ঘড়ী বা ক্লক।

বিলাতে ও ভারতে রাজকর্ম্মচারীদের বেতন।

বিলাতের বিখ্যাত এডিনবরা রিভিউ ত্রৈমাসিক এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন যে তথায় প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদের বেতন বড় বেশী, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী এবং আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্র অপেক্ষাও বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হইয়াছে যে বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর পদ সর্ব্বোচ্চ, তিনি বার্ষিক পঁচাত্তর হাজার টাকা বেতন পান। কিন্তু ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনারেল বৎসরে আড়াই লক্ষ আটশত ; বোম্বাই,

মান্দ্রাজ ও বাংলার গবর্ণর প্রত্যেকে একলক্ষ কুড়ি হাজার; এবং যুক্তপ্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা, পঞ্জাব, ও ব্রহ্মদেশের ছোটলাটেরা প্রত্যেকে একলক্ষ; এবং গবর্ণর জেনারেলের মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সভ্য আশী হাজার করিয়া বেতন পান। ইঁহারা সকলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা নিম্নপদস্থ, কিন্তু বেতন পান অনেক বেশী। বিলাতের অন্যান্য মন্ত্রীরা প্রত্যেকে গড়ে বার্ষিক চল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকা পান। ভারতবর্ষের বড়লাট, লাট, ছোটলাট, এবং বড়লাটের মন্ত্রীরা ত ইহার চেয়ে বেশী পানই, চীফ কমিশনারেরা এবং রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বরেরাও বেশী পান। আসাম এবং মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনারেরা প্রত্যেকে বৎসরে বাষট্টি হাজার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনার চুয়ান্ন হাজার, অজামের মেরবারা, কূর্গ ও বালুচীস্থানের চীফ কমিশনারেরা প্রত্যেকে আটচল্লিশ হাজার, এবং রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বরেরা প্রত্যেকে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী ও আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্র পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ধনী দেশ। পক্ষান্তরে সভ্যজাতি-সকলের মধ্যে ভারতবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা গরীব। এই দরিদ্রতম জাতির রাজকর্ম্মচারীরা পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম হারে বেতন পাইয়া থাকেন। এত বেতন যে আমরা দিতে পারি না, তাহার একটি প্রমাণ এই যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট টাকা খরচ করিতে পারেন না। কিন্তু বেতন কমাইয়া দেশের মঙ্গলকর অত্যাবশ্যক কার্য্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় করাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। সুতরাং, কাজে যাহাই হউক, অন্ততঃ মুখে এই দাবীটা করি, যে, যেহেতু আমাদের দেশের রাজকর্ম্মচারীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বেতন পান, অতএব পৃথিবীর সকল জাতির চেয়ে তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে চোরডাকাতদের উপদ্রব হইতে নির্ভয়, সুস্থ সবল সাহসী, সুশিক্ষিত, শিল্পবাণিজ্যে অগ্রসর এবং ধনশালী করুন। তাহা হইলেই এই ইংরেজী প্রবচন সার্থক হইবে যে, শ্রমী তাহার পারিশ্রমিক পাইবার যোগ্য।

সাধু ভাষা ও কথিত ভাষা।

আমরা কথাবার্ত্তায় যেরূপ ভাষা ব্যবহার করি, সাহিত্যের ভাষাও তদ্রূপ হওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কোন দেশেরই সাহিত্যিক ভাষা বোধ হয় ঠিক্ কথাবার্ত্তার ভাষার মত নয়। কিন্তু বাস্তব জীবনের সহিত সাহিত্যের যোগ ও সাদৃশ্য রক্ষা করিতে হইলে লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে বেশী প্রভেদ রাখাও চলে না। বাংলায় এই পার্থক্য বড় বেশী। ইহা কমান দরকার। কিন্তু কথিত ভাষা কতকটা চালাইতে গেলেই কথা উঠে, "বাংলা দেশের সর্ব্বত্র কথিত ভাষা ত এক নয়; সুতরাং কোন্ জায়গার কথিত ভাষা চালান যাইবে?" ইহার সোজা উত্তর এই যে লেখক নিজে যে ভাষায় কথা বলেন তিনি তাহাই ব্যবহার করিবেন; কারণ তাহাই তাঁহার পক্ষে সকলের চেয়ে সোজা ও স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাতে এই আপত্তি হইবে যে লেখক যদি কলিকাতার লোক হন, তাহা হইলে তাঁহার কথিত ভাষা বাঁকুড়া মানভূম, রংপুর বগুড়া, কিম্বা শ্রীহট্ট চট্টগ্রামের লোকেরা বুঝিবে না। অতএব তাঁহার পক্ষে নিজের কথিতভাষা ব্যবহার করা "জবরদস্তী" হইবে। কিন্তু ইহাতে জবরদস্তী কোথায়? আমি যাহা লিখিব, তাহা পড়িয়া তুমি যদি আনন্দ পাও, উপকার পাও, তাহা হইলে পড়িও; নতুবা পড়িও না। সাধুভাষায় লিখিত বহিও ত বিনা আয়াসে বুঝা যায় না; অভিধান দেখিতে হয়। কথিত ভাষা বুঝিবার জন্যও লোকে সেইরূপ কষ্টস্বীকার করিবে, তাহার অভিধান প্রস্তুত করিবে, যদি তাহাতে লিখিত জিনিষ শ্রেষ্ঠ মূল্যবান্ সাহিত্য হয়। প্রত্যুত্তরে "সাধুভাষার" পক্ষপাতী বলিবেন, "এত হাঙ্গাম করিয়া লাভ কি বাপু? সাধুভাষাতেই লেখ না কেন?" তাহার উত্তর বোধ হয় এই, "আনন্দে সাহিত্যের জন্ম। যে ভাষা ব্যবহারে আমার প্রাণটা সকলের চেয়ে বেশী খোলে, যাহাতে সকলের চেয়ে ভাল করিয়া কথার স্রোত চলে, ও কলম সরে, আমি তাহাই ব্যবহার করিব।"

বাঁকুড়াবাসী প্রবাসী-সম্পাদকের বাঁকুড়ার ভাষা চালাইবার মত সাহিত্যিক প্রতিভা ও শক্তি নাই, কলিকাতার বা অন্য কোন জায়গার ভাষা জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক নকল করিবারও প্রবৃত্তি নাই; অজ্ঞাতসারে যাহা অনুকৃত হয়, তাহার উপর হাত নাই। কিন্তু কথিত ভাষা ব্যবহার করি বা না করি, উহার যে উপযোগিতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আটপৌরে ধুতিচাদরেও বিদ্যাসাগরের মূল্য কমিত না; খুব সম্মান হইত; কিন্তু ভুও বড়মানুষদের পোষাকের ভড়ং না হইলে চলে না। তেমনি যাহার বলিবার কিছু আছে, তাহার লেখা কথিত ভাষাতেও আদর পায়; কিন্তু যাহার বলিবার জিনিষটা মূল্যহীন, তাহাকে ভাষার আড়ম্বরের আশ্রয় লইতে হয়। অবশ্য সাধু ভাষাতেও খুব সারবান্ আনন্দপ্রদ সাহিত্য রচিত হইয়াছে ও হইবে। কথিত ভাষায় ভাব ও চিন্তার দৈন্য লুকান কঠিন, সাধুভাষায় তত কঠিন নয়, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের বড় ছবিখানি বাঁকুড়া সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ফোটোগ্রাফ হইতে। অপর দুটির নেগেটিভ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সেবক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেব দিয়াছেন।

মায়ামৃগ-বধ।
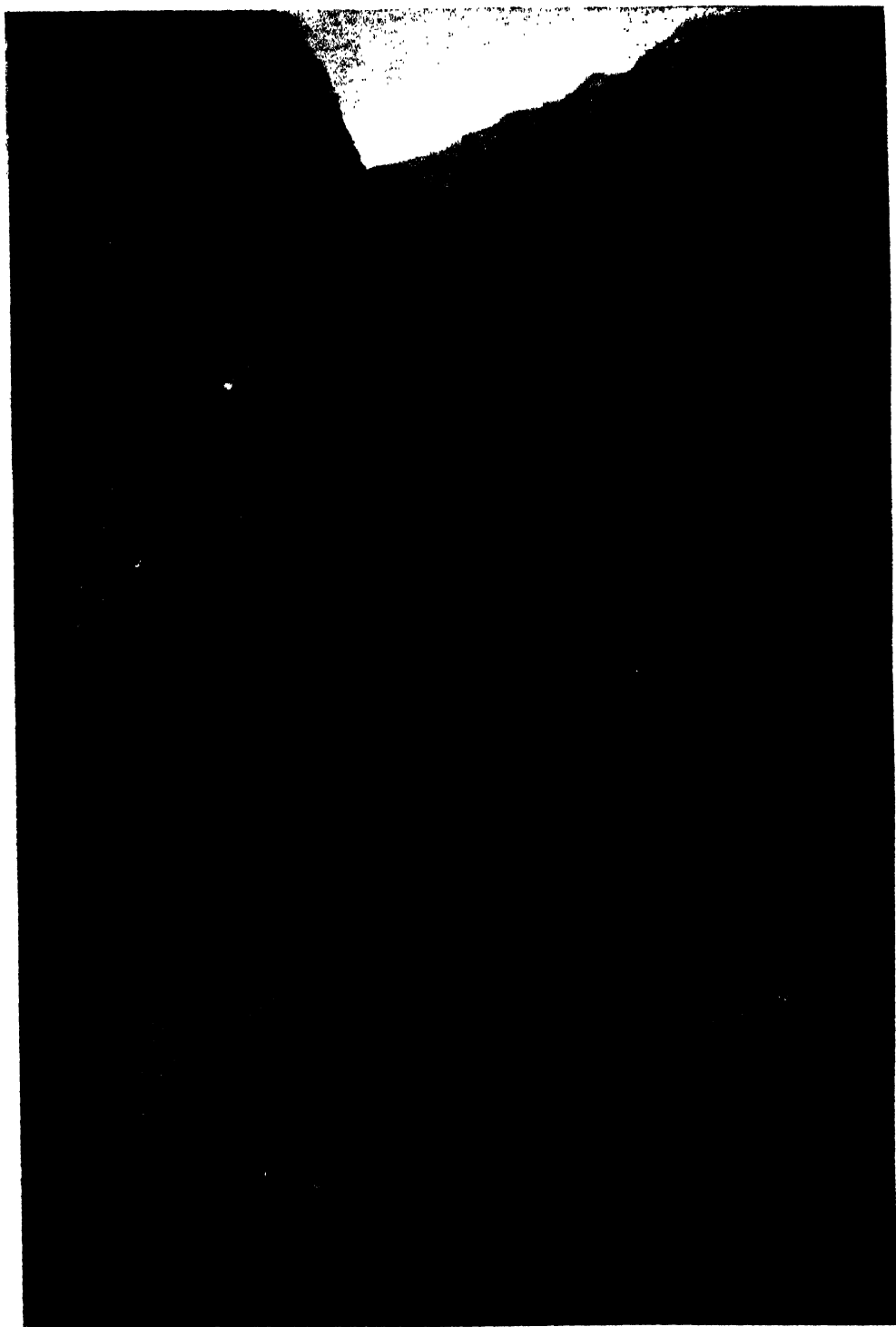
(চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ উকীল মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে

ঝড়ের খেয়া

দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জ্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল!
বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্চ্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন,—
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্র-তীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,—
ডাকিছে কাণ্ডারী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবেনা।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,—
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি,—
"তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।"
তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারিদিক হতে ওই দাঁড় হাতে ছুটে আসে দাঁড়ি!

"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর?"
একথা শুধায় সবে
ভীত আর্ত্তরবে
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো,—জানে না ত কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ,—
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী,—
"নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।"
বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জ্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;
"যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রিদল,"
উঠেছে আদেশ,
"বন্দরের কাল হল শেষ।"

মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় ত নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি'
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;—
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।
অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ,—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসা হলাহল,

সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
উর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দ্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত !
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি ?—মাথা কর নত !
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ !
রাখ নিন্দাবাণী, রাখ আপন সাধুত্ব-অভিমান,
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে !

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে ;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে ;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তা'রা সরে যায়
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখ তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ !
তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বল অকম্পিত বুকে,—
"তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ !
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক !"

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে' যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহঙ্কার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘর-ছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত ?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবেনা
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবেনা দিন ?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্যসীমা
তখন দিবেনা দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বের ব্যায়াম-সভায় ভারতবাসীর স্থান

কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত এস বি দত্তরের "দৌড়" আমাদের অত্যন্ত আনন্দ ও শ্লাঘার বিষয়। দত্তরের দৌড় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৌড় না হইলেও, আমাদের দেশের, এমন কি এসিয়ার, শ্রেষ্ঠ দৌড় একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৌড়ের record বা স্মরণীয় দৃষ্টান্ত মাত্র তিনজন রাখিয়াছেন ;—১৯০৮ সালে

কার্পেন্টিয়ার। প্যাট কনোলী।

লণ্ডনে যে Olympic Games হয়, তাহাতে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের মিঃ জে জে হেইস্ (J. J. Hayes) ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ, ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ১৮$\frac{২}{৫}$ সেকেণ্ডে দৌড়ান ; গত ১৯১২ সালে (Stockholm) ষ্টকহল্মের (Olympic Games) ওলিম্পিক খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার মিঃ কে কে ম্যাক্ আর্থার (Mac Arthur) ও মিষ্টার উইলিয়াম গিট্শ্যাম (Gitsham) ২৫ মাইল, ২ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট ৫৪-৮ সেকেণ্ডে ও ২ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ৫২ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া হেইসের (record break) কৃতিত্ব খর্ব্ব করেন। মাত্র উপরোক্ত

ডাক্তার রোলার। হেকেনস্মিট।

কয়জন দত্তরের উপর। কিন্তু ২৭ মাইল দৌড়ানর উদ্যম পৃথিবীতে এই প্রথম। শ্রীযুক্ত দত্তর প্রথম চেষ্টাতেই আমাদের দেশের (record) দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন ; আশা করা যায় তিনি শীঘ্রই (World's Marathon record) জগতের ম্যারাথন দৌড়ের দৃষ্টান্ত হইয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতবাসী ব্যায়াম-চর্চ্চায় কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, অধীন জাতি বলিয়া আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পালোয়ান ও খেলোয়াড়দিগের মধ্যে গণ্য হই না।

এই প্রবন্ধে আমি ভারতবাসীর ব্যায়াম-পটুতা ও কৃতিত্বের কথাই বলিতেছি। আমরা যে কেন অন্যান্য জাতির মত এবিষয়ে বিশ্বসভায় স্থান পাইব না বা পাই না তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। অধুনা আমাদের কৃতিত্ব স্বীকার বা অস্বীকার করা সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয়দিগের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা নিজেদের খুব বড়

(মাথায়) আহামদ বয় আরমণ্ড কার্পিলোডের সহিত লড়িবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। (নীচে) দেবী চৌধুরী পাথরের নাল তুলিতেছেন।

Sportsman বা খেলোয়াড় বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, কিন্তু "কালা আদমীকে" নিজেদের মধ্যে স্থান দিতে একান্ত অসম্মত। তাহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ইউরোপীয়দিগের নিগ্রো জ্যাক্ জন্সনের সহিত অন্যায় ব্যবহার। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (Tommy Burns ও Jim Jefferies) টমী বার্নস ও জিম জেফ্রিসকে পরাভূত করিয়া জনসন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টি-যোদ্ধা (boxer.) বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে (Georges Carpentier) জর্জ্জেস্ কারপেন্টিয়ার ১৭ বৎসর বয়সে ফ্রান্সের ও ক্রমে সমগ্র ইউরোপের (Welter-weight Boxing Championship) মুষ্টিযুদ্ধের ওস্তাদ পদবী পাওয়ায় (French Boxing Association) ফরাসী মুষ্টিযুদ্ধ-সমিতি কার্পেন্টিয়ারকে (White Heavy-weight Champion of the World) জগতের ওজনে ভারী শ্বেতকায় ওস্তাদ আখ্যা দিয়া জনসনের (Championship ওস্তাদ-পদবী অস্বীকার করে। ফলতঃ ইউরোপীয়দিগের চক্ষে কার্পেন্টিয়ার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হয়। ইহা ইউরোপীয়দিগের অন্যায় পক্ষপাতের চরম উদাহরণ।

(Olympic Games) ওলিম্পিক খেলাতেও আমাদের স্থান পাওয়া দুষ্কর। এই বৎসর বার্লিনে উক্ত সার্ব্বভৌম খেলা হইবার কথা ছিল; তাহাতে নিজের দেশের লোক পাঠাইবার জন্য ইংলণ্ড Olympic Games Fund নামে এক ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতে সার রতনটাটা প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতবাসীও চাঁদা দান করেন। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরা ইংরেজাধিকৃত স্থানসমূহ হইতে লোক লইয়া ইংলণ্ডের তরফ হইতে পাঠাইতে মনস্থ করায় অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ক্যানাডা বৃটেনকে সাহায্য করিবার যোগ্য বিবেচিত হয়; কেহ কেহ ভারতবর্ষ হইতে লোক লইবার কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেকথা অচিরে চাপা পড়ে। বিলাতের Health & Strength এবং Sporting Life পত্রিকার অফিস হইতে খবর লইয়া জানিয়াছিলাম যে ভারতবর্ষীয় কোন খেলোয়াড় লওয়া হইবে কিনা সন্দেহ : তাঁহারা আমার চিঠি, "ছাপা হইবে না" বলিয়া ফেরত দেন।

উপস্থিত আমরা ব্যায়ামচর্চ্চার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভারতবাসীর কৃতিত্বের কথা একে একে আলোচনা করিব।

জিম্‌নাষ্টিক—শুনা যায়, এথেন্সে যে বৎসর (Olypmpic Games) ওলিম্পিক খেলা হয়, (বোধ হয়, ১৮৯২ বা ৯৩ সাল) তাহাতে হিপোড্রোম সার্কাসের স্বত্বাধি

মরিস ডিরিয়াজ। আহামদ বক্স। জিমি ইসন।

কারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বসাক Individual gymnastics) ব্যক্তিগত কসরতে প্রথমস্থান অধিকার করেন। একথা লোকমুখে শুনামাত্র, কেহ এবিষয়ের সত্যতা জ্ঞাপন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

মুষ্টিযুদ্ধ বা বক্সিং—অনেক ভারতবাসীর ভাল মুষ্টিযোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি আছে। গোবরডাঙ্গার সেজ বাবু শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং শুনা যায় কলিকাতার সুবিখ্যাত মিষ্টার পি মিত্র তাঁহাদিগের অন্যতম। সম্প্রতি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যারিষ্টার মিষ্টার পি এল রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমোদলাল রায় দুই বৎসর উপর্য্যুপরি (Inter-University Welter-Weight Boxing Championship) সর্ব্ববিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান জিতিয়া মূল্যবান পুরস্কার ও College full blue পাইয়াছেন। এবৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক খেলা বন্ধ, তাহা না হইলে, আমরা প্রমোদলালের কৃতিত্বের কথা আরও শুনিতে পাইতাম। বিলাতের "Boxing" নামক কাগজ প্রমোদলালকে গুর্খা বলিয়া বক্সিং-জগতে পরিচিত করিয়াছিলেন, অবশ্য পরে তাঁহারা ভুল স্বীকার করেন। ইংলণ্ডের বড় বড় ওস্তাদগণ প্রমোদলালকে কার্পেণ্টিয়ারের তুল্য গুণসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করেন।—Mr. Roy has the rare fighting-qualities like Carpentier, in his time he promises to be a world-famous boxer ইহাতে দেখা যাইতেছে মুষ্টিযুদ্ধ ইউরোপীয়ের ঘরের জিনিষ হইলেও একেবারে নিজস্ব বা অনন্য নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা নিরূপণের জন্য বৃহৎ সভা হইয়াছিল। মহারাজা প্রদ্যোতকুমার, তাজহাট্ প্রভৃতির দত্ত পুরস্কার থাকা সত্ত্বেও কোন ভারতবাসী তাহাতে যোগ দিতে পায় নাই। প্রত্যেক বৎসর ভারতবর্ষে মুষ্টিযুদ্ধের সম্মিলন হইতেছে, কিন্তু তাহাতে স্থান পায় ইংরেজ, আর সেই ইংরেজ খেলোয়াড়দের মধ্যে বিজেতার নাম হয় "সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ" (All-India Champion); যেন
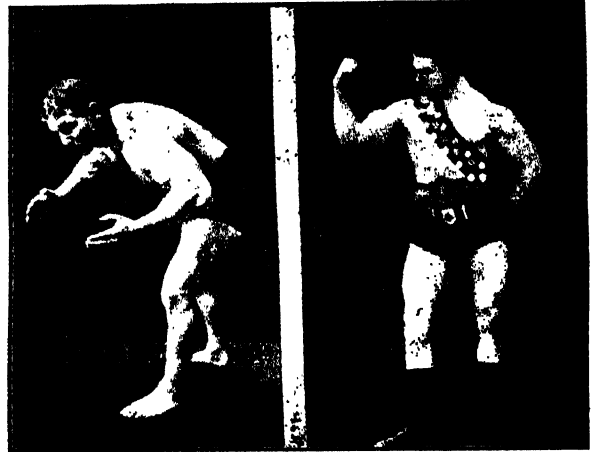
জন লেম। হেকেনস্মিট।

সে এই দেশের সকল জাতিরই খেলোয়াড়দিগকে হারাইয়া সর্ব্বজয়ী বীর হইয়াছে!

দ্বিচক্রযানে দূরগমন (Long distance cycling)—১৯১১ সালে তিনজন পার্শী পেশোয়ার হইতে বম্বে পর্য্যন্ত প্রায় ১২০০ মাইল সাধারণ সাইকেল সাহায্যে দৌড়িয়াছিলেন, কিন্তু ইহা শ্রেষ্ঠ দূরগমন বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে কলিকাতা হইতে বম্বে পর্য্যন্ত (motor bike race) মোটর-বাইকের

Sporting Life আপিসে কুস্তির সত্ত স্বাক্ষর। কাপিলোড়। ডিলালোই।

জন্য ভারোত্তোলন করেন; তাহাতে উক্ত প্রফেসর ৯৮৫ পাউণ্ড ৯ বার তুলিয়াছিলেন ও তিনি ভারতবর্ষের প্রকৃত "চ্যাম্পিয়ন" বলিয়া স্বীকৃত হন, অবশ্য ভারতবাসীর দ্বারা। কাশীর দেবী চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি ৯৬০ পাউণ্ড ৬ বার উপর্য্যুপরি তুলিতে পারেন; তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর; বয়স হিসাবে ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার। অতএব দেখা যাইতেছে, হিম্মৎবক্স, দেবী চৌধুরী প্রভৃতি শুধু ভারতের কেন সমগ্র ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ হইবার যোগ্য। ইংলণ্ডে এইসকল বিষয়ে উৎসাহ
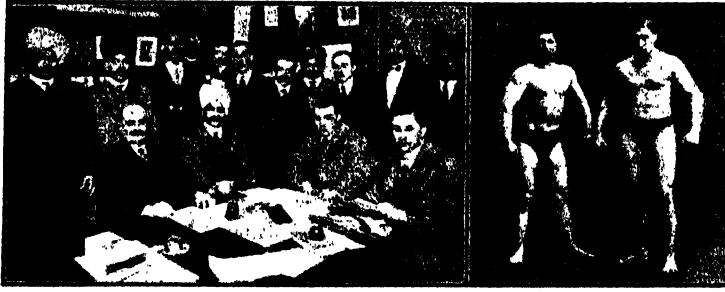
দৌড় শ্রেষ্ঠ স্থান লইয়াছে ও উক্ত তিনজন পার্শীর দৌড়ের কথা চাপা পড়িয়াছে। অথচ তৎপূর্ব্বে এদেশে সাধারণ সাইক্লের সাহায্যে কেহই অতদূর গমন করেন নাই।

ভারোত্তোলন—ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারোত্তোলন অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যায়াম বলিয়া প্রচলিত। অধুনা আমাদের দেশে অনেকে পাশ্চাত্যদেশের প্রথা মনে করিয়া এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। অবশ্য পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্য দুই ভূখণ্ডের যন্ত্র দুই প্রকার: ইউরোপ ও আমেরিকায় লৌহনির্ম্মিত "বারবেল" ব্যবহার হয়, ও আমাদের দেশে প্রস্তরনির্ম্মিত "নাল" ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ব্যায়ামের প্রণালীও দুই ভূখণ্ডে বিভিন্ন প্রকারের। ভারোত্তোলনের পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ আর্থার স্যাক্সন; তিনি এক হাতে ৩৭০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৪ মণ ২৫ সের পর্য্যন্ত তুলিতে পারেন। অষ্ট্রিয়ার কার্ল স্বোবোডা (Swoboda) ও জসেফ্ ষ্টীন্‌ব্যাক্ (Steinbach) প্রায় ৫০০ পাউণ্ড দুই হাতে তুলিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলেও স্যাক্সন সর্ব্বজেতা বীর। এদেশে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে করাচীতে (All-India weight-lifting championship) সর্ব্বভারতের সর্ব্বজেতা ভার-উত্তোলনকারী নির্ণীত হয়; তাহাতে একজন প্রাইভেট গোরা মাত্র ২৭৫ পাউণ্ড তুলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ (weight-lifter) ভার-উত্তোলনকারী বলিয়া ইংরেজ-সমাজে স্বীকৃত হয়। এলাহাবাদ-প্রদর্শনীর কিয়ৎকাল পরে প্রফেসর হিম্মৎ বক্স্ ও ডাক্তার ইস্মাৎউল্লা দক্ষিণ আওরঙ্গাবাদে সমগ্র ভারতের সর্ব্বজেতা ওস্তাদ পদবীর

গচ।

দিবার এবং বিধিবদ্ধ আলোচনা (record) করিবার সভা আছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতাও ঐ সভার উপর ন্যস্ত: সুতরাং সেখানে
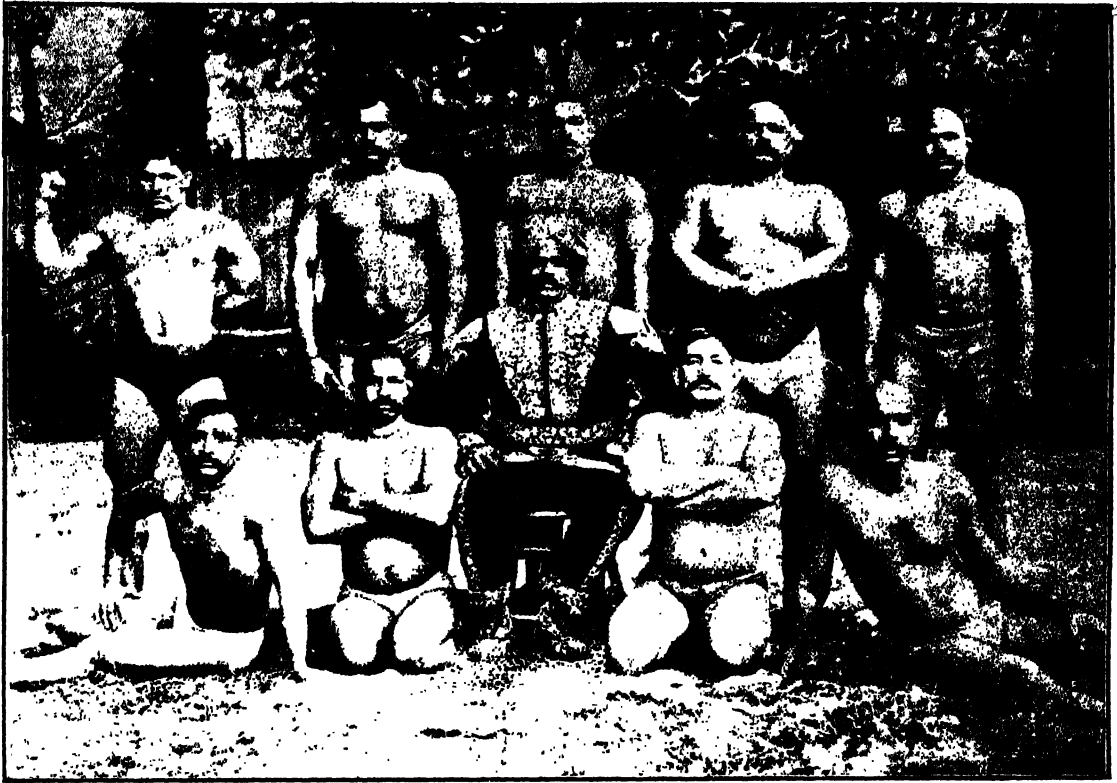
দাঁড়াইয়া—চাগা। রমজান। গোলাম মহিদিন। কালা। টীলা।
বসিয়া—মামুদ। আহামদ বক্স। রামমূর্ত্তি। মজিদ। রহিম।

মরিস ডেরিয়াজ "নিদ্রিত ব্যাকাস্" মূর্ত্তিতে চিত্রিত।

পালোয়ানদিগের পরিশ্রম সার্থক হয় এবং যে-সে নিজেকে "চ্যাম্পিয়ন" বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে পারে না। ইংলণ্ডে ঘুসিলড়ার ব্যাপার (National

Sporting Club) জাতীয় খেলোয়াড়-সঙ্ঘের হস্তে। ভারোত্তোলনের জন্য British Amateur and Professional Weight-lifting Association নামক

সমিতি আছে, কুস্তীগিরেরা Wrestlers' Union বা পালোয়ানসঙ্ঘের নিয়মাধীন। এইরূপ দৌড়ান, সাঁতার প্রভৃতিরও এক-একটা Controlling Committee বা পরিচালক সমিতি আছে, সকলেই এই-সকলের নিয়মানুসারে কাজ করিতে বাধ্য। আমাদের দেশে এক (Football Association) ফুটবলের ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নিয়ামক সঙ্ঘ নাই, উক্ত সভার প্রভাবও কেবলমাত্র কলিকাতায় আবদ্ধ; তাহা হইলেও এদেশে

পাথরের হাঁসুলি-গলায় গোবর।

ফুটবল খেলার কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। প্রত্যেক খেলার বা ব্যায়ামানুশীলনের জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত এক-একটি Controlling Body বা নিয়ামক সমিতি না থাকিলে, আমাদের অন্য সব খেলার উন্নতি অসম্ভব, ও কোন ব্যায়ামে কেহ উৎকর্ষসাধন করিলেও তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা ও প্রচার হইবে না, সুতরাং তাহা হইতে কোন সুনাম প্রত্যাশা করাও যাইতে পারে না।

কুস্তী—কুস্তী ভারতবাসীর ব্যায়ামপটুতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহা ভারতবর্ষে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে। এদেশে কুস্তী যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা বহু শতাব্দীর নিরন্তর আলোচনার ফল। আমাদের দেশের কুস্তীগির যে পৃথিবীর সেরা তাহা একাধিকবার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কুস্তীতে আমাদের আধিপত্য চিরকালের। আশা করা যাইতে পারে যে সুদূর ভবিষ্যতেও তাহা

ভীম ভবানী।

অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অনেক ইংরেজ বিশেষজ্ঞ একথা স্বীকার করিয়াছেন যে,

"Nowhere in the world has the art of wrestling received so much attention as in India......Wrestlers not to be equalled in any other country. Of no other country can it be said as of India that wrestling is the national sport, and the Indian professional wrestler has nothing to learn from the exponents of the art in Europe or America. Wrestling has been practised in India since the earliest times......"

ভারতের ন্যায় জগতের আর কোথাও কুস্তীর দিকে এত মনোযোগ দেখা যায় না। ভারতের পালোয়ানের সমকক্ষ জগতে নাই। কুস্তী ভারতের জাতীয় ব্যায়াম; ভারতের পালোয়ানদের শিখাইবার মতন য়ুরোপ-আমেরিকার পালোয়ানদের কিছু নাই। অতি পুরাকাল হইতে ভারতে কুস্তীর চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে।

কেহ কেহ যুযুৎসু পালোয়ানদিগকে ভারতীয় পালোয়ান হইতে উচ্চে স্থান দেন; সেটি একটি প্রকাণ্ড ভুল, কারণ,

"None of the tricks of Jiujitsu that might be applied in wrestling, are unknown to the Indian wrestler. There is this difference, that the latter has been taught to avoid them as being unfair. The wrestler could apply them in any emergency."

অর্থাৎ, কুস্তীতে যুযুৎসুর কোন কৌশলই ভারতীয় কুস্তীগিরিদের অবিদিত নাই। এইটুকু প্রভেদ যে কোন বিশেষ সঙ্কটে সে তাহা প্রয়োগ করিতে পারে বটে কিন্তু ভারতীয় পালোয়ান তাহা কুস্তীতে ব্যবহার অন্যায় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেই শিক্ষিত হয়।

জাপানীরা যুযুৎসুর এই-সকল কৌশল অনায়াসে প্রয়োগ করিবার জন্য শিক্ষা দেয় আর ভারতীয়েরা বিশেষ সঙ্কটাবস্থা ব্যতীত তাহার প্রয়োগ অন্যায় বলিয়া পরিত্যাগ করিতে শিক্ষিত হয়—তাহাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সম্মানার্হ প্রশংসা আর কি হইতে পারে!

বোধ হয় কেহ জানেন না যে যুযুৎসু উত্তর ভারতে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল; তাহা এই অঞ্চলে বিনোট বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে এই বিদ্যা দিন দিন লোপ পাইতেছে। রোহিলখণ্ড প্রদেশে মাত্র এক কি দুই জন "বিনোট" জীবিত আছেন। আমাদের অন্যান্য অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে ইহার পুনরুদ্ধারও একটি। আমাদের দেশের অনেক বস্তু উপযুক্ত সাধনা ও উন্নতির অভাবে লোপ পাইতেছে। যদি আমরা বিনোট ইত্যাদির চর্চ্চা গুণ্ডামির অনুশীলন মাত্র বলিয়া অবহেলা করি, তাহার লোপ অবশ্যম্ভাবী। যাহা কত বিশেষজ্ঞের নিয়ত চিন্তা ও সাধনার ফল, তাহার লোপ পাওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। পূর্ব্বে দেশীয় রাজন্য ও অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠ-পোষকতায় এই সকল কলাবিদ্যা সম্যক্ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে যাহা-কিছু-পাশ্চাত্যের তাহারই আদর করিয়া আমরা আমাদের দেশের অমূল্য রত্ন বিনাশ করিতেছি। বিনোটের শিক্ষা এই দেশেই সম্ভব, পৃথিবীর অন্য কোন দেশ আমাদের এই কলাবিদ্যার শিক্ষক হইতে পারে না। আইস্‌ল্যাণ্ডের "গ্লিমা" (glima) বা জাপানের যুযুৎসু আমাদের দেশীয় কুস্তীর শাখা মাত্র। এইসকল কলাবিদ্যা—যাহা কত শত বর্ষে সম্যক্ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, আমাদের অবহেলায় মৃতপ্রায় হইয়া আছে; যে কয়েকজন ইহাতে কৃতসাধন, তাঁহাদের মৃত্যুর সহিত ইহা নাম মাত্রে পরিগণিত হইবে।

উল্লিখিত ও অন্যান্য কলাবিদ্যার পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন, নতুবা বোধ হয় আর কুড়ি বৎসর পরে তাহার একান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তখন প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও তাহাদিগের সম্যক্ উদ্ধারসাধন হইবে না। ফুটবল সভার মত ব্যায়ামোন্নতি সমিতি স্থাপন করিলে এদেশে ব্যায়ামচর্চ্চা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। সর্ব্বপ্রকার ব্যায়ামের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমিতি স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক; তাহা হইলে ব্যায়ামানুশীলনকারীদিগের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে এবং যে-সে নিজের কথা মাত্র প্রমাণ রাখিয়া আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রচার করিতে পারিবে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গত প্যারিস্ প্রদর্শনীর সময় এলাহাবাদের মাননীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বিখ্যাত কুস্তীগীর গোলামকে প্যারিসে লইয়া গিয়াছিলেন। গোলামের পূর্ব্বে কোন ভারতীয় পালোয়ান ইউরোপে পদার্পণ করেন নাই। প্যারিস্ প্রদর্শনীতে গোলাম ও তুর্কী পালোয়ান আহমদ্ মাদ্‌রালীর কুস্তী হয়, তাহাতে গোলাম প্রায় বিনা আয়াসে মাদ্‌রালীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। গোলামের জীবিতাবস্থায় বা ইদানী তাঁহার সমকক্ষ কোনও পালোয়ান ছিল না বা নাই। ভবিষ্যতেও সেইরূপ সর্ব্বজয়ী শ্রেষ্ঠ পালোয়ান জন্মগ্রহণ করিবেন কি না সন্দেহ। ইউরোপের চক্ষে গোলাম অতুলনীয়, কুস্তীগিরের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষ সেই পালোয়ান-শ্রেষ্ঠকে জন্মদান করিয়া ধন্য হইয়াছে।

১৯০৯-১০ সালে গামা, গামু, ইমামবক্স ও আহম্মদ বক্সকে মিঃ আর বি বেঞ্জামিন ইংলণ্ডে লইয়া যান। মিঃ বেঞ্জামিনের চেষ্টায় ও উৎসাহে যুক্ত আমেরিকার বিখ্যাত কুস্তীগীর ডাক্তার রোলারের (Dr. B. F. Roller, B.Sc., M.D.) সহিত গামার, ও ইমাম বক্সের সহিত সুইট্‌জারল্যাণ্ডের নামজাদা পালোয়ান জন লেমের (Lemm) কুস্তী স্থির করা হয় ও Sporting Life কাগজের অফিসে দুইলক্ষ টাকা জমা দিয়া আহ্বান-পত্র (Challenge) স্বাক্ষর করা হয়। জন লেম্ ও ডাক্তার রোলার ইউরোপ ও আমেরিকার পালোয়ানদিগের মধ্যে হেকেনস্মিট (Heckensmidt) ও গচের (Gotch) তুল্য শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত। জন লেম ১৯০৮ সালে Hengler's Tournament নামক প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পালোয়ান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সমগ্র ইউরোপ আশা করিয়াছিল যে এই নগণ্য চারিজন ভারতবাসী উচিত

মত শিক্ষা পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। রোলার ২০ মিনিটের মধ্যে গামার নিকট পরাজিত হইলেন এবং লেম ইমামবক্সের নিকট হারিতে ১২ মিনিটেরও অধিক সময় লন নাই। ইউরোপ ও আমেরিকায় আমাদের দেশের মত মাত্র একবার কুস্তীজেতায় ফলে বিজেতা নির্ণীত হয় না, সেখানে (Best of three falls) বারবার তিনবার রীতি প্রচলিত। ইউরোপ আশ্চর্য্য হইয়া গামাকে The Lion of the Panjab পাঞ্জাব-কেশরী এবং ইমামবক্সকে The Panther পুরুষব্যাঘ্র উপাধি দান করেন। মিঃ বেঞ্জামিন ইউরোপ-আমেরিকার বিখ্যাত কুস্তীগীর মাত্রকেই তাঁহার পালোয়ান-দিগের সহিত লড়িবার জন্য (Challenge) আহ্বান করেন। ভুবনবিজয়ী কুস্তীগীর হেকেনস্মিট এই সময়ে ইংলণ্ডে উপস্থিত থাকিয়া গামা ও ইমামবক্সের ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, জনসাধারণ তাঁহাকে সহস্র অনুরোধ করিয়াও গামার সহিত লড়িতে সম্মত করাইতে পারে নাই। রোলারকে জয় করিয়া গামা রোলারের জমা এক সহস্র পাউণ্ড ও টিকিট বিক্রয়ের শতকরা ৭০্ টাকা পাইয়াছিলেন, বাকি শতকরা ৩০্ রোলার পান। ইমাম বক্সও ৫০০ পাউণ্ড ও টিকিট বিক্রয়ের টাকা এই হিসাবে পান। বলা বাহুল্য হেকেনস্মিটের জন্য কেহ কেহ ৭০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত জমা দিতে সম্মত হইয়াছিল, কিন্তু "রুষ-সিংহ" তাহাতে সম্মত হন নাই। রোলার পরাজিত হইবার পর গামার বিজয়বার্ত্তা শুনিয়া অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত পালোয়ান ও ভূতপূর্ব্ব (World's Champion) জগৎজয়ী বিস্কো (Zbysco) ইংলণ্ডে আসিয়া গামার সহিত কুস্তীর বন্দোবস্ত করিয়া লন, এবং লেম ও "এপোলো"র (Wm. Bankier, alias Apollo) সাহায্যে লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। লেমের পরাজয়ের অল্পদিন পরে গামার সহিত বিস্কোর লণ্ডনে কুস্তী হয়। এই কুস্তীর আলোচনায় পুঁথি বাড়িয়া যাইবার ভয়ে বিস্তৃত বিবরণ দিতে নিরস্ত হইলাম। গামা "আহ্বানপত্রে" বিস্কোকে এক ঘণ্টায় দুইবার পরাজিত করিবেন বলিয়া স্বাক্ষর করেন, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই; যাঁহারা বায়োস্কোপে এই ব্যাপার দেখিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, কেন গামা স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। বিস্কোর শরীর দেখিতে গামার দ্বিগুণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; উভয়ের শরীরের মাপ নিম্নে দিলাম —

	গামা	বিস্কো
গলদেশ	১৮″	২২½″
ছাতি	৪৮″ (সাধারণ অবস্থায়)	৫৮″ (সাধারণ অবস্থায়)
বাহু	১৮″	২২″
পুরোবাহু	৪″	১৫″
জানু	২৭″	৩২″
	১২৫	১৪৯½

ইহা সত্ত্বেও গামা সম্পূর্ণ ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট তাঁহাকে নিজের নীচে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবস এই কুস্তী পুনরায় হইবার কথা ছিল, কিন্তু বিস্কো ইংলণ্ড হইতে চলিয়া যান। গামাকে বিজেতা স্বীকার করিয়া ইংরেজ "জনবুল চাপরাস" (John Bull Wrestling Belt) এবং গামার প্রাপ্য বিস্কোর জমার টাকা দেন। এদিকে হেকেনস্মিটও আপনার মান বাঁচাইবার জন্য ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সুইজারল্যাণ্ডে গমন করেন। গামা ও বিস্কোর কুস্তী ইংলণ্ডে The Gama-Zbysco Fiasco বলিয়া পরিচিত। ইহার পর বেঞ্জামিন সাহেব বহু চেষ্টা করিয়া গামার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইমামবক্সের সহিত আইরিশ কুস্তীগীর (Pat Connolly) প্যাট কনোলীর কুস্তীর বন্দোবস্ত করেন। ইমামবক্স বিনা আয়াসে তাহাকে পরাজিত করেন। এই দিগ্বিজয়ী বীর ইমাম আজ প্রায় দুই বৎসর হইল কলেরায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র ইংলণ্ডের কুস্তীগীর সম্প্রদায় "The Panther" ইমামবক্সের নামে আজও কাঁপিয়া উঠে।

বহুদিন পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব জগৎজয়ী (World's Champion Tom Cannon) টম ক্যানন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া কলিকাতায় আসেন। কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব মহামাননীয় শ্রদ্ধেয় রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর গোলামের পিতা রহিমকে লইয়া গিয়া টম ক্যাননের সহিত কুস্তী লড়ান। এই বিখ্যাত ইংরেজ কুস্তীগীর পরাজিত হইয়া পরদিন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। রহিমের দ্বারা পরাজিত হইলেও টম ক্যানন ইংরেজের নিকট (The

Undefeated World's Champion) অপরাজিত জগৎজয়ী বলিয়া পরিগণিত ও বিখ্যাত।

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিঃ বেঞ্জামিন ১৯১২ সালে প্রফেসর রামমূর্ত্তি ও ষোলজন ভিন্ন ওজনের বাছা বাছা কুস্তীগীর লইয়া ইংলণ্ড যান; ইহাঁদিগের মধ্যে, আহমদ বক্স, রহিম, কাল্লা, ভীলা, গোলাম মহীদীন, বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। গামার ইংলণ্ড গমনের পর হইতে বিলাতি পালোয়ানদিগের মধ্যে একটা ভারতবাসী-ভীতি হইয়াছিল, সুতরাং উক্ত পালোয়ানদিগের সহিত কুস্তী লড়িতে কেহই সম্মত হইতেছিল না। কিছুকাল পরে ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান মরিস ডিরিয়াজ (Maurice Deriaz) ইংলণ্ডে আসিয়া আহমদ বক্সের সহিত কুস্তী লড়েন। আহমদ ডিরিয়াজকে প্রথম বার ৬৬ সেকেণ্ড ও দ্বিতীয় বার ৯ মিনিটে পরাজিত করিয়া জগৎকে স্তব্ধ করিয়া দেন। ডিরিয়াজের ম্যানেজার ডিলালয় (E. Delaloye) আর্মণ্ড কার্পিলড (Armand Cherpillod) নামক অন্য এক জগদ্বিখ্যাত কুস্তীগীরকে বিলাতে "বক্সের" সহিত কুস্তী লড়িতে লইয়া আসেন। আহমদ বক্স তাহাকে মাত্র চার মিনিটে পরাজিত করেন। এবং সেও গালি দিতে দিতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে; তাহাকে দ্বিতীয়বার লড়িবার জন্য কেহই সম্মত করিতে পারে নাই। ১৯১৩ সালে মরিস্ ডিরিয়াজের যত্নে প্যারিসের Nouveau Cirque নামক স্থানে এক মহাসম্মিলন হয়, তাহাতে মরিস্ ডিরিয়াজ পৃথিবীর Middle Weight Champion মাঝারী ওজনের ওস্তাদ উপাধি লাভ করেন। অথচ আহমদ বক্স তাঁহার অপেক্ষা শারীরিক ওজনে প্রায় ৩ সের কম, এবং মরিস্ তাঁহার নিকট উপর্য্যুপরি দুইবার পরাজিত হইয়াছিলেন। ইউরোপের Championship, বা ওস্তাদ একটি দুর্জ্ঞেয় বস্তু। ইংলণ্ডে কুস্তী পাইবার আশায় নিরাশ হইয়া গোলাম মহীদীন প্রভৃতি ফ্রান্সে গমন করিয়া কুস্তী লড়িবার পাশ্চাত্য প্রণালী (Greeco-Roman style) শিক্ষা করেন ও ফ্রান্সের (Greeco-Roman Champion, Maurice Gambier) মরিস্ গাম্বিয়ে প্রভৃতি প্রায় ৫০ জন কুস্তীগীরকে পরাজিত করিয়া আমেরিকা যান। তথায় বিস্কোর সহিত কুস্তী করিয়া কাল্লা ভারতবাসীর নামে দুরপনেয় কলঙ্ক র্অপন করিয়া আনেন, বিস্কো কাল্লাকে উপর্য্যুপরি দুইবার পরাজিত করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুস্তীগীর ফ্রাঙ্ক গচের (Frank Gotch) সহিত লড়িবার আশায় আহমদ বক্স প্রভৃতি আমেরিকা যান। কিন্তু ধূর্ত্ত গচ্ সংবাদপত্র বা ইহাদের কথায় একেবারেই কর্ণপাত করে নাই, সুতরাং একান্ত নিরাশ হইয়া ইঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুহ ওরফে গোবর বিলাতি পালোয়ানদিগের সহিত স্বীয় শক্তি পরীক্ষা করিবার আশায় ইংলণ্ড গমন করেন। বাল্যকালে মেট্রোপলিটন স্কুলে আমরা সহপাঠী ছিলাম এবং তাঁহার বাল্যাবস্থাতেই দৈহিক শক্তি দেখিয়া ভাবিতাম কিরূপে এমন শক্তিশালী হওয়া যায়। আমার পূর্ব্বতন সতীর্থ যে নিজের দৈহিক শক্তি দেখাইয়া জগৎকে আশ্চর্য্য করিয়াছেন, ইহা আমার একান্ত আনন্দ ও গর্ব্বের বিষয়। ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাঁহার ব্যায়ামপদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। Health and Strength পত্রিকা গোবরের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন; উক্ত সংবাদপত্রের মতে গোবরের সামান্য মুদ্গরটি পর্য্যন্ত সাধারণ ইংরেজ ভূমি হইতে তুলিতে অক্ষম।

"Gobar, for instance, who is in England now, swings clubs that no ordinary Englishman could lift, and carried a stone collar of prodigious weight round his neck."

গোবরের অনেক কথা "মডার্ণ রিভিউ" ও "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং সে-সকল বিষয়ের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। এডিনবরায় গোবর প্রথমে "জিনি ক্যাম্বেল" ও পরে "জিমি ইশন" (Champion Heavy-weight Wrestler of Britain) নামক দুজনা ইংরেজ ওস্তাদকে পরাস্ত করেন। প্রথমবার পরাজিত হইয়া ইশন দ্বিতীয়বারের কুস্তীতে গোবরকে ঘুসি মারিতে আরম্ভ করে, তাহাতে বিচারকগণ (judges) তাহাকে পরাজিত স্থির করিয়া কুস্তী বন্ধ করিয়া দেন। এই কুস্তীতে গোবর ১৫০০ পাউণ্ড পুরস্কার (purse) ও সাধারণ জমা এবং টিকিট বিক্রয়ের শতকরা ৭০্ টাকা পান। প্যারিসে Nouveau Cirque Tournament নামক প্রতিযোগিতায়

সময় গোবর উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি উক্ত সম্মিলনে যোগদান করেন নাই। ফ্রান্সে দুই চারিজনকে পরাজিত করিয়া গোবর গচের সহিত লড়িবার আশায় আমেরিকা গমন করেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা সফল হয় নাই।

গত বৎসর গচ্ কুস্তী হইতে অবসর গ্রহণ করায় তাঁহার নির্ব্বাচিত "আমেরিকাস্" (Americas) পৃথিবীর "শ্রেষ্ঠ" বলিয়া গণ্য হয়, এবং তাহাকে পরাজিত করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত আইরিশ্ পালোয়ান প্যাট কনোলী (Pat Connolly) World's Champion বা জগৎজয়ী ওস্তাদ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কনোলী ইমাম বক্সের নিকট এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পালোয়ানদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পালোয়ান, এবং ইমাম বক্স নগণ্যদিগের শ্রেণীতে নিক্ষিপ্ত। ভারতবর্ষের অজ্ঞাতপূর্ব্ব কতিপয় পালোয়ানই ইউরোপকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, না জানি কাল্লু অথবা কিক্কড় সিংহকে দেখিলে তাহারা কি করিত। কিন্তু ফল একই, ইউরোপে "নিগ্রোর" স্থান হইতে পারে, তাহারা Championship অর্থাৎ জগৎজয়ী ওস্তাদ পদবী হাতের মুঠায় পাইতে পারে, কিন্তু ভারতবাসী সহস্র গুণ সত্ত্বেও পালোয়ানসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই।

ইউরোপের Music Hall Strong Men বা তামাসাওয়ালা পালোয়ান হিসাবে আমাদের দেশে অনেক ব্যক্তি আছেন; ইঁহাদিগের মধ্যে রামমূর্ত্তি, হিম্মৎ বক্স, কৃষ্ণদাস শীল, ভবানী সাহা এবং মহিষাদলের জি পি গর্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ কয়জনের মধ্যে রামমূর্ত্তি, ভবানী সাহা ও শীল ছাতির উপর হস্তী রক্ষা করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। প্রফেসর রামমূর্ত্তি এই হস্তী-ব্যাপারের প্রবর্ত্তক। তাঁহার পূর্ব্বে পৃথিবীর আর কেহই একথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। রামমূর্ত্তিকে দেখেন নাই এমন লোক এদেশে বিরল, সুতরাং তাঁহার বিশেষ বিবরণ ও পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। প্রফেসর রামমূর্ত্তি ৮০০০ পাউণ্ড ওজনের বৃহৎ প্রস্তর পৃষ্ঠদেশ হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ভারোত্তোলনকারী (Weight-lifter) সমাজে অগ্রণী ও বরণীয় হইয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বে শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ ক্ষমতার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

ভবানী ওরফে ভবেন্দ্র, ভীম ভবানী নামে বাঙালীর নিকট পরিচিত। ইঁহার বয়স এখন ২৫।২৬ বৎসরের বেশী নয়। ইনি ১২ বৎসর বয়স হইতে ব্যায়ামচর্চ্চা আরম্ভ করেন; এখন তিনি কুস্তীতে ওস্তাদ। ইনি অনেক দিন রামমূর্ত্তির সার্কাসের দলে খেলা দেখাইতেন। রামমূর্ত্তির বক্ষের মাপ ৪৮ ইঞ্চি, বক্ষ প্রসারণ করিলে হয় ৫৭ ইঞ্চি; ১০ মিনিট ধরিয়া বক্ষ ঐরূপে প্রসারিত করিয়া রাখিতে পারেন। ভবানীর বক্ষ সচরাচর ৪২ ইঞ্চি কিন্তু প্রসারণ করিলে ৪৮ ইঞ্চি হয়। রামমূর্ত্তি বুকের উপর ৮০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় একশত মণ ওজনের পাথর চড়াইয়া রাখিতে পারেন; ২২ ঘোড়ার জোরের চলন্ত মোটর গাড়ী পিছন হইতে টানিয়া থামাইয়া রাখিতে পারেন; মোটা শিকল হাতের গুলি ফুলাইয়া পেশীর জোরেই ছিঁড়িতে পারেন; লোক-বোঝাই দুখানা গরুর গাড়ী বুকের উপর দিয়া চালাইতে দিতে পারেন। ভবানীও এই-সমস্ত পারেন।

ভবানী সাহার ন্যায় শীলও বিভিন্ন খেলায় স্বীয় শারীরিক সামর্থ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। মহিষাদলের গর্গ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুস্তীগীর গচকে "আহ্বান" করিয়াছিলেন। তিনি ভূমণ্ডলের যে-কোন স্থানে লড়িতে এবং ৮০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১ লক্ষ ২০ হাজার মুদ্রা জমা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু গচ তাঁহার আহ্বান-পত্রের কোন উত্তর দেন নাই।

ভারতবর্ষীয় পালোয়ান যে "World's Champion" জগৎজয়ী ওস্তাদের সম্মান লাভের যোগ্য সেইটুকু প্রমাণ করাই আমার উদ্দেশ্য।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মজুমদার।

Member of the Health & Strength League, London;
Member of the British Amateur Weight-lifter's Association, London.

ধনাদপি গরীয়সী

সারাজীবন যে কেবল পানাহারে মত্ত হয়ে অর্থ সঞ্চয় করেছে; যে কখনো শোকার্ত্তের অশ্রু মোছায়নি, শীতার্ত্তের শীত নিবারণ করেনি, সে বেঁচে থাকাতে জগতের কি লাভ? তার জীবন একেবারেই ব্যর্থ।

মানুষ যখন মরে তখন লোকে জিজ্ঞাসা করে লোকটা কত সম্পত্তি রেখে গেল? কিন্তু পরলোকের দ্বারে সে যখন উপস্থিত হয়, তখন দেবদূত জিজ্ঞাসা করেন—তোমার অগ্রে কোন্ সৎকার্য্য কোন্ পুণ্য অনুষ্ঠান পাঠিয়েছ?

* * *

এডিনবরায় সেদিন বড় শীত। পরণে শতছিন্ন পোশাক, মুখ কৃশ রক্তহীন শীতে বিবর্ণ, পদদ্বয় নগ্ন ক্ষতবিক্ষত—এমন একটি ছোট ছেলে জনৈক ভদ্রলোকের নিকট এসে করুণ কণ্ঠে বল্লে—দয়া করে' দেশলাই কিনুন মশায়? ভদ্রলোকটি বল্লেন—না, আমার দেশলায়ের দরকার নেই। ছেলেটি বল্লে—নিন্না মশাই। সিকি পয়সা করে' দাম। ভদ্রলোকটি বল্লেন—তাহলে কি হয়? আমার যে দরকার নেই বল্লুম। ছেলেটি কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে বল্লে—নিন্, সিকি পয়সায় দু বাক্স দেব।

ভদ্রলোকটি আর কি করেন, ছেলেটির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে বল্লেন—দাও এক বাক্স। কিন্তু পরক্ষণেই দেখেন, ভাঙানো পয়সা নেই, তাই বল্লেন—আচ্ছা কাল নেব 'খন এক বাক্স। ছেলেটি মিনতি করতে লাগলো—নিন্, নিন্, আজকেই নিন্। আমি দৌড়ে টাকা ভাঙিয়ে এনে দিচ্ছি—আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে! উপায়ান্তর না দেখে ভদ্রলোকটি অবশেষে একটি টাকা ছেলেটির হাতে দিলেন, সে ছুটে বেরিয়ে গেল। অনেকক্ষণ কেঁটে গেল, বালকটির জন্যে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু তার দেখা নেই। একবার মনে হ'ল টাকাটি বুঝি মারা গেল; কিন্তু আবার মনে হ'ল অমন সরল মুখ ছেলেটির, সে কি প্রবঞ্চনা করতে পারে!

সন্ধ্যার পর ভদ্রলোকটির ভৃত্য এসে বল্লে একটি ছোট ছেলে দেখা করতে চায়। ছেলেটি ভিতরে এলে তিনি দেখলেন সে দেশলাই বিক্রেতার ছোট ভাই। দুই ভায়ের চেহারায় যথেষ্ট সাদৃশ্য। এ ভাইটি বড়টির চেয়েও অপরিচ্ছন্ন, কৃশকায় ও দরিদ্র। ছিন্নবস্ত্রের মধ্যে হাত পুরে দিয়ে সে ক্ষণকাল যেন কি অনুসন্ধান করতে লাগল, তারপর বল্লে—আপনি কি আমার ভায়ের কাছে দেশলাই কিনেছিলেন? ভদ্রলোকটি বল্লেন—হ্যাঁ। তখন সে বল্লে - এই নিন আপনার চার আনা, এক টাকার মধ্যে। আমার ভাই আসতে পারবে না। সে ভালো নেই। গাড়ী চাপা পড়েছিল। তার টুপি, দেশলাই, আপনার এগারো আনা পয়সা, সব খোয়া গেছে। তার দুটো পা-ই ভেঙে গেছে, মোটেই ভালো নেই সে। ডাক্তার বলেছে সে মরে যাবে, আর বাঁচবে না। আপনাকে চার আনার বেশী আর দিতে পারবে না—কোথায় পাবে সে!" তার মুখ দিয়ে আর কথা ফুটল না, সে ভেউ ভেউ করে' কাঁদতে লাগল। ভদ্রলোকটি ছেলেটিকে খাওয়ালেন, তারপর তার সঙ্গে তার ভাইকে দেখতে গেলেন।

গিয়ে দেখেন ছেলে দুটি তাদের এক মাতাল বিমাতার কাছে থাকে। তাদের বাপ মা দুজনেই মৃত। বড় ছেলেটি একগাদা কাঠের চাঁচির ওপর শুয়ে ছিল। তাঁকে দেখেই চিনতে পেরে বল্লে, "আমি টাকা ভাঙিয়ে আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম। তক্‌খুনি ঘোড়াটা আমার ওপর দিয়ে চলে গেল, দুটো পা-ই ভেঙে দিয়ে গেছে। আমি ত মরচি, কিন্তু আমার ভাই যে বড় ছোট, কে ওকে দেখবে! রুবি! ভাইটি আমার! আমি চলে গেলে তুই কি করবি রুবি? তুই কার কাছে থাকবি ভাই?" ভদ্রলোকটি তার হাত দুখানি ধরে' বল্লেন—আমি তোমার ভাইকে দেখব। কিছু ভেবোনা তুমি। এই কথা শুনে সে একবার ভদ্রলোকটির মুখের দিকে কৃতজ্ঞতায়-ভরা সকরুণ চোখ দুটি ফেরালে; কিছু বলবার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শক্তিতে কুলাল না। ক্রমে তার নীল চোখের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে এল—তারপর সব শেষ!

সে বালকটির না ছিল অশন, না ছিল বসন। সে কখনো পায়ে জুতা পরেনি, গাড়ী চড়া ত দূরের কথা। কিন্তু তার সত্যনিষ্ঠা, তার সততা এবং তার মহত্ত্ব কয়জন লক্ষপতির আছে?

মানুষের পেশা কি, বা সে কি কিনতে পারে, তা দিয়ে মানুষের মহত্ত্ব বিচার করা চলবে না। লোকটি কি ধরণের তাই দেখে তার মহত্ত্ব বিচার করতে হবে। যে-ধনীর প্রাসাদনির্ম্মাণে সহায়তা করবার জন্যে মজুর সারাদিন মাথায় ইটের বোঝা বহন করে, অনুসন্ধান করলে হয়ত দেখা যাবে সে-ধনীর চেয়ে মজুরটি-ই ঢের বেশী মহৎ। প্রভূত আর্থিক উন্নতি অনেকস্থলে মানসিক ও নৈতিক উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। একজন বিপুল ধনের অধিকারী হয়; ফলে কত শত লোক নিঃস্ব অসহায় হয়ে পড়ে। সে-ধনের ভিত্তিমূলে কত ক্ষুধিতের অন্ন, পীড়িতের বিলাপ, নৈরাশ্যের হাহাকার সঞ্চিত কে তার ইয়ত্তা রাখে! কিন্তু ধী-শক্তি বা চরিত্র-গৌরবে যিনি সার্থক হন তিনি কারো ক্ষতি করেন না; তিনি সমাজকে উন্নত করেন, লাভবান করেন, অতুলনীয় ধনের অধিকারী করেন। আর চরিত্রের ছাপ কখনো মুছে যাবার নয়; এই ছাপ দিয়েই সকল সময়ে সকল জাতির যথার্থ মূল্য নিরূপিত হয়।

প্রভূত ধনলালসায় মানুষ যখন সংগ্রামে মাতে, তখন প্রায়শঃই তার যে নৈতিক অবনতি ঘটে সে কথা ভালো-রকম বুঝেছিলেন বলেই যীশুখৃষ্ট শিষ্যগণকে বলেছিলেন, —"নিশ্চয় করে' বলছি ধনী কদাচিৎ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে।" টাকার নেশায় যখন ধরে, তখন সহস্র পেলে স্বভাবতই লক্ষের দিকে মন ধাবিত হয়; এবং অর্থের পিছু পিছু দৌড়োবার সময় চরিত্রের মহত্ত্ব ও ন্যায়বোধ পদদলিত হয়ে মারা পড়ে।

অর্থসঞ্চয় করতে গিয়ে মন যদি দীন হয়; আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস যদি শুষ্ক হয়; সৌন্দর্য্যবোধ যদি নির্ব্বাপিত হয়; যদি আমরা প্রকৃতির বা চারুশিল্পের সৌন্দর্য্যের প্রতি বিমুখ উদাসীন হয়ে পড়ি; ন্যায় অন্যায় পাপপুণ্য-বোধ যদি একাকার হয়ে যায়—তবে সে অর্থসঞ্চয়ে প্রয়োজন নেই।

কি লাভ হবে সেরূপ অর্থসঞ্চয়ে যা আমাদের সমস্ত মন অধিকার করে বসে; যা মানুষকে নীচ মলিন জীবন যাপন করতে শেখায়! অর্থচিন্তায় পাগল হয়ে যদি বই, ছবি, সঙ্গীত, ও দেশভ্রমণ ত্যাগ করতে হয়, তবে কাজ নেই তেমন অর্থসঞ্চয়ে। নিজের হৃদয়মনের উন্নতি বা পরের ভালো করতে যদি পরমানন্দ না পাই; পরমানন্দ যদি কেবল হয় তখন, যখন ভাবি সিন্দুক কেমন দিনে দিনে টাকায় পূর্ণ হয়ে উঠচে, এবং ব্যাঙ্কে সুদের পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেচে, তবে নমস্কার করি তেমন অর্থকে! আমি দীনদরিদ্রই থাকব!

শোনা যায় রাজা মিডাস প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যা-কিছু স্পর্শ করবেন তা-ই যেন সোনা হয়ে যায়! তিনি ভেবেছিলেন তা হলেই তাঁর আর সুখের অন্ত থাকবে না। দেবতা তাঁর প্রার্থনা গ্রাহ্য করলেন। অমনি রাজার পোশাকপরিচ্ছদ, আহার্য্য, পানীয় সব সোনা হয়ে গেল! যদি পুষ্প চয়ন করেন তখনি তা সোনা হয়ে যায়! অবশেষে যেই তাঁর শিশুকন্যাকে চুম্বন করেছেন অমনি সে-ও প্রাণহীন স্বর্ণপিণ্ডে পরিণত হয়ে গেল। তখন রাজা হায় হায় করতে লাগলেন, আকুলস্বরে বলে' উঠলেন —নাও হে দেবতা নাও, তোমার সোনার পরশ ফিরিয়ে নাও! সকল সোনার চেয়েও যা মূল্যবান সেই প্রাণের পরশ ফিরিয়ে দাও!

লুথারের উইলে লিখিত ছিল যে তিনি অর্থ বা কোনো-প্রকার বহুমূল্য পদার্থ রেখে যাননি। কিন্তু তিনি যে সম্মানের সিংহাসনে চিরদিনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত, বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর কোন্ নরপতি তাঁর সিংহাসনের ওপর তেমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন?

দেশের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান উৎপাদন দেশের খাঁটি মানুষ।

সেই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী যে দেশকে সকলের চেয়ে ধনী করে; যাকে পেয়ে দেশের লোক আপনাদিগকে ধনী মনে করে, ধন্য বোধ করে; যে সাধারণের মধ্যে নিজের অর্থ এবং তার সঙ্গে আপনাকেও বিলিয়ে দ্যায়; যে সকলকেই সাহায্য করতে তৎপর; যে বধীরের কর্ণস্বরূপ, অন্ধের চক্ষুস্বরূপ এবং খঞ্জের পদস্বরূপ।

সুবিখ্যাত ফরাসী-লেখক ভল্টেয়ার বলেছিলেন—"যাঁরা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেছেন তাঁরা ব্যতীত অন্য কোনো মহৎ লোক জানি না।" মানুষ কত সম্পত্তির অধিকারী তা দিয়ে তার মূল্য নিরূপণ হয় না; সে কি করে তা-ই তার একমাত্র মাপকাঠি।

* * *

মার্কিন কংগ্রেসে ওয়াশিংটনের একখানি পত্র পড়া হ'ল। তাতে তিনি বষ্টন নগরের ওপর গোলানিক্ষেপ করা উচিত বলে লিখেছিলেন। পত্রপাঠ সমাপ্ত হলে সভ্যেরা সকলেই নির্ব্বাক হয়ে রইলেন, কারণ তাঁদের অজ্ঞাত ছিল না যে ঐ শহরে তাঁদের সভাপতি মহাশয়ের অনেক স্থাবর সম্পত্তি আছে। অবশেষে সভাপতি হ্যান্‌ককের যখন মত জিজ্ঞাসা করা হ'ল তখন তিনি অম্লানবদনে দৃঢ়কণ্ঠে বল্লেন—"একথা সত্য যে বষ্টন শহরে বাড়ী এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তিই জগতে আমার একমাত্র সম্বল। কিন্তু যদি শত্রুর সৈন্যদলকে বিতাড়িত করার জন্যে, যদি আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে বষ্টন ভস্মসাৎ করা প্রয়োজন হয় তবে এখনি সে আদেশ দেওয়া হোক।"

* * * *

কৃতী বলবে কাকে? যার হিংস্র পশুর ন্যায় মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সে কখনো কাকেও কিছু দান করেনি কেবলি গ্রহণ করেছে,—তাকে বলবে কৃতী? তার নিষ্ঠুর মুখের ওপর কি বিধবা ও পিতৃমাতৃহীনের করুণ কাহিনী লিখিত নেই? যে নিজের উন্নতির জন্যে অন্যের অবনতি ঘটিয়েচে, আপনাকে গড়ে তুলতে পরকে ভূমিসাৎ করেছে—তাকে কি আত্মচেষ্টায় উন্নত বলবে? পরকে যে দরিদ্র করে সে কি যথার্থ ধনী?

চীনারা অখৃষ্টান; তাই খৃষ্টান য়ুরোপ তাদের বর্ব্বর আখ্যা প্রদান করেন। অহিফেনের ব্যবসায় চালাবার জন্যে লাইসেন্সের আবেদনের উত্তরে অখৃষ্টান চীন সম্রাট বলেছিলেন—"প্রজাবর্গকে দুঃখ ও পাপের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত করে' লাভবান হওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।" কিন্তু খৃষ্টান জাতি চীনদেশে অহিফেনের ব্যবসায় চালিয়ে কোটি কোটি মুদ্রা লাভ করে' আনন্দ রাখবার ঠাঁই পান না!

আমেরিকায় যখন দাসপ্রথা উঠিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছিল তখন ঐ কুপ্রথা বাহাল রাখবার পক্ষপাতীরা স্থির করলেন যে, যে-সকল ব্যবসায়ী দাসত্বপ্রথা-বিরোধী 'ক্ষ্যাপা'দের বিপক্ষে না দাঁড়াবে তাদের অন্ন মারবার বিধিমতে চেষ্টা হবে। এরূপ বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও একদল ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দিলেন—আমরা রেশম বিক্রী করি, আমাদের মৎ বিক্রী করি না? এ বিজ্ঞাপনে ব্যবসায়ে ক্ষতি না হয়ে যথেষ্ট লাভই হ'ল। লোকে রেশম কিনতে গেল তাদেরই কাছে যারা আত্ম-বিক্রয় করেনি।

লিংকন সর্ব্বদা চরিত্রের উৎকর্ষসাধনের জন্যে তৎপর থাকতেন। তাঁর সমব্যবসায়ী উকিলেরা তাঁকে "অন্যায় রকম সাধু" বলতেন। তিনি কিছুতেই মকদ্দমায় অন্যায় পক্ষ সমর্থন করতেন না; মকদ্দমা অন্যায় বা ভিত্তিহীন বুঝতে পারলে তখনি সে পক্ষ ত্যাগ করতেন। একবার জনৈক মহিলার নিকট হতে অগ্রিম দুইশত মুদ্রা পেয়ে দীর্ঘকাল ধরে' কাগজপত্র দেখে তাঁকে মুদ্রা ফেরত দিয়ে বল্লেন—মকদ্দমায় জয় হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। মহিলাটি বল্লেন—কিন্তু টাকা ফেরত দিচ্ছেন কেন? ও টাকা তো আপনি উপার্জ্জন করেছেন। লিংকন বল্লেন—না না সেটা ঠিক কাজ হবে না। আমার কর্ত্তব্য করেছি, তার জন্যে অর্থ গ্রহণ করতে পারব না!

মার্কিন ঋষি এমার্সনের মতে সভ্যতার খাঁটি নিরিখ লোকসংখ্যায় নয়, সহরের আয়তনে নয়, উৎপাদিত শস্যের পরিমাণেও নয়; দেশে কি প্রকারের মানুষ জন্মেছে তাই হচ্ছে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিরিখ। চরিত্রের গৌরবই পরম গৌরব।

নারীর বিবাহ হলে লোকে জিজ্ঞাসা করে—কেমন? বিবাহ ভালো হয়েছে তো? তার মানে এ নয় যে বরটি সাধু সজ্জন নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র কি না;—মানে হচ্ছে, ভাত-কাপড়ের ভালোরকম সংস্থান আছে তো? অর্থ আছে অথচ হৃদয় নেই, বাস করা হয় অট্টালিকায় কিন্তু মনটা অতি নীচ এর চেয়েও দুঃখের কথা আর কি হতে পারে?

ভল্টেয়ার বলেছেন—"যারা নৌবাহিনী বা রণবাহিনীর নায়ক ছিল তাদের সকল কথাই অবলুপ্ত, আছে কেবল নামটি। একশত যুদ্ধজয়েও মানবজাতির কোনো উপকার হয় না। মহাপুরুষ তাঁরাই যাঁরা অনাগত মানববংশের জন্যে নিষ্কলুষ শাশ্বত আনন্দের সৃষ্টি করে' গেছেন। দুই সমুদ্রকে যুক্ত করে এমন একটি খাল, একখানি ছবির-মত-ছবি, সুলিখিত একখানি বিয়োগান্ত নাটক বা একটা আবিষ্কৃত সত্যের মূল্য সকল দেশের সকল রাজসভার বিবরণী এবং সকল যুদ্ধকাহিনীর মূল্য অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক। যাঁরা মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন, মানুষের কাজে যাঁরা লেগেছেন, তাঁরাই আমার মতে মহাপুরুষ।"

চার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার জনৈক মিশরদেশীয় রাজার সমাধিপ্রস্তরে লেখা আছে—একটি শিশুরও আমি ক্ষতি করিনি। একটি বিধবার ওপরও অত্যাচার করিনি। একটি কৃষকের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করিনি। আমার রাজত্বে ভিক্ষুক ছিল না, অনাহারেও কেউ মরত না। যখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভূমি কর্ষণ করিয়েছিলুম, বাসিন্দাদের আহার যুগিয়েছিলুম। বিধবার দুরবস্থা হয়নি। পতি জীবিত থাকলে তাদের অবস্থা যেমন স্বচ্ছল থাকত, তেমনি অবস্থায় তাদের রেখেছিলুম!" আমাদের সভ্য উন্নত যুগে কোন্ নরপতি এমন কথা বলতে পারেন?

অর্থ পুণ্যের সমকক্ষ হতে পারে না। সামাজিক প্রতিষ্ঠা মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করে না।

ফিলিপ্স্ ব্রুক্সের কথায় প্রবন্ধ শেষ করি।

"যে অন্তত কতক পরিমাণে অনুভব করেনি যে তার জীবন তার জাতির জন্যে; এবং বিধাতা তাকে যা দ্যান, তা সমগ্র মানবজাতির জন্যেই দ্যান,—সে কখনো প্রকৃত মহত্ত্বের অধিকারী হয়নি।"

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিপর্য্যয়

আজ কাননে উঠল যে ফুল ফুটি,
আজকে আমার চাই-ই যে চাই ছুটি,
গুরুমশায় দোহাই পড়ি পায়;
বসন্তেরে দিওনা আজ লাজ,
বন্ধ থাকুক পাঠশালাটার কাজ
আজ যে পাঠে মন লাগানো দায়।
তোমার হাতের বেত সে জ্ঞানাঞ্জন,
তোমার শাস্ত্র গভীর সনাতন,
হিতকর সে, চটুল চপল নয়;
মাথায় তাঁরা থাকুন রাত্রিদিন
চন্দনে আর সিন্দূরেতে লীন,
গরীব তাঁদের বড়ই করে ভয়।
কোথা হ'তে বয় যে পাগল হাওয়া,
মনের মোটেই যায় না নাগাল পাওয়া
কেমন ক'রে করি বা মন স্থির;
নবদ্বারে রুধবো কিসে আর
লোমে লোমে খুল্‌ল অযুত দ্বার
বিশ্বভুবন লাগায় মনে ভিড়।
যৌবন ঢেউ নিত্য দোদুল প্রাণে
শান্তিশতক পালান মানে মানে,
অশান্তি যে হাজাররূপে হাসে;
মোহের জোয়ার খেলছে কোটাল বানে
মুদ্গর যান্ ভেসেই অকূল পানে,
অবোধ হর্ষ প্রবোধচন্দ্রে গ্রাসে।
অবোধ আমি বড়ই অকিঞ্চন
রতন ত্যজি ফুলের পরে মন,
করবে কেন মিথ্যা অপচয়?
মস্ত ধরা, কালও লম্বা খুব,
দিবে তত্ত্ব-সাগর মাঝে ডুব
জুটবে এমন সুবোধ শিষ্যচয়।
জানি তোমার আইন বিষম কড়া
ম'লেও তাহার নাইকো নড়াচড়া
মানুষ সৃষ্টি আইন মানার তরে।
ছুটি আমার মিলবে না বেশ জানি,
আমার তাতে নাইকো বিশেষ হানি,
দোহাই কিন্তু দোষ দিওনা পরে।
আইন দিয়ে যতই বাঁধো তুমি
প্রাণ-সাগরের বিপুল বেলাভূমি
সহজ মনের যতই রচো কারা,
নিমেষে সব বাঁধন ফেলে টুটে
গতির সুখে উধাও যাবে ছুটে
বেআইনির হাজার নূতন ধারা।
এত যৌবন এত প্রচুর প্রাণ
এত হাসি অশ্রু এতই গান
বুকের মাঝে উঠল ফুলে' ফুলে',
পাগলা হাওয়ার নিশাস যেথায় লাগে
সবুজ প্রাণের বন্যা সেথায় জাগে
প্রাচীন পাষাণ হঠাৎ হাসে ভুলে'।
বিধি-নিষেধ-বাঁধা এ পাঠশালা
হেথায় মোদের বদল হবে মালা
প্রেমের সে যে বাসর-কুঞ্জ হবে,
পুঞ্জীভূত শান্তিশতক বুকে
মিলন-শয়ন রচিলে কেউ সুখে
গুরুমশায় রাগ ক'রোনা তবে।
দেখছো নাকি শুকনো তোমার বেতে
নবজীবন উঠছে কেমন চেতে
সবুজ পাতায় ফেলছে ছেয়ে তারে,
আদ্যি কালের তোমার চিকণ টাক
ঘুচল বুঝি মৌরসি তার জাঁক
লুপ্ত হল কৃষ্ণকেশের ভারে।
গুরুমশায় দেখ্‌ছি আমি বেশ
কি যে তোমার দশায় হবে শেষ
মায়াবাদের কাটবে অলীক মায়া,
মোদের বাসর-কুঞ্জ-কবি তব
কণ্ঠে যে গান ফুটবে অভিনব
পড়বে তাহে কায়াবাদের ছায়া।
আজকে যদি স্বয়ং মৃত্যু এসে
হিতকথা আর নীতির উপদেশে
ফিরাতে চান মোদের মতিগতি,
এমন চাওয়া চাইব যে তার পানে
হাড়ের পাঁজর ভাসবে রূপের বাণে
বাসর-সখী হবেন রূপবতী।

শ্রী ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

ইতিহাস পাঠ সম্বন্ধে দুই একটি কথা

বড়ই সুখের বিষয় আজকাল আমাদের সাহিত্য-জগতে এক নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। দেশের পণ্ডিত-মণ্ডলী সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা-সকল দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি সমগ্র শিক্ষণীয় বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে। যে বিদ্যার বলে আমাদের প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষ হয় ও আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সভ্য জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারি সে বিদ্যা অর্থকরী না হইলেও তাহাকে আমরা সম্মান করিতে শিখিয়াছি। এখন আর কেবল লঘু উপন্যাস বা নাটক পড়িয়া আমরা তৃপ্ত থাকিতে পারি না। গবেষণা-মূলক গভীর বিষয়ের সম্যক অনুশীলন করিয়া নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে না পারিলে, পুরাতনকে নূতন ভাবে গঠন করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিলে, প্রত্যেক বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে, আমাদের জ্ঞানপিপাসা দূর হয় না। সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে আমরা সাহিত্যের নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। ইতিহাস চর্চ্চা আমাদের এই পরিবর্ত্তিত রুচির একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। বঙ্গ-সাহিত্য কেন, সমগ্র ভারতের সাহিত্যে ইতিহাস কোন কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। এমনকি আমাদের দেশের ইতিহাস জানিতে হইলে বিদেশী লেখকের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বড়ই আনন্দের বিষয় যে আমাদের এই দুরপনেয় কলঙ্ক অপনয়ন করিবার জন্য দেশের সুসন্তানগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইদানী আমাদের দেশে শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ-দৃষ্টি পড়িয়াছে। প্রায়শঃ সমস্ত মাসিক পত্রিকায় কোন-না-কোন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের জাতীয় ও দেশীয় ইতিহাস নূতন ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া ভারতবাসী আজ ভারতবর্ষের গৌরব সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে উদ্ভাসিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে। এই সময়ে ইতিহাস সঙ্কলন, ইতিহাস পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য ও ইতিহাসের প্রকৃত মর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা অসাময়িক হইবে না বলিয়া মনে হয়।

বিশাল সাহিত্য-ক্ষেত্র কল্পনা এবং বিচার-শক্তি, এই দুইটি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির লীলাভূমি। কাব্য, নাটক ও উপন্যাস প্রধানতঃ কল্পনামূলক; দর্শন ও বিজ্ঞান বিচার-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসে আমরা এই পরস্পর-বিরোধী মানসিক বৃত্তিদ্বয়ের সমন্বয় দেখিতে পাই। সুদূর অতীতকে মানসচক্ষুগোচর করিতে হইলে, তদানীন্তন আচার ব্যবহার কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, কল্পনা-বলে অতীত ঘটনাবলীর ভিতর প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে, নচেৎ আমাদের ইতিহাস পাঠ ব্যর্থ হইবে। কল্পনার সাহায্যে নীরস অসংবদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কিরূপ সুন্দর ও বিচিত্র ভাবে বিন্যাস করা যায় এবং তাহা কিরূপ হৃদয়গ্রাহী ও সুখপাঠ্য হয়, স্কট (Scott) এবং আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইতিহাসকে সরস, চিত্তাকর্ষক করিতে হইলে লেখক এবং পাঠক উভয়েরই কল্পনা-শক্তি পরি-চালনার প্রয়োজন হয়। কাব্য কিম্বা উপন্যাসে কল্পনা কোন সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিতে চাহে না এবং সেইজন্যই অনেক সময়ে অসংযত ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কিন্তু ইতিহাসে কল্পনাকে বিচার-শক্তির শাসন মানিয়া চলিতে হয়, কারণ মানব-জীবন বিভিন্ন ঘটনাবলীর সংঘর্ষে কোন্ পথে পরিচালিত হইতেছে তাহা নির্ণয় করাই ইতিহাসের প্রধান কাজ। ইহা যথার্থভাবে নিরূপণ করিতে হইলে অতীত ঘটনাচক্রের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কল্পনার অবাধ গতি সংযত করিতে হইবে, তাহা না হইলে সত্যের অপলাপ হইবে। এতদ্ভিন্ন অতীত ঘটনা-বলীর প্রকৃত গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা, তাহাদের ভিতর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা, কল্পিত কাহিনী হইতে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটন করা, বিচারশক্তি ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে। বিচারশক্তির সাহায্যে ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা এককালীন বহুদর্শিতা ও দূরদর্শিতা লাভ করিতে পারি, কি প্রকারে জাতীয় জীবন পরিচালিত করিলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন হয়, তাহা স্থির করিতে পারি।

কল্পনাশক্তি ও বিচারশক্তির যথাযথ সমন্বয় হইলে সমগ্র শাস্ত্রের মধ্যে ইতিহাসের স্থান অতিশয় গৌরবান্বিত হইবে, ইতিহাস পাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ থাকিবে না, ইতিহাস হইতে শিখিবার অনেক আছে আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে উপকারিতা এবং কার্য্যকারিতার উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি পরিচালিত হইতেছে। যে বিদ্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সহায়তা করে তাহারই আদর বেশী। ইহার ফলে একদিকে বিজ্ঞান ও অপরদিকে দর্শন এই দুই শাস্ত্রের ভিতর একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা আপনাদের সিদ্ধান্ত অবিসংবাদী ভাবে প্রতিপন্ন করিয়া দর্শন কাব্য প্রভৃতি অনুমান- ও কল্পনামূলক শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি নিষ্ফল গবেষণা (idle speculation) বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। এমন কি ধর্ম্মালোচনা ও ভগবৎভক্তিকে বিজ্ঞানের গণ্ডীর ভিতর না আনিতে পারিলে তাঁহাদের কাছে উহা কুসংস্কার বলিয়া পরিগণিত হয়। তাঁহাদের মতে অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন শাস্ত্রই অধ্যয়ন বা আলোচনার যোগ্য নহে। জগদ্বিখ্যাত কবি মিল্টনের Paradise Lost পাঠ করিয়া জনৈক অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—it does not prove anything—ইহা হইতে কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। এরূপ উক্তিতে মিল্টনের মহাকাব্যের অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে কি না সুধী পাঠক পাঠিকা তাহার বিচার করিবেন, কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর যে তাঁহার মানসিক বৃত্তির দীনতার পরিচয় দিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইতিহাসের সৌভাগ্য যে ইতিহাস সম্বন্ধে এরূপ কোন প্রতিকূল মন্তব্য প্রযুজ্য হইতে পারে না, কারণ ইতিহাস সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্ভব জগতে যাহা প্রকৃত ঘটিয়াছে তাহার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। মনুষ্য-জীবন পার্থিব সর্ব্ববিধ ঘাতপ্রতিঘাতের নিয়মাধীন হইয়া কোন্ পথে পরিচালিত হইতেছে, পারিপার্শ্বিক ঘটনার সংঘর্ষে মানব-সমাজ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া কি প্রকারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহাই ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। জাতীয় জীবনকে নূতন পথে পরিচালিত করিতে, সমাজগঠনে সহায়তা করিতে, বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েরই প্রভাব দৃষ্ট হয়। দর্শনশাস্ত্র মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন আলোচনা না করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য পথ স্থির করিয়া দেয়। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া জনসাধারণের সুখ সমৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করে। উভয়েই বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথ প্রদর্শন করিতেছে। ইতিহাস পাঠকালে আমাদের উপরোক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং ঘটনাস্রোতের গতি নির্ণয় করিয়া বুঝিতে হইবে যে দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ বাহিক, প্রকৃতিগত নহে। মানব-সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করাই উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য। কার্য্যপ্রণালী পৃথক হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য এক। মানবসমাজের ক্রমোন্নতি মঙ্গলময়ের বিশ্ব-বিধানের প্রধান অঙ্গ, এই ঐতিহাসিক সত্য আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। দর্শন ও বিজ্ঞান তাহার উপলক্ষ্য মাত্র, ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

ইতিহাস বলিলে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বা দেশের ইতিহাস বুঝায় না, জগতের ইতিহাস বুঝায়। ইতিহাসে দেশকাল-পাত্রের ভেদাভেদ নাই। ইতিহাসের গণ্ডী অসীম ও জগদ্ব্যাপী। জগতের সৃষ্টি হইতে ইদানীন্তন যে-সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে তাহার ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে যে এক মহৎ ঐক্য নিহিত আছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে ইতিহাসপাঠ সার্থক হইবে। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত ফ্রিমান (Freeman) যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন—

"We must cast away all distinctions of 'ancient' and 'modern,' of 'dead' and 'living' and must boldly grapple with the great fact of the unity of history."—

—প্রাচীন ও বর্ত্তমান, মৃত ও জীবিতের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা পরিহার করিয়া মহৎ ঐতিহাসিক ঐক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা পণ্ডিতপ্রবরের উক্তির সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। এই ঐতি-হাসিক ঐক্যের খাতিরে আমাদিগকে সমগ্র জগতের ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে। কোন নির্দ্দিষ্ট দেশ বা জাতির ইতিহাস সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে অন্যান্য

দেশ ও জাতির ইতিহাসের আলোচনা স্বল্প বিস্তর করিতে হয়, নতুবা আমরা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সেই দেশের কি স্থান তাহা বুঝিতে পারিব না। মনুষ্য-জীবনের সম্পূর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যেমন সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করিয়া বিশ্ববিধানের নিয়মাধীন হইয়া আমাদের ব্যক্তিগত জীবন পরিচালিত করিতে হয়, জাতীয় জীবন গঠনেও তদ্রূপ সাপেক্ষতার অনুভূতি একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্য দেশ ও জাতির সহিত আমাদের কি সম্পর্ক, তাহাদের সহিত সংঘর্ষে আমাদিগের জাতীয় জীবন কি প্রকার আলোড়িত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি অসম্ভব। আজকাল আমাদের দেশে যে প্রণালীতে ইতিহাসচর্চ্চা হইতেছে তাহাতে আমরা নিজের দেশ লইয়াই ব্যস্ত; অপর দেশের খবর তাহাতে বিশেষ পাওয়া যায় না। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে স্বদেশের ইতিহাস সর্ব্বাগ্রে জানা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিদেশকে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না। স্বদেশকে ভাল করিয়া জানিতে হইলে বিদেশকেও চিনিতে হইবে। কাব্য উপন্যাস বা নাটককে খাটি স্বদেশী উপকরণে পরিপুষ্ট করা যাইতে পারে, কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে কেবলমাত্র স্বদেশী আন্দোলন করিয়া বিদেশীকে বয়কট্ (Boycott) করিলে আমরা ইতিহাসের সম্পূর্ণতা বা সার্ব্বজনীনতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব না; সমগ্র পৃথিবীর ঘটনাবলীর ভিতর বিশ্বনিয়ন্তার যে একটা বিশ্ববিধান ওতপ্রোতভাবে নিহিত আছে, এই ধ্রুবসত্য উপলব্ধি করিতে পারিব না। কোন নির্দ্দিষ্ট দেশ বা জাতির ইতিহাস যতই বৈচিত্র্যপূর্ণ হউক না কেন তাহা পৃথকভাবে পাঠ করিলে ইতিহাস অধ্যয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হইবে না। আমাদের দেশে য়ুরোপীয় কাব্য নাটক উপন্যাসের বহুল অনুবাদ হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় য়ুরোপীয় ইতিহাসের আজ পর্য্যন্ত কোনপ্রকার অনুবাদ হয় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত একটিও সুলিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাস দেখিতে পাই নাই, অথচ বিদেশী ছোট ছোট গল্পের অনুবাদ করিয়া অনেকেই বঙ্গ-সাহিত্যকে পুষ্ট করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। দেশীয় সাহিত্যের নূতন যুগে এরূপ উদাসীনতা কি নিন্দার কথা নহে? সমস্ত পৃথিবীর ঘটনাস্রোতের গতি নির্দ্ধারণ করিতে হইলে জগতের ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে, মহান্ ঐতিহাসিক ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, নচেৎ ইতিহাস চর্চ্চা পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে।

প্রাকৃতিক ও নৈতিক অবস্থাভেদে বিভিন্ন জাতির সভ্যতা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। অবস্থান্তরে জাতিগত ভাবের পার্থক্য হয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাচক্রের ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের গতি অচিন্ত্যপূর্ব্ব পথে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন জাতির আদর্শ স্বতন্ত্র ও লক্ষ্য পৃথক হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশের, সমগ্র জাতির কার্য্যকলাপের ভিতর, সমগ্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ভিতর, স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা আছে, মঙ্গলময়ের একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। জাতিগত আদর্শ যতই পৃথক বা পরস্পর-বিরুদ্ধ হউক না কেন তাহার গতি অলক্ষিত ভাবে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনা, প্রত্যেক মহাপুরুষের কার্য্যাবলী, এমন কি যুদ্ধ বিগ্রহ —যাহা প্রলয়াবতারের তাণ্ডব নৃত্য বলিয়া বোধ হয়— সব সেই বিশ্বস্রষ্টার মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের উপাদান মাত্র। বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্ববিধানে সেই মহৎ উদ্দেশ্য যে কি তাহা বুঝিতে হইলে ইতিহাসের সার্ব্বজনীনতা অনুভব করিতে হইবে। সমগ্র মানবসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন মহাপুরুষের সেই মহৎ উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডের জনৈক দার্শনিক এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—

"......to show how each transaction has been by its consequences a part of a combined whole, having for its general issue the improvement of human society; how each leading individual, whatever may have been the motive or the quality of his conduct, was an agent, though free and unconscious, in the execution of the plan of a wise and beneficent providence."

পণ্ডিতপ্রবরের উদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে সমগ্র দেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাবলীর ফল বিভিন্ন নিয়মের অধীন হইলেও বিশ্ববিধানের অনুগত হইয়া মোটের উপর মানব-সমাজের কল্যাণ সাধন করিতেছে। এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে ভগবানের বিশ্ববিধানের ভিতর যে একটা নৈতিক শাসন (moral government)

আছে তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ভিতরও সেই শাসন লক্ষিত হয়। কালচক্রে এক জাতির অভ্যুদয় ও অপর জাতির অধঃপতন হইয়া থাকে। এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ভিতর অব্যবহিত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ লক্ষিত না হইলেও উহা বিধাতার বিশ্ববিধানের অঙ্গীভূত। যাহা আপাত অমঙ্গলকর বলিয়া মনে হয় পরিণামে তাহা হইতে সমগ্র মানব-জাতির অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যাপারকে ঘটনা-সমষ্টির অংশ-স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে কোন ঘটনা-বিশেষকে পৃথক ভাবে আলোচনা করিলে তাহার ফলাফল বা গুরুত্ব আমরা সম্যক বুঝিতে পারিব না। শান্ত নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে ভগবানের নৈতিক শাসনের ফলে মনুষ্যজাতির ক্রমোন্নতি হইতেছে। এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করাই ইতিহাস পাঠের চরম সার্থকতা।

ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বাস্তব জগতে তাঁহার অসীম করুণা ও অপার মহিমার পরিচয় পাই। সমগ্র বিশ্বচরাচরে একটা সুব্যবস্থা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা অবলোকন করিয়া আমরা সেই মহাপুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পাই। একটু চিন্তা করিয়া পাঠ করিলে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ভিতরও ভগবানের বিধান ও ব্যবস্থা লক্ষিত হইবে। প্রাকৃতিক নিয়মাদি সনাতন ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া বাস্তবজগতের শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা আমাদের শীঘ্রই অনুভূত হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর মানুষের প্রভাব থাকায় তাহার স্রোত সহস্রমুখ হইয়া চিরবৈচিত্র্যের ভাব ধারণ করে। কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে যদি একটা নিয়ম বা শৃঙ্খলা না থাকে তাহা হইলে মঙ্গল-ময়কে আমরা বিশ্বনিয়ামক বলিতে পারি না। তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে তাঁহার সৃষ্টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। একদিকে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, নিয়মের রাজ্য; অপরদিকে সবই অনিয়মিত, অব্যবস্থিত, বিশৃঙ্খল। মানুষের কার্য্যপ্রণালীতে এরূপ ক্ষুদ্র শক্তি বা ভ্রান্ত বিচারের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী তাঁহার কার্য্যকলাপে এরূপ খুঁৎ থাকা আদৌ সম্ভবপর নহে।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিশ্ববিধানের অনুগত, এবং বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্ববিধানে সমগ্র মানব-সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতেছে, এই সত্য অনুভব করিতে পারিলে আমরা মনে শান্তি পাইব, বিশ্ববিধানের অনুগত হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে পারিব, সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া উন্মার্গগামী হইব না। পৃথিবীর গতি উন্নতিশীল, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা এই সত্য প্রতি-পাদন করিতে রত, কবি কল্পনা-বলে ইহা অনুভব করিয়াছেন—

> ......"One far-off divine event,
> To which the whole creation moves."—

ইতিহাস তাহার জীবন্ত সাক্ষী।

শ্রীলাবণ্যলাল মুখোপাধ্যায়।

অভিমান

(গল্প)

সমস্তটা যৌবন বিধবার ন্যায় কাটাইয়া যৌবন-সীমায় তারা যখন সত্য-সত্যই বিধবা হইল, তখন তাহার মনে একটা অজ্ঞাত বিষাদ ছাড়া আর কোন লাভ-লোকসানের খতিয়ান হয় নাই।

প্রাপ্ত যৌবনে যখন তাহার বিবাহ হয়, সম্মুখের ভবিষ্যৎকে সে তখনই কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। সে রূপ-হীনা বা দরিদ্র-কন্যা না হইলেও এই কৌলীন্যাভিমানী পত্নীব্যবসায়ী স্বামীর দুষ্প্রাপ্য কুটীরে যে তাহার স্থান হইবে না তাহা সে বেশ বুঝিয়াছিল; তথাপি লোকে একটা ভবিষ্যতের আশা করে, তাই সকলের সঙ্গে সঙ্গে সেও আশা করিয়াছিল, যদি কালে তাহার স্বামীর অখণ্ড কৌলীন্যের উত্তরাধিকারী কেহ তাহাকে মাতৃত্বের গৌরবে তৃপ্ত করে, তাহা হইলে সে আপনার ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার আশা করিতে পারে। তাহা যখন বিধাতার অভিপ্রায় নয়, তখন সে ভ্রাতৃগৃহেই আপনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল।

জন্মাবধি একটা দুর্জ্জয় অভিমান তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই জন্মিয়াছিল,—তাহার অপ্রতিহত আধিপত্য হইতে সে কোনোদিনই আপনাকে মুক্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু,

এমনই অদৃষ্টের খেয়াল যে, ছোট বেলায়ই সমস্ত অভিমানের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া তাহার মা জীবন-যবনিকার আড়ালে লুকাইল। যখনই সে সংসারের সমস্ত ভুল ক্রটি আলোচনা করিত, তখনই তাহার অভিমানাহত ক্ষুব্ধ চিত্ত সংসারের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিত; প্রধান কারণ, কেহ তাহার মনের কথা বোঝে না। সেও কাহারো কাছে অভাবের অভিযোগ করে না। ইহাতে তাহার মন সঙ্গেসঙ্গে বেশ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, কেহ কখনো কোন কারণে তাহার চোখে জল দেখে নাই; লোকলোচনের বহির্ভাগে তাহার অশ্রু যে জমাট বাঁধিয়া তাহার বক্ষে পাষাণ চাপাইয়াছে, তাহা কেহ অনুমানও করে নাই। তারপর, আদর আবদারের প্রধান বিশেষ্য স্বামী,—তিনি ত তাহার কর্ত্তৃপদ উহ্য রাখিয়াই চলিয়াছেন। পরিশিষ্টে কেহই নাই, ইদানী কাহারও আমদানীরও সম্ভাবনা নাই।

বাৎসরিক কর আদায় করিতে, তাহার স্বামী-দেবতা মূর্ত্তিমান বজ্রশ্রীতে বর্ষান্তে একদিনের জন্য উদয় হইতেন, কাজেই তাঁহাকে অপরিচিত বলিতে পারি না। কিন্তু, তারা ঐ একদিন, সারা বৎসরের সেরা ঐ একদিনও তাঁহার সহিত অপরিচিতের মতই ব্যবহার করিত।

স্ত্রীচরিত্রাভিজ্ঞ কুলীন স্বামী তারার এই অলোকসাধারণ ব্যবহার ও দৃঢ়ভাবাত্মক মুখশ্রীতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইত, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কোনো মন্দ কথা ভাবিতে সাহস হইত না। একদিন পাটরাণী বা প্রথমা পত্নীর অঙ্কে মস্তক রাখিয়া গ্রামকে-গ্রাম আঁধার করিয়া স্বামী বেচারা অন্তর্দ্ধান হইলেন,—আর তাঁহার গৃহরাজ্য যে প্রথমার গর্ভজাত কুমার-কুমারীই পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ-দখল করিবে, ইহা কাহারো অবিদিত রহিল না।

তারা একাকী—তারা নিঃসহায়!

বিমাতৃ-গর্ভজাত ভাই, ভাই বটে, কিন্তু এক স্তন্যে বর্দ্ধিত নয়; এইটুকু ব্যবধান কাহারো মুখে বা কার্য্যে প্রকাশ পাইত না, কিন্তু অন্তরের অন্তরালে যে কথা অবস্থান করে, তাহা অভিমানের অগোচর থাকে না;—তাই সে মনে করিত, সে একাকী, সে নিঃসহায়।

ইহার মধ্যে একটি অভাবনীয় কাণ্ড প্রায় সমস্ত বর্ত্তমানটাকে উল্টাইয়া দিল। গ্রামান্তরবাসিনী তাহার কোনো পরিচিতা সপত্নী, নিরাশ্রয়তানিবন্ধন স্বামীর নবজাত দানটিকে তাহার সঙ্কুচিত হস্তে অযাচিত আগ্রহে অভাবনীয় রূপে স্থাপন করিয়া জগৎসংসারের ফাঁকিতে দিশাহারা হইয়া আপনি সকলকে ফাঁকি দিল।

তারা ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এই স্বামী-শাবকের ভার গ্রহণ করিল। তাহাতে আর কাহারো কিছু আসিয়া যাইতেছিল না, কিন্তু ভ্রাতৃজায়ার পক্ষে এ ব্যাপারটা নির্ব্বিবাদে সহিয়া যাইতে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল; তাহার কতক তরঙ্গ ভাইএর ভঙ্গুর প্রাণে যে আঘাত করে নাই, এমনও নয়; এবং সংসার-সাগরের জোয়ার-ভাটার আকস্মিক পরিবর্ত্তনে, কোন একটি নূতন কাণ্ডের অবতারণা অবশ্যম্ভাবী; ফলে, শিশুসহ তারা পৃথকান্ন হইল।

পৃথকান্ন হইলে অন্নপ্রাপ্তি যে কিঞ্চিৎ কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বিধাতা কি দুর্জ্জয় অভিমানই নারী-হৃদয়ে দিয়াছিলেন।

সামান্য মনোমালিন্যের পরিবর্ত্তে সে সকল আয়াসসাধ্য কার্য্য স্বীকার করিয়া লইল। দুই-এক ঘর সাধারণ শিষ্য যজমান যাহা তাহার অংশে পড়িয়াছিল,—তাহা সে আপনি মাহিয়ানায় লোক খাটাইয়া রক্ষা করিত, এবং নিরাশ্রয়া ব্রাহ্মণকন্যা যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে নির্দ্দোষ নির্ব্বিঘ্নে আপনার অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারে, সমস্ত অপমান অভিমানে সংবৃত করিয়া সে তাহাই আরম্ভ করিল।

আপনার অটল পণে আপনি অটুট থাকিলেও এই ক্ষুদ্র শিশুহৃদয়ের কাছে সে অনেকখানি কোমল।

শ্রীমান নলিনীর জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা অতীব সামান্য জিনিস হইলেও এবং নিজের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইলেও সে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া দিত।

কিন্তু, মাত্রাধিক পরিমাণ আদর ঢালিয়াও তাহার সর্ব্বোপরি দৃষ্টি ছিল বালকের শিক্ষার প্রতি। যেমন করিয়া হউক তাহাকে পড়াইতে হইবেই; ভবিষ্যতে যে নলিন্ তল্পী বহন করিয়া বেড়াইবে, এ কল্পনা তারার [illegible]ক্ষে অসহ্য।

(২)

দিনান্তের ম্লান কান্তির মত শান্তমূর্ত্তি তারা আপনার

অন্তরের মধ্যে রৌদ্ররস পোষণ করিত; তাহা তাহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন। সে অনায়াসে আপনার যাহা কিছু আছে বিক্রয় করিয়া ও বাড়ী বন্ধক দিয়া নলিনকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। নলিনের পড়িবার সুবিধার জন্য সে আপনার সহস্র অসুবিধা বরণ করিয়া লইল।

আত্মীয়হীন দেশে উদরান্ন সংস্থানই তাহার পক্ষে দুষ্কর ব্যাপার, তাহার উপরে পড়ার খরচ—!

পাচিকা-বৃত্তিতে যখন কলেজ-খরচ কুলাইয়া উঠা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন অগত্যা তারা কৌলীন্য-রীতি অবলম্বন করিল। কোনো বংশজ বংশীয় বড়মানুষের কন্যাকে যথোচিত দক্ষিণাসহ দান গ্রহণ করিয়া, প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ নলিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের খেয়ার কড়ি যোগাড় করিয়া দিল। অবস্থা বিপরীত হইয়া না দাঁড়াইলে সে অত্যন্ত বুদ্ধিরই কাজ করিয়াছিল; কিন্তু সে গোড়ায় এতখানি বুঝিয়া এইটুকু বোঝে নাই যে সকলেই তাহার মত রুদ্ধহৃদয় নয়।

বধূ লইয়া ঘর করিতে সকলেরই সাধ যায়, কিন্তু গৃহহীনার গৃহস্থালি কোথায়? বিবাহের আশীর্ব্বাদান্তে বধূ তাহার দুর্লভদর্শন হইল।

নলিন শ্বশুরালয়ে সুসজ্জিত পাঠাগারে স্থান পাইয়াছে; তারার মুখের গ্রাস বাঁচাইয়া আর তাহার তৃপ্তি সাধন করিতে হয় না; উপযুক্ত ভোজ্য পানীয় প্রচুর রঙ্গরসের সহিত যে সে তিন বেলা উদরস্থ করিত, তাহা না বলিলেও চলিবে। শ্বশুর মহাশয় ফড়িয়ার মতো জামাতা-রূপ ফলটিকে লুটিয়া লইয়াছেন, নিষ্ফলা বৃক্ষের মত তারার আর কোনো আবশ্যক নাই। অবশ্য তিনি যে মাতৃসহ জামাতৃপালন করিবেন, ইহা কোনো শাস্ত্রেই নাই, তারাও তাহা সহ্য করিতে পারিত না; কিন্তু তারা পূর্ব্বে ইহা মোটে বুঝিতেই পারে নাই যে বৈবাহিক কন্যাকে দান না করিয়া ঋণ দিয়াছেন,—সুদ-রূপী জামাতা আদায়ই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

তারা আপনার চির-অনাদৃত জীবন লইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকিতে চায়, কারণ লোকের সহস্র চক্ষু দৃষ্টির খোঁচা দিয়া দিয়া যদি তাহার সহস্র অভাব দেখিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার অপ্রতিহত অভিমানে অত্যন্ত আঘাত লাগিবে। সে যে আত্মীয়হীন তাহা সে আপনার সৌভাগ্য বলিয়াই বিবেচনা করিত; সে অবহেলার দান চায় না; কিন্তু পরের বোঝা মাথায় করিয়া তাহাকে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইয়াছে এইখানেই তাহার অভিমান। তবু এখন সে মুক্ত, অনেক খানি মুক্ত!—

আপনাকে সহস্রবার মুক্ত মনে করিয়াও সে মুক্ত হইতে পারিতেছিল না। মনে একটা আত্মবোধ জন্মাইবার জন্য সজোরে সে মনের উপর কড়া হুকুমে কর্ত্তৃত্ব করিল। নলিনের আপত্তি ও অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া সে আপনার পরিত্যক্ত মাতৃভূমিতে ফিরিয়া গেল। যে আঘাতের জন্য সে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল সে বড় ভয়ানক আঘাত।

তাহার চির পরিচিত আকাশ বাতাস,—সেই তৃণ তরু লতা,—সবই তেমনই আছে, কিন্তু কিছুই তাহার নয়, কিছুই তাহাকে তেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিল না, যেন কোন কিছুর মধ্যেই তাহার স্থান নাই।

চিরদিনের উপেক্ষিত হৃদয়ে এই অনিবার্য্য উপেক্ষা তেমন বেদনা দিতে পারিত না, যদি সে কোনো দিন সুখের কল্পনা না করিত। যাহা আপনার নয়, আপনার হইতে পারে না, তাহারই উপরে আপনার সমস্তখানি ভবিষ্যৎকে অঙ্কিত করিয়া তোলা যে কি পরিমাণ মূঢ়তার কার্য্য হইয়াছে, তাহা সে ভাবিয়াই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। নিরাশ্রয় চিত্ত শুধু অভিমানকে অবলম্বন করিয়াই আপনার জীবনযাত্রা সহজ করিয়া লইল। পরমুখাপেক্ষী হওয়া তাহার কর্ম্ম নয়, যদিও তাহার অদৃষ্ট তদনুযায়ীই।

সে পৈতা কাটিয়া নিমন্ত্রণ যজ্ঞের রান্না রাঁধিয়া আপনার হবিষ্যান্নের যোগাড় কোনো মতে করিয়া লইল।

চারি বৎসর উপর্য্যুপরি চেষ্টায় একখানি ডিপ্লোমা বাহির করিতে না পারিয়া, অনাদৃত লজ্জিত নলিনী যখন ইউনিভারসিটির পায়ে সেলাম করিয়া, কপাল ঠুকিয়া বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার অপমানক্ষুব্ধ মুখখানি খালি তারাকে দেখাইতে লজ্জা বোধ করে নাই। এত দিনের পরে নলিনকে কোলের কাছে পাইয়া তারার তপ্ত হৃদয় কিছু শান্ত হইবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু যখন

শুনিতে পাইল অকম জামাতার উপর কন্যার ভার প্রদানে শ্বশুর মহাশয়ের প্রবল আপত্তি ও কন্যারও সুস্পষ্ট কোনো মতামত নাই,—যদিও তাহার পোষ্যপালনের মত কিছুই নাই তথাপি—তখন তারার চাপা অভিমান আবার দ্বিগুণ তেজে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কেন তাহারা আর একটু বিনীত হয় নাই!—

তারা জিজ্ঞাসা করিল "তোমায় লোকের বাড়ী ছেলে পড়িয়ে পড়তে হবে, রাজি আছ কি না?"

আদেশের নামান্তর এই জিজ্ঞাসার উপর কোনো আপত্তি করিতে নলিনের সাহস হইল না, কিন্তু পরীক্ষার ফল গতানুগতিক হইবারই সম্ভাবনা, তাহা সে ধ্রুব নিশ্চয় করিয়া লইয়াছিল। ফিরিয়া কলিকাতায় যাইয়া অন্য কলেজে নলিন ভর্ত্তি হইল। তারাও সঙ্গে গেল।

ভর্ত্তি হওয়া যে সহজসাধ্য হয় নাই তাহা সহজবোধ্য। বহু চেষ্টা ও অনুসন্ধানের ফলে নিতান্ত অদৃষ্টক্রমে নলিনের একটা প্রাইভেট টিউটারী আর তারার একটা রাঁধুনীগিরি জুটিয়া গেল। প্রায় পাশাপাশি বাড়ীতেই থাকা হইত, কাজেই তারার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নলিনের উপর কড়া পাহারার কাজ করিত। নলিনকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়া ঠাকুর দেবতা যাহা কিছু আছে সকলের নামে দিব্য দিয়া, নিজের পা ছোঁয়াইয়া প্রতিজ্ঞা করাইল এক বৎসরের মধ্যে শ্বশুরালয় সম্পর্কীয় কাহারও সহিত দেখা করিতে পারিবে না।

প্রতিমার কথা মনে হইলে নলিনের মনখানি যে চঞ্চল হইয়া উঠিত না এমন নয়, কিন্তু সম্মুখের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করার সাধ্য তাহার ছিল না। আর তারার স্বহস্ত-পালিত তরুণ হৃদয় যে অভিমানশূন্য ছিল এমনও নয়।

দিন কাটিল অনেক। মাহিনার টাকা মাহিনায় ফুরায়, ছাত্র-বাড়ী অন্ন এবং তারার রোজগারে বস্ত্র তথা কাগজ কলম চালাইয়া বৎসর ঘুরিয়া আসিল। নিরুদ্দিষ্ট জামাতার অনুসন্ধান করিয়া শ্বশুর বিফলমনোরথ হইয়াছেন; দেশ গাঁয়ের দূত ফিরিয়া কহিল, না, ও ছেলে বেমালুম নিখোঁজ।

যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তখন যে নামের লিষ্টে নলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্পষ্টরূপেই লেখা ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আর সে লিষ্ট পড়িয়া শ্বশুর-সম্প্রদায় যে সন্দেহে খানাতল্লাসী করিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কলেজের আশে পাশে অনুসন্ধান করা ব্যতীত আর কোনো উপায় ছিল না।

নলিনীর আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও তারার আদেশ অবহেলা করিবার তাহার কোন ক্ষমতা ছিল না। পুনরায় দুই বৎসরান্তে আইন পাশ করিয়া নলিনী ব্যবসায়ের আয়োজন করিল।

তারার বক্ষের শোণিত-সদৃশ শ্রমোপার্জ্জিত অর্থগুলি ফিসে খরচ হইয়া গিয়াছে। মূলধন না হইলে আইনের ব্যাপার চলে না; এই ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ানোর মত ব্যবসায় নলিনের সাজে না। তারা এইবার বধূ আনিবার জন্য নলিনকে পাঠাইল। তারা যেরূপ ভাবে যাইয়া ধূলা-পায়েই বধূকে আনিবার কথা বলিল, তাহাতে উৎসাহিত নলিনের মনে হইল আনিতে হইবেই।

(৪)

প্রতিমাকে আনিতে যাইয়া নলিনী বিশেষ মুস্কিলেই পড়িল। এত দিনের অনুপস্থিতির প্রাপ্য এবং পূর্ব্বের বাকী বকেয়া আদর আবদার একেবারে বর্ষিত হইয়া, তাহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলিল।

তাহাদের সম্মিলিত মতামতের সার সংগ্রহ এই—প্রতিমার যাওয়া হইবে না, কারণ, খোকা খোরপোষের অভাবেই মারা যাইবে। নলিনী এখানেই থাকিবে, শ্বশুর মহাশয় সমস্ত বিষয়েরই বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। বন্দোবস্তটা যখন তাঁহাকেই করিতে হইবে, তখন তিনি সেটা রাঁধুনীর বাড়ীতে করিতে রাজী নহেন। নলিনী ব্যাপার দেখিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল; প্রতিমাকে জানাইল, তাহাকে যাইতে হইবেই, না হইলে সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত। আয়োজন সমস্তই হইল; দুইদিন ধরিয়া দুইজনে পরামর্শ ঠিক করিল, প্রতিমার যে অলঙ্কার আছে, তাহাতেই বসবাস ঠিক করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিবে, পরে একটা গতি হইবেই। শ্বশুরের উপরও একেবারে ভরসাশূন্য হওয়া যায় না।

তাহারা কখন্ আসিয়া পৌছিবে তারাকে সংবাদ দিয়া রাখিয়াছিল। প্রায় শেষ রাত্রে যখন তাহারা বাসার কাছে গাড়ী থামাইয়া তারাকে উঠাইয়া লইবার জন্য নামিয়া

পড়িল, তখন নলিনী আপনাকে অনেকটা হাল্‌কা মনে করিল।

কিন্তু কই?—তারা যে বাসায় নাই! ডাকাডাকি করিয়া দরোজা ঠেলিয়া ঝির কাছে শুনিল, তারা সন্ধ্যার ট্রেনে কাশী চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীসরযূবালা সেনগুপ্তা।

গুল্‌বর্গা

হায়দরাবাদে দর্শনীয় বহু দ্রব্য আছে; এমন কি দেশের লোকগুলি পর্য্যন্ত কৌতূহল উদ্রেক করে। এই দেশকে দেখিলে বিস্মৃতিগর্ভে লুক্কায়িত বহু পুরাতন বিগত মুসলমান রাজগণের স্মৃতি বারবার মনে জাগিয়া উঠে। মনে হয় যেন অনেক বিষয়ে পূর্ব্বের সেই স্বেচ্ছাচারী শাসনের প্রাদুর্ভাব এখনও রহিয়াছে। যেমন হায়দরাবাদ দেখিবার মত সহর, সেইরূপ এই রাজ্যে দ্রষ্টব্য আরও কয়েকটি সহর আছে। আমরা এখানে এইরূপ একটি প্রাচীন সহরের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব যাহা একদিন ধনে জনে বৈভবে কর্ম্মকুশলতায় বেশ একটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই সহরের নাম গুল্‌বর্গা অর্থাৎ গোলাপের পাপড়ি। প্রত্যেক নিজামকে সিংহাসন অধিরোহণের পর এখানে একবার আসিতে হয়, কারণ গিজো দিরাজ নামক একজন ফকীরের সমাধি এখানে রহিয়াছে। যখন বর্ত্তমান নিজাম সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন সেই সময় গুল্‌বর্গার আশে-পাশে ভয়ানক প্লেগ হইতেছিল। প্লেগের ভয়ে নিজাম যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু নিজামের মাতা তাহা শুনিলেন না, তিনি জিদ করিয়া ধরিলেন পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়াছেন তাহা করিতেই হইবে, তাহাতে প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার। ফকীরের এই সমাধি দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদের অনেকেরই নিকট অতি পবিত্র বস্তু এবং প্রতি বৎসরই এখানে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। কথিত হয় যে এই ফকীর পঞ্চদশ শতাব্দীতে দিল্লি হইতে গুল্‌বর্গায় আগমন করেন এবং সুলতান ফেরোজসাহ অতি সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু আদর আপ্যায়নের এই ঘনিষ্ঠতা বেশী দিন টিকিল না। কিন্তু নিজামের ভ্রাতা ফকীরের সঙ্গে খাতির রাখিলেন; ফলে নিজামভ্রাতা ও ফকীরের মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্ব গজাইয়া উঠিল। ফকীর নাকি একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে নিজামভ্রাতার পুত্রই গুল্‌বর্গার সিংহাসনে আরোহণ করিবে। সেই জন্য সুলতান যেদিন পুত্রের মঙ্গলকামনা করিয়া ফকীরের আশীর্ব্বাদের প্রত্যাশী হইয়া দাঁড়াইলেন সেদিন ফকীর নিজামপুত্রকে ভাবী নিজাম বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলেন না। ইহাতে সুলতান এরূপ ক্রোধান্বিত হইলেন যে তখনই তাঁহাকে সহর ছাড়িয়া বহুদূরে যাইতে হুকুম দিলেন—সহরে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া গেল। ফকীর সহর ছাড়িয়া কিছুদূরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু মধুলোভে অলিগণ যেরূপ জোটে সেইরূপ ফকীরের নিকট বহু শিষ্য জুটিয়া গেল, দিনে দিনে তাঁহার বিমলযশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শিষ্যগণ ফকীরের একটি সুন্দর সুদৃশ্য সমাধি-ভবন গড়িয়া দিয়াছিলেন। কিছুদিন হইল নিজামের আদেশে ইহার সংস্কার হইয়াছে। এই সমাধিভবনের নিকট আরও কয়েকটি ইমারত আছে যাহা দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতে ত্রুটী করে না। এইগুলি আওরঙ্গজেবের সময় নির্ম্মিত।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে বিদরে বাহমনীরাজ্যের রাজধানী উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে বাহমনীরাজ্যের রাজধানী-রূপে গুল্‌বর্গা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। বাহমনীরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হাসান ত্রিশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত গাঙ্গু নামক একজন ব্রাহ্মণের ক্ষেতে কাজ করিত। কাজ করিতে করিতে সে একদিন কি একটা শক্ত জিনিস পাইল; খুলিয়া দেখে প্রাচীন মুদ্রার কলসী। হাসান তাহা ব্রাহ্মণের নিকট লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ তাহাকে অর্থ সমেত রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই প্রাপ্ত অর্থের বিনিময়ে সুলতানের নিকট তাহার কার্য্য জুটিল ও দিন দিন সে উচ্চপদে উঠিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ তাহার কোষ্ঠি গণিয়া পড়িয়া দেখিলেন সুদূর ভবিষ্যতে রাজ-টীকা তাহার ললাটেই অঙ্কিত হইবে। হাসান দৌলতাবাদের শাসনকর্ত্তার অধীনে কাজ পাইয়াছিল। সেইখানে সে জায়গীরও পাইয়াছিল—তাহাতে তাহার বেশ দু'পয়সা রোজগারও হইত।
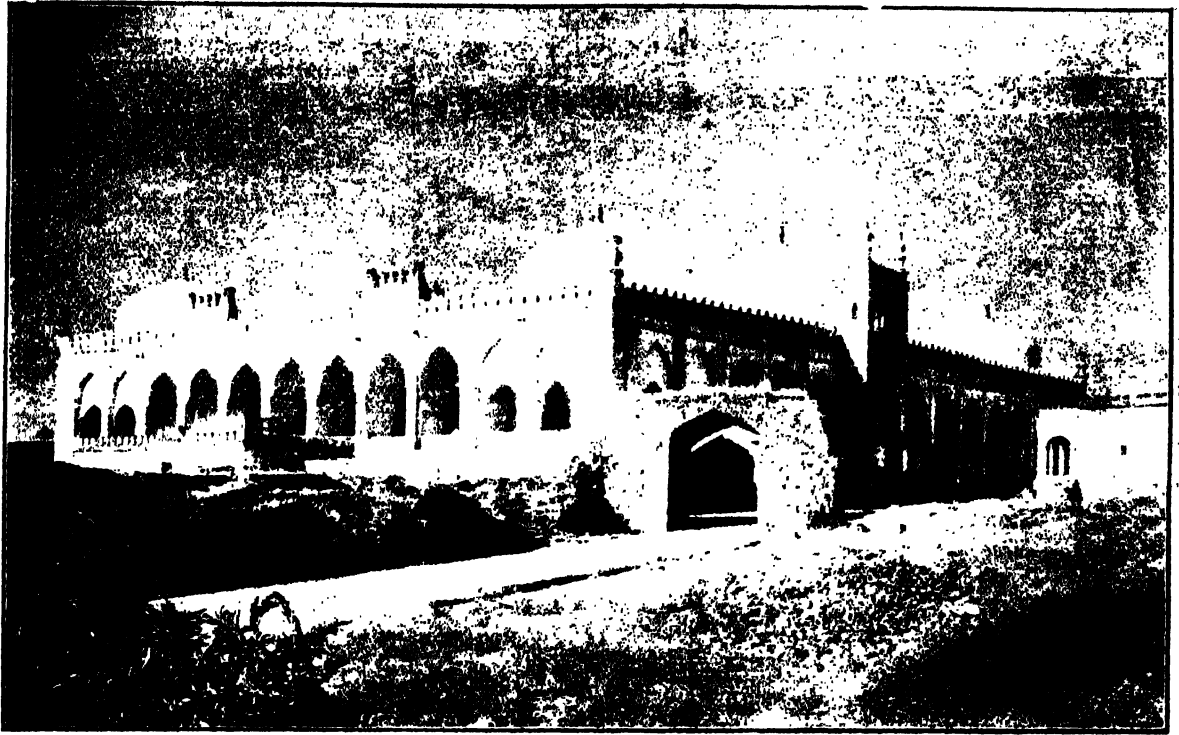
গুলবর্গার বৃহৎ মসজিদ।

গুলবর্গার মসজিদের ছাদ।
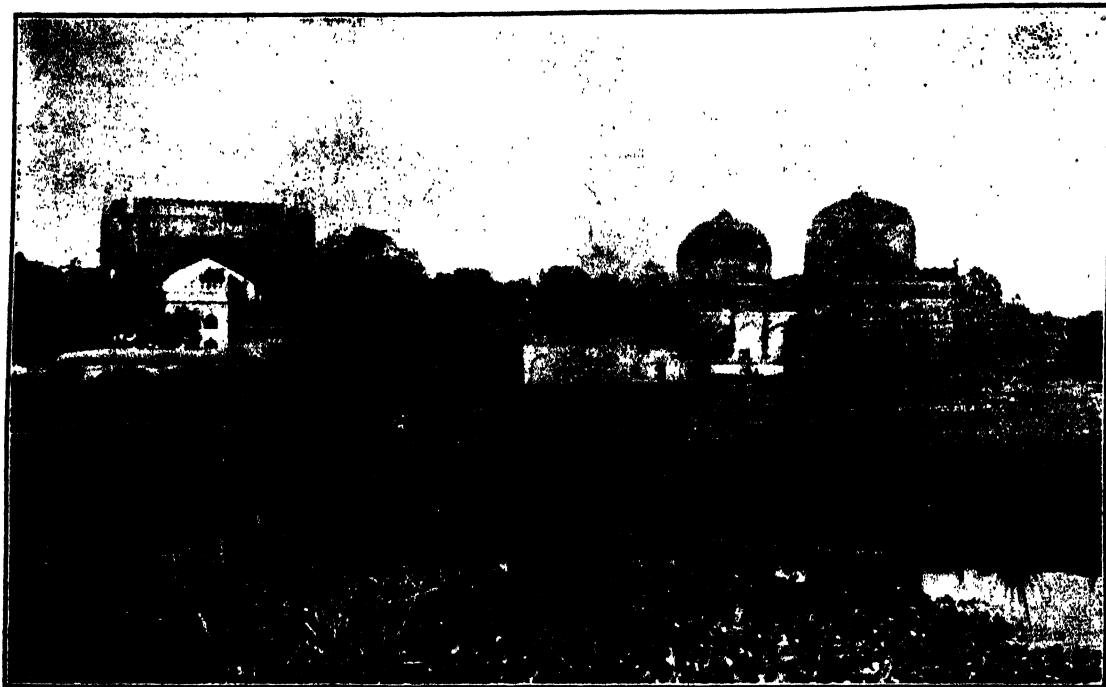
গুলবর্গায় বাহমনী রাজাদের সমাধিমন্দিরের সমষ্টির দৃশ্য।
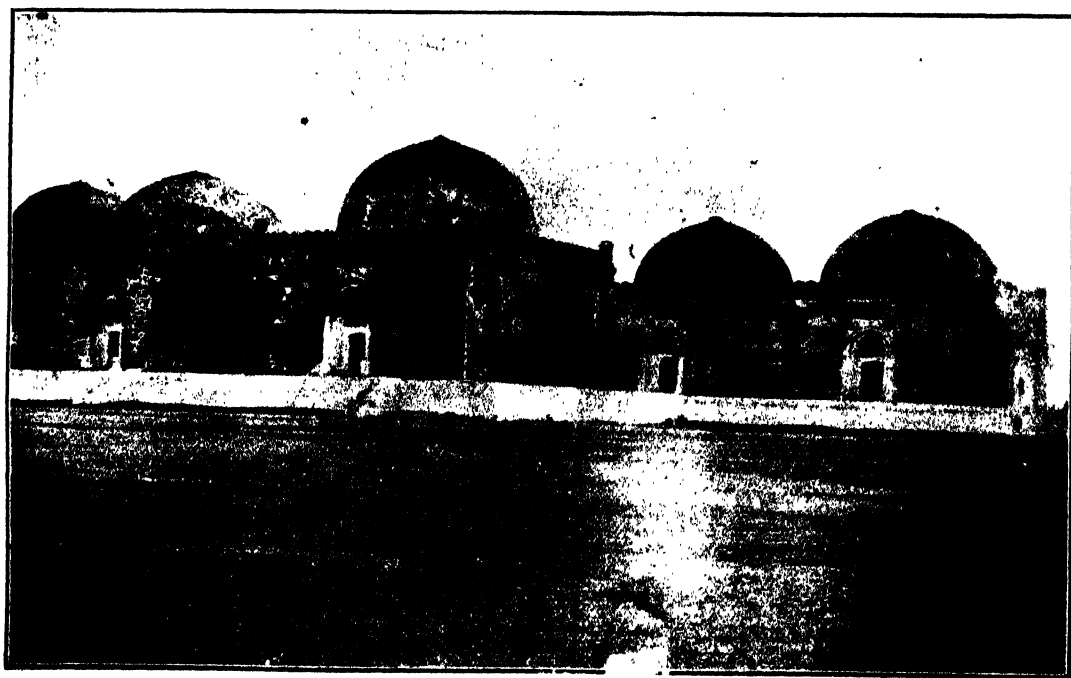
গুলবর্গায় বাহমনী রাজাদের সমাধিমন্দির।
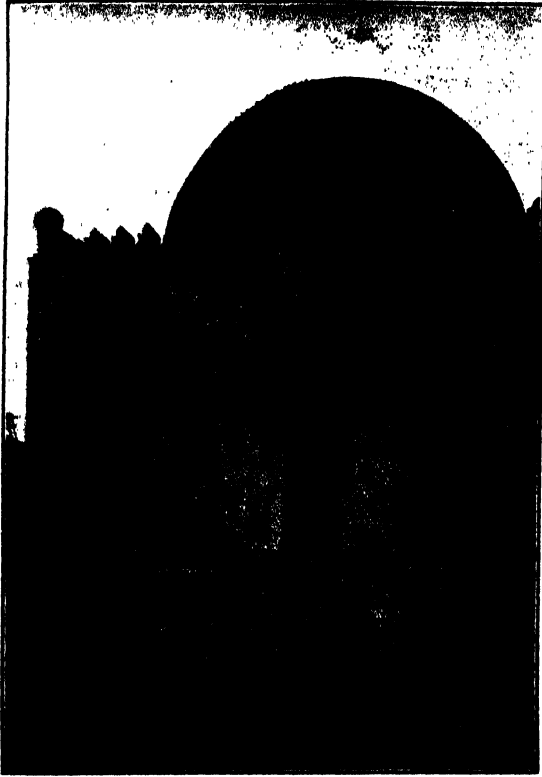
গুলবর্গায় বাহমানী রাজের সমাধিমন্দির।
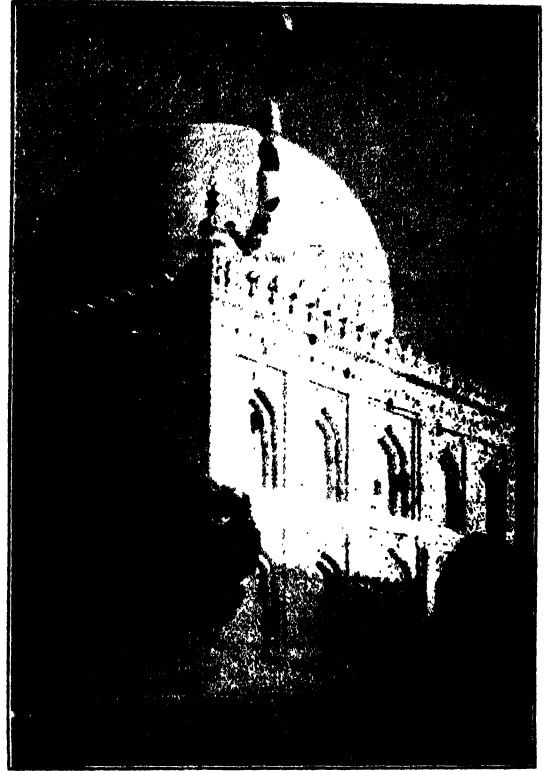
গুলবর্গার পীরের সমাধিমন্দির।

মহম্মদ তোগলকের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া হাসান যখন দৌলতাবাদে সসৈন্য প্রবেশ করিল, তখন একটা বিরাট আন্দোলন পড়িয়া গেল; ফলে সে-ই সিংহাসনে অধিরোহণের উপযুক্ত নির্ব্বাচিত হইল। এখন হইতে মজুর হাসান হইল সুলতান আলাউদ্দীন হাসান কানগো বাহমনী ও বাহমনীবংশের প্রতিষ্ঠাতা। গুল্‌বর্গাই হইল তাঁহার রাজধানী। নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি নির্ব্বাচনের মর্ম্ম ও সম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার গুণগরিমার প্রশংসা করিয়া থাকেন। একজন লেখকের মতে "মুসলমানদের মধ্যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর অসমসাহসিক লোকের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সংখ্যা ও নিষ্ঠুরতার কলঙ্কশূন্য কৃতকার্য্যতার দৃষ্টান্ত বিরল।" দিল্লীর নবাবেরা দেখিলেন ইহাকে লইয়া নাড়াচাড়া করা ভাল নহে; সুতরাং সুবিধা ও সুযোগ পাইয়া হাসান অবাধে রাজ্য বিস্তৃত করিয়া ফেলিলেন। তিনি স্বীয় মন্ত্রীকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। তৎকালে উপস্থিত লোকগণের মতে এরূপ ধুমধাম জাঁকজমক পৃথিবীতে কদাচিৎ হইয়া থাকে। জনৈক লেখক বলিতেছেন—

"সম্ভ্রান্ত লোক ও অন্যান্য বহুলোককে স্বর্ণ-সাটিন কিংখাব ও মখমলের দশ সহস্র পোষাক বিতরিত হইয়াছিল। সহস্র আরব ও ইরাণী অশ্ব ও মণিমুক্তাখচিত দুইশত তরবারিও বিতরিত হয়। জনসাধারণ নানারূপ আমোদ প্রমোদ দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিল, গাড়ী গাড়ী বোঝাই মিষ্টান্ন পথে পথে লোককে বিতরণ করা হয়; এক বৎসর ধরিয়া এই আনন্দোৎসব চলে—উৎসবের শেষদিন সম্ভ্রান্ত লোকগণ ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীরা সুলতানকে মণি মুক্তা হীরক ও নানাদেশ হইতে সমাহৃত দুর্লভ বস্তুসমূহ প্রদান করে।"

সুলতান হাসানের কার্য্যকলাপ সকলের প্রীতি ও
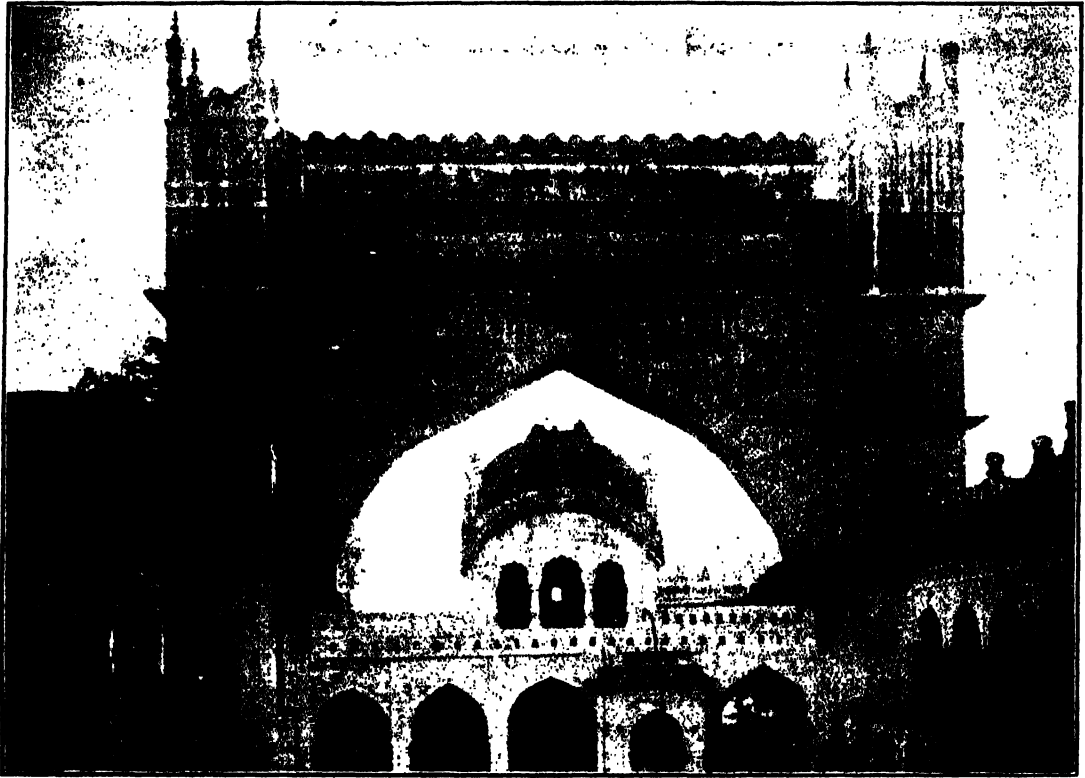
গুলবর্গার পীরের সমাধির নিকটস্থ একটি তোরণ।

প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল। তিনি দৃঢ় ন্যায়দর্শী সুলতান ছিলেন। রাজার প্রধান গুণ যে দয়া ও দাক্ষিণ্য তাহা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই; যেখানে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল এমন সব অবস্থাকেও তিনি দয়ার প্রলেপে কোমল ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই দয়াপ্রকাশই তাঁহাকে প্রকৃতিপুঞ্জের অতি আপন করিয়া তুলিয়াছিল। একবার অভিযানে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি গুলবর্গায় প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হয়েন ও তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়াছিলেন "ভগবন তুমিই ধন্য।"

গ্রিবিলের মতে "সুলতান আলাউদ্দীনের সম্বন্ধে অতি অল্প ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি পাওয়া যায়; কিন্তু সামান্য পরিচয় হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, পৃথিবীর মহৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহার নামও উল্লেখযোগ্য। অতি দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় সাধু চরিত্রের বলে তিনি একটি রাজ্য ও বংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া উঠেন এবং ক্ষমতাদীপ্ত হইয়াও নিজের চরিত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া অত্যাচার ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার রাজত্বের মত "রামরাজত্ব" ইতিহাসে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই মুসলমান ব্যতীত অন্য কোনও জাতির মধ্যে এইরূপ "মজুর সুলতান" নাই বলিলেই হয়। সুলতান হইয়াও তিনি চিরদিন চরিত্র বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক নম্র ও বিনয়ী ছিলেন।"

১৩৫৭ খৃঃ তাঁহার পুত্র সুলতান হয়েন। এবং একটি ক্ষুদ্র অভিযানের পর সুদীর্ঘ তের বৎসর ধরিয়া বাহমনী রাজ্যে শান্তি বিরাজিত থাকে। কথিত হয় তিনি অতিশয় জাঁকজমক ভাল বাসিতেন; সেই জন্য গুলবর্গার উন্নতিকল্পে কত অর্থব্যয় করেন। তৎনির্ম্মিত বহু প্রাসাদ এখন ধ্বংসে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু একটি মসজিদ এখনও তাঁহার শিল্পপ্রিয়তার পরিচয় দিতেছে। কর্ডোভার বিখ্যাত বিশ্ববিশ্রুত মসজিদের অনুকরণে ইহা নির্ম্মিত এবং ভারতবর্ষে ইহার প্রবর্ত্তন নূতন। পূর্ব্ব-পশ্চিমে
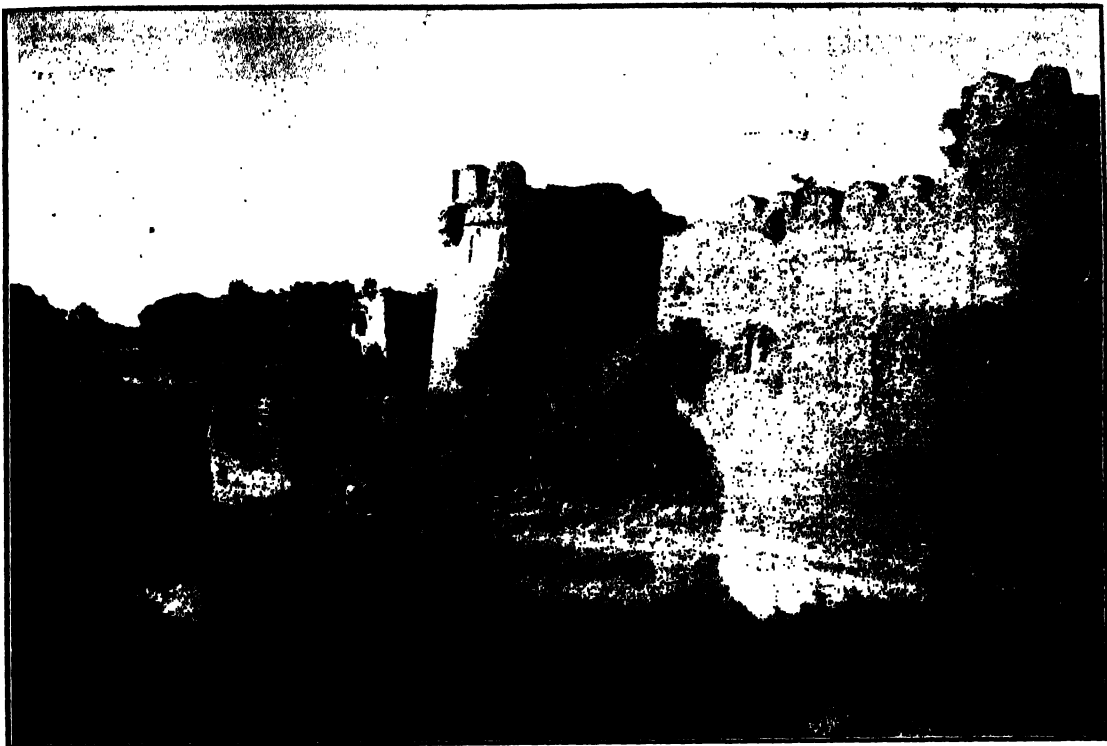
গুলবর্গার কেল্লা।

ইহা ২৬৫ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ১৭৬ ফুট লম্বা, ইহার বিস্তৃতি ৩৮০১৬ ফুট। কতকগুলি সমচতুষ্কোণ স্তম্ভের মাথায় খিলানের উপর ছাদটি রক্ষিত, সকল খিলানই প্রার্থনাবেদীতে গিয়া শেষ হইয়াছে। প্রার্থনা-বেদীটিকে পাথরের রেলিং দ্বারা মূল মস্‌জিদ হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। এই মস্‌জিদের বিশেষত্ব এই যে ভারতের যত মস্‌জিদ তাহার মধ্যে মাত্র এইটিরই সারা-চৌহদ্দীভুক্ত সীমানা ছাদ দিয়া ঢাকা। ফার্গুসানের মতে, শিল্প-হিসাবে কোন্‌টি ভাল তাহা ঠিক করা দুরূহ, কারণ ইহার মধ্যে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে না। কিন্তু ফার্গুসান সাহেব গুল্‌বর্গার নমুনাকেই সুবিধা ও স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য হিসাবে বেশী পছন্দ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

পরলোকগত নিজাম মস্‌জিদাদি সম্বন্ধে, বিশেষতঃ এই মস্‌জিদটির সংস্কারকল্পে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বাহমনীরাজাদের সমাধিভবনগুলি অনেকটা ভালভাবেই ছিল, সেই জন্য অল্প অর্থ ব্যয়েই ইহাদের সংস্কার হইয়াছে। আহম্মদ সাহের রাজত্বকালে রাজধানী বিদরে স্থানান্তরিত। হয়, কারণ বিদরের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল এবং জলের কোনওরূপ কষ্ট ছিল না। বিদরনগর ১৪৩১ খৃঃ নির্ম্মিত হয় এবং তখন গুলবর্গার গৌরব-রবি অস্তমিত হয়। বর্ত্তমানে ব্যবসার হিসাবে ইহার কিছু মূল্য আছে এবং ফকীরের সমাধির জন্য মুসলমানদের নিকট সমাদৃত হইয়া থাকে।

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী।

পঞ্চশস্য

সর্ব্বাধিক দম রক্ষা—

আমেরিকার কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র দশ মিনিট দম বন্ধ করিয়া ছিল; ইহার পূর্ব্বে এতক্ষণ কেহ দম বন্ধ করিয়া থাকিতে পারিয়াছে বলিয়া জানা নাই। ছাত্রটি চিত হইয়া শুইয়া দু মিনিট জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া রক্ত হইতে অধিক পরিমাণে কার্ব্বন ডাইওক্‌সাইড গ্যাস নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিয়া দম ভরিয়া অক্‌সিজেন গ্যাসের নিশ্বাস লইয়া দম বন্ধ করে; দু মিনিট
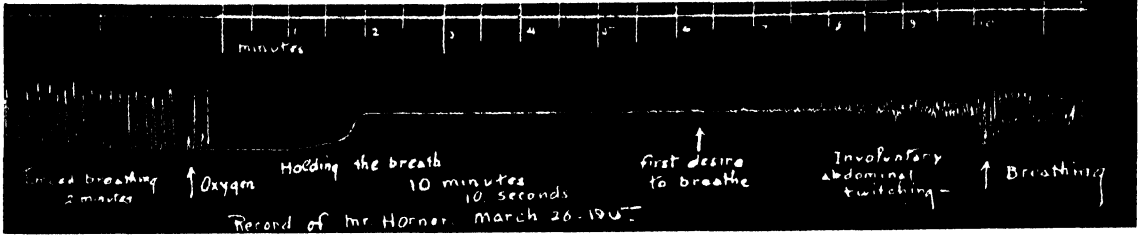
দশ মিনিট দম রক্ষার রেকর্ড।

পরে শ্বাসযন্ত্রের পেশী শিথিল হইতে দেখা যায়, দু মিনিট নিশ্বাস লইবার ইচ্ছা মাত্র পরিলক্ষিত হয় না, ৬ হইতে ৮ মিনিট সময়ে শ্বাসরোধের ইচ্ছাকৃত চেষ্টা যন্ত্রলেখে ধরা পড়ে, ৮ হইতে ১০ মিনিট পর্যন্ত তলপেটের পেশীতে অস্বাভাবিক মোচড় পড়িতে দেখা যায়, কিন্তু তখনো নিশ্বাস পড়ে নাই; দশ মিনিট পরে নিশ্বাস পড়ে। দমবন্ধ থাকার সময় ছাত্রটির চেহারা ও নাড়ী বেশ সহজ ছিল; দশমিনিট দশ সেকেণ্ডের সময় নিশ্বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু মাথা-ঘোরা বোধ হয়, কিন্তু আর কোনো রকম দুর্ব্বলতা বা হৃৎযন্ত্রের বৈলক্ষণ্য কিছুই বোধ হয় নাই।

* * *

কেজো কাঠের হাত—

যুদ্ধে যাহারা একেবারে মরিয়া না যাইতেছে তাহারা অঙ্গহীন হইয়া ফিরিতেছে—কাহারও চোখ, কাহারও হাত পা যাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য কারিগরেরা কাচের চোখ, কাঠের হাত পা স্বাভাবিক আকারের তৈয়ারি করিয়া হঠাৎদৃষ্টিতে অঙ্গহানির কদর্য্যতা অনেকটা ঢাকিতে পারিলেও সেইসব কৃত্রিম অঙ্গে কাজ চলে সামান্যই।

কেজো কাঠের হাত।

আমেরিকার একজন কৃত্রিম হাতের কারিগর কিন্তু অসাধ্যসাধন করিয়াছে। তাহার কৃত্রিম হাতে যদিও হাড়ের বদলে কাঠ, কনুই কব্জির বদলে ইস্পাতের কব্জা ও আঙুলের বদলে চামড়া স্থান পাইয়াছে, তথাপি সে এই হাত দিয়া মুলোকে কাজ করাইতে পারে। বুকে পিঠে পেটি বাঁধিয়া এই কৃত্রিম হাত কাটা হাতের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়; কাটা হাত সামনে নাড়িলেই কৃত্রিম হাতের কনুইএর কব্জা বাঁকিয়া যায় ও কাঠের হাত উঁচু হইয়া উঠে, কাঁধের পেশীর নিম্নমুখী গতিতে আঙুলে সংলগ্ন দড়িতে টান পড়ে এবং তাহাতে কব্জি বাঁকিয়া ও আঙুলগুলি খুলিয়া ছড়াইয়া যায়, আবার কাঁধের উর্দ্ধ গতিতে আঙুলগুলি গুটাইয়া আসে ও হাত মুঠি বাঁধিতে পারে, ইহাতে কোনো জিনিস সহজেই ধরিয়া নাড়াচাড়া করা যায়। সেই কারিগর নিউ ইয়র্ক সহরে সর্ব্বজাতিক অস্ত্রচিকিৎসক-সম্মিলনীতে (International Surgical Congress) এই কৃত্রিম হাত লাগাইয়া উহার কার্য্যপ্রণালীর পরীক্ষা দেখাইয়াছিল। সে কৃত্রিম হাত দিয়া জুতার ফিতা বাঁধা, মোজার গার্টার কষা, মাথা গলাইয়া শার্ট পরা, জামায় বোতাম লাগানো, কলারে বোতাম পরানো, নেকটাই বাঁধা, হাট তুলিয়া মাথায় দেওয়া প্রভৃতি আঙুলের কাজ অতি সুচারু রকমে পূর্ণাঙ্গ মানুষের ন্যায়ই ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল। সে তারপর ঐ কৃত্রিম হাতেই সিগারেট পাকাইয়া মুখে ধরিয়া দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইয়া টানিতে টানিতে যখন ডাহিন ও বাঁ দুই হাতেই পরিষ্কার অক্ষরে নিজের নাম সই করিয়া দেখাইল তখন আর ডাক্তারদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

* * *

বায়োস্কোপ ও চক্ষুপীড়া—

বায়োস্কোপে চক্ষুর সামনে দিয়া ক্রমাগত উজ্জ্বল আলোকের চলন্ত ছবি দ্রুত কম্পিত হইতে থাকে বলিয়া খানিকক্ষণ দেখিলেই চক্ষু পীড়িত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অতি তাড়াতাড়ি ফিল্মের রীল ঘুরানো হয় বলিয়া অভিনেতাদের কাজ ও ঘটনা অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকমে দ্রুত হয়—বায়োস্কোপের মানুষের চলা নয়ত দৌড়, হাত পা নাড়া নয়ত জিমন্যাষ্টিকের কসরৎ! ঘটনা বুঝাইবার জন্য যে আলোর লেখা পর্দ্দায় ফেলা হয় তাহাও এত শীঘ্র সরাইয়া লওয়া হয় যে দর্শকেরা ঘটনা বুঝিবার জন্য তাড়াতাড়ি পড়িয়া লইতে গিয়া চোখের উপর অত্যধিক জুলুম করে। এই সমস্তের প্রতিকার হওয়া উচিত। ফিল্মের রীল আর-একটু ধীর গতিতে গুটাইলে আংশিক প্রতিকার হইতে পারে। ডাক্তার নরম্যান রিজলী বলেন, যে, এখন বায়োস্কোপের কল থাকে উঁচুতে, সেই কলের ছায়াবাজি পর্দ্দা হইতে লোকের চোখে নীচের দিকে বাঁকিয়া প্রতিফলিত হয়; এই ব্যবস্থা বদল করিয়া মেঝের নীচে হইতে পর্দ্দায় ছবি ফেলিলে দর্শকদের চোখে প্রতিফলিত আলোক সোজা রেখায় গিয়া পড়িতে পারে, এবং তাহাতে চক্ষুতে আলোকের চাপ অল্পই লাগে।

* * *
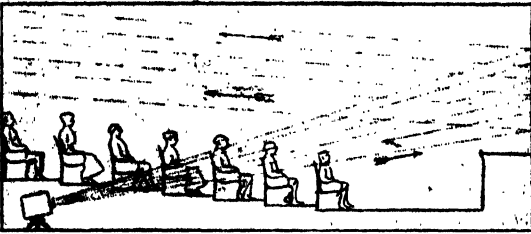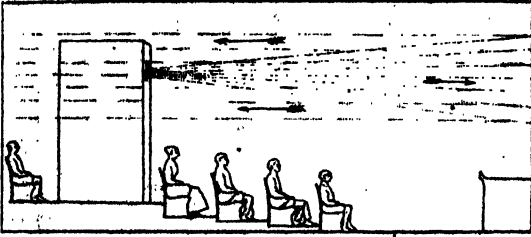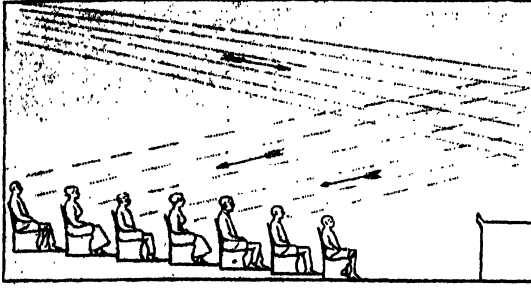
বায়োস্কোপ ও চক্ষুপীড়া, এবং তাহা নিবারণের উপায়।

(১) বর্ত্তমান ব্যবস্থায় উঁচু হইতে আলো ফেলা হয়। (২) মধ্যস্থল হইতে আলো ফেলিলে বর্ত্তমান ব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অনেকে ছবি দেখিতে না পাইতেও পারে।
(৩) মেঝের নীচে হইতে ছবি ফেলাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

লোমশ ব্যাং—

অসম্ভব বুঝাইতে হইলে আমাদের দেশে আকাশ-কুসুম, শশ-বিষাণ প্রভৃতির সহিত তুলনা যেমন, পাশ্চাত্য দেশে তেমনি ব্যাঙের লোম ও মুরগীর দাঁত কথার চলন আছে। কিন্তু আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশে লোমশ ব্যাং আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্তন্যপায়ী জীবের লোম ও নখ একই জাতীয় জিনিস—শৃঙ্গ সম্পর্কীয়। ব্যাঙের লোম ঠিক সে জাতীয় নয়—উহা ব্যাঙের চামড়ায় যে গুটি থাকে তাহারই অতিবৃদ্ধি। কিন্তু শারীর-বিদ্যার চক্ষে উহা যাহাই হোক, সাধারণ লোকে দেখিলেই মনে করিবে উহা ব্যাঙের লোম। স্তন্যপায়ী জীবের ও পাখীদের মধ্যে মদ্দা জন্তুর গায়ে লোম বা পালক বেশী থাকে, মাদী জন্তু অপেক্ষাকৃত নির্লোম হয়; লোমশ ব্যাঙেরও মদ্দাদেরই গায়ে মাদী ব্যাঙের চেয়ে লোম বেশী হয়। প্রজনন-ঋতুতে ব্যাঙের গায়ে ঐ লোম ঘন হইয়া উঠে, তাহাতে অনেক পণ্ডিত মনে করেন উহা ঐ জাতীয় ব্যাঙের যৌন সম্মিলনের পরিপোষক স্ত্রীজাতির মন ভুলাইবার সজ্জা মাত্র।

চারু।

লোমশ ব্যাং।

ছাত্রছাত্রীদের আহারের অল্পতা—

চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইউনাইটেড ষ্টেটসের পনেরটি সহরের ৫৪৭৯০৯ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৯০১৯ জন প্রায় অর্দ্ধাহারে থাকে। ইহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহাদের খাদ্যের অভাব এত বেশী যে তাহাকে অনাহার কিম্বা উপবাস বলিলেও চলে। সারাজীবন এইরূপ অনাহারে কাটাইয়া অকালে মৃত্যুর কোলে মুক্তি লাভ করিয়া ইহারা আপনারা শান্তি পায় ও সমাজকে ভারমুক্ত করে। বালকবালিকাদিগকে এই অনাহারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য (New York School Lunch Committee) স্কুল জলপানি সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সম্পাদক মিঃ এড্ওয়ার্ড এফ্ ব্রাউন সরকারী খরচে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে চান। নিউইয়র্ক স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন-আহারের বিষয়ে মিঃ ব্রাউন লিখিয়াছেন—"যেসকল বালকবালিকা গৃহে যথেষ্ট খাদ্য পায় না, বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্ন-ভোজন তাহাদের অভাব দূর করে। যাহাদের জননীরা দিনের বেলা কাজে বাহির হয়, তাহারা সচরাচর দ্বিপ্রহরের আহারের জন্য মাতার নিকট দুই চারি পেনি পাইয়া থাকে; কিন্তু শিশুরা সাধারণতঃ সেই পয়সায় পুষ্টিকর খাদ্য না খাইয়া মিঠাইমণ্ডা খাইয়া উড়াইয়া দেয়। ঠেলা গাড়ী কিম্বা ঝুড়ি করিয়া মিঠাই, কেক, ফল প্রভৃতি ছেলে-ভুলান খাবার লইয়া পাঠশালার নিকটস্থ স্থানসমূহ দখল করিয়া বসা খাবারওয়ালাদের বহুকালের

ব্যবসায়। এইসকল খাবার সর্ব্বদা ধূলা ময়লার মধ্যে খোলা পড়িয়া থাকে এবং তাহাতে প্রায়ই ভীষণ রকম ভেজাল দেওয়া হয়। বিভিন্ন পরিবারের জন্য ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ভাড়াটে বাড়ীতে এইসকল খাদ্য প্রস্তুত হইয়া অনেক সময় সারারাত্রি খাবারওয়ালাদের ঘরে পোকা, মাকড়, মাছি ও অন্যান্য আবর্জ্জনার মধ্যে খোলা পড়িয়া থাকে। শিশুগণ খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে এইসকল বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করে।

"নিউইয়র্কের ছাত্রছাত্রীদের একতৃতীয়াংশ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে ১৩৯৯৯ জন অভাব অনুযায়ী পুষ্টি লাভ করে নাই। বাকি দুই-তৃতীয়াংশেরও যদি এইরূপ অবস্থা ধরিয়া লইতে হয় তবে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে মোটের উপর ৪০,০০০ বালকবালিকা পুষ্টির অভাবে স্বাস্থ্য হারাইতেছে বলিতে হইবে।" এই অপুষ্টির কারণ খোঁজ করিতে গিয়া যে পনেরটি সহরের বিদ্যালয়ের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

মিঃ ব্রাউন এই কারণগুলিকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত এই দুই বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত কারণগুলি দেখাইয়াছেন—

ক। সামাজিক—

(১) জানালা- ও রৌদ্রহীন গৃহে বাস।

(২) স্নানের সুযোগের অভাব।

(৩) গৃহে হাওয়া চলাচলের অভাব।

(৪) বিদ্যালয়ে পাঠের পর পরিশ্রম।

(৫) বিদ্যালয়ের অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা।

(৬) জন্মগত দুর্ব্বলতা।

খ। ব্যক্তিগত—

(১) খাদ্যের অযোগ্যতা ও অপ্রাচুর্য্য।

(২) স্বাস্থ্যহানিকর শয়নের ব্যবস্থা।

(৩) যথেষ্ট নিদ্রার অভাব।

(৪) অপরিচ্ছন্নতা।

(৫) মুখের রোগ, দন্ত-রোগ, ব্রঙ্কাইটিস্, ক্ষয়কাশ, হৃদ্‌রোগ, বাত, বসন্তাদিরোগ-জনিত দৌর্ব্বল্য, বাল্যকালে যত্নের অভাব প্রভৃতি।

"উপরোক্ত যে কোনটিই এই অপুষ্টির কারণ হইতে পারে এবং সেই কারণেরও অন্য কারণ থাকা সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ পারিবারিক অর্থাভাব, গৃহিণীর সংসারজ্ঞানের অভাব, পরিবারের আহারাদি পর্য্যবেক্ষণে তাচ্ছিল্য কিম্বা অসামর্থ্য ও শিশুর জন্মগত দোষ কিম্বা পিতামাতার বংশগত রোগ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরিবারের প্রধান উপার্জ্জক যদি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় কিম্বা কোন কারণে অক্ষম হইয়া পড়ে তাহা হইলে খরচ কমাইতে গিয়া দৈনিক আহারের উপরেই সর্ব্বাগ্রে টান পড়ে। ইহাতে বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদেরই বিশেষ ক্ষতি হয়, যথেষ্ট পুষ্টির অভাবে তাহাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির বিশেষ বাধা হয়।"

যথেষ্ট পুষ্টির অভাবে শিশুর জীবনী-শক্তি কমিয়া যায়, ইহার ফলে সে অতি সহজেই নানারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই ভীষণ বিপদ ত' আছেই, তাহার উপর আর-একটি অসুবিধাও আসিয়া জুটে। এইসকল শিশু সংক্রামক বীজ ছড়াইয়া বেড়ানোতে সঙ্গীগণের বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদের পড়াশুনাও নিতান্ত সামান্য হয়। ইহারা চটপটে একেবারেই হয় না এবং পড়ায় মনও সহজে দিতে পারে না। বালকবালিকাদিগকে গৃহে ও বিদ্যালয়ে যথেষ্ট খাদ্য, বিশ্রাম, বিশুদ্ধ বাতাস, রৌদ্র ও নিয়মিত স্নান এই কয়টি মাত্র দ্রব্য যোগাইতে পারিলেই তাহারা এই বিপদের হস্ত হইতে ত্রাণ পায়। মিঃ ব্রাউন মনে করেন যে পিতামাতাগণ খাদ্য যোগাইতে অপারগ হইলে কিম্বা সে বিষয়ে অবহেলা করিলে সরকারী খরচে বিদ্যালয় হইতে খাবার যোগানই উচিত। তিনি বলেন—

"যে ছেলের পুষ্টির একান্ত অভাব হইয়াছে, তাহাকে গড়িয়া তোলা অত্যন্ত শক্ত কাজ। এই রকম ছেলেমেয়েরা সচরাচর অত্যন্ত জড়-প্রকৃতি ও খিটখিটে হয় এবং ইহারা পড়াশুনা করিয়া উঠিতে না পারায়, সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রেণীর বাকি ছেলেমেয়েদেরও পড়ায় পিছাইয়া রাখে। এই রকম এক-একটি শিশুর লেখাপড়ার জন্য যে টাকা খরচ হয়, তাহাতে শিশুর কিম্বা দেশের কোন উপকারই হয় না।

"খাদ্যের উপরেই বালকবালিকাদের শরীরের অবস্থা বিশেষ করিয়া নির্ভর করে। জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে হইলে এইসকল শিশুর যথাসময়ে প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যক আছে। বিদ্যালয়ে খাদ্য যোগাইতে হইলে একবার খাইতে দিয়া শেষ করিলেই চলিবে না। এই খাদ্যদানের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করা দরকার।

"বিদ্যালয়ে ছেলেদের খাইতে না দিলে কি ফল হয়, সে বিষয়ে ইংলণ্ডে অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ব্রাডফোর্ড বিদ্যালয়ে Whitsuntideএর ছুটির সময় ছেলেদের খাইতে দেওয়া হইত না। এইসকল ছেলেরা যখন ছুটির পরে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখা গেল প্রত্যেকে গড়ের উপর আধসের করিয়া কমিয়া গিয়াছে। পরীক্ষার ফল প্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি ছেলেকে ছুটির পূর্ব্বেও খাইতে দেওয়া হইত না। ছুটির পর দেখা গেল ইহারা প্রায় আড়াই পোয়া করিয়া কমিয়াছে। ছুটির ক্ষতিটা পূরণ করিতে প্রায় পনের দিন সময় লাগিয়াছিল। গ্রীষ্মের ছুটির সময় পরীক্ষা করিয়াও এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল।

"অনেকে বিদ্যালয়ে ভোজনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, ইহার ফলে নিঃসম্বল পিতামাতারা সন্তানপালনের বিধিদত্ত দায়িত্বের ভার অন্যের উপর অর্পণ করিবে। কিন্তু আমরা সেরূপ কিছু দেখি নাই। অধিকন্তু, অনেকে আমাদের নিযুক্ত লোকেদের সংস্রবে আসিয়া ছেলেদের কি খাইতে দেওয়া উচিত এবং তাহা কি প্রকারে প্রস্তুত করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে।"

বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নভোজনের আবশ্যকতা, দুর্নীতিপূর্ণ গৃহ, গৃহিণীর গৃহকার্য্যে অবহেলা অথবা সাংসারিক জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি সামাজিক বিশৃঙ্খলার লক্ষণ। এইসকল স্থানে যথেষ্ট মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ভোজনের ফলে যে সুফল উৎপন্ন হয়, বাড়ীতে অসার বস্তু খাইয়া সে ফল নষ্ট হইয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য মিঃ ব্রাউন বলেন যে শিশুদের খাদ্যের ব্যবস্থা সামাজিক সেবার একটি অঙ্গ হওয়া উচিত।

* * *

রঙিন তুলা—

আজকাল আমরা তুলা কিম্বা সূতা রং করিয়া থাকি। কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা সকল রঙের কার্পাসেরই চাষ করিতে পারিব বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীর নানা অংশে রঙিন তুলার চাষ পূর্ব্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সকল রঙের তুলা উৎপন্ন করিতে হইলে এই সমস্ত কার্পাসের বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকারে মিলাইয়া সঙ্কর বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়া বহু মিশ্রিত রং উৎপন্ন করা দরকার। এইরূপ করিতে হইলে বীজগুলি খাঁটি রঙিন কার্পাসের হওয়া চাই, অর্থাৎ সবুজ, লাল কিম্বা হলদে তুলার বীজ হইলে তবেই ঠিক ঐসকল রঙের তুলাই উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। আমেরিকার একজন কৃষিতত্ত্ববিৎ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এইসকল বীজ খাঁটি হইলেও, আব হাওয়া কিম্বা মাটির গুণে তুলায়

রং হয় না। নিউইয়র্কের World Sunday Magazineএর একজন লেখক বলেন, "যে-কোন রঙের প্রকৃতি-রঞ্জিত তুলার উৎপাদন কার্পাস চাষের এক অভিনব চেষ্টা। এই চেষ্টার ফলে ইউনাইটেড ষ্টেট্সের বহুল উপকারের সম্ভাবনা।"

তুলায় স্বাভাবিক রং হইলে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এবং সময়াদামের কার্পাস বস্ত্রগুলিকে খেলো করিয়া, আর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্পাসে রং ধরাইতে হইবে না। বাণিজ্যক্ষেত্রে ইহা একটা মস্ত লাভ। এই নব প্রণালী সম্পূর্ণ সফল হইলে, যে-কোন নক্সার কাপড় বুনিবার জন্য তাঁতে প্রকৃতি-রঞ্জিত সুতার যোগান-দেওয়া সম্ভব হইবে। ইহার রং কখনও নষ্ট কিম্বা ম্লান হইয়া যাইবে না।

আমেরিকার ব্রাভামই এই রঙিন তুলা প্রচারের অগ্রদূত। কেবল মাত্র শ্বেত কার্পাসের সহিত পরিচিত আমেরিকাবাসীকে তিনি জানাইয়াছেন যে এখনই পৃথিবীতে নানা রঙের কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। পেরু প্রদেশে এক রকম লালচে কার্পাস জন্মিয়া থাকে। মিশরদেশ, পেরুপ্রদেশ ও হাওয়াই দ্বীপে পিঙ্গল তুলা উৎপন্ন হয়। চীন-দেশে পীত ও ভারতবর্ষে ধূসর কার্পাস হয়। ইহা ছাড়া দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে একরকম সবুজ তুলা উৎপাদিত হইয়াছে এবং মেক্সিকোতে বোধহয় এক রকম ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের তুলা হইতেছে। বষ্টনের সি, এইচ, ক্লার্ক মিঃ ব্রাভামকে বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে নীল তুলাও উৎপন্ন হইতে পারে।

প্রথম প্রথম লোকে মনে করিত যে, মাটির গুণে তুলার নানা রকম রং হয়, কিন্তু মিঃ ব্রাভাম প্রমাণ করিয়াছেন যে, চীন, পেরু, মিশর প্রভৃতির বিভিন্ন জাতীয় তুলা অন্য দেশের মাটিতেও ঠিক সেইরূপ হইবে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, শাদা, লাল, ধূসর, পীত, পিঙ্গল, সবুজ, নীল ও কাল—এই আট রঙের তুলা সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। মিঃ ব্রাভাম বলেন যে এই কয়টি রং নানা প্রকারে মিশাইয়া অন্য অনেক মাঝামাঝি রং পাওয়া যাইবে; যথা শাদা ও লাল কার্পাসের সঙ্কর চারায় চাষ করিলে, এক রকম গোলাপী তুলা হইবে, লাল ও নীল মিশাইয়া সঙ্কর করিলে বেগুনি রঙের তুলা পাওয়া যাইবে; যে-কোন রঙের সঙ্গে কাল রঙের কার্পাসের সঙ্কর করিয়া চাষ করিলে সেই রং আরও গাঢ় হইবে।

শ্রীশান্তা চট্টোপাধ্যায়।

* * *

ষ্ট্রিণ্ডবার্গের নূতন বই—

"The Son of a Servant" অর্থাৎ দাসীপুত্র নামক পুস্তক সুইডেনের বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক অগষ্ট ষ্ট্রিণ্ডবার্গ-রচিত—গল্পটি গ্রন্থকারেরই বাল্যজীবনের কাহিনী লইয়া। গ্রন্থকারের 'The Inferno'র মতো ইহাতেও প্রতিভাশালী লোকের অদ্ভুত চরিত্র বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। একটি অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ সাধারণ লোক হইতে উচ্চ চরিত্রের লোকের অন্তরের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত হইয়াছে—বইখানি ষ্ট্রিণ্ডবার্গেরই অন্তরের প্রতিধ্বনি।

ষ্ট্রিণ্ডবার্গের সকল ভক্তেরই এই কাহিনী পাঠ করা উচিত—কারণ ইহার মধ্যে তাঁহার জীবনের দর্শন ও আপন মতের বীজ দেখিতে পাইবেন।

গ্রন্থের নায়কের নাম জন। জাহাজ-সরকার পিতা এবং দাসী মাতার পুত্র জন এখনে ক্ষুধা আর ভয়ের তাড়নাই বেশী পাইয়াছিল।

সে অন্ধকার ও আঘাত পাইবার ভয় করিত। পড়িয়া যাইবার ভয়ও তাহার ছিল; রাস্তায় বাহির হইতে ভয় পাইত, পাছে চলিতে কিছুর সঙ্গে টোক্কর লাগে। সে তাহার ভাইদের কড়া হাতকে ভয় করিত, দাসী বালিকাদের কর্কশ স্বভাব তাহাকে ব্যথিত করিত, দিদিমার ভৎসনা মা'র যষ্টি ও পিতার বেত সব সময়ই তাহাকে ভীত রাখিত। বালকের দেহে দুইটি রক্তধারা বহিতেছিল,—একটি তাহার পিতার উচ্চ বংশের, অপরটি মাতার নীচ বংশের। জীবনের প্রথম ভাগ অসহনীয় দারিদ্র্যের ভিতরে অতিবাহিত হয়, শেষে তাহার পিতা অবস্থা একরকম স্বচ্ছল করিয়া তোলেন বটে।

সমস্ত গল্পটিতেই গ্রন্থকার বংশানুক্রমের উপর বেশী জোর দিয়া গিয়াছেন। তিনি জনের চিত্র আঁকিয়াছেন—যেন দুইদিক হইতে তাহাকে দুইটা ধারায় টানিতেছে—ইহাতেই যেন তাহাকে রুগ্ন হতভাগ্য করিয়া তাহার জীবনটাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

শিক্ষার মধ্যে সে শুধু পাইয়াছিল বক্, চুল ধরিয়া টানা, আর বক্তৃতা আদায় করিয়া লওয়া। বালক শুধু তাহার কর্ত্তব্যের কথাই শুনিত, কিন্তু তাহার অধিকারের কথা কিছুই জানিত না,—সকলেই নিজের নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে পারে—তারই ইচ্ছা শুধু শত ভাবে নির্যাতিত হইত।

সে একটা কিছু নষ্ট না করিয়া কোন কাজ করিতে পারিত না। কারো চলার বাধা না হইয়া রাস্তা চলিতে পারিত না, অপরের কথার মধ্যে কথা না বলিলে তাহার কথা বাহির হইত না,—অবশেষে এমন হইল যে, সে নড়িবার পর্যান্ত সাহস পাইত না। তাহার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম ছিল একখানা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা। এটা তাহার মনে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহার নিজের কোন ইচ্ছা নাই—এই ভাবেই ক্রমশঃ তাহার চরিত্র দুর্ব্বল হইতেছিল।

কিন্তু পাঠে জনের আসক্তি ছিল। এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও তাহার বুদ্ধিবৃত্তি বাড়িল এবং প্রসারিত হইল। কিন্তু জীবনে তাহার সুখের মুহূর্ত্ত অতি অল্পই ছিল, সাংসারিক জ্ঞানও সে সামান্যই লাভ করিয়াছিল।

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময় ষ্ট্রিণ্ডবার্গ নায়কের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে তাহাকে ভীরু, অস্থিরচিত্ত, দুর্ব্বল করা হইয়াছে।

কিন্তু সে সত্য কথা বলিতে শিখিয়াছিল। আর তার চরিত্রের দুইটা বিশেষত্ব ছিল; প্রথম সন্দেহ—সে না ভাবিয়া, সমালোচনা না করিয়া কোন কথাই গ্রহণ করিত না; আর একটি তাহার ভাবপ্রবণতা। শেষেরটাকে সে সব সময়ই কমাইবার চেষ্টা করিত।

অন্তর বিশ্লেষণের সকল গল্পই চিত্তাকর্ষক হয় না; কিন্তু ষ্ট্রিণ্ডবার্গের লেখার সেটুকু কায়দা আছে—এবং মনের গোপন-কথাটি কল্পনা ও বাস্তবে মিশাইয়া জগতের চক্ষু সেই দিকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

আধখানা চোখ

প্রাচীরের ফাঁকে আধখানা চোখ, পুরা চোখটিও নয়—
তাহারি ত্বরিত চকিত চাহনি—সেও এত কথা কয়!
যে কথা শুনিতে সব শোনা ভোলে কান,
যে কথা বলিতে সব বাণী ম্রিয়মাণ,
সীমার মাঝারে নিমেষে ফুটায় অসীমের বিস্ময়!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সেখ আব্দু

(২৩)

তখন চৈত্র মাস পড়িয়াছে, প্রকৃতির রাজত্বের উপর হইতে স্তব্ধ জড়তার আবরণ সরিয়া গিয়া, উজ্জ্বল স্বচ্ছ উল্লাসের মদিরা-বিহ্বল স্রোত ভাসিয়া আসিয়া চারিদিকে একটা মনোরম স্বপ্নাবেশ সৃষ্টির সূচনা করিতেছে। শুক্লানবমীর সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নার নব যৌবনে তরুণ লাবণ্য যেন উছলিয়া উছলিয়া ধরাবক্ষ ভাসাইয়া হাসাইয়া প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছে।

আহারাদি সারিয়া আব্দু নিজের গৃহের সম্মুখে সঙ্কীর্ণ রোয়াকটিতে পায়চারী করিতেছিল, এমন সে প্রায়ই করিয়া থাকে, আহারের পরই নিদ্রা তাহার অভ্যাস নহে। জনবিরল পল্লী তখনো নিস্তব্ধ হয় নাই, পাশাপাশি বাড়ী হইতে দু-একজনের কণ্ঠস্বর তখনো শ্রুত হইতেছে, অদূরে ময়রাদের দোকানের আলো রাস্তায় পড়িয়া জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোটুকুর উপর রুদ্ররূপের বিরক্তিকর ছায়া খানিকটা ফেলিয়া গর্ব্বের আকাঙ্ক্ষায় লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছিল। আব্দু আপন মনে ভাবিতেছিল,—আজ যদি তাহার স্কন্ধে একটি পোষ্যপালনের দায়িত্ব থাকিত, তাহা হইলে বুঝি বাধ্য হইয়া তাহাকে দীনতার চরণে মস্তক নত করিতে হইত। উঃ! সে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! ভাগ্য তাহাকে সে বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছে! তাহার মত প্রতিকূল অবস্থায় এমন অনুকূল ভাবে জীবন যাপন করিতে তো প্রায় কাহাকেও দেখা যায় না।

আব্দু বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। আপনার জীবনটা আদ্যোপান্ত চিন্তা করিয়া দেখিতে দেখিতে সহসা দাদাজীর আত্মীয় মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। আব্দুর একটু হাস্যোদ্রেক হইল,—তিনি পূর্ব্বে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের অধীনে সমস্ত যৌবনটা ভোর সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়াছিলেন, তাহার পর এখন সে সঙ্কটসঙ্কুল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, নিজামের অধীনে, নিশ্চিন্তের কূলে পা দিয়া, বিবাহাদি করিয়া দিব্য আরামে সংসারী হইয়া সৈনিকের সাজে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতেছেন,—কোথায় সৈনিকের সংযম সহিষ্ণুতা, আর কোথায় সাংসারিক সুখসম্ভোগলুব্ধতা,—ধিক্!

আব্দু শিথিল ভাবে রোয়াকের লৌহস্তম্ভে হাত রাখিয়া, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সামনের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল।

বিপরীত দিক হইতে শুভ্রবেশধারী এক প্রৌঢ় পথিক ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, আব্দুর দিকে চাহিয়া বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে বলিলেন "ওগো বাপু, রাত্রের মত থাক্‌বার জায়গা এখানে কোথা পাওয়া যায় বল্‌তে পার?"

চিন্তামুহ্যমান আব্দু ত্রস্তে মাথা ফিরাইয়া চাহিল, লোহার খুঁটী ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "কি বলছেন মশাই?"

"তুমি বাঙ্গালী?" পথিক সোৎসাহে বলিলেন "তুমি বাঙ্গালী! আঃ বাঁচালে বাপু, রাত দুপুরে বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে বড়ই ফাঁকরে পড়ে গেছি; যে দেশ, একটা ভদ্রলোকের দাঁড়াবার স্থল নেই—," লোকটি আরো বকিয়া যাইতেছিলেন, আব্দু বাধা দিয়া বলিল "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

পথিক বলিলেন "আস্‌ছি কলকাতা থেকে,— যাব ইঞ্জিনীয়ার বাবুর বাড়ী, সে এখান থেকে কতদূর বলতে পার?"

আব্দু বলিল "আজ্ঞে ইঞ্জিনীয়ার বাবুর বাড়ী এখান থেকে যে ক্রোশখানেক তফাতে,—"

পথিক বলিলেন "আচ্ছা কণ্ট্রাক্টর রমানাথ রায়ের নাম শুনেছ? তাঁর বাড়ী কোথা জান?"

আব্দু বলিল "আজ্ঞে তা তো বল্‌তে পারছি না, তাঁর নাম কখনো শুনেছি কি না, তাও মনে পড়্‌ছে না। তিনি কি এখানকার বাসিন্দা?"

পথিক বলিলেন "হাঁ এখানে তাঁদের বাড়ী আছে, কিন্তু কোথায় তা আমি জানি না।—আচ্ছা বাবা, এখানে কোথাও কি থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে না?—"

আব্দু ব্যস্ত হইয়া বলিল "আজ্ঞে আপনি যদি একটু অসুবিধে সহ্য করে এখানে থাকেন,—"

পথিক মাথা নাড়িয়া বলিলেন "আর অসুবিধে বাবা, মাথা গুঁজে দাঁড়াবার একটু স্থল পেলে বেঁচে যাই।"

আন্দু সসম্ভ্রমে বলিল "তবে আসুন আমার এই ঘরটায় একটু জিরিয়ে নিন, আমি দেখি কাছাকাছি যদি কোথাও সুবিধা কর্ত্তে পারি।—আপনারা ?"

পথিক বলিলেন "আমরা সদ্গোপ, তোমরা ?—"

আন্দু বলিল "আজ্ঞে পাঠান্।—" ঘরে গিয়া তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিল। সে এতক্ষণ প্রদীপ নিভাইয়া জ্যোৎস্নালোকে রোয়াকে পাদচারণা করিতেছিল। প্রদীপালোকে সেই প্রৌঢ় পথিক আন্দুর বলিষ্ঠ সুন্দর শরীরের পানে অত্যন্ত বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাহার কেহ নাই, এবং সে এখনো অবিবাহিত কেন ?—এই কথাটা এমনি গভীর আশ্চর্য্যের সহিত তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন যে বিব্রত আন্দু-মুগ্ধ নিজের সম্বন্ধে কেমন একটা নূতন অসম্ভব বিস্ময় অনুভব করিল। আন্দুর যে কেহই নাই, এ কাথাটা পথিকের ধারণায় যেন মোটে খাপ খাইতেছিল না, তিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার নানাদিক দিয়া কথাটা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু আন্দু যখন পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সহিত বলিল, যে, সত্যই সে আত্মীয়-হীন নির্ব্বান্ধব,—তখন প্রৌঢ় বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া সহসা অস্ফুট স্বরে বলিয়া ফেলিলেন, "এতটা মুক্তি ভাল নয় !"

আন্দু চমকিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া আপনা-আপনি একটু হাসিল। সে প্রসঙ্গান্তর আলাপ করিবার চেষ্টা করিল। আন্দু পথিকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে নিজের বক্তব্য পুনঃ পুনঃ ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এক কথা দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিল। পথিক যখন বলিলেন যে তিনি চিত্রকর,—সেকেন্দরাবাদের ইঞ্জিনীয়ার বাবুর আদেশে গৃহপ্রাচীরে চিত্রের জন্য এখানে আসিয়াছেন, কণ্ট্রাক্টর রমানাথ বাবুর অধীনে তিনি কাজ করিবেন, তখন আন্দু সহসা বলিল—সেও কিছু-দিন পূর্ব্বে চিত্রবিদ্যা শিখিয়াছিল। পথিক উৎসাহিত হইয়া তাহার বিদ্যার পরিচয় আদ্যোপান্ত সব জিজ্ঞাসা করিলেন। আন্দু মুহূর্ত্তে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা নূতন ব্যবস্থা ঠিক করিয়া পথিকের প্রশ্নের সমুদয় উত্তর দিল, এবং খানিকক্ষণের কথাবার্ত্তার পর দুজনে মিলিয়া এই বন্দোবস্ত ঠিক করিল, যে, আন্দু অতঃপর পথিকের সহিত আলোচিত চিত্রবিদ্যার পুনঃ চর্চ্চা আরম্ভ করিবে।

চিত্রকর মহাশয়ের নাম শ্যামাদাস ঘোষ; আন্দু নিজের শয্যায় চাদর বদলাইয়া সেইখানে চিত্রকর মহাশয়ের শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল, ও আপনি স্বতন্ত্র একটি ক্ষুদ্র শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিল। চিত্রকরের আহারাদি ষ্টেশন হইতেই সমাধা হইয়াছিল, সুতরাং উভয়েই শয়ন করিলেন এবং অনেক রাত্রি অবধি এই দুই অসমবয়স্ক সদ্যমিলিত অপরিচিত ব্যক্তি, আপন-আপন জীবনী পরস্পরকে শুনাইলেন।

(২৪)

পূর্ণ আহার, পূর্ণ নিদ্রা ছাড়িয়া, পড়াশুনা রাখিয়া, নমাজের সময় কমাইয়া দিয়া, আন্দু নূতন করিয়া চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিতে বসিল। অশ্রান্ত অধ্যবসায় তাহাকে দ্রুত-বেগে ক্রমোন্নতির পথে টানিতে লাগিল। নূতনত্বের আস্বাদনে নব নব উদ্যমে উত্তেজিত হইয়া—ঠিক ভূত-গ্রস্তের মত দুর্দ্দম্য উচ্ছৃঙ্খলতায়, দিন রাত্রিগুলাকে অবজ্ঞার সহিত পিছনে ফেলিয়া ব্রতীর সংযম ধরিয়া একরোখা আবেগে সে চিত্রবিদ্যা শিখিতে লাগিল। সমস্ত শক্তিই অনুশীলন-সাপেক্ষ, এবং সমস্ত সফলতাই পরিশ্রমের মুখা-পেক্ষী। আন্দু অত্যন্ত দ্রুতবেগে শিখিতে লাগিল। তাহার অদম্য ঝোঁক দেখিয়া চিত্রকর বিস্মিত হইলেন; দাদাজী ধমক দিলেন, বলিলেন অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

লব্ধ বিদ্যা যখন পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত হইল, এবং ইঞ্জিনীয়ারপ্রমুখ সহরের সৌখীন সম্ভ্রান্ত লোকেদের গৃহ-ভিত্তির গাত্রে যখন আন্দুর সুনিপুণ হস্তের কলাকৌশল পরিস্ফুটরূপে প্রসন্ন উজ্জ্বলতায় হাসিতে লাগিল, তখন হায়দরাবাদ হইতে পত্রের উত্তর আসিল ! তিনি লিখিয়াছেন যে তিনি বিশেষরূপে সুবিধা-মত কার্য্যের চেষ্টা করিতেছেন, পাইলেই সংবাদ দিবেন, তবে তিনি যুদ্ধবিভাগের লোক হইয়া—এবং যোদ্ধজীবনের সম্পূর্ণরূপে বিশেষজ্ঞ হইয়া, আন্দুর মত অনভিজ্ঞ যুবকসম্প্রদায়কে এই পরামর্শ দেন যে যুদ্ধবিদ্যা অপেক্ষা অন্য কোন নিরাপদ কার্য্যে জীবন-যাপন তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ শ্রেয়স্কর।—আন্দু, পত্রপাঠ

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার হিতৈষিতার অজস্র সুখ্যাতি করিয়া তৎপরে লিখিল, তাঁহার উপদেশ-মত সে অত্যন্ত নিরুপদ্রব পথে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে।

চিত্রকরদিগের দৈনিক উপার্জ্জন আন্দুর পক্ষে মন্দ হইত না; যত্র আয় তত্র ব্যয় সত্বেও কয়েক মাসেই আন্দুর কিছু জমিয়া গেল। আন্দু খুব উৎসাহের সহিত কুস্তির আখড়ার নূতন সরঞ্জাম কিনিয়া, আবার মহম্মদের বাড়ীতে নিরুৎসাহ কুস্তিগীরদিগকে সমবেত করিয়া তালিম করিতে সুরু করিল। তাহার অযত্নে দলটি প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। আন্দু যখন যে দিকটায় ঝুঁকিত, তখন এমনি প্রাণপণে সেটায় জোর দিত, যে, তাহার চাড়ে যে অন্য দিকটা সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইতেছে, তাহার হিসাব রাখিত না। মহম্মদ প্রায়ই তাহাকে বিদ্রূপ করিত যে "তুমি বেহিসাবী বন্দোবস্তের মধ্যে কোন্ দিন নিজেকে সুদ্ধ খরচ করিয়া ফেলিবে!"

কুস্তির পর মহম্মদের বাড়ীতে প্রতিদিন গীতবাদ্যের চর্চ্চা হইত। এই যুবকসম্প্রদায়ের সংসর্গে প্রাণ ভরিয়া মিশিয়া, আন্দুর সংযত সংহত জীবনের মধ্যে যৌবন-প্রবাহে তরল স্বাচ্ছন্দ্যের ঢেউ খেলিতে আরম্ভ হইল, নিবৃত্তির গাম্ভীর্য্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গেল, চপল প্রবৃত্তি প্রতাপের সহিত ধীরে ধীরে উন্মেষিত হইতে লাগিল, মনোবৃত্তির পশ্চাতে কর্ত্তব্য-অভিমানের শোভনীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত কামনারূপসী নববধূর বেশে সলজ্জ ভাবে উঁকি দিল, আন্দু মুগ্ধ হইয়া দেখিল কি সুন্দর!

(২৫)

দাদাজীর সহিত কণ্ট্রাক্টর রমানাথ বাবুর বিশেষ আলাপ ছিল। সেদিন ইঞ্জিনীয়ার বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে আন্দুর কথা উঠিতেই, দাদাজী যখন বলিলেন যে ঐ নবীন পেণ্টারটিই পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিউবার্ট সাহেবকে উন্মত্ত ঘোড়া হইতে বাঁচাইয়াছিল, এবং প্রকাণ্ড মেলায় ডেপুটীর উদ্ধত জামাতাকে পদাঘাত করিয়াও নির্ব্বিবাদে ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনামূলক চাকরী স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া আসিয়াছে,—তখন আন্দুর উপর সকলেরই একটু সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠিল। পরদিন আন্দু যখন তুলি ছাড়িয়া ছুটীর সময় ছুতারের সহিত করাত চালাইতেছিল, তখন অকস্মাৎ ইঞ্জিনীয়ার বাবু আসিয়া, তাহার সর্ব্বাবয়বের মাপজোঁক করিয়া, তাহার শরীরের বিস্তর প্রশংসা করিলেন ও তাহার জীবন সম্বন্ধে অনেক অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন সুধাইয়া গেলেন। তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া আন্দু ক্ষুণ্ণ মনে ভাবিল, খোদা এমনি বিষম চেহারায় তাহাকে দুনীয়ায় পয়দা করিয়াছেন, যে, সেই অভাগাই সকলের চোখে ঠেকিয়া যায়।

কয়েকদিন পরে পুরাতন পেণ্টার মহাশয়ের শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি কলিকাতা চলিয়া গেলেন। কণ্ট্রাক্টর বাবুর কাজও আর বেশী ছিল না, সুতরাং আন্দু একলাই চালাইতে লাগিল।

এই সময় কণ্ট্রাক্টর বাবু একটি নূতন কাজ ঠিকা লইলেন। এক সাহেবের প্রকাণ্ড বিল্ডিংয়ের কিয়দংশ গাঁথিয়া তুলিতে হইবে, ও অপরাংশের পুনঃসংস্কার হইবে। এবার সর্দ্দার মিস্ত্রি মহম্মদেরও ডাক পড়িল। আন্দু ও মহম্মদ একসঙ্গে কাজে খুব উৎসাহের সহিত লাগিল।

কয়েকদিন পরে কণ্ট্রাক্টর বাবুর দৌহিত্র, ত্রয়োদশ বর্ষীয় রতু বাবু, নিজের গরজে আন্দুর সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া ফেলিল,—তাহার পাঠগৃহের দেয়ালের পেণ্টিংগুলি বিকৃত হইয়া চটা উঠিয়া যাইতেছে, সুতরাং আন্দুকে একবার বিশেষ প্রয়োজন। এই সুকোমল সুন্দর বালকটির সহিত খুব আগ্রহের সহিত আলাপ করিয়া আন্দু তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল যে, আগামী কল্য রমানাথ বাবু কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতা যাইবেন, তিনি না আসা পর্য্যন্ত বিল্ডিংয়ের কাজ বন্ধ থাকিবে, সেই অবসরে আন্দু রতু বাবুর ঘর পুনঃ সংস্কৃত করিয়া দিবে।

রতু কথাবার্ত্তা পাকাপাকি করিয়া বিদায় লইল। ছেলেটির ফুটফুটে পরিষ্কার চেহারা দেখিয়া আন্দুর তাহাকে বড় ভাল লাগিয়াছিল। রতু চলিয়া যাইবার সময় তুলি ফেলিয়া আন্দু বিল্ডিংয়ের দ্বার পর্য্যন্ত আসিল ও কথাপ্রসঙ্গে যখন জানিতে পারিল যে এই সুন্দর কিশোর বালকটি পিতৃমাতৃহীন,—তখন করুণায় তাহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল। রতুও এই পেশী-কঠিন-দেহ লোকটির নম্র মনোহর আলাপপরিচয়ে বড় খুসী হইয়া প্রফুল্লচিত্তে বাড়ী ফিরিল।

পরদিন প্রত্যুষের ট্রেনে রমানাথ বাবু কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

প্রাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আন্দু রমানাথ বাবুর বাড়ীতে আসিল, বাড়ীখানি তাহার অপরিচিত নহে, এই বাড়ীতেই সে একদিন লতিকা ও পরিমল প্রভৃতিকে দেখিয়াছিল। বাড়ীখানা পূর্ব্বে সে ভাড়া মনে করিয়াছিল, গতকল্য কৌতূহল মীমাংসার জন্ম রতুকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছে বাড়ীখানি রতুর পিতার। আন্দু লতিকার স্বামী ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখ করিতেই রতু বলিল—"হাঁ তাঁহারা পিতার বন্ধুর আত্মীয়; সেকেন্দরাবাদের বাড়ীতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ম আসিয়াছিলেন।" আন্দু এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিল না, এবং নিজেও যে তাহাদের পরিচিত ব্যক্তি সে কথাও কিছু প্রকাশ করিল না।

প্রাতঃকাল; ক্রমবর্দ্ধমান তপনালোকের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে আন্দু বরাবর আসিয়া বাড়ীর বারাণ্ডায় উঠিল; সে রতুকে ডাকিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সহসা স্তব্ধ হইয়া শুনিল, হলের ঐ দিকে অদূরবর্ত্তী কক্ষ হইতে অতি সুমধুর রমণীকণ্ঠে গীতা পঠিত হইতেছে।—

মুহূর্ত্তে আন্দুর সমস্ত অন্তঃকরণটা আলোড়িত করিয়া সমুদায় চিত্তবৃত্তি সবলে উন্মুখ হইয়া উঠিল, আত্মবিস্মৃত আন্দু পরিপূর্ণ মুগ্ধতায় অভিভূত হইয়া পড়িল। সে ত দাদাজীর মুখে অনেকবার এসব শ্লোক শুনিয়াছে,—কিন্তু সেখানে সে বরাবরই অনুভব করিয়াছে প্রাণস্পর্শী মঙ্গল-মন্ত্র;—আজ এখানে, সহসা অন্য কণ্ঠের মধ্যে সে আশ্চর্য্যের সহিত অনুভব করিল, নিবিড় মর্ম্মস্পর্শী মাধুর্য্য-সঙ্গীত।

বাড়ীর চাকর কৃষ্ণ হলঘরের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিতেই তাড়াতাড়ি আপনাকে সাম্‌লাইয়া আন্দু ব্যগ্র হইয়া বলিল "রতু বাবু কই?"

কৃষ্ণ রতুকে ডাকিয়া দিতেই আন্দু রতুর সহিত আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহার পাঠগৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। গত কল্য পেণ্টিংয়ের মলিন চটাগুলি উঠাইয়া ঘরখানি চুনকাম করা হইয়াছে, সুতরাং আন্দু গিয়াই কাজ আরম্ভ করিল।

দ্বিপ্রহরে ক্লান্তির অবসরে সরল ব্যায়ামে বুকপিঠের অস্থিগুলা সোজা করিয়া হাত-পা-গুলো সজোরে খেলাইয়া অসাড়তা ঘুচাইয়া যখন আন্দু বিশ্রামের জন্ম বসিয়া দেরাজের গায়ে ঠেসানো ঘরের ছবিগুলি দেখিতেছিল, তখন চাকর কৃষ্ণকান্ত তাহার সংবাদ লইতে ঘরে ঢুকিল; রতু তখন স্কুলে গিয়াছিল।

কৃষ্ণ আন্দুর সহিত অনেক অনাবশ্যকীয় প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ করিল। অন্যমনস্ক আন্দু ছবিগুলা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে, সহসা একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ তুলিয়া সোৎসুকে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছবি কার?—"

কৃষ্ণ সকৌতুকে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; আন্দু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া ভাবিল—তাইত, সে কি নির্ব্বুদ্ধিতাই করিয়া ফেলিয়াছে! কৃষ্ণ বলিল "চিন্‌তে পারছ না? রতু-বাবু আর ওঁর দিদি!"

আন্দু ঢোক গিলিয়া বলিল "ওঃ!"—যেন সে সত্য-সত্যই এতক্ষণে রতুকে চিনিল; কিন্তু তাহা নহে, রতুকে সে চিনিয়াছিল বলিয়াই রতুর পশ্চাৎবর্ত্তিনী বৃক্ষতলে-উপবিষ্টা বৃক্ষকাণ্ড-বামস্কন্ধ-সংলগ্না, কমনীয়-মূর্ত্তি অনাড়ম্বর-বসনা তরুণীর পরিচয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—ফটোখানি দেখিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে একটা তীব্র কৌতূহল আন্দুর মনের মাঝে খর স্রোতে বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার সদ্যোন্মেষিত শিল্প-কলারসিক গুণগ্রাহী দৃষ্টি চিত্রখানির ভাবমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল—কিশোর বালক, তরুণীর কণ্ঠাবলম্বনে, ঠিক যেন তাঁহার বক্ষে ন্যস্ত মস্তক রাখিয়া সম্মুখের দিকে, ভবিষ্যৎ পানে আগ্রহাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; আর তরুণী, বালককে দক্ষিণ হস্তে জড়াইয়া, পৃথিবীর কঠিন অনাবৃত বক্ষে বসিয়া, বিশাল বৃক্ষকাণ্ডে নির্ভর স্থাপন করিয়া বেদনাব্যঞ্জক স্নিগ্ধ সকরুণ দৃষ্টিতে উর্দ্ধ মুখে চাহিয়া আছে, সে যেন পরম, গভীর, সুদূরগামী দৃষ্টি! উভয়েরই আকৃতিতে একটা সাদৃশ্য-ব্যঞ্জক কোমল লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছে। একাগ্র দৃষ্টিতে ছবিখানি দেখিতে দেখিতে সহসা আন্দুর মনে হইল, সে যেন এইরূপ চেহারা কোথায় কাহার দেখিয়াছে। ফশ্ করিয়া আন্দু জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"এঁর নাম?—"

কৃষ্ণ বলিল, "তাকে মণি বলে, নাম জোচ্ছনা,—। উনি বিধবা।—"

আন্দুর স্তম্ভিত দৃষ্টি নত হইল।

(২৬)

চার পাঁচ দিনের মধ্যে রতুর ঘরের কাজ শেষ হইয়া গেল। তখনো রমানাথ বাবু আসিলেন না। আন্দু খুব ব্যস্ততার সহিত কুস্তির দলের সাগরেদদের কুস্তির নূতন নূতন প্যাঁচ শিখাইয়া, দীঘিতে ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া পর্য্যায়ক্রমে সাঁতার শিখাইয়া, এবং পরিচিত অপরিচিত সকলের কুশলাকুশল জানিয়া, কয় দিন কাটাইল। সেদিন যখন ছোট বাবুর সহিত দেখা করিয়া তাঁহার বাসা হইতে প্রাতঃকালে ফিরিতেছিল, তখন পথে কৃষ্ণর সহিত সাক্ষাৎ হইল, কৃষ্ণ ডাক্তারখানা হইতে ফিরিতেছে, তাহার হাতে ঔষধের শিশি। আন্দু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—রমানাথ বাবু অসুস্থ হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। অভ্যস্ত সংস্কারবশে তখনই তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া সহসা আন্দু একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বলিল "না চল, আমি দেখে আসি।"

কৃষ্ণ ঘরে গিয়া শিশি রাখিয়া, ডাক্তারের বক্তব্য বিষয় বলিয়া, আন্দুর কথা বলিতেই রমানাথ বাবু তাহাকে ডাকিলেন।

নিকটে বাতায়নে পিঠ রাখিয়া জ্যোৎস্না বসিয়া দাদা-বাবুর কথানুযায়ী একখানি পত্র লিখিতেছিল। অপরিচিতের আগমনের সম্ভাবনায় কাগজ কলম চেয়ারে ফেলিয়া মাথায় কাপড় তুলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছিল, রমানাথ বাবু ডাকিয়া বলিলেন "মা, আমার মোজা-দস্তানা-গুলো পরিয়ে দাও তো, হাত পা বড় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, উলের গেঞ্জিটাও দিও।"—

জ্যোৎস্না আন্‌লা হইতে মোজা ও দস্তানা পাড়িয়া আনিল; উঁচু হুকের উপর হইতে গেঞ্জিটা নামাইতে যেমন হাত বাড়াইয়াছে, ঠিক সেই সময় আন্দু কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেই একেবারে উন্নত-মুখী জ্যোৎস্নার সহিত তাহার চোখোচোখী হইয়া গেল। জ্যোৎস্না মাথায় কাপড় ঠিক করিয়া গেঞ্জি লইয়া দাদাবাবুকে পরাইতে আসিল।

আন্দুর আপাদমস্তকে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চমক খেলিয়া গেল!—ইনিই তিনি! যাহার অস্পষ্ট স্মৃতি মনের মাঝে অস্পষ্টতর হইয়া গিয়াছে, যাঁহার শোচনীয় পরিবর্ত্তিত জীবনের ফলে শান্ত সহিষ্ণু মূর্ত্তির মৌন করুণদৃষ্টি তাহার চিত্ত গভীর বিষাদে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, ইনিই তিনি!—শিল্পের আদর্শ বটে! আন্দুর সমস্ত চিত্তশক্তি অকস্মাৎ সাগ্রহে উন্মুখ হইয়া,—তাহার অজ্ঞাতে,—সেই সৌন্দর্য্য-সুষমা চিত্ত ভরিয়া গ্রহণ করিল,—কি সুন্দর দৃষ্টি! কি মনোহর! আন্দু সারা জীবনের মাঝে এমন শুচিস্মিত, এমন শান্ত দৃষ্টি আর কখনো দেখে নাই! আন্দুর মনে হইল, সে যেন কত যুগযুগান্তর ধরিয়া এই দুইটি আদর্শ মনোরম মহিমাময় দৃষ্টির আরাধনা করিয়া আসিতেছে, আজ তাহার সাধনা ধন্য হইল!—এই প্রসন্ন সুপবিত্র দৃষ্টি, এ জগতে অতুলনীয়, সারা বিশ্বের সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ এই দৃষ্টির মাঝে! কি অপরিসীম আনন্দ-সংবাদ! আন্দুর সমস্ত অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ হইয়া গেল। জ্যোৎস্না চাহিতেই আন্দু সসম্ভ্রমে পিছু হটিয়া গিয়া দ্বারের বাহির হইতে রমানাথ বাবুকে অভিবাদন করিল। রমানাথ বাবু তাহার সহিত আবশ্যকীয় কথা কহিতে লাগিলেন।

জ্যোৎস্না দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া রমানাথ বাবুকে মোজা দস্তানা জামা স্বহস্তে পরাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। জ্যোৎস্নাও আজ মনের মাঝে একটা অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময় অনুভব করিয়া চঞ্চল হইল। দূর হইতে কয়দিন যে সামান্য লোকটাকে দূরে দূরে কাজ করিতে দেখিয়াছে, আজ অত্যন্ত কাছা-কাছি তাহার সম্ভ্রমসুন্দর চক্ষু দুটির মাঝে কোমল আগ্রহের সন্ধান পাইয়া সেও কৌতূহল জয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বিশেষ, মানবসমাজে অপরিচিত দৃষ্টির প্রতি যখনই সে নেত্রপাত করিয়াছে, তখনি সেখানে এমনি একটা জ্বালাময় তীব্রতা অনুভব করিয়াছে—যাহাকে কঠিন ঘৃণায় অবজ্ঞা না করিয়া মোটেই থাকিতে পারা যায় না!—কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ নিকটবর্ত্তী দীপ্ত প্রশান্ত খরত্ব-হীন দৃষ্টিতে পুণ্যোজ্জল ভাবের আভাষ পাইয়া বড় খুসী হইল।

এই সামান্য লোকটির বিনয়নম্র শিষ্টাচারের সহিত সম্ভ্রান্ত লোকদের গর্ব্বিত ফ্যাসান-বদ্ধ শিষ্টাচারের তুলনা

করিয়া দেখিতে দেখিতে—সহসা মেঘছিন্ন রৌদ্রের মত—পুরান কথা তাহার মনে পড়িল,—সে ভাগলপুরের কথা! চকিতে ভাগলপুরের সমস্ত ঘটনা তাহার চিত্তক্ষেত্রে একটা সুগভীর স্পর্শ বুলাইয়া গেল—সব চেয়ে বেশী স্পষ্ট মনে হইল, লতিকার বিড়ম্বনা-ক্লিষ্ট আচরণের উপসংহার!—সেই জ্যোৎস্না-যামিনীতে নির্জ্জন ছাদের উপর হইতে দেখা সেই দীপালোকিত কক্ষের সেই গম্ভীর স্থৈর্য্য ও অধীর চপলতার দৃপ্ত সংঘাত-অভিনয়! জ্যোৎস্না ভারাক্রান্ত চিত্তে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল,—মনে মনে বলিল—এই পেণ্টারটির আকৃতি অনেকটা সেই ড্রাইভারের মত!

শীতকালের রৌদ্রের মত সুমিষ্ট হেমাভ-উজ্জ্বল সেই একটা মহত্ত্ব-স্মৃতি সহসা আজ তাহার হৃদয়ের দ্বারে বড় জোরে ঝাপ্টা মারিয়া তাহাকে অনেক দূরের অতীতের পানে বার বার টানিতে লাগিল,—জ্যোৎস্নার বড় ইচ্ছা হইল যে একবার ভাল করিয়া সেই অদৃশ্যপ্রায় অতীত রাজ্যটা সমস্ত চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া লয়; কিন্তু কাল মাঝখানে একটা ঘন ছায়ার যবনিকা ফেলিয়া তাহাকে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করিতে লাগিল, সেই পুরাতন—সেই অতীতকে একবার নূতন করিয়া দেখিতে—নূতন করিয়া মর্ম্মের মাঝে অনুভব করিতে, জ্যোৎস্নার মন আজ বড় লালায়িত হইয়া উঠিল, তীব্র কৌতূহল তাহার বক্ষের মাঝে ব্যর্থ চেষ্টায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুর্দ্দম্য ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃজন করিল। জ্যোৎস্নার শান্ত নিরুপদ্রব চিত্তের মাঝে সেই পুরান নির্জ্জীব ঘটনা-স্মৃতি অকস্মাৎ আজ যেন দানো পাইয়া মহা উৎপাত বাধাইয়া তুলিল!

কলিকাতা গিয়া রমানাথ বাবুর খুব জ্বর হইয়াছিল। জ্বর যদিও সারিয়াছে, কিন্তু শ্লেষ্মার প্রকোপ কমে নাই, তাহাতে তখন বর্ষাকাল, চারিদিকেই অসুখবিসুখ হইতেছে। তিনি আন্দুকে বলিয়া দিলেন যে তাঁহার শরীর সুস্থ না হাওয়া পর্য্যন্ত বিল্ডিংয়ের কাজ বন্ধ থাকিবে।

মহম্মদকে রমানাথ বাবুর আদেশ জানাইতে হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া রাস্তায় নামিয়াই কিন্তু আন্দু সে কথা ভুলিয়া গেল। গন্তব্য অগন্তব্য নানা পথের মধ্য দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে, সে কেবলই জ্যোৎস্নার কথা ভাবিতে লাগিল;—এই জ্যোৎস্না, তিনি! যেদিন বিলাসভোগ-উজ্জ্বলা সৌভাগ্য-গৌরবময়ী কিশোরী জ্যোৎস্নাকে আন্দু ভাগলপুরে দেখিয়াছিল, তখন তাহার সৌন্দর্য্য আন্দুর চোখে ভাল করিয়া ঠাহর হয় নাই, আজ তাহাকেই স্পষ্ট করিয়া দেখিল সংসারের সর্ব্বসুখবঞ্চিতা অবস্থায়,—ভাগ্যচক্রের নিষ্ঠুর দৈন্যপীড়িত জীবনে,—ঠিক যেন তপশ্চর্য্যার পবিত্রতায়, শান্ত সুন্দর মাধুর্য্যমণ্ডিত বেশে! এই মূর্ত্তির মধ্যে কৃত্রিম শোভা-চাতুর্য্যের লেশ মাত্র আড়ম্বর ছিল না, ছিল শুধু গভীর উদাসীনতা। আন্দু তাঁহার গায়ের সেমিজ, পরণের সরুপাড় ধুতি, হাতের রুলী, কপালের অনাদৃত বিশৃঙ্খল কেশ, কিছুই লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য সন্তর্পণ-চকিত-নেত্রে দেখিয়াছিল মাত্র তাহার চক্ষুদুটি!—সেইখানেই সে যেন তাঁহার সমস্ত পরিচয় জানিয়া লইয়াছিল!

আন্দুর চিত্তের একাগ্রতা যতদিন কাজের মাঝে ছিল, ততদিন কর্ম্মের মাঝে নিরন্তর সে সফলতাই লাভ করিয়াছে, এখন কর্ম্মহীন অলস মুহূর্ত্তগুলা শুধু গভীর চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, একটি মাত্র বিষয়কে সহস্র দিক হইতে সহস্র অংশে বিশ্লেষণ করিল। মনুষ্যহৃদয়-নামক সজীব পদার্থটা অন্তর্দৃষ্টির অনুবীক্ষণযন্ত্রের দ্বারা মোহের দিক হইতে মনোরম ভাবে দেখিতে চেষ্টা করিল,—পদার্থ-বাচক বিশেষ্য মাত্রেই যে অগ্নির ভক্ষ্য সে কথাটা স্মরণ রাখিতে সে ভুলিয়া গেল।

সত্যই তাহার সূক্ষ্ম অনুভব-শক্তিকে ইতিপূর্ব্বে কেহই এমন তীব্র আক্রমণে জাগাইয়া তুলে নাই। তাই এখন সহসা সেটা অত্যন্ত গভীরতার সহিত অনুভব করিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল। নিতান্ত অনাবশ্যক বোধে জগৎব্যাপারের যে অংশটায় বিবেকের পর্দ্দা ফেলিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে এতদিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া দিন কাটাইয়াছে, আজ অকস্মাৎ গভীর সংঘর্ষণের মুহূর্ত্তে তাই সেটার দিকে তীক্ষ্ণ আগ্রহ পড়িল, উত্তেজনার ঝাপ্টার বেগে পর্দ্দাটা ছিঁড়িয়া রহস্য-গহ্বরের অন্ধকারের অভ্যন্তরে যতদূর সম্ভব দৃষ্টিশক্তি চালাইল,—এবং সেই অলক্ষণীয় অংশটাই যে মানব-জীবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ মহত্তর,—সে সম্বন্ধে আজ তাহার তিলার্দ্ধ সন্দেহ রহিল না।

নয়নের মধ্য দিয়া যে প্রচণ্ড অনুভূতি তাহার অন্তরের

অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পুলক-হিল্লোলে প্রবল বেগে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল, আন্দু পরিপূর্ণ সংহত চিত্তে তাহারই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মর্ম্মগ্রহণে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করিল।

বহুদিন রুক্ষ রূঢ়তার সংসর্গে তাহার চিত্ত এতদিন যে পরিমাণ তৃষ্ণা সঞ্চয় করিয়াছিল, আন্দুর চিত্ত এতদিনে সেই পরিমাণ পীপাসায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—যাহা সে পান করিতে চাহিতেছে তাহা স্বাস্থ্যকর পানীয়, কি মত্ততাকর সুরা, তাহা বুঝিয়া দেখিবার শক্তি তাহার ছিল না।

(ক্রমশ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

মনের বিষ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অবশেষে আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। শীতল সমীরণ হাস্নার ফুলের পরিমল বহন করিয়া দিনের দাহ জুড়াইতে লাগিল। আকাশপটে বিচিত্র রঙের খেলা স্থির সাগর-বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া এক রংকেই বিচিত্র করিয়া তুলিতে লাগিল। আমার ইচ্ছা আমাকে ব্যগ্র করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু আমি শেষ রশ্মিটির বিদায় লওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। উড়ন্ত পরীর ওড়নার মতন অস্তরবির রং যখন সাগর জলে ডুবিয়া গেল—হলুদবরণ চাঁদ যখন আকাশ-সাগরের মিলন-রেখার উপর ফুটিয়া উঠিল, তখন আমি আমার বাড়ীর পথ ধরিয়া রওনা হইলাম। আমার বক্ষ স্পন্দিত হইয়া ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল, আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল, আমার পদক্ষেপ প্রতিপদে দ্রুততর হইতেছিল—তবু মনে হইতেছিল পথ কত লম্বা! আমি সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলাম; তোরণ বন্ধ; সিংহদ্বারের সিংহ-মূর্ত্তি যেন আমার অনধিকার প্রবেশের চেষ্টাকে ভ্রূকুটি করিতেছে। ভিতর হইতে নির্ঝরের জলপতন শব্দ শোনা যাইতেছিল, উদ্যানের নাগকেশর ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। আমি গৃহে ফিরিয়াছি। আমার সর্ব্ব শরীর ও অন্তর পুলকে ঔৎসুক্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিবার আমার ইচ্ছা ছিল না; একবার স্নেহাকুল দৃষ্টিতে বাড়ীর দিকে চাহিয়া যে গোপন পথে আমি বাহির হইয়াছিলাম সেই খিড়কি দরজার দিকে চলিলাম। এই বিজন আমের তরুবীথি আমার অতিপ্রিয়, আমি প্রায়ই এখানে একাকী ভ্রমণ করিতাম। আমি সন্তর্পণে সেই তরুবীথির মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। আমার প্রিয়জনদের দেখিবার মুহূর্ত্ত নিকটতর হইয়া আসিতেছে, উল্লাস আমি আর ধরিয়া রাখিতে পারি না। নীলা—নীলা আমার—তাহাকে বক্ষে ধরিবার জন্য বক্ষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

আমাকে ফিরিয়া পাইয়া তাহারও আহ্লাদের সীমা থাকিবে না। চম্পা! এত সকালে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিস্ কি? ঘুমাইলেও আমি তোকে না জাগাইয়া ছাড়িব না। তোর ঐ করবী-কোরক-সদৃশ নির্ম্মল গণ্ডদ্বয়ে স্নেহচুম্বন না দিলে আমার সুখ সম্পূর্ণ হইবে না। গোবিন্দ! তুমি এখন কোথায়? বন্ধুপত্নীর সান্ত্বনার জন্য এ গৃহে আছ কি? এস, বন্ধু, বন্ধু তোমার ফিরিয়া আসিয়াছে, সর্ব্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা কর, আশীর্ব্বাদে আশীর্ব্বাদে তাহার সকল সন্তাপ দূর করিয়া দাও।

কি গভীর সুখ-কল্পনায় বিভোর হইয়া নীরব নিস্তব্ধ লতাবিতান অতিক্রম করিতেছিলাম; সহসা আমার সুখ-স্বপ্ন কে এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল! নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলাম। একি! কাহার এই হাস্যধ্বনি—আনন্দ-উচ্ছ্বাস! সে সুমিষ্ট হাস্যলহরী আমার সম্পূর্ণ পরিচিত, আমার অস্থি মজ্জার সহিত বিজড়িত, এও কি ভুল হয়! সে হাস্য নিশ্চয় নীলার! বংশপত্রের ন্যায় শরীর কাঁপিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিলাম, জগৎ আমার চক্ষু হইতে ডুবিয়া গেল। হায়! নীলা আমাকে মৃত জানিয়া, চিরতরে আমাকে হারাইয়া, কোন্ প্রাণে এমন হাসি হাসিতেছে! বৃক্ষপত্রের অবকাশ দিয়া দেখিলাম, নীলা আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। পত্রান্তরালে লুকাইলাম। নিবিড় পত্রের ছায়ার অন্ধকারে উত্তমরূপে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া নীলার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আবার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। সে শব্দ আমার মস্তিকে তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত বিদ্ধ হইল। সে সুখী প্রফুল্ল, জ্যোৎস্নালোকে আমোদ করিতেছে! নির্ব্বোধ

আমি,—ভাবিয়াছিলাম, আমার অভাবে নীলা শোকাতুরা, অশ্রুসিক্তা, আমার আত্মার কল্যাণে সে প্রার্থনারতা! সকলই বৃথা—সকলই অমূলক! মোহমুগ্ধ, ভ্রান্ত আমি। পোষাকবিক্রেতা বৃদ্ধকে বাতুল বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। সে বাতুল নয়, বাতুল আমি। অভিজ্ঞ বৃদ্ধ, যাহা বলিয়াছে তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য,—নীলা নির্ম্মম—হৃদয়হীন—সয়তানী!

না—ভুল বুঝিতেছি, নীলা, সে যে আমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসে! কৃত্রিমতা!—তাহাতে অসম্ভব। এই আকস্মিক বিপদে প্রিয়তমা বুঝি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে; নতুবা এক দিবস পূর্ব্বে যাহার স্বামীর মৃত্যু ঘটিয়াছে, সে কি এমন হাসি হাসিতে পারে। কি নিষ্ঠুর আমি, এখনও এখানে বসিয়া আছি! ছুটিয়া যাই; প্রিয়াকে বলি তোমার হেম মরে নাই!

উঠিব ভাবিতেছি, এমন সময় দুইটি মূর্ত্তি, হাত ধরাধরি করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে দেখিলাম; তাহার একটি আমার স্ত্রী, দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার বন্ধু গোবিন্দ! আত্মসম্বরণ করিয়া নিজকে বুঝাইলাম, ইহাতে এমন অস্বাভাবিকতা কি আছে। গোবিন্দ আমার সহোদর-সদৃশ,—বিমনা রমনীকে প্রকৃতিস্থ করিবার তাহার এ চেষ্টা। সে ত তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যই করিতেছে। কিন্তু গোবিন্দ-কেন নীলার গণ্ড প্রান্তে বদন অবনত করিল। আর দেখিবার সাধ্য হইল না; চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। আমার হৃদপিণ্ডে শোণিত শব্দ-করিয়া ফুটিতে লাগিল; মস্তক দিয়া অগ্নি বাহির হইল। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিল। লুক্কায়িত স্থানে অসাড়ের মত কেমন করিয়া বসিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলাম বলিতে পারি না। আমারই সম্মান ইজ্জত, আমারই সম্মুখে কলঙ্কিত হইতেছিল, মৃত আমি মৃতের ন্যায় নিশ্চিন্ত ছিলাম। বোধ হয়, তখন আমার চেতনা ছিল না; তাহা না হইলে মানুষ কি সে দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে। তাহারা—গোবিন্দ ও আমার স্ত্রী—আমার অনতিদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাদের প্রতি অঙ্গভঙ্গী দেখিতে পাইতেছিলাম, প্রত্যেকটি বাক্য শুনিতে পাইতেছিলাম। পরিধানে শুভ্র সুচিক্কণ রেশমী পোষাক, বক্ষে একটি রক্তবর্ণ পদ্ম হীরক-সূচিকায় আবদ্ধ,—জ্যোৎস্নায় জলিতেছে, ও-বক্ষে রক্তবর্ণ পদ্মের পরিবর্ত্তে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের রক্ত-উৎস, হীরক সূচিকার পরিবর্ত্তে সুতীক্ষ্ণ তরবারি অধিকতর যোগ্য নয় কি? কি করিব,—আমি তখন নিরস্ত্র। মৃত্যু আমাকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। হায়, ঈশ্বর! এ দৃশ্য দেখিতে হইবে যদি কেন আমাকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া দিলে! নীলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম; নীলা নিতান্ত সরল বা ক্রূর-শিরোমণি; বদনের সে ভাব রক্ষা করা কম শক্তির কথা নহে। সে তখনো তেমনি সুন্দর, তাহার মুখের শিশুর ন্যায় হাসি, তাহা দেখিয়া কে বলিবে সে দোষী! কি ভয়ানক রমণী!

নীলা তাহার অভ্যস্ত মধুর কণ্ঠে বলিল "গোবিন্দ, আজ যদি হেম জীবিত থাকিত তবে কি হইত? কে ভাবিয়াছিল, সে এত সত্বর আমাদের সুখের পথ সুগম-করিয়া এমন ভাবে অন্তর্হিত হইবে।"

গোবিন্দ ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল "সে জীবিত থাকিলেও কোন আশঙ্কা ছিল না। তুমি তাহা অপেক্ষা অনেক চতুর। বিশেষতঃ সে আপনার ভাবে আপনি সর্ব্বদা মত্ত থাকিত; মনে তাহার সন্দেহের লেশ মাত্র ছিল না। নিজের উপর তাহার অসীম বিশ্বাস ছিল; সে ভাবিতে পারিত না, তাহার স্ত্রী তাহাকে ব্যতীত অন্যকে ভাল বাসিতে পারে।"

আমার স্ত্রী—যাহাকে আমি তাম্রলিপ্তি গগনের নিষ্কলঙ্ক শশধর, স্ত্রী জাতির শিরোমণি বলিয়া ভাবিতাম ধীর স্বরে বলিল "সে মরিয়া বাঁচিয়াছে, আমিও বাঁচিয়াছি। কিন্তু গোবিন্দ সংসারজ্ঞানহীন, অকাল-কুষ্মাণ্ড, তুমি কেন আমার পশ্চাতে লাগিয়া আছ—লোকে দেখিলে কি বলিবে? ছয় মাস অন্ততঃ আমাকে বিধবার বেশে কাটাইতে হইবে; তাহা ছাড়া আরও অন্য কথা ভাবিবার আছে।"

গোবিন্দ অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "না না, প্রিয়তমা, আমি এখন হইতে সে বিষয়ে সাবধান হইব। সেই জন্যই ত বলিতেছিলাম, হেমের মৃত্যুতে আমি নিশ্চিন্ত হই নাই; আমাদের বিবাহ হইয়া গেলেতবে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব!"

স্থির থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইল। থর থর

করিয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কম্পনে আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ পত্রবহুল বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা সহিত আন্দোলিত হইয়া একটি মৃদু শব্দ উত্থিত করিল। সন্দিগ্ধমনা নীলার শ্রবণ শক্তি তাহা অতিক্রম করিতে পারিল না। সে ভয়-বিহ্বল চকিত দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিল "আর এখানে না; চল ভিতরে যাই। মাত্র গত কল্য তাহার সমাধি হইয়াছে, তাহাও ঐ অবস্থায়! লোকে বলে কত মানুষ মরিয়া ভূত হয়। এই লতাবিতান তাহার বড় প্রিয় ছিল, তাহার কন্যাকে লইয়া সে এখানে বেড়াইতে বড় ভালবাসিত; তাহার প্রেতাত্মা যদি সে প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে না পারে। আমি তাহার না হই,—কন্যা ত তাহার। চল ফিরিয়া যাই।"

গোবিন্দ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "সে সুখের আশা এখনও যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নরকে পাঠাইব। অনেক সহ্য করিয়াছি; সে যতটি চুম্বন তোমার অধর হইতে চুরি করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির জন্য আমি তাহাকে অভিসম্পাৎ দিয়াছি দিতেছি। বিবাহ করিলেই ত স্বামীর অধিকার পাওয়া যায় না; যে যাহাকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসে সেই তাহার স্বামী—সেই তাহার স্ত্রী!"

হা ভগবান! এই সমাজ কিনা সভ্য! বিবাহের ইহা একটা অভিনব ধারা বটে! স্বামী চোর, আর প্রেমিক সাধু, স্বাধীন! সভ্যতার নামে নরক আর কাহাকে বলে। আমার স্ত্রীর প্রিয় লোকটি তাহার বক্ষের হীরকহারের ধুক-ধুকি নাড়িতে নাড়িতে বলিল "তুমি কি গুণে হেমকে বিবাহ করিয়াছিলে?"

স্ত্রী বলিল, "কেন করিয়াছিলাম, তাহা তুমি বুঝিবে না। আমি ধনীর কন্যা; পালিত হইতেছিলাম ভিক্ষুণীদের আশ্রমে; ধনের ঐশ্বর্য্যের লালসা আমার মজ্জাগত, তাহার অভাব আমাকে পীড়া দিতেছিল; হেম যখন সেই অভাব মোচন করিবার সম্ভাবনা লইয়া আমার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিল তখন আমি তাহাকে ভাল না বাসিলেও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। অমন আর একটি বর সমস্ত তাম্রলিপ্তিতে ছিল কি? সৌভাগ্য আমার; তাহাকে আমি আমার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের মোহে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিলাম। বুঝিলে এখন হেমকে কেন বিবাহ করিয়াছিলাম?"

গোবিন্দ বলিল, "তবে—অর্থই যদি তোমার সব,—আমি ত ধনহীন,—আমার আশা তবে ডুবু-ডুবু!"

নীলা হেলিয়া দুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "নিশ্চয়ই না। আমি এখন স্বাধীন; অর্থ বিত্ত আমার অপরিমিত। এখন আমি যাহাকে ভালবাসি স্বচ্ছন্দে তাহার হইতে পারি—হোক না সে দরিদ্র, ধনহীন! আমি বধূ হইয়া হেমের অন্তঃপুরে আসিয়া যেই তোমাকে দেখিলাম অমনি, আপনাকে আপনি বলিলাম—এই, এই আমার প্রিয়তম, এই আমার স্বামী!"

গোবিন্দ নীলার বাক্য শেষ হইতে না দিয়া আবেগ-ভরে বলিল, "নীলা, থাম, থাম, আমাকে আর পাগল করিও না। বুঝিবে কি তুমি, তোমাকে আমিও কত ভাল-বাসি! আজি তুমি প্রভূত অর্থের অধিকারিণী বলিয়া আমার এ ভালবাসা নহে। সেই দিন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমিও তোমার দাস। দাসের মতই তোমার সেবা করিয়াছি। কখনই অধৈর্য্য হই নাই,—আমি জানিতাম তুমি নারী, দেবী নও; একদিন না একদিন তুমি আমার পানে চাহিবেই। আমার প্রেম-সঙ্কেত তুমি অগ্রাহ্য কর নাই; হাস্য কৌতুকে, মনোহর বাক্যে আমাকে উৎসাহিতই করিয়াছ। এখন যাহা আমার প্রার্থনায় তাহা তুমি অপূর্ণ রাখিও না। নীলা তুমি আমারই, চিরদিন আমারই থাকিবে!"

গোবিন্দ আবেগভরে নীলাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সে তাহার হস্ত সরাইয়া দিয়া বলিল, "ছি! গোবিন্দ একি! তোমার মত নির্ব্বোধ, নির্লজ্জ আমি কখনো দেখি নাই।"

গোবিন্দ কাতর হইয়া বলিল, "অপরাধ হইয়াছে! আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তুমি হেমের স্ত্রী। অধীনের অপরাধ ক্ষমা কর।"

নীলা ভ্রূধনু আকুঞ্চিত করিয়া কটাক্ষবাণে গোবিন্দকে জর্জ্জরিত করিয়া কহিল, "ক্ষমা? কখনই হইবে না। নিমক-হারাম,—ক্ষমা! কোন সাহসে ক্ষমা চাহিতেছ?"

গোবিন্দ হাস্যের অন্তরালে ভীতির ভান করিয়া বলিল,

"না না ক্ষমা আমি কি পুণ্যে প্রার্থনা করিব! আমি চাই প্রেম!"

নীলা তাহার অতি নিকটে যাইয়া বলিল, "কি! প্রেম! প্রেম কি তোমার ন্যায় কাপুরুষের প্রাপ্য? চোর তুমি;—শাস্তি তোমার উপযুক্ত; তাহাই গ্রহণ কর। এই বন্ধন!"

নীলা গোবিন্দর গ্রীবা বাহুপাশে বদ্ধ করিল। উভয়েই হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাস্যধ্বনি সশব্দ বজ্রের ন্যায় আমার মস্তকে পতিত হইল। আমি যন্ত্রণায় চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। পরক্ষণে চাহিয়া দেখি,—নরকের কীটদ্বয় নরকে চলিয়া গিয়াছে। হা হরি, ইহারা যদি মানুষ তবে ক্রিমিকীটের অধম কাহারা?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহামারীতে আমি মরি নাই; মরিলাম আমি এখন,—আমার স্ত্রী, আমার বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা আমার জীবনান্ত করিল। শ্রেষ্ঠী হেমরাজ মরিল; জগতের চক্ষে সে প্রকৃতই মৃত। এ গৃহে আর হেমরাজের অস্তিত্ব কোথায়,—কিরূপে সম্ভবে? নীলার প্রেমামৃতে আমি জীবিত হইতে আসিয়াছিলাম; প্রেম-মদিরা হৃদয়ভাণ্ড শূন্য করিয়া উবিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট কি আছে? শূন্য, শূন্য! জীবন, মন সকলই শূন্য। হেমরাজের নাম শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে,—আছি আমি শুধু শূন্যাশ্রিত হেমরাজের প্রেতকায়া। নীলা যদি আজ আমাকে প্রেম-সঞ্জীবনীতে সঞ্জীবিত করিত,—গ্রহণ করিত, মহামারীতে আমার অনিষ্ট করিত কি? মারী রোগ নহে, সমাজের মারী—পিশাচীর হৃদয়ের পাপ-পিপাসা আমার হৃদয়-শোণিত নির্দ্দয়রূপে পান করিয়া আমার জীবনান্ত করিয়াছে। এ দেহও হেমরাজের নহে, আমি এখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীব! হেমরাজের পার্থিব যাহা কিছু আমি তাহার সমস্ত হইতেই বঞ্চিত। এই ত মৃত্যু! এই জীবন লইয়া এত!

উঠিলাম,—আমার লুক্কায়িত স্থান হইতে উঠিলাম। কোন্ আশায় আর এ গৃহে অপেক্ষা করিব? এখানে আমার যাহা ছিল হারাইয়াছি; যাহা সহ্য করিবার নয়, তাহাও সহ্য করিলাম;—যাহা দেখিবার নয়, দেখিলাম। দেখিতে হইবে—অদৃষ্টে আর কত নিগ্রহ বাকী আছে! অবিশ্বাসী হৃদয়দ্বয় যে স্থানে দাঁড়াইয়া প্রেমের অবমাননা করিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বুঝিতে চেষ্টা করিলাম, যাহা দেখিলাম, তাহা প্রকৃত না স্বপ্ন। তখনো মনে হইতেছিল ইহা অসম্ভব—বুঝি স্বপ্ন!

চিন্তার অবধি নাই, মস্তক ঠিক নাই; সমস্তই যেন মিথ্যা। আমি মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মিথ্যা, তাহার মালিক—তিনিও মিথ্যা। কোথায় তিনি? কোথায় তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য? পাপ শয়তান তাহা অধিকার করিয়াছে। জগতের সৌন্দর্য্য আর কোথায় আছে? এই যে পুষ্প—দেব অর্চ্চনার নির্ম্মল উপকরণ, এ ত বিলাসীর, বিপথগামীর, বিলাস-সামগ্রী। চন্দ্র,—পতিতের আনন্দময় বন্ধু। অনন্ত তারকা—তাহাদের অনন্ত পাপলীলার সাক্ষী। প্রকৃতির আর মহত্ব কোথায় তবে? স্ত্রী,—জীবনসঙ্গিনী—এ জগতে পাপ-রঙ্গিনী, অর্থে ক্রীত দাসী, হেয় হইতে হেয়তম জীব! যে স্বর্ণের জন্য আত্ম বিক্রয় করিতে পারে তাহার আবার মনুষ্যত্ব? সে কি আবার স্ত্রী! সে আমার কন্যার মাতা! না—ভিখারিণী, অধম আত্মসম্মানহীনা নারী অর্থের লালসায় কন্যাকে আমার তাহার পাপ উদরে স্থান দিয়াছিল, সে তাহার মাতা নহে। হৃদয়হীনা রাক্ষসী,—তাহার এই নিকৃষ্টতম পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে না? ইহার কি কোন শাস্তি নাই!—অবশ্যই আছে। আমাকেই তাহার বিধান করিতে হইবে। কিন্তু সে শাস্তি কি?

বৃদ্ধ পোষাকবিক্রেতা বলিয়াছিল, "তাহাকে মারিয়া আসা চাই।" অবশেষে নারীর রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিব কি? না, হেমরাজ এত নীচ হইতে পারে না। তবে সকলই নীরবে সহ্য করিব? আমি কি এতই কাপুরুষ! পাপকে প্রশ্রয় কে দিবে। তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি আমাকে দিতেই হইবে; ছুরিকা দ্বারা নহে,—তাহার লালসা-বহ্নিতেই তাহাকে পুড়াইয়া। যে ঐশ্বর্য্যের জন্য আমার সহিত তাহার প্রতারণা, যে ইন্দ্রিয়বিলাসের জন্য পাপপথে তাহার স্বইচ্ছায় পদার্পণ, তাহার দ্বারাই তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে; যেন অন্তিমকালে সে বুঝিতে পারে তাহার অদম্য ধনলিপ্সার, অবৈধ প্রেম-

পিপাসার চরম পরিণাম অনন্ত যন্ত্রণাময় অনন্ত নরক। সে যেন তাহার নিজকৃত বিষাক্ত বাগুরায় নিজেই হত হয়। নারীহত্যা আমার দ্বারা হইবে না। আমার প্রতিহিংসা-অনল এরূপ ভাবে প্রজ্বলিত করিব, পতঙ্গ যেন স্বইচ্ছায় তাহাতে আসিয়া পুড়িয়া মরে—আমি তাহাই চাই। চাই—চাই, সেই আমার এখন একমাত্র জীবনব্রত! কিন্তু সে প্রতিহিংসা-ব্রত উদ্‌যাপনের পন্থা কি? পন্থা নিরূপণের জন্য আকাশপাতাল ভাবিতেছিলাম। স্থির-চিত্তে চিন্তা করা আমার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। পিঞ্জর-বদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায়, লতাবিতানে অসম পদবিক্ষেপে গতায়াত করিতেছিলাম। সান্নিপাতিক-বিকারগ্রস্ত রোগীর চিন্তার মত আমার চিন্তা কোন কার্য্যকর সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া কেবল আমাকে আরও পীড়া দিতেছিল। হীরক-মল্লিকাটি সহসা আমার বক্ষচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইল। এই না সেই মল্লিকা,—যম-দ্বারে যে আমাকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিল? প্রতিহিংসার পথও সেই আমাকে দেখাইয়া দিল। মল্লিকাটি দেখিবামাত্রই মনে হইল, হায়, হতভাগিনী নীলা, অর্থের জন্যই আমাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিল; তাহার সুখের জন্য অর্থ ব্যয়ে কোন দিনই একটু দ্বিধা করি নাই,—আজও দস্যু রুদ্রদামের প্রভূত অর্থ তাহাকেই ডালি দিতে আসিয়াছিলাম, তবু তাহার অদম্য অর্থলালসাকে তৃপ্ত করিতে পারি নাই! তাহার অতৃপ্ত ভোগলালসার ফলেই আজ আমার এ দশা, এই অতৃপ্তি-অস্ত্রেই তাহাকে বধ করিব! এই হীরক-মল্লিকাই তাহার প্রাণান্তক অসি—আমার প্রতিহিংসা পরিতৃপ্তির অমোঘ অস্ত্র!

পন্থা স্থির; তাহার সিদ্ধির উপায়, কার্য্য-কল্পনা এক একটি করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সংকল্প সিদ্ধির ফন্দীগুলি আপনা হইতেই বেশ মাথায় আসিতে লাগিল। জানি না, ভগবান, কি শয়তান আমার সাহায্যে আমাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মনের অন্ধকার কাটিয়া গেল। বিগত স্নেহ, প্রেম, দয়া, ক্ষমা বৃত্তিগুলি বিন্দুমাত্রও আমার হৃদয়ে নাই। যাহা মৃত,—গত, তাহার জন্য অনুশোচনায় ফল কি? যে নারীর প্রেম আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে নাই, বিবাহিত জীবনের কয়েক দিনের মধ্যেই যাহার শেষ হইয়াছিল, সেই ক্ষণভঙ্গুর প্রেমের জন্য আবার দুঃখ কি! আমারই প্রেমের অবমাননা করিতে শয়তানী আমার চক্ষে মিথ্যা প্রেমের আবরণ বাঁধিয়া দিয়াছিল। বিধাতার আশীর্ব্বাদে আজ তাহা আপনি খসিয়া পড়িয়াছে, নারীর চটুলতাকে প্রশ্রয় দিয়া আবার তাহা চক্ষে বাঁধিব? তাহা হইতে আমার মৃত্যু সহস্রবার শ্রেয়। সুবিচার, সুযুক্তি, সমাজ, আত্ম-সম্মান, আত্মধর্ম্ম, জগতের ধর্ম্ম—পাপীর শাস্তি প্রার্থনা করিতেছে, আমি তাহারই ব্যবস্থা করিব। ইহাতে ক্ষমা নাই। উপযুক্ত শাস্তি বিধানই এ ক্ষেত্রে ধর্ম্ম; আমি ধীর স্থির অটলভাবে সেই ধর্ম্মাচরণ করিব! আমার জীবন আর পুষ্পমাল্যের ন্যায় কোমল হইলে চলিবে না। এখন হইতে জীবনকে লৌহ শৃঙ্খলের মত সুদৃঢ়, মৃতের ন্যায় শীতল, ইস্পাতের ন্যায় অভঙ্গুর নীরস করিয়া গঠন করিতে হইবে। আমার জীবন-শৃঙ্খলে যেন এই বিশ্বাসহন্তা প্রতারক প্রাণীদ্বয়কে এরূপ ভাবে নিগড়িত, নিষ্পেষিত করিতে পারি, যাহাতে আর তাহাদের পরিত্রাণের কোন উপায় না থাকে! এই আমার প্রতিজ্ঞা—এখন এই আমার জীবন-ব্রত!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রজনী শেষে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি পূর্ব্ব-জীবনের সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া প্রথম রাত্রেই শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার ন্যায় গৃহহীনের আর আশ্রয় কোথায়? একটা সাধারণ পান্থশালায় আশ্রয় লইয়াছি। পান্থশালার কদর্য্য কঠিন শয্যায় আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় নাই। মাতৃক্রোড়ে চিন্তাহীন শিশুটির মত নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিয়াছি। সংকল্প আমার স্থির; আবেগ, উৎকণ্ঠা আমাকে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি দান করিয়াছে। সুনিদ্রায় শরীর অনেক সুস্থ বোধ করিলাম। ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া নগরবাসী জাগ্রত হইবার পূর্ব্বে সমাধি-গুহার দিকে ছুটিলাম। লণ্ঠন, হাতুড়ি, লৌহ-কীলক প্রভৃতি আবশ্যকীয় সরঞ্জাম পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম; সঙ্গে লইলাম। সমাধি-ভূমিতে উপনীত হইতে ঊষার আলোক দেখা দিল। সন্দিগ্ধচিত্তে

চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলাম, কুত্রাপি কেহ নাই। লণ্ঠন জ্বালিয়া সেই গুপ্ত ছিদ্রপথ দিয়া গুম্ফায় প্রবেশ করিলাম। সিন্দুক খুলিয়া, প্রবালসংগ্রহকারীর পোষাকের আস্তরের নীচের সুদীর্ঘ বটুয়া স্বর্ণমুদ্রা, জহরত ইত্যাদিতে পূর্ণ করিলাম। অবশিষ্ট ধনরত্নাদি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া লৌহ কীলকের সাহায্যে সিন্দুকের আবরণ সুদৃঢ়ভাবে আঁটিয়া দিলাম। সেই অন্ধকারময় পাতালপুরীতে লোক সমাগমের সম্ভাবনা ছিল না। শুনিয়াছিলাম, রুদ্রদাম সদলবলে তাম্রলিপ্তি পরিত্যাগ করিয়াছে। তথাপি সাবধানের মার নাই। এই অর্থরাশিই যে এখন আমার একমাত্র অবলম্বন।

সত্বর কার্য্যশেষ করিয়া গুম্ফা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। গুপ্তপথ পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া সমুদ্রের উপকূলাভিমুখে চলিলাম। সেই দিনই তাম্রলিপ্তি পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। উপকূলে উপনীত হইয়া অনুসন্ধানে জানিলাম, একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ চোল রাজ্যে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। চোলরাজ্য আমার উপযুক্ত গন্তব্য স্থান। প্রধান দস্যু চোড়গঙ্গ নাকি সেই প্রদেশে পলায়ন করিয়াছে। তথায় তাহার সংবাদ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সহজ হইবে। জাহাজে প্রধান মাঝির সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র সে পরিচিতের ন্যায় হাস্য করিয়া বলিল, "এই শেষ সুযোগ—ইহার পর আর সময় থাকিবে না।"

আমি তাহার উক্তির তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। এই শ্রেণীর লোকের সহিত আমার সেই প্রথম আলাপ। ভাবিলাম, জাহাজে যাত্রী লইবার শেষ সময় বোধ হয় অতি নিকট। বলিলাম "ধন্য ভগবান। তাহা হইলে আমি টায়-টায় আসিয়াছি, আর একটু বিলম্ব হইলেই এ-যাত্রায় হতাশ হইতে হইত।"

মাঝি সহাস্যে বলিল, "শুধু হতাশ নয় প্রভু, জীবনে আর এ যাত্রা ঘটিত কি না সন্দেহ। বিপদ হইত—চোলরাজ্যে এই শেষ যাত্রা!"

তাহার বাক্য প্রহেলিকা; সে কেন আমাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। আমি যে প্রবালসংগ্রহকারী নাবিক। বুঝি নাবিকে নাবিকে ইহা কৌতুক-সম্ভাষণ।

মাঝি আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। জাহাজ ছাড়িবার জন্য সে তখন অতি ব্যস্ত। আমরা তীর ত্যাগ করিলাম। ক্ষুদ্র জাহাজ অগ্রসর হইতে লাগিল। উপকূলের অনতিদূরেই আমার প্রাসাদ। জাহাজ হইতে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া কি মনে হইতেছিল, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া শিকারী-তাড়িত হরিণীর মত ছুটিতেছিল। চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিলাম। কখন্ শ্রেষ্ঠীপ্রাসাদ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছে, বুঝিতে পারি নাই। মাঝির সম্ভাষণে আমার চমক ভাঙ্গিল। সে আমার নিকটে একখানি আসন রাখিয়া বলিতেছে—"প্রভু বিশ্রাম করিবেন কি?"

আমি বলিলাম, "আমাকে বার বার প্রভু বলিতেছেন কেন—বলুন ত? আমি প্রবালসংগ্রহকারী নাবিক ব্যতীত আর কিছুই নই।"

সে নয়ন অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া বলিল "সে ত সত্য। প্রভুর যখন যেমন ইচ্ছা।"

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "ইচ্ছা,—সে কি রকম?"

"ধন্য ভগবান,—তিনিই জানেন। আপনার হাত দুইখানি যে প্রবালসংগ্রহকারীর মত নয়।"

আমি অজ্ঞাতসারে হস্ত উঠাইয়া তালুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। সত্যই তাহার আকার ও মসৃণতা আমার ছদ্মবেশের অনুপযুক্ত। অন্যে যাহা ধরিতে পারে নাই, তীক্ষ্ণচক্ষু মাঝি তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মন্তব্যে বিচলিত হইলাম। একটু হাসিয়া বলিলাম "বন্ধু, তাহাতে কি? সকলের হাতই কি কার্য্যে রূপান্তরিত হয়?"

সে তাড়াতাড়ি বলিল, "না—না—আমার কথায় কান দিবেন না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমার প্রাণ গেলেও আমা হইতে আপনার অনিষ্ট হইবে না; আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। অন্যের বিষয় লইয়া থাকা আমার স্বভাব নয়। কাহার কখন্ কোন্ ভাবে কাটাইতে হয় কে জানে, বিপদ আপদ সকলেরই আছে। সংসার সুখের ও দুঃখেরও, এখানে ভালবাসাও আছে, প্রতিহিংসাও আছে; অর্থও

আছে অনর্থও আছে; কাহাকে কখন্ কোন্ অবস্থায় পড়িয়া কি করিতে হয় সেই জানে। তাহা লইয়া অন্তে যে মাথা ঘামায় তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা, আমাকে হুজুর সে রকম লোক মনে করিবেন না। আপনার এ বেশের এখন আবশ্যক আছে, এইটুকু বুঝিয়াই আমি নিশ্চিন্ত। আপনিও স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। আমাকে বিশ্বাস করিয়া আপনি আমার জাহাজে যখন আশ্রয় লইয়াছেন, আপনার বিশ্বাস আমি পূর্ণভাবে রক্ষা করিব। আপনার সাহায্যের জন্ত আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত। আমার দ্বারা আপনার কোন অপকার হইবে না।"

এমন গম্ভীর বিনীত ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাইল যে আমি তাহার সরলতাকে অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমি আমার হস্ত প্রসারিত করিলাম; সে সসম্মানে তাহা গ্রহণ করিয়া অতি সন্তর্পণে নমস্কার করিল। বলিল "ধন্ত ভগবান, তিনি আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।"

আমি প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের মানসে আসনে বসিয়া বলিলাম, "বেশ আসন ত!"

মাঝি উৎসাহিত হইয়া বলিল "চমৎকার! যাহার উপহার এ, সে যে-সে আসনে বসিত না। সবার সেরা তাহার পছন্দ। কি সৌখিন লোকই নষ্ট হইয়াছে। রুদ্রদাম চোড়গঙ্গের মত আর কয়জন হইতে পারে? রাজা মহারাজাও ত নয়।"

বিস্ময়ে আমার শরীর কণ্টকিত করিল। আমার ভাগ্য কিরূপে বিখ্যাত দস্যু-সর্দ্দারের সহিত গ্রথিত হইয়াছে। আমি তাহার আসনে পর্য্যন্ত বসিতেছি; তাহার পরিচিত নাবিক আমার আশ্রয়দাতা, তাহার হৃত অর্থ আমার অবলম্বন; তাহার মাতৃভূমি চোড়রাজ্যে আমি চলিয়াছি; পরোক্ষে চোড়গঙ্গ আমার বিপদের বন্ধু। আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তাহা হইলে তুমি দস্যুসর্দ্দারকে চেন?"

"চিনি না শুধু, আমি যেমন আমার নিজকে জানি, তাহাকেও তেমনি জানি। আজও দুই মাস হয় নাই, আমরা এই জাহাজেই এক সঙ্গে কাটাইয়াছি। আমি তখন লঙ্কা দ্বীপে। সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমার জাহাজে উপস্থিত হইয়াছিল! আত্ম পরিচয় দিয়া বলিয়াছিল—রাজার লোক তাহার পাছ লইয়াছে। তাহাকে অনতিবিলম্বে সে দেশ হইতে লইয়া যাইতে হইবে। এক তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিয়াছিল, 'আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে এ মুদ্রা তোমার; এ কেন, যদি বেশী চাও তাহাও দিতে প্রস্তুত আছি। অস্বীকৃত হও যদি কিছুতেই তোমার মস্তক স্কন্ধে রাখিতে পারিবে না।' আমি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলাম 'এ জীবনে অনেক মাথাই ত স্কন্ধ হইতে নামাইয়াছ, আমার মাথাটা বা নাই নামাইলে। নিজের মাথাটা ঠিক করিয়া এখন বসো। তোমার এত ভয়; তুমিই আবার একজন সামান্ত নাবিককে ভয় দেখাইয়া বাধ্য করিতে চাহিতেছ! ভয়ে যদি লোক বাধ্য হইত, তবে তুমি কবে সরকারের নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে। এত বড় একজন দস্যুদলপতি হইয়াও এ সামান্ত কথাটা বুঝনা। রজনীর অন্ধকারেই বুঝি তোমার সাহস—দিনে নহে। যাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে তাহার সহিত সরল ব্যবহার কি উচিত নহে? আমরা সরল নাবিক, সরলভাবে আমার আতিথ্য স্বীকার কর, তোমার অনিষ্ট আমা হইতে হইবে না।' রুদ্রদাম আমার বাক্যে জল হইয়া গেল; বোধ হয় লজ্জিত হইয়াছিল। সে পরিচিত বন্ধুর ন্যায় আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, 'ক্ষমা কর। দুর্ঘটনায় আমাকে বুদ্ধিহারা করিয়াছে। দলের লোকের বিশ্বাস-ঘাতকতায় মানুষের গুণ দেখিবার শক্তি আমি হারাইয়াছি। জয়াবলী আমার সঙ্গে; আমার নিজের জন্ত নয়, তাহাকে রক্ষা করিতে আমি অধীর হইয়াছি; আমার নির্ভীক হৃদয় আকাশে আশঙ্কার মেঘ দেখা দিয়াছে। মাঝি! রুদ্রদাম জীবনে কখনও কাহারও শরণাপন্ন হয় নাই, আজ তোমার নিকট হইল।' আমি উত্তর করিয়াছিলাম, 'আমিও তোমার শরণাপন্ন। যাত্রীর অনুগ্রহই আমাদের উপজীবিকা; তাহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তোমার স্বর্ণে লোভ রাখি না, স্বাধ্য আমার যথেষ্ট। দস্যু তুমি, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি। সর্ব্বদাই ত আমরা দস্যুর অধম জুয়াচোরের সহিত কারবার করিতেছি। পান্থশালায় যাও, সরাই-ওয়ালারা প্রতারকের শিরোমণি; মুদী, সে ত ও বিষয়ে অদ্বিতীয়, সে বলিয়া কহিয়া দিনে দুপুরে ডাকাতি করে;

ভেজাল ভেজাল, তাহার বাক্যে ব্যবহারে দ্রব্যে সমস্তভেই ভেজাল। এমনি সকলেই! তোমাকে আর দস্যু বলিয়া কি বলিব? অন্যের অপেক্ষা তোমার অপরাধটাও তেমন বেশী বলিয়া মনে করি না। তবে কথায় কথায় মাথা লইতে চাও এইটাই যা তোমার মস্ত দোষ!' রুদ্রদাম হাসিয়া ফেলিল; বলিল 'বন্ধু, ও কথা ভুলিয়া যাও। জয়াবলী ক্লান্ত। আগে তাহার বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।' চাহিয়া দেখি, রুদ্রদামের পশ্চাতে একটি রমণী; বুঝিলাম সেই জয়াবলী। তাড়াতাড়ি একখানা আসন আনিয়া তাহাকে বসিতে দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়দের জন্য কিছু খাদ্যের জোগাড় করিব কি?' জয়াবলী তাহার সুন্দর হস্তখানি প্রসারিত করিল। আমি সসম্মানে তাহার কর স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলাম। সে বলিল, "ধন্যবাদ নাবিক, খাদ্যের এখন আবশ্যক নাই। আপনার আশ্রয়ই যথেষ্ট। আপনার মত স্পষ্টবক্তা, সুরসিক কমই দেখিয়াছি; আপনার সহিত পরিচিত হইয়া সুখী হইলাম। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি আমাদের চিন্তার আর কারণ নাই!' তাহার মন্তব্যে বাস্তবিক আনন্দ অনুভব করিলাম। রুদ্রদামের নাম শুনিয়া প্রথমে যেরূপ একটা ভয়ানক লোক কল্পনা করিয়াছিলাম, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দস্যু বা তাহার সঙ্গিনীর ব্যবহারে তেমন কিছু দেখিতে পাইলাম না। সেই যাত্রার কয়েক দিনেই আমাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল; আজও তাহার নাম স্মরণ হইলে আনন্দ হয়। দুঃখ হয়, অমন একটা বীর পুরুষ দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আত্ম গোপনের চেষ্টায় দেশে দেশে ঘুরিতেছে; সুভাবে থাকিলে তাহার আর কিসের অভাব ছিল। তাহার যেরূপ প্রতিভা, অসীম সাহস, তাহাতে সে যে-অবস্থায় যে ব্যবসায়ই অবলম্বন করিত না কেন, তাহাতেই সে সৌভাগ্যবান হইতে পারিত, নিশ্চয়।'

মাঝির বাক্যে আমার ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করিতেছিল। রুদ্রদামের তথ্য সংগ্রহ করা, আমার চোল দেশে যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য। কি আশ্চর্য্য! ভগবান কি আমার মনের ভাব পাঠ করিয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূলে সকল বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। আমি ভণিতার প্রশ্রয় না দিয়া মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "জয়াবলীর কথা বলিতেছ,—সে কে?"

মাঝি হাত উল্টাইয়া বলিল, "সে যে কে কেহই জানে না। তাহার পরিচয় লইবারও আমার সাহস হয় নাই; প্রবৃত্তিও ছিল না। রুদ্রদামকে সে ভালবাসে এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। জয়াবলী সুন্দরীর শ্রেষ্ঠা; ছোট ফুলটির মত; ফুলের মতই তাহার লাবণ্য—তাহার কোমলতা, গুণ-সৌরভেও সে তেমনি। রুদ্রদামের কি বিশাল বপু। গাত্রের বর্ণ তাম্রের মত; চক্ষু দুইটি ব্যাঘ্রের চক্ষুর ন্যায় উজ্জ্বল। জয়াবলী দুর্দম্য দস্যুর পাষাণ-হৃদয়ের স্নেহ-উৎস। জয়াবলী আছে বলিয়া রুদ্রদাম আজও মানুষ; ধনীর ধন অপহরণ করিয়া দরিদ্রকে সে দান করে। রজনীতে আকাশপটে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছেন কি? চন্দ্রের কিরণে সে মেঘখণ্ড কেমন স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে? জয়াবলী তাহাই। মেঘের মত কোমল; দেহে সেই গোলাপী আভা, কুঞ্চিত কেশদামে তাহাকে আরও সুন্দরী করিয়াছে। নয়নদ্বয় নীলাকাশের মত প্রশান্ত, গভীর। হস্ত দুইখানি দেখিয়া মনে হয় না, সে সামান্য খড়গাছিও দুই ভাগ করিতে পারে। অথচ রুদ্রদামের মত অমন দুর্দ্ধর্ষ দস্যু তাহার কথায় উঠে বসে!

মনে মনে বলিলাম, নারীর সৌন্দর্য্য-মোহ পুরুষের পক্ষে এমনই বটে। পুরুষ বুঝিয়াও বুঝে না; কি বিষম ভ্রম! আপনা-আপনি বলিলাম, "জয়াবলী—যাহার সৌন্দর্য্যের প্রভাবে রুদ্রদামের মত কূটনৈতিক দস্যুও অন্ধ হইয়া আছে, সে কি প্রকৃতই তাহাতে অনুরক্ত,—সে কি সতী?"

মাঝি বিস্মিত হইয়া বলিল "সে বিষয়েও কি সন্দেহ করিবার! জয়াবলী সতীশ্রেষ্ঠ। দেহের শক্তি আর তাহার কতটুকু, বাক্যবিন্যাসেরই বা সে কি জানে? তাহার প্রভাবই ঐ সতীত্বে, রুদ্রদাম তাহার সেই গুণেই বাধ্য। আমি ভাবিয়াছিলাম, মহাশয় দস্যু সর্দ্দারের সহিত পরিচিত; ক্ষমা করিবেন, মনে করিয়াছিলাম, আপনি তাহার দলভুক্ত। 'ধন্য ভগবান'—তাহার দলের সাংকেতিক শব্দ,—আপনি আমার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তবে কি সেটা আকস্মিক মিল। তবে শুনুন, রুদ্রদামের দলের একজন,—লোকটা যেমন অসম সাহসী, তেমনি

উচ্ছৃঙ্খল,—একদিন জয়াবলীকে একা পাইয়া তাহার প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিল। তন্বী সতী রমণী সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ পাপাত্মাকে দুর্জ্জয় পদাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া বলিয়াছিল 'এক রুদ্রদাম ব্যতীত জয়াবলীর প্রণয় ভিক্ষা করিবার জন্য কে স্পর্দ্ধা রাখে। যে সে দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করে, পদাঘাত তাহার পুরস্কার, মৃত্যু তাহার অনিবার্য্য!' সেই দুষ্ট দস্যুর সেই ক্ষণে মৃত্যু হইলে ভাল ছিল। এখন সেই বিশ্বাসঘাতক কুক্কুর রুদ্রদামের গুপ্ত সন্ধি রাজাকে বলিয়া দিয়া হিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে। তাহার জন্যই দস্যুসর্দ্দার দেশত্যাগী।"

মনে মনে বলিলাম, দস্যুসর্দ্দার দেশত্যাগী, সে ত মঙ্গলের কথা। কিন্তু জয়াবলীর জন্য দুঃখ হয়। সে কেন দস্যুর প্রেমে মুগ্ধ হইল। তাহার কি ইহাতে স্বার্থ নাই! নিঃস্বার্থ প্রেমে বিশ্বাস হয় না; জয়াবলী কি সাধারণ রমণী হইতে ভিন্ন? ভাবিলাম মাঝিও বুঝি রমণীর মোহে অন্ধ। বলিলাম "তুমি দেখিতেছি বেশ সুখী। শান্তির জন্য তরণী ও নারী উভয়ই বোধ হয় তোমার মনের মত!"

মাঝি গম্ভীর স্বরে বলিল "হাঁ, মহাশয়, আমার আরাধ্যা শুধু রমণী নন, তিনি দেবী, আমার জননী!"

আমি তাহার স্বরে স্তম্ভিত হইয়া তাহার ভক্তি-আপ্লুত বদনের দিকে চাহিলাম। রমণী মাতৃত্বে দেবী। হায়! আমি সেই সাক্ষাৎ দেবী শৈশবে হারাইয়াছি। আমি হতভাগ্য।

জনৈক নাবিক কার্য্যোপলক্ষে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঝি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। নির্জ্জনতা প্রার্থনা করিতেছিলাম। জয়াবলীর প্রসঙ্গ আমাকে আবার কাতর করিয়াছিল। জয়াবলী দস্যুপত্নী; তাহার প্রেমাস্পদ শোণিতপিপাসু নরশার্দ্দুল, তাহার প্রতিও সে অনুরক্ত। আর নীলা, স্বামী যাহার সম্মানে বংশগৌরবে তাম্রলিপ্তিতে শীর্ষস্থানীয়, যাহার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য আমি জীবনপাত করিতে প্রস্তুত ছিলাম, সেই কিনা পবিত্র বিবাহ-বন্ধন, শ্বশুরকুলের বহু-কষ্টার্জ্জিত অটুট সম্মান, অনায়াসে, প্রবৃত্তির বশে পদদলিত করিয়া আপনাকে এমন হেয় নীচত্বে পাতিত করিল! সাধারণবংশ-সম্ভূতা জয়াবলী, অভিজাত বংশীয়া নীলার চরিত্র অবগত হইলে, কি বলিত? তাহার অপবিত্র হস্ত সে কখনই গ্রহণ করিত না। জয়াবলীর চক্ষে নীলা কুক্কুরী হইতেও হেয়; তাহার পদতলে বসিবারও নীলা উপযুক্ত নহে হা ঈশ্বর! আমি এমন কি পাপ করিয়াছি যে যাহা দস্যুর প্রাপ্য আমি মহাশ্রেষ্ঠী তাহা হইতে বঞ্চিত। চম্পা, প্রিয়তমা কন্যা—তুই ত বিষ-বৃক্ষের ফল; পরিণত বয়সে তুই কি হইবি কে জানে। তোর জন্যই প্রাণ অধিক কাঁদে। আমি নাই, কে তোকে দেখিতেছে। চরিত্রহীনা রমণী রাক্ষসী, আত্ম-সুখের নিকট তাহার অন্য সকলই তুচ্ছ—সে কি তোর যত্ন লইবে? কিছুদিন অপেক্ষা কর চম্পা। পিতা তোর তোকে জীবন থাকিতে ভুলিবে না। প্রতিহিংসা-ব্রত উদযাপন হোক—তারপর প্রাণ যদি রাখিতে হয় সে তোর জন্য। তুই ভিন্ন সংসারে আমার আর কে আছে! *

(ক্রমশ)

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

প্লেটোর এয়ুথ্যুফ্রোন †

(দ্বিতীয়ার্দ্ধ)

সোক্রাটীস—বুঝিতে পারিতেছি—তুমি মনে করিতেছ, যে আমি বিচারকগণ অপেক্ষা অধিকতর স্থূলবুদ্ধি; কেননা, তাঁহাদিগকে তুমি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবে, যে, তোমার পিতার কার্য্যটি অন্যায় হইয়াছে, এবং দেবতারা সকলেই এই প্রকার কার্য্য ঘৃণা করেন।

এয়ুথ্যুফ্রোন—হাঁ, সোক্রাটীস, যদি তাহারা আমার কথা শুনে, তবে খুব স্পষ্টরূপেই বুঝাইয়া দিব।

সোক্রা—তুমি যদি ভাল করিয়া বলিতে পার, তবে তাহারা শুনিবে বই কি। কিন্তু তুমি যখন কথা বলিতে-ছিলে, তখন এই প্রশ্নটা আমার চিত্তে উদিত হইল, আমি এখন তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতেছি:—যদিই বা এয়ুথ্যুফ্রোন আমাকে যথাসম্ভব বুঝাইয়া দেয়, যে, দেবতারা সকলেই এই প্রকার মৃত্যু অন্যায় বিবেচনা করেন, তাহাতে, পাপ কি এবং পুণ্যই বা কি, তাহা আমি এয়ুথ্যুফ্রোনের নিকট হইতে বেশী কি শিখিলাম? কেননা, এই বিশেষ

---

* ইংরেজী উপন্যাসের প্লট অবলম্বনে।

† মূল গ্রীক হইতে অনুবাদিত।

কার্য্যটি হয় তো দেবতাগণের অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে ; কিন্তু এই মাত্র দেখা গিয়াছে, যে, এই প্রণালীতে পাপ ও পুণ্যের সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; কারণ, আমরা দেখিয়াছি, যাহা দেবতাগণের অপ্রিয়, তাহাই আবার তাঁহাদিগের প্রিয়। অতএব, হে এয়ুথ্যফ্রোন, আমি এই আলোচনা হইতে তোমাকে অব্যাহতি দিলাম ; যদি তোমার অভিরুচি হয়, আমরা মানিয়া লইতেছি, যে, দেবতারা সকলেই এই কার্য্যটি অন্যায় বিবেচনা করেন, ও সকলেই ইহা ঘৃণা করেন। কিন্তু, তাহা হইলে, এক্ষণে আমাদিগের সংজ্ঞাটি এইরূপ সংশোধন করিতে হইবে, যে, যাহা দেবতারা সকলেই ঘৃণা করেন, তাহা পাপ ; ও যাহা সকলেই ভাল বাসেন, তাহাই পুণ্য ? কিন্তু যাহা কোন কোন দেবতা ভাল বাসেন, ও কোন কোন দেবতা ঘৃণা করেন, তাহা এই দুইয়ের কোনটিই নহে, কিংবা পাপ পুণ্য উভয়ই নহে ? তুমি কি তবে চাও, যে, আমরা পাপ ও পুণ্যের এই সংজ্ঞাটি গ্রহণ করি ?

এয়ু—তাহাতে বাধা কি, সোক্রাটীস ?

সোক্রা—বাধা আমার পক্ষে কিছুই নাই, এয়ুথ্যফ্রোন, কিন্তু তুমি দেখিও, যে এই সংজ্ঞাটি স্বীকার করিয়া লইলে, তুমি যে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা আমাকে খুব অনায়াসে বুঝাইয়া দিতে পারিবে কি না।

এয়ু—আচ্ছা, আমি বলিতে চাই, যে, যাহা দেবতারা সকলেই ভাল বাসেন, তাহাই পুণ্য, এবং, পক্ষান্তরে, যাহা দেবতারা সকলেই ঘৃণা করেন, তাহাই পাপ।

সোক্রা—হে এয়ুথ্যফ্রোন, তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক্ কি না, তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব, না পরীক্ষায় কাজ নাই ? আমরা কি আমাদিগের কিংবা অপরের যে-কোন উক্তি গ্রহণ করিব ? যদি কেহ শুধু বলে, 'ইহা এই প্রকার' তাহাতেই সম্মতি দিব ? না সে কি বলিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ?

এয়ু—পরীক্ষা করিতে হইবে ; কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যে, এক্ষণে যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিখুঁত।

সোক্রা—হে ভদ্র, আমরা তাহা শীঘ্রই আরও ভালরূপে জানিতে পারিব। এখন এই প্রশ্নটিতে মনোনিবেশ কর—পুণ্য পুণ্য বলিয়াই দেবতারা উহা ভাল বাসেন, না তাঁহারা ভাল বাসেন বলিয়াই পুণ্য পুণ্য ?

এয়ু—ওহে সোক্রাটীস, তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না।

সোক্রা—আচ্ছা, আমি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা উহ্যমান ও বহন্, নীয়মান ও নয়ন্, দৃশ্যমান ও পশ্যন্ এই প্রকার শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি।* তুমি জান যে এই প্রকার সমুদায় শব্দ পরস্পর ভিন্নার্থক ; এবং বিভিন্নতাটি কি, তাহাও জান।

এয়ু—হাঁ, আমার তো মনে হয়, জানি।

সোক্রা—তাহা হইলে, প্রীয়মান ও তাহা হইতে ভিন্নার্থক প্রীণন্ শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ?

এয়ু কেন হইবে না ?

সোক্রা—তবে আমাকে বল, উহ্যমান বস্তু বাহিত হইতেছে বলিয়াই উহ্যমান, না তাহার আর কোনও কারণ আছে ?

এয়ু—না, আর কোনও কারণ নাই, বাহিত হইতেছে বলিয়াই উহ্যমান।

সোক্রা—এবং নীয়মান বস্তু নীত হইতেছে বলিয়াই নীয়মান ও দৃশ্যমান বস্তু দৃষ্ট হইতেছে বলিয়াই দৃশ্যমান ?

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—তাহা হইলে, যেহেতু একটি বস্তু দৃশ্যমান অতএব উহা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা নহে ; কিন্তু, তদ্বিপরীত, উহা দৃষ্ট হইতেছে বলিয়াই দৃশ্যমান ; নীয়মান, অতএব উহা নীত হইতেছে ; তাহা নহে, কিন্তু উহা নীত হইতেছে বলিয়াই নীয়মান, উহ্যমান, অতএব উহা বাহিত হইতেছে, তাহা নহে, কিন্তু উহা বাহিত হইতেছে বলিয়াই উহ্যমান। হে এয়ুথ্যফ্রোন, আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে তো ? আমি ইহাই বলিতে চাহিতেছি—যদি কোনও বস্তু জন্মে কিংবা কোনও প্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা জায়মান বলিয়া জন্মে, এরূপ নহে ; কিন্তু জন্মে বলিয়াই জায়মান, বিকৃত বলিয়া বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে,

* গ্রীক শব্দগুলি সংস্কৃত শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয়যোগে অবিকল প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় অনুবাদ এইরূপ হইবে—বাহিত হইতেছে ও বহন করিতেছে ; নীত হইতেছে ও লইয়া যাইতেছে ; দৃষ্ট হইতেছে ও দেখিতেছে ; প্রীতি করিতেছে ও প্রীতি পাইতেছে।

তাহা নহে; কিন্তু বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই বিকৃত। না তুমি একথায় সায় দিতেছ না?

এয়ু—দিতেছি।

সোক্রা—তবে, যাহা প্রীয়মান, তাহা এমন একটা বস্তু, যাহা অপর কোনও বস্তু দ্বারা জায়মান কিংবা বিকারীভূত?*

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—তবে অপরাপর স্থলে যেমন, এস্থলেও তাহাই ঠিক্। যাহারা কোনও বস্তুকে প্রীতি করে তাহারা প্রীয়মান বলিয়া উহাকে প্রীতি করে না; কিন্তু প্রীতি করে বলিয়াই উহা প্রীয়মান।

এয়ু—অবশ্য।

সোক্রা—তবে, হে এয়ুথ্যফ্রোন, পুণ্য সম্বন্ধে আমরা কি বলিব? তোমার কথানুসারে ইহা কি দেবগণের সকলেরই প্রীতিপ্রাপ্ত নয়?

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—ইহা পুণ্য, এই জন্য, না অন্য কোনও কারণে?

এয়ু—না, পুণ্য বলিয়া।

সোক্রা—তবে, ইহা পুণ্য, এইজন্য দেবগণ ইহাকে প্রীতি করেন; কিন্তু তাঁহারা প্রীতি করেন, এই হেতু ইহা পুণ্য, এরূপ নহে।

এয়ু—এই প্রকারই বোধ হইতেছে।

সোক্রা—কিন্তু, তাহা হইলে যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহা দেবগণ প্রীতি করেন বলিয়াই প্রীয়মান ও দেবগণের প্রিয়।

এয়ু—তাহা নয় তো কি?

সোক্রা—তবে, তুমি যে বলিতেছ, যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহাই পুণ্য, ও যাহা পুণ্য তাহাই দেবগণের প্রিয়, একথা ঠিক্ নহে, এই দুইটি পরস্পর পৃথক্।

এয়ু—কেমন করিয়া, সোক্রাটীস?

সোক্রা—যেহেতু, আমরা একমত হইয়া মানিয়া লইয়াছি যে পুণ্য পুণ্য, এই জন্যই দেবগণ উহাকে প্রীতি করেন, কিন্তু তাঁহারা প্রীতি করেন বলিয়াই উহা পুণ্য নহে। কেমন?

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—আর, যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহা দেবগণের প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং দেবগণের প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই দেবগণের প্রিয় হইয়াছে; কিন্তু, ইহা দেবগণের প্রিয়, অতএব ইহা প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ নহে।

এয়ু—তুমি যথার্থ বলিয়াছ।

সোক্রা—তবে, হে প্রিয় এয়ুথ্যফ্রোন, 'দেবপ্রিয়' ও 'পুণ্য' যদি এক হইত,—যদি দেবগণ পুণ্যকে পুণ্য বলিয়াই ভাল বাসিতেন, তবে তাঁহারা যাহা দেবপ্রিয়, তাহাকেও দেবপ্রিয় বলিয়াই প্রীতি করিতেন; কিন্তু যাহা দেবপ্রিয়, তাহাকে দেবতারা প্রীতি করেন বলিয়াই দেবপ্রিয়, অতএব, যাহা পুণ্য, তাহাও দেবতারা ভালবাসেন বলিয়াই পুণ্য হইত। কিন্তু তুমি এক্ষণে দেখিতে পাইতেছ, যে, এই দুইটি সর্ব্বতোভাবে পরস্পর হইতে ভিন্ন, সুতরাং একটি অন্যটির বিপরীত। কেননা, একটি প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং উহা প্রীতির যোগ্য; কিন্তু অপরটি প্রীতির যোগ্য, অতএব উহা প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছে। হে এয়ুথ্যফ্রোন, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পুণ্য কি? কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে, তুমি আমার নিকটে পুণ্যের সত্তা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেছ না; তুমি শুধু উহার একটি অবস্থা উল্লেখ করিয়াছ, পুণ্যের সেই অবস্থাটি এই যে উহাকে দেবতারা সকলেই প্রীতি করেন; কিন্তু তাহার স্বরূপ কি, তাহা তুমি এখনও বল নাই। অতএব, যদি তোমার অভিরুচি হয়, আমার নিকটে কিছুই গোপন করিও না, কিন্তু আবার প্রথমাবধি বল, পুণ্য কি, যাহাতে দেবগণ ইহাকে প্রীতি করেন, বা ইহার এবংবিধ অপর লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়; লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমরা তাহা লইয়া বিবাদ করিব না। স্বচ্ছন্দচিত্তে বল দেখি, পাপ কি, এবং পুণ্যই বা কি?

এয়ু—কিন্তু, সোক্রাটীস, আমার মনের কথা তোমাকে কি করিয়া খুলিয়া বলিব, ভাবিয়া পাইতেছি না, কেননা, আমরা যে স্থানে যে প্রতিপাদ্য বিষয়টি স্থাপন করিতেছি,

---

* অর্থাৎ যে অপর কাহারও প্রীতি প্রাপ্ত হয়, সে ঐ প্রীতিকারী ব্যক্তির দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়; তাহার অবস্থান্তর ঘটে; সে প্রীতি পাইবার পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনটি আর থাকে না। ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসা না পাওয়া, এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহাই এস্থলে লক্ষিত হইয়াছে।

তাহা তথায় না থাকিয়া নিয়তই চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে।

সোক্রা—হে এয়ুথ্যুফ্রোন, তোমার যুক্তিগুলি আমার পূর্ব্বপুরুষ ডাইডালসের শিল্পকৌশল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যদি কথাগুলি আমার হইত, এবং আমি সেগুলিকে উপস্থাপিত করিতাম, তবে হয় তো তুমি আমাকে এই বলিয়া উপহাস করিতে, যে, আমি ডাইডালসের বংশধর কি না, সেইজন্য আমার সমুদায় যুক্তি-কৌশল তাঁহার মূর্ত্তির ন্যায় অপসরণ করে, এবং আমি সেগুলিকে যথায় স্থাপন করিতে চাই, তথায় কিছুতেই স্থির হইয়া থাকে না। এখন, এই সংজ্ঞাগুলি কিন্তু তোমার; এই পরিহাসও সুতরাং অপরের পক্ষেই শোভা পায়। তুমি নিজেই দেখিতে পাইতেছ, যে, সেগুলি তোমার ইচ্ছানুরূপ স্থির থাকিতে চাহিতেছে না।

এয়ু—হে সোক্রাটীস, আমার কিন্তু বোধ হয়, এই পরিহাসটি উপস্থিত ক্ষেত্রে বেশ খাটে। সংজ্ঞাটি যে এক-স্থানে স্থির না থাকিয়া চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, সে কৌশল আমার নয়, আমার বোধ হয়, সেই ডাইডালস তুমি। যদি আমার উপরে নির্ভর করিত, তবে উহা এক স্থানেই থাকিত।

সোক্রা—হে সখে, তাহা হইলে আমি ডাইডালস অপেক্ষাও বিচিত্রতর শিল্পী; কেননা, তিনি নিজে যে মূর্ত্তিগুলি গঠন করিতেন, শুধু তাহাই সঞ্চরণ করিত; কিন্তু আমি নিজের পরিবর্ত্তে অপরের রচিত মূর্ত্তি পরিচালিত করিতেছি, এইরূপ বোধ হইতেছে। আর আমার কৌশলের চমৎকারিত্ব এই যে আমি অনিচ্ছাসত্ত্বে জ্ঞানী হইয়াছি। কেননা, আমি বরং চাই, যে, আমার সংজ্ঞাগুলি স্থির ও নিশ্চল হইয়া একস্থানে অবস্থান করুক; ইহা অপেক্ষা ডাই-ডালসের জ্ঞান ও টাণ্টালসের ঐশ্বর্য্যও আমি অধিক আকাঙ্ক্ষা করি না। যাক্, এবিষয়ে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। যখন দেখা যাইতেছে, যে, আলোচ্য বিষয়ে তুমি শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছ, তখন আমি নিজে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছি, যাহাতে তুমি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার, পুণ্য কি। তুমি পরাঙ্মুখ হইও না। দেখ, তোমার কি বোধ হয় না, যে, পুণ্যমাত্রেই ন্যায়?

এয়ু—হাঁ, আমার বোধ হয়।

সোক্রা—তবে ন্যায় মাত্রেই পুণ্য? অথবা সমুদায় পুণ্যই ন্যায় বটে, কিন্তু সমুদায় ন্যায় পুণ্য নহে, পক্ষান্তরে কোন কোনও ন্যায় পুণ্য এবং কোন কোনও ন্যায় অপর একটা কিছু?

এয়ু—হে সোক্রাটীস, আমি তোমার কথাগুলি অনুধাবন করিতে পারিতেছি না।

সোক্রা—তবু তো তুমি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ, এবং জ্ঞানেও তদনুরূপ প্রবীণতর। যাক্, আমি বলিতেছিলাম যে তোমার জ্ঞান-ভাণ্ডার অগাধ বলিয়া তুমি ঔদাস্য দেখাইতেছ। কিন্তু, হে ভাগ্যধর, আপনাকে জড়তা হইতে মুক্ত কর; আর, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা এমন কিছু কঠিন কর্ম্ম নহে। একজন কবি স্বরচিত কবিতায় যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহার বিপরীত একটা কথা বলিতেছি:—

"জেয়ুস স্রষ্টা; তিনিই এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; তুমি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিও না; কেননা, যেখানে ভয়, সেখানেই ভক্তি।"

আমি কিন্তু এই কবির সহিত ভিন্নমত; তোমাকে বলিব কেন?

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—আমার বোধ হয় না, যে, যেখানে ভয়, সেইখানেই ভক্তি বর্ত্তমান। আমরা দেখিতে পাই, যে, অনেকে রোগ, দারিদ্র্য ও এইরূপ বহু বিষয় ভয় করে; তাহারা ভয় করে বটে, কিন্তু যাহা ভয় করে, তাহা ভক্তিও করে, আমার ত এমত বোধ হয় না। কেমন, তোমার কি একথা ঠিক্ মনে হয় না?

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যে, যেখানে ভক্তি, সেইখানেই ভয় বর্ত্তমান। এমন কে আছে, যে কোনও বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও তৎসম্বন্ধে অন্তরে ব্রীড়া অনুভব করিয়া থাকে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে অযশস্কতার অপবাদকে ভয় ও শঙ্কা করে না?

এয়ু—অবশ্যই শঙ্কা করে।

সোক্রা—অতএব একথা ঠিক্ নহে, যে, যেখানে ভয়, সেইখানেই ভক্তি; যদিচ, যেখানে ভক্তি, সেখানেই ভয়

বর্ত্তমান, তথাপি যেখানে ভয়, সেখানেই সব সময়ে ভক্তি বিদ্যমান থাকে না। যেহেতু, আমার মতে, ভয় ভক্তি অপেক্ষা ব্যাপকতর। ভক্তি ভয়ের অংশ, যেমন অযুগ্ম সংখ্যা সংখ্যার অংশ, সুতরাং যেখানে সংখ্যা, সেখানেই অযুগ্ম বর্ত্তমান, এমত নহে, কিন্তু যেখানে অযুগ্ম, সেখানেই সংখ্যা বর্ত্তমান। কেমন, এখন আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ?

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—আমি পূর্ব্বে তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যে, যেখানে ন্যায়, সেখানেই পুণ্য বর্ত্তমান? অথবা, যেখানে পুণ্য, সেখানেই ন্যায় বর্ত্তমান বটে, কিন্তু যেখানে ন্যায়, সেখানেই নিয়ত পুণ্য বর্ত্তমান নহে? কেননা, পুণ্য ন্যায়ের অংশ। আমরা ইহাই বলিব, না, তোমার নিকট ইহা ঠিক বোধ হইতেছে না?

এয়ু—না, ঠিক্ বোধ হইতেছে। আমার প্রতীতি হইতেছে, তুমি যথার্থ বলিতেছ।

সোক্রা—তৎপরে এই বিষয়টি লক্ষ্য কর। যদি পুণ্য ন্যায়ের অংশ হয়, তবে আমার বিবেচনায়, আমাদিগের অনুসন্ধান করা উচিত, পুণ্য ন্যায়ের কি প্রকার অংশ। এখন, তুমি যদি আমাকে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিতে, অযুগ্ম সংখ্যা সংখ্যার কি প্রকার অংশ, এবং অযুগ্ম কি প্রকার সংখ্যা, তাহা হইলে আমি বলিতাম যে যাহা যুগ্ম নহে, তাহাই অযুগ্ম সংখ্যা। কেমন, তোমারও কি তাহাই মনে হয় না?

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—তবে তুমি আমাকে বুঝাইয়া দিতে প্রযত্ন কর, যে, পুণ্য ন্যায়ের কি প্রকার অংশ, যাহাতে আমি মেলীটসকে বলিতে পারি, "তুমি অন্যায়রূপে আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মের অভিযোগ আনিও না, যেহেতু আমি এয়ুথ্যুফ্রোনের নিকট হইতে পর্য্যাপ্তরূপে শিক্ষা করিয়াছি, ধর্ম্ম ও পুণ্য কি, এবং অধর্ম্ম ও অপুণ্যই বা কি।"

এয়ু—আচ্ছা, সোক্রাটীস, আমার মতে, ধর্ম্ম ও পুণ্য ন্যায়ের সেই অংশ, যাহা দেবগণের সেবার সহিত সংস্পৃষ্ট; যাহা মানব-সেবার সহিত সংস্পৃষ্ট, তাহা ন্যায়ের অবশিষ্ট অংশ।

সোক্রা—হে এয়ুথ্যুফ্রোন, আমার প্রতীতি হইতেছে, যে, তুমি উত্তম বলিয়াছ। কিন্তু এখনও একটু সামান্য বিষয়ে আমি অভাব বোধ করিতেছি। আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, যে, তুমি কি প্রকার সেবার কথা বলিতেছ। কেননা, তুমি বোধ করি এমত বলিতেছ না, যে, অপরাপর বিষয়ের সেবা যেপ্রকার, দেবগণের সেবাও সেই প্রকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বলিতে পারি—যেমন আমরা বলিয়া থাকি, অশ্বের সেবা সকলেই জানে, এমত নহে, কিন্তু যে অশ্বপাল, শুধু সেই জানে, কেমন?

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—বোধ হয় অশ্ব-বিদ্যাই অশ্বের সেবা।

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—কুকুরের সেবা সকলেই জানে, এমত নহে, কিন্তু শুধু শিকারীই জানে।

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—এবং গো-বিদ্যাই গো-সেবা।

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—হে এয়ুথ্যুফ্রোন, তবে তুমি বলিতেছ, যে, পুণ্য ও ধর্ম্মই দেবসেবা?

এয়ু—আমি তাহাই বলিতেছি।

সোক্রা—তবে কি সমুদায় সেবার উহাই লক্ষ্য নহে? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, উহা এইরূপ একটা কিছু—যে সেবা প্রাপ্ত হয়, তাহার কল্যাণ ও হিত, সেবার লক্ষ্য; যেমন তুমি দেখিতে পাইতেছ, যে, অশ্ব-বিদ্যার সাহায্যে অশ্বগণ উপকৃত হয় ও উন্নতি লাভ করে। অথবা তোমার সেপ্রকার বোধ হইতেছে না?

এয়ু—হাঁ, হইতেছে।

সোক্রা—এবং বোধ করি কুক্কুরগণ কুক্কুর-বিদ্যাদ্বারা ও গোগণ গো-বিদ্যাদ্বারা উপকৃত হয়; অন্যান্য সকল বিষয়েও এইরূপ। না, তুমি বিবেচনা কর যে, যে সেবাপ্রাপ্ত হয়, সেবা তাহার অপকার করে?

এয়ু—রাম, আমি তাহা কখনও মনে করি না।

সোক্রা—তবে উপকার করে?

এয়ু—তা' নয় তো কি?

সোক্রা—তাহা হইলে, পুণ্য,—যাহা দেবগণের সেবা

বলিয়া পরিগণিত—দেবতাদিগের উপকার ও উন্নতি সাধন করে? তুমি কি একথায় সায় দিতে প্রস্তুত আছ, যে, তুমি যখন কোনও পুণ্য কর্ম্ম কর, তখন কোনও না কোনও দেবতার উন্নতি সাধন করিয়া থাক?

এয়ু—রাম, তাহা কখনও নহে।

সোক্রা—এয়ুথ্যুফ্রোন, আমিও বিবেচনা করি না, যে, তুমি এই প্রকার বলিতেছ; সে কথা আমার মনের ত্রিসীমাতেও আইসে নাই; এজন্যই তো আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি কাহাকে দেবসেবা বলিতেছ; আমি ভাবিয়াছিলাম যে ঐরূপ বলা তোমার অভিপ্রায় নয়।

এয়ু—তুমি ঠিক্‌ই ভাবিয়াছ, সোক্রাটীস; আমি ওরূপ কিছু বলিতেছি না।

সোক্রা—ভাল; তবে পুণ্য কি প্রকার দেবসেবা?

এয়ু—দাস যে প্রকার প্রভুর সেবা করে, সেইরূপ, সোক্রাটীস।

সোক্রা—বুঝিলাম; তবে বোধ হইতেছে, ইহা দেবগণের এক প্রকার পরিচর্য্যা!

এয়ু—নিঃসন্দেহ।

সোক্রা—তুমি কি বলিতে পার যে, যে পরিচর্য্যা বৈদ্যের সহায়, তাহা কি ফল প্রসব করে? তুমি কি বিবেচনা কর না, যে উহা স্বাস্থ্য?

এয়ু—হাঁ, করি।

সোক্রা—তবে? যে পরিচর্য্যা-বিদ্যা গো-নির্ম্মাতার সহায় তাহার ফল কি?

এয়ু—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সোক্রাটীস, যে, তাহা নৌকা।

সোক্রা—তেমনি, গৃহনির্ম্মাণ-বিদ্যার ফল গৃহ?

এয়ু—হাঁ।

সোক্রা—তবে, হে ভদ্র, বল, দেবপরিচর্য্যাবিদ্যা কি ফল প্রসব করিয়া থাকে? নিশ্চয় তুমি ইহা জান, যেহেতু তুমি বলিয়া থাক, যে, তুমি অপর সমুদায় লোক অপেক্ষা দৈববিষয় উৎকৃষ্টরূপে অবগত আছ।

এয়ু—কথাটা তো আমি সত্যই বলি, সোক্রাটীস।

সোক্রা—তবে, দেবতার দোহাই, বল দেখি, সেই শ্রেষ্ঠ ফলটি কি, যাহা দেবগণ আমাদিগের পরিচর্য্যা-সাহায্যে উৎপাদন করিয়া থাকেন?

এয়ু—সে ফল বহু ও উত্তম, সোক্রাটীস।

সোক্রা—হে প্রিয়, সেনাপতিও তাহাই করিয়া থাকে; কিন্তু তথাপি তুমি অনায়াসেই বলিতে পার, যে, যুদ্ধে জয় সকল ফলের শীর্ষস্থানীয়; তাহাই নয় কি?

এয়ু—তা' নয় তো কি?

সোক্রা—অধিকন্তু, আমার মতে কৃষকও বহু ও উত্তম ফল উৎপাদন করে; কিন্তু তথাপি, ধরিত্রীকে শস্যশালিনী করাই সকল ফলের শ্রেষ্ঠ ফল।

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—তবে? দেবগণ যে বহু ও উত্তম ফল উৎপাদন করেন, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফল কোন্‌টি?

এয়ু—হে সোক্রাটীস, তোমাকে আমি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, এই-সকল বিষয় সুক্ষ্মরূপে অবগত হওয়া বিলক্ষণ শ্রমসাধ্য তথাপি তোমাকে আমি মোটামুটী বলিতেছি, যে, যদি কেহ জানিতে পারে, যে, যখন সে দেবগণের নিকটে প্রার্থনা করে ও তাঁহাদিগকে বলি উপহার দেয়, তখন তাহার বাক্য ও কার্য্য তাঁহারা প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে তাহাই পুণ্য; তাহাই তাহার স্বকীয় গৃহপরিবার ও রাষ্ট্রীয় বিভূতিকে রক্ষা করে; পক্ষান্তরে, যাহা প্রিয়ের বিপরীত, তাহাই অধর্ম্ম; তাহাই যাবতীয় বিষয়ের অকল্যাণ ও ধ্বংস সাধন করে।

সোক্রা—হে এয়ুথ্যুফ্রোন, ইচ্ছা করিলে তুমি আমার প্রধান প্রশ্নটির উত্তর আরও অনেক সংক্ষেপে দিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র নও; ইহা সুস্পষ্ট। কেননা, এই মাত্র যেই তুমি কথাটি বলিতে যাইতে ছিলে, অমনি থামিয়া গেলে। যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে, তবে আমি তোমার নিকট হইতে সুস্পষ্ট জানিতে পারিতাম, পুণ্য কি। এখন কিন্তু—আমি জিজ্ঞাসু, তুমি জিজ্ঞাসিত, সুতরাং তুমি যেখানেই লইয়া যাও না কেন, আমি তোমার অনুগমন করিতে বাধ্য। আচ্ছা, তুমি পুণ্য ও পবিত্রতা বলিতে কি বুঝিয়া থাক? ইহা কি প্রার্থনা-ও-বলি-বিষয়িণী বিদ্যা নহে?

এয়ু—হাঁ, আমি তাহাই মনে করি।

সোক্রা—বলি দেওয়া, দেবতাদিগকে কিছু প্রদান করা, ও প্রার্থনা করা, তাঁহাদিগের নিকটে কিছু চাওয়া—ইহাই নয় কি?

এয়ু – খুব ঠিক্ কথা, সোক্রাটীস।

সোক্রা—তবে, এই কথা অনুসারে, পুণ্য, চাহিবার ও দেবগণকে উপহার প্রদান করিবার বিদ্যা।

এয়ু—সোক্রাটীস, তুমি আমার কথাটা খুব চমৎকার বুঝিতে পারিয়াছ।

সোক্রা—হাঁ, সখে, আমি তোমার জ্ঞান লাভের জন্য সমুৎসুক কি না, এজন্য তোমার বাক্যে তদ্গতচিত্তে মনোনিবেশ করিতেছি, যেন তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার একটা কথাও বৃথা না যায়। কিন্তু বল আমায়, দেবতাদিগের এই পরিচর্য্যাটা কি? তুমি বলিতেছ, তাঁহাদিগের নিকটে কিছু চাওয়া ও তাঁহাদিগকে কিছু দেওয়া?

এয়ু—হাঁ, বলিতেছি।

সোক্রা—তবে, তাঁহারা আমাদিগের যে সকল অভাব মোচন করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের নিকটে তাহা চাওয়াই, ঠিক্ ভাবে চাওয়া?

এয়ু—তাহা বৈ কি?

সোক্রা—এবং আমরা তাঁহাদিগের যে-সকল অভাব মোচন করিতে পারি, তাঁহাদিগকে প্রতিদান-স্বরূপ তাহা দেওয়াই, ঠিক্ ভাবে দেওয়া? কেননা, যে-সকল বস্তুর অভাব নাই, কাহাকেও তাহাই উপহার দেওয়া বোধ করি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

এয়ু—সত্য কথাই বলিতেছ, সোক্রাটীস।

সোক্রা—তাহা হইলে, এয়ুথ্যুফ্রোন, পুণ্য, দেব ও মানবের মধ্যে একপ্রকার কেনা-বেচার বিদ্যা।

এয়ু—হাঁ, যদি এইরূপ বলাই তোমার অভিরুচি হয়, তবে কেনা-বেচার বিদ্যাই বটে।

সোক্রা—না, না, যাহা সত্য নয়, তাহা বলা মোটেই আমার অভিরুচি নহে। কিন্তু আমাকে বল, দেবগণ আমাদিগের নিকট হইতে যে-সকল নৈবেদ্য প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহাদিগের কি উপকার হইয়া থাকে? তাঁহারা আমাদিগকে যে-সকল ইষ্ট পদার্থ প্রদান করেন, তাহা তো সর্ব্বথা সুস্পষ্ট; কেননা, আমাদিগের এমন কোনও সম্পদ নাই, যাহা তাঁহাদিগের দান নহে। কিন্তু আমাদিগের নিকট হইতে তাঁহারা যাহা লাভ করেন, তাহা তাঁহাদিগের কি হিত সাধন করে? অথবা, এই কেনা-বেচার ব্যাপারে আমরাই এত অধিক লাভবান্, যে, আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে যাবতীয় শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হই, কিন্তু তাঁহারা আমাদিগের নিকট হইতে কিছুই লাভ করেন না।

এয়ু—কিন্তু, সোক্রাটীস, তুমি কি বিবেচনা কর, যে, দেবতারা আমাদিগের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা তাঁহারা উপকৃত হইয়া থাকেন?

সোক্রা—কিন্তু, এয়ুথ্যুফ্রোন, আমরা দেবগণকে যে-সকল উপহার প্রদান করিয়া থাকি, সেগুলি কি?

এয়ু—মান এবং আনুগত্য, এবং এইমাত্র আমি যেমন বলিয়াছি, ইষ্টবস্তু প্রদানে প্রসন্নতা—ইহা ভিন্ন তুমি আর কি মনে কর?

সোক্রা—তবে, হে এয়ুথ্যুফ্রোন, পুণ্য দেবগণের প্রসন্নতাভাজন, কিন্তু উহা তাঁহাদিগের হিতকর কিংবা প্রিয় নহে?

এয়ু—আমি তো মনে করি, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

সোক্রা—তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, পুণ্য ও যাহা দেবগণের প্রিয়, এই দুইটি একই।

এয়ু—ধ্রুব নিশ্চিত।

সোক্রা—একথা বলিবার পরেও কি তুমি আশ্চর্য্য হইবে, যে, তোমার সংজ্ঞাগুলি এক স্থানে স্থির না থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? ইহার পরেও কি তুমি আমাকে এই দোষে দোষী করিবে, যে, আমিই ডাইড লসরূপে সেগুলিকে ঘুরাইতেছি? তুমি নিজেই তো ডাইডালস অপেক্ষা বহুগুণে কৌশলী, এবং নিজেই তো সংজ্ঞাগুলিকে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করাইতেছ। অথবা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, যে, আমাদিগের সংজ্ঞা পরিভ্রমণ করিয়া পুনশ্চ পূর্ব্বস্থানে উপনীত হইয়াছে? কেননা, তোমার হয়তো স্মরণ আছে, যে পূর্ব্বে আমাদিগের এইরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, যে, 'পুণ্য' ও 'দেবপ্রিয়' এক নহে, প্রত্যুত পরস্পর পৃথক্। না তোমার তাহা স্মরণও নাই?

এয়ু—হাঁ আছে।

সোক্রা—এখন তবে তুমি দেখিতে পাইতেছ না, যে, তুমি বলিতেছ, যাহা দেবগণের প্রিয়, তাহাই পুণ্য? যাহা দেবগণের প্রিয় তাহা 'দেবপ্রিয়' ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কেমন, কথাটা ঠিক্ নয়?

এয়ু—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—তাহা হইলে, আমরা পূর্ব্বে যাহাতে একমত হইয়াছিলাম, তাহা সঙ্গত নহে, অথবা তাহা যদি সঙ্গত হয়, তবে এখন আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি তাহা ভ্রান্ত।

এয়ু—তাহাই বোধ হইতেছে।

সোক্রা—তবে আমাদিগকে আবার প্রথম হইতে দেখিতে হইবে, পুণ্য কি। তত্ত্বটি অবগত হইবার পূর্ব্বে আমি স্বেচ্ছায় কাপুরুষের মত পরাজয় স্বীকার করিব না। কিন্তু, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না, প্রত্যুত সর্ব্বপ্রযত্নে যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিয়া এক্ষণে সত্যটি বিবৃত কর। মানবকুলে যদি কেহ উহা অবগত হইয়া থাকে, তবে সে তুমি; যতক্ষণ না তুমি সত্যটি আমায় বলিবে, ততক্ষণ প্রোটেয়ুসের মত তুমি কিছুতেই মুক্তি পাইবে না। যদি তুমি পাপ ও পুণ্য সম্যক্‌রূপে অবগত না থাকিতে, তবে ইহা কখনও সম্ভব নয়, যে, তুমি একজন দাসের হত্যার জন্য তোমার বৃদ্ধ পিতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনয়ন করিতে। বরং হয় তো এই কার্য্যটি ধর্ম্মসঙ্গত হইতেছে না, এই আশঙ্কা বশতঃ তুমি দেবগণের ভয়ে এমন বিষম কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে, এবং লোকসমাজে অখ্যাতি অর্জ্জনের শঙ্কাতেও মরমে মরিয়া যাইতে। কিন্তু এখন আমি বেশ জানি যে, তুমি মনে কর, যে, পুণ্য কি, এবং পুণ্য কি নয়, তাহা তুমি সম্যক্ অবগত আছ। অতএব, হে পুরুষোত্তম এয়ুথ্যফ্রোন, আমাকে বল, তুমি কি পুণ্য বলিয়া বিবেচনা কর, আমার নিকটে উহা গোপন করিও না।

এয়ু—সে কথা তবে আর এক দিন হইবে, সোক্রাটীস, কারণ এখন আমি বড় ব্যস্ত, এবং আমার যাইবার সময় উপস্থিত।

সোক্রা—ও বন্ধু, তুমি কি করিতেছ! আমি যে অন্তরে মহতী আশা পোষণ করিয়াছিলাম, যে, তোমার নিকটে পাপ ও পুণ্য কি, তাহা শিক্ষা করিব, এবং মেলীটসের অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইব, তাহাতে আমাকে বঞ্চিত করিয়া তুমি চলিয়া যাইতেছ! আমি তাঁহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম, যে, আমি এক্ষণে যাবতীয় দৈব বিষয়ে এয়ুথ্যফ্রোনের নিকটে জ্ঞানলাভ করিয়াছি; আমি আর অজ্ঞতাবশতঃ ঐসকল বিষয়ে বাচালের মত যাহা-তাহা বলি না, এবং উহাতে নূতন কিছু প্রবর্ত্তন করিতেও চাহি না; অধিকন্তু, আমি সংকল্প করিয়াছি যে, আমার অবশিষ্ট জীবনকাল আমি আরও সুচারুরূপে যাপন করিব।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

বিদেশী নৃত্যগীতবাদ্য

বিদেশী সাহিত্য বুঝা কঠিন নয়—বিদেশী চিত্রাঙ্কন বুঝাও কঠিন নয়—বিদেশী মূর্ত্তিগঠনও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু বিদেশী নৃত্যগীতবাদ্য বুঝা বড়ই কঠিন। নাচ-গান মানুষের পক্ষে অতি স্বাভাবিক কার্য্য; কিন্তু এক জাতীয় লোক অপর জাতীয় নরনারীর এই নাচগান শীঘ্র বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সাধারণতঃ বিদেশী নৃত্যকে লম্ফন মাত্র বিবেচনা করা হয়—গীতকে বিকট চীৎকার মনে করা হয় এবং বাদ্যকে বেসুর নিনাদ বিবেচনা করা হয়।

বষ্টনের এক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতালয়ে গানবাজনা শুনিবার জন্য বিনা পয়সায় কম্প্লিমেণ্টারি টিকেট পাইয়াছিলাম। প্রায় পাঁচ হাজার স্ত্রীপুরুষ আজ শ্রোতা। মঞ্চের উপর প্রায় একশত লোক সঙ্গত করিতেছেন। কতকগুলি সুর বাজান হইল—কয়েকটা গানও হইল। গান করিলেন এক রমণী। ইনি ওলন্দাজ—কণ্ঠস্বর মিষ্ট। বার্লিনে ইনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে ওস্তাদ কালোয়াতেরা হিন্দী বা উর্দ্দু-ভাষায় গান গাহিয়া থাকেন। গীতের ভাষা বুঝি বা না বুঝি আমরা এই ওস্তাদীই ভালবাসি—আমরা হিন্দীগীতই ফরমাস দিয়া শুনিয়া থাকি। ইংলণ্ড আমেরিকায়ও দেখিতে পাই—প্রত্যেক হোটেল রেষ্টরাঁ ইত্যাদিতে খাদ্যদ্রব্যের নাম তালিকায় ফরাসীভাষায় লেখা—অথচ ফরাসী-জানা লোক একজনও নাই। ইহা একটা ফ্যাসন। সেইরূপ সঙ্গীতালয়ে সাধারণতঃ যে-সকল গান হয় সেগুলি প্রধানতঃ ইতালীয় জার্ম্মান অথবা ফরাসীভাষায় রচিত। যাহারা ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষার ধার ধারে না তাহারা

এই অপরিচিত ভাষায় লিখিত গীতাবলীর সুর শুনিয়াই মুগ্ধ হয়! বুঝিতে না পারিলেও "সমে"র সময়ে "হুঁ" করিতে সকলেই পারে। এখানেও দেখি যথাসময়ে হাততালি দিতে কেহই ছাড়ে না।

সঙ্গীতালয়ে একখানা পুস্তিকা পাওয়া গেল। ইহাতে প্রত্যেক বাজনা ও গীতের ইতিহাস বিবৃত আছে। কবে কোথায় প্রথম অভিনয়, কে উদ্ভাবয়িতা বা রচয়িতা ইত্যাদি তথ্য জানিতে পারা যায়। প্রথমে একটা জার্ম্মান "Symphony" বাজান হইল। ইহা ১৮৪১ খৃঃ অঃ উদ্ভাবিত। (Robert Schuman) রবার্ট শুমান ইহার রচয়িতা।

ওলন্দাজ রমণী ইতালীয় ভাষায় একটি গীত গাহিলেন। এই গীত (Monteverde) মণ্টিভার্ডি (১৫৬৭-১৬৪৩ খৃঃঅঃ) কর্ত্তৃক রচিত। গীতের নাম The Lament of Ariadne বা য়্যারিয়্যাড্‌নে-বিলাপ। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের অজ-বিলাপ, সীতাবিলাপ, রতি-বিলাপ ইত্যাদির অনুরূপ। এক ইতালীয় রাজকুমারের বিবাহ-উপলক্ষ্যে একটা (opera) অপেরা অভিনয় হয়! তাহার ভিতর এই বিরহ-গীতি ছিল। শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর ইহার প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে—

"The lament of Ariadne forsaken by Theseus was with so much feeling and in such a moving manner that all the hearers were deeply affected by it, and there were tears in every woman's eyes."—থিসিউস-পরিত্যক্তা য়্যারিয়্যাড্‌নের বিলাপ-সঙ্গীত এমন ভাব দিয়া গাওয়া হইয়াছিল যে সকল শ্রোতারই মন দ্রব হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোকের চোখে জল পড়িয়াছিল।

এই গীতের ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

O Theseus, O my Theseus, you must say that you are mine, even though you fly from me, alas, cruel in my eyes! O Theseus, if you knew, O God, if you knew how troubled is your poor Ariadne, perhaps, repenting, you would turn your prow back toward the shore, and with tranquil breezes you would not leave me, you happy while I weep here. Alas, that you do not reply! Alas, that you are deaf to my cries!

O clouds, O whirlwinds, O winds, overwhelm him in the waves! Hasten, sea-monsters and lightning, fill your abysses with his dismembered body! What am I saying? Am I raving? O me miserable, what do I ask? O Theseus, O my Theseus, it is not I who has said these fierce words—my trouble speaks, my grief speaks, even my tongue speaks, but not my heart. Where is the faith you have sworn to me? Not thus did you reply in the old home of our ancestors. Are these the crowns wherewith my locks are adorned? These the sceptres, these the jewels, and the golden ornaments? Leave me prostrate, O wild beast which tears and devours me! Ah, my Theseus, you could leave me to die, weeping in vain, calling in vain for help, the unhappy Ariadne who would give you her faith, her glory, her life!

Let me die! who would wish to comforf me in such a cruel fate in so great a martyrdom? Let me die!"

ইতালীর ওস্তাদ মণ্টিভার্ডি ইয়োরোপীয় সঙ্গীত-কলার ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। মধ্যযুগে—এবং এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, ইয়োরোপীয় ভূম্যধিকারী এবং রাজারাজড়ারা কালোয়াত এবং ওস্তাদগণকে ধনসম্পত্তি দ্বারা পালন ও সংরক্ষণ করিতেন। বড় বড় উৎসব উপলক্ষ্যে গানবাজনা হইত। জার্ম্মান ওস্তাদ বাক্ (Bach) ১৬৮৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৫০ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইঁহার সুরগুলি সর্ব্বত্র সুবিদিত। ইনিও এক সঙ্গীতপ্রিয় রাজকুমারের বন্ধু ও ওস্তাদ ছিলেন। নানাপ্রকার নাচের তালে সাহায্য করিবার জন্য ইনি কতকগুলি বাজনার গৎ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এইরূপ একটা গৎ বষ্টন-সঙ্গীতালয়ে বাজান হইল—নাচের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

হ্যাণ্ডেল (Handel) আর-একজন জার্ম্মান ওস্তাদ। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইয়োরোপে নামজাদা হইয়াছিলেন। ইতালীয় ভাষায় ইনি বেশী গীত রচনা করেন। ওলন্দাজ রমণী হ্যাণ্ডেল প্রণীত একটি জার্ম্মান গীত গাহিলেন। তাহার ইংরেজী অনুবাদ:

"Thanks be to thee, O Lord, for thou hast led thy people with thee, thy people Israel through the Sea. As a flock it passed through. Thy hand, O Lord, protected it in thy goodness. Thou gavest it safety.

অনেক সময়েই দেখা যায় যে গীত রচনা করেন একজন কিন্তু তাহার সুর ঠিক করেন আর একজন। জার্ম্মান ওস্তাদ বীঠোবেন (Beethoven) কবি ম্যাথিসনের গীতাবলীর সুরযোজনা করিতে ভাল বাসিতেন। বীঠোবেনের নাম ইয়োরোপের নগণ্য পল্লীতেও পরিচিত। ইঁহার তাল-মানলয়-সমন্বিত ম্যাথিসনের গীত বষ্টন-সঙ্গীতালয়ে

শুনিলাম। ওলন্দাজ গায়িকা জার্ম্মান ভাষায় গাহিলেন। গীতের ইংরেজী অনুবাদ :—

Lonely wanders thy friend, where o'er the garden
Charmful Springtime in mellow radiance floateth,
And thro' wavering, flow'ry branches quiv'reth,
Adelaide !
In the glimmering floods, in alpine snowfields,
In the clouds' golden glow when day declineth,
In the stars' high dominion, beams thine image,
Adelaide !
Twilight breezes 'mid tender leaves are sighing,
Silv'ry May bells are tinkling in the grasses,
Waves are murm'ring and nightingales are warbling,
Adelaide !
Once, O marvel, my grave shall bear a flower,
From its ashes my heart shall yield a blossom,
Brightly gleaming, on every purply petal,
Adelaide !

বীঠোবেন গীতরচয়িতার অনুমতি না লইয়াই ইহার সুরযোজনা করিয়াছিলেন। কবিকে গায়ক ৩৪ বৎসর পর পত্র লিখিতেছেন :—

"You yourself know what change a few years produce in an artist who is constantly advancing; the greater the progress he makes in art, the less do his old works satisfy him. My most ardent wish is gratified if the musical setting of your heavenly 'Adelaide' does not altogether displease you; and if thereby you feel moved soon again to write another poem of similar kind, and not finding my request too bold, at once to send it to me, I will then put forth my best powers to come near to your beautiful poetry."

বীঠোবেন ব্যতীত আরও অনেক ওস্তাদ এই গানে সুর লাগাইয়াছিলেন। কিন্তু কবি স্বয়ং তাঁহার কবিতার ভূমিকায় বলিয়াছেন :—

"Several composers gave a musical soul to this lyrical phantasy; but no one, such is my inmost conviction, by his melody threw the text into deeper shade than the gifted Ludwig van Beethoven at Vienna.

সর্ব্বশেষে একটা গৎ বাজান হইল। সেকস্‌পীয়রের Midsummer Night's Dreamএর প্রারম্ভিক গীতের জার্ম্মান সুর শুনিতে পাইলাম। জার্ম্মান সাহিত্যে এবং জার্ম্মান সঙ্গীতে বিলাতী সেকস্‌পীয়ারের প্রভাব অত্যধিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেকস্‌পীয়ারের নাটকসমূহ জার্ম্মানভাষায় অনূদিত হয়। সাহিত্যরথী শ্লেগেলের (Schlegel) অনুবাদ জগৎপ্রসিদ্ধ। সেক্স্‌পীয়ারসাহিত্য জার্ম্মানে প্রবর্ত্তিত হইবামাত্র জার্ম্মানির চিন্তামণ্ডলে নব-যুগের সূত্রপাত হয়। ভাবুকতার আন্দোলন বা "রোমান্টিক্ মুভমেণ্ট" সেই যুগের লক্ষণ। কাণ্ট ফিক্‌টে হেগেল পেষ্টালজি বিস্মার্ক এবং "নব্য নেপোলিয়নের" Father-landকে যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে সেকস্‌পীয়ারের প্রভাব বুঝিতে হইবে। সেকস্‌পীয়ারের জার্ম্মান-অনুবাদই উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মান-ভাবুকতা, বীরত্ব এবং একরাষ্ট্রীয়তা ও সাম্রাজ্যনীতির প্রথম স্তর গঠন করিয়াছে।

জার্ম্মান সমালোচক (Wernaer) ওয়ার্ণেয়ার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্ম্মান-ভাবুকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার "Romanticism and the Romantic School in Germany" গ্রন্থে ওয়ার্ণেয়ার বলিতেছেন :—

"Shakespeare was classed by many contemporaries of the Romanticists among the Stormers and Stressers. The romanticist themselves, however, claimed him as one of their own, considering him the greatest of romantic poets."

স্বপ্নপ্রচার করা ভাবুকগণের অন্যতম লক্ষণ। জার্ম্মান ভাবুকগণ সাহিত্যে নানাপ্রকার স্বপ্ন প্রচার করিতেন। ওয়ার্ণেয়ার-প্রণীত গ্রন্থের Tieck and the Romantic Mood অধ্যায়ে প্রকাশ :—

Already in 1793 when Tieck was but twenty years old, he recorded his reflections on this subject in a very interesting essay on *Shakespeare's Treatment of the Supernatural.* "The Tempest" and "The Midsummer Night's Dream" he writes, "may be compared with sunny dreams. Shakespeare, who so often in his dramas reveals his intimate familiarity with the tenderest emotions of the human heart, no doubt studied the working of his own mind in his dreams, and made use of his knowledge thus gained in writing poetry."

আজকাল সেক্‌স্‌পীয়রের বংশধরেরা শ্লেগেলের বংশধর-গণের সঙ্গে ইয়োরোপের কুরুক্ষেত্রে মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত—কাজেই দুই জাতির সাহিত্যসেবীগণের মনোমালিন্য বহু-কাল পর্য্যন্ত চলিবে। এক জাতির গুণীগণ শত্রুপক্ষীয় গুণীগণের আদর করিতে পারিবেন না। কিন্তু সেক্স্‌

পীয়রকে ভুলিলে যুবক জার্ম্মানির জন্মবৃত্তান্ত ভুলিয়া যাওয়া হইবে।

জার্ম্মান গায়ক মেণ্ডেলসন (Mendelssohn) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে প্রসিদ্ধ হন। ইনি শ্লেগেল-অনূদিত সেক্‌স্‌পীয়ার পাঠ করিয়া কবিতাগুলিতে সুরতাললয় যোজনা করিতে প্রবৃত্ত হন। মেণ্ডেলসনের সুরই বষ্টনের সঙ্গীতালয়ে শুনিলাম। ওস্তাদের ভগ্নী এই সুরের গৌরব করিতেন :—

"We have grown up from childhood in the *Midsummer Night's Dream*, so to speak, and Felix has really made it so wholly his own that he has simply reproduced in music what Shakespeare produced in words, from the splendid and really festal wedding march to the mournful music on Thisbe's death, the delightful fairy songs and dances and entr'actes—all men, spirit, and clowns, he has set forth in precisely the same spirit in which Shakespeare had before him."

যন্ত্রসঙ্গীত এবং কণ্ঠসঙ্গীত সবই অতি উত্তম লাগিল। এই সঙ্গীতের বিস্তৃত বা বিশদ সমালোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। দেশী সঙ্গীতেরও বিস্তৃত সমালোচনা করিবার যোগ্যতা কোন দিন পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। এমন কি আমাদের দেশে সঙ্গীতকলার বিশদ সমালোচনা কেহ করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহাও শুনি নাই। এইজন্য বিদেশী গানবাজনাগুলি ভাল লাগিল ও সুমিষ্ট বোধ হইল—এই পর্য্যন্ত বলিতে পারাই যথেষ্ট মনে করিতেছি। গানের অথবা বাজনার আরম্ভ মধ্য অথবা শেষ সকল স্থলেই ধরিতে পারিয়াছি একথা বলিতে পারি না। গীতের ভাষাগুলি বুঝিতে পারিলে হয়ত সুরগুলি বুঝা সহজ হইত। অধিকন্তু স্বদেশী গীতবাদ্য সম্বন্ধে খানিকটা অভিজ্ঞতা থাকিলেও কানটা কিছু তৈয়ারী থাকিত। এতগুলি অসম্পূর্ণতা লইয়া ভারতবাসী ইয়োরোপ ও আমেরিকার সঙ্গীতালয়ে উপস্থিত হন। কাজেই ঝকমারি বোধ হইবে না ত কি? এই কারণেই পাশ্চাত্য নৃতগীতবাদ্য তাণ্ডব-লীলা মাত্র মনে হয়। এই জন্যই আবার মূর্খ এবং গীত-বাদ্যে অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্যেরা আমাদের দেশীয় সঙ্গীতাদিকে অসভ্য বর্ব্বরোচিত বীভৎস অনুষ্ঠান বিবেচনা করিয়া থাকে। কিন্তু তালমানলয়-জ্ঞানসম্পন্ন বিদেশীয়েরা ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার আদর আরম্ভ করিয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত সমালোচনার আসরে প্রচারিত ছিল যে পাশ্চত্য সঙ্গীতে Harmony আছে—ভারতীয় সঙ্গীতে Harmonyর অভাব, Melody আছে। এই দুইটা পারিভাষিক শব্দের অর্থ বুঝি না। যাহা হউক এক্ষণে সমালোচকেরা এই দুইটা শব্দ মাত্রের দ্বারা চালিত না হইয়া একটুকু গভীর ও বিস্তৃত-ভাবে সঙ্গীতকলার রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের যন্ত্রসঙ্গীত এবং কণ্ঠসঙ্গীতের গৌরব আজকাল পাশ্চাত্য-মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়।

বষ্টনে জার্ম্মান-সঙ্গীত শুনিয়া পুলকিত হইলাম—বিলাতে কোন কোন ইংরেজী গীত শুনিয়াও বুঝিতে পারিয়াছি যে পাশ্চাত্যের গানগুলি ভারতবাসীর কর্ণে পীড়াদায়ক নয় এবং ইহাদের বাজনাও চিত্তে খোঁচা মারে না। নিউইয়র্কে এক রুশ গির্জায় উপস্থিত হইয়া গ্রীকমতাবলম্বী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসঙ্গীত শুনিয়াছিলাম। রুশেরা সকল প্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই হিন্দুর প্রণালীতে চালাইয়া থাকেন। মন্ত্রপাঠ, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, আরতি, উচ্চারণ, গীত ইত্যাদি কোন বিষয়েই প্রভেদ লক্ষ্য করা কঠিন। কেবল ভাষা পৃথক্। কিন্তু গানের সুরগুলি বেশ বুঝিতে পারা গেল।

আর একদিন একজন ইয়াঙ্কি কবির যন্ত্রসঙ্গীত শুনিয়াছি। ইনি নিউইয়র্কের ভাবুক সাহিত্যসেবী ফ্রান্‌সিস গ্রিয়ার্সন। ইনি গান গাহেন না—পিয়ানো বাজাইয়া থাকেন। ইঁহার বাজনা ফ্রান্সে এবং বিলাতেও আদৃত হইয়াছে। নিউইয়র্কে একদিন ইঁহার বাজনা শুনিলাম। একটা সুরের নাম প্রকাশিত হইল—"Arabian music।" ইনি প্রাচ্য দেশে কখনই যান নাই, কিন্তু ইনি মিষ্টিক এবং ভাবুকতা বিষয়ক সাহিত্যচর্চ্চা করিয়াছেন। প্রাচ্যজগৎ' মিষ্টিসিজম বা ভাবুকতার দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং আরবই হউক, অথবা হিন্দুস্থানই হউক পাশ্চাত্যের হিসাবে সবই একপ্রকার। গ্রিয়ার্সন নাকি নূতন নূতন গৎ ও সুর উদ্ভাবন করিয়াছেন। আজকালকার দিনে পাশ্চাত্যজগতে প্রাচ্যবিষয়ক যে-কোন বস্তু আদরণীয়। বোধ হয় এই জন্যই গ্রিয়ার্সন তাঁহার সঙ্গীতের সঙ্গে প্রাচ্য-জনপদের নাম সংযুক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক গ্রিয়ার্সনের উদ্ভাবিত "Improvisation"গুলি মন্দ নয়। কোন

কোনটায় কথঞ্চিৎ প্রাচ্য টান আছে। মিশরের কাইরোতে দুই-একটা সুরের কিয়দংশ এইরূপ পাইয়াছি।

গ্রিয়ার্সন একজন সঙ্গীত-সংস্কারক। আজকাল এসকল দেশের সংস্কারকেরা প্রাচীন কিম্বা প্রাচ্যপ্রথা অবলম্বন করিতে চাহেন। আমাদের দেশের সংস্কারকেরাও হয় অতীতে যাইতে চাহিতেছেন—না হয় পাশ্চাত্যের প্রথা অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। ভবিষ্যবাদী (Futurist) দল দুই মহলেই এখনও অল্প। বিশেষতঃ ভবিষ্যতের মূর্ত্তি কল্পনা করা নিতান্তই কঠিন। ইতালীয় ভবিষ্যবাদী চিত্রকরগণ এবং তাঁহাদের ফরাসী ইংরেজ জার্ম্মান ও ইয়াঙ্কি অনুচরেরা যে বস্তু প্রদান করিতেছেন তাহাতে জগতের কোন লোকেরই পেট ভরিতেছে না। কাজেই পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা হয় "গীতাঞ্জলি"র অভ্যর্থনা করিতেছেন—না হয় প্রাচীন আদিম ইত্যাদির সেবক হইয়াছেন। এইরূপে ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতেছে।

একদিন নিউইয়র্কে এক নৃত্য-সংস্কার-পরিষদের ভবনে উপস্থিত ছিলাম। ইহাতে থিয়েটারের পেশাদার নর্ত্তকীরা আসেন না। নৃত্যকলার উন্নতিবিধান করিবার জন্য এক ওস্তাদ রমণী এই Dancing Academy স্থাপন করিয়াছেন। ভদ্রঘরের মেয়েদিগকে উচ্চধরণের নৃত্যবিদ্যা শিখান এই পরিষদের উদ্দেশ্য। ইহাতে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনা রাষ্ট্রের একজন শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে এই পরিষদে গিয়াছিলাম। ইনি স্বয়ং নাচিলেন না—ইনি পরিষদের প্রতিষ্ঠাত্রীর বন্ধু।

প্রথমে কিছুক্ষণ বক্তৃতা হইল। যুক্তরাষ্ট্রের উইস্‌কন্‌সিন প্রদেশ হইতে একজন রমণী এইজন্য নিউইয়র্কে আসিয়াছেন। ইনি নৃত্যগীতবাদ্যের সংস্কারসাধন করিতে প্রয়াসী। বাজনা ও গানের সুরে শব্দের ওঠানামা এবং সরল বা বক্রগতি সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নৃত্যকালে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিই লক্ষ্য করিবার বিষয়। বক্তা সঙ্গীতকলার সঙ্গে নৃত্যকলার তুলনা করিয়া বুঝাইলেন। প্রত্যেক সুরের সঙ্গে সঙ্গে ইনি নিজের শরীর যথারীতি হেলাইয়া দুলাইয়া নৃত্যের ভঙ্গীর সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন। অধিকন্তু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের রেখাপাতে এবং আকৃতিগঠনেও যে এই গতিবিধি, নৃত্যভঙ্গী ও গানবাজনার রীতি অবলম্বিত হয় তাহাও বুঝান হইল। বাকি থাকিল চিত্রকলা। বক্তা বুঝাইলেন যে এই-সমুদয় সুকুমার শিল্পে যাহার নাম রেখাপাত, গতিভঙ্গী অথবা উঠাবসা তাঁহাই চিত্রকরের ভাষায় বর্ণবিন্যাস, বর্ণসমাবেশ ইত্যাদি। কাজেই গানের ভিতরও রং দেখিতে পাওয়া যায়—বাজনার ভিতরও বর্ণভেদ আছে। চিত্রকে যেরূপ রঙ্গিন বলা হইয়া থাকে, গান বাজনা নাচ ইত্যাদিকেও সেইরূপ রঙ্গিন বলা চলে। অর্থাৎ কানের দ্বারাও রং বুঝিতে পারা যায়, একমাত্র চোখের দ্বারা নয়। এইরূপে ইনি সকল সুকুমার শিল্পের সামঞ্জস্য এবং ঐক্য স্থাপন করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহের পরস্পর সাপেক্ষতা এবং সমতা প্রতিপাদন করিলেন। অধিকন্তু সঙ্গীতকলায় বর্ণতত্ত্বও প্রচারিত হইল।

সঙ্গীতে বর্ণতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বক্তা অনেক উদাহরণ দিলেন। ইনি প্রাকৃতিক জগতে, জীবজগতে, উদ্ভিদ্‌জগতে, মানবজগতে, এককথায় সমগ্র সংসারে বর্ণভেদের উৎপত্তি আলোচনা করিলেন। Anthropology বা নৃতত্ত্ব-বিদ্যায় প্রচারিত বর্ণভেদের কারণই ইনি উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"উত্তর মেরুতে শ্বেত ভল্লুক জন্মগ্রহণ করে—গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নানাবর্ণে চিত্রিত জীবজন্তু দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে মানব বর্ণহীন অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ। উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজে বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্ট হয়। সূর্য্যরশ্মির উনিশ বিশ ভেদই জগতে লাল কাল শ্বেত পীত ইত্যাদি রং সৃষ্টির কারণ। প্রাকৃতিক জগতে ইহা লক্ষ্য কে না করিয়াছে? মানসিক জগতেও ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক।"

এই বলিয়া বক্তা তাঁহার একজন সহযোগিনীকে গ্রামোফোনের বাক্স হইতে একটা গান শুনাইতে বলিলেন। কলের গান বন্ধ হইলে বক্তা শ্রোতৃমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা বর্ণহীন জাতির গান—না বর্ণযুক্ত জাতির গান? ইহা শীতপ্রধান দেশীয় লোকের গান—না গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় লোকের গান?" কোন রমণী বলিলেন—"ইহাতে সুরের খাদ চড়াই বড় বেশী—ইহা নিশ্চয়ই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গীত—ইহা coloured." আর একজন বলিলেন "ঠাণ্ডাদেশের লোকেরা কখনই এরূপ ভাবে গলা ছাড়িয়া

পারিবে না। ইহাতে গরমের প্রভাব বেশ মনে হইতেছে।" এই ধরণের অনেকগুলি কলের গান শুনিলাম—সঙ্গে সঙ্গে বক্তার ব্যাখ্যা এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর সমালোচনাও বুঝিতে লাগিলাম। আইরিশ, ফিনিশ, রুশ, জার্ম্মান, ইত্যাদি, চীনা, জাপানী, ভারতীয়, মিশরীয়, লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্, ফরাসী, ইতালীয়, ইংরেজী ইত্যাদি সকল জাতীয় গীতই এইরূপে একসঙ্গে তুলনা করা হইল। সঙ্গীতকলায় ভূগোলের প্রভাব বুঝানই বক্তার উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে বোধ হয় ইনি বক্তব্য স্পষ্ট করিতে পারিয়াছেন। ইঁহার সিদ্ধান্তসমূহ বেশ চিত্তাকর্ষক মনে হইল—ইনি বুঝাইবার যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলাম। এই ধরণের সমালোচনা জগতে নূতন নয়। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে মানবের চরিত্র, সমাজের চরিত্র, রাষ্ট্রের চরিত্র ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য অনেকেই এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন। মানবের সভ্যতা তাহার আবেষ্টন, জন্মস্থান, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জ ইত্যাদির দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত, কেহই আজকাল ইহা সর্ব্বাংশে অস্বীকার করেন না। ফরাসী বোডিন ও মণ্টেউস্কি, জার্ম্মান হার্ডার ও হেগেল, ইংরেজ বাক্‌ল্ ও ব্যাজহট এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। (Buckle) বাক্‌লের History of Civilisationএ খানিকটা বাড়াবাড়ি আছে। (Bagehot) ব্যাজহটের Physics and Politics গ্রন্থেও ভূগোলের মহিমা অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেই বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। এমন কি, কেহ কেহ বলিতেন—"কোন্ দেশ কত গরম তাহা জানিতে পারিলেই আমি বলিয়া দিব সেই দেশের লোকেরা প্রজাতন্ত্রশাসন পছন্দ করে কিম্বা রাজতন্ত্র শাসন পছন্দ করে। Thermometer বা তাপমানযন্ত্রের সাহায্যে জাতির চরিত্র মাপা যাইতে পারে।" এইরূপ জড়বাদী পণ্ডিতগণের চিন্তায় মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি ভূগোল রসায়ন এবং পদার্থবিজ্ঞানেরই ছায়া মাত্র। মানবচিত্তের উপর জড়জগতের প্রভাব সম্বন্ধীয় এইরূপ মতবাদ জার্ম্মান দার্শনিক হীকেল (Haeckel) এবং ইংরেজ বৈজ্ঞানিক হাক্সলে (Huxley) নিজ নিজ রচনায় প্রচারিত করিয়াছেন। এই মতের নাম Epi-Phenomenalism, অর্থাৎ মন, চিত্ত, আত্মা ইত্যাদি ভূত, শরীর এবং জড়পদার্থ ইত্যাদির ফল মাত্র—ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও মূল্য নাই।

সঙ্গীতকলার বর্ণতত্ত্বপ্রচারকও খানিকটা বাড়াবাড়ি করিলেন। কোন দেশের উত্তাপ জানিতে পারিলেই ইনি সেখানকার সঙ্গীতের ধরণধারণ বলিয়া দিতে পারেন এইরূপই ইঁহার ধারণা! কিন্তু কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য নয়।

কলের গান এবং বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলে নাচ সুরু হইল। ওস্তাদ রমণী বলিলেন—"আজকাল নৃত্যকলায় কুরুচি দেখা দিয়াছে। সুরুচি প্রবর্ত্তনের জন্য আমি প্রাচীন গ্রীক রীতি প্রবর্ত্তন করিতে চাহি।" নাচ দেখিলাম। ভাল মন্দ বিশ্লেষণ করা কঠিন। সাধারণ থিয়েটারে কিম্বা নাচ-ঘরে যে ধরণের নৃত্য দেখা যায় তাহা হইতে এগুলি স্বতন্ত্র, এই যা বুঝিলাম। কিন্তু ওস্তাদ পূর্ব্ব হইতে এই প্রভেদ ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বলিয়া না দিলে সাধারণ হইতে পার্থক্য বুঝিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

আজকাল নৃত্য-সংস্কারের আন্দোলন পাশ্চাত্য জগতের নানা স্থানে দেখা যায়। মধ্যযুগের কয়েকটা নৃত্যভঙ্গী পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রয়াস চলিতেছে। একজন কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে এক ব্যক্তি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। লণ্ডনের কোন West End Dancing Academyর অধ্যক্ষ বলেন—"লোকরুচি আজকাল এত বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে মধ্যযুগের ভাল ভাল কায়দাগুলি আর সমাদৃত হয় না। সেগুলি পুনঃ প্রবর্ত্তন করা একপ্রকার অসম্ভব।" তাঁহার কথা লণ্ডনের Daily Telegraphএ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"Why don't we revive them? Who would dance them even if we did succeed? We are always trying to improve the state of matters as regards dancing, but we do not make much headway. The *minuet*! What would a minuet be like danced by your modern woman, with her hockey, golf and motor muscles, her masculine strike and her ungainly movements? Then just picture to yourself the average modern man; take him somewhat rotund in appearance, with a tight-fitting suit and his hands encased in white gloves two sizes too large in case they split in putting on, and you have a picture of the minuet as it is better left alone. No, the minuet demands powder and patches and old brocades and wigs and slow graceful movement. The men would have to wear

high-heeled shoes, with buckles as they used to do and the modern man simply won't.

And the *pavane!* Do you know what a pavane means. It was an old Italian dance, with slow and sweeping movements. Think of slow and sweeping movements with two-button white kid gloves. The cavalier danced it with his cloak on, and at a certain point in the dance he made a low bow and with a languid and graceful movement touched his sword. The hilt of the sword rose up and the cloak went with it, making something like the effect of a peacocks tail: hence the name pavane. And the ladies wore voluminous skirts and dipped and courtesied. No, the minuet and the pavane are out of keeping with the modern ball-room spirit. Deportment is out of fashion. The modern woman does not deport herself, she shuffles and strides and slouches. * * * We are using a new set of drill exercises, because hockey and games of that kind have made our women so muscular and so ungainly. They have been over-doing it."

দেখিতেছি কৃত্রিমতা অস্বাভাবিকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে দুনিয়ার সর্ব্বত্র এবং সকল ক্ষেত্রে "Storm and stress" অর্থাৎ উন্মাদনা ও সংগ্রাম এবং তীব্র প্রতিবাদ চলিতেছে। ইহাই কি বিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক আন্দোলনের সূত্রপাত নয়? নবীন জগৎ গঠনের জন্য, নূতন আদর্শ প্রচারের জন্য, নূতন চিন্তাপ্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য কবি গায়ক নর্ত্তক চিত্রকর বৈজ্ঞানিক দার্শনিক শিক্ষাপ্রচারক সকলেই উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। এশিয়াবাসীর জাগরণ, ইয়োরোপে ও আমেরিকায় এশিয়ার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ এবং এশিয়ার কীর্ত্তিপ্রচার, পাশ্চাত্যজগতের বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্র, সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, তুলনামূলক আলোচনাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন, Higher Criticism, "The Mind of Primitive Man," "Transvaluation of Values", "Sadhana," "Anti-Intellectualism," "Intuition," ইত্যাদি কি অষ্টাদশ শতাব্দীর Sturm und Drangএরই পুনরাবৃত্তি বুঝাইতেছে না? কাজেই বিশ্বে যুগান্তর আগতপ্রায়। কবি শেলীর কথা মনে পড়িতেছে—If winter comes, can spring be far behind?

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

হারামণি

[এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন; কবিওয়ালা, তর্জ্জাওয়ালা, জারিওয়ালা, বাউল, দরবেশ, ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের।]

লালন ফকিরের গান।

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
মন, যা কর্ ত্বরায় কর্‌রে ত্বরায় কর্ এই ভবে।
অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি, মানবের তুলনা কিছুই নাই,
দেব দানবগণ, করে আরাধন,
জনম নিতে মানবে।
কত ভাগ্যের ফলে না জানি,
মনরে, পেয়েছ এই মানব-তরণী,
বেয়ে যাও ত্বরায় তরী সুধারায়,
যেন ভরা না ডোবে।
মানুষে হবে মাধুর্য্য ভজন,
তাইতে, মানস রূপ এই গঠিল নিরঞ্জন,
এবার, ঠেকিলে আর
না দেখি কিনার,
লালন কয় কাতর ভাবে॥

(২)

মন আইন-মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি?
কাল-শমন এলে হবে কি?
ভাবিতে দিন আখের হ'ল,
ষোল আনা বাকী প'ল,
কি আলস্য ঘিরে এল,
দেখলিনে খুলে আঁখি।
নিষ্কামী নির্ব্বিকার হলে,
জীয়ন্তে মরে যোগ সাধিলে,
তবে খাতায় ওয়াশীল পাবে,
নইলে উপায় কই দেখি।

শুদ্ধ মনে সকলি হয়,
তাও তো এবার জোটিলনা তোমায়,
লালন বলে করবি হায় হায়,
ছেড়ে গেলে প্রাণপাখী।

(৩)

সে লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে।
লীলার যার নাইরে সীমা কোন্ খানে কোন্ রূপ ধরে।
আপনি ঘর সে, আপনি ঘরী,
আপনি করে রসের চুরি,
(ঘরে ঘরে)
ও সে আপনি করে ম্যাজিষ্টিরি,
আবার আপনি বেড়ায় বেড়ী পরে।
গঙ্গায় রইলে গঙ্গাজল হয়,
গর্ত্তে গেলে কূপজল কয়,
(বেদ-বিচারে)
তেমনি সাঁইর, বিভিন্ন আকার জানায় পাত্র-অনুসারে।
একে বয় অনন্ত ধারা,
তুমি আমি নাম বেওরা,
(ভবের পরে)
অধীন লালন বলে, কেবা আমি জান্‌লে ধাঁধা যেত দূরে।

(৪)

আমি একদিনো না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরসী-নগর,
এক পড়্‌শী বসত করে।
ও সে গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি,
তার নাই কিনারা, নাই তরণী
পারে—
মনে বাঞ্ছা করি,
দেখ্‌বো তারি,
আমি কেমনে সে গাঁয় যাইরে।
বলবো কি সেই পড়শীর কথা, তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা,
নাইরে—
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর,
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।
সেই পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
তবে যম-যাতনা যেতো
দূরে—
আবার, সে আর লালন একখানে রয়,
থাকে লক্ষ যোজন ফাঁকরে।

(৫)

হতে চাও হুজুরের দাসী।
মনে গোল তো পোরা রাশি রাশি।
না জান সেবা সাধনা,
না জান প্রেম উপাসনা,
সদাই দেখি ইতর-পনা,
প্রভু রাজি হবে কিসি?
কেশ বেশে বেশ করলে কি হয়,
রসবোধ না যদি রয়,
রসবতী কে তারে কয়,
কেবল মুখে কাষ্ঠ হাসি।
কৃষ্ণপদে গোপী সুজন,
করেছিল দাস্য সেবন,
লালন বলে তাই কিরে মন
পারবি ছেড়ে সুখবিলাসী।

সংগ্রহকর্ত্তা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোচনা

Syllable শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে "কবিতায় ভাষা ও ছন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন ইংরেজী syllable শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ "পদ" এবং "মাত্রা"। কিন্তু বোধ হয় এই উভয় শব্দের কোনটিই syllableএর প্রতিশব্দ হইতে পারে না। "সুপ্‌তিঙন্তং পদম্‌," সুতরাং পদশব্দ syllableএর প্রতিশব্দ নহে। আর লঘুত্ব এবং গুরুত্বের পরিমাণকেই মাত্রা বলে, সুতরাং মাত্রাও syllable-এর প্রতিশব্দ নহে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন যে "অক্ষর"ই syllableএর প্রতিশব্দ। কিন্তু তাঁহার মতও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। যুক্ত, অযুক্ত এবং হসন্ত বর্ণকেই অক্ষর বলে। "হঠাৎ" এই শব্দটায় তিনটি অক্ষর আছে, কিন্তু উহাতে syllable মোটে দুইটি। "ভৎ'সনা" শব্দে চারিটি অক্ষর আছে, কিন্তু উহাতে তিনটি মাত্র syllable আছে। একটা স্বরের সাহায্যে একটানে যত অক্ষর উচ্চারণ করা যায় তাহাকেই syllable বলে। সুতরাং সাধারণতঃ "স্বর"ই syllable শব্দের প্রতিশব্দ। "অনুষ্টুপ্‌ ছন্দের প্রত্যেক চরণে আটটি

স্বর বা syllable লাগে" ইহা বলিলে ভুল হয় না। অন্য পক্ষে "পয়ারের প্রতিচরণে চৌদ্দটি syllable বা স্বর লাগে" একথা প্রকৃত নহে, যেহেতু পয়ারে চৌদ্দটি অক্ষর মাত্র লাগে এবং সেই চৌদ্দটি অক্ষরের প্রত্যেকটা syllable হইতেও পারে, না হইতেও পারে। "ডাক্ হাঁক্ ঢাক্ ঢোল্ মাল্ সাট্ সার্" ইহা পয়ারের চৌদ্দ-অক্ষর-বিশিষ্ট একটি চরণ, অথচ ইহাতে সাতটি মাত্র syllable বা স্বর আছে। যদি এই শব্দগুলিকে স্বরান্ত করিয়া পড়া যায় তাহা হইলে উক্ত চরণের পাঠ হয় "ডাক হাঁক ঢাক ঢোল মাল সাট সার।" ইহাতে স্বর বা syllableও চৌদ্দটি, অক্ষরও চৌদ্দটি। এই-সমস্ত আলোচনা করিলে বোধ হয় যে "স্বর"ই syllableএর প্রতিশব্দ।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

অবৈদিক পন্থা।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিতেছেন, সেগুলি লইয়া অনেক আলোচনা ও বিচার হইতেছে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। আমাদের বিচারপদ্ধতি যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে অনেক আলোচনা এবং অনুসন্ধান পণ্ড হইতে পারে। খাঁটি বৈদিক মূল হইতে উৎপন্ন না হইলেই যে জিনিসটি অনার্য্য-সৃষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, অথবা আর্য্যেরা প্রাচীনকালে যাহা কিছু গড়িয়াছিলেন তাহার সকলগুলির উপাদানই বেদ হইতে সংগৃহীত, অথবা আর্য্যেরা অনার্য্যদের কোন মতবাদই গ্রহণ করেন নাই, এ-সকল কথা কদাপি বলা চলে না। এ বিষয়ে এই পত্রের কার্ত্তিকের সংখ্যায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। আর্য্য এবং অনার্য্য লইয়াই এই ভারতবর্ষ এবং তাহার ইতিহাস, একথা যেন ভুলিয়া না যাই।

"বেদপন্থী"দের সকল মতবাদই যে "বৈদিক" এ কথা বলা দুঃসাহসিকতার কর্ম্ম। নাম মাত্রে বেদের ধূয়াটুকু ধরিয়া এবং প্রকৃতপক্ষে বৈদিক পন্থা ভুলিয়া গিয়া অথবা ছাড়িয়া দিয়া সেকালে এবং একালে এ দেশের লোকেরা আপনাদিগকে বেদপন্থী বলিয়া পরিচয় দিতে ভুলে নাই। কাজেই সর্ব্বত্র বেদপন্থীর নাম করিলেই বৈদিক মতবাদের দোহাই দেওয়া হয় না। কোন মতবাদ এবং অনুষ্ঠান যদি খাঁটি বেদসংহিতায় পাওয়া না যায় এবং সেগুলিকে যদি বেদব্যাখ্যার গ্রন্থে অথবা বৈদিক-অনুষ্ঠান-সংগ্রহের গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই শেষোক্ত গ্রন্থগুলির বয়স ঠিক করিয়া লইতে হয়। অমুক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে মহাবীর বা বুদ্ধদেব অমুক অমুক কথা অমুকের নিকট হইতে ধার করিয়াছিলেন, এরূপ কথা বলিলে কোন বিচার হয় না; কারণ, নানা পণ্ডিতের বিরুদ্ধবাদও উপস্থাপিত হইতে পারে। স্বয়ং পণ্ডিত হরপ্রসাদকেই অনেক ইয়াকোবি (Jacobi)র বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে পারা যায়।

বিশেষ পুণ্য উপনিষদ্ দশখানি এবং গৃহ্যসূত্রগুলি কপিল, মহাবীর এবং বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত করিতে না পারিলে কপিলাদিকে বৈদিক পন্থানুসারী বলা চলে না। চরণব্যূহাদিতে স্বীকৃত হইয়াছে যে আপস্তম্ব হিরণ্যকেশী এবং খাদির গৃহ্যসূত্র দক্ষিণাপথের আর্য্য বা ব্রাহ্মণদিগের জন্য রচিত হইয়াছে। এ কথা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে ঐ গৃহ্যসূত্রগুলি অশোকের সময়ের পূর্ব্বকালে রচিত হয় নাই। স্বয়ং আপস্তম্ব তাঁহার গৃহ্যসূত্রে লিখিয়াছেন যে, গৃহ্যসূত্রকারেরা কেহই ঋষি নহেন; কারণ তাঁহারা অবরযুগে অর্থাৎ অর্ব্বাচীনকালে অথবা "হীন" কলিকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং যে-সকল বৈদিক অনুষ্ঠান সমাজে চলিয়া আসিতেছিল, তাহাই গুছাইয়া লইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গৃহ্যসূত্রে আছে, যে, বিবাহের সময়ে কন্যা যে-স্বামী লাভ করেন, কেবল তাঁহারই সহিত কন্যার বিবাহ হয় না,—কন্যাকে স্বামীরূপে শ্বশুরকুলের সহিত বিবাহিত হইতে হয়, এবং সেইজন্যই স্বামীর মৃত্যুর পর, স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ ঐ কন্যাতে সন্তান উৎপাদন করেন। কিন্তু এই প্রথা এই "হীনযুগে" চলিতে পারে না। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে গৌতম এবং বৌধায়ন প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকৃত হয়। এ বিচার নির্ভুল হউক আর না-ই হউক, ঐ গৃহ্যসূত্রগুলিতে যে কথঞ্চিৎ অবৈদিক প্রভাব আছে, এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। খাঁটি বৈদিক অনুষ্ঠান প্রাচীনকাল হইতে ঠিক যেরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, কেবল তাহাই যদি নিঃসন্দেহে বৌধায়ন লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে হয়ত কথা উঠিত না; কিন্তু তিনি যখন অন্যবিধ মতবাদের উল্লেখ ও বিচার করিতে ছাড়েন নাই, তখন তাঁহার গ্রন্থকে অবিকৃত বৈদিক-পদ্ধতি-সংগ্রহ বলিতে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইতে হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের একাদশ কাণ্ডিকায় লিখিয়াছেন যে, অমুক মতকে কেহ কেহ মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু উহা যখন অসুর বংশের কপিলের মত, তখন উহা অগ্রাহ্য। সমাজে অসুর বংশের মত যে চলিতেছিল, এবং উহা লইয়া যে বৈদিক গ্রন্থে বিচারও হইতেছিল ইহা নিঃসন্দেহ। কপিলকে এখানে প্রহ্লাদের পুত্র বলিয়া পাই; দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ আর্য্যদলে মিশিয়াছিলেন বলিয়াই পৌরাণিক গল্পে সূচিত হয়; কিন্তু এখানে তিনি অসুর বলিয়া অন্ততঃ বৌধায়নের অবজ্ঞার পাত্র। গৌতমের গৃহ্যসূত্রে খাঁটি বৈদিক যতি শব্দ অথবা অল্প পরবর্ত্তী সময়ের সন্ন্যাসী শব্দ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত ভাষার ভিক্ষু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গৃহ্যসূত্রের মত গ্রন্থে প্রাকৃত বা অপভ্রংশ শব্দ ব্যবহার যে নিতান্ত দুর্ব্যবহার, তাহা প্রাচীনকালের ব্যাকরণের বিধি নিষেধের ব্যবস্থা হইতে বুঝিতে পারি। মূলতঃ যে যতির নাম ভিক্ষু হইয়াছিল, সে যদি বৈদিক প্রথার গৃহত্যাগী যতি হইত, তবে কদাচ তাহার নামের পরিচয়ে পবিত্র ভাষার শব্দের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত ভাষার শব্দের ব্যবহার হইতে পারিত না। প্রমাণের নামে এই ক্ষুদ্র দুইটি কথা তুলিয়াই গৃহ্যসূত্র দুইখানির সময় নির্ণয় করিতেছি না; এ বিষয়ে যে সাবধানতার প্রয়োজন এবং সময় নির্ণয় না করিলে যে পূর্ব্বাপরবর্ত্তিতার কথা উত্থাপিত হইতেই পারে না, তাহাই আমার বক্তব্য।

ঋগ্বেদ সংহিতাতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের আহার পান প্রভৃতির এবং সাংসারিক কার্য্যানুষ্ঠানের যে-সকল কথা সূচিত হয়, গৃহ্যসূত্রগুলির ব্যবস্থা কি ঠিক তাহার অনুরূপ? মিথ্যা কথা কহিতে নাই, কিম্বা কোনরূপ এমন অত্যাচার করিতে নাই যাহাতে শরীরমনের অনিষ্ট হয়, এ-সকল কথা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে প্রচলিত ছিল এবং আছেও; কাজেই ঐ-সকল কথার এক-একটা দৃষ্টান্ত তুলিয়া একটি বিশেষ নীতিমার্গের প্রবর্ত্তকের প্রবর্ত্তককে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রাচীন পন্থার অনুযায়ী বলা যাইতে পারে না। চরিত্রের উন্নতিবিধানের জন্য যেখানে একজন মহাপুরুষ বিশেষ একটি সাধনার পথ বাহির করিলেন এবং সেই সাধনার উপযোগী কতকগুলি আচারকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সংখ্যাক্রমে পঞ্চশীলাদির ব্যবস্থা করিলেন, সেখানে সেই সাধনার ক্রম এবং পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়াই মতবাদের উৎপত্তির প্রাচীনতা বা নবীনতা স্থির করিতে হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম এই দেশের লোক-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত; কাজেই সেই ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যায় এই দেশের প্রচলিত শব্দকোষ হইতে শব্দ লইয়া ব্যবহার করিতে হইয়াছে; এস্থলে একটি শব্দ দেখিয়া ভাবের উৎপত্তির কথা নির্ণীত হইতে পারে না।

ভগবান বুদ্ধদেব, তাঁহার সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ৬১টি বিভিন্ন মোক্ষবাদ-ঘটিত দর্শনতত্ত্বের বিচার করিয়াছিলেন বলিয়া নিকায়ে উল্লিখিত আছে। ঐগুলি দেখিলে কতকটা বুঝিতে পারা যায় যে, এখন যে-সকল সূত্রগ্রথিত দর্শনশাস্ত্রগুলি পাওয়া যায় তাহা বুদ্ধদেবের সময়ের

পরবর্ত্তীকালে রচিত। তবে কেহ বলিতে পারেন যে, বুদ্ধদেব তাঁহার সময়ের প্রচলিত উপনিষদ বা দার্শনিক তত্ত্বসমূহ অবগত ছিলেন না। মহাপুরুষ সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহাতে কিন্তু এ কথায় বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন করাও দুঃসাধ্য।

অনার্য্য-সমাজ হইতে যে আমাদের অনেক বিশ্বাসের বস্তু আসিয়াছে এবং মঙ্গোল জাতির প্রভাবও আর্য্য-জাতির উপর পড়িয়াছিল বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আছে, সে কথা প্রবাসীপত্রের কার্ত্তিক-সংখ্যায় লিখিয়াছি। রক্তমিশ্রণের কথা তখনও তুলি নাই, এখনও বলিব না; এ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইলে দুই চারিটি শাস্ত্রবচন তুলিলে কিছুই হইবে না, রিজলী সাহেবের মাপকাঠির সমালোচনা করিলেও চলিবে না,—কারণ, নৃ-তত্ত্বের বিচার করিতে হইলে, জীবন-বিজ্ঞানের আলোকে গভীর অনুসন্ধান করিতে হয়। খাঁটি আর্য্য ঠিক কিরূপ ছিলেন, কেহই জানে না; তবে আমরা যে তথা-কথিত বৈদিক যুগের সময় হইতেই বহুজাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া আসিয়াছি, তাহার প্রমাণ বড় দুষ্প্রাপ্য নহে। একটা কাল্পনিক গৌরবের মোহে যাহাতে যথার্থ তথ্য অনুসন্ধান করিতে কুণ্ঠিত না হই, তাহাই একবার বলিবার জন্য এবং প্রশান্ত মনে সকলে যাহাতে আলোচনার পথে অগ্রসর হয়েন সেই জন্যই এই আলোচনাটির অবতারণা করিলাম।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বিচিত্র বিবাহ

এই প্রবন্ধে আমি বিবাহের বিষয় অবতারণা করিব, আশা করি ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না, কারণ বিবাহে নূতনত্ব কিছু না থাকিলেও বিবাহ এরূপ "দিল্লীর লাড্ডু" যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, যে যে-কারণেই হউক, বিবাহের নামে প্রায় সকলেই উৎফুল্ল। তবে আমি অবশ্য সনাতন বিবাহের গল্প বা ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট আট প্রকার বিবাহের কথা বলিব না। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তবে এ আবার কি প্রকার বিবাহ! তাঁহাদের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য বলিতেছি, এই বিবাহ আসল নহে, নকল। নকল আজকালের জিনিষ নহে, উহা চিরকালই আছে, তবে আজকাল কিছু বেশী-বেশী, পূর্ব্বে কিছু কম ছিল। বিবাহব্যাপারটি জীবের অস্তিত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট, বহু পুরাতন, সুতরাং ইহাতেও নকল জুটিবে বিচিত্র কি? এই-সকল নকল বিবাহের একটা উদাহরণ দিলেই আপনারা কতক বুঝিতে পারিবেন। শুনিয়াছি (সত্য মিথ্যা জানি না) কলিকাতার খুব নাম-জাদা একজন সাহেব অধ্যাপককে (তিনি এখনও জীবিত আছেন) কেহ তাঁহার বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "আমার বইএর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে" (I am wedded to my books)। তিনি পুস্তক-বিবাহের উপযুক্ত লোকই বটে, কিন্তু তাঁহার এই পুস্তক-বিবাহ ঠিক নকল বিবাহ নহে, কারণ তিনি সত্য-সত্যই বিবাহের রীতি-অনুসারে পুস্তকের সহিত বিবাহিত হন নাই, যদি তাহা হইতেন তাহা হইলে উহা পুরা নকল বিবাহ হইত। আমার বর্ণিত বিবাহ মানব-সমাজে প্রচলিত এইরূপ বিচিত্র বিবাহ।

উদ্ভিদের সহিত বিবাহ।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে প্রথা আছে, বোধ হয় অনেকেই জানেন, যে, যদি কোন লোকের দুইবার স্ত্রীবিয়োগ হয় এবং সে যদি তৃতীয় বার দারপরিগ্রহের ইচ্ছা করে, তাহা হইলে অগ্রে কোন একটি ফুলগাছের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া পরে নির্দ্ধারিতা কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। এরূপ পুষ্পবৃক্ষের সহিত বিবাহ দিবার কারণ যাহার দুইবার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে তাহার "বার বার তিন বার" সূত্র-অনুসারে তৃতীয়বারও স্ত্রীনাশের সম্ভাবনা। সুতরাং বৃক্ষ তৃতীয় পত্নী হইল, মরে ত সেই মরিবে, চতুর্থের ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

পঞ্জাবপ্রদেশে কাহারও শাস্ত্রমতে তৃতীয় বার বিবাহ হইতে পারে না। সুতরাং যদি কাহারও তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অগ্রে তাহাকে আখ-গাছ বা বাবলা গাছ বিবাহ করিতে হয়। তাহার পর নারীর সহিত বিবাহ হইতে পারে। কারণ ঐ বৃক্ষ কন্যা হইয়া তৃতীয়বার বিবাহের দোষ খণ্ডন করিয়া দিল। *

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যদি উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহারও পত্নীবিয়োগ বা অন্য কোন কারণ বশতঃ তৃতীয় বার বিবাহ করিতে হয়, তবে পুরোহিত অগ্রে তাহাকে একটি ইক্ষুক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তথায় ইক্ষুবৃক্ষের সহিত তাহার যথাশাস্ত্র বিবাহ দেন। পরে সে স্থিরীকৃতা কন্যার পাণিগ্রহণ করে।

সেইরূপ আবার হিমালয়প্রদেশস্থ পার্ব্বত্য জাতিদিগের কাহারও তৃতীয়বার বিবাহের বাসনা হইলে তাহাকেও

---

* Crooke—Folk-lore of Northern India. Vol II, chap. II.

অগ্রে আম গাছ বিবাহ করিতে হয়। উক্ত বিবাহের এইরূপ নিয়ম। কোন একটি আম্রবৃক্ষের নিকট একটি বেদী নির্ম্মাণ করা হয়, অথবা বেদীর নিকট আম গাছ আনিয়া বসান হয়। তৎপরে সাধারণতঃ যেরূপ রীতি-অনুসারে বিবাহ হয়, ঐ বৃক্ষের সহিতও ঠিক সেইরূপ ভাবে লোকটির বিবাহ দেওয়া হয়। তাহার পর বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঐ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে একগাছি মঙ্গলসূত্র দশবার জড়ান হয়। বৃক্ষটি চারি দিবস এইরূপ অবস্থায় থাকে। পঞ্চম দিবসে এই বৃক্ষবিবাহের অবসান হয় ও লোকটি তখন যাহাকে ইচ্ছা পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারে।

মান্দ্রাজপ্রদেশে এক জাতির মধ্যে কোন লোকের প্রথম পত্নীবিয়োগান্তে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইলে তাহাকে প্রথমে একটি কলাগাছ বিবাহ করিতে হয়। *

আমাদের দেশের কোন কোন নীচ জাতি বিবাহের পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে আম্রবৃক্ষের সহিত পরিণীত হইয়া থাকে। মুণ্ডারি কোলগণ বিবাহের গাত্রহরিদ্রার পর পাত্রকে একটি আমগাছের সঙ্গে ও পাত্রীকে একটি মহুয়া (মৌয়া) গাছের সঙ্গে বা তাহার অভাবে আমগাছের সঙ্গে বিবাহ দিয়া থাকে। এই বিবাহের পর বরকন্যা বৃক্ষ দুইটিকে জড়াইয়া ধরে ও তাহাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য বৃক্ষ দুইটির সহিত বন্ধন করিয়া রাখা হয়। তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া বর কন্যাকে বিবাহ করে। পশ্চিম অঞ্চলের কূর্ম্মিদিগের বিবাহপ্রথাও প্রায় এইরূপ। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে বরকে একটি আম্রবৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়া একটি মঙ্গল-সূত্র দ্বারা তাহাকে ঐ বৃক্ষটির সহিত বন্ধন করিয়া রাখা হয় এবং বর তাহার বৃক্ষ-বধূকে সিন্দূর পরাইয়া দেয়। কন্যাটিও ঠিক ঐরূপ ভাবেই একটি মহুয়া বৃক্ষের সহিত বদ্ধ থাকে। তাহার পর কিছুক্ষণ পরে তাহাদের বন্ধন মোচন করিয়া আম্রবৃক্ষের একটি পল্লব ঐ সূত্র দ্বারা কন্যার হস্তে ও মহুয়া-বৃক্ষের পল্লব বরের হস্তে বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর বর-কন্যার বিবাহ হয়। এই-সকল জাতির ধারণা, অগ্রে বৃক্ষের সহিত বিবাহ না হইলে কোন বিবাহই মঙ্গলজনক হয় না।

পঞ্জাবপ্রদেশে ধনী লোকদিগের সন্তানাদি না হইলে তাহারা বাড়ীতে অতি যত্নসহকারে একটি তুলসীবৃক্ষ রোপণ করে। তুলসীগাছটি বড় হইলে উহাকে বিবাহের যথাযথ রীতি-অনুসারে একটি ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেয় ও ব্রাহ্মণ তদবধি তাহাদের জামাতা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। †

যবদ্বীপে তালরসের জন্য তালগাছ কাটিবার পূর্ব্বে লোকটি অগ্রে তালবৃক্ষটির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার পর বৃক্ষটিতে ছিদ্র করে। কারণ বিবাহিত তালবৃক্ষের সে তখন ভর্ত্তা, সুতরাং তাহার উপর লোকটির তখন সম্পূর্ণ অধিকার!

কাঙড়া জেলায় যদি কন্যার অভিভাবকগণ তাঁহাদের কন্যার জন্য কোন পাত্র স্থির করেন কিন্তু কন্যার ঐ পাত্রকে বিবাহ না করিয়া তাহার নিজের মনোনীত কোন লোককে বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কন্যা নিজ প্রিয়-পাত্রের সহিত অরণ্যে পলায়ন করে। বনে গিয়া একটি বৃক্ষের নীচে অগ্নি জ্বালিয়া প্রিয়পাত্রের সম্মুখে ঐ বৃক্ষটিকে বিবাহ করে। ইহাতে পূর্ব্বের বিবাহ-সম্বন্ধ বন্ধ হইয়া যায় ও কন্যার বৃক্ষ-বিবাহ অনুমোদিত হওয়ায় সে তখন প্রিয়-পাত্রকে বিবাহ করিতে পারে।

আমাদের বাঙ্গালাদেশে কোন কোন জাতি যৌবনের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া এতই আবশ্যক মনে করে, যে, যৌবনের পূর্ব্বে বিবাহের পাত্র না জুটিলে কন্যাকে যথা-বিহিতভাবে একটি কলাগাছের সহিত বিবাহ দিয়া রাখে।

গুজরাটে এক জাতি আছে যাহাদের কন্যাদিগের বিবাহে কোন কারণে যদি কোন অন্তরায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা কন্যার একটি আম্রবৃক্ষের বা অন্য কোন ফলবান্ বৃক্ষের সহিত বিবাহ দেয়। ঐ জাতির মধ্যেই আবার কোন কোন সম্প্রদায় বিবাহযোগ্যা কন্যার পাত্র সন্ধান করিতে না পারিলে একটি ফুলের তোড়ার সহিত মনুষ্য বিবাহের নিয়ম-অনুসারে কন্যার বিবাহ দেয়। 'মিলনযামিনী গত হইলে, শুকান ফুলদল' কূপে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কন্যাও বিধবা হয়। তাহার পর বিধবা কন্যার

* Risley—Tribes and Castes, ii.

† Crooke—The Religion and Folk-lore of Northern India, Vol II, chapter II.

বিবাহ যখন-তখন দেওয়া চলিতে পারে। ইহার জন্য পরাশরসংহিতার বচন খুঁজিবার প্রয়োজন হয় না।

অযোধ্যা প্রদেশে পাত্রপাত্রীর গ্রহ-নক্ষত্রাদির অসামঞ্জস্য হইলেও যদি ঐ বিবাহ একান্ত বাঞ্ছনীয় হয় তাহা হইলে অগ্রে একটি অশ্বত্থবৃক্ষের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়। এই অশ্বত্থবৃক্ষ-বিবাহে 'গ্রহের ফের' কাটিয়া গেলে বরকন্যার বিবাহ হইতে পারে।

নেপালে নেওয়ার জাতি তাহাদের কন্যাদিগের বাল্যাবস্থায় একটি বিল্বফলের সহিত বিবাহ দেয় এবং বিবাহান্তে বিল্বফলটিকে নদীর জলে নিক্ষেপ করে। এই বিল্বফলের সহিত বিবাহই তাহাদের আসল বিবাহ। তাহার পর কন্যার যৌবনপ্রাপ্তিতে তাহারা কন্যার একটি মনুষ্যস্বামী মিলাইয়া দেয়। এই মনুষ্যস্বামীর লোকান্তর হইলে কন্যা পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারে বা মনুষ্যস্বামীর গৃহে তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হইলে সে এই স্বামীর মাথার বালিসের নীচে একটি সুপারি রাখিয়া স্বামীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনপূর্ব্বক অন্যপুরুষকে পতিত্বে গ্রহণ করিতে পারে, কারণ নেওয়ার স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃত স্বামী বিল্বফল, উহা অবিনশ্বর, বৃক্ষ অন্বেষণ করিলেই পাওয়া যায়। সুতরাং নেওয়ার কন্যাগণ কখনও বিধবা হয় না, অন্য স্বামী তাহাদের পুত্রার্থে বা ভরণার্থে আবশ্যক। সুতরাং কর্ম্মচারার ন্যায় একজনের সঙ্গে না পোষাইলে তাহাকে অনায়াসেই জবাব দেওয়া চলে! *

গোয়া ও গুজরাটপ্রদেশে বারাঙ্গনা-কন্যাদিগের পুষ্পবৃক্ষের সহিত বিবাহ হয়। এই বিবাহের জন্য বাটীতে পুষ্পবৃক্ষ রোপিত হয়। কন্যাগণ বিবাহের পর তাহাদের বৃক্ষস্বামীকে জলসেচন ও যত্ন করিয়া থাকে এবং বৃক্ষটি মরিয়া গেলে অশৌচ গ্রহণ করে।

সার্ভিয়ায় কন্যার আপেলবৃক্ষের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। কন্যাকে সজ্জিত করিয়া মাথায় ওড়না দিয়া আপেলবৃক্ষের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। বৃক্ষতলে জলপূর্ণ একটি কলস রক্ষিত থাকে। ঐ কলসের মধ্যে মুদ্রা নিক্ষেপ করার পর ওড়নাখানি কন্যার মস্তক হইতে খুলিয়া লইয়া উহা ঐ বৃক্ষে বন্ধন করা হয়। কন্যা তৎপরে পদদ্বারা কলস ফেলিয়া দিয়া নৃত্য করিতে করিতে বৃক্ষটিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিলে বিবাহ সমাধা হয়। †

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, রুষিয়া প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় দেশসমূহে মে, হুইট্‌সান্‌টাইড, মিড সামার প্রভৃতি উৎসব-উপলক্ষে ছেলেমেয়েদের মে-রাণী (May-bride, May-Queen, May-King, Whitsuntide-bridegroom and bride, Grass-King) প্রভৃতি সাজান হয়। এই উৎসবগুলিতে ফুলের ছড়াছড়ি ও মে-দণ্ড, মে-বৃক্ষ প্রভৃতিও থাকে। এগুলিতে এখন বিবাহের বরকন্যা ব্যতীত আর বিশেষ কিছু থাকে না বটে কিন্তু সম্ভবতঃ এই উৎসবগুলি ইয়ুরোপের পুরাকালের বৃক্ষ-বিবাহের শেষ নিদর্শন।

(২) দেবতার সহিত বিবাহ।

এই বিচিত্র বিবাহ যে কেবল বৃক্ষের সহিতই হয় এরূপ নহে, দেবতাদিগের সহিতও হইয়া থাকে। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে আমাদের দেশের ধারণা যে বিবাহ না হইলে স্ত্রীলোকদিগের কায়া শুদ্ধ হয় না। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কন্যার সুপাত্র অনেক সময়ই মিলিত না, সুতরাং তাহাদিগকে অবিবাহিতা থাকিতে হইত। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যার দেহ অপবিত্র থাকিয়া যাইবে ইহা কখনই হইতে পারে না, সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে অবিবাহিতা কুলীন-কন্যাদিগের শালগ্রাম ঠাকুরের সহিত বা তৎপ্রতিনিধি তুলসীবৃক্ষের সহিত বিবাহ দেওয়া হইত। এখন অবশ্য আর এ প্রথা চলিত নাই।

আফ্রিকাদেশে আকাম্বা জাতির প্রত্যেক রমণীর দুইবার বিবাহ হয় ও দুইটি স্বামী থাকে। প্রথম বিবাহ হয় কন্যার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কাহারও স্বর্গগত আত্মার সহিত ও দ্বিতীয় বিবাহ হয় কোন পুরুষের সহিত। রমণী বিবাহের পর এই অশরীরী ও শরীরী দুই স্বামীরই ভজনা করেন ও সন্তানাদি না হইলে মনে প্রাণে অশরীরী পতির সেবা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সন্তানলাভের চেষ্টা করেন। দুই স্বামী থাকাতে মনুষ্যস্বামী পরলোক গমন করিলেও আকাম্বা স্ত্রীলোকগণ বিধবা হয়েন না। 'সতী কি কখন বিধবা হয়?' এই কবিবাক্য ইহাদিগের সম্বন্ধে সার্থক।

* Wright—History of Nepal,

† Frazer—Totemism and xogamy, Vol I. 33.

পূর্ব্বকালে ব্যাবিলোনিয়া দেশের প্রধান দেবতার নাম ছিল বেল্। এই বেল্‌দেবের অত্যুচ্চ মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে বেল্‌দেবের জন্য একখানি মণিখচিত মনোহর স্বর্ণ-পর্য্যঙ্ক থাকিত। ব্যাবিলোনিয়া দেশের স্ত্রীজাতির মধ্য হইতে বেল্‌দেবতা যাহাকে ইচ্ছা নিজ অঙ্কশায়িনীরূপে গ্রহণ করিতেন। এই রমণী এই শয্যার অর্দ্ধ-অধিকারিণী, যেহেতু তিনিই বেল্‌দেবের সহধর্ম্মিণী, তিনি এইখানেই জীবন অতিবাহিত করিতেন এবং অন্য কোন পুরুষের সহিত তাঁহার সম্পর্ক থাকিত না। ইহা আমাদের দেশের দেবদাসী হওয়ার প্রথার অনুরূপ।

আসিরিয়ার রাজধানী কালানগরে আসিরিয়ার দেবতা নাবুরও বেল্‌দেবতার ন্যায় মানবীভার্য্যা থাকিত ও প্রতি বৎসর একটি রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইত ও এই বিবাহব্যাপার দেশের একটি প্রধান উৎসব ছিল। *

মিসরেও তথাকার প্রধান দেবতা (Ammon) এমনের একটি করিয়া মানবীপত্নী থাকিত এবং তিনি এমনের মহিষীহিসাবে মন্দির-মধ্যে এমনের পার্শ্বে রাত্রি যাপন করিতেন, এবং তাঁহারও দেবতা ভিন্ন অন্য কোন মানবের সহিত বিবাহসম্পর্ক থাকিতে পাইত না। কিন্তু মিসর-সম্রাট্ স্বয়ং এমন, তিনি মনুষ্য-দেহ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য অবস্থান করিতেন মাত্র, এইজন্য প্রায়ই স্বয়ং রাজ্ঞীই এমনের দেবীরূপে মন্দিরে যামিনী যাপন করিতেন। কিন্তু মিসরসাম্রাজ্যের শেষদশায় সেরূপ কোন প্রতাপশালী রাজা না থাকায় রাজ্ঞীর অভাবে এমনের পুরোহিতগণ তাঁহাদের নিজনির্ব্বাচিত কোন রমণীকে এমনের দেবীরূপে মন্দিরে প্রেরণ করিতেন। মিশর রোম কর্তৃক অধিকৃত হইলে মিসরদেশস্থ কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুরূপা কন্যাকে এমনদেবের পত্নীত্বে নিযুক্ত করা হইত। রাজ্ঞীদিগের পুত্র হইলে তিনি এমনই হইতেন, কারণ এমনের পুত্র এমনই হইয়া থাকেন—(আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ), কিন্তু মিসর রোম-কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পরে কেহ মিশরসম্রাট না থাকায় এমন-পত্নীদিগকে যৌবন-প্রাপ্তির পরেই বিদায় দেওয়া হইত, কারণ তাহার গর্ভে এমন জন্মগ্রহণ করিলে অনর্থের সম্ভাবনা। এমনের তখন আবার নূতন দেবী নির্ব্বাচিত হইত। †

গ্রীসদেশের আপলো প্রসিদ্ধ দেবতা। তিনি শীতকাল পাটারায় ও গ্রীষ্মকাল ডেলসে যাপন করিতেন। তাঁহার আদেশ মনুষ্যগণকে জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার একজন করিয়া স্ত্রীপুরোহিত থাকিত। শীতকালে যখন তিনি পাটারায় থাকিতেন তখন তাঁহার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত এই রমণীকে প্রতিরাত্রে তাঁহার মন্দির-মধ্যে তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে হইত। আবার গ্রীসের ইফসাস্ নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম আর্টেমিস্। তিনি গ্রীসের লক্ষ্মী, সুতরাং তাঁহার নারায়ণ আবশ্যক। এজন্য তাঁহার পুরোহিতগণ তাঁহাদের কার্য্যকালের মধ্যে কোন কামিনীর পাণিগ্রহণ করিতে পাইতেন না ও প্রতিরাত্রে তাঁহারা আর্টেমিস্ লক্ষ্মীর 'নর-নারায়ণ' হইয়া তাঁহার নিকট শয়ন করিয়া থাকিতেন।

দেশের গতি ভালই হউক বা মন্দই হউক সুরাপানে অনেকেরই গতি জন্মে। আমাদের দেশের লোকেরা তথা দেবতারা পুরাকালে সোমরস-পানে আসক্ত ছিলেন। গ্রীস-দেশবাসীগণও এতাদৃশ দ্রাক্ষারস-প্রিয় ছিলেন যে এথেন্স নগরে ডায়োনিসাস্ নামে এক দ্রাক্ষার দেবতাই ছিলেন। প্রচুর পরিমাণে দ্রাক্ষা জন্মাইবার জন্য প্রতিবৎসর এই ডায়োনিসাস্ দেবের এথেন্সের রাণীর সহিত মহাসমারোহে শুভ-পরিণয় হইত।

গ্রীসের দেবতাদিগের পিতার নাম জিয়ুস্, তিনি গ্রীসের বজ্রপাণি ইন্দ্র। ইফসাস্ নগরে আর্টেমিস্ নামে যেমন একটি লক্ষ্মী ছিলেন, তেমনি ইলিউসিস্ নগরে ডিমিটার নাম্নী একটি লক্ষ্মী দেবী ছিলেন। জিয়ুসের একজন পুরোহিত থাকিতেন ও ডিমিটারের পূজা স্ত্রীলোকের দ্বারাই সম্পন্ন হইত। প্রতি-বৎসর দেশের সমৃদ্ধিকল্পে জিয়ুসের সহিত ডিমিটারের বিবাহ হইত। জিয়ুসের পুরুষপুরোহিত মহাশয় জিয়ুস্ দেবের প্রতিনিধি হইতেন ও ডিমিটারের স্ত্রীপুরোহিত ডিমিটারের প্রতিনিধি হইতেন। এই পুরুষপুরোহিত ও স্ত্রীপুরোহিতে বিবাহ হইত। প্রতি বৎসর যে একই লোক পুরুষপুরোহিত বা স্ত্রীপুরোহিত থাকিতেন এমন নহে।

* Jastrow—Religion of Babylonia and Assyria, 117.

† Breasted—A History of the Ancient Egyptians.

সুইডেন্ অত্যন্ত শীত-প্রধান দেশ, শস্যাদি ভাল জন্মে না। এজন্য সুইডেনবাসীগণ তাহাদের দেশের মনুষ্য ও উদ্ভিদের সৃষ্টিকর্ত্তা ফ্রেদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া শস্যাদি লাভের নিমিত্ত প্রতিবৎসর তাঁহার বিবাহ দিত। ফ্রে দেবতা বটেন, কিন্তু তাঁহার মানবীভার্য্যা আবশ্যক হইত। একটি পরমরূপলাবণ্যবতী যুবতী তাঁহার পত্নী হইতেন। প্রতি বৎসর এই দেবদেবীর পরিণয় মহোৎসবের সহিত সম্পন্ন হইত ও বিবাহান্তে ঐ যুবতী আপ্‌সালা নগরে ফ্রের প্রসিদ্ধ মন্দিরে তাঁহার পত্নীরূপে অবস্থান করিতেন। এই দেব-দেবীর বিবাহ একবার অতি চমৎকার হইয়াছিল। গানার হেল্‌মিং নামক নরওয়ে-দেশবাসী একটি লোক কোন কারণবশতঃ কিছুকালের জন্য দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হয়। সে নরওয়ে পরিত্যাগ করিয়া সুইডেনের আপসালা নগরে আসিয়া দেখে যে ফ্রেদেবের একটি সুন্দরী যুবতীর সহিত বিবাহ-উৎসব হইতেছে। সে দেবতা সাজিয়া সমবেত লোকসকলকে বলিল যে তিনিই ভগবান্ ফ্রেদেব, আপসালার অধিবাসীবৃন্দের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া এবার সশরীরে উপস্থিত হইয়াছেন। কপটতাশূন্য লোকেরা তাহার বাক্‌চাতুরীতে বিশ্বাস করিয়া ফ্রেদেবের কাষ্ঠমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে জীবন্ত ফ্রেদেব ও তাঁহার নববধূকে রথে বসাইয়া নগরমধ্যে তাঁহাদের শোভাযাত্রা সমাধা করিল। তৎপরে ফ্রেদেব মনুষ্যের ন্যায় তাহাদের সহিত কথা-বার্ত্তা বলিতেছেন ও আহারবিহার করিতেছেন দেখিয়া তাহারা আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল, তাহারা বুঝিল এতদিনে তাহাদের পাপ কাটিয়াছে, ঠাকুর ধরা দিয়াছেন! তাহার পর দুই চারি মাস পরে দেবীর সন্তান-সম্ভাবনা দেখিয়া তাহাদের আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইল ও ভাগ্য-ক্রমে সেই বৎসর প্রভূত পরিমাণে শস্য-উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা ভাবিল ভগবান্ যখন স্বয়ং মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাদের কৃপা করিয়াছেন, তখন আর কিছুরই অসম্ভাব থাকিবে না, পৃথিবীই স্বর্গ হইবে। দেশবিদেশ হইতে ফ্রেদম্পতির পূজার জন্য অর্থ অলঙ্কার প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য আসিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে একদিন তাহারা মন্দিরে পূজা দিতে গিয়া দেখিল দেবদেবী উভয়েই অর্থ অলঙ্কারাদি লইয়া অন্তর্ধান করিয়াছেন। বহুবিলম্বে তাহাদের চট্‌কা ভাঙ্গিলে দেবদেবীকে ধরিবার জন্য লোক ছুটিল। কিন্তু তখন আর ধরে কে? তখন যে বিজয়া শেষ হইয়াছে ও দেব দেবীকে লইয়া দক্ষপুরীকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া নরওয়ে-কৈলাসে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছেন। তাহাদের দুঃখ করা সঙ্গত হয় নাই, কারণ "দেবগণের মর্ত্তে আগমন" ক্ষণকালের নিমিত্ত মাত্র ইহা তাহাদের বুঝা উচিত ছিল। *

ফ্রিজিয়া দেশের দেবমাতার নাম ছিল সিবিল। তিনি সুইডেনের ফ্রেদেবের ন্যায় সৃষ্টিকর্ত্রী ও কমলা। ফ্রে-দেবের যেরূপ মানবীভার্য্যা আবশ্যক হইত, সিবিল দেবীরও সেইরূপ মনুষ্যভর্ত্তা আবশ্যক হইত। প্রতিবৎসর একজন করিয়া খোজার সঙ্গে সিবিল দেবীর শুভ পরিণয় হইত। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফরাসিদেশেও সিবিল-পরিণয়ের ন্যায় এক দেবীর মানবের সহিত পরিণয় হইত। রুষের অসভ্য কৃষকদিগের মধ্যে অনেকস্থলে দেবীর এইরূপ মনুষ্য-বিবাহ এখনও প্রচলিত আছে।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুরাজ্যে অনেক আদিম অসভ্য জাতি আছে। তথাকার কোন এক গ্রামে গ্রামবাসীদিগের একটি মনুষ্যাকৃতি প্রস্তরময় দেবতা আছে। তাহারা একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া সুন্দরী বালিকাকে তাহাদের ঐ দেবতার সহিত বিবাহ দেয়। বিবাহ নৃত্যগীত ও বিবিধ আমোদ-প্রমোদসহকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ বালিকাটি আর মনুষ্যকে বিবাহ করিতে পায় না ও গ্রামবাসীগণ তাহাকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকে।

উত্তর-আমেরিকার এক জাতীয় আদিম অধিবাসী সূর্য্যোপাসক ছিল। তাহারা প্রতিবৎসর বর্ষাকালে সূর্য্য-দেবের চন্দ্রমার সহিত বিবাহের উৎসব করিত। ঐ সময় সমস্ত লোক উপবাস করিয়া থাকিত এবং তাহাদের পুরোহিত মহাশয়ের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিত। সূর্য্য অবশ্য আকাশেই থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী চন্দ্রমার স্থান গগনের শশী পূরণ করিতে পারিতেন না। পুরো-হিত মহাশয় আকাশের চন্দ্রের পরিবর্ত্তে একটি চন্দ্রাননা রমণীকে চন্দ্রমা করিতেন। ঐ রমণী হয় কুমারী হইতেন

* Frazer—The Golden Bough, Vol II, chap XII.

অথবা একস্বামিকা হইতেন। কোন রমণী এই দুইটি সর্ত্তভঙ্গ করিয়া তাহা গোপন করিয়া যদি চন্দ্রমা হইতেন তবে উহা প্রকাশ পাইবামাত্র তাঁহাকে সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মরাজের সদনে প্রেরণ করা হইত। এই চন্দ্রাননা মানবচন্দ্রমা বিবাহান্তে সূর্য্য-মন্দিরে যামিনী যাপন করিতেন ও প্রাতঃ-কালে সূর্য্যের আদেশ পুরোহিত মহাশয়কে জ্ঞাপন করিয়া বৎসরান্তে অবসর গ্রহণ করিতেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের গুরগাঁও জেলায় বাসদোদা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রোৎসব হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ধিনওয়ার বালিকাগণ ঐ উৎসবের দেবতাদিগের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইত এবং তাহারা নাকি বৎসরের মধ্যেই দেবতা-দিগের সহিত স্বর্গে বাস করিবার নিমিত্ত ইহলোক ছাড়িয়া যাইত।

বিহারে শ্রাবণ মাসে অনেক নাগিনীর আবির্ভাব হয়। তাহারা আপনাদিগকে নাগপত্নী বলিয়া পরিচয় দিয়া আড়াই দিন ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় ও ভিক্ষালব্ধ সামগ্রীদ্বারা মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ ও গ্রামবাসীদিগকে বিতরণ করিয়া থাকে।

পশ্চিম আফ্রিকায় দেবতামাত্রেরই প্রায় মানবীভার্য্যা থাকে। দেশের শতকরা পঁচিশজন স্ত্রীলোক কোন-না-কোন দেবতার দেবী। প্রতি নগরে অন্ততঃ একটি করিয়া বালিকাদিগের নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবসেবা শিখিবার বিদ্যালয় আছে। শিক্ষা শেষ হইলে কন্যাগুলির দেবতা-দিগের সহিত বিবাহ হয় এবং বিবাহান্তে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির পর তাহারা সর্ব্বলোকে বিদ্যমান থাকে। তাহারা মনুষ্য-বিবাহ করিতে পায় না বটে কিন্তু দেবানুগ্রহে তাহাদের পুত্রকন্যার অভাব থাকে না। তাহাদের এই পুত্রকন্যাগুলি আধুনিক সমর-শিশুর (war babies) ন্যায় দেশের দেব-শিশু ও দেবতার খাস তালুকের প্রজা।

আমাদের দেশে দেবতাদিগের মনোরঞ্জনার্থে পুরীর জগন্নাথ দেব ও অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরে যে বহু-সংখ্যক দেবদাসী থাকে তাহার বিষয় বোধ হয় সকলেই জানেন, উহা আর বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক। এই দেবদাসীগণ দেবগণের মানবীভার্য্যা-স্বরূপ, তাহারা কখনও মনুষ্যকে বিবাহ করিতে পায় না।

স্থল-দেবতার ন্যায় পৃথিবীতে জল-দেবতারও অভাব নাই। অনেক স্থলে হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জলজন্তু জল-দেবতার জীবন্ত প্রতিনিধি। জল দেবতাদিগেরও অনেক সময়ই মনুষ্য বিবাহ নহিলে পরিতৃপ্তি হয় না। দেবতা দেবী হইলে তাঁহার মনুষ্যস্বামী ও দেব হইলে তাঁহার মানবীভার্য্যা আবশ্যক। এবং তাঁহাদের পূজকগণ যাঁহার যাহা আবশ্যক তাঁহাকে তাহা দিয়া পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে।

উত্তর ব্রহ্মদেশস্থ সান্‌রাজ্যে স্বয়ং টাং নামক একটি হ্রদে একটি প্রতাপশালী জলদেব আছেন। প্রতিবৎসর বৎসরের অষ্টম মাসে তাঁহার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার পূজা দেওয়া হইয়া থাকে এবং তিন বৎসর অন্তর তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য চারিটি সুন্দরী অবিবাহিতা যুবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হয়। অষ্টম মাসে রাজমন্ত্রীর আদেশে হ্কোন জাতির রমণীগণ স্বয়ং টাং হ্রদের তীরে সমবেত হয়েন ও তাঁহাদের মধ্য হইতে অনিন্দ্যসুন্দরী দশজন অবিবাহিতা রমণীকে বাছিয়া লওয়া হয় এবং এই দশজনের মধ্য হইতে চারিজনকে মনোনীত করা হয়। পূজার পর এই চারিজন কুমারীকে দেবতার সহিত পরিণীত করা হয়। পূজা ও বিবাহান্তে তাঁহাদিগকে মন্ত্রী মহাশয় রাজভবনে পাঠাইয়া দেন ও তাঁহারা রাজপ্রাসাদে দুই চারি যামিনী যাপন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বিবাহের সর্ত্ত তিন বৎসর মাত্র। তিন বৎসর গত হইলে কামিনী-গণ ইচ্ছানুরূপ পুনরায় বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতে পারেন।

আফ্রিকার ভিক্‌টোরিয়া ন্যান্‌জা হ্রদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোক-সকল ঐ হ্রদের দেবতাকে নৌকা-যাত্রার সময় অনর্থ ঘটান হইতে নিরস্ত রাখিবার নিমিত্ত দীর্ঘ নৌকাযাত্রার পূর্ব্বে কুমারীদিগের সহিত হ্রদস্থ দেবতার বিবাহ দিয়া থাকে। ঐ কুমারীগণ আর কখনও বিবাহ করিতে পায় না, কারণ তাহারা দেবতার বিবাহিতা পত্নী। এখন বোধ হয় এ প্রথা আর প্রচলিত নাই, কারণ তাহারা এখন খ্রীষ্টান।

ইংরেজ-অধিকৃত পূর্ব্ব-আফ্রিকার অকিকুযু জাতি নাগ উপাসক। তাহাদের দেবতার নাম নগই। কয়েক বৎসর

অন্তর এই নাগদেবের বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের পাত্রী যুবতী কুমারী। বিবাহের পূর্ব্বে নাগদেবের নদীতীরে বহুসংখ্যক পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হয় ও সেই কুটীরে ঐ নারী-দিগের সহিত নাগদেবের যথা-বিহিত বিবাহ হয়। যদি যুবতীগণ স্বেচ্ছায় ঐ কুটীরে গমন করিয়া নাগদেবকে পতিত্বে বরণ করিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে বল-পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। নাগদেবের দুই একটি দেবীতে মনস্তুষ্টি হয় না, তাঁহার একত্রে অনেকগুলি ভার্য্যা আবশ্যক হয়। এই নাগদেবের যে বংশবৃদ্ধি হইবে তাহার আর বিচিত্র কি! তাঁহার পুত্রকন্যাগণ নাগদেবের সন্তান নামে পরিচিত হইয়া থাকে, যেহেতু তাহাদের পিতা নাগ ও মাতা সাক্ষাৎ নাগিনী।

পূর্ব্বোক্ত জলদেবতাদিগের সহিত পরিণীত সুন্দরীগণ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্থলে থাকিয়াই জলদেবতার ঘর-সংসার করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেক স্থলে জলদেবতাদিগের সহিত উদ্বাহের ফলে উদ্বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পরই তাহাদিগকে জলদেবতার জলগৃহে প্রয়াণ করিতে হয়।

নীল নদ মিসর দেশের জীবন-স্বরূপ। নীল নদ না থাকিলে মিসর দেশ সাহারা মরুভূমির অংশ মাত্র হইয়া থাকিত। নীল নদ প্রতি বৎসর জলপ্লাবন দ্বারা মিসর দেশ উর্ব্বর করিয়া না দিলে শস্যাদি কিছুই হয় না। এজন্য নীল নদের প্লাবন একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রতি বৎসর জলপ্লাবনের প্রাক্কালে নীল নদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত মিসরবাসীগণ একটি অবিবাহিতা যুবতীকে সুন্দর বসনভূষণে ভূষিত করিয়া ঐ জল-দেবের সহিত বিবাহ দিত ও বিবাহান্তে তাহাকে স্বামীগৃহবাসের জন্য নীল নদের অতল জলে নিক্ষেপ করিত। মিসরে এখন আর এই নিষ্ঠুর বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই, মুসলমানগণ উহা বন্ধ করিয়া দেন।

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে এতাদৃশ কুম্ভীরের উৎপাত যে এমন কি কুম্ভীর কখন কখন সমুদ্র ও নদীতীরস্থ গ্রামে আসিয়া মানুষ ধরিয়া লইয়া যায়। এ কারণে তিমর দ্বীপবাসীগণ কুম্ভীরকে দুর্দ্দান্ত দেবতা বলিয়া জানে ও তাহাদের রাজা কুম্ভীর-বংশসম্ভূত বলিয়া খ্যাত। সুতরাং কুম্ভীর-দেবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য নূতন রাজার রাজ্যাভিষেকের সময় অগ্রে কুম্ভীর-পূজা হইত। কুম্ভীর-দেব কোন কামিনীকে ভার্য্যাস্বরূপ পাইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, এজন্য পূজার সময় কুম্ভীর ঠাকুরকে একটি করিয়া কন্যা সম্প্রদান করা হইত। রাজার আদেশে একটি বিবাহযোগ্যা কন্যাকে আনয়ন করিয়া বিবাহসজ্জায় সজ্জিত করিয়া তাহাকে নদীতীরে একখানি পবিত্র উপলখণ্ডে বসাইয়া বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কুম্ভীরকে ডাকা হইত। কুম্ভীরও অচিরে জল হইতে উঠিয়া আসিয়া হতভাগিনীকে জলে টানিয়া লইয়া গিয়া আপন ভোগে লাগাইত। তটস্থ সকলে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিত, কারণ তাহাদের ধারণা যে ঠাকুরের যদি কন্যা পছন্দ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি কন্যাকে ফিরাইয়া দিয়া যাইবেন, আর ফিরাইয়া না দিয়া যাইলে বুঝিতে হইবে তিনি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। কন্যা যে ঠাকুরের কখন অপছন্দ হইয়াছে এরূপ সংবাদ কেহ কখনও শুনে নাই। সভ্য ইয়ুরোপীয়গণ এই নিদারুণ বিবাহপ্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। ঐ দ্বীপেই অন্য উৎসবের সময় কখন কখন নবজাত কন্যাকে কুম্ভীরের সহিত বিবাহ দেয় ও এই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুম্ভীর-দেবের প্রতিনিধি তাঁহার পুরোহিত এই কন্যাটিকে পত্নী-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তিমর দ্বীপের নিকটবর্ত্তী অন্য একটি দ্বীপে একবার কুম্ভীরের এতই উৎপাত হয় যে ঐ দ্বীপ জনশূন্য হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। অবশেষে এইরূপ দৈববাণী হইল যে কুম্ভীরদিগের রাজার কোন সুন্দরীর প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছে, তাহাকে পাইলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। ইহাতে সকলে গিয়া ঐ কন্যার পিতাকে তাহার কন্যাকে বিবাহসজ্জা করাইয়া দিতে আদেশ করিল ও কন্যাটি সজ্জিত হইলে তাহাকে কুম্ভীররাজের সহিত বিবাহ দিয়া হতভাগিনীকে জলমধ্যস্থ পতিসদনে প্রেরণ করা হইল।

ভারত মহাসাগরস্থ মালদ্বীপে সমুদ্রে অনেক সময় এক প্রকার আলো (phosphorescence) দেখিতে পাওয়া যায়। মালদ্বীপবাসীদিগের ধারণা ছিল যে প্রতি

মাসে তাহাদের দেশের অসুর জিন্নী আলোকময় অর্ণব-যানের আকার ধারণ করিয়া তাহাদের দ্বীপে আসে। তাহাকে যদি অর্ঘ্য দিয়া সন্তুষ্ট করা না হয় তবে সে মহা অনর্থ ঘটাইবে। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু ষোড়শী যুবতী। সুতরাং তাহারা প্রতিমাসে একটি কুমারীকে বিবাহ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া জিন্নীর সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত তাহাকে সমুদ্রতীরস্থ জিন্নীর মন্দিরে লইয়া গিয়া বিবাহান্তে কন্যাটিকে রাত্রে ঐ মন্দিরে একা রাখিয়া চলিয়া আসিত। প্রাতঃকালে গিয়া দেখিত কন্যা আর কুমারীও নাই এবং তাহার আত্মাও আর ইহলোকে নাই; কন্যা জিন্নী-স্বামীর সহগামিনী হইয়াছে। এখন মাল-দ্বীপবাসীগণ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং সে জিন্নীও নাই, সে বিবাহও নাই।

চীনের টাং বংশের শাসনকালে প্রতি বৎসর একটি সুন্দরী যুবতী কুমারীর সহিত পীত নদের বিবাহ দেওয়া হইত। বিবাহান্তে কন্যাটিকে নদীর অতল জলে স্বামী-সদনে চিরকালের নিমিত্ত প্রেরণ করা হইত। চীনা ভৈরবীগণ এই নৃশংস বিবাহের নিমিত্ত প্রতি বৎসর একটি করিয়া অনিন্দ্যসুন্দরী প্রাপ্তযৌবনা কন্যা ধরিয়া লইয়া আসিত ও বিবাহশেষে কন্যাকে পতি-সদনে প্রেরণ করিয়া তবে ক্ষান্ত হইত। বহুকাল পরে ঐ প্রদেশে এক সদাশয় শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। তিনি আদেশ করেন যে এই নদী-বিবাহ আর হইতে পারিবে না। কিন্তু পিশাচী ভৈরবীর দল এই নৃশংস আমোদে বঞ্চিত হইতে অনিচ্ছুক হইয়া শাসনকর্ত্তার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব্বের মত বিবাহের আয়োজন করিল। শাসনকর্ত্তা এই সংবাদ পাইয়া বিবাহের দিনে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া ভৈরবীগুলিকে ধৃত করাইলেন ও তাহাদের বলিলেন যে জলদেবতা তাহাদের বহুকালের এই ঘটকালিতে সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্ন দিয়াছেন যে এবার তিনি আর অন্য কোন রমণীর পাণিগ্রহণ না করিয়া তাহাদের মধ্যেই কাহারও পাণিপীড়ন করিবেন। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকে দেবতা মনোনীত করিবেন তাহা তিনি ঠিক করিতে না পারায় তাহাদের সকলকেই দেব-সকাশে প্রেরণ করিবেন, তাহার পর তাহাদের অদৃষ্ট! এই কথা বলিয়া তিনি সৈন্যদিগকে ভৈরবীদিগের হস্তপদ বন্ধন করিতে আদেশ দিলেন। ভৈরবী ঠাকুরাণীরা এবার নিজেদের বিবাহের পালা আসিয়াছে শ্রবণে বীভৎস চীৎকার করিতে আরম্ভ করায় শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে অচিরে স্বামী সন্দর্শনের আশ্বাস দিলেন ও তাঁহার ইঙ্গিত পাইবামাত্র সৈন্যগণ তাহাদিগকে শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য নদীতে নিক্ষেপ করিল। নদী-দেবতাদেরও ভৈরবী পাইয়া চিরকালের মত বিবাহবাসনা পরিতৃপ্ত হইল। *

(৩) জড়পদার্থের সহিত বিবাহ।

বৃক্ষ ও দেবতা ভিন্ন অনেক স্থলে জড়পদার্থের সহিত এইরূপ অদ্ভুত বিবাহ মানব-সমাজে প্রচলিত আছে।

পশ্চিম অঞ্চলের হিমালয় প্রদেশে যদি কোন বর বা কন্যার রাহুর কিম্বা অন্য কোন অমঙ্গলজনক দশা হয় বা গ্রহনক্ষত্রাদি মন্দ হয়, অথবা বর বা কন্যা বিকৃতমস্তিষ্ক বা বিকলাঙ্গ হয় তাহা হইলে বর বা কন্যার সহিত জলপূর্ণ মাটির কলসীর বা মঙ্গল ঘটের বিবাহ হইয়া থাকে। এক গাছি মঙ্গল-সূত্র দ্বারা বর বা কন্যার গলা কলসীর গলার সহিত বাঁধা হয় ও পুরোহিত শাস্ত্র-মত কলসীর সহিত তাহাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করে।

পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত গোয়া প্রদেশে নর্ত্তকী-কন্যারা নিজ ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে যথা-বিহিত নিয়মানুসারে তরবারির সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, তৎপরে তাহারা নৃত্য-ব্যবসায় আরম্ভ করে।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে উত্তর আমেরিকার আলগন্-কুইনস্ নামক এক ধীবর জাতি একবার মৎস্য ধরিবার কালে টানা-জাল ফেলিয়া কিছুতেই মৎস্য ধরিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা ভগবানের নাম স্মরণ করিতে থাকে। এমন সময় জালের দেবতা মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধীবরদিগের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "আমি পত্নীহারা হইয়াছি এবং আমা-ভিন্ন অন্য-কোন পুরুষকে জানে না এমন কন্যাও পাইতেছি না যে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করি। একারণে আমার মন অত্যন্ত অস্থির।

* Frazer—The Golden Bough, Magic Art, Vol II, Chap XII.

আমার মনস্থির করিয়া যদি আমাকে জালে বসাইতে পার, তবেই তোমরা পুনরায় মৎস্য ধরিতে পারিবে নচেৎ নহে।" ইহা শুনিয়া ধীবরকুল সমবেত হইয়া ছয়সাত-বৎসর-বয়স্কা দুইটি সুরূপা বালিকাকে কন্যা সাজাইয়া জালদেবতার সহিত বিবাহ দিল। বালিকাদ্বয়ের তখনও পুরুষচিন্তা মনে জাগে নাই, সুতরাং জালদেবতা তাহাদিগকে পত্নীস্বরূপ পাইয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন ও ধীবরেরা জাল-ফেলিবামাত্রই আশাতীত মৎস্য প্রাপ্ত হইল। এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আল্‌গনকুইনস্‌ ধীবরদিগের প্রতিবাসী হুরন জাতীয় ধীবরগণও ঐরূপে দুইটি বালিকার সহিত জাল-দেবতার বিবাহ দিয়া প্রচুর মৎস্য প্রাপ্ত হইল। প্রবাদের ভিত্তি যাহাই হউক, সেই অবধি অদ্যাপি আল্‌গনকুইনস্‌ ও হুরন ধীবরগণ প্রতি বৎসর মৎস্য ধরিবার কাল উপস্থিত হইলে অল্পবয়স্কা দুইটি বালিকাকে বিবাহের রীতি অনুসারে জালের সহিত বিবাহ দিয়া থাকে।*

আপনারা বঙ্কিমবাবুর দেবীচৌধুরাণীতে পড়িয়াছেন যে ব্রজেশ্বরের সাগর বৌ ছিল। কিন্তু সে বৌয়ের নাম সাগর হইলেও বৌ সত্য সত্যই সাগর ছিলেন না, তিনি আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের একটি মেয়ে। সাগর আমাদের হিন্দুমতে স্ত্রী নহেন, পুরুষ। নদী তাঁহার পত্নী। কিন্তু প্রতীচ্য দেশে সাগর স্ত্রী। সুতরাং ইয়ুরোপে সাগর প্রকৃতই কাহারও স্ত্রী হইবেন ইহা অসম্ভব নহে। মধ্য যুগে ভূমধ্য-সাগরে ভিনিসের প্রবল আধিপত্য ছিল। সমুদ্রের উপর এই আধিপত্যের স্মারকচিহ্ন-স্বরূপ প্রতিবৎসর ভিনিসের প্রধান শাসনকর্তা ডোজের সহিত সাগরের বিবাহ হইত। ডোজ নিজ করস্থিত অঙ্গুরী খুলিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতেন। ইহাতেই সাগর-বিবাহ সম্পন্ন হইত।

(৪) পক্ষীর সহিত বিবাহ।

পঞ্জাবে কোন কোন অংশে যদি কোন লোকের দুই কিম্বা তিন বার স্ত্রী বিয়োগ হয় তাহা হইলে ঐ লোকটি পুনরায় বিবাহ করিবার পূর্ব্বে কোন স্ত্রীলোককে একটি পক্ষী ধরিয়া পোষ্যকন্যা গ্রহণ করিতে বলে। তাহার পর সে কন্যাপণ দিয়া ঐ পক্ষীটিকে আনয়ন করতঃ উহাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করে। দুই চারি দিবস পরে সে ঐ পক্ষীটির সহিত বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করে।†

(৫) মনুষ্যের সহিত বিবাহ।

আপনারা মনে করিতে পারেন যে মনুষ্যের বিবাহ মনুষ্যের সহিত হইবে ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কোন কোন স্থলে বিবাহ বলিলে আমরা যাহা বুঝি বরকন্যার বিবাহে ঠিক তাহা সাধিত হয় না। এই বিবাহে বরকন্যা উভয়েই মনুষ্য হইলেও বৃক্ষ-বিবাহ, দেবতা-বিবাহ প্রভৃতির ন্যায় এইগুলিও নকল বিবাহ। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি হইতে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমাদের দেশের বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা-দিগের কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু কুলীন সুপাত্র যোগাড় করা সুকঠিন। এই নিমিত্ত অনেক সময় কোন কোন কুলীনকন্যাদিগের বাল্যকালে যে-কোন কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত নকল বিবাহ দেওয়া হয়। ইহাকে 'করণ' বলে। এই বিবাহে কৌলীন্য রক্ষা হইল। পরে কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার কুলীন বা অকুলীন যাহার সহিত সুবিধা বিবাহ দেওয়া চলে।

ইয়ুরোপে অনেক সময় বরকন্যার বয়সের অল্পতা-প্রযুক্ত বা অন্য-কোন অসুবিধাবশতঃ বর কন্যাকে বিবাহ করিতে কন্যার আলয়ে যাইতে অপারগ হইলে, কন্যাকে তাঁহার হইয়া বিবাহ করিয়া আসিবার জন্য বর প্রতিনিধি পাঠান। এই প্রতিনিধি গিয়া বরের হইয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়া আইসে। এই বিবাহ নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। প্রতিনিধি পায়ের জুতা খুলিয়া পেণ্টুলানটাকে জানু পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়া কন্যার শয্যায় শয়ন করে। তৎপরে তাহার নগ্নপদ কন্যার চরণকমলের সহিত রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করা হয়। তাহার পর পুরোহিত মহাশয় যথাশাস্ত্র বিবাহমন্ত্র পাঠ করিলে বিবাহ নিষ্পন্ন হয় ও প্রতিনিধি দেশে প্রত্যাগমন করে। পরে যখন সুবিধা

* Frazer—The Golden Bough, Vol II, 147-8.

† Crooke—Folk-lore of Northern India, Vol II. 119.

আসল বরবধূর মিলন হইয়া থাকে। * মুসলমানদের মধ্যেও প্রতিনিধির দ্বারা বিবাহ হইতে পারে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধের সময় এক আইন করিয়াছেন যে কোন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলেও তাহার মনোনীতা রমণীকে তাহার প্রতিনিধি বিবাহ করিতে পাইবে ও এই প্রতিনিধি মারফত বিবাহে তাহার বিবাহ সিদ্ধ হইবে। এই আইন অনুসারে ১৮ই মে এম্ সাউকে নামক এক ব্যক্তি এম্ লাবিন নামক এক সৈনিকের প্রতিনিধিরূপে মিলি ম্যাটিগ্নী নাম্নী এক কামিনীর পাণিপীড়ন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। †

ইয়ুরোপে অনেক দেশে বিবাহের পূর্ব্বে প্রথমে নকল কন্যা আনিয়া বিবাহ দেওয়া হয়। যথা, পোলোনিয়ায় একজন চাপদাড়ি-ওয়ালা লোককে কন্যা সাজাইয়া বিবাহের পাত্রীস্বরূপ লইয়া আসে। পোল্যাণ্ডে একটি শুক্লবস্ত্র-পরিধানা অবগুণ্ঠনবতী বৃদ্ধাকে প্রথমে কন্যা সাজাইয়া আনে। এসথোনিয়ায় কন্যার ভ্রাতা স্ত্রীলোকের বেশে সজ্জিত হইয়া প্রথমে কন্যার স্থান অধিকার করে। ঐ দেশেই আবার কখন কখন একটি বৃদ্ধা ভূর্জ্জপত্রের মুকুট পরিয়া কন্যা সাজিয়া আসেন। ফ্রান্সের ব্রিটানি প্রদেশে কন্যার পরিবর্ত্তে প্রথমে বাটীর একটি অল্পবয়স্কা বালিকা, তাহার পর বাটীর কর্ত্রীঠাকুরাণী, তা তিনি মাতাই হউন বা তৎস্থানীয় আর যে-কেহই হউন, এবং অবশেষে কন্যার পিতামহীকে কন্যা সাজাইয়া বিবাহে নামাইয়া দেওয়া হয়! একবারে একপিণ্ডে তিন কুল উদ্ধার! ‡

অষ্ট্রেলিয়ায় উরাবান্না, ভিইরি প্রভৃতি অনেক জাতি আছে, যাহাদের বিবাহ-প্রথা অতি চমৎকার। অনেক দেশেই সাধারণতঃ বিবাহের 'পার্ণি-ঘর' আছে। অষ্ট্রেলিয়ায় এই জাতিদিগের মধ্যে যে গোষ্ঠীর পুরুষদিগের সহিত যে গোষ্ঠীর কন্যার বিবাহ হইতে পারে, জন্মাইবার পরক্ষণেই কন্যা সেই গোষ্ঠীস্থ সকল পুরুষের স্ত্রীরূপে পরিগণিত হয়। কন্যা বয়ঃস্থা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে কাহারও সহিত তাহার আসল বিবাহ হয় ও সাধারণতঃ সেই স্বামীর গৃহেই ঐ কন্যা সংসার করে। কিন্তু ঐ রমণীর গর্ভজাত পুত্র ঐ লোকটির একার পুত্র নহে, সকলের পুত্র, সকলকেই সে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে; কারণ কন্যা বড় হইলে যে লোকটি তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, ঐ মহিলা সাধারণতঃ তাহার গৃহে বাস করিলেও মহিলাটির প্রথমে গোষ্ঠীবিবাহ হওয়াতে সে বৎসরের মধ্যে একদিন করিয়া গোষ্ঠীস্থ সকল স্বামীর গৃহে বাস করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। বৎসরে একদিন ব্যতীত অন্য কোন দিন গোষ্ঠী-স্বামীর মধ্যে কাহারও ঐ রমণীকে আপন ভার্য্যারূপে আবশ্যক হইলে ঐ রমণীর আসল স্বামীর অনুমতি লইতে হয়। এই রীতি অনুসারে ঐ জাতির মহিলাগণের সকলেরই একটি করিয়া খাস স্বামী ও গোষ্ঠী-বিবাহের বহু স্বামী থাকে ও কোন রমণী কোন একজন লোকের নিজস্ব নহে, সে গোষ্ঠীপত্নী। এরূপ গোষ্ঠী-বিবাহপ্রথা আমেরিকায় কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে। §

আমাদের দেশের কুলীন-কন্যাগণের মনুষ্য-বিবাহের অভাবে শালগ্রাম ঠাকুরের সহিত কায়াশুদ্ধির জন্য বিবাহ দেওয়া হইত এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু নেহাৎ পাত্র না মিলিলে অভাব-পক্ষেই এই ঠাকুরের সহিত বিবাহ হইত। সুপাত্র মিলিলে যে অবস্থায়ই হউক তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া চলিত। অনেক সময় খাঁটি-কুলীন বাহাত্তর-বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধকে তীরস্থ করিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রাণ বাহির হইতে তখনও কিছু বিলম্ব আছে, এরূপ পাত্রের সহিতও কুলীন-কন্যাদিগের (সময় সময় একসঙ্গে তিন-চারি জনের) বিবাহ দেওয়া হইত। কন্যা হাতে শাঁখা দিয়া বিবাহ করিতে যাইতেন ও বিবাহান্তে স্বামীর সৎকার করিয়া শাঁখা ভাঙ্গিয়া থান পরিয়া বাড়ী ফিরিতেন। এরূপ বিবাহও নকল বিবাহের অন্তর্ভুক্ত বলিলে অসঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

মান্দ্রাজে রেদ্দি জাতিদিগের মধ্যে এক বীভৎস বিবাহ-প্রথা আছে। কোন এক ষোড়শী যুবতীকে পাঁচ-ছয়-বৎসর-বয়স্ক একটি বালকের সহিত যথারীতি বিবাহ দেওয়া হয়।

* Tennyson—The Princess, Canto I.

† "শ্রীরামপুর," ৬ই শ্রাবণ ১৩২২ সাল।

‡ Crooke—The Popular Religion and Folk-lore of Northern India, Vol II. 8.

§ Frazer—Totemism and Exogamy, Vol I. Chap I, Group marriages.

বিবাহের পর বধূ স্বামীগৃহে শিশু স্বামীর কোন আত্মীয়ের—যথা তাহার খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো ইত্যাদি ভ্রাতা, মামা বা পিতা অর্থাৎ কন্যার নিজ শ্বশুরের-সঙ্গে দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বাস করে। বিবাহ বরের মামা, পিতা ইত্যাদি লোকগুলির সুবিধার জন্যই দেওয়া হয়, বালকটি কেবল নিমিত্তের ভাগী হয় মাত্র। পুত্রবধূর পুত্রকন্যাদি হইলেও পুত্রকন্যাগণ ঐ বালক-স্বামীর পুত্রকন্যাদি বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। পরে বালকটি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন তাহার বাল্যকালের স্ত্রী অনেক স্থলেই বৃদ্ধা হইয়া পড়ে। সুতরাং সে তখন ঐ পরিণতবয়স্কা স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলে অন্য বালকের স্ত্রীকে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নিজের সেবায় নিযুক্ত করে। এই বিবাহ-প্রথা যে কেবল মান্দ্রাজ প্রদেশেই প্রচলিত এরূপ নহে। ইহা ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও বোম্বাই প্রদেশে, রুষরাজ্যের কোন কোন অংশে, ককেসিয়ান জাতিদিগের ও নূতন গ্র্যানাডার চিবচাস জাতিদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। *

উপরিনির্দ্দিষ্ট এই কয়েক প্রকার নকল বিবাহই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে অবশ্য লোকে বৃক্ষের সহিত বৃক্ষের বা কূপের বা পুষ্করিণীর, পুতুলের সহিত পুতুলের, ঠাকুরের সহিত ঠাকুরের, জন্তুর সহিত জন্তুর ইত্যাদি বিবাহ দিয়া থাকে। কিন্তু এই বিবাহগুলিতে বর বা কন্যা কেহই মনুষ্য না হওয়াতে এ প্রবন্ধে উহার বিষয় আলোচনা করিলাম না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

* Lord Avebury—The Origin of Civilisation, Chapter III. 62.

দেশের কথা

দুর্ভিক্ষ সমভাবেই চলিতেছে। অন্নের অভাব ছিল, এখন শীত পড়াতে বস্ত্রের অভাব অনুভূত হইতেছে। কারণ দুর্ভিক্ষপীড়িতদের না আছে অন্ন, না আছে বস্ত্র—কিছুই নাই। দেশময় শতসহস্র চর্ম্মাচ্ছাদিত কঙ্কাল ঘুরিয়া ফিরিতেছে। যাতনা ক্রমশ চরমসীমায় গিয়া পৌঁছিতেছে, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া পড়িতেছে। তাই শুনিতেছি জননী সন্তান হত্যা করিতেছে; সন্তান-বিক্রয়ের কথা তো ইতিপূর্ব্বেই আমরা শুনিয়াছি। "পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী"তে প্রকাশ—

সেদিন নদীয়ার দায়রা জজের এজলাসে এক অষ্টাদশ বর্ষীয়া মুচি রমণী আত্মহত্যা ও পুত্রহত্যার চেষ্টাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। রমণী তাহার পৈশাচিকতার কারণস্বরূপে আদালতে বলে তাহার স্বামী সম্প্রতি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই চারিদিন যাবৎ তাহাদের কিছুমাত্র আহার জুটে নাই। সে তাহার দেড় বৎসরের শিশু পুত্রটিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ক্ষুধার জ্বালা ভুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। শিশুটিও ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া উঠিল। অনন্তর জননীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল, সে রাক্ষসীরূপে সন্তানের গলায় ছুরি বসাইল, নিজের গলাও দ্বিখণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিল। সৌভাগ্যক্রমে শিশুর গ্রীবা বেশী কাটে নাই, রমণীও অধিক জখম হয় নাই। পরে চিকিৎসা দ্বারা তাহারা ক্রমশঃ সারিয়া উঠিয়াছে। দায়রা জজ মিঃ ম্যাকনিভিস এই মর্ম্মস্পর্শী করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া রমণীকে সেদিন আদালতে কার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষের সাহায্যে যে দান আসিতেছে তাহা নিতান্ত সামান্য। ধনীসম্প্রদায় একরকম উদাসীন রহিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে বাঁচাইবার জন্য অনেক অর্থ, প্রচুর-পরিমাণ অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন। ধনী দান না করিলে নির্ধনের দানে আর কি হইবে! মফঃস্বলের কাগজ হইতে কয়েকটি দানের সংবাদ দিতেছি। "ঢাকাপ্রকাশ" খবর দিয়াছেন—

গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে কুমিল্লার নবাবপুত্রের সহিত পশ্চিম-গাঁয়ের নবাবপুত্রীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই শুভ পরিণয়োৎসব উপলক্ষে উভয় নবাব ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে যথাক্রমে ৩০০৲ ও ২০০৲ শত টাকা দান করিয়া সজ্জনমাত্রেরই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

"২৪ পরগণা বার্ত্তাবহে" প্রকাশ—

আসামের দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রজাদিগকে তাকাবি ঋণ প্রদান করার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

"ঢাকা গেজেট" সংবাদ দিয়াছেন—

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ, বাজিৎপুর, অষ্টগ্রাম থানার এলাকাধীন গ্রামসমূহে লোকের ভীষণ দুরবস্থা উপস্থিত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বিপন্ন লোকদিগের সাহায্যকল্পে গবর্ণমেণ্ট পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর এবং সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অন্নদানের ন্যায় শিক্ষাদানও মহা পুণ্যের কাজ। "২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ" এরূপ দুইটি পুণ্য কাজের খবর দিয়াছেন—

ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আগামী ১লা জানুয়ারি হইতে ইষ্টবেঙ্গল ইনষ্টিটিউসন নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় খোলা

হইবে। ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ছাত্র ভর্ত্তি হইতে পারিবে। সদরঘাটের উপর নদীর তীরে একখানি সুবৃহৎ বাড়ী স্কুলের জন্য লওয়া হইয়াছে। শীঘ্রই শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। বিদেশীয় ছাত্রদিগের জন্য উপযুক্ত হোষ্টেলের ব্যবস্থা করা হইবে। কতিপয় দরিদ্র বালককে বিনামূল্যে পড়িবার সুবিধা দেওয়া হইবে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা বেলগাছিয়া মেডিকেল স্কুল কলেজে উন্নীত হইবে বলিয়া ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

পল্লীসংস্কার কার্য্যে অর্থব্যয় হইবে বলিয়া গভর্মেণ্ট সে কাজে হস্তক্ষেপ করিতে চান না। এবারে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে লোকের অভাব বাড়িয়াছে, সস্তায় কাজ হইবে অথচ লোকের সাহায্য করা হইবে বলিয়া গভর্মেণ্ট পল্লী-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছেন।

"স্বরাজ" বলেন—

গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবার দেশে যেরূপ অন্নকষ্ট তাহাতে দরিদ্র প্রজাকুল সামান্য পারিশ্রমিক লইয়াই কাজ করিবে। এই অবস্থায় জেলাবোর্ডসমূহ প্রাপ্ত অর্থদ্বারা পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে একদিকে যেমন দরিদ্র প্রজাকুলের উপকার হইবে অন্যদিকে দেশের জলাভাবও দুরীভূত হইবে। গবর্ণমেণ্টের এ সিদ্ধান্ত সমীচীন ও সম্পূর্ণ সাময়িক এবং ইহাতে দেশের পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয় ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে বহু বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। ডিঃ বোর্ডের কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় গত বৎসর পাবনা জেলাবোর্ড দেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্য কিছুই করিতে পারেন নাই। বোর্ড প্রাপ্ত অর্থের কোনই ব্যবহার করিতে না পারায় গবর্ণমেণ্ট দুঃখই প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে বোর্ড জেলার মধ্যে কতকগুলি ইন্দারা খননে উদ্যোগী হইয়াছেন সত্য কিন্তু কার্য্য যেরূপ মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে দেশব্যাপী এই ভীষণ জলকষ্ট কিছুতেই প্রশমিত হইতে পারে না।

আমাদের দেশ হইতে অনেক পুরানো স্বদেশী শিল্প অর্থাভাবে লুপ্ত, কতকগুলি লুপ্তপ্রায়। সে-গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন গভর্মেণ্ট। অন্যান্য সভ্যদেশে গভর্মেণ্টই শিল্পপ্রতিষ্ঠার ভার প্রধানত লইয়া থাকেন। আমাদের দেশেই কেবল অভিনব ব্যবস্থা। "চারুমিহির" একটি লুপ্তপ্রায় দেশী শিল্পের প্রতি গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

পূর্ব্বে এ দেশে নীল, কুসুমফুল ইত্যাদি নানাপ্রকারের রংএর ব্যবসা প্রচলিত ছিল। কিন্তু জার্ম্মানগণ রসায়নপ্রক্রিয়া দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে ঐ-সকল রং প্রস্তুত করিয়া আমাদের দেশের ব্যবসা নষ্ট করিয়াছে। নীলের ব্যবসা নষ্ট হওয়ায় এ দেশের অনেক ইংরেজ ব্যবসায়ীকে বিস্তর ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। তজ্জন্য গবর্মেণ্ট নীল চাষের সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কুসুমফুলের রং দ্বারা পূর্ব্বে কাপড় ও ফিতা ইত্যাদির রং করা হইত। গবর্ণমেণ্ট আফিসে যে-সকল ফিতা ব্যবহার হইয়া থাকে উহা প্রস্তুত করিবার জন্য পূর্ব্বে ঐ রং ব্যবহৃত হইত। এখন ভিন্ন দেশ হইতে সস্তা ফিতা আমদানী হওয়ায় ঐ ব্যবসাটি মৃতপ্রায় হইয়াছে। আশা করি, গবর্ণমেণ্ট এই সুযোগে ঐ ব্যবসাটিকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করিবেন।

পণপ্রথা-রূপ সামাজিক ব্যাধি সারাইবার উপায় নানান্ জনে নানাপ্রকারে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অধিকাংশ লোক সংস্কারমুক্ত মনে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন না, সেই জন্য তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ঔষধ নিতান্ত হাতুড়িয়া-চিকিৎসকের ঔষধের ন্যায় মনে হয়। কাশীর এক সভায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় এই ব্যাধির যে ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা আমাদের খুব খাঁটি বলিয়া মনে হইল। পণ্ডিত যাদবেশ্বর বলিয়াছেন—

বাঙ্গালা দেশে পাত্রের বিবাহে যত দিন ইচ্ছা অপেক্ষা করা চলিতে পারে, কিন্তু লৌকিক আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া পিতা মাতা নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যেই কন্যার বিবাহ-প্রদানের জন্য অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। প্রত্যুতঃ শাস্ত্রে কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধে কোনরূপ বয়স নির্দ্দেশ করা হয় নাই। মনু বলিয়াছেন, "উপযুক্ত পাত্র না পাইলে কন্যাকে আজীবন অবিবাহিতা রাখিবে।" যদি পিতা মাতা মনুর উপদেশ অনুসরণ করিয়া স্ব স্ব কন্যাকে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ প্রদান করেন, তবে উল্লিখিত ভ্রান্ত জনমত সহজেই বিদূরিত হইবে। আজ-কাল লোকে পুত্রকন্যার বিবাহকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত বরের জন্যই বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এই-সকল পাশের সহিত অধুনা বড় একটা অর্থের সম্বন্ধ নাই। প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত, পাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইলেই যে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই, সুতরাং উপাধিপ্রাপ্ত বর লাভের লুব্ধ আশ্বাসে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার সার্থকতা কোথায়?

আপনারা স্ব স্ব কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করুন, তাহা হইলে শিক্ষিত যুবকগণ বিনা পণে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইবেন।

"রংপুর-দর্পণ" উপরোক্ত সংবাদ দিবার প্রসঙ্গে যথার্থই বলেন—

শিক্ষিতা কন্যা পাইলেই শিক্ষিত পাত্র যে বিনাপণে তাহাকে খুঁজিয়া লইবে, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা তাহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। এখন টাকাও চাই, লেখা পড়াও চাই, সকল স্থানেই ত ইহাই দেখিতেছি। যতদিন জাতীয় চরিত্রের উন্নতিসাধন, দেশের শিক্ষিত যুবকগণের হৃদয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্রেক না হইবে, ততদিন শিক্ষার প্রলোভনে শিক্ষিত যুবকের মন টলিবে না। ইহা ধ্রুব সত্য।

আমরা বাঙ্গালার পিতামাতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, তাঁহারা স্ব স্ব কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক উপার্জ্জনশীলা করুন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধির সঞ্চার হইবে, আর বিবিধ কার্য্যকরী শিল্পকলাদি শিক্ষার ফলে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাবও জাগ্রত হইবে। যখন শিক্ষিত যুবকগণ দেখিবেন, এইসকল কুমারী কেবল নবেল-পড়া ও চিঠি-লেখা ব্যতীত সাংসারিক জীবনে প্রকৃত ভাবে সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যা, তাঁহারা আর গলগ্রহ নহেন, তাঁহাদিগের হৃদয়েও আত্মসম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, তখন সহজেই হৃদয়ের হীনভাব বিদূরিত হইবে, "পণের দাবী" হৃদয় হইতে বিলীন হইবে। এমন

দিনও আসিতে পারে যেদিন এইরূপ কুমারী-রত্ন লাভের জন্য যুবকগণেরও হৃদয়ে প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগ্রত হইবে।

"সম্মিলনী"তে নিম্নলিখিত সমাজ-চিত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে। এ দুর্ভাগ্য দেশে এরূপ চিত্রের অভাব মোটেই নাই।

ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মোক্তার চন্দ্রশেখর বর্দ্ধন পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ। দুই স্ত্রীর মৃত্যুর পর মোক্তার মহাশয় গত আশ্বিন মাসে ১২ বৎসরের মেয়ে কিরণবালার পাণি গ্রহণ করেন। গত শ্রাবণ মাসে তাঁহার এক স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। যাহা হউক কিরণবালা সমাজের শিরে পদাঘাত করিয়া গত ২৮শে অক্টোবর পাঁচ ঘটিকার সময় কেরোসিন-সিক্ত পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লাগাইয়া আত্মত্যাগ করিয়াছে।

নারী স্বভাবতই দুর্ব্বল ভীরু ও অক্ষম, এরূপ একটা কুসংস্কার জগতের সর্ব্বত্র পুরুষের মন আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। এ কুসংস্কারের মোহ য়ুরোপের নারীসমাজ ভাঙিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে সাহস ও শক্তিতে পুরুষের একচেটিয়া অধিকার নাই। রমণী কোমল হইলেও কঠোর হইতে পারেন, সাহসে সুদুর্জ্জয় হইতে জানেন। আমাদের দেশেও রমণীকে শক্তিরূপিণী বলিত। এখন আমরা তাঁহাদের হাত পা বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে অবলা দুর্ব্বলা প্রভৃতি নামে অভিহিত করি বটে। মুসলমান "অবলা"র নিম্নলিখিত বীরত্বকাহিনী কয়েকখানি কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ সংবাদ পড়িতে গৌরব বোধ হয়।

বরিশাল স্পেশ্যাল ট্রিবিউনাল কোর্টে সম্প্রতি এক ডাকাতি মোকর্দ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। তিনজন মুসলমান ইহার আসামী। ঘটনার বৃত্তান্ত এইরূপ:—গত ১২ই তারিখে কদমতলা গ্রামে মীরজান বিবি ও তাহার পৌত্র রহমালী বারান্দার একদিকে ও তাহার কন্যা সবুরজান তাহার শিশুপুত্র আবদুল মজিদ ও ভ্রাতুষ্পুত্রী জোলেখা বিবিসহ বারান্দার অন্য দিকে শুইয়া ছিল। শেষরাত্রে সবুরজান বিবি কুকুরের চীৎকার শুনিয়া জাগরিত হয়, এবং মা ও ভ্রাতৃবধূকে চুপি চুপি বলে যে, চোর আসিয়াছে। জোলেখা দা হাতে করিয়া বসিয়া রহিল। প্রাঙ্গণে আগুন জ্বালিয়া ৬।৭ জন লোক বাটীতে প্রবেশ করে। তাহারা মীরজান ও সবুরজানকে টাকা রাখিবার জায়গা দেখানোর জন্য মারপিট করে। মীরজান বিবি কিছুতেই বলিতে স্বীকৃত না হওয়ায় একজন ডাকাত অন্য সকলকে রামদাও আনিতে বলিল। তখন মশালের আলো নিভাইয়া দেওয়া হয়। জোলেখা রামদাও আনার কথা ও খাশুড়ীর মুখে কাপড় গুঁজিয়া দেওয়ার শব্দ শুনিয়া দা হস্তে দরজার পেছনে দাঁড়াইল। এক ব্যক্তিকে রামদাও লইয়া আসিতে দেখিয়া সে তাহার মাথায় দা দ্বারা আঘাত করিল। সে ভোঁ দৌড়। আর একজন ডাকাত বাঁশ হাতে বারান্দায় ঢুকিতেছিল; বীর রমণী তাহার মাথায়ও এক দায়ের ঘা লাগাইল, সে ব্যক্তিও পলায়ন করিল। তৎপরে জোলেখার খাশুড়ীকে এক ব্যক্তি উৎপীড়ন করিতেছে দেখিয়া সেখানে যাইয়া ডাকাতের পৃষ্ঠদেশে এক ঘা লাগাইল। রমণীর আক্রমণে ডাকাতগণ পলায়ন করিল। পুলিশ ছয়জন আসামীকে ধৃত করিয়াছিল। তিন জন প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করিয়াছে। বাকি তিনজনের মধ্যে একজনের ১০ বৎসর, একজনের ৫ বৎসর ও একজনের ৪ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

—

শিক্ষার ভাষা

শিশুদের শিক্ষা স্বভাবতঃ মাতৃভাষার সাহায্যেই হইয়া থাকে। তাহারা মাকে, বাড়ীর লোকজনকে, পাড়াপড়শী সঙ্গীদিগকে মাতৃভাষাতেই নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, এবং মাতৃভাষাতেই উত্তর পায়। তা ছাড়া তাহারা তাহাদের মাতৃভাষাতে লোকদিগকে যাহা বলিতে শুনে, তাহা হইতেও বিস্তর জ্ঞান লাভ করে। গৃহে যাহা হয়, বিদ্যালয়েও স্বভাবতঃ সব দেশে তাহাই হইয়া থাকে,—মাতৃভাষার সাহায্যেই শিশুরা, বালকবালিকারা, শিক্ষা পাইয়া থাকে। "সব দেশে" বলায় একটু ভুল হইতেছে। ভারতবর্ষে শিক্ষার গোড়াপত্তন মাতৃভাষার সাহায্যেই হইয়া থাকে বটে; কিন্তু কতকদূর অগ্রসর হইবার পর ছাত্রেরা ইংরেজীর সাহায্যে শিক্ষা পায়। শুনিয়াছি, পঞ্জাবে অনেক জায়গায় শিক্ষার আরম্ভ পর্য্যন্ত উর্দ্দুতে হয়, যদিও শিশুদের মাতৃভাষা অনেকস্থলেই উর্দ্দু নয়, পঞ্জাবী; কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

জাতীয় সাহিত্যেই সকল জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও আদর্শ নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন জাতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাহার সাহিত্যেই পাওয়া যায়। জাতীয় বিশেষত্বও জাতীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্যেই দৃষ্ট হয়। জাতির প্রাণের মর্ম্মের নিগূঢ় কথা জাতীয় সাহিত্যেই ব্যক্ত হয়। মানবের চিন্তা ও আদর্শের ভাণ্ডারে প্রত্যেক জাতির নিজের কিছু দিবার আছে। তাহা প্রত্যেক জাতি মাতৃভাষায় লিখিত সাহিত্যের ভিতর দিয়াই দিতে পারে। এই জন্য মাতৃভাষা ও তল্লিখিত সাহিত্যের চর্চ্চা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

বিদেশী ভাষার সাহায্যে জ্ঞান অর্জ্জন কঠিন; এরূপে শীঘ্র জ্ঞান লাভ করাও যায় না। তা ছাড়া এই প্রকারে লব্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অস্থিমজ্জাগত, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হয় না। মাতৃভাষার সাহায্যে লব্ধ জ্ঞান স্থায়ী জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়; উহা জাতীয় চিত্তের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের কলিকাতা রিভিউ পত্রে একজন লেখক লিখিয়াছিলেন :—

"ইতিহাসে দেখা যায়, যে, কোন জাতি এ পর্য্যন্ত উহার মাতৃভাষার ভিতর দিয়া ভিন্ন শিক্ষিত বা সভ্য হয় নাই। ইতিহাস ইহাও বলে যে, কোন জাতির মাতৃভাষার উচ্ছেদ এবং ঐ জাতির ধ্বংস, অন্ততঃ উহার বিশেষত্বের ও ব্যক্তিত্বের বিনাশ, একই কথা। বাক্য বা ভাষা, চিন্তা এবং অস্তিত্ব পরস্পরের সহিত এরূপ ভাবে জড়িত, যে উহাদিগকে পৃথক করা অসম্ভব। প্রত্যেক জাতির পক্ষে এই তিনটি সংশ্লিষ্ট হইয়া একটি অবিচ্ছেদ্য সত্তায় পরিণত হইয়াছে।"*

অতএব সাধারণভাবে এ কথায় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না যে মাতৃভাষাই শিক্ষার ভাষা হওয়া উচিত, এবং দেশভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু ভারতবর্ষ বিদেশীদের দ্বারা শাসিত বলিয়া তাহাদের ভাষাও আমাদিগকে শিখিতে হয়। ভারতবর্ষের কোন ভাষার সাহায্যেই আধুনিক সর্ব্ববিধ জ্ঞান লাভ করা যায় না ; এইজন্য অন্ততঃ একটি শ্রেষ্ঠ বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, এবং কোথাও-কোথাও একটি প্রদেশেই (যেমন মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে) ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এবং কোথাও কোথাও একই প্রদেশে দেশবাসীদের মধ্যে বাণিজ্যাদি লৌকিক কার্য্যনির্ব্বাহ এবং ভাব ও চিন্তার আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য একটি সাধারণভাষার দরকার। ভারতবর্ষের বাহিরের পৃথিবীস্থ নানা জাতির সঙ্গে কারবার এবং মানসিক আদানপ্রদানের জন্যও অন্ততঃ একটি বহুদেশ-ব্যাপ্ত শ্রেষ্ঠ বিদেশী ভাষা জানা আবশ্যক। আমাদের কূপমণ্ডুকতা ঘুচাইয়া মনের দৃষ্টি বিশ্বমানবের কার্য্য ও চিন্তার উপর নিক্ষেপ করিতে হইলেও অন্ততঃ একটি শ্রেষ্ঠ বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচয় আবশ্যক। ভারতবর্ষকে বর্ত্তমান কালের ভাব ও চিন্তার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া তাহার "সেকেলেত্ব" ঘুচাইয়া তাহাকে নবীভূত করিতে হইলে, এখন অন্ততঃ কোন একটি শ্রেষ্ঠ বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ঐক্য সম্পাদনের জন্যও একটি সাধারণ ভাষা চাই। বিদেশী কোন কোন সাহিত্য প্রকৃতিপুঞ্জের সাম্য শক্তি ও অধিকার প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যেমন উপযোগী ভারতবর্ষীয় কোন ভাষা এখনও তেমন উপযোগী হয় নাই। শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি এবং অসাম্য পাশ্চাত্য দেশসকলেও আছে, সেখানেও সকল দেশে সকল শ্রেণীর লোক রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ অধিকার সমান ভাবে পায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে ভেদবুদ্ধি, অসাম্য ও রাষ্ট্রীয়-অধিকারশূন্যতা যত বেশী, এরূপ কোন পাশ্চাত্য দেশে নহে। সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর পাশ্চাত্য জাতিদের সাহিত্যের অনুশীলন করিলে ভারতবর্ষে সর্ব্বসাধারণের সাম্য, শক্তি ও অধিকার ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতগবর্ণমেণ্টের ভিত্তিভূত ব্যবস্থা (constitution) অনুসারে আমরা দাস্যতাশূন্য (free) হইলেও আমরা বস্তুতঃ পরাধীন। মুদ্রাযন্ত্র-আইনগুলির শিকলে আমাদের হাত পা বাঁধা। অতি সত্য এবং অতি যুক্তিসঙ্গত কথাও খুব ধীরভাবে আমরা নির্ভয়ে ও অসঙ্কোচে লিখিতে পারি না। লেখায় যেমন বাধা ও বিপদ আছে, বলাতেও তেমনি বাধা ও বিপদ আছে। এইজন্য, সকল দিকে মানুষের মনের বিকাশ ও প্রকাশ আমাদের দেশে হইতে পারিতেছে না। আমাদের সাহিত্যও তজ্জন্য অসঙ্কোচে নির্ভয়ে বিকসিত এবং স্বাধীন মনের বন্ধনহীন ভাষায় লিখিত নহে। যে-সকল দেশে এই-সব বাধা ও বিপদ নাই, সেই-সব দেশের সাহিত্য এই জন্য আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি অপেক্ষা মুক্ত, স্বাধীন, শক্তিশালী। আমাদের কল্যাণের জন্য এই-সকল মুক্ত, শক্তিশালী সাহিত্যের অন্ততঃ কোন একটির সঙ্গে পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

ইংরেজী শিখিলেই উপরি লিখিত সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। এইজন্য ইংরেজী শিক্ষা করা আবশ্যক। ভারতবর্ষে যাঁহারা দেশভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিবার

* "History tells us, that no nation has ever yet been civilised or educated save through its own vernacular, and that the uprooting of a vernacular is the extermination of the race, or at least of all its peculiar characteristics. Speech, thought and existence are so closely bound together that it is impossible to separate them. They are the great trinity in unity of the race." *The Calcutta Review*, December, 1855.

পক্ষপাতী, তাঁহারা কেহই শিক্ষণীয় বিষয়সকলের তালিকা হইতে ইংরেজী বাদ দিতে বলেন না। সুতরাং ইংরেজী শিখিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। ছাত্রগণ ইহা "দ্বিতীয় ভাষা" রূপে শিখিতে পারে।

(ইংরেজী স্কুলগুলির নীচের ক্লাসসকলে দেশভাষায় লিখিত বহি ব্যবহৃত হয়। উপরের ক্লাসগুলিতে পাঠ্যপুস্তক ইংরেজীতে লিখিত হইলেও, তাহা বুঝাইবার জন্য শিক্ষকেরা দেশভাষা ব্যবহার করেন। দেশভাষার সাহায্যে যে-বিষয়ের বহি বুঝান যায়, সে বিষয়ে বহিও নিশ্চয়ই দেশভাষায় লেখা যাইতে পারে। বাস্তবিকও দেখা যায়, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রেরা ইতিহাস ভূগোল গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক যে-সকল ইংরেজী বহি পড়ে, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য ছেলেরা বাংলায় লেখা বহি হইতে ঠিক্ সেই-সকল বিষয়ই শিখে। আবার নর্ম্যাল স্কুলগুলিতে শিক্ষকতা শিক্ষা করিবার জন্য যাঁহারা পড়েন, তাঁহারা কলেজে শিক্ষণীয় বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি কঠিন বিষয়ও বাংলায় লেখা বহির সাহায্যে শিক্ষা করেন।) আমরা জানি কলেজে অনেক অধ্যাপক গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নানা বিষয় বাংলায় বুঝাইয়া দিয়া খুব ভাল ফল পাইয়াছেন। এই ডিসেম্বর মাসের মডার্ণ-রিভিউ কাগজে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন যে তিনি ইউরোপীয় ইতিহাসের নবজাগরণের যুগের (renaissance) বিষয়ে পাটনা কলেজের বি-এ ক্লাসের ছেলেদিগকে কিছু বলেন। তাহার পর ছেলেদের নোট্ লইবার খাতা খুলিয়া দেখেন যে কেবল মাত্র দুটি "অনার" (honours) ক্লাসের ছেলে তাঁহার বক্তৃতার সুসম্বদ্ধ চুম্বক লিখিতে পারিয়াছে। তাহার পর তিনি ঐ বিষয়ে বাংলায় বোলপুর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছেলেদিগকে কিছু বলেন। তাহাদের বয়স ও শিক্ষা পাটনার বি-এ ক্লাসের ছেলেদের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন যে শান্তিনিকেতনের বালকেরা বাংলায় তাঁহার বক্তৃতার বিষয় সংক্ষেপে বেশ সুসম্বদ্ধভাবে লিখিয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে তিনি তাঁহার কলেজের ছাত্রদিগকে তাহাদের মাতৃভাষায় ঐতিহাসিক বিষয়ে সন্দর্ভ লিখাইয়া দেখিয়াছেন, যে, তাহাতে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ অধিক পরিমাণে সাধিত হয়, মৌলিক চিন্তা করিবার ক্ষমতা বাড়ে, এবং তাহারা তদ্দ্বারা, ইতিহাস হইতে প্রত্যেক মানুষের এবং এক-একটা জাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা শিক্ষণীয় তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত করিতে পারে।)

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় প্রাচীন হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে সংস্কৃতে গতিবিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে। যাহা নাই, তাহা অল্প আয়াসেই সংস্কৃত ধাতু হইতে গড়িয়া লওয়া যায়। তাহার প্রমাণ বাংলা নানা মাসিক পত্রে লিখিত শ্রেষ্ঠ লেখকদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি। কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনেও উচ্চ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হইতেছে। অতএব বৈজ্ঞানিক বিষয়সকলে বাংলা বহি লেখা অসাধ্য নহে। দার্শনিক বিষয়ের ত কথাই নাই; কারণ, প্রাচীন হিন্দুরা দর্শনের খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। দার্শনিক পারিভাষিক শব্দের অভাব হইবে না।

মোটামুটি বলিতে গেলে জার্ম্মেন, ইংরেজী, ফরাসী, প্রভৃতি ভাষায় কঠিন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয়সকলে এক শতাব্দী পূর্ব্বে বেশী কিছু বহি ছিল না। পারিভাষিক শব্দও ছিল না। যেমন প্রয়োজন হইয়াছে, ইংরেজ ফরাসী ও জার্ম্মেনরা তাহাদের নিজের নিজের ভাষা হইতে বা গ্রীক লাটীন হইতে পারিভাষিক শব্দ গড়িয়া লইয়াছে। রুশীয়েরা ত আরও আধুনিক সময়ে বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে। এইসব জাতি যাহা পারিয়াছে, আমরা কেন তাহা পারিব না? লাটীন ও গ্রীক হইতে যেমন শব্দ গড়া যায়, সংস্কৃত হইতে শব্দ রচনার সুযোগ তাহা অপেক্ষা বেশী বৈ কম নহে।

জাপানের দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের আরও শিক্ষালাভ হয়। পাশ্চাত্য দেশসকলের সহিত সংস্পর্শের পূর্ব্বে জাপানী সাহিত্য ভারতের প্রধান প্রধান প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি অপেক্ষা বেশী সমৃদ্ধিশালী ছিল না; জাপানীদের উচ্চ সাহিত্যিক শিক্ষা যে চীনদেশীয় সাহিত্যের অধ্যয়ন দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাও সংস্কৃত, আরবী বা ফারসী সাহিত্য

অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী নহে। এ অবস্থায় ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, জাপানের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট ওকুমা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ওাসেডা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত করেন যে তথায় অধ্যয়ন অধ্যাপনার সমুদয় কাজ জাপানী ভাষায় হইবে। তখন জাপানী ভাষায় বিদ্যার নানাশাখার উচ্চ উচ্চ বিষয়ের পুস্তক ছিল না। পাঠ্য-পুস্তকের এই অভাব মোচনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগকে কেবল পুস্তক রচনা ও প্রকাশে নিযুক্ত রাখা হয়। প্রথম প্রথম এই বিভাগ লোকসান দিয়া চালান হইত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে উহা একটি লাভের কারবার হইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত ওাসেডা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ১০,০২৯ জন ছাত্র পড়িয়াছিল ও পড়িতেছিল। ১৯১৩র শেষে ৬,৬২২ জন ছাত্র তথায় পড়িতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য অধ্যাপকদের সংখ্যা ছিল ১৬৫। তা ছাড়া আরও শিক্ষক আছে। এখানে উচ্চতম মান (standard) পর্য্যন্ত রাষ্ট্রনীতি (politics), আইন, বার্ত্তা-শাস্ত্র (economics), বাণিজ্য, বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং এবং সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। সমস্ত পুস্তক জাপানী ভাষায় লিখিত, এবং ব্যাখ্যা অধ্যাপনা জাপানী ভাষায় হয়। জাপানে আরও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা জাপানীতে হয়, যদিও তাহাদের পাঠ্যতালিকার মধ্যে জার্ম্মেন, ফরাসী বা ইংরেজী বহিও আছে।

যখন জাপানী অন্ততঃ একটি বিশ্ববিদ্যালয়েও বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় উচ্চতম মান পর্য্যন্ত জাপানী বহি ও জাপানী ব্যাখ্যানের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তখন আমাদের দেশে অন্ততঃ প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সব বিষয় নিশ্চয়ই বাংলায় শিখান যাইতে পারে। আমাদের ধারণা কলেজেও বাংলায় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তাহা ক্রমশঃ পরে আসিবে।

প্রবেশিকা-বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষার মত শিখাইয়া আর সব বিষয় বাংলায় শিখাইবার বিরুদ্ধে তিনটি প্রধান আপত্তি শুনা যায়। (১) এরূপ করিলে ছাত্রদের ইংরেজীর জ্ঞান কম হইবে; (২) তাহারা কলেজের ইংরেজী অধ্যাপনা ও ব্যাখ্যান বুঝিতে পারিবে না; (৩) তাহারা চাকরী ও অন্যান্য কাজের জন্য বর্ত্তমান প্রণালীতে শিক্ষিত লোকদের সমকক্ষ হইবে না। আপত্তিগুলি বিচার-যোগ্য।

ছেলেদের ইংরেজী-জ্ঞান শিক্ষকদের যোগ্যতা, শিক্ষাদান-প্রণালী এবং পরীক্ষায় কিরূপ জ্ঞান চাওয়া হয়, অনেকটা তাহার উপর নির্ভর করে। যদি শিক্ষকেরা যোগ্য হন, শিক্ষাদান-প্রণালী ভাল হয়, এবং পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট কোন এক বা একাধিক বহি সম্বন্ধে জ্ঞান না চাহিয়া, পরীক্ষার্থীদের বয়স অনুসারে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের কতকটা জ্ঞান চাওয়া হয়, তাহা হইলে ছাত্রদের ইংরেজী-জ্ঞান নিশ্চয়ই কম হইবে না। কেমন করিয়া ইহা হইতে পারে, এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব না। কেবল জার্ম্মেন বিদ্যালয়-সকলে ইংরেজী শিক্ষার ফলের উল্লেখ করিব। লংম্যান্স্‌দের প্রকাশিত রসেলের লিখিত পুস্তকে (Russell's German Higher Schools) জার্ম্মেনীর রিয়াল-স্কুল গুলিতে (Real Schools) ইংরেজী শিখাইবার শ্রেণীসমূহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "Here is life and vigour and ability and, of course, most excellent results;" "এখানে খুব স্ফূর্ত্তি ও জীবন্তভাব এবং যোগ্যতা দৃষ্ট হয়; সুতরাং ফলও খুব ভাল হয়।" এই খুব ভাল ফল লাভ করিবার জন্য খুব বেশী সময় দেওয়া হয় না। ছেলেরা ইংরেজী পড়ে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে সপ্তাহে চারি ঘণ্টা, দ্বিতীয় শ্রেণীতেও সপ্তাহে চারি ঘণ্টা, এবং তৃতীয় শ্রেণীতে হপ্তায় পাঁচ ঘণ্টা। তৃতীয় শ্রেণীর নীচে ইংরেজী পড়ানই হয় না। রসেলের পুস্তকে ইংরেজী শিক্ষাদান-প্রণালী বর্ণিত এবং ইংরেজী পাঠ্য পুস্তকগুলির নামও উল্লিখিত হইয়াছে। প্রশিয়ার রিয়ালজিমনাসিয়েন্ (Realgymnasien) নামক স্কুল-সমূহে সর্ব্বোচ্চ ছয়টি শ্রেণীতে সপ্তাহে কেবল তিন ঘণ্টা করিয়া ইংরেজী পড়ান হয়। অন্যান্য শ্রেণীতে ইংরেজী পড়ানই হয় না। জার্মেন ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষা এই পর্য্যন্ত। এবং বলা বাহুল্য জার্ম্মেনীতে আর সমস্ত বিষয়ই জার্ম্মেন্ ভাষার সাহায্যে শিখান হয়, এবং জার্ম্মেন বিশ্ববিদ্যালয়-সকলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, বা ইংরেজীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু কেবল স্কুলে কয়েকটি শ্রেণীতে হপ্তায় কয়েক ঘণ্টা ইংরেজী শিখিয়া, ভারতবর্ষে জার্ম্মেন অধ্যা-পকেরা কলেজে ইংরেজীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন, এবং

চিঠি পত্র রিপোর্ট লেখা প্রভৃতি কাজ করিয়াছেন। তা ছাড়া তাঁহারা প্রত্নতত্ত্ব (archaeology) ও অন্যান্য সরকারী বিভাগে চাকরী করিয়া ইংরেজীতে পত্রব্যবহার করিয়াছেন, ও পুস্তক, রিপোর্টাদি লিখিয়াছেন। জার্মেন বণিকরা এদেশে ইংরেজীর সাহায্যে বড় বড় কারবার করিয়াছে। শুধু ভারতবর্ষেই যে জার্মেনরা অধ্যাপকতা বা বাণিজ্য করে, তাহা নয়, আমেরিকাতে আরও বেশী পরিমাণে করে। ইংরেজী কম জানার জন্য যদি তাহাদের কাজ খারাপ হইত, তাহা হইলে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত বিষয় ইংরেজীতে না শিখাইয়া, উহা কেবল দ্বিতীয় ভাষারূপে শিখাইলে, ছেলেদের ইংরেজী-জ্ঞান নিশ্চয়ই কম হইবে, এমন বলা যায় না। ঐ ভাষা যোগ্য শিক্ষকের দ্বারা সুপ্রণালী অনুসারে ভাল করিয়া যাহাতে শিখান হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে। দেশভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণদের চেয়ে বয়সে ছোট ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছেলেরা পাটীগণিত, ইতিহাস, ভূগোলাদি বিষয়ে তাহাদের সমান জ্ঞানসম্পন্ন। ছাত্রবৃত্তি-পাশকরা এমন অনেক ছেলের বিষয় অনেকে জানেন যাহারা এণ্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি হইবার ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই প্রবেশিকা পাশ করিয়াছে, এবং কেহ কেহ বৃত্তি পাইয়াছে। তাহাদের ইংরেজী-জ্ঞান, যাহারা শৈশব হইতে ১০ বৎসর ইংরেজী পড়িয়াছে, তাহাদের চেয়ে কম নয়। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের গত অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন :—

দেশে বিজ্ঞানপ্রচারের তৃতীয় অন্তরায় বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা। এই বিদেশী ভাষা, ইংরেজী ভাষা এত কঠিন যে, শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত দশ বার বৎসরের যত্নে ও শ্রমে যৎকিঞ্চিৎ আয়ত্ত হয়। মস্তিকের শক্তি অফুরন্ত নহে, আমাদের বয়সও নহে। এই ভাষা শিখিতে আমাদের কত রক্ত জল হইতেছে, কত শক্তি ক্ষয় হইতেছে, তাহা চিন্তা করুন। অথচ এই বিদেশী ভাষা শিক্ষা আমাদের কাম্য নহে; কাম্য বিজ্ঞান। কাম্যের চতুর্দ্দিকের কণ্টকের প্রাকার ভেদ করিতেই শক্তি সামর্থ্য ক্ষয় হইতেছে। ইহাও সহ্য হইত; মাতৃভাষায় না শেখাতে বিদেশী বিজ্ঞান বিদেশী থাকিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান-বিষয়ে কিছু বলিতে কিছু লিখিতে হইলে বিদেশী ভাষায় বলিতে লিখিতে হইতেছে; চিন্তা করিতে হইলেও বিদেশী শব্দমূর্ত্তির উপাসনা করিতে হইতেছে। কারণ, অন্য সাধন জানা নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে, সভা-সমিতি আপিশ আদালতে যাইতে হইলে গৃহবেশ ত্যাগ করিয়া যেমন সভ্যবেশ পরিধান করি, এবং সেখান হইতে আসিয়াই সে বেশ ত্যাগে সুস্থ বোধ করি, আমাদের পক্ষে বিজ্ঞানও তেমন হইয়াছে। উহা দেশের ধাতুতে মিশিতেছে না, বাহিরে বাহিরে শোভাসম্পাদনের নিমিত্ত থাকিতেছে। ইংরেজীতে বিজ্ঞান শিখিতে ছাত্রের যত বৎসর লাগিতেছে, মাতৃভাষায় শিখিলে অর্দ্ধেক সময় লাগিত না।

কয়েক বৎসর আমাকে কটকের মেডিক্যাল ইস্কুলে রসায়নবিজ্ঞান শিখাইতে হইয়াছিল। ছাত্রদিগের শিক্ষণীয় বিষয় অল্প ছিল না; এখনকার আই-এস সি পরীক্ষার নিমিত্ত যতখানি আছে প্রায় ততখানি ছিল। ছিল না কর্ম্মাভ্যাস। কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যে অধ্যাপনা শেষ করিতে হইত। আমরা কলেজে কত কুড়ি দিন দিয়া থাকি, তাহা সবাই জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশে অন্যূন সাতকুড়ি দিন অধ্যাপনা করিতেছি। এই প্রভেদের প্রধান কারণ ভাষার প্রভেদ। মেডিক্যাল ইস্কুলের ছাত্র মাতৃভাষায় শিখিত। দেখিয়াছি, ইংরেজিতে যাহা এক ঘণ্টা বুঝাইয়া ছাত্রের হৃদ্গত করিতে পারি নাই, অল্প বাঙ্গালা কথায় তাহা অক্লেশে পারিয়াছি। জল কেন ছাঁকি, কি কাজে কেমন ছাঁকনি চাই, ইত্যাদি হাজার বলি, এক "ফিল্‌টার" শব্দে একটা বিদেশী অজানা অদেখা বস্তুর আব্‌ছায়া মনে ভাসিতে থাকে। বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে বয়সে যত বিদ্যা আয়ত্ত করে, সে বয়সে তত বিদ্যা আমাদের ছাত্রেরা পারে না। এই যে ভাষা-বিভীষিকা যাহার জন্য আমাদের ছাত্রদিগের দেহ মন জড়ভাবাপন্ন হইতেছে, ইহার প্রতিকার কি হইবে না? ইংরেজি ভাষা, বিদেশী ভাষা শিখিলে হিত হয় না, কিংবা বিনয় অভ্যাস হয় না, এমন বলি না। বলি, কি মূল্য দিয়া এই হিত ক্রয় করিতেছি? মাতৃভাষায় শিখিলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব মনে গাঁথা হইয়া যায়, বিদেশী ভাষায় বহু সময় লাগে। আরও দেখুন, বিদেশী ভাষা হেতু শিক্ষার ফল দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে না। বিজ্ঞান জনকয়েকের অধিকৃত থাকিতেছে, সকলের ভোগে আসিতেছে না।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে বাংলাভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিলে কেবল যে শিক্ষা ভাল হয়, জ্ঞান সম্পূর্ণ নিজের জিনিষ হইয়া যায়, তাহা নহে, ইহাতে সময় কম লাগে এবং শক্তিও কম লাগে। সময় ও শক্তি যতটা এই প্রকারে বাঁচাইতে পারা যায়, দরকার হইলে তাহার কতকটা ইংরেজী ভাষায় অতিরিক্ত শিক্ষা দেওয়ায় প্রযুক্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, আর সব বিষয় বিদ্যালয়ে শিখাইয়া ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা রূপে শিক্ষা দিলে ছেলেরা এত কম ইংরেজী শিখিবে যে কলেজে আসিয়া অধ্যাপকদের ইংরেজী ব্যাখ্যান ও ইংরেজীতে অধ্যাপনা বুঝিতে পারিবে না। যে-সব ছেলে ছাত্রবৃত্তি পাশের পর কেবল ৪ বৎসর ইংরেজী পড়িয়া এণ্ট্রেন্স্ পাশ করিয়াছে, তাহারা কি কলেজে আসিয়া ইংরেজীতে অধ্যাপনায় লাভবান হয় নাই? তাহা ত নয়। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে

আমরা বরং ইহার বিপরীত সাক্ষ্যই দিতে পারি। জার্মেনেরা তাহাদের দেশে স্কুলে অল্প সময় মাত্র ইংরেজী শিখিয়া ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় ইংরেজীতে অধ্যাপনা করে, রিপোর্ট ও বহি লেখে, পত্র-ব্যবহার করে, বড় বড় কারবার চালায়, আর আমাদের দেশের ছেলেরা কি এতই অল্পবুদ্ধি যে তাহারা বিদ্যালয়ে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষার মত করিয়া ৭।৮ বৎসর শিখিলেও তাহাদের উহাতে কলেজে পড়িবার মত দখল জন্মিবে না? ইহা ত বিশ্বাস হয় না।

জাপানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সকলে (middle schools) ৫ বৎসর ধরিয়া সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা মাত্র ইংরেজী শিখান হয়। উচ্চ বিদ্যালয়-সকলে ছাত্রেরা ৩ বৎসর সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা মাত্র ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মেনের মধ্যে কোন দুটা বিদেশী ভাষা শিখে। ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত জাপানে শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকে লিখিত আছে যে জাপানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ভাল ইংরেজী লিখিতে পারে না, বলিতে ত পারেই না। কিন্তু এই ছাত্রেরাই উচ্চ বিদ্যালয়ে আরো ৩ বৎসর সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা কোন দুটা পাশ্চাত্য ভাষা শিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ পাশ্চাত্যভাষাভাষী অধ্যাপকদের অধ্যাপনা ও ব্যাখ্যান বুঝিতে পারে। তাহারা যদি ইংরেজ, ফরাসী বা জার্মেন অধ্যাপকদের ভাষা বুঝিতে না পারিত, তাহা হইলে জাপান গবর্ণমেণ্ট এই-সব বিদেশী অধ্যাপকদিগকে নিযুক্ত করিতেন না, জাপানীরাও যেরূপ পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছে, তাহা হইতে পারিত না। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে জাপানীদের ভাষার গঠন ইউরোপীয় ভাষা-সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এইজন্য পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ শিখিতে তাহাদের বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ভাষা এবং ইংরেজী ভাষা একই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। সুতরাং আমাদের ইংরেজী শিক্ষা জাপানীদের মত আয়াস বা সময়-সাধ্য না হইবার কথা।

তৃতীয় আপত্তি, নানাবিধ চাকরী, আইন-ব্যবসায় ডাক্তারী, বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য এখন ছাত্রেরা যতটা উপযুক্ত হয়, ইংরেজী কেবল দ্বিতীয় ভাষা রূপে শিখিলে ততটা উপযুক্ত হইবে না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা মাত্র হইলেও ছাত্রেরা যথেষ্ট ইংরেজী শিখিতে পারিবে; সুতরাং এই-সকল নানা কার্য্যে সিদ্ধি ইংরেজী-জ্ঞানের উপর যে পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা তাহাদের অধিকৃত হইবার সম্ভাবনা। তাহার পর ইহাও বিবেচ্য যে সাংসারিক উন্নতির জন্য ইংরেজীর কিরূপ জ্ঞান দরকার। আমাদের ত মনে হয় ইংরেজী ভাষার সমস্ত ধরণধারণ খুঁটিনাটি তন্নতন্ন করিয়া না জানিলেও চলে। অন্য চাকরী দূরে থাক, দেশী হাইকোর্টের জজদের, সেশ্যান জজদের, মাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে সকলেই যে বিশুদ্ধ ইংরেজী লিখিতে পারেন, এরূপ বলা যায় না। ইহা আমাদের নিজের অভিজ্ঞতার কথা। বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার ও অধ্যাপকদের সম্বন্ধেও ইহা সত্য নহে যে তাঁহারা সকলেই ভাল ইংরেজী লেখেন, বলেন বা জানেন। খুব পসার ও রোজগার আছে এরূপ উকীল ইংরেজীর ভুল করেন, ইহাও জানা কথা। ভাল ভাল ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ারদেরও এই ত্রুটি আছে। বাণিজ্যের ত কথাই নাই। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বণিকদের মধ্যে অধিকাংশ ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ। জার্মেন ও জাপানীরা সামান্য ইংরেজী জানিয়াও আমাদের দেশের ব্যবসা দখল করিয়াছিল ও করিতেছে, আর আমরা এক-একজন বিদ্যার জাহাজ হইয়া উপবাস করিতেছি। বাণিজ্যে খুব কৃতিত্ব লাভের জন্য পৃথিবীব্যাপী কোন ভাষা কিছু জানা দরকার বটে, কিন্তু বাণিজ্যে সিদ্ধিলাভ ভাষাজ্ঞান অপেক্ষা অন্যবিধ যোগ্যতা ও গুণের উপর নির্ভর করে। আমরা নিশ্চয়ই ইহা মনে করি যে ইংরেজী ভাল জানা এবং ভাল লিখিতে ও বলিতে পারা বাঞ্ছনীয়। যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা চূড়ান্ত রকমে করাই আদর্শ। কিন্তু চাকরীতে ও নানা ব্যবসায়ে পয়সা রোজগার, অতি উৎকৃষ্ট ইংরেজী বলিতে বা লিখিতে না পারিলে হয় না, ইহা মহা ভ্রম। ইংরেজীতে বাহাদুরী দেখাইবার প্রয়াস একটা কুসংস্কার মাত্র। যাহার কোন বিষয়েই গভীর জ্ঞান নাই, এরূপ লোকও ফড়ফড় করিয়া ইংরেজী বলিতে এবং খচ্ খচ্ করিয়া ইংরেজী লিখিতে পারে। কিন্তু তাহার মূল্য কি?

ইংরেজী কাগজের সম্পাদক, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কংগ্রেসের নেতা, মিউনিসিপালিটির সভাপতি, প্রভৃতিদের মধ্যে সবাই ইংরেজীতে মহাপণ্ডিত নহেন। নাম-করা

ভাল দেখাইবে না; নতুবা লেখার দৃষ্টান্ত সহ নাম করা অসম্ভব হইত না।

আমরা কেবল বাংলাভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা লিখিলাম, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রধান প্রধান ভাষাতেও এইরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তন্মধ্যে যেগুলি বাঙ্গলার মত উন্নত নহে, তাহাদেরও উন্নত হইতে বেশী সময় লাগিবে না। কিন্তু অনেকে বলিবেন যে ভারতবর্ষে এত বেশী ভাষা প্রচলিত, যে, সবগুলিতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলে মহা অনর্থ ঘটিবে, দেশের ঐক্য সুদূর-পরাহত হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে বাস্তবিক যত ভাষা আছে বলিয়া ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, তত ভাষা নাই। ভারতবাসীরা যে কখন এক হইতে পারে না, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে তাঁহারা যেন বাঁচেন। এই জন্য ভারত-বাসীদের মধ্যে পরস্পর যতটা ও যত রকমের প্রভেদ তাঁহারা কল্পনা করেন, তত প্রভেদ নাই। তাঁহারা যে ভাবে উপ-ভাষাগুলিকেও স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া খাড়া করিয়াছেন, সে প্রকারে ইংলণ্ডেও ৮।১০ টা ভাষা চলিত বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে। ভারতপ্রবাসী ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিৎ ১৯০১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে বলিয়াছিলেন ভারতবর্ষের ভাষার সংখ্যা ১৪৭টি। ১০ বৎসর পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সস রিপোর্টে লেখা হইয়াছে যে ভারতবর্ষের ভাষার সংখ্যা ২২০টি। অর্থাৎ ১০ বৎসরে আমাদের ভাষাগুলাও দেড় গুণ, শতকরা ৫০টা বাড়িয়া গেল! বাস্তবিক ভাষা বাড়ে নাই। ইংরেজ পণ্ডিতদের চুল চিরিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বাড়িয়া চলিয়াছে।

সে যাহা হউক, এই ২২০টা ভাষার মধ্যে কতকগুলি অতি অল্পসংখ্যক লোকেই বলে। কালে সে-সব ভাষা লোপ পাইবে, এবং যাহারা উহাতে কথা বলে, তাহারা তাহাদের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাবহুল ও অগ্রসর প্রতিবেশীদের ভাষাই ব্যবহার করিবে। এখনও অনেক প্রদেশে অসভ্য লোকেরা তাহাদের সভ্যতর প্রতিবেশীদের ভাষা জানে ও বলে; যেমন সাঁওতালেরা বাংলা বলে।

কোন কোন ভাষা যে আগেকার চেয়ে কম লোকে ব্যবহার করিতেছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বিদেশে ও ভারতে দুর্লভ নহে। ওয়েল্‌স্ দেশে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৪৬ জন ওয়েল্‌ষ ভাষা বলিত; ১৯১১তে তাহাদের সংখ্যা কমিয়া শতকরা ৪০·৪ হইয়াছে। স্কট্‌ল্যাণ্ডে ১৮৯১, ১৯০১ এবং ১৯১১ সালে যথাক্রমে শতকরা ৬.৩, ৫·২, ও ৪.৩ জন গেলিক ভাষায় কথা বলিত। আয়ারল্যাণ্ডে ১৮৯১, ১৯০১ ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে শতকরা ১৪.৫, ১৪.৪, ও ১৩.৩ জন আইরিশ ভাষায় কথা কহিত। এই তিনটি প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষাভাষীরা সভ্য, শক্তিশালী ও কর্ম্মিষ্ঠ। এই তিন ভাষাতেই ভাল সাহিত্য আছে। "সেল্‌টিক্ রিভাই-ভ্যাল" নামক পুনরুজ্জীবন-প্রচেষ্টাও কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। এ সব সত্ত্বেও লোকে ক্রমশঃ এই তিনটি ভাষা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজী ব্যবহার করিতেছে। সুতরাং আমাদের দেশের আদিমনিবাসী অসভ্য লোকদের যে সব ভাষার নিজের কোন বর্ণমালা নাই, পুরাতন সাহিত্য এমন কি নূতন সাহিত্যও নাই, সেগুলি যে ক্রমশঃ অপ্রচ-লিত হইয়া পড়িবে তাহা খুবই সম্ভব। ইহা যে ঘটি-তেছে, তাহার প্রমাণও আছে। সেন্সস্ রিপোর্টে দেখা যায় যে যাহারা মুণ্ডা ভাষাগুলিতে কথা কয়, তাহাদের সংখ্যা এখন মোটামুটি ত্রিশ লক্ষ; কিন্তু "there are signs that they were formerly far more widespread;" "কিন্তু পূর্ব্বে যে তাহাদের সংখ্যা ও বিস্তৃতি আরো বেশী ছিল, তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে।" অতএব অনুমান ও সাক্ষাৎ প্রমাণ উভয় দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে অসভ্যদের ভাষাগুলি টিকিবে না। সেগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা।

সরকারী ভাষাতত্ত্ববিদেরা বিহারী, পূর্ব্বাঞ্চলের হিন্দী ও পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী, এই তিনটি স্বতন্ত্রভাষার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু দেশের ৮ কোটি ২০ লক্ষ লোকে বলে যে তাহাদের ভাষা হিন্দী। তাহাদের ভাষাকে ত্রিধাবিভক্ত না করিয়া হিন্দী বলিলেই যথেষ্ট হয়।

এইরূপে অন্যান্য প্রধান ভাষারও ডালপালা বাদ দিয়া দেখা যায় যে ভোটিয়া, ব্রহ্মদেশীয়, তমিল, মলয়ালম, কানাড়ী, তেলুগু, পঞ্জাবী, সিন্ধী, মরাঠী, ওড়িয়া, বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাতী, নেপালী, এই কয়টি ভাষাতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষা দিলে যথেষ্ট হইতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য আরো কোন কোন

ভাষা ব্যবহৃত হইতে পারে। যদি তাহারা কালক্রমে সাহিত্যে সমৃদ্ধ হয়, তাহা হইলে উচ্চতর শিক্ষার জন্যও তাহারা ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, যদি উল্লিখিত ১৬টি ভাষার কোনটির ক্রমিক অবনতি হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহা আর উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইবে না। সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের শিক্ষার জন্য ১৬টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এমন কিছু বেশী নয়। বেল্‌জিয়মের লোকসংখ্যা ৭৫ লক্ষ, তথায় তিনটা ভাষা প্রচলিত। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৩৮ লক্ষ, তথায় চারিটা ভাষা প্রচলিত।

যে যুক্তিমার্গ অনুসরণ করিয়া আমরা বলিয়াছি যে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সব বিষয়ে শিক্ষা দেশভাষায় হইতে পারে, তাহার শেষ লক্ষ্যস্থল দেশভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন;—যেমন জাপানে ওাসেডা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের জন্য ১৬ টা বা ২০ টা বিশ্ববিদ্যালয় কিছু বেশী নয়। এই-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদয় বিষয় দেশভাষায় শিখান হইবে; তা ছাড়া ইংরেজী ও আরও ২।১টা পাশ্চাত্য ভাষা এবং সংস্কৃত আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে। সমুদয় উন্নত দেশের বিদ্যালয়ে প্রাচীন সাহিত্য, দেশভাষা, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি ছাড়া অনেক স্থলে দুটা বিদেশী ভাষা শিখান হইয়া থাকে। মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞানলাভ অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া আমাদের ছেলেরাও এইরূপ নানা বিদ্যা ও নানা ভাষা শিখিতে সমর্থ হইবে।

উচ্চ রাজকার্য্যে ভারতবাসী ও ইউরোপীয়

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া সাক্ষাৎভাবে ভারতশাসনের ভার গ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব্বে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বৃটিশ-অধিকৃত ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। কোম্পানী এই ঘোষণা করেন যে ভারতবাসীরা যোগ্য হইলে জাতি বা ধর্ম্মের জন্য কোনও উচ্চ সরকারী চাকরী হইতে বঞ্চিত হইবে না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়াও এইরূপ ঘোষণা করেন। তাঁহার পুত্র সম্রাট্‌ সপ্তম এড্‌ওার্ড এবং পৌত্র পঞ্চম জর্জ্জ এই ঘোষণার সমর্থন করেন। তা ছাড়া, যাহারা যে দেশের লোক, তাহাদের সেই দেশের সর্ব্বোচ্চ কাজ করিবার স্বাভাবিক অধিকারও আছে। এখন দেখা যাক্‌, স্বাভাবিক অধিকার এবং সরকারী ঘোষণা সত্ত্বেও ভারতবাসীরা কি পরিমাণে উচ্চ চাকরী পাইয়াছে।

এলাহাবাদের পাইয়োনীয়ার ছাপাখানা হইতে তিনমাস অন্তর ভারতের সকল প্রদেশের উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের একটি তালিকা বাহির হয়। ইহার নাম কথাইও্‌ সিবিল লিষ্ট। গত ১লা জুলাই পর্য্যন্ত সংশোধিত যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। আমরা উহাই অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। ইহা একখানি ৫০৪ পৃষ্ঠা পরিমিত বড় বহি। ইহার মধ্যে সৈনিক বিভাগের চাকরীর কোন তালিকা নাই। প্রবন্ধে যে-সকল সংখ্যা দিলাম, আমরা তাহা গণনা করিয়া স্থির করিয়াছি।

তালিকাটিকে, সিবিল সার্ভিস্‌সমূহের এবং ভারতগবর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চতর ইউরোপীয় চাকরীগুলির তালিকা (List of the Civil Services and Higher European Services under the Government of India) বলা হইয়াছে। কিন্তু আইন ভারতবাসীদিগকে কোন চাকরীরই অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে নাই, কিম্বা কোন শ্রেণীর চাকরীই কেবল ইউরোপীয়দের জন্য রাখিয়া দেয় নাই। সুতরাং কোন শ্রেণীর চাকরীকে ইউরোপীয় চাকরী বলা উচিত নহে।

শাসনবিভাগে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটী অপেক্ষা উচ্চতর কাজে কোন ভারতবাসী নিযুক্ত নাই। বলা বাহুল্য, গবর্ণর জেনেরাল, তিনজন গবর্ণর, চারিজন লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্ণর, এবং আট জন চীফ কমিশনর, সকলেই ইউরোপীয়। ডিবিজনের কমিশনারেরাও সকলেই ইউরোপীয়।

গবর্ণর-জেনেরাল প্রভৃতির খাস্‌ কর্ম্মচারীদের তালিকা।

	ইংরেজ	ভারতবাসী
গবর্ণর-জেনারাালের	১১	২
বঙ্গের গবর্ণরের	১৪	২

	ইংরেজ	ভারতবাসী
বোম্বাইয়ের গবর্ণরের	৯	৩
মান্দ্রাজের „	৭	২
যু, প্র, লেফ্‌টেনান্ট-গবর্ণরের	৫	২
বিহার „	৪	২
ব্রহ্ম „	৪	২
পঞ্জাব „	৩	৩

এই তালিকাভুক্ত ভারতীয় কর্ম্মচারীরা সকলেই নিম্নপদস্থ এ-ডি-কং; তার চেয়ে বড় কাজ কাহারও নাই।

মন্ত্রীসভার সভ্যদের তালিকা।

	ইংরেজ	ভারতবাসী
গবর্ণর-জেনার‍্যালের	৭	১
বঙ্গের গবর্ণরের	২	১
বোম্বাই „	৩	১
মান্দ্রাজ „	২	১
বিহার লেফ্‌টেনান্ট-গবর্ণরের	২	১

ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিয়েট।

বিভাগ	ইংরেজ	ভারতবাসী
পররাষ্ট্র ও রাজনীতি	১৭	১
হোম্‌ বা স্বরাষ্ট্র	৯	৩
হিসাব	৯	৬
সৈনিক হিসাব	১২	০
পূর্ত্ত	১৪	০
শিক্ষা	৮	২
আইন	৪	২
বাণিজ্য	৭	৩
সৈনিক	১১	১

ভারত-গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিয়েটগুলিতে একজন সেক্রেটারীও ভারতবাসী নহে। ভারতবাসীরা সকলেই নিম্নপদস্থ।

ভারত-গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বিভাগে ২০ জন ইংরেজ ও ৩ জন ভারতবাসী কাজ করে। তিন জনই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা সর্দ্দার-কেরাণী মাত্র। রেলওয়ে-হিসাব বিভাগের দশজন কর্ম্মচারীই ইংরেজ।

প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট সমূহ।

প্রদেশ	ইংরেজ	ভারতবাসী
বাংলা	১৯	৬
বোম্বাই	১৬	৫
মান্দ্রাজ	১৫	৫
যুক্ত প্রদেশ	১৫	০
বিহার	১৪	২
ব্রহ্ম	১৯	১
আসাম	১০	১
মধ্য প্রদেশ	১২	২
পঞ্জাব	২৭	১
উ, প, সীমান্ত	৮	৩

বঙ্গে একজন দেশী অস্থায়ী সেক্রেটারী, মান্দ্রাজে ১ জন স্থায়ী সেক্রেটারী এবং আসামে ১ জন স্থায়ী সেক্রেটারী আছেন। প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটগুলিতে নিযুক্ত আর সব ভারতবাসী নিম্নপদস্থ।

সিবিল সার্বিস।

প্রদেশ	মোট সংখ্যা	ইংরেজ	ভারতবাসী
বাংলা	১৭৮	১৬৫	১৩
বোম্বাই	১৮৫	১৭৩	১২
মান্দ্রাজ	১৭৬	১৬৫	১১
আসাম	৪৩	৪৩	•
বিহার	১১৬	১১১	৫
ব্রহ্ম	১২৫	১২৩	২
মধ্য প্রদেশ	৯৭	৯৩	৪
পঞ্জাব	১৫০	১৪৫	৫
উ, প, সীমান্ত	১৫	১৫	•
যুক্ত প্রদেশ	২৩৯	২২৭	১২
সমগ্র ভারতে	১৩২৪	১২৬০	৬৪

অর্থাৎ সিবিলিয়ানদের মধ্যে শতকরা ৪·৮ জন মাত্র ভারতবাসী। ইহা ছাড়া ভারতীয় ষ্টাট্যুটরী সিবিলিয়ান বোম্বাইয়ে ১, মান্দ্রাজে ১, বিহারে ১, মধ্যপ্রদেশে ১, পঞ্জাবে ৩, এবং যুক্তপ্রদেশে ২ জন আছেন। আসামে ৮ জন সৈনিক কর্ম্মচারী সিবিলিয়ানদের কাজ করেন; তাঁহারা সবাই ইংরেজ। ব্রহ্মে ৪৯ জন সৈনিক ও অন্যবিধ কর্ম্মচারী সিবিলিয়ানদের কাজ করেন; সব ইংরেজ। মধ্যপ্রদেশের এইরূপ ৮ জন কর্ম্মচারীর মধ্যে ২ জন ভারতবাসী। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে ১৭ জন সৈনিক ও ৪ জন অন্যবিধ কর্ম্মচারী সিবিলিয়ানদের কাজ করেন; সকলেই ইউরোপীয়। ব্রহ্মেও এইরূপ ২৮ জন কাজ করেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহই দেশী নহেন।

ভারতীয় সিবিলিয়ান ৬৪ জনের মধ্যে ২৪ জন বাঙ্গালী। নামের দ্বারা যতটা অনুমান করা যায় তাহাতে বোধ হয় ৮ জন মহারাষ্ট্রীয়, ৭ জন মান্দ্রাজী, ৪ জন হিন্দুস্থানী, ২ জন পঞ্জাবী, ২ জন গুজরাতী, ১ জন সিন্ধী, ১ জন

কাশ্মীরী, এবং ১ জন ইউরেশীয় (পিতা বাঙ্গালী)। ৭ জন মুসলমান সিবিলিয়ান আছেন। তাঁহারা কয়জন কোন্ প্রদেশের, তালিকা হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। পার্সী সিবিলিয়ানের সংখ্যা ৬ জন। পার্সী সম্প্রদায়ের ইহা খুব বাহাদুরী; কারণ সাড়ে একত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে পার্সীদের মোট সংখ্যা কেবল একলক্ষ ছিয়ানব্বই জন মাত্র। প্রথম প্রথম অধিকাংশ স্থলে বাঙ্গালীরাই বিলাত যাইতেন। এইজন্য তাঁহাদের প্রাধান্য হইয়াছে; কিন্তু এখন তাহা ক্রমশঃ কমিতেছে।

সিবিলিয়ানদের কার্য্যে নিযুক্ত প্রাদেশিক কর্ম্মচারীর তালিকা।

প্রদেশ	ইংরেজ	ভারতীয়
বাংলা	০	১২
মান্দ্রাজ	১	৮
বিহার	০	৫
ব্রহ্ম	৪	২
মধ্যপ্রদেশ	১	৪
উ-প-সীমান্ত	০	২
পঞ্জাব	২	৯
যুক্তপ্রদেশ	০	১২

এক্ষেত্রে সমুদয় চাকরী ভারতবাসীদেরই পাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা ঘটে নাই।

ভারত গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র বিভাগ।

	ইংরেজ	ভারতীয়
আজমের-মেরবারা	৪	২
বালুচীস্তান	২০	০
বড়োদা	৩	০
মধ্যভারত	১৪	০
গিলগিট্	৩	০
হায়দরাবাদ	৪	০
কাশ্মীর	৬	০
খোরাসান ও সীস্তান	৪	০
মহীশূর	৫	০
নেপাল	২	০
পারস্য উপসাগর	৯	০
রাজপুতানা	১৪	০

ইহার মধ্যে কেবলমাত্র আজমের-মেরবারায় ১ জন ভারতবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের মত এবং অন্যজন মুন্সেফের মত কাজ করেন। বাকী সব কাজগুলি ইংরেজের একচেটিয়া, এবং সবগুলিই বেশ মোটা মাহিনার।

সাম্রাজ্যিক (Imperial) নানাবিধ বিভাগ।

	ইংরেজ	ভারতীয়
প্রত্নতত্ত্ব	৯	৬
অরণ্য	৩	০
ঔদ্ভিদিক প্রেক্ষা	৫	২
ভূতত্ত্ব "	১৮	০
সামুদ্রিক রণ	১১	০
কৃষি	১১	৩
ভারতজরীপ	৮	০
পশু-চিকিৎসা	৩	০
নভোবিদ্যা	৯	১
আরণ্য গবেষণা ও কলেজ	১০	৩

ডাক ও তার বিভাগ।

এই বিভাগের ডিরেক্টর জেনেরাল ও তাঁহার প্রতিনিধি ইংরেজ। ডাকবিভাগের ৯ জন পরিচালক কর্ম্মচারীদের মধ্যে ৬ জন ইংরেজ। টেলিগ্রাফ এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৯ জনই ইংরেজ, ট্রাফিকের তিনজনও তাই। ডাক ও তার বিভাগের হিসাব আফিসে ৪ জন ইউরোপীয় ও ৬ জন ভারতীয়। তারের ভাণ্ডার আফিস ও কারখানায় ৫ জন ইংরেজ এবং একজন দেশী। রেলওয়ে মেল সার্ভিসে ৫ জন ইংরেজ, তিনজন দেশী (তিনজনই বড় কেরাণী মাত্র)।

ডাক চক্র ও তার চক্র।

সমুদয় প্রাদেশিক ডাকচক্রগুলিতে ৫৬ জন ইংরেজ ও ১০ জন দেশী কর্ম্মচারী আছেন। দেশীরা কেহ পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল নহেন। তার-চক্রগুলিতে ৭৬ জন ইংরেজ ও ১২ জন দেশী আছেন।

প্রাদেশিক কৃষিবিভাগসমূহ।

প্রদেশ	ইংরেজ	ভারতীয়
বাংলা	৭	২
বোম্বাই	১১	০
মান্দ্রাজ	১০	২
আসাম	৪	০
বিহার	৭	২
ব্রহ্ম	৫	০
মধ্য প্রদেশ	৯	০
উ-প-সীমান্ত	১	০
পঞ্জাব	৬	১
যুক্তপ্রদেশ	১০	২

এই বিভাগগুলির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কৃষকদিগকে উপদেশ দান। অধিকাংশ কৃষক নিরক্ষর; দেশী কর্ম্মচারী

হইলে তবু তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে পারেন। কিন্তু দেশভাষায় অনভিজ্ঞ ইংরেজ এখানেও সর্ব্বেসর্ব্বা।

প্রাদেশিক বনবিভাগসমূহ।

এই সমুদয় বনবিভাগে ২২৬ জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী এবং ২ জন মাত্র দেশী কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। এই দুজনেই পার্সী; তাঁহারা বোম্বাই ও মান্দ্রাজে ১ জন করিয়া নিম্নপদে নিযুক্ত আছেন।

আবকারী, লবণ, আফিং প্রভৃতি।

প্রদেশ	ইংরেজ	দেশী
বাংলা	৩৩	৫
বোম্বাই	৩৭	৬
মান্দ্রাজ	২৮	২
আসাম	২	২
বিহার	৪	১৩
ব্রহ্ম	৩৫	২
মধ্যপ্রদেশ	৪	০
উ, প, সীমান্ত	৪	০
পঞ্জাব	৮	০
যুক্তপ্রদেশ	২৪	১

ভারতীয় জরীপ।

প্রদেশ	ইংরেজ	দেশী
বাংলা	৯	০
মান্দ্রাজ	৭	০
আসাম	৫	০
বিহার	২	০
মধ্যপ্রদেশ	২	০
পঞ্জাব	১৭	২

হিসাব।

	ইংরেজ	দেশী
ভারতবর্ষ	৫৭	১২
বাংলা	৪	৮
বোম্বাই	৮	৫
মান্দ্রাজ	৬	৭
আসাম	৪	১
বিহার	৫	১
ব্রহ্ম	৯	৪
মধ্যপ্রদেশ	৪	৩
উ, প, সীমান্ত	১	০
পঞ্জাব	১০	৩
যুক্তপ্রদেশ	৬	৭

জেল বিভাগ।

প্রদেশ	ইংরেজ	দেশী
বাংলা	১০	০
বোম্বাই	৪	১
মান্দ্রাজ	১১	০
আসাম	৬	২
বিহার	৪	১
ব্রহ্ম	১০	১
মধ্যপ্রদেশ	৬	০
উ, প, সীমান্ত	১	০
পঞ্জাব	৮	০
যুক্তপ্রদেশ	১১	০

প্রাদেশিক রেজিষ্ট্রেশন বিভাগগুলিতে ৮ জন ইংরেজ ও ৩ জন দেশী কর্ম্মচারী আছেন।

পুলিস বিভাগ।

প্রদেশ	ইংরেজ	দেশী
বাংলা	১০১	২
বোম্বাই	৭৪	১
মান্দ্রাজ	৭৫	৩
আসাম	৪১	০
বিহার	৫৬	১
ব্রহ্ম	১২৩	১৫
মধ্যপ্রদেশ	৫৭	২
উ-প-সীমান্ত	২১	০
পঞ্জাব	৯৪	১
যুক্তপ্রদেশ	১১২	০

ব্রহ্মদেশে দেশী ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চৌদ্দজনকেও তালিকাভুক্ত করায় দেশীদের সংখ্যা বেশী দেখাইতেছে। অন্য প্রদেশে ডেপুটী-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদিগকে কম্বাইণ্ড্ সিবিল লিষ্টে ধরা হয় নাই। কারণ, বাস্তবিক তাঁহারা উচ্চ পুলিসের অন্তর্গত নহেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরাই উচ্চ কর্ম্মচারী। তাঁহাদের মোট সংখ্যা ৭৬০। তাহার মধ্যে ৯ জন দেশী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন; এসিষ্টাণ্ট কেহই নাই।

সামুদ্রিক বিভাগসমূহ।

বাংলা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, আসাম, ও ব্রহ্মদেশের সামুদ্রিক বিভাগগুলিতে ৪৪ জন কর্ম্মচারী আছেন; সব ইংরেজ।

পররাষ্ট্রবিভাগের অধীন শিক্ষাকর্ম্মচারী।

ইঁহাদের মধ্যে ২১ জন বিদেশী, একজন দেশী।

শিক্ষা বিভাগ।

প্রদেশ	বিদেশী	দেশী
বাংলা	৪৫	৬
বোম্বাই	৩৭	১

প্রদেশ	বিদেশী	দেশী
মান্দ্রাজ	৩২	২
আসাম	৯	১
বিহার	২৩	১
ব্রহ্ম	১৫	৫
মধ্যপ্রদেশ	২৪	২
উ-প-সীমান্ত	২	১
পঞ্জাব	২৮	০
যুক্তপ্রদেশ	৩৪	০

আসামের একমাত্র দেশী কর্ম্মচারী মহিলা; তিনি মাসিক ২৬০৲ বেতনে এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্ট্রেসের কাজ করেন। ব্রহ্মের তালিকায় ১ জন প্রতিনিধি ইন্সপেক্টর ও ৩ জন সহকারী ইন্সপেক্টর আছেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দেশী লোকটির মাসিক বেতন ১৭০৲ মাত্র।

খ্রীষ্টীয় পাদ্রী বিভাগসমূহ।

দশটি প্রাদেশিক বিভাগে ২১৯ জন ইউরোপীয় এবং ২ জন দেশী লোক কাজ করেন।

প্রাদেশিক চিকিৎসা বিভাগসমূহ।

প্রদেশ	বিদেশী	দেশী
বাঙ্গলা	৪২	১
বোম্বাই	৫৭	৭
মান্দ্রাজ	৫০	৫
আসাম	১১	২
বিহার	২৩	১
ব্রহ্মদেশ	৫৬	১
মধ্যপ্রদেশ	২৬	১
উ-প-সীমান্ত	১১	০
পঞ্জাব	৪৪	৩
যুক্তপ্রদেশ	৫৯	২

প্রাদেশিক রাজনৈতিক বিভাগসমূহ।

এই সব বিভাগে ৯৯ জন বিদেশী এবং ৫ জন দেশী কর্ম্মচারী আছেন। দেশীরা একজন ছাড়া সবাই সামান্য চাকরী করেন।

পূর্ত্তবিভাগসমূহ।

প্রদেশ	বিদেশী	দেশী
বাঙ্গলা	৪৪	১৮
বোম্বাই	৭১	৩০
মান্দ্রাজ	৭৩	২৮
আসাম	২২	২
বিহার	৩৩	১৮
ব্রহ্ম	১০৫	৫
মধ্যপ্রদেশ	৩৮	১৮
উ-প-সীমান্ত	৩০	১
পঞ্জাব	২৭৯	৪৯
যুক্তপ্রদেশ	১৩৬	২৯

এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়ারদিগকেও তালিকাভুক্ত করায় দেশীদের অবস্থা অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা পূর্ত্তবিভাগে কিছু ভাল দেখাইতেছে। বাস্তবিক কিন্তু বেশী ভাল নয়।

রুড়কী এঞ্জীনিয়ারিং কলেজে ১৮ জন বিদেশী অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রভৃতি আছেন। একমাত্র দেশী (পদার্থ-বিজ্ঞানের) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ লইয়া গিয়াছেন।

কাসৌলী গবেষণামন্দিরে ৮ জন ইংরেজ ও একজন দেশী কর্ম্মচারী আছেন।

আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জে ২৭ জন বিদেশী ও ৩ জন দেশী কর্ম্মচারী আছেন। এই তিনজনের মাসিক বেতন যথাক্রমে ৩৩০৲, ৩২০৲, এবং ২৫০৲ মাত্র।

এই সমস্ত ছাড়া আরও কতকগুলি চাকরী আছে। তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে

বিবিধ চাকরী।

	বিদেশী	দেশী
ভারত গবর্ণমেণ্ট	৪৭	২
বাংলা	১৫	০
বোম্বাই	১৪	০
মান্দ্রাজ	১৫	০
আসাম	৬	০
বিহার	৮	০
ব্রহ্মদেশ	১১	০
মধ্যপ্রদেশ	৯	১
উ, প, সীমান্ত	১	০
পঞ্জাব	১০	০
যুক্তপ্রদেশ	২৮	০

এই প্রবন্ধে প্রদত্ত তালিকাগুলি পড়িলে সহজেই মনে অবসাদ আসিতে পারে। কিন্তু উৎসাহ আসাও অস্বাভাবিক হইবে না। সমুদয় কাজ ত আমাদেরই প্রাপ্য। পুরুষকার যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সবগুলি ক্রমশঃ দখল করিতে চেষ্টা করুন।

সিবিলসার্বিস্ পরীক্ষা কেবল বিলাতে হওয়ায় আমরা

সিবিলিয়ানদের চাকরী কমই পাই। পুলিশ পরীক্ষাও লণ্ডনে হয়, এবং তাহা আমাদের দিবারই জো নাই। কিন্তু এ দু-রকমের চাকরী বাদেও দেখা যাইতেছে, বিস্তর মোটা মাহিনার কাজ আমরা পাই না। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীরা যখন আমাদের শিক্ষিত যুবকদের বলেন, "তোমরা চাকরী, চাকরী, কেন কর? স্বাধীন ব্যবসা কর না। গবর্ণমেণ্ট কি সবাইকে চাকরী দিতে পারেন?" তখন তাহা শুনিয়া তাঁহাদের নিঃস্বার্থতায় হাসি পায়। সব রকমের চাকরীতে যোগ্য দেশী লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহার পর এইরূপ উপদেশ দিলে শুনায় ভাল।

পুস্তক-পরিচয়

ভূতপতরীর দেশ—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ৮ অংশিত ৬৫ পৃষ্ঠা, এণ্টিক কাগজে কাস্তিক প্রেসের ছাপা. অনেকগুলি চমৎকার ইঙ্গিতময় চিত্রে সজ্জিত, রঙিন মলাট বোর্ডে বাঁধাই, মূল্য আট আনা মাত্র।

এই পুস্তকের উৎসর্গ (ভূতপতরীর দেশের ভাষায় উৎকোচ) হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিচিত্র আজগুবি রকমে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, উপকথা, ছবি মিলাইয়া বালক হইতে বয়স্কদের পর্য্যন্ত চিত্তগ্রাহী বর্ণনা। সমুদ্রতীরে মনসা-বুড়োর পৃথিবী গঠনের কাহিনী, ঘোড়া-ভূতের নিশ্বাসে উড়ো খৈএর পিছনে তাহার ছুটাছুটির শব্দ-ছবি, সমুদ্রতীরের বালির চড়ার উপর দিয়া পাল্কী চলার মধ্যে মনের মধ্যেকার ছমছমে ভাবের বর্ণনা, আরব্য-উপন্যাসের জের টানিয়া ভারতবর্ষের সহিত শুরু করিয়া নানা দেশের ভূগোল ও ইতিহাসের রহস্যময় আজগুবি ধারা, বিচিত্র শব্দের ও হাস্যকর কথার মালায় গাঁথিয়া অর্থহীন অসম্ভাব্যের পোষাক পরাইয়া লেখক এমন একটি স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব আনন্দ ছেলে বুড়ো সকলের জন্য জমা হইয়া আছে। এই ভূতপতরীর দেশ কল্পনাপ্রবণ বালকবালিকাদেরই দেশ; তাহারা আনন্দে ইহাতে বিচরণ করিবে। আমাদের দেশে শিশুর উপযুক্ত বই দুর্লভ, অবনীন্দ্র বাবুর রঙিন তুলি কয়েকখানি সৃষ্টি করিয়াছে। এখানি অতি চমৎকার কৌশলে শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তগ্রাহী করা হইয়াছে।

ক-কারের অহঙ্কার—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ কর্ত্তৃক প্রকটিত। নিক্রয় এক শিকি ও এক আনা। প্রকাশক বঙ্গবাসী কলেজ স্কুল বুকষ্টল, ২৫।১ স্কট লেন, কলিকাতা, ক্রাঃ দুঃ ৯০ পৃষ্ঠা।

ধর্ম্মকর্ম্ম, দর্শন, ভাষা ও সাহিত্য, জ্যোতিষ, আহার, ভূগোল, প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে কত ক-কার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই অর্থসংলগ্ন পদে গাঁথিয়া লেখক কৌতুক করিয়াছেন। কৌতুক ভিন্ন ইহার অন্য উদ্দেশ্য না থাকিলেও তাহার সঙ্গে ঐ-সকল বিষয়ের এত নাম ও তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও ইঙ্গিত আছে যে এই বই পড়িলে শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের সাহায্য হয়; অনেক জানা কথার কৌতুককর সমাবেশ দেখিয়া আনন্দ হয়, এবং যাহা অজানা এমন কথার ইঙ্গিত পাইলে তাহা জানিবার জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল হয়। কিন্তু বিষয়টি এমনি একঘেয়ে যে একটা অধ্যায় পড়িতে পড়িতেই মন ক্লান্ত হইয়া আসে—ক-এর হেঁয়ালী যেন গোলকধাঁধা, প্রথম ছুচার পাক মন্দ লাগে না, তারপর মনে হয় ত্রাহি মাম্। এই পুস্তক হইতে কোষ-কার অনেক শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

সরল প্রসূতিদর্পণ ও শিশুপালন—মিসেস পি দাস কৃত। মূল্য এক টাকা। মাত্র ৯৩ পৃষ্ঠার বইএর পক্ষে মূল্য বড় বেশী ধরা হইয়াছে। কুন্তলীন প্রেসে ছাপা, কাপড়ে বাঁধা, সচিত্র।

এই পুস্তকে নারী-দেহ ও নারী-শরীরতত্ত্ব, গর্ভধারণ হইতে প্রসব পর্য্যন্ত ও প্রসবান্তে সন্তান পালন সম্পর্কে পঁচিশ অধ্যায়ে আটাশখানি চিত্রের সাহায্যে সরল ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনেকগুলি ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, সেগুলি কেবল বাংলানবিশদের মুস্কিলের পক্ষে একটু অসুবিধা হইবে; দেশী ইংরেজী-অনভিজ্ঞ দাইএরা ঐ-সকলকে চলতি কথায় কি বলে তাহা জানিয়া ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া দিলে বেশ হইত—লেখিকা এক এক স্থলে তাহা দিয়াছেনও, যেমন, আফ্‌টার পেন, প্রসবান্তর বেদনা, বা ভ্যাদাল বা হেঁত্যাল ব্যথা। মোটের উপর বইখানি হইয়াছে ভালো। ভাবী জননীদের ইহা পড়িয়া রাখা উচিত, তাহা হইলে প্রসবের অনেক বিপদ ও শিশুপালনের অনেক ত্রুটি নিবারিত হইতে পারিবে।

মুদ্রারাক্ষস।

১। **সুগম মুগ্ধবোধব্যাকরণম্** পদ্যরচিতম্ শ্রীহরনাথ বিদ্যারত্নেন প্রণীতম্, মূল্যম্ আনকদশকম্, ৺ কাশীধাম, গণেশমহল্লা, শ্রীহরনাথ বিদ্যারত্নের বাটীতে, এবং কলিকাতা ২৪ নং গিরিশবিদ্যারত্নের লেন, গিরিশবিদ্যারত্নযন্ত্রে পাওয়া যায়।

২। **ধাতুরত্নমালা** তথা অভিন্নধাতুরূপরত্নম্ শ্রীহরনাথ বিদ্যারত্নেন প্রণীতম্, মূল্য ৵৹। পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় প্রাপ্য।

৩। **কাশীস্থ বিশ্বেশ্বরাদি নানা দেবতা স্তোত্রম্** নানা পুরাণাদি- সংগৃহীত কাশীমাহাত্ম্যসহিতম্ বিশ্বাসপঙ্কজসমন্বিতঞ্চ, শ্রীহরনাথ বিদ্যারত্নেন প্রণীতম্। পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় প্রাপ্য। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মূল রচনায় কোন কবিত্ব দেখিতে পাইলাম না।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

ভ্রম সংশোধন

১। গত কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে ৭ পৃষ্ঠায় ছাপা সাঁতারে প্রথম শ্রীযুক্ত ম ল মুখোপাধ্যায়ের ছবি শ্রীযুক্ত টি পি সেন ফটোগ্রাফারের তোলা; ইহা স্বীকার করিতে ভুল হইয়াছিল।

২। গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে ১৩৯ পৃষ্ঠায় ছাপা যুদ্ধের খেলা প্রবন্ধটি ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত ইহাও স্বীকার করিতে ভুল হইয়াছিল।

৩। বর্ত্তমান সংখ্যায় বিদেশে ব্যাঙ্ক-সভায় ভারতবাসীর স্থান নামক প্রবন্ধে ২৪১ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ৩ প্যারাগ্রাফের ৮ম লাইনে "দুই লক্ষ টাকা জমা দিয়া" স্থানে "দুই পক্ষ টাকা জমা দিয়া" হইবে।

২৩৯ পৃষ্ঠার নীচের ছবিখানি ছাপাখানার ভুলে উল্টা ছাপা হইয়াছে।

২৪৩ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ৪র্থ প্যারাগ্রাফে "জিমি ক্যাম্বেলের" স্থানে "জিমি ক্যাম্বেল" হইবে।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।"

১৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩২২

৪র্থ সংখ্যা

বোধন

[বিক্রমপুর সম্মিলনীতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিভাষণ ।]

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বংশের জননী প্রপিতামহী দেবী তরুণ যৌবনে বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র শিশুসন্তান লইয়া ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রের লালনপালন ও শিক্ষার ভার লইয়া প্রপিতামহী দেবী যখন নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, তখন একদিন তাঁহার শিশুপুত্র শিক্ষকের তাড়নায় অন্তঃপুরে আসিয়া মাতার অঞ্চল ধারণ করিয়াছিল। যিনি তাঁহার সমুদয় শক্তি একমাত্র পুত্রের উন্নতিকল্পে প্রতিদিন তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিতেছিলেন, সেই স্নেহময়ী মাতা মুহূর্ত্তে তেজস্বিনীর রূপ ধারণ করিয়া পুত্রের হস্ত পদ বাঁধিয়া তাহাকে শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভাবিয়া দেখিলে আমাদের মাতৃভূমি বিক্রমপুর, আমার তেজস্বিনী বংশজননীর মত। সন্তানদিগকে বিক্রম ও পৌরুষে উদ্দীপ্ত হইতে ত্বরা দিয়া তিনি তাহাদের প্রতি আপনার গভীর বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে অঙ্কে রাখিয়া আলস্যে কাল হরণ করিতে দেন নাই, কিন্তু জগতের অগ্নিময় কর্ম্মশালে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন, "পৃথিবীর সংগ্রামময় কর্ম্মক্ষেত্রে যখন যশ, বিক্রম ও পৌরুষ সংগ্রহ করিতে পারিবে তখনই আমার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিবে।" মাতার আদেশ পালন করিবার জন্য বহু শতাব্দী পূর্ব্বে দীপঙ্কর হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বত গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত বহু বিক্রমপুরবাসী ভারতের বহুস্থানে গমন করিয়া কর্ম্ম, যশ ও ধর্ম্ম আহরণ করিয়াছেন। বিক্রমপুর বিক্রমশালী সন্তানের জন্মভূমি, মনুষ্যত্বহীন দুর্ব্বলের নহে। আমার পূজা হয়ত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এই সাহসে ভর করিয়া আমি বহুদিন বিদেশে যাপন করিয়া জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। হে জননি, তোমারই আশীর্ব্বাদে বঙ্গভূমি এবং ভারতের সেবকরূপে গৃহীত হইয়াছি।

কি ঘটনাসূত্রে আমি এখানে সভাপতিরূপে আহূত হইয়াছি তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। কোন্ নিয়মে আমাদের দেশে কোন এক সঙ্কীর্ণ পথে খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগকে বিসদৃশ কার্য্যে নিয়োগ করা হয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। যে যুক্তি অনুসারে ব্যবহারাজীবকে কলকারখানার ডিরেক্টার করা হয়, সেই নিয়মেই লোকালয় হইতে দূরে পরীক্ষাগারে লুক্কায়িত শিক্ষার্থী আজ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিয়োজিত হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ আপনারা গ্রহণ করেন নাই। আপনাদের প্রীতিকর কিছু যে আমি বলিতে পারিব সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। যে বিষয়ে আমার কোন অভিজ্ঞতা

নাই সে বিষয়ে কিছু বলিতে উদ্যম করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমি স্বীয় জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি কেবল সেই বিষয়েই কিছু বলিব। পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া আমি ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে আমাদের সমুদয় শিক্ষা দীক্ষা কেবল মনুষ্যত্ব-লাভের উদ্দেশ্যে মাত্র। কি করিয়া আমরা দুর্ব্বলের ক্রন্দন ও স্ত্রীজনসুলভ মান অভিমান ও আবদার ত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত শক্তিবলে স্বহস্তে স্বীয় অদৃষ্ট গঠন করিতে পারি, তাহাই যেন আমাদের একমাত্র সাধনা হয়।

বিক্রমপুরের কৃতী সন্তান।

বিক্রমপুর চিরদিন পাণ্ডিত্যের জন্যই বিখ্যাত। এখানে বৌদ্ধযুগে দীপঙ্কর, শীলভদ্র, হিন্দুরাজত্বে হলায়ুধ, আর কেদার রায়ের রাজত্বের কিছু পূর্ব্বে জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ ঠাকুর পূর্ব্ববঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারক। আধুনিক কালেও ন্যায়, দর্শন ও স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বহুব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার তর্কনিধি, কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম, সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, কালীচরণ তর্কালঙ্কার, নৃসিংহ শিরোমণি, কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন, দীননাথ বিদ্যাবাগীশ, ব্রজলাল তর্করত্ন, কালীচরণ তর্কবাগীশ, মদনমোহন সার্ব্বভৌম, কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় রাসমোহন সার্ব্বভৌম, গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌম, চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি, জগবন্ধু তর্কবাগীশ, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এবং কালিদাস কবিরত্ন, রামদুর্ল্লভ সেন, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, রামরাজা দাস, ভগবানচন্দ্র দাস, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন, পীতাম্বর কবিরত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাহার পর গুডিভ চক্রবর্ত্তী, গুরুপ্রসাদ সেন, রজনীনাথ, নিশিকান্ত, শীতলাকান্ত, অভয়কুমার দত্ত, ও অভয়াচরণ দাস, মুন্সী কাশীনাথ, সার চন্দ্রমাধব, মনোমোহন ও লালমোহন, দাতা কালীকুমার ও কালীমোহন, দুর্গামোহন, ভুবনমোহন এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি বহু মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ অঘোরনাথ ও তাঁহার বিদুষী কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নামও স্মরণীয় থাকিবে। সৎকার্য্য বিক্রমপুরের অনেকে করিয়াছেন; তবে এ বৎসর শেখরনগরের শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়, হাসারার শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র।

বিক্রমপুরে কয়েকটি সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিক্রমপুরের ইতিহাস উদ্ধারে বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

আমি যে সময়ের কথা বলিলাম তাহার পর পৃথিবীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জীবনসংগ্রামে যে কেবল শক্তিমান্‌ই জীবিত থাকে, দুর্ব্বল নির্ম্মূল হয়, একথা কেবল নিম্ন জীবের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য মনে করিতাম। কিন্তু এবার পৃথিবী-ভ্রমণের ফলে এ ভ্রান্তি দূর হইয়াছে; এখন দেখিতেছি বিশ্বব্যাপী আহবে দুর্ব্বল উচ্ছিন্ন হইবে এবং সবল প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনে করিবেন না যে আমরা এখনও দূরে আছি বলিয়া এই খাণ্ডবদাহ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। বহুদিন হইতেই এই ভীষণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের অধিপতি অনেক দিন হইতেই দেশবাসীকে সাবধান করিয়াছেন, "জাগ্রত হও, নতুবা জ্ঞানে, শিল্পে এবং বাণিজ্যে বিদেশীর নিকট পরাভূত হইলে জগতে আর তোমাদের স্থান থাকিবে না।" পূর্ব্বগৌরবে মুগ্ধ ইংলণ্ডবাসী এত দিন এই আহ্বানে বধির ছিলেন। সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে এখন রণ-ভেরীর নিনাদে তাঁহারা উদ্বোধিত এবং জাগরিত হইয়াছেন।

অহিফেন সেবনে অতি সহজেই নানা কষ্ট হইতে নিজকে উদ্ধার করিতে পারা যায়। সুতরাং অতীত গৌরব স্মরণই আমাদের পক্ষে বর্ত্তমান দুরবস্থা ভুলিবার প্রকৃষ্ট উপায়। আর এই যে সম্মুখে ম্যালেরিয়াতে জনপদ নির্ম্মূল হইতেছে, দেশী শিল্প জাপানের প্রতিযোগিতায় উচ্ছিন্ন হইতেছে, এ সব কথা ভাবিতে নাই। আমাদের জড়তা সম্বন্ধে যদি আমি কোন তীব্র ভাষা ব্যবহার করি তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। আমার জীবনে যদি কোন সফলতা দেখিয়া থাকেন তবে জানিবেন তাহা সর্ব্বদা নিজেকে আঘাত করিয়া জাগ্রত রাখিবার ফলে। স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে; যদি বাঁচিতে চাও তবে কশাঘাত করিয়া নিজকে জাগ্রত রাখ।

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার।

বিক্রমপুর এতদিন স্বাস্থ্যকর বলিয়াই খ্যাত ছিল। বাঙ্গালার আর আর স্থল ম্যালেরিয়াতে মনুষ্যহীন হইতেছে, কিন্তু এদেশ এবিপদ হইতে এতকাল উদ্ধার পাইয়াছিল। অল্পদিন হইল এই ভীষণ শত্রুর উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম অবস্থাতেই এই বিপদ দূর করিবার সময়, গৌণে আর কোন উপায় থাকিবে না। ওলাউঠা, বসন্ত ও আর আর সংক্রামক রোগ যেন দেশকে একেবারে বিধ্বস্ত করিতে চলিল। এই-সব বিপদ একেবারে অনিবার্য্য নয়, কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা ও চেষ্টাহীনতারই বিষময় ফল। যে পুকুর হইতে পানীয় জল গৃহীত হয় তাহার অপব্যবহার সভ্যতার পরিচায়ক নহে। কি করিয়া এই-সব অজ্ঞতা দূর হইতে পারে? স্কুল বৃদ্ধি অতি মন্থর গতিতে হইতেছে; আর কোন কি উপায় নাই যাহা দ্বারা অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে প্রচারিত হইতে পারে? আমাদের সর্ব্বসাধারণে শিক্ষাবিস্তারের চিরন্তন প্রথা কথকতা দ্বারা। তাহা ছাড়া চক্ষে দেখিলে একটা বিষয়ে সহজেই ধারণা হয়। আমার বিবেচনায় স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়, গৃহ ও পল্লী পরিষ্কার, বিশুদ্ধ জল ও বায়ুর ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ, এ-সব বিষয়ে শিক্ষাবিস্তার এবং আদর্শ-গঠিত পল্লী প্রদর্শন অতি সহজেই হইতে পারে। ইহার উপায় মেলা-স্থাপন। পর্য্যটনশীল মেলা বিক্রমপুরের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই অন্য প্রান্তে পৌছিতে পারে। এই মেলায় স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ছায়া-চিত্র যোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যায়াম প্রচলন, যাত্রা, কথকতা, গ্রামের শিল্প-বস্তুর সংগ্রহ, কৃষি-প্রদর্শন ইত্যাদি গ্রামহিতকর বহুবিধ কার্য্য সহজেই সাধিত হইতে পারে। আমাদের কলেজের ছাত্রগণও এই উপলক্ষে তাহাদের দেশ-পরিচর্য্যা-বৃত্তি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন।

লোকসেবা।

গত কয়েক বৎসরই আমাদের দেশের ছাত্রগণ বহুবিধ অবস্থায় লোকসেবায় আশ্চর্য্য পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। 'পতিতের সেবা' অথবা 'ডিপ্রেষ্ট মিশনে'ও অনেকের ঐকান্তিক উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ইহা বিশেষ শুভ লক্ষণ। এই সম্বন্ধেও কিছু ভাবিবার আছে। শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাঙ্গালা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজী স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র এবং বামে এক ধীবরপুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশু পক্ষী ও জলজন্তুর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবতঃ, প্রকৃতির কার্য্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই-সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ছুটির পর যখন বয়স্যদের সহিত আমি বাড়ী ফিরিতাম, তখন মাতা আমাদের আহার্য্য বণ্টন করিয়া দিতেন। যদিও তিনি সেকেলে—একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন—কিন্তু এই কার্য্যে যে তাঁহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখনও মনে করিতেন না। ছেলেবেলায় সখ্যতা হেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। সেদিন বাঁকুড়ায় "পতিত অস্পৃশ্য" জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছিল। যাঁহারা যৎসামান্য আহার্য্য লইয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে অনশনে শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য অস্বীকার করিয়া মুমূর্ষু স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেয় আহার্য্য পাইয়া তাহা দশ জনের মধ্যে বণ্টন করিল। ইহার পর প্রচলিত ভাষার অর্থ করা কঠিন হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে কাহারা পতিত—উঁহারা না আমরা?

আর এক কথা। তুমি ও আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত ভারত-সাম্রাজ্যের ভার প্রকৃত পক্ষে কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে হইলে সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। গোপনে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্ম্মসার এই "পতিত" শ্রেণীরাই ধনধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই। কিন্তু যে জীবন্ত

অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চির-বেদনা নিহিত আছে।

শিল্পোদ্ধার।

সম্প্রতি এই বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে সরকারী একজন ডিরেক্টার নিযুক্ত হইলেই আমাদের দেশের শিল্পোদ্ধার হইবে। ডিরেক্টার মহোদয় সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন। এই-সমস্ত গুণের সমন্বয়েও বিধাতাপুরুষ আমাদের দুর্গতি দূর করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে মনে হয় আমাদেরও কিছু কর্ত্তব্য আছে যাহাতে আমরা একান্ত বিমুখ। জাপানে অবস্থানের কালে দেখিলাম যে ভারতবাসী ছাত্রগণ তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছে। অথচ কার্য্যক্ষেত্রে ভারতবাসীর কোন স্থান নাই। জাপানী কিন্তু ঐ অবস্থাতেই সিদ্ধ-মনোরথ না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। সে নিজের নিষ্ফলতার কারণ অন্যের উপর ন্যস্ত করে না। আমাদের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ কি? কারণ এই যে চরিত্রে আমাদের বল নাই, 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' একথা আমরা কেবল মুখেই বলিয়া থাকি। আমি জানি যে আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশী শিল্পের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন। বহু দিনের চেষ্টার পর তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবিধ ব্যবহার্য্য বস্তু উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের ব্যবসা যে স্থায়ী হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাহার প্রকৃত কারণ এই যে এ পর্য্যন্ত তাঁহারা একজনও কর্ম্মকুশল ও কর্ত্তব্যশীল পরিচালক দেখিতে পাইলেন না।

কেরাণী বাবু শত শত পাওয়া যাইতেছে—তাহাদের কেবল কলমের ও মুখের জোর। বিদেশে দেখিয়াছি, ক্রোড়পতির পুত্রও ব্যবসা শিক্ষার সময় আফিসে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম কার্য্য গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেখানকার সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে করিয়া সম্যক শিক্ষা লাভ করেন। আমাদের দেশে অল্পেতেই লোকের মান ক্ষয় হয়। এমন কি আমাদের দেশের ছাত্র, যাহারা আমেরিকা যাইয়া সেখানকার রীতি অনুসারে কোন কার্য্য হীন জ্ঞান করেন নাই—এমন কি দারোয়ানী করিয়া এবং বাসন ধুইয়া বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন—এখানে আসিয়াই তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ভুলিয়া বিদেশী বাহিরের ধরণ ধারণ অবলম্বন করেন। তখন তাঁহাদের পক্ষে অনেক কার্য্য অপমানকর মনে হয়।

এসব সম্বন্ধে সম্প্রতি জাপান হইতে প্রত্যাগত জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে জাপানে আমাদের সম্বন্ধে দুএকটি আমোদজনক কথা চলিতেছে। তাহাদিগের অনুগ্রহ ব্যতি-রেকে নাকি আমাদের গৃহিণীদের পট্টবস্ত্র হইতে হাতের চুড়ি পর্য্যন্ত সংগ্রহ হয় না। এখন বাঙ্গালী বাবুদের জন্যও তাহাদিগকে হুকার কল্কে পর্য্যন্ত প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত তোমরা ইউরোপের উপেক্ষা বহন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছ। এখন হইতে তোমরা এশিয়ারও হাস্যাস্পদ হইতে চলিলে! আমাদের দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণ-রূপে ত্যাগ না করিলে কোন দিন কি শিল্পে সাথকতা লাভ করিতে পারিব?

মানসিক শক্তির বিকাশ।

শিল্পের উন্নতির আর এক প্রতিবন্ধক এই যে বিদেশে শিক্ষা করিয়া উহার ঠিক সেইমত কারখানা এদেশের ভিন্ন অবস্থায় পরিচালন করিতে গেলে তাহা সফল হয় না। অনেক কষ্টে এবং বহু বৎসর পরে যদি বা তাহা কোন প্রকারে কার্য্যকারী হয় তাহা হইলেও অতদিনে পূর্ব্বপ্রচলিত উপায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পরের অনুকরণ করিতে গেলে চিরকালই এইরূপ ব্যর্থমনোরথ হইতে হইবে। কোন দিন কি আমাদের দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে না—যাঁহারা কেবল শ্রুতিধর না হইয়া স্বীয় চিন্তাবলে উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার করিতে পারিবেন?

যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ভারতের সমকক্ষ প্রতিযোগী বহু প্রাচীন জাতি ধরা-পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞান-শক্তি ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইত। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেও তখন আমাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না। এখন সে দিন চলিয়া গিয়াছে—এখন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী। জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই। কত কাল এই অপমান সহ্য করিবে? তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে? তোমার কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না? ভাবিয়া দেখ এক সময়ে দেশদেশান্তর হইতে জগতের বহুজাতি তোমার নিকট শিষ্যভাবে আসিত। তক্ষশিলা, কাঞ্চী ও নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ? বিক্রমপুর যে শিক্ষার এক পীঠস্থান ছিল তাহা কি স্মরণ নাই? ভারতের দান ব্যতিরেকে জগতের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ থাকিবে, সম্প্রতি তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা দেবতার করুণা বলিয়া মানিতে হইবে; এই সৌভাগ্য যে চিরস্থায়ী হয় ইহা কি তোমাদের অভিপ্রেত নহে? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার, কোথায় সেই শিষ্যবৃন্দ! এই-সব আশা কি কেবল স্বপ্নমাত্রই থাকিবে? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে চেষ্টার বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়—ইহা আমি জীবনে বারম্বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অজ্ঞ হিন্দু রমণী কেবল বিশ্বাসের বলেই বহু দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞানমন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব?

মুষ্টিমেয় ভিক্ষার ফলে ভারতের বহুস্থানে বিশাল বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হইয়াছে। অজ্ঞানই যে ভেদসৃষ্টির মূল, এবং তোমাতে এবং আমাতে যে কোন পার্থক্য নাই, ইহা কেবল ভারতই সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই বিশাল একত্বের ভাব কি জ্ঞান ও সেবা দ্বারা জগৎকে পুনঃ প্লাবিত করিবে না?

ভয় করিতেছ যে সমস্ত জীবন দিয়াও এই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিব না? তোমার কি কিছু মাত্র সাহস নাই? দ্যূতক্রীড়কও সাহসে ভর করিয়া জীবনের সমস্ত ধন পণ করিয়া পাশা নিক্ষেপ করে। তোমার জীবন কি এক মহা ক্রীড়ার জন্য ক্ষেপণ করিতে পার না? হয় জয় কিম্বা পরাজয়!

বিফলতা।

যদিই বা পরাজিত হইলে, যদিই বা তোমার চেষ্টা বিফল হইল, তাহা হইলেই বা কি? তবে এক বিফল জীবনের কথা শোন,—ইহা অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি অতদিন পূর্ব্বেও দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি উদ্ধার না করিলে দেশের আর কোন উপায় নাই। দেশে যখন কাপড়ের কল প্রথম স্থাপিত হয় তাহার জন্য তিনি জীবনের প্রায় সমস্ত অর্জ্জন দিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রথম পথপ্রদর্শক হন তাঁহাদের যে গতি হয়, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। বিবিধ নূতন উদ্যমে তিনি বহু ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষকদের সুবিধার জন্য তাঁহারই প্রযত্নে সর্ব্বপ্রথমে ফরিদপুরে লোন্ আফিস হয়। এখানে তাঁহার সমস্ত স্বত্ব পরকে দিয়াছিলেন। এখন তাহাতে শতগুণ লাভ হইতেছে। তাঁহারই প্রযত্নে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য ফরিদপুরে মেলা স্থাপিত হয়। তিনিই আসামে স্বদেশী চা বাগান স্থাপন করেন। তাহাতেও তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অংশিদারগণ এখন বহুগুণ লাভ করিতেছেন। তিনিই প্রথমে নিজব্যয়ে টেক্‌নিকেল্ স্কুল স্থাপন করেন, তাহার পরিচালনে সর্ব্বস্বান্ত হন। জীবনের শেষ ভাগে দেখিতে পাইলেন, যে তাঁহার সমস্ত জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ? হয়ত একথা তাঁহার নিজ জীবনে প্রযুজ্য হইতে পারে, কিন্তু সেই ব্যর্থতার ফলে বহুজীবন সফল হইয়াছে। আমি আমার পিতৃদেব ৺ভগবানচন্দ্র বসুর কথা বলিতেছিলাম। তাঁহার জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপ যখন ফল ও নিষ্ফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোন সফলতা হইয়া থাকে তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবালকঙ্কাল দ্বারাই মহাদ্বীপ নির্ম্মিত হয়।

হে বঙ্গবাসী, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের কথা এখন ভাবিয়া দেখ।

তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে অকূল জলধি এবং হিমাচল তোমাদিগকে সমগ্র পৃথিবী হইতে নিঃসম্পর্ক রাখিতে পারিবে

না? তুমি কি বুঝিতে পার না যে অতিমানুষ-শক্তি ও জ্ঞান-সম্পন্ন পরাক্রান্ত জাতির প্রতিযোগিতার দারুণ সংঘর্ষের মধ্যে তুমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছ? তুমি কি তোমার ক্ষীণশক্তি ও জীবন লইয়া জাতীয় জীবন চিরদিনের মত প্রবাহিত রাখিবে আশা করিতেছ? তুমি কি জান না ধরিত্রী মাতা যেমন পাপভার বহন করিতে অসমর্থ, প্রকৃতি-জননীও সেইরূপ অসমর্থ জীবের ভার বহন করিতে বিমুখ? প্রকৃতি-মাতার এই আপাতক্রূর নির্ম্মম প্রকৃতিতেই তাঁহার স্নেহের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে। রুগ্ন ও দুর্ব্বল কতকাল জীবনের যন্ত্রণা বহন করিবে? বিনাশেই তাহার শান্তি, ধ্বংসই তাহার পরিণাম। আসিরিয়া, বেবিলন, মিশর ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তোমার কি আছে যাহার বলে তুমি জগতে চিরজীবী হইতে আকাঙ্ক্ষা কর? বোধ হয় পূর্ব্বপিতৃগণের অর্জ্জিত পুণ্য এখনও কিয়ং পরিমাণে সঞ্চিত আছে; সেই পুণ্যবশেই বিধাতা তোমার অবসন্ন মস্তক হইতে তাঁহার অমোঘ বজ্র সংহার করিয়া রাখিয়াছেন।

এই দেশে এখনও ভগবান্ তথাগতের মন্দির ও বিহারের ভগ্ন চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভগবান বুদ্ধদেবের সম্মুখে বহুতপস্যালব্ধ নির্ব্বাণের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল তখন সুদূর জগত হইতে উত্থিত জীবের কাতর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সিদ্ধ পুরুষ তখন তাঁহার দুষ্কর তপস্যালব্ধ মুক্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন। যতদিন পৃথিবীর শেষ ধূলিকণা দুঃখচক্রে পিষ্ট হইতে থাকিবে ততদিন বহুযুগ ধরিয়া তিনি তাহার দুঃখভার স্বয়ং বহন করিবেন। কথিত আছে, পঞ্চশত জন্ম পরম্পরায় সুগত জীবের দুঃসহ দুঃখভার বহন করিয়াছিলেন। এইরূপে যুগে যুগে দেবোপম মহাপুরুষগণ মানবের ক্লেশভার লাঘব করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই যুগ কি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? নরের দুঃখপাশ ছেদন করিবার জন্য ঈশ্বরের লীলাভূমি এই দেশে কি মহাপুরুষগণের পুনরায় অবির্ভাব হইবে না? পূর্ব্ব পিতৃগণের সঞ্চিত পুণ্যফল ও দেবতার আশীর্ব্বাদ হইতে আমরা কি চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছি? যখন নিশির অন্ধকার সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতম তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙ্গিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যে স্বার্থপরতায় এবং পরশ্রীকাতরতায়! ভাঙ্গিয়া দাও এসব অন্ধকারের আবরণ! তাহা হইলেই তোমাদের অন্তর্নিহিত আলোক-রাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া দিগদিগন্ত উজ্জ্বল করিবে।

খাণ্ডিক্য

(বিষ্ণুপুরাণে লিখিত মূল উপাখ্যানের বিবৃতি)

সে আজ দুহাজার বছরের কথা, যখন ধর্ম্মধ্বজ মিথিলার রাজা ছিলেন। ধর্ম্মধ্বজের মৃত্যুর পর তাঁর প্রকাণ্ড রাজ্যটি দুই পুত্র কৃতধ্বজ আর মিতধ্বজের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল। কৃতধ্বজ ছিলেন জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ; তাঁর পুত্র কেশীধ্বজও তাই জ্ঞানী, অধ্যাত্মবিদ্যায় নিপুণ এবং আর্য্য-ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু মিতধ্বজের তেমন জ্ঞানের বলও ছিল না, যোগের বলও ছিল না, যে, পরিবারের প্রত্যেককে বংশধর্ম্মে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন, তাই তাঁর পুত্র খাণ্ডিক্য নামে যেমন বংশকে ছাড়াইয়া উঠিলেন, ধর্ম্মেও তেমনি জ্ঞাতিদের অতিক্রম করিয়া গেলেন। শারদপার্ব্বণে কেশীধ্বজ যখন মন্দির সাজাইয়া, ধূপ জ্বালাইয়া, ঘণ্টা বাজাইয়া ফুলে চন্দনে, ধূপে দীপে চণ্ডিকার পূজা করিতে বসিতেন, যখন উৎসবের সুরে আকাশ ছাইয়া রাজবাড়ীর সাত দুয়ারে সাতটি নহবত বাজিয়া উঠিত, আর রাজকুমার রাজকুমারীরা মাণিক-গাঁথা চিকুর দোলাইয়া বসনভূষণে ঝিলিক খেলাইয়া হাস্যকলকলে পূজার আঙ্গিনায় ছুটাছুটি করিত, খাণ্ডিক্য তখন সারাবৎসরের সঞ্চিত ধনরাশি দীন দুঃখীদের বিলাইয়া দিয়া পুত্রকন্যাদের সাথে রিক্তহাতে ভিক্ষায় বাহির হইতেন। সেই জলঢালা মেঘের মত শুভ্র, গন্ধঝরা পূজানির্ম্মাল্যের মত বিশুদ্ধ রাজমূর্ত্তি, সেই সদ্যস্নাত কুসুমকলির মত পবিত্র রাজকুমারদের দেখিয়া প্রজাগণ তাদের সমস্ত হৃদয় লুটাইয়া দিত। কিন্তু প্রণাম করিত না; সেদিন তাঁকে কোন সম্মান দেখান খাণ্ডিক্যের নিষেধ ছিল।

খাণ্ডিক্য ভগবান বুদ্ধদেবের শিষ্য—কর্ম্মের উপাসক; তাই তাঁর প্রজাপালন-কর্ম্মকেই নির্ব্বাণের পন্থা করিয়া

লইয়াছিলেন। এক বছরের সূর্য্য আর বছর দেখিতে না-দেখিতেই তিনি তাঁর রাজ্যকে দানের দ্বারা অদীন, জ্ঞানের দ্বারা প্রবীণ এবং প্রেমের দ্বারা পবিত্র নবীন করিয়া তুলিলেন। সুখে ও শান্তিতে, দয়ায় ও প্রীতিতে, পুণ্যে ও ঋদ্ধিতে সেই রাজ্য বসন্তপ্রভাতের কুঞ্জকাননের মত আনন্দে আনন্দময় হইয়া উঠিল। শারদ-উষার সেফালি-তলা যেমন ফুলের শুভ্রতায় পূর্ণ হইয়া থাকে, ফাল্গুন মাসের দক্ষিণা হাওয়া যেমন চূতমুকুলের গন্ধে বিভোর হইয়া যায়, আর্য্যাবর্ত্ত তেমনি খাণ্ডিক্যের দানের যশে একেবারে ভরপুর হইল।

কেশীধ্বজ আগুন হইয়া উঠিলেন; বলিলেন "বেদ মানে না, ক্রিয়াকাণ্ড মানে না খাণ্ডিক্য, তার আবার এত যশ কিসের? ওর মুণ্ডপাত করে' লাখো প্রজার নরকের পথ রুদ্ধ করব।" এই বলিয়া তিনি সেনাপতিকে সৈন্য সাজাইতে হুকুম দিলেন। শারদ নবমীতে দানের শেষে খাণ্ডিক্য যখন পুত্রকন্যাদের সাথে ভিক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, কেশীধ্বজের সৈন্যগণ সহসা তখন পুরী আক্রমণ করিল। খাণ্ডিক্যের অসজ্জিত সেনাগণ হারিয়া হারিয়া দিক্‌বিদিকে পলায়ন করিল। খাণ্ডিক্য নিজেও পলায়ন করিলেন। পুত্র শিরিধ্বজ কেশীধ্বজের হাতে বন্দী হইলেন।

কারাগার যে-রাজকর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে ছিল, তাঁর নাম ছিল পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয়ের এক কন্যা ছিল, সুনীতি। সুনীতি আসিয়া পুরঞ্জয়কে বলিল "বাবা, কারাগারে নাকি নূতন বন্দী এসেছে, দেখ্‌তে যাব।"

পুরঞ্জয় সুনীতির ছোট মাথাটির ঘ্রাণ লইয়া বলিলেন "আজ নয় মা, আজ পুণ্যদিনে পাষণ্ড দেখ্‌তে নাই।"

"পাষণ্ড কাকে বল? আজ নাকি রাজকুমার শিরিধ্বজ বন্দী হয়ে আমাদের কারাগারে এসেছেন?"

"হাঁ সেই রাজকুমারই—বৌদ্ধ—নগ্ন—পাষণ্ড।"

"রাজকুমার কি করে পাষণ্ড হলেন? শুনেছি তিনি নাকি বীর, দাতা, কর্ম্মী। তিনি নাকি অরুণের মত সুন্দর, আকাশের মত উদার, সাগরের মত গভীর! মেঘ যেমন বর্ষণের দ্বারা লঘু হয়ে আকাশে হারা হয়ে যায়, তাঁর পিতাও নাকি তেমনি কর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধ হয়ে সুখদুঃখের অতীত হয়ে গেছেন। তবে তিনি পাষণ্ড হলেন কি করে?"

"ওসব শাস্ত্রের তর্ক তুমি বুঝবে না মা! মনে রেখো, ওরা বেদ মানে না। আর যারা বেদ মানে না, তারাই নগ্ন, তারাই পাষণ্ড।"

সুনীতি কোন উত্তর করিলেন না, কেবল বাদল-ভরা সূর্য্যমুখীর মত মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মেঘ-ভাঙ্গা রৌদ্রের ছটা জানালার ফাঁক দিয়া আসিয়া সে মুখখানির উপর জলজ্বল করিয়া উঠিল; এক দম্‌কা পাগ্‌লা হাওয়া বাবলা-ফুলের রেণুকণা লইয়া তার পটলচেরা চোখ দুটির উপর ঝাপ্‌টাইয়া পড়িল; ঘরের কোণের পোষা সারিকাটি "দিদি আমায় ভালবাসে, দিদি আমায় ভালবাসে" বলিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করিল। পুরঞ্জয় তিনবার আঙ্গিনার এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

সারাটি দিন সুনীতির ভাবনায় চিন্তায় কাটিল। এই যে সুন্দর পৃথিবী, ফলে পুষ্পে ভরা, যেখানে গাছের গায়ে লতা জড়াইয়া উঠে, কাকের বাসায় কোকিল পালন হয়; যেখানে মেঘে বিজুলিতে জড়াজড়ি করিয়া খেলে; যেখানে পাহাড়ের সঙ্গে সাগরের, আকাশের সঙ্গে পাথারের, জড়ের সঙ্গে চেতনের এমন সুন্দর মিলন; যেখানে গ্রীষ্মের তাপ বর্ষায় জুড়াইয়া দেয়, মরুর বুকে চাঁদের কিরণ ঝরিয়া পড়ে; আর যেখানে সদ্য বিধবার বুকেও শিশু হাসে, সেখানে মানুষে মানুষে এত রেষারেষি, এত রক্তারক্তি কেন? কেন সেখানে ধর্ম্মের প্রতি ধর্ম্মের এমন দারুণ অভিশাপ? বালিকা এ ধাঁধার কোন উত্তর না পাইয়া অস্থির হইয়া উঠিল। ভাইদের সঙ্গে আজ আর সে নাহিতে গেল না, বোনদের সঙ্গে বসিয়া চুল বাঁধিল না; সারাটা দীর্ঘ দিন অদিনের নিরালা পদ্মকলিটির মত একলা বসিয়া কাটাইয়া দিল।

প্রহরখানেক রাত হইতে বাড়ী-সুদ্ধ সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। মা ঘুমাইলেন, বাবা ঘুমাইলেন, সোনার দীপের আলো নিভাইয়া সাতটি চাঁপার মত সাত ভাই ঘুমাইলেন। সুনীতি অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। রামীর নাক ধরিয়া একটি নাড়া দিল, বামীর চুল ধরিয়া একটি টান মারিল, ক্ষেমীর চোখের

পাতা চাঁদমুখের পদ্মগন্ধি ফুঁয়ে একবার কাঁপাইয়া দেখিল, তারপর চুপি চুপি গিয়া দরজা খুলিল। চন্দ্র তখন অস্ত গেছে; আকাশের নীল, তারার আড়ালে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে; আর সম্মুখে এক অন্ধকারের যবনিকা পড়িয়াছে —স্নিগ্ধ, স্তব্ধ, অচঞ্চল!—বাসরঘরের দেয়ালের মত গন্ধে ইঙ্গিতে অর্থে পরিপূর্ণ। সুনীতি সেই জগৎ-ছাওয়া পর্দ্দাখানাতে নাড়া দিয়া নূতনতর অভিসারিকার মত "কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে" বাহির হইয়া পড়িল। পেছন হইতে একটা অন্ধকারের পাখী গাছের ডালে ডাকিয়া উঠিল— নিম্! নিম্! নিম্!

যেখানে বন্দীখানার ফটকের আলোটা একসারি খেজুর গাছের কাছে কাছে আসিয়া শেষ হইয়া গেছে, সুনীতি সেখানে হঠাৎ থামিল—কে তার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কে সে? বালিকা চাহিয়া চাহিয়া চিনিল— রাজকুমার।

রাজকুমারও সুনীতিকে চিনিলেন, চিনিয়া একেবারে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মিথিলার রাজবধূ হবে সুনীতি— এই রূপের ভরা গুণীর সেরা সুনীতির এমন গানের মত শরীরটি, এমন তানের মত চালচলনটি, এমন সদ্য কমলের মত পবিত্র মুখখানি, আর সেই সুনীতি ঘরের বাহির হইয়াছে!—একলা—একলা—এই অন্ধকার রাত্রে!

রাজকুমারের মনে কেমন একটা আঘাত লাগিল। সে আঘাত সামলাইতে না পারিয়া তিনি সুনীতিকে বড় একটা অন্যায় কথা বলিয়া ফেলিলেন। বালিকাও আহত অভিমানে উম্বান আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল "কুমার এ জান্‌বেন, যে, সুনীতি কোন ঘুমন্ত রাজার গলায় ছুরি দিতে চলে নাই।"

"তবে কি কর্‌তে চলেছে?"

"রাজকুমার শিরিধ্বজকে দেখ্‌তে চলেছে—আর পারলে তাকে মুক্ত করতে।"

বলিয়াই সুনীতি কাঁপিয়া উঠিল; তার পর বুকের মধ্যে জোর বাঁধিবার জন্যই সোজা হইয়া—শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। রাজকুমারের বুকের ভিতর কে যেন সহসা কামান দাগিয়া দিল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

(৩)

সুনীতি যখন বন্দীখানায় পৌছিল, তখন ফটকের কাছে সাতজন প্রহরী পাহারা দিতেছে। দূর হইতে ইহাদের সদাপ পদক্ষেপ দেখিয়া বালিকার আর সেদিকে ঘেঁসিতে সাহস হইল না। কোথায় সেই বৃদ্ধ রামলাল— যার ভরসা করিয়া সে এই গভীর রাত্রের অন্ধকারকে বিবাহ-সভার আলোকের মত বরণ করিয়া নিয়াছিল, এই অনভ্যস্ত পথকঙ্করকে বরশয্যার ফুলকলির মত জ্ঞান করিয়াছিল? আর এরা কারা?—এই দস্যুর দল? বালিকা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। আবার একটা অন্ধকারের পাখী দূর গ্রামান্ত হইতে অলক্ষুণে সুরে নিম্ নিম্ করিয়া ডাকিয়া উঠিল; এক দম্‌কা শীতল বাতাস মাথার উপর ঝাউগাছের ভিতর দিয়া চাপা কান্নার সুর তুলিয়া গেল। তারপর সব স্তব্ধ। সমুখে কাকলাসের চোখের মত দুটা ফটকের আলো, পেছনে শেষরাত্রির দুঃস্বপ্নের মত একরাশি অনারাম অন্ধকার। বালিকার মনে হইল—এই আলো দুটার ভিতর রাজকুমারের চক্ষুদুটি জ্বলিতেছে, এই অন্ধকারের মধ্যে রাজকুমারের হৃদয় হইতে এক ঝাঁক হিংসার দাঁশ ছুটাছুটি করিতেছে। হায়রে বিধি!

যারা দেবতার নামে অহঙ্কারের সেবা করে, যারা মায়ের নামে রাক্ষসীর পূজা করে, যারা রাজ্যপালনের নামে ঈর্ষ্যার তর্পণ করে, তাদের ধিক্ ধিক্। সুনীতির হতাশের রাত্রি যখন ভোর হইল, তখন রাজধানীময় রাষ্ট্র হইয়াছে —বন্দী রাজপুত্র শিরিধ্বজ আর কারাগারে নাই! তাঁর ছিন্নমুণ্ড মশানে লুটাইতেছে।

কার হুকুমে এ কাণ্ড হইল? রামলালের ডাক পড়িল, পাহারা ছিল সেদিন রামলালের হাতে। রামলাল জবাব দিল—গভীর রাত্রে রাজকুমার আসিয়া তাকে অবসর দিয়া নূতন লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তখন রাজকুমারের তলব হইল।

ভরা সভায় পাত্রমিত্র সৈন্যসামন্তের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কুমার উত্তর করিলেন "আমিই শিরিধ্বজের মাথা নিয়েছি।"

"কেন? কার হুকুমে?"

"আমি তার কোন জবাব দিতে পারি না।"

মুখ তুলিয়া চোখ মেলিয়া কতক গর্ব্বে কতক বিনয়ে এই কটি কথা বলিয়া কুমার মাথা নোয়াইলেন। তখন সভার লোকে চোখ চাওয়াচাওয়ি আর কানাকানি। রাজা অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন "আজ থেকে তুমি বন্দীর স্থান অধিকার করলে। সপ্তাহ অন্তে তোমার প্রাণদণ্ড।"

(৪)

সেদিন আকাশভাঙ্গা বাদল নামিয়াছে। সারা রাত ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি হইয়াছিল, বর্ষণ তবু ফুরায় নাই। ভোর বেলাতেও ঝর ঝর বৃষ্টি আর সর্ সর্ বাতাস। খালে নালায় যত রাজ্যের ভেকের দল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মাথার উপর গাছের পাতায় আর বাদলা হাওয়ায় খুব একটা ফিস্‌ফিসানি চলিতেছে। খাণ্ডিক্য গভীর বনে ক্ষুদ্র একখানি কুটীরের আঙ্গিনায় বসিয়া একটি হরিণশিশুর মুখে ইঙ্গুদি তেল লেপিতেছিলেন। দুচারজন পার্শ্বচর কাঠুরিয়াদের পথ হইতে ঝরিয়া-পড়া কাঁটাডাল সরাইয়া রাখিতেছিল। বাকী পাঁচ সাত জন আঙ্গিনার কোণে বটগাছটার তলায় ময়ূরময়ূরীর জন্য খই ছড়াইতেছিল, এমন সময় একজন অনুচর আসিয়া খাণ্ডিক্যের সর্ব্বনাশের সংবাদ দিল। খাণ্ডিক্য স্থিরচিত্তে শুনিলেন, তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরিণশিশুটিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন "কেশীধ্বজ বড় দুর্ভাগ্য। আহা তার পুণ্যও গেল, পুত্রও গেল।" বলিতে বলিতে গালের উপর দিয়া দুই বিন্দু শুভ্র অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বাতাস তখন পাগল হইয়া উঠিয়াছে, চাঁপাফুলের রেণুকেশর উড়িয়া আসিয়া খাণ্ডিক্যের গায়ে মাথায় ঝরিতেছে, হরিণশিশু তার ডাগর দুটি চোখের ভিতর জলভার লইয়া সেই সকরুণ মুখখানির দিকে চাহিয়া আছে, পাত্রমিত্র বিস্ময়ে মূক—গর্ব্বে গম্ভীর—শোকে পরিশুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধীরে ধীরে খাণ্ডিক্যের চক্ষু কোলের উপর হইতে উঠিয়া গিয়া অমাত্যদের উপর পড়িল—অমাত্যদের উপর হইতে উঠিয়া গিয়া গাছের মাথায় পড়িল, গাছের মাথা হইতে সরিয়া গেল দূর আকাশের বুকে—মেঘের রাশি যেখানে অন্ধকারের ঢেউয়ের মত দুলিতেছে, বিদ্যুৎ যেখানে মহাকালের কষাঘাতের মত কাঁপিতেছে, বাতাস যেখানে উন্মত্ত পাগলের মত ছুটিতেছে,—বৃষ্টিবিন্দু ধুনিয়া ধুনিয়া, সবুজ শোভা মুছিয়া মুছিয়া, দুর্দ্দিনের চিতাধূমে আকাশ ছাইয়া। খাণ্ডিক্য শুনিলেন সে বাতাসের মর্ম্ম-কথা বেদনার গান। তরুমর্ম্মরে রণিয়া উঠিতেছে—কত পিতার ক্রন্দন! পাতায় পাতায় খসিয়া পড়িতেছে—কত অভাগীর অশ্রুধারা! বায়ুমণ্ডল ভরিয়া উঠিয়াছে—কত যুগযুগান্ত-ঝরা দীর্ঘশ্বাস! আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে রক্তের বর্ণে, কত দিগ্‌দিগন্ত-মাতানো হিংসার আনন্দে। সহস্র শকুনীর কি সে ধাপাধাপি! সংগ্রামের অন্ধ উতরোলে কি সে নাড়ি ছেঁড়াছেড়ি। আর সকলের উপর বাজিয়া উঠিতেছে ঐ কান্না—ঐ চাপা কান্না, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্না, বুকফাটা কান্না। ফুলের লতা ফুল ছুড়িয়া বলিতেছে হায় হায় হায়! বাঁশের ঝাড় মাথা আছড়াইয়া বলিতেছে হায় হায় হায়! আকাশ ছাইয়া ভাসিয়া আসিতেছে হায় হায়, হায়রে হায়!

এ সকলের মধ্যে হতভাগ্য পিতা আপনার হৃদয়ের সুর শুনিতে পাইলেন। যে পুত্রশোকের আহ্বানটুকুকে এতক্ষণ পরদুঃখের বেদনা দ্বারা চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, এখন তাহা বিশ্বসংসারের পুত্রশোকের ভিতর দিয়া আরো বড় হইয়া যেন ফুটিয়া উঠিল। খাণ্ডিক্য দুই হাতে বুক বাঁধিয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন—বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। ঠোঁটদুটি বাদলঝরা ফুলদলের মত কাঁপিতে আরম্ভ করিল। তারপর আর বাঁধ টিকিল না। অসহায় পিতা দুইহাতে চোখ ঢাকিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন; আর ডাকিতে লাগিলেন "ভগবান, ভগবান, উপায় কর—রক্ষা কর—আর পারিনা; বাঁচাও বাঁচাও!"

সহসা মেঘ ভাঙ্গিয়া পূব-গগনে রৌদ্রের ছটা ফুটিয়া উঠিল। ভিজা বাতাস কেতকীর সৌরভে কোকিল-উড়া মুকুলের মত কাঁপিয়া উঠিল। বনের মাঝে পাখীর ডাকে জাগরণের সানাই বাজিতে লাগিল। খাণ্ডিক্য উঠিয়া বসিয়া জোড় হাত করিলেন; বন্ধুবান্ধব চারিদিক হইতে জোড় হাতে বলিয়া উঠিল

"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

(৫)

এদিকে পুত্রকে কারাগারে পাঠাইয়া কেশীধ্বজ ভাবিলেন "এইত সংসার! কর্ত্তব্যের খাতিরে এখানে ভাইকে ভাইয়ের গলায় ছুরি দিতে হয়, পিতাকেও পুত্রের রক্ত চাহিতে হয়। এই সংসার নিয়া এত টানাটানি? এত রেষারেষি? এত খুনাখুনি? কি দেখিয়া মানুষ ভুলে? আর কি দেখিয়া আমিই বা ভুলিলাম? হায় হায় হায়! কেন এ গরল খাইলাম? আমার প্রায়শ্চিত্ত কি?"—ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলেন, একবার নির্জ্জন বনে বসিয়া ইষ্টপূজা করিতে হইবে, তাতে যদি মন স্থির হয়।

তখন কোশাকুশী, পোঁটলাপুঁটলী বাঁধিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা ঝাঁঝর লইয়া, গুরু পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া রাজা বনে গেলেন। পাছে পাছে গেল পাত্রমিত্র, স্তুতির পণ্যে বুক ভরিয়া; আর গেল সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রেবর্ম্মে ঐশ্বর্য্যের দম্ভের ঝলক হানিয়া।

বনে এক বটগাছ ছিল, সে হাজার বছরের গাছ; পাতায় পাতায় সে আকাশের নীচে ছাউনি করিয়াছে; শিকড়ে শিকড়ে ছাউনির নীচে স্তম্ভ গাড়িয়াছে। ডালে ডালে তার লাখে লাখে পাখীর বাসা, পাতায় পাতায় তার সর্ সর্ বাতাসের স্বর। তার নীচে কেশী পূজায় বসিলেন।

পূজা খুব জমিয়া উঠিয়াছে—ধূপ দীপ নৈবেদ্যর গন্ধে বাতাসে একটা আনন্দ আনিয়াছে, এমন সময়ে এক সিংহের বজ্রগর্জ্জনে সমস্ত বন কাঁপিয়া উঠিল।

পাত্র মিত্র যারা ছিলেন, তাড়াতাড়ি গাছে গাছে উঠিয়া পড়িলেন। কেশীধ্বজ তখন ফুলচন্দনের অঞ্জলি লইয়া ধ্যানে বসিয়াছেন। একটু দূরে শ্যামল ঘাসের কোমল আস্তরণে লাল তেলতেলা গাইটি শুইয়া ছিল, ধ্যানের সূত্র ছিন্ন করিয়া সে কথাটি তাঁর মনে জাগিল; মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল, ফুল বেলপাতা ছুড়িয়া ফেলিয়া তীর ধনুকই টানিয়া লন। কিন্তু ধ্যান ছাড়িয়া উঠিতে সাহস হইল না, পাছে দেবতা অপ্রসন্ন হন। মনের দুর্দ্দম ইচ্ছাটাকে মন্ত্রজপের দ্বারা দাবাইয়া রাখিয়া কেশীধ্বজ একেবারে পাথরের মত শক্ত হইয়া বসিলেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে বনবনানি কাঁপাইয়া, দিগ্‌বিদিক তোলপাড় করিয়া আর-একবার সেই গভীর গর্জ্জন জলভরা মেঘের গুরুগুরু ধ্বনির মত। দুরুদুরু করিয়া ভয়াতুরের বুকের মত কেশীধ্বজের আসনবেদী কাঁপিয়া উঠিল। তারপর একটি কাতর হাম্বা, একটু পৎপৎ, মর্মর্, আর অমনি সব নীরব—পাষাণের বুকের মত নীরব, ঝড়ের মুখে আকাশের মত নীরব—ভয়ানক, ভয়ানক, অতি ভয়ানক নীরব।—ধ্যানীর সমস্ত প্রাণ লইয়া নাড়া পড়িল। যমদূতের ভেরীর মত এই সিংহটার গর্জ্জন যেখানে হার মানিয়াছিল, একটি গাভীর কাতর হাম্বা সেখানে শেলের মতন বিঁধিল। ধ্যানের গর্ব্ব, পূজার কল্পমঞ্চ সত্যের ফুঁয়ে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেশীধ্বজ ফুলের অঞ্জলি দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া ধনুক ধরিয়া চক্ষু মেলিলেন—হায়! সেখানে আর কিছুই নাই! কেবল সুন্দর সবুজ ঘাসের উপর টাট্‌কা—লাল টক্‌টক্ টাট্‌কা, শিশুর হৃৎপিণ্ডের মত টাট্‌কা একটি রক্তের ধারা।

পাগলের মত কেশী লাফাইয়া উঠিলেন। কোশাকুশী লাথি মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন "রাক্ষস! রাক্ষস! একটা শক্তিহীন অসাড় রাক্ষস! এতদিন কার পূজা করেছি? কার পায়ে প্রাণ বলি দিয়েছি? আমার অসহায় গাভীটিকে রাখ্‌তে পার্‌লে না!" হায় রে, সে হতভাগার হৃদয়ে তখন একটা করুণ হাম্বারব থাকিয়া থাকিয়া আঘাত করিতেছিল; সূচের মতন, শেলের মতন, বিষধর সর্পের সাংঘাতিক দাঁতের মতন বিঁধিতেছিল। রাজা ধনু হাতে করিয়া অরণ্যময় ছুটিতে লাগিলেন।

ছুট! কেবল ছুট! কেবল ছুট! ঝোপে, ঝাড়ে, গর্ত্তে গহ্বরে কেবল ছুটাছুটি! ছুটিতে ছুটিতে পূবের সূর্য্য পশ্চিমে গেলেন, পশ্চিমের ছায়া পূবে গেল; অস্তযাত্রার ফাগুয়া খেলায় পশ্চিমের আকাশ রঙ্গিয়া উঠিল; ভোরের হাওয়ায় ফোটা ফুল সন্ধ্যার হাওয়ায় নুইয়া পড়িল; কেশীধ্বজ শুধু ছুটিতেই লাগিলেন।

অবশেষে যখন সাঁঝের আলো বনের মাথা হইতে সরিয়া গিয়াছে; অন্ধকারের স্তর রাশিরাশি জোনাকী লইয়া গাছের তলায় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে; মাঠের বুকে,

দিগন্তের কোণে একটা স্নিগ্ধ ছায়ার অপরূপ আবরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কেশীধ্বজ তখন বনের বাহির হইয়া দাঁড়াইলেন। খোলা মাঠের শীতল হাওয়া তাঁর তপ্ত মুখের উপর দিয়া শান্তিমন্ত্রের মত বহিয়া গেল। নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি গুণ-চড়া ধনু আর তীর-ভরা তূণ এক অনুচরের হাতে তুলিয়া দিলেন। তাড়াতাড়ি পাইক পারিষদ দৌড়িয়া আসিল, বলিল "শিবিরে চলুন।" কেশীধ্বজ উত্তর করিলেন "আমি আজই রাজপ্রাসাদে গিয়ে ঘুমাব। তোমরা কাল ভোরে শিবির তুলে রাজধানীতে প্রস্থান করবে।" সকলে ত শুনিয়া অবাক্। অন্ধকার রাত্রি, তিলকে তাল, তালকে তিল মনে হয়; খালে বিলে ঝোপে ঝাড়ে কত বিপদ লুকাইয়া থাকে—এমন রাত্রে একলা পথ চলা? নিষেধের উপর নিষেধ পড়িল। কিন্তু রাজা কারো নিষেধ মানিলেন না। কালো ঘোড়ায় চাবুক মারিয়া কালো অন্ধকারে মিশাইয়া গেলেন।

(৬)

পরদিন বিরাট সভা করিয়া কেশীধ্বজ রাজ্যের যত বড় বড় পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ দিলেন। গুরু, পুরোহিত, আচার্য্য, উপাধ্যায় কিংখাবের গদিতে লালধূলির পদচিহ্ন আঁকিয়া মণ্ডলী করিয়া বসিয়া পড়িলেন। রাজসভা বসন-ভূষণের শুচিতায় ধব্‌ধব্‌ করিতে লাগিল; জ্ঞানগরিমার উত্তাপে টগ্‌বগ্‌ করিতে লাগিল। রাজা প্রশ্ন করিলেন "সশস্ত্র ক্ষত্রিয়ের সাক্ষাতে যদি গোহত্যা হয়, তবে তার প্রায়শ্চিত্ত কি?"

কি অদ্ভুত প্রশ্ন! সভাতলে যেন হঠাৎ একটা বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্ষণকাল সকলে নীরব। তারপর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া বলিলেন "মহারাজের প্রশ্ন বড় সমস্যা-পূর্ণ। নরহত্যা, শিশুহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে বিহিত আছে, কিন্তু পশুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত—এ ত কখনো শুনিনি!"

রাজা উত্তর করিলেন "ঠাকুর দেবতারা কি তবে চম্‌কে উঠলেন? চম্‌কে উঠবার প্রশ্ন বটে। আরো চম্‌কে উঠবার কথা যে আপনাদের শাস্ত্রে এর কোন মীমাংসা নাই। আর আরো বেশী চম্‌কে উঠবেন, যদি শুনেন যে, আমি—দেশের রাজা—তীরধনু কাছে নিয়ে বসে থাকৃতে হিংস্র সিংহ আমার চোখের কাছে গোহত্যা করে গেল, আর আমি—এই প্রজার ভাগ্যপুষ্ট, এই গাভীর দুগ্ধপুষ্ট কাপুরুষ চুপ করে বসে রইলাম।" বলিতে বলিতে রাজার দুই চোখ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়া জলে ভরিয়া গেল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শান্তভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন "মহারাজের এতে অনুশোচনার কোন কারণ নাই। আপনি পূজায় ছিলেন, পূজা ছেড়ে উঠলে অপরাধ হত, দেবতা রুষ্ট হতেন।"

"দেবতা রুষ্ট হতেন?" আর কেশীধ্বজ ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। সিংহাসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন "কোন্ দেবতা রুষ্ট হতেন? যে রুষ্ট হত, সে দেবতা না মাংসাশী রাক্ষস? আমার ঐ গাভীটি কি দেবতার সৃষ্টি নয়? যে হাত তোমায় আমায় গড়েছে, সেই হাতই তারও দেহখানিকে রক্তে মাংসে গড়েছিল না কি? তার গায়ের উপর লাল টুকটুক্ লোমের আবরণ মেলে দিয়েছিল না কি? যত্ন করে তার ঐ নূতন-গজানো শিং দুটির মাঝ-খানটায় সেই সাদা তিলক-রেখাটি এঁকে দিয়েছিল না কি? তার রক্ষায় দেবতা রুষ্ট হতেন, আর তার অপঘাতে তিনি তুষ্ট হয়েছেন? ঠাকুর-দেবতা, এ যদি তোমার শাস্ত্র হয়, তবে শাস্ত্র দৈববাণী নয়—কষাইয়ের বাণী!

"ওগো, যে রক্ত মাংস প্রাণ তোমার দেহে, তাইত পশুরও দেহে, তবে পশু এত হেলার জিনিস হল কি করে? ভগবান নিজের হাতে যাকে কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন, নিজের হাতে যাকে আত্মরক্ষার অস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন, তুমি মানুষ কোন্ অহঙ্কারে তাকে হেলা করবে? কোন গুণে তুমি পশুর চাইতে শ্রেষ্ঠ? আছে তোমার এই হাতীর মত সংযম, ঐ মহিষের মত একতা, ঐ গাধার মত ধৈর্য্য? পার তুমি আমার সেই গাইটির মত তোমার যা কিছু স্বার্থের দুধ পরের ছেলেকে বিলিয়ে দিতে? তবে তুমি কোন্ আস্পর্দ্ধায় আপনাকে সৃষ্টির মাথার মণি বলে মনে কর? না ব্রাহ্মণ, এ অহঙ্কারটুকু ছাড়তে হবে। ভগবানের সৃষ্টিকে প্রাণ দিয়ে বুঝতে হবে। শাস্ত্র যাঁরা করেন, তাঁদের জানতে হবে, যে, একই রক্ত-মাংসে মানুষ আর পশুর শরীর। একই সুখদুঃখে তাদের জীবন! একই হাসিকান্নার মধ্যে তারা দোল খায়!

এই তৃণে শস্যে মণ্ডিত ধরণীর উপর; এই ফুলরেণু-সুরভি বায়ুর উপর; এই আশার মত চঞ্চল, কালের মত অবিরাম, প্রাণের মত স্নেহময় জলধারার উপর তোমার যেমন অধিকার, ঐ পশুরও তাই, পাখীরও তাই। এটুকু সত্য যাঁরা দেখতে না পারেন—চোখের উপরে—বুকের ভিতরে—আপনার প্রতিদিনকার কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগবিলাসের মধ্যে—শাস্ত্র লিখবার তাঁদের অধিকার নেই!

"ওগো, কি অন্ধকারে এতদিন ঘুরে মরেছি! কি নিরর্থের বোঝা পিঠে করে এতদিন ছুটে চলেছি! আজ যে হাড়ে হাড়ে ব্যথা জমে উঠেছে, জানু দুটি নীচের দিকে নুয়ে পড়ছে, সমস্ত দেহ মাটির উপর লুটাতে চাচ্ছে! কি করে তবে পথের সন্ধান করব? জানি না, কতবার আর জন্ম নিতে হবে! কতবার আর নূতন করে যাত্রা সুরু করতে হবে—এমনি অনর্থের ভার কাঁধে করে, এমনি মিথ্যার আঁধার সমুখে করে, এমনি বন্ধুর-কঠোর-ক্লান্ত পথেচরণ টেনে টেনে! কবে সে সত্য পাব?—ওগো সে আমার অভয়মরণ শ্রান্তিহরণ অমল ধবল সত্য!—যার আলোকে চোখের ধাঁধা মুছে যাবে, বুকের রক্ত জেগে উঠবে, জন্মমরণের দুস্তর পথ পার হয়ে গিয়ে এ যুগযুগান্তের কর্ম্মের বোঝা নামিয়ে দিতে পারব—সেই মহাজনের দুয়ারে—সে আমার রাজাধিরাজের পায়ের কাছে!" কেশীধ্বজের গলায় কথা বিঁধিয়া গেল, চোখ দুটি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল; সভাসদ স্তব্ধ—স্তম্ভিত!

মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া আবার রাজা বলিতে লাগিলেন "কিন্তু আর না! হিংসার রক্ত দিয়ে, মিথ্যার ধূলি দিয়ে আর এ বোঝার ভার বাড়াব না! পূজাপার্ব্বণ করে দেখেছি—এতে শুধু ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারকে ফেনিয়ে তোলে; যাগ যজ্ঞ করে দেখেছি, এতে শুধু রক্তের তৃষা জাগিয়ে দেয়! এবার প্রায়শ্চিত্তের আরম্ভ। এই গোবধের প্রায়শ্চিত্ত থেকে সুরু করে' জীবনে যত কিছু হত্যা করেছি—পশু, মানুষ, স্নেহ, মমতা, যা কিছুকে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে এক একটি সুন্দর ফুলের মত ছিঁড়ে ফেলেছি—এ সমস্তের জন্যে আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। হিংসায় পোষা দন্তে ছোঁয়া যা-কিছু অর্থ—সব নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে হবে; মিথ্যার বোঝায় কলঙ্কিত এ মাথার কেশ মুণ্ডনের দ্বারা ত্যাগ কর্ত্তে হবে। এত কালের রক্তের গন্ধ এ দেহে—গঙ্গার জলে ধুয়ে ফেল্‌তে হবে। তার পর মুক্ত—একেবারে সমুদ্রতীরের খোলা হাওয়ার মত মুক্ত এ জীবনটাকে অনন্তের মধ্যে ছেড়ে দেব—যদি সত্যের সন্ধান পায়!" বলিয়া রাজা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। আহা, এই রাজসভার বাহিরে, এই সোনায়-গড়া পিঞ্জরার বাহিরে সংসারটা কেমন খোলা, কেমন বাতাসে ধোয়া, কেমন আনন্দময়! এই ঐশ্বর্য্যের কয়েদখানাটার বাহিরে গাছগুলি কি সতেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, ঘাসের সবুজ কেমন জীবনের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, লতার বাহু কেমন স্নেহের আহ্বানে লতাইয়া পড়িয়াছে! আর সমস্তের উপর এই সকাল বেলাকার সূর্য্যকিরণ!—কেমন একটা বন্ধনহীন প্রকাশের মত—শরতের দুটি মিনতি-ভরা আঁখির মত—নীল আকাশের অগাধ ভালবাসার মত! হায় রে, মানুষ কী স্বর্গে কী নরক রচনা করিয়া বসিয়া থাকে! কেশীধ্বজ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "পণ্ডিতগণ, চুপ্ করে' বসে' থাকলে চলবে না; আমি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাই।"

তখন পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি বৃদ্ধ, তিনি দাঁড়াইয়া রাজার "স্বস্তি" কামনা করিলেন আর বলিলেন "রাজন্, এ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আমরা দিতে পারি না। নগ্নগণই পশুবধের বিরোধী। আপনি নির্ব্বাসিত খাণ্ডিক্যের নিকট গমন করুন। শুনিয়াছি, তিনি নাকি "মায়ামোহের"* ধর্ম্মে সুপণ্ডিত। তিনিই আপনাকে যথার্থ বিধান দিতে পারবেন।" বৃদ্ধের কথায় সকলেই সায় দিলেন।

(৭)

ভোর হইতে যখন গাছের আড়ালে মেঘের পুঞ্জ উষরাণীর মুকুটের মত জ্বলিয়া উঠিল, কেশীধ্বজ তখন খাণ্ডিক্যের আশ্রমের অদূরে দেখা দিলেন। সারাদিন, সারারাত ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়াছেন—গায়ে ঘাম, মুখে লালিমা, চোখে রক্ত; পাছে পাছে অনুচরের দল। খাণ্ডিক্যের সেনাপতি ধনুকে তীর যোজনা করিয়া কহিলেন "ঐ দেখুন—আপনাকে বনবাস দিয়েও কেশীধ্বজের সাধ মিটে নাই, এখন প্রাণ নিতে আস্‌ছে।"

* পুরাণে বুদ্ধকে "মায়ামোহ" বলা হইয়াছে।

থাণ্ডিক্য বলিলেন "আসুক।"

সেনাপতি। "যদি হুকুম দেন—"

থাণ্ডিক্য। "হুকুম দিলাম, তীর ধনু ফেলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।"

সেনাপতি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কেমন হুকুম?"

থাণ্ডিক্য প্রশ্ন করিলেন "আমার প্রাণ নিয়ে যদি কারো তৃপ্তি হয়, তোমাদের তাতে আপত্তি কি?"

সেনাপতি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "যথেষ্ট আপত্তি আছে। হিংসুক হিংসার দ্বারা এ সুন্দর পৃথিবীটাকে ছারখার কর্‌বে, এ আমি সইতে পার্‌ব না।"

গম্ভীর কণ্ঠে থাণ্ডিক্য উত্তর করিলেন "হিংসুক হিংসা করবে বলে কি তোমরাও হিংসা করবে? সুন্দর পৃথিবীতে তোমরাও রক্ত-পাত করবে? তা হবে না!"

সে আদেশ লিখার মত পরিষ্কার, প্রস্তরলিপির মত স্থির! সেনাপতি ধনুতীর ফেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কেশীধ্বজ অনুচরদের দূরে থাকিতে আদেশ দিয়া একলা খাণ্ডিক্যের নিকট আসিলেন। বলিলেন "থাণ্ডিক্য, তোমার কাছে জান্‌তে এসেছি—গোবধের প্রায়শ্চিত্ত কি?" প্রশ্ন শুনিয়া থাণ্ডিক্য বিস্মিত হইলেন না। চোখের ভিতর দিয়া তিনি কেশীধ্বজের হৃদয়ের লেখা পড়িয়া লইলেন।—সে হৃদয়ে এখন কেবল একটা অনুতাপের শিখা, একটা বিদ্রোহের ধোঁয়া।

কোন প্রশ্ন না করিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেন। কেশী বলিলেন "তুষ্ট হলাম, তুমি বর চাও।"

থাণ্ডিক্য দুই বড় বড় চোখে কেশীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বর দিবে?"

কেশী উত্তর করিলেন "হাঁ।"

থাণ্ডিক্য যোড় হাতে কহিলেন "রাজন্, যদি বর দিতে চাও, তবে এই বর দাও, যেন রাজকুমার কামমুক্ত হন, আর তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়।"

কেশীধ্বজ চোখ তুলিয়া থাণ্ডিক্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এক দম্‌কা পাগলা হাওয়া গাছ হইতে একরাশি ফুল উড়াইয়া দুই ভাইর মাথার উপর ছড়াইয়া গেল!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা।

শিশুর প্রাণরক্ষা

নিউ-জীল্যাণ্ড দ্বীপে শিশুদের অকালমৃত্যু-নিবারণের চেষ্টা যেরূপ সফল হইয়াছে, এরূপ আর কোন দেশে হয় নাই। পৌষের প্রবাসীতে লিখিয়াছি, সেখানে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এক বৎসরের অনধিক-বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুর হার ছিল হাজারকরা ৮৩, ১৯১২তে উহা হয় ৫১। বঙ্গে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে হাজারে ২২১ জনের উপর শিশু মরিয়াছে, অর্থাৎ নিউ-জীল্যাণ্ডের চারিগুণেরও বেশী। নিউ-জীল্যাণ্ডের ডানেডিন সহরে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে শিশুমৃত্যুর হার হইয়াছিল হাজারে মোট ৩৮, অর্থাৎ বঙ্গের প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ। এরূপ সুফল কেমন করিয়া ফলিল?

নিউ-জীল্যাণ্ডে শিশুমৃত্যুর হার কমিয়াছে প্রধানতঃ একটি সমিতির চেষ্টার ফলে। উহার নাম নিউ-জীল্যাণ্ড-বাসী নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য-সমিতি (New Zealand Society for the Health of Women and Children)। এই সমিতির অধিকাংশ কর্ম্মচারী স্ত্রীলোক। গবর্ণমেণ্ট ইহাকে অর্থ-সাহায্য করেন ও ইহার কার্য্য পরিদর্শন করেন। মিউনিসিপালিটি-সমূহ নানা প্রকারে ইহার শাখাগুলির সাহায্য করেন।

শিশুর জননীদিগকে এবং অন্তঃসত্তা নারীগণকে তাঁহাদের নিজের ও শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ে শিক্ষা দিয়া শিশুদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করা হয়। শিশুকে খাওান ও তাহার যত্ন করা (Feeding and Care of Baby) নামক একটি বহি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা ১৬২ পৃষ্ঠা পরিমিত; ৬০টি ছবি আছে। মূল্য এক শিলিং বা বার আনা। গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বাভাবিক খাওান, কৃত্রিম উপায়ে খাওান, শিশুর জীবনের দ্বিতীয় বৎসরে খাওান, কেমন করিয়া শিশুকে বিছানা হইতে তুলিতে হয় এবং বহন করিতে হয়, শিশুর খাওা, দাওা প্রভৃতি বিষয়ে কি প্রকারে নিয়মিত অভ্যাস জন্মাইতে হয়, প্রচলিত ভ্রম, সাধারণ স্বাস্থ্য, সাধারণ ব্যাধি, সাবধানতা, প্রভৃতি বিষয়ে ইহাতে সোজাভাষায় উপদেশ দেওা আছে। তা ছাড়া, শিশুর কি আবশ্যক (What Baby Needs), ঘড়ি ধরিয়া খাওান (Feeding by the Clock), শিশুর পক্ষে

সকলের চেয় ভাল কি (What is Best for Baby), প্রভৃতি ছোটছোট পুস্তিকা আছে। সমিতির সমক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়, এবং এই বক্তৃতাগুলি ও সমিতির রিপোর্টসমূহ সর্ব্বসাধারণ পাইতে পারে।

সমিতির দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকপুস্তিকাদি ছাড়া গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত কতকগুলি পুস্তিকাও পাওয়া যায়। সরকারী একটি বহির নাম শিশুর প্রথম মাস (Baby's First Month)। কোন শিশুর জন্ম রেজিষ্টরী হইবামাত্র তাহার মাকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই বহি একখানি বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হয়। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৫; দশখানি ছবি আছে।

এইসব সুবিধা থাকায় নিউ-জীল্যাণ্ডের কোন মাতার বলিবার জো নাই যে আমি সুযোগের অভাবে জানিতে পারি নাই যে আমার স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে কি করিতে হইবে, কিম্বা আমার শিশুটিকে সুস্থ রাখিতে হইলে এবং উহাকে সবল ও বুদ্ধিমান্ মানুষ করিয়া তুলিতে হইলে কি করিতে হইবে।

নিউ-জীল্যাণ্ডের লোক-সংখ্যা সাড়ে এগার লক্ষ মাত্র; প্রায় বাঁকুড়া জেলার সমান; চব্বিশপরগণা, রংপুর, বা বাখরগঞ্জ জেলার অর্দ্ধেক; এবং মৈমনসিংহের সিকি। এই অল্পসংখ্যক লোকের জন্য ৭০টির উপর স্থানীয় কমিটি আছে। এই কমিটিগুলি স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়-সমূহের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় গার্হস্থ্য-জীবনের প্রতি ছাত্রী-দিগকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষা, এবং শিশুপালন সম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহল উদ্রেক করেন, এবং শিক্ষা দেন।

নিউ-জীল্যাণ্ডের প্রত্যেক সংবাদপত্রে প্রতিসপ্তাহে শিশুদের কল্যাণবিষয়ক নানা প্রশ্নের আলোচনার জন্য ২।১ স্তম্ভ জায়গা নির্দ্দিষ্ট আছে।

বাঙ্গলাদেশে গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটীসমূহ, সম্পাদকগণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি নিউ-জীল্যাণ্ডের মত উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সদ্যসদ্যই কিছু সুফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে হইলে নারীদিগকে লেখাপড়া শিখান আবশ্যক। নতুবা যাহা ছাপিবেন, তাহা পড়িবে ক জন? বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশে যে ৯৯ জন বালিকা ও নারীর মধ্যে কেবলমাত্র ১ জন লিখনপঠনক্ষম, এবং ৯৮ জন নিরক্ষর।

নিউ-জীল্যাণ্ড কেবল পুস্তকপুস্তিকাদি প্রকাশ ও প্রচার এবং বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করেন নাই। বঙ্গের একটি ক্ষুদ্র জেলার সমান লোকের জন্য ২০ জনের উপর সুদক্ষ ধাত্রী নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা দেশময় ঘুরিয়া বেড়ান, এবং মাতা ও সন্তানসম্ভাবিতাদিগকে যথোপযুক্ত উপদেশ ও পরামর্শ দেন। খুব দূরবর্ত্তী দুর্গমস্থানবাসী লোকদিগকে তাঁহারা পত্রদ্বারা পরামর্শ দিয়া থাকেন। এই-সকল ধাত্রীদের স্থায়ী ঠিকানা এবং তাঁহারা কখন কোথায় যাইবেন থাকিবেন, তাহার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখা থাকে যে তাঁহাদের সেবা ও সাহায্য সম্পূর্ণরূপ বিনামূল্যে ধনী নির্ধন সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত নির্বিশেষে সকলে পাইতে পারিবেন। অবশ্য, ইঁহারা ছাড়া বিস্তর চিকিৎসক ও ধাত্রী আছেন, যাঁহাদিগকে লোকে, প্রয়োজনমত, টাকা দিয়া ডাকিয়া থাকে। ডানেডিন সহরে একটি শিশুচিকিৎসাগার আছে। তথায় একজন সুশিক্ষিতা ধাত্রী শিশুদিগকে পরীক্ষা ও ওজন করেন, এবং অপুষ্টি বা পীড়া লক্ষিত হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা ও পরামর্শ দেন। সমিতি কেবলমাত্র শিশুদের জন্য একটি হাঁসপাতাল চালান। সেখানে প্রসূতিগণ সন্তানসহ গিয়া ও থাকিয়া স্বাস্থ্যলাভ-বিষয়ে সর্ব্ববিধ পরামর্শ ও সাহায্য পাইয়া থাকেন।

গবর্ণমেণ্টের অনেকগুলি সাধারণ সূতিকাগার আছে, এবং প্রত্যেক জেলার জন্য ধাত্রী আছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক ধাত্রীকে রেজিষ্টরীভুক্ত হইতে হয়; গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কাহাকেও ধাত্রীর কাজ করিতে দেওয়া হয় না। প্রসবান্তে রক্তদুষ্টি (septic case) হইলে ধাত্রীকে জরিমানা দিতে হয়। সাধারণ সূতিকাগারসমূহে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত আছে। তথায় অনেক নারী ধাত্রীবিদ্যা শিখিতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে নিউ-জীল্যাণ্ডের প্রতি হাজার মানুষে একজন শিক্ষিতা ধাত্রী হইবেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহে (U. S. A.) শিশু-রক্ষার চেষ্টা প্রধানতঃ রাষ্ট্র (States) এবং মিউনিসিপালিটি

গুলি দ্বারাই হইয়া থাকে। অনেকগুলি রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে বহুসংখ্যক শিশুমৃত্যু-নিবারণ-বিষয়িণী পুস্তিকা বিতরিত হইয়া থাকে। ইহাতে গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময়, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর কি কি করা উচিত, সমুদয় লেখা আছে। অনেকগুলি পুস্তিকা নানাভাষায় লেখা। পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া রাষ্ট্রে ইংরেজী, ইতালীয়, জার্মেন, পোলিশ, য়িদ্দিশ, এবং স্লোভাক্ ভাষায় মুদ্রিত পত্রী বিতরিত হয়। নানা সহরের স্বাস্থ্য-বোর্ডগুলি রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত শিশুদের প্রাণরক্ষা-বিষয়ে সহযোগিতা করেন। তাঁহারা অনেকে যোগ্য ডাক্তার ও ধাত্রীর অধীনে শিশুচিকিৎসাগার এবং জননীদের জন্য পরামর্শগৃহ চালাইয়া থাকেন, এবং অনেকে জননীদিগকে বাড়ী বাড়ী গিয়া পরামর্শ দিবার জন্য সুদক্ষ ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

শিশুজীবন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মত এই যে শিশুদিগকে মাতৃস্তন্যপান করানই বিধি। যেসব ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়, তথায় বিশুদ্ধ দুগ্ধ, চিকিৎসকের ব্যবস্থা-অনুযায়ী, চুণজল, যবজল, বা ওট্‌জল মিশাইয়া খাওান উচিত। এইরূপ আহারের ফল কিরূপ হয়, আমেরিকায় তাহা লক্ষ্য করা হয়, এবং অপুষ্টি ও উদরের পীড়ার প্রতিকার করা হয়। বিশুদ্ধ দুধ পাইবার জন্য আমেরিকার সহরগুলিকে খুব কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। নিউইয়র্ক সহরে প্রত্যহ চল্লিশ হাজার মণ দুধ দরকার হয়। ইহার কিয়দংশ ৪০০ মাইল দূর হইতে আসে। শিকাগোতে প্রত্যহ ২৫,০০০ মণ দুধ খরচ হয়। তাহা ১০০ হইতে ২০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে সংগৃহীত হয়। দুধ সুস্থ, স্বাস্থ্যকর স্থানে রক্ষিত, এবং ভাল খাদ্যে পুষ্ট গাভী হইতে প্রাপ্ত কি না, এবং গ্রামস্থ গোশালা হইতে সহরে আনিবার সময় উহা যাহাতে দূষিত না হয়, তাহা দেখিবার জন্য সহরের কর্ত্তৃপক্ষকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হয়। কোন কোন আমেরিকান্ সহর এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজ খুব কর্ত্তব্য-পরায়ণতার সহিত করেন। যেরূপ স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় (hygienic) অবস্থার মধ্যে দুধ পাওা যায় এবং ক্রেতাকে দেওা হয়, তদনুসারে দুধের শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। বিশুদ্ধতার তারতম্য অনুসারে মূল্যেরও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। খুব ভাল, একেবারে খাঁটি বলিয়া সার্টিফিকেট-দেওয়া দুধ, গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকেরা কিনিতে পারে না। কোন কোন সহরে মিউনিসিপালিটী দুধের দোকান খুলিয়াছেন; তথায় মাতাদিগকে বিনালাভে দুধ বিক্রী করা হয়, কখন বা যে দামে কেনা তার চেয়েও কম দরে, এবং স্থলবিশেষে বিনামূল্যেই দেওয়া হয়।

কোন কোন সহরের স্বাস্থ্যবিভাগ সহরের ও প্রত্যেক ওার্ডের বড় মানচিত্র রাখেন, এবং কোন ওার্ডে একটি শিশুর মৃত্যু হইলেই তাহার মানচিত্রে একটি আলপিন পুঁতিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক রোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঙে রঙান মাথাওালা আলপিন ব্যবহার করা হয়। এইরূপে সহরের কোন অঞ্চলে কোন্ রোগে কত শিশু মরিতেছে, তাহা অবিলম্বে জানা যায়, এবং ঐ রোগ নিবারণের জন্য উপায় অচিরে অবলম্বন করা যায়। শিশুর জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্টরী করিবার কড়া নিয়ম যে যে স্থানে লোকদিগকে পালন করিতে বাধ্য করা হয়, কেবল সেখানেই এইরূপ বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয়। কিন্তু অন্যত্রও ইহাতে কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে।

আমেরিকার কোন কোন সহরে বালিকাবিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে প্রত্যেক বালিকাকে মাতার কর্ত্তব্য ও শিশুপালন শিখিতে বাধ্য করা হয়। ওহিও রাষ্ট্রের ক্লীভল্যাণ্ড সহরে নিম্নলিখিত রূপ পাঠ নির্দ্দিষ্ট আছে:—

পাঠ ১। শিশুকে কেমন করিয়া সুস্থ রাখিতে হয়। মৃত্যুহারের উচ্চতার কারণ, এবং তাহা নিবারণের উপায়।

পাঠ ২। স্বাভাবিক শিশুর বাড় এবং বিকাশ।

পাঠ ৩। শিশুর কাপড় চোপড় বিছানা আদি কাটিতে ও সেলাই করিতে শিক্ষা।

পাঠ ৪। শিশুকে খাওান। স্তন্যদান, কৃত্রিম আহার, পেটেণ্ট খাদ্যে বিপদ।

পাঠ ৫। স্নান। স্নানের জন্য কি কি জিনিষ চাই; স্নানের আগেকার আয়োজন; স্নানে শিশুর কত উপকার হয়।

পাঠ ৬। শিশুদের সাধারণ রোগ। উদরের পীড়ার প্রারম্ভে বাড়ীতে কিরূপ চিকিৎসা করা যাইতে পারে।

অনেক সহরে বালিকাদিগকে খোকাখুকীদের লালন-পালন করিতে শিখাইবার জন্য "ছোট্ট মাদের সমিতি," "ছোট্ট মাদের শ্রেণী" (Little Mother Leagues, Little Mother Classes) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের অনেক সহরেও শিশুদের মৃত্যু-সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা বহু পরিমাণে সফল হইয়াছে।

এখন নানা দেশের লোকে বুঝিতে পারিয়াছে যে, কতকগুলি শিশুকে এক বৎসরের হইবার আগেই মরিতেই হইবে, ইহা বিধিলিপি নয়, যত্ন করিতে জানিলে শিশুদের মৃত্যু খুব কমান যায়। আমাদের এই ধারণা কবে হইবে? কবে আমরা বুঝিব, যে, দেশের দরিদ্রতা নিবারণ এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ত করিতেই হইবে; তাহা ছাড়া, শিশুদিগকে বাঁচাইতে হইলে, জননীদিগকে সন্তানপালন শিক্ষা দিতে হইবে, এবং শিশুর প্রধান খাদ্য খাঁটি দুগ্ধের অভাব দূর করিতে হইবে। শিশুপালন বহি পড়িয়া বা কানে শুনিয়া শিখিলেই শুধু হইবে না। নিতান্ত বালিকা-বয়সে হৃদয়ে মাতৃস্নেহের বিকাশ হয় না। শিশুপালন-শিক্ষার জন্য বয়স হওয়া চাই, জননী হইবার নিমিত্ত দেহ যেরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তাহার জন্য বয়স হওয়া চাই, আবার মাতৃস্নেহের বিকাশের জন্যও বয়স চাই। যে দিক্ দিয়াই দেখা যাক্, বাল্যবিবাহ ও অকালমাতৃত্ব দূরীভূত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এখন একান্নবর্ত্তী পরিবার পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে। চাকরী ও অন্যবিধ বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে পৈত্রিক আবাস ছাড়িয়া দূরেও বেশী লোকে যাইতেছে। এইসব কারণে এখন অনেক অল্পবয়স্কা জননী সন্তান পালনে বাড়ীর প্রবীণাদের সাহায্য পান না। এই-জন্যও সন্তানপালন শিক্ষা বেশী আবশ্যক হইয়াছে।

ইউরোপের যুদ্ধে এখন প্রত্যেক জাতি মানুষের অভাব অনুভব করিতেছে; ভাবিতেছে, আরও যদি মানুষ থাকিত তাহা হইলে সেনাদলভুক্ত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া শীঘ্র জয়-লাভ করিতাম। কিন্তু শান্তির সময়ের জন্য মানুষের প্রয়োজন আরো বেশী। সুস্থ, সবল, সাহসী, শিক্ষিত লোক যাহাদের যত বেশী, তাহারা প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে তত ধন আহরণ করিতে পারে; শুধু জড়-ঐশ্বর্য্য নয়, জ্ঞান ও অন্যবিধ আধ্যাত্মিক সম্পদেও তাহারা তত ধনী হয়। এক একটি শিশু বাস্তবিকই এইজন্য, শুধু মায়ের চোখে নয়, স্বদেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিকের চোখেও, এক একটি অমূল্য রত্ন;—কে জানে কাহার মধ্যে কি শক্তি সঞ্চিত আছে!

ইংলণ্ডের হাডার্সফীল্ড সহরের লংউড পল্লীতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর হইতে ১৯০৫এর ঐ তারিখ পর্য্যন্ত যতগুলি শিশু জন্মিয়াছিল, কোন প্রকার বাছাই না করিয়া প্রত্যেকের জন্মের তারিখ, পিতামাতার নাম ধাম, লিখিয়া লওয়া হয়। প্রথমটি জন্মে ১০ই নবেম্বর, ১৯০৪, শেষটি ৮ই নবেম্বর, ১৯০৫। প্রত্যেক শিশুর বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইবামাত্র সে বাঁচিয়া আছে কিনা খবর লইবার জন্য তাহার বাড়ী যাওয়া হয়। শেষ যাহার জন্ম হয়, সে ১৯০৬ সালের ৮ই নবেম্বর পূর্ণ এক বৎসর বয়স্ক হয়। তখন দেখা গেল মোটে ১১২ জন জন্মিয়াছিল; তাহার মধ্যে ১০৭ জন এক বৎসরের হওয়া পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল, ৪ জন তৎপূর্ব্বেই মারা পড়িয়াছিল, একজনের বাপ মা সে স্থান ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল স্থির করিতে পারা যায় নাই। যে ১০৭ জনের ১ বৎসর বয়স হইয়াছিল, তাহার পরও তাহাদের উপর নজর রাখা হয়। ১৯১৪ নবেম্বরে যখন তাহারা দশ অতিক্রম করিয়াছিল, তখনও ৯৭ জন সুস্থ ও সবল ছিল। বাকী ১০ জনের মধ্যে ৬ জন স্থান ত্যাগ করিয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ তখনও বাঁচিয়া ছিল। এই শিশুগুলি সব রাজা বাদশার ছেলে নয়, আর দশজন খোকাখুকীর মত; কিন্তু মানবজীবন এমনই অমূল্য বলিয়া লোকে বুঝিয়াছে যে সাতরাজার ধন মাণিকের মত ইহাদের প্রত্যেকের খবর ও গতিবিধি দশ বৎসর ধরিয়া রাখা হইয়াছে!

যে জাতি বড় হইতে চায়, তাহাকে শিশুদের খবর রাখিতে হইবে।

শপথ-ভঙ্গ

(পুরাতন জাপানী কবিতা হইতে)

হৃদয় ভেঙেছে মোর তার লাগি নাহি কাঁদি,
নমিয়াছি নিয়তির পায়।
শপথ ভাঙিয়া তুমি পড়েছ ধাতার কোপে
করিয়াছ মহাপাপ হায়,
তার লাগি বড় ভয়, ভাবি আমি আঁখিজলে,
হইয়াছি উন্মাদিনীসমা,
এ প্রার্থনা নিশিদিন বিধাতা সদয় হোন্
ওগো প্রিয়, লভ তাঁর ক্ষমা।

শ্রীকালিদাস রায়।
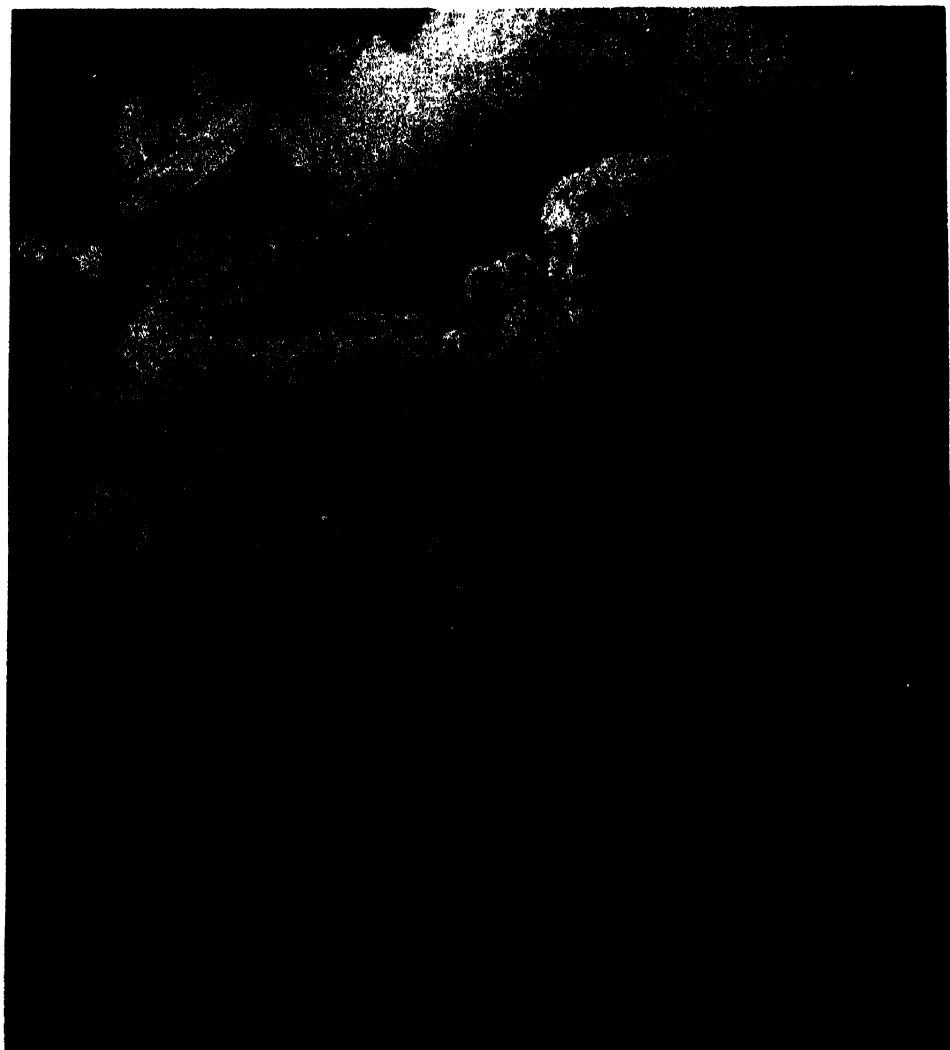
শিল্পীর মোহভঙ্গ।

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে।

মার্কিন মেয়েদের কথা

প্রথম প্রস্তাব

আমেরিকার যু°রাজ্য হইতে হিন্দুর নির্ব্বাসনের চেষ্টা চলিয়াছে। এ সময়ে মার্কিনের কথা বাঙালীর কাছে রুচিকর হইবে কি না জানি না; কিন্তু এ দেশে আমাদের সম্বন্ধে লোকের যে সকল ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহা দূর করিবার জন্য যেমন আমরা চেষ্টা করিতেছি তেমনি নিজেদের দেশেও যাহাতে এ দেশের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিতে পারে তাহার চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য বলিয়া বারবার অনুভব করিয়াছি।

আমাদের দেশ সম্বন্ধে যে-সকল ভ্রান্ত ধারণা এ দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী বিশেষভাবে খৃষ্টীয় মিশনরী ও ত্াঁদিনের পর্য্যটকগণ। আমরাও যে দায়ী সে কথা একশ' বার স্বীকার করিতে হইবে, কারণ এই-সকল মিশনরী ও পর্য্যটকগণ আমাদের গৃহে কোনো দিন নিমন্ত্রিত হন না, এবং আমাদের সমাজ, গৃহপরিবার দেখিবার সুযোগ পান না, কাজেই তাঁহারা ভাসা-ভাসা যাহা দেখেন ও লোকমুখে যাহা শোনেন তাহা কল্পনার রঙে রঙাইয়া কেতাবে লেখেন এবং তাহা বাইবেল অপেক্ষা অভ্রান্ত বলিয়া এ দেশে গৃহীত হইয়া থাকে। *

হটন্ ওয়েব্‌ষ্টার (Hutton Webster) আমেরিকার একজন সুপরিচিত নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। যেদিন তিনি প্রকাশ্য সভায় হিন্দুকে "অৰ্দ্ধসভ্য" (semi-civilized) বলিয়াছিলেন সেদিন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তাঁহার যুক্তি ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই; যৌন নির্ব্বাচন ও বিবাহচ্ছেদ প্রথা নাই; সাধারণ লোকশিক্ষা এখনো প্রবর্ত্তিত হয় নাই; সতীদাহ, শিশুবলি, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদ এখনো সম্ভবপর, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার এই অভিযোগের উত্তরে ভারতবর্ষে আচরিত এ-সকল পাপের কোন্‌টি আমেরিকায় নির্ব্বিবাদে আচরিত হয় না তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি "not one of them" বলিবার পর উত্তরে যাহা বলিয়াছিলাম তাহার সারমর্ম্ম এখানে দিলাম।

পাশ্চাত্য হিসাবে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে, মান্দ্রাজে, রাজপুতনায়, কাশ্মীরে, বাঙলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে যে স্ত্রীস্বাধীনতা আছে তাহা তিনি জানেন কি? বিরাট ভারতবর্ষের বিভিন্ন আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মধ্যে অতীতে যৌন নির্ব্বাচন প্রথা সুপ্রচলিত ছিল এবং এখনো স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে তাহা তিনি জানেন কি? মুসলমান সমাজে ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজে † (অনেকে ইহাদের "হিন্দু" নাম দিতে হয়তো আপত্তি করিবেন) বিবাহচ্ছেদপ্রথা সুপ্রচলিত তাহা তিনি জানেন কি? তা' ছাড়া বিবাহচ্ছেদ প্রথার বিদ্যমানতা সভ্যতার একটা উচ্চ অঙ্গ বলিয়া ধরা যাইতে পারে কি? বিবাহচ্ছেদ প্রথা এ দেশে উৎকর্ষ লাভ করিতে করিতে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যাহাতে প্রত্যেক এগারটি বিবাহের মধ্যে একটি বিবাহচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে কি না? সাধারণ লোকের মধ্যে অক্ষরপরিচয়ের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যুক্ত-রাজ্যের অসংখ্য জনমণ্ডলীর নিরেট মূর্খতা দূর হইয়াছে কি? সতীদাহ নাই বটে কিন্তু "লিঞ্চ" প্রথা (জীবন্ত নিগ্রোকে ধরিয়া হত্যা করিবার প্রথা) প্রচলিত আছে কি না? প্রতিদিন অবাধে নারীহত্যার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে কি না? গঙ্গাসাগরে শিশুবিসর্জ্জন নাই বটে কিন্তু সহস্র সহস্র শিশু জননী-কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং সময়ে সময়ে নিহত হয় কি না? ‡ মর্ম্মনদিগের (Mormons) মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল কি না, এবং এখনো আছে কি না? অসংখ্য পুরুষ এবং নারী পরস্পরের সহিত দুদিন ঘর করিয়া অবসাদ আসিলে ছুতা করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতনের সন্ধানে বাহির হয় কি না? অথবা বিচ্ছেদের পূর্ব্বেই নূতনের সন্ধান ঠিক করিয়া লয় কি না? আমেরিকার সুবিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জর্জ্জ এলিয়ট্ হাওয়ার্ড এই পৌনঃপুনিক বিবাহচ্ছেদকে "economic polygamy"

* নমুনাস্বরূপে উইলিয়াম বাট্‌লারের "Land of the Vedas" উল্লেখযোগ্য।

† যথা ছোটনাগপুরের বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে।

‡ শিশু... [illegible] প্রাণবধ করিয়া অর্থলাভের চেষ্টার কথা পাশ্চাত্যদেশে কখন কখন শুনা যায়।

আখ্যা দিয়াছেন কি না? সমাজসঙ্গত বাল্যবিবাহ খুব সাধারণ না হইলেও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্যবিবাহ এখনো প্রচলিত আছে কি না? সমাজ ও আইনঘটিত না হইলেও বালকবালিকার লৌকিক সমাগম * (biological marriage) ও সন্তানসম্ভাবনা † যুক্তরাজ্যে অতি সাধারণ ঘটনা কি না? অ-শ্বেত যাত্রীদিগের জন্য যুক্তরাজ্যের দক্ষিণস্থ প্রায় সমুদয় ষ্টেটে স্বতন্ত্র ট্রামগাড়ীর ব্যবস্থা আছে কি না? রেলে নিগ্রোলাঞ্ছনার প্রতিকারকল্পে নিগ্রোকুল-ধুরন্ধর মিঃ বুকার টি ওয়াশিংটনকে সমরক্ষেত্রে নামিতে হইয়াছে কি না? টিউটনবংশীয় ব্যতীত অন্যান্য য়ুরোপীয় ও ঐশেয়ীয় জাতিদিগকে এ দেশে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা হয় কি না? সামাজিকতা ও বিবাহ ব্যাপারে ইহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা জাগ্রত আছে কি না?

পণ্ডিত ওয়েব্‌ষ্টার জানিতেন না যে হিন্দু আমেরিকায় আসিয়া জুড়িখাতা (scrap book) কিনিয়া, আমেরিকার যা' কিছু উৎকৃষ্ট ও যা' কিছু কুৎসিত দুয়েরই সংবাদ কাগজ হইতে কাটিয়া তাহাতে আঁটিয়া রাখে। যখন তিনি আমার প্রশ্নে আপত্তি করিলেন ও আমার অভিযোগ অস্বীকার করিবার চেষ্টা পাইলেন তখন আমি বলিলাম আমার জুড়ি-খাতা আনিয়া দেখাইব? পণ্ডিতকে তাঁহার তর্ক ত্যাগ করিতে হইল।

যখনি পারিব আমরা দেশকে সমর্থন করিব; কিন্তু যেহেতু আমেরিকায় এ সব আছে সুতরাং আমাদের লজ্জিত হইবার কোনো কারণ নাই, আমরা যেন এরূপ একটা ধারণা করিয়া না বসি। আমরা যে কত বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া আছি, আমাদের মধ্যে কত গলদ রহিয়াছে তাহা কি আমরা একবারও অস্বীকার করিতে পারি? কিন্তু সে গলদ খ্রীষ্টান পাদ্রী চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে গেলে আমাদের অসহ্য গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। খৃষ্টীয় দেশসমূহের পাপপ্রবাহ যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ গাত্রদাহ হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

মার্কিন মেয়েদের কথা কিছু বলিতে চাই। বিষয়টি অতি বড় ও অতি গুরুতর। এ সম্বন্ধে এ দেশে অসংখ্য বই লিখিত হইয়াছে এবং নিত্য নূতন বই বাহির হইতেছে, তবু উহা পুরাতন হইতেছে না। ভারতপ্রবাসী, হিন্দুর একান্ত মুক্তিকামী, সাধারণ খ্রীষ্টান পাদ্রীর চোখ লইয়া আমি এ দেশে প্রবেশ করি নাই। শ্রদ্ধা ও কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে এ দেশে আসিয়াছিলাম। যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি তাহার মধ্যে অনেক কুৎসিত, অকথ্য, অশ্রাব্য, এমন কি অভাব্য জিনিস আসিয়া পড়িয়াছে; সেজন্য মনে ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় এমন অনেক জিনিস দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি যাহাতে সমগ্র হৃদয়মন স্নিগ্ধ-তায়, শুচিতায়, মহৎ আকাঙ্ক্ষায় বহুবার ঊর্দ্ধে, কত ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে! ভালোমন্দ দুইদিকের আভাস, ও বিশেষ ভাবে ভালো দিকটা ভালো করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব; কতদূর কৃতকার্য্য হইব জানি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া যখন প্রথম দেখিলাম অসংখ্য সুন্দরীর মাঝখানে এক-একটি পুরুষ বসিয়া একান্ত মনে পাঠে নিযুক্ত রহিয়াছে তখন একটু থতমত লাগিয়া গিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীর সংখ্যাই অধিক। পাঠাগারের একটি আসনও খালি নাই বলিলে হয়, অথচ টুঁ শব্দটি নাই। এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে পাঠে যাইবার সময় পথে ঘনিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীগণের

* (a) "Anna Weise, 14 years of age, the alleged victim of the assaults of John Hudson, on trial in district court on a charge of statutory rape, was on the stand in district court this morning." Lincoln Evening News, April 17, 1914.

(b) Olathe, Kansas. Jan. 1, 1914. "Young man, this is a bad way to start the new year." This salutation greeted Richard Snydar of Carrolltown, Ms., when he opened the door of his room in a local hotel this morning in answer to a knock. Before him stood an officer of the law, whose search for a 14-year-old girl, missing since Dec. 19, was ended ...... Thus ended the sordid romance of Pernelophy Harwick, a pretty slip of a girl *barely out of short dresses*. The *child* was found in the room sobbing softly......" Kansas City Journal, Jan. 2, 1914.

† "May Weatherhogg, *14 years of age, and mother of a child*, born a few weeks ago, the result of which was a state charge filed against her step-father, Cæsar Fowlkes, was taken to Lincoln, Friday, by Miss Jones, agent of the state board of control, after a complaint had been filed by the country attorney charging the girl with being a dependent and neglected child." Lincoln Daily News, Feb. 2, 1914.

মধ্যে একমাত্র সম্ভাষণ, "Hello !" অল্পপরিচয়ে, "Good morning !" ও "How do you do ?"

প্রথম প্রথম মনে হইয়াছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মেলা-মেশার একটা ধরাবাঁধা নিয়ম নাই ; এরূপ মনে করিবার অবশ্য কারণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম অলিখিত কতকগুলি বিধি দ্বারা ইহারা সাধারণতঃ পরিচালিত হইয়া থাকে ; তাহার ব্যতিক্রম হইলেই নিন্দা ইহাদের আক্রমণ করে। কোনো ছাত্র কোনো ছাত্রীর সহিত তাহার বাড়ীতে দেখা করিতে চাহিলে আগে তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া, অনুমতি লইয়া, সময় ঠিক করিয়া তবে দেখা করিবে, নতুবা বে-আদবি হইবে। পথে কোনো ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হইলে, পরিচয় থাকিলেও বলিবার মত বিশেষ কিছু না থাকিলে কথা জুড়িয়া দেওয়া অসঙ্গত। কোনো ছাত্রী সাধারণতঃ কোনো ছাত্রের বাসায় গিয়া দেখা করিতে পারে না ; তবে ঐ ছাত্র পিতা মাতা, ভাইভগ্নী অথবা অন্য কোনো আত্মীয়ের পরিবারে থাকিলে তাঁহাদের উপস্থিতিতে ছাত্রী সে বাড়ীতে যাইতে পারে। প্রকাশ্য হোটেলে বা কাফেতে (Cafe) ছাত্রগণ ছাত্রীদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে, উহা বিশেষ কারণ ব্যতীত নিন্দনীয় নয়। হার্ভার্ড, য়িএল্, প্রিন্সটন্ প্রভৃতি পূর্ব্বদিকের বিখ্যাত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়ম কিছু স্বতন্ত্র। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন ছাত্রদের বান্ধবীগণ তাহাদের বাসায় আসিয়া দেখা করিতে পারে, য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্সের পূর্ব্বাঞ্চলের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও তাহাদের তেমনি অবাধ গতি। পরিচারিকা (goody) অথবা অভিভাবিকার (chaperon) উপস্থিতি নাম মাত্র। বান্ধবীদের লইয়া ছাত্রগণ নানা স্থানে বেড়াইতে গিয়া থাকে ; তাহাতে কোনো বাধা নাই, অধিক রাত্রি না হইলেই হইল। থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতি দেখিবার জন্য ইহারা সর্ব্বদাই যুগলমূর্ত্তিতে বাহির হইয়া থাকে। ইহাতে অনেকে শঙ্কিত হইতে পারেন, কিন্তু বাস্তবতঃ উহার মধ্যে যতটা শঙ্কার কারণ দেখা যায় সাধারণতঃ ততটা শঙ্কার কারণ উহার মধ্যে নাই। বাল্যকাল হইতে পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া মেয়েদের এমন একটা চারিত্রিক শক্তি, এমন একটা ব্যক্তিত্ব জন্মায় যে নিতান্ত প্রগল্‌ভ পুরুষ ছাড়া মেয়েদের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতায় হাত দিতে কেহ সাহস পায় না। বস্তুতঃ মাসের পর মাস একটি অনূঢ়া মেয়ের সঙ্গে অবিশ্রান্ত মিশিবার পরও একটি চুম্বন দিবার অনুমতি ভিক্ষা করিতে নতজানু হইতে হয় না এমন বিবাহার্থী পুরুষ বিরল। পূর্ব্বাঞ্চলে (New England States) কৌতুকচ্ছলে যুবকগণ সকলের সম্মুখেই বান্ধবীদের সময়ে সময়ে চুম্বন দিয়া থাকে। কিন্তু মধ্য যুক্তরাজ্যে (middle west) ও পশ্চিম যুক্তরাজ্যে (west) বাগ্‌দানের (engagement) পূর্ব্বে এরূপ চুম্বন রীতিবিরুদ্ধ। ইহা জানা কথা, যে, পাশ্চাত্যেরা চুম্বনকে ভারতবাসীদিগের হইতে ভিন্ন চক্ষে দেখে। ভারতবর্ষেই দেখিয়া থাকিবেন, রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, ভগিনী ভ্রাতাকে বিদায়চুম্বন দিতেছেন। ব্যাঙ্ক, আপিস, আদালত, বিশ্ববিদ্যালয়, ডাকঘর, রেলওয়ে ষ্টেশন, রাজনৈতিক সভাগৃহ, হাঁসপাতাল, রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণাক্ষেত্র, গির্জ্জাঘর যেখানে ইচ্ছা যাও, নারীর অধিকার প্রায় সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। এ দেশে ভদ্রপরিবারে স্ত্রী সকল কর্ম্মের মূলশক্তি। প্রাচীন ভারতে নারীর যে অধিকার ছিল অধুনা তাহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান না থাকিলেও আমরা এখনো সে প্রভাব প্রতিদিন অনুভব করিয়া থাকি। আজ শিক্ষার অভাব, শক্তিতে সন্দেহ, ও বহু নের জড়তা আর্য্যগৃহলক্ষ্মীর পাদবিক্ষেপকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। সঙ্কল্পে ও কর্ম্মে দৃঢ় এই পাশ্চাত্য আর্য্য নারীর মূর্ত্তি কত শ্রদ্ধেয়, আমাদের নারীসমাজের কর্ম্মশক্তির বিকাশ সম্বন্ধে কত আশাপ্রদ।

নারীর আত্মনির্ভরের আদর্শ এ দেশে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে এ পৃথিবীর আর কোথাও এমন ফোটে নাই। যেখানে পুরুষ বলিয়াছে,"এ কাজ নারীর দ্বারা সম্ভবপর নয়," নারী অমনি বদ্ধপরিকর হইয়া দেখাইয়া দিয়াছে পুরুষ যে-সকল কাজ করিতে সমর্থ, নারী তাহা তো পারেই তাহা ছাড়া পুরুষ কোনোদিন করিতে সমর্থ হইবে না এমন কাজও নারীর প্রকৃতিতে সম্ভবপর। মোটর চালাইতে, বিদ্রোহ ও অশান্তির সময় শৃঙ্খলা ও শান্তি সংস্থাপন করিতে, বড় বড় যন্ত্রের কাজ পরিচালন করিতে, গুরুতর বিষয়-সমূহের অধ্যাপনা করিতে, দুর্নীতি ও দুরাচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে, রাষ্ট্রীয় শক্তির সম্যক পরিচালনা

করিতে নারী যে সমর্থ সমগ্র আমেরিকায় তাহা আজ আর কেহ অস্বীকার করে না। এ বিষয়ে নারী পুরুষের সমকক্ষতা দেখাইয়া দিয়াছে এবং ইহার উপর আরো দেখাইয়া দিয়াছে যে নারীর জগৎমাতৃত্ব তাহাতে লোপ পায় না। নারী আজ আর "lesser man" নয়, "greater man"; ইহা কবি-কল্পনার অথবা chivalryর কথা বলিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই।

আমাদের দেশে ছাত্রগণ টুইশান করিয়া অনেক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন; কায়িক শ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারৎপক্ষে কেহই রাজি হইবেন না। কিন্তু এ দেশে কায়িক শ্রমের ও শ্রম-জীবীর যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর। এ দেশে আসিবার কিছু-দিন পরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার নিমন্ত্রণ হয়। উক্ত পরিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলে গৃহকর্ত্রী তাঁহার পুত্র ও কন্যার সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন; তাহার পর একটি ফুট্‌ফুটে তরুণী ও একটি ১৬।১৭ বৎসরের বালকের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন; কিন্তু তাহারা কে তাহা বলিলেন না। পরিচয়ের পর শেষোক্ত দুইজন পাশের ঘরে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিলাম তাহারা টেবিলে আহারের সব জিনিসপত্র আনিয়া রাখিতেছে। তখন উক্ত মহিলা অনুচ্চ স্বরে আমাকে বলিলেন, "ছেলেটি আমাদের চাকর, আর মেয়েটি উহার বোন্, এক সপ্তাহের জন্য আমাদের এখানে থাকিতে আসিয়াছে।"

অল্পক্ষণ পরে যখন সেই সম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত পরিবারে উক্ত ভৃত্য বালক ও তাহার ভগ্নী আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে আহারে বসিল তখন বাস্তবিকই আমার ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল! আমরা সবসুদ্ধ সাতজন। গৃহকর্ত্তা মোহড়ায় (at the head of the table) ছিলেন। আহারের সময় বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম ইঁহারা ঐ বালক ও তাহার শিক্ষিতা ভগ্নীর প্রতি কেমন শ্রদ্ধা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিলেন। তাহার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নাই, কোনো অনুগ্রহের ভাব নাই। গৃহিণী নিজের ছেলেমেয়েকে এমন শিক্ষা দিয়াছেন যে তাহারাও যথেষ্ট সম্মান ও ভালবাসার সহিত ইহাদের সঙ্গে ব্যবহার করে। ইহা শুধু একটি পরিবারে দেখি নাই, প্রথম এই পরিবারে দেখিয়াছিলাম বটে কিন্তু তাহার পর অসংখ্য পরিবারে দেখিয়াছি এবং এই উচ্চ সাম্যের আদর্শকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিয়াছি।

আর-একটি ঘটনা এই সঙ্গে মনে পড়িতেছে। যুক্ত-রাজ্যের ষ্টেট সেক্রেটারী মাননীয় ব্রায়ানের অনুজ মিঃ চার্লি ব্রায়ানের সঙ্গে হিন্দুনির্ব্বাসন প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। ইনি বিখ্যাত "Commoner" পত্রের সম্পাদক। মিঃ ব্রায়ানের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করিবার পর পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে হাসির ফোয়ারা উঠিতে আরম্ভ হইল; তাহার পর নৃত্যের (waltz) শব্দ, তাহার পর হাসির গান। হঠাৎ মিসেস্ ব্রায়ান্ আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, "'Tis our housemaid's birthday, and so she's invited her friends to our home, and is having a good time with them. You will please excuse us for the noise." বাড়ীর দাসীর জন্মদিনে ইহারা সমুদয় বৈঠকখানাটি ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং বাড়ীর শৃঙ্খলা ভাঙিতে দিয়াছেন জানিয়া একটু বিস্মিত হইয়া গেলাম। ছেলেমেয়েদের পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া তাহা-দের কেহ কেহ সে রাত্রির মত উপরে পড়িতে চলিয়া গিয়াছে, কেহ কেহ এই জন্মদিনের উৎসবে যোগ দিয়াছে। শুধু সাধারণ পরিবারে নয়, মিঃ ব্রায়ানের মত সুবিখ্যাত পরিবারেও দাসীর এই অধিকার দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। ভৃত্যের প্রতি স্নেহ, সহানুভূতি, এমন কি সখ্যভাব ভারতে হিন্দু মুসলমান বহুযুগ ধরিয়া দেখাইয়া আসিয়াছেন; পাশ্চাত্য জগতে ঐশ্বর্য্যের একাধিপত্যের মধ্যেও এই অনাবিল সাম্যের ছবি মনে গভীর আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল।

শুধু যুবকগণ এ দেশে কায়িক শ্রম দ্বারা লব্ধ অর্থে শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করে এমন নয়, মেয়েরাও করে। অসংখ্য মেয়ে, যাহাদের রূপ আছে, গুণ আছে, যাহারা ইচ্ছা করিলেই সুবিধামত বিবাহ করিতে পারে তাহারাও কত কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শেখে তাহা দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এই-সব মেয়েদের দূর হইতে দেখিয়া এবং কাহারো সহিত পরিচিত হইয়া ইহাদের জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে

শ্রদ্ধার ভাবই আসিয়াছে। কত সংগ্রাম ইহাদের, কত প্রলোভন প্রতিপদে, তবু ইহারা এই সংগ্রামকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লয়। ইহাদের সম্বন্ধে সংবাদপত্র হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। "নেব্রাস্কা ষ্টেট য়ুনিভার্সিটিতে সম্প্রতি প্রায় ৫০টি ছাত্রী স্বাবলম্বন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। ইহারা পরের বাড়ীতে শারীরিক শ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, সহজ ও স্বাস্থ্যকর উপায় বলিয়া বিবেচনা করে। * * * অনেকে নৃত্যের, বা অন্যবিধ বাদ্যের সাহায্য করিয়া লেখাপড়ার আংশিক ব্যয় উপার্জ্জন করে। কেহ কেহ বোর্ডিংএ বা রেস্তরাঁয় পরিচারিকার কাজও করে। একজন টেলিফোঁর ভার লইয়াছে, ইহাতে রাত্রি জাগিতে হয়, সুতরাং ইহার যৌবনে অকাল-বার্দ্ধক্য অবশ্যম্ভাবী। একজন জনৈক ডাক্তারের সহকারিণী-রূপে বিষয়-বিশেষের তথ্যসংগ্রহে তাঁহার সাহায্য করিতেছে। আর একজন জনৈক বধির স্ত্রীলোককে ইঙ্গিতে বই পড়িয়া শুনাইতেছে।" *

কোনো কোনো বিষয়ে ইহারা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায় ইহা সত্য, কিন্তু আত্মসম্মানবোধ লইয়া জীবনসংগ্রামে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইবার আনন্দ হইতে ইহারা বঞ্চিত হইতে চায় না। বুকভরা সাহস ইহাদের, মুখভরা হাসি। অনেকের বিবাহের প্রতি তেমন অনুরাগ নাই, আবার অনেকের বেশ অনুরাগ আছে। যখনি সুযোগ পাইয়াছি তখনি এই-সব মেয়েদের ধর্ম্মভাব, ইহাদের কর্ম্মের আদর্শ, ইহাদের সাহিত্যের অনুশীলন, ইহাদের বন্ধুত্ব, মোটের উপর সকল দিক হইতে ইহাদের বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহাদের একজন লিঙ্কলন্ সহর হইতে দূরবর্ত্তী এক সহর হইতে তাঁহার জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে লিখিতেছেন † —"আমার মনে হয় আমেরিকার মেয়েরা আসলে কেমনতর তা আপনার বুঝতে অসুবিধা হয়। বস্তুতঃ আমার নিজের মনের ভাব যা তা' এই—নারীর পক্ষে মা হওয়ার বাড়া আর কোনো সৌভাগ্য নেই। এ পৃথিবীতে ভালো স্ত্রী ও ভালো মায়ের বড় প্রয়োজন! এই পৃথিবীতে আমার একান্ত কামনা যেন মিসেস * * * র মত আদর্শ মা হতে পারি। যদি মা-হওয়ার দুর্লভ অধিকার হতে বঞ্চিত হই, তবে এমন কোনো শিক্ষাসংক্রান্ত অথবা প্রচারসম্পর্কীয় কাজ নেব যাতে অন্যান্য জননীরা যে-সকল সন্তানের ভার নিতে পারেন না তাদের সামান্য সেবাতেও লাগতে পারি।" কি চমৎকার কথাগুলি! শুধু কথাগুলি যে চমৎকার তাহা নয়, ভাবটি কত সুন্দর! ইহাদের বয়স ২০।২১এর বেশি নয়, অথচ কেমন গাম্ভীর্য্যের পরিচয় উক্তিগুলির মধ্যে! কে বলিবে ইহা আদর্শ হিন্দু নারীর উক্তি নয়? আমাদের দেশের মেয়েরা যেদিন দলে দলে এই ভাবের ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিতে সমর্থ হইবেন সেদিন কি সুখের দিন হইবে!

যাহারা গরিব ও নানাবিধ সংগ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছে তাহাদের জীবন তো সাধারণতঃ সুন্দর বটেই, তা ছাড়া যাহারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল গৃহের মেয়ে তাহারাও জীবনকে বেশ দায়িত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে। ইহাদের কিছু "ফুলের মতন, হাসির মতন, কুসুমগন্ধরাশির মতন, হাওয়ার মতন, নেশার মতন" এম্নি আসিয়া ভাসিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। ইহারা স্বেচ্ছায় গৃহে শ্রম করে, সমাজের সকল কাজে যথাশক্তি আপনার সেবার ফসল আনিয়া দেয়; প্রেমেও সংযমের সাধনা করে; ঈশ্বরে বিশ্বাস ও

* "There are about 50 girls in the State University earning their board and room by doing housework. This is regarded by them as the most healthful, best-paying and on the whole the happiest way of putting oneself through school...... Several of the girls have earned part of their expense money by playing accompaniments or dance music. Others are waitresses in boarding houses or restaurants One girl is a telephone operator; that sounds like murdering one's youth. Another is helping a physician who is collecting statistics. Another is reading to a deaf woman in the sign language." Lincoln Daily News, Dec. 16, 1913.

† "I suppose you wonder what we American girls are at soul. I believe, Mr. Banerji, that God has given to women the greatest gift of all, that of being a mother. Were I to choose my future life I would ask for that one thing and that only. The one thing that I ask of this old world is, that I may be just what Mrs *** is,—a mother perfect as human can be. Should I never be permitted this, then I shall take up some sort of educational and missionary work, trying to fill the niches that other mothers have not."

ভক্তি ইহাদের অনেকের জীবনে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই মধ্যবিত্ত পরিবারের আর-একটি অনূঢ়া কুমারীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা উদ্ধৃত করিলেই বিষয়টা কতকটা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। ইনি লিখিতেছেন:—"আমি প্রয়োজন হইলে যাহাতে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি এ কথা স্মরণ রাখিয়া লেখাপড়া শিখিতেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি নিজের সংসার পাতিয়া যাহাতে জীবনের নিগূঢ়তম প্রদেশ হইতে নিজেকে ফুটাইয়া তুলিয়া আমার পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থা ও ঘটনার একটি নিবিড় ঐক্য স্থাপন করিতে পারি সেই দিকেই আমার বিশেষ লক্ষ্য। আমি সেই-সকল গুণ কামনা করি যাহাতে আমি স্ত্রী ও মাতৃরূপে আমার সকল কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে পারিব, ও গৃহের সকল অনুষ্ঠানে উদ্দীপনা আনিয়া দিতে সমর্থ হইব......যদি স্বামী ও সন্তানলাভ আমার ভাগ্যে না থাকে তবে ভবিষ্যতে যে ভাবেই হউক অল্পবয়স্ক বালকবালিকার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতে আমার একান্ত কামনা।" *

বারান্তরে মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা মার্কিন কুমারীর স্বাধীনতার ঈষৎ আভাস দিব।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৌন্দর্য্যমাপক যন্ত্র

কিছুদিন হইল একখানি ইংরেজী মাসিকপত্রে মানুষের মুখ-সৌন্দর্য্য মাপিবার এক নব-আবিষ্কৃত যন্ত্র সম্বন্ধে একটি বিচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা প্রফেসর উইলিয়াম বার্ণেস ফদারিংহাম।

সৌন্দর্য্য কি রকম হইলে মন মুগ্ধ করে, নাকের ডগাটি কি রকম হইলে সুন্দর দেখায়, চোখের ভঙ্গীটি কি রকম হইলে পুষ্পধন্বার পুষ্পবাণ একেবারে সটান সজোরে গিয়া বক্ষে বিঁধে, এতদিন তাহাই লইয়া নাড়াচাড়া চলিত; বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে সৌন্দর্য্যের যে আবার পরিমাপ হইতে পারে তাহা কাহারও কল্পনাতেও আসে নাই। প্রফেসর ফদারিংহাম বলেন তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে এই অসম্ভব ব্যাপারটা নাকি সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে!

সৌন্দর্য্যমাপক যন্ত্রের উদ্ভাবয়িতা প্রফেসার ফদারিংহাম তাঁহার যন্ত্র দিয়া সৌন্দর্য্য পরীক্ষা করিতেছেন।

প্রফেসর মহাশয় বহুদিন হইতে মানুষের মুখ অতি সযত্নে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এই পরীক্ষার ফলে তিনি যে তথ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

মানুষের মুখের ভিতর দিয়া যে নৈতিক বা মানসিক সৌন্দর্য্যের ছাপটি প্রকাশ পায় সে সম্বন্ধে ফদারিংহাম একটি কথাও বলেন নাই। তিনি মনুষ্য-মুখকে শরীর হইতে একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি মুখোসরূপে ধরিয়া লইয়া তাহাকে নানান শ্রেণীতে ভাগ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন।

গ্রীকছাঁচের মুখাবয়বকে আদর্শ ধরিয়া প্রফেসর ফদারিংহামের সৌন্দর্য্যমাপক যন্ত্র বা "Kallometer"এর সৃষ্টি। এই যন্ত্রে তিনি সম্মুখের দিকে ঠিক সোজাভাবে

* "I desire my education, to incidentally provide me with a way for earning a livelihood until such a time when I shall have a home of my own, and chiefly to give me a philosophy of life which would cause me to fit harmoniously into my environment in which I might be placed. I should like to have those qualities of disposition and temperament and those domestic accomplishments (good housekeeping) which would make me an inspiration in my home as wife and mother...... If it is not my fortune to have husband or children, I shall wish to devote my life to young people in whatever way shall seem best later."

প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের চিত্রে অঙ্কিত মুখের মাপ।

রোমক প্রতিমা   র‍্যাফেলের ছবি   বটিসেলির ছবি   রুবেন্সের ছবি।
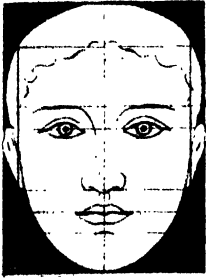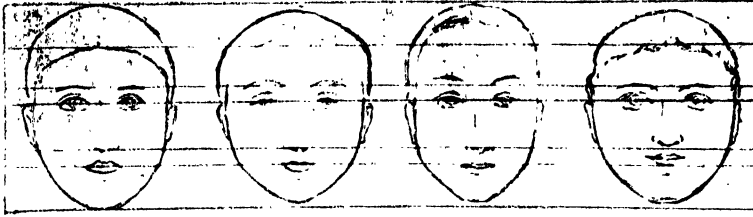
গ্রীক আদর্শের নিখুঁত মুখ।

নিখুঁত মুখ ৯ ইঞ্চি চৌকা, অর্থাৎ ব্রহ্মতালু হইতে চিবুকের নীচে পর্য্যন্ত ৯ ইঞ্চি, এবং নাকের ডগা হইতে মাথার পিছন পর্য্যন্তও ৯ ইঞ্চি।
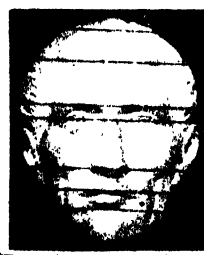
জুলিয়াস সীজারের মুখ সৌন্দর্য্যমান যন্ত্রের মাপে।

তাকানো অবস্থায় চোখের তারার সোজা একটি রেখা টানিয়া লন। ফদারিংহামের আদর্শানুযায়ী সুন্দর মুখ হইতে হইলে এই রেখা হইতে নাসারন্ধ্রের ঠিক তলদেশে আর-একটি রেখা টানিলে এই দুই রেখার ব্যবধান হইবে ১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। শেষোক্ত রেখা হইতে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত যে স্থান তাহার ব্যবধান হইবে $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি এবং ওষ্ঠ হইতে চিবুকের তলদেশ পর্য্যন্ত দুই ইঞ্চি মাত্র হইবে।

প্রফেসর ফদারিংহামের মতে এই তো গেল লম্বালম্বিভাবে সুন্দর মুখের মাপ। তাহার পর চওড়ার দিকেও তিনি মাপজোক লইতে ছাড়েন নাই। তাঁহার আদর্শানুযায়ী সুন্দর মুখে এক কানের নীচ হইতে আর-এক কানের নীচ পর্য্যন্ত ব্যবধান হওয়া উচিত সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। এক চোখ হইতে আর-এক চোখের ব্যবধান ২$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি এবং মাথাটি পুরাপুরি ৭ ইঞ্চি হওয়া আবশ্যক।

"Kallometer" যন্ত্রের যে প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল তাহা হইতে বোঝা যাইবে যে এই যন্ত্র-নির্ম্মাণব্যাপার বিশেষ কিছুই আয়াসসাধ্য নহে। একটি কাঠের বা কার্ডবোর্ডের ফ্রেমের উপর নির্দ্দিষ্ট ব্যবধান রাখিয়া সুতা বা তার লাগাইয়া লইলেই সৌন্দর্য্য-মাপক যন্ত্র তৈয়ারী হইল।

ফদারিংহাম বলেন যে মানুষের মুখ এমন কতকগুলি ভাগে আপনিই বিভক্ত হইয়া আছে যে দেখিবা-মাত্রই অতি সহজে সেই ভাগগুলি ধরিতে পারা যায়। এই-সকল শ্রেণীকেও আবার এমনভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে যে তাহা হইতে হাতে-কলমে প্রমাণ করা যায় যে পৃথিবীতে ঠিকই একই প্রকারের দুইটি মুখাকৃতি থাকিতে পারে না। প্রফেসর মহাশয় সমগ্র মানবমুখকে

সৌন্দর্য্যমান যন্ত্রে প্রসিদ্ধ লোকদের মুখের মাপ।

প্যাকারে   ডিকেন্স   স্কট   কিপলিং

রেডমণ্ড।   এফ ই স্মীথ।

জি, কে, চেষ্টারটন।   সার জন হেয়ার।

চার্চিল।   উইল ক্রুকস্।
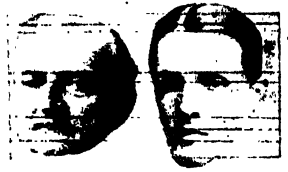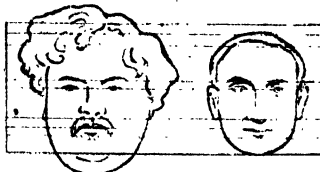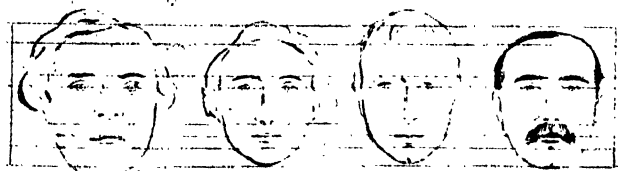
কেবলমাত্র চল্লিশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

গ্রীকছাঁচের মুখকে মনুষ্যের মুখের সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া কেন ধরা হইল এই প্রশ্নের উত্তরে ফদারিংহাম বলেন—মানুষের শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগত পছন্দ থাকিতে পারে। কিন্তু

এই স্বাধীন পছন্দের মূলেও একটি ধ্রুব আদর্শ আছে। যে মুখে মহত্ত্বের ছাপ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আছে এবং যে মুখ সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিবর্ত্তনশীল তাহাই সাধারণতঃ মানুষের নিকট আদর্শ মুখ বলিয়া পরিগণিত হয়। সকল কালের ও সকল দেশের (?) কবি ও শিল্পীগণের মতানুসারে এই ছাঁচ গ্রীকমূর্ত্তিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই গ্রীকছাঁচের মুখকেই তিনি আদর্শ ধরিয়াছেন।

প্রফেসর মহাশয়ের মতে পুরুষের মুখের সহিত স্ত্রীলোকের মুখের একটি অদ্ভুত বৈষম্য বর্ত্তমান। এই বৈষম্য যে শুধু বাস্তবজীবনেই দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে—চিত্রেও তাহা প্রচুর পরিমাণে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। ভাস্করগণ স্ত্রীলোকের মুখাকৃতি সম্বন্ধে সর্ব্বত্র একটি বাঁধা নিয়মের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু চিত্রকরগণকে অধিকাংশস্থলে এ সম্বন্ধে নিজ নিজ মত ও রুচিদ্বারা

মিস ম্যাক্সিন ইলিয়ট ও জর্জ্জ ইলিয়ট সৌন্দর্য্যমানের চক্ষে।

পরিচালিত হইতে দেখা যায়। বিখ্যাত ভাস্করগণের খোদিত মুখাকৃতির সহিত র‍্যাফেল, বটিসেলি, রুবেন্স প্রভৃতি চিত্রকরের অঙ্কিত মুখের ছাঁচের তুলনা করিলেই এ সত্য স্পষ্ট বোঝা যায়। পুরুষের মুখ অপেক্ষা নারীর মুখ-সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে ভাব (expression) ও রংয়ের উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রফেসর ফদারিংহামের মতে সৌন্দর্য্যের প্রকৃত স্বরূপটি মাপিতে গেলে এগুলিকে বাদ দিতে হইবে এবং যথাযথভাবে মুখের প্রত্যেক অংশটির মাপজোক লইতে হইবে।

ফদারিংহাম অনেকগুলি প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মুখ তাঁহার Kallometer যন্ত্রে ফেলিয়া দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের মুখাকৃতি আদর্শ ছাঁচ হইতে কত পৃথক।
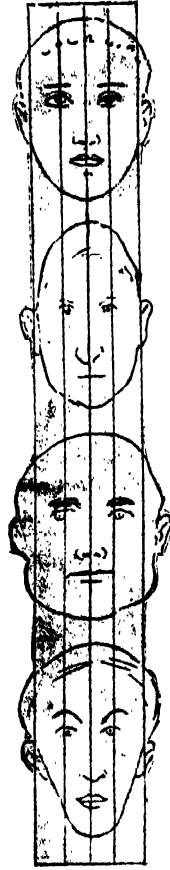
সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি চওড়া মুখ আদর্শ; কম বেশী সমতার বিঘ্নকর।

এই বস্তুতন্ত্রতার দিনে ক্যালোমিটারের থার্ম্মোমিটারে রূপের ডিগ্রী মাপিয়া লইতে পারা যাইবে এই অদ্ভুত আবিষ্কার যদি প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকাদের মনঃপূত হয় তবে তাঁহারা অতি অনায়াসেই ক্যালোমিটার প্রস্তুত করিয়া আপনাদের নিজের ও বন্ধু-বান্ধবদের মুখের উপর প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পারেন যে গ্রীকছাঁচ হইতে তাঁহাদের মুখাকৃতির পার্থক্য কতটা।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

সাহিত্যের ত্রিবিধ কার্য্য

সাহিত্যের শক্তি অপরিসীম, সাহিত্যের কার্য্যও অসংখ্য; আমরা সাহিত্যের প্রধান তিনটি কার্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, রসোদ্ভাবন ও ভাবের সঞ্চার সাহিত্যের প্রধান কার্য্য। সৌন্দর্য্য, রস ও ভাবের প্রতি মানব-হৃদয়ের একটি অতি আশ্চর্য্য আকর্ষণ আছে। জগতে সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিলেই মানুষ উহা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়; মানুষ সুমধুর রসের মধ্যে হৃদয়কে ডুবাইয়া দিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠে এবং সুগভীর ভাবের মধ্যে একেবারে আত্মহারা হইয়া যায়। এই জন্যই সাহিত্য মানুষের অত্যন্ত স্পৃহণীয় সামগ্রী। কারণ সাহিত্য জীবনের সত্য ও জগতের গূঢ় তত্ত্বকে সৌন্দর্য্যে রসে ও ভাবে পূর্ণ করিয়া তোলে; মানুষ সহজেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়; এবং সত্যকে মনোরাজ্যের, ও গূঢ়তত্ত্বকে হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া লয়।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত "সাহিত্য" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

"সাহিত্য দুই রকম করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়। এক, সে সত্যকে মনোহররূপে আমাদিগকে দেখায়, আর সে সত্যকে আমাদের গোচর করিয়া দেয়।"

যাহা হোক, একটুকু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক জাতি যে পরিমাণে জীবনের সত্য ও জগতের গূঢ়তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারেন, সেই পরিমাণে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন। সাধারণতঃ বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্য দিয়াই সত্য এবং তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে সাহিত্যের বিশেষত্ব আছে। বিজ্ঞান শুধুই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, দর্শন ও ইতিহাস কেবলই দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকাশ করে; সাহিত্য ঐ তিন রকমের সত্যই প্রকাশ করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে। সাহিত্যের মধ্য দিয়া ঐ তিন রকমের সত্য সৌন্দর্য্যে সুন্দর, রসে সুমধুর ও ভাবে সুগভীর হইয়া প্রকাশিত হয়। সেইজন্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের চেয়ে প্রবীণ ও প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। তিনি সহজেই মানবহৃদয়ের উপর মায়া বিস্তার করেন এবং হৃদয়ের প্রীতিরসের সঙ্গে তত্ত্ব ও সত্যকে মিশ্রিত করিয়া দেন। তাই জগতের অধিকাংশ লোক বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসের চেয়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়াই অনেক সত্যের সহিত পরিচিত হন। এই জন্য জগতের প্রবীণ ও প্রতিভাসম্পন্ন লেখকগণ কেবল মাত্র সাহিত্যিক নহেন; তাঁহারা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। তাঁহারা অনেকেই হয় ত কলেজে অধ্যাপকের নিকট বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন নাই; কিন্তু প্রাচীনকালের উপনিষদের ঋষিদিগের ধর্ম্মসাধনের মধ্য দিয়াই যেমন দর্শনের সত্যসকল প্রকাশিত হইয়াছিল, তেমনি তাঁহাদিগের সাহিত্যসাধনার মধ্য দিয়াই বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসের সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাই সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলির মধ্যে জীবনের নিগূঢ়তত্ত্ব ও জগতের রহস্যকথাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া এ দেশের প্রতিভাবান্ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিকদিগের জন্য শ্রেষ্ঠ আসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বরচিত "বিবিধ প্রবন্ধে"র এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, * * রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সর্ব্বাপেক্ষা কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্বপক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেই প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা এবং উপকারকর্ত্তা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তি-সম্পন্ন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি পাঠ করিয়া অনেকে হয় ত মনে করিবেন, ইহা সাহিত্য ও কাব্যের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য অত্যুক্তি মাত্র। অত্যুক্তি যে নয়, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। এ দেশে সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের ন্যায় অত্যুৎকৃষ্ট দর্শনশাস্ত্র রহিয়াছে; আবার তাহার পাশেই রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্য রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দুসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের উপর সাংখ্য ও বেদান্তের প্রভাব অধিক, না রামায়ণ মহাভারতের প্রভাবই অধিক? আমরা দেখিতেছি, যেমন নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বিনী সৌন্দর্য্যে ও কলতানে মানুষের মনোরঞ্জন করে, অসংখ্য প্রাণীকে সুমিষ্ট বারি দান করিয়া তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে, তীরভূমিকে স্বর্ণশস্যে পূর্ণ করিয়া মানুষের অন্ন যোগায়, এবং বক্ষে তরণীসকলকে ধারণ করিয়া বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দেয়, তেমনি রামায়ণ ও মহাভারত দুই মহাকাব্য সৌন্দর্য্যে নরনারীর হৃদয় সুধাময় করিয়া তুলিতেছে, ভক্তিরসে মানুষের ধর্ম্মতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতেছে, জীবনের মহৎ আদর্শ প্রকাশ করিয়া অসংখ্য পুরুষ ও রমণীকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। শুধু তাহাই নহে। সাহিত্যজগতের এই দুই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিন্দুজাতির নিকট ধর্ম্মের কত নিগূঢ় তত্ত্ব, দর্শনের কত অকাট্য সত্য এবং ইতিহাসের কত যুগযুগান্তরের কাহিনী প্রকাশ করিতেছে। এই বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের উন্নতি ত কত হইয়াছে, তবুও অদ্যাপি শত শত নরনারী রামায়ণ মহাভারতের রামচরিত্র, সীতাচরিত্র, ভীষ্ম ও সাবিত্রীর চরিত্রকে আদর্শ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছেন।

অত পুরাতনকালের কথাই বা বলিতে যাই কেন? এ যুগে মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বর্গীয়

অক্ষয়কুমার দত্ত, স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অতীত যুগের শ্রেষ্ঠলেখক বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রেষ্ঠকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে সকল উচ্চতর সত্য ও মহৎভাব প্রকাশিত হইয়াছে, বাঙ্গলাদেশ জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাহারই প্রভাবে পরিচালিত হইতেছে। অতএব সাহিত্যের শক্তি যে অত্যন্ত অধিক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সাহিত্য সত্যকে এবং জগতের গূঢ়তত্ত্বকে সৌন্দর্য্যে রসে ও ভাবে মানুষের চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলে বলিয়াই সাহিত্যের এই শক্তি।

কিন্তু সাহিত্য যে শুধু জীবনের সত্য ও জগতের গূঢ়তত্ত্বকেই চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলে, তাহা নয়। সাহিত্যের মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য, জগতের ছবি, মানুষের বাহিরের ঘটনা ও মনের ব্যাপার সমস্তই সুন্দর ও আকর্ষণের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, রসোদ্ভাবন ও ভাবের সঞ্চার সাহিত্যের যে একটি প্রধান কার্য্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

সাহিত্যের দ্বিতীয় কার্য্য আদর্শসৃষ্টি। শক্তিশালী লেখকেরা সাহিত্যের মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের ও দেবত্বের নব নব আদর্শকেই পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। আমরা সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়াই জীবনপথে অগ্রসর হই।

এ জগতে বিধাতার সৃষ্টিলীলা অতীব বিস্ময়কর। তিনি ধরিত্রীকে অনুন্নত অবস্থায় প্রকাশ করিয়া ক্রমাগত উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছেন; নরনারীকে অপূর্ণ অবস্থায় সৃষ্টি করিয়া ক্রমশঃই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিতেছেন। অপূর্ণ অবস্থা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়াই যেন মানবজন্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু অনুন্নত অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায়, অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে যাইতে হইলেই জীবনের আদর্শ চাই। সম্মুখে আদর্শ না থাকিলে মানুষ কেমন করিয়া নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট অবস্থায় উপনীত হইবে? তজ্জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ লেখক ও শ্রেষ্ঠ কবিগণ তাঁহাদের ধ্যানদৃষ্টিতে মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের উচ্চ আদর্শ দর্শন করেন; এবং তাহা সাহিত্য ও কাব্যের মধ্যে অঙ্কিত করেন। সাহিত্য ও কাব্যের মধ্যে মানবজীবনের মহৎ আদর্শের কথা কবিত্বে, উপমায়, অলঙ্কারে অত্যন্ত আকর্ষণের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায় এবং তৎপ্রতি সহজেই নরনারীর হৃদয় আকৃষ্ট হয়;—মানুষ তদনুসারে জীবনগঠন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত যে ক্ষণজন্মা পুরুষ সাহিত্যের মধ্যে জীবনের নব নব আদর্শকে উৎকৃষ্টরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক; তাঁহার গ্রন্থই সামাজিক উন্নতির পরম সহায়। আমরা এ দেশের উচ্চশ্রেণীর লেখকদিগের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হই।

এ স্থানেও রামায়ণ মহাভারতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিন্দুনারী নারীধর্ম্মের স্বর্গীয় আদর্শ কোথায় পাইলেন? আমরা পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহের মহৎ আদর্শ কোথায় পাইলাম? রামায়ণ মহাভারতের মধ্যেই নয় কি?

অতীত যুগের সর্ব্বজনমান্য লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ও চিন্তাশীল কবি রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে কি দেখিতে পাই? দেখি তন্মধ্যে নানা ভাবে মানবজীবনের নানা আদর্শই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস সীতারাম গ্রন্থের জয়ন্তীচরিত্রের উল্লেখ করিতে পারি। এই চরিত্রের মধ্যে নারীজীবনের নব আদর্শ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয়টি স্ফুটতর করিবার জন্য জয়ন্তীচরিত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে গুটিকয়েক কথা বলিব।

জয়ন্তীচরিত্র সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। ভ্রমর, সূর্য্যমুখী ও কমলমণির চিত্র অতি রমণীয় বটে; কিন্তু ঐ-সকল নারীচরিত্রের আদর্শ পুরাতন। বঙ্কিমচন্দ্র নারীজাতির শিক্ষার উন্নতি দর্শন করিয়া জয়ন্তীচরিত্রের মধ্যে নারীজীবনের নূতন আদর্শ অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন।

জয়ন্তী বুদ্ধিমতী ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্না শক্তিশালিনী সংযতমনা ক্ষমাশীলা করুণহৃদয়া মহিমাময়ী নারী। জয়ন্তীর অপার্থিব অতুলনীয় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দর্শন করিলে নরনারীর কেবল ভক্তিবিস্ময়েরই উদ্রেক হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সেই নিরুপমা নারীমূর্ত্তির বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন:—

"প্রাসাদশিখরোপরি উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জয়ন্তীর অতুলনীয় রূপরাশি সেই মঞ্চোপরি উদিত হইল। তখন সহস্র সহস্র দর্শক উর্দ্ধমুখে উৎক্ষিপ্ত লোচনে গৈরিকবসনাবৃতা মঞ্চস্থা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই উন্নত, সম্পূর্ণায়ত, ললিত, মধুর অথচ উজ্জ্বল জ্যোতিবিশিষ্ট দেহ; তাহার দেবোপম ধৈর্য্য—দেবদুর্ল্লভ শান্তি; সকলে বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল জয়ন্তীর নবরবিকরপ্রোদ্ভিন্ন পদ্মবৎ অপূর্ব্ব প্রফুল্ল মুখ; এখনও অধরতলায় মৃদু মৃদু মধুর

স্নিগ্ধ বিনম্র হাস্য—সর্ব্ববিপৎসংহারিণী শক্তির পরিচয়স্বরূপ সেই স্নিগ্ধ মধুর মন্দহাস্য! দেখিয়া অনেকে দেবতাজ্ঞানে যুক্তকরে প্রণাম করিল।"

এই বর্ণনার দ্বারাই আমরা সেই মনস্বিনী নারীকে অনেক পরিমাণে বুঝিয়া লইতে পারি। নারী তরুণবয়স্কা হইয়াও পরম সাধনার দ্বারা ধর্ম্মের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার বাসনানল নির্ব্বাপিত, তাঁহার অন্তর ভক্তিরসে পরিপ্লুত; তাঁহার জীবন ঈশ্বরেতে প্রতিষ্ঠিত; তিনি ঈশ্বরকেই "সকলের স্বামী" জানিয়া তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রেমেই তাঁহার নারী-প্রকৃতি চরিতার্থ হইয়াছে। এখন তাঁহার সুখের জন্যও স্পৃহা নাই, দুঃখেতেও কোন ভয় নাই। তিনি ধর্ম্মের দুর্জ্জয় শক্তিতে শক্তিশালিনী হইয়া নির্ভীকচিত্তে সর্ব্বত্র গমন করেন। সর্ব্বলোকের হিতানুষ্ঠানই তাঁহার জীবনের ব্রত। বিপন্ন লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করাই তাঁহার কার্য্য। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে গিয়া অপমান নির্য্যাতন সকলই তিনি অম্লান বদনে সহ্য করেন। জয়ন্তী সীতারামকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, তাঁহার কল্যাণের জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন; তবুও সেই মোহান্ধ সীতা-রাম তাঁহার প্রতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। সেই অত্যাচারের মধ্যেও তাঁহার অন্তরে গভীর আনন্দ! জয়ন্তী তন্মধ্যে ঈশ্বরেরই মঙ্গলাভিপ্রায় অনুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"জয় জগন্নাথ! তোমার দয়া অনন্ত! তোমার মহিমার পার নাই! তোমাকে যে না জানে, যে না ভাবে, সেই ভাবে বিপদ! বিপদ কাহাকে বলে প্রভু? তাহা বলিতে পারি না। তুমি যাহাতে আমাকে ফেলিয়া-ছিলে তাহা পরম সম্পদ!"

ইহার পর সীতারামের পত্নী নন্দা স্বামীর অমানুষিক অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়া ভয়ে কম্পিত হৃদয়ে জয়ন্তীকে বলিতে লাগিলেন—

"মা, দয়া করিয়া অভয় দাও। * * মা! অপরাধ লইও না।" জয়ন্তী হাসিয়া নন্দাকে কহিলেন—"মা! আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হউক। ক্ষণকালের জন্যও মনে করিও না যে, আমি কোন প্রকার রাগ বা দুঃখ করিয়াছি। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখনও তোমাদের বিপদ পড়ে জানিতে পারি, আমি আসিয়া তোমার যথাসাধ্য উপকার করিব।"

এই হৃদয়মাহাত্ম্যে মহিমাময়ী নারী ধর্ম্মার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন এবং পরার্থে জীবন ধারণ করিতেছেন। ইঁহার পবিত্র জীবনের পুণ্যকাহিনী স্মরণ করিয়া বিস্ময়ের উদ্রেক এবং ভক্তির উদয় হয়। মনে হয়, কবে কবির কল্পনা সত্যে পরিণত হইবে? কবে জয়ন্তীর ন্যায় আদর্শ নারী বাঙ্গলাদেশে আবির্ভূতা হইবেন? কবে শিক্ষিতা ও শক্তি-শালিনী রমণীর অতুলনীয় ধর্ম্মভাবের দ্বারা দেশ উন্নত হইয়া উঠিবে? বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থসমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন চৌধুরী মহাশয় জয়ন্তীচরিত্রের মহৎভাবে স্তম্ভিত হইয়া লিখিয়াছেন—

"ফলতঃ এই জয়ন্তী-চিত্র সর্ব্বত্রই পূর্ণ—সর্ব্বত্রই বিকশিত, সর্ব্বত্রই জ্যোতিপূর্ণ; এই মহান্ চরিত্র ভাবিতেও মনে অসীম বিস্ময় ও আনন্দ উপস্থিত হয়। হায় মা! আবার কবে তোমায় এ দেশে দেখিব মা?"

আমরা জানি, অনেক পাঠক জয়ন্তীচিত্রকে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন বিপুল বঙ্গসমাজের কোথাও ত জয়ন্তীর ন্যায় রমণী দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন দেখিতে পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু ভবিষ্যতেও কি দেখিতে পাওয়া যাইবে না? হিন্দুজাতির উন্নতির জন্য জয়ন্তীর ন্যায় রমণীর অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়াই দেশের হিতৈষী এবং শ্রেষ্ঠ লেখকের উদার কল্পনার সম্মুখে জয়ন্তীর তুল্য নারীচিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই স্থানে আমাদের একজন পূজনীয় পরম ভক্তের কথা মনে হইতেছে। বাঁকিপুরপ্রবাসী ভক্ত প্রকাশচন্দ্র বলিতেন, এ দেশে বর্ত্তমান সময়েও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইতেছে; কিন্তু মহানারী ত আবির্ভূতা হন না। তবে সময় আসিয়াছে; এখন মহানারীর আবির্ভাব হইবে। এই উদারচিত্ত ধার্ম্মিকের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। এ যুগে মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে; তাঁহারা ঈশ্বরচরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া নরনারীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। মহানারীগণ তাঁহাদের ন্যায় এই দেশে আবির্ভূতা হইয়া ঈশ্বরচরণে জীবন সমর্পণ করিবেন এবং নিষ্কাম কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন—এই মহা সত্যই মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাই তিনি তাঁহার সৃজন-শক্তির সাহায্যে ধর্ম্মপরায়ণা ও কর্ম্মশীলা নারী জয়ন্তীকে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

প্রতিভাসম্পন্ন প্রবীণ লেখকদিগের রচনার মধ্য দিয়া মানবজীবনের মহৎ আদর্শ কিরূপে যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আশা করি এতক্ষণে তাহা বুঝাইতে সমর্থ হইলাম।

সাহিত্যের তৃতীয় কার্য্য উদ্দীপনা। কালের প্রভাবে কখনো কখনো এক-একটি সমাজের লোক নিস্তেজ অবসাদ-গ্রস্ত এবং উৎসাহহীন হইয়া পড়ে। তাঁহাদের মহৎ কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি থাকে না; তাঁহাদের গৌরবস্পৃহাও চলিয়া যায়; তাঁহারা মনুষ্যত্ব হারাইয়া সুখস্পৃহার অধীন হইয়া নিরন্তর স্বার্থসাধনেই প্রবৃত্ত হন এবং সুখ ও আরামই খুঁজিয়া বেড়ান। এইরূপ অবস্থায় মানবজাতির হিতৈষী মহামনা সাহিত্যিকগণ গভীর ভাবাত্মক রচনা দ্বারা সমাজের লোক-দিগকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। ঐ-সকল লেখকগণ সাহিত্যের ভিতর দিয়া মানবপ্রাণে আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চার করেন; উহাতে লোকের অবসন্ন ও নিরাশ চিত্ত সবল ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; এবং মানুষ ক্ষুদ্র সুখ ও আরামের স্পৃহা ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। শুধু তাহাই নহে। সাহিত্যিকদিগের উদ্দীপনাপূর্ণ রচনায় মানুষ উত্তেজিত হইয়া অম্লান বদনে ক্ষুদ্র স্বার্থকে তুচ্ছ করে, মহৎ কর্ত্তব্যপালনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হয় এবং সমাজের নরনারীর কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করে।

এক শতাব্দী পূর্ব্বে যখন বাঙ্গলাদেশের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, তৎকালে মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে মহদ্ভাবপূর্ণ রচনা লিখিয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়কে নব ভাবে উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, শক্তিশালী অক্ষয়কুমার দত্ত, খ্যাতনামা পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাপ্রাণ লেখকগণ উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ধর্ম্ম সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে প্রগাঢ় রচনা-সকল লিখিতে লাগিলেন। উহা পাঠ করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিতে লাগিল; বিস্তর শিক্ষিত যুবক দেশের কল্যাণানুষ্ঠানে ব্রতী হইতে লাগিলেন।

ঐ-সকল প্রাচীন ব্যক্তিদিগের সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি দেশের মুখোজ্জ্বলকারী সাহিত্যিকদিগের অভ্যুদয় হইল। তাঁহারা সাহিত্যের ভিতর দিয়া অভিনব ভাবের স্রোত প্রবাহিত করিলেন। বাঙ্গালীর প্রাণ নবতেজে নবোৎসাহে মাতিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে দেশের লোক শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্ম—ইহার প্রত্যেকটি বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এখন শিক্ষিত প্রাচীন লোকদিগের মুখে সেই সময়ের কত গল্পই শুনিতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে যখন "সাম্য" প্রকাশিত হইত, তৎকালে কত লোক উহা পাঠ করিয়া সামাজিক দুর্গতি দূর করিবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করিতেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন নারীদিগের দুঃখ মোচনের জন্য সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময় কবি হেমচন্দ্র জ্বালাময়ী ভাষায় উদ্দীপনা-পূর্ণ কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। তিনি লিখিলেন—

"এখনো ফিরিয়া দেখনা চাহিয়া
জগতের গতি—ভ্রমেতে ডুবিয়া
চরণে দলিয়া মাতা সুতা জায়া
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে?
বাঁধিয়া রেখেছ বামা রাশি রাশি
অনাথা করিয়া গলে দিয়া ফাঁসি,
কাড়িয়া লয়েছ কবরী কঙ্কণ
হার বাজু বালা দেহের ভূষণ
অনন্ত দুঃখিনী বিধবা নারী।
দেখ রে নিষ্ঠুর, হাতে লয়ে মালা
কুলীন কুমারী অনূঢ়া অবলা,
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে
অসংখ্য রমণী পাগলিনী-বেশে,
কেহ বা করিছে বরমাল্য দান
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মাণ
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি?"

এই কবিতাটি পড়িয়া বহুলোক রমণীদিগের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই শ্লোকগুলি পড়িতে পড়িতে এখনও অশ্রুতে নয়ন সিক্ত হইয়া যায়। কে বলিবে এই কবিতা পড়িতে পড়িতে কত কুলীন ব্রাহ্মণের হৃদয় আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কুলীন কুমারীদিগের দুঃখমোচন করিবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন?

বর্ত্তমান সময়ে কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা ও সঙ্গীতের দ্বারা মানুষের মনকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়, দ্বিজেন্দ্রলাল কালের আহ্বানে অকালে সংসার হইতে প্রস্থান করিলেন। রবীন্দ্রনাথ এখনও তাঁহার প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ রচনার দ্বারা আমাদিগকে মহত্ত্ব ও দেবত্বের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি তাঁহার "এবার ফিরাও মোরে" শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন :—

"তবে উঠে এস—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে,—তবে তাই কর আজি দান!
বড় দুঃখ বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার!—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।
*　　*　　এ দৈন্য-মাঝারে কবি
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি!"
*　　*　　*
"কি গাহিবে, কি শুনাবে?—বল মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুখ! স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগত হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে!
*　　*　　*
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি
প্রতি দিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্ব্বজনে! তার পর দীর্ঘপথ শেষে
জীবযাত্রা অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহারা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে!　*　　*
*　　*　　*
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্ত ক্ষমা? হয় ত ঘুচিবে দুঃখ-নিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্বপ্রেমতৃষা।"

এইরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ অপূর্ব্ব কবিতা যতবার পাঠ করা যায়, ততবারই প্রগাঢ় ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়, অন্তরে মহৎ সংকল্প জাগ্রত হইয়া উঠে। এ দেশের শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকদিগের কাব্য এবং প্রবন্ধের মধ্যে কত উদ্দীপনাপূর্ণ উৎকৃষ্ট রচনা রহিয়াছে; আমরা জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে সেই-সকল রচনার মহদ্ভাবে অবিভূত হইয়া মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

ভাবিয়া দেখিলে, সাহিত্যের উন্নতির দ্বারাই দেশের যথার্থ উন্নতি হয়। বাঙ্গলা সাহিত্য মনোরাজ্যের সত্য ও জড়জগতের তত্ত্বকে সৌন্দর্য্যে ভাবে ও রসে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে পারিলে, আমরা সহজেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইব; বাঙ্গলা সাহিত্য মানবজীবনের নব নব আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিলে মানুষ জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে সেই আদর্শই গ্রহণ করিবে; এবং বাঙ্গালী লেখকগণ সমাজের মধ্যে মহদ্ভাব ও ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিবার জন্য উদ্দীপনাপূর্ণ রচনা প্রকাশ করিলে পাঠকদিগের হৃদয় মহত্ত্বে ও মনুষ্যত্বে উন্নত হইয়া উঠিবে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

সেখ আন্দু

(২৭)

কিছুদিন হইতে আন্দুর চিত্তরাজ্যের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলতার ঘূর্ণী বাত্যা বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল, আন্দু তাহার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার কোন উদ্যোগই না করিয়া আপনাকে ঘূর্ণীর মধ্যবর্ত্তী করিয়া কৌতুক দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তারপর যখন স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ভয়ঙ্কর ভাব-সমুদ্র উচ্ছ্বাসে সমস্ত চিত্তরাজ্যটা সম্পূর্ণ বিপ্লাবিত করিয়া তুলিল—তখন আন্দু সহসা বিপর্য্যস্ত হইয়া অত্যন্ত আকুলতায় আশ্রয়ের অবলম্বন হারাইয়া উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে আপনাকে আশ্বাস দিল, যে, সে ভাসিতে ভাসিতে যদি তলাইয়া যায়, তাহাতে কাহারই বা ক্ষতি! উদ্দাম উদ্দীপনার ঝোঁকে পূর্ব্বাভ্যস্ত নিশ্চিন্ত শান্ত জীবনটার উপর একটু বিশেষ ভাবে আড়ি করিয়াই সে খুব উৎসাহের সহিত প্লাবনের স্রোতে ভাসিয়া চলিল; নিজের পৌরুষ-বলের উপর তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, সে জানিত, যখন খুসী সে আপনাকে টানিয়া ফিরাইতে পারিবে।

কিন্তু যখন উচ্ছ্বসিত সমুদ্রবারি সরিয়া যাইতে আরম্ভ হইল, এবং তাহার টানে সে আপনাকেও যখন নিম্নগামী হইবার উপক্রম দেখিল, তখন সহসা অত্যন্ত শঙ্কাকুল হইয়া সে প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তখন পদতলের কর্দ্দমাক্ত মৃত্তিকা শিথিল, অত্যন্ত পিচ্ছিল! আন্দু শিহরিয়া উঠিল, সে এতখানি আসিয়া পড়িয়াছে?

কয়েক দিন ধরিয়া নিস্তব্ধ অলসতার মাঝে ক্ষুদ্র রোয়াকটিতে সবেগে পায়চারি করিয়া, ক্রমাগত অসংলগ্ন জটিল চিন্তা-তরঙ্গে মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া, আন্দু দেখিল

সে এমনি অকর্ম্মণ্য, এমনি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, যে, কোন কাজের উপর জোর দেওয়া চুলায় যাউক, নিজের অন্তরটার প্রতি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেও তাহার ভরসা হইতেছে না। কিছুদিন হইতে যে দুর্ব্বলতা সে মর্ম্মের মাঝে অনুভব করিতেছিল, আজ সহসা সেই দুর্ব্বলতাকে প্রবল বিপদে রূপান্তরিত হইতে ও তাহার মধ্যে নিজেকে নিঃসহায় বেপথুমান দেখিয়া, আতঙ্কে আন্দু যেন অসাড় অবশ হইয়া গেল! অনেক দিন আগে, আন্দুর মনে পড়িল, একবার এক বালককে কোরানের ছিন্ন পত্র পোড়াইতে দেখিয়া আন্দু তিরস্কার করিয়াছিল; তাহাতে সেই দুরন্ত বালক হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল "ও ত শুধু কাগজ!"—আন্দুর মনে হইল সেও ঠিক সেই বালকের মত মূঢ়তা করিয়া বসিয়াছে,—দুর্দ্দান্ত চিত্ত লইয়া ক্ষুদ্র খেয়ালের খেলায় কৌতুক করিতে গিয়া সেও পবিত্র বিবেকবল ভ্রমের আগুনে পুড়াইয়া আপনি বনিয়া গিয়াছে শুধু ছাই!

আন্দু আদ্যোপান্ত সমস্ত জীবনটা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে নূতন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল,—দেখিল, যাহাতে এত দিন সে ক্রমাগতই সার্থকতা ও সন্তোষ দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা নিরর্থক, নিতান্তই ব্যর্থ! তাহার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া শুধু অসম্পূর্ণতা ও অসীম অনর্থের শূন্যগর্ভ উপঢৌকন সঞ্চিত রহিয়াছে! ইহা লইয়া, আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়া সে মানুষ বলিয়া এতদিন দিব্য শান্তিতে সুখে দিন কাটাইয়াছে!—তাহার চারিদিকেই অতৃপ্তি, চারিদিকেই নিরাশা, চারিদিকেই নিরর্থকতা, চারিদিকেই অচরিতার্থতা! ইহার মধ্যে সে একান্ত অবলম্বনহীন নিরাশ্রয়!

চারিদিকে ধূলিলাঞ্ছিত পুস্তকরাশি, অযত্নে পরিত্যক্ত চিত্রযন্ত্রাদি ছড়াইয়া, আন্দু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। এমন সময় হাস্যবদন মহম্মদ আসিয়া দ্বার ঠেলিয়া কক্ষে ঢুকিল। আন্দুকে তেমন অবস্থায় নিঝুম হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—"একি মিঞা, অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?"

সবেগে চমকিয়া, মনের উচ্ছলিত চিন্তাস্রোত ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া, আপনাকে উগ্র ঝাঁকুনিতে শক্ত করিয়া আন্দু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল "কই না। খবর ভাল তো? তোমায় যে কদিন দেখিনি,—পাড়ার সবাই ভাল আছে?—দাদাজীর খবর কি জান, কদিন যেতে পারিনি।"

আন্দুর কালিমালিপ্ত বিশুষ্ক মুখচোখ দেখিয়া মহম্মদ পুনরায় বলিল "তোমার এর মধ্যে অসুখ করেছিল নাকি?—বড় যে শুকিয়ে গেছ!"

সে কথা উল্টাইয়া আন্দু অন্য কথা পাড়িল। মহম্মদ বলিল তাহার পুত্রের জাত-কর্ম্ম উপলক্ষ্যে আজ তাহার বাড়ীতে আন্দুর নিমন্ত্রণ।

যে উদ্যমশীল বন্ধুর মুখপানে চাহিলে সুখের উচ্ছ্বাসে আন্দুর প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিত, আজ তাহার সহিত কথা কহিতে, তাহার বাড়ীতে শুভোৎসবের নিমন্ত্রণ আন্দুর যেন উৎকট বিস্বাদ বোধ হইল। চারিদিকের মাটী তাহার ধসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, পৃথিবীর নীরস কর্ম্ম-কোলাহল তাহার কানে যেন হতাশার আর্ত্তনাদের মত শুনাইতেছে, তাহার যে এ মহাব্যর্থতার মাঝে কিছুই ভাল লাগিতেছে না, কিছুতেই স্বস্তি মিলিতেছে না,—সে করিবে কি? প্রাণপণে আত্মদমন করিয়া আন্দু মহম্মদের কথায় একটিমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া তখনই তাহার সহিত চলিল।—এমনি অবান্তর কথাবার্ত্তা লইয়া, এমনি অসংলগ্নভাবে অনর্গল বকিতে লাগিল যে তাহার মনে যে লেশমাত্র নিগূঢ় চিন্তার গোপন আয়োজন আছে, তাহা মহম্মদ ধারণাই করিতে পারিল না।

আন্দু আপনাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া বহির্জ্জগতের কাজে ঠেলিয়া আনিল বটে, কিন্তু আপনাকে আর তাহার সহিত কিছুতেই নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত করিতে পারিল না। এমনি একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান মাঝখানে দৃঢ়ভাবে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, যে, যতই মাথা ঠোকাঠুকি করুক, মাথার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠা ছাড়া কোনই ফল হইল না। আন্দু দেখিল বহির্জ্জগৎ তাহার নিকট হইতে একেবারে অপরিচিত—একেবারে বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোন কালে যে তাহার সহিত প্রাণের যোগ ছিল, সে কথা আন্দু একেবারে স্মরণ করিতে পারিল না; সে যেন চিরদিনই এমনি স্বতন্ত্রভাবে দিন কাটাইতেছে, কোন দিনই কাহারো সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল না।

কষ্ট-সৃজিত উৎসাহ-আনন্দের আবরণে চিত্তের তীব্র-

তিক্ততা ঢাকিয়া উৎসবের বাড়ীতে সারা দিনমান কোনরূপে কাটাইল; কোনকালে তামাক না খাইলেও সন্ধ্যার পর যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্তির দোহাই দিয়া হুঁকা লইয়া সে নিতান্ত নির্জ্জীবভাবে বসিয়া পড়িল, তখন মহম্মদ-সুদ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল "তোমার হল কি? আজকের দিনে অমন মিইয়ে থাক্‌লে তো চল্‌বে না, চল আসরে গান বাজ্‌না বসেছে, তুমি না হলে তো জাঁকাবে না।" আন্দু নিজের কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে সভয়ে বিস্তর ক্রটী উল্লেখ করিয়া পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু নির্দ্দয় মহম্মদ কোনো আপত্তি শুনিল না, তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল; পরিচিত শিষ্য-বন্ধুজন গান গাহিবার জন্য প্রবল পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। অন্তরে অন্তরে আহত ক্ষুব্ধ হইয়া আন্দু মুখে শুধু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "উঁচুতে পাল খাটাতে গিয়ে বুকে বড় ধাক্কা লেগেছে, গাইতে গেলেই লাগবে, তোমরা গাও!"

বুকের কোন্ শিরাটা যে আহত হইয়াছিল, তাহা আন্দু নিজেই জানিত না। অবশ্য সেটা চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত নহে, ইহা নিশ্চয়। যে সূক্ষ্ম কোমল অননুভূত তীব্র নেশা, বেদনার মত তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল, বাতাসের সঙ্গে যাহার মাদকতা স্তরে স্তরে জমিয়া পলকে পলকে তাহার নিঃশ্বাস মত্ত-বিষাদে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল, যে অভিনব অনাস্বাদিত উদ্দাম আবেগে তাহার আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়াছিল,—তাহাতে যে ধৈর্য্য ধরিয়া অন্যের চিত্তরঞ্জন তাহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব, এ কথা শতবার স্বীকার্য্য।

গান বাজনা চলিতে লাগিল, মহম্মদের এক কুটুম্ব যুবক কণ্ঠস্বরের খ্যাতি লাভ করিয়া উৎসাহ-উদ্বেলিত কণ্ঠে গান ধরিল—

"তুম্‌সে হাম্‌সে পেয়ার ভয়া হায়, দুনিয়াসে কোন্ কাম্?
শাওন রয়্‌না বাঢ়ে আঁধেরী, বরখে অবিরাম!"

আন্দুর হৃদ্‌পিণ্ড ধক্ করিয়া লাফাইয়া, তাহার পর সহসা স্তব্ধ তন্ময় হইয়া গেল! এমন মৃত্যু-বিহ্বল বিকলতা সে জীবনে কখনো অনুভব করে নাই! গানের তালে তালে সে যেন ক্রমশঃ নির্জ্জীব, মুমূর্ষ হইয়া আসিল! একি গান এ যে তাহার আপন চিত্তের দৃশ্য! একটা গভীর আবেগভরা ভাব তাহার সারা চিত্ত মথিত করিয়া সবেগে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। আন্দু অন্ধকারে মুখ ফিরাইয়া ছিল, কেহ দেখিল না, অকস্মাৎ সে সভা ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

কোলাহলময় জগৎ তাহার কাছে একেবারে ডুবিয়া গেল, তাহার দৃষ্টিতে রহিল শুধু দুটি শান্ত স্মিত চক্ষু।

দুঃস্বপ্ন-আবিষ্ট ও আতঙ্কে আড়ষ্ট উদ্‌ভ্রান্ত আন্দু এমনি একটা বিপ্লবময় গভীরতার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল যে সারা বিশ্বের মধ্যে কোথাও সে অবলম্বনের আশ্রয় পাইল না। চারিদিক হইতে কঠিন বিভীষিকা যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিল। উন্মাদের মত নির্জ্জন পথে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে শেষ রাত্রে বাসায় আসিয়া শয়ন করিল।

মাথা একটু ঠাণ্ডা হইলে ভাবিল—সে করিতেছে কি?

(২৮)

অতি প্রত্যূষে দাদাজীর আহ্বানে দ্বার খুলিয়া আন্দু এমনি ভাবে তাঁহার পানে চাহিল, যেন সে এখনিই কাহাকে খুন করিয়া আসিয়াছে; উষ্ণ মস্তিষ্কের অদ্ভুত-কল্পনা-উদ্ভূত আশঙ্কার বেগে কম্পিত বক্ষে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। দাদাজী বলিলেন, "বড় বিপদ আন্দু, তোমায় তাই বল্‌তে এলুম।...রমানাথ বাবুর অবস্থা বড় খারাপ...আর বাঁচ্‌বেন না।"

আন্দুর শ্রবণশক্তি যেন লোপ পাইয়া গিয়াছিল, সে জড়বৎ বসিয়াই রহিল। দাদাজী বলিতে লাগিলেন "হটাৎ ঠাণ্ডা লেগে জ্বর খুব বেড়ে গেছে, দুদিকে নিউমোনিয়া হয়েছে। কল্‌কাতায় টেলিগ্রাম করা হয়েছে, এখনি দুজন ডাক্তার আস্‌বেন, আমি তাদের আন্‌তে ষ্টেশন যাচ্ছি; তুমি আর ঘুমিও না, তোমারও যেতে হবে,—"

স্বপ্নাবিষ্ট আন্দু সবেগে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ত্রস্ত স্বরে বলিল "আমি যে আজই মক্কা যাব দাদাজী।"

দাদাজী বিচলিত হইয়া বলিলেন "কেন?—কে সঙ্গে যাবে?"

আন্দু ভীতচকিত নয়নে চাহিয়া বলিল "কেউ না, একলা!"

দাদাজী বলিলেন "একলা! ওঃ—সে তীর্থ অনেক দূর!

এখন যেটা আট্‌কেছে সেইটে করবে চল, তীর্থের সময় এর পর ঢের পাবে!—"

আন্দু নিঝুম হইয়া গেল, তাহার কানে শুধু বাজিতে লাগিল, তীর্থ অনেক দূর! তীর্থের সময় সে ইহার পর পাইবে,—এখন শুধু কাজ! তীর্থের অধিকার তাহার নাই, তীর্থ হইতে সে যে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছে, যে আবর্জনার বোঝা চিত্তের উপর চাপাইয়া সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কি শুধু রক্তমাংসের দেহটাকে খাটাইয়া কতকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলেই সুগ্ধ মুক্ত হইতে পারিবে? না না—কালীর দাগ তুলিতে হইবে ঘসিয়া! দাদাজী সত্যই বলিয়াছেন, তীর্থ অনেক দূর! লক্ষ্যহারা সঙ্গীহীন আন্দু একাকী সেখানে কিসের জন্য বৃথা যাইবে?

দাদাজী বলিতে লাগিলেন, যে, রমানাথ বাবুর জনবিরল বাড়ীতে শক্তিসামর্থ্যযুক্ত সেবার লোক নাই, তাই তিনি আন্দুকে ডাকিতে আসিয়াছেন; কারণ ইতিপূর্ব্বে যখন দরিদ্র বিধবার দৌহিত্র নূরুদ্দিনের মাথায় ইট লাগিয়া বালকটি মৃতপ্রায় হইয়াছিল, তখন আন্দু কিরূপ দক্ষতার সহিত সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিল, তাহা তো তিনি ভাল রকমই দেখিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি আন্দুকে একাজের উপযুক্ত মনে করেন...।

আন্দু উপযুক্ত!—হায় সরলপ্রাণ বৃদ্ধ, আজ আন্দুর কি হইয়া গিয়াছে তাহা তো কেহই জান না!—আন্দু যে-শুচিতার বলে দক্ষতার সহিত নির্ব্বিকার চিত্তে জগতের সকল কাজে প্রাণ ঢালিয়া ধন্য হইত, আজ যে সে-শুচিতা সে-নিষ্ঠা তাহার নাই! আজ যে সে অনুপযুক্ত, একান্ত অপারগ! কেন অনুপযুক্ত, তাহাও যে সে বলিতে পারে না। রোগীর কক্ষ—সে তো তাহার চক্ষে পূর্ব্বে ছিল, দেবতার মন্দির!—এখন, এখন যে তাহার চক্ষে সেই পুণ্যদীপ্তি নাই, তবে সে কোন্ সাহসে সেই স্বর্গ শুচিতার সান্নিধ্যে অগ্রসর হইতে ভরসা করিবে।

দাদাজী বলিলেন "কাল তোমায় খুঁজ্‌তে এসে দুবার ফিরে গেছি, কোথায় ছিলে?"

আন্দু বলিল "মহম্মদের বাড়ী।"

দাদাজী বলিলেন "আমিও তাই মনে করেছি যে তুমি ত কোথাও চুপ করে বসে থাক্‌বার লোক নও,—তা, সে যাই হোক্, এখন চল শীগ্রী।"

আন্দু বিমূঢ়ের ন্যায় চাহিয়া বিকল কণ্ঠে বলিল "আমি গিয়ে কি করব?"—

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া দাদাজী বলিলনে "কি করবে?" সত্যই এমন নির্ব্বোধ প্রশ্ন আন্দুর মুখে কেহ কখনো শুনে নাই; রোগীর বাড়ীতে গিয়া কি করিতে হইবে, তাহা আজ আন্দুকে দাদাজী বুঝাইয়া দিবেন? এমন অবস্থায় কি করা উচিত—তাহা কি পুরাণ তন্ত্র খুলিয়া দাদাজী ব্যবস্থা দিবেন? এমন নিদারুণ সঙ্কটের মুখেও সে নিশ্চিন্ত হইয়া প্রশ্ন করিতেছে! সে কি বিপদের বুকে মাতালের মত ক্ষুদ্র খেয়াল লইয়া পড়িয়া থাকিবে? তাহার হাতে শক্তি আছে, তাই সাংসারিক কাজে তাহার ডাক পড়িয়াছে,—সে কি হাত পা গুটাইয়া এখনো অলসভাবে ঘুমাইতে চায়!—

আন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল। না, সে যেমন পুরুষমানুষ হইয়া জন্মিয়াছে, তেমনি পুরুষত্বের সদ্ব্যবহার করিয়া পৌরুষের গৌরব রাখিবে। ভয় কি! কর্ত্তব্য সকলের আগে, কর্ত্তব্যকে ফাঁকি দিয়া কে কবে শ্রেয় লাভ করিয়াছে? সংসারে সকলেই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, সেও এই ব্যর্থ বেদনার মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্বটি বলিদান দিয়া, সংসারে সকলের জন্য পূর্ব্বের মত আন্দু হইয়া কাজ করিবে। মক্কা অনেক দূর,—কিন্তু এই রোগ-শয্যা, এ তো নিকটস্থ, আগে ইহারই স্পর্শে সে চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া লউক, তাহার পর তীর্থ!

আন্দু বলিল "চলুন!"

(২৯)

কলিকাতার সাহেব ডাক্তারদের লইয়া যথাসময়ে দাদাজী রমানাথবাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারেরা রোগীকে যথাবিহিত পরীক্ষা করিয়া, পূর্ব্ব হইতে স্থানীয় যে ডাক্তারটি দেখিতেছিলেন তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার যথানির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত বলিয়া কহিয়া পারিশ্রমিক লইয়া বিদায় হইলেন।

চিত্তের সমস্ত শক্তি সবলে সংহত করিয়া রোগীর পায়ের কাছে আন্দু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বেলা হইল। দাদাজী স্নানাহার করিতে বাসায় গেলেন, তিনি ফিরিয়া আসিলে আন্দু যাইবে। রতু রোগীর মাথার কাছে উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল।

সেঁকের সময় হইল; জলন্ত আগুনের কড়া গামছায় ধরিয়া মাথায় কাপড় দিয়া জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকিল। আন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল, মৃদুস্বরে রতুকে বলিল, "কুটকে ডেকে দিন্, আমি সেঁক দেব।"

জ্যোৎস্না নতমুখে বলিল "সে যে ডাক্তারখানা গেছে। রতুর হাতের ফোস্কাটা কেমন আছে?"

রতু হাত তুলিয়া দেখাইল, মধ্যমাঙ্গুলীর উপর মস্ত ফোস্কা। আন্দু নতশিরে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা কহিতে তাহার সাহস হইল না। যে প্রাণীটির অগোচরে যাঁহার অস্তিত্বের ছায়া লইয়া, সংসারের অজ্ঞাতে, সমাজের অদৃষ্টে, মনোরম স্বপ্নকুহক-পুরে, সকলের প্রান্তে, সকলের উর্দ্ধে, অন্তরের গোপনকক্ষে, যে বিচিত্র সৌন্দর্য্য-পূজায় সে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কলুষ স্পর্শ না করুক, তবু ত সে অপরাধ! সে চিন্তা যতই বিশেষত্বসূচক তন্ময় হউক, তবু ত সে ভ্রম! তাহার শক্তি কোথা! দোষীর সাহস নাই! আন্দু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গিয়া বারান্দায় পদচারণা করিতে লাগিল। তাহার সমগ্র স্নায়ু-কেন্দ্রের একাগ্র গ্রন্থি আকুল বেদনায় হাহাকার করিয়া শতছিন্ন হইয়া গেল! ধিক্ সে এমনি দুর্ব্বল ভীরু! এই আন্দুই না আজীবন পরের উপকারে বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যসাধনের একগুঁয়েমির ঝোঁকে নিজের জীবন-মরণের শঙ্কা রাখিত না!—সেই আন্দুর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এখন বাতাসের ফুৎকারে ক্ষণে ক্ষণে শূন্যে মিলাইতেছে! সে না পুরুষমানুষ! সে না পৌরুষে প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়!—এই কুণ্ঠিত ত্রস্ত মন লইয়া সে পৌরুষের গর্ব্ব করে? ধিক্!

আন্দু তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আগুনের কড়াখানা ধরিয়া সবেগে ঝাঁকানি দিয়া উপরের ছাইগুলা উড়াইয়া নতমুখে বলিল "সরুন, আমি একাই সেঁক দেব।"

জ্যোৎস্না ক্ষীণভাবে বলিল "একলা তো সুবিধে হবে না, আমি সুদ্ধু ধরি।"

আন্দুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। আগুনের গনগনে আঁচের মত তাহার মুখখানা উজ্জ্বল লাল হইয়া উঠিল। জ্যোৎস্না জলের হাঁড়ি চাপাইল। আন্দুর ইচ্ছা হইল সে প্রাণপণ চীৎকারে উত্তর দেয়, আমি পারিব না, আমি পারিব না,—কিন্তু তাহার রুদ্ধকণ্ঠে একটি শব্দও উচ্চারিত হইল না।

রোগযন্ত্রণাচ্ছন্ন রমানাথবাবু চক্ষু চাহিয়া বলিলেন "ওকি!"

আন্দু চমকিয়া উঠিল। রতু বলিল "কি বল্‌ছেন দাদাবাবু?"

রমানাথবাবু পাশ ফিরিয়া বলিলেন "ও কে মণি? রতু, ওখানে কে?"

আন্দু কাছে আসিয়া বলিল "আজ্ঞে আমি।"

তিনি শান্তভাবে, পুনশ্চ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেন।

সেঁক আরম্ভ হইল। দুই জনে ভিজা ফ্লানেল গামছায় দিয়া নিংড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, জ্যোৎস্না রোগীর বুকে সেঁক দিতে লাগিল। আনত দৃষ্টি আন্দু জলন্ত কড়াইয়ের পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—কি বিড়ম্বনা পরমেশ্বর! যে দুর্ভেদ্য ব্যবধান কখনো ঘুচিবার নহে, তাহা এক মুহূর্ত্তে কাগজের আবরণের মত অতর্কিতে খসাইয়া একই কাজে দুইজনের হাতে হাতে মিলাইলে!—এ কি বিভীষিকা?—না বিপন্মুক্তির বিমল আনন্দের পূর্ব্বাভাস।

আন্দু সময়োচিত ঘটনা-সংঘাতে অন্তরের আকৃতিটা খুব শান্তভাবে তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। সে কি সত্যই একটা ভ্রমের মধ্যে আপনাকে এমন ক্লান্ত করিয়াছে? ইহা কি সত্যই একটা ক্ষণিকের মোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে? আন্দুর মস্তিষ্কে চিন্তাবেগ খরস্রোতে বহিতে আরম্ভ হইল, এতখানি মর্ম্মান্তিক আলোড়ন, এ কি সত্যই কিছু নয়?

(৩০)

আন্দু জ্যোৎস্নাকে দূরত্বের মোহ-মরীচিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে যতক্ষণ দেখিয়াছিল, ততক্ষণ সে প্রচণ্ড উত্তেজনায় বল্গাছিন্ন অশ্বের ন্যায় ইচ্ছা-মত মনোবৃত্তিগুলাকে দিগ্বিদিকে ছুটাইয়াছিল, কিন্তু অবস্থা-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এখন সে ক্রমশঃ সচেতন হইয়া যখন ভাল করিয়া চাহিল, তখন জ্যোৎস্নাকে একেবারে অত্যন্ত আত্মীয় ভাবে নিতান্ত কাছাকাছি দেখিয়া তাহার বিপদাচ্ছন্ন ধৈর্য্য-সম্ভ্রম-মণ্ডিত পুণ্য গম্ভীর শ্রীতে অভিষিক্ত মনোহর মূর্ত্তি দ্বিতীয় বার দেখিয়া ক্রমে ক্রমে গভীর বেদনায় তাহার বক্ষ ভরিয়া উঠিল; নিজের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশ

হইল না, সে অত্যন্ত গভীর সংযমে মর্ম্মের মধ্যে স্বর্গীয় শ্রদ্ধার চরণে নিঃশব্দে আপনাকে পরিপূর্ণরূপে নত করিল।

হৃদয়-বীণায় সৌন্দর্য্যের অর্চ্চনা-সঙ্গীত গাহিতে গিয়া বাসন্তী সুরের তরুণ উন্মাদনায় অকস্মাৎ উদ্দাম আবেগে যে স্বর্ণাভ উজ্জ্বল কুসুম-কোমল স্বপ্ন রচনা করিয়া অন্তরের গোপন-গৃহে যে রমণীর আদর্শ সম্ভ্রমের আসনে স্থাপন করিয়া মুগ্ধ অবশ হইয়া গিয়াছিল, আন্দু সজোরে তাহার সম্মুখে আপনাকে খাড়া করিয়া তুলিল।—নিজের মূঢ়-অজ্ঞতায় সমস্ত হৃদয়টা তপ্ত-নিঃশ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তবু সে সেই আবেগ-রচিত বেদনার স্বর্গসৃষ্টি দানবের নির্ম্মমতায় সমূলে ধ্বংস করিয়া সংহারলীলার শেষে আপনাকে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব করিয়া সার্থক হইতে পারিল না; সে দুই হাতে আপনার বক্ষ চাপিয়া ধরিল;—সেই ক্রূর বীভৎস মারণ-যজ্ঞ তাহার দ্বারা হইবে না, এ ভ্রম ভ্রমই হোক—সে এই ভ্রমকে সম্ভ্রমের সহিত নতশিরে চিরদিন পূজা করিবে! এ ভ্রম সে কখনো ভুলিতে পারিবে না,—এ তো ভুলিবার জন্য নহে, এই ভ্রমকে সে চির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার মধ্যে সার্থকতা লাভ করিবে।—এ ভ্রম অন্যের কাছে বিসর্জ্জনের আবর্জ্জনা হইতে পারে, কিন্তু তাহার কাছে এ ভ্রম মনুষ্যত্বের পৌরুষ-নিষ্ঠার বিস্ময়-প্রতিমা! এই ভ্রম সে জীবনের সম্বল, মরণের মঙ্গল বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইয়াছে,—রাখিবেও। জগতের উপহাসে এই ভ্রম তীব্র অবজ্ঞায় পায়ে দলিয়া সে জগতের কাছে গৌরব অর্জ্জন করিতে চাহে না, সে আপনার অন্তরের কাছে বিশ্বস্ত থাকিবে,—জগতের কাছে শ্রদ্ধা অর্জ্জনের জন্য সে পিশাচের নিষ্ঠুরতায় আপনার আভ্যন্তরকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আকাশে উড়াইতে পারিবে না!

দাদাজী আসিয়া আন্দুকে আহারাদি করিতে পাঠাইয়া দিলেন। আন্দু যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতায় স্নানাহার শেষ করিয়া দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিল। বাহিরের বারান্দায় কাহাকেও না দেখিয়া সে জুতা খুলিয়া নিঃশব্দে একেবারে রোগীর ঘরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিতে উদ্যত হইয়া সহসা সে নিরস্ত হইল, শুনিল জ্যোৎস্নাদেবী বলিতেছেন, "আমিও তাই মনে করেছি দাদাজী। দু তিন বছরের কথা, স্পষ্ট মনে নাই, কিন্তু লোকটির চেহারা যে ঠিক তারই মত, তা আমার দেখেই মনে হয়েছিল। এই আন্দুই সেই ভাগলপুরের ড্রাইভার! ওঃ!—"

সত্রাসে আন্দুর সমস্ত চিত্ত আড়ষ্ট হইয়া গেল। ইহারা তাহারই কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন! যে অতিষ্ঠ কল্পনা ক্ষিপ্ত হৃদয় গুরুদায়িত্বের কঠিন আকর্ষণে সংযত করিয়া সে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিতেছিল, মুহূর্ত্তে তাহা যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল,—সমস্ত বৈধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণে সহসা দুরন্ত মনোবৃত্তি উগ্র হইয়া দাঁড়াইল। পুষ্পাঞ্জলির পূত-সংস্কৃত মন্ত্র যেন অকস্মাৎ উৎকট প্রলাপের মধ্যে ম্লান হইয়া গেল। আন্দু আর ঘরে ঢুকিল না, ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া একটা চেয়ার লইয়া বসিল।

আন্দু আপনার দৃঢ়তাকে শত ধিক্কার দিল। তাহার মনে পড়িল অনেক দিন আগে, শৈশবে একদিন মেঘাড়ম্বর-ময়ী অমাবস্যা রাত্রিতে সে একাকী দূরতর স্থান হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল; মধ্য পথে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইলে নিরাশ্রয় বালক সবেগে ছুটিতে আরম্ভ করে; সহসা অদূরে বজ্রপতন হইল,—বালক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর অকস্মাৎ উচ্চ হাস্যে বলিল "আমার ভয় কি!"—যেন সেই অসমসাহসী বালকের সহিত স্বয়ং পরমেশ্বর বিদ্রূপ করিতেছেন,—তাই বালক প্রকৃতির ভীষণ ভ্রুকুটি অবজ্ঞার হাস্যে অগ্রাহ্য করিতেছে। সেই আন্দু আজ যৌবনে এ বিড়ম্বনা কি করিয়া জয় করে দেখিবার জন্য এও কি অদৃষ্টের কৌতুক?

মস্‌মস্‌ করিয়া ডাক্তার বাবু আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন। আন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন কেমন আছেন?"

আন্দু থতমত খাইল। তাই ত! সে নিজে এখানে রহিয়াছে বটে, কিন্তু সে তো রোগীর সংবাদ কিছুই জানে না, সে তো আপনার সংবাদ লইতেই বিহ্বল। আন্দুর হৃৎপিণ্ডের উপর কে যেন সজোরে করাত চালাইল। আন্দু নত মুখে বলিল "আমি এই আস্‌ছি, এখনো ঘরে যাইনি।"

ডাক্তারের সহিত আন্দু ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে উঠিয়া আসিলেন। বাহিরে আসিতেই দাদাজী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রকম ?"

ডাক্তার বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন "আর কি বল্‌ব ? আমাদের চিকিৎসার সময়, যতক্ষণ শেষ নিশ্বাস, ততক্ষণ পর্য্যন্ত। আর ঘণ্টা দুই দেরি,—তারপর ইঞ্জেক্ট করা যাবে।"

ডাক্তারকে সত্বর আসিতে বলিয়া তাঁহারা ঘরে ফিরিলেন। আন্দু রমানাথ বাবুর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। যন্ত্রণাচ্ছন্ন রমানাথ বাবু সহসা পার্শ্বোপবিষ্ট দাদাজীর পানে চাহিয়া সবেগে বলিলেন "পণ্ডিতজী, বড় যন্ত্রণা !"

দাদাজী সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন "কি কর্‌বেন বলুন, এ রোগের যাতনা তো ঐ রকমই। কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে ?"

মাথা নাড়িয়া রমানাথ বাবু বলিলেন, "রোগের নয়, রোগের নয়,—বুকে, এই বুকে !"—তিনি পার্শ্বোপবিষ্টা জ্যোৎস্নার হাতখানা টানিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। গৃহপ্রান্তে কম্বলে উপবিষ্টা মাসীমা মালা হাতে করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; জ্যোৎস্না ও রতু রুদ্ধস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আন্দুর বুক যেন কে ভাঙ্গিয়া দিল ! অনেক কষ্টে সকলে একটু শান্ত হইলে রমানাথ বাবু মাথা ঘুরাইয়া, আন্দুকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি এখনো রয়েছ বাবা ?"

অনন্ত-কশাহত-অন্তর আন্দু কথা কহিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। দাদাজী বলিলেন "আজ রাত্রে সেঁক দেবার জন্যে আন্দু এখানে রয়েছে,"—

রমানাথ বাবু আশ্বস্ত ভাবে বলিলেন "বেশ।"—তারপর সহসা গভীর স্বরে বলিলেন "আপনারা সবাই রইলেন, এদের দেখবেন !—" তিনি আকুল ভাবে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আন্দু ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

(৩১)

সমস্তই ব্যর্থ হইল।—জ্যোৎস্নার সেবা, দাদাজীর যত্ন, রতুর উদ্বেগ, মাসীমার কাতরতা, আন্দুর মর্ম্মপীড়া, সমস্ত অতিক্রম করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে রমানাথ বাবু ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

যথাসময়ে যথাবিধানে শবদাহান্তে শববাহীগণ স্নান করিয়া রতুকে লইয়া যখন বাড়ী ফিরিল, তখন অস্নাত বিশুষ্ক আন্দু শ্মশানের কাছে বটবৃক্ষতলে ধূলার উপর বসিয়া পূর্ব্বাকাশের বিকাশোন্মুখ তরুণ তপনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আশান্বিত প্রাণে ভাবিতেছিল—কি চমৎকার, কি সুন্দর !

অনেকক্ষণের পর, অনেক ভাবনার পর, অন্তরের মীমাংসা এবং বাহিরের রৌদ্র যখন খুব চম্‌চমে পরিষ্কার হইয়া উঠিল, তখন আন্দু ধীরে ধীরে উঠিয়া নিজের বাসার দিকে চলিল।

খানিক দূর আসিতেই কৃষ্ণ আসিয়া পথরোধ করিল, বলিল, "দাদাজী তোমায় খুঁজছেন, বাড়ী চল।"

আন্দু সজোরে নিজের ঘাড়টা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "বাড়ী আর নয়, এখন বরাবর মক্কার দিকে চলেছি।"

দুই তিনবার পীড়াপীড়ি করিয়া, কৃষ্ণ অবশেষে বলিল, "বাসায় যাচ্ছ, চান্ করে যাও।"

ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়া আন্দু বলিল 'আমি যে নিজেই অশুচি !"—পর মুহূর্ত্তেই আত্মসম্বরণ করিয়া, বিস্মিত কৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিল,—"আমি যে মুসলমান, শ্মশান থেকে এলে আমাদের চান কর্ত্তে নেই। তুমি দাদাজীকে বোলো, আমি এর পর তাঁর সঙ্গে দেখা করব !"

আন্দু চলিয়া গেল।

যথাসময়ে চতুর্থীর শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। এই শোকবিহ্বল পরিবার লইয়া দাদাজী বিব্রত হইয়া রহিলেন, একাকীই তাহাদের সকল কার্য্য দেখিতে লাগিলেন; রমানাথ বাবুর যে-সমস্ত কাজ ঠিকা লওয়া ছিল, সত্বর তৎসমুদায়ের বিলি বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন; বেশী দেরী হইলে লোকসান দিতে হইবে, সুতরাং হিসাবপত্র দেখিতে ও সান্ত্বনা দিতেই তাঁহার কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

আন্দুর কিন্তু কোনই সংবাদ পাওয়া গেল না। সে যে সেই শ্মশান হইতে কোথায় গেল, কেহই বলিতে পারিল না, দাদাজী উদ্বিগ্ন হইয়া চারিদিকে তাহার খোঁজ লইলেন; বাসায় চাবি রহিয়াছে, মহম্মদ কিছুই জানে না। দাদাজীর বড় গোলমাল বোধ হইল।

মর্ম্মভেদী আলোড়নের নিষ্করুণ সংঘাতে, জ্যোৎস্নার অনুভব-শক্তি প্রথমটা যেন লোপ হইয়া গিয়াছিল, কি হইল না-হইল তাহা যেন তাহার বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না,—

কলের পুতুলের মত প্রাণহীন ভাবে ঘটনার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছিল। ক্রমশঃ শোকের তীব্র আঘাত যখন হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, তাহার অসহ্য তীক্ষ্ণতা সহ্য করাইয়া হৃদয়ের মাঝে বসিয়া গেল, তখন সেই গভীর ক্ষতের জ্বালার মুখে, দাদাজীর অমায়িক সান্ত্বনার স্নিগ্ধ স্পর্শের প্রলেপে মূর্চ্ছিত অনুভূতি চৈতন্যে উদ্বোধিত হইলে একজনের কথা তাহার মনে সমবেদনার সুরে গভীর ভাবে বাজিতে লাগিল।—তাহার ভক্তিভাজন, বড় ভালবাসার দাদাবাবুর অন্তিম অবস্থায়, যে অন্তিমের বান্ধব প্রাণপণ খাটুনি খাটিয়া তাহাকে চির-কৃতজ্ঞ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, সে যে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে অত সহৃদয়তায় শ্মশান পর্য্যন্ত দাদাবাবুর সহিত গিয়া আর বাড়ীতে ফিরিল না,—এই কথাটা বড় মর্ম্মান্তিক রূপে তাহার মর্ম্মে জাগিতে লাগিল। সে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া কেন সহসা ওরূপে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। শোকের বেদনার সহিত আর-একটা অজ্ঞাত কাতরতা তাহার চিত্ত ক্রমে ক্রমে আলোড়িত করিয়া তুলিল,—সে কেন চলিয়া গেল?

(ক্রমশ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

আমেরিকায় বিদ্যাচর্চ্চা

হার্ভার্ডে অধ্যাপনা।

চীনাবাদাম ও ভুট্টা-ভাজা অথবা মুড়ি খাইতে খাইতে ছাত্রেরা বক্তৃতা-গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড গৃহ ভরিয়া গেল। মনোবিজ্ঞানের জন্য এত ছাত্র পূর্ব্বে আশা করি নাই। প্রায় চারিশত শিক্ষার্থীকে এক গৃহে দেখিতে পাওয়া আনন্দের কথা। কয়েক জন নিগ্রো ছাত্রও দেখিলাম।

দুই সপ্তাহ ধরিয়া পরীক্ষা চলিতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কাজকর্ম্ম একপ্রকার বন্ধই ছিল। অধ্যাপকেরাও সকলে কেম্ব্রিজে ছিলেন না। অবকাশের সময়ে হার্ভার্ডের অধ্যাপকগণ যুক্তরাষ্ট্রের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য আহূত হন। এখানে আসিয়াই শুনিলাম কোন অধ্যাপক কর্ণেলে, কোন অধ্যাপক ক্যালিফর্ণিয়ায়, কোন অধ্যাপক নিউইয়র্কে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

আজ অধ্যাপক মুন্‌ষ্টারবার্গ এই চারিশত ছাত্রের মনোবিজ্ঞানে হাতেখড়ি আরম্ভ করিলেন। কোনও গ্রন্থ পাঠ করা হইল না—অথবা নোট-বুক হইতেও মাঝে মাঝে কিছু পাঠ করা হইল না। অধ্যাপক গল্পের ভাষায় কথাগুলি সরলভাবে বলিয়া গেলেন। অক্‌স্‌ফোর্ডের অধ্যাপকগণ এইভাবে অনর্গল বক্তৃতা করিয়া যান না। তাঁহারা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যান মাত্র। মুন্‌ষ্টারবার্গের প্রণালীই হৃদয়গ্রাহী।

মনোবিজ্ঞান পদার্থটা কি তাহা বুঝানই আজ বক্তার উদ্দেশ্য। মুন্‌ষ্টারবার্গ বুঝাইলেন এই বিদ্যাটা কটমট ও নীরস নয়। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে, বিজ্ঞাপন-প্রচারে, শিক্ষা-ব্যবসায়ে, চিত্রকলায়, সাহিত্য সেবায়, সমাজ-সংস্কারে জীবনের প্রতিদিনকার প্রত্যেক কার্য্যেই এই বিদ্যার প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই সমুদয় কথা যথাসময়ে বিবৃত করা হইবে। অধিকন্তু সাধারণ নরনারীর পরিচিত চিন্তা, আবেগ, উচ্ছ্বাস, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, যুক্তিপ্রণালী ইত্যাদিই মুন্‌ষ্টারবার্গের একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকিবে না। ইনি প্রতিভাসম্পন্ন বীরগণের চিত্তবৃত্তি আলোচনা করিবেন আবার দুর্ব্বলচরিত্র মস্তিষ্কহীন পাগলদিগের মনোভাবও বিশ্লেষণ করিবেন। ইঁহার আলোচনায় ব্যক্তিগত চিন্তাপ্রণালী ছাড়া সমাজগত, সম্প্রদায়গত, বংশগত, জাতিগত, সমিতিগত, পরিষদ্‌গত, রাষ্ট্রগত চিন্তা এবং ধারণাসমূহও বিশ্লেষিত হইবে। তাহা ছাড়া কখনও শিশু-চরিত্র, কখনও পৌঢ়-চিত্ত, কখনও বা বৃদ্ধের মন আলোচনার বিষয় থাকিবে। কেবল তাহাই নহে। পশু-পক্ষী জীবজন্তুদিগের চেতনা, তাহাদের ধারণাশক্তি, তাহাদের স্মৃতিশক্তি, তাহাদের সুখদুঃখবোধ, ইত্যাদিও ইঁহার ছাত্রেরা বুঝিবার চেষ্টা করিবে।

মুন্‌ষ্টারবার্গ বলিলেন—"তোমাদের জন্য আমি একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। নাম Psychology General and Applied, ইহাতে এই-সমুদয় বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ অল্পদিন মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তোমাদের পূর্ব্বে আর কেহ ইহা ব্যবহার করে-

নাই। তোমরাই এই বৎসর ইহা প্রথম পাঠ করিবে। পাঠের পর তোমাদের সমালোচনা আমি চাহি। সেই-সকল সমালোচনা-অনুসারে আমি আমার গ্রন্থের উন্নতি সাধন করিব।”

এমার্সন হলে মুনষ্টারবার্গের অধ্যাপনা দেখিয়া Colonial Club নামক অধ্যাপকগণের মজলিশে গেলাম। ইহার ক্ষুদ্র লাইব্রেরীতে বসিয়া বই ঘাঁটা গেল। বিজ্ঞান-বীর আগাসিজের রচনাবলী এবং জীবনবৃত্তান্ত বিশেষরূপে দেখিলাম। দর্শনে জেমসের যে স্থান, সাহিত্যে হুইট্ম্যান ও এমার্সনের যে স্থান, বিজ্ঞানে আগাসিজের (Agassiz) সেই স্থান। ভূতত্ত্ব, ভূগোল, উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং জীববিদ্যা, এই কয় বিদ্যাই আগাসিজ প্রধানতঃ চর্চ্চা করিতেন। ইনি সুইজর্ল্যাণ্ড দেশীয় লোক ছিলেন—পরে ইয়াঙ্কিস্থানের অধিবাসী হন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে ইয়াঙ্কিস্থানের উত্তর ও দক্ষিণ রাষ্ট্রসমূহের গৃহবিবাদ চলিতেছিল। সেই যুদ্ধের পর দাসত্ব-প্রথা বিতাড়িত হয় এবং আধুনিক যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। এই সময়ে আগাসিজ কোন ধনী বন্ধুর সাহায্যে ৮।১০ জন বৈজ্ঞানিককে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ-আমেরিকা বেড়াইতে আসেন। ব্রেজিল-ভ্রমণই প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই বৈজ্ঞানিক অভিযানের বৃত্তান্ত Journey in Brazil পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে মেগাস্থেনীস, হুয়েন্থসাং, আল্‌বিরুনি, টেভার্নিয়ার ইত্যাদি পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত সুপরিচিত। যাঁহারা নূতন নূতন জগৎ, দেশ, প্রদেশ, দ্বীপ ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহাদের voyages বা পর্য্যটন-কাহিনী বিশেষরূপে আলোচিত হয় না। এইসকল ভৌগোলিক আবিষ্কার-বৃত্তান্ত ভারতীয় সাহিত্যে থাকা আবশ্যক। অন্ততঃ মূলগ্রন্থগুলি ভারতবাসীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানবিৎ, জীবতত্ত্ববিৎ, ভূতত্ত্বজ্ঞ, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক-গণের ভ্রমণবৃত্তান্তও ভারতবর্ষে প্রচলিত হওয়া উচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ ডারউইন এবং প্রথম ভাগে জার্মান হাম্বল্ড জগৎ ভ্রমণ করিয়া বিজ্ঞানে যুগান্তর আনিয়াছিলেন। ডারউইন এবং হাম্বল্ডের ভ্রমণকাহিনী বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। আগাসিজের ব্রেজিল ভ্রমণও বিজ্ঞানসেবী মাত্রের আদরণীয় বস্তু।

ধন-বিজ্ঞানবিষয়ক অনুসন্ধানালয় বা সেমিনারে উপস্থিত হইলাম। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা যথারীতি আসিয়াছে। দুইজন অধ্যাপক নায়কতা করিবেন। স্থাবরসম্পত্তির মূল্য নিরূপণ কি উপায়ে হইয়া থাকে তাহাই আজ আলোচনার বিষয়। কেম্বিজনগরের অন্যতম শাসনকর্ত্তা এই বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন। নগরের কতিপয় প্রবীণ ব্যবসায়ী ও মহাজন এই আলোচনায় যোগ দিতে আসিয়াছেন।

বক্তা নিউইয়র্ক, বষ্টন, পিটস্‌বার্গ ইত্যাদি নগরের নানা রাস্তার উল্লেখ করিলেন। কোন্ রাস্তার কোন্ দিকে ভূমির মূল্য কিরূপ তাহা জানান হইল। মূল্য-নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তারা কোন্ কোন্ বিষয় বিচার করিয়া দেখেন সেই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চলিল। বক্তৃতার পর তর্ক প্রশ্ন এবং সমালোচনার সময় ছিল না।

কলাম্বিয়ায়ও দেখিয়াছি বর্ত্তমান সময়ে নগরশাসন, রেলের ভাড়া, ভূমিক্রয়, দোকানদারী, ভেজাল মাল, নূতন দ্রব্যের সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে ধনবিজ্ঞানশিক্ষার্থীরা আলোচনা করিতে শিখে। হার্ভার্ডেও তাহাই দেখিতেছি। ইহার সঙ্গে ভারতে প্রচলিত ধনবিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা তুলনা করিলে বলিব আমরা ধন-বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা এখনও জানিনা। যেদিন দেখিব নগরের শাসনকর্ত্তারা এবং প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ ঋণদান, ঋণগ্রহণ, রাজস্ব আদায়, রাজস্ব বিভাগ, ইত্যাদি যে-সমুদয় বিষয়ে মাথা ঘামাইয়া থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও পঠদ্দশায় সেই-সমুদয় প্রশ্নেরই আলোচনা করিতেছে, সেই দিন বুঝিব ধনবিজ্ঞান-বিদ্যাটা ভারতবর্ষে যথার্থই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত ধনবিজ্ঞান ভারতবাসীর পেটে পড়ে নাই বলিতে হইবে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গ্রন্থশালায় ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ রক্ষিত হয়। তাহার নাম ‘ডিভিনিটি লাইব্রেরী’। ইহার ভিতর যাইয়া দেখি অধ্যাপক ল্যানম্যান সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর নূতন তালিকা প্রস্তুত ও সাজান গুছান করিতেছেন। এই লাইব্রেরীর সম্মুখে বড় বড় মিউজিয়াম-গুলি অবস্থিত—পার্শ্বে সেমেটিক মিউজিয়াম। আমি ল্যান্‌ম্যানকে বলিলাম—“বোধ হয় আপনি একটা ভারতীয়

মিউজিয়াম স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন?" ল্যান্‌ম্যান বলিলেন—"না মহাশয়, আমি এরূপ সংগ্রহালয় পছন্দ করি না। এই যে সেমিটিক মিউজিয়াম দেখিতেছেন—ইহার জন্য ঝাড়ুদার ও কেরাণী রাখিতেই যত খরচ তত খরচে ভাল ভাল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারে। গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইলে দুনিয়ার সর্ব্বত্র উপকার ছড়াইয়া পড়ে। আর এই একটা বাড়ীতে লক্ষ লক্ষ টাকা পুতিয়া রাখিলে লাভ কি? কালেভদ্রে দুই-একজন লোক হয়ত দ্রব্যগুলি দেখিতে আসে। আমাদের Oriental Series প্রচারের ফলে নরওয়ে, রুশিয়া, তোকিও হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রেজিল চিলি পর্য্যন্ত হার্ভার্ডের নাম প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু একটা (Indic Museum) ভারতসম্পর্কীয় মিউজিয়ম স্থাপন করিলে অর্থব্যয় অত্যধিক হইত, অথচ সেই পরিমাণে হার্ভার্ডের অথবা জগদ্বাসীর উপকার হইত না।"

ধনবিজ্ঞানের সাধারণ ক্লাসে প্রায় ৫০০ ছাত্র উপস্থিত। দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক ছাত্রেরা আসিয়াছে। অধ্যাপক টাওসিগ পড়াইতেছেন। একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র ইঁহাকে সাহায্য করিতেছে। নীউ লেক্‌চার হলে প্রবেশ করিয়া দেখি একজন অধ্যাপকের আদেশ অনুসারে গ্র্যাজুয়েট বোর্ডের উপর লিখিতেছে। ১৯১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পশম ও চিনি কত আমদানী হইয়াছে এবং কত উৎপন্ন হইয়াছে তাহারই বিবরণ লিখিত হইতেছে। শুল্ক বসাইয়া যুক্তরাষ্ট্র কত আয় করিয়াছেন তাহাও তালিকায় দেখিলাম।

টাওসিগ গল্পাকারে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। প্রথমে গত পরীক্ষা সম্বন্ধীয় একটা প্রশ্ন আলোচিত হইল। কোন কোন দেশে রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বেশী। গ্রেট-বিটেন ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ইহার কারণ কি? আবার কোন কোন দেশ হইতে সোনারূপা রপ্তানী অত্যধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। ইহারই বা কারণ কি? দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সোনারূপা বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু রুশিয়ায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে সোনারূপা উৎপন্ন হইয়া দেশেই থাকে। এই-সকল বিষয়ের পর অদ্যকার পাঠ আরম্ভ হইল। সংরক্ষণনীতি অবলম্বনের সুফল বুঝান হইল। যুক্তরাষ্ট্রের গত দশ বৎসরের কথাই আলোচিত হইল। অধ্যাপক বলিলেন—"সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের ফল সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তাদিগের দুইটা ভুল ধারণা আছে। প্রথমতঃ ইঁহারা বিবেচনা করেন যে বিদেশী দ্রব্যের উপর খাজনা বসাইতে পারিলেই স্বদেশকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তোলা যায়। দ্বিতীয়তঃ আর এক দলের রাষ্ট্র-পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন যে, বিদেশী দ্রব্য আমদানীর উপর শুল্ক বসাইবার ফলেই যুক্তরাষ্ট্রে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।" ইনি দুই মতেরই বিরোধী। দেশের সমৃদ্ধি অথবা দ্রব্যাদির মূল্য বুঝিতে হইলে দেশী লোকদের মূলধন, ব্যাঙ্ক পরিচালনা, Currency বা টাকা কড়ির পরিমাণ, ইত্যাদি আলোচনা করা কর্ত্তব্য। Free Trade (অবাধ বাণিজ্য) অথবা Tariff Legislation (শুল্কনীতি) কোনো একটির ঘাড়ে সকল সুখ বা দুঃখ চাপাইলে সমস্যাটা তলাইয়া বুঝা হইবে না।

চারি পাঁচশত ছাত্র বক্তৃতা শুনিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। কেহ নোট লইতে পারে, কেহ পারে না। অনেকে ঘুমাইয়া পড়ে। অক্‌সফোর্ডেও এই অবস্থা। তাহা হইলে ছাত্রেরা শিখে কখন? এইজন্য গৃহে ইহাদের পড়াশুনা দেখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৫।২০ জন ছাত্রকে এক এক দলে বিভক্ত করা হয়। ইহারা সহকারী অধ্যাপকগণের অধীনে পড়াশুনা বুঝিয়া লইতে পারে। এইরূপ Tutorial System অক্‌সফোর্ডেও আছে। হার্ভার্ডে এইরূপ দল বিভাগের নাম Section Conference। এই ব্যবস্থা না থাকিলে কোন ছাত্রেরই হার্ভার্ডে উপকার হইত না। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং হার্ভার্ডে যত রকম প্রভেদ আছে তাহার মধ্যে এই বিষয়টি অন্যতম। সহযোগী অধ্যাপকগণের নিয়োগেই হার্ভার্ড কলাম্বিয়া ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসংখ্যা প্রায় ৮০০ হইতে ১০০০ হয়। এতগুলি লোক নিযুক্ত করিতে পারিলে সকল দেশেই গাধা পিটাইয়া মানুষ তৈয়ারী করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইতে পারে। অবশ্য সুযোগগুলি ব্যবহার করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। ভারত-বাসীর সে ক্ষমতা নাই কি?

৩০।৪০ জন গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের সেমিনার দেখিলাম। অধ্যাপক টাওসিগ পরিচালনা করিতেছেন। কলাম্বিয়ায়

দেখিয়াছি—এক এক জন ছাত্র এক এক বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার লইয়াছে। সেলিগম্যানের সেমিনারে একদিন দেখিলাম জার্ম্মানভাষায় প্রচারিত ধনবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকখানা পত্রিকা পাঠ করিয়া একজন ছাত্র নোট সংগ্রহ করিয়াছে। কোন্ পত্রিকায় কিরূপ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে সেই কথা অন্যান্য ছাত্রগণকে জানান তাহার কর্ত্তব্য। এইরূপে ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য ভাষায় ধনবিজ্ঞানের কথাগুলি সকল ছাত্রই জানিতে পারে। টাওসিগের সেমিনারে দেখিলাম Economic Theory বার্ত্তা-তত্ত্ব আলোচনা হইতেছে। পূর্ব্বে য়্যাডামস্মিথ, রিকার্ডো, মার্শ্যাল ইত্যাদি- ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার ধুরন্ধরগণের গ্রন্থ সমালোচিত হইয়াছে। টাওসিগ বলিলেন—"আমি শীঘ্রই মার্শ্যালের ভুলগুলি দেখাইয়া তাঁহার নিকট পত্র লিখিব। কোন কোন স্থলে ভাষা অস্পষ্ট—কোন কোন স্থলে যুক্তির দোষ।" আজ ক্লার্কপ্রণীত The Distribution of Wealth পুস্তকের সমালোচনা হইল। অধ্যায়ের পর অধ্যায় অনুসারে আলোচিত বিষয়ের বিশেষত্ব দেখান হয়। তাহার পর সেই-সমুদয় তথ্য সম্বন্ধে তর্ক প্রশ্ন বাদানুবাদ চলিতে থাকে। এই প্রণালীতে গ্রন্থসমূহের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা হয়।

মনোবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে দেখিলাম প্রত্যেক গৃহে দুইজন করিয়া পি-এইচ্-ডি উপাধিপ্রার্থী ছাত্র নানাপ্রকার পরীক্ষায় ব্যাপৃত। অধ্যাপক ল্যাঙ্গফীল্ড বলিলেন—"একজন ভারতীয় ছাত্র নরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এই বিজ্ঞানালয়ে পি-এইচ-ডি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া সে নব্য দার্শনিক মতবাদসমূহের সমালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছে। সেই বিভাগেই সে পি-এইচ-ডি পাইবে। কিন্তু (Experimental Psychology) প্রমাণমূলক মনোবিজ্ঞানে তাহার জ্ঞান প্রশংসার্হ। ভারতবর্ষে সে এই বিদ্যা প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে।"

হার্ভার্ডের পি-এইচ্-ডি পরীক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। বার চৌদ্দ দিন ধরিয়া লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা হয়—তাহার উপর মৌলিক গবেষণায় উচ্চ সম্মান লাভ করা আবশ্যক। অক্সফোর্ডে বি-এ পাশের পর আর কোন পরীক্ষা লওয়া হয় না। জার্ম্মানীতে পি-এইচ-ডি অক্সফোর্ডের বি-এ-পরীক্ষার ন্যায় সর্ব্বনিম্ন পরীক্ষা। সকল দিক দেখিলে মনে হইবে যে পরীক্ষা হিসাবে হার্ভার্ডের পি-এইচ-ডি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

ইয়াঙ্কি সংস্কৃতের ঝুলি।

অধ্যাপক ল্যানম্যানের বয়স ৬৪ বৎসর। এই বয়সে পাশ্চাত্য লোকেরা বৃদ্ধ বলিয়া গণ্য হন না। কিন্তু ল্যানম্যান কিছু স্থবির হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতীয় বৃদ্ধগণের স্বভাব ইঁহাতে কিছু কিছু দেখিতেছি।

ল্যান্ম্যান প্রায়ই বলিয়া থাকেন—"কি আর বলিব মহাশয়—বড়ই কষ্টে দিন কাটিতেছে। চারিটা মেয়ে, দুইটা ছেলে। প্রত্যেককে উচ্চশিক্ষা দিতে যথেষ্ট অর্থব্যয়। এদিকে বড় মেয়ের বয়স ২৫ বৎসর হইয়া গেল। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যুবক অধ্যাপকের সঙ্গে ইহার প্রণয় জন্মিয়াছে। অথচ চারিবৎসর হইয়া গেল যুবক এখনও বিবাহের পাকা কথা পাড়িল না। কন্যাদায় বিষম ব্যাপার। ভারতবর্ষেও কি 'মেয়ে পার' করা একটা সমস্যা নয়?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রণয় জন্মিয়াছে বলিয়া দুই জনের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে আশা করিতেছেন কি করিয়া?" ল্যানম্যান বলিলেন—"অবশ্য সাধারণত "এন্‌গেজ্‌মেণ্ট" হইতেই বিবাহের আশা করা যায় না। কিন্তু যুবক আমার কন্যাকে আংটি উপহার দিয়াছে—আমার নিকট অনুমতি পর্য্যন্ত চাহিয়াছে। অবশ্য ইচ্ছা করিলে সে ইহাকে ছাড়িয়া দিতেও পারে—কিন্তু তাহার দায়িত্বজ্ঞান থাকা উচিত ছিল।"

রান্না-বাড়ির কথা, ঘর-দরজার কথা, জামা-জুতার কথা, টাকা-কড়ির কথা ইত্যাদিতে ল্যানম্যানের সঙ্গে একসঙ্গে ৪।৫ ঘণ্টা কাটান কিছুই কঠিন নয়। এতদিন বহু প্রবীণবয়স্ক পাশ্চাত্যপণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হইয়াছে—বস্তুতঃ কেহই ৫০ বৎসরের কম নন—অনেকেই ৬০ বৎসরের বেশী! কিন্তু কেহই কোন দিন শারীরিক অসুস্থতার কথা পাড়েন নাই। কাহাকেও দেখিয়া তাঁহাদের শারীরিক দুর্ব্বলতা সন্দেহ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই। কিন্তু ল্যান্-

ম্যান্ অত্যধিক এলাইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহার মুখেই প্রথম শুনিলাম—"আর কতদিন বাঁচিব মহাশয়? জীবনে কিছু করিতে পারিলাম না।" কেহ কেহ হয়ত ভাবিবেন—সংস্কৃত পাঠ করিতে করিতে ল্যানম্যান ভারতীয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন।

ইয়াঙ্কিরা যে কয়জন জগৎপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের গৌরব করেন তাহার মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ হুইটনি (Whitney) অন্যতম। বিজ্ঞানবীর আগাসিজের ন্যায় হুইটনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ভাষাবিজ্ঞানে ইঁহার ব্যুৎপত্তি অসাধারণ ছিল। জার্ম্মান পণ্ডিত ম্যাক্‌সমুলারের ন্যায় হুইট্‌নি পাশ্চাত্যজগতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি করেন। হুইট্‌নি ল্যান্‌ম্যানের গুরু, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইয়েলই আমেরিকার সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃতকেন্দ্র।

ল্যান্‌ম্যান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হুইট্‌নির পূর্ব্বে ইয়াঙ্কিদের মধ্যে কোন পণ্ডিত সংস্কৃত চর্চ্চা করিয়াছিলেন কি?" ল্যান্‌ম্যান্ বলিলেন—"তাঁহার পূর্ব্বে দুইজন সংস্কৃত প্রচার করেন—অধ্যাপক স্যাল্‌স্‌বারি এবং ওয়েল্‌স্। হুইট্‌নি স্যাল্‌স্‌বারির ছাত্র—স্যাল্‌স্‌বারির কাছে ইয়েলে হুইটনির সংস্কৃত ভাষায় হাতে খড়ি হয়।"

এখনকার মত তখনকার দিনেও জার্ম্মানীই সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। সংস্কৃত শিখিবার জন্য সকলকে জার্ম্মানীতে যাইতে হইত। টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোট (Roth) সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। হুইট্‌নি ইঁহার নিকটও সংস্কৃত শিখেন। বার্লিনে অথর্ব্ববেদের মূল পুঁথি ছিল। হুইট্‌নি দিনরাত খাটিয়া সেই পাণ্ডুলিপি হইতে ইংরেজী অক্ষরে নকল করিতে থাকেন। আমেরিকায় ফিরিয়া আসিয়া হুইট্‌নি অথর্ব্ব বেদের সটীক অনুবাদ প্রস্তুত করেন। সে গ্রন্থ এক্ষণে Harvard Oriental Seriesএ প্রকাশিত হইয়াছে।

রোটের কথা উঠিবামাত্র ল্যান্‌ম্যান্ তাঁহার নিজ ছাত্রাবস্থার স্মৃতিচিহ্নগুলি বাহির করিলেন। সহপাঠীদিগের ছবি দেখাইতে দেখাইতে সেই সময়কার জার্ম্মানজাতির অবস্থা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। দু-এক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে জার্ম্মানেরা ফরাসীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া জার্ম্মান সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। সে আজ ৪০ বৎসরের কথা। জার্ম্মানজাতি তখনও দরিদ্র—তাহাদের বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্য ও ধনসম্পদের কোন চিহ্ন তখন ছিল না। বরং নবীন সাম্রাজ্য টিকিবে কিনা সেই সন্দেহে সকলকে শঙ্কিত থাকিতে হইত।

রোটের ছাত্র হুইট্‌নি—আবার হুইট্‌নির ছাত্র ল্যান্‌ম্যান্ রোটের নিকট সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন। ল্যান্‌ম্যান্ ছবি দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেন—"রোটের মত পণ্ডিত বিরল। ইঁহার সংস্কৃত অভিধান দেখিয়াছেন ত? এই দেখুন সেই বিরাট গ্রন্থ। তখনকার দিনে সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিভাগ হইতে শব্দপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত বাহির করা কি সামান্য পরিশ্রমের কথা? পুরাণ বলুন, উপনিষদ বলুন—সবই হস্তলিখিত পুঁথির ভিতর আবদ্ধ ছিল। সেই-সকল পুঁথি ঘাঁটিয়া শব্দ বাহির করিতে অসাধারণ সহিষ্ণুতার আবশ্যক।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই অভিধান সঙ্কলনে রোট কি একাকী ছিলেন?" ইনি বলিলেন—"এই কার্য্যে সহযোগীও জুটিয়াছিল। রুশ সংস্কৃতজ্ঞ বীট্‌লিঙ্ক (Boehtlingk) রোটের সমান পরিশ্রম করিতেন। এদিকে হুইট্‌নি আমেরিকা হইতে জ্যোতিষবিষয়ক শব্দের ভাব লইয়াছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতের সাহায্যও পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু রোটের সঙ্গে বীট্‌লিঙ্কের একবারও দেখা হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। চিঠিপত্রের সাহায্যে এই বিরাট কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইল তাহা ত আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।"

এই অভিধান সম্পূর্ণ করিতে পাকা ২৫ বৎসর লাগে। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে ইহা সমাপ্ত হয়। সেই বৎসর বীট্‌লিঙ্কের ৬০ বৎসর পূর্ণ হয়। ইনি তখন জার্ম্মানির জেনা নগরে বাস করিতেছিলেন। ল্যান্‌ম্যান বলিলেন—"এই উপলক্ষে এক সভা আহূত হয়। ভোজপানের আয়োজন হইয়াছিল। আমি তখন জার্ম্মানির শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম। কিছু দিনের জন্য জেনাতে স্লাভনীয় ভাষা ও সাহিত্য শিখিতে প্রবৃত্ত হই। এই সময়ে বীট্‌লিঙ্কের সঙ্গে আমার আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। হুইট্‌নি অভিধান সমাপ্তি উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমেরিকা হইতে আসিয়াছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তখনকার দিনে বার্লিনে সংস্কৃত শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল?" ল্যান্‌ম্যান্ উত্তর করিলেন—"বার্লিনে ওয়েবার (Weber) অধ্যাপক ছিলেন। আমি টুবিঙ্গেন হইতে বার্লিনেও গিয়াছিলাম। কিন্তু কি চরিত্রে, কি পাণ্ডিত্যে ওয়েবার রোটের সমকক্ষ নন।"

ল্যান্‌ম্যানের সহপাঠীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সুইডেনের পণ্ডিত ল্যাসেন (Lassen) ইয়োরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ মহলে সুপরিচিত। রিটার (Ritter) কীপার্ত (Keipert) ভূগোল-বিদ্যায় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। অনেকেই এখনও জীবিত আছেন। ল্যান্‌ম্যান্ বলিলেন—"সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ বিস্ময়ের কথা বলিতেছি শুনুন। ষাট বৎসর বয়সে বৌট্‌লিঙ্গ সেই সংস্কৃত অভিধানের উপসংহার বা পরিশিষ্ট একাকী সুরু করেন। অথচ পরিশিষ্ট প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা আয়তনে বৃহত্তর!"

আজকাল ইয়াঙ্কিস্থানের সাতটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা চলিয়া থাকে। ইয়েলের পর জন্‌স্ হপ্‌কিন্‌সে সংস্কৃত প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। সেই বৎসর ল্যান্‌ম্যান্ জার্ম্মানি হইতে ফিরিয়া আসেন। ল্যান্‌ম্যান্ এইখানে সংস্কৃতের প্রথম অধ্যাপক হন। পরে ইঁহার ছাত্র ব্লুমফিল্ড জন্‌স্ হপ্‌কিন্সের অধ্যাপক হইয়াছেন। ব্লুমফিল্ড আজকাল সংস্কৃত মহলে প্রসিদ্ধ।

জন্‌স্ হপ্‌কিন্সের পরে হার্ভার্ডে সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হয়। প্রথমে একজন অধ্যাপক ছিলেন। এলিয়ট যখন সভাপতি ছিলেন তখন তিনি নানা কৌশলে হুইট্‌নিকে ইয়েল হইতে ছাড়াইয়া আনিতে চেষ্টা করেন। ল্যান্‌ম্যান্ বলিলেন—"হুইট্‌নি তাঁহার Alma Mater অর্থাৎ শিক্ষামাতাকে ছাড়িলেন না। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারাও রোটকে টুবিঙ্গেন হইতে ছাড়াইয়া আনিতে চেষ্টা করেন—কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চ্চা হয় পূর্ব্বে জানিতাম না। কিন্তু দেখিলাম ইঁহাদের Indo-Iranian Series নামে ভারত-পারস্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রচারিত হইতেছে। অধ্যাপক জ্যাক্‌সনের (Jackson) সঙ্গেও কয়েকবার আলোচনা ও দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি সংস্কৃত অপেক্ষা বোধ হয় পারশী ভাষা ও সাহিত্যে অধিক পারদর্শী। ইঁহার রচনাবলী পারস্য সম্বন্ধেই বেশী বুঝিলাম।" ল্যান্‌ম্যান বলিলেন—"জ্যাক্‌সনের সম্বন্ধে একটা মজার গল্প বলিতেছি। আমরা নিউইয়র্কে একবার American Oriental Societyর সভা করিতেছিলাম, তাহাতে জ্যাক্‌সন উপস্থিত ছিলেন—তখন তিনি ছাত্র। ইঁহার সঙ্গে দৈবক্রমে আমার আলাপ হয়। তাহাতে বুঝিতে পারি যে জ্যাক্‌সন স্বচেষ্টায় ইরাণীয় ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। ইঁহার সহিষ্ণুতা, অনুরাগ ও অধ্যবসায় দেখিয়া আমি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে পত্র লিখিলাম যে, জ্যাকসনকে একটা বৃত্তি দিয়া জার্ম্মানিতে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। সভাপতি তাহাই করিলেন। তাহার পর জ্যাক্‌সন প্রাচ্যবিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া কলাম্বিয়ায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ভারতবর্ষেও বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসও ইনি রচনা করিয়াছেন।"

ক্যালিফর্ণিয়া ও শিকাগোতে আজকাল সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপকদ্বয় ল্যানম্যানেরই ছাত্র। দুইজনেই সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। পেন্‌সিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এখানকার ছাত্র অধ্যাপক ব্লুমফীল্ডের ছাত্র—সুতরাং ল্যান্‌ম্যানের প্রশিষ্য।

ল্যান্‌ম্যান্‌কে American Oriental Societyর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ল্যানম্যান বলিলেন—"ইহার ইতিহাসও ইয়াঙ্কিস্থানে সংস্কৃত চর্চ্চার ইতিহাসের অনুরূপ। প্রথমে বষ্টনে এই সমিতির কার্য্যালয় ছিল—কিন্তু ইয়েলে শীঘ্রই স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে অধ্যাপক (Salisbury) সালিসবেরী ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। পরে হুইট্‌নির আমলে ইহার উন্নতি হয়। আমিও কিছুকাল এই পরিষদের জন্য খাটিয়াছি। ইহাকে খাড়া করাইতে পারিলাম না—অথচ ইহার জন্য আমার যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই জন্যই আমি মৌলিক গবেষণায় হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। আমার জীবন নিষ্ফল হইতে চলিল। যাহা হউক—আমার শিষ্যেরা আমেরিকায় সংস্কৃত চর্চ্চার ধারা রক্ষা

করিতে পারিবে বুঝিতে পারিয়াছি। বর্ত্তমানে American Oriental Societyর বড় দুরবস্থা। আমেরিকায় পুস্তক মুদ্রণের ব্যয় কিছু বেশী। এইজন্য পরিষৎ জার্ম্মানিতে ছাপা হইবার জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া থাকেন। জার্ম্মানিতে খরচ কম। আমিও Harvard Oriental Seriesএর কোন কোন গ্রন্থ অক্‌স্‌ফোর্ডের 'ক্লেরেন্স' প্রেসে ছাপিতে দিই, বিলাতে বই ছাপিবার খরচ আমেরিকা হইতে কম। আমাদের টাকা বড় অল্প। এইজন্য একখানা গ্রন্থ ছাপাখানার লোহার সিন্দুকে দুই বৎসর হইতে মজুত রাখা হইয়াছে। টাকা হাতে হইলে ছাপিবার অর্ডার দেওয়া যাইবে। একখানা গ্রন্থ গ্রহণ করিতেই পারিলাম না, লেখক দুঃখিত হইলেন সন্দেহ নাই। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও Indo-Iranian Series ছাপিবার জন্য টাকা নাই। জ্যাক্‌সন বন্ধু জুটাইয়া টাকা সংগ্রহ করেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এদেশের অধ্যাপকগণ তাহা হইলে গ্রন্থ প্রকাশ করেন কি করিয়া?" ল্যান্‌ম্যান্ বলিলেন—"যে-সকল বই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে একমাত্র সেই-সকল বই প্রকাশকেরা নিজ খরচে ছাপাইয়া থাকেন। অন্যান্য গ্রন্থ লেখকগণ নিজব্যয়ে প্রকাশ করিতে বাধ্য হন। আমার Sanskrit Reader ছাপিতে ৫০০০৲ খরচ হয় – আমাকে নিজে এই খরচ বহন করিতে হইয়াছিল। "হার্ভার্ড ওরিয়েণ্ট্যাল সীরিজ" ছাপিবার টাকা বেশী নাই। কয়েক বৎসর কোন বই ছাপা হয় নাই বলিয়া ভাণ্ডারে টাকা জমিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে একসঙ্গে ৮।১০ খানা গ্রন্থ যন্ত্রস্থ। কাজেই বিলের দেনা শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

ল্যান্‌ম্যানের এক ছাত্র মৃত্যুকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগে ৩০,০০০৲ দান করেন, তাহার বার্ষিক আয় ২,০০০৲। এই টাকা হইতে ল্যান্‌ম্যান্-সম্পাদিত প্রাচ্য গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ল্যান্‌ম্যান্ বলিলেন—"আমার গৃহের এই লাইব্রেরীতে কয়েকটা দেখিবার উপযুক্ত বই আছে। এই দেখুন "ধম্মপদ"—ইহা জার্ম্মান দার্শনিক শোপেনহোয়ারের বই ছিল। এই যে নোটগুলি দেখিতেছেন এই সমুদয় শোপেনহোয়ারের হাতে লেখা!

"এই দেখুন বাঙ্গালা অক্ষরে "ঋতুসংহার"। ইহাই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহা ভারতবর্ষে ছাপা হইয়াছিল।

"এই দেখুন রামমোহন রায়ের প্রণীত ঈশোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত। কিছুদিন হইল বিলাতের এক পুরাতন পুস্তকালয় হইতে আনাইয়াছি।

"এই দেখুন প্রথম দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত গ্রন্থ—হিতোপদেশ। ১৮০০ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরে ইহা ছাপা হয়।

"এই দেখুন "সিদ্ধরূপ"। ইহা ল্যাটিনভাষায় রচিত। পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্বই বিশ্বাস করিতেন না। অনেকের ধারণা ছিল যে এটা একটা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের জুয়াচুরী। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে "সিদ্ধরূপ" সম্বন্ধে ল্যাটিন ভাষায় প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহার ফলে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলের বিশ্বাস জন্মে।"

ল্যান্‌ম্যান্ ভারতীয় ছাত্রগণের হিতৈষী। আবশ্যক হইলে তাহারা ইঁহার নিকট টাকা ধার লইতে পারে। ল্যান্‌ম্যান্ একদিন বলিলেন—"পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-অধ্যাপক (Sylvain Levi) সিলভ্যাঁ লেভী বলেন যে ভারতীয় ছাত্র পারীতে আসিলে তিনি তাহাদের (non-official) বে-সরকারী ভারতীয় কনসাল (Consul) স্বরূপ হন। আমিও সেইরূপ হার্ভার্ডে ভারতীয় ছাত্রগণের অভিভাবক স্বরূপ নিজকে বিবেচনা করি।"

ল্যান্‌ম্যান্ ভারতীয় পণ্ডিতগণের সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। ইনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে চিনিতেন—ভারতবর্ষে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ভাণ্ডারকারের সঙ্গেও ইঁহার আলাপ আছে। এতদ্ব্যতীত মেজর বামনদাস বসু এবং মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থমালা সম্পাদকগণের কার্য্য সম্বন্ধে ল্যান্‌ম্যানের সহানুভূতি এবং প্রশংসা লক্ষ্য করিলাম। অধিকন্তু ইনি ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সম্মান যে ভাবে করিতে চাহেন তাহাতে পাশ্চাত্য মহলে একটা নূতনত্ব দেখা দিবে সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ পাশ্চাত্যেরা ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞগণের কোনরূপ খাতির করেন না। ল্যান্‌ম্যান্ এইরূপ অহঙ্কারের

বিরোধী। ইনি ভারতবাসীর গুণপনা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত। সম্প্রতি মরাঠা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেলভেলকার হার্ভার্ডে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার "উত্তর চরিত" বিষয়ক গ্রন্থের সম্পাদকীয় ভূমিকায় ল্যান্‌ম্যান্ বলিতেছেন—(প্রুফ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে)—

"Within the last decade, the West and the Far East have become virtually near neighbours. From the responsibilities of such neighbourhood there is no escape. We must have to do with the East, and as members of the world family of nations, we must treat the East aright. To treat the people of the East aright, we must respect them ; and to respect them we must know them. * * *

It is a happy augury that scholars of the East are joining hands with those of the West in the great work of helping each to understand the other. The work calls for just such co-operation and above all things else for co-operation in a spirit of mutual sympathy and teachableness. There is much of great moment that America may learn for example, from the history of the peoples of India, and much again that the Hindus may learn from us. But the lessons will indeed be of no avail unless the spirit of arrogant self-sufficiency give way to the spirit of docility and the spirit of unfriendly criticism to that of mutually helpful constructive effort, the relation of teacher and taught is here in an eminent degree, a reciprocal one, for both East and West must be at once both teacher and taught...... I am glad that a Hindu well versed in the learning of his native land, should think it worth while to learn of the West...... And I hope again that many in the coming years may follow his example establishing thus most valuable relations of personal friendship and co-operation between Indianists of the Orient and the Occident.

গত দশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিম ও পূর্ব্ব যেন প্রতিবেশী হইয়া উঠিয়াছে। এখন প্রতিবেশীর দায়িত্ব এড়াইবার উপায় কাহারো নাই। বিশ্ব-পরিবারের অঙ্গরূপে পূর্ব্বের প্রতি পশ্চিমকে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিতে হইবে। ন্যায্য ব্যবহার করিতে হইলে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হইবে; শ্রদ্ধাবান হইতে হইলে পরিচয় পাওয়া আবশ্যক।

সুলক্ষণ যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বন্ধুভাবে হাতে হাত মিলাইয়া পরস্পরকে বুঝিতে সাহায্য করিতেছেন। এইরূপ সহমর্ম্মিতা ও শিখাইবার ইচ্ছা লইয়া সহযোগিতাই যথার্থ আবশ্যক। পশ্চিম বহু গুরুবিষয়ে ভারতের ইতিহাস হইতে জ্ঞান লাভ করিতে পারে; ভারতেরও পশ্চিম হইতে শিখিবার অনেক আছে। কিন্তু দাম্ভিক আত্মম্ভরিতা দূর করিতে না পারিলে দৃষ্টান্ত কোনো কাজেই লাগিবে না; প্রতিকূল সমালোচনা ত্যাগ করিয়া পরস্পরের সাহায্যে কিছু গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরস্পরের নিকট গুরু ও শিষ্য উভয়ই হইবে।

ল্যান্‌ম্যানের এই ভূমিকায়, নবযুগের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাইতেছে।

অধ্যাপক ল্যানম্যান।

ল্যান্‌ম্যান্ পালিসাহিত্যেরও চর্চ্চা করেন। ইঁহার গৃহে বহু পালিগ্রন্থ দেখিলাম। ইনি কয়েক বৎসর হইতে "বিসুদ্ধিমগ্‌গ" সম্পাদনে নিযুক্ত আছেন। এই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আমাদের বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ কোশাম্বী হার্ভার্ডে তিন বৎসর কার্য্য করিয়াছেন। ল্যান্‌ম্যানের সঙ্গে কোশাম্বীর বনিল না। কাজেই বিসুদ্ধিমগ্‌গ কবে সম্পূর্ণ হইবে বলা কঠিন। একাকী এই কার্য্য করিবার ক্ষমতা ল্যান্‌ম্যানের নাই।

ভারতবর্ষে আমরা উপযুক্ত লাইব্রেরীর অভাবে বড় কষ্ট পাই। ল্যান্‌ম্যানের নিজের লাইব্রেরীতে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যে সমুদয়

আধুনিক গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্রিকা, অভিধান ইত্যাদি আছে আমাদের উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যদি তাহার সাহায্য সহজে পাইতেন তাহা হইলে ভারতীয় পাণ্ডিত্যের সম্মান জগতে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যাইত। এ-সকল সুযোগ ভারতবর্ষে কোন দিন সৃষ্ট হইবে না কি?

"হার্ভার্ড ওরিয়েণ্ট্যাল সীরিজ্" গ্রন্থমালায় সর্ব্বসমেত প্রায় ত্রিশ খানা গ্রন্থ প্রকাশিত ও যন্ত্রস্থ হইয়াছে। ল্যান্‌ম্যান্‌কে বলিয়া গ্রন্থগুলি ভারতীয় পণ্ডিতগণকে বিনামূল্যে উপহার দিবার ব্যবস্থা করা গেল। ল্যান্‌ম্যান্ সম্মত হইলেন। বোধ হয় ভারতবাসীরা গ্রন্থগুলি যথাসময়ে পাইবেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, জাতীয় শিল্পপরিষৎ, বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, হরিদ্বারের গুরুকুল, কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা, এলাহাবাদের হিন্দীসাহিত্য সম্মিলন ইত্যাদি কয়েক কেন্দ্রের ঠিকানা দিলাম।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এক-একখানা গ্রন্থসম্পাদন করিবার জন্য বহুবৎসর লাগিয়া থাকেন। ইঁহাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রশংসার্হ। তাহা ছাড়া গ্রীক, ল্যাটিন, রুশ, জার্ম্মান, ফরাসী, আরবী ইত্যাদি ভাষাসমূহের দুই তিনটা ইঁহাদের প্রত্যেকের জানা থাকে। অধিকন্তু দর্শন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান ন্যূনাধিক পরিমাণে ইঁহাদের সকলেরই আছে। এই জন্য ইঁহাদের কার্য্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় বেশী পাই। ইঁহারা যে পরিমাণ সাধারণ বিদ্যা লইয়া সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ করেন সে পরিমাণ বিদ্যা ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যেও বিরল। এই জন্য ইঁহাদের জ্ঞান সংস্কৃত অথবা পালিতে গভীর না হইলেও মোটের উপর ইঁহারা ভারতবাসীকে সহজে পরাস্ত করিতে পারেন। বিশেষতঃ একটা কাজে বহুকাল লাগিয়া থাকিবার সময়ে ইঁহারা অন্নচিন্তায় অস্থির হন না। ইহাই মস্ত সুবিধা। এই সুবিধা এবং লাইব্রেরীর সাহায্য পাইলে ভারতবাসীও জগতে নাম করিতে পারিবেন।

মাথা মাপার কারখানা।

সে দিন অধ্যাপক ডিক্‌সন বলিতেছিলেন—"ইয়াঙ্কিস্থানে নৃতত্ত্ব (Anthropology) ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের ন্যায় আলোচিত হয়। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মস্তকের পরিধি, গায়ের রং, চুলের রং, চোখের রং ইত্যাদি আলোচনা করিয়া নরনারীর জাতি নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা নাই। শরীরতত্ত্ব অর্থাৎ Anatomyর সাহায্যে 'য়্যান্থ্রপলজি' আলোচিত হইলে সেই বিদ্যাকে Physical Anthropology অথবা Somatology বলা হয়। এই "সোমাটলজি"র চর্চ্চা জার্ম্মানিতে ও ফ্রান্সে বেশী হয়। যুক্তরাজ্যে একমাত্র ওয়াশিংটনে ইহার জন্য বড় কেন্দ্র আছে। হার্ভার্ডে এই বিভাগ সবেমাত্র খোলা হইয়াছে।"

হার্ভার্ডের সোমাটলজি-বিভাগের কর্ত্তা ডাক্তার হুটনের সঙ্গে হার্ভার্ড ক্লাবে আলাপ হইল। ইনি যুবক—বৎসর দুএক পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করিয়াছেন। ইনি বলিলেন—"মহাশয়, আমি বাল্যাবধি সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা ইত্যাদির অনুশীলন করিয়াছি। দৈবক্রমে শরীর-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, Comparative Anatomy এবং Comparative Zoology ইত্যাদির দিকে ঝুঁকিয়াছি। অথচ এক্ষণে আমিই হার্ভার্ডে মাথা-মাপা বিভাগের দায়িত্ব পাইয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার গতি পরিবর্ত্তিত হইল কি করিয়া?" ইনি উত্তর করিলেন—"আমি হার্ভার্ডে পি-এইচ-ডি উপাধির জন্য মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিতেছিলাম। আমার আলোচ্য বিষয় ছিল প্রাচীন রোমের লোকসাহিত্য, লৌকিক ধর্ম্ম ও শিল্পকলা। যাহাকে Cultural অথবা Psycho-Social Anthropology বলে আমার কার্য্য সেই বিভাগের অন্তর্গত ছিল বলা যাইতে পারে। হার্ভার্ডে পরীক্ষার পর আমি অক্সফোর্ডে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান বিদ্যাচর্চ্চার জন্য যাই। সেখানে য়্যান্থ্রপলজি বা নৃতত্ত্ব বিভাগে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করি। কর্ত্তারা বলিলেন শরীরতত্ত্ব না শিখিলে ডিপ্লোমা পাইব না। কাজেই (Anatomy) শরীরবিদ্যা ধরিলাম। অক্সফোর্ডে সামান্যমাত্র ল্যাবরেটরী ছিল। আজকাল হার্ভার্ডে শরীরতত্ত্ববিষয়ক নৃতত্ত্বের জন্য যতবড় ল্যাবরেটরী আছে অক্সফোর্ডে তাহার দশমাংশও ছিল না। কিন্তু সেখানে একজন পাকা অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কর্ম্ম করিয়া আমি Somatology বিদ্যার অনুরাগী হইয়াছি। অক্সফোর্ডে বেশী ছাত্র এদিকে ঘেঁসে না।"

হুটনের সঙ্গে নৃতত্ত্বসংগ্রহালয়ে দেখা করিলাম। ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার এই মিউজিয়াম দেখা হইয়াছে। আজ ল্যাবরেটরী ও লাইব্রেরী দেখাই উদ্দেশ্য। হুটন্ বলিলেন "Physical Anthropology সম্বন্ধে কোন সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তক এখন বেশী প্রণীত হয় নাই। জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্ম্মান অধ্যাপক রুডল্‌ফ মার্টিন একখানা সচিত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া সর্ব্বাংশে ব্যবহারযোগ্য গ্রন্থ আর নাই। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্‌ওয়ার্থের "Morphology and Anthropology" ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ। ইহাতে শরীরতত্ত্ব আমাদের বিজ্ঞানের উপযোগীরূপে আলোচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া Home University Library গ্রন্থমালায় লণ্ডনের প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধ্যাপক কীথ Human Body নামক ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। "মাথা মাপা" বিদ্যার অন্য কোন পুস্তক ত দেখি না। কিন্তু বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ প্রায়ই প্রকাশিত হয়।"

মাথা মাপার কারখানা দেখিতে অগ্রসর হইলাম। নানা প্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ যন্ত্রের ব্যবহার দেখিলাম। হুটন অস্থি মাপার কায়দা, মাথার খুলি মাপিবার কৌশল, শরীর মাপিবার প্রণালী দেখাইয়া দিলেন। কতকগুলি মাথার খুলি হইতে চীনা মাটির নকল (Cast) প্রস্তুত করা হইয়াছে। হুটন বলিলেন "যে-গুলি ইয়োরোপের বড় মিউজিয়ামের সম্পত্তি তাহাদের নকল এইরূপে পাইয়া থাকি।" আঙ্গুলের ছাপ লইবার কল, শারীরিক শক্তি মাপিবার ডাইনামোমেটার ইত্যাদি বহুপ্রকার যন্ত্র, দেখিলাম। গৃহগুলি সাধারণ চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের মিউ-জিয়াম স্বরূপ বোধ হইল। বেশীর ভাগ দেখা গেল কতকগুলি যন্ত্র ও হাতিয়ার।

একস্থানে প্রায় ৫০০ মড়ার মাথা সাজান দেখিতে পাইলাম। অধ্যাপক বলিলেন—"এইগুলি pre-historic বা প্রাগৈতিহাসিক। যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি প্রদেশের কোন অঞ্চলে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে এই সমুদয় পাওয়া গিয়াছে। এই মাথাগুলি কোন্ যুগের তাহা বলা কঠিন। একজন ছাত্র পি-এইচ-ডি উপাধির জন্য এইগুলি লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছে।" কতকগুলি হাড়ের টুকরা দেখাইয়া হুটন্ বলিলেন—"ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই সমুদয় ব্যবহার করি। চিকিৎসা-শিক্ষার্থী ছাত্রদেরও এইরূপ অস্থিজ্ঞান দেখাইতে হয়।"

ল্যাবরেটরীতে নানারংয়ের চুল সংগ্রহ করা হইয়াছে দেখিলাম। ইয়োরোপের মানচিত্রে Cephalic Index বুঝান হইয়াছে। কোন্ জনপদের নরনারীর মস্তকের আকৃতি লম্বা, কোন্ জনপদের নরনারীর মস্তক গোলাকার, ইহা চিত্রের সাহায্যে বুঝাইবার জন্য এই ম্যাপ অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ইয়োরোপীয় জাতিপুঞ্জের শারীরিক গঠন সহজেই জানিতে পারা যায়।

হুটন বলিলেন—"মাথা-মাপা-বিদ্যাটা নিতান্ত সহজ-ভাবে গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। একমাত্র উপর-উপর লম্বা-চৌড়ার অনুপাত জানিলেই মস্তকের যথার্থ আকৃতি বুঝা হয় না। অন্ততঃ তাহা দ্বারা নরনারীর জাতি-বিভাগ স্থির করা উচিত নয়। এতদিন পণ্ডিতেরা এইরূপ ভাসা-ভাসা অনুপাত বাহির করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে আরও গভীর ও বিস্তৃততর আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।" বুঝিলাম আজকাল সকল বিভাগেই intensive studyর গভীর গবেষণার যুগ চলিতেছে।

হুটন একটা নূতন কল দেখাইয়া বলিলেন—"এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে জার্ম্মানি হইতে ইহা আনাইয়াছি। কলটা অল্পদিন মাত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা মস্তকের আকৃতি সহজেই চিত্রিত করা যায়।" আর একটা কৌশল দেখিলাম। তাহার দ্বারা Cranial capacity মাথার খোলের আয়তন মাপা যায়। মাথার খুলির ভিতর কতখানি গর্ত্ত আছে ইহা জানিতে না পারিলে মস্তিষ্কের (Brain) পরিমাণ বুঝা যায় না। অথবা মস্তিষ্কের পরিমাণ না জানিলে কেবল মাথার খুলির আকৃতি দেখিয়া কি হইবে? কাজেই মস্তিষ্ক মাপিবার প্রয়োজন খুব বেশী। খুলির ভিতর সরিষা ভরা হয়; পরে সেই সরিষাগুলি একটা ভাণ্ডে ঢালা হয়। এইরূপ ভরা ও ঢালা যাহাতে নির্দ্দোষভাবে হইতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা আছে। ভাণ্ডে ঢালা হইলে সরিষার পরিমাণ জানা যায়। এই পরিমাণ হইতে খুলির গর্ত্তের Capacity—অর্থাৎ মস্তিষ্কের পরিমাণ বুঝা হয়।

একটা গৃহের ভিতর দেখিলাম বড় বড় কাঠের বাক্সে নানা প্রকার দ্রব্য মজুত করা রহিয়াছে। হুটন বলিলেন—"হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে একবার মিশরাভিযান অনুষ্ঠিত হয়। তাহার ফলে নানা দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। সেইগুলির মধ্যে যে-সমুদয় বস্তু নৃতত্ত্ব-সম্পর্কিত সেই-সমুদয় এইখানে রাখিয়াছি। নানাপ্রকার অস্থি, মাথার খুলি, মাটির ভাঁড় ইত্যাদি এই বাক্স-সমূহের ভিতর আছে। এইগুলি সাজাইতে গুছাইতে বহুকাল লাগিবে, খরচও কম হইবে না।"

ল্যাবরেটরী ও মিউজিয়াম করাইবার জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু গৃহের ভিতর আলমারী দিতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হইবে। এত টাকা সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা খরচ করিতে প্রস্তুত নন। কাজেই জিনিষপত্রগুলি গাদা করিয়া নানাস্থানে রাখা হইয়াছে।

প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরীতেই ফটোগ্রাফি-গৃহ থাকে। Somatology বিভাগেও দেখিলাম। একজন ছাত্র মিসৌরি-জনপদে আবিষ্কৃত অস্থি কঙ্কাল ইত্যাদি বস্তু-সমূহের তালিকা ও চিত্র প্রস্তুত করিতেছে।

সর্ব্বশেষে লাইব্রেরী দেখিলাম। বিদ্যালয়ের অন্তর্গত যতগুলি ল্যাবরেটরী, মিউজিয়াম, চিত্রভবন ইত্যাদি আছে প্রত্যেকের সংশ্লিষ্ট একটা করিয়া লাইব্রেরী আছে। ইহাতে অধ্যাপক ও ছাত্রের সুবিধা যৎপরোনাস্তি। কথায় কথায় ইহাদিগকে বড় লাইব্রেরীতে দৌড়িতে হয় না।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট গ্রন্থশালার জন্য নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছে। তাহাতে প্রত্যেক অধ্যাপকের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাঠগৃহ থাকিবে—এবং গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদিগের মৌলিক গবেষণার জন্য ৩০০।৪০০ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইবে।

হুটন বলিলেন—"আমাদের মিউজিয়ামে নৃতত্ত্ববিষয়ক প্রায় সকল গ্রন্থ ও পত্রিকাই আছে। অক্‌স্‌ফোর্ডে বড় অসুবিধা ভোগ করিতাম। এত সহজে কোন বই দেখিতে পাইতাম না। এখানে এক স্থানে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় রচনা রহিয়াছে। বেশী হয়রান হইয়া লাইব্রেরীর ক্যাটালগ হাতড়াইতে হইবে, না।"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মনের বিষ

নবম পরিচ্ছেদ।

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ত্রিবন্দরমে পৌছিলাম। সেখানেও এক বিপদ। তরণী তীরে লগ্ন হইতে না হইতেই কতকগুলি সশস্ত্র রাজ-প্রহরী আমাদের জাহাজে উপস্থিত হইল। তাহারা পূর্ব্বে হইতেই সন্ধান লইয়া আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রধান প্রহরী রুদ্রদামের নামের গেরেপ্তারী পরোয়ানা মাঝিকে দেখাইয়া বলিল, "আমরা সংবাদ পাইয়াছি রুদ্রদাম পুরী হইতে বরুণ মাঝির মধুকর জাহাজে ত্রিবন্দরম অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। আপনার জাহাজের নাম মধুকর, আপনার নামও বোধ হয় বরুণ মাঝি। আমাদের অনুমান সত্য নয় কি?"

প্রহরীর বাক্যে আমি মাঝির বিপদের আশঙ্কায় চিন্তিত রহিলাম। মাঝি একটুকুও বিচলিত বা ভীত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সে হাসিয়া উত্তর করিল "মহাশয় যাহা বলিলেন সত্য। আমার জাহাজের নাম কি তাহা গুপ্ত নাই—উহার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে; আমার নামও বরুণই বটে ইহার একবিন্দুও মিথ্যা নহে; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আপনার সংবাদদাতার কল্পিত কাহিনীর অপরাংশের সত্যতা সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করিতে হইলে নিজকে মিথ্যাবাদী করিতে হয়। জাহাজ ও তাহার মাঝির নাম কোন প্রকারে জানিতে পারিলেই কি এমন একটা মিথ্যা বর্ণনা দাখিল করিয়া বাহাদুরী লইতে হয়? তিনি বলিতেছেন আমি আসিতেছি পুরী হইতে। বন্দরের ছাড়-পত্র ও মালামালের হুণ্ডি হইতে সহজেই বুঝিতে পারিবেন আমি আসিতেছি তাম্রলিপ্তি হইতে। রুদ্রদামের নামের সহিত আমি পরিচিত তাহাও ঠিক—দস্যু-সর্দ্দারের নাম কে না জানে? কিন্তু তাহার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ও সাহস আমার হয় নাই। হইলে কি করিতাম বলিতে পারি না। একে সমুদ্রে সমুদ্রে প্রাণটা হাতে করিয়া বেড়াই; রুদ্রদামের সঙ্গে দেখা হইলে হয়ত এতদিন জাহাজ চালাইতে হইত না। চোর ডাকাতের স্বভাব সকলেই জানে। কার কাঁধে দুইটা মাথা যে দস্যুর সঙ্গে বন্ধুতা করিবে? যাহার নাম শুনিয়া প্রাণ কাঁপে

তাহার আবার সাহায্য করিব? বিশ্বাস না হয়, মহাশয়, খানা-তল্লাসী করুন। রুদ্রদাম ত আর মশক নয়, দৈত্যের সহোদর। তাহাকে লুকাইয়া রাখা অসম্ভব।"

মাঝির বাক্যে হাবভাবে প্রহরীদল দমিয়া গেল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে জাহাজখানি তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিল। বাক্যবাগীশ বরুণ মাঝি সময়োচিত হাস্য কৌতুকে গম্ভীর প্রহরীদিগকেও হাসাইতেছিল। প্রধান প্রহরী বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিবার কালে বলিল "মাঝি, আপনি খুব খেলোয়াড় বটেন; অমন একটা পুরা পাঁচ হাত জোয়ানকে একদম গুম করিয়া ফেলিলেন। আসল কথাটা বলুন না। রাস্তায় কোথায় তাহাকে নামাইয়া দিয়া আসিলেন? বলুন, আমরাও রক্ষা পাই, আপনারও দুই দশ হাজার টাকা আসিয়া যাক। শুনেন নাই কি রুদ্রদামের গেরেপ্তারের জন্য লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে।"

মাঝি বলিল "সে অদৃষ্ট যদি থাকিবেই মহাশয়, তবে কি আর সমুদ্রে ঘুরিয়া মরি। আপনাদের সংবাদদাতার উক্তির সঙ্গে নাম দুইটা মিলিল যদি, আসল জিনিষেরই অভাব। অদৃষ্ট, অদৃষ্ট, সকলই অদৃষ্ট!"

প্রহরী হাসিয়া বলিল "চমৎকার লোক দেখিতেছি আপ্‌নি। কিছুতেই আপনাকে পারিয়া উঠিবার উপায় নাই। বলি, পুরস্কারের টাকা অপেক্ষা কি রুদ্রদামের উপহারের মূল্য এত বেশী? লোক-সমাজের উপকারের দিক হইতেও ত রুদ্রদামের সন্ধান বলা উচিত।"

"উচিত যে তাহা বালকেও বুঝে। প্রাণের চেয়ে কিছুই বেশী নয়। দস্যুদের সেই প্রাণ লইয়া খেলা। কিন্তু শুধু ইচ্ছা থাকিলেই কাজ হয় কি? দস্যুকে ধরাইয়া দিলেই পুরস্কার, কত লোকের উপকার, বুঝি সব, পারি কৈ? মিথ্যা বলিয়া লাভ কি বলুন? রুদ্রদাম আমার জাহাজের আরোহী ছিল, একথা বলিলেই কি আপনি গিলিয়া খাইবেন? কত লোক জানা অজানা, জাহাজে যাত্রী হইতেছে, আমাদের ব্যবসাই ঐ। মিথ্যা বলিয়া দরকার?"

মাঝি এমন দৃঢ়তার সহিত কথাগুলি বলিল যে, কাহারও তাহা অবিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি থাকিল না। মানুষ অনেক সময়ই এইরূপ বহুরূপীর বেশ দেখিয়া প্রতারিত হয়। প্রহরী তাহার শেষ চেষ্টা না করিয়া ছাড়িল না। জাহাজের নাবিকগণকে একে একে ডাকিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিল। নাবিকগণও মাঝি অপেক্ষা কম নয়। প্রহরী বিফলমনোরথ হইয়া জাহাজ পরিত্যাগ করিল। আমার সৌভাগ্য—আমার পরিচ্ছদ। প্রহরীরা আমাকে প্রবালসংগ্রহকারী মনে না করিলে, নাবিক-জীবনে আমার যে অভিজ্ঞতা, তাহাতে আমাকে অধিক প্রশ্ন করিলে কি হইত কে জানে।

প্রহরীদল দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে মাঝি ক্রীড়াভূমে বালকের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সেই ঘটনায় তাহার স্ফূর্ত্তি যেন বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে আমার নিকটে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "দেখিলেন বেটাদের বুদ্ধি! ওদের বিশ্বাস ভাল লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই অমনি সুবোধ ছেলেটির মত একজনের কথা বলিয়া দিবে আর কি! আরে বাপু, রুদ্রদামের সন্ধান যে জানে সে যে রুদ্রদামের লোক। রুদ্রদামের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সহজ কথা নয়—সে কাঁচ ছেলে নয়। আগে লোকের নাড়ী-নক্ষত্র ভাল করিয়া বুঝে তবে সে আত্মপরিচয় দেয়। তাহার সংবাদ যদি অত সহজে মিলিত, তবে আর দেশে দেশে তাহাকে ধরিবার জন্য এত ফন্দী ফিকির চলিত না। বক্তৃতা করিয়া আমার মন গলাইবি সে কর্ম্ম তোদের নয়। সামান্য নাবিকের কথায় খেই পাস না—তোরা আবার ধরবি রুদ্রদামকে।"

আমি বলিলাম, "সাবাস তোমার স্নায়ুর জোর। এমন জীবন্ত সত্যটা অমন স্থির ধীর ভাবে গোপন করিবার শক্তি অনেকেরই নাই। তোমার তখনকার হাবভাব দেখিয়া কে বলিবে তুমি রুদ্রদামের নামটি পর্য্যন্ত শুনিয়াছ। তাহাদের কথা শুনিয়া তুমি যেন আকাশ হইতে পড়িলে। যা হোক জাহাজ ছাড়িয়া রঙ্গালয়ে যোগ দিলে তোমার নাম দেশবিখ্যাত হইত। আমার ত তোমার জন্য ভয়ই হইয়াছিল।"

মাঝি হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "ভয় আমারও হওয়া উচিত ছিল বৈকি; নইলে যে সমস্তই অস্বাভাবিক হয়। গেরেপ্তারী পরোয়ানা ছিল রুদ্রদামের নামে ভয়

হইবে আমার? ভাল আপনার কথা। রুদ্রদাম আজ জাহাজে থাকিলেও দমিতাম কি না সন্দেহ। ফাঁকা আওয়াজে ভয়টা কি? বলিতে পারেন যে দেশের শত্রু, পরস্ব অপহারক, তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া পাপ; কিন্তু বলুন ত বিশ্বাসঘাতকতা তাহা হইতে কি গুরুতর পাপ নয়? রুদ্রদাম যে আমাকে বিশ্বাস করিয়াছে। আপনি হইলে, এমন অবস্থায় কি করিতেন?"

আমি অন্তরের সহিত তাহার মত অনুমোদন করিলাম। বলিলাম, "আমি কি করিতাম? ঠিক তুমি যাহা করিয়াছ তাহাই। বিশ্বাসহন্তার নরকেও স্থান নাই। আজকাল এই পাপেই সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে।"

মাঝি উৎসাহিত হইয়া বলিল, "আঃ হুজুর, এ আপনারই উপযুক্ত কথা। বড়ই দুঃখ হইতেছে আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির সহিত দুই দিন বৈ কাটাইতে পারিলাম না।"

আমি বলিলাম, "মাঝি, তোমার উপকার ভুলিতে পারিব না। আবশ্যক হইলে স্মরণ করিও; আমাকে বন্ধু বলিয়া মনে করিও।"

মাঝি ঔৎসুক্যের সহিত বলিল, "তা ত বুঝিলাম, মহাশয়ের নামটা জানিবার ভাগ্য এখনও হইল না; স্মরণ করিবার ইচ্ছা হইলেই বা কি করিয়া তাহা পূর্ণ করিব?"

পূর্ব্বেই আমি সে প্রশ্নের উত্তর স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। বলিলাম, "শ্রেষ্ঠী শেষাদ্রি ওড্রকে স্মরণ করিও। আমি কয়েক দিন পরেই তাম্রলিপ্তিতে ফিরিব। তোমার দরকার হইলে, সেখানেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে।"

মাঝি তাহার মস্তক হইতে উষ্ণীষ তুলিয়া বিনীত ভাবে আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আমার অনুমান কি মিথ্যা হয় হুজুর? ও হাত কখনই প্রবালসংগ্রহকারী নাবিকের হইতে পারে না। ভদ্রলোকে আত্মগোপন করিতে চাহিলে কি হয়, চেহারাতেই তাঁহারা ধরা পড়েন। হুজুরের আমি হুকুমের চাকর; তাঁবেদার সর্ব্বদা হুকুমের জন্য প্রস্তুত।"

আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "বন্ধু! তোমার যত্নের জন্য শত ধন্যবাদ। আমাকে তুমি প্রবালসংগ্রহকারী বলিয়াই মনে করিও। আমিও তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিব।"

মাঝির বদনমণ্ডল উৎফুল্ল হইল। সে বারবার আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। আমি তাহাকে অর্থে ও বাক্যে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ত্রিবন্দরমের ভূমিতে প্রথম পদ স্পর্শেই মনের অবস্থা অন্য প্রকার হইয়া গেল। মনে হইতেছিল, সংসারে সত্যই বা কি, মিথ্যাই বা কি! যে জীবনকে একদিন সত্য বলিয়া জানিয়াছিলাম, তাহা এখন কি? সম্পূর্ণ মিথ্যা! তাহার সকলই স্বপ্ন,—সকলই অলীক! সে গৃহ কি আর আমার? স্ত্রী, বন্ধু,—তাহাদের সহিত কি প্রকৃতই সেই সম্বন্ধ? ভ্রম করিয়া ভাবিতাম, তাহারা আমার নিতান্ত আপনার; জীবন-মরণের সঙ্গী। আজ যথার্থ সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সে সত্য কি বিষম! তাহার বিষময় ফলে আমি মহাশ্রেষ্ঠী হেমরাজ মিথ্যা শ্রেষ্ঠী শেষাদ্রি ওড্র নামে অভিহিত। আমি এই মিথ্যার দ্বারাই সভ্য সমাজের সত্য-বেশী মিথ্যার কণ্টক উদ্ঘাটিত করিব। সভ্যতার মেকি সত্য রসাতলে যাউক, আমার মিথ্যা-জীবনের সফলতা দাও বিধাতা!

ত্রিবন্দরমে পৌঁছিয়া আমার প্রথম কার্য্য, আমার প্রবালসংগ্রহকারীর মিথ্যা বেশ পরিবর্ত্তন ও সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা শ্রেষ্ঠী শেষাদ্রি ওড্রের রূপ ধারণ। তাহার ব্যবস্থা করিলাম। অর্থ থাকিলে কোন কার্য্যেই বিঘ্ন হয় না। তথাকার প্রধান পোষাকবিক্রেতা অতি সহজেই মানিয়া লইল, আমি শ্রেষ্ঠী শেষাদ্রি, সখ করিয়া আমোদের উদ্দেশ্যে প্রবালসংগ্রহকারীর পোষাক পরিধান করিয়াছি। কয়েক প্রস্থ মূল্যবান পোষাক বিক্রয় করিয়া সে কৃতার্থ হইল; ভবিষ্যতের আশায়, স্তব স্তুতি করিতেও বিস্মৃত হইল না। অর্থের লালসায় আমাকে সন্দেহ করিবারও তাহার অবসর ছিল না। পদের উপযুক্ত সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নগরের সর্ব্বপ্রধান পান্থনিবাসের উত্তম অংশ কয়েক সপ্তাহের জন্য ভাড়া লইলাম। পরদিন এক শ্রেষ্ঠীর গদিতে ধনরত্ন গচ্ছিত রাখিলাম; কুঠীওয়ালা আমার ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। আরও বিবিধ উপায়ে, নিজে অলক্ষ্যে থাকিয়াও নাম বেশ জাঁকাইয়া তুলিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই ত্রিবন্দরমের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। আড্ডায় আড্ডায় আমার

ধনের পরিমাণ লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা চলিল। কাহার মতে আমি দ্বিতীয় কুবের। কেহবা রেহাই দিয়া বলিল "যত রটে তত নয় হে!"

আমার সম্মান দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসল কার্য্যে মন দিলাম। বৃথা কাল হরণ করিবার অবসর নাই; আমাকে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতে হইবে। বাক্যে, ব্যবহারে, গতিবিধি আদব কায়দায় শ্রেষ্ঠী হেমরাজের সামান্য সাদৃশ্যও যেন আমাতে বর্ত্তমান না থাকে। পূর্ব্বে আমি গোঁফ দাড়ি রাখিতাম না, এখন যাহাতে তাহার আধিক্য হয়, সে বিষয়ে মনোযোগী হইলাম। অভিনেতার ন্যায় রীতিমত অভিনয় অভ্যাস করিতে লাগিলাম। গলার স্বর গম্ভীর করিয়া ধীরে ধীরে ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলিতে অভ্যাস করিতে লাগিলাম। স্ফূর্ত্তিময় চঞ্চল হেমরাজকে গম্ভীর ধীরগতি শেষাদ্রি ওড়ে পরিণত করিতে প্রতি মুহূর্ত্তে চেষ্টা চলিল। কয়েক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই একদিন চাকরদের গোপনীয় কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, আমার চেষ্টা সফল হইতেছে। তাহাদের একজন বলিতেছিল, "লোকটার কি রাশ ভার; মুখখানা যেন বাঘের মত—জীবনে কখন বুঝি হাসে নাই।"

মনে মনে হাসিলাম, ভাবিলাম, এই আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ। আমি বাঘই বটে, বাঘের মত শিকারে সিদ্ধ, অমনি হিংস্রক আমি যেন হইতে পারি। দিনরাত আমার সেই চেষ্টা। কোথায় দিয়া একটা মাস কাটিয়া গেল, বুঝিতে পারিলাম না। কেবল মনে হইত, এখনও বুঝি আমি উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযুক্ত হইতে পারি নাই। প্রতিহিংসার তীব্র অনল আমার হৃদয় মন দগ্ধ করিয়া অহোরাত্র জলিতেছে। সে অসহনীয় জ্বালায় অন্য চিন্তা কি মনে আসে? আমার কেবলই মনে হয়, কবে পিশাচীর শোণিত-তর্পণে হৃদয়জ্বালা নির্ব্বাপিত করিব।

বিধাতা অনুকূল। একদিন রুদ্রদামের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভিত হইলাম। সে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার সেই দুর্বৃত্ত সঙ্গী, সুযোগ লাভ করিয়া জয়াবলীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তেজস্বিনী রমণী তাহাকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া নিজেও আপনার অস্ত্র স্বহস্তে আপন বক্ষে বিদ্ধ করে, তাহাতেই সতীর প্রাণবিয়োগ হয়। রুদ্রদাম তখন উপস্থিত ছিল না। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রণয়িনীর শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া সে প্রতিহিংসাতে উন্মত্তপ্রায় হয়। সতীর অপমানকারী নারকী অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় অদূরে পড়িয়াছিল। রুদ্রদামের হস্তে কি তাহার আর রক্ষা আছে। শত্রুকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াও দস্যু-সর্দ্দার প্রিয়তমার শোক বিস্মৃত হইতে পারিল না। জয়াবলীর বক্ষবিদ্ধ ছুরিকা তুলিয়া লইয়া নিজ বক্ষে আমূল প্রোথিত করিয়া দিল। রুদ্রদাম মরে নাই, স্বর্গে গিয়াছে; সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে। ধন্য জয়াবলী! ধন্য তোমাদের প্রেম! সাধে তুমি দুর্দ্দান্ত দস্যু রুদ্রদামকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাস নাই। সে সতীরই পতি হইবার উপযুক্ত। প্রেমের নিকট তাহার প্রাণের মায়া তুচ্ছ! তাহার সাহস সর্ব্বক্ষেত্রে। হউক দস্যু, পরস্ব অপহারক, আমি তাহাকে প্রণাম করি। সে ধন্য, তুমি ধন্য, যে দেশে একটিও এমন সতী জন্মগ্রহণ করে সে দেশ ধন্য। আমি তোমার স্বদেশবাসী, তোমার পুণ্যে আত্ম-শ্লাঘা অনুভব করিতেছি। তাম্রলিপ্তি যে বৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া নরকে পরিণত, তোমার সেই বৃত্তির উৎকর্ষে তাম্রলিপ্তি আজ স্বর্গ! পাষাণহৃদয় দস্যুর পত্নী তুমি? অন্যে বলে বলুক আমি বলি তুমি পাষাণ-হৃদয়ে মন্দাকিনী, তোমার অমৃত-প্রস্রবণে রুদ্রদাম অবগাহন করিয়া অমর, মনুষ্য-সমাজ গৌরবান্বিত। বংশ-গৌরবে সভ্য আমরা! হা অদৃষ্ট! সূর্য্যালোক কি স্থানাস্থান দেখিয়া উহা আলোকিত করে? যাহা উন্মুক্ত, আচ্ছাদনহীন সেই স্থানেই আলোকের গতি। প্রকৃত প্রেম সূর্য্যরশ্মি হইতেও বিমল, আরও উজ্জ্বল, মহিমায় মহান; বংশে, আভিজাত্যে সীমাবদ্ধ নয়। পতিতা নীলা, সভ্যতা-অভিমানিনী,—দস্যু-প্রণয়িনী জয়াবলীর পদরেণুর সমকক্ষ হইবার যোগ্য কি? নীলা শয়তানী, জয়াবলী দেবী! নীলা পত্নী, তাহার জন্য আমার সহানুভূতি কোথায়? আর জয়াবলী, হেয় দস্যুর প্রণয়িনী, তাহার জন্য অশ্রু বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রেমই পুণ্য! এখন বুঝিলাম, রুদ্রদাম কেন তড়াগ হইতে সলিল উৎসারিত করিয়া তৃষিত ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে সিঞ্চন করিত। প্রেম সীমাবদ্ধ হইতে জানে না। অধম আমি, তোমার পন্থা গ্রহণ

করিতে পারি নাই। তোমার ধন তোমার ভাবেই ব্যয় করিব। তাহা দরিদ্রের জন্য, প্রেমের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। প্রেমিকের অর্থে প্রেমের প্রত্যবায়কারীর মহাশাস্তির বিধান করিব—এই আমার প্রাণপণ চেষ্টা, প্রতিজ্ঞা!

অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, রুদ্রদামের দলের কতিপয় দস্যু ধৃত হইয়াছে। অধিকাংশই ছত্রভঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছে। নিশ্চিন্ত হইলাম। অর্থের অভাবে আমাকে আর প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে হইবে না। ইহাও বিধাতার আশীর্ব্বাদ—পাপীর শাস্তি বিধানের ইঙ্গিত নহে কি?

দশম পরিচ্ছেদ।

আবার তাম্রলিপ্তিতে ফিরিয়া আসিলাম। আসিলাম সত্য, কিন্তু যাহাতে জন্মভূমির আকর্ষণ তাহা আর ফিরিয়া পাইলাম না। আমার পূর্ব্ব-জীবনের সহিত সে-সমস্ত বহুপূর্ব্বে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। অর্থ বিত্ত অতি তুচ্ছ। তাম্রলিপ্তিতে যাহা হারাইয়াছি, তাহার তুলনায় তাহা অতি হেয়, অসার। আজ যদি পথের ভিখারী হইয়াও আমার হৃদয়ের আনন্দ, চির সাধনার ধন অবিকৃত থাকিত, তাহা হইলে আর ক্ষোভের কারণ ছিল কি? মনুষ্যের নিজের নাম,—সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু; তাহা চির-স্মরণীয় করিতে লোকে কি না করিতেছে? আমি তাহা হইতেই বঞ্চিত। আমি আর মহাশ্রেষ্ঠী হেমরাজ নহি, এখন আমি শ্রেষ্ঠী শেষাদ্রি ওড্র নামে অভিহিত! যুবক নহি, বৃদ্ধ! দেহ প্রাণ নাম হইতে মনুষ্যের যাহা প্রিয়তম, সেই আত্মীয় স্বজন, যাহাদের মৃত্যুতে লোকে হাহাকার করে, আমার সেই প্রিয় পরিজন জীবিত থাকিতেও আমি তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাহারা আমাকে বিস্মৃত! তাম্রলিপ্তিতে আমার আছে কি? তাম্রলিপ্তিতে কেন, সমস্ত জগতেও আমার বলিতে কিছু নাই! আমি আর ইহ জগতের নহি, দেহী হইয়াও পরপারের প্রাণী! প্রকৃতই আমি হেমরাজের প্রেত! আমার বৃত্তি পৈশাচিক, হৃদয়ে প্রতিহিংসা! তাহার চেষ্টাতেই দেশত্যাগী হইয়াছিলাম; তাহার সাফল্যের জন্যই এই নিদারুণ স্মৃতিময় তাম্রলিপ্তি-শ্মশানে ফিরিয়া আসিয়াছি। তাম্রলিপ্তিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই তাহার ব্যবস্থা করিলাম। যে অর্থ বিত্ত আমাকে সকল বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, সেই কণ্টকে কণ্টক উদ্ধার করিতে জাল পাতিলাম। যাহাতে এখানে ধনী শ্রেষ্ঠীরূপে পরিচিত হইতে পারি, তাহার উদ্যোগে ত্রুটী করিলাম না। রাজ-প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, লোক জন গাড়ী ঘোড়া সংগ্রহ করিলাম। আমার আগমনবার্ত্তা মহা আড়ম্বরের সহিত ঘোষণা করিলাম। তাম্রলিপ্তি আমার অস্তিত্ব পূর্ণভাবে অনুভব করিল; আমার ঐশ্বর্য্য সম্মান তাহাদের গল্পের বিষয়ীভূত হইল।

তাম্রলিপ্তিতে তখন মহামারীর অবসান হইয়াছে। শান্তি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। আমোদ প্রমোদ ব্যবসা বাণিজ্য পূর্ব্ববৎ চলিয়াছে। তাম্রলিপ্তির তখন নব যৌবন, সমস্তই তাহার আনন্দময়। আমি শ্রেষ্ঠী শেষাদ্রি আমার উদ্দেশ্য সাধনার্থ সে আনন্দে যোগ দিয়াছি, বংশ-গৌরবে স্ফীত আমার পরিচিত অনেক পুরুষ-পুঙ্গবের সহিত নব ভাবে আবার পরিচিত হইয়াছি। আমি হেমরাজ থাকিতে যে সান্ধ্য মজলিসটি আমার প্রিয় ছিল, তথায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছি। গোবিন্দেরও সেটি প্রিয় স্থান। প্রথম দিনেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ। হেয়তম প্রবঞ্চক মহাসুখে বিলাসীদলের সহিত যোগ দিয়াছিল। মজলিসের প্রধান আমোদ গল্প; ভাঙ, মদ্য ইত্যাদি তাহার আনুসঙ্গিক। আগন্তুকগণ পৃথক পৃথক ভাবে মনোমত সঙ্গী সহ গল্প গুজব করিতেছিল। গোবিন্দ একা এক পার্শ্বে শোকবেশে উপবিষ্ট। ভণ্ড আমার শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়া প্রকারান্তরে বন্ধুত্বের অবমাননা করিতেছে। তাহার পার্শ্বে সুবর্ণনির্ম্মিত নস্যদানী, হস্তে অতি উজ্জ্বল হীরক অঙ্গুরী; দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম সে দুইটি আমারই নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু ছিল। পীড়ায় যখন অজ্ঞান হই, তখনও তাহারা আমার সঙ্গে;—মহাত্মা কৃপাশরণ বোধ হয় আমাকে সমাধিগ্রস্ত করিবার কালে, এগুলি গ্রহণ করিয়া আমার স্ত্রীকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহা এখন প্রণয়-উপহার, আমার অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর দত্ত অবৈধ দান।

নিজকে সামলাইয়া লইয়া, গোবিন্দের পার্শ্বস্থ তাকিয়া

অধিকার করিলাম। বেশ বুঝিলাম—সে আমার আগমন লক্ষ্য করিল। সে দিকে আমি ভ্রূক্ষেপও করিলাম না। অতি গম্ভীর ভাবে, আমার যত্ন-অর্জ্জিত ধীর গম্ভীর স্বরে মজলিসের ভৃত্যকে এক পেয়ালা সরবৎ আনিতে আদেশ করিলাম। বিনীত ভৃত্য নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল; অনতিবিলম্বে এক পেয়ালা সরবৎ লইয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তাম্রলিপ্তিতে বোধ হয় তুমি অনেক দিন আছ ?"

"হাঁ মহাশয়, আমার এই সহরেই জন্ম—এখানেই আছি।"

"বেশ, তুমি তাহা হইলে এখানকার অনেক সংবাদই জান; জানাশুনাও বোধ হয় অনেকের সঙ্গে আছে ?"

"এতটুকু সহর—অজানা আর কে আছে ?"

"আচ্ছা, তাহা হইলে তুমি বোধ হয় মহাশ্রেষ্ঠী হেমরাজকে জান। আমি বহুদিন এদেশ ছাড়া; রাস্তাপথ সমস্তই নূতন হইয়া গিয়াছে, আমি ঠিক ঠাওরাইয়া উঠিতে পারিতেছি না কোথায় তাহাদের বাড়ীটা ছিল, তাহার ঠিকানাটা আমাকে বলিয়া দিতে পার কি ?"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া গোবিন্দর কি ভাব হয় দেখিবার জন্য তাহার দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। গোবিন্দ বিচলিত হইয়াছে; আমাদের কথাবার্ত্তা মনোযোগের সহিত শুনিতেছে। ভৃত্য বলিল "হায়! শ্রেষ্ঠী যে জীবিত নাই। তিনি জীবিত থাকিলে এই স্থানেই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতেম; তিনি আমাদের মজলিসের প্রধান সহায় ছিলেন। এমন অমায়িক লোক আর কি হয়।"

আমি সেই অপ্রত্যাশিত সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম যেন এইরূপ ভান করিয়া বলিলাম, "অঁা—শ্রেষ্ঠী হেমরাজ মারা গিয়াছেন! এত অল্প বয়সে? তুমি বোধ হয় তাঁহার পিতার কথা বলিতেছ।"

ভৃত্য বলিল, "যুবা বৃদ্ধ, ধনী নির্ধন, মহামারীর নিকট নাই, মহাশয়। মারীতে তাম্রলিপ্তি ছারখার হইয়াছে। দুই মাস পূর্ব্বে এখানে আসিলে দেখিতেন এটি নগর নয়, মহা-শ্মশান। মহামারীতে শ্রেষ্ঠী হেমরাজের মৃত্যু হইয়াছে।"

আমি দুঃখব্যঞ্জক স্বরে বলিলাম, "কি পরিতাপ! অন্নের জন্য আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। হেমরাজের পিতা আমার অতি প্রিয় বন্ধু ছিলেন। আমি যখন তাম্রলিপ্তি পরিত্যাগ করি, হেম তখন অতি শিশু। বড় আশা করিয়াছিলাম, বন্ধুপুত্রকে দেখিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিব। তাহা ছাড়া হেমের সঙ্গে আমার কাজও ছিল। কে জানিত, সে এই বয়সেই ইহধাম ত্যাগ করিবে! বলিতে পার কি তাহার আর কে আছে। সে বিবাহ করিয়াছিল কি ?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "হাঁ, মহাশয়, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠিনীকে আর বাহিরে দেখা যায় না। শুনিয়াছি, শ্রেষ্ঠীপ্রাসাদে অতিথি অভ্যাগতের যাতায়াত একবারে বন্ধ। হইবে না—অমন স্বামী হারাইয়া কে ঠিক থাকিতে পারে। মহাশ্রেষ্ঠীর মেয়েটিও নাকি একবারে কেমন হইয়া গিয়াছে। শিশু হোক, পিতার অদর্শন বুঝিবার ক্ষমতা হইয়াছে ত।"

তাম্রলিপ্তিতে ফিরিয়া যাহার সংবাদের জন্য প্রাণ আকুল হইয়াছিল, সেই প্রিয়তমা কন্যা চম্পার দুঃখ-মালিন্যের সংবাদ পাইয়া মনটা দমিয়া গেল। ভৃত্যের কথার উত্তর দিতে পারিলাম না।

গোবিন্দ আর স্থির থাকিতে পারিল না। আমার প্রতি বাক্যে তাহার ঔৎসুক্য জাগ্রত করিতেছিল। সে আমার দিকে ঝুঁকিয়া অভিবাদন করিয়া বিনীত ভাবে বলিল, "মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। আমি স্বর্গীয় মহাশ্রেষ্ঠী হেমরাজকে বিশেষরূপে জানিতাম। যদি তাহার সম্বন্ধে আপনার কিছু জানিবার থাকে, আমার চেয়ে অন্যে বেশী বলিতে পারিবে না।"

আমি প্রতিনমস্কার করিয়া গম্ভীর বিকৃত কণ্ঠে বলিলাম, "মহাশয়ের অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। আপনি স্বর্গীয় মহাশ্রেষ্ঠীর আত্মীয়ের সহিত আমার সংবাদ আদান প্রদান করিলে, আমি শুধু উপকৃত হইব না, কৃতজ্ঞ হইব। বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠী হেমের পিতা আমার সহোদরের অধিক ছিলেন। জীবনে কাহারও সহিত এমন মনের মিল হইয়া যায় যে তাঁহাদের পরম আত্মীয়ের অধিক মনে হয়। বিদেশেও শ্রেষ্ঠীকে ভুলিতে পারি নাই; তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ আমাকে অধীর করিয়াছিল। তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া বন্ধুর শোক ভুলিব ভাবিয়াছিলাম, তাহাও অদৃষ্টে ঘটিল না।

গোবিন্দ বলিল "মানুষের জীবন।"

আমি মস্তক সঞ্চালন করিয়া তাহার মন্তব্যে সম্মতি দিলাম। বলিলাম, "স্বার্থের খাতিরে, মহাশয়ের নিকট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আত্মপরিচয় দিতে হইতেছে। দোষ লইবেন না।"

আমি আমার নাম বলিলাম। সে আমার নাম শুনিয়াই বলিয়া উঠিল—"আমি আজ ধন্য। এরূপভাবে, এত সহজে আপনার সহিত পরিচয় হইবে স্বপ্নেও তাহা ভাবি নাই। লোকমুখে যাঁহার আগমনের সংবাদ নিত্য নানা ভাবে শুনিতেছি, যাঁহার আগমনে তাম্রলিপ্তির অধিবাসী সকলেই আনন্দিত;—তাঁহারই অনুগ্রহ আমি লাভ করিলাম, ইহা আমার কম সৌভাগ্যের কথা নহে।"

আমি তাহার বাক্যে উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাস্তে বিনয় প্রকাশ করিলাম। গোবিন্দ হস্ত প্রসারিত করিল। হা ঈশ্বর! আমি গোবিন্দর হস্ত কোন্ প্রাণে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিব। আত্মসম্বরণ করিয়া তাহার হস্ত গ্রহণ করিলাম। সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল। গোবিন্দর প্রাণ তখন আনন্দোচ্ছ্বাসময়, সে তাহা লক্ষ্য করিল না। হাসিতে হাসিতে সবিনয়ে বলিল, "আমার নাম আপনাকে বলিবার অনুমতি পাইতে পারি কি? এ দীনের নাম গোবিন্দ, অতি নগণ্য চিত্র-শিল্পী। মহাশয়ের আদেশের ভৃত্য, আপনার সামান্ত কার্য্যে আসিতে পারিলেও নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।"

আমি নমস্কার করিয়া তাহার নাম ধাম লিখিয়া লইলাম। গোবিন্দ পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিল, "নস্য ইচ্ছা করেন কি? কিছু মনে করিবেন না; এ নস্য আপনার অনুপযুক্ত হইবে না।"

গোবিন্দ আমারই নস্যদানীটি আমার সম্মুখে স্থাপন করিল। তাহাতে মহাশ্রেষ্ঠী-বংশ-সজ্জা ও আমার নামের আদ্য অক্ষর অঙ্কিত। আমারই প্রিয় নস্যে পূর্ণ! আমি নস্যদানীটি অন্যমনস্কভাবে গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "চমৎকার ত! কোন্ পুরাতন বংশ-চিহ্নে চিহ্নিত। এটি কি আপনার পৈতৃক?" গোবিন্দ তাড়াতাড়ি বলিল, "না না। বলিয়াছি আমি সামান্ত চিত্র-শিল্পী। বন্ধু হেমরাজের এটি ছিল, এটি তাঁহার বড় সখের বস্তু। মারীতে যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখনও এটি তাঁহার নিকটে ছিল। যে ভিক্ষু তাঁহাকে সমাহিত করিয়াছিলেন, তিনি এটা হেমরাজের স্ত্রীকে দিয়া যান। শ্রেষ্ঠিনী আবার আমাকে বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এইটি আর এই হীরক আংটিটি দান করিয়াছেন।"

একটিপ নস্য লইয়া নস্যদানীটা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, "উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত উপহার বটে। বোধ হয় মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠিনী হেমরাজের যোগ্যা ছিলেন?"

গোবিন্দ হাই তুলিয়া বলিল, "মহাশয়কে বলিয়াছি, হেমরাজ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে বা তাঁহার বিষয় জানিবার আমার যেমন সুযোগ ছিল, অন্য কাহারও তাহা ছিল না। তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর কথা,—আপনি যদি যুবক হইতেন আপনার নিকট বলিতাম কি না সন্দেহ, কিন্তু আপনার শুভ্র কেশ আমার সকল সন্দেহ দূর করিয়া দিয়াছে। আপনি তাঁহাদের সম্বন্ধে যে কল্পনা করিয়াছেন, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল ঠিক তাহার বিপরীত। হইবারই কথা। শ্রেষ্ঠিনী নীলা অদ্বিতীয় সুন্দরী, বসন্তের পূর্ণ বিকশিত ফুল্ল কুসুমটির মত। সত্য বলিতে কি, তাঁহার তুলনায় হেমরাজ ছিলেন ভূত। লোকটা আপনার ভাবে আপনি মত্ত থাকত। অমন লোকের পক্ষে সৌন্দর্য্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা কি সম্ভব? সে না জানিত রসিকতা, না করিত রমণীর আদর, না বুঝিত মান অভিমান। সংসারটা ছিল তার ভাসা-ভাসা। স্ত্রী কি স্বামীর সেরূপ ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? নীলার ন্যায় রূপসী, সমাজের যুবকগণের প্রশংসা-আকর্ষণের কেন্দ্র, আদব-কায়দা চাল-চলনে আদর্শ যিনি, তিনি উদাসীন হেমরাজকে চিরদিন পছন্দ করিবেন, আশা করাই অন্যায়। কেবল অর্থে মানুষকে কত দিন তৃপ্তি দান করিতে পারে?"

গোবিন্দর প্রত্যেক বাক্য, সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার মত আমার হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হইতেছিল। অন্য সময় হইলে কি করিতাম বলিতে পারি না। লক্ষ্যকে ধ্রুব রাখিয়া সকলই সহ্য করিলাম। বলিলাম, "আমি তাহাকে শিশু দেখিয়াছি। তখন তাহাকে আমার বড় ভাল লাগিত। তাহার পিতার সহিত অনেক দিন কথা হইত, ছেলেটা বাঁচিয়া থাকিলে

মানুষ হইবে। পরে, তাহার পিতার পত্রে, যাহা শুনিতাম তাহাতেও হতাশ হই নাই। স্বভাবে, বিদ্যায়, দয়া দাক্ষিণ্যে, বন্ধুবান্ধব-বাৎসল্যে সে নাকি মানুষের মত হইতেছিল। তাহার পিতার মৃত্যুর পর তাহার সম্বন্ধে অন্ধকারে ছিলাম। জানি না বয়সে মানুষকে কেমন বদলাইয়া দেয়। আমার বিশ্বাস ছিল, তাহার বাল্যকালের শিক্ষা নিরর্থক হইবে না। আপনি বলিতেছেন, আপনি তাহার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন; আপনি অবশ্য সকল কথা ভাল জানেন।"

আমি কথাগুলি সহজ ভাবে বলিতে চাহিলেও আমার আন্তরিক শ্লেষ তাহাতে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকারান্তরে উহা তাহার উক্তির প্রতিবাদ। সে অসহিষ্ণু-ভাবে উত্তর করিল, "যা বলিতেছেন ঠিক। আপনি কেন, আমিও বলিতেছি, চরিত্রহীন তাম্রলিপ্তিতে সে একমাত্র চরিত্রবান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পাঠে তাহার অত্যধিক অনুরক্তি ছিল। কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যের গৌরব কি? যাহার সাংসারিক জ্ঞান নাই, তাহাকে নির্ব্বোধ বলিতে বাধ্য। তাহার জীবনে স্বল্পের সুখ কি? সে কেবল নানারূপে পরিজনবর্গের পদে পদে বাধা হইয়া অশেষ অশান্তির কারণ ছিল।"

আমারই দুগ্ধে পুষ্ট সর্প, প্রসাদ-লোলুপ কুক্কুর, হেয় হীন দরিদ্র, অনশন হইতে রক্ষা করিয়া যাহার জীবন দিয়াছি, তাহার মুখে এই উক্তি! আমি তাহার অশান্তির কারণ! ভগবান সহ্য করিতে দিয়াছেন, সহ্য করিলাম। লঘুচিত্তের ন্যায় হাসিয়া বলিলাম, "ভাল, ভাল, আপনি দেখিতেছি বেশ রসিক, খোলা-প্রাণ, এই ত চাই। কে বাপু ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া এমন সখের প্রাণটাকে মাটী করিতে চায়। বস্তুতই ভালমানুষ আর নিরেট বোকা একই কথা। ঠিকই তাই,—দেখিতে দেখিতে বুড়া হইলাম,—ভালর কাল আজকাল নাই; যে কোন কাজের নয়, সেই ভাল-মানুষ সাজে।"

আমাকে হঠাৎ হাস্য কৌতুকে উৎফুল্ল হইতে দেখিয়া গোবিন্দ বিস্মিত হইল; ক্ষুণ্ণিত হইল না। ইহার পূর্ব্বে আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে একটু দ্বিধা বোধ করিতে-ছিল, তাহা কাটিয়া গেল। সে সহাস্যে বলিল, "মহাশয় সমজদার ব্যক্তি। এ বয়সে ত আর কম দেখেন নাই; আপনার অজ্ঞাত কি আছে?"

আমি সে কথায় কান না দিয়া, কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "বেচারা হেমরাজের মৃত্যু কি অকস্মাৎ হইয়াছিল?"

"হাঁ, মহাশয়ের অনুমান ঠিক।" আমার মৃত্যুকাহিনী গোবিন্দ বর্ণনা করিল। আমার সেই মৃত্যুঘটনাকে পাগলামি, নির্ব্বুদ্ধিতা প্রভৃতি শ্লেষ বিশেষণে অলঙ্কৃত করিতেও ত্রুটী করিল না। আমি যথার্থই নির্ব্বোধ; তাহার বাক্যগুলি বাধ্য ছাত্রের মত শুনিয়া গেলাম। সুযোগ বুঝিয়া প্রশ্ন করিলাম, "মৃত্যুর পূর্ব্বে হেমের জ্ঞান ছিল, সে অনায়াসে তাহার নিজ প্রাসাদে আনীত হইতে পারিত; তাহা না হইয়া সে অবশেষে একটা সাধারণ সরাইয়ে অমন অবস্থায় মারা গেল?"

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি বলিল, "সে দোষ তাহার স্ত্রীর নয়, সেও তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার ফল। শুনিয়াছি, সে প্রাসাদে আসিলে পাছে তাহার স্ত্রী ও কন্যা দুরন্ত সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় সেই ভয়েই সে তাহার পীড়ার সংবাদ প্রাসাদে প্রেরণ করে নাই। লোকটা ছিল ঐ এক ধরণের, মরিতে বসিয়াও তাহার সেই গোঁ। সকলেই মৃত্যুকালে আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহার সে সখও ছিল না। স্ত্রী-কন্যার বিপদের আশঙ্কাটা যত নয়, তাহাদের প্রতি ঔদাসীন্যটাই আসল। এমন অদ্ভুত লোকও জন্মায়!"

তাহার বাক্যের প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। সে স্পৃহা সেই দিনই বিসর্জ্জন দিয়াছি। তাম্রলিপ্তিতে ফিরিয়া যাহার সংবাদের জন্য আকুল হইয়াছিলাম, এই অবসরে তাহার কথাই জিজ্ঞাসা করিলাম, "হেমরাজের একটি কন্যা আছে শুনিয়াছি। মেয়েটি কেমন?"

"ঠিক তাহার বাপের মত। হেমরাজ যেমন সেকেলে অদ্ভুত জীব ছিল, মেয়েটাও হইয়াছে তাহাই। আকর্ষণের তাহাতে কিছু নাই। শ্রেষ্ঠিনীও তাহাই বলেন, একটা মেয়ে তাহাও যমের অরুচি।"

বুঝিলাম, চম্পার এখন কি অবস্থা; অবজ্ঞায়, অত্যাচারে সে জর্জ্জরিত হইতেছে। তাহার গর্ভধারিণী তাহাকে স্বচক্ষে দেখিলে গোবিন্দ কখনই এভাবে তাহার

কথা বলিতে সাহসী হইত না। এই স্বার্থান্ধ, সময়ের উপাসক হেয় গোবিন্দই না আমার সমক্ষে চম্পার কত প্রশংসা কত আদর করিত। তখন তাহার আদর অর্থে আমার অর্থের আদর। এখন বোধ হয় ক্ষুদ্র বালিকার নিন্দাবাণী, তাহার রাক্ষসী জননী নীলার মনোহরণের মন্ত্র; তাই গোবিন্দর এত সাহস। বলহীন অসহায় চম্পার ম্লান মুখ কল্পনা করিয়া হৃদয় শতধা হইবার উপক্রম হইল। অনেকক্ষণ কথা বলিতে পারিলাম না; আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। কেবলই মনে হইতেছিল,—জীবনের সমস্তই হারাইয়াছি; যে একটুকু আছে, তাহারও এই অবস্থা! আমার কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে, এত অযত্নে, এত অত্যাচারে আমার সেই হৃদয়-কুসুম অকালে ঝরিয়া পড়িবে না ত?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্তরের অন্ধকার বাহিরে প্রকাশ পাইলেই বিপদ! আমার প্রতি গোবিন্দর মনোভাব কি, আমার অজ্ঞাত ছিল না। তবুও প্রসঙ্গক্রমে তাহা পরিষ্কার করিয়া লইতে চেষ্টা পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার বন্ধুর নির্ব্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও আপনি বোধ হয় তাহাকে ভাল বাসিতেন?"

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল, "ভাল বাসিতাম? না,—আপনার নিকট বলিতে কি, আমাদের সম্বন্ধকে ঠিক ভালবাসা বলিলে, মিথ্যা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে আমি তাহাকে খুব পছন্দ করিতাম। সে আমার রাশি রাশি ছবি ন্যায্যাতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করিত। আমি ধনবান নই; অমন একজন ক্রেতাকে কে পছন্দ না করে? হাঁ,—পছন্দ কেন, সে যতদিন বিবাহ না করিয়াছিল, শুধু পছন্দ নয়, তাহা অপেক্ষা আর-একটু অধিক স্থান আমার হৃদয়ে সে অধিকার করিয়াছিল।"

"হেমরাজের স্ত্রী বুঝি ভালবাসার অন্তরায়রূপে আপনাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন?"

গোবিন্দর বদনমণ্ডল রক্তাভ হইল। সে সংক্ষেপে উত্তর করিল, "হাঁ, বিবাহে হেমরাজকে অনেকটা বদলাইয়া ফেলিয়াছিল।"

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের ইচ্ছায় সে বলিল, "অনেকক্ষণ আমরা বসিয়া আছি। বাহিরে একটু বেড়ান যাক না।"

বৃদ্ধের ন্যায় অতি ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার বাসার দিকে যাইবেন কি? রাত এক প্রহর হইয়াছে, সকাল-সকাল শয়ন করা আমার অভ্যাস। আমার চোখের অবস্থা ভাল নয়; বাতির আলো সহ্য হয় না। বাসায় ফিরিবার পথে আপনার সহিত কথা বার্ত্তায় যাওয়া যাইবে। আপনার অন্যত্র কার্য্য থাকিলে অবশ্য ভিন্ন কথা।"

"বেড়ানই কাজ। মহাশয়ের অনুগ্রহে বড় খুসী হইয়াছি; আপনার সহিত যতক্ষণ কাটাইতে পারি ততই সুখের।"

"উভয়েরই। আমি এখানে নূতন লোক, পুরাতন বন্ধুগণের অনেকেরই অভাব হইয়াছে; আপনার সহিত পরিচিত হইয়া উপকৃত হইলাম। শ্রেষ্ঠীপরিবারের আপনি বন্ধু, আমিও তাহাই ছিলাম। তাঁহাদের প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে; আপনার সাহায্যে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিব। আশা করি সত্বরই একদিন আপনার চিত্রশালা দেখিয়া সুখী হইব। আমাকে আপনার পৃষ্ঠপোষকরূপে গণ্য করিলে আনন্দিত হইব।"

গোবিন্দ আগ্রহের সহিত বলিল, "সহস্র ধন্যবাদ। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র শিল্পীর নগণ্য চিত্রে আপনাকে সুখী করিতে পারিলে বস্তুতই আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব। কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় পৃষ্ঠপোষকের জন্য লালায়িত নই। ঠিক বলিতে গেলে, আমি মাস ছয়েকের মধ্যে এ ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছি।"

"কেন? আপনি বুঝি অন্য কোন লাভজনক ব্যবসা করিবেন স্থির করিয়াছেন।"

"না—ব্যবসা নয়। তবে একটি ধনবতী রমণীকে বিবাহ করিবার আশা রাখি। নিজে ধনবান হওয়া, আর ধনশালিনী মহিলাকে বিবাহ করা এক নয় কি?"

কে সে ধনবতী রমণী আমার বুঝিতে বাকি থাকিল না। ক্রোধে আমার বুকের রক্ত ফুটিতে লাগিল। কি নির্লজ্জতা! সমাজের রীতি অনুসারে ছয়মাস অপেক্ষা না করিয়া উপায় নাই, নতুবা হয়ত পিশাচ পিশাচী তাহার পূর্ব্বেই পবিত্র বিবাহের নামে কলঙ্ক আরোপ করিত।

লোকে তাহাদের এই অদ্ভুত ব্যবহারে কি বলিবে, তাহাও কি ইহাদের মনে আসে না? তাম্রলিপ্তি কি একবারেই রসাতলে গিয়াছে? মনুষ্যত্বের জন্য না হউক, লোকলজ্জার খাতিরেও ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল। যাক আমার বংশমর্য্যাদা আমিই রক্ষা করিব। মুহূর্ত্তের মধ্যে শত চিন্তা হৃদয়কে আঘাত করিয়া গেল। সহ্য করিতে বসিয়াছি, সহ্য করিলাম। সহাস্যে বলিলাম, "একই বটে! আপনার সৌভাগ্যকে আমি সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।" এত চেষ্টাতেও আমার স্বরে একটা ঘৃণাব্যঞ্জক সুর লুক্কায়িত রাখিতে পারিলাম না। গোবিন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছায় বলিল, "আপনি বহুদেশ দেখিয়াছেন, না?"

আমি গম্ভীরস্বরে বলিলাম, "হাঁ।"

গোবিন্দ বৃদ্ধের সহিত সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। বলিল "কোন্ দেশের রমণী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী?"

আমি গম্ভীরস্বরে বলিলাম "যুবক বন্ধু! ক্ষমা করিবেন। আমার ব্যবসা বাণিজ্যের ঝঞ্ঝাট মহিলাসমাজ হইতে আমাকে সম্পূর্ণ দূরে রাখিয়াছিল। অর্থের পশ্চাতেই জীবন ভরিয়া ছুটিয়াছি। আমার মনে হয়, সংসারের সকলেরই মূলে অর্থ; উপযুক্ত অর্থ হইলে তথাকথিত রমণীর প্রেম ক্রয় করিতে আর কতক্ষণ? আমি সেই সর্ব্বমূলাধার অর্থের জন্যই লালায়িত ছিলাম; যৌবন কোথায় দিয়া কাটিয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই; রমণীর বিষয় ভাবিবার বা দেখিবার অবসর আমার হয় নাই। বয়সে যাহা ঘটে নাই, এখন এই জীবনসন্ধ্যায় সে আশা বৃথা; সংসার দূরে রাখিয়া অন্য জগতের চিন্তাই এখন আমার শোভা পায়, সেই চেষ্টাতেই দিন কয়টা নিরিবিলি কাটাইতে চাই!"

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল, "আপনার কথায় হেমরাজের কথা মনে হয়, বিবাহের পূর্ব্বে সেও অমনি বলিত, কিন্তু অবশেষে সে এত শীঘ্র এত সহজে বদলাইয়া গিয়াছিল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়!"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? তাহার স্ত্রী কি এমনি সুন্দরী! স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে তাহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল, বলুন।"

"সত্যই তাই। সেই অদ্বিতীয়া সুন্দরীর রূপপ্রবাহে সে প্রথম দৃষ্টিতেই ডুবিয়া গিয়াছিল, সে আপনারি মতই ভাবিয়াছিল, অর্থে রমণীকে ক্রীতদাসী করা যায়। ভুল। রমণী অর্থের আশা করে বটে, কিন্তু তাহাতে বাঁধা পড়ে না,—বিশেষতঃ অমন সুন্দরী!"

"বটে! সৌন্দর্য্যের মহিমা এত! সৌন্দর্য্য জিনিষটা প্রেম হইতে অবশ্য ভিন্ন। প্রেম সৌন্দর্য্যেরও নয় অর্থেরও নয়। কি তাহা যখন জানি না, তখন তাহার আলোচনা না করাই ভাল। সৌন্দর্য্যের প্রভাব আপনি অনুভব করিতে পারিয়াছেন. জানিয়া সুখী হইলাম। আমার সে চেষ্টা, এ বৃদ্ধ বয়সে শোভা পায় না; নহিলে বাঁচিয়া বসিতাম!"

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল, "সে সুযোগ এখনো আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই। সৌন্দর্য্যের উপাসক না হন, একবার সুন্দরীকে দেখা দিতে বাধা কি? শ্রেষ্ঠী-পরিবারের আপনি পুরাতন বন্ধু; সেই হিসাবেও ত একবার আপনার শ্রেষ্ঠিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হয়।"

আমি আগ্রহহীন স্বরে বলিলাম, "আবশ্যক কি? কোন মহিলার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইতে আমার সাহস হয় না। বিশেষ শ্রেষ্ঠিনী এখন শোকার্ত্তা। শুনিয়াছি, তিনি পরিচিত জনের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও অনিচ্ছুক; হইবারই কথা, এ সময়ে কি লোকসমাগম ভাল লাগে? বন্ধুদেরই তাঁহাকে ত্যক্ত করা উচিত নয়; আমি ত অপরিচিত।"

গোবিন্দ আগ্রহের সহিত বলিল, "অপরিচিত! কি বলিতেছেন? আপনি তাঁহার পরিবারের পুরাতন বন্ধু; নিশ্চয় তিনি আপনাকে বিশিষ্ট বন্ধুরূপে সাদরে গ্রহণ করিবেন। শোকে তিনি এমন কাতর হন নাই যে আপনার ন্যায় বন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারেন।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "তেমন কাতর হন নাই!"

"অমন সুন্দরী,—যুবতী,—সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন,—সকলের লক্ষ্যস্থল যিনি, তিনি দুঃখ করিতে চাহিলেও, তাঁহার দুঃখ করিবার অবসর কোথায়? অনেকেই তাঁহার আনন্দে আনন্দিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছে। এত

লোককে অসুখী করিবার তাঁহার শক্তি আছে কি? তাঁহার এখন হাসিবার খেলিবার বয়স; একজন,—যাহাকে তিনি ভাল বাসিতেন কি না সন্দেহ,—তাহার জন্ম তিনি জীবনটাকে নষ্ট করিবেন! কেহ কি তাহা পারে?"

আমরা আমার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি বলিলাম, "এই আমার ক্ষুদ্র গৃহ। চলুন এক গেলাস মদ্য পান করিয়া যাইবেন; যে ঠাণ্ডা।"

গোবিন্দ চিরকালই মদিরাক্ষি হইতেও মদ্যের অধিকতর পক্ষপাতী। সে বিনা আপত্তিতে আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। বৈঠক কামরায় উপস্থিত হইলাম। মকমলে আচ্ছাদিত একখানি চৌকীতে তাহাকে সাদরে বসিতে অনুরোধ করিলাম। বহুমূল্য আস্‌বাবে পূর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে আমার ধন-পরিমাণের একটা কল্পনা করিয়াছিল, বোধ হয়। সে ভাব সে গোপন না করিয়া বলিল, "মহা-শ্রেষ্ঠী, আপনার অগাধ অর্থ,—চেহারাখানাও সুন্দর, যৌবনে না জানি কি সুন্দরই ছিলেন। আশ্চর্য্য! যে দেশে আপনি ছিলেন, সেখানে কি রমণীর চোখ নাই!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "থাকিলেও আমি দেখি নাই। যাহার জন্ম তাহারা আমাকে চাহিবে আমি সেই অর্থের দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছিলাম। কখন এদিক ওদিক তাকা-ইতে অবসর হয় নাই। কোন রমণীর সাধ্য ছিল না অত দ্রুত চলিতে পারে,—কাজেই তাহারা পশ্চাতে পড়িয়াছিল; আমার সম্মুখে তাহাদের কেহ আসিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। এখন আমিই পশ্চাতে, ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ, তাহারা পশ্চাতে ফিরিয়া আমাকে দেখিবে কেন! কে বোঝা বহিতে সজীর ইচ্ছা করে।"

গোবিন্দ গম্ভীর হইয়া বলিল, "বলিয়াছি, আপনার কথা শুনিয়া বন্ধু হেমরাজকে মনে পড়ে। চেহারাতেও আপনা-দের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্ত্তমান। সেও আপনার মত লম্বা-চওড়া ছিল।"

আমি রহস্যের স্বরে বলিলাম, "চারপেয়েদের চলনই অমি। এমন চেহারার লোকগুলাই বুঝি এই রকম অদ্ভুত মতের হয়। শুনিয়া সুখী হইলাম, আমি আপনার একজন বন্ধুকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারিয়াছি। এক দেশে যাহাদের জন্ম, এক রকম সমাজে যাহাদের বসবাস, লম্বা চওড়ায় যাহারা একরকম, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকে বৈকি, সকল দেশেই আমিও এটা লক্ষ্য করিয়াছি।"

গোবিন্দ কোন উত্তর করিল না। সে বক্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল; আমিও তাহার মুখ-ভঙ্গিতে মনের ভাব পাঠ করিতে চেষ্টিত ছিলাম। আহারীয় আনীত হইলে উভয়ে আহারে বসিয়া গেলাম। বেশী কথাবার্ত্তা হইল না। গোবিন্দ খাদ্যের, বিশেষতঃ মদ্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সময়োচিত দুই একটি মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। আমি মৃদুহাস্যে তাহার জন্ম বিনয় প্রকাশ করিয়াছি মাত্র। আহারান্তে গোবিন্দ বলিল, "এখন বিদায় হই। আপনার শয়নের সময় বোধ হয় বিলম্বিত করিয়া ফেলিলাম। ক্ষমা করিবেন। আপনার আতিথ্যে পরম তুষ্ট হইয়াছি। আশা করি, শ্রেষ্ঠিনী নীলার নিকট আপনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা, আপনার অমত হইবে না; তাঁহার পরিবারের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ তাহা অবগত হইলে তিনি আনন্দিত হইবেন। আপনি কি তাঁহার সঙ্গে একবারও দেখা করিবেন না, স্থির করিয়াছেন?"

"স্থির, অস্থির কিছু নাই; প্রথম, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের এ সময় নয়। তারপর অন্য কথাও আছে, আমি সেকেলে লোক, মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশার ধরণ-ধারণ জানি না, জানিতে ইচ্ছাও হয় না। যত দেখাশুনা না হয় ততই ভাল। তবে একটা কথা,—যদি কিছু মনে না করেন বলি—"

গোবিন্দ আগ্রহের সহিত বলিল, "আমাকে আবার কিছু বলিতে দ্বিধা—যা ইচ্ছা বলুন না।"

"কথাটা কি,—আজ আপনার সহিত পরিচয় হইবার পর, মনে হইয়াছিল, আমার একটা উপকার করিবার জন্ম আপনাকে অনুরোধ করিব। শ্রেষ্ঠী-পরিবারের প্রতি আমার একটি কর্ত্তব্য পালন করিতে আছে, আপনি তাহাতে সাহায্য করিবেন। কিন্তু আপনাকে বৃথা কষ্ট দিতে অনিচ্ছুক, তাই বলি নাই। বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠিনীর সঙ্গে সকালে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনাও বোধ হয় আপনার নাই।"

গোবিন্দর বদন আরক্তিম হইল। সে একটু চেষ্টা

করিয়া লজ্জিতভাবে উত্তর দিল, "কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আজ রাত্রেই আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। আমি আপনার এখান হইতে বরাবর শ্রেষ্ঠীপ্রাসাদে যাইব। আপনার কোন কার্য্যে আসিতে পারিলে, যথার্থ ই আমি আনন্দিত হইব।"

বলিলাম "অত তাড়াতাড়ির আবশ্যক ছিল না। তা—আপনি যখন যাইতেছেন, সুবিধা হইলে বলিবেন, আমি শ্রেষ্ঠিনীকে একটা সামান্য উপহার দিতে ইচ্ছা করি। বলিয়াছি, বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠী আমার বন্ধু ছিলেন; তিনি কোন এক সময়ে আমার যেরূপ উপকার করিয়াছিলেন, তাহা জীবনে কখন ভুলিব না। সেই স্মৃতি জাগুরুক রাখিতে, তাঁহাকে একটি প্রণয়োপহার দিব স্থির করিয়াছিলাম। সহস্র মণিরত্নের মধ্যে এক একটি করিয়া বাছিয়া সে উপহার রচিত হইয়াছিল। আমার দুভাগ্য, অসময়ে বন্ধু চির-প্রস্থান করিলেন। পরে ভাবিয়াছিলাম, বন্ধুপুত্রকে তাহা উপঢৌকন দিয়া স্নেহঋণ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত হইব, সেই জন্যই হেমরাজের সংবাদ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেও চলিয়া গিয়াছে। এখন উহা তাঁহার স্ত্রীরই প্রাপ্য। মহাশয় যদি ঘটনাটা বলিয়া শ্রেষ্ঠিনীর মতামত আমাকে জানাইতে পারেন, আমি প্রকৃতই কৃতার্থ হইব।"

গোবিন্দ বিনীত ভাবে বলিল, "আমি আনন্দের সহিত মহাশয়ের দৌত্য গ্রহণ করিলাম। এমন একটি আনন্দ-বার্ত্তা বহন করা শ্লাঘার বিষয়। সুন্দরীগণ অলঙ্কার-প্রিয়; সেজন্য তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। যোগ্যে যোগ্যে মিলনই সংসারের সুখ। সুন্দরীর উজ্জ্বল নয়ন-তারকা আর নিষ্কলঙ্ক মণিমুক্তা উভয়ই এক। তবে আসি, নমস্কার মহাশয়।"

গোবিন্দ হর্ষ-কম্পিত হস্তে আমার হস্ত ধরিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। আমি বাতায়নপার্শ্বে দাঁড়াইলাম। গোবিন্দ উৎফুল্ল চিত্তে ছুটিয়া চলিয়াছে; তাহার হৃদয়ে সুখ কানায় কানায় পূর্ণ! আমি তাহাদের সুখের পথে কণ্টক ছিলাম। আমার শেষ, তাহাদের সুখপ্রভাত সমুদিত। ছয় মাস প্রতীক্ষার কাল; সেও ত মিথ্যা আবরণ; আমার মৃত্যুর পর পিশাচ পিশাচীর মিলনে ছ ঘণ্টাও বিলম্ব হয় নাই। মনে মনে বলিলাম, "যাও গোবিন্দ, আর কয়টা দিন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ কর। আজ যে ফাঁদে পা দিলে তাহাতে আর এ স্ফূর্ত্তি বেশী দিন ভোগ করিতে হইবে না। যাহার দয়াতে এখন তোমার জীবন, তাহার হৃদয়ে দয়া নাই; ক্ষমা তাহার পক্ষে মহাপাপ; পাপীর শাস্তি বিধানই তাহার ধর্ম্ম,—শাস্তি! জানি না, আজ যদি ভুলিয়াও হেমরাজের মৃত্যুতে দুঃখ করিতে, যাহাকে বন্ধু উপকারী বলিয়া এক সময় এত স্তবস্তুতি করিয়াছ, ভদ্রতার খাতিরেও যদি তাহার পারিবারিক বন্ধুর সমক্ষে আত্মভাব গোপন করিয়া মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে, তাহা হইলে হয়ত তোমার শাস্তির পরিমাণ অনেক লঘু হইত। আমার স্ত্রী সেই ত প্রধান অপরাধী, মহাপাপী। যে এরূপ করিয়া আত্ম-মর্য্যাদায় ও পারিবারিক সম্মানে আঘাত করিতে পারে, তাহার নরকেও স্থান নাই, নরক হইতেও ভীষণতর স্থান তাহার উপযুক্ত। গোবিন্দ এত দিন তোমায় পাপ-নরকের উপযুক্ত বলিয়াই মনে করিতাম, তুমি নারীর বিভ্রম বিলাসে মুগ্ধ। না—আজ বুঝিয়াছি তুমি শুধু তাহা নহ, তুমি পিশাচাধম। আমি তাহার জন্য সুখী,—আজ তুমি এমন কিছু বল নাই,—এমন কোন ভাব প্রকাশ কর নাই, যাহার জন্য দয়ার লেশ মাত্র আমার হৃদয়ে জাগ্রত হইতে পারে; আমার সংকল্প হইতে বিচলিত হইবার বিন্দুমাত্র সুযোগও আমাকে তুমি দাও নাই। সেই আমার পক্ষে মঙ্গল। আমার প্রতিহিংসার ভিত্তি-প্রস্তর সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত হইল। আজ আমি সুখী।" (ক্রমশ)

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

যাদুকর

নিশার তরল স্বচ্ছ কম্পিত তিমির
কিসের আবেগে আজ স্ফটিক-কঠিন,
বাষ্প-মৃদু স্পন্দমান হৃদয়ের নীর
প্রচ্ছন্ন পরশে কার বিমল তুহিন?

হে মায়াবি এস এস, গড় তাই দিয়ে
শুভ্র স্নিগ্ধ পান-পাত্র তৃষিত হিয়ার,
ছড়ায়ে তারকা চূর্ণ, চন্দ্রমা ছানিয়ে
অমিয়া পিয়াও ভরি জীবন আমার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পঞ্চশস্য

যুদ্ধ-ফলের শ্রেষ্ঠতম ভাব-চিত্রকর—

জগতের প্রত্যেক মহাব্যাপার ও যুগান্তর ঘটনার কালে এক-একজন এমন ভাব-চিত্রকরের আবির্ভাব হইয়া থাকে যিনি জনসাধারণের আত্মা-নিহিত ভাবগুলিকে ভাষা দিয়া আকার দিয়া তাহাদের নিকট সুপ্রকাশ করিয়া ধরেন। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম ভাব-চিত্রকর বলিয়া সকলের সম্মতিতে স্বীকৃত হইয়াছেন হলাণ্ডের দা তেলেগ্রাফ নামক সংবাদপত্রের চিত্রকর লুই রেমেকাস্ (Louis Raemaekers)। তিনি সভ্যতার বর্ব্বরতাকে এমন একটা সতেজ আন্তরিকতার সহিত আক্রমণ করিতে পারেন যে সে-রকম ভাব কথায় লিখিয়া প্রকাশ করিতে কোন নিরপেক্ষ জাতির কোনো সংবাদপত্র সাহসই করিতে পারে না। যুদ্ধের আড়ম্বরপূর্ণ বহিঃসৌষ্ঠবের অন্তরালে কি যে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা ও দুঃখদারুণ করুণ দৃশ্য লুক্কায়িত আছে তাহা রেমেকাসের চিত্রে এমন ভাবময় ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে যুদ্ধে লিপ্ত জাতিরা তাহা দেখিয়া আপনাদের অমানুষ আচরণে লজ্জা ও বেদনা পাইতে বাধ্য হইবে। যুদ্ধে যে শুধু যোদ্ধারাই আহত হয় তাহা ত নয়, যুদ্ধের ফল যে নিরস্ত্র দূরের লোককেও আঘাত করে—সে স্ত্রীলোক শিশু বৃদ্ধ কাহাকেও ত রেয়াত করিয়া চলে না। এইসব নিরীহ লোকদের দুর্দ্দশা চিত্রকরের ভাবপ্রবণ চিত্তকে বিমথিত করিয়া অশ্রু ও রক্তের ছোপ দিয়া চিত্র আঁকায়; সে-সব চিত্র দেখিলে দর্শকের চিত্তও ক্লিষ্ট হয়—শোক-পাণ্ডুর অনাহারশীর্ণ মুখ, ভয়বিস্ফারিত চক্ষু, ভগ্ন স্তব্ধ প্রাচীর চারিদিকে শুধু দুঃখ দারিদ্র্য অনাহার নিরাশ্রয়তা এবং মৃত্যুর হিম স্তব্ধতা প্রকাশ করিয়া দুঃসহ বিভীষিকা সৃষ্টি করে। এই দুঃখছবির কৃষ্ণতার মধ্যে আশার একটি ক্ষীণালোক-রেখাও দেখিতে পাওয়া যায় না; এই মেঘ-দুর্দ্দিনের অন্ধকারের মধ্যে অস্তসূর্য্যের আবৃত মুখের আভাসটুকুও পাওয়া যায় না। এই চিত্রকরের চিত্র-পরম্পরার ভিতর দিয়া স্বয়ং মৃত্যু যেন কালো মহিষে চড়িয়া খর্পর ভরিয়া নরনারী-শিশুবৃদ্ধের শোণিত পান করিতে করিতে ও কলিজা চিবাইতে চিবাইতে চলিয়াছেন; তাঁহার বরযাত্রী নিরাশা, দুর্ভিক্ষ, শোকবিহ্বলতা। রেমেকাসের ছবিতে যেন পাগলের তুলির একটু স্পর্শ আছে—এসব যেন নরকের মধ্যে হাসির মতন ভয়ানক! হত লোকদের ভূতেরা যেন পরলোক হইতে আসিয়া তাঁহার তুলিতে ভর করিয়া এইসব দারুণ ছবি আঁকাইয়াছে।

তাঁহার কএকখানি ছবি।—সভ্যতা একটি শীর্ণ পাণ্ডুর রমণীমূর্ত্তি; তাহার হাত পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা; সেই মুখে একটু জীবনের রং নাই, একেবারে ছাইএর মতন পাণ্ডাশ, খুন-করা বাসি-মড়ার বিকট মুখ। তাহার পাশে জার্ম্মান যোদ্ধ্ভাব, একটা মাতাল ছোটলোক বর্ব্বর, একটা পিস্তল দেখাইয়া তাহাকে যেন বলিতেছে—'কি গো সুন্দরী, আমায় পছন্দ হয়?' এ ছবি কী বীভৎস!

যুদ্ধচিত্রকর রেমেকাস।

সন্তানহারা মাতারা।

বেলজিয়মের হানা বাড়ীর ভাঙাচূরার মধ্যে একটি পরিবার;—দুজন বুড়োবুড়ি ক্ষুধায় আর ক্লান্তিতে আধমরা হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে; পুত্রবধূ সদ্যবিধবা, তাহার কোলে একটি ছোট ছেলে কঙ্কালসার মরমর; শোকবিহ্বলা মাতা পাগল হইয়া গিয়াছে—তাহার চোখের দৃষ্টিতে শয়তান নৃত্য করিতেছে। এ যেন বেলজিয়মের হানা অন্তরের এক অংশ বিদ্যুৎ-চমকে আমাদের চোখের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিধবারা।

অনাথ শিশুরা।

রেমেকারের চিত্রের মধ্যে প্রধান তিনখানি—পুত্রহীনা মাতারা, বিধবারা, অনাথ শিশুরা। এই তিন ছবিতে যুদ্ধের সকল দুঃখ পুঞ্জীভূত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। সন্তানহারা মাতারা শোকের কৃষ্ণতায় একেবারে আবৃত, তাঁহারা আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না; মন্দিরে বেদীর সম্মুখে কম্পিত দীপশিখার সাক্ষাতে আপনাদের মুহুঃসহ হৃদয়-বেদনা ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দিতেছেন—"আমি আপন বেদনা পারি না বহিতে প্রভু লও মোর ভার!" পতিহীনা বিধবারা কালো জমির উপর দিয়া পাণ্ডুমুখে হাত-ধরাধরি যাইতেছে—তাহাদের দলে প্রণয়-মুকুলা যুবতী ও প্রণয়-পুষ্পিতা প্রৌঢ়া দুইই আছে। অনাথ শিশুরা কবরের অরণ্যের একটা গলি দিয়া আসিতে আসিতে পরলোকগত পিতাকে উদ্দেশ করিয়া যেন খুঁজিতেছে—বাবা, তোমার কবর কোন্‌টা?

রেমেকার্স জগৎকে দেখাইয়াছেন যে কথা না বলিয়াও অন্যায়ের প্রতিবাদ কেমন করিয়া করিতে পারা যায়। যেখানে আইন মুখ বন্ধ করে, সেখানে ইঙ্গিতের ভাষা চোখ দিয়া পড়িয়া লইতে পারিলে আইনকে ফাঁকি দেওয়া সহজ। রেমেকার্স স্বদেশের ভীরু মনের ইতস্ততঃ ঘুচাইয়া তাহাদিগকে অত্যাচারীকে অত্যাচারী, স্বাধীনতা-অপহারীকে মনুষ্যত্বের শত্রু অসঙ্কোচে বলিতে শিখাইয়াছেন।

রেমেকার্সের জন্ম হয় ১৮৬৯ সালে। তিনি আমষ্টাডাম, ব্রুসেল্‌স ও পারীতে আর্ট শিক্ষা করেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত অতি ভদ্রলোক; তিনি বহু ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে পারেন ও বহু দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। এতদিন তাঁহার খ্যাতি স্বদেশেই আবদ্ধ ছিল; বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে তিনি ব্যথিত অন্তরে সকল বিষয় ছাড়িয়া যুদ্ধেরই দুঃখচিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, এবং তাহাতেই তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকায় পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন।

আমাদের দেশেও নবপন্থী চিত্রকর সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতেছে, এবং কেহ কেহ বিদেশেও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন; তাঁহাদেরও উচিত জীবন্ত মন দিয়া স্বদেশের রাষ্ট্র সমাজ জীবন দেখিয়া তাহারই সুখদুঃখ আশা নিরাশা অবিচার অত্যাচার নির্ভয়ে প্রকাশ করিয়া চলা। শুধু পৌরাণিক বিষয়ের চর্ব্বিত চর্ব্বণ ছাড়িয়া জীবন্ত ভাবের চর্চ্চা করুন; দেশের দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবিচার অত্যাচার তাঁহাদের তুলিকাকে উৎসাহিত করুক।

* * *

মোটা লোকের কথা—

আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটি মহৎ সফলতা মোটা হওয়া নিবারণের প্রতিকার আবিষ্কার। ডাঃ উইলিয়াম ব্রাডী বলেন যে লোক এখন মোটা হইতে চাহিবে না, সে আর মোটা হইবে না। মানুষ মোটা হয় দুই কারণে—(১) সে বেশী খায়, খাটে কম, (২) নয়ত তাহার শরীর-যন্ত্রের (Oxidation apparatus, ductless glands) কিছু গোলমাল আছে। ছোট ছেলে বিপর্য্যয় মোটা হইয়া উঠার কারণ প্রায়ই মস্তিষ্কের গোড়ায় যে শ্লেষ্মা-স্রাবী বীচী থাকে তাহা হইতে স্রাব ভালো না হওয়া। এরূপ লোকেরা প্রায়ই খুব মিষ্ট-খোর হয়।

(১) যাহারা বেশী খায় ও খাটে কম, তাহারা দেহ-ইঞ্জিনে দরকারের চেয়ে বেশী ইন্ধন জোগায়। যাহার কায়িক শ্রমের সুবিধা নাই, তাহার খেলা করা উচিত। যদি কোনো মোটা স্ত্রী বা পুরুষ খেলিতে প্রস্তুত থাকে, নিজেকে হাস্যাস্পদ হইতে দেখিয়াও, হাতীর নাচ বা বানরের ভঙ্গি হইলেও যে খেলিতে পশ্চাৎপদ হয় না, সেই লোকের

মাফিক-সই হইবার আশা আছে। যে মোটা লোক পড়িয়া কুমড়া-গড়াগড়ি যাইতে, কুপো-কাৎ হওয়ার ন্যায় ডিগবাজি খাইতে বা অন্ততঃ নড়াচড়া করিয়া অশোভন অভব্য বনিতে দ্বিধা করে তাহার আর উপায় নাই—সে হাজার উপোষ করুক তার মোটা রোগ সারিবার নয়।

মোটা লোকেরা আবার দুরকম—(ক) একরকম মোটার গায়ে অতিরিক্ত রক্তাধিক্য থাকে, (খ) অন্য রকম মোটার গায়ে দরকারের চেয়ে কম রক্ত থাকে। কোনো রকম পীড়ার জন্য বাধা হইয়া অনড় থাকিলে এই রক্তহীন স্থূলতা দেখা দায়-যেমন, কোন অস্ত্রাঘাতের পর, হাড়ভাঙার পর বা জ্বর যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের পর। রক্তাধিক্যে মোটা লোকেরা প্রায় ত্রিশ বৎসরের বেশী বয়সের হয়, এবং প্রথম প্রথম মনে করে—বাঃ! কেয়া সুস্থ শরীর! কিন্তু বেচারার দো-তলা চিবুকের উপর মুখের ছোট্ট ঘুলঘুলি তাহাকে বুঝাইতে চাহে যে লক্ষণ বড় ভালো নয়।

শরীরে আবশ্যকের অতিরিক্ত জ্বালানি জমা হইলে তাহা জ্বালাইয়া জীবনীশক্তিতে পরিণত করিবার একমাত্র উপায় ব্যায়াম। সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রত্যহ চার মাইল হাঁটা নিয়ম করিয়া চাইই চাই—রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, বাত কিছু মানা চলিবে না। পাছা, পিঠ ও পেটের চর্ব্বির ঢিপি কমাইবার জন্য ঘরে কসরৎ করা দরকার।

সঙ্গে সঙ্গে উপোষ করা খুব উপকারী। এক-লাগাড়ে তিন চার দিন উপবাস মোটা লোকের শরীরের পক্ষে বেশী জুলুম মোটেই নয়, কারণ তাহার সর্ব্বাঙ্গে যে পুষ্টির ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া আছে তাহা কল্পতরুর ন্যায় ফেলিয়া ছড়াইয়া খরচ করিলেও শীঘ্র ফুরাইবার নয়। পাকযন্ত্র বেচারাকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়া তাহাকে তাজা রাখিবারই উপায়।

মোটা লোকের খাই-খাই বড় বেশী। খাওয়ার সময় ঠাণ্ডা জল খাইলে পাকযন্ত্রে পাচক রস বেশী ক্ষরিত হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। সুতরাং মোটা লোকের জল মোটেই খাওয়া উচিত নয়; যদি একান্তই খাইতে হয়, খাওয়ার আধ ঘণ্টা আগে অল্প গরম জল খাওয়া উচিত। রক্তহীন স্থূলতা জলপানে বাড়ে; রক্তাধিক্যের স্থূলতা জলপানে উপশম হওয়ার সম্ভাবনা।

শরীরের ওজন কমাইতে হইলে এক-একবার আহারের সময় মাত্র এক রকম খাদ্য খাওয়া উচিত—কিন্তু যাহারা রক্তহীন তাহাদের পক্ষে এ উপায় অবলম্বনীয় নহে। অল্প তৈল-পদার্থ আহার করিলে শরীরে-তাপদায়ী শ্বেতসার-ও-শর্করা-যুক্ত খাদ্য যথেষ্ট কম করা চলে। শ্বেতসার ও শর্করা খাদ্য লোকটে মোটা করে। যে-সব তরী-তরকারী মাটির উপরে জন্মে তাহা ও অল্পঘৃতসংযুক্ত রুটি মোটা লোকের পথ্য—কিন্তু শিম, মটর কলায় প্রভৃতি তরকারী পরিত্যাজ্য; আলু প্রভৃতি মূল ও কন্দ পরিবর্জ্জনীয়। রক্তহীন মোটা লোক চর্ব্বিহীন মাংস অল্প আহার করিতে পারে।

মোটা কমাইবার ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সুবিচার-কৃত ব্যবস্থায় Thyrorid extract আশ্চর্য্য রকম উপকার করে। গাত্রমার্জ্জন, গা ডলা ও বিবিধ প্রকারের স্নান স্থূলতার আনুসঙ্গিক উপসর্গ কমাইয়া থাকে।

* * *

অতার টেলিফোঁ—

বিজ্ঞানে কত অঘটন ঘটাইয়া মানুষকে আশ্চর্য্য চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে ও দিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড় কেরামতি বোধহয় এই যে সরিৎ-সাগর-ভূধরের ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার কথা পাঁচ হাজার মাইল দূরে তোমার কানে গিয়া অবিকল পৌঁছিবে, অথচ তোমার আমার মধ্যে এক আকাশের যোগ ছাড়া আর কোনো পদার্থের যোগ থাকিবে না। অতার টেলিগ্রাফের মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র; তিনি সে ক্ষেত্র ছাড়িয়া জীবনতত্ত্বে মন দিলেন বলিয়া উহা কার্য্যের উপযোগী ও উন্নত করিলেন ইটালীর উইলিয়াম মার্কনি। মার্কনি অতার টেলিফোঁ আবিষ্কারেরও চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু যুদ্ধে অতার টেলিগ্রাফ পাঠাইবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হওয়ায়, তিনি আর অপর দিকে মন দিবার অবসর পাইতেছেন না; তিনি আশা করেন যে যুদ্ধ থামিলেই তিনি উহা সম্পন্ন করিতে কৃতকার্য্য হইবেন। ডাক্তার পিটার কুপার হেওিট, বেল সাহেবের উদ্ভাবিত বর্ত্তমান টেলিফোঁ করিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, অতার টেলিফোঁ আবিষ্কার করিয়াছেন; এবং ওয়াশিংটনে কথা কহিয়া হাওাই দ্বীপে তাহা লোকের শ্রুতিগোচর করা গিয়াছে। এই দুই স্থানের দূরত্ব নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডন, পারী, রোম, বার্লিন বা ভিয়েনা অপেক্ষা বেশী; সুতরাং শীঘ্রই আমেরিকা ও য়ুরোপ তারের হাঙ্গামা না রাখিয়া অমনি কথাবার্ত্তার আদানপ্রদান করিতে পারিবে। ডাঙার উপর দিয়া অপেক্ষা জলের উপর দিয়া বাহনহীন বাক্যপ্রেরণ সহজ; মুখের কথাকে আটলাণ্টিক পার করিতে একটুও বেগ পাইতে হইবে না।

অতার টেলিফোঁ অতার টেলিগ্রাফের নিয়মেই চলে, কেবল শ্রবণ ও কথন-যন্ত্র দুটি একটু বেশী সূক্ষ্ম অনুভূতির করিতে হইয়াছে। ইহার মূল তত্ত্ব হইতেছে আকাশে ইথরের মধ্যে তরঙ্গ উৎপাদন ও সেই তরঙ্গ শ্রবণ-যন্ত্রে ধরিতে পারা; অতার টেলিগ্রাফে প্রেরকযন্ত্র হইতে ইথরের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিত হইয়া গ্রাহক যন্ত্রে গৃহীত হয়; উভয়ের মূলতত্ত্বের এই মাত্র প্রভেদ। যে উপায়ে তারবাহন টেলিফোঁ চলে ঠিক সেই উপায়েই বাহনহীন টেলিফোঁ চালানো হইয়াছে—শক্তিমান বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে প্রেরকযন্ত্রে কথা কহার কম্পন অতিমাত্রায় প্রবর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়া সেই তরঙ্গ আকাশে চলিয়া যাইতে দেওয়া হয়। এই তরঙ্গের জোর তখন এত বেশী থাকে যে তাহার ধাক্কায় একখানা এঞ্জিন স্বচ্ছন্দে চালানো যায়। কিন্তু শূন্যপথে বহু বাধা অতিক্রম করিতে করিতে সেই বেগবান তরঙ্গ এমন ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে চার পাঁচ হাজার মাইল দূরে সেই তরঙ্গ অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রে অতি মৃদু কম্পনের আকারে ধরা পড়ে এবং সেই মৃদু শব্দকম্পনকে আবার জোরালো করিয়া লইলে মানুষের কথা অবিকল ও স্পষ্ট হইয়া শ্রুতিগোচর হয়।

বর্ত্তমান অবস্থায় বাহনহীন টেলিফোঁ বার মাস যে সমান পটু থাকিবে তাহা বোধ হয় না। গ্রীষ্ম কালে আকাশের স্থৈর্য্য বোধহয় বাক্য প্রেরণের অন্তরায় হইবে; একসঙ্গে বহু লোকের কথা কহা ও শোনা চলিবে না; কিন্তু বিশেষ আবশ্যকে দূরের সঙ্গে কথাবার্ত্তার আদান-প্রদানে ইহা খুব সাহায্য করিবে নিশ্চয়। বেল কোম্পানি ও মার্কনি উভয়েই একমত যে যাহার বাহন আছে তাহা বাহনহীনের চেয়ে বেশী মজবুত ও কার্য্যক্ষম। সুতরাং কেবল দূর স্থানের সহিতই অতার টেলিফোঁ চলিবে; জাহাজে জাহাজে তারের যোগ রাখা যেখানে অসম্ভব সেখানে ইহা খুব দরকারে লাগিবে। অতার টেলিফোঁ তার-বাহনের সহকারী হইবে, ইহাকে উদ্বাস্ত করিতে পারিবে না।

ডাঃ এইচ ব্যারিংটন কক্‌স্ এক রকম চলন্ত অতার টেলিফোঁ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার তোড়জোড় এত অল্প যে সাধারণ য়ুরোপীয়ের স্বল্প পরিচ্ছদের মধ্যেও তাহা লুকাইয়া বহন করা সম্ভব; অতার টেলিগ্রাফের দীর্ঘ লৌহস্তম্ভের স্থানে হাত-ছড়ির ন্যায় একটি লোহ-লাঠি হইতে শব্দ-তরঙ্গ প্রেরিত হয়; সুতরাং তাহা হাতে থাকিলে সহজে কেহ ধরিতে পারিবে না যে দূরে কথা কহিবার যন্ত্র বহন করিতেছে, সাধারণ লাঠিই মনে করিবে; নির্জ্জন পাইলে বন্ধুকে শত্রুর ছিদ্রের সন্ধান বলিয়া দেওয়া চলিবে। সুতরাং ইহা যুদ্ধের সময় বিশেষ কাজে লাগিবে।
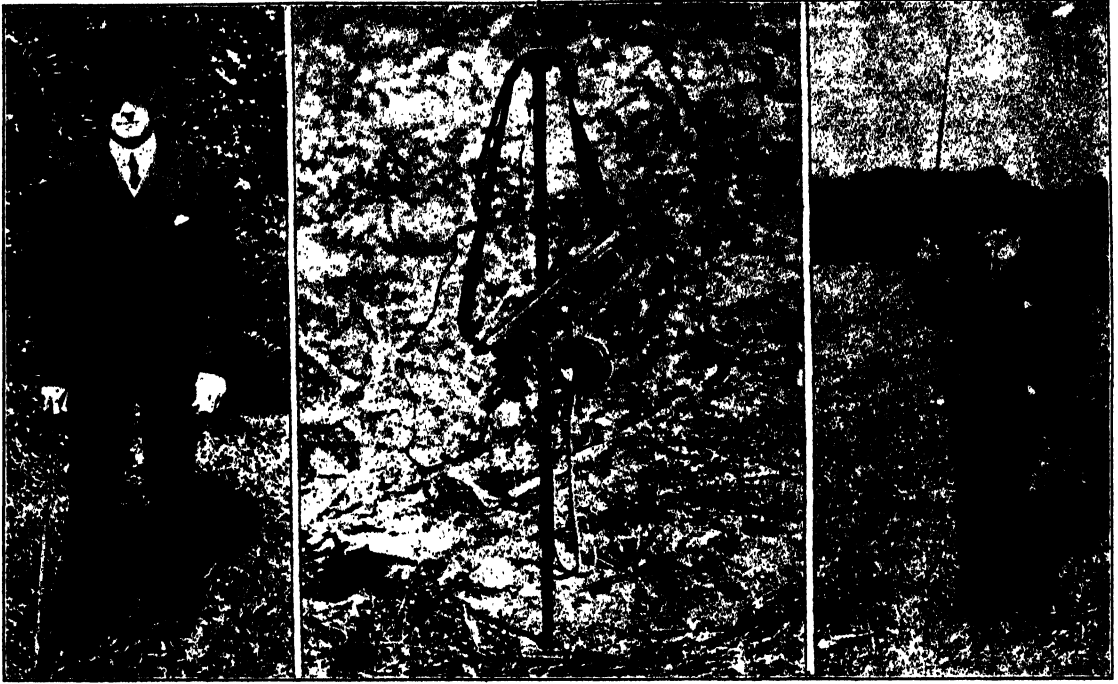
চলন্ত অতার টেলিফোঁ ও তাহার উদ্ভাবনকর্ত্তা ডাক্তার এইচ ব্যারিংটন ককস্।

নূতন সৃষ্টির জন্য দমকা ধাক্কার দরকার—

আমেরিকার New York *Times Magazine* পত্রিকায় মিঃ স্যামুএল আরউইন লিখিয়াছেন যে কোনো নূতন সৃষ্টি করিতে হইলে shock বা দমকা ধাক্কা পাওয়া দরকার। সে যে কি রকম ও কিসের ধাক্কা তাহা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা কঠিন, এক কথায় বলিতে গেলে তাহা এক প্রকার জাতীয় বিপ্লব। প্রকৃত সাহিত্য এই জাতীয় বিপ্লবের অপেক্ষা রাখে, ইহা হইতেই সকল অগ্রগতি, উন্নতি আসিয়া থাকে। যদি কোনো নূতন আইডিয়া মনে দমকা ধাক্কা না লাগায়, তবে তাহাকে অন্তত সন্দেহের চক্ষে দেখাও ভালো; সহিয়া চুপ করিয়া যাওয়া জড় মৃত প্রাণের লক্ষণ। যদি কোনো আইডিয়া মনকে নাড়া না দেয়, তবে তাহা নূতন আইডিয়া নয়। সাহিত্য গতানুগতিক পথে চলিতে চায়; যিনি সৃষ্টি করিয়া নূতন পথে সাহিত্যের গতি ফেরান তিনি পুরাতন-প্রিয়দের মনে একটা নাড়া দিয়া অনেককে তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথে ফিরাইয়া আনেন। জাতীয় জীবন ও সাহিত্য যাহাদের রক্ষণপন্থী, সংস্কারবিরোধী, তাহাদের ঔষধ দমকা ধাক্কা। সকল জাতি এক এক ধাক্কায় আগাইয়া চলিয়াছে, স্থির হইয়া আছি শুধু আমরা। কোনো কোনো প্রাচ্য জাতি সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে বড় সনাতনী, কিন্তু য়ুরোপের কোনো জাতি স্থবির নয়। আমরা প্রায় সেই স্থবিরতার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছি। ইহার কারণ যে বহুকাল আমাদের দেশে কোনো প্রকার বিপ্লব ঘটে নাই, কোনো উপদ্রবে আমাদের জীবনের গতি অভ্যস্ত খাত ছাড়িয়া ভিন্ন খাতে গিয়া পড়িবার সুযোগ পায় নাই। এ জন্যই আমরা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ জাতি হইয়া আছি। যে সামান্য সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিপ্লবেরই ফল, এবং তাহার চিহ্ন লাওেল ও এমার্সন, এমন কি ব্রেট হার্ট ও মার্ক টোএনে পর্য্যন্ত আছে। অতএব অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য জাতীয় বিপ্লব ও ব্যক্তিগত বিপ্লব দরকার! ঔপন্যাসিক সাধারণ জীবন হইতে উপন্যাসের কাহিনী আহরণ করেন না, তাঁহাকে প্লট খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় নিজের অন্তরের সকল উলটপালট-করা ভাবের বিপ্লব হইতে।

* * *

উভচর মোটর গাড়ী—

কয়েক বৎসর ধরিয়া বহু দেশে বহু লোকে উভচর মোটর গাড়ী উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছিল, এবং কেহ কেহ অল্পস্বল্প সফলও হইয়াছে। ভিয়েনা শহরের ইঞ্জিনিয়ার জাইনার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উভচর গাড়ী গড়িয়াছেন। ইহা সাধারণ মোটর গাড়ীর মতনই; কেবল পাশটা খুব উঁচু খাড়া, এবং চারিটি চাকা ছাড়া পিছনে একটা ঠেলনা পাখা থাকে (তাহা ছবিতে দেখা যাইতেছে না)। গতিশক্তি নীচের চাকায় বা পিছের পাখায় ইচ্ছামত বদল করিতে পারা যায়। চড়নদার স্বচ্ছন্দে নদীর ঢালু পাড় দিয়া নামিয়া জলে পড়িয়া চাকার গতি পাখায় দিয়া নদী পার হইয়া আবার পাখা থামাইয়া চাকা চালাইয়া ঢালু পাড় দিয়া উপরে উঠিয়া যাইতে পারে। এই যন্ত্র যুদ্ধব্যাপারে খুব উপকারে লাগিবে। ইহা জল ও কাদা জায়গার উপর দিয়াও চলিতে সক্ষম; অল্প জলে চাকা ও পাখা দুই দিয়া গাড়ী চালানো যায়; এবং ইহাতে বালিতে বা পাঁকে গাড়ী আটকাইয়া যাইবারও ভয় নাই। গতিশক্তি ১৬ ঘোড়ার জোরের মোটর হইতে দেওয়া হয়, স্থলে ঘণ্টায় ৪৫ মাইল, ও জলে ১২ মাইল যাইতে পারে।

* * *

ডাঙায়।
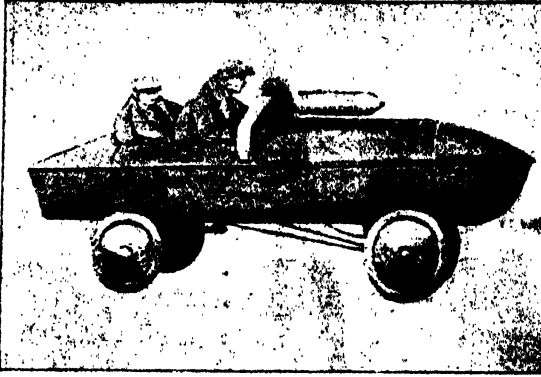
জলে।

উভচর মোটর গাড়ি।

কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন নিবানো—

পদার্থ যতই কেন দাহ্য হোক না, প্রত্যেকেরই তাপের একটা সীমা আছে, যাহার কমে তাহা কিছুতেই জ্বলিবে না। সুতরাং সেই তাপসীমার মধ্যে অতি দহনশীল পদার্থ দিয়াও আগুন নিবানো যাইতে পারে, যেন সে জিনিস মোটেই দাহ্য নহে।

সম্প্রতি The Scientific American খবর দিয়াছেন যে আমেরিকায় একটা তুলার গুদামে আগুন লাগিয়াছিল; তুলার বস্তা গুমিয়া গুমিয়া পুড়ে; তুলার বস্তার চাপে আগুন যে পরিমাণ তপ্ত থাকে ঐ পরিমাণ তাপে কেরোসিন তেল জ্বলে না; জল দিয়া তুলার আগুন নিবাইলে তুলা দাগী হইয়া যায়, সেইজন্য কেরোসিন তেল দিয়া আগুন নিবানো হইয়াছিল। অবশ্য কেরোসিন তেল দিয়া আগুন নিবাইবার সময় খুব বিচার বিবেচনা ও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এসব উদ্ভট অসম্ভাব্য ব্যাপার কেবল আমেরিকাতেই সম্ভব; অন্য দেশে জলের আশ্রয় লওয়াই নিরাপদ—হোক তুলা একটু দাগী। তুলার গাঁটের আগুন নিবাইতে কেরোসিন তৈলের ব্যবহারের আর একটু বেশী উপযোগিতা আছে। তুলার গাঁট খুব চাপিয়া কষা থাকে; উহার মধ্যে জল সহজে ঢুকিতে পারে না; কিন্তু কেরোসিন তেল জলের চেয়েও পাতলা বলিয়া গাঁটের মধ্যে সহজে ঢুকিয়া গিয়া চট করিয়া আগুন নিবায়। আগুন নিবিয়া গেলে গাঁট খুলিয়া পোড়া তুলা বাছিয়া ফেলিয়া তুলা ছড়াইয়া রৌদ্রে দিলে দু চার দিনেই তুলা হইতে কেরোসিন তেল উবিয়া যায় এবং তুলায় দাগ বা গন্ধ কিছু থাকে না।

চারু।

* * *

যুদ্ধরীতিতে বিশিষ্টতা—

যুদ্ধে মানবের মনোবৃত্তি অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, ইহাতে দেশভেদে বিভিন্ন রীতির প্রবর্তন হয়। যুদ্ধকালে মানবের মহত্ত্ব ও উদারতার সঙ্গে সঙ্গে জঘন্য পিশাচবৃত্তির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে কার্থেজবাসীগণের নিকট মৃত সেনাপতির নিন্দার ওর থাকিত না। 'একো হি দোষো গুণরাশিনাশী' এই এক দোষেই তাঁহার পূর্ব্বাপর গুণরাজী বিলুপ্ত হইয়া যাইত। চীন সেনানি মাং শত্রু-সৈন্য পরাজয়ে অসমর্থ হইলে রাজাজ্ঞায় তাঁহাকে এমন আদর্শ বধদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল যে তাহাতে অন্যান্য সেনাপতিদিগের প্রাণ বাঁচাইবার সাধ ঘুচিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা শক্তির পুরামাত্রা প্রয়োগ করিয়া রণরঙ্গে প্রমত্ত হইতে একেবারে শঙ্কাবিরহিত হইয়াছিলেন। এরূপেই সাহস দিতে হয়!

নব ফরাসীর অসভ্যগণ যখন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিত তৎকালে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত আহতদিগকে নেপালী কুলীদিগের মত ঝুড়িতে বোঝাই করিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া লইয়া যাইত। পাছে সহচরগণ শত্রুহস্তে পতিত হইয়া নির্দ্দয় ভাবে নিহত হয়, এই ভয়ে তাহারা নিজের জীবনও সংশয়াপন্ন করিত। মানবের সদ্‌বৃত্তি সঙ্কট ও বিপদের ভীষণ পেষণের ভিতরও কেমন করিয়া সাড়া দিতে চেষ্টা করে ইহা হইতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। স্পার্টার অধিবাসীগণকে কথায় কথায়ই অসি উন্মোচন করিতে দেওয়া হইত না; কিন্তু শত্রু বারংবার উত্যক্ত করিলে তাহার ধ্বংস সাধন ন্যায়ানুমোদিত ছিল।

সিথিয়াবাসীগণ যে-সকল বীরেরা স্বহস্তে শত্রুশির ছিন্ন করিতে পারিত তাহাদিগকে প্রতি বৎসর খুব বড় রকমের একটা ভোজ দিত। শত্রুর মাথার খুলি তাহাদের পানপাত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। নর-কপালের সংখ্যানুসারে তাঁহাদিগকে সুরা দানের বিধি ছিল। যে যুবা এই বীরভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইত না তাহাকে বহুদূর হইতে সতৃষ্ণ-নয়নে উক্ত বীরভোগ্য সম্মানসুখ দর্শন করিয়া লালসা পরিতৃপ্ত করিতে হইত। এই রীতির সাহায্যে সিথিয়সমাজ বীরপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিল।

যুদ্ধে মানবের ধর্ম্মবৃত্তির প্রভাব হিংসা ও দ্বেষানলে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহার স্থলে পিশাচবৃত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। পর্ত্তুগীজেরা যখন স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ সহর আক্রমণ করিয়াছিল তৎকালে উক্ত নগর-বাসীগণ ভ্রষ্টচরিত্রা রমণীদিগকে স্বদেশ-সেবায় অনুপ্রাণিত করিয়া নিশীথ-যোগে শত্রু শিবিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহার ফলে পর্ত্তুগীজ সৈন্যগণ কদর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অবশিষ্ট-গুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল। মারি অরি পারি যে কৌশলে! পক্ষান্তরে অনেক স্থলে মানুষ দেশ কাল পাত্রাপাত্র ভেদের জ্ঞানশূন্য হইয়া গোঁড়া ভাবে প্রচলিত দেশাচার ধর্ম্ম ও সঙ্কীর্ণ রাজশাসন-নীতির অনুগমন করিয়া বীরসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চেষ্টা করে। তাহার এই দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞতার পাপে সমগ্র সমাজ-দেহে যে অবসাদ আসে তাহা যুগ যুগান্তরেও কাটিয়া উঠে না।

রবিবারে রোমীয়গণ য়িহুদীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বিশ্রাম-দিবসে রক্তপাত করিবে না বলিয়া অস্ত্রত্যাগ করিয়া নির্ব্বিবাদে শত্রুদিগকে আক্রমণের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেয়। গ্রীক ইতিহাস হইতে

এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, ভারতেতিহাসও এই কুসংস্কারের প্রভাব বিবর্জ্জিত নহে। মকরাক্ষ রথে গরু বাঁধিয়া লড়াই করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু রামচন্দ্রের নিকট এ বুজরুকি খাটিল না। কবি লিখিয়াছেন—

"মকরাক্ষ এসেছিল রথে বেঁধে গরু,
বায়ুবাণে ধেনু উড়ে বেটা হৈল ভীরু।"

কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী করিয়া বীরচরিত্রের লাঘব করেন নাই।

রাজপুতেরা মুসলমানদের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য কেল্লার সম্মুখে তুলসীপত্র ছড়াইয়া রাখিয়া ও কেল্লার প্রাচীরের চারি দিকে গরু বাঁধিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ছিল, আর শত্রু তাহাদের কিছু করিতে পারিবে না,—তুলসীপত্র মাড়াইয়া কেল্লার নিকটে মুসলমান আসিবে কেমন করিয়া, পাপ হইবে না! দূর হইতে তীর গোলাগুলি ছুড়িবে কেমন করিয়া, গোবধ হইবে যে! কিন্তু মূর্খেরা ঠেকিয়া শিখিল যে মুসলমানেরা তাহাদের কুসংস্কার মান্য করে না; তুলসীদল তাহাদের যাইবার পথ কোমল করিয়া রাখিয়াছিল এবং গরুগুলি তাহাদের প্রচুর রসদ জোগাইয়াছিল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

মৌমাছি পালন

"মক্ষিকা সামান্য প্রাণী, কিন্তু তারে ধন্য মানি,
উপদেশ লহ পরিশ্রমে।
কর্ম্মের সময় যাহা, ক্ষণমাত্র বৃথা তাহা,
যেন নাহি যায় কোন ক্রমে॥"

ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কিছুই তুচ্ছ নহে। সকলের মধ্য দিয়া তিনি নিজ মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। মানুষ যখন তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করে, তখন বুঝিতে পারে, মানুষের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। "সমস্ত জীবজন্তু নিজের নিজের কার্য্যে প্রত্যেকে শ্রেষ্ঠ। আমি মাকড়সার মত জাল বুনিতে পারি না, বাবুই পাখীর মত বাসা বুনিতে পারি না, মৌমাছির মত ফুল হইতে মধু পৃথক করিতে পারি না।" মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ, সকলের মধ্য দিয়াই ভগবান পৃথক পৃথক ভাবে তাঁহার কার্য্যকৌশল প্রকাশ করিতেছেন।

মধুমক্ষিকা আমাদিগকে কতপ্রকার শিক্ষা প্রদান করিতেছে। একখানি চাকে ১০ হাজার হইতে ৫০ হাজার পর্য্যন্ত প্রাণী বাস করে, অথচ তাহাদের মধ্যে কলহ বিবাদ নাই, আশ্চর্য্য নিয়ম ও একতার সহিত কার্য্য করে। ঐ অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে ২।১ টি ব্যতীত আর সকলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অহরহ নিষ্কামভাবে খাটিতেছে,—পরের জন্য নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিতেছে। চাকে সঞ্চিত আহার না থাকিলে, ইহারা নিজে আহার না করিয়াও রাণী মক্ষিকা ও ছোট ছোট মক্ষিকাদিগকে মধু আহরণ করিয়া খাইতে দিয়া থাকে। শত্রু আসিলে ইহারা চাক রক্ষার্থ প্রাণ দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। ইহারা ফুলে ফুলে ভ্রমণ করিয়া যেমন মধু ব্যতীত অন্য বস্তু আহার করে না, তেমনি আবার সঞ্চয়ের স্পৃহা প্রবল থাকায় প্রতিবারেই মধু মুখে লইয়া গিয়া চাকে সঞ্চয় করে। ইহাদের অসাধারণ অধ্যবসায় ও সঞ্চয়ের গুণ, সকল দেশের কবিগণ অনেক প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধেও ইহারা পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে।

একজন মহাত্মা বলিয়াছেন, "মাছি মলমূত্রেও বসে, মধুতেও বসে; কিন্তু মৌমাছি কেবল মধুতেই বসে। যে মানুষ সংসারের নীচ কার্য্যে লিপ্ত হয় আবার ভগবানের নাম করে, সে মাছির ন্যায়। কিন্তু যে মানুষ কেবল ভগবানেই লিপ্ত, সে মৌমাছির ন্যায় কেবল মধুপানেই মত্ত।"

জগতে যতপ্রকার মিষ্ট পদার্থ আছে, তাহার তুলনা কবিগণ মধুর সহিত দিয়া থাকেন। সেই মধু, এই ক্ষুদ্র প্রাণী মৌমাছি মানবকে প্রদান করে। ইহাদের উপর অত্যাচার করিয়া, ইহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার উপায় দেখাইবার জন্য আমি এ প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। পরন্তু কিরূপে ইহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা যায়, কিরূপে ইহাদিগকে যথাসাধ্য আরাম দেওয়া যায়, এবং কিরূপে ইহাদের নিকট হইতে মানুষের পরম উপকারী বস্তু মধু, ইহাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট না দিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং তৎপরিবর্ত্তে ইহাদিগকে কি আহার্য্য দ্রব্য দেওয়া যাইতে পারে, তাহাই দেখান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। মধু-মক্ষিকার কার্য্যকলাপ এবং কৌশলও পাঠকগণের গোচর করিতে ইচ্ছা।

পায়রা, কুকুর, খরগোস প্রভৃতি যেমন পোষা হয়, সেইরূপ মৌমাছিও পোষা যাইতে পারে। মৌমাছি দেখিয়া লোকে ভয় পায়; কিন্তু মৌমাছির চাক নাড়িতে নাড়িতে এরূপ অভ্যস্ত হইতে পারা যায় যে মৌমাছির চাকযুক্ত বাক্স বাসস্থানের বারাণ্ডায় রাখিলেও তাহারা মানুষকে কামড়ায়

না। গরু পুষিয়া যেমন দুগ্ধ পাওয়া যায়, মৌমাছি পুষিয়া, তাহাদের প্রতি হিংসা না করিয়াও, তাহাদের চাক হইতে মধু লওয়া যাইতে পারে। ইচ্ছা করিলে ২।১ খানি মৌচাক গৃহস্থেরা বাটীতে রাখিতে পারেন।

বিলাতে মৌমাছি পালন একটি লাভজনক ব্যবসায়। আমাদের দেশে প্রায় সকল ব্যবসায়ই নূতন। এখনও আমাদের কেবল শিখিবার অবস্থা। শিখিবার অবস্থায় লাভ হইতেও পারে, কিন্তু ক্ষতি হইবারই অধিক সম্ভাবনা। প্রথম অবস্থায় ক্ষতি হইলেই যদি মনে করা যায় যে, সে ব্যবসায়টি লাভজনক হইতে পারে না, তাহাকে ভ্রম ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? যখন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সেই ব্যবসায় দ্বারা লাভ হইতে দেখা যায়, তখন আমাদের দেশে হইবে না কেন? আমাদের দেশে প্রধানতঃ ৩টি কারণে ব্যবসা দ্বারা লাভ হয় না—১ম, অর্থাভাব; ২য়, অধ্যবসায়ের অভাব; ৩য়, ব্যবসায়-বিশেষের শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার অভাব।

মোম ও মধু সংগ্রহ আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে, কিন্তু মধুমক্ষিকা পালন আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত হয় নাই। অনেকে বলেন, আমাদের দেশে আরণ্য মধু এত অপর্য্যাপ্ত ও সস্তা, যে কৃত্রিম উপায়ে এ ব্যবসায়ের কোন প্রয়োজনই নাই। পূর্ব্বে অবশ্য মধু সস্তা ছিল, এবং মধুতে ভেজালও থাকিত না। কিন্তু এখন ইহা ক্রমেই দুর্ম্মূল্য হইতেছে, এবং খাঁটি মধু বাজারে প্রায় পাওয়াই যায় না। বাসি মধু অনেক সময় মাতিয়া গাঁজিয়া উঠে; তাহা দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ। সুতরাং টাটকা মধুই সুস্বাদ ও উপকারী। সুতরাং মধুমক্ষিকা পালন ব্যতীত টাটকা মধু সর্ব্বদা পাওয়ার কোনো উপায় নাই।

মধু অনেক রোগের ঔষধে ব্যবহার হয়। নবজাত সন্তানকে মধু খাওয়াইবার ব্যবস্থা আছে। গ্রীষ্মকালে মধুর সরবত অতি উপাদেয়। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই এক এক বোতল খাঁটি মধু থাকা আবশ্যক।

পদ্মের মধু চক্ষুরোগের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। গোলাপ বাগানের নিকটস্থ মধুচক্রের মধু সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহাতে গোলাপ ফুলের সুগন্ধ ছিল। শর্দ্দি বা কাশি হইয়া গলা ভাঙ্গিয়া গেলে মধু এবং আদার রস একত্রে মিশাইয়া খাইলে অতি শীঘ্র রোগ উপশম হয়। ছোট ছেলেদের শর্দ্দি বা কোষ্টবদ্ধ হইলে মধু এবং তুলসী-পাতার রস অত্যন্ত উপকারী।

মধুমক্ষিকা হইতে আমরা মধু পাইয়া থাকি বটে কিন্তু মধু জিনিষটা মৌমাছির নিজস্ব নহে। মৌমাছি ফুল হইতে ইহা সংগ্রহ করে এবং প্রয়োজনের অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করে বলিয়াই ইহা মৌচাকে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌচাকের মধু ঠিক ফুলের মধুও নহে, কারণ মধু প্রথমতঃ মৌমাছির উদরস্থিত মধুস্থলীতে সঞ্চিত হয়। তাহার পর মৌমাছি যখন চাকে আসিয়া বসে তখন সে উহা উদ্গিরণ করিয়া ফেলে। মৌমাছির উদরে থাকার সময় মধুতে কতিপয় রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। সুতরাং খাঁটি ফুলের মধুর সহিত ইহার কিছু পার্থক্য আছে।

আমাদের দেশে এখন যে মধুসংগ্রহের প্রথা আছে, তাহাতে (১) মক্ষিকাগুলিকে চাক ভাঙ্গিয়া গৃহশূন্য করিয়া তাড়াইয়া দিতে হয়; (২) তাহাদের ডিম এবং বাচ্ছা-গুলিকে মারিয়া ফেলা হয়; এবং (৩) মক্ষিকাগুলিকে কিছুদিনের জন্য অনাহারে এবং অতিশয় কষ্টে ফেলিতে হয়। কিন্তু ইউরোপীয় নিয়মানুসারে মধুমক্ষিকা পালনে লাভ এই যে ১) ইচ্ছামত যখন-তখন খাঁটি মধু পাওয়া যাইতে পারে, (২) মক্ষিকাগুলিকে না মারিয়া এবং চাক না ভাঙ্গিয়া মধু সংগ্রহ করা যায়, (৩) ইচ্ছানুযায়ী চাকের বাক্স পদ্মবনে রাখিয়া পদ্মের মধু এবং গোলাপের বাগানে রাখিয়া গোলাপের মধু সংগ্রহ হইতে পারে, (৪) মধু সংগ্রহের একটি কুঠি বা farm খুলিলে তাহাতে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ, অনেক মধুমক্ষিকার বাসভূমি। এ দেশের সকল সময় এবং সকল স্থানই পুষ্পশোভিত, এখানকার জলবায়ুও মধুমক্ষিকার উপযোগী। সুতরাং মধুমক্ষিকা-পালন এখানে সুবিধাজনক। আমেরিকায় পূর্ব্বে মধুমক্ষিকা একেবারেই ছিল না। ইউরোপ হইতে সেখানে মধুমক্ষিকা লইয়া গিয়া প্রথম মধুমক্ষিকা পালন আরম্ভ হইয়াছিল। এখন সেখানে এ ব্যবসায়ের খুব উন্নতি হইয়াছে।

মৌমাছি পালনের কুঠি।
(ইংলণ্ডে ডোভারের নিকট রিপল্ কোর্ট এপিয়ারী)

পুষা কলেজে মধুমক্ষিকা পালন করা হয় এবং সেখানে এই ব্যবসায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও আছে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ চারি জাতীয় মধুমক্ষিকা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—১) Apis dorsata (২) Apis Indica ৩) Apis flora এবং (৪) Melipona Sp।

Apis dorsata নামক মৌমাছিকে পাহাড়িয়া মৌমাছি বলিতে পারা যায়। ইহারা পর্ব্বত-গাত্রে, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় কিম্বা সময়ে সময়ে বড় বড় বাড়ীর প্রাচীরে একটিমাত্র বৃহদায়তন চাক প্রস্তুত করে। চাক প্রস্থে এমন কি তিন হাত সাড়ে তিন হাত পর্য্যন্ত হয়। ইহা কখনই আচ্ছাদিত স্থানে চাক প্রস্তুত করে না। এক-একটি চাকে পঁচিশ ত্রিশ সের পর্য্যন্ত মধুও পাওয়া যায়। এই মৌমাছি এত কোপনস্বভাব যে ইহাদিগকে পালন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার।

পক্ষান্তরে Apis indica জাতীয় মৌমাছি সকল সময়ে আচ্ছাদিত স্থানেই চাক প্রস্তুত করে। বৃক্ষের কোটরে, প্রাচীরের গহ্বরে, অব্যবহৃত গৃহে অথবা গৃহসজ্জাদিতে ইহাদের চাক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সমান্তরাল-ভাবে সজ্জিত একাধিক চাক প্রস্তুত করে। এই জাতীয় পার্ব্বত্য মক্ষিকা নিম্নদেশস্থ মক্ষিকা অপেক্ষা কিছু বড়। ইহাদের চাকে গড়ে বৎসরে তিন সের সাড়ে তিন সেরের অধিক মধু পাওয়া যায় না। সুতরাং মধুসঞ্চয়-হিসাবে ইহারা ১ম শ্রেণীর মক্ষিকা অপেক্ষা অপকৃষ্ট।

Apis flora মক্ষিকা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর। ইহারা একটিমাত্র চাক প্রস্তুত করে বটে কিন্তু ইহাদের চাক প্রস্থে সাধারণতঃ ৬।৮ ইঞ্চির অধিক হয় না। ঝোপ ঝাপ ও ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিতে ইহাদের চাক অনেক সময় দৃষ্ট হয়। চাক হইতে উৎপাদিত মধুর পরিমাণ অত্যন্ত কম—আধপোয়া এক-পোয়ার অধিক নহে।

Melipona Sp. নামক মধুমক্ষিকা ভারতীয় মধুমক্ষি-কার মধ্যে ক্ষুদ্রতম। ইহা ব্রহ্মদেশেই অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহার চাকে মোমের পরিবর্ত্তে যে একপ্রকার রজন পাওয়া যায় তাহা বার্ণিস ও অপরাপর কার্য্যের জন্য অল্প বিস্তর মাত্রায় রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহারা অতি অল্প পরিমাণে মধু সঞ্চয় করে। এই জাতীয় মক্ষিকা-পালনে সুতরাং লাভের আশা বড় অধিক নাই। ছোট মৌমাছিকে সংস্কৃতে ক্ষুদ্রক ও তাহার মধুকে ক্ষৌদ্র বলে।

মৌমাছিদের অন্যভাবে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে

পারে। প্রথমতঃ যাহারা একটিমাত্র চাক নির্ম্মাণ করে; দ্বিতীয়তঃ যাহারা পাশাপাশি অনেকগুলি চাক নির্ম্মাণ করে। প্রথম প্রকারের মধুমক্ষিকা দুই জাতীয় দেখা যায়, এক অতি ছোট জাতীয় (Apis flora) এবং অন্য খুব বড় জাতীয় পাহাড়ে মক্ষিকা (Rock bee)। দ্বিতীয় প্রকারের মধুমক্ষিকা মাঝারি আকারের; তাহাদিগকে (Apis Indica) কহে। আমাদের দেশে Apis Indicaই পালন করিবার উপযুক্ত। এই জাতীয় মক্ষিকার সহিত ইটালিয়ন মক্ষিকার অনেক সাদৃশ্য আছে। ইটালিয়ন মক্ষিকা Apis Indica হইতে কিছু বড়। এই দুই জাতীয় মক্ষিকার কার্য্যপ্রণালী প্রায় একরূপ।

মৌমাছির জীবনবৃত্তান্ত অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। জন্ম হইতে আরম্ভ করিলে ইহার জীবনের চারিটি বিভিন্ন অবস্থা অথবা রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—(১) ডিম্ব (২) কীড়া (৩) পুত্তলী (গুটির অবস্থা) এবং (৪) পূর্ণাবয়ব-প্রাপ্ত মক্ষিকা। একটি মৌচাক ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে চাকের কোন কোন কোষে অতি ক্ষুদ্র ঈষৎ বক্র শ্বেতবর্ণ নলাকার পদার্থ রহিয়াছে। উহাই ডিম্ব। প্রায় তিন দিনের পর ডিম ফুটে এবং তখন দ্বিতীয় অর্থাৎ কীড়া অবস্থা আরম্ভ হয়। শ্রেণীভেদে মধুমক্ষিকা ছয় বা সাত দিবস কীড়া পালন করিয়া তাহার পর কোষের মুখ আবৃত করিয়া দেয়। আবৃত হওয়ার পর ১১ কিম্বা ১৭ দিবস পর্য্যন্ত কীড়া ক্রমশঃ পুত্তলীতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই সময়ের অবসানে মৌমাছি পূর্ণদেহপ্রাপ্ত পতঙ্গরূপে বাহির হইয়া আসে।

মধুমক্ষিকার চাকে তিন প্রকারের মক্ষিকা থাকে।—(১) রাণীমক্ষী (Queen bee) (২) দাসীমক্ষী (worker bee); এবং (৩) পুংমক্ষিকা বা নর (Drones)।

এক মধুচক্রে একটি মাত্র রাণীমক্ষিকা থাকে। ইহার আকার অন্যান্য মক্ষিকা হইতে বড়; লেজের অংশটি লম্বা এবং পাখা খুব ছোট। ইহার কার্য্য কেবল ডিম-পাড়া। ইহা মধু অন্বেষণে যায় না, সর্ব্বদা চাকেই বসিয়া থাকে। চাকের সমস্ত মক্ষিকা ইহার সন্তান। ইহা ৪।৫ বৎসর জীবিত থাকে। রাণীমক্ষিকা চাকের যে ঘরে
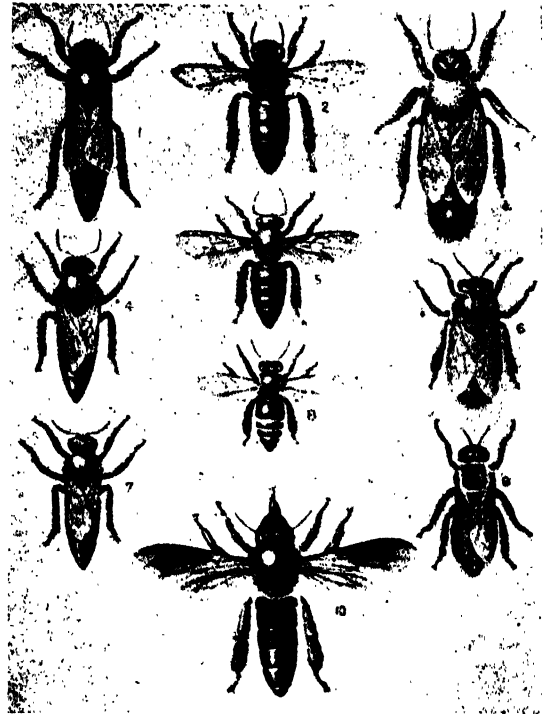
মধুমক্ষিকা।

১। রাণী য়ুরোপীয় মক্ষিকা—ইটালিজাতীয় (Apis melifica)
২। দাসী ,, ,, ,,
৩। পুং মক্ষী ,, ,, ,,
৪। রাণী ভারতীয় মক্ষিকা (Apis Indica)
৫। দাসী ,, ,,
৬। পুং মক্ষী ,, ,,
৭। রাণী ক্ষুদ্র মক্ষিকা (Apis flora)
৮। দাসী ,, ,,
৯। পুং মক্ষী ,, ,,
১০। দাসী পাহাড়িয়া মক্ষিকা (Apis dorsata)

জন্মগ্রহণ করে, তাহা চাকের মধ্যস্থিত অন্যান্য ঘর অপেক্ষা অনেক বড় এবং চাকের প্রান্তভাগে স্থিত। যখন রাণী-মক্ষিকা উৎপন্ন করা প্রয়োজন হয়, দাসীরাই চাকের এক প্রান্তভাগে একটি বা দুইটি বড় ঘর প্রস্তুত করে, এবং রাণীমক্ষিকা সেই রাজকোষে ডিম পাড়ে। একটি রাণী-মক্ষী ২০০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়িতে পারে। ৩ দিনে এই সব ডিম ফোটে। ডিম ফুটিলে সেই পোকাকে রাণীর উপযুক্ত বলকারক এক প্রকার খাদ্য দাসীরা খাইতে দেয়। ডিম ফুটিবার ৫।৬ দিন পরে সেই ঘরের মুখটি মোম দ্বারা বন্ধ করা হয়। গুটিপোকার ন্যায় বদ্ধঘরে ৭ দিন থাকিয়া

রাজকোষ।

A—গঠিত হইতেছে।

B—রাজকোষে রাণী মৌমাছির পুত্তলী অবরুদ্ধ হইয়াছে।

C—রাণী মৌমাছি রাজকোষ কাটিয়া বাহির হইয়াছে।
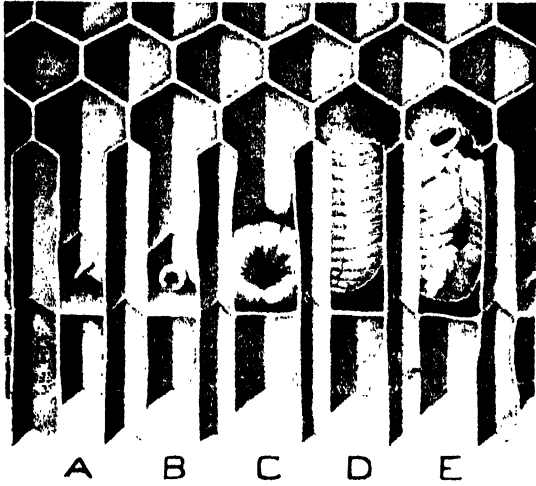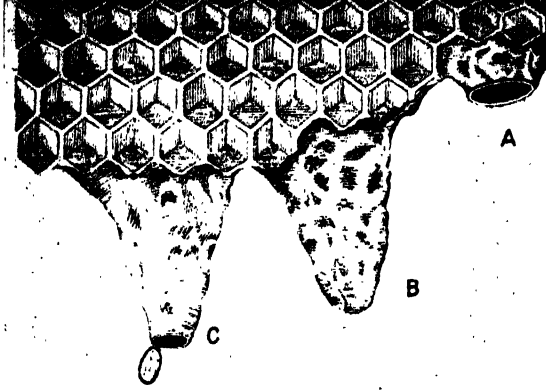
মৌমাছির বিকাশের ধারা।

A—ডিম। B—কীড়া। C—বৰ্দ্ধিত কীড়ার কুণ্ডলী। D—পুষ্ট কীড়া রুদ্ধকোষে গুটি বাঁধিবার অবস্থায়। E—রুদ্ধ কোষে মৌমাছির পুত্তলি।

পোকাটি রাণীমক্ষিকার আকার ধারণ করিয়া বাহির হয়। ডিম্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে রাণী-মক্ষীর সাড়ে পনর দিন লাগে। নূতন রাণী ঘর হইতে বাহির হইলেই, সেই ঘরটি দাসী-মক্ষিকারা নষ্ট করিয়া ফেলে। পূর্ণাবয়ব-প্রাপ্তির ৫।৬ দিন পরে নূতন রাণী, দিবসের মধ্যভাগে, যখন সূর্য্য মেঘাবৃত না থাকে, চাকের বাহিরে চলিয়া যায় এবং ইতস্ততঃ উড়িতে থাকে। সে সময় কএকটি পুংমক্ষিকা তাহাকে আক্রমণ করে, এবং একটির সহিত তাহার সঙ্গম হয়। ইহাদের এমনি নিয়ম যে চাকের মধ্যে অনেক পুংমক্ষিকা থাকিলেও কখনও সেখানে সঙ্গম হয় না। চাকের বাহিরে ঐ প্রকার সঙ্গমের পর পুংমক্ষিকাটি মরিয়া যায়। জীবনে এই একবার সঙ্গম ব্যতীত রাণী মক্ষিকার আর কখনও পুং-মক্ষিকার সহিত সহবাস হয় না। যদি প্রথম দিনে বাহির হইলে সঙ্গম না হয় তাহা হইলে কএক দিন ধরিয়া ঐ প্রকার চাকের বাহিরে যাইতে থাকে। এবং সঙ্গম হইলেই রাণী চাকে আসিয়া বদ্ধ হয়, আমরণ আর বাহিরে যায় না। যদি তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যহ বাহির হইয়াও কোনবারেই সফলমনোরথ না হয়, তাহা হইলে রাণী চাক হইতে আর বাহির হয় না; রাণী চিরকুমারী হইয়া বদ্ধ থাকে।

রাণী মক্ষিকার শরীরে দুইটি জরায়ু আছে; সঙ্গমের পর একটিতে পুংবীর্য্য সঞ্চিত হয় এবং অপরটিতে ডিম্ব-প্রজনন রস থাকে। ঐ রস ডিম্বের আকার ধরিয়া বাহির হইবার সময় অপর থলিস্থিত পুংবীর্য্যে সংস্পৃষ্ট হইলেই তাহার সম্পূর্ণত্ব সাধিত হয়। এই প্রকার ডিম্ব হইতে রাণীমক্ষিকা এবং দাসী-মক্ষিকার জন্ম হইতে পারে। পুংবীর্য্যে সংস্পৃষ্ট না হইয়া ডিম্ব বাহির হইলে তাহাতে কেবল পুংমক্ষিকার জন্ম হয়। পুংবীর্য্যের থলি রাণী ইচ্ছামত খুলিতে বা বন্ধ রাখিতে পারে; সুতরাং যে জাতীয় মক্ষিকা হউক রাণী ইচ্ছামত উৎপন্ন করিতে পারে। বীর্য্য-সংপৃক্ত ডিম্ব হইতে কেবল মাত্র মাদি মক্ষিকাই জন্মে। ঐ প্রকার ডিম্ব চাকের প্রান্তস্থিত বড় ঘরে রাখা হইলে এবং ভালরূপে পুষ্টিকর খাদ্যে পালিত হইলেই রাণী মক্ষিকা উৎপন্ন হয়; এবং ঐ প্রকার ডিম্ব সাধারণ ঘরে থাকিলে ও সাধারণভাবে পালিত হইলে তাহা হইতে দাসী মক্ষিকা উৎপন্ন হয়। রাণী ও দাসী উভয়েই স্ত্রীজাতীয়, তফাৎ এই যে রাণী পরিপুষ্টাঙ্গ বলিয়া প্রজাবতী হইতে পারে, এবং দাসীদের প্রজনন-শক্তি জন্মে না। ডিম্ব পুংবীর্য্যে সংস্পৃষ্ট না হইলে, অথবা থলিস্থিত পুংবীর্য্য ফুরাইয়া গেলে তাহা হইতে পুংমক্ষিকা উৎপন্ন হয়। রাণী বৃদ্ধা হইলে পুংবীর্য্য ফুরাইয়া যায়, সুতরাং স্ত্রী-মক্ষিকা জন্ম লইতে পারে না, কেবল

পুংমক্ষিকাই জন্মে। তাহার পূর্ব্বে নূতন রাণী উৎপাদন না করিলে চাক নষ্ট হইয়া যায়। রাণীর সহিত পুংমক্ষিকার সহবাস না হইলেও সে ডিম পাড়িতে পারে, কিন্তু সে অবস্থায় পুংমক্ষিকা ব্যতীত অন্য মক্ষিকার জন্ম দিতে পারে না।

দাসী-মক্ষিকা সর্ব্বদাই কাজ করিতে থাকে। মধু সংগ্রহ করা, চাক প্রস্তুত করা, মধু রাখা, মধুর ঘর বন্ধ করা, পাহারা দেওয়া, রাণীর সেবা ইত্যাদি সকল কার্য্যই ইহারা করে। সূর্য্যোদয় হইতে-না-হইতেই ইহারা বাহিরে যায়; মধু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া চাকে অল্পক্ষণ বসিয়া পাহারার কার্য্য করে; তৎপরে আবার মধুসংগ্রহে বাহির হয়। ইহারা মধু আনিতে প্রায় এক ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। ইতিমধ্যে চাকে কোন বিপদ হইলে, চাকে উপস্থিত দাসী-মক্ষিকারা উড়িয়া গিয়া সহচরীদের সংবাদ দেয়, এবং তখন সকল মক্ষিকা চাকে আসিয়া উপস্থিত হয়। দাসী-মক্ষিকা ৬ মাসের অধিক জীবিত থাকে না। ইহারা স্ত্রীজাতীয়, কিন্তু সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা ইহাদের নাই। ইহারা পালা করিয়া চাকে পাহারা দেয় এবং শত্রুকে কামড়াইতে পারে। ইহাদের হুলের গোড়ায় একটি বিষের থলি থাকে। হুলটি ফলার ন্যায়, সুতরাং মক্ষিকা কামড়াইলে সেই থলিটি সুদ্ধ দষ্ট স্থানে থাকিয়া যায়। দষ্ট স্থানটি তাড়াতাড়ি রগড়াইলে থলি হইতে বিষ বাহির হইয়া শরীরে প্রবেশ করে ও তাহাতে যন্ত্রণা বেশী হয়। কিন্তু দংশন করিবামাত্র হুল ও বিষের থলি আস্তে আস্তে তুলিয়া ফেলিলে যন্ত্রণা অধিক হয় না। দংশন করিতে গিয়া বিষের থলি ছিঁড়িয়া গেলে মক্ষিকাটি মরিয়া যায়।

একটি মাঝারি আকারের মৌচাকে দাসী-মক্ষিকার সংখ্যা বিশ হাজারের কম থাকে না। ইহাদিগকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া ইহারা অধিক দিন বাঁচে না। একটি দাসী-মক্ষিকার আয়ু দেড়মাস হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত। কিন্তু যাহাতে চাকের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তজ্জন্য সকল সময়েই যথেষ্ট পরিমাণে দাসী-মক্ষিকা জন্মাইবার ডিম্ব মজুদ থাকে। বস্তুতঃ একটি চাকের অধিকাংশ ডিম্বই দাসী-মক্ষিকা উৎপাদন করে। রাণী অথবা পুংমক্ষিকা উৎপাদনের উপযুক্ত ডিম্ব কেবল সময় সময় প্রয়োজন অনুসারে প্রস্তুত হয় মাত্র।

পুং-মক্ষিকা দাসী-মক্ষিকা অপেক্ষা আকারে বড়। সেই জন্য যে-সকল কোষে ইহাদের কীড়া প্রতিপালিত হয় সেগুলিও অপেক্ষাকৃত বড়। বৎসরের সকল সময় চাকে পুং-মক্ষী দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন নূতন রাণী প্রতিষ্ঠার আবশ্যক হয় তখনই ইহাদের সৃষ্টি হয়। একটি চাকে এক সময়ে ৫।৬টির বেশী নর্-মক্ষী থাকে না। ইহাদের সাধারণ আয়ু প্রায় দুই মাস, কিন্তু রাণীর গর্ভোৎপাদন ভিন্ন ইহাদের আর কোন কার্য্য না থাকায় এবং ইহারা নিজেদের
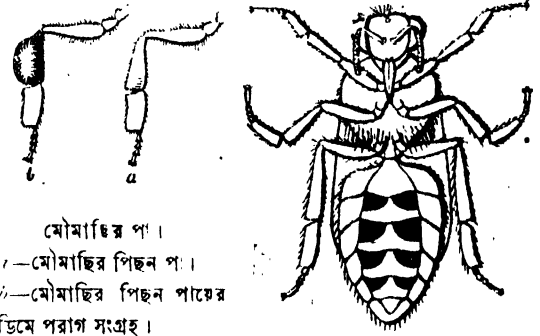
মৌমাছির পা।
a—মৌমাছির পিছন পা।
b—মৌমাছির পিছন পায়ের ডিমে পরাগ সংগ্রহ।

মৌমাছির পেটে মোম তৈয়ারির গ্রন্থি (কালো দাগগুলি)

আহার নিজেরা সংগ্রহ করিতে পারে না বলিয়া দাসী-মক্ষিকারা ইহাদের দ্বারা একবার কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে ইহাদের পক্ষচ্ছেদ করিয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। এইরূপ অসহায় অবস্থায় ইহারা শীঘ্রই অকালে মরিয়া যায়। কখনো কখনো দাসীরা ইহাদিগকে মারিয়াও ফেলে।

পুংমক্ষিকারা যেমন কোন কাজ করে না, তেমনি তাহারা কামড়াইতেও পারে না। নর্-মৌমাছি দাসীর ঘরে জন্মিলে আকারে ছোট হয়। এজন্য তাহাদের ঘর মৌচাকে স্বতন্ত্র থাকে; তিন দিনে ডিম ফুটিয়া নর্-মৌমাছির কীড়া বাহির হয়; এবং পুষ্টাঙ্গ পুংমৌমাছি উৎপন্ন কর্ব্বিবার জন্য দাসীরা সযত্নে তাহাদিগকে রাজার হালে রাখে ও পুষ্টিকর খাদ্য জোগায়। গুটিবাঁধার ১৩ দিন পরে নর্-মৌমাছি পূর্ণাবয়ব হইয়া মৌচাক হইতে বাহির হয়।

চাকের উপর অংশে মধু থাকে এবং নিম্ন অংশে ডিম

পোষ মৌমাছির চাক পরীক্ষা।

মৌমাছি পুষিবার চাকের বাক্স।
R—ডালা। B—দেয়ালের ঘের। F—গোড়াঞ্চে। A—মৌমাছির ঘরে ঢুকিবার দরজার সামনে অবতরণের বারান্দা।

এবং বাচ্ছা থাকে। ঘরগুলি মধুপূর্ণ করিয়া মক্ষিকাগণ তাহার মুখ মোম দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। প্রয়োজন হইলে ইহার ঢাকনি কাটিয়া মধু খায়।

রাণী-মক্ষিকা প্রতি ঘরে ঘরে একটি করিয়া ডিম পাড়ে। কিছু দিন পরে সেই ডিম ফুটিয়া তাহা হইতে লম্বা পোকা বা কীড়া জন্মায়। যে-সকল ছোট মক্ষিকা তখনও উড়িতে শেখে নাই তাহারা ভাণ্ডার হইতে খাদ্য লইয়া সেই কীড়াগুলিকে খাওয়াইবার কার্য্য করে। কীড়াগুলি তৎপরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিজ নিজ ঘরের মধ্যে নিজের লালায় গুটি বাঁধে। গুটি বাঁধিলে দাসী-মক্ষিকারা সেই ঘরগুলির মুখ মোম দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। কিছুদিন এই অবস্থায় থাকিয়া পোকাগুলি মক্ষিকা আকারে পরিণত হয় এবং ঘরের মুখ কাটিয়া বাহিরে আইসে। ৮।০ দিন পরে ইহারা চাকের বাহিরে গিয়া কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়। সকল ডিমই এক আকারের। রাণী ও নর্ মৌমাছির কীড়া কিন্তু দাসী-মৌমাছির কীড়ার চেয়ে আকারে বড় হয়। আবার রাণী-মৌমাছির চোখ দুটি ঘেঁষাঘেঁষি থাকে ও নর্-মৌমাছির তফাত তফাত থাকে—ইহা দেখিয়া উহাদিগের কীড়ার পার্থক্য বুঝা যায়।

মক্ষিকাগণ চাকের ভিতর মলমূত্র ত্যাগ করে না। চাকের মধ্যে কোন মৃত মক্ষিকা বা ময়লা থাকিলে দাসীরা তৎক্ষণাৎ তাহা বাহিরে ফেলিয়া দেয়। ইহারা চাক সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখে। গরম হইলে পাখা নাড়িয়া চাকের নিকট বাতাসের প্রবাহ দেয়। তাহাতে শন্ শন্ শব্দ হইতে থাকে, যেন জোরে নিশ্বাস ফেলিতেছে।

অত্যন্ত শীতের সময় মধুমক্ষিকারা চাকের বাহিরে গিয়া মধুসংগ্রহ করিতে পারে না। এই সময় ডিম পাড়াও বন্ধ থাকে এবং অনেক মক্ষিকা উপযুক্ত আহারের অভাবে মারা যায়। তাহাদের আহারের জন্য চিনির রস এবং ময়দা গোলা মিশাইয়া একটি পাত্রে করিয়া চাকের নিকট রাখিয়া দিলে তাহাদের আহারের সুবিধা হয়।

মধুমক্ষিকার পক্ষে বর্ষাকালও অত্যন্ত কষ্টকর সময়। এ সময় অনেক চাক নষ্ট হয় এবং অনেক মক্ষিকা মরিয়া যায়। মাঘ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত ইহাদের খুব স্ফূর্ত্তির সময়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে মধুকালে ইহারা নূতন রাণীর সৃষ্টি করিয়া দল বৃদ্ধি করে। ঐ সময় মক্ষিকাদের অনেক স্থানে চাক বাঁধিতে দেখা যায়। ছোট বড় সকল প্রকার গাছে এই সময় ফুল হওয়াতে ইহাদের সুখের আর পরিসীমা থাকে না।

মধুমক্ষিকার চাক কোথায় আছে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, ২০০ গজ আন্দাজ ব্যবধানের দুইটি স্থানে অল্প অল্প মধু ছিটাইয়া দিতে হয়। মধুমক্ষিকারা সেই দুই স্থানের মধু খাইতে আইসে। মধু খাইয়া তাহারা যে দিকে উড়িয়া যায় তাহা লক্ষ্য করিয়া দুই স্থান হইতে দুই ব্যক্তি সেই সেই দিকে অগ্রসর হইয়া যেখানে উভয়ে মিলিত হইবে, তাহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে চাক আছে বুঝিতে হইবে।

Apis Indica মধুমক্ষিকার চাকে ১০ হাজার হইতে ৫০ হাজার মক্ষিকা বাস করে। ইহারা সকলেই এক বংশের। অন্য চাকের মক্ষিকাকে ইহারা স্থান দেয় না। দিবাভাগে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যা এক সময়ে মধু অন্বেষণে বাহিরে যায়।

মৌমাছিরা নিজের দলের মক্ষিকাকে গায়ের গন্ধ শুঁকিয়া চিনিতে পারে। চাকের মুখে বসিয়া যাহারা পাহারা দেয় তাহারা যেসকল মক্ষিকা ভিতরে প্রবেশ করে তাহাদের প্রত্যেককে দেখিয়া লয়। নিজের চাকের মক্ষিকা না হইলে তখনই তাহাকে মারিয়া ফেলে। বোল্‌তা, ভিমরুল, ডেয়েপিঁপড়ে, ফিঙে ইহাদের শত্রু। ইহারা যখন চাকের কাছে আইসে, রক্ষক মক্ষিকাগণ প্রাণের ভয় না করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। চাকের সমস্ত মক্ষিকা একত্রে কাহাকেও আক্রমণ করে না। যাহারা রক্ষকের কার্য্য করে তাহারাই দংশন করিতে যায়।

ইহারা চাকে কোন বিপদ দেখিলেই মধুপূর্ণ প্রকোষ্ঠগুলি কাটিয়া মধু বাহির করিয়া খাইয়া ফেলে এবং যতটা সম্ভব মুখে লইয়া অন্যত্র পলায়ন করে। মধু না খাইলে ইহারা মোম উৎপাদন করিতে পারে না এবং মোম না থাকিলে
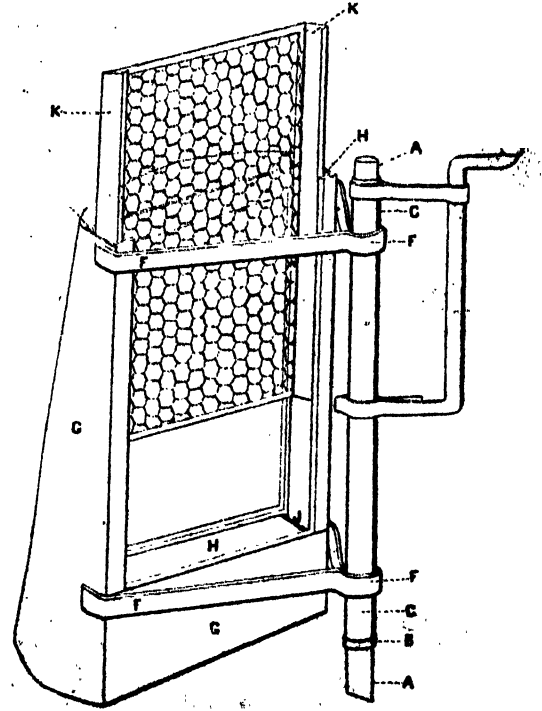
চাক না ভাঙিয়া মৌচাক হইতে মধু নিংড়াইবার কল।

চাক প্রস্তুত হয় না। ইহাদের পেটের ভিতরের গ্রন্থি হইতে মোম বাহির হয়। মোম তৈয়ারির গ্রন্থি শুধু দাসীদের থাকে, রাণী বা নর মৌমাছির মোম তৈয়ারির গ্রন্থি থাকে না। একটি চাক ছাড়িয়া অন্যত্র চাক করিতে হইলে ইহাদের অনেক মধু খাইতে হয়। ইহারা ফুলের এবং গাছের নরম ছালের রেণু পিছন পায়ের লোমে জড়াইয়া সংগ্রহ করিয়া আনে, এবং তাহাতে মধুমিশ্রিত করিয়া আহারের জন্য চাকের কতকগুলি প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দেয়।

মৌমাছির চাকের সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলি ছকোণা ও এক ঘরের ছটি দেয়াল ঠিক একই মাপের হয়।

গ্রীষ্মকালে যখন চাকের মধ্যে মক্ষিকার সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হয়, তখন নূতন রাণীর সৃষ্টি করিয়া দিয়া পুরাতন রাণী একদল মক্ষিকা সঙ্গে লইয়া অন্যত্র পৃথক চাক নির্ম্মাণ করে। ইহাতেই মক্ষিকা-দলের বৃদ্ধি হয়। এক বৎসরে এক চাক হইতে এই প্রকারে ২।৩ দল কখনও কখনও

বাহির হয়। এইরূপ করাকে দলভঙ্গ বা উপনিবেশ স্থাপন বলা যাইতে পারে।

মধুমক্ষিকার স্বভাব ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্য পাঠকগণের গোচর করা হইল। মধুমক্ষিকা পুষিতে হয় কেমন করিয়া এখন তাহা বলা আবশ্যক। মধুমক্ষিকা পুষিতে হইলে তাহাদের থাকিবার উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিতে হইবে। ইহারা চাক বাঁধিবার জন্য স্বভাবতঃ গাছের কোটর, দেয়ালের ফাটল, গাছের ঝোপ প্রভৃতি এমন স্থান অনুসন্ধান করে, যেখানে বৃষ্টি বা শীত বা সূর্য্যের আলোক লাগিতে না পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে তাহারা হাঁড়ির ভিতর কিম্বা ভাঙ্গা বাক্সের ভিতর চাক বাঁধিয়াছে। বাক্সের ভিতর চাক বাঁধিলে, চাক ভাঙ্গিয়া মধু বাহির করিয়া লইলেও, আবার তাহারা সেইখানে চাক বাঁধে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, সুবিধা-মত বাক্স পাইলে ইহারা তাহার মধ্যে চাক বাঁধা পছন্দ করে।

মৌমাছি পুষিতে হইলে প্রথমতঃ তাহাদের বাসের উপযোগী একটি বাক্স প্রস্তুত করিতে হইবে। বাক্সের চারিদিক বন্ধ হওয়া আবশ্যক, অথচ যেন ডালা খুলিয়া ভিতরের চাক দেখা যাইতে পারে। মক্ষিকাদের যাওয়া আসার জন্য একটি পথও রাখা চাই। Apis Indica মৌমাছির চাক পাশাপাশি সারবন্দি থাকে; সুতরাং সেই চাকের সারগুলি যদি পৃথক পৃথক ফ্রেমের মধ্যে বাঁধাইতে পারা যায়, তাহা হইলে এক-একটি করিয়া চাক তুলিয়া দেখিবার সুবিধা হয়। উক্ত সকল প্রকারের সুবিধা যাহাতে হয় এমন বাক্স প্রস্তুত করিতে হইবে।

বিলাতে ও এখানকার পুষা কলেজে যেরূপ বাক্স ব্যবহৃত হয় তাহাই অতিশয় সুবিধাজনক। এই বাক্স তিন খণ্ডে বিভক্ত—নিম্নখণ্ড, মধ্যখণ্ড এবং উপরের খণ্ড। নিম্নের খণ্ডটি একটি ৮ ইঞ্চি উচ্চ পায়া বিশিষ্ট চারকোণা চৌকি। এই চৌকির উপর মধ্যখণ্ডটি থাকে; তাহা চারকোণা দেয়ালের ঘেরের ন্যায়। উপরের খণ্ডটি মধ্যখণ্ডের ঢালু-ছাদ-বিশিষ্ট-ডালা। এই তিনটি খণ্ড উপরি উপরি বসাইলেই সম্পূর্ণ বাক্স হইল। মধ্যখণ্ডটিতে চাকের জন্য চারকোণা পাতলা ফ্রেম ঝোলান থাকে; তাহাতে মক্ষিকারা চাক বাঁধে। মধ্যখণ্ডের নিম্নে একটি ছিদ্র থাকে, সেখান দিয়া মৌমাছিরা যাতায়াত করে। উপরের ডালা খুলিলে মৌমাছি দেখা যায়। মধ্যভাগটি তুলিয়া নিম্নখণ্ডের উপরে সঞ্চিত ময়লা পরিষ্কার করা যাইতে পারে। বাক্স তিন খণ্ড করাতে এই সকল সুবিধা হয়।

এক্ষণে প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ দেওয়া আবশ্যক। নিম্নখণ্ডটি ৮ ইঞ্চি উচ্চ, ১৭½ ইঞ্চি লম্বা এবং ১৫½ ইঞ্চি চওড়া হইবে। পায়াগুলির নিম্নভাগ সরু হওয়া চাই যাহাতে জলপাত্রে বসাইয়া চাককে পিপীলিকা প্রভৃতি হইতে রক্ষা করা যায়। এই খণ্ডের লম্বা দিকের গায়ে মৌমাছির বাক্সে ঢুকিবার ছিদ্রের সম্মুখে ঝোলা বারান্দার ন্যায় একটি ছোট তক্তা বসান থাকিবে, যাহাতে মৌমাছিরা আসিয়া তাহার উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে বা পাহারা দিতে পারে। এই তক্তার উপরেই মৌমাছিদের প্রবেশ দ্বার থাকিবে।

মধ্যখণ্ডটি একটি চারকোণা ঘেরা যাহা নিম্নখণ্ডের উপর ঠিকভাবে বসান যাইতে পারে। ইহারও বহির্ভাগ লম্বায় ১৭½ ইঞ্চি এবং চওড়ায় ১৫½ ইঞ্চি হইবে। ইহার বাহিরের উচ্চতা ৮½ ইঞ্চি হইবে। এই খণ্ডের কাঠ ¼ ইঞ্চি পুরু হইবে; সুতরাং ভিতরের দিকে লম্বা ১৭ ইঞ্চি ও চওড়া ১৫ ইঞ্চি থাকিবে। চওড়া দিকের দেয়াল দুইটির ভিতরের দিকে ৮⅜ ইঞ্চি উচ্চ অপর দেয়াল তক্তা দিয়া আঁটা থাকিবে; এই দুই দেয়াল এতটুকু পুরু হইবে যাহাতে ভিতরে ১ ½ ইঞ্চি ব্যবধান থাকে। মধ্যখণ্ডের বাহির দিকে নিম্নভাগে পাতলা বিট একটু নীচের দিকে বাড়াইয়া আঁটা থাকিবে, যাহাতে মধ্যখণ্ড নিম্নখণ্ডের উপর ঠিক আঁটিয়া বসিয়া যায়। প্রবেশদ্বারের কাছে মধ্যখণ্ডের নিম্নভাগে একটু কাটা থাকিবে, যাহাতে মৌমাছি যাতায়াত করিতে পারে।

উপরের খণ্ড বাহিরের দিকে লম্বায় ১৭½ ইঞ্চি, চওড়ায় ১৫½ ইঞ্চি এবং মধ্যের উচ্চতায় ৬¼ ইঞ্চি ও ধারের উচ্চতায় ১¼ ইঞ্চি হইবে। উপরের ছাদ দুইদিকে ঢালু হইবে এবং সর্ব্বোপরি একখানি ক্যানেস্তারার টিন কাটিয়া ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে ভিতরে জল প্রবেশ না করে। উপরের খণ্ডেরও নিম্নভাগে পাতলা বিট আঁটা থাকিবে, যাহাতে উপরের খণ্ড মধ্যখণ্ডে আঁটিয়া বসিয়া যায়।

ফ্রেমগুলির উপরের কাঠ ১৭ ইঞ্চি লম্বা হইবে এবং নিম্নের কাঠ ১৪ ইঞ্চি লম্বা হইবে। উপরের কাঠের উপর হইতে নিম্নের কাঠের তলা পর্য্যন্ত ৮ ১/২ ইঞ্চি ব্যবধান থাকিবে। ফ্রেমের কাঠগুলি ৭/৮ ইঞ্চি চওড়া এবং ৩/৮ ইঞ্চি পুরু হইবে।

ফ্রেমগুলি মধ্যখণ্ডের ভিতরের দেয়ালে ঝুলান থাকে। একটি ফ্রেমের মধ্যস্থল হইতে অপরটির মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ১ ৩/৮ ইঞ্চি ব্যবধান থাকিবে; অর্থাৎ ১৫ ইঞ্চির ফাঁকে মধ্য-খণ্ডের মধ্যে ১০টি ফ্রেম ঝুলিতে পারে।

বাক্স ও ফ্রেম নরম কাঠের হওয়া আবশ্যক। কাঁচা কাঠ হইলে ফ্রেম ও বাক্স বাঁকিয়া যাইতে পারে। দেবদারু কাঠে বাক্স করা যাইতে পারে; কিন্তু ফ্রেমগুলি পুরাতন শিশু বা সেগুন কিম্বা অন্য কাঠের হইলে ভাল হয়।

বাক্স প্রস্তুত হইল। কিন্তু ইহার মধ্যে মধুমক্ষিকা কিরূপে আনিতে হইবে তাহাই এখন বিবেচ্য। বিলাত হইতে বা পুষা কলেজ হইতে মধুমক্ষিকা ক্রয় করিয়া আনিলে, তাহা বাক্স সুদ্ধ আসিবে, সুতরাং তাহা পুষিবার পক্ষে বিশেষ কষ্ট নাই। কিন্তু আমাদের দেশের বুনো মক্ষিকাদলকে কিরূপে বাক্সে প্রবেশ করাইতে হইবে তাহা স্থির করা আবশ্যক।

পৌষ, মাঘ বা ফাল্গুন মাসে গাছের তলায় বা বাগানের মধ্যে চাকের বাক্স রাখিয়া দিলে অনেক সময় মধুমক্ষিকা আসিয়া আপনা হইতেই তাহাতে চাক করে। বাক্সের ভিতর ৬ খানি ফ্রেম রাখিয়া তাহার পশ্চাৎ দিকে একটি কাঠমোড়া ফ্রেম বা তক্তা, দেয়ালের ন্যায় দিতে হইবে, যাহাতে ফ্রেমের বাহিরে মক্ষিকা চাক না করে। ফ্রেমগুলিতে উপরের কাঠে মোম লাগাইয়া রাখিতে হইবে, অথবা মোমের ছাচে কৃত্রিম চাক গড়িয়া লাগাইয়া দিতে হইবে। কৃত্রিম চাক গড়িবার কল পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে দেখা আবশ্যক, যে, মৌমাছি চাক করিয়াছে কি না। মোম লাগান বা মোমের ছাঁচ থাকিলে মৌমাছিরা তাহাতেই চাক বা বাসা করে। চাক লাগাইলে, ফ্রেমের উপরে একখানি অএলক্লথ বা কোন প্রকার গরম কাপড় বিছাইয়া দিতে হয়। ইহাতে দুই কাজ হয়, মৌমাছিদের ঘর গরম থাকে এবং তাহারা ফ্রেমের ঊর্দ্ধদিকে গিয়া উপরের ডালায় চাক লাগাইতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকারের উপায় এই যে, মাঘ মাস হইতে বৈশাখের মধ্যে যে-কোন সময়ে হউক মৌমাছির দলকে ধরিয়া বাক্সের মধ্যে বন্দী করিয়া ফেলা। কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, মৌমাছির দল উড়িয়া আসিয়া গাছের ডালে বসিয়াছে, কিন্তু তখনও তাহারা চাক বাঁধে নাই। এই সময় একটি কাঠের চৌকো গর্ত্ত ডালা সেই স্থানের উপর রাখিতে হইবে, এবং অল্প ধোঁয়া দিলে মাছিগুলি আস্তে আস্তে গাছের ডাল ছাড়িয়া সরিয়া গিয়া সেই ডালার মধ্যে আশ্রয় লইবে। সব মাছিগুলি ডালায় চলিয়া গেলে, ডালার মুখে একখানি কাপড় ঢাকা দিয়া নামাইয়া আনিতে হইবে। অনন্তর মাছি সুদ্ধ ডালাটি বাক্সের ভিতর রাখিয়া ডালার মুখ খুলিয়া দিতে হইবে এবং কিছু চিনির রস তাহাদের উপর ছিটাইয়া দিতে হইবে। তখন চিনির রস চাটিয়া খাইতে থাকায় মৌমাছিরা পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিবে না। অনন্তর বাক্সের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া এবং ফ্রেমে চাক করিবার সুবিধা দেখিয়া তাহারা সেই স্থানেই থাকিয়া যাইবে।

তৃতীয় প্রকারের উপায়, চাক সুদ্ধ মৌমাছি আনিয়া বাক্সের মধ্যে বসান। অনেক সময় দেখা যায় যে, জানালার মাথায় বা দেয়ালের মধ্যে বা গাছের কোটরে মৌমাছি চাক বাঁধিয়াছে। সেই স্থান হইতে চাকসুদ্ধ মৌমাছির দল সরাইতে হইলে প্রথমে চাকের উপরে বা নিকটে এমন ভাবে একটি কাঠের ডালা বা কাপড়ের থলি রাখিতে হইবে, যাহাতে চাকের নিকট ধোঁয়া দিলে মাছিগুলি সেই ডালায় বা থলিতে গিয়া আশ্রয় লয়। কৌশল করিয়া সেই ডালা এবং থলির মধ্যে মাছিগুলিকে আনাইয়া বন্দী করিতে হইবে। তারপর চাকগুলি আস্তে আস্তে ছুরি দিয়া কাটিয়া পৃথক পৃথক করিতে হইবে। এক একখানি চাক লইয়া এক-একখানি ফ্রেমে বসাইতে হইবে। জ্বলন্ত বাতির সাহায্যে গলাইয়া এবং মোম লাগাইয়া চাকগুলিকে ফ্রেমের মধ্যে দৃঢ় করিয়া বসাইতে হইবে। সব চাকগুলি এইরূপে ফ্রেমে বসান হইলে, সেগুলিকে বাক্সের মধ্যে রাখিয়া তৎপরে বন্দী মৌমাছিগুলিকে সেই বাক্সের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এমন ভাবে মৌমাছি ছাড়া চাই যাহাতে তাহারা আস্তে আস্তে গিয়া চাকে আশ্রয় লয়।

একবার তাহারা চাকে আশ্রয় লইলে আর পলাইবার আশঙ্কা থাকে না। এই প্রকার মক্ষিকা ও চাক সরান রাত্রিতে হইলেই ভাল হয়, কারণ তখন সকল মক্ষিকারা চাকে থাকে। দিবসে করিলে অনেক মক্ষিকা স্থানভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

মৌমাছির চাক দিবসে নাড়াইলে অনেক মৌমাছি মারা পড়ে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ⅔ সংখ্যা মাছি চাক ছাড়িয়া বাহিরে আহার অন্বেষণ করে। মক্ষিকাদের নিয়ম এই, যে স্থান হইতে ইহারা যায়, পুনরায় সেই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সেখানে আসিয়া তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া মারা পড়ে। সন্ধ্যার সময় সকল মক্ষিকা চাকে আসে। সুতরাং সন্ধ্যার পর চাক স্থানান্তরিত করা বা চাকের মুখের রাস্তা বদলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চাক সরাইতে হইলে ২।৩ ফুট করিয়া প্রত্যহ অল্প অল্প সরাইয়া লইয়া যাওয়া উচিত।

বিলাত হইতে যখন জাহাজে মক্ষিকার চাক আসে, চাকের বাক্সের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা পলাইয়া না যায়। কিন্তু যে বন্দরে সমস্ত দিন জাহাজ থাকিবে, সেখানে সমুদ্রতীরে চাকের বাক্স রাখিয়া বাক্সের মুখ খুলিয়া দেওয়া হয়। মুখ খোলা পাইলে মক্ষিকাগণ বাহিরে গিয়া আহার অন্বেষণ করে এবং সন্ধ্যার সময় পুনরায় চাকে আসিয়া প্রবেশ করে। তখন আবার বাক্সের মুখ বন্ধ করিয়া জাহাজে রাখিয়া দেওয়া হয়।

রাণী মক্ষিকাকে ধরিয়া রাখিলে অন্য মক্ষিকাগণ পলাইয়া যায় না। এই কারণে অনেক সময়ে তারের খাঁচায় চাকের নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাণী মক্ষিকাকে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। তারের খাঁচা এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে তাহার মধ্যে অন্য মক্ষিকারা যাইতে পারে, কিন্তু রাণীমক্ষিকার শরীর বড় হওয়ায় সে বাহির হইতে না পারে।

ধোঁয়া দিয়া মাছি সরাইবার প্রয়োজন হইলে একটা নেকড়ার দুট প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আগুন দিলে যে ধোঁয়া বাহির হইবে তাহাই যথাস্থানে প্রয়োগ করিতে হয়। অল্প কার্ব্বলিক এসিড জলে গুলিয়া তাহাতে একখানি নেকড়া ভিজাইয়া তাহার গন্ধ লাগাইলেও মৌমাছিরা সরিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে এইরূপে মৌমাছিদের সরাইয়া তাহাদিগকে ডালা বা থলির মধ্যে বন্দী করিতে পারা যায়।

চাক ও মৌমাছি সরান হইলে পূর্ব্বে যেখানে চাক ছিল সেই স্থানেই চাকের বাক্স ৫।৬ দিন রাখা আবশ্যক, এবং চাকের মুখটি পূর্ব্বের চাকের মুখের নিকট রাখিতে হইবে। নতুবা পূর্ব্বস্মৃতি থাকায় অনেক মৌমাছি পূর্ব্বস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মারা পড়ে।

পাঠক বলিবেন, মধুমক্ষিকার চাক এত নাড়া চাড়া করিবার কথা হইল, কিন্তু তাহা করিবে কে? দংশনের কি ভয় নাই? মধুমক্ষিকার সহিত বন্ধুতা করিতে করিতে বেশ বুঝা যায় যে নিজের মনের উপর অপরের শত্রুতার বা মিত্রতার ভাব অনেক নির্ভর করে। মধুমক্ষিকার চাক নাড়িয়া দেখিয়াছি, অনেকক্ষণ ধরিয়া নির্ভয়ে তাহাদের চাক সরাইয়া দিতেছি বা বাক্‌স পরিষ্কার করিতেছি, আমার মনে তাহাদের উপকার বই অনিষ্টের ভাব নাই, তাহাদেরও আমার উপর কোন অত্যাচার নাই। কিন্তু যাই মনে হইল "মৌমাছি কামড়াইবে না ত?" অমনি একটি উড়িয়া আমার গায়ে বসিল; আমি অস্থির হইয়া তাহাকে মারিতে গেলাম, সেও তখন আমাকে কামড়াইয়া দিল। একটিকে মারিতে যাইবা মাত্র আরও অনেকগুলি মক্ষিকা আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল ও কামড়াইতে লাগিল। মনে ভয় আসিলেই ভয়ের কারণ জুটিল এবং বিপদও আসিল। নতুবা কোন বিপদ নাই। আমার একটি মালী মক্ষিকার চাকের ৩।৪ হাত দূরে থাকিলেও, মাছিগুলি উড়িয়া আসিয়া তাহাকে কামড়াইয়া দেয়। কিন্তু আমার আর-একটি ভৃত্য চাক লইয়া কত নাড়া চাড়া করে, কিন্তু তাহাকে তাহারা কামড়ায় না।

পাঠককে এখনও কিছুই বিশেষ উপায় বলা হইল না, যাহাতে মৌমাছি কামড়াইতে না পারে। উপায় অবশ্য আছেই। পেণ্টেলুন, কোট ও হ্যাট পরিয়া, হ্যাটের উপর হইতে একখানি নেট ঝুলাইয়া গলায় বাঁধিয়া লইলে, এবং হাতে দস্তানা পরিলে, মধুমক্ষিকা দংশন করিবার কোন স্থান পাইবে না। তখন নির্ভয়ে চাকে হাত দিয়া কার্য্য করিতে পারা যায়। হ্যাটের পরিবর্ত্তে একটি পেথে ব্যব-

হার করা যাইতে পারে এবং পেণ্টেলুন কোটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন প্রকারে গা ঢাকা যাইতে পারে। সরিষার তৈলে তুলসীপাতার রস মিশাইয়া তাহা গায়ে মাখিয়া লইলে এবং মুখে তুলসীপাতা চিবাইয়া ফুৎকার দিলে সেখানে আর মৌমাছিরা আসিতে পারে না। ধোঁয়া লাগাইলেও মৌমাছিরা পলাইয়া যায়। ধোঁয়া দিবার কল পাওয়া যায়। মৌমাছিরা কর্কশ শব্দ শুনিলে বা হঠাৎ তাহাদের চাকের নিকট যাইলে, বা মৃত মক্ষিকার গন্ধ পাইলে, কামড়াইতে আইসে। ধীরভাবে চাকের পশ্চাৎদিক হইতে আস্তে আস্তে তাহাদের নিকট যাইলে, তাহারা কোন প্রকার অনিষ্ট করে না। মৌমাছিরা উত্তেজিত হইলে ভয়ে এক প্রকার শন্ শন্ শব্দ করে; তখন তাহাদের কাছে না যাওয়াই ভাল।

মধুমক্ষিকার চাকের নিকট ধোঁয়া দিলে বা চাক নাড়া দিলে, মক্ষিকাগণ উপরের দিকে গিয়া আশ্রয় লয়। তাহারা চাকের নিম্নদিকে কখনও আসে না; সুতরাং নিম্নে বসিয়া পড়িলে দংশনের ভয় নাই। উপদ্রব চলিয়া গেলে তাহারা পুনরায় উড়িয়া পূর্ব্বের স্থানে আসিয়া জড়ো হয়। চাক ভাঙ্গা হইলেও অনেক সময় সেই স্থানেই আবার চাক করে।

বর্ষাকালে চাকের বাক্স জলে বসাইয়া রাখিতে হয়। কারণ সেই সময় wax moth নামক এক প্রকার পোকা ধরিয়া প্রায়ই চাক নষ্ট করিয়া দেয়। Wax moth চাকের ভয়ানক শত্রু; ইহা একবার লাগিলে আর সে চাকের রক্ষা নাই। ক্রমে ক্রমে ইহারা সমস্ত চাকটি খাইয়া ফেলে। একপ্রকার পতঙ্গ রাত্রিতে চাকের মধ্যে গোপনে প্রবেশ করে। তৎপরে সেখানে ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটিয়া পোকা হয় এবং সেই পোকা চাক খায়। পোকা হইতে গুটি বাঁধে ও জালে সমস্ত চাক ঘিরিয়া দেয়। সেই গুটি হইতে আবার পতঙ্গ জন্মে। এইপ্রকার ইহাদের জীবনের ইতিহাস। এই পোকা নিবারণের একমাত্র উপায়, চাক জলে বসাইয়া রাখা এবং চাকের নিকটস্থ স্থান খুব পরিষ্কার রাখা। স্বাভাবিক অবস্থায় মক্ষিকারা এমন স্থানে চাক বাঁধে, যেখানে এই পোকা যাইতে পারে না।

চাক হইতে মধু বাহির করিবার একপ্রকার যন্ত্র আছে। এই যন্ত্র ব্যবহারে চাক বা ডিম নষ্ট হয় না। ফ্রেমসহ চাকটি বাক্স হইতে তুলিয়া, একখানি নেকড়া দিয়া তাহার ডিম ও বাচ্চার বাসের অংশটি মুড়িয়া দিতে হইবে। তৎপরে মধুর প্রকোষ্ঠগুলির মুখ ছুরি দ্বারা চাঁচিয়া দিয়া, চাকযুক্ত ফ্রেমখানি, মধুর দিকটি নীচে করিয়া একটি টিনের চেপ্টা বাক্সে রাখিতে হইবে। তৎপরে সেই বাক্সটি খুব জোরে ঘুরাইলে (centrifugal force) কেন্দ্রাতিগ গতির দ্বারা চাক হইতে মধু বাহির হইয়া সেই টিনের বাক্সের ভিতর পড়িবে। সমস্ত মধু বাহির হইয়া গেলে নেকড়া খুলিয়া চাকটি আবার যথাস্থানে বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। মৌমাছিগুলি পুনরায় সেই চাকে গিয়া মধু সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয় করে। এই সময় তাহাদিগকে চিনির রস এবং ময়দা মিশ্রিত খাদ্য দিলে উপকার হয়।

নানা স্থান হইতে চাক সংগ্রহ করিয়া অথবা বিলাত বা পুষা হইতে চাক ক্রয় করিয়া, চাকের সংখ্যা বাড়াইতে পারা যায়। ক্রমে ইহাদের কার্য্যপ্রণালী জানিতে পারিলে, নূতন রাণী চাকে উৎপন্ন করাইয়া, পুরাতন রাণীর দ্বারা নূতন দল সৃষ্টি করাইতে পারা যায় এবং তাহাতে চাকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। অনেক দিন ধরিয়া মধুমক্ষিকার চাক নাড়াচাড়া করিলে এবং ইহাদের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিলে, মধুমক্ষিকা পালন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে।

মৌমাছি কামড়াইলে কি ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও জানা আবশ্যক। হুলটি বাহির করিয়া বেঞ্জিন (benzene) বা তরল এমোনিয়া (Liquid ammonia), অথবা হোমিওপেথিক টিংচার লেডাম (Tinc Leadum) লাগাইলে জ্বালা নিবারণ হয়। যদি ক্ষতস্থান অধিক ফোলে বা অত্যন্ত জ্বালা করে, তাহা হইলে গরম জলের সেক দেওয়া যাইতে পারে। যাহাদিগকে ২।৩ বার মৌমাছি কামড়াইয়াছে, তাহাদিগকে আর বিষে অধিক কষ্ট দিতে পারে না।

পাঠকগণের যদ্যপি মধুমক্ষিকাপালন সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানিবার ইচ্ছা জন্মে তাহা হইলে Superintendent, Entomological department, Pusa Institute ঠিকানায় পত্র লিখিলে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

কীটতত্ত্ব বিভাগের সহকারী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত পুষা কলেজের Bulletin no. 46, Bee-keeping অথবা Land Obicus এবং Indian Amateur Dairy Farm নামক পুস্তকের মধুমক্ষিকাপালন সম্বন্ধে অধ্যায় পাঠ করিলেও বহু তথ্য জানা যাইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

কষ্টিপাথর

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোথায় গেল ?

মুসলমানের আক্রমণে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বাঙ্গালা হইতে লোপ হইয়াছিল, কিন্তু যেখানে মুসলমান যাইতে পারেন নাই, সেখানে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কিছু কিছু ছিল। নবদ্বীপ ও গৌড় জয়ের পর পূর্ব্ব বাঙ্গালা জয় করিতে মুসলমানদের প্রায় একশত কুড়ি বৎসর লাগে। সোনারগাঁওএর রাজারা সব হিন্দু ছিলেন না। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অনেক বৌদ্ধ ছিল। আমরা বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা একখানি পঞ্চরক্ষার বৌদ্ধ পুঁথি পাইয়াছি, ১২১১ শকাব্দায় বা ১২৮৯ খৃঃ অব্দে লেখা।

লেখক বলিতেছেন এ সময়ে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত মধুসেন আমাদের রাজা। কুলগ্রন্থে বল্লালের পর মধুসেন বলিয়া একজন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে একজন স্বাধীন বৌদ্ধরাজা ছিলেন। এবং নিশ্চয় তাঁহার দেশে অনেক বৌদ্ধ বাস করিত।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি চৌদ্দ শতকের শেষকালে তাঁহার প্রসিদ্ধ স্মৃতির গ্রন্থসকল রচনা করেন। এই-সকল গ্রন্থের মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক' খুব চলিত। তিনি একটি বচন তুলিয়াছেন যে নগ্ন দেখিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। নগ্ন শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"নগ্নঃ বৌদ্ধাদয়ঃ"। বৌদ্ধ না থাকিলে তিনি এরূপ অর্থ করিতে পারিতেন না। আমি একখানি বাঙ্গালা অক্ষরে তালপাতায় লেখা বোধিচর্য্যাবতারের পুঁথি পাইয়াছি। সেখানি বিক্রম সংবতের ১৪৯২ অব্দে লেখা অর্থাৎ ইংরেজী ১৪৩৬ সালে। বোধিচর্য্যাবতারখানি মহাযানের পুঁথি—বৌদ্ধদিগের গভীর দর্শনের পুঁথি। পুঁথিখানি সোহিনচরা প্রদেশে বেণুগ্রামে মহত্তর মাধবমিত্রের পুত্রের জন্য নকল করা হয়। একজন বৌদ্ধভিক্ষু উহা লেখেন আর একজন উহার পাঠ মিলাইয়া দেন। সুতরাং বাঙ্গালার অনেক কায়স্থ যে তখনও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এরূপ বেশ বোধ হয়। কেম্ব্রিজে একখানি বাঙ্গলা হাতে তালপাতার লেখা বৌদ্ধধর্ম্মের পুঁথি আছে। সেখানি ইংরেজী ১৪৪৬ সালে লেখা। সেখানি মূল কালচক্রতন্ত্রের পুঁথি। পুঁথিখানি শাক্যভিক্ষু জ্ঞানশ্রী কোন বিহারে দান করিয়াছিলেন। লেখক মগধদেশীয় ঝাড়গ্রামনিবাসী করণ-কায়স্থ শ্রীজয়রাম দত্ত। উহাতে লেখা আছে "পরম ভট্টারক ইত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ" অর্থাৎ জয়রাম দত্ত পূর্ব্বে আরও অনেক পুঁথি নকল করিয়াছিলেন। ব্রিটিস্ মিউজিয়মে ঐরূপ আর একখানি তালপাতার পুঁথি আছে, সেখানি ১৪৭৭ বিক্রম সংবৎ ১৩২০ খৃ-অব্দে লেখা। এখানি কাতন্ত্রের উণাদিবৃত্তি। বৌদ্ধস্থবির শ্রীবররত্ন 'মহাশয় আপনার পাঠের জন্য লিখাইয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন কপালিয়া গ্রামের কায়স্থ শ্রীবাগীশ্বর। ব্রিটিস্ মিউজিয়মে শ্রীবররত্নের জন্য লেখা আরও অনেক বিস্তর পালি দেওয়া আছে। বাঙ্গালাতেও বোধ হয় শেবযোগীরাই ক্রমে বাঙ্গলা ভাষায়ও লেখা আছে। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে তৎকালে বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধবিহার ছিল, বৌদ্ধস্থবির ছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণ-শাস্ত্র বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িতেন। শ্রীবররত্নের যে-সকল বিশেষণ দেওয়া আছে তাহাতে তিনি যে মহাযানমতাবলম্বী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং পনর শতকেও বাঙ্গালায় অনেক জায়গায় বৌদ্ধ ছিল এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পুঁথিপাঁজীও লেখা হইত। এই শতকে রাঢ়ীশ্রেণী মহিন্তা গাঁই বৃহস্পতি নামে একজন বড় পণ্ডিত, গৌড়ের সুলতান রাজা গণেশ ও তাঁহার মুসলমান উত্তরাধিকারীগণের নিকট "রায়মুকুট" উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তিনি একখানি স্মৃতি, অনেকগুলি কাব্যের টীকা ও অমরকোষের একখানি টীকা লিখিয়া বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃতশিক্ষার বিশেষ উপকার করিয়া যান। তাঁহার অমরকোষের টীকা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি ঐ টীকায় চৌদ্দ-পনরখানি বৌদ্ধ-পুস্তক হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অমরকোষের টীকার তারিখ ইংরেজী ১৪৩১ সাল। তাহা হইলে তখনও বৌদ্ধ-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ছিল এবং ব্রাহ্মণেরাও অন্ততঃ শব্দশাস্ত্রের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বৌদ্ধ পুঁথি পড়িতে বাধ্য হইতেন।

চৈতন্য দেবের তিরোভাব হয় ইংরেজী ১৫৩৩ সালে। তাহার পর তাঁহার অনেকগুলি জীবন-চরিত লেখা হয়। চূড়ামণি দাস একখানি চৈতন্য-চরিত লেখেন। তাহাতে লেখা আছে চৈতন্যের জন্ম হইলে সকলেই আনন্দিত হয়, তাহার মধ্যে বৌদ্ধেরাও আনন্দিত হয়। জয়ানন্দ আর-একখানি 'চৈতন্য-চরিত' লিখিয়াছেন। তিনি পুরীর জগন্নাথ-দেবকে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ১৬ শতকেও বৌদ্ধেরা বাঙ্গালা হইতে একেবারে লোপ পায় নাই।

১৭ শতকে মঙ্গোলিয়া দেশে উঁয়ানামক নগরে এক মহাবিহারে তারানাথ নামে একজন প্রসিদ্ধ লামা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ আছে জানিবার জন্য ১৬০৮ সালে বুদ্ধগুপ্ত নাথ নামে একজন লামাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথ ও তৈলঙ্গ ঘুরিয়া বাঙ্গালাদেশে আসেন। তিনি কাশ্রমগ্রাম ও দেবীকোট, হরিভঞ্জ ফুকবাদ, ফলগু প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। এই সকল স্থানেই অনেক বৌদ্ধপণ্ডিত ছিলেন, অনেক বৌদ্ধ পুঁথি-পাঁজী ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্মও খুব প্রবল ছিল। হরিভঞ্জ বিহারের ধর্ম্ম-পণ্ডিতের নিকট তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ শিক্ষালাভ করেন। হেতুগর্ভবন নামে একজন পণ্ডিত উপাসিকা তাঁহাকে নানারূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইখানে তিনি অনেক সূত্রের মূলগ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরেও তিনি অনেক স্থানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উন্নতি দেখিতে পান। তাঁহার সময়ে রাঢ়ে ও ত্রিপুরায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বেশ প্রবল ছিল। তিনি বোধগয়ায় মহাবোধিমন্দিরে ও বজ্রাসনের নিকটে অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি এই অঞ্চলে কোন বিহারে জনকায় সিদ্ধনায়ক ডাক প্রভৃতি অনেক মণ্ডলের চিত্র দেখিয়াছিলেন। তিনি তৈলঙ্গ, বিদ্যানগর, কর্ণাট, প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক ঘুরিয়াছিলেন। তিনি শান্তিগুপ্ত নামে একজন সিদ্ধের নিকট দীক্ষিত হইয়া "নাথ" উপাধি পাইয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার নাম হইয়াছিল "বুদ্ধগুপ্ত নাথ"। যোগিনী দিনকরা ও মহাগুরু গম্ভীরমতির নিকট তিনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তিনি মহোত্তর সুধীগর্ভের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রাজগৃহের গৃধ্রকূট গিরিগুহায় ও প্রয়াগে অনেক বড় বড় তীর্থস্থান দেখিয়াছিলেন। তিনি খগেন্দিরি পাহাড়ের উপর যোগীদের থাকিবার জন্য এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

নেপালে ললিতপত্তন নামে একটা নগর আছে। উহাকে এখন 'পাটন' বলে। এখানকার একজন বজ্রাচার্য্য ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে তীর্থ করিতে আসিয়া কিছুদিন মহাবোধিমন্দিরের নিকট বাস করেন। তখন

তাঁহাকে স্বপ্ন হয়, তিনি যেন মহাবোধিস্তূপের মত একটি স্তূপ নিজের দেশে নির্ম্মাণ করেন। তিনি তিন বৎসর মহাবোধিতে থাকিয়া উহার একটি চিত্র আঁকিয়া লইয়া যান এবং পাটনে মহাবোধি নামে এক বিহার নির্ম্মাণ করেন। উহার ঠিক মধ্যস্থলে মহাবোধি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। পাটনের সে বিহার ও সে স্তূপ আজও আছে। মহাবোধি বিহারের বজ্রাচার্য্যেরা নেপালের বৌদ্ধদিগের মধ্যে আজিও অতি উচ্চ-স্থান লাভ করিয়া আসিতেছেন।

আঠার শতকের প্রথমে কাশীতে নাথুরাম নামে একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে লোকে নথমল ব্রহ্মচারী বলিত। বদরিকাশ্রমের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি নামে বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতেন না। তাঁহার সংস্কার ছিল সংবৎ ১৭৫৫, ৮ই মাঘ বুদ্ধদেব বদরিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইবেন। ৫ই মাঘ বিষ্ণু শিব গণপতি শক্তি এবং সূর্য্য নথমলের নিকট আসিয়া তাঁহাকে মুখভাষা-গ্রন্থ লিখিতে বলেন। সেই গ্রন্থে বুদ্ধের অবতার হওয়া, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব প্রভৃতি অনেক কথা লেখা থাকিবে। তিনিও সেইমত কাশীর রামাপুরায় থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় চারি পাঁচ জন বিদ্যার্থীর সাহায্যে সাড়ে বার লক্ষ শ্লোকে এক প্রকাণ্ড পুস্তক লেখেন। ঐ পুস্তকের খানিক খানিক কাশীর পুঁথিওয়ালাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। খানিকটা এসিয়াটিক সোসাইটীতেও আছে, কিন্তু সেটা মূল পুঁথি নয়—নকল করা, পুঁথির নাম এখন হইয়াছে 'বুদ্ধচরিত'। বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া শূরসেন দেশে বুদ্ধনামক এক দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিলেন।

মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষ অধিকার করেন তখন ভারতবর্ষে যে একটা বৌদ্ধ বলিয়া প্রবল ধর্ম্ম ছিল তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা ভারতবাসী সভ্যজাতিমাত্রকেই হিন্দু বলিতেন। সুতরাং বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম দুইই তাঁহাদের কাছে হিন্দুধর্ম্ম ছিল। মিনহাজ ওদন্তপুরী বিহার বিনাশের যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যে, মুসলমানেরা দুই হাজার সব-মাথাকামান ব্রাহ্মণকে বধ করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা "ওদন্তপুরী" বিহারকে "ওদনন" বিহার বলিতেন। সব-মাথাকামান ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। সন্ন্যাসীরাই সব-মাথা কামায়। বিহারের ভিক্ষুরা সব-মাথা কামাইতেন। আকবরের সময় নানাদেশের ও নানাধর্ম্মের পণ্ডিতগণ তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার সভায় কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন না। ইংরেজেরা যখন প্রথম বাঙ্গালা হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখনও তাঁহারা ইংরেজ-অধিকৃত দেশে কোন বৌদ্ধ দেখিতে পান নাই। কিরূপে বৌদ্ধদের নাম পর্য্যন্ত এদেশে লোপ হইয়া গেল, তাহা জানিতে হইলে প্রথম বৌদ্ধদের ইতিহাস জানা চাই। শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা বড় কদাচারী হইয়াছিল—অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াছিল এবং তাহারা শেষ অবস্থায় ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিল সে অতি কদাকার। সেই জন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে প্রথমে বিদ্রূপ করিতেন, পরে ঘৃণা করিতেন। হিন্দুরাজারাও বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে করিতে ত্রুটি করিতেন না। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, যেখানে দেবোত্তর ভূমি আছে তাহার নিকটে ব্রাহ্মণকে "ব্রহ্মোত্তর" দিবে না। কিন্তু সেন রাজাদের ব্রহ্মোত্তর দানে দেখা যায় যে উহার একসীম "বুদ্ধবিহারী দেবমঠঃ"। কিন্তু বৌদ্ধদের প্রধান শত্রু রাজারাও ছিলেন না—ব্রাহ্মণেরাও ছিলেন না—শৈবযোগীরাই উহাদের প্রধান শত্রু ছিল। শেষকালের বৌদ্ধগ্রন্থসকলে দেখিতে পাওয়া যায় শৈবযোগীদের উপর উহাদের বড়ই রাগ। স্বয়ম্ভুপুরাণ নেপালের রাজা যক্ষমল্লের সময়ে লেখা হয়। তিনি ইংরেজী চৌদ্দ শতকের শেষে রাজত্ব করিতেন। স্বয়ম্ভুপুরাণের শেষে শৈবদিগকে বিস্তর গালি দেওয়া আছে। বাঙ্গালাতেও বোধ হয় শৈবযোগীরাই ক্রমে প্রবল হইয়া বৌদ্ধদের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। চৈতন্যদেব অনেক নীচ অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধার করিয়াছেন। অনেক সময় মনে হয়, এই সকল নীচ অস্পৃশ্য জাতিরা পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল, এখন বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতেও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নাম ক্রমে লোপ পাইয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালার আশেপাশে, বিশেষ উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চলে, অনেক বৌদ্ধ ছিল। দার্জ্জিলিঙ্গ, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে অনেক বৌদ্ধ বাস করিত; নেপালে অনেক বৌদ্ধ ছিল; চাটগাঁয়ে অনেক বৌদ্ধ ছিল। চাটগাঁ ও ত্রিপুরার পাহাড়ে বরাবরই বৌদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে নেপালী বৌদ্ধেরাই সেকালের ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারী। দার্জ্জিলিঙ্গের বৌদ্ধেরা প্রায়ই তিব্বত হইতে তাহাদের বৌদ্ধধর্ম্ম লাভ করিয়াছে। সিকিম ও দার্জ্জিলিঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবেশ করে তিব্বত হইতে। নেপালেও তিব্বতীরা আপনাদের প্রভাব কিছু কিছু বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু নেপালের অধিকাংশ বৌদ্ধই পুরাণো ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ।

চট্টগ্রামে যে বৌদ্ধেরা আছেন তাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ নহেন। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা আরাকান হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম লাভ করেন, সে ধর্ম্মও বর্ম্মা ও সিংহল হইতে আসিয়াছে। রাঙ্গা-মাটিতে যে-সকল বৌদ্ধ আছেন তাঁহারা যদিও এখন চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের শিষ্য, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক আচার-ব্যবহার আছে যাহাতে বোধ হয় তাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ, কিন্তু নিকটবর্ত্তী চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের সংস্রবে আসিয়া তাঁহারা অনেক পরিমাণে হীনযান মত গ্রহণ করিয়াছেন।

উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম একেবারে লোপ পায় নাই। বোধ নামে যে একটি করদ মহল আছে, তাহার নামেই প্রকাশ, যে, উহাতে এখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। উড়িষ্যার সরাকী তাঁতিরা এখনও বৌদ্ধ। তাহাদের বিবাহের সময় বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে। আমাদের বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলায়ও সরাকী তাঁতি আছে। তাহারা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে।

কাজে বৌদ্ধ, নামেও বৌদ্ধ, এরূপ লোক অনেক খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু খাঁটি বৌদ্ধ আছে, অথচ নাম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, এরূপও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

(নারায়ণ, পৌষ) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

*
* *

অসবর্ণে বিবাহ।

ব্রাহ্মণ-বৈদ্যাদির Sexual segregationএ উক্ত নিয়ম-প্রয়োগ-কারীকে আমি জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যরূপ গণ্ডীর ব্রাহ্মণাংশে এমন কোন্ অতি বাঞ্ছনীয় পরাবর্ত্তন (জননকোষজই হউক বা দৈহিক-কোষীয়ই হউক) উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার রক্ষাবিধানের জন্য কায়স্থ ও বৈদ্যের সহিত ব্রাহ্মণের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন আপত্তিজনক? অথবা ঐ গণ্ডীর কায়স্থ বা বৈদ্যাংশে কোন্ দূষণীয় পরাবর্ত্তন তিনি লক্ষ্য করিয়া-ছেন যজ্জন্য বৈবাহসূত্রে ব্রাহ্মণদিগের পৃথকীকরণ প্রয়োজনীয়?

১৯১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে যে মানুষগণনা হয়, তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে (১৩২০ শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসী দ্রষ্টব্য) যে, কলিকাতার বৈদ্য-দিগের মধ্যে শতকরা ৬৯ জন পুরুষ লিখনপঠনক্ষম; কায়স্থ ৬০; এবং ব্রাহ্মণ ৫৭। বৈদ্যনারীদিগের মধ্যে ৪৯ জন লিখিতে পড়িতে জানে; কায়স্থনারী ৩৩ ও ব্রাহ্মণনারী ২৭। আমাদের দেশে আমরা যাঁহা-দিগকে 'বড়লোক' বলি ও যাঁহাদের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হই,

তাঁহাদিগের জাতি নির্ণয় করিতে যাইয়া দেখিতে পাইব যে, ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ-বৈদ্যকে হীনপ্রভ করিতে পারিবেন না।

কলিকাতা ও সহরতলীতে ১৪২টি কলকারখানার মালিক ১৪২ জন দেশীয় ধনী ব্যক্তি। তন্মধ্যে ৬৫ জন কায়স্থ, ৬১ জন ব্রাহ্মণ ও ১৬ জন বৈদ্য। (১৩২০; শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী।) কলিকাতার সংখ্যা একাধিক হইলে আমাদের প্রতিভাবিকাশের আরও অধিক সুযোগ ঘটিত, এরূপ চিন্তা করা অন্যায় নহে। ব্যবসায়বাণিজ্যে কৃতকার্য্যতা লাভ ব্যবসায়ক্ষেত্রে নৈতিকজীবন-পরিচালনের উপর নির্ভর করে। Business morality or Business ethicsএর নীতিসমূহ রক্ষা না করিলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সুতরাং কলিকাতার উক্ত তালিকাটি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের নৈতিক জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছে। এ বিষয়ে নিগূঢ় তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে Criminology and Penalogy ও দাম্পত্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত দেশস্থ কারাগারসমূহ হইতে অপরাধীগণের তালিকা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের জাতি এবং অপরাধের প্রকার ও গুরুত্ব নির্ণয় করিতে হইবে। বারবনিতা সম্বন্ধেও ঐরূপ কর্ত্তব্য। আশা করি, এরূপ অনুসন্ধানের ফল জাতিত্রয়ের মধ্যে স্বর্ণনিরকের পার্থক্য ঘোষণা করিবে না।

(১) মানবজাতির বিবাহের মূলে প্রধানতঃ দুইটি কারণ বর্ত্তমান।

(ক) যৌনসম্মিলনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা।

(খ) Æsthetics (সৌন্দর্য্যবোধ?)।

(২) উন্নততর মানবসমাজে Eugenics বা হীনতর পাত্রপাত্রীর মিলনে বাধা প্রদানপূর্ব্বক বংশানুক্রমের উন্নতিবিধান কর্ত্তব্য। এই নির্ব্বাচনে unit character কি হইবে তাহা অবশ্য ভিন্ন কথা। এ সম্বন্ধে Nietzscheর "The Superman" দ্রষ্টব্য।

(৩) Æsthetics নামক ধর্ম্মটি relative, কাজেই ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হইবে ততই ইহা পুষ্টিলাভ করিবে।

(৪) সুতরাং Æsthetics ও Eugenics উভয় দিক্ হইতে ভারতবর্ষে অসবর্ণে বিবাহ সুফলজনক।

(গম্ভীরা, কার্ত্তিক, ১৩১২) শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, বি-এ।

*
* *

স্কুলের আসবাব।

স্কুলঘরের আসবাব সকল কিরূপ হওয়া উচিত এ বিষয়ে অনেকে চিন্তা করেন না। কিন্তু ছাত্রগণের দৈহিক বিকৃতি এই অনুচিত আসন, বেঞ্চ বা ডেস্কের ব্যাপত্তিতে ঘটিয়া থাকে। অনেক ঘটা একাসনে বসিয়া থাকিলে তাহাতে বালকের নিশ্চয়ই শারীরিক ক্ষতি হইয়া থাকে। আসনে বসিয়া শরীর অনেকক্ষণ সোজা করিয়া রাখিতে হইলে পৃষ্ঠদেশের পেশী-সকলের উপর পীড়ন করা হয়। বালকদিগের ক্রমাগত ঐরূপ একাসনে অবস্থিতির জন্য শরীরেরই বিকৃতি সম্পাদিত হয়। কেহবা আনতস্কন্ধ ও বিস্তৃতবক্ষ হইয়া থাকে।

সম্ভবতঃ এমন একদিন উপস্থিত হইবে যখন স্কুলগৃহ আমাদের আবাসগৃহে পরিণত হইবে। আবাসগৃহের ন্যায় স্কুলগৃহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চেয়ার টেবিল ও ডেস্ক দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া বালকদিগের স্বাস্থ্য ও প্রীতি উৎপাদন করিবে। স্কুলগৃহের আসবাবপত্রাদি বিশেষ উপযোগী ধরণের হওয়া উচিত। বসিবার বেঞ্চ বিশেষ নীচু হইলে হাঁটু উঁচু হইয়া থাকে। অঙ্গনিগ্রহজনক অবস্থানের ফলে উদরের যন্ত্রসমূহে চাপ পড়িয়া শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায় এবং সরল পৃষ্ঠদেশ গঠনের পক্ষেও অসুবিধা
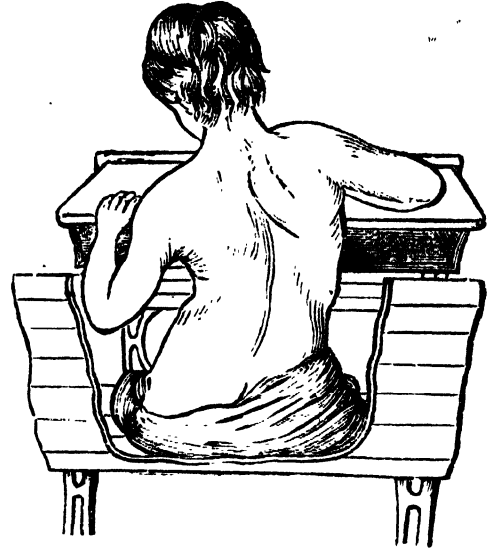
আসনের অধিক উচ্চতার জন্য মেরুদণ্ডের বক্রতা।

হয়। যদি বেঞ্চের তুলনায় ডেস্ক খুব উচ্চ হয় তাহা হইলে ডেস্কের উপর কনুই রাখিলে স্কন্ধ উঁচু হইয়া উঠে। লিখিবার জন্য দক্ষিণ কনুই ডেস্কের উপর রক্ষা করা হয় এবং তাহার ফলে স্কন্ধের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। যদি ডেস্ক খুব নীচু হয় এবং বেঞ্চের সম্মুখ হইতে সরিয়া থাকে, তাহা হইলে
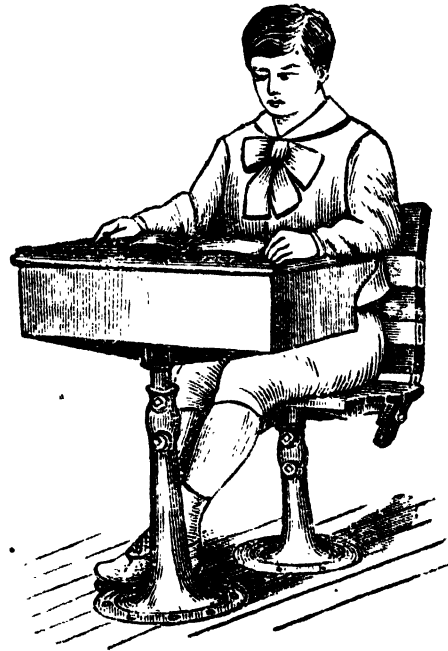
সোজা ভাবে বসিবার ঠিক আসন। পেলভিস্ ও মেরুদণ্ড যথাস্থানে অবস্থান করিতেছে।
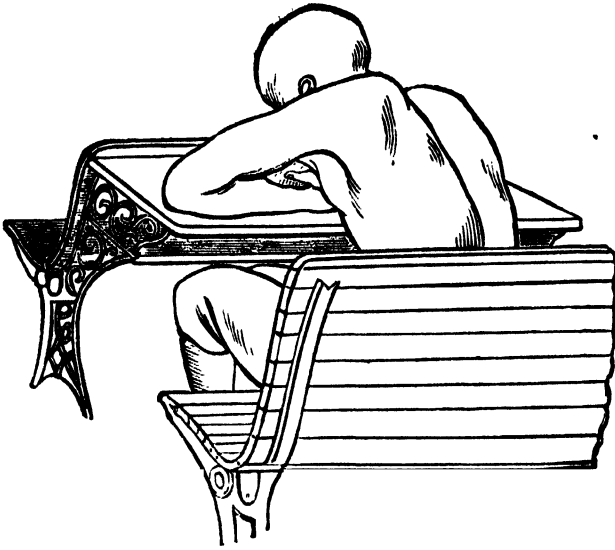
ডেস্ক ও বেঞ্চ নীচু হওয়ার জন্য কুব্জ ভাবে আসন গ্রহণ।

ডেস্কের উপর বই রাখিয়া পাঠের জন্য বালককে বিশেষ নীচু হইতে হয় এবং হঠাৎ হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইবারও সম্ভাবনা থাকে। যদি বসিবার বেঞ্চ খুব উচ্চ হয় তাহা হইলে পা দুলিতে থাকে এবং উরুর শিরায় চাপ পড়িয়া অনিষ্ট হয়। এই জন্য ছাত্রেরা বেঞ্চের সম্মুখ দিকে সরিয়া আসিয়া অঙ্গ বিস্তৃত করিয়া মেঝেতে পা রাখার চেষ্টা করে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে আজকাল স্কুলের আসবাবাদি এরূপ উপযোগী-ভাবে নির্ম্মিত হয় যে, স্কুলকর্ত্তৃপক্ষগণকে সেগুলি শ্রেণী অনুযায়ী ঠিক-ভাবে বসান (adjust) ভিন্ন আর কিছুই করিতে হয় না। ভারতবর্ষে অল্প স্কুলেই ডেস্ক দেওয়া হয়, কিন্তু সেগুলি আবশ্যকমত উঁচু নীচু (adjust) করার উপায় থাকে না। সেগুলি এক মাপেরই তৈয়ারী করা হয় এবং উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেণীর বালকেরাই তাহা ব্যবহার করে। এই জন্য সেগুলি জনকতকের পক্ষে খুব উঁচু এবং জনকতকের পক্ষে খুব নীচু হইয়া থাকে। বেঞ্চ বা ডেস্ক বালকের উপযোগী হইয়াছে কি না তাহা নির্দ্ধারণের কতকগুলি উপায় দেওয়া হইল।

বেঞ্চ এরূপ হইবে যে পা সহজে মেঝের উপর রাখা যায়। বেঞ্চ উরুর লম্বের প্রায় ⅔ ভাগ চেটাল হওয়া উচিত। বসিবার স্থানের পশ্চাৎভাগ অল্প (½ ইঞ্চি) খাল হওয়া আবশ্যক। ঠেসান দিবার জায়গা পৃষ্ঠের স্বাভাবিক গঠন অনুযায়ী (Backward and Upward slope) থাকা আবশ্যক, বিশেষতঃ পশ্চাতে কটিপ্রদেশ যেন ঠেস পায়। ঠেসান দিবার জায়গায় পৃষ্ঠদেশ, কটিদেশ এবং বস্তিদেশ ঠেস পাইয়া থাকে।

ডেস্ক এরূপ উচ্চ হওয়া উচিত যেন কনুই সমেত হাত তাহার উপর স্বাভাবিকভাবেই রাখা যায়। ডেস্কের উপরিভাগ গড়ানে (১৫ ডিগ্রী) হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে পুস্তক চোখের দৃষ্টিরেখার (Line of vision) প্রায় সমকোণে থাকে এবং লিখিবার পক্ষেও বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে।

স্কুলের আসবাবাদি বালকগণের বয়স অনুযায়ী না করিয়া দৈহিক আকৃতি অনুযায়ী ছোট বা বড় করা আবশ্যক।

ভারতবর্ষে গ্রাম্য পাঠশালা-সকলে বেঞ্চের ন্যায় কোন উচ্চ আসন বা ডেস্ক ব্যবহৃত হয় না। পাঠশালায় মেঝের সতরঞ্চি বা মাদুর বিছাইয়া আসনপিড়ি দিয়া বসিতে হয়। বেঞ্চে বসিবার অপেক্ষা এরূপ বসা স্বাস্থ্যকর ও কম যন্ত্রণাদায়ক। ইহাতে বালকেরা ইচ্ছামত স্বচ্ছন্দে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারে। ইহার সঙ্গে ডেস্কের পরিবর্ত্তে ছাত্রদিগকে যদি একখানা পুস্তকাধার দেওয়ার রীতি থাকিত তাহা হইলে পড়িবার সময়ও ইহাদিগকে ঘাড় হেঁট করিতে হইত না।

(লেখা ও ছবি স্বাস্থ্য-সমাচার, অগ্রহায়ণ)

*
* *

বাঙ্গালীর খাদ্যবিচার।

(১) বিভিন্নপ্রকারের খাদ্য এবং তাহাদের পুষ্টি-কারিতা (২) পরিশ্রম অনুযায়ী শরীরের উপর তাহাদের ক্রিয়া, শরীরবিধানের বৃদ্ধি ও Metabolism মেটাবলিজম্ (খাদ্য সকলের সারাংশ গ্রহণ ও অসারাংশের পরিত্যাগ ক্রিয়া) এবং (৩) ভোক্তার রোগ প্রতিষেধের জন্য তাহাদের আবশ্যকতা প্রভৃতি সকল বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

সামাজিক অবস্থানুসারে বঙ্গবাসীগণের মধ্যে কিরূপ দৈনিক আহার প্রচলিত আছে প্রথমতঃ তাহারই আলোচনা করা হইল।

১নং—কৃষকশ্রেণী।—

চাল = ১৬ ছটাক = ৩২ আউন্স।
ডাল = ½ „ = ১ „
তরকারী =
মাছ = ½ „ = ১ „ (সপ্তাহে ২ বা ৩ বার), তৈল ইত্যাদি।

২নং—সাধারণ গৃহস্থ।—

চাল = ৮ ছটাক = ১৬ আউন্স।
ডাল = ½ ছটাক = ১ „
তরকারী =
মাছ = ½ „ = ১ „
দুধ = ২ „ = ৪ „
তৈল, ঘৃত = ½ „ = ১ „

৩নং—অবস্থাপন্ন গৃহস্থ।—

চাল = ৩ ছটাক = ৬ আউন্স।
আটা = ৩ „ = ৬ „
ডাল = ½ „ = ১ „
তরকারী =
মাছ = ১ „ = ২ „
দুধ = ৪ „ = ৮ „
ঘৃত = ½ „ = ১ „
তৈল = ½ „ = ১ „

ইহার সঙ্গে মাংস ও ডিম্ব ইত্যাদিও গৃহী·

৪নং—ধনী লোক।—

চাল = ২ ছটাক = ৪ আউন্স।
ময়দা = ৩ „ = ৬ „
ডাল = ¼ „ = ½ „

তরকারী=

মাছ = ২ „ = ৪

দুধ = ৮ „ =১৬

ঘৃত = ২ „ = ৪

তৈল = ½ „ = ১

মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি থাকে। ইচ্ছামত মিষ্টান্নাদি গৃহীত হয়।

৫নং—ছাত্রগণ (বেসরকারী মেসে)।—

চাল = ৬ ছটাক =১২ আউন্স।

ডাল = ½ „ = ১ „

তরকারী=

মাছ = ১ „ = ২ „

দুধ = ২ „ = ৪ „

তৈল, ঘৃত= ½ „ = ১ „

মাংস ও ডিম্ব থাকে।

৬নং—ছাত্রগণ (সরকারী হোষ্টেলে)।—

চাল = ৮ ছটাক=১৬ আউন্স।

ডাল = ১ „ = ২ „

তরকারী=

মাছ = ½ „ = ১ „

ঘৃত = ½ „ = ১ „

তৈল = ½ „ = ১ „

মাংস =সপ্তাহে দুইবার।

৭নং—জেলকয়েদীগণ (বঙ্গের)।—

চাল =১৩ ছটাক=২৬ আউন্স।

ডাল = ৩ „ = ৬ „

তরকারী=

এইসকল খাদ্যতালিকায় কোন্‌টিতে কোন্‌জাতীয় উপাদান কত আছে নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল—

১নং—

আমিষ জাতীয় = ৬০ গ্রাম।

শালি জাতীয় =৭৪০ „

স্নেহ জাতীয় = ২৫ „

২নং—

আমিষ জাতীয় = ৫০ „

শালি জাতীয় =৪০০ „

স্নেহ জাতীয় = ৫০ „ (খুব বেশী হইলে)

৩নং—

আমিষ জাতীয় = ৬০ „

শালি জাতীয় =৩০০ „

স্নেহ জাতীয় = ৯০ „

৪নং—

আমিষ জাতীয় = ৮০ হইতে ৯০ গ্রাম।

(গৃহীত মাংসাদির পরিমাণ অনুযায়ী)

শালি জাতীয় =২৭০ হইতে ৩০০ গ্রাম।

(গৃহীত মিষ্টান্নাদির পরিমাণ অনুযায়ী)

স্নেহ জাতীয় =১৫৩ গ্রাম (গড়ে)

সামাজিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী এই তালিকার অনেক তারতম্যও হইয়া থাকে।

৫নং—

আমিষ জাতীয় = ৫৫ গ্রাম (সর্ব্বরকমে)

শালি জাতীয় =৩২৫ „

স্নেহ জাতীয় = ৬০ „

৬নং—

আমিষ জাতীয় = ৭০ „

শালি জাতীয় =৫৫০ „

স্নেহ জাতীয় = ৭০ „

৭নং—

আমিষ জাতীয় = ৯০ „

শালি জাতীয় =৭০০ „

স্নেহ জাতীয় =২০ „ (সর্ব্ব রকমে

উপরিলিখিত তালিকাসমূহে বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙ্গালীর খাদ্যের উপাদানগত পার্থক্য দেখান হইল। আমিষ উপাদানের মাত্রা ৫০ হইতে ৮০ গ্রাম, ধনী লোকের খাদ্যে ইহার মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং দারিদ্রের খাদ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম। স্নেহ উপাদানের তারতম্যও ঐরূপ। কিন্তু শালিজাতীয় উপাদানের মাত্রা অবস্থার উন্নতির সঙ্গে কমিতেই থাকে। জেলকয়েদীদের খাদ্যে আমিষ ও শালি উপাদান সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্য অপেক্ষা অনেক অধিক, কিন্তু স্নেহ উপাদানের মাত্রা দরিদ্রগণের খাদ্যের অপেক্ষাও কম। কৃষকের খাদ্যে শালি উপাদান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

নির্দ্দিষ্ট খাদ্যতালিকার সহিত তুলনা।

Voit সাহেব ইউরোপীয়গণের জন্য যে নির্দ্দিষ্ট খাদ্যতালিকা করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বলিখিত তালিকাগুলির মধ্যে কোনটিরই আমিষ উপাদান ইহার কাছাকাছি নহে। শালি উপাদানের মাত্রা কিছু কম বেশী প্রায় একরূপ। কিন্তু স্নেহ উপাদানের মাত্রা Voitএর তুলনায়, দুইটি ব্যতীত সকল তালিকারই বিশেষ কম।

Voit নিম্নলিখিত মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

আমিষ জাতীয় ... ১২০ গ্রাম

শালি জাতীয় ... ৪০০ „

স্নেহ জাতীয় ... ১০০ „

কিন্তু Chittenden সাহেবের নির্দ্দিষ্ট, জীবন রক্ষার পক্ষে ন্যূন পক্ষে যতটা আমিষ উপাদান আবশ্যক, সেই মাত্রার সহিত বাঙ্গালীর খাদ্যের আমিষ উপাদানের মাত্রার মিল আছে। তিনি শালি উপাদানের যেরূপ মাত্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তদপেক্ষা বাঙ্গালীর খাদ্যে শালি উপাদানের মাত্রা কিছু অধিক।

শরীরের উপর বিভিন্ন খাদ্যের ক্রিয়া।

দেহের (Cellular structureএর) ক্ষয় নিবারণ করাই আমিষ উপাদানের কার্য্য, এই উপাদান অধিক পরিমাণে গৃহীত হইলে যেরূপে হউক বাহির হইয়া যাওয়া আবশ্যক। শালিজাতীয় উপাদানের ক্রিয়া অন্যরূপ। ইহা প্রথমতঃ দেহের উত্তাপ ঠিক রাখে, দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মশক্তি (energy) দান করে, তৃতীয়তঃ অতিরিক্ত আমিষ উপাদান গ্রহণের কুফল নিবারণ করে। শরীর-মধ্যে গৃহীত হইয়া আমিষ উপাদানের অতিরিক্ত অংশ একমাত্র মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়ার দ্বারাই পরিত্যক্ত হয়। অধিক আমিষ আহার করিলে, মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়া বিশেষ বৃদ্ধি পায়। এই-সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া খাদ্যের তালিকা ও ভোক্তার শরীরের উপর তাহাদের ক্রিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

কৃষক-জীবন বিশেষ পরিশ্রমের জীবন, প্রায় ১২ ঘণ্টা কাল তাহাদের কঠিন দৈহিক পরিশ্রম করিতে হয়। এইরূপ কঠিন পরিশ্রমের ফলে অধিক পরিমাণ কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড বাষ্পের উৎপত্তি হয়, শরীরে অধিক তাপ এবং তৎসঙ্গে শক্তিও নাশ পায়। এই দৈহিক উত্তাপ ও শক্তির ক্ষয়, গৃহীত শালিজাতীয় খাদ্যের দ্বারা পূরণ হয়। কৃষকের (ও যাহারা অধিক শারীরিক পরিশ্রম করে) অধিক পরিমাণ শালিজাতীয় খাদ্য গ্রহণের আবশ্যক হয়। কৃষকের খাদ্যে আমিষ উপাদানের মাত্রা উপযুক্তরূপ এমন কি Chittenden সাহেব যে আবশ্যকীয় মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তদপেক্ষা ২০ গ্রাম বেশী আছে। যদি শালিজাতীয় খাদ্যের মাত্রা ঠিক থাকে তাহা হইলে, কৃষকের খাদ্যের আমিষ উপাদান, তাহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে যথেষ্ট। কৃষকের খাদ্যে স্নেহ উপাদানের পরিমাণ অতি অল্প কিন্তু ইহার জন্য তাহাদের কোন ক্ষতি দেখা যায় না। কৃষকেরা যে কার্য্য করে তাহার প্রায় সবই শারীরিক পরিশ্রম এবং তাহারা সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করিয়াই নিজেদের কার্য্য সম্পূর্ণ ও উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। বঙ্গের পল্লীবাসীগণের মধ্যে কৃষকেরাই (ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ছাড়া) সুগঠিত-দেহ ও বলবান, তাহাদের দেহ চর্ব্বির আধিক্যের জন্য স্থূলতাদোষে দুষ্ট নহে এবং তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিশ্রম-সহিষ্ণু।

কৃষকের পরেই সাধারণ গৃহস্থ, যাঁহারা কোনরূপে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন রক্ষা করিতে সক্ষম হন। তাঁহাদের খাদ্য-তালিকায় শালি উপাদান কৃষকের অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু স্নেহ-উপাদান কিছু অধিক থাকে।

খাদ্য যেরূপই হউক সাধারণ গৃহস্থই অধিক কষ্ট ভোগ করেন। কারণ প্রথমতঃ তাঁহাদের কার্য্যে দৈহিক পরিশ্রম অল্প, দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের পয়সার অভাব, তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্যাদিও অপকৃষ্ট শ্রেণীর এবং তৃতীয়তঃ দৈহিক পরিশ্রম অল্প বলিয়া তাঁহারা পরিশ্রমী কৃষকগণের মত নিজ খাদ্য পরিপাক করিতে সক্ষম হন না।

অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা সহজেই গ্রাসাচ্ছাদন-কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহাদের খাদ্যসামগ্রী উৎকৃষ্ট, খাদ্যে আমিষ-উপাদান উপযুক্তরূপ থাকে, শালি-উপাদানের মাত্রাও মন্দ নহে। গৃহীত স্নেহ-উপাদানের পরিমাণও শরীরের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁহাদের কর্ম্মের ধরণও অপেক্ষাকৃত উপযুক্তরূপ, তাঁহারা নিয়মিত অভ্যাসী। যদিও তাঁহারা নিজেদের সামাজিক অবস্থা ঠিক রাখার জন্য একবারে উদ্বেগশূন্য হইতে পারেন না, তথাপি এই শ্রেণীর লোকেই অধিক সুস্থ হইয়া থাকেন।

ধনী লোকে কেবল মাত্র সুখাদ্যের জন্য, রসনার তৃপ্তির জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের খাদ্যে আমিষ ও স্নেহ-উপাদানের মাত্রা অধিক থাকে। স্নেহ-উপাদানই অত্যধিক গ্রহণ করা হয়। এই-সকল লোকের ভুঁড়ি বাড়িয়া যায় এবং মাথাটি দেহের তুলনায় ছোট দেখায়। এই-সকল অতিভোজী লোকে সম্ভবতঃ কোনরূপ কাজকর্ম্ম না থাকায়, নানারূপ কল্পিত রোগের অনুযোগ করিয়া থাকেন।

বেসরকারী ছাত্রাবাসের খাদ্যতালিকা যদিও অনুপযুক্ত নহে, তথাপি সরকারী হোষ্টেলের তুলনায় তাহার পুষ্টিকারিতা কম। সরকারী হোষ্টেলের খাদ্যতালিকাকে প্রায় আদর্শ-তালিকা বলা যাইতে পারে। বেসরকারী ছাত্রাবাসের খাদ্য-তালিকায় আমিষ-উপাদানের মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দিলেই বিশেষ উপযুক্ত হয়।

জেল-কয়েদীদের খাদ্যে আমিষ ও শালি-উপাদানের মাত্রা খুব বেশী কিন্তু স্নেহ-উপাদানের মাত্রা অতি অল্প। অন্যান্য জনসাধারণের তুলনায় জেলকয়েদীদের স্বাস্থ্য ভাল বলা হয়, কিন্তু তাহারা যে-পরিমাণে শালি-উপাদান গ্রহণ করে তাহা সহজে পরিপাক পায় কি না এবং জেল-কয়েদীদের মধ্যে আমাশয় ও উদরাময়ের অত্যন্ত আধিক্য এই জন্য হয় কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

রোগের উৎপত্তি।

নানা বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া ইহা একরূপ নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে সাধারণ-আহার-গ্রহণকারী কৃষক বা শ্রমজীবীগণ অপেক্ষা গুরুভোজী ব্যক্তিগণই নানারূপ রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। পরিশ্রমী দরিদ্রগণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই অজীর্ণতা, রেনেল কলিক, বাত বা স্থৌল্য রোগে কষ্ট পায়।

অজীর্ণতা—Dyspepsia—রসনার তৃপ্তির জন্য যাঁহারা অতি ও গুরুভোজন করেন তাঁহাদের মধ্যেই অজীর্ণতা রোগের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। এরূপ স্থলে খাদ্যের পচনজনিত অজীর্ণতাই (Fermentative Dyspepsia) অধিক। নানারূপ খাদ্য বহুবারে গ্রহণ করাতে পাকাশয় অতি অল্পই বিশ্রাম পায়, ইহার ফলে পাকাশয়-পেশীগাত্রের ক্রিয়াশক্তি কমিয়া যায় এবং পাকাশয় মধ্যে খাদ্যাংশ পচিয়া গ্যাস উৎপাদন করে। এইসকল কারণ ব্যতীত আর-একটি কারণ আছে এই যে, তাহাদের কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম থাকে না। ইহার ফলে যে পচনজনিত অজীর্ণতা (Fermentative Dyspepsia) হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সাধারণ গৃহস্থগণের মধ্যেও অজীর্ণতা সাধারণ ব্যাধি, অম্লজনিত অজীর্ণতাই (Acid Dyspepsia) অধিক। এরূপ অজীর্ণতার কারণ—(১) অসচ্ছলতার জন্য, উত্তম ও নির্দ্দোষ খাদ্যসংগ্রহের অভাব, (২) কোন গতিকে আহার-দ্রব্য গলাধঃকরণ করা এবং (৩) নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহাদিগকে যে পরিশ্রম করিতে হয় তাহা। শ্রমজীবীগণের মধ্যে অজীর্ণতা প্রায় নাই বলিলেই হয়।

মূত্রগ্রন্থির শূল বেদনা—Renal Colic—এই রোগ মেটাবলিজম্ ক্রিয়ার ব্যাঘাতের জন্য হইয়া থাকে এবং যাঁহারা ভোগে থাকেন তাঁহাদেরই হয়। যাঁহারা অত্যধিক মাংসাহার করেন তাঁহাদের মধ্যেই এই রোগ অধিক দেখা যায়, কিন্তু যাঁহারা মোটেই মাংসাহার করেন না তাঁহাদের মধ্যে যে একেবারেই নাই এমন নহে।

গেঁটে বাত, (Gout)—মাংসাহারী ব্যক্তিগণের মধ্যেই এই রোগ সীমাবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। ধনীগণ ছাড়া অতি অল্প বাঙ্গালীরই এই রোগ হইয়া থাকে।

মধুমেহ—Diabetes Mellitus:—মধ্যবিত্ত এবং অবস্থাপন্ন লোকের ইহা একটি প্রধান ব্যাধি। যাঁহারা ভোগে থাকেন, মেটাবলিজম ক্রিয়ার ব্যাঘাতের জন্যই তাঁহাদের এই রোগ হইয়া থাকে। অবস্থাপন্ন লোক বিশেষতঃ যাঁহাদের শারীরিক পরিশ্রম অপেক্ষা অধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাঁহাদের মধ্যেই এই রোগ দেখা যায়। শ্রমজীবীগণের মধ্যে এ রোগ একরূপ দেখাই যায় না।

স্থূলতা—Obesity:—প্রকৃতপক্ষে ইহা রোগ না হইলেও, ইহার জন্য নানারূপ অবস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে হয়। অতিরিক্ত ভোজন ও পরিশ্রমের অভাবই ইহার কারণ। দরিদ্রলোকের মধ্যে এই দোষ মোটেই দেখা যায় না, অতিরিক্ত ভোগের জন্য ধনীগণের অনেকেই ইহাতে কষ্ট পান।

শরীরবিধানতন্তু-সমূহের বৃদ্ধির সময়ে মাংসাদি খাদ্য উপযোগী হইতে পারে কিন্তু শরীরের যখন হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় তখন মাংসাহার আয়ু কমাইবার প্রধান কারণ স্বরূপ হয়। কিন্তু জীবনের প্রথম সময়েও শালিজাতীয় খাদ্যকে অবহেলা করা যায় না, কারণ বর্দ্ধনশীল শরীর-বিধানতন্তু-সমূহের শক্তির আবশ্যক হয়, এই শক্তি প্রধানতঃ শালিজাতীয় উপাদান হইতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালীর বর্ত্তমান আহার তাহাদের জন্য যথোপযুক্ত এবং তাহার

বিশেষ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই, কিন্তু স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধান সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি পালনের আবশ্যকতা রহিয়াছে। নিজের এবং চতুষ্পার্শ্বের স্বাস্থ্যকর অবস্থা-সমূহের উন্নতি করিলে, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন-লাভের পক্ষে বিশেষ সুফল ফলিবে।

পরিমিত পরিশ্রমী বয়স্ক বাঙ্গালী গৃহস্থ ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কিরূপ দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

চাল = ১ পোয়া। (অথবা
চাল ২ ছটাক ও আটা ২ ছটাক)
ডাল = ১ ছটাক।
মাছ = ১ „
তরকারী = উপযুক্ত পরিমাণ, আলু
প্রত্যহ থাকা আবশ্যক।
দুধ = ১ পোয়া।
ঘি,তেল = ½ ছটাক।

উপরোক্ত খাদ্যে ৪০ হইতে ৫০ গ্র্যাম আমিষ উপাদান এবং ৩০০ গ্র্যাম শালি-উপাদান আছে।

তালিকা-পরিমিত খাদ্য, আহারের লালসা মিটাইবার পক্ষে কম হইতে পারে কিন্তু দিন কতক অভ্যাস করিলেই ইহাতে আর কোন অসুবিধা হয় না।

পূর্ব্বলিখিত সাধারণ আহারই যথোপযুক্ত। তবে যাহাদের অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম তৎসঙ্গে মানসিক পরিশ্রমও করিতে হয়, তাহাদের খাদ্যে মধ্যে মধ্যে মাংস কিংবা ডিম্বের যোগ আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু অধিক পরিমাণ দুগ্ধের দ্বারাও উক্ত অভাব পূরণ হইতে পারে এবং বাঙ্গালী মাংস স্পর্শমাত্র না করিয়াও ভাল থাকিতে পারে।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, অগ্রহায়ণ)

দেশের কথা

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন দুর্দ্দশায় পড়িয়া মানুষ যথার্থ বন্ধুর পরিচয় পায়, অসময়েই কে বন্ধু এবং কে নয় তা জানিতে পারে, তেমনি জাতীয় জীবনেও দারুণ বিপদের সময়ই সমগ্র দেশের ঐক্য ও সহানুভূতি পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। বাংলা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভাষা ভিন্ন, পোষাক ভিন্ন; আচার ব্যবহারও অনেকাংশে ভিন্ন। এই সব দেখাইয়া আমাদের শাসক-সম্প্রদায় অহরহ বলিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষের ঐক্য কবি-কল্পনা, উহা অসম্ভব। কিন্তু আজ যখন বাংলা দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী অনশন ও রিক্ততায় নিষ্ঠুরভাবে প্রপীড়িত তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ অনাহারী বঙ্গবাসীর মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়া প্রমাণ করিতেছেন যে যদি হৃদয়তন্ত্রী একসুরে বাঁধা থাকে তবে সহস্র ব্যবধানও মিলনের পথে অন্তরায় হয় না। ভারতবর্ষ ঐক্যের পথে সহমর্ম্মিতার পথে চলিয়াছে, ইহার চেয়ে আশার কথা আর কি আছে!

ভারতীয় মুসলমান সমাজেও জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, মুসলমানেরাও কুশিক্ষা কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকারে আর থাকিতে ইচ্ছুক নন, বাঁধি পথ ও বাঁধি বুলি ছাড়িয়া তাঁহারা এখন নিজের ভালোমন্দ নিজে ভাবিতে শিখিতেছেন—ইহার প্রমাণ ভারতীয় মোসলেম লীগ। সম্প্রতি বোম্বাই সহরে এই লীগের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। "মোহাম্মাদী" সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

সপ্তমে সুর চড়াইয়া, শব্দগ্রামকে তীব্রতর স্তরে আরোহণ করাইয়া বজ্রকঠোর হস্তে অস্ত্রাঘাত করিবার সময় আসিয়াছে, নচেৎ এ সমাজের আর রক্ষা নাই, এ জাতির আর উদ্ধার নাই। জানি, অনেকেই সত্যের তীব্র আলোক সহ্য করিতে পারিবে না। যাহারা অন্ধকারের জীব, অন্ধকারে যাহাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি, তাহারা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবে, তাহাদের চোখ ঝলসিয়া যাইবে, তাহারা সমস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিবে। কিন্তু মানুষের ভয়ে সত্য প্রচারে ক্ষান্ত থাকা মুসলমানের কাজ নহে; অতএব তীব্র হইলেও, কঠোর হইলেও, এবং অনেকের পক্ষে অপ্রীতিকর হইলেও ক্ষান্ত হওয়া সঙ্গত ও সম্ভবপর হইতেছে না।

ইহাই তো মানুষের মত কথা! ইহা হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ সকলের বেলাই খাটে।

আমাদের দেশের কথার মধ্যে আনন্দের কথা অতি অল্প। দেশে ব্যাধির অন্ত নাই; তার উপর পণপ্রথাটিও প্লেগ বসন্ত কলেরা ম্যালেরিয়ার মতই মারাত্মক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে "বাঙ্গালী" লিখিয়াছেন—

বিবাহ-সভায় মনুষ্যচর্ম্মাবৃত নিম্মম অর্থলোভকে বরকর্ত্তার মুখোস পরিয়া নির্লজ্জের মত দাঁড়াইয়া অসঙ্কোচে সোনার গহনা ওজন করিয়া লইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ফুলশয্যার তত্ত্ব মনের মত হয় নাই, কি পণের টাকা দুই এক শত কম পড়িয়াছে বলিয়া নববধূকে পিত্রালয়ে যাইতে দেওয়া হয় নাই; মেয়ের বাপ মেয়ে আনিতে গেলে, তাহাকে অপমান করিয়া হাঁকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাও অনেকবার দেখিয়াছি।

বিনা পণে যাহাতে বাঙ্গালীর ছেলের বিবাহ হয় এজন্য আন্দোলন ত মন্দ হইতেছে না; সভাসমিতি ও বক্তৃতারও অভাব নাই! কিন্তু এমন সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে যিনি এই সভার সভাপতি হইলেন, বরপণ প্রথার অপকারিতা সম্বন্ধে যিনি তারস্বরে তিন ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিলেন, তাঁহারই পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয় বা পৌত্রের বিবাহ দিতে বসিয়া শেষে তিনিও সাত হাত লম্বা ফর্দ্দ বাহির করিয়া বসেন; এবং তাহা দেখিয়া কন্যাকর্ত্তার চৌদ্দ হাত জিব বাহির হইয়া পড়ে। তাহাকে নিরুপায় হইয়া "হাড়ি কাঠে" মাথা পুরিয়া দিতে হয়।

আমাদের একটি বন্ধু মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র খুঁজিতেছেন। কন্যার বিবাহের জন্য পাত্রান্বেষণই এখন তাঁহার পেশা। মেয়েটি সুন্দরী, তিনিও যথাসাধ্য সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদানে সমুৎসুক, অবস্থাপন্ন সুশিক্ষিত যোগ্য পাত্রের সন্ধানও মিলিল। বরের বাপ সদরালা; তিনি মেয়ে পছন্দ করিয়া বক্রমুখে বলিলেন 'তা চল্‌তে পারে, কিন্তু অমুক মিত্র ছয় হাজার পর্য্যন্ত উঠেছে; আপনি সাত হাজারে রাজী হইলেই শুভকার্য্যের দিন স্থির করা যায়।' বন্ধুটি অগত্যা

তাহাতেই রাজী হইলেন। পাঁচ সাত দিন পরে বরের বাপ বলিয়া পাঠাইলেন, অমুক মিত্র ছাড়ছে না; তার মেয়েটিও আপনার মেয়ের চেয়ে সুন্দরী, বিশেষতঃ সে যখন সাত হাজারেই রাজী, তখন কি করে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া যায়? তবে আপনাকে যখন কথা দিয়েছি, তখন আপনি আর এক কাজ করুন, যাহা পঞ্চার তাঁহা ছাপ্পান্ন, আপনি আর হাজার খানেক টাকা ধ'রে দিন। কুটুম্বের সঙ্গে কথার এদিক ওদিক হওয়া বড়ই কষ্টের কথা! কিন্তু কি করি? সমাজের চাল চলন একেবারে বিগড়ে গিয়েছে। ইত্যাদি।

বন্ধু বলিয়া পাঠাইলেন, আমার কন্যা চিরকাল অনূঢ়া থাকে তাহাও স্বীকার; আপনার ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব না।

নিলর্জ্জ সবলালা সংবাদ পাঠাইলেন; সাত হাজারেই রাজী।—ছেলে এম-এ পাশ হলে আসছে বৎসর নিশ্চয়ই ডেপুটিগিরি পাইবে। ভাবিয়া উত্তর দিবেন। আমি এক কথার মানুষ।

বন্ধু বলিলেন, আপনার ছেলে বাঙ্গালার সিংহাসন পাইলেও এ বিবাহ হইবে না।

তাই বলিতেছি সভা করিয়া বক্তৃতা দিয়া সমাজের এই উৎকট ব্যাধির প্রতীকার হইবে না। সমাজের যাঁহারা প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা হাতে-কলমে কাজ করিয়া আদর্শের সৃষ্টি করুন।

"স্বরাজ" সংবাদ দিয়াছেন—

কিঞ্চিদধিক সাত বৎসর পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-তনয় মধ্যবিত্ত একটি ব্রাহ্মণ-তনয়ার পাণিগ্রহণ করে। বিবাহ-কালীন বর ম্যাট্রিকুলেশান ২য় শ্রেণীতে পড়িত। এই বিবাহে বর কন্যাপক্ষের নিকট হইতে নগদ ১৫০০৲ টাকা গ্রহণ করে এবং তাহার পড়ার ব্যয় বহন করিতে হইবে, শ্বশুরকে এরূপ এক চুক্তিপত্রে আবদ্ধ করে। বিবাহের কিয়দ্দিবস পর শ্বশুরের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে এবং তিনি এই ব্যয়ভার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য জামাতাকে সানুনয় অনুরোধ করেন। জামাতা অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং আদালত অবলম্বন করে এবং ডিক্রীজারী করিয়া শ্বশুরের নিকট হইতে এই টাকা আদায় করিতে থাকে। এই ঘটনার পর হইতে জামাতা তাহার স্ত্রীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে এবং কিয়দ্দিবস পরে পরিণীতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। এই জামাতা সম্প্রতি বি, এ, ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে। গত বৎসর জামাতা শ্বশুরালয়ে স্ত্রীকে সংবাদ দেয় যে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবে। হতভাগিনী এই সংবাদে মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প হয়। সামান্য পরিচারিকার ন্যায় স্বামীগৃহে বাস করিতে চাহিয়াও যখন লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হইয়া পিত্রালয়ে তাড়িতা হইল তখন সে একদিন অহিফেন সেবন করিল। তিন দিবস অসহনীয় যন্ত্রণা পাইয়াও চিকিৎসকের সাময়িক চেষ্টার ফলে তাহার মৃত্যু হইল না। হতভাগিনী এখনও জীবিত আছে। স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেছে। আর সেই জামাতাপুঙ্গব এখনও বি, এ, শ্রেণীতে পড়িতেছে, ইহার অভিভাবক নাই—নিজেই নিজের কর্তৃপক্ষ। আমরা আরও অবগত হইলাম ২৫০০৲ টাকা পণ হাঁকিয়া ইনি ২য় বার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী ভদ্রসমাজে ইহার এরূপ দুর্নাম রটিয়াছে যে কেহই আর ইহার হাতে কন্যাসম্প্রদানে অগ্রসর হইতেছে না।

স্ত্রীলোককে এমন হইতে হইবে, তেমন হইতে হইবে, তাহাকে মুখ বুজিয়া সকল কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, স্বামী যত বড় পশুই হৌক না কেন তাহাকে দেবতাজ্ঞানে অহরহ পূজা করিতে হইবে, এরূপ ঝুড়ি ঝুড়ি শাস্ত্রবচন ও উপদেশ অহরহ আমাদের মেয়েদের শুনানো হয়। কিন্তু মজার কথা এই যাঁহারা উপদেশ দ্যান তাঁহারা পুরুষ; এবং সেইজন্যই তাঁহারা এমন উপদেশ দ্যান যাহাতে তাঁহাদের সুখ ও স্বাধীনতা ষোল আনা বজায় থাকে। পুরুষ যা খুসি তাই করুক; কারণ সে যে পুরুষ। আর স্ত্রীলোক যদি কোনো অপরাধও না করে, পুরুষের খুসী হইল, তো দাও তাহাকে দূর করিয়া—ইহাই আমাদের সমাজে নির্দ্দিষ্ট। তাই "সম্মিলনী"তে প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি পড়িয়া আমরা বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছি।

* * * দেবী ব্রাহ্মণ-পত্নী, বয়স ১৭।১৮ বৎসর। তাঁহার স্বামী * * * সারাঘাট রেলওয়েতে কাজ করেন। তাঁহার আত্মীয় জগদীশচন্দ্র মৈত্র ও নসিরুদ্দীন মণ্ডল তাঁহার পত্নীকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া গত ২৬শে আষাঢ় স্বামীর গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়। ৮।৯ দিন নানাস্থানে রাখে। হতভাগিনীর স্বামী সমাজের চিরাচরিত রীতি অনুসারে স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া দুঃখদুর্দ্দশার অকূল পাথারে ভাসাইয়া দেন নাই। তিনি স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছেন।

সে-ই সার্থক প্রেমিক যে নিন্দা গ্রাহ্য করে না, সমাজের রক্তচক্ষুকে ভয় করে না; তাহার প্রেয়সীকে যখন সকলে অপমান করিয়া তার নারীমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া তাড়াইয়া দিতে উদ্যত তখন সত্য ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লয়।

বর্ষার বারিধারায় সিক্ত হইয়া, খর রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, শীতে কম্পমান দেহে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে বসবাস করিয়া যে কৃষক সম্প্রদায় আমাদের অন্ন জোগাইতেছে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা প্রায় সকলেই একেবারে উদাসীন। নিজেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ি, কিন্তু তাহাদিগকে শিক্ষাহীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখিয়াছি। ব্যবস্থা করিয়াছি রামায়ণ মহাভারত শুনিলেই তাহাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইবে। তাহারা কৃষক কি না, তাই তাহাদের কৃষিবিদ্যা শেখার প্রয়োজন মোটেই নাই। দেশে মধ্যে মধ্যে বিশেষত বড়দিনের সময় রাষ্ট্র-নৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রভৃতি নানা রকম বৈঠক বসে; কিন্তু কৃষিজীবীদের অবস্থা কেমন করিয়া উন্নত হইবে, কেমন করিয়া উন্নত প্রণালীতে চাষবাস করা তাহাদিগকে শেখানো যায়—এসব চিন্তা লইয়া কৈ কেহ তো মাথা ঘামান না! অথচ এই কৃষিজীবী সম্প্রদায়ই দেশের মূল ভিত্তি।

"রায়ত" লিখিয়াছেন—

বড়দিনের বন্ধে বঙ্গের যে কোনও স্থানে আমরা কৃষি কনফারেন্সের অধিবেশন দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব ছিলাম, তজ্জন্য আমাদের যত্ন চেষ্টারও ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্মবীরকে আমরা যথাসময়ে হাতে পাই নাই। দেশের এবং সমাজের জন্য কিঞ্চিৎ স্বার্থ ত্যাগ না করিয়া শুধু মুখে লম্বা লম্বা কথা ছাড়িলে কোনও দিনই কোনও কাজ হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় বঙ্গীয় কৃষকদলের উপকারকল্পে সেরূপ কর্ম্মীপুরুষ আমরা একটিও পাইলাম না। কাজেই বড়দিনের বন্ধে কৃষি কনফারেন্সের আশা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইতেছে। এই অত্যাচরিত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত সম্প্রদায়ের বিন্দু উপকারের জন্য দেশের কোনও ধনী, সুখী, বা জমিদার তালুকদার শ্রেণীর লোক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, সে আশা আমাদের নাই এবং তাহা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। বঙ্গের কৃষক ও জোতদার সম্প্রদায় বর্ত্তমান ব্যাপারে তাহার বেশ পরিচয় পাইলেন। এখন সকলেই মনে রাখুন, নিজেদের উপকারের পথ পরিষ্কার করিয়া লইবার ইচ্ছা থাকিলে, নিজেদের অভাব অভিযোগ রাজদ্বারে জানাইবার বাসনা থাকিলে, নিজেরা তাহার জন্য প্রস্তুত হউন। অন্যথা সমস্ত সুযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে।

কৃষি কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য কি?

কৃষি কনফারেন্সে কৃষি-কথারই তত্ত্ববহুল আলোচনা হইবে। কৃষি সম্বন্ধীয় নিত্য প্রয়োজনীয় ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সকলকে তাহার বিস্তারিত বিবরণ বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। প্রাকৃতিক নানাকারণে, দেশ ক্রমশঃ অনুর্ব্বর হইতেছে, খাল বিল নদ নদী, ক্রমশঃ জলহীন হইয়া পড়িতেছে, কৃষিকার্য্যের উন্নতির পক্ষে ইহা এক প্রবল অন্তরায়, কিসে ইহা হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, তাহার উপায় চিন্তা করিয়া উদার গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে। কৃষি-কার্য্যের বর্ত্তমান অধঃপতনের যুগে, সুধু প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আকাশের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিলে এখন আর কৃষিকার্য্যে সফলতা ও লাভের আশা করা যাইতে পারে না। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত রাসায়নিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য না করিলে আর আমাদের উপায় নাই, পেটের ক্ষুধা দূর করিবার হেতু আসিবে না, সুতরাং আমরা অনাহারে কাঁদিয়া মরিব। সুতরাং কৃষি কনফারেন্সে এই বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালীর আলোচনা করিয়া নিরক্ষর কৃষককে তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য সহানুভূতিও প্রার্থনা করা হইবে। কি উপায় অবলম্বন করিলে পল্লীগ্রামের নিরীহ দরিদ্র কৃষক নানাশ্রেণীর অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পায়, কিসে তাহাদের স্বত্ব স্বামিত্ব বজায় থাকে, কিসে তাহারা প্রকৃত কৃষক ও মানুষ হইতে পারে, এবং যাহাতে তাহাদের মধ্যে অবাধে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হয় প্রভৃতি বিষয়ের উপায় চিন্তা করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করাই কৃষি কনফারেন্সের উদ্দেশ্য। দেশের শতকরা ৮৫ জন নরনারী যে ব্যবসায়ী তাহাদিগকে রক্ষা করাই এই কনফারেন্সের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পল্লীগ্রামের ইস্কুল পাঠশালা ও মোক্তবগুলির হীনাবস্থা লক্ষ্য করিয়া "রায়ত" যথার্থই বলিয়াছেন—

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বন্ধ থাকায় দেশীয় পল্লী সমূহের স্কুল পাঠশালা মোক্তবগুলি প্রায় লোপ হইতে বসিয়াছে। পাড়াগেঁয়ে মূর্খ বালকগুলিকে মূর্খতার অন্ধকারে রাখিয়া উচ্চশিক্ষার হাল ধরিলে দেশের কোনও উপকার হইবে বলিয়া আমরা আশা করি না। শিক্ষার প্রচারকল্পে গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট ব্যয় করিতেছেন। ডিরেক্টার, এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টার, ইনস্পেক্টার, ডেপুটী ইন্সপেক্টার প্রভৃতি দলের জন্য গবর্ণমেণ্টের বোঝা বোঝা টাকা ব্যয় হইতেছে। তার উপরেও শিক্ষা-কমিশনারের জন্য কত টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। যে অজুহাতে পল্লী-পাঠশালার দরিদ্র গুরুগুলির মুখের অন্ন বন্ধ রাখা হইতেছে, সেই উদ্দেশ্যে তৎপরিবর্ত্তে এই মোটা বেতনের দুই এক জনকে এখন কতক দিন না পুষিলে কি চলে না? ইহাতে শিক্ষার পথে কোন বাধা ত হইবেই না, অথচ দরিদ্র গুরুর দল বাঁচিয়া যাইবে।

দেশের জমিদারদের উচিত নিজের নিজের জমিদারীতে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করা। তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিয়া বিলাসিতা করিলে ও প্রজার হিতে ব্যয় না করিলে তাঁহাদের অধর্ম্ম হইবে, পরন্তু চুরি করা হইবে। এক এক জনের আয় ত কম নয়; য়ুরোপের ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকেও ত নিজের প্রজার সমস্ত অভাব মোচন করিতে হয়; আমাদের জমিদারেরাও যদি তেমনি প্রত্যেকে নিজের জমিদারীকে উন্নত শিক্ষিত সুস্থ সবল করিয়া তুলিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের দুঃখদৈন্য কদিন থাকে। এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত এদেশেও আছে—

বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রসার।—বারোদার গায়কোয়াড় ও মহীশূরের মহারাজের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া [আউন্ধের মহারাজা ও] ইন্দোরের মহারাজ হোলকার স্বীয় রাজ্যের সর্ব্বত্র বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। স্কুল স্থাপন, তাহার পরিচালন এবং স্কুলগৃহ নির্ম্মাণের জন্য মহারাজ যথোপযুক্ত অর্থ বিনিয়োগের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। (সম্মিলনী)

প্রত্যেক রাজা জমিদার প্রজার কাছে ঋণী, তাঁহারা প্রজার ঋণ এইরূপে শোধ করিতে ধর্ম্মত লোকত বাধ্য।

আমাদের দেশে টাকার অভাবে সৎকার্য্য হইতে পায় না, অজ্ঞান দূর হয় না, উপবাসী অন্ন পায় না; কিন্তু দেশে যে টাকা একেবারে নাই তাহাও ত নয়। আমাদের দেশের টাকা যক্ষের ধন; আমরা আগলাইয়া বসিয়া থাকি, ব্যবসা বাণিজ্যে খাটাইয়া বৃদ্ধি করিতে জানি না, সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া যশ ও পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারি না। অনেক কাগজে এই সংবাদটি প্রকাশ হইয়াছে—

প্রায় দেড় লক্ষ টাকা উইএর পেটে।—মানভূমের জমীদার শ্রীযুক্ত সাহজীলাল সিং দেও একটা লোহার সিন্দুকে এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকার করেন্সী নোট রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সিন্দুক খুলিয়া দেখিতে পান যে, উহার মধ্যে কিরূপে উই প্রবেশ করিয়া সমস্ত নোটগুলি খাইয়া ফেলিয়াছে।

এই টাকা উইএর পেটে যাওয়াতে জমিদার সিংহদেওএর কিছুই ক্ষতি হয় নাই, কথামালার কৃপণের ন্যায় তিনি মনে করিলেই পারিবেন টাকা তাঁহার মালখানায় লোহার সিন্দু-

কেই আছে। ক্ষতি হইল দরিদ্র দেশের; আর দরিদ্র প্রজার—যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া স্ত্রীপুত্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া জমিদারের লোহার সিন্দুক ভরাইয়াছিল।

যে-সব জমিদার বা সাধারণের চাকর যাহাদের নিমক খাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকেন তাহাদের হিতেই উদ্বৃত্ত অর্থ কিছুও ব্যয় করেন তাঁহারা যথার্থ মানুষ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া সকলের নমস্য। এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে দুর্লভ হইলেও একেবারে অসম্ভাব নাই।

সদনুষ্ঠানে দান।—ঢাকার কাসিমপুরের জমিদার বাবু সারদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী লোকান্তরিত পুত্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য, ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্রবে আর্ত্ত ও অনাথদিগের জন্য এক আশ্রম নির্ম্মাণার্থ ৬০০০ টাকা ব্যয় করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন। সার্থক স্মৃতিরক্ষা।

—হিন্দুরঞ্জিকা।

পাবলিক লাইব্রেরী।—বরিশালের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মি: এফ, ডব্লিউ, ষ্ট্রং সাহেব অত্রত্য পাবলিক লাইব্রেরীতে ৬২৫ খানা বহি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন।

—কাশীপুরনিবাসী।

দেশে দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি জুড়িয়া বসিয়াছে। বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ এখনো ভীষণ হইয়া আছে। চারুমিহির নেত্রকোণায় অন্নকষ্ট ও কলেরার খবর দিয়াছেন, বাজিতপুরে দুর্ভিক্ষ ও ডাকাতির খবরও আছে। ত্রিপুরাহিতৈষী ত্রিপুরায় আধি ব্যাধি অন্নকষ্টের সংবাদ দিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন; ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভিক্ষ ও কুখাদ্য ভক্ষণের পীড়ার সংবাদ আমরা পাইয়াছি। যশোহর সংবাদ দিয়াছেন—

সহরে মফঃস্বলে সর্ব্বত্র জরজ্বালা চলিতেছে। লোকে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া অধীর হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তারের ফি ও ঔষধের মূল্য যোগাইতেই লোকে কষ্টানুভব করিতেছে, তদুপরি খাদ্যসামগ্রী মাত্রেরই মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় জনসাধারণের দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

যশোহরের কলের জল আজও বিশুদ্ধ হয় নাই; এখনও মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ জলের পোকা মারিয়া উঠিতে পারেন নাই।

শৈলকূপা গ্রামনিবাসী শরচ্চন্দ্র সাহা জনৈক যুবক। যুবক সম্প্রতি জ্বররোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যুবকের বৃদ্ধ পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বদিন বুঝিতে পারিলেন 'শরৎ' আর বাঁচিবে না। তাই পুত্রশোক হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পুত্রের আগেই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে "চারুমিহির" বলেন—

আমরা ইউরোপীয় যুদ্ধে সৈনিকপুরুষ ও অফিসারদিগের মৃত্যু-তালিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠি এবং কালে ইউরোপের দশা কি হইবে তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল হই। বিনা যুদ্ধে আমাদের দেশে কিরূপ লোকক্ষয় হইতেছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে নিজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সরকারী বিবরণ পাঠে জানা যায় ১৯১৪ সনে বাঙ্গালা দেশে জন-সংখ্যা ৪,৫৩,২৯,২৪৭ ছিল। সেই বৎসরে জন্ম-সংখ্যা ১৫,৩৫,২৮১, মৃত্যুসংখ্যা ১৪,৩১,২৮৯ জন। ১৯১৩ সনে জন্মসংখ্যা ১৫,২৯,৯২১, মৃত্যুসংখ্যা ১৩,৩১,৮৬৮ জন। সুতরাং ১৯১৩ সন হইতে ১৯১৪ সনে জন্ম-তালিকায় ৫৩৬০ জন মাত্র বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ হাজারকরা জন্ম ৩৩.৭৫ হইতে ৩৩.৮৬তে উঠিয়াছে কিন্তু মৃত্যুসংখ্যা হাজার করা ২৯.৩৮ হইতে ৩১.৫৭তে উঠিয়াছে। কেবল ১৯১৩ সনে বাঙ্গালায় জ্বরে ৮৬৫,৫৪৬ জন ও কলেরায় ৭৮৮৯৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাঙ্গালী জাতি বিনা যুদ্ধেই দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

ভাবিবার কথা। নিশ্চেষ্ট বসিয়া পিতৃপিতামহের কীর্ত্তিকলাপের স্বপ্ন দেখিলে চলিবে না। বাঁচিতে হইবে, বাঁচিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। পোকামাকড়ের মত মরিয়া যাওয়াতে কোনো গৌরব নাই। মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি, মানুষের মত বাঁচিতে হইবে; এবং সময় হইলে মানুষের মতই মরিতে হইবে।

সু।

হারামণি

[এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন; কবিওয়ালা, তর্জ্জাওয়ালা, জারিওয়ালা, বাউল, দরবেশ, ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের।]

লালন ফকিরের গান।

(১)

বেদে কি তার মরম জানে।
যেরূপ সাঁইর লীলা খেলা আছে এই দেহ-ভুবনে।
পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার,
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার,
মানুষতত্ত্ব ভজনের সার,
বেদ ছাড়া বৈরাগ্যের মনে।

গোলে হরি বলিলে কি হয়,
নিগূঢ় তত্ত্ব নিরালা পায়,
নীরে ক্ষীরে যুগলে রয়
(সাঁইর) বারামখানা সেইখানে।
পড়িলে কি পায় পদার্থ,
আত্মতত্ত্বে যারা ভ্রান্ত,
লালন বলে, সাধু মোহান্ত
সিদ্ধি হয় আপনারে চিনে।

(২)

পাগল দেওয়ানের মন কি ধন দিয়ে পাই।
বলি যে আমার আমার, আছে কি ধন আমার,
সদা মনে মনে ভাবি তাই।
দেহ-মন-ধন দিতে হয়, সেও ধন তারি আমার ত নয়,
আমি মুটে মোট চালাই ;
আবার ভেবে দেখি আমিই বা কি,
তাও তো আমার হিসাব নাই।
ওসে, পাগলাটার যে পাগলা খিজি,
নয় সামান্য ধনে রাজি,
কোন্ ভাবে কোন্ ভাব মিশাই ;
পাগলা ভাবনা জেনে, যদি যায় শ্মশানে,
পাগল হয় কি অঙ্গে মাখ্‌লে ছাই।
ওসে, পাগল ভেবে পাগল হলাম,
সেই পাগল কই সরল হলাম,
আপন পর তো ভুলি নাই ;
অধীন লালন বলে, আপনার আপনি ভোলে,
ঘটে প্রেম, পাগলের এম্‌নি বাই।

(৩)

কোন্ সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে।
দেখ্‌সে আপনি বাজায়, আপনি মজে সেই রবে।
নামটি না-সরিকালা * সবার সরিক সেই একেলা
আপনি তরঙ্গ, আপনি ভেলা,
আপনি খাবি খায় ডুবে।
ত্রিজগতে যে রাই বাঙ্গা, তার দেখি ঘরখানি ভাঙ্গা,
হায় কি মজার আজব রাঙ্গা, দেখায় ধনি কোন ভাবে।
আপন চোরা আপন বাড়ী, আপনি সেলায় আপন বেড়ী,
লালন বলে, এ নাচাড়ী কই না, থাকি চুপে চাপে।

(৪)

দেখনারে ভাবনারে ভাবের কীর্ত্তি।
জলের ভিতরে রে জল্‌ছে বাতি।
ভাবের মানুষ ভাবের খেলা, ভাসে বসে দেখ্‌ নিরালা,
নীরে ক্ষীরেতে ভেলা রয় যুতি।

* না-সরিকালা—অদ্বিতীয়।

জ্যোতিতে রতির উদয়, সামান্যে কি তাই জানা যায়,
তাতে কত রূপ দেখা যায় লাল মোতি।
যখন নিঃশব্দে শব্দেরে খাবে, তখন ভাবের খেলা
ভেঙ্গে যাবে,
লালন কয় দেখ্‌বি কি রে কি গতি।

(৫)

খুঁজে ধন পাই কি মতে, পরের হাতে ঘরের কল কাটি
শতেক তালা মালকুঠী,
শব্দের ঘর নিঃশব্দের কুড়ে, সদাই তারা আছে জুড়ে,
দিয়ে জীবের নজরে ঘোর টাটী।
আপন ঘরে পরের কারবার,
আমি দেখ্‌লাম না রে তার বাড়ী ঘর,
আমি বেহুঁস্ মুটে কার মোট খাটি।
থাকৃতে রতন ঘরে, এ কি বেহাত আজ আমারে,
লালন বলে মিছে ঘর বাটী।

(৬)

আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা, গলে কাঁথা, কটিতে কৌপীন ধরা।
গোরা হাসে কান্দে ভাবের অন্ত নাই,
সদা দীন দরদী বলে ছাড়ে হাই,
জিজ্ঞাসিলে কয়না কথা হয়েছে কি ধন-হারা।
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে,
আপনি মেতে জগত মাতিয়েছে,
মরি হায় কি লীলা কলিকালে বেদবিধি চমৎকারা।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়,
গোরা তার মাঝে এক দিব্য যুগ দেখায়,
অধীন লালন বলে, ভাবুক হলে সে ভাব জানে তারা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

উপেন্দ্রকিশোর রায়

[শ্রাদ্ধ বাসরে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুকুমার রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক পঠিত]

জন্ম—মসুয়া, ময়মনসিংহ; ২৮শে বৈশাখ, ১২৭০।

মৃত্যু—কলিকাতা, ৪ঠা পৌষ, ১৩২২।

তাঁহার পিতামহ সাধক ও সুপণ্ডিত ৺লোকনাথ রায় অল্প বয়সেই সংসারাসক্তির বন্ধনমুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি একবারমাত্র সকলের অনুরোধে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন জমীদার তাঁহাকে উৎকোচ গ্রহণে প্রলুব্ধ করায় তিনি অচিরে সেই কর্ম্ম ত্যাগ করেন। এরূপ একাগ্রভাবে তিনি তন্ত্রোক্ত শক্তি সাধনায় নিবিষ্ট হ'ন যে তাঁহার পিতা, পুত্রের সংসার ত্যাগের আশঙ্কায়, ডামরগ্রন্থ নরকপাল মহাশঙ্খমালা প্রভৃতি সাধনের উপকরণাদি ব্রহ্মপুত্রে বিসর্জ্জন করেন। এই শোকে লোকনাথ তিনদিনের মধ্যে দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর মাত্র।

লোকনাথের পুত্র উদার তেজস্বী স্বাধীন-চেতা কালীনাথ রায় লোকসমাজে মুন্সী শ্যামসুন্দর নামেই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ও পার্শীভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রাত্যহিক দেবার্চ্চনাদিতে তিনি স্বরচিত স্তোত্রাদি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার কাব্যকুশলতার যে-সকল পরিচয় তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, দৈব দুর্ব্বিপাকে তাহার সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থ হইয়াও তিনি পাণ্ডিত্যগুণে ব্রাহ্মণের বিচার-সভায় মধ্যস্থের আসন লাভ করিতেন। কথিত আছে, তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে শূদ্রের অনধিকারচর্চ্চায় ব্রাহ্মণসমাজ সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে নিষেধ জানাইবার জন্য এক প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সেই প্রতিনিধি অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলে আন্দোলনকারীগণ তাহাতেই নিরুৎসাহ হ'ন।

একবার বিধবাবিবাহসম্পর্কে-জাতিচ্যুত কোন দরিদ্রের গৃহে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও সমাজহিতৈষীগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি সমাজের বাধা নিষেধ ও শাসন অনুশাসনাদি উপেক্ষা করিয়া নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। বলা বাহুল্য "মুন্সী শ্যামসুন্দর"কে জাতিচ্যুত করিতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই।

শ্যামসুন্দরের প্রথম পুত্র স্বনামখ্যাত সারদারঞ্জন রায় বর্ত্তমানে মেট্রপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ। দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জন পাঁচবৎসর বয়সে তাঁহার খুল্লতাত ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল ও জমীদার স্বধর্ম্মনিরত আচারনিষ্ঠ হরিকিশোর রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হন। তদবধি তিনি উপেন্দ্রকিশোর নামেই পরিচিত।

বালক উপেন্দ্রকিশোর ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া প্রতিদিন সুসজ্জিত সমারোহে গাড়ীতে চড়িয়া স্কুলে যাইতেন—কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার বয়স্ক সঙ্গীগণ দেখিতেন যে ক্ষুব্ধ মনের অভিমান সর্ব্বদাই তাঁহার মুখশ্রীতে বিষাদ-রেখায় অঙ্কিত হইয়া থাকিত। তারপর, ক্রমে তিনি স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন; নানা বন্ধুসংসর্গে, খেলা ধূলার উৎসাহে, বাঁশী বাজাইয়া ও ছবি আঁকিয়া, তাঁহার মুকুল জীবন নব নব আনন্দে বিকশিত হইতে লাগিল। ক্রমে কোন্ অলক্ষ্য সূত্রাবলম্বনে শিল্প ও সঙ্গীতের আকর্ষণ তাঁহার হৃদয়কে অল্পে অল্পে একেবারে অধিকার করিয়া বসিল।

অতি অল্প বয়সেই কেবল নিজের আগ্রহে বিনাশিক্ষা ও বিনাসাহায্যে, তিনি শিল্পসাধনায় কৃতিত্বলাভ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। একবার সার এস্লি ইডেন স্কুল পরিদর্শনের কালে তাঁহার খাতায় দৈবাৎ আপনার প্রতিকৃতি দেখিয়া তরুণ শিল্পীকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া বলেন, "তুমি ইহারই চর্চ্চায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিও।"

শিক্ষকগণ বলিতেন, উপেন্দ্রকিশোর প্রতিদিন ক্লাসে অত্যুচ্চ স্থান লাভ করেন, তিনি অনন্যসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী, কিন্তু জ্ঞানলিপ্সা সত্ত্বেও স্কুলপাঠ্য বিষয়ে তাঁহার মন নাই। রাত্রে তিনি আদৌ পড়েন না; জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "শরৎকাকা পাশের ঘরে পাঠাভ্যাস করেন, তাহাতেই আমার পড়া হয়। দুইজনে পড়িতে গেলে অনর্থক গণ্ডগোল বাড়ে।" ইহার মধ্যে একদিন তিনি বাসায় আসিয়াই বলিলেন "গুপীদা, এখনই আমার জন্য একটা বেহালা কিনিয়া আন। একটা গৎ শুনিয়াছি, দেরী করিলে ভুলিয়া যাইব।" সেই উৎসাহে সেই দিনই বেহালা বাদনের সূত্রপাত হইল।

সহৃদয় ছাত্রবৎসল শরৎচন্দ্র রায় তখন ময়মনসিংহের

একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার স্নেহদৃষ্টি এই প্রতিভাবান বালকের উপর পড়িল। তিনি বলিলেন "এই উপেন্দ্রকিশোর কালে একজন মানুষের মত মানুষ হইবে। শিল্প ও সঙ্গীতের ঝোঁক তাহার যতই প্রবল হউক, সে পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিবেই। পিতা হরিকিশোর রায় হিন্দুসমাজের নেতা হউন, হিন্দুধর্ম্মজ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সভাপতি হউন, উপেন্দ্রকিশোরকে ব্রাহ্মসমাজে আনিতেই হইবে।"

তখন ব্রাহ্মভীতির যুগ। ব্রাহ্মসমাজ কখন্ কাহার সন্তানকে গ্রাস করিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় বঙ্গের অভিভাবকগণ সন্ত্রস্ত। শরৎচন্দ্র নামজাদা ব্রাহ্ম—হিন্দুসন্তানমাত্রেই তাঁহার সংসর্গবর্জ্জনে বিশেষভাবে উপদিষ্ট —তাঁহার এ সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা কোথায়? তিনি ব্রাহ্ম ছাত্রগণকে এবং বিশেষভাবে উপেন্দ্রকিশোরের সহাধ্যায়ী সুহৃদ্ ও আত্মীয় গগনচন্দ্র হোমকে উৎসাহ দিয়া এই কার্য্যে ব্রতী করিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে বালকের মনে ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে যে জিজ্ঞাসার উদ্রেক হইল তাহা সন্ত্রস্ত অভিভাবকগণের শত বাধা নিষেধ শাসন নির্য্যাতন সত্ত্বেও ক্রমে ঐকান্তিক আগ্রহ ও ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইতে চলিল।

এদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষা আসন্নপ্রায়। শরৎবাবু ব্যাকুল হইয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক রত্নমণি গুপ্তের শরণাপন্ন হইলেন—কই, তাঁহার প্রিয়ছাত্র যে এখনও বেহালা ও তুলিকার মোহ ত্যাগ করিল না; এখনও যে সে পড়ায় মন দিল না! শিক্ষক মহাশয় ছাত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমার উপর আমরা অনেক আশা রাখিয়াছি; দেখিও, তুমি যেন আমাদের নিরাশ করিও না।" অনুতপ্ত বালক সেইদিনই গৃহে আসিয়া আপনার সাধের বেহালাটি ভাঙিয়া ফেলিলেন। যথাসময়ে পরীক্ষান্তে ১২৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি মহা সমারোহে "ব্রাহ্ম দোকানে" এক ভোজ দিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মদলে মিশিয়া, ব্রাহ্মছাত্রাবাসে বাস করিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট আত্মীয়স্বজনকে আরও শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার সতের বৎসর বয়সে তিনি যে ডায়ারি রাখিতেন তাহাতে তাঁহার সেই সময়কার জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় অনেক সময়ে সঙ্গীতচর্চ্চায় ও চিত্রানুশীলনে তাঁহার অবসর সময়, এবং অনবসর কালও, কাটিয়া যাইত। নানা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র লইয়া নানা শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য লইতে আসিত। যন্ত্রের জীর্ণসংস্কার আবশ্যক হইলে লোকে তাঁহার শরণাপন্ন হইত।

সেই সময় হইতেই শিশুপাঠ্য গ্রন্থাদি রচনার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়াছিল; শিশুদিগের জন্য একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বাভাষ তাঁহার ডায়ারির মধ্যে স্পষ্টই দেখা যায়। আর দেখা যায়, তাঁহার অদম্য জ্ঞানস্পৃহা। কলাবিদ্যার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিজ্ঞানমুখী প্রতিভা তাঁহাকে নানা সুযোগে নানা বিজ্ঞানের চর্চ্চায় নিযুক্ত রাখিত। এই জ্ঞানানুরাগ উত্তরকালে তাঁহাকে বিশেষভাবে নানাক্ষেত্রে সাফল্য লাভে সক্ষম করিয়াছিল।

বিশ বৎসর বয়সে, তাঁহার পিতা হরিকিশোর রায়ের লোকান্তর প্রাপ্তিতে তাঁহার জীবনে এক বিষম পরীক্ষাসঙ্কট উপস্থিত হইল। নিষ্ঠাবান ও প্রতিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজনেতার শ্রাদ্ধে যতপ্রকার সমারোহ দান দক্ষিণাদির ব্যবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাহার আয়োজন হইয়াছে, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমাগম আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় স্বাধীনচেতা অকুতোভয় যুবক উপেন্দ্রকিশোর বলিয়া বসিলেন, "আমি প্রচলিত দেশাচারমতে পিতৃশ্রাদ্ধ করিব না।" ক্ষুব্ধ রুষ্ট আত্মীয় স্বজন ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন, সমাজ তাঁহার নিন্দাবাদে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু সেই একনিষ্ঠ আত্মস্থ মহাপুরুষ সকল নির্য্যাতন ও ভ্রূকুটিভঙ্গিকে উপেক্ষা করিয়া ঘোর অশান্তির মধ্যে অবিচলিত প্রশান্তভাবে আপন বিশ্বাসনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিয়া স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিলেন, এবং সামাজিক উৎপীড়নের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ মাত্রায় ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেন।

ইহার অনতিকাল পরেই দেশবিশ্রুত দ্বারকানাথ

গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহসম্বন্ধের সংবাদ দেশে গিয়া পৌঁছিল। এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অনাচার হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু প্রতিবাদের তপ্ত নিঃশ্বাস কোন দিনই তাঁহার চিত্তের অটল স্থৈর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কোনরূপ বাদবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত না হইয়াও তাঁহার চিরপ্রসন্ন স্বভাবের অনিন্দ্যসুন্দর মাধুর্য্যে তিনি এমন অক্লেশে বিরুদ্ধাচারীর হৃদয়ে আসন লাভ করিলেন যে, প্রতিবাদের কোলাহল আপনা হইতেই সসম্ভ্রমে থামিয়া গেল। এই সময় হইতেই, অথবা ইহার পূর্ব্বেই, তিনি শিশু-সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হ'ন। যে সময়ে মানুষ অসম্ভব রকমের উচ্চকথার আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া শিশুদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত একরূপ ভুলিতে বসিয়াছিল, সেই সময়ে প্রমদাচরণ সেন প্রভৃতির সহযোগে তিনি শিশুসাহিত্যে যুগান্তর আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিশুচিত্ত বিনোদনের এই ঐকান্তিক আগ্রহের উৎসকে যখন অন্বেষণ করি, তখন দেখি যে শিশুজীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তাহার সহিত আনন্দের আদানপ্রদানে তাঁহার হৃদয়ের প্রেম যে কি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিত, এমন ভাষা পাইনা যাহাতে তাহার সম্যক্ বর্ণনা করিতে পারি। শিশুর শিশুত্বের মধ্যে তিনি অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার আনন্দযজ্ঞে আপনাকে এমন যথার্থভাবে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রথম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ "ছেলেদের রামায়ণ" মুদ্রণকালে তাঁহার স্বহস্তাঙ্কিত চিত্রগুলি উড্‌এন্‌গ্রেভারের হস্তে যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তাহারই ফলে এদেশে বিজ্ঞানসম্মত চিত্রশিল্পের প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি উৎসুক হইয়া পড়েন। লঘুভাবে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল,—যখন যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহারই সাধনায় একেবারে নিমগ্ন থাকিতেন। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। এই বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি শক্তি অর্থ স্বাস্থ্য ও সময় অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন এবং গুরুতর মানসিক শ্রমের ফলে অকালে আয়ুক্ষয়কর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। "হাফটোন" শিল্প তখন সবেমাত্র প্রতিপত্তি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—তখনও তাহার মূলসূত্রাদি সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই; মতসঙ্কুল অস্থিরতার মধ্যে তাহার কার্য্যপ্রণালীর সঙ্কেতাদি তখনও সুসঙ্গতরূপে নির্ণীত হয় নাই। তিনি স্বাধীনভাবে এই-সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহার যে প্রকার সমাধান করেন, তাহাই বর্ত্তমানে সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছে। হাফটোনের যে-সকল প্রণালী পাশ্চাত্যদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহাতে বহুল পরিমাণে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থাই অনুসৃত হইয়াছে। এক্ষেত্রে তিনি কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার কৃতিত্ব নানাদেশে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

আজ বলিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহারা উপেন্দ্রকিশোর রায় বলিতে কেবল কৃতী শিল্পীকেই দেখিলেন, সাহিত্য-কলাকুশল সঙ্গীত-রসজ্ঞকে দেখিলেন, তাঁহারা জানেন না কোন্ মনস্বী আত্মা আপনাকে এই-সকল পরিচয়ের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা জানেন না, যে, সেই কীর্ত্তিমান পুরুষ যতই কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকুন না কেন, কিছুতেই তাঁহার নিরহঙ্কার বিনয়নম্রতাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হয় নাই।

সংসারে স্বার্থব্যবসায়ী প্রবঞ্চক তিনি কম দেখেন নাই, নিজে ব্যবসায় সম্পর্কে ও সংসারের নানাক্ষেত্রে শতবার প্রতারিত হইয়াছেন—কিন্তু তবু মানুষের উপর তাঁহার কি গভীর বিশ্বাস! মানুষের স্বভাবসিদ্ধ মনুষ্যত্বের প্রতি কি আশ্চর্য্য শ্রদ্ধা! অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সাংসারিক ক্ষতি অকুণ্ঠিত চিত্তে বহন করিয়াছেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও অকারণ সন্দেহকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মনের প্রসন্নতা নষ্ট করিতে সম্মত হয়েন নাই।

তাঁহার অন্তরের সংস্পর্শে যে আসে নাই, সে জানে না তাঁহার জীবনের প্রত্যেক সাধনার মধ্যে তিনি কি আনন্দরস সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। যখন যাহাতে হাত দিতেন তদর্পিতপ্রাণ হইয়া তাহাতেই ডুবিয়া যাইতেন। শিশুদের জন্য লিখিতে বসিয়াছেন, চিত্ররচনার জন্য হস্তে তুলিকা লইয়াছেন—মনে হইত সংসারে তাঁহার অন্য কোন চিন্তা নাই, ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই; উপস্থিত কর্ত্তব্যের আনন্দে তিনি আর-সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। রোগযন্ত্রণা ও সাংসারিক সকল দুর্ভাবনার মধ্যে যেমন বেহালাখানি
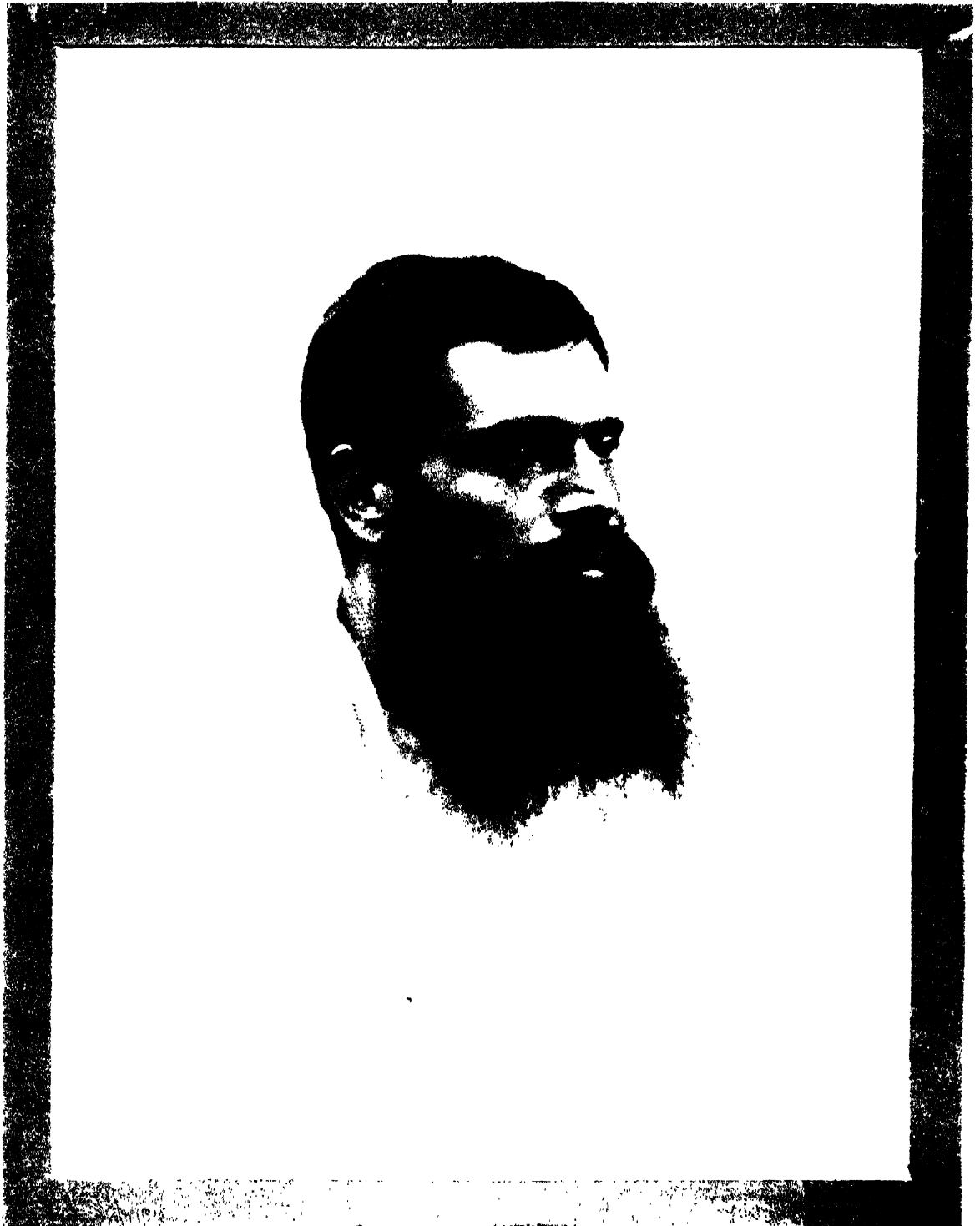
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

২৮শে বৈশাখ, ১২৭০ ৪ঠা পৌষ, ১৩২২

হাতে লইয়াছেন—অমনি তন্ময়! আর কোথায় দুঃখ, কোথায় বিপদ—মনে হয় এমন শান্তি এমন সান্ত্বনা বুঝি আর কিছুতে মিলে না। সত্তাকে যিনি পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখিতে পান, কর্ত্তব্য তাঁহার কাছে শুষ্ক কর্ত্তব্যমাত্র থাকিতে পারে না— মনে হয় জীবনের সামান্যতম কর্ত্তব্যের মধ্যেও তিনি আনন্দরস লাভে বঞ্চিত হয়েন নাই।

দুরন্ত রোগনির্য্যাতনের মধ্যে আপনার চিত্তের স্থৈর্য্যকে রক্ষা করিয়া চিকিৎসকের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়া আসিতেছিলেন। মৃত্যুর প্রায় ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে রোগ যখন সহসা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেহকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তিনি চিকিৎসকদিগের শত আশ্বাস সত্ত্বেও তাহার মধ্যে কালের আহ্বান শুনিয়া অটল বিশ্বাসে, প্রশান্ত চিত্তে, পরম আনন্দে লোকান্তরপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কি পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তিনি পরকালের কথা বলিয়া গেলেন; মৃত্যুর বিভীষিকা কি অপরূপ আনন্দময় মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট দেখা দিয়াছিল! "আমার জন্য তোমরা শোক করিও না—আমি আনন্দে আছি, আনন্দেই থাকিব" —একি আশ্চর্য্য সান্ত্বনার কথা। যেমন আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে শিশু এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি আনন্দের আহ্বানে অমর আত্মা লোকান্তর প্রাপ্ত হয়, এই সাক্ষ্য তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

গিরিডি থাকিতে দুই দিন রোগাচ্ছন্ন দেহে তন্দ্রাগতবৎ পড়িয়া ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সেই সময়ের কথা বিশেষ ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। "এই সময়ে সকল যন্ত্রণাবিমুক্ত হইয়া আমি কি আনন্দে বাস করিয়াছি, কি অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছি—তোমরা তাহা জান না। তোমরা আমাকে ঔষধ পথ্যাদি যাহা দিয়াছ তাহার কি অপূর্ব্ব স্বাদ—আমি অমৃত জ্ঞানে তাহা পান করিয়াছি। আমার সকল ভয় ভাবনা দূর হইয়াছে— আমি সেই জ্যোতির রেখা দেখিয়াছি। আমি দেখিলাম, আমি এ দেহ নই, কিন্তু আমার এই দেহের জন্য তোমাদের কত যত্ন, তোমরা ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা কতরূপে তাহার সেবা করিতেছ। দেহবিযুক্ত হইয়া মৃত্যুর অতীত লোকে মানুষ কি ভাবে অবস্থান করে, দয়াময়ের কৃপায় আমি তাহা স্পষ্ট দেখিলাম। দয়াল আমায় বুঝাইয়া দিলেন, তোমাকে এইরূপ বিদেহী অবস্থায় থাকিতে হইবে।" দয়া কি জিনিষ! দয়া যে কল্পনা নয়, দয়াময় নাম যে শুধু আপাত তৃপ্তিপ্রদ নামমাত্র নয়, জীবন্ত জাগ্রত করুণা যে জীবনবেদের ছত্রে ছত্রে আপনার পরিচয় দিয়া যাইতেছে, অন্তিম সময়ে তাহার সাক্ষ্য এমন করিয়া কয়জনে দেয়?

গিরিডিতে যে গৃহে বাস করিতেন, তাহার সুব্যবস্থার কথা বারবার বলিতেন, "আমি রোগযন্ত্রণার সময়ে যাহাতে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকি, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যেন এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।" গিরিডির দারুণ শীতের উপশমজন্য গরম কাপড় আনান হইল। কিন্তু দরজি কই? সেই উদ্বেগ ও ব্যস্ততার মধ্যে জামা প্রস্তুত করে কে? গুরুতর কর্ম্মের তাড়নায় কাহারও অবসর আর ঘটিয়া উঠে না। এমন সময় অযাচিতভাবে কোথা হইতে দরজি আসিয়া উপস্থিত! তখন ভক্তের আনন্দ দেখে কে! "দেখ ভগবানের দয়া।" ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের চিরজাগ্রত ইচ্ছা সৃষ্টি তোলপাড় করিয়া অঘটন ঘটাইতে পারে, একথা আজ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

কলিকাতায় গিয়া চিকিৎসা করাইলে তিনি সুস্থতা লাভ করিবেন, এরূপ কথা তিনি বলিতে দিতেন না। বলিতেন—"ওরূপ ভাবিতে নাই। ভগবান যেরূপ বিধান করেন তাহার জন্যই যেন প্রস্তুত থাকিতে পার।"

মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে ভক্তিভাজন দাদামহাশয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে তিনি প্রার্থনা করিতে বলেন। দাদামহাশয় প্রার্থনার সময় বলেন "তুমি ইঁহার জীবনের অপরাধ সমুদয় মার্জ্জনা কর।" এ প্রার্থনায় তৃপ্ত হইলেন না। আবার তিনি নিজেই আকুলভাবে প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন "আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, এ প্রার্থনা আমি করি না। যদি দণ্ডদান আবশ্যক হয়, দণ্ডই দাও। কিন্তু আমায় পরিত্যাগ করিও না।"

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন, রবিবার উষার প্রাক্কালে পাখীর কাকলী শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "পাখীরা এমন করিয়া ডাকে কেন?" বলা হইল, এখন সকাল হইয়া আসিতেছে। ইহাতে অত্যন্ত মৃদুভাবে যেন আপনমনে তিনি কি বলিলেন, ভাল বোঝা গেল না; কেবল শোনা

গেল, "পাখীরা কি জানে? তারা বুঝতে পারে?" দুটি ছোট পাখী জানালার কাছে আসিয়া কিচিরমিচির করিয়া উড়িয়া গেল। তিনি বিস্মিত ভাবে তাকাইয়া বলিলেন "ও কী পাখী! ও কী বলিয়া গেল, শুনিলে না? পাখী বলিল 'পথ পা' 'পথ পা'।" রবিবার দিবাবসানের সঙ্গে যখন সকলের আশারও অবসান হইয়া আসিল, আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আত্মীয় স্বজন সকলে সমবেত হইলেন। চিকিৎসকেরা আশঙ্কা করিতেছিলেন, হয়ত অন্তিমে তাঁহাকে ক্ষয়রোগের যন্ত্রণা ভুগিতে হইবে। কিন্তু তিনি অজাতশত্রু, মৃত্যুও তাঁহার পরম মিত্ররূপে অবতীর্ণ হইল। মৃত্যুর প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে দয়ালের শেষ দয়ার সাক্ষ্য রাখিয়া তিনি পরম শান্তিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত চিরশান্তিময় সুখের দেশে প্রস্থান করিলেন।

কি শান্তি! কি শান্তি! ভয়াবহ মৃত্যুর কি অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি! তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমার রোগক্লিষ্ট দেহকে দেখিতেছ; আমার অন্তরে কি আরাম, কি শান্তি, তাহা যদি দেখিতে, তোমাদের আর দুঃখ থাকিত না। আমার জন্য তোমরা শোক করিও না—আমি আনন্দে আছি আনন্দেই থাকিব। মৃত্যুর সময়ে ক্রন্দন করিয়া আমাকে অস্থির করিও না। আমার কাছে বসিয়া সকলে ভগবানের নাম গান করিও।" প্রয়াণকালে উষালোকে সঙ্গীত হইতেছিল—যখন গান আরম্ভ হইল "জানিহে যবে প্রভাত হবে তোমার কৃপা-তরণী লইবে মোরে ভবসাগর-কিনারে" তখনও তাঁহার মৃদুকম্পিত ওষ্ঠ যেন এই সঙ্গীতের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়াছিল। তারপর আপনা হইতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে নিশ্বাস থামিয়া গেল—অস্তমিত জীবনসূর্য্য কোন্ নূতন লোকে নূতন প্রভাতের নব আনন্দে উদিত হইল জানি না।

মৃত্যুর অতীত লোকের পাথেয়রূপে জীবনের সঞ্চিত পুণ্য আজ তাঁহার সম্বল রহিয়াছে। কায়মনোবাক্যে যিনি কোন দিন সত্যকে লঙ্ঘন করেন নাই, শাশ্বত চিরজাগ্রত সত্য আজ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। যে দয়ার সাক্ষ্য তিনি আজীবন বহন করিয়া গেলেন, সে দয়া আজও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। যে আনন্দের আস্বাদনে বিভোর হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন "আমি আনন্দে আছি আনন্দেই থাকিব" সেই আনন্দ তাঁহার অনন্ত জীবনপথের শাশ্বত সঙ্গী হইয়া চলিয়াছে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ান্ত্যভিসংবিশন্তি।

[উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় হাফ্‌টোন খোদাই সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন এবং যেসব প্রক্রিয়া ও যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন তাহা ইউরোপ আমেরিকায় নূতন ও মূল্যবান্ বলিয়া আদৃত হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দের অভাবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ বাংলায় লেখা সহজ নয়; সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ইংরেজীতে জানুয়ারী মাসের মডার্ণ-রিভিউ কাগজে দেওয়া হইয়াছে।

তিনি চিত্রাঙ্কণে সুদক্ষ ছিলেন, বিশেষতঃ প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে। শিশুদের মাসিক-পত্র ও বহির জন্য ছবি আঁকিতে, তাহাদের জন্য ব্যঙ্গচিত্র বা কৌতুকজনক ছবি আঁকিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। বৈজ্ঞানিক ছবিও তিনি বেশ আঁকিতে পারিতেন। তাঁহার "সেকালের কথা"য়, মানুষের সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং অতি প্রাচীন মানুষদের সমকালে, পৃথিবীতে যে-সব জীবজন্তু ছিল, তাহাদের কতকগুলির ছবি ও বৃত্তান্ত আছে। এইসব ছবি তাঁহার নিজের আঁকা। এই ছবিগুলি দেখিয়া গবর্ণমেন্টের ভূতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর হল্যাণ্ড সাহেব বলিয়াছিলেন, ছবিগুলি এখানে ছোট-ছেলেদের চিত্তরঞ্জক বহিতে দেওয়া হইতেছে, কিন্তু এরূপ চিত্র বিলাতী প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে স্থান পাইতে পারে। "সন্দেশে"র জন্য তিনি অণুবীক্ষণের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র নানা প্রকার ফুলের যে রঙীন ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহা বড় সুন্দর।

উপেন্দ্র বাবু পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, প্রত্ন-জীববিজ্ঞান, প্রভৃতি নানা বিজ্ঞান জানিতেন। অনেক বিষয়ে সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। এগুলি পল্লবগ্রাহীর মত এক আধটা বিলাতী সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ দেখিয়া লেখা নয়, বিশেষজ্ঞের মত লেখা। তাঁহার "আকাশের কথা"র অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সম্ভবতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুকুমার সম্পূর্ণ করিয়া বাহির করিবেন। ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি প্রবাসীতে কয়েকটি প্রবন্ধ

লিখিয়াছিলেন। আরও একটি কতকদূর লেখা আছে।, তাহা মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা আছে।

কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে তিনি সুদক্ষ ছিলেন এবং দক্ষতার সহিত উহা শিখাইতে পারিতেন। সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তিনি যে স্বরলিপি ব্যবহার করিতেন, তাহা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝিতে পারিত। হারমোনিয়ম শিখাইবার জন্য তিনি একখানি বহি লিখিয়াছিলেন। উহার বেশ কাট্‌তি ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার এই ধারণা হইয়াছিল যে হারমোনিয়মের দ্বারা ভারতীয় সঙ্গীতের বড় অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। এই জন্য তিনি ঐ বহির প্রকাশকের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও আর নূতন সংস্করণ ছাপিতে দেন নাই।

তিনি শিশুদের জন্য রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে যে-সব বহি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সমকক্ষ বহি বাংলা শিশু-সাহিত্যে নাই। তিনি রামায়ণ মহাভারত পৌরাণিক গল্প, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, উপকথা, বা আর যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা ছেলেদের জন্যই হউক বা বুড়োদের জন্যই হউক, তাঁহার বিমল রসিকতার মৃদু ও স্নিগ্ধ শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত। লিখিতে তিনি যে আনন্দ পাইতেন, অপরে পড়িয়া সেই আনন্দ পাইত বলিয়া তাঁহার রচনা সাহিত্য নামের যোগ্য হইয়াছে।

তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সমুদয় পুরাণে দেবদেবী সংপৃক্ত এক একটি আখ্যায়িকা কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখাইয়া একটি বহি লিখিবেন; কিন্তু পীড়িত হইয়া পড়ায় তাহা করিতে পারেন নাই। বাংলা ছাপার অক্ষর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিলে হরফ ঢালাইয়ের কাজ, এবং ছাপাখানার কম্পোজ করার কাজ, অনেক সহজ ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য হয়; এবং ইংরেজী যেমন টাইপ-রাইটার কল আছে, বাংলারও তেমনি হইতে পারে। কিরূপ অক্ষর করিলে ইহা হইতে পারে, তাহা আঁকিয়া, এবং প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহাও করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার মত, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার অনেকটা জানেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়ের নানাবিষয়িণী প্রতিভার কথা লিখিয়া মানুষটির পরিচয় দেওয়া যায় না। তাঁহার সদা-প্রসন্ন মূর্ত্তি, তাঁহার বিনয়নম্র সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার, তাঁহার সরস বাক্যালাপ তাঁহার অন্তরের কতকটা সাক্ষ্য দিত। তিনি যেমন নম্র, তেমনি স্বাধীনচিত্ত ছিলেন। এই স্বাধীন-চিত্ততায় রূঢ়তা রুক্ষতা ছিল না। তাঁহার চরিত্রে গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার সঙ্গ ছেলে বুড়ো সকলেরই ভাল লাগিত। তিনি প্রকৃত ভক্ত ছিলেন, যদিও ভক্তির কথা তাঁহার মুখে বড় শুনা যাইত না। সম্পাদক।]

পুস্তক-পরিচয়

বিবুধবিনোদম্—চট্টগ্রাম সংস্কৃত-কলেজ-বিদ্যালয়াধ্যক্ষ-চট্টল-ধর্ম্মমণ্ডলীসম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য-কৃতম্।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন-উপলক্ষে তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়া এই দৃশ্য কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। ইহার ভাব-ভাষা-কল্পনা -সমস্তই অদ্ভুত, কিম্ভূত-কিমাকার! মাথা-মুণ্ডু কিছুই খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই! চ্যুতসংস্কৃতিও প্রচুর, ছন্দোভঙ্গেরও অসদ্ভাব নাই। ইহার মধ্যে যদি কিছু পাওয়া যায় তবে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জঘন্য তোষামোদ। এই চটী বইখানি না লিখিলেই সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের গৌরব রক্ষিত হইত।

আজকাল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়েরা আমাদের পবিত্র সংস্কৃত পাঠ-শালাসমূহকে ঐ নামে অথবা চতুষ্পাঠী বা টোল নামে অভিহিত করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন, আর গুরুতর লজ্জা বোধ করিতেছেন নিজেকে প ণ্ডি ত বা অ ধ্যা প ক বলিতে; এখন কলেজ, প্রফেসার, বা প্রিন্সিপ্যাল না হইলে ইঁহাদেরও মন উঠে না। হায় রে দেশের অবস্থা! হা ভারতের সংস্কৃত শিক্ষা, তুমিও পরাধীন হইয়া পড়িলে! অন্ধেরা তোমার দুর্গতি এখনো দেখিতে পাইতেছে না!

আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্টম্—শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ-কোচ-বিহারাধিপতি-মন্ত্রি মহোদয় স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ শর্ম্মণা সঙ্কলিতম্, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্যেণ এম্, এ, বিদ্যারত্নোপাধিকেন সম্পাদিতম্ জ্ঞানোদয়যন্ত্রমুদ্রিত-প্রথমসংস্করণাৎ পরং রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষদা পুনর্মুদ্রিতম্, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়েন সহকারি-সম্পাদকেন প্রকাশিতম্। শকাব্দা ১৮৩৪, অর্দ্ধমুদ্রামাত্রং মূল্যম্।

গ্রন্থকারের পিতা-পিতামহ কোচবিহাররাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন, তিনিও নিজে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রিপদ লাভ করিয়া রাজ্যের বিবিধ উন্নতি সাধন করেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" সুপ্রসিদ্ধ। রঘুনাথ নিজের গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ বলিয়া যাহা যাহা উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন, স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ শর্ম্মা মহাশয় তাহাই পরিশিষ্টরূপে সঙ্কলন করিবার ইচ্ছা করেন। রঘুনন্দনের সমস্ত "তত্ত্বের" পরিশিষ্ট লেখা বহুকালসাধ্য, হয় ত জীবনে হইয়াই উঠিবে না, এই ভাবিয়া তিনি "আহ্নিকতত্ত্বেরই" এই পরিশিষ্টখানি রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহার এক সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যয় দিয়াছেন গ্রন্থকারের পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন রায় চৌধুরী বক্সী মহাশয়। গ্রন্থের সংস্করণ সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন মহাশয় কোনো যত্ন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। নানারূপ ত্রুটি ও অশুদ্ধি

আগা-গোড়া থাকিয়া গিয়াছে। তাঁহার নিকটে এরূপ নিকৃষ্ট সংস্করণ আমরা কখনো আশা করি নাই। ইহার দ্বারা তাঁহার নিজের ও রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের উভয়েরই সুনামের ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

জ্যোতিঃহারা—উপন্যাস, ৩৯৮ পৃঃ। ছাপা, কাগজ, মলাট ভালো। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত, ও কলিকাতা, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

ইতিপূর্ব্বে আমরা লেখিকার "পোষ্যপুত্র" উপন্যাসখানি পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে বর্ত্তমান উপন্যাসখানি পড়িয়া হতাশ হইয়াছি।

আলোচ্য পুস্তকের আখ্যানভাগে কোনো বিশেষত্ব নাই; পুরুষ বা নারী একটি চরিত্রও ভালোরকম ফুটিয়া ওঠে নাই—সবই কেমন ভাসা-ভাসা ধরণের। মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ প্রকৃতি-বর্ণন পাঠকের চিত্তে অবসাদ আনে। "পোষ্যপুত্র" উপন্যাসেও আমরা এই দোষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তারপর যেখানে-সেখানে দার্শনিক তত্ত্বের এত ছড়াছড়ি যে মনে হয় লেখিকা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের বিশেষত্ব বিচার করিবার জন্য এক বিরাট thesis লিখিতে বসিয়াছেন। কাণ্ট, ডারুইন, হার্বার্ট স্পেন্সার, হাক্‌স্‌লে, ডয়সন, সাংখ্যদর্শন, বেদান্ত, উপনিষদ—কেহ বা কিছুই এই পুস্তকে বাদ পড়ে নাই। এই-সব দার্শনিক কচকচির মধ্যে পড়িয়া প্রাণ আইঢাই করিয়া উঠিয়াছে—বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!

লেখিকা এই পুস্তকে একটি 'দাদামহাশয়'কে খাড়া করিয়াছেন—এই দাদামহাশয়-চরিত্র রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দ্দা-চরিত্রের অক্ষম অনুকরণ। "দাদামহাশয়" আমাদের দেশের "পরমপাক" বিজ্ঞদের মত মৃদু হাসিয়া অনেক সনাতনী বিধিব্যবস্থার এক-একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনাইয়া দিয়াছেন। তার মধ্যে দু-একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি। ফুলচন্দন লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাঁধি মন্ত্র আওড়াইয়া পূজা করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে "দাদামহাশয়" বলেন—"এবাগুণ তোমরা মান তো? একটি অণুপরিমাণ হোমিওপ্যাথি ওষুধ যদি একটা প্রকাণ্ড তমকে পরাজয় করিতে সক্ষম হয়, ত হ'লে সত্ত্বপ্রধান শুভ্র বস্ত্র, তুলসী বা রুদ্রাক্ষমালা গন্ধপুষ্প আর ধূপ অগুরুর গন্ধে রজটাকে তাড়িয়ে দিতে নাই বা পারবে কেন? ইষ্টমন্ত্রও ওই নিয়ম-পালনের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছু নয়. একটি জিনিষ—জিনিষটি ক্ষুদ্র, কিন্তু তার ভিতরের অর্থে সৃষ্টি স্থিতি লয় এবং তারও পরের সংবাদ ব্যক্ত হচ্ছে। সেই ভাব নিয়ে ক্রমে ক্রমে অর্থ এবং ভাবকে মনের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিলে, আর কি নেই-ই তখন তার অন্তরময় হয়ে দাঁড়ায়। নিত্য নূতন কথার মালা গেঁথে দিলে, তা শুধু যে কথাই থেকে যাবে, প্রাণপ্রতিষ্ঠ হবে না তো তাতে।"

শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের ও শূদ্রের অধিকার নাই কেন? "দাদামহাশয়" বলেন—"ক'জন স্ত্রীলোক ঘর সংসার স্বামীপুত্রের সুখ ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রস্বালোচনা করতে যাচ্ছে? নারী বলিতে এখানে যার মধ্যে প্রকৃতির অংশ বেশী কাজ করিতেছে, এইটেই বুঝিতে হইবে কি না। প্রকৃতিকে যে যতটা পরাভব করিতে সক্ষম হইয়াছে, তার মধ্যে পুরুষের ততখানি প্রকাশ হয়েচে। সে সেই পরিমাণে পুরুষ। এই রকম নারী-দেহধারিণীদের তো কোনো শাস্ত্রে অনধিকার নাই।...শূদ্র সম্বন্ধেও তাই। এসব সূক্ষ্ম জিনিষ না বুঝে তারা উল্টা পথে যাবে বলেই তাদের জন্য সহজ জিনিষের ব্যবস্থা কর হয়েছিল।" এই-সব শুনিয়া কার না বলিতে ইচ্ছা হয়—সাবাস দাদামহাশয়! কথোপকথনের মধ্যে মুখভাষা ও লেখ্য রীতিতে লিখিত শব্দের সংমিশ্রণ শ্রুতিকটু ও দোষাবহ হইয়াছে।

গ্রন্থের নায়িকা অণিমা সত্য-উপাসিকা। আধুনিক প্রথায় শিক্ষিতা। তিনি কোনো (dogma) নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান-পদ্ধতি বা মতের ধার ধারেন না। তাঁর কাছে হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টান সব সমান; কোনো প্রভেদ নাই। কিন্তু তাঁর মুখেই আবার লেখিকা কেমন করিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি আরোপ করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। অণিমার ভাই বিলাতে শ্বেতাঙ্গ রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন। অণিমা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন—"দাদা আসিতেছেন, তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করিতে চাহি না, এ বাড়ীতেও তার স্থান নাই। সে আজ আর আমার ভাই নয়, সে এই বিখ্যাত বংশের আজ শত্রু। বিধর্ম্মী, বিদেশী তাহাতে হীনবংশীয়া কন্যা বিবাহ দ্বারা সে শুধু সত্যের নিকটই নয়, সমাজের নিকট পূর্ব্বপুরুষের নিকটও ঘোর অপরাধী। আজ বুঝিয়াছি এই জন্যই সমাজবন্ধনের এত প্রয়োজন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এইজন্যই এদেশের মনীষিগণ এত বিরোধী।" লেখিকা অণিমাকে দিয়া যে কথা বলাইয়াছেন, এদেশের তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অনেকেই ঐরূপ কথাই বলিয়া থাকেন। ক্ষুদ্র গৃহকোণে বসিয়া তাঁহারা সংবাদ রাখেন না যে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের মধ্যে আমরা 'প্যারিআ' বই আর কিছু নয়। বিদেশী, বিধর্ম্মীকে ঘৃণা করিয়া ছোট বলিবার অধিকার আমাদের নাই। অথচ আমাদের দেশেরই কথা স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি!

জ্যোৎস্না যে যামিনীপ্রকাশকে ভালোবাসিত সে কথা জ্যোৎস্নার কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে ফুটাইয়া তোলাই উচিত ছিল। জ্যোৎস্নার দিদি অমলা সে-কথা আবার যামিনীপ্রকাশকে বলিতে যান কেন? আভাসে ইঙ্গিতে অনেক কথা বলা, সম্যক খুলিয়া না বলিয়াও কোনো বিষয় সুস্পষ্ট করিয়া তোলাই শ্রেষ্ঠ আর্টের লক্ষণ। আলোচ্য ক্ষেত্রে আর্ট বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

অবান্তর কথা, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনা ও দীর্ঘ দার্শনিক তত্ত্বের লেকচার বাদ দিয়া সংযতভাবে বইখানি লিখিতে পারিলে সুখপাঠ্য হইতে পারিত।

পুস্তকের ১৬৭-১৬৮ পৃষ্ঠায় লেখিকা অমার্জ্জিতরুচি অশিক্ষিত ধনী বাঙালী অন্তঃপুরিকাদের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা খুব জীবন্ত হইয়াছে, উহাই আমাদিগকে আনন্দ দিয়াছে।

সু।

অঞ্জলি—শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, অধ্যাপক, সিটিকলেজ। মূল্য বার আনা। ১৮৭+১২৮ পৃষ্ঠা।

ইহাতে ৭৩টি আরাধনা, এবং ৬৩টি প্রার্থনা আছে।

পুস্তকখানি সুলিখিত। আরাধনা ও প্রার্থনাগুলিতে গভীর ধর্ম্মভাব এবং আন্তরিক নিষ্কাম ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কবিতার আকারে গ্রথিত স্তোত্র সংস্কৃতে অনেক আছে; প্রার্থনাও আছে। প্রার্থনাগুলির কোন কোনটি গদ্যে লিখিত। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে আরাধনা ও প্রার্থনা আছে; সতীশবাবুর বহিটি গদ্যে লিখিত।

কবিরা মানুষের অন্তরের এমন অনেক কথা বলেন, যাহা আমাদের হৃদয় মনেও আছে, কিন্তু যাহার অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি নাই, কিম্বা যাহা আমরা বেশ পরিস্ফুট ভাবে ধরিতে পারি নাই। যদি বা বুঝিয়াছি, ভাষায় ভাল করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি নাই। কবিদের সাহায্যে জগতের সৌন্দর্য্য ও অন্তর্নিহিত সত্য আমরা বুঝিতে পারি, নিজেকে বুঝিতে পারি; তাঁহাদের সাহায্যে নব নব ভাব ও চিন্তার উন্মেষ হয়, অস্পষ্ট ভাব সুস্পষ্ট ও পরিস্ফুট আকারে সুব্যক্ত হয়। ইহা কবিতার অন্যতম সার্থকতা। আরাধনা উচ্চ অঙ্গের কবিতার মত হইতে পারে।

অভাব বোধ হইলে অভাব পূর্ণ হয়, বিশ্বের এই নিয়ম। হৃদয়টা শূন্য বোধ হয়, জগৎটা নীরস আঁধার বোধ হয়, জীবন অপূর্ণ বোধ হয়,

অনেকেরই; কিন্তু সকলে পরিষ্কার করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না যে কেন এমন হয়, বা অভাবটি কি, বা কোন্‌খানে। সাধনার পথে অগ্রসর লোকদেরও এইরূপ অবস্থা কখন কখন ঘটিতে পারে। এইজন্য কোন সরল প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা পড়িলে অপরের উপকার হইতে পারে।

র।

অশোক-অনুশাসন—শ্রীচারুচন্দ্র বসু ও শ্রীললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ এম-এ কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ১।০ টাকা; কাপড়ে বাঁধানো ২৲ টাকা। প্রকাশক মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই পুস্তকে প্রিয়দর্শী অশোকের গিরিগাত্রে বা স্তম্ভগাত্রে খোদিত বহু অনুশাসনের চিত্র, উহার মূল পাঠ বাংলা অক্ষরে, বাংলা অনুবাদ, বিবিধ টীকা, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ ও সংস্কৃত তাৎপর্য্য, অশোক-অনুশাসনে ব্যবহৃত প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির রূপ ও তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সমস্ত অশোক অনুশাসনের অনুবাদ ইংরেজি পণ্ডিত-পত্রিকায় ছড়াইয়া ছিল; এত দিন কোনো ভারতীয় আধুনিক ভাষায় অনুবাদিত হয় নাই। সেই-সমস্ত অনুশাসন একত্র করিয়া তাহাদের এমন সুসম্পূর্ণ সম্পাদন ভারতীয় আধুনিক ভাষায় এই প্রথম। পুস্তকের উপক্রমণিকায় অনুশাসন খোদিত করার ইতিহাস এবং পরিশিষ্টে সমস্ত গিরিলিপি ও স্তম্ভলিপি অনুশাসনের মোদ্দা কথা প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা ইতিহাস, বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতির আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক একান্ত আবশ্যক। এই উপাদেয় সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ সুসম্পাদিত পুস্তক পাঠ করিয়া আনাড়ি বা অব্যবসায়ী সাধারণ পাঠকও বহু নূতন বিষয়ে শিক্ষা ও আনন্দ পাইবেন। ইহা হইতে প্রাচীন ভারতের রীতিনীতি, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি জানিয়া ভারতের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। এই সুমুদ্রিত ও সুসম্পাদিত উপকারী পুস্তকখানি ঘরে ঘরে বিরাজিত হওয়া উচিত।

ভূপরিচয়—শ্রীনেপালচন্দ্র রায় ও শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ৩০৮ ও ৷৵০ পৃষ্ঠা; বহু চিত্র ও রঙিন ম্যাপে ভূষিত; মূল্য মাত্র বারো আনা। প্রাপ্তিস্থান —ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

বাংলা ভাষায় যত ভূগোল দেখিয়াছি, তাহাদের সকলের চেয়ে এখানি শ্রেষ্ঠ।

সাধারণতঃ দেশ, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতির নাম কণ্ঠস্থ করিয়া ছাত্রগণ সময়ের অযথা অপব্যবহার করিয়া থাকে। এই গ্রন্থে কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্যকারণের নিয়ম অনুসরণ করিয়া মহাদেশগুলির অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, সমুদ্রোপকূল প্রভৃতির আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহাদেরই ফলে ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে জলবায়ু, উদ্ভিদ্‌ ও জীবজন্তুর কি বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং, এই গ্রন্থকে যথার্থভাবে অনুসরণ করিলে, ভূগোল-শিক্ষা ছাত্রদের পক্ষে নীরস হইবে না; প্রত্যুত তাহাতে তাহারা আনন্দ লাভ করিবে, এরূপ আশা করা যায়।

যাহাতে ছাত্রগণের কল্পনাশক্তি উদ্বোধিত হয় এবং সমস্ত জগতের চিত্র তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, এজন্য নানা স্থানের বর্ণনা ও নানা আমোদজনক কাহিনী দ্বারা গ্রন্থখানির কলেবর পূর্ণ। "ভূপ্রকৃতি" প্রভৃতি অন্যান্য পাঠের মধ্যে এই-সকল পাঠ সুকৌশলে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই ভূগোল সেণ্ট্রাল টেক্স্‌ট বুক কমিটি পাঠ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত স্কুল পাঠশালায় ইহা পড়াইলে শিক্ষকের পড়ানো ও ছাত্রের পড়া আনন্দময় ও সতেজ হইবে।

মার্কিন-যাত্রা—শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক সান্যাল কোম্পানি। ১৫৪ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

লেখক দুইবার মার্কিনে গিয়াছিলেন—একবার ছাত্ররূপে, পরের প্রদত্ত বৃত্তি লইয়া, মধ্যবিত্ত অবস্থায়; এবং দ্বিতীয়বার কুচবিহারের মহারাজকুমারের অভিভাবক রূপে রাজ-কায়দায়; প্রথমবারে মধ্যশ্রেণীর ও দ্বিতীয় বারে উচ্চশ্রেণীর ধনীদের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ ঘটে। সেই দুই যাত্রার দিনলিপি ও আত্মীয় স্বজনকে লিখিত চিঠিপত্র হইতে তথ্য সঙ্কলন করিয়া এই পুস্তক রচিত। ইহাতে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়া আফ্রিকার উপকূল ও য়ুরোপের ভিতর দিয়া আমেরিকা পৌছিবার পথের জ্ঞাতব্য দ্রষ্টব্য অনুভাব্য বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে; এবং আমেরিকার ও ইংলণ্ডের রীতিনীতি, সভ্যতাভব্যতা এবং সেখানে ভারতীয় ছাত্রদের সুবিধা কুবিধা মোটামুটি নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইসব বর্ণনার মধ্যে হাসাইবার মতন অনেক মজার মজার ঘটনা ও কথা আছে। লেখকের ভাষা ঝরঝরে পরিষ্কার স্বচ্ছ। একটু আধটু শব্দ উচ্চারণের ভুল ভাষার মধ্যে আছে; এবং দুইচারিটা ইংরেজী শব্দ ইংরেজী হরপে বাংলা বিভক্তি জুড়িয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। এগুলি না থাকিলে ভালো হইত। পুস্তকে যাঁহারা বিবিধ তথ্য বা গাইড বুকের ন্যায় স্থানের খুটিনাটি বর্ণনা খুঁজিবেন তাঁহারা হতাশ হইবেন; ইহা কেবল মাত্র নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা দিগদর্শন মাত্র—ইহা মার্কিন-যাত্রীর কাজে লাগিবে না, কিন্তু সাধারণ পাঠকের পড়িতে মন্দ লাগিবে না।

প্রবাস-প্রসূন—শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র। পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজি ১০৮ পৃষ্ঠা। মূল্য বারো আনা, বড় বেশী।

জব্বলপুর, বোম্বাই, পুনা, নাসিক, ইলোরা ও রামটেক ভ্রমণের কাহিনী। বহু খুটিনাটি তথ্যে পূর্ণ। ঐ-সকল স্থানে ভ্রমণ করিতে যাইতে যাহাদের ইচ্ছা তাহারা এই বই সঙ্গে রাখিলে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন—পাণ্ডার কাজ করিবে। যাহারা না যাইবেন তাহারা ঘরে বসিয়া বিশদ বর্ণনা পাঠে একটা কল্পিত ছবি মনে গাঁথিয়া লইতে পারিবেন।

কেদার-বদরী পরিক্রমা—শ্রীসন্তোষকুমার দাস প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস লাইব্রেরী, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১২৭ পৃষ্ঠা; ম্যাপ, চার্ট, চটী ও পথের ফর্দ্দ প্রভৃতি সমন্বিত। মূল্য আট আনা।

ইহা তীর্থযাত্রীর পথ নির্দ্দেশের বই, পাণ্ডার বদলে সঙ্গে রাখা চলে। ইহা তথ্যবহুল, ও যাত্রার জানা-আবশ্যক বিষয়ে পূর্ণ। ইহা তীর্থযাত্রী, হিন্দুতীর্থের জ্ঞানলাভেচ্ছু, হিমালয়ের ভূগোল-সংস্থান জানিতে উৎসুক পাঠকের প্রীতিকর হইবে।

মঙ্গলনির্ঘোষ—ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল, ১৬১ হ্যারিসন রোড কলিকাতা হইতে বিনামূল্যে বিতরিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মূল মত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের দর্শনতত্ত্ব বৈষ্ণব শাস্ত্র অবলম্বনে বিবৃত হইয়াছে।

সাধন কলি—শ্রীতারিণীচরণ দেব প্রণীত। মূল্য এক আনা।

লেখক শিলচর গভর্মেণ্ট হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। গুটি-কতক পদ্য লিখিয়া ছাপাইয়াছেন।

কুসুমাঞ্জলী—শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ডায়মণ্ড হার্বার। মূল্য আট আনা। বইএর নাম হইতে ভুল আরম্ভ। এগারটি পদ্যের অঞ্জলি। তাহার ১০ পাতা শুদ্ধিপত্র!

মুদ্রারাক্ষস।

গ্রহনক্ষত্র

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের ছাপা ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ২৬০ পৃষ্ঠা। বহু চিত্রে শোভিত, কাগজ বাঁধা ছাপা অত্যুত্তম। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

জগদানন্দ বাবুর "গ্রহনক্ষত্র" পাইয়াছি এবং আস্তে আস্তে উহার সমস্তটাই পড়িয়াছি।

প্রকাশক খুব সাহসী পুরুষ,—এরূপ খরচ করিয়া যে এমন সুন্দর বহি বাহির করিলেন, ইহা প্রকৃতই বীরত্বের লক্ষণ। ছবিগুলি সম্বন্ধে ত কথাই নাই। এমন ছবি যে এদেশের ছাপাখানা হইতে বাহির হইতে পারে আমার সে ধারণাই ছিল না। জগদানন্দ বাবু লাওয়েল্ সাহেবের নিকট হইতে ছবি আনাইয়া বাঙ্গালা দেশে ছাপাইয়াছেন; ইহা প্রায় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। গ্রন্থকার ধন্য হইয়াছেন।

এই ত গেল বাহিরের কথা। ভিতরের সম্বন্ধে আমার অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন,—আমি চিরকালই জগদানন্দ বাবুর বৈজ্ঞানিক রচনার পক্ষপাতী। এখন বাঙ্গালা-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক রচনার ধারা তিনিই বজায় রাখিতেছেন। যোগেশ বাবু ও আমি, আমরা উভয়েই বৃদ্ধ ও বানপ্রস্থাবলম্বী, আমরা ও-পথ ছাড়িয়াছি। আশা করি, জগদানন্দ বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া এই কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন।

জ্যোতিষের সম্পর্কে বাঙ্গালা বই নাই বলিলেই হয়। সে-কালে একখানা "খ-গোল বিবরণ" ছিল; একালে ময়মনসিং হইতে প্রকাশিত "আকাশের কথা" এবং অপূর্ব্ব বাবুর বহি সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বাহির হইয়াছে। জগদানন্দ বাবুর বহি ছেলে বুড়া উভয়েরই কাজে লাগিবে। এরূপ সাধারণের বোধগম্য ছাঁদে লেখা এবং এতটা বৃহৎ বিষয় লইয়া এত অল্পের মধ্যে গোছাইয়া লেখা বহি বোধ হয় আর নাই। নক্ষত্র, নীহারিকা, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড কিছুই বাদ পড়ে নাই,—কেবল "ছায়াপথের" কথাটা আর-একটু বিস্তৃত হইলে ভাল হইত। "আমাদের জ্যোতিষ" অধ্যায়টি ত বেশ হইয়াছে। "নক্ষত্র-চেনার" ব্যবস্থা করিয়া গ্রন্থকার ভালই করিয়াছেন; তাঁহার বিবরণ পাঠে অনায়াসেই নক্ষত্র চেনা চলিবে;—এই উদ্যমও বাঙ্গালা বহিতে বোধ করি-এই প্রথম।

বহির সম্পূর্ণতার জন্য লেখককে পরামর্শ দিবার অধিক কিছু পাইলাম না। দুই-চারিটি পারিভাষিক শব্দ পরিবর্তন-সহ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু আট্‌কাইবে না।

যাহা হউক গ্রন্থকারকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তাঁহার উদ্যম সফল হউক। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি কয়েকখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বাহির করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের ও বাঙ্গালী পাঠকের যে উপকার করিলেন, তাহার ঋণ অপরিশোধ্য।

আজকাল বাঙ্গালা পুস্তকের যেন কিছু আদর হইতেছে,—এমন কি বৈজ্ঞানিক পুস্তকেরও কিছু হইতেছে। জগদানন্দ বাবুর "গ্রহনক্ষত্রের" বাহ্য ও অভ্যন্তর-শোভা যেরূপ, তাহাতে ইহারও আদর হইবে বলিয়া মনে করি।

সে কথা যাক্,—জগদানন্দ বাবু প্রকৃতই কর্ম্মী পুরুষ, তাঁহাকে পুনরায় মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া এই বুড়া সাহিত্যিক আজকার মত বিদায় চাহিতেছে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

আলোচনা

ইমাম বক্স পালোয়ান।

গত পৌষমাসের "প্রবাসী"তে "বিশ্বের ব্যায়ামসভায় ভারতবাসীর স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে পড়িলাম:—

"ইহার পর বেঞ্জামিন সাহেব বহু চেষ্টা করিয়া গামার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইমামবক্সের সহিত আইরিস কুস্তীগীর (Pat Connolly) প্যাট কনোলীর কুস্তীর বন্দোবস্ত করেন। ইমামবক্স বিনা আয়াসে তাঁহাকে পরাজিত করেন। এই দিগ্বিজয়ী বীর ইমাম আজ প্রায় দুইবৎসর হইল কলেরায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র ইংলণ্ডের কুস্তীগীর সম্প্রদায় 'The Panther' ইমামবক্সের নামে আজও কাঁপিয়া উঠে।"

শুনিয়া সুখী হইবেন যে গামার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইমামবক্স জীবিত আছেন এবং দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আরো বাড়িয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বয়স ২৫ বা ২৬ বৎসরের অধিক হইবে না। দুই ভ্রাতা লাহোরেই থাকেন, এবং মোরীগেটের বাহিরে তাঁহাদের পুরাতন আখড়ায় আজকাল খোলা কসরৎ করিতেছেন। আমি এই পত্র ইমামবক্সের পাশে বসিয়া লিখিতেছি এবং ইমামবক্স আপনাদের বহুৎ বহুৎ সেলাম দিতেছেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
লাহোর।

কপিলবাস্তু।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রও বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতায় দুইস্থানে (১০।২, ১১।২) কপিলবাস্তু প্রয়োগ করিয়াছেন, কপিলবস্তু নহে।

"ন্যগ্রোধারামনিরতং দ্রষ্টুং কপিলবাস্তুনি।
ভগবন্তং যযৌ নন্দঃ শাক্যরাজসুতঃ পুরা॥" ১০।২
"শাক্যানাং নগরে পূর্ব্বং স্ফীতে কপিলবাস্তুনি।
মহতঃ শাক্যমুখ্যস্য সুমুখী দাসকন্যকা॥" ১১।২

পূর্ব্বে সাধারণত হীনযান ও মহাযান এই দুই প্রধান ভাগে বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে ভাগ করা হইত, ইহাই মনে করিয়া মোটামুটি ভাবে আমি মহাবস্তু প্রভৃতিকে মহাযানীয় বলিয়াছিলাম, কিন্তু খুব খাঁটি করিয়া বলিতে হইলে আমি স্বীকার করিতেছি, মহাযানীয় বলা ভুল। দিব্যাবদান সম্বন্ধে এখনো একটু সন্দেহ আছে। যাহাই হউক, এই-সকল গ্রন্থ যে-কোন-যানীয় হউক, প্রকৃত বিষয়ে ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।

আমি এখন অতি পীড়িত, এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার শক্তি নাই।

শ্রীযুত রমাপ্রসাদ বাবুর আর সকল কথা কলহের অবতারণা, অতএব উপেক্ষণীয়।

হাজারীবাগ শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বস্তুতন্ত্রসার

কাব্য লেখ বস্তুতন্ত্র বাঁচিবে যদ্যপি।
ফুল ছেড়ে কণ্ঠে গেঁথে পর ফুলকপি॥

বস্তুতান্ত্রিকচূড়ামণি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আনন্দ ও কাজ।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ;" এই বিশ্ব-চরাচর আনন্দ হইতে জাত। যাহা আনন্দ হইতে জাত, তাহা আনন্দময়। উষা ও সন্ধ্যা, আঁধার ও আলোক, আকাশ ও সমুদ্র, নদী ও পর্ব্বত, প্রমুক্ত মরুপ্রান্তর ও নিবিড় অরণ্য, সব সুন্দর।

ফলশস্য মানুষের কাজে লাগে। কিন্তু ঐ কেজো জিনিষের রূপে রসে গন্ধে বর্ণে স্পর্শে কত আনন্দ রহিয়াছে। বীজ অঙ্কুর বৃক্ষ লতা পাতা ফুল ফল, সব সুন্দর। শরীরের পুষ্টির জন্য যে-সব রাসায়নিক জিনিষ দরকার প্রকৃতি সেইগুলি বিশ্লেষণ করিয়া শিশিতে ভরিয়া মানুষের কাছে পাঠান নাই, সকল রকমে আনন্দময় করিয়া পাঠাইয়াছেন।

অঙ্গচালনায় ক্ষুধা হয়, বল বাড়ে, সুস্থ থাকা যায়, এ কথা বৈজ্ঞানিকেরা বলিবার আগেই শিশুর অকারণ উদ্দেশ্যবিহীন হাত পা নিক্ষেপ কোন্ স্মরণাতীত যুগে আরম্ভ হইয়াছে। শুধু হাত পা নাড়া নয়, তালে তালে হাত পা ছুড়া। চলিতে শিখিবার পর, নৃত্যে শিশুদের স্বভাবপটুতা দেখা যায়, যেন কোন্ অরূপ নৃত্যাচার্য্য তাহাদিগকে এই বিদ্যা শিখাইয়াছেন। এসব তাহাদের উচ্ছল আনন্দেরই রূপ।

শিশুদের কাছে সবই খেলা। শিক্ষাও তাহাদের কাছে খেলার মত হয়, যদি বিশ্ব আনন্দের অভিব্যক্তি বলিয়া শিক্ষকের বোধ থাকে।

কেবলমাত্র কেজো হইতে, কেবলমাত্র কেজো জিনিষ গড়িতে, অল্পদিন হইল মানুষ আরম্ভ করিয়াছে। কুম্ভকার যে মাটীর হাঁড়ি কলসী ভাঁড় গড়ে, সেগুলি দেখিতে কেমন সুন্দর। আগে সুন্দর ভাণ্ডে যে কাজ হইত, এখন সহরে তাহার যায়গায় হইয়াছে টিনের মগ,—অতি কদাকার। ভাঁড় সহজে ভাঙিয়া যায় বটে, কিন্তু আমরা সাবধান হই না বলিয়া ভাঙে। দামী কাচের পাত্র এবং চীনের বাসনও ঠুনকো, কিন্তু দামী বলিয়া যত্নের সহিত ব্যবহার করায় এসব জিনিষ কোন কোন পরিবারে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত ও রক্ষিত দেখা যায়। সস্তা বলিয়া সুন্দর মৃৎপাত্রের অযত্ন করা উচিত নয়। বাস্তবিকও পল্লীগ্রামের গৃহস্থালীতে ২।৩।৪ পুরুষ দেখিয়াছে, এরূপ মাটীর পাত্র দুর্লভ নয়। যেমন করিয়াই ব্যবহার কর, টিনের মগ কিছু দিন পরে মরিচা ধরিয়া অব্যবহার্য্য হইবে, কুৎসিত দেখাইবে, দূষিত হইবে, ব্যবহার করিতে ঘৃণা বোধ হইবে, ভাঙিয়া যাইবে ; কিন্তু মৃৎপাত্র যত্ন করিয়া ব্যবহার করিলে খুব স্থায়ী হয়, ও দূষিত হয় না। ইহা টিনের পাত্র অপেক্ষা সস্তাও বটে।

সেই আদিম কালের মাটীর প্রদীপ কি সুন্দর! তাহার সহিত কত মাতার, কত কন্যার, কত বধূর হর্ষশোক-বৈচিত্র্যময় জীবনের কত স্মৃতি জড়িত। গরীবের ঘরে আজ মাটীর সুন্দর প্রদীপের স্থান অধিকার করিয়াছে কদর্য্য অস্বাস্থ্যকর কেরোসিনের ডিবা বা টেমি। ধনীর গৃহে উৎকৃষ্ট ল্যাম্প বা বিদ্যুতের আলোক থাকিতে পারে, কিন্তু ধনী কয়জন? তদ্ভিন্ন, ধনীর গৃহেও পূর্ব্বে যেমন সুন্দর ধাতুনির্ম্মিত প্রদীপ ও দীপাধার ব্যবহৃত হইত, এখনকার ল্যাম্প ও বাল্‌ব্‌গুলি কি সবই তেমন সুন্দর?

সেকেলে গরীব, মধ্যবিত্ত ও ধনীর গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত সব জিনিষের সৃষ্টিতে আনন্দের পরিচয় পাওয়া যাইত। দড়ির খাটেরও পায়াগুলির সুন্দর গড়ন ছিল। দড়ির বুননেও কত কারীগরী ও বৈচিত্র্য ছিল। লাঠির মুখটি সুন্দর করিয়া গড়া হইত। খড়ের ঘরের খুঁটিগুলিতে, দ্বারের চৌকাঠ ও কপাটে সুন্দর খোদাই ছিল, খড়ের ছাউনির নীচের বেত বা বাঁশের আস্তরণ নানা রঙ দিয়া বিচিত্র করা হইত। তাহার জায়গায় হইয়াছে পুরাতন রেলের খুঁটি, টিনের বা করগেটেড আয়রনের ছাদ, টিনের কপাট, ইত্যাদি। এসব দেখিতেও সুন্দর নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল নয়। কিন্তু "কেজো" বলিয়া চলিতেছে।

আগেকার ঘটী বাটী কলসী থালা ভৃঙ্গার প্রদীপ দীপাধার সব সুন্দর হইত ; কেননা শিল্পীর প্রাণ তাহাতে ছিল, আনন্দ তাহাতে ছিল। এখন এই কারখানার যুগে কলে এবং কলের অঙ্গস্বরূপ মানুষের সাহায্যে পূর্ব্বেকার বৈচিত্র্যও আনন্দপূর্ণ জিনিষ হইতে পারিতেছে না।

ক্রেতারাও জীবনসংগ্রামে চঞ্চল অতিষ্ঠ হইয়া কোন প্রকারে "কেজো" জিনিষের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে; সুন্দরের আনন্দময়ের সন্ধানে সে ফিরিতে পারিতেছে না। শিল্পীরও আনন্দ নাই, সুতরাং তাহার জিনিষ কেমন করিয়া সুন্দর হইবে? কারখানার মালিক বা অংশীদারের সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা মূলধনের সুদে; তাহা কারখানায় উৎপন্ন জিনিষের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না।

আমরা মানুষকে ফিরিয়া অতীত যুগে যাইতে বলিতেছি না; বর্ত্তমান যুগের সুখস্বচ্ছন্দতা সুবিধাও ত্যাগ করিতে বলিতেছি না। আমরা কেবলমাত্র-"কেজো" হওয়া অস্বাভাবিক সুতরাং অকল্যাণকর বলিয়া তাহার নিন্দা করিতেছি। মজুর কারিগর কৃষক দোকানদার শিক্ষক গৃহস্থ শিল্পী কবি, সব রকমের সব মানুষ কেমন করিয়া নিজের নিজের কাজ প্রকৃতির মত আনন্দের সহিত সুন্দর করিয়া করিতে পারেন, প্রত্যেক মানুষের অন্যের সহিত সম্পর্ক কেমন করিয়া সুন্দর ও আনন্দময় হয়, তাহা ভাবিবার বিষয়।

যে কাজে মানুষের প্রাণের টান নাই, তাহাতে সে আনন্দ পায় না; সে কাজ তাহার দ্বারা ভাল করিয়া হয় না। মানুষ পেটের দায়ে কত কাজই না করে। এমন অনেক শিক্ষক আছেন, যাঁহাদের অন্য কোন কাজ না জুটায় ছেলে ঠেঙাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য নানা দেশে এবং আমাদের দেশেও অনেকে উপার্জ্জনের জন্য ধর্ম্মোপদেষ্টা ও পুরোহিতের কাজ করেন। আর কোন কাজ না জুটায় খবরের কাগজের ব্যবসাও অনেকে করেন। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায়, এবং নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি পুস্তক পড়িয়া পরীক্ষা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, ছেলেদের পাঠ্য পুস্তক লেখা একটা মস্ত ব্যবসা হইয়া উঠিয়াছে। কোন দেশের সেকালের সাহিত্য এইরূপ পয়সা-ধরা ফাঁদ ছিল না। এখন, ছেলেদের বহি কি কি বিষয়ে লিখিতে হইবে, কোন্ বিষয়ে কত পৃষ্ঠা বা পংক্তি লিখিতে হইবে, কতটুকু পদ্যে, কতটুকু গদ্যে, কতটুকু ঈশ্বরভক্তি, কতটুকু রাজভক্তি, কতটুকু গুরুভক্তি, সমস্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। ভাষা কি পরিমাণে সোজা বা শক্ত হইবে, লিখিবার ধরণ, যাহাকে বলে "ইষ্‌টাইল্," কেমন হওয়া দরকার, সমস্তই বরাত দেওয়া আছে। উৎসাহ বা অনুরাগ বশতঃ তুমি যদি হঠাৎ একটু স্বদেশ-প্রীতি বা স্বাধীনতার কথা বলিয়া ফেল, তাহা হইলে পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচক কমিটির মতে তোমার পাতিত্য ঘটিবে। এই প্রকার বরাতী ছাঁচে-ঢালা রচনার মধ্যে সাহিত্যিক রস বা উৎকর্ষ থাকিতে পারে না। ইহাতে প্রাণের খেলা, আনন্দ কোথায়? যে চিন্তায়, যে ভাবে, যে প্রসঙ্গে তুমি আনন্দ লাভ করিয়া অপরের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে চাও, তাহাই হইবে সাহিত্য। পাঠ্যপুস্তক বিক্রী হইলে এক রকম সুখ হয় বটে, কিন্তু তাহা সাহিত্য-রস আস্বাদন, দান, এবং অন্যের সহিত উপভোগজনিত আনন্দ নহে। তা ছাড়া, বহিগুলা বিক্রী করিয়া লেখকের সুখ হয় বটে, কিন্তু সেগুলা পড়িতে ছেলেমেয়েদের আনন্দ হয় না, তাহাদের পিতামাতার সেগুলা কিনিয়া দিতেও আনন্দ হয় না। সাহিত্যের কল্যাণের জন্য, ছেলেমেয়েদের আনন্দ ও সুশিক্ষার জন্য এই বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তকরূপী পয়সা-ধরা ফাঁদগুলির উচ্ছেদ একান্ত আবশ্যক।

চিত্রাঙ্কণ একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। এখন বিদ্যালয়পাঠ্য-পুস্তক, তথাকথিত শিশুসাহিত্য এবং সচিত্র কাগজের বরাতমত এক প্রকার ছবির জোগান দিবার লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে। এই সব সচিত্র-বহি ও কাগজের দরকার আছে বটে। কিন্তু রসহীন, শিল্পনৈপুণ্যবিহীন, কদর্য্য ছবির প্রয়োজন নাই।

প্রকৃত ধর্ম্মাচার্য্য যিনি, তিনি বিশ্বে আনন্দের নিলয় দেখিতে পাইয়া ও তথায় বাস করিয়া সকলকে সেই আনন্দ দিতে ব্যগ্র হন। তাঁহার মস্তিষ্ক পাপীদের উদ্ধারের জন্য উপদেশ সরবরাহ করিবার কারখানা নয়, তাঁহার মুখ কিঞ্চিৎ রোজগারের নিমিত্ত মন্ত্র আবৃত্তির কল নহে। বস্তুতঃ, যিনি আপনাকে উদ্ধারকর্ত্তা বা লোকশিক্ষক বলিয়া মনে করেন এবং মনের মন্দিরে বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া বিশ্বজনের প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, তিনি উপদেশের কারখানা হইতে পারেন, ধর্ম্মাচার্য্য নহেন।

সকলের জীবনে, সকলের কাজে আনন্দ আসুক, সৌন্দর্য্য আসুক, লীলা অবতীর্ণ হউক।

সার্ব্বজনিক শিক্ষা ও কৌলিক বৃত্তি।

সর্ব্বসাধারণকে লেখাপড়া শিখাইবার বিরুদ্ধে একটি এই আপত্তি শুনা যায় যে সকলে লিখনপঠনক্ষম হইলে চাষা চাষের কাজ, কামার কামারের কাজ, ছুতার ছুতারের কাজ, ছাড়িয়া দিবে, চাকর আর চাকর থাকিতে চাহিবে না, ইত্যাদি। এই আপত্তির মধ্যে যতটুকু আমাদের নিজের স্বার্থবুদ্ধি ও আরামলোলুপতা আছে, তাহাকে আমরা মোটেই আমল দিব না। আমাদের আরামের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া আর কতকগুলি লোক চিরকাল অজ্ঞ ও দরিদ্র হইয়া থাকিবে, তাহা হইতে পারে না; আমরা যদি চাকর না পাই, নিজের কাজ নিজেই করিব; যদি না পারি, যতটুকু সাহায্য একান্ত আবশ্যক উচ্চহারে পারিশ্রমিক দিয়া ভৃত্যকে সহায়কের সম্মান দিয়া, সেই সাহায্য তাহার নিকট হইতে লইব।

কিন্তু এই আপত্তির মধ্যে সত্য আছে, ভাবিবার বিষয় আছে। শুধু লিখিতে পড়িতে শিখিয়াই যে মানুষের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, সৌন্দর্য্য-বোধের বিকাশ হয়, হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা নহে। যিনি কেরাণী, হিসাব রক্ষক, বা নকলনবিশের কাজ করেন, তিনি রাজমিস্ত্রী, দরজি, ছুতার, কামার, কুমারের চেয়ে কি বেশী বুদ্ধি, সৌন্দর্য্যবোধ, বা হৃদয়ের সরসতার পরিচয় দেন? লিপিজীবী ও বাক্যজীবীদের কাজ যে সংসারে মানুষের পক্ষে শিল্পজীবীদের কাজের চেয়ে বেশী দরকারী, তাহারই বা প্রমাণ কি? ভারতবর্ষের লোকেরা যে সভ্য ও উন্নত, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যে সভ্য ও উন্নত ছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা কি বলিয়া থাকি? আমাদের আগেকার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস যাহা আছে, সাক্ষ্যস্বরূপ সেগুলিকে উপস্থিত করি। কিন্তু তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হই না। আমরা প্রাচীন স্তূপ, সমাধিমন্দির, দেবালয়, প্রাসাদ, প্রস্তরমূর্ত্তি, ধাতবমূর্ত্তি, মৃণ্ময়মূর্ত্তি, মৃৎপাত্র, অলঙ্কার, চিত্র, সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, প্রভৃতিরও উল্লেখ করি। এই-সকল পুরাকালের কীর্ত্তি ও চিহ্নে সেকালের লোকদের প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি দেখিয়া বুঝা যায় যে, তাহাদের সুন্দর জিনিষ পরিকল্পনা ও সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তাহারা কাহারা? তাহারা কেরাণী, নকলনবীশ, স্কুলের মাষ্টার পণ্ডিত, উকীল মোক্তার, ডাক্তার, ডেপুটী, মুন্সেফ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কাগজের সম্পাদক, দার্শনিক, কবি বা ধর্ম্মাচার্য্য ছিল না। সাঞ্চী ও সারনাথের স্তূপ, বা আগ্রার তাজমহল, এই-সকল "ভদ্র" শ্রেণীর লোকে নির্ম্মাণ করে নাই; অজন্টাগুহার চিত্রাবলীও তাহাদের আঁকা নহে। এখন যাহাদিগকে আমরা রাজমিস্ত্রী বা পটুয়া বলি, সেই শ্রেণীর লোকে এই-সব কাজ করিয়াছিল প্রাচীনকালের অন্যান্য গৌরবের জিনিষও কামার, কুমার, ছুতার, তক্ষক, ভাস্কর, স্বর্ণকার, প্রভৃতি শিল্পীরা প্রস্তুত করিয়াছিল। যাহাদের দক্ষতায় প্রাচীন ভারতবর্ষকে গৌরব-মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, পাশ্চাত্য কলকারখানার প্রতি-যোগিতায়, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির বিরোধিতায়, একালের লোকদের রুচির বিকৃতি বা পরিবর্ত্তনে ও জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহপ্রণালীর পরিবর্ত্তনে, ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিবর্ত্তনে এবং উৎসাহের অভাবে, এখন তাহাদের বংশধর বা সমশ্রেণীর লোকেরা বহু পরিমাণে কৌলিক বৃত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা এখনও কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে তাহাদের সম্পূর্ণ সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং জা'ত ব্যবসার প্রতি তাহারা বীতরাগ হইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থায়, তাহাদের মধ্যে অনেকের দৃষ্টি "ভদ্র" শ্রেণীর ব্যবসা কেরাণীগিরি প্রভৃতির দিকে পড়া স্বাভাবিক: কারণ ইহাতে কিছু টাকা আছে, আবার সম্মানও আছে।

নানা প্রকারের শিল্প দ্বারা অর্থ-উপার্জ্জন করা যায়; মানুষের ভাব ও চিন্তার, সৃষ্টি-শক্তির, সৌন্দর্য্য-বোধের, প্রতিভার, এক কথায়, সভ্যতার উৎকর্ষের, পরিচয় উহাতে পাওয়া যায়। যে দিক্ দিয়াই দেখা যাক্, শিল্পগুলিকে মরিতে দিলে চলিবে না। যদি দেখিতাম, আমাদের সাবেক শিল্পগুলির জায়গায় তার চেয়ে ভাল শিল্প আমাদের কারিগরদিগের গৃহে ও দোকানে স্থান পাইতেছে, যদি দেখিতাম, এইসব উচ্চতর শিল্প আমাদের ছেলেমেয়েরা শতশত শিল্পবিদ্যালয়ে শিখিবার সুযোগ পাইতেছে, তাহা হইলে না হয় মনে এই সান্ত্বনা লাভ করিতাম যে প্রাচীন যাইতেছে বটে কিন্তু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নবীন তাহার স্থান

অধিকার করিতেছে। কিন্তু তাহা ত নয়। এখনও আমাদের কামার কুমার সেকরা ছুতার তাঁতিদের বাড়ীই আমাদের শিল্পশিক্ষার প্রধান স্থান, একমাত্র স্থান বলিলেও বেশী ভুল হয় না। কোন উৎকৃষ্টতর শিল্প এখনও দেশের লোকেরা অনুসরণ করিতেছে না, বা করিবার সুযোগ পায় নাই। সুতরাং আমাদিগকে দেখিতে হইবে, যে, দেশের সব ছেলেমেয়েকে বহি এবং কাগজ কলমের সাহায্যে চিন্তা করিতে শিখাইতে গিয়া, কারিগরের নানা যন্ত্রের দ্বারাও যে চিন্তা করা যায়, আমরা সে কথা যেন ভুলিয়া না যাই। একজন হাতে কলম লইয়া একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কবিতা, নাটক বা উপন্যাস রচনা করিলেন। কিন্তু যে মিস্ত্রী হাতে কর্ণিক ও গজ লইয়া তাজ গড়িয়াছিলেন, তিনি কম ভাবুকতা, চিন্তা, প্রতিভা ও সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় দেন নাই। কলম চালাইবার দক্ষতা, জিহ্বা ও ঠোঁট নাড়িবার দক্ষতা চাই, কিন্তু হাতের (এবং পায়েরও) নানাবিধ দক্ষতা এবং চোখের শিক্ষা কম আবশ্যক নয়। হাতটি এমন পটু হওয়া চাই, যাহাতে উহা নিজেই চিন্তা করিয়া কাজ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। সৌন্দর্য্য বুঝিতে, কেবল দেখিয়া আকৃতি আয়তন দৈর্ঘ্য বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রতা, ঋজুতা ও বক্রতা, প্রভৃতি নির্ণয় করিতে চোখ দুটির শিক্ষিত হওয়া চাই। কান দ্বারা মানুষের কণ্ঠধ্বনির ও বাদ্যযন্ত্রের নানা ধ্বনির পার্থক্য, এবং মাধুর্য্য বা কর্কশতা বিচার করিতে পারা চাই। সমুদয় কারিগরকে লিপিকরে বা বাক্যজীবীতে পরিণত করিলে চলিবে না। চলিবে না, কেননা তাহাতে একটা সমগ্র জাতির দিনপাত হইতে পারে না; চলিবে না, কেননা, তাহাতে আমাদের দেশের প্রতিভা সকল দিকে ক্রমশঃ অধিকতর বিকাশ ত পাইবেই না, বরং যতটুকু বিকাশ পাইয়াছে, তাহাও লুপ্ত হইয়া যাইবে।

এইজন্য লেখাপড়াশিক্ষা যেমন চাই, বৃত্তিশিক্ষাও তেমনি চাই। লেখাপড়া বাদ দিলে চলিবে না, এইজন্য যে, কোন মানুষের বিশ্বের অন্তর্বাহ্য সম্বন্ধে জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকা উচিত নয়; বঞ্চিত থাকিলে মনুষ্যত্বলাভে ব্যাঘাত ঘটে। জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়, পড়িতে ও লিখিতে শিখা। দেখিয়া শুনিয়া অনেক শিখা যায়, কিন্তু মৃত ও জীবিত জ্ঞানীদের জ্ঞান আবশ্যক-মত এই প্রকারে লাভ করা অসম্ভব; এবং নিজে দেখিয়া শুনিয়া যতটুকু জ্ঞান লাভ হয়, তাহাও লিখিয়া না রাখিলে ভুলিয়া যাইতে হয়। একজন জ্ঞানী পুস্তক লিখিয়া অতি দূরবর্ত্তী লোককেও, ভবিষ্যদ্বংশীয় লোককেও নিজের জ্ঞানের অংশী করিতে পারেন; পুস্তক লিখিয়া যত লোককে শিক্ষা দিতে পারেন, বক্তৃতা দ্বারা তত পারেন না। তা ছাড়া, তিনি যে সময়ে বক্তৃতা দিবেন, আমার তখন তাহা শুনিবার অবসর না হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার বহি একখানি কিনিয়া রাখিলে আমার অবসর-মত অল্প অল্প করিয়া আমি পড়িতে পারি। লিখনপঠন শুধু জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানদানের জন্যই আবশ্যক নহে। মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শের সঙ্গে এবং অন্যান্য দেশের লোকদের কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনা করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইলে দেশস্থ সমুদয় মানুষকে জাগাইয়া তুলা, উদ্বুদ্ধ করা, অসাড়কে সচেতন করিয়া তুলা, একান্ত আবশ্যক। সকলকে লেখাপড়া শিখাইলে ইহা যত সহজে, যত শীঘ্র ও যে পরিমাণে করা যায়, এমন আর কোন উপায়ে হইতে পারে না। যে যে-বংশে জন্মগ্রহণ করে, তাহার বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, শক্তি, ঠিক্ সেই বংশের অনুরূপ হয়, ইহা সত্য নহে। কৃষকের ছেলে দার্শনিক বা জজ হইতে পারে, পুরোহিতের ছেলে কলকারখানা চালাইতে পারে। এই-জন্য, সব ছেলেমেয়েকে সাধারণ-শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; কাহার শক্তি কোন্ দিকে খুলিবে, তাহা ত বলা যায় না। শিল্পকার্য্যও সকলেই যে নিজ কৌলিক পথে থাকিয়া করিবে, তাহাও নয়। বাল্যে আমাদের এক প্রতিবেশী তেলিকে ছুতার ঘরামির কাজ নৈপুণ্যের সহিত করিতে দেখিয়াছি। জাতিতে ধোপা, অথচ তাঁতের কাজ করে, এমন লোকের অভাব নাই।

একটু লেখাপড়ার আস্বাদন পাইলে প্রায় সবাই যে লিপি-বা-বাক্য-জীবী হইতে চায়, তাহার একটা কারণ আছে। একজন কামার বা রাজমিস্ত্রী যত বুদ্ধিমান্, দক্ষ, সৎ ও উপার্জ্জক হউক না কেন, আমরা এইরূপ ধরিয়া রাখিয়াছি যে সে "ভদ্র" লোক হইতে পারে না। তাই একটা

চলিত গল্প আছে যে ভোলানাথ নামধারী একজন লক্ষপতি স্বর্ণকার নিজ পুত্রকে ইংরেজী লেখাপড়া শিখাইয়া কোন এক আফিসের হেড্ কেরাণীর কাছে ছেলের জন্য একটি ২০৲ টাকার চাকরীর উমেদার হন। তাহাতে হেড্ কেরাণী জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার বাপু অতুল সম্পত্তি, ছেলেকে ২০৲ টাকার চাকরী করিতে কেন দিতেছ?" ভোলানাথ বলিলেন, "মহাশয়, আমি যেমনই হই, কেহ ভোলা সেক্‌রা বই বলে না, এবং বসিতে চেয়ার দেয় না। কিন্তু আমার ছেলে যদি কেরাণী হয়, তাহা হইলে সবাই তাহাকে মাণিকলাল বাবু বলিবে, এবং বসিতে চেয়ার দিবে।" এখন এ ভাবটা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে; মানুষ, যে বংশেরই হউক, যোগ্যতা ও চরিত্রের অনুরূপ সম্মান অনেক স্থলে পাইতেছে। অন্যদিকে সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবংশীয় লোকদিগকেও কারিগরদের কৌলিক কাজে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যাইতেছে, এবং তাহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদার কিছুই লাঘব হইতেছে না। কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা অসঙ্কোচে কারিগরদিগকে আপনাদের সমকক্ষ বলিয়া গ্রহণ না করিলে, আপনাদের সন্তানদিগকে প্রয়োজন-মত কারিগর হইতে না দিলে, এবং কারিগরের ছেলেদিগকেও কেতাবী-শিক্ষা-সাপেক্ষ বৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখিয়া অকুণ্ঠিত না থাকিলে, আমাদের দেশ-সম্ভবা কলালক্ষ্মী ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে দুর্দ্দিন যেন না আসে; কিন্তু আসিলে তখন দেশে কতকগুলি লেখনীজীবী ও বাক্যজীবী থাকিবে, কতকগুলি নিরক্ষর কৃষক, মজুর ও কলকারখানার শ্রমজীবী থাকিবে, এবং কলকারখানা আদির মালিক কতকগুলি ধনী লোক থাকিবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্থাপত্য, তক্ষণ, চিত্রাঙ্কণ, মূর্ত্তিনির্ম্মাণ, ভাস্কর্য্যাদির যে-সকল বিস্ময়কর নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের সুদূরকালের বংশধরেরা আমাদের সভ্যতার সেরূপ কোন চিহ্ন দেখিতে পাইবে না।

রাণীর বাঘ শিকার।

সোঁড়ুর নামক ক্ষুদ্ররাজ্যের শ্রীমতী সৌভাগ্যবতী "তারারাজে" রাণীসাহিবা ঘোরপড়ে একটি বাঘ শিকার

সোঁড়ুর রাজ্যের শিকারী রাণীসাহেবা তারারাজে ঘোরপড়ে।

করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার শিকারের সখ চড়ে। গত বৎসর ৯ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৫॥০ টার সময় সোঁড়ুর রাজ্যের স্বামিকার্ত্তিক পাহাড়ের পশ্চাতে তিনি এই বাঘ শিকার করেন। শিকারের সময় তাঁহার কাছে আর কোন মানুষ ছিল না; তিনি তখন শিকারের বেশেও ছিলেন না; কিন্তু বাঘকে সামনে আসিতে দেখিয়া অব্যর্থ সন্ধানে এক-গুলিতেই তাহার প্রাণবধ করেন। রাণীসাহিবা অক্কল-কোটের মহারাজের তৃতীয়া কন্যা। তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক বিশ বৎসর। "হিন্দী চিত্রময় জগতে" এই সংবাদ ও রাণীর ছবি বাহির হইয়াছে।

খৃষ্টীয় বৎসরের শেষ সপ্তাহ।

প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের কোন-না-কোন সহরে দেশের ভাবনা ভাবিবার নিমিত্ত, দেশের উন্নতি কেমন করিয়া হয় তাহার উপায় স্থির করিবার নিমিত্ত, এই উন্নতির পথে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কতদূর অগ্রসর করিয়া দিতে পারেন, আমরা নিজের চেষ্টাতেই বা কতদূর অগ্রসর হইতে পারি, ইত্যাকার বিষয়ের আলোচনার জন্য নানা সভাসমিতিমণ্ডলীর অধিবেশন হইয়া থাকে। এবার অধিকাংশ সমিতির অধিবেশনের স্থান হইয়াছিল বোম্বাই। আট দশ দিন সময়ের মধ্যে একই স্থানে বহু-সংখ্যক সভার অধিবেশন হইলে কর্ম্মকর্ত্তারা কোনটাতেই ভাল করিয়া মন দিতে পারেন না; কারণ, এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা জাতীয় জীবনের নানাবিভাগে

অধ্যাপক কার্বে।
সমাজ-সংস্কার সংঘের অধিনায়ক।

উন্নতি চেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট। যাঁহারা দর্শক ও শ্রোতা, তাঁহাদের ত মহা বিপদ্! দূর দূর প্রদেশ হইতে নানা ঢংএর রং বেরঙের পোষাক-পরা কত বিখ্যাত অবিখ্যাত মানুষ আসিয়াছে, কত প্রসিদ্ধ বক্তা আসিয়াছে, কাহাকে দেখি, কাহার কথা শুনি? যাহারা কেবল হুজুকপ্রিয় বা কৌতূহলের বশবর্ত্তী নহে, কিছু সার জিনিষ চায়, তাহারাই বা কোন্ সভা ছাড়িয়া কোথায় যায়? ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শুধু বোম্বাই সহরেই ১২টি জনসমষ্টির অধিবেশন হইয়াছিল; যথা থিয়সফিক্যাল কন্ভেন্শন, জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেস, সমাজসংস্কার-সভা, একেশ্বরবাদীদিগের সভা, মাদকনিবারিণী সভা, শিল্পোন্নতি সভা, মুস্লিম লীগ বা মুসলমানসংঘ, হিন্দু কন্ফারেন্স, ভাটিয়া কন্ফারেন্স, আর্য্যসমাজের বার্ষিক উৎসব, সমগ্র ভারতের ক্ষত্রিয় কন্ফারেন্স, বাণিজ্য-কংগ্রেস। ইহা ছাড়া বারাণসীতে ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল, এবং অন্যত্র কায়স্থ কন্ফারেন্স, আসাম কন্ফারেন্স, বিক্রমপুর সম্মিলনী প্রভৃতির অধিবেশন হইয়াছিল। এই সমুদয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতির বক্তৃতা ও অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ ব্যতীত আরও উৎকৃষ্ট বক্তৃতা হইয়াছে। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ দৈনিক কাগজেও সমুদয় বক্তৃতা ছাপিতে পারে না। কোন কোন দৈনিকে এখনও সভাপতিদের বক্তৃতার জের চলিতেছে। সমুদয় বক্তৃতার আলোচনাও হয় না। সভাপতিদের বক্তৃতার আলোচনার জের এখনও দৈনিক কাগজে মিটে নাই।

সার দোরাব তাতা।
শিল্পোন্নতি সমিতির অধিনায়ক।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, শ্রোতা, দর্শক, পাঠক, সম্পাদক, সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। কোন সভাসমিতিমণ্ডলীসংঘের অধিবেশনের সম্পূর্ণ রিপোর্ট যথা-সময়ে বাহির হয় না, কোন কোনটির রিপোর্ট মোটেই বাহির হয় না। তাহা হইলেও, নিতান্ত বিলম্বে বাহির না

হইলে, যাঁহার যে বিষয়ে অনুরাগ আছে, তিনি তদ্বিষয়ক সভার অধিবেশনের রিপোর্ট কিনিয়া অবসরমত ধীরভাবে অধ্যয়ন ও চিন্তা করিতে পারেন।

ভিন্ন ভিন্ন সংঘের অধিবেশন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হইলে ভাল হয়। কিন্তু যাঁহারা অধিবেশনসমূহে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই অবসর আফিস-আদালতের ছুটির সময় হয়। কারণ, উকীল ব্যারিষ্টার-দের ব্যবসাও বাস্তবিক স্বাধীন নয়। সেই জন্য, যতদিন প্রকৃত স্বাধীনজীবিকার লোকেরা দেশহিতকর প্রচেষ্টা-সকলে অধিক পরিমাণে যোগ না দিতেছেন, ততদিন অধিবেশন, বক্তৃতা, উপদেশ, পরামর্শ, প্রস্তাব, ও প্রতিজ্ঞার বন্যায় আমাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে।

সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।
জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের অধিনায়ক।
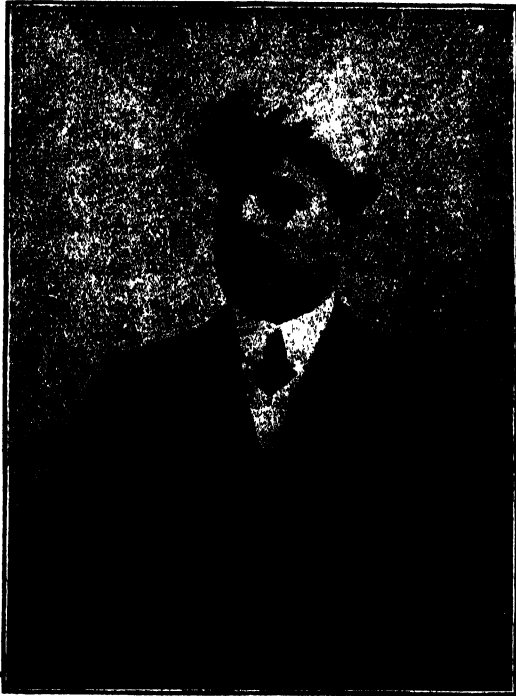
সার ফজুলভাই করিমভাই।
বাণিজ্যকংগ্রেসের অধিনায়ক।

কিন্তু ইহাতেও লাভ আছে। কতকগুলি লোক একটি বা ২।১টি মাত্র সভায় যোগ দেন; কতকগুলি দর্শক ও শ্রোতা কেবল দু-একটি অধিবেশনমণ্ডপে উপস্থিত হন; কতকগুলি পাঠক মাত্র দু-একটি সংঘের বক্তৃতা পাঠ করেন। ইহাতে তাঁহাদের বেশী তাড়াতাড়ি বা অমনোযোগ না হইবার কথা। সংবাদপত্রে ২।৪ টা বক্তৃতার আলোচনা যাহা হয়, তাহাতেও উপকার হয়। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েক দিনের জন্যও একটা সজাগ ভাব দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার পরই অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়। যতগুলি সভাসমিতির অধিবেশন হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই স্থায়ী কমিটি থাকা উচিত। উহার কর্ম্মচারীরা বেতনভোগী হইবেন, এবং পুস্তিকা প্রচার, সংবাদপত্রে প্রবন্ধলিখন, এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দ্বারা দেশের লোককে সম্বৎসর সজাগ রাখিতে চেষ্টা করিবেন। শুধু রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের বিষয়ই যদি বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলেও সম্বৎসর ধরিয়া কাজ করার প্রয়োজন বুঝিতে পারা যায়। যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় কিছু ফল লাভের আশা থাকে, তাহা হইলে সে চেষ্টা সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া করা কর্ত্তব্য। আর যদি গবর্ণমেণ্টের কাছে ভিক্ষা করাই প্রধান উপায় বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলেও ভিক্ষার অবিশ্রান্ত চীৎকারে এবং দরখাস্তের অবিরাম বর্ষণে রাজপুরুষদিগকে হায়রান-পরেশান করিয়া

শ্রীযুক্ত মজ্‌হর্‌-উল্‌-হক।
মুসলমান সংঘের অধিনায়ক।

তুলা কর্ত্তব্য। স্বাবলম্বনই বল আর ভিক্ষাই বল, চূড়ান্ত না দেখিয়া নিরস্ত হইতে নাই। এই পরামর্শটা খুব পুরাতন, কিন্তু ইহার অনুসারে কাজ এখনও হইল না। এইজন্য ফল এই দাঁড়ায় যে

নানা ব্যক্তি এক পুরে ছুটিতে বিহরে সুখে,
ছুটি-অবসানে তারা দশ দিকে ধায়।

বোম্বাইয়ের শিক্ষা।

কিন্তু কূপমণ্ডূক হইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকা অপেক্ষা ইহাও ভাল; বিশেষতঃ যদি চোখ কান মন খোলা থাকে, এবং সর্ব্বোপরি, যদি বাড়ীর মেয়েরা সঙ্গে থাকেন। এই যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের লোকেরা বোম্বাই বেড়াইয়া আসিলেন, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি লোক বুঝিতে পারিয়াছেন যে মহারাষ্ট্র গুজরাট হইতে শিখিবার কি আছে। ছুটি বিষয়ে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ভারতের আর সমুদয় প্রদেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে। প্রথম, কলকারখানা ব্যবসা বাণিজ্যে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সত্য বটে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে খুব তুলার চাষ হয়,

মাননীয় ডাক্তার শ্রীনীলরতন সরকার।
একেশ্বরবাদীদের সমিতির অধিনায়ক।

এবং তজ্জন্য সুতা ও কাপড়ের কল ঐ প্রদেশে স্থাপন করিবার সুবিধা আছে। তথাকার লোকেরা সে সুযোগ হেলায় হারায় নাই। কিন্তু বাংলা দেশেও ত প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মে। তুলা পৃথিবীর নানা দেশে হয়। পাট কেবল বাংলা দেশেই হয়। কিন্তু পাটের কল সমস্তই বিদেশীর হাতে; বাঙালী একটিও পাটের কল স্থাপন করিতে পারে নাই। এত দিকে বাঙালী বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে, এক্ষেত্রে বাঙালী পশ্চাৎপদ কেন? ওকালতী ব্যারিষ্টারীতে কিছু টাকা আছে বটে; কিন্তু তাহার মানে এই যে দেশের দশজনের টাকা ২।১ জনের সিন্দুকে পৌঁছিতেছে, উকীল ব্যারিষ্টার ধন উৎপাদন করিতেছেন না। আর, তাঁহারা কতই বা রোজগার করেন? সার্‌ দোরাব তাতা শিল্পোন্নতি-সভার সভাপতিরূপে বক্তৃতা দিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে বলেন, যে, সাক্‌চীতে তাঁহাদের যে বৃহৎ লোহা-ইস্পাতের কারখানা আছে, তাহার প্রধান কর্ম্মচারী মিষ্টার পেরিন্‌ ভারতের বড়লাট অপেক্ষা কম বেতন পান না। (বড়লাটের বেতন বার্ষিক আড়াই লক্ষ আটশত টাকা।) বঙ্গে কোন্‌ ব্যারিষ্টার, উকীল

বা জমীদারের বড়লাটের সমান বেতন দিয়া কর্ম্মচারী রাখিবার ক্ষমতা আছে ? বোম্বাই অঞ্চলে তুলা হয় বলিয়া না-হয় সেখানে সুতা ও কাপড়ের কল অনেক হইয়াছে, কিন্তু সাকৃচী ত ছোটনাগপুরে এবং ভৌগোলিক হিসাবে বঙ্গেরই অন্তর্গত। সেখানে বোম্বায়ের লোকে আসিয়া বিরাট কারখানা স্থাপন করিল, বাঙালী কেন পারিল না ? এ বিষয়ে বাঙালীর অকৃতকার্য্যতা স্পষ্টতর হয়, যখন চিন্তা করা যায়, যে, তাতা কোম্পানী ময়ূরভঞ্জের যে লোহার খনি হইতে লোহা পাইতেছেন, তাহা একজন বাঙালী, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, বাংলাদেশে জমীর খাজনা সম্বন্ধে জমীদারদের সহিত গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া যাওয়ায়, এখানে এমন একদল ধনী লোকের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাদিগকে জীবিকার জন্য পরিশ্রম করিতে হয় না, ধনী হইবার জন্য মূলধন কারবারে খাটাইতে হয় না, এবং সেইজন্য বাঙালী কলকারখানা কারবারে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। জানি না ইহাতে কতটুকু সত্য আছে। কিন্তু ইহাতে কিছু সত্য থাকিলেও, বঙ্গে জমীদার কয় জন ? দেশের সমগ্র অধিবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় মাত্র। বাকী বাঙালীরা কেন ব্যবসাবাণিজ্য কলকারখানায় মন দেন না ? অন্যান্য প্রদেশের লোকদের চেয়ে আগে বাঙালীরা ইংরেজী লিখিতে পড়িতে বলিতে অভ্যস্ত হওয়ায়, তাহারা স্বপ্রদেশে এবং ভারতের আরও অনেক প্রদেশে কেরাণী, শিক্ষক, উকীল, ডাক্তার, মুন্সেফ, ব্যারিষ্টার হইয়াছে। এই বাহাদুরীর নেশায় তাহারা দেখিতে পাইতেছে না যে এখন ছোটছোট-সহরের ছোটছোট-কারবার পর্য্যন্ত মাড়োয়ারীর হাতে গিয়া পড়িতেছে, এবং বাড়ীর রাঁধুনী চাকর, নৌকার মাল্লামাঝি, ক্ষেতের মজুর ভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিতেছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়ে বোম্বাই ভারতবর্ষের আর সকল প্রদেশ হইতে অগ্রসর, তাহা জনহিতৈষণা।

দেশের সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি না হইলে যেমন তাহারা রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি আবার ইহাও সত্য যে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ না করিলে দেশের উন্নতির চেষ্টাও সফল হয় না। ইংরেজেরা বলেন, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, অজ্ঞ ; সুতরাং ভারতবাসীরা কেমন করিয়া দেশের কাজ চালাইবে ? আমরা বলি, যদি ইহা মানিয়া লওয়া যায় যে লেখাপড়া না জানিলে দেশের কাজ করা যায় না (বাস্তবিক ইহা কেবল আংশিক ভাবে সত্য), তাহা হইলে তোমরা অন্যান্য সভ্য দেশের মত ভারতবর্ষে সার্ব্বজনিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতেছ না কেন, শিক্ষাবিস্তারে বাধা দিতেছ কেন, স্বর্গীয় গোখলে মহাশয়ের সার্ব্বজনিক-শিক্ষা-আইন পাস হইতে দিলে না কেন ? আমরা ইহাও বলি, তোমরা আমাদের অধিকাংশের নিরক্ষরতার ওজুহাতে আমাদিগকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিতে চাও না ; কিন্তু আমাদের মত এই যে আমরা স্বায়ত্ত শাসন পাইলে ২০।২৫ বৎসরে দেশের নিরক্ষরতা প্রায় লুপ্ত করিয়া আনিতে পারি, এবং আমরা স্বায়ত্তশাসন না পাইলে এই নিরক্ষরতা দূর হইতে কত শতাব্দী লাগিবে বলা যায় না।

যাহা হউক, ইংরেজরা কি বলে না বলে, আমাদের কি সুবিধা করিয়া দিবে বা না দিবে, তাহার আলোচনায় সমস্তটা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই ; আমরা নিজে কি করিতে পারি, সে চেষ্টাও করিতে হইবে। কেবল রাষ্ট্রনৈতিক ও অন্যবিধ দেশহিতকর কার্য্য করিবার জন্য স্বর্গীয় গোখ্‌লে মহোদয় পুনায় "ভারতসেবক-সমিতি" স্থাপন করেন। পরে ইহার শাখা অন্যত্রও স্থাপিত হইয়াছে ; কিন্তু বঙ্গে হয় নাই। পুনায় "দাক্ষিণাত্য শিক্ষাসমিতি" (Deccan Education Society) কর্তৃক স্থাপিত ফার্গাসন কলেজের (Fergusson College) মত কলেজ অন্য কোন প্রদেশে নাই। অধ্যাপন ইহার মত বা ইহা অপেক্ষাও ভাল অন্যত্র হইতে পারে। কিন্তু ইহার অধ্যাপকগণ সামান্য বেতনে (আগে মাসিক ৭৫৲ ছিল, এখন শুনিয়াছি ১০০৲ হইয়াছে) অন্যূন ২০ বৎসর কাজ করিবার ব্রত গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর টিলক ইহার অধ্যাপক ছিলেন ; স্বর্গীয় গোখলে ইহার অধ্যাপক ছিলেন ; ভারতের প্রথম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীনিয়র র‍্যাঙ্গলার শ্রীযুক্ত রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যে এইরূপ ব্রত লইয়া এই কলেজের অধ্যক্ষতা করিতেছেন।

অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কার্বে কর্তৃক স্থাপিত ও পরি-

চালিত পুনার হিন্দু বিধবাশ্রম বোম্বাই প্রদেশের অন্যতম সুকীর্ত্তি। এখানে বিধবাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া জীবিকা উপার্জ্জনে, এবং স্ত্রীশিক্ষা দান বা অন্যবিধ জনহিতকর কার্য্য সাধনে সমর্থ করা হয়। বিধবাদের বিবাহ দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য নহে। তাহার জন্য অন্য প্রতিষ্ঠান আছে। অধ্যাপক কার্বে কুমারীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মহিলা-বিদ্যালয় নামে আর-একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেখানে তাহাদের ভর্ত্তি হইবার সর্ত্ত এই যে তাহাদের অভিভাবকদিগকে এই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে তাহারা ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিবে; ন্যূনকল্পে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিতেই হইবে। বিধবাশ্রম ও মহিলা বিদ্যালয় এখন সম্মিলিত হইয়া "মহিলাশ্রম" নামে একটি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এই সম্মিলিত হিতকর প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষয়িত্রী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম্.এ উপাধিধারিণী হিন্দুমহিলা কুমারী কৃষ্ণাবাঈ ঠাকুর। মহিলাশ্রমের কার্য্য যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, তজ্জন্য অধ্যাপক কার্বে "নিষ্কামকর্ম্মমঠ" নামক একটি মণ্ডলী গঠন করিতেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত উপযুক্তসংখ্যক মহিলা এই মঠের কাজের জন্য পাওয়া যাইবে না, ততদিন পুরুষেরাও ইহাতে যোগ দিতে পারিবেন; নারীর সংখ্যা যথেষ্ট হইয়া গেলে আর পুরুষ সভ্য লওয়া আবশ্যক হইবে না। ইহার বর্ত্তমান সভ্যসংখ্যা ১৫; ১১জন নারী, ৪জন পুরুষ। ইহারা গৃহত্যাগী, সমাজত্যাগী, সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী নহেন। সংসারের, সমাজের নিষ্কাম সেবা করাই ইহাঁদের উদ্দেশ্য। সভ্যদিগকে নিম্নলিখিতরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হয়:—

(১) আমি আজ হইতে মঠের কাজে আমার জীবন উৎসর্গ করিব। (২) আমার সমুদয় শক্তি ইহাতে লাগাইব, এবং ব্যক্তিগত কোন লাভের চেষ্টা করিব না। (৩) মঠের নিয়মানুযায়ী অনুজ্ঞা অকুণ্ঠিত চিত্তে পালন করিব। (৪) আমার জীবন পবিত্র রাখিব। (৫) আমার ও আমার পোষ্যদিগের ভরণপোষণের জন্য সভ্যদের অধিকাংশের মতে যেরূপ ব্যবস্থা হইবে আমি প্রসন্নচিত্তে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব। (৬) আমার পোষাক চালচলন সাদাসিধা হইবে। (৭) অপরের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমি উদারতা অবলম্বন করিব, এবং অপরের সংস্কারে আঘাত লাগে এমন কিছু করিব না। (৮) আমি কাহাকেও ঘৃণাবিদ্বেষ করিব না।

"মহিলাশ্রম" নামক বিদ্যালয়টিতে সমুদয় ছাত্রীই বাস করেন। তাঁহাদের সংখ্যা ২০০। তন্মধ্যে ১০০ বিধবা।

অধ্যাপক কার্বের আশ্রম ও মঠের গৃহগুলিরই মূল্য এক লক্ষ দশ হাজার টাকা। তিনি সমাজসংস্কার-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে বলিয়াছেন যে এই বৎসর হইতে মহিলাশ্রমে দেশভাষাতে (মরাঠী বা গুজরাটীতে) নারীগণকে কলেজের সমান উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই শিক্ষালয় ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্রীয় নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারে। ইহার জন্য তিনি ইতিমধ্যেই চৌদ্দ হাজার টাকা দান পাইয়াছেন।

এখন ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে তথাকথিত পতিত, অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় লোকদের শিক্ষা ও উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে। বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত বিঠলরাম শিন্ধে কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "ডিপ্রেষ্ট ক্লাস্ মিশন" এইরূপ কার্য্য করেন। এই মিশনের মত বিস্তৃত বহুব্যয়সাধ্য সুশৃঙ্খল কাজ অন্য কোন প্রদেশে হয় না।

বোম্বাইয়ের সমাজসেবা-মণ্ডলীও (Social Service League) নানা প্রকারে নিরক্ষর দরিদ্র লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও মত্ততানিবারণ করিতেছেন, তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, সুনীতির সঞ্চার করিতেছেন, তাহাদিগকে ঋণমুক্ত হইতে ও অঋণী থাকিতে শিখাইতেছেন ও সাহায্য করিতেছেন, এবং উৎকৃষ্ট পুস্তকপাঠে অভ্যস্ত করিতেছেন। ইহার কার্য্য উৎসাহ ও শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে।

বোম্বাইয়ের সেবা-সদনে বালিকা ও নারীগণকে সাধারণ শিক্ষা, সেলাই প্রভৃতি শিল্প শিক্ষা এবং রোগীর শুশ্রূষা শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপে তাঁহারা নিজ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহে এবং সমাজের হিত সাধনে সমর্থ হন। সেবাসদন স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে মহোদয়ের পত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মীবাঈ রাণাড়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। কতকটা এইরূপ কার্য্য বোম্বাইয়ের এবং সুরাটের "বনিতা-বিশ্রাম" নামক প্রতিষ্ঠান দুটিতেও হয়।

পণ্ঢরপুরের অনাথালয়ে পিতৃমাতৃ-হীন বালকবালিকা এবং পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শিশুরা পালিত ও শিক্ষিত হয়।

এক একটি করিয়া পয়সা ভিক্ষা করিয়া সংগৃহীত "পয়সা-ফণ্ডে"র সাহায্যে তালেগাঁও নামক স্থানে একটি

কাচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে প্রস্তুত কাচের দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভ হইতেছে, এবং শিক্ষার্থীরা কাচের জিনিষের নির্ম্মাণ-প্রণালী শিখিতেছে।

এইরূপ আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বোম্বাইয়ের অধিকাংশ দেশ-হিতকর কার্য্যের প্রাণ নারীগণ। ইঁহাদের অধিকাংশই হিন্দু। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে নারীরা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকেন না। কি হিন্দু কি পার্সী সকলেই সর্ব্বত্র অবাধে যাতায়াত করিতে পারেন। এইজন্য সকল কাজে তাঁহাদের সাহস, স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভর ও উৎসাহ বেশী। কোন ভাল কাজ করিতে গেলে গাড়ীভাড়া দিতে দিতেই তাঁহাদিগকে হায়রান হইতে হয় না। জনহিতকর কার্য্যে বাংলাদেশ কখন বোম্বাইয়ের সমান হইতে পারিবে না, যদি এখানকার অবরোধপ্রথা দূরীভূত না হয়।

হোমরুল বা স্বরাজের যোগ্যতা।

ভারতবাসীদিগকে ইংলণ্ডের তত্ত্বাবধানে নিজের দেশের কাজ চালাইতে দেওয়া উচিত কি না, এবং যদি উচিত হয়, তাহা হইলে এখনই সেই ভার দিতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সেই ভার দেওয়া যায় কি না, তাহার আলোচনা কিছুদিন হইতে খবরের কাগজে হইতেছে। হোমরুললীগ কন্‌ফারেন্সে, কংগ্রেসে এবং মুস্‌লিম লীগেও এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। আমাদিগকে এইরূপ ভার দেওয়াই যে আদর্শ, সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যাইতেছে না। মতভেদ হইতেছে, কখন্ ভার দেওয়া যাইবে, সেই সময় সম্বন্ধে। অনেকে এই সময়টিকে সুদূর অনির্দ্দেশ্য ভবিষ্যতে স্থাপন করেন; কেহ বা বলেন, খুব দূর না হইলেও দূর বটে; অন্যেরা বলেন, ভার দিতে আরম্ভ এখনই করা উচিত; কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে সম্পূর্ণ-ভার দিবার আয়োজনও এখনই আরম্ভ হইতে পারে।

দেশের কাজ চালান মানে, বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করা, দেশে বিদ্রোহ বিপ্লব ডাকাতি না হইতে দিয়া শান্তি রক্ষা করা, জমীর খাজনা ধার্য্য আদায় ও খরচ করা, অন্যান্য ট্যাক্স ধার্য্য আদায় ও খরচ করা, আইন প্রণয়ন করা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার করা, সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা, রেল নদী খাল সাধারণ রাস্তা প্রভৃতিতে মানুষ চলাচল এবং পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানীর ব্যবস্থা করা, শিক্ষা ও উৎসাহ দিয়া কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির দ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি। এই সমস্ত বা অধিকাংশ কাজই অল্লাধিক পরিমাণে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদের সাহায্যে মোটামুটি ১৫০ বৎসর চালাইতেছেন। তাহার পূর্ব্বে মুসলমান-হিন্দু চালাইত, তাহারও পূর্ব্বে হিন্দুরা চালাইত। ব্রিটিশ আমলেও দেশের লোকেরা দেশের কাজের যে-কোন বিভাগে ঢুকিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহাতেই আপনাদের যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছে। শান্তির সময়ের কাজ, যুদ্ধের কাজ, কোনটাতেই তাহাদের সাহস, শ্রমশীলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, বুদ্ধিবিবেচনার অভাব লক্ষিত হয় নাই। সুতরাং তাহারা দেশের কাজ করিবার অযোগ্য, ইহা বলা যায় না। কথা উঠিতে পারে যে, এ সমস্ত কাজ এক বা একাধিক ইংরেজ কর্ত্তার পরিচালনাতে হয়। হয় বটে, কিন্তু সব কাজ নয়। স্বাধীনভাবেও কোন কোন কাজ করিবার যোগ্যতা দেশের লোক দেখাইয়াছে। তদ্ভিন্ন, তাহারা ইংরেজ প্রধান-কর্ম্মচারীর অধীন না থাকিয়া স্বয়ং কোন বড় কাজ চালাইতে পারে কি না, তাহার পরীক্ষাও ত বেশী পরিমাণে হয় নাই। সুতরাং যদিই বা ধরা যায়, যে, আমাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হয় নাই, তাহা হইলে ইহাও বলা উচিত যে আমাদের অযোগ্যতাও প্রমাণিত হয় নাই। এস্থলে ইংরেজ বলিতে পারেন, তোমরা যোগ্য হইলে বড় কাজের স্বাধীন ভার দিতাম। ইহা সত্য কথা নয়। একটা বিভাগ ধরুন। শিক্ষাবিভাগে দেশী লোক ইংরেজের চেয়ে কম যোগ্যতা দেখান নাই, কেহ কেহ সমুদয় ইংরেজ কর্ম্মচারীর চেয়ে বেশী যোগ্যতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এখানেও নূতন পাস্‌-করা ইংরেজ ছোকরা উচ্চতম বিভাগে কাজ পায়, কিন্তু খুব যোগ্য ভারতবাসীর ওরূপ কাজ পাইবার নিয়ম নাই; এক-আধ জনকে যে দেওয়া হয়, তাহা "পিত্তি রক্ষা"র জন্য। দেশশাসনের ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত দিতেছি। রমেশচন্দ্র দত্ত বা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত কি ছোটলাটদের চেয়ে যোগ্যতায় কম? কিন্তু ইঁহাদিগকে ছোট লাট করা হয় নাই।

আমরা যে কাজ করিতে পাইয়াছি, তাহাতেই আমাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা করিতে পাই নাই, তাহাতে যোগ্যতা বা অযোগ্যতা কিছুই প্রমাণ হয় না। আমাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হইলে তবে আমরা ভার পাইব, ইহা হাস্যকর কথা। তুমি আগে সাঁতার দিতে শিখ, তাহার পর জলে নামিয়া সাঁতার দিবার অধিকার পাইবে, এ কথা কোন বুদ্ধিমান্ লোকে বলে না, কেননা জলে নামিবার অধিকার না পাইলে, জলে নামিয়া সাঁতার দিতে না পাইলে সাঁতার শেখা যায় না। রাষ্ট্রীয় কাজের ভার না পাইলে রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইবার যোগ্যতা কেমন করিয়া জন্মিবে?

ইহা সোজা কথা যে, যে কাজের জন্য আমরা যোগ্য বলিয়া ইংরেজ স্বীকার করিবেন, তাহা আমাদিগকে দিতে হইবে। অর্থাৎ এক্ষণে যে কাজ করিয়া ইংরেজের অন্ন হইতেছে, তাহার সে কাজটি যাইবে। এই রূপে নিজের পায়ে কুঠার মারিয়া ইংরেজ আমাদের যোগ্যতা সহজে স্বীকার করিবেন, ইহা কি স্বাভাবিক? ইংরেজ মানুষ, ইংরেজ দেবতা নয়। অতএব যাঁহারা বলেন, তোমরা যোগ্য হইলে ভার পাইবে, বা ইংরেজ তোমাদিগকে যোগ্য বলেন না, অতএব তোমরা অযোগ্য, তাঁহারা অতি-বড় বুদ্ধিমান্, এমন মনে করা যায় না।

দেশের কাজ যে কি কি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এগুলির মধ্যে অতিনিগূঢ়রহস্যপূর্ণ, ভয়ঙ্কর জটিল, এমন কিছু নাই, যাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য এবং শক্তির অসাধ্য। ভারতবাসী জগতের লোককে এখনও ধর্ম্ম শিখাইতেছে, এখনও ভারতবাসী জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হইতেছে, এখনও ভারতবাসী জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের সমকক্ষ হইতেছে, এখনও ভারতবাসী কলকারখানা-স্থাপনে ও পণ্যদ্রব্য-উৎপাদনে অন্য দেশের লোকের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করিতেছে, এখনও ভারতবাসী সাম্রাজ্যের পার্লেমেণ্টে স্থান দখল করিতেছে, এখনও ভারতবাসী ভারত-সাম্রাজ্যের লণ্ডনস্থ ও দিল্লীসিমলাস্থিত মন্ত্রিসভাদ্বয়ে যোগ্যতার সহিত কাজ করিতেছে, এখনও ভারতবাসী যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তায় যে-কোন জাতীয় সৈনিকের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আপত্তি হইতে পারে যে, দৃষ্টান্তস্থানীয় লোকগুলি ব্যতিক্রমস্থল মাত্র; তাহারা স্বর্গ হইতে একেবারে ইউরোপ-আমেরিকাতেই জন্ম লইতে যাইতেছিল, হঠাৎ কোন কারণে পথ ভুলিয়া ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ইহা অতি হাস্যকর কথা। বৃক্ষলতাতৃণশূন্য যে-সব মরুভূমি আছে, তাহাদের মাঝ-খানে এক-একটি বনস্পতি দাঁড়াইয়া আছে, এইরূপই কি আমরা দেখি? অতি বিশাল বৃক্ষ খুঁজিবার জন্য আমরা কি মরুভূমিতে যাই? তা যাই না। যে অরণ্যে সহস্র সহস্র বৃহৎ বৃক্ষ আছে, সেইখানেই বৃহত্তম বৃক্ষ অন্বেষণ করি ও খুঁজিয়া পাই। মানবসমাজেও এইরূপই ঘটে। নিরক্ষর বর্ব্বর সাহিত্যিকপ্রতিভাশূন্য দেশে শেক্সপীয়র জন্মেন নাই। তাঁহার সময়ে আরও অনেক বড় কবি জন্মিয়া-ছিলেন; তিনি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাত্র। নেল্‌সন খুব বড় নৌসেনাপতি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কাছাকাছি যান এরূপ নৌসেনাপতিও অনেকে ছিলেন। আমাদের দেশ সৃষ্টি-ছাড়া নয়। এখানেও যাঁহারা নানা বিভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সমান, ঠিক্ সমান, হয়ত বা তাঁহাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, আরও অনেক লোক আছেন। তাঁহারাও কঠিন কঠিন কাজ করিবার সুযোগ পাইলে করিতে পারেন।

যদি কেহ বলেন যে দেশের কাজ চালাইবার যোগ্যতা বংশগত, তাহা হইলে বলি, আমরা যে-বংশে জন্মিয়াছি, সেই বংশের লোক ত হাজার হাজার বৎসর দেশের কাজ চালাইয়াছে। ভারতবর্ষে সাধারণতন্ত্র অনেক ছিল, ইউরোপের প্রাচীনতম গ্রীস্‌রোমের সাধারণতন্ত্রগুলি অপেক্ষা বড় বড় সাধারণতন্ত্র ছিল, ভারতবর্ষের হিন্দুরাজা ও সম্রাটদের মন্ত্রিসভা ছিল, ভারতবর্ষের অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, ধর্ম্মপাল, প্রভৃতি বড় বড় সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছেন, আবার নগরের গ্রামের কাজের সুব্যবস্থাও করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আকবর, আওরংজীব, শিবাজীও দেশের কাজ চালাইয়াছেন। আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল্লের রাজস্বসম্বন্ধীয় ব্যবস্থার অনুকরণ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। ভারতবর্ষের গ্রামগুলির কাজ স্মরণাতীত কাল হইতে নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া সাধারণ-তন্ত্রপ্রণালী-অনুসারে গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া

আসিতেছিল। ইংরেজের আমলে এই গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন-প্রণালী প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এখনও বড় বড় রাস্তা, বড় বড় খাল, বড় বড় জলাশয় আগেকার নৃপতিদের সুব্যবস্থা ও দেশহিতৈষণার পরিচয় দিতেছে। এখনও শুক্রনীতি, চাণক্যের অর্থশাস্ত্র, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী পূর্ব্বতন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির সর্ব্বাঙ্গীনতা ও উৎকর্ষের সাক্ষ্য দিতেছে। সুতরাং বংশ হিসাবে আমাদের অযোগ্যতা নাই।

একটা যুক্তি আছে, যে, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হয় ত যোগ্য ছিলেন, কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষ বিজিত হইয়াছে, তাহার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে ভারতবাসীরা স্বায়ত্তশাসনের অযোগ্য। বেশ কথা। ভারতবর্ষের সব প্রদেশ বিজিত না হইলেও, না-হয় ধরিয়া লইলাম যে ইহা বিজিত দেশ। কানাডা উপনিবেশের ফরাসী অধিবাসীরা ইংরেজ-কর্ত্তৃক ১৭৬৩ সালে বিজিত হইয়াছিল। ১৭৯১ সালে সেখানে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার পরেও অধিবাসীরা যে কখন বিদ্রোহ করে নাই, তাহাও নহে। বিদ্রোহীরাও পরাজিত হইয়াছে। তথাপি এখনও কানাডায় স্বায়ত্তশাসন আছে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ১৫ বৎসর আগে বুঅরেরা বিজিত হইয়াছে, এবং তাহার পরই তাহাদের দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আয়র্লণ্ড কয়েক শতাব্দী হইল বিজিত হইয়াছে। তথাপি তথাকার অধিবাসীদের নিজেদের পার্লেমেণ্ট ছিল। তাহারা মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ-চেষ্টা করিয়াছে, এবং পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লুপ্ত হয় নাই। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডকে গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে এক পার্লেমেণ্টের অধীন করা হয়। ঐ পার্লেমেণ্টে আইরিশরা বরাবরই বহুসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে। তাহারা শীঘ্রই হোমরুল (অর্থাৎ স্বরাজ) এবং নিজেদের পার্লেমেণ্ট পাইবে। এই দৃষ্টান্তগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস হইতে গৃহীত। এই ইতিহাসে আরও দৃষ্টান্ত আছে। নিউজীল্যাণ্ড নামক বৃটিশ উপনিবেশের নিজের পার্লেমেণ্ট আছে। উহার অসভ্য আদিম অধিবাসী মেওরীদের সংখ্যা ৫০,০০০ মাত্র। তাহারা চারিজন পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন করে। এই অধিকার তাহারা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছে।

আমেরিকা ১৭ বৎসর হইল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ জয় করে। গত ৯।১০ বৎসর হইতে অসভ্য ও অর্দ্ধ-সভ্য ফিলিপিনোরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করিতেছে। সার্বিয়া বহু শতাব্দী তুরস্কের অধীন ছিল। ১৮৭৮ সালে বার্লিনের সন্ধি অনুসারে ইউরোপের প্রবল খৃষ্টীয় জাতিদের সাহায্যে সে স্বাধীনতা পাইয়াছে, এবং উহার অধিবাসীরা নিজের দেশের কাজ যোগ্যতার সহিত চালাইতেছে। বুলগেরিয়ার ইতিহাসও এইরূপ। উহা বহু শতাব্দী তুরস্কের অধীন থাকিয়া ১৯০৮ সালে স্বাধীনতা পাইয়াছে, এবং তথাকার রাজা প্রজাতন্ত্র-প্রণালী অনুসারে দেশের কাজ চালাইতেছেন। বাহুল্যভয়ে আর বেশী দৃষ্টান্ত দিব না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বিজিত হইলেই কোন দেশের লোকদের দেশের কাজ চালাইবার অধিকার লুপ্ত হয় না, বা কাজ চালাইবার শক্তি অন্তর্হিত হয় না। ইহা ন্যায়সঙ্গতও বটে। একজন পালোআন আর-একজন পালোআনকে যদি কুস্তিতে হারাইয়া দেয়, তাহা হইলে এমন কোন দেশের আইন নাই, যে, জেতা পালোআন ও তাহার বংশধরেরা চিরকাল বিজিত পালোআন ও তাহার বংশধরদিগকে নিকৃষ্ট মনে করিবে এবং তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি ইচ্ছামত ভোগ দখল করিতে থাকিবে। বিজিত পালোআনের বংশে যোগ্য লোক জন্মিতে পারে, জেতার বংশে অযোগ্য লোক জন্মিতে পারে। এরূপ সর্ব্বদাই ঘটিয়াও থাকে।

বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাসেও দেখুন। বেল্‌জিয়ম স্বাধীন দেশ, নিজের কাজ নিজে চালাইতেছিল; এবং শিক্ষায়, বাণিজ্যে, শিল্পে খুব অগ্রসর হইয়াছিল। জার্ম্মেনী ঐ দেশ জয় করিয়াছে। কিন্তু ইংরেজ ফরাসী ও রুশীয়েরা মনে করিতেছেন না যে এই পরাজয়বশতঃ বেলজিয়মের স্বকার্য্যনির্ব্বাহের অধিকার ও ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে; বরং তাঁহারা জার্ম্মেনীকে পরাস্ত করিয়া আবার বেল্‌জিয়মকে স্বাধীন করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। পোল্যাণ্ডকে বহুকাল ধরিয়া রুশিয়া, জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রিয়া ভাগ করিয়া

লইয়া শাসন করিতেছে। এখন যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় পোলদিগকে নিজের নিজের দলে ও সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত রুশিয়া ও জার্মেনী সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে অঙ্গীকার করিয়াছে। বিজিত হইলেই যদি স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা ও অধিকার অন্তর্হিত হইত, তাহা হইলে হঠাৎ পোলরা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত না।

এখন কথা উঠিতে পারে, যে ভারতবর্ষে এত ধর্ম্মভেদ, শ্রেণীভেদ, জাতি-(race)-ভেদ, ভাষাভেদ, এখানে অন্যান্য স্বায়ত্তশাসক দেশের নজীর খাটিতে পারে না; তা ছাড়া দেশটাও খুব বড়। উত্তর এই যে, আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্র খুব বড় দেশ, রুশীয় সাম্রাজ্য খুব বড় দেশ; এবং এই উভয় বৃহৎ দেশেই নানা জাতির, নানা ধর্ম্মের, নানা ভাষাভাষী লোক বাস করে; কিন্তু উভয়েই স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত। তা ছাড়া নানা জাতির দ্বারা অধ্যুষিত নানা ভাষাভাষী অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতে, তুরস্কসাম্রাজ্যে ও স্বইট্‌জারল্যাণ্ডে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত।

এরূপ কথাও শুনা যায়, যে, প্রাচ্য দেশের লোকেরা আদিকাল হইতে স্বেচ্ছাচারী রাজার দ্বারা শাসিত হইতে অভ্যস্ত, তাহারা প্রজাতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে দেশের কাজ চালাইবার উপযুক্ত নয়, হইতেও পারে না। প্রথমতঃ, এই কথাটাই মিথ্যা যে সমুদয় প্রাচ্যদেশ চিরকাল স্বেচ্ছাচারী রাজাদের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনেক সাধারণতন্ত্র ছিল, এবং যেখানে রাজতন্ত্র ছিল, তথায়ও রাজারা মন্ত্রিসভার সাহায্যে ও পরামর্শ-অনুসারে দেশ শাসন করিতেন। গ্রামগুলির কাজ ত হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সব আমলেই সাধারণতন্ত্র-প্রণালী অনুসারে নির্ব্বাহিত হইত। আর যদি ইহা সত্যও হয় যে আমাদের দেশে আগে প্রজাতন্ত্রপ্রণালীর লেশমাত্রও ছিল না, তাহাতেই বা কি আসে যায়? পাশ্চাত্য যে-সব দেশে এখন প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রচলিত, তাহার সবগুলাতে বা কোনটাতেই কি কোন কালে রাজার ইচ্ছাই আইন ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল; ইতিহাস পড়িলেই তাহা দেখা যায়। তার পর, প্রাচ্য দেশের দৃষ্টান্ত দিতেছি। জাপানে মোটামুটি ৫০ বৎসর হইল সম্রাট্ স্বেচ্ছায় প্রজাদিগকে পার্লেমেণ্ট দ্বারা দেশের কার্য্যনির্ব্বাহের অধিকার দিয়াছেন। তাহারা কেমন সুন্দরভাবে কাজ চালাইতেছে, তাহার প্রমাণ শক্তিশালী জাতিসকলের মধ্যে জাপানের স্থানলাভে, এবং জাপানের শিক্ষা ও বাণিজ্যবিস্তারে পাওয়া যাইতেছে। পারস্যের লোকেরাও প্রজাতন্ত্রপ্রণালী স্থাপন করিয়াছে; কিন্তু রুশিয়া, ইংলণ্ড ও জার্মেনীর সে দেশে কাহার কিরূপ প্রভুত্ব ও বাণিজ্যিক সুবিধা থাকিবে, তদ্বিষয়ে সকলের সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়ায়, পারস্যে প্রজাতন্ত্রপ্রণালী-প্রবর্ত্তনের সুফল এ পর্য্যন্ত ফলিতে পায় নাই। ভবিষ্যতে কি হইবে বলা যায় না। চীনেও প্রজাতন্ত্রপ্রণালী চলিতেছে; যদিও আবার পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা আছে। যাহা হউক, প্রাচ্যজাতিদের প্রজাতন্ত্র-প্রণালী-অনুসারে দেশের কাজ চালাইবার যে কোন প্রকার স্বাভাবিক অযোগ্যতা নাই, তাহা জাপানের দৃষ্টান্তেই প্রমাণ হইতেছে। জাপান ৫০ বৎসরের স্বায়ত্তশাসনে আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছে, আর আমরা ১৫০ বৎসর ব্রিটিশ শাসনের পর স্বায়ত্তশাসনের প্রারম্ভিক অল্পস্বল্প অধিকারও পাইবার উপযুক্ত যদি বিবেচিত না হই, তাহা কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গৌরবের বিষয় হইবে?

ভারতের দেশীরাজ্যগুলির নৃপতি দেশী লোক, প্রধান মন্ত্রী দেশী লোক, প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী অধিকাংশ দেশী লোক। মহীশূর, বড়োদা, গোআলিয়র, ত্রিবাঙ্কুড়, প্রভৃতি রাজ্যের শাসনকার্য্য ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, বরং কোন কোন অংশে উৎকৃষ্ট; যেমন শিক্ষা ও শিল্পের উন্নতির চেষ্টা, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য সম্পাদন। এইসব দেশী রাজ্যের কাজ ত দেশী লোকেই চালাইতেছে? তাহাদেরই স্বধর্ম্মী, স্বজাতীয় লোকেরা ব্রিটিশ ভারতে এত অযোগ্য কেন বিবেচিত হয়? সত্য বটে, দেশী রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বাহ্য আক্রমণ হইতে এবং অন্তর্বিবাদ হইতে রক্ষার অঙ্গীকার করিয়া নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতবাসী আমরাও তো বলিতেছি না যে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এখনই লুপ্ত হউক? কংগ্রেস ও মুসলিম্‌লীগ উভয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এবং ঐ সাম্রাজ্যেরই শক্তির রক্ষণাবেক্ষণে ভারতবর্ষকে স্বশাসন-ক্ষমতা দিতে বলিতেছেন।

তা ছাড়া, ভারতবর্ষেরই একটি অংশ নেপাল স্বাধীনভাবে নিজের কাজ নিজে চালাইতেছে। কোনও ইংরেজ নেপালের রাজকর্ম্মচারী নহে। উহার রক্ষার ভারও ইংরেজের উপর নাই। সত্য বটে, ইউরোপের কোন শক্তিশালী জাতির বিরুদ্ধে নেপাল আত্মরক্ষা করিতে পারে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু বেল্‌জিয়ম্‌ও তো জার্মেনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না; ডেন্মার্ক, এবং হল্যাণ্ডও পারে না। কিন্তু তাহা দ্বারা বেল্‌জিয়ম্, হল্যাণ্ড, ও ডেন্মার্কের আত্মশাসন-ক্ষমতা বা অধিকার নাই, ইংরেজেরা কি এরূপ মনে করেন? না, সেরূপ মনে করা ন্যায়সঙ্গত?

এরূপ আপত্তি হইতে পারে, যে, দেশী রাজ্যগুলি ছোট; তাহার কাজ দেশী রাজা মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীরা চালাইতে পারে বলিয়া ভারতবর্ষের মত বড় দেশের কাজও চালাইতে পারিবে, এমন মনে করা উচিত নহে। কয়েকটি স্বশাসক ব্রিটিশ উপনিবেশের লোকসংখ্যা ও বিস্তৃতি এবং আমাদের কয়েকটি দেশী রাজ্যের বিস্তৃতি ও লোকসংখ্যা

দিতেছি। ছোট ছোট উপনিবেশের কাজ চালাইয়া যদি উপনিবেশিকেরা প্রমাণ করিয়া থাকে যে তাহারা স্বরাজের যোগ্য এবং সাম্রাজ্যশাসনে অংশী হইবার উপযুক্ত, তাহা হইলে ছোট ছোট রাজ্য চালাইয়া আমরা কেন স্বরাজের যোগ্য বিবেচিত হইব না, এবং সাম্রাজ্যিক কার্য্যে অংশীদার হইতে পারিব না?

দেশীয় রাজ্য	বিস্তৃতি বর্গমাইল	লোকসংখ্যা
গোআলিয়র	২৫১০৭	৩০,৯৩,০৮২
ত্রিবাঙ্কুড়	৭১২৯	৩৪,২৮,৯৭৫
বড়োদা	৮১৮২	২০,৩২,৭৯৮
মহীশূর	২৯,৪৫৯	৫৮,০৬,১৯৩
হায়দরাবাদ	৮২,৬৯৮	১,৩৩,৭৪,৬৭৬

ব্রিটিশ উপনিবেশ	বিস্তৃতি বর্গমাইল	লোকসংখ্যা
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	৪০,০০০	২,৪০,·০০
নিউজীল্যাণ্ড	১০৫,০০০	১০,৫০,০০০
নিউসাউথ ওএল্‌স্‌	৩১০,৪০০	১৬,৫০,০০০
ভিক্টোরিয়া	৮৮,০০০	১৩,২০,০০০
কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ড	৬৭০,৫০০	৬,০৬,০০০

ইউরোপের কোন কোন স্বাধীন দেশ ও জাতিও খুব বড় নয়; অথচ তাহাদের ক্ষুদ্রতা তাহাদের আত্মশাসন-ক্ষমতার অভাবের একটা প্রমাণ বলিয়া ইউরোপীয়েরা মনে করে না।

দেশ	বিস্তৃতি বর্গমাইল	লোকসংখ্যা
বেলজিয়ম	১১,৩৭৩	৭৫,৭১,৩৮৭
ডেন্‌মার্ক	১৫,৫৮২	২৭,৭৫,·৭৬
হল্যাণ্ড	১২,৫৮২	৬২,১২,৭০১
সুইট্‌জারল্যাণ্ড	১৫,৯৭৬	৩৮,৩১,২২০
মণ্টিনিগ্রো	৫,৬০৩	৫,১৬,০০০
সার্বিয়া	১৮,৬৫০	২৯,১১,০০১

ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন-প্রাপ্তির বিরোধী ইংরেজ ও ভারতবাসীরা বলেন,—"রোম একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই; ইংরেজ প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসক জাতি অনেক শতাব্দী ধরিয়া ক্রমে ক্রমে যে উৎকৃষ্ট প্রজাতন্ত্রপ্রণালী পাইয়াছেন ও গড়িয়াছেন, তাহা তোমরা একদিনের মধ্যেই চাও?" রোম একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই, ঠিক্। কিন্তু এখন যদি কেহ কোন দেশের একটী সুন্দর রাজধানী নূতন করিয়া গড়িতে চায়, তাহা হইলে তাহা গড়িতে কি রোম-নির্ম্মাণের মত ২০।২৫।৩০ শতাব্দী লাগে? পূর্ব্ববঙ্গের নূতন রাজধানী নূতন ঢাকা গড়িতে ক'বৎসর লাগিয়াছিল? নূতন দিল্লী ত ৪।৫ বৎসরেই নির্ম্মিত হইয়া যাইত, যদি মধ্যে ইউরোপের যুদ্ধরূপ ব্যাঘাত না ঘটিত। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া উন্নতি হইতে হইতে ষ্টীম এঞ্জিন বর্ত্তমান কার্য্যকারিতা ও উৎকর্ষ পাইয়াছে। এখন যদি কেহ ষ্টীম এঞ্জিন গড়িতে শিখিতে চায়, তাহা হইলে কি তাহার ২।৩ শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া ২।৩ শত বৎসর ধরিয়া ঐ কলটি গড়িতে শিখিতে হইবে? রসায়নের ও তাড়িত-বিজ্ঞানের বর্ত্তমান উন্নতি বহু বহু বৎসরের চেষ্টায় হইয়াছে। কিন্তু এখন রসায়নীবিদ্যা বা তাড়িত-বিজ্ঞান শিখিতে ৫।৭।১০ বৎসর মাত্র লাগে। ইউরোপের যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধাস্ত্রনির্ম্মাণবিদ্যা অনেক শতাব্দীর চেষ্টায় বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। কিন্তু জাপানীরা কি তাহা ৫।৭।১০ বৎসরেই শিখিয়া লইয়া কোন কোন স্থলে গুরুর শিক্ষক হইয়া বসিতেছে না? অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন জাপানের নূতন যুগ আরম্ভ হইল, তখন জাপান গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অনেক যুবক উন্নত আধুনিক প্রণালী অনুসারে দেশের কাজ চালাইতে শিখিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা গিয়াছিল। তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইতে কয়েক শতাব্দী লাগে নাই; ৫।৭।১০ বৎসরেই তাহারা যাহা কিছু জানিবার জানিয়া লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া অভিজ্ঞতার দ্বারা সেই জ্ঞান ও শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া স্বদেশকে বর্ত্তমান সমৃদ্ধ সভ্য ও শক্তিশালী অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে।

বাস্তবিক সকল দেশেই বড় বড় সেনাপতি, বড় বড় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, বড় বড় শাসনদক্ষ ব্যক্তি এইরূপ অল্প সময়েই শিক্ষা করে। শিশু যখন জন্মে, সে ইংলণ্ডেই জন্মুক, জাপানেই জন্মুক, আর ভারতবর্ষেই জন্মুক, সে অজ্ঞ থাকে। তাহার পর বয়োবৃদ্ধিসহকারে, কতক অজ্ঞাতসারে দেখিয়া শুনিয়া প্রতিবেশী সঙ্গী বন্ধুদের নিকট হইতে শিখে, কতক বাড়ীর লোকদের নিকট হইতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে শিখে, কতক শিক্ষালয়ে শিখে; শিক্ষা পূর্ণ হইতে থাকে কর্ম্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা দ্বারা। সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর শিশু পুত্রকেও গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হয়, আবার অতি দরিদ্র আরণ্যকুটীরবাসী আব্রাহাম লিঙ্কনকেও গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। স্বাধীন জাতির শিশু ও পরাধীন জাতির শিশুতে যে আকাশপাতাল প্রভেদ আছে মনে করা হয়, তাহা কাল্পনিক। সুযোগ পাইলে যে-কোন জাতির শিশুরা অন্য যে-কোন জাতিদের সমকক্ষ হইতে পারে। ভারতবর্ষীয় যে দু একজন লোক ভারত সাম্রাজ্যের লণ্ডনস্থ বা দিল্লীসিমলাস্থ মন্ত্রিসভায় স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারাও যাহা শিখিয়াছেন, নিজেরই জীবিতকালের মধ্যেই শিখিয়াছেন; তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভবিষ্যৎ বংশধরের শুভাদৃষ্ট আগে হইতে জানিয়া তাঁহার সুবিধার জন্য কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মন্ত্রিসভার সভ্যের উপযুক্ত জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিলেন, এবং সকলের সেই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান

তাঁহাদের বর্ত্তমান ভাগ্যবান্ বংশধর ২।১ জন পাইয়াছেন, একথা কেহই বলিবেন না। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এস্কুইথের পূর্ব্বপুরুষগণ ভবিষ্যদ্দর্শী ছিলেন, ভবিষ্যদৃষ্টি-বলে জানিয়াছিলেন যে এস্কুইথ প্রধান মন্ত্রী হইবেন, এবং তজ্জন্য পুরুষানুক্রমে রাষ্ট্রনীতি শিখিয়া ও সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে চালান করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রীবরকে যোগ্য করিয়াছেন, এরূপ আজগুবি অনুমান কেহ করে না। এস্কুইথ সাহেবকে অন্যান্য শিশুর মত অজ্ঞতা হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞ হইতে হইয়াছে। তিনি স্বাধীন দেশে জন্মিয়াছেন, সুযোগ পাইয়াছেন, উচ্চপদ ও দায়িত্ব লাভ করিয়াছেন। পরাধীন দেশে জন্মিলে তাঁহাকেও অযোগ্যতার অপবাদ সহ্য করিতে হইত। মানুষ যদি বংশানুক্রমে গুণ শক্তি ও অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী হইত, তাহা হইলে সমুদয় বা অন্ততঃ অধিকাংশ শক্তিশালী প্রতিভাশালী লোকের বংশধরেরা শক্তিশালী প্রতিভাশালী হইত, এবং অজ্ঞাতনামা লোকদের বংশে মহৎলোক জন্মিত না। কিন্তু প্রতিভা ও শক্তির আবির্ভাব এরূপ কোন নিয়ম মানে না। অতএব, ইংরেজেরা যাহাই মনে করুন, আমাদের স্বদেশবাসীগণ বিশ্বাস করুন যে আমরা আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই অর্থাৎ এক পুরুষেই সমস্তই শিখিতে পারি, এবং সমস্ত কঠিন কাজই করিতে পারি। এমন মানবীয় কোন ব্যাপার বা কাজ নাই যাহা এক পুরুষে (generation) শিখা যায় না। তাহার মত সুযোগ পাইতে বা করিয়া লইতে হইবে, তাহার মত ত্যাগস্বীকার পরিশ্রম এবং কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।

আমাদের দেশের শূদ্রেরা স্মরণাতীত কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে, যে, যদি তাহারা খুব পুণ্য করিতে থাকে, তাহা হইলে কয়েক জন্ম পরে তাহারা দ্বিজ হইতে পারিবে। কিন্তু এখন তাহারাও আর প্রতারিত হইতেছে না; অনেক জাতিই এখন দ্বিজত্বের ন্যায় দাবী করিতেছে। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে এই পুরাতন ফিকিরটা এ যুগে খাটিবে না। অনেক শতাব্দী যুগ বা পুরুষ ধরিয়া চেষ্টা করিলে তবে আমরা দেশের কাজ চালাইবার যোগ্য হইব, ইহা নিতান্তই বাজে কথা। ইহাতে যে ভুলে সে, শাস্ত্রের ভাষায়, "গোখরঃ"।

অন্যান্য প্রকারের যোগ্যতার মত দেশের কাজ চালাইবার যোগ্যতাও আপেক্ষিক; ইহার কোন একটি-মাত্র মাপকাটি নাই। সম্পূর্ণ যোগ্য, নিখুঁতভাবে যোগ্য, কোন জাতিই নয়। ইংরেজও স্বরাজের যোগ্য, আইরিশও স্বরাজের যোগ্য, জাপানীও স্বরাজের যোগ্য, আবিসীনিয়ার হাব্‌সীও স্বরাজের যোগ্য, নিগ্রো সাধারণতন্ত্র লাইবীরিয়ার নিগ্রোরাও যোগ্য," সার্ব্বও স্বরাজের যোগ্য, বুঅয়রও স্বরাজের যোগ্য, ফিলিপিনোও স্বরাজের যোগ্য, আফ্‌গানও স্বরাজের যোগ্য। কিন্তু সকলেরই দেশ কি সমান উন্নতি করিয়াছে, না সকলের ক্ষমতা সমান? কতটুকু ক্ষমতা থাকিলে কোন্ দেশের বা শ্রেণীর লোক রাষ্ট্রীয় অধিকারের যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে, তাহা বিধাতা স্থির করিয়া দেন নাই, কোন মানুষ বা জাতিও স্থির করিয়া দিতে পারে না। ইংরেজেরা মনে করেন যে তাঁহারা রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু তাঁহারা কি নিজের দেশের কাজ সব সময়ে যথেষ্ট দক্ষতার সহিত চালাইতে পারিয়াছেন? তাহা হইলে তাঁহাদের ইতিহাসে বিপ্লব, বিদ্রোহ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, রক্তপাত কেন দেখা যায়? বর্ত্তমান যুদ্ধের চালনাতেও কি তাঁহারা ভুল করেন নাই? এইরূপ ভুল প্রত্যেক স্বাধীন জাতি করিয়াছে ও করিতেছে। অতএব ভারতবাসীদের ভুল ভ্রান্তি হইবে, সুতরাং তাহাদিগকে কোন ক্ষমতা দিও না, এটা কথাই নয়। যে কখন ভুল করে নাই, সে কখন বড় কাজ করে নাই; যে শিশু কখন পড়ে নাই, সে চলিতে শিখে নাই। দেড়শত বৎসর ধরিয়া ত ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া আছেন; তাঁহারা দেশকে বাহিরের আক্রমণ হইতে এবং অন্তর্বিপ্লব হইতে রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কি ভারতবর্ষকে শিক্ষায় ঐশ্বর্য্যে স্বাস্থ্যে শক্তিতে নিকৃষ্টতম সভ্যদেশেরও সমান করিতে পারিয়াছেন? সভ্যদেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের মত নিরক্ষর দরিদ্র ব্যাধিপীড়িত বলহীন দেশ একটিও নাই। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যজন্তুর দ্বারা এত মানুষ ও গবাদির প্রাণনাশ, এবং ডাকাতের উপদ্রব ভারতবর্ষের মত কোন সভ্যদেশে নাই। আমেরিকা ১৭ বৎসরে ফিলিপিনোদিগকে শিক্ষায় যতটা অগ্রসর ও নীরোগ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তার এবং ম্যালেরিয়া আদি নিবারণ ততটা হয় নাই। ভারতবর্ষ স্বভাবতঃ দরিদ্র, তাহা বলিবার জো নাই। কেননা, তাহা হইলে পৃথিবীর নানা জাতি প্রাচীনকাল হইতে এবং তৎপরে খৃষ্টীয় ষোড়শশতাব্দী হইতে ভারতবর্ষের বাণিজ্য একচেটিয়া করিতে বা তাহাতে ভাগ বসাইতে এত চেষ্টা করিত না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রাণ ও সম্পত্তি নাশের বিষয়ে অভয়, সমৃদ্ধি, শক্তি, এই পাঁচটি কষ্টিপাথরে আপনাদের যোগ্যতা কষিয়া বলুন, ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা দেশের কাজ চালাইতে কি পরিমাণে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। অথচ তাঁহারাই উচ্চৈঃস্বরে ভারতবাসীদের অযোগ্যতা ঘোষণা করেন।

অনেক ছোট ছোট কথা বলিয়া আমাদের দেশেরই অনেক লোক এবং অনেক বিদেশী আমাদের যোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। বলেন, এ দেশের লোক বড় অসৎ ঘুসখোর. ইত্যাদি। তহবিল তসরূপ করা, টাকা চুরি করা,

ঘুস খাওয়া বড় খারাপ, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আপত্তি-কারীরা এমন একটিও সুসভ্য দেশের নাম করিতে পারেন কি যেখানে স্বায়ত্তশাসনের যুগের মধ্যেই খুব ছোট কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া উঁচু কর্ম্মচারীদের মধ্যে এই সব দোষ অল্পাধিক পরিমাণে দেখা যায় নাই? এদেশেও ইংরেজ-শাসনের সময়ে ইংরেজ ও দেশী চোর ও ঘুসখোর কর্ম্মচারী আগেও ছিল, এখনও আছে। ইংরেজ কর্ম্মচারীরা কোম্পানীর আমলে প্রথম অবস্থায় ভয়ঙ্কর চোর ও ঘুসখোর ছিল। তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় সেই দুর্নীতির ক্রমশঃ প্রতিকার হইয়াছে।

দেশে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার প্রাধান্য আর একটি আপত্তি। কিন্তু সাইমন ডি মণ্টফোর্টের পার্লেমেণ্টের সময়ে ও তৎপরেও ইংলণ্ডে যতটা শিক্ষার বিস্তার হইয়াছিল, ভারতবর্ষে এখন তাহা অপেক্ষা শিক্ষার বিস্তার কম নহে। আর, এ আপত্তিখণ্ডন ত রাজপুরুষেরা সহজেই করিতে পারেন। তাঁহারাই ত গোখলের সার্ব্বজনিক শিক্ষা আইন পাস্ হইতে দিলেন না। তা ছাড়া, লিখিতে পড়িতে না জানিলে লোকে দশজনে মিলিয়া কোন কাজই চালাইতে পারে না, ইহাও ঠিক্ নয়। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে প্রত্যেক জাতির সামাজিক কাজ অধিকাংশের মতে পঞ্চায়েতের দ্বারা হইয়া আসিতেছে; গ্রামের কাজও সাধারণতন্ত্রের মত প্রণালীতে অধিকাংশের মতে হইত। ইহাতে নিরক্ষর ও অক্ষরজ্ঞের কোন অধিকারবৈষম্য ছিল না, অথচ কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত চলিয়া আসিয়াছে।

ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যিক এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির কাজ ইংরেজীতে হয়; অথচ গবর্ণমেণ্ট এই-সব ব্যবস্থাপক সভায় বরাবর এমন কোন কোন লোককে সভ্য মনোনীত করিয়া আসিতেছেন, যাঁহারা ইংরেজীর একটি বর্ণও জানেন না। যে-সকল ইংরেজ রাজপুরুষ এইরূপ লোক নির্ব্বাচন করেন, তাঁহাদের মুখে অধিকাংশ ভারতবাসীর নিরক্ষরতামূলক আপত্তি শোভা পায় না।

আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা দিবার বিরুদ্ধে ইংরেজদের দুই একটি চূড়ান্ত আপত্তি আছে। তাঁহারা বলেন, "আমরা যদি চলিয়া যাই, তাহা হইলে ত তোমরা দেশ রক্ষা করিতে পারিবে না; আবার আর কোন একটা প্রবল জাতি আসিয়া দেশ দখল করিবে, এবং তোমাদের কত দুরবস্থা হইবে।" আমরা বলি, ইংরেজরা এদেশে আসিবার আগে দেশের লোক যে পরিমাণে আত্মরক্ষায় সমর্থ ছিল, এখন সে পরিমাণে সমর্থ নহে; ইংরেজদের আগমনের আগে, এবং তাঁহাদের রাজত্বের প্রথম অবস্থায় যে যে প্রদেশের যত জাতি সৈন্য হইতে পাইত, এখন তত পারে না;—দেশের এই যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য আমরা দায়ী না গবর্ণমেণ্ট দায়ী? আমরা যদি আত্মরক্ষায় সমর্থ না হই, আমাদিগকে অস্ত্র দিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া সমর্থ করা গবর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য। এমন সময় আসিতে পারে, যখন আমাদিগকে যুদ্ধশিক্ষা না দেওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হইবে। তাহার পর, ইংরেজরা আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমাদিগকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছেন, ইহা সত্য নয়। তাঁহারা প্রধানতঃ নিজেদের সাম্রাজ্য, চাকরী, ও বাণিজ্য রক্ষার জন্য দেশ রক্ষা করিতেছেন; আমাদের যাহা উপকার হইতেছে, তাহা আনুষঙ্গিক ও গৌণফল। তাঁহারা যদি তাঁহাদের সাম্রাজ্য, মোটামোটা বেতনের চাকরী, এবং কোটি কোটি টাকার বাণিজ্যের মায়া কাটাইতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের প্রতি দয়া নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতে পারিবে না। তাঁহারা যদি চলিয়া যান, তাহা হইলে ভারতবাসীকে অগত্যা হয় আত্মরক্ষা করিতে হইবে, নয় আবার পরপদানত, এবং সম্ভবতঃ অত্যাচরিতও হইতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরেজ ও ভারতবাসীর ছাড়াছাড়িতে, উভয় পক্ষেরই দুর্গতির সম্ভাবনা আছে, সুতরাং দুর্ভাবনার কারণও আছে; ইহা ইংরেজরা বুঝেন কি না তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমরা বুঝি, এবং দুর্গতি সহ্য করা আমাদের অভ্যাস আছে। সুতরাং অবিচলিত চিত্তে নিষ্পন্দ দৃষ্টিতে বিধাতার কঠোরতম ন্যায্যবিধানেরও সম্মুখীন হইতে পারা আমাদের উচিত। সৌভাগ্যশালী ইংরেজ জাতি তাহা পারেন কি না, ভাবিয়া দেখিবেন।

ইংরেজরা আমাদিগকে আরও ভয় দেখান যে আমরা চলিয়া গেলে তোমরা নিজেদের মধ্যেই কাটাকাটি মারামারি করিয়া মরিবে। ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি যে সময়ে ভারতবর্ষে প্রাধান্যের জন্যে লড়িতেছিলেন, তখন ভারতবর্ষে বড় অরাজকতা ছিল, কাটাকাটি মারামারি ছিল; কিন্তু এইরূপ অবস্থা পূর্ব্বে ইউরোপের সব দেশেই কোন না কোন যুগে ছিল। তাহার পর লোকেরা পরস্পর সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছিল, এখন কিন্তু গত ৩।৪ বৎসর হইতে প্রথমে বল্কান রাজ্যগুলির মধ্যে, তারপর বড় বড় জাতির মধ্যে, আবার কুরুক্ষেত্র বাধিয়াছে। শান্তির সময়েও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নারী ও পুরুষ রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং বাণিজ্য ব্যবসায় মজুরী লইয়াও যত দাঙ্গা হাঙ্গামা করে, আমাদের দেশের লোকে সেরূপ করে না। সুতরাং কাটাকাটি মারামারি আমরাই করি, ইউরোপের লোকেরা করে না, বা তাহারা থাকিলে কাটাকাটি মারামারি হইতে পায় না, অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস এরূপ বলিতেছে না।

আমরা বলিয়াছি যে ইংরেজ-প্রাধান্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়ে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষে

অরাজকতা ও অশান্তি ছিল। কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের মামুলী বা চিরন্তন অবস্থা ছিল না; ইহা ভারতবাসীদের প্রকৃত চরিত্রেরও পরিচায়ক নহে। তাহারা শান্তিপ্রিয়। অরাজক অশান্তিময় দেশ ধনধান্যে সমৃদ্ধ ও সভ্য হয় না। ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ দেশ ছিল বলিয়াই ইউরোপীয় জাতিরা এখানে প্রথমে দলে দলে বণিকবেশে আসিয়াছিলেন। ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে কোম্পানির আমলের একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ইংরেজ যোদ্ধা ও শাসনকর্ত্তা সার্ টমাস মানরো (Sir Thomas Munro) উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে লিখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে সভ্যতার আমদানী রপ্তানী হইলে ইংলণ্ড will gain by the import cargo; অর্থাৎ ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে যতটা সভ্যতা দিতে পারিবে, ভারতবর্ষ তার চেয়ে বেশী সভ্যতা ইংলণ্ডে চালান করিতে পারিবে। এখন যদি অবস্থা বিপরীত হইয়া থাকে, তাহার জন্য একমাত্র আমরাই দায়ী নহি।

যাক্ সে কথা। আমরা বলিতেছিলাম, ইংরেজেরা আসার পর অরাজকতা দূর হইয়াছে, এবং অশান্তিও মোটের উপর কমিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা না আসিলেও কালে আমরা নিজেদের মধ্যে, আপোষে, একটা বন্দোবস্ত করিয়া ঘরকন্না করিতে পারিতাম; এ অভ্যাসটা আমাদের ছিল, এবং তাহারই ফলে ইউরোপীয় জাতিদের লোভনীয় অতুল সম্পত্তি ভারতে সঞ্চিত হইয়াছিল, এবং ভারত সভ্য হইয়াছিল। এই অভ্যাসের ফলে এখনও দেশীরাজ্যসকলে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া ও তদ্রূপ অন্যান্য দাঙ্গা হাঙ্গামা ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা কম হয়; কারণ, যাহারা নিজেই ফলভাগী ও দায়ী, তাহারা হয় ঝগড়া করে না, কিম্বা ঝগড়া যত শীঘ্র সম্ভব মিটাইয়া ফেলে; ঝগড়া তৃতীয় পক্ষের হাতে গিয়া পড়িলে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের দায়িত্ব-বোধ কমিয়া যায়, এবং যাহারা ঝগড়ার ফল ভুগে তাহাদের কর্তৃত্ব থাকিলে ঝগড়া না করিতে বা তাহা মিটাইতে তাহারা স্বভাবতঃ যত উৎসুক হইবে, বিবাদভঞ্জন-কার্য্যে নির্লিপ্ত অ-ফলভোগী তৃতীয় পক্ষের ততটা উৎসুক হওয়া স্বাভাবিক নয়। কেননা, তৃতীয় পক্ষ যেমন দানব নহেন, তেমনি দেবতাও নহেন,—মানুষ।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ।

বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যের জন্য বাঁকুড়া-সম্মিলনীর কোষাধ্যক্ষরূপে প্রবাসী-সম্পাদকের হাতে ২৭শে পৌষ পর্য্যন্ত যত টাকা আসিয়াছে, তাহা প্রবাসী-বিজ্ঞাপনীতে স্বীকৃত হইল। দয়ালু দাতাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক এখনও ৬।৭ মাস সাহায্য দিতে হইবে। শীতের জন্য, মনে রাখিবেন, এখনই লোকের খুব কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। পরে আরও বাড়িবে। যাঁহারা অনশন-পীড়িত স্থানগুলিতে কাজ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এই কথা বলিতেছেন।

"আলো ও ছায়া" প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা কামিনী রায় মহোদয়া পুরুলিয়া হইতে ৫০্টি টাকা পাঠাইয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার এক প্রতিবেশীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা "একলব্য" অভিনয় করিয়া এবং কিছু চাঁদা তুলিয়া এই ৫০্ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল।

শান্তিনিকেতনের বালক ও অধ্যাপকগণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শিক্ষা অনুসারে এই মাঘমাসে "ফাল্গুনী"র অভিনয় করিবেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথও অভিনয় করিবেন। দর্শক ও শ্রোতাদের নিকট হইতে যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভিক্ষ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের তোলা একটি ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন। তাঁহার পত্র পড়িয়া ও ঐ ফোটোগ্রাফ দেখিয়া এই ধারণা হয় যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে লোকে এখনও অন্নাভাবে ও বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাইতেছে। যিনি যাহা পারেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ত্রিপুরা) ঠিকানায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলে অনেক দুঃখীর উপকার হইবে।

মুখপত্রের রঙীন ছবি।

বর্ত্তমান সংখ্যার প্রথম রঙীন ছবিটির বিষয়, সীতার লক্ষ্মণভর্ৎসনা। রামচন্দ্র যখন মায়ামৃগ-বধে গিয়াছিলেন, তখন মারীচের "ভাই লক্ষ্মণ, মরি রে," ক্রন্দন শুনিয়া সীতা রামচন্দ্রের সাহায্যার্থ দেবরকে যাইতে বলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সীতা তাঁহাকে তিরস্কার করেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মোহ।

অভ্যস্ত ছিল। আমেরিকা কর্তৃক দ্বীপগুলি বিজিত হইবার পরও তাহারা নরবলি দিয়াছে, সম্ভবতঃ এখনও দেয়।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফিলিপিনোরা স্পেনের অধীন ছিল। তাহাদের দেশভাষায় লিখিত কোন সাহিত্য নাই। স্পেনীয় ভাষায় লিখিত কিছু সাহিত্য আছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমেরিকানরা ফিলিপাইন জয় ও অধিকার করে। তখন তথায় সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৯৯ সালের মে মাসে তাহার পরিবর্ত্তে সিবিল অর্থাৎ শান্তির সময়ের উপযোগী শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার ক্রমোন্নতি হইতে হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অর্থাৎ বিজিত হইবার পর নয় বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধসভ্য ও অসভ্য ফিলিপিনোরা স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিয়াছে। তাহাদের দেশ ফিলিপাইন কমিশন এবং ফিলিপাইন-প্রতিনিধি-সভা দ্বারা শাসিত হয়। গবর্ণর-জেনারেল এবং আটজন কমিশনারকে লইয়া ফিলিপাইন-কমিশন গঠিত হয়। গবর্ণর জেনারেল আমেরিকা হইতে নিযুক্ত হইয়া আসেন। ফিলিপাইন কমিশনের আটজন কমিশনারের মধ্যে ৫ জন ফিলিপিনো এবং ৩ জন আমেরিকান। আমাদের বড়লাটের মন্ত্রিসভার আটজন সভ্যের মধ্যে একজন ভারতীয় এবং সাতজন ইংরেজ। ফিলিপাইন প্রতিনিধিসভার ৮০ জন সভ্যের মধ্যে প্রত্যেকেই জনসাধারণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। ভারতবর্ষের বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার ৬৪ জন সভ্যের মধ্যে কেবলমাত্র ২৪ জন দেশবাসী কর্তৃক নির্ব্বাচিত হয়; তাহাও এরূপভাবে যে এই নির্ব্বাচনে দেশের মতের প্রভাব খুব কম লক্ষিত হয়।

সমুদয় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ৩৬টি প্রদেশে, এবং আরো কয়েকটি ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রদেশের গবর্ণর দেশবাসীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। সমুদয় সহরগুলির কাজ মিউনিসিপালিটি দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। মিউনিসিপালিটির সভাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় কর্ম্মচারী এবং সহরবাসীদের প্রত্যেক প্রতিনিধি নাগরিকেরা নির্ব্বাচন করে।

আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভা দুই অংশে বিভক্ত, সেনেট এবং প্রতিনিধিমণ্ডলী। বর্ত্তমান ফেব্রুয়ারী মাসে সেনেটে একটি প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে যে দুই বৎসর পরে এবং চারি বৎসরের মধ্যে সম্মিলিতরাষ্ট্র ফিলিপিনোদিগের উপর প্রভুত্ব ত্যাগ করিবেন ও তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিবেন। প্রতিনিধিমণ্ডলী কর্তৃক ইহা মঞ্জুর হইলেই ফিলিপিনোরা ৪ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে। আমেরিকানরা অনেক দিন হইতে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিবার অঙ্গীকার করিয়া আসিতেছে। তাহাদের ব্যবস্থাপক সভার এক অংশে ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীন করিবার প্রস্তাব ধার্য্য হইয়া গিয়াছে। আমেরিকানরা শিক্ষার বিস্তার ও অন্যান্য উপায়ে ফিলিপিনোদিগকে ক্রমে ক্রমে স্বদেশের কার্য্যনির্ব্বাহে সমর্থ করিয়া আসিতেছে। তাহাতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ক্রমশঃ আমেরিকান সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস এবং ফিলিপিনো কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। উচ্চতম সমুদয় পদেও এখন ফিলিপিনোদিগের সংখ্যা বেশী। যদি চারি বৎসরের মধ্যে আমেরিকা ফিলিপাইনের উপর প্রভুত্ব ত্যাগ করে, এবং এরূপ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে ফিলিপিনোরা বিজিত হইবার ২১ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধ না করিয়া স্বাধীনতা পাইবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বিজেতা কোন জাতি স্বেচ্ছায় বিজিত কোন জাতিকে এপর্য্যন্ত স্বাধীন করিয়া দেয় নাই। শ্বেতবর্ণ বিজেতা অশ্বেতবর্ণ বিজিতদিগকে ত স্বাধীন করিয়া দেয়ই নাই। সুতরাং ফিলিপিনোরা যখন স্বাধীনতা লাভ করিবে, তখন উহা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় অভূতপূর্ব্ব ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইবে, এবং অন্যান্য বিজেতা বা প্রভুজাতিদের অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে।

ব্রিটিস সাম্রাজ্যে অসভ্যজাতির মধ্যে স্বরাজ।

প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অংশের মধ্যস্থলে গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ এবং এলিস্ দ্বীপপুঞ্জ নামক দুটি দ্বীপপুঞ্জ আছে। প্রথমটির বিস্তৃতি ১৬৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩০,০০০। দ্বিতীয়টির আয়তন ১৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২৪০০। এই দ্বীপগুলি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড নিজের রক্ষণাধীন করিয়া লয়েন। গত বৎসর (১৯১৫) ২ই নবেম্বর ব্রিটিশরাজ তাহাদিগকে তাহাদের অধিবাসীদিগের ইচ্ছা-ও সম্মতিক্রমে ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছেন।

এই অসভ্য লোকগুলি প্রায় সর্ব্বদাই নগ্ন থাকে, কিন্তু মাথায় পেণ্ডেনাসগাছের পাতার টুপি পরে। তাহারা খুব যুদ্ধ করিতে পারে। যুদ্ধের সময় নারিকেল ছোবড়ার দড়ি-নির্ম্মিত বর্ম্ম পরিধান করে। হাঙ্গরের দাঁতের নির্ম্মিত একপ্রকার তলোআর তাহাদের প্রধান অস্ত্র। এই অসভ্যেরা স্বরাজ লাভ করিয়াছে। ইউনাইটেড এম্পায়ার (United Empire) নামক বিলাতী মাসিকপত্রে লিখিত হইয়াছে :—

To-day a state of Home Rule exists which is probably unique among native races under the protection of the British Crown. With their own code of native laws, revised and amended by a King's Regulation, the people are wisely and justly ruled by their own councils of chiefs and elders under the advice and guidance of the few European officials who assist the Resident Commissioner as administrative officers in charge of a number of islands.

"এখন এখানে বৃটিশরাজের রক্ষণাধীনে স্বরাজ বিদ্যমান। অশ্বেত জাতিদের মধ্যে এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। এখানকার লোকেরা তাহাদের নিজের দেশী আইন অনুসারে তাহাদের নিজের রাজা ও প্রধানদের সমিতিকর্ত্তৃক ন্যায়পরায়ণতা ও বিজ্ঞতার সহিত শাসিত হয়। দেশী আইন ব্রিটিশরাজের একটি রেগুলেশ্যন দ্বারা কিছু সংশোধিত হইয়াছে, এবং দেশী শাসনকর্ত্তারা অল্প-সংখ্যক ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়া থাকে।"

ভারতবাসীরা সভ্য কিম্বা অসভ্য, বলা যায় না। তবে ইহা ঠিক্ যে তাহারা নগ্ন থাকে না, পাতার টুপি পরে না, যুদ্ধে নারিকেল ছোবড়ার বর্ম্ম পরে না, বা হাঙ্গরের দাঁতের তলোআর ব্যবহার করে না। সভ্য হইলে মানুষ স্বরাজের যোগ্য বা অযোগ্য হয়, বলা কঠিন। যদি অসভ্য হইলে মানুষ স্বরাজের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীরা তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হইয়া একবার গিলবার্ট ও এলিস্ দ্বীপবাসীদের মত হইতে চেষ্টা করিয়া দেখুন না? সব রকম চেষ্টাই করিয়া দেখা ভাল। তাহা হইলে কোন আপসোস থকে না। ভারতবাসীদের স্বরাজলাভের বিরুদ্ধে ইংরেজেরা যত প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা প্রবাসী ও মডার্ণ-রিভিউ কাগজ দুখানিতে তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এখন যদি তাঁহারা এই আপত্তি করিয়া বসেন যে তোমরা গিলবার্ট ও এলিস্ দ্বীপবাসীদের মত দিগম্বর নও, সুতরাং স্বরাজ পাইতে পার না, তাহা হইলে আমাদিগকে একেবারে নিরুত্তর হইতে হইবে। অতএব, স্বদেশবাসীদের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিব কি, যে, তাঁহারা আমাদিগকে এই শেষ ও প্রবলতম আপত্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ করুন, তাঁহারা বর্ব্বর অবস্থায় পিছাইয়া যাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করুন? তাহাও যে বিপজ্জনক।

কনিষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক গবেষক।

ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা খুব অল্পই হইতেছে। অতি অল্পসংখ্যক প্রতিভাশালী ব্যক্তি ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও প্রতিভা দ্বারা জগতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছেন

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এস্‌সী।

বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের মত বৃহৎ, বহুজনাকীর্ণ ও প্রাচীন-সভ্যতাগৌরবমণ্ডিত দেশের পক্ষে তাহা অতি সামান্য। তাহা হইলেও নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। বরং আশার কারণ অনেক আছে।

কোন দেশে কোন যুগে মানুষ যাহা করিয়াছে, অন্য দেশে অন্য যুগেও মানুষ তাহার মত কাজ করিতে পারে। প্রতিভা ও শক্তি কোন দেশে, কালে বা জাতিতে আবদ্ধ নহে। আজ যে জাতি অসভ্য বা দুর্ব্বল বা প্রতিভাহীন বলিয়া পরিগণিত, কাল সে সভ্য, শক্তিমান্ ও প্রতিভাশালী হইতে পারে। এরূপ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বরাবর ঘটিয়া আসিতেছে, এখনও ঘটিতেছে। এখন বিজ্ঞানে যে-সব জাতি উন্নততম, তাহারা ঐতিহাসিক যুগেই নগ্নচিত্রিতদেহ বর্ব্বর ছিল; প্রাগৈতিহাসিক যুগে ত সকলেই বর্ব্বর ছিল। অতএব আমরা যে বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করিতে পারি তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এম্‌-এস্‌সী।

যে জাতির লোক এক সময়ে সভ্যতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের বংশধরদের ত আশান্বিত হইবার অধিকতর কারণ আছে। ভারতবর্ষের লোকেরা প্রাচীন কালেও সভ্য ছিল, এবং জ্ঞানে অগ্রণী ছিল। বিজ্ঞানেও তাহারা উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং আমাদের পক্ষে আশান্বিত হওয়া অযৌক্তিক নহে।

যে জাতি বর্ত্তমান সময়েই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সিদ্ধি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাদের আশা করিবার কারণ আরো বেশী। আমাদের মধ্যে যদি কেবল ২।১ জন বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকই থাকিতেন, তাহা হইলে শত্রুপক্ষ তাঁহাদিগকে ব্যতিক্রমস্থল মনে করিলেও আমরা তাহা মনে করিতাম না; এবং সেরূপ মনে না করা বিন্দু-মাত্রও অযৌক্তিক হইত না। কিন্তু ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষকদিগের মধ্যে এখন যেমন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আছেন, তেমনি প্রৌঢ় এবং যুবকও আছেন। আমরা যতদূর জানি, গবেষকদিগের মধ্যে যাঁহাদের পারদর্শিতা বিদেশেও স্বীকৃত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান্ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এম্‌-এস্‌সী, ও শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এস্‌সী কনিষ্ঠতম। ইঁহাদিগকে বালক বলিলেও চলে; কিন্তু ইতিমধ্যেই ইঁহারা অনেক রাসায়নিক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণা আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নেলে প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি তাঁহারা তাঁহাদের গুরু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অপেক্ষাও কৃতী ও যশস্বী হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিবেন। অল্প বয়সে সিদ্ধি ও প্রশংসা লাভ করিয়া কাহারও কাহারও মাথা খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা বাস্তবিকই বুদ্ধিমান ও বিবেচক, তাঁহারা কখন ভুলিয়া যান না যে মনস্বীশ্রেষ্ঠ নিউটনও বলিয়াছিলেন যে তিনি অপার জ্ঞানজলধির তীরে উপলখণ্ডমাত্র আহরণ করিতেছেন।

সভ্যতার সোপান।

জাপান যখন রুশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করে তখন একজন বিখ্যাত জাপানী লেখক বলিয়াছিলেন, "আমরা অনেকদিন হইতে সুকুমার শিল্পে, ব্যাবহারিক শিল্পে, এবং সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গে অনেক উন্নতি করিয়া আসিতেছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জাতিরা আমাদিগকে সভ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু যাই আমরা যুদ্ধে কতকগুলা মানুষ মারিলাম, যাই একটা প্রবল পাশ্চাত্য জাতিকে পরাজিত করিলাম, অমনি আমরা ইউরোপের চক্ষে সভ্য হইয়া গেলাম!"

বাস্তবিক যুদ্ধে জয়লাভ এখন পর্য্যন্ত উন্নত জাতির

প্রধান লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইয়া রহিয়াছে। তাই পাক্‌ (Puck) নামক সচিত্র ব্যঙ্গ-পত্রে সভ্যতার সিঁড়ি নামক একটি বিদ্রূপের ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সিঁড়ির সর্ব্বনিম্ন ধাপ লগুড়, এবং সর্ব্বোপরি আছে বিষাক্ত ক্লোরীন্ গ্যাস। এই সিঁড়ির সাহায্যে সভ্য পাশ্চাত্য জাতিরা সভ্যতার আদর্শে উপনীত হইবার আশা করিতেছেন।
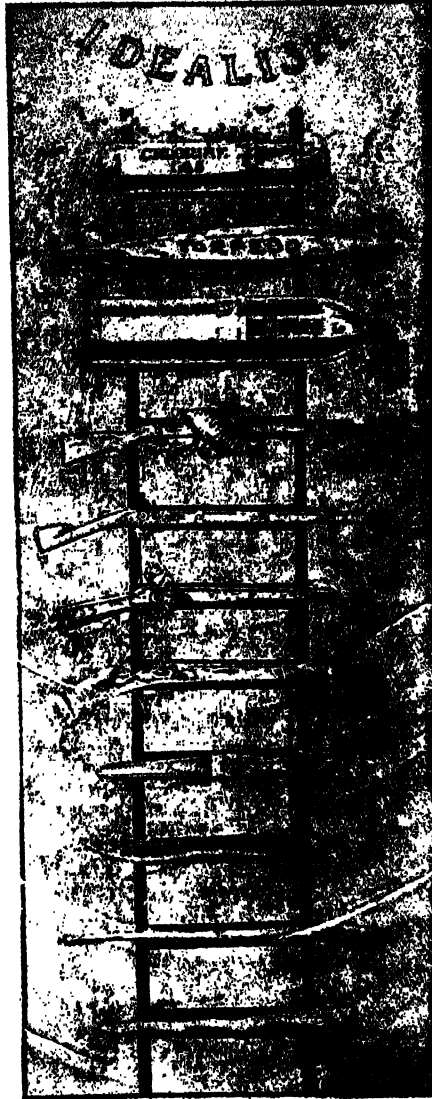
যুদ্ধে যেরূপ নেতৃত্ব, নেতার আজ্ঞাধীনতা, দল বাঁধিবার ক্ষমতা, দৈহিক বল, সাহস, ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা অস্ত্র নির্ম্মাণের ক্ষমতার আবশ্যক হয়, উহাতে ভবিষ্যৎ সর্ব্ববিধ বিপদ ও সঙ্কট হইতে উদ্ধারের যেরূপ ব্যবস্থা আগে হইতে অনুমান করিয়া করিতে হয়, তাহাতে রণকৌশল ও রণদক্ষতা যে একপ্রকার উৎকর্ষের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্তর্জ্জাতিক ডাকাতির জন্য যুদ্ধ করা বর্ব্বরতা মাত্র। স্বদেশরক্ষা, এবং দুর্ব্বলের রক্ষা এবং নিজের ও অপরের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ সভ্যতা-সঙ্গত।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যাহ্নে আহারের ব্যবস্থা

কয়েক মাস পূর্ব্বে বড়োদার মহারাজা গাইকওয়াড় তাঁহার রাজ্যে শিক্ষাপ্রণালীর কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কমিশনের সভ্যেরা বলেন যে উঠতি বয়সের ছেলেদের বড় দৈহিক অবনতি হইতেছে এবং সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে ছেলেদিগকে ১০টার পূর্ব্বেই আহার করিয়া স্কুলে আসিতে হয়, এবং ব্যায়ামাদি শেষ করিয়া তাহাদের বাড়ী ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যায়। এত ঘণ্টা তাহারা অনাহারে থাকে বলিয়া তাহাদের শরীর ক্ষীণ হইতে থাকে। গাইকওয়াড় মহাশয় আদেশ করেন, অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে কোন একটি স্কুলে ছাত্রদিগকে মধ্যাহ্নের ছুটির সময় বিনাব্যয়ে খাইতে দিয়া কিরূপ ফল হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক। গত আগষ্ট মাসে বড়োদা রাজধানীর একটি বিদ্যালয়ে এই পরীক্ষা আরম্ভ হয়। উহার ছাত্রসংখ্যা ৬০০। চারি মাস পরীক্ষার পর দেখা গেল যে গড়ে প্রত্যেক ছাত্রের ওজন আধসের করিয়া বাড়িয়াছে, কাহারও কাহারও দুই সের বাড়িয়াছে। আর এক সুফল এই হইয়াছে যে অনেক অভিভাবক ভোজনের বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হইয়া ব্যয়ের কিয়দংশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। [illegible] দেওয়া সম্বন্ধে শিক্ষকেরা এই নিয়ম করেন যে যে-সব ছেলে পড়া তৈয়ার করিয়া আসিবে না, তাহারা মধ্যাহ্নে খাইতে পাইবে না। ইহাতে, বিনা বেত্রাঘাত-ভয়েও, অমনোযোগী ছেলেরাও পড়ায় অনুরাগী হইতেছে; শুধু পড়ায় নয়, তাহারা বিকালে ব্যায়ামও উৎসাহের সহিত করিতেছে। ক্ষুধিত অবসন্ন দেহে ব্যায়ামের কুফলও এই প্রকারে নিবারিত হইতেছে। বড়োদার এই স্কুলে এত ছাত্র ভর্ত্তি হইতে চাহিতেছে যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সকলকে স্থান দিতে পারিতেছেন না।

সভ্যতার সিঁড়ি। "পাক্‌" (Puck) হইতে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথিবীর অনেক সভ্যদেশে অল্পবয়স্ক ছাত্র ও ছাত্রীদের বিনামূল্যে ভোজনের ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে এই প্রকার বন্দোবস্ত প্রথমে গত বৎসর ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যে হয়। তাহার পর বড়োদার রাজধানীতে হইল। এই দুই রাজ্যের সমুদয় স্কুলে, এবং পরে অন্যান্য দেশী রাজ্যেও মধ্যাহ্নে ভোজনের রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে ব্রিটিশ ভারতের রাজকর্ম্মচারীদিগকে জাগাইবার সময় আসিতে পারে। আপাততঃ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ছাত্রদের যেরূপ সাহায্য করেন, তেমন সাহায্য আর কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট ছাত্রদিগকে করেন না, লর্ড কারমাইকেলের এই ভিত্তি-হীন উক্তিতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

আধুনিক ভারতে তক্ষণশিল্প।

প্রাচীন ভারত যে তক্ষণশিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্ত্তি। ভি, ভি, ওাঘকৃত।

করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এখনও নানা প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ হইতে পাওয়া যাইতেছে। তক্ষণে আধুনিক

লর্ড হার্ডিঞ্জের মূর্ত্তি। ভি, ভি, ওাঘকৃত।

কালেও যে ভারতবাসীদের প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ একটু একটু করিয়া আমরা পাইতেছি। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত গণপত কাশীনাথ ম্হাত্রের নাম প্রবাসীর পাঠকদের সুপরিচিত। তাঁহার নির্ম্মিত অনেক প্রস্তরমূর্ত্তির চিত্র আমরা মুদ্রিত করিয়াছি। শ্রীযুক্ত ভি, ভি, ওাঘ (V. V. Wagh) বোম্বাইয়ের একজন উদীয়মান শিল্পী। তিনি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও দুই একজন বাঙ্গালীর আবক্ষ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। লর্ড হার্ডিঞ্জেরও ঐরূপ মূর্ত্তি তিনি গড়িয়াছেন। রবীন্দ্র-নাথের চেহারা বাঙ্গালীর সুপরিচিত। ওাঘ যে তাঁহার মূর্ত্তিগঠনে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা উহার ছবি দেখিলেই বুঝা যাইবে। লর্ড হার্ডিঞ্জের মূর্ত্তিরও ছবি আমরা দিলাম। বড় লাটের এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ওাঘকে যে সন্তোষজ্ঞাপক চিঠি লিখিয়াছেন, নীচে তাহা মুদ্রিত হইল।

24-3-14.
Viceregal Lodge, Delhi.

Dear Mr. Wagh,

Her Excellency the Lady Hardinge has asked me to let you know that she is highly pleased with the bust you have prepared of H. E. the Viceroy, and thinks it is an extremely good likeness.

Please allow me to congratulate you on your success.

Yours very truly,
(Sd.) I. H. Duboulay.

এই চিঠি হইতে দেখা যাইতেছে যে পরলোকগতা লেডী হার্ডিং এই মূর্ত্তিটি ঠিক্ লর্ড হার্ডিঞ্জের মত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেন এবং তজ্জন্য শ্রীযুক্ত ওাঘের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

লর্ড কারমাইকেলের একটি ভ্রান্ত উক্তি।

ঢাকা কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে গত মাসে লর্ড কারমাইকেল একটি বক্তৃতা করেন। তাহার মধ্যে এক জায়গায় তিনি বলেন :—

What I want to remind you of is that whatever is the help you get from Government, whether you think it great, or whether you think it small—and for my part I think it great—I know of no country where the general mass of students on the average are proportionately so helped by Government as students are here on the average.

লর্ড কারমাইকেলের এই উক্তিটি ভ্রমপূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন আমাদের দেশের ছাত্রেরা গড়ে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে যে অনুপাতে সাহায্য পায়, আর কোন দেশের ছাত্রেরা তত সাহায্য পায় না। ছাত্রদের শিক্ষার জন্য যত ব্যয় হয়, ছাত্রদের বেতন হইতে তত টাকা উঠে না। কতক ব্যয় সরকারী অর্থ হইতে দেওয়া হয়, কতক ছাত্রদত্ত বেতন হইতে উঠে, কতক দেশের লোকে চাঁদা করিয়া দেয়। এইরূপে দেখা যায় যে সমগ্র ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার ব্যয়ের শতকরা ৫৫ টাকা সরকারী অর্থ হইতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা সমস্ত ব্রিটিশ ভারতের হিসাব অনুসারে স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল বাংলা দেশ ধরিলে দেখা যায় ১৯১৩-১৪ সালে মোট শিক্ষায় ব্যয় হইয়াছিল ২,২০,৭৬,৫৩৫ টাকা। তাহার মধ্যে সরকারী অর্থ হইতে দেওয়া হইয়াছিল ৮৮,৯১,৭৬২ টাকা; এবং ছাত্রেরা বেতন দিয়াছিল ৯৫,৫০,০৭০। সুতরাং দেখা যাইতেছে বঙ্গে সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ৪১ টাকা সরকারী টাকা হইতে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল, এবং ছাত্রেরা তাহা অপেক্ষা বেতন অধিক দিয়াছিল। ১৯১৩-১৪ সালে বড়োদা-রাজ নিজ রাজ্যের শিক্ষাব্যয়ের শত করা ৯০ টাকা রাজকোষ হইতে দিয়াছিলেন। যাহা হউক, লর্ড কারমাইকেল বলিতে পারেন, তোমরা যতই দিয়া থাক, এবং সরকার যতই দিয়া থাকুন, ভারতবর্ষের বাহিরে অন্য কোন দেশে সরকার ইহা অপেক্ষা বেশী দেন না। কিন্তু তাহা সত্য নহে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে; এবং পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়-সকলের ছাত্রগণকে এক পয়সাও বেতন দিতে হয় না। অনেক দেশে এই-সকল শিশু বহি কাগজ শ্লেট পেন্সিল কলমও বিনামূল্যে পায়। বহুদেশে রুগ্ন ছাত্রগণ বিনাব্যয়ে চিকিৎসকের ব্যবস্থা পাইয়া থাকে। কোন কোন দেশে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রগণ মধ্যাহ্নে বিনা ব্যয়ে খাইতে পায়। এইরূপ ব্যবস্থা দেশীরাজ্য ত্রিবাঙ্কুড়ে এবং বড়োদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতে একমাত্র আসামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেতন লওয়া হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে-সকল দেশে ছাত্রেরা বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা পায়, যে-সকল দেশে তাহারা বিনা ব্যয়ে পুস্তকাদি পায়, যেখানে যেখানে তাহারা বিনা মূল্যে চিকিৎসকের ব্যবস্থা পায়, এবং যেখানে তাহারা মধ্যাহ্নে বিনাব্যয়ে খাইতে পায়, সেই সেই দেশে গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশভারত অপেক্ষা ছাত্রদের অধিক সাহায্য করেন। যদি এরূপ বলা হয় যে লর্ড কারমাইকেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কথা বলেন নাই, তিনি উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিকেই লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহার উক্তি সত্যমূলক বলা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রসকলে উচ্চতর সরকারী বিদ্যালয়-সকলেও ধনী নির্ধন যে-কেহ বিনা বেতনে শিক্ষা পাইতে পারে, এবং অনেকস্থানে ছাত্রেরা পুস্তকাদিও বিনা ব্যয়ে পায়। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে সমুদয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এরূপ সাহায্য পায় না। বরং গবর্ণমেণ্ট

সর্বত্র বেসরকারী স্কুল-সকলকেও ছাত্রদের বেতন বাড়াইতে বাধ্য করিয়াছেন। যদি এরূপ বলা হয় যে লর্ড কারমাইকেল কেবল কলেজের ছাত্রগণকে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহার কথা সত্য হয় না। কারণ আমাদের দেশে কলেজের ছাত্রেরা কম বা বেশী যতই বেতন দেক্ না, ব্রিটিশ ভারতের কোন প্রদেশেরই সরকারী বা বেসরকারী কলেজগুলি সম্পূর্ণ অবৈতনিক নহে, কিছু খরচ ছাত্রদিগকে করিতেই হয়। কিন্তু, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রসমূহের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় (আইন ও চিকিৎসা-বিভাগ ব্যতিরেকে) সম্পূর্ণ অবৈতনিক,* এবং কোথাও কোথাও ছাত্রেরা পাঠ্যপুস্তকসকলও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ধার পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীতে এরূপ দেশ আছে যেখানে ছাত্রেরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ব্রিটিশভারত অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অধিক সাহায্য পায়।

আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট "পিত্তি রক্ষা"র জন্য অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রকে বিদেশে পাঠান। কিন্তু জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও চীন দেশ হইতে এবং আরও অনেক দেশ হইতে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ছাত্র সরকারী ব্যয়ে বিদেশে শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রতি আর যে-কোন বিষয়ে বদান্যতার দাবী করিতে পারুন বা না পারুন, রাজ-কর্ম্মচারীরা সত্যের অনুসরণ করিয়া ইহা কখনই বলিতে পারিবেন না যে তাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে অন্য সভ্যদেশ অপেক্ষা বা অন্য সভ্যদেশের সমান উৎসাহ দেখাইয়াছেন।

গামা।

আমরা পৌষ মাসের প্রবাসীতে অনেক ভারতবর্ষীয়

লাহোরের কুস্তিগীর গামা।

পালোয়ানের বৃত্তান্ত ও ছবি দিয়াছিলাম। তখন গামার ছবি দেওয়া হয় নাই। এখানে তাহার এক ছবি দিতেছি।

---

* "Wide diversity prevails at present among American Colleges in regard to fees The State Universities for the most part charge nothing except for law and medicine , the state, principally in the West, has been taking over more and more of education, with the consequent elimination, of fees from the elementary school up through the university." (*Cyclopedia of Education*, edited by Paul Monroe and published by Macmillan & Co., Vol. II, p. 589.)

প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্মান।

কাশীর ধর্ম্মমহামণ্ডল প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, ভট্টোজিদীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী, নানা উপনিষদ এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদক ও ভাষ্যকার নানাভাষাবিদ রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসুকে বিদ্যার্ণব, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারকে ইতিহাসাচার্য্য, এবং রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহকে বিদ্যাভূষণ উপাধি দিয়াছেন। উপাধি যোগ্য পাত্রেই অর্পিত হইয়াছে।

প্রবাসী বাঙ্গালীর বিদ্যানুরাগ।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের যেটুকু প্রাধান্য, প্রভাব ও সম্মান আছে, তাহা বিদ্যার বলে। বিদ্যানুরাগী হওয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাভাবিক। এই বিদ্যানুরাগ কেবল যে বালকদের শিক্ষাদানেই সূচিত হয়, তাহা নহে, বালিকাদের শিক্ষাতেও উহা প্রকাশ পায়। যদিও বালিকাদের শিক্ষার অবস্থা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শোচনীয়, তথাপি প্রবাসী বাঙ্গালী এ বিষয়ে তাহাদের প্রতিবেশীদের অপেক্ষা কিছু ভাল।

সম্প্রতি বাঁকিপুর উচ্চ বালিকাবিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে সভাপতি ওল্‌ডহাম্ সাহেব বলেন যে তিনি বেহারী ছাত্রীর সংখ্যা আরও বেশী দেখিতে পাইলে সন্তুষ্ট হইতেন। বর্ত্তমানে স্কুলে ৯২টি ছাত্রী পড়ে। তাহার মধ্যে ৬৫টি বাঙ্গালী, ২১টি বেহারী এবং ৭টি পঞ্জাবী।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীসভার অন্যতম সভ্য মাননীয় মিঃ পি. সি. লায়ন কিছুদিন হইল কলিকাতায় ছাত্রদিগকে উপদেশ দিয়া একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটিতে এমন কোন কোন কথা ছিল, যাহাতে আমরা সায় দিতে পারি। এমন কথাও ছিল, যাহাতে আমরা সম্পূর্ণ সায় দিতে পারি না। মিঃ লায়ন বলিয়াছেন, It is the inherent right of a nation to govern itself। প্রত্যেক জাতির যে নিজেই নিজেকে শাসন করিবার স্বাভাবিক অধিকার আছে, এবং উহা কাড়িয়া লইবার যে কাহারও অধিকার নাই, ইহা খুব সত্য। মিঃ লায়নের মত উচ্চপদস্থ এবং তাঁহা অপেক্ষাও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা যদি ভারতবাসীদিগকে এই স্বাভাবিক অধিকার ফিরিয়া পাইতে সাহায্য করেন, তাহা হইলে বক্তৃতাতে এইরূপ কথা বলা সার্থক হইবে।

মিঃ লায়ন বলিয়াছেন, The future of this country and the future of Bengal depend upon themselves and not upon the Government। ইহা অংশতঃ সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রত্যেক জাতির ভবিষ্যৎ প্রধানতঃ জাতির নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে বটে; কিন্তু গবর্ণমেণ্টও বহুপরিমাণে সাহায্য করিতে পারেন। জাপানের মত যে দেশে গবর্ণমেণ্ট স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়, সেখানে জাতীয় চেষ্টা ও সরকারী চেষ্টাকে এক বলা যাইতে পারিলেও, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কিরূপ আবশ্যক হইয়াছে ও কেমন আশ্চর্য্য ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা জাপানের ইতিহাসে অনস্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বিদেশী হইলেও তাহার দ্বারা দেশের উন্নতি কি পরিমাণে সাধিত হইতে পারে, তাহা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাসে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। ইউরোপের ও আমেরিকার বহু দেশের ইতিহাস হইতেও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের আবশ্যকতা ও উপকারিতা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু ইংরেজেরা অনেক সময় এশিয়াকে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে, একটা সৃষ্টিছাড়া ভূখণ্ড মনে করেন; তাঁহাদের মত এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে পাশ্চাত্য দেশসকলের পক্ষে যাহা সত্য, এশিয়ার বা ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সত্য নহে। এইজন্য এশিয়ারই কোন কোন দেশ হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যেও বড়োদা, মহীশূর, প্রভৃতি রাজ্যে শিক্ষা, শিল্পের উন্নতি, প্রভৃতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় অনেক সুফল ফলিয়াছে। যাহা হউক, মিঃ লায়নের এবং তাঁহার মত আরও অনেক শাসনকর্ত্তার কথা ও লেখা হইতে ভারতবাসীদের বুঝা উচিত যে অন্যান্য দেশে এবং ভারতবর্ষের কোন কোন দেশী রাজ্যে গবর্ণমেণ্ট যাহা করেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশভারতে ততটা করিতে এখনও প্রস্তুত নহেন। এইজন্য আমাদিগকে নিজেদের চেষ্টা আরও প্রবল, অবিরাম ও সুশৃঙ্খল করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট যাহাতে দেশের শিক্ষা,

স্বাস্থ্য, শিল্প, প্রভৃতির উন্নতিকল্পে খুব বেশী সাহায্য করেন, তাহার জন্যও চাপ দিতে হইবে। কারণ, গবর্ণমেণ্টের টাকা আমাদেরই প্রদত্ত টাকা, এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা আমাদেরই ভৃত্য। তাঁহারা আমাদেরই প্রয়োজনসাধন জন্য সরকারী খাজনাখানা হইতে বেতন পান। তাঁহারা জনসাধারণের প্রভু নহেন, জনসাধারণের সেবক। সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছা-ও-প্রয়োজন-অনুসারে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের কল্যাণকর কাজ করিবেন, ইহাই রাষ্ট্রীয় আদর্শ।

মিঃ লায়ন বলিয়াছেন, The main duty of the Government is to preserve peace and tranquility। শান্তি-রক্ষাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়া উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে মিঃ লায়ন গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। শান্তিরক্ষা গবর্ণমেণ্টের একটি কাজ হইলেও, প্রধান কর্ত্তব্য নহে; উহা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যপালন ও উদ্দেশ্যসাধনজন্য সুযোগ লাভের উপায় মাত্র। সর্ব্বসাধারণের কল্যাণসাধনই গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য। জনগণের দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের জন্য শান্তির প্রয়োজন।

ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা বরাবর গবর্ণমেণ্টকে অর্থাৎ আপনাদিগকে দেশবাসীদিগের মা-বাপ মনে করিয়া আসিতেছেন, এবং অনেকে প্রকাশ্যভাবে তাহা বলিয়াওছেন। তাঁহারা যদি মাবাপ-স্থানীয় হন, তাহা হইলে শান্তিরক্ষা কি প্রকারে প্রধান কর্ত্তব্য হইতে পারে? কোন পরিবারে মাবাপ যদি ছেলেমেয়েদিগকে কেবল শান্ত শিষ্ট ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য লাঠিহাতে দাঁড়াইয়া থাকেন, বা কয়েকজন দারোয়ান পাহারাওলা রাখিয়া দেন, তাহা হইলেই কি মনে করা যাইতে পারে যে তাঁহারা আদর্শ পিতামাতা? ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য পাইতেছে কি না, স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিতে পাইতেছে কি না, শীতাতপ হইতে শরীররক্ষার জন্য এবং সভ্যভব্য হইবার নিমিত্ত যথেষ্ট পরিধেয় বস্ত্র পাইতেছে কি না, মনের ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন জন্য এবং জীবিকা উপার্জ্জনের নিমিত্ত আবশ্যকমত শিক্ষা পাইতেছে কি না, পীড়িত হইলে চিকিৎসকের সাহায্য ও ঔষধশুশ্রূষা পাইতেছে কি না, এসব দেখা কি মাবাপের কর্ত্তব্য নয়?

ইংরেজ কর্ম্মচারীরা আপনাদিগকে দেশবাসীর মাবাপ মনে করেন বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে লগুড় হস্তে শান্তিরক্ষা করাই মাবাপের প্রধান কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু আমরা বাস্তবিক তাঁহাদিগকে দেশের মাবাপ মনে করি না; দেশের পরিচায়ক মনে করি। পরিচর্য্যা বলিলে কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ শান্তিরক্ষা বুঝায় না। দেশের কল্যাণার্থ যাহা কিছু করিবার আছে, তাহা শিক্ষাই হউক, স্বাস্থ্যরক্ষাই হউক, শিল্পের উন্নতিই হউক, সমস্তই পরিচারকের কর্ত্তব্য।

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকে প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিলে, জনগণের স্বাধীনতায়, স্বাধীন উন্নতিতে, স্বাধীন ও প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনে অনেক সময় হাত পড়ে। পরিবর্ত্তন, কখন কখন আমূল পরিবর্ত্তন, দেশের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক হয়; এবং পরিবর্ত্তন যত গুরুতর হইবে, শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত (অস্থায়ী হইলেও) তত অধিক হইবে। মরা মানুষের চেয়ে শান্ত ঠাণ্ডা আর কে আছে? আধমরা দুর্ব্বল শিশুর চেয়ে সুস্থ সবল শিশু অশান্ত। স্বাধীন মানুষের চেয়ে শিকলে-হাত-পা-বাঁধা মানুষ শান্ত, নিশ্চেষ্ট, ঠাণ্ডা। কিন্তু তা বলিয়া, মরা মানুষ, আধমরা শিশু, বা শৃঙ্খলিত মানুষ আমাদের আদর্শ নহে। কল্যাণ আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য জনগণের অবিরত চেষ্টা থাকা চাই, এবং গবর্ণমেণ্ট এই চেষ্টার সহায় হওয়া চাই। শৃঙ্খলা ও শান্তি সমাজ ও সভ্যতার রক্ষার জন্য প্রয়োজন; কিন্তু সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ও উন্নতির জন্য, পরিবর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা এবং স্বাধীনতার প্রয়োজন। এ বিষয়ে মিঃ সী ডিলাইল বার্ন্স (C. Delisle Burns) তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ (Political Ideals) সম্বন্ধীয় পুস্তকে বলিয়াছেন:—

> ...order may be paid for too dearly if it is at the expense of liberty. Obviously in giving order to Europe, Rome had taken away all local vitality...... for order cannot imply the limitation of the natural development of what is set in order. If it were so, life would not be orderly, but only death; an order which is inflexible is tyranny,—or, in the words of a keen Roman critic, 'We make a desert and call it peace.' ......As liberty tends to degenerate into license, so order tends to be corrupted into unnatural fixity of the *status quo*......the order which sacrifices originality, and therefore growth, destroys itself.

শান্তিরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশকে প্রায় নিরস্ত্র

করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে দেশ অসহায় ও নির্বীর্য্য হওয়ায় শান্তিরক্ষাও হইতেছে না। ঘন ঘন নানা স্থানে ডাকাতি তাহার প্রমাণ। ভারতবর্ষে শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করিতে গিয়া যাহাতে তাহার জীবনীশক্তি নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। দেশবাসীরও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে শান্তিতে বাস করাই পরমার্থ নহে। গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয়েরই লক্ষ্য উচ্চতর হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষে যুগব্যাপী যুদ্ধ।

মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে যখন মারামারি কাটাকাটি হয়, তখন তাহাকে যুদ্ধ কহে। তাহাতে কোন না কোন দেশ লণ্ডভণ্ড হয়, লক্ষ লক্ষ লোক হত ও আহত হয়, সহস্র সহস্র পরিবার অসহায়, সহস্র সহস্র নারী বিধবা, সহস্র সহস্র শিশু অনাথ হয়। কিন্তু আর এক প্রকারের যুদ্ধ আছে, যাহাতে ঠিক এইরূপ বা ইহা অপেক্ষাও ভীষণ ফল ফলে, যদিও তাহাতে কামানের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনা যায় না, বা রক্তের স্রোত ধরাতলে প্রবাহিত হয় না। এই যুদ্ধ মানুষে মানুষে নহে; মানুষের সঙ্গে রোগের যুদ্ধ।

এক যুগের অধিক হইয়া গেল ভারতবর্ষে প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাহার আক্রমণ নিবারিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত বহু লক্ষ লোক প্লেগে মরিয়াছে। গত ২২শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতে ৬৮৯০ জন প্লেগে মারা পড়িয়াছে;— বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ২২৬৫, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ৫৫২, বঙ্গে ৪, বিহার-উড়িষ্যায় ৪৬১, আগ্রা-অযোধ্যায় ১১৯৩, পঞ্জাবে ৭১, ব্রহ্মে ২৪৩, মধ্যপ্রদেশসমূহে ৯৭১, মহীশূরে ১৪৩, হায়দ্রাবাদে ৯৩৬, এবং মধ্যভারতে ৯৬।

বাঙ্গলাদেশে প্লেগে বরাবরই অপেক্ষাকৃত কম লোক মরে। কিন্তু তা বলিয়া বাংলার শত্রু কোন ভীষণ ব্যাধি নাই, এমন বলা যায় না। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র জ্বরেই বাংলাদেশে দশলক্ষ একষট্টি হাজার একচল্লিশ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব দুই বৎসর জ্বরে যথাক্রমে ৯,৬৮,৫৪৬ ও ৯,৫৯,১৯৩ জন মরিয়াছিল, এবং ১৯০৯ হইতে ১৯১৩ এই পাঁচবৎসরের জ্বরে গড় মৃত্যুসংখ্যা ৯,৩১,৩৮৩ ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। জ্বর ভিন্ন ১৯১৪ সালে ওলাউঠায় মরিয়াছে ৮৭,২২৪। অন্যান্য দেশের স্বাস্থ্যের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে জ্বর ও ওলাউঠা উভয়ই নিবার্য্য; অথচ এইরূপ নানা নিবার্য্য পীড়ায় বঙ্গে প্রতিবৎসর ১৪।১৫ লক্ষ লোক মরিতেছে।

সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চায়; মরিলেও কেহ রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া মরিতে চায় না। এতগুলি লোক যে মরে তাহা তাহাদের দুঃখের বিষয়, তাহাদের পরিবারবর্গের দুঃখের কারণ, দেশেরও ইহাতে ক্ষতি। তাহাদের মৃত্যুতে কত প্রতিভা, কত অন্যবিধ শক্তির অপচয় হইতেছে, কে বলিতে পারে? টাকার লোক্‌সানই কি কম? এক এক জন বাঁচিয়া থাকিলে, কিছু ধন উৎপাদন, কিছু রোজগার ত করিত? এই ধন হইতে দেশ বঞ্চিত হইতেছে। যাহারা মরে না, কেবল রোগ ভুগে ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তাহারাও অসমর্থ থাকায় দেশ তাহাদের সেবা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বরং তাহাদেরই সেবা করিতে বাধ্য হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন:—

"এই-সকল মৃত্যুতে লোকের কষ্ট ত আছেই। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক মানবজীবনের একটা আর্থিক মূল্য এখন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারিত করেন। কোন্ ব্যক্তির উপার্জ্জন-ক্ষমতা কত এবং তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা কত দিন, এই দুইটি অঙ্ক লইয়া ঐ ব্যক্তির জীবনের মূল্য স্থির করা হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মিঃ ফার (Farr) হিসাব করিয়াছিলেন যে একটি নবজাত কৃষকসন্তানের জীবনের মূল্য ৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৫ টাকা। আমেরিকার মিঃ ফিশার (Fisher) যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদিগের জীবনের মূল্য গড়ে ৫৮০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৮৭০০ টাকা এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। নিকলসন্ ইংলণ্ডের এক-একটি লোকের জীবনের মূল্য স্বদেশের পক্ষে ১০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫০০০ টাকা এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। আমরা কৃষ্ণবর্ণ হইলেও, মাতৃভূমির পক্ষে এক এক জনের জীবনের মূল্য গড়ে উহার ৩০ ভাগের এক ভাগ ধরিয়া লইতে বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না।" (প্রবাসী, বৈশাখ।)

প্রতিবৎসর বাঙ্গলাদেশে মোটামুটি দশ লক্ষ লোক শুধু জ্বরেই মারা যায়। তাহাতে মোটামুটি দেশের ৫০০ × ১০,০০,০০০ = ৫০,০০,০০,০০০, অর্থাৎ পঞ্চাশকোটী টাকা ক্ষতি হয়। মানুষের জীবনের আর্থিক মূল্য ছাড়া অন্য এবং উচ্চতর মূল্য আছে। কিন্তু শুধু আর্থিক মূল্য ধরিলেও প্রতিবৎসর জ্বর আমাদের ৫০ কোটি টাকা অপহরণ করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট ও দেশের লোক ডাকাতি

নিবারণের জন্য বাক্যব্যয় ও কাগজকালী ব্যয় এবং কিছু অর্থব্যয়ও করিতেছেন। কিন্তু যে শত্রু ডাকাতদের চেয়ে সহস্রগুণ ঐশ্বর্য্য হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে, তাহাকে পরাজিত করিবার জন্য তেমন কোন চেষ্টা বা ব্যয় করিতেছেন না।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সংগ্রামের প্রারম্ভে বৃটিশগবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের জন্য প্রত্যহ দেড়কোটি টাকা খরচ করিতেন; এখন প্রত্যহ ৩।৪ কোটি করেন। যদি মনুষ্যদেহধারী কোন শত্রু বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া প্রতিবৎসর ইহার ১০।১৫ লক্ষ লোকের প্রাণবধ করিত, এবং ৫০ কোটি টাকা লুটিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য নিশ্চয়ই কোটি কোটি টাকা খরচ করিতেন। কিন্তু জররূপী শত্রু মনুষ্যদেহধারী নয় বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এলোমেলো ভাবে বৎসরে কয়েক হাজার টাকা খরচ করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। বাস্তবিক রোগনিবারণের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা উচিত; এবং মানুষ-শত্রুর যুদ্ধ যেমন সুশৃঙ্খল, সুচিন্তিত, সুপরিচালিত, দলবদ্ধ ভাবে উপযুক্ত নেতার নেতৃত্বে করা হয়, ব্যাধি-শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঠিক্ তেমনি ভাবে করা উচিত। বরং বলা উচিত যে রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরও বেশী জনবল, ধনবল, বুদ্ধিবল, সাহসবল, এবং উৎসাহবলের সহিত করা কর্ত্তব্য। কারণ, জার্মেনীর লোকবল ও ধনবল ক্ষয় পাইলেই ইউরোপের যুদ্ধ থামিবে; কিন্তু মানুষের শত্রুরূপী যে রোগবীজ তাহার নিধন এভাবে হইবে না। তাহার বংশবৃদ্ধি অতিদ্রুত হয়।

আমরা কেবল বাংলা দেশের হিসাব দিলাম। সমগ্র ভারতবর্ষের হিসাব দিলে তাহা আরও ভয়াবহ হইবে। কিন্তু ভয় পাওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। শত্রু যত বড়ই হউক, মানুষ তাহার বিনাশ সাধন করিতে পারে।

বাঁকুড়া জেলার অবস্থা।

পাঠকগণ অবগত আছেন, বাঁকুড়া জেলার নিরন্ন ও শীতার্ত্ত লোকদিগকে এখনও অনেক মাস সাহায্য করিতে হইবে। আমরা ২৫শে মাঘ তারিখের বাঁকুড়া-দর্পণ হইতে জেলার অবস্থা সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

বাঁকুড়া জেলার অবস্থা দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইতেছে। আমরা এখন মফঃস্বলের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে দিন দিন সাহায্য-প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। এমন অনেক মধ্যশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সাহায্য-কেন্দ্রে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে পারেন না অথচ তাঁহাদের ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট সাহায্য-সমিতি চাঁদার টাকা হইতে স্থানে স্থানে কতকগুলি ভদ্রলোককে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত ফণ্ডে টাকা কম। এক্ষণে বদান্য ব্যক্তিগণ উক্ত ফণ্ডে আরও অধিক টাকা চাঁদা দিলে তবে দরিদ্র ভদ্রপরিবারের জীবন রক্ষার উপায় হয়।

অনাবৃষ্টি জন্য বাঁকুড়ায় ভাল শস্য জন্মে নাই; সেই জন্য মহাজনগণ রেলপথে নানা স্থান হইতে ধান্য ও চাউল আমদানী করিতেছেন। ধান্য ও চাউলের বাজার যে গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর অধিক তেজ তাহাও নহে। রেলপথে হু হু করিয়া ধান্য ও চাউল আসিতেছে, অথচ ভীষণ অন্নকষ্ট। তাহার কারণ কেবল অর্থের অভাব। এদেশে কৃষিজীবী লোকের সংখ্যাই অধিক। অধিকাংশ মজুর কৃষিজীবী লোকের ক্ষেত্রে কার্য্য করে। এদেশে মজুরকে কেহ বেতন স্বরূপ পয়সা দেয় না, কেবল ধান্য দেয়; তাহাকে "বেরুন" দেওয়া বলে। এ দেশের লোকের পয়সা নাই, তাই ধান্য মজুরী দেওয়া ব্যবস্থা। এ বৎসর ধান্য জন্মে নাই, লোকে মজুরকে "বেরুন" কোথা হইতে দিবে? অনেকে বেতনভোগী চাকর চাকরাণীও ছাড়াইয়া দিয়াছে। কৃষিজীবী লোকের ঘরে ধান্য চাউলও নাই, কাজেই ভিক্ষুকেরা ভিক্ষাও পাইতেছে না, তাই হাহাকার রব উঠিয়াছে। মহাজনদের আমদানীর চোটে ধান্য ও চাউলের অভাব নাই, অভাব কেবল পয়সার। এই হাহাকার রব এখনও ছয় মাস থাকিবে।

যুদ্ধের জন্য গৃহস্থের প্রতিনিয়ত ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিতেছে। আর গৃহস্থ কয় দিন টিকিবে—যায় যায় রব উঠিয়াছে। লবণের মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে, বস্ত্রের মূল্যও প্রতি টাকায় চারি আনা বাড়িয়াছে, ঔষধাদি যে-কোন দ্রব্য অগ্নিমূল্য, তাহার উপর এই দীর্ঘকালব্যাপী অন্নকষ্ট; তাই সর্ব্বত্র ত্রাহি মধুসূদন রব। লোকে গবর্ণমেণ্ট হইতে কৃষিঋণ লইয়া রবিশস্য আবাদ করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল ধান্য পাইলাম না, গোধূম যবাদি খাইয়া প্রাণ বাঁচাইব। সেই আশায় লোকে প্রাণপণ চেষ্টায় রবিশস্য আবাদ করিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকালের মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি না হওয়ায় এবং জলাশয়সমূহ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় তাহাদের সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। কোথা যায় কি খায়, কিরূপে সন্তান সন্ততিগণের মুখে অন্ন দেয় এই-সকল ভাবিয়া লোকে হতজ্ঞান হইয়াছে। কেহ "নামাল" যাইতেছে, কেহ বা দেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া আসাম যাইতেছে। সেদিন কয়েকজন জোতদার ভদ্রলোকের সহিত কোন পল্লীগ্রামে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা বলিলেন যে মহাজন করিয়াই হউক বা গবর্ণমেণ্টের নিকটই হউক বর্ষা ঋতুতে আমরা যদি কর্জ্জ পাই তথাচ আমাদের পূরা আবাদ চলিবে না, কারণ মজুর পাওয়া যাইবে না। যে-সকল সবলকায় কৃষিকার্য্য-দক্ষ মজুর এতদিন তাঁহাদের কৃষিকার্য্য চালাইয়া আসিতেছিল তাহারা এখন পেটের দায়ে হয় আসামে নয় 'নামাল' চলিয়া গিয়াছে। আসামে কালা জ্বর ও 'নামালে' প্লীহাযকৃত—অর্দ্ধেক লোকেও দেশে ফিরিবে কি না সন্দেহ।

কেবল অন্নকষ্ট নয় জলকষ্টও দিন দিন গুরুতর হইয়া পড়িতেছে। অনেক পুষ্করিণী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। আবার গবাদি পশুর খাদ্যাভাব একটি প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়াছে। যদি অচিরাৎ দুই এক পশলা বৃষ্টি হয় এবং ক্ষেত্রে ঘাস জন্মে তবেই গবাদি পশু বাঁচিবে নতুবা সেগুলির অভাবে আগামী বৎসরও লোকের চাষ করা হইবে না।

গবর্ণমেণ্ট কৃষকগণকে কিছু কৃষি ঋণ দিয়াছেন। আবার কৃষকগণ পুরা কৃষি ঋণ পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে তাহাদিগকে বহু টাকা কৃষি ঋণ দিতে হইবে। কৃষিকার্য্যের জন্য বহু টাকার আবশ্যক। প্রথম গোমহিষাদি পশু চাই, দ্বিতীয় বীজ চাই, তৃতীয় মজুরের "বেরুন'' চাই। দুর্ভিক্ষ বলুন আর অন্নকষ্টই বলুন এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী দুর্দ্দিন আর পূর্ব্বে কখনও আসে নাই। লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, দুই এক মাস থাকে, আবার লোকে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আজ ছয় মাস লোকে অন্নকষ্ট পাইতেছে, আরও ছয় মাস অন্নকষ্ট পাইতে হইবে।

বাঁকুড়া জেলার তন্তুবায় শ্রেণীর অবস্থা যে অত্যন্ত হীন হইয়াছে একথা পাঠকগণ অবগত আছেন। এ জেলার বিষ্ণুপুর এবং বীরসিংহপুরে অনেক তাঁতির বাস। তাহারা প্রধানতঃ রেশম ও তসরের বস্ত্র প্রস্তুত করে। পূর্ব্ববঙ্গের তুলনায় এই কঙ্করময় অনুর্ব্বর বাঁকুড়া জেলা নিতান্ত দরিদ্র স্থান। এ জেলার অতি অল্প লোকেই রেশম বস্ত্র ক্রয় করে, কিন্তু এ জেলার তন্তুবায়গণ কর্তৃক প্রস্তুত রেশম বস্ত্রসমূহ পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন বস্ত্রব্যবসায়ী এ জেলায় আসিয়া সেই-সকল বস্ত্র লইয়া যান। যুদ্ধের জন্য গত বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের পাট-উৎপন্নকারী কৃষকগণের মধ্যে একটা অন্নকষ্ট দেখা দেয়, কাজেই পূর্ব্ববঙ্গের মহাজনগণ এদেশে আসা বন্ধ করেন। সেই সময় হইতেই এ জেলার রেশমবস্ত্র-বয়নকারী তন্তুবায়দের বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ হয় ও তাহাদের মধ্যে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। মধ্যে পাটের মূল্য একটু বৃদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গের রেশমবস্ত্রব্যবসায়ীগণ আবার এ জেলায় বস্ত্র ক্রয় করিতে আসেন। তাঁহারা যে-সকল বস্ত্র লইয়া যান তাহার অধিকাংশই রং করা, কিন্তু এখন রংয়ের বাজারে আগুন লাগিয়াছে। তন্তুবায়গণ বস্ত্র রং করিবার জন্য যে এক প্যাকেট রং চারি পয়সা ছয় পয়সায় খরিদ করিতে পাইত সেই এক প্যাকেট রংয়ের মূল্য এখন এক টাকা। তাহাও আবার পাওয়া যাইতেছে না। সেইজন্য ঐ-সকল তন্তুবায় অত্যন্ত মনস্তাপ পাইতেছে। অনেকের বয়নকার্য্য একবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে নিরন্ন লোকদিগকে সাহায্যদানকার্যে ব্রতী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী মহাশয়ও "সঞ্জীবনী"তে লিখিয়াছেন যে নিরন্ন লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। "একে অন্নকষ্ট তাহার উপর জলকষ্ট হইয়াছে। জলাভাব হওয়াতে লোকে অপরিষ্কার জল খাইতে বাধ্য হইতেছে। তার ফলে কোথাও কোথাও কলেরা আরম্ভ হইয়াছে।"

২৮শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী) তারিখের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গের সরকারী কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর লিখিয়াছেন যে বৃষ্টির অভাবে বাঁকুড়া জেলার রবিশস্যের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে। সুতরাং রবিশস্য হইতে লোকের দুঃখ-মোচনের আশা নাই।

যিনি উপবাসী লোকদিগকে আগে কিছু দেন নাই, তিনি এখন কিছু দান করুন। যিনি পূর্ব্বে দিয়াছেন তিনিও আবার দান করুন।

নিরন্নের সাহায্যার্থ অভিনয়।

বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে দুই দিন তাঁহার "বৈরাগ্য-সাধন" ও "ফাল্গুনী"র অভিনয় করিয়াছিলেন। দর্শকশ্রোতাদিগের নিকট টিকিট বিক্রয় করিয়া ৭৯৪৯ এবং নাট্য দুটির পুস্তক বিক্রয় করিয়া ২২২, মোট ৮১৭১ টাকা আয় হইয়াছে। এই সমস্ত টাকাই দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য দেওয়া হইবে। অভিনয় উপলক্ষে যে নগদ ১০৩০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহার সমস্তই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন। বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত বৌবাজার ষ্ট্রীটের এন্ এণ্ড এন্ ঘোষ বিনামূল্যে করিয়া দিয়াছিলেন, মিঃ জে এফ মদন বিনাভাড়ায় কিছু রঙ্গমঞ্চের সরঞ্জাম ধার দিয়াছিলেন, বেভান কোম্পানী এবং ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্ বিনা পারিশ্রমিকে টিকিট বিক্রয় করিয়াছিলেন, মিঃ আব্দুল খালেক কিছু সাজসজ্জা বিনা ভাড়ায় দিয়াছিলেন, ইউ রায় এণ্ড সন্স্ বিনা লাভে নাট্যদুটির বাংলা পুস্তক সমস্তটি এবং ইংরেজী পুস্তকের মলাটটি ছাপিয়া দিয়াছিলেন, জাপানী মালী মিঃ কাসাহারা রঙ্গমঞ্চ সাজাইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, ঈশ্বরীপ্রসাদ, অসিতকুমার হালদার, এবং "বিচিত্রা"র আরও কোন কোন চিত্রকর দৃশ্যপটগুলি আঁকিয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমান্ মুকুলচন্দ্র দে পুস্তকটির মলাটের চিত্রটি আঁকিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বাঁকুড়াবাসীদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। যাঁহারা অভিনয় ও সঙ্গীত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ঋণ বাঁকুড়াবাসী কখনও শোধ করিতে পারিবে না।

যাহার যে প্রকার শক্তি সামর্থ্য আছে তাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে জনহিতসাধনে প্রযুক্ত হইলেই তাহার সার্থকতা হয়।

"ফাল্গুনী"র অভিনয় প্রথমে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে হইয়াছিল। অতি চমৎকার হইয়াছিল। সাজসজ্জা রঙ্গমঞ্চের ঘটা ছিল না। কিন্তু নাটক হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে বিশ্বে চিরযৌবন ও চিরবসন্ত বিরাজিত, তাহার অভিনয় মুক্ত প্রান্তরে উদ্যানমধ্যস্থ তৃণাচ্ছাদিত নাট্যশালায় ক্রীড়াচঞ্চল বালকবৃন্দ ও তাহাদের অধ্যাপকদিগের দ্বারা হওয়ায় সকলই সঙ্গত, সুশোভন, সমঞ্জসীভূত বোধ হইয়াছিল। আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

কলিকাতার অভিনয়ে শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের সহিত সামঞ্জস্যরূপ বিশেষত্ব ছিল না বটে, কিন্তু অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল, এবং সাজসজ্জা, দৃশ্য, রং ও আলোকের চিত্রকলানুমোদিত আশ্চর্য্য সংযোগে মায়াপুরীর সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজসভা যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা শূদ্রকের রাজসভার মত মনে হইতেছিল। রাজবেশী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সুন্দর মানাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মত নানাবিষয়িনী শক্তি ও প্রতিভা অতি

হইবে। অর্থকে আত্মিক ঐশ্বর্য্য লাভের সহায় করিতে হইবে।

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির আর একটি অসম্পূর্ণতা পূরণ করিতে হইবে। ইহাতে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে হইবে; চিত্র, স্থাপত্য, তক্ষণ, প্রভৃতি কলা শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার শিক্ষকও ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইবে।

বলিয়াছি, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, স্বতন্ত্র আত্মা চাই। তেমনি ইহার দেহটিও, সাজসজ্জা পরিচ্ছদও যথাসম্ভব ভারতীয় হওয়া চাই। এই হেতু ইহার জন্য যে-সকল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে, তাহা ভারতীয় স্থাপত্য-রীতি অনুসারে হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং ইহার উদ্যানাদি ভারতীয় প্রণালীতে পরিকল্পিত ও রচিত হওয়া উচিত। ইহার আসবাবপত্রেও ভারতবর্ষের বিশেষত্ব রক্ষিত হইলে ভাল হয়।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুর জ্ঞানযজ্ঞ। ইহাতে সকল প্রদেশের স্থান আছে, কাজ আছে। ইহার প্রধান কর্ম্মী পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়; তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, ভারতভক্তি, ত্যাগ, সাহস, লোকচরিত্রানুরূপ ব্যবহার, মিষ্টভাষিতা, ধৈর্য্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতিরেকে ইহা সম্ভবপর হইত না। তাঁহার সঙ্গে আরও অনেকে পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নাম করা এখানে সম্ভব না হইলেও কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে কাজটি যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা হইত না, এবং পরেও কাজ চলিবে না। "প্রবাসী" সমুদয় বাঙ্গালীর এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর কাগজ। এইজন্ত আমাদের আনন্দ হইতেছে যে অন্যান্ত প্রদেশের লোকের ন্যায় বাঙ্গালী এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর চেষ্টা, সেবা, ত্যাগও হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মূলে এবং মধ্যে রহিয়াছে। ঠিক্ কাহার মস্তিষ্কে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনা ও আদর্শ প্রথম উদিত হইয়াছিল, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন; কিন্তু আমরা অবগত হইয়াছি যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম এই কল্পনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রবাসী বাঙ্গালীদের অন্যতম অগ্রণী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয় একজন। এখনও তিনি এই মহৎ উদ্যমের একজন অধিনায়ক। চারি পাঁচ জন ত্যাগী সুযোগ্য প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সেণ্ট্র্যাল হিন্দু কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন। ব্যবহারাচার্য্য রাসবিহারী ঘোষ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রভৃতি দানশীল বাঙ্গালী ইহার ধনভাণ্ডার পুষ্ট করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের কোন কার্য্যেই কোন প্রদেশের লোকের বাদ পড়া উচিত নয়। বাঙ্গালী বাদ পড়েন নাই দেখিয়া সুখী হইলাম। যাঁহারা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ আদর্শ পূর্ণাঙ্গ ও বিকশিত করিয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছেন, ভিত্তিস্থাপন-মহোৎসব উপলক্ষে তাঁহাদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের মত বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর শিরোমণি উপস্থিত থাকিয়া অভিভাষণ দ্বারা সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুরাতন ছাত্রদের নিকট সবিনয় নিবেদন।

বিজ্ঞানাচার্য্য বসু মহাশয়ের প্রেসিডেন্সী কলেজে একত্রিংশবর্ষব্যাপী অধ্যাপকতার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্য্যের স্থায়িত্ব বিধান কল্পে অধ্যাপক মহাশয়ের পুরাতন এবং বর্ত্তমান ছাত্রগণের সমবেত চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার পুরাতন ছাত্রগণ দয়া করিয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা জানাইয়া এই সমবেত চেষ্টার সহায়ক হউন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীবনওয়ারী লাল চৌধুরী।
১২০ লোয়ার সার্কুলার রোড্, কলিকাতা।

বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা শ্রীযুক্ত বনওয়ারী লাল চৌধুরী ডি-এস্সী মহাশয়ের বিজ্ঞাপনটি এখানেই মুদ্রিত করিলাম। বিজ্ঞানাচার্য্য বসু মহাশয়ের সমুদয় ছাত্র চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিলে সুখী হইব। প্রবাসী-সম্পাদক।

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যার্থ প্রাপ্ত দান কৃতজ্ঞতার সহিত বিজ্ঞাপনীতে স্বীকৃত হইল।

পারের যাত্রা।

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীলের সৌজন্যে

আমেরিকায় এশিয়ার শিক্ষক

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন—সে আজ প্রায় ২৫ বৎসরের কথা। দার্শনিক জেমস্ প্রণীত Pragmatism গ্রন্থের The One and the Many অধ্যায়ে তাহার পরিচয় পাই। Mysticism বা অদ্বৈতবাদের লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া অধ্যাপক জেমস্ বলিতেছেন :—

"The paragon of all monastic systems is the Vedenta philosophy of Hindoosthan and the paragon of Vedantist missionaries was the late Swami Vivekananda who visited our land some years ago. The method of Vedantism is the mystical method. You do not reason, but after going through a certain discipline you see, and having seen, you can report the truth. Vivekananda thus reports the truth in one of his lectures here. "Where is there any more misery for him who sees this Oneness in the Universe, this Oneness of life, Oneness of everything ? This separation between man and man, man and woman, man and child, nation from nation, earth from moon, moon from sun, this separation between atom and atom is the cause really of all the misery, and the Vedanta says this separation does not exist, it is not real. It is merely apparent, on the surface. In the heart of things there is unity still. If you go inside you find that unity between man nd man, women and children, races and races, high and low, rich and poor, the God and men : all are One and animals too, if you go deep enough, and he who has attained to that has no more delusion. * * Where is there any more delusion for him ? What can delude him ? He knows the reality of everything, the secret of everything. Where is there any more misery for him ? What does he desire ? He has traced the reality of everything unto the Lord, that centre, that Unity of everything, and that is Eternal Bliss, Eternal Knowledge, Eternal Existence. Neither death nor disease nor sorrow nor misery nor discontent is there."

জেমস্ এই অদ্বৈতবাদ পুরাপুরি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন। বিবেকানন্দের মতবাদ সম্বন্ধে জেমসের সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

"Observe how radical the character of the monism here is. Separation is not simply overcome by the One, it is denied to exist. There is no many. We are not parts of the One. It has no parts, and since in a sense we undeniably *are*, it must be that each of us is the One, indivisibly and totally. *An Absolute One, and I that One*,—surely we have here a religion, which emotionally considered, has a high practical value; it imparts a perfect sumptuosity of security."

জেমস্ এই সম্বন্ধে আবার বলিতেছেন—

"We all have some ear for this monatic music, it elevates and reassures. We all have at least the germ of mysticism in us. And when our idealists recite their arguments for the Absolute, saying that the slightest union admitted anywhere carries logically absolute Oneness with it, and that the slightest separation admitted anywhere logically carries disunion remediless and complete, I cannot help suspecting that the palpable weak places in the intellectual reasonings they use are protected from their own criticism by a mystical feeling that, logic or no logic, absolute Oneness must somehow at any cost be true."

জেমসের মতে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া চিত্ত স্থির রাখা যাইতে পারে সত্য, আধ্যাত্মিক উন্নতির সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে সত্য,—কিন্তু ইহা কোনরূপ যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না ইহা এক প্রকার হৃদয়োচ্ছ্বাস বা আবেগের ফল স্বরূপ। প্রেমিক কবি ইত্যাদি লোকের এইরূপ ভাবুকতা দেখা যায়। ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল লোকই এইরূপ ভাবপ্রবণ। কাজেই জেমস্ ভাবুকতা পদার্থটা নিতান্ত অগ্রাহ্য করেন না।

যাহা হউক বুঝা গেল যে ইয়াঙ্কিস্থানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকের চিন্তায় বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচার স্থান পাইয়াছে।

গত বৎসর রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতাবলী Sadhana নামে প্রচারিত হইয়াছে।

এইবার জগদীশচন্দ্র ভারতের বাণী প্রচার করিতেছেন। যে হলে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হইয়াছিল জগদীশচন্দ্রও সেই হলেই বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। দর্শন-বিভাগের সম্পাদক অধ্যাপক উড্‌স্ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বসু মহাশয়কে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে বলিলেন :—

"জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রূপে সুপরিচিত। আমরা হার্ভার্ডের দর্শনবিভাগ হইতে ...

আলোচনা করিয়া থাকি। আমাদের অধ্যাপকগণ ইঁহার গবেষণার ফলসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই হার্ভার্ডে জগদীশচন্দ্রের অমর্য্যাদা হইবে না।”

এ কয়দিন এমার্সন হলের ল্যাবরেটরীগুলি দেখিতে দেখিতে এইরূপই মনে হইতেছিল। Experimental Psychology বিদ্যার পশুবিভাগে এবং উদ্ভিদ্‌বিভাগে যে-সমুদয় কার্য্য হয় তাহা অনেকটা জগদীশচন্দ্রের অনুসন্ধান-সমূহের অনুরূপ। অধ্যাপক ইয়ার্কিস Plant Psychology এবং Animal Psychology বিদ্যায় মানবচিত্তের সঙ্গে ইতর চিত্তের ধারাবাহিকতা এবং সাম্য প্রচার করিতেছেন। ইয়ার্কিসকে যে-সকল দিকে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চালাইতে হয় জগদীশচন্দ্রকেও খানিকটা সেই দিকে কার্য্য করিতে হয়। তবে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের Physiology সম্বন্ধে বেশী দৃষ্টিপাত করেন, এবং ইয়ার্কিস মনস্তত্ত্বের আলোচনায় যত্নবান্। জগদীশচন্দ্রের অনুসন্ধানসমূহ হইতে এই কারণেই দার্শনিক এবং মনস্তত্ত্ববিদেরা সাহায্য পাইয়া থাকেন।

বক্তৃতায় প্রায় ২০০ লোক উপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, দর্শনাধ্যাপক এবং সাধারণ স্ত্রী পুরুষ বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন। বক্তৃতার নাম—“The Control of Nervous Impulse in Plants.”

আলোকচিত্রের সাহায্যে বক্তৃতা হইল। চিত্রগুলি সবই চিত্তাকর্ষক। বক্তৃতা অতি মধুর হইয়াছিল—ব্যাখ্যা-প্রণালীতে শ্রোতৃমণ্ডলী সন্তুষ্ট হইয়াছেন। উদ্ভিদের মদ্য পান, উদ্ভিদের নিদ্রা, উদ্ভিদের মৃত্যু, উদ্ভিদের ক্লান্তি ইত্যাদি (lantern slide) ছায়াবাজির সাহায্যে হৃদয়গ্রাহিরূপে বুঝান হইল। সকলেই বুঝিল—

(১) মানুষ যেরূপ বাহিরের আঘাত পাইলে তাহার যথোচিত উত্তর দিয়া থাকে উদ্ভিদও ঠিক সেইরূপ করে।

(২) মানুষের হৃৎপিণ্ড যেরূপ কার্য্য করে উদ্ভিদেরও সেইরূপ হৃৎপিণ্ড আছে এবং হৃৎপিণ্ডের কার্য্যও সেইরূপ।

(৩) মানবশরীরের ভিতর চেতনাবাহী শিরা আছে, উদ্ভিদেরও তাহা আছে।

বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কয়েকটা এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা দেখান হইয়াছিল। যন্ত্রাদি বসুমহাশয়ের নিজের উদ্ভাবিত।

লজ্জাবতী লতা।
এই লতাটি আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সহিত জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া জীব ও উদ্ভিদের সমতা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছে।

বক্তৃতা শুনিয়া হার্ভার্ডক্লাবে নৈশভোজনে যোগদান করিলাম। দর্শন-বিভাগের কর্ত্তারা উপস্থিত। দু-একজন বাহিরের লোকও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সাধারণতঃ এইরূপ খানার উৎসবে বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। এ যাত্রায় তাহা হইল না। পাশাপাশি অথবা মুখামুখি কথাবার্ত্তা মাত্র হইল। হার্ভার্ডক্লাবে বোধ হয় কোন রমণীর যাওয়া-আসা নাই— এজন্য জগদীশচন্দ্র একাকী নিমন্ত্রিত হইয়াছেন —তাঁহার পত্নী সঙ্গে আসেন নাই। তিনি এমার্সনহলে বক্তৃতার সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকার সর্ব্বত্রই জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা সমাদৃত হইয়াছে। ফিলাডেল্‌ফিয়ায় ইয়াঙ্কি বিজ্ঞান-সেবীদিগের সম্মিলন হইয়াছিল। প্রতিবৎসর বড়দিনের সময়ে ভারতবর্ষের মত এদেশেও নানাপ্রকার কংগ্রেস, কনফারেন্স, সম্মিলন ইত্যাদি হইয়া থাকে। ফিলাডেল্‌ফিয়ার সম্মিলনে বিজ্ঞানসেবীরা হিন্দুবৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত যন্ত্রাদি দেখিয়া
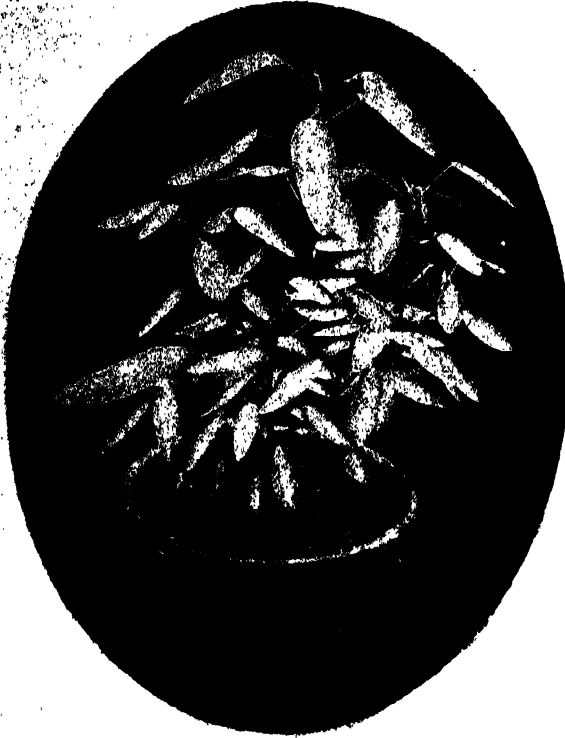
বনচাঁড়াল গাছ।
এই গাছ আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সহিত জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া জীব ও উদ্ভিদের সমতা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছে।

এবং বক্তৃতা শুনিয়া পুলকিত হইয়াছেন। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বষ্টন, উইস্কন্সিন, শিকাগো, মিশিগান ইত্যাদি স্থানের নানা সভায় জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করিয়াছেন।

দর্শন ও কাব্য ছাড়া অন্যান্যবিভাগেও ভারতবাসীর মাথা খেলে—ইয়াঙ্কিরা এই কথা এতদিনে প্রথম বুঝিল। ইয়াঙ্কিস্থানে এবং দুনিয়ার সর্ব্বত্র এই কথা বুঝাইবার জন্য ভারতবাসীর উপযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। জগৎ মাথার জোরে চলিতেছে—ভারতীয় মস্তিষ্কের শক্তি নানা ক্ষেত্রে দেখাইতে না পারিলে ভারতবাসী মানবজাতির সম্মান লাভ করিতে পারিবে না।

জাপানী বৌদ্ধ-প্রচারক।

অধ্যাপক আনেসাকি বলিলেন—"মহাশয়, আজকাল পাশ্চাত্য লোকেরা এশিয়ার পর্য্যটকগণের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন ধরণের জীবনযাপন-প্রণালীর পরিচয় পাইতেছে। প্রাচ্যপর্য্যটকগণের আগমনে ইয়াঙ্কি ও ইয়োরোপীয়ান-দিগের নূতন নূতন দিকে চোখ ফুটিতেছে—বিশ্বাস করি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বলিতেছেন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কিছু খুলিয়া বলিবেন কি?"

জাপানী অধ্যাপক বলিলেন—"গত সপ্তাহে আমি শিকাগোতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলাম। কোন এক সভায় আমি, আমার ইয়াঙ্কি বন্ধু, আপনাদের অধ্যাপক বসু এবং তাঁহার স্ত্রী এবং বহু নরনারী উপস্থিত ছিলেন। এই সভার কথা আমার বন্ধু আমাকে কয়েক-দিন পরে বলিতেছিলেন—'দেখুন, প্রাচ্যদের একটা গাম্ভীর্য্য ও গভীরতা আছে। আমরা বড়ই হাল্‌কা এবং তরলস্বভাব। সেদিন বসুপত্নীর সঙ্গে বহু ইয়াঙ্কিরমণী গল্প করিতেছিলেন। কথোপকথনের সময়ে লক্ষ্য করিলাম ইয়াঙ্কিরা অনর্থক নানা কথা বকিয়া যাইতেছে। কাহারও উদ্দেশ্য নিজের বিদ্যা-ফলান—কাহারও বা ইচ্ছা একটা কায়দা করিয়া কথা বলা। কিন্তু বসুপত্নী সর্ব্বদা স্থির ও সংযতভাবে কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তির ভিতর একটা শান্তির লক্ষণ বিরাজ করিতেছিল। লোক-দেখান পাণ্ডিত্য চঞ্চলতা অথবা প্রগল্‌ভতা আমাদের রমণীগণের একটা লক্ষণ। প্রাচ্যের নিকট আমাদের ধৈর্য্য, স্থিরতা এবং সংযম শিক্ষা করা আবশ্যক।'"

আনেসাকি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে-ছেন—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শিকাগোতে বক্তৃতা দিবার উপলক্ষ্য কি ছিল?" ইনি বলিলেন—"শিকাগোতে একটা সুবৃহৎ প্রাচ্য-সংগ্রহালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহার কর্ম্মকর্ত্তারা আমাকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করিয়া-ছিলেন। জাপানী-জাতীয়-জীবনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলাম। এই দেখুন বক্তৃতার মুদ্রিত সূচীপত্র।"

বিজ্ঞাপনপত্রে চারিটা বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার দেখিলাম। আনেসাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, দেখিতেছি ইহাতে লেখা রহিয়াছে আপনি তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাহা হইলে আপনি হার্ভার্ডেও অধ্যাপক থাকিলেন কি করিয়া?" ইনি বলিলেন—"এক্ষণে আমি দুই স্থানেই অধ্যাপক। কিন্তু শিকাগোর কর্ম্মকর্ত্তারা হার্ভার্ডের নাম করিতে নারাজ। তাঁহারা আমার জাপানের সম্বন্ধই জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহেন?"

জাপানী অধ্যাপক আনেসাকি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি একসঙ্গে হার্ভার্ডে ও তোকিওতে অধ্যাপক রহিলেন কি করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না? হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক বিনিময়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন জানি। আপনি কি এখানে একজন Exchange-Professor (দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিনিময়ে আগত)? হার্ভার্ড আপনার বিনিময়ে তোকিওতে কাহাকে পাঠাইয়াছেন?" আনেসাকি বলিলেন—"আমি Exchange-Professorও নহি। আমার চাকরী নূতন ধরণের। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু জাপানী ছাত্র উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ আজকাল প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, কেহ বড় আফিসের কর্ত্তা, কেহ অধ্যাপক, কেহ সংবাদপত্রের সম্পাদক। এইরূপ একশত জন মিলিয়া একটা ধনভাণ্ডার গঠন করিয়াছেন। ইহার মূল্য ৬০০০০৲। এই টাকার বার্ষিক সুদ হইতে একজন জাপানী অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও তোকিও বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলিত হইয়া এই ধনভাণ্ডার সমিতির উদ্দেশ্য অনুসারে কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই সর্ত্ত অনুসারে Japanese Literature and Life অর্থাৎ জাপানের সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে হার্ভার্ডে অধ্যাপনা করিবার জন্য তোকিও বিশ্ববিদ্যালয় এক-একজন অধ্যাপক পাঠাইবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এক-একজন কয় বৎসরের জন্য আসিবেন তাহার কোন নিয়ম আছে কি? সাহিত্য ও সমাজবিষয়ক আলোচনা বলিলে কি বুঝিব? ইহা যে খুব ব্যাপক শব্দ। প্রাচীন ও মধ্যযুগ এবং বর্ত্তমানকাল সকল সময়েরই আলোচনা চলিতে পারিবে বোধ হইতেছে।"

আনেসাকি বলিলেন—"কত দিন এক এক অধ্যাপক থাকিবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। আলোচ্য বিষয় এবং আলোচনা-প্রণালীর উপর ইহা নির্ভর করিবে। আমি তিন বৎসরে আমার কার্য্য শেষ করিব মনে করিয়াছি। বৌদ্ধদর্শন শিক্ষা দিতেছি। পরে জাপানী কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমার পরবর্ত্তী অধ্যাপক হয়ত চিত্রকলা এবং অন্যান্য সুকুমার শিল্প শিক্ষা দিবেন। জাপানের সমগ্র জাতীয় জীবন এবং প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাসের যে-কোন বিভাগ সম্বন্ধে অধ্যাপক আলোচনা করিতে পারেন। কোন সময়ে হয়ত বর্ত্তমান জাপানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অধ্যাপনা হইবে, কখনও বা জাপানী ব্যবসায় বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচিত হইতে পারিবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম কাহার মাথা হইতে বাহির হইয়াছিল?" আনেসাকি বলিলেন—"অধ্যাপক উডসের। আমার সঙ্গে ইঁহার ভারতবর্ষে দেখা হয়। আমরা দুইজনে কিছুকাল কাশীতে একত্র বাস করি। ইনি যখন জাপানে আসেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা ইঁহার সঙ্গে দেখা করে। এইরূপ দেখা সাক্ষাৎ হইবার পর উডস্ হার্ভার্ডে জাপানী সভ্যতা প্রচারের আয়োজন করিতে থাকেন। জাপানী গ্র্যাজুয়েটগণের প্রয়াসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও কিছু সাহায্য

করিয়াছেন। সম্প্রতি ৬০০০০৲ টাকা মাত্র উঠিয়াছে—সর্ব্বসমেত তিন লক্ষ টাকা তুলিবার ইচ্ছা আছে। তাহার সমস্ত সুদই অধ্যাপককে বেতন দেওয়া হইবে।"

আনেসাকিকে বলিলাম—"মহাশয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে ভারতীয় দর্শন সাহিত্য ও সমাজ পুরাপুরি pessimism বা দুঃখবাদে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবাসীর চিন্তায় Optimism বা আশাতত্ত্ব নাই। এইরূপ দুঃখবাদময় দর্শনের প্রভাবে ইহারা নিষ্কর্ম্মা অলস এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। পাশ্চাত্যেরা এইজন্য বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য এবং বেদান্তদর্শনকে বেশী তিরস্কার করিয়া থাকেন। জার্ম্মানদার্শনিক শোপেন-হোয়ার বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক মতবাদ আলোচনা করিয়া Pessimist অর্থাৎ দুঃখবাদ-প্রচারক হইয়াছিলেন। এই জন্য পাশ্চাত্যেরা বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনকে দুঃখবাদের আকর বিবেচনা করেন। আপনি এই পাশ্চাত্য মত সম্বন্ধে কি বলেন?"

আনেসাকি বলিলেন—"আমার সঙ্গে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সভাপতি শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ ষ্ট্যান্‌লি হলের কথোপকথন হইয়াছিল। হল্‌ পাশ্চাত্যসংসারে প্রচলিত মতই প্রকাশ করিতেছিলেন। আমার মত অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মে কর্ম্ম-তৎপরতা বিকশিত হইতে পারে তাহা তিনি কখনও ভাবেন নাই।"

একদিন ইউনিটেরিয়ান্‌ পাদ্রী ওয়েওটে বলিতেছিলেন—"আপনাদের ঠাকুর-কবি গতবৎসর হার্ভার্ডে বক্তৃতা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—'ইহা কি হিন্দুত্ব? হিন্দুধর্ম্মে এইরূপ উৎসাহপূর্ণতা, কর্ম্মতৎপরতা, জীবনবত্তা আসিল কোথা হইতে? ইহা যে ইয়াঙ্কি এমার্সনের আশাতত্ত্ব। হিন্দুত্ব ত দুঃখবাদ এবং নৈরাশ্যের প্রতিশব্দ।'"

ভারতবর্ষের জলবায়ুতে নৈরাশ্য, অকর্ম্মণ্যতা, কাণ্ড-জ্ঞানহীনতা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না—উন-বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যেরা এই কথাই শিখিয়াছেন। ইঁহারা ভারতবর্ষকে জড়ত্বের প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

আনেসাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি বলিলেন যে ষ্ট্যান্‌লি হলকে আপনি বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে নূতন ধারণা দিয়াছেন। প্রচলিত মত খণ্ডন করিলেন কি করিয়া? "নির্ব্বাণ" শব্দ শুনিবা মাত্রই ইয়াঙ্কি ও ইয়োরোপীয়েরা থতমত খায় না কি? যাহারা নির্ব্বাণের জন্য ব্যস্ত তাহারা কি কখনও সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প ইত্যাদির সংবাদ রাখিতে পারে? যাহারা অহিংসা পরম ধর্ম্ম বিবে-চনা করে তাহারা কখনও অস্ত্রধারণ করিতে উৎসাহী হয় কি? তাহারা শত্রুহস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করা ধর্ম্ম বিবেচনা করিবে কি?"

আনেসাকি বলিলেন—"নির্ব্বাণের অর্থ বুঝিতে গোল হয়। তাহা ছাড়া দুঃখবাদ স্বীকার করিয়া লইলেও অকর্ম্মণ্যতা অথবা জড়ত্ব পুষ্ট হইবে কেন? বৌদ্ধেরা স্বীকার করেন যে মানবের ভিতর অসংখ্য দুর্ব্বলতা সঙ্কীর্ণতা অসম্পূর্ণতা—এক কথায় অবিদ্যা রহিয়াছে। এগুলি উড়াইয়া দিবার জো নাই। ইহারই নাম দুঃখবাদ বা Pessimism অথচ এই দুঃখবাদ মানুষের স্বাভাবিক। বৌদ্ধধর্ম্ম দুঃখ হইতে মুক্তির পথ দেখাইতে চাহেন—মানুষকে অকর্ম্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানহীন জড়পদার্থে পরিণত করিতে চাহেন না। যখন নরনারীর অসম্পূর্ণতা ও অবিদ্যাগুলি "নির্ব্বাণ" প্রাপ্ত হয় তখন তাহারা বুদ্ধত্ব লাভ করে। এই ত আমাদের ধর্ম্মমত। ইহাতে মানুষকে কর্ম্মঠ কর্ম্মযোগী উৎসাহী এবং পরিশ্রমী করিয়া তুলিবার কথা—অবনত অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় উঠাইয়া দিবার কথা। অবিদ্যার নির্ব্বাণই মানুষের বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধ-দেবের জীবনে কি দেখিতে পাই? তিনি কি কেবল গিরিগুহাশায়ী অথবা তরুতলোপবিষ্ট নিষ্কর্ম্মা পুরুষ ছিলেন? ইয়োরোপ ও ইয়াঙ্কিস্থানের নরনারী যে ধরণের কর্ম্মতৎ-পরতা দেখিলে সুখী হন বুদ্ধদেবের তাহা কম ছিল না। সমাজসেবা, লোকহিত, রোগীশুশ্রূষা, পরোপকার, দুঃখ-নিবারণ ইত্যাদি কত কার্য্যই না তিনি করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান বৌদ্ধপ্রচারকগণের জীবনেও কর্ম্মপ্রাধান্য দেখিতে পাই না কি? তাহার পর মহাযানশাখাবলম্বী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রভাবেও কর্ম্মতৎপরতা কোন অংশে কমে নাই। এই সম্প্রদায় চীন ও জাপানে প্রভাববিস্তার

করিয়াছিল। চীন ও জাপানের বহু প্রতিষ্ঠানে বৌদ্ধদিগের বাস্তবজ্ঞান, কর্ম্মপ্রিয়তা, আশাতত্ত্ব এবং শক্তিপূজা দেখিতে পাই। তারপর লড়াই ও রক্তারক্তির কথা—বৌদ্ধ হইলে যুদ্ধ করিতে হইবে না কে বলিল? বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণ চাহে —কিন্তু কিসের নির্ব্বাণ? দুঃখের, অবিদ্যার, অত্যাচারের, অবিচারের, দুর্নীতির নির্ব্বাণ। এই-সকল নির্ব্বাণের জন্য প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করাও ধর্ম্মসঙ্গত. সুতরাং দুঃখবাদ ও নির্ব্বাণতত্ত্বের সঙ্গে সাংগ্রামিকতার কোন বিরোধ নাই। গোঁড়া বৌদ্ধও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।"

আমি বলিলাম—"দেখিতেছি—বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদিগের গতানুগতিক মত খণ্ডন করা আপনার একটা প্রধান কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধে কেন —সমগ্র এশিয়ার শিল্প বলুন, সমাজ বলুন, রাষ্ট্রপরিচালনা বলুন, বিদ্যাচর্চ্চা বলুন, সাহিত্য বলুন সকল বিষয়েই পাশ্চাত্যদের ভুল ধারণা আছে। এই-সকল ধারণা বদলাইয়া দিবার জন্য এশিয়াবাসীর বিশেষ চেষ্টা করা উচিত নহে কি? এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস এতদিন পাশ্চাত্যেরা লিখিয়াছেন। এশিয়া সম্বন্ধে এশিয়াবাসীর মত এখনও প্রচারিত হয় নাই। এক্ষণে জাপানী, চীনা, হিন্দুস্থানী, পারশী, আরবী ও মিশরী পণ্ডিতগণের এক ইতিহাস-পরিষৎ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রাচ্যসভ্যতার বিশ্বকোষ সঙ্কলিত হইবে। প্রত্যেক দেশের বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কার ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া সভ্যতার নানা বিভাগ সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিবেন। এইরূপ রচনা প্রকাশিত হইলে প্রাচ্য জীবন সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের ধারণা কিছু কিছু বদলাইতে পারিবে।"

আনেসাকি বলিলেন—"এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থের আবশ্যক হইবে। পাশ্চাত্যেরা এই ধরণের কার্য্য করিবার জন্য অজস্র টাকা পাইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা উপযুক্ত পরিমাণ টাকা তুলিতে পারিব কি? জাপান, চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য, মিশর ইত্যাদি দেশে অনুসন্ধান-কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে—অন্ততঃ কতিপয় লোককে মাসিক অর্থসাহায্য দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহকার্য্যে এবং গ্রন্থ-প্রণয়নে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া এশিয়ার কোন প্রসিদ্ধ নগরে প্রধান কেন্দ্র ও কার্য্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। ইহার পরিচালনার জন্যও অর্থ আবশ্যক।"

ইয়াঙ্কিস্থানে প্রাচ্য সভ্যতা আলোচনার কেন্দ্র সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। আনেসাকি বলিলেন—"ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী অধ্যাপক জাপানের ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন। নিউইয়র্কের কলাম্বিয়ায় চীনা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। বষ্টনের কলাভবনে জাপানী চিত্রকলার সংগ্রহ বোধ হয় দেখিয়াছেন। মিশিগানের জাপানী সংগ্রহগুলিই শ্রেষ্ঠতর।"

আমি বলিলাম—"কলাম্বিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে বোধ হয় আলোচনা বেশী হয় না। অধ্যাপক হার্ন্ চীনের ভাষা ব্যবসায় সাহিত্য শিল্প ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আলোচনা করিয়া থাকেন।" আনেসাকি বলিলেন—"নিউইয়র্ক বড় সহর—নিত্য নূতন ফ্যাশন ওখানে উপস্থিত হয়। আজকাল ইয়াঙ্কি ধনী লোকেরা চীনা পদার্থ সংগ্রহের জন্য জলের মত টাকা খরচ করিতেছে। চীনের চিত্রশিল্প বিষয়ক প্রদর্শনী আজকাল নিউইয়র্কে অনেক দেখিতে পাইবেন। এইরূপ হুজুগের কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরিচালকগণ হুজুগের প্রভাব এড়াইতে পারেন না। ইঁহারা ফ্যাশন-স্রোতের সঙ্গে কথঞ্চিৎ গা ঢালিতে বাধ্য হন। এই কারণে স্থায়ী চীনা সাহিত্য বা দর্শন অপেক্ষা সাময়িক চীনাতত্ত্বের আলোচনা কলাম্বিয়ায় অধিক হইবার কথা। এখানে চিত্রশিল্পের আলোচনা যত হয় বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা তাহার দশমাংশও হয় কিনা সন্দেহ। হুজুগ-প্রধান স্থানে চিত্তবিক্ষেপ বেশী হয়—কার্য্যপ্রণালী বড় শীঘ্র শীঘ্র বদলাইয়া যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে অতি দ্রুত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু কলাম্বিয়া অত্যধিক মাত্রায় 'আধুনিক' বা "uptodate", বিশ্ববিদ্যালয়ের কিঞ্চিৎ 'সে-কেলে' থাকা মন্দ নয়।"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সেখ আব্দু

(৩২)

আড়াই বৎসর কাটিয়া গেল। জাহাজে খালাসির কাজ লইয়া আড়াই বৎসর ধরিয়া সমুদ্রে জাহাজে জাহাজে ঘুরিয়া আব্দু কর্ম্মদক্ষতার গুণে এখন সারঙ্গের সহকারীর পদে উন্নীত হইয়াছে। আড়াই বৎসর ধরিয়া নানাস্থান ঘুরিয়া, এবার সে যাত্রী জাহাজের কর্ম্মচারী হইয়া ভারত-বর্ষের দিকে আবার চলিয়াছে। কয়দিন হইল, এডেন হইতে তাহাদের জাহাজ ছাড়িয়াছে।

ফেব্রুয়ারী মাসের কুয়াশাচ্ছন্ন মলিন প্রাতঃকাল। গত কল্য রাত্রের বাসন্তী জ্যোৎস্নার শোভা বিকাশের ধাক্কায় আজিকার প্রভাত যেন জখম হইয়া রহিয়াছে। বৃষ্টির মত ফিন্‌কি দিয়া কুয়াশা ঝরিতেছে। জাহাজের চারিদিকের কাছি লোহা দড়ি দাণ্ডা পাল বহিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল জমিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। বসন্তের মনোরম বুকের উপর যেন বর্ষা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে গভীর স্নেহের শীতল আলিঙ্গনে অভিষিক্ত করিতেছে।

জাহাজ সমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ ঢেউরাশি ছিঁড়িয়া অপ্রতিহত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। জাহাজময় লোকজন ব্যস্তসমস্ত হইয়া এদিক-ওদিক ঘুরিতেছে, চারিদিকেই কাজের ভিড় ও আনন্দের আয়োজন। যাত্রীগণ নিশ্চিন্ত আরামে এদিক-ওদিক বিচরণ করিতেছে। উপরে ধূসর আকাশ; নিম্নে ফেনপুঞ্জ-উদ্গারী, শব্দ-মুখর, উত্তাল সমুদ্র; চারিদিক কুয়াশায় আবৃত; আর জাহাজ কলরব-মুখর।

শীতের মোটা পোষাকে আবৃত হইয়া, সারেঙ্গের টুপী মাথায়, আব্দু ডেকের উপর রেলিংএ কুনুইয়ের ভর দিয়া স্থির নয়নে নিঃশব্দে সমুদ্রের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে দিকে লোকজন বড় কেহ একটা ছিল না, আব্দু নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল, সে আবার চলিয়াছে,—ভারতবর্ষের দিকে!

দেখিতে দেখিতে কুয়াশা কাটিয়া উজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে চারিদিক হাসিয়া উঠিল। আব্দু মাথা হইতে টুপীটা খুলিয়া জলকণাগুলা ঝাড়িয়া লইয়া সেটাকে আবার ভাল করিয়া মাথায় বসাইতেছে, এমন সময় দূরে ভারতের তটরেখা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া যাত্রীরা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। আব্দু সেই ক্ষীণ নীল রেখার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—

জীবন-সমুদ্রে মোহের উত্তাল তরঙ্গ ক্রমাগতই উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহার বিরাম নাই নিবৃত্তি নাই, কিন্তু বিবেকের দৃঢ় তটে প্রতিহত হইয়া তাহা বারংবার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—কেবল তাহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে শুধু একটু দুর্ব্বলতার জন্য মুহূর্ত্তের ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া অসতর্ক হওয়ায় একটা উদ্দাম তরঙ্গ চকিতে আসিয়া কূল প্লাবিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তুফান আসিয়াছিল, তুফান চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু যে পঙ্কের বোঝা বুকের উপর চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে—তাহা কত দিনে সংস্কৃত হইবে? হয় আকাশের প্রখর সূর্য্যের তাপে ইহাকে দিনে দিনে তিলে তিলে শুকাইয়া ধূলার মত উড়াইতে হইবে,—নয় আকাশের প্রবল বৃষ্টিধারায় ইহাকে নিঃশেষে ধৌত করিয়া পরিচ্ছন্ন হইতে হইবে;—এখন যাহাই করা যাক, আকাশ ভিন্ন গতি নাই!

আব্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলিল! পরমেশ্বর, এ ভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত কতদিনে হইবে? সে কি সারাজীবনব্যাপী!

একটা উদ্দাম হিল্লোলে স্নায়ুতন্ত্রীগুলা ঝন্‌ঝন্‌ করিতে লাগিল, মস্তিষ্কে তুমুল বিপ্লব বাধিয়া উঠিল। আব্দু মাথায় হাত দিয়া রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল।

ওঃ! সে আর পারে না। ভগবান, সে আর পারে না—এত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত যুঝিবার সামর্থ্য তাহার আর নাই,—সে লক্ষ্মীছাড়া নিজের দায়ে সর্ব্বস্ব বিকাইয়াছে, সংসারে অনেককে সুখী করিতে গিয়া অনেকের মর্ম্মান্তিক অসুখের কারণ হইয়াছে, সে যে জগতের কোন্‌খানে কত-খানি অনিষ্টসাধন করিয়া আসিয়াছে, অদৃষ্টের অগোচরে সে যে কি উদ্‌ভ্রান্ত মত্ততা জীবনসূত্রে গাঁথিয়া সারা জীবনটা বিষাক্ত বাষ্পাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহার খবর ত কেহ জানে না।—না জানুক, সে তাহার ভ্রমের কাহিনী লইয়া জগতের কৌতুকের মজলিশে বিদ্রূপের উপকরণ যোগাইতে চায় না। কিন্তু আর যে সে পারে না!—এ মৌন উদ্দামদীপক-ঝঙ্কৃত ক্ষুদ্র জীবনের সহিত জগতের এই কলরব-মুখর শত-আশা-উদ্বেলিত অনন্ত জীবনের আর

কিছুতেই খাপ খাইতেছে না, সে আর ইহাদের সঙ্গে পোষাইয়া চলিতে পারিবে না। জীবন্তের সহিত জগতের সম্পর্ক!—সে যে প্রাণহীন, সে যে পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এখন ওগো পৃথিবীর ভূত-ভবিষ্যতের চির বর্ত্তমান, হে অনন্তদেব, ওগো দীন দুর্ব্বলের অবশিষ্ট আশ্রয়, আর সে পারে না, তাহার শক্তি সামর্থ্য আর নাই, এবার ক্ষীণ-মুমূর্ষু অন্তরে অন্তিমের মত অধিষ্ঠান হও; সে অনেক ভাবিয়াছে, আর ভাবিবার কিছু নাই, এখন ভরসা শুধু তুমি, আর কেহ নাই, সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া বিশাল বিশ্বের বুকে একাকী দাঁড়াইয়াছে, তাহার অগ্র-পশ্চাৎ বেড়িয়া অনেক বিভীষিকা অনেক ক্রটী তাহাকে কঠোর ভাবে নিষ্পেষিত করিবার জন্য রুষিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার জর্জ্জর জীবনে আর যে কিছু সহিবার নাই! দেবতা, তাহার জীবনের সমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত ছন্দ, সমস্ত মন্ত্র, সমস্ত সম্বল, অজ্ঞাত অন্ধকারে বিসর্জ্জন করিয়া সে পরিপূর্ণ দৈন্যে নিরাশ্রয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আজিকার ভরসা ওগো জীবন-মরণের দেবতা, তুমি শুধু তুমি!

আব্দুর সমস্ত বক্ষ উদ্বেলিত করিয়া, একটা অপরিসীম সান্ত্বনার সুস্নস্পর্শ পবন বহিয়া গেল! সৃষ্টির সূচনার জন্য প্রলয়ের প্রয়োজন,—জীবনের জন্য মরণের উদ্বোধন—আব্দুর বেদনাহত চিত্ত পূর্ণ করিয়া গভীর সান্ত্বনা বর্ষিত হইল।

অনেক দিনের পর আব্দু অত্যন্ত শান্তির সহিত, পরিপূর্ণ স্থিরতায় নমাজ করিল। তারপর কোরানখানি খুলিয়া বসিল। এক পৃষ্ঠা পড়া শেষ হইতে না হইতে তাহার চিত্তে তীব্র ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এই পুস্তকের বোঝা সে বুকে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে অমৃতসিন্ধু বিদ্যমান রহিয়াছে,—তাহার স্পর্শসুখ লাভে অমরত্ব প্রাপ্তির পথ হইতে সে কতদূরে চলিয়া গিয়াছে! এই পুরাতন পরিচিত—আবাল্যের অভ্যস্ত কোরান সরিফ, আজ তাহাকে নূতন করিয়া সেই চির পুরাতন পূজনীয় সত্যবাণী সজীব ভাষায় বলিতেছে। আব্দু অবাক হইয়া গেল, এতদিন সে কি করিয়া এ সব ভুলিয়া মস্তিকের মধ্যে অলীক চিন্তার সহস্র জঞ্জাল পুরিয়া, কোন্ মোহে বসিয়া ছিল? আশ্চর্য্য বটে!

জাহাজ বন্দরে লাগিতেই চারিদিকে খুব হৈ চৈ গোলমাল পড়িয়া গেল, ডেকের উপর হইতে সমুদ্র-উপকূলের পানে চাহিয়া আনন্দে আব্দুর বুক ভরিয়া গেল।—কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেও টাকার ব্যাগটি ও কোরানখানি হাতে লইয়া জাহাজের সিঁড়ি বহিয়া বোটে আসিয়া আশ্রয় লইল।

জেটী হইতে বাহিরে আসিয়া নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে আব্দু সমুদ্রের ধারে এক বাগানের নিকট সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া উপস্থিত হইল; অদূরে এক বৃক্ষতলে তিনজন বৃদ্ধ ফকীর মক্কার দিকে মুখ করিয়া নমাজ করিতেছিলেন, নাবিকের পরিচ্ছদ পরিহিত আব্দু তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া উপাসনায় যোগ দিল।

নমাজ শেষ হইলে বয়োজ্যেষ্ঠ ক্ষীণদৃষ্টি শীর্ণাকৃতি ফকীর স্নেহময় স্বরে তাহাকে ডাকিয়া তাহার পরিচয় লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আব্দু ফকীরদের পরিচয় লইয়া জানিল, তাঁহারা মক্কা যাইবার উদ্দেশ্যে আজ তিন মাস বম্বে বন্দরে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, ভিক্ষার দ্বারা হজ যাত্রার খরচা সংগ্রহের বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোন হৃদয়বান ধনীর অনুগ্রহ আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কেবলমাত্র মুষ্টিভিক্ষায় উদরান্নের সংস্থান করিতেছেন মাত্র। অনেকক্ষণ তাঁহাদের সহিত অনেক কথা কহিয়া আব্দু উঠিয়া অদূরে নির্জ্জন সরোবরের সোপানে গিয়া বসিল।

নিজে কি করিবে, কোথায় যাইবে,—কিছু ভাবিবার অবকাশ হইল না। সে ভাবিতে লাগিল ঐ দরিদ্র অনাথ নিরন্নদের তীর্থযাত্রার কথা। সে কি ইহাদের জন্য কিছু করিতে পারে না?

বিপ্লবের ধাক্কা খাইয়া, সমস্ত জীবনটাই সে কেবল পিছু হটিয়া চলিয়াছে, সন্ধির দ্বারা শান্তি লাভ করিয়া কোন মতেই সামনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; এখনো কি পারিবে না?—আর তো সব শেষ হইয়া আসিয়াছে, শ্রবণের পথে মরণের ভেরী গম্ভীর নিঃস্বনে বাজিয়াছে, এখন কি এই ধ্বংসোন্মুখ শরীরের শেষ রক্তকণিকাগুলি বিক্রয় করিয়া ইহাদের তীর্থের পাথেয় জীবনের সম্বল সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে না?—

আব্দু সঞ্চিত মুদ্রাগুলি মিলাইয়া হিসাব করিয়া দেখিল, তাহাতে উহাদের পাথেয় হইতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধ ফকীরটির একটি বলিষ্ঠ অবলম্বনের যে নিতান্ত প্রয়োজন!—

আব্দু ভাবিতেছে, এমন সময় এক বৃদ্ধ গাড়ু ও গামছা লইয়া ঘাটে আসিয়া হাত মুখ প্রক্ষালন করিয়া গাড়ু জলে পূর্ণ করিয়া উঠিতে উঠিতে মৃদুস্বরে নিরঞ্জনাষ্টক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কণ্ঠস্বরে চমকিয়া চিন্তামগ্ন আব্দু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে বৃদ্ধের পানে চাহিল, তাহার পরই অকস্মাৎ তীরবেগে উঠিয়া আনন্দ-উচ্ছল কণ্ঠে ডাকিল "দাদাজী!"

বৃদ্ধ নির্নিমেষ নয়নে সেই অপরিচিত-বেশ-পরিহিত লোকটির পানে চাহিয়া রহিলেন। আব্দু টুপী ফেলিয়া তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া প্রণাম করিয়া বলিল "আমি আব্দু!"

দাদাজীর হস্তস্খলিত গাড়ুর জল সব সোপানের উপর পড়িয়া গেল, অশ্রুসিক্ত নয়নে আব্দুকে বুকে তুলিয়া গভীর আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "এতদিনের পর?"—

অনেকক্ষণ পরে উভয়ে শান্ত হইয়া, ব্যগ্রপ্রশ্নে সংক্ষেপে পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা শেষ করিলেন। আব্দু বলিল "রতু বাবুদের খবর কি?"

"রতু যে এইখানেই রয়েছে। তার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, আমাদের নিয়ে তাই কাল এখানে এসেছে। আমরা সেতুবন্ধ রামেশ্বর হয়ে এলাম; এবার দ্বারকায় যাব। রতুর মাসী, দিদি, সবাই সঙ্গে এসেছে, এখানে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠেছে। তুমি দেখা করবে চল।"

আব্দু বলিল "চলুন।"

পথে চলিতে চলিতে আব্দু বালকের মত অসঙ্কোচ উৎসাহে এমনি আনন্দের সহিত নানা অবান্তর কথা কহিতে লাগিল, যে, দাদাজীর উল্লাসের সীমা রহিল না— দাদাজী জিজ্ঞাসা করিলেন "এতদিন কোথায় ছিলে আব্দু?"

আব্দু সংক্ষেপে জাহাজে চাকরীর কথা বলিল। কথাটা লইয়া দাদাজীকে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করিবার অবসর মাত্র না দিয়া হঠাৎ বলিল—"আপনারা দ্বারকা যাবেন,— আমারও যে যেতে ইচ্ছে করছে!"

দাদাজী উৎসাহের স্বরে বলিলেন "চলনা দাদা।"

উভয়ে আসিয়া অদূরে বাটীর মধ্যে ঢুকিলেন। উঠানে আসিয়া দাদাজী উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন "আলোটা দেখাও মা, আমরা রকের সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছি না।"

লণ্ঠন হস্তে শুভ্রবসনা জ্যোৎস্না ঘর হইতে বাহিরে আসিল,—আলো তুলিয়া চাহিতেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। আব্দু কাছে আসিয়া অভিবাদন করিয়া অত্যন্ত সহজ নিঃশঙ্কভাবে বলিল "ভাল আছেন?—চিনতে পারেন?"

জ্যোৎস্নার হাত হইতে সহসা আলোটা পড়িয়া গেল। আব্দু তুলিয়া, বাতিটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। রতু ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া সজোরে আব্দুকে জড়াইয়া ধরিল। আব্দুর সাড়া পাইয়া মাসীমা বাহিরে আসিলেন, আব্দু দূর হইতে প্রণাম করিল। তারপর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া পরম উৎসাহে আপনার নাবিক-জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল।

নতবদনা জ্যোৎস্না পাংশুমূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার মিথ্যা উৎসাহের কপট আনন্দ লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানা উদ্ভট চিন্তা সমুদ্ভূত হইয়া শিরা উপশিরায় শোণিতস্রোত এমনি তীব্র বেগে ছুটিতে লাগিল, জ্যোৎস্না যেন অভিভূত হইয়া পড়িল। আপনার অন্তরের মধ্যে একটা তপ্ত সংঘর্ষণ অনুভব করিয়া জ্যোৎস্না কেমন হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে আব্দু একবার জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ বিদায় চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দাদাজী বলিলেন—"কোথায় যাবে?—রাত্রে এই-খানেই থাক না।"

রতুও ধরিয়া বসিল। আব্দু একবার জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আচ্ছা।"

আব্দু বাড়ীর পাশে বাগানের পুকুরের ঘাটে গিয়া বসিল, স্থানটি বেশ নির্জ্জন!—সে দিন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী, তখন বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

চন্দ্রালোকে সরোবরের জলরাশি ঝিকমিক করিয়া হাসিতেছিল। আব্দু জ্যোৎস্নার অমল ধবল স্রোতোচ্ছ্বাসে চিত্ত গলাইয়া কোরানের স্থান বিশেষের আবৃত্তি করিতে-ছিল,—সমস্ত দিন যে তাহার আহার হয় নাই, সে যে কত দিকে কত ঘুরিয়াছে, আজ কিছুই তাহার চিত্তকে স্পর্শ

করিতেছিল না। সহসা পিছন হইতে একটা ছায়া সোপান-তলে পতিত হইল। আন্দু ফিরিয়া দেখিল জ্যোৎস্না!—ঘাটের রানায় ভর রাখিয়া বোধ হইল কাঁপিতেছে।

অভ্যাস-বশে টুপী তুলিয়া আন্দু সন্ত্রস্তভাবে অন্য দিকে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে পড়িল, এমনি জ্যোৎস্না-লোকে ভাগলপুরে চৌধুরী-সাহেবের বাড়ীতে সে লতিকাকে দেখিয়াছিল,—কত দিন কত নির্জ্জনে গভীর ক্ষত যন্ত্রণার মত সে স্মৃতি তাহার মনকে ঝলসাইয়া ক্লিষ্ট করিয়াছে!—স্বপ্নের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন সে সব কথা আজ যেন নূতন স্পষ্ট হইয়া উঠিল!

আন্দু জ্যোৎস্নার মুখপানে চাহিল, স্পষ্ট অসঙ্কোচে, সম্পূর্ণ কুণ্ঠাহীন দৃষ্টিতে! জ্যোৎস্নার আকৃতি প্রস্তরকঠিন নির্জ্জীব, দৃষ্টি অন্তাবলম্বী। কম্পিত স্বরে জ্যোৎস্না বলিল—"তুমি কি দ্বারকা যাবে?"

আন্দু দ্বারকা যাবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। জ্যোৎস্নার কথায় সংজ্ঞা পাইয়া বলিল—"যাব একবার মনে করেছিলাম।"

জ্যোৎস্না সবলে রানা ধরিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল "না না তুমি দ্বারকা যেও না।"

আন্দুর কঠোর দৃঢ়তা যেন মুহূর্ত্তের জন্য শিথিল হইল, মূঢ়ের মত প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল—"কেন?"—কিন্তু পর মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া, ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া ঈষৎ বেগের সহিত বলিল, "আমায় ভয় কি?"—

কি ভয়, সে যে ভাষায় বুঝাইবার নহে!—পরিপূর্ণ আবেগে জ্যোৎস্নার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিশ্চল চৈতন্যশূন্য হইতে বসিয়াছে! হৃদ্‌পিণ্ড যেন পঞ্জরাস্থি ভেদ করিয়া ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতে চাহিতেছে—মরণাহতের অন্তিম নিঃশ্বাসের মত তাহার কণ্ঠ চিরিয়া মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারিত হইল—"তোমাকে ভয় নয়, তুমি ত মহৎ, তুমি পবিত্র! তোমার নিঃশব্দ ধৈর্য্য আর নীরব আত্মত্যাগ বড় কঠিন বড় ভয়ানক! তাতেই মনকে মুগ্ধ করে, ভীত করে। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরে যাও—আমার তীর্থ ধর্ম সকল হতে দাও!"—জ্যোৎস্নার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

আন্দু নির্ব্বাক! এমন মর্ম্মঘাতী কথা যে এত স্পষ্ট করিয়া শুনিতে হইবে, তাহা কোন দিন সে কল্পনাও করে নাই। সে প্রশান্ত গম্ভীর দৃষ্টিতে আকাশের হাস্যোজ্জ্বল চন্দ্রের পানে চাহিয়া রহিল!—অস্পষ্ট কুয়াশা ভেদ করিয়া যে নির্ম্মম সত্য আবিষ্কার হইয়া গেল, তাহাতে অভিমান কি? বেদনা কি? ক্ষোভ কি?—

আন্দু অতি শান্ত অতি মধুর মর্ম্মস্পর্শী স্বরে বলিল "তবে এই শেষ। আমি কাল জন্মের মত এ দেশ থেকে যাব,—এ জীবনে আর ভারতবর্ষের মাটীতে ফিরে আসব না! আপনার সমস্ত অমঙ্গলের আশঙ্কা—ভগবানের ওপর সত্যকার মঙ্গল-নির্ভরে প্রতিষ্ঠিত হোক্, ঈশ্বর আপনাকে শান্তি দিন। আসি তবে। সেলাম।"

আন্দু অকম্পিত পদে অগ্রসর হইল। জ্যোৎস্না বিদীর্ণ বক্ষে ঘাটের রানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, যন্ত্রণা-রুদ্ধ স্বরে বলিল "আমার দুর্ব্বলতা ক্ষমা কর, তোমার অতুল নিষ্ঠার গভীর মহত্ত্ব অনুভবের শক্তি আমার নাই, আমায় ক্ষমা কর!"

"ক্ষমা!"—আন্দু স্বভাবসুন্দর হাসিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল, "ক্ষমা?—না দেবী, এর মাঝে ক্ষমা নাই। এ ত হৃদয়হীন ছেলেখেলায় পরিতাপের কুটুম্বিতা নয়!—এ যে প্রাণের গোপনে প্রাণের আদর্শপূজার উন্মাদ সাধনা! এতে যদি অপরাধ থাকে, তবে শাস্তিও আছে। কিন্তু ক্ষমা?—না ক্ষমা নাই!"

আন্দু ধীর পদে চলিয়া গেল। অর্দ্ধমূর্চ্ছিত জ্যোৎস্নার প্রাণে কেবল বাজিতে লাগিল—এতে যদি অপরাধ থাকে তবে শাস্তিও আছে, কিন্তু ক্ষমা নাই!—পূজার মাঝে কামনাই পাপ,—আসক্তিই অপরাধ! কিন্তু ত্যাগের ব্রতে উৎকর্ষের অর্চ্চনা,—সে যে আমরণের সাধনার সামগ্রী! তাতে ক্ষমা নাই, ক্লান্তি নাই,—শেষ নাই!

* * * *

প্রাতঃসূর্য্যের হৈম-কিরণে সমস্ত পৃথিবী সমুদ্ভাসিত। আন্দু বক্ষসম্বদ্ধ করে জাহাজের সিঁড়ির নীচে জেটিতে দাঁড়াইয়া প্রসন্ন-স্মিত দৃষ্টিতে সামনের দিকে চাহিয়া ছিল। জাহাজ ছাড়িতে আর বেশী দেরী নাই, খালাসীরা সিঁড়ি তুলিয়া লইবার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে। ফকীর তিনজন জাহাজের ডেকের উপর, মক্কার দিকে মুখ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'ভেকা' পাঠ করিতেছিলেন।

রতু দ্রুতপদে আসিয়া আন্দুকে জড়াইয়া ধরিল,—পশ্চাতে দাদাজী ও জ্যোৎস্না! ইঁহারা দ্বারকাযাত্রী জাহাজে চড়িতে আসিয়া আন্দুকে দেখিতে পাইয়াছেন। রতু বাষ্প-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল "আবার চল্লে, সমুদ্রে?"

আন্দু সস্নেহে তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিল—"না দাদা, এবার একেবারে কূলে গিয়ে উঠব, মক্কায়!"

দাদাজী অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন "এবার তীর্থে?"

আন্দু প্রণাম করিয়া বলিল "হাঁ দাদাজী, এইবার তীর্থে।—"

সংসারবিরাগী নির্লিপ্তচিত্ত দাদাজীর চোখে জল আসিল! আন্দুর প্রাণ এত কঠিন! সে এক কথায় লোকের সহিত সৌহৃদ্য করে, আবার এক কথায় সমস্ত নিবিড় মমতা-বন্ধন কাটিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়!

জ্যোৎস্নার বক্ষের মধ্যে সপ্তসমুদ্র উছলিয়া উঠিল। সে করুণ দৃষ্টি তুলিয়া আন্দুর পানে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিল। অকস্মাৎ গভীর বেদনায় রুদ্ধ-নিঃশ্বাস অলক্ষিতে দীর্ঘ শব্দে নির্গত হইল!—আন্দু চমকিয়া চাহিল, সে নিঃশ্বাস যে তাহার অন্তরে গিয়া বাজিয়াছে।

জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। দাদাজী আন্দুকে আলিঙ্গন করিলেন। আন্দু শান্ত সরল হাসিতে কোমল ভাবে বলিল "জীবনের কর্ত্তব্যগুলো সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে দাদাজী, এবার মরণের অবলম্বনে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করে তুলব,—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন!"

(সমাপ্ত)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

চন্দননগর ও শিল্প-প্রদর্শনী

কোন ইংরেজ পর্য্যটক অল্পদিন পূর্ব্বে চন্দননগর-প্রসঙ্গে ইংলিশম্যান পত্রে লিখিয়াছেন—বাঙ্গলার মধ্যে যদি স্বর্গ থাকে তবে তাহা চন্দননগর। বাঙ্গলার সকল গ্রাম-সকল নগর দেখি নাই, প্রকৃতি দেবী কোথায় কোন্ স্থানকে কিরূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহা জানি না, সুতরাং এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। তবে এ কথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে, কলিকাতা হইতে বরাবর উত্তরাভিমুখে ভাগীরথীর উভয় কূলে বহুদূর পর্য্যন্ত যে-সকল নগর ও জনপদ নদীবক্ষ হইতে নয়নগোচর হইয়া থাকে তাহার মধ্যে চন্দননগরের মত সুন্দর রমণীয় দ্বিতীয় স্থান আর আছে কি না সন্দেহ।

বহু-অট্টালিকাময় রাজধানীর তীব্রোজ্জ্বল-দৃশ্যে পীড়িত-চক্ষু মানবের কাছে গঙ্গার উপর হইতে চন্দননগর একখানি ছবির মত মনে হয়। সবুজ ঘাসের পাড়ের উপর ষ্ট্রাণ্ডের ধারে সেই সারি সারি অত্যুচ্চ সাদা থামগুলির পশ্চাতে সবুজ তরুশ্রেণীর কোলে অট্টালিকাশ্রেণী প্রকৃতই অতি

চন্দননগর শিল্পপ্রদর্শনী—জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র।

মনোহর। শুনিতে পাওয়া যায় এই প্রসিদ্ধ মনোরম ষ্ট্রাণ্ড নামক স্থানটির ন্যায় সুন্দর স্থান এ প্রদেশে আর কোথাও নাই; এমন কি ইন্দ্রপুরীসম কলিকাতার ইডেন্ উদ্যানের সৌন্দর্য্যেও বুঝি এতটা রমণীয়তা নাই।

চন্দননগর সহর হইলেও এখানে রাজধানীর প্রাসাদসম উচ্চ অট্টালিকা নাই, বিবিধ অশ্বযানের অবিশ্রান্ত ঘর্ঘর শব্দ নাই, কল কারখানার শত শত আকাশচুম্বী

চন্দননগর শিল্পপ্রদর্শনী—মহিলা-শিল্প বিভাগ।

উচ্চ চিমনী হইতে অবিরত ধূমোদ্গিরণ হইতেছে না, এখানে অতি বিস্তৃত দীর্ঘ রাজপথ নাই, এখানে-সেখানে রাজকীয় সুবিন্যস্ত পার্ক নাই, এখানে অগণিত-মক্ষিকা-পূর্ণ চক্রের ন্যায় বড় বড় অফিষ নাই, এখানে নাগরিক জীবনের দিবসযামিনীব্যাপী সে কোলাহল নাই, জীবন-সংগ্রামের অফুরন্ত তুমুল আন্দোলন নাই; এখানে সেই আবর্জ্জনা-পূর্ণ পূতিগন্ধময় রবিকরসম্পর্কশূন্য শত শত অপ্রশস্ত গলিপথ নাই, ধনমদমত্ত বিলাসীগণের বিলাসবাসনা পূর্ণ করিবার অসংখ্য পাপক্ষেত্র নাই, আর শঠতা প্রবঞ্চনার নিত্য অভিনয়ও নাই। ডুপ্লের সাধের চন্দননগর, ফরাশিদের অতীত গৌরবের স্থান, পূর্ব্বের সে গৌরব গরিমা হারাইয়া, লুপ্ত ইতিহাসের স্মৃতি মাত্র বুকে লইয়া ধন-বল-শূন্য বনিয়াদি বড়লোকের ন্যায় বাঙ্গলার মানচিত্রে একটি প্রাচীন শান্ত মধুর নগররূপে বিরাজ করিতেছে; উৎসাহশূন্য, কর্ম্মহীন, অলস অধিবাসীদের অবসাদময় জীবনভার বুকে করিয়া চন্দননগর দিনে দিনে অবসাদ প্রাপ্ত হইতেছে। শ্যামল তরু-লতা-পূর্ণ শান্তিময় নগর নানা কারণে ক্রমেই জনহীন হইয়া উঠিতেছে, তথাপি এই ক্ষুদ্র স্থানটি প্রকৃতির শোভায় এখনও বাঙ্গলার একটি নন্দনকানন সম হইয়া আছে। তাই আজ রাজধানীর এত নিকটে অবস্থিত, বিবিধ শিল্পের আবাসস্থান চন্দননগরে এই অনতিবৃহৎ ভারতীয় শিল্পের একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে এতটা জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তাই ফরাশি ভারতের মহামান্য গভর্ণর মসিয়ে মার্তিনোর (LL. EE. M. Martineau নিমন্ত্রণে বাঙ্গালার জনপ্রিয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল প্রদর্শনী দর্শনার্থে চন্দননগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

চন্দননগরে ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির শুভাগমন এই প্রথম নহে; লর্ড লান্সডাউন, লর্ড ডফরিন, লর্ড লিটন্ প্রভৃতি অনেকেই এখানে আসিয়াছিলেন; এমন কি সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড যুবরাজরূপে এবং ডিউক্ ও ডাচেস অব কনোট্

তাঁহাদের ভারতে আগমনের কালে এই সহরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তথাপি বহু বৎসরের পর অধুনা বাঙ্গলার গভর্ণরকে ফরাশি চন্দননগরের প্রদর্শনীর উদ্‌যোগীদিগকে ও দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করিতে দেখিয়া মনে এক প্রকার আনন্দের উদয় হইয়াছিল।

বিগত কলিকাতা প্রদর্শনী বা এলাহাবাদ প্রদর্শনীর তুলনায় এই দেশীয় শিল্পকলার প্রদর্শনী অতি সামান্য হইলেও, ইহার দ্বারা পক্ষাধিককাল চন্দননগরকে প্রকৃতই উৎসবময় করিয়া রাখিয়াছিল। ফরাশি দূত মসিয়ে শার্ল্ বারে (M. Charles Barret) প্রদর্শনীর উদ্বোধন কালে যথার্থই বলিয়াছিলেন—যেন শত বৎসরের পর আজি অকস্মাৎ চন্দননগর নব জাগরণ লাভ করিয়াছে। ইংলিশ-ম্যানের লেখকও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। চন্দন-নগরে সাধারণ উৎসবের অভাব নাই। এখানে প্রসিদ্ধ যাদুঘোষের রথযাত্রা আছে; ১৪ই জুলাইয়ের ফরাসী জাতীয় উৎসব (Fete National) আছে; অগ্রহায়ণ মাসে খৃস্তির মহোৎসব আছে; প্রসিদ্ধ সুবৃহৎ জগদ্ধাত্রী ও কার্ত্তিক পূজার ধূমধাম আছে; এবং এখানে প্রাচীন বিবিধ শিল্পের তিরোভাব ঘটিলেও, এখনও ফরাশডাঙ্গার বস্ত্রশিল্প, চেয়ারের কাজ ও কুম্ভকারের দ্রব্যাদি বিখ্যাত; তথাপি এই মহৎ-উদ্দেশ্য-মূলক, ভারতের বহু স্থানের শিল্প ও কারু-কার্য্যের প্রদর্শনী আজি বাঙ্গলার বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আর সেই জন্যই আজ এই ফরাশি-অধিকৃত প্রাচীন ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক নগরটি অনেক দিনের পর লোকের আলোচনার বিষয় হইয়াছে।

ইউরোপের কালসমরই এই প্রদর্শনী হইবার মূল। বৃটীশরাজের জগৎব্যাপী রাজত্বের সকল অংশেই যেমন প্রজাপুঞ্জ রাজার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, ফ্রান্সের বহু দূরের ক্ষুদ্র উপনিবেশ চন্দননগরের সামান্য নাগরিক-গণও এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত নহেন। চন্দননগরের সুযোগ্য আদ্‌মিনিস্ত্রেতর মসিয়ে ভঁ্যাসার (Monsieur C. Vincent) অধিনায়কতায় তাঁহারা তাঁহাদের সামান্য শক্তিতে যুদ্ধে আহত সৈনিকগণের সাহায্যের জন্য যাহা কিছু করিতে পারেন তাহা করিতে উদাসীন নহেন। সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই শিল্পপ্রদর্শনীর বিশদ বিবরণ লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে বা ইহার অতিরিক্ত প্রশংসা করাও আমার অভিপ্রায় নহে। ইহার দ্বারা পরিণামে চন্দননগরের বিশেষ কোন উপকার সাধিত হইবে কি না জানি না; তবে ইহা নিশ্চয় বলিয়া মনে হয়, যাঁহারা একটু মনোযোগের সহিত এইরূপ স্বদেশী দ্রব্যের সংগ্রহ দেখিয়া থাকেন তাঁহাদের অনেক উপকার হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে দেশেরও অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।
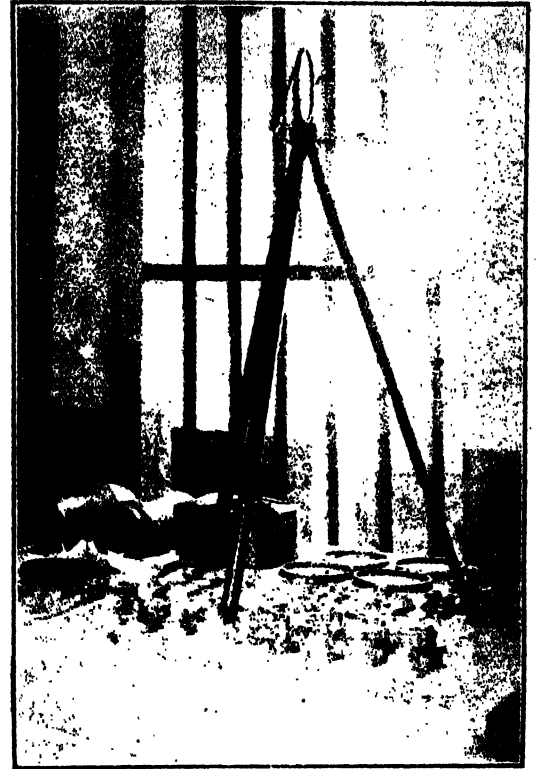
চন্দননগর শিল্পপ্রদর্শনী—শেল, প্রাপনেল ও হেলিওগ্রাফ যন্ত্র।

আমাদের নিত্য-অবশ্যকীয় দ্রব্যের মধ্যে দেশী জিনিষ এমন কি নাই, যাহা না হইলে চলিতে পারে না, তাহা ভাবিয়া পাই না। যিনি এই প্রদর্শনীতে কক্ষের পর কক্ষ-গুলিতে স্তরে স্তরে সাজান সুন্দর দ্রব্যগুলি একবার দেখিয়া-ছেন তাঁহাকেই এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষ ভাবে রাজ-সহায়তা না পাইয়াও, ভারতবাসীর উৎসাহের যথেষ্ট অভাব সত্ত্বেও আমাদের দেশীয় শিল্পের পুনরায় কতদূর উন্নতি হইয়াছে, কত নূতন শিল্পের আবিষ্কার হইয়াছে

তাহা যিনি এই প্রদর্শনী দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন। ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন, চন্দননগরের ধুতি, খাগড়ার কাঁসার দ্রব্য, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, মুরশিদাবাদের হস্তীদন্তের কাজ ও রেশমী কাপড়, মৃজাপুরের গালিচা, ঢাকার শৃঙ্গের কাজ, কাশ্মীরের শাল, জয়পুর মোরাদাবাদ ও বেনারসের পিতলের দ্রব্যাদির আমি উল্লেখ করিতে চাহি না। এ-সকল আমাদের ভারতের নিজস্ব। অবনীবাবুর প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার নমুনা, যামিনীবাবুর নিসর্গ চিত্র-সকল, নেপালের কারুকার্য্য, পিতাম্বর সরকার কোম্পানির সেগুন কাষ্ঠের কাজ, এ-সকলের কথাও আমার বলা উদ্দেশ্য নহে। আমি বলিতে চাহি এলাহাবাদের কাচের জিনিষ, ঢাকা ও শ্রীহট্টের ঝিনুকের বোতাম, বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানির দেশী সাগু এরারুট ঔষধ ও যন্ত্রাদি, দিল্লীর বিস্কুট, কলিকাতা পটারি ওয়ার্কের চিনামাটির দ্রব্যাদি, পি এল দত্ত কোং-র বালতি, বসাক ফ্যাক্টারির ষ্টীলট্রাঙ্ক ও রিবিট্, জি বি বসাকের ড্রাইশেল, জ্ঞানচন্দ্র পালের ছবির ফ্রেম, দত্ত ব্রাদার্সের চিকনের কাজ, ন্যাসন্যাল ওরিয়েণ্ট্যাল ও বুলবুলের সাবান, বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ঔষধ ও যন্ত্রাদি, কাশীপুর গান ও শেল ফ্যাক্টারির লৌহ ও ষ্টীলের দ্রব্যাদি, লাল-ইমলির পশমের বস্ত্রাদি, প্যারেরা সাহেবের চামড়ার দ্রব্যাদি, দাস কোম্পানি, দাস ঘোষ ও এন এল ঘোষ কোং-র ষ্টীলের আলমারি ও তালা, আলিগড়ের তালা ও কল, উবেরয়ের ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম, হিন্দুস্থান ফ্রুট্ প্রিজার্ভিং কোং-র মোরব্বা ফল, এফ এন গুপ্তর পেন-হোল্ডার, স্মল্ ইণ্ডাষ্ট্রী ডেভেলপিং কোং-র পেন্সিল, বারন কোম্পানির মাটির জিনিষ; যশোর কোম্ব ফ্যাক্টরির চিরুণী; ও চা, এসেন্স, তৈল, সিংয়ের ও হাড়ের কাজ; ইক্মিক্ কুকার, জুয়েল কুকার ও পেটেণ্ট কুকার প্রভৃতি। এই-সকল সুন্দর অথচ বিদেশী দ্রব্যের তুলনায় অনধিক মূল্যের দ্রব্যাদির একত্র সমাবেশ দেখিয়া মনে এক অননুভূত-পূর্ব্ব আশা ও আনন্দের উদয় হইয়া থাকে।

সারি সারি বিটপিশ্রেণীতে শোভিত সুন্দর পথের ধারে পুষ্পপত্র ও শ্বেত নীল লোহিত বর্ণের ফরাশি জাতীয় পতাকায় ভূষিত দুপ্লে কলেজের বহিঃপ্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া বহুবিধ চাকচিক্যশালী দ্রব্যসামগ্রীতে সজ্জিত ঘরের পর ঘরগুলি বেড়াইয়া, মসিয়ে পোমের (Monsieur Pomes, Commissarie de Police) কল্পিত যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অপূর্ব্ব পরিখাদির আদর্শ; ত্রাপনেল, শেল, ম্যাক্সিম গান, রাজপুতানার বহু পুরাতন ঐতিহাসিক স্মরণ-চিহ্ন-সকল, প্যারেরা সাহেবের জঙ্গল-দৃশ্য দেখিয়া ও উপরে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সজ্জিত বিস্তৃত থিয়েটার হলে থিয়েটর, মেমের নাচ, বায়স্কোপ প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ কিছুকালের জন্য উপভোগ করিয়া অনেকে নিঃসন্দেহ বিমোহিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রদর্শনী দেখার আনন্দ ঠিক উহাতে নহে। আমাদের নিজের বলিতে কতটুকু, আমাদের আপন পায়ে দাঁড়াইবার ক্ষমতা কতদূর, আমাদের প্রাচীন শিল্পের আমরা কি পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছি, দশ পনের বৎসর পূর্ব্বে আমাদের স্বদেশী যে-সকল জিনিষ ছিল না এখন তাহার কি কি দেখিতে পাওয়া গেল এবং বিদেশী জিনিষের সহিত তাহার পার্থক্য কি, আমাদেরই দেশী জিনিষ অথচ যাহা এতদিন আমাদের জানা ছিল না, এই-সকল দেখিয়া ও ভাবিয়া যদি দর্শক আনন্দ লাভ করিতে পারেন তবেই এই শ্রেণীর প্রদর্শনীর সার্থকতা। আমার মনে হয় সে হিসাবে চন্দননগর প্রদর্শনী নিরর্থক হয় নাই। এখানে বহুতর অদ্ভুত ব্যাপারের সমাবেশ ছিল না, এসেন্স আতরের ছড়াছড়ি ও একই জিনিষের গাদা গাদা নমুনা ছিল না। যাহা ছিল তাহার অধিকাংশ অনেক স্বদেশী প্রদর্শনীতে বা কলিকাতার বাজারের এখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যাইলেও, স্বল্পের মধ্যে এমন বহু স্থানের বহুবিধ জিনিষের নয়নরঞ্জন সুবিন্যস্ত বিচিত্র নমুনা অন্য প্রদর্শনীতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না এ কথা অনেকের মুখেই শুনা গিয়াছে এবং ইহাই এই প্রদর্শনীর বিশেষত্ব।

চন্দননগরের প্রধান বিচারপতি মসিয়ে ডেলরিয়ু (Monsieur Delrieu) সর্ব্বপ্রথম এই প্রদর্শনী খুলিবার প্রস্তাব করেন। তৎপরে প্রদর্শনী কমিটির সভ্যগণের চেষ্টা ও উদ্যোগে এবং চন্দননগরবাসী বহু লোকের সহানুভূতিতে এই প্রদর্শনীর সৃষ্টি হইলেও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে প্রভৃতি মহাশয়গণের এ কার্য্যে পরিশ্রম

অগ্রগামীকারের কথা উল্লেখ না করিলে ত্রুটী রহিয়া যায়। অশুভ যুদ্ধের কারণে ইহার সৃষ্টি হইলেও ফরাশি কনসলের সঙ্গে আমরাও আশা করি ইহা যেন বার্ষিক কার্য্যে পরিণত হয়। আরও আশা করি যেন প্রতি জেলায় জেলায় এই প্রকার প্রদর্শনীর সৃষ্টি হইয়া এই অশুভ কাল সময়ের দ্বারা আমাদের অন্ততঃ একটি শুভকার্য্যের সূচনা হয়। যেন জার্ম্মান পণ্যের পরিবর্ত্তে আমেরিকার ও অপদার্থ জাপানি জিনিসের দ্বারা আমাদের অভাব পূর্ণ করিতে না হয়, যেন ভারত অচিরে আপন হাতে আপন ভাণ্ডার হইতেই আপনার সন্তানদের সকল অভাব মোচন করিতে সমর্থ হয়।

হরিহর শেঠ।

—— —

পঞ্চশস্য

ব্যথার কথা—

ম্যাস মদে বলিয়াছেন, ব্যথা ব্যতীত আমাদের জীবন টিকিত না; ব্যথা না থাকিলে আমরা জীবনের বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক হইতে পারিতাম না। ব্যথা নিজে অস্বাভাবিক কিছু নয়, উহা অস্বাভাবিক অন্য কিছুর বিরুদ্ধে স্বভাবের প্রতিবাদ মাত্র। যে লোক ব্যথা বোধ করে সে, যে লোক ব্যথা বোধের শক্তি হারাইয়াছে তাহার চেয়ে আরামে আছে বুঝিতে হইবে। ব্যথা না অনুভব করা ব্যথার চেয়ে বড় রকমের দুর্লক্ষণ।

বাস্তবিক, জীব মেরুদণ্ডী জীবের পর্য্যায়ে যথেষ্ট উন্নত হইয়া না উঠিলে বেদনা অনুভব করিতে পারে না। কেঁচো বিদলিত হইয়া পাক খাইয়া লুটাপুটি করে, বেদনায় নহে, শরীরে আঘাতের উত্তেজনায় উহা সাড়ার বাহ্য প্রকাশ মাত্র।

অনেক বিশেষ অনুভূতির ন্যায় বেদনা-অনুভূতি মনের ও জাতির বিশেষ অবস্থাগত ব্যাপার। অনেক অসভ্য জাতি নিজের শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত বিকল করিত—যেমন উল্কি পরা, চড়কের বাণ ফোঁড়া, কাটা ঝাঁপ খাওয়া, সন্ন্যাসীদের শরশয্যায় বসা ইত্যাদি; উহা বেদনা-বোধের অভাব ও সেই বিশেষ জাতির সহনশীলতার পরিচায়ক—উহা খুব একটা সাহস, বীরত্ব বা অসহ দুঃখের ব্যাপার তাহাদের কাছে মোটেই নহে। পশুচিকিৎসকেরা পশুর শরীরে অস্ত্র-উপচার করে, কোনো রকম স্পর্শবোধ-অপহারক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া, কারণ পশুর বেদনা-বোধ মানুষের চেয়ে ঢের কম। সভ্য মানুষের জন্ম মাত্রেই বেদনা-অনুভূতি পরিণত থাকে না, তাহাকে ক্রমশ তাহা ফুটাইয়া তুলিতে হয়। নবজাত মুসলমান বা য়িহুদি শিশুদের সুন্নত করা হয়, তাহাতে তাহারা খুব বেদনা-বোধের পরিচয় দ্যায় না। কুকুর ঘোড়া প্রভৃতি কোন্ধে কোনো জন্তুর মুখে একটা কাতর ভাব দেখা যায়; কিন্তু তাহা মানুষের বেদনা-বোধের কাতরতার সঙ্গে এক শ্রেণীর নহে।

অনুভূতি-পরিবহ স্নায়ুকে অতিরিক্ত উত্তেজিত করায় যে ভাব হয় তাহাকে আমরা বেদনা বলি; একটা কোনো কঠিন বস্তু আমাদের স্নায়ু ছিঁড়িলে স্পর্শবোধ লুপ্ত এবং উহা যত জোরে আমাদের ত্বকের উপর চাপ দিতে থাকে তত বেশী বেদনা বোধ হইতে থাকে। এই বেদনা-অনুভূতি স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বকের উপর ছড়ানো আছে; ত্বক ভেদ করিলে আর বড় বেশী পাওয়া যায় না। একটা ছুঁচ ত্বক ভেদ করিবার সময় লাগে, বিদ্ধ হইয়া গেলে আর লাগে না; পেটের নাড়ী অক্লেশে কাটিয়া ফেলিতে পারা যায়, কিন্তু পেটের পেশীর সঙ্কোচন হইলে দারুণ বেদনা বোধ হয়; পেটের উপরে রাই সরিষার গুঁড়া গুলিয়া লাগাইলে জ্বালা করে, খাইলে কোনো কষ্ট হয় না; চুনে জিভ পুড়ে, কিন্তু কণ্ঠনালি পুড়ে না; লঙ্কার ঝাল মুখে লাগে, পেটে লাগে না। অনুভূতির বিভিন্ন যন্ত্র উত্তেজনা পাইলে বিভিন্ন প্রকারের বেদনা বোধ হয়। স্নায়ুমূল উত্তেজনা পাইলে সে স্থানে জ্বালা বোধ হয়; কোনো স্থানে রস জমিয়া ধমনীর রক্তপ্রবাহে বাধা জন্মাইলে রক্তের থাকিয়া থাকিয়া চলার ভাবকে আমরা দপদপ করা বা চিড়িক মারা বলি। শরীরের কোনো কোনো অংশে স্পর্শ বা তাপ-শৈত্য বোধ নাই, অথচ সেখানে বেদনাবোধ আছে; যেমন চোখের শ্বেত অংশ, তাহার উপর কোনো কিছু পড়িলে চোখ করকর করে, অথচ উহার স্পর্শ বা তাপ-শৈত্য বোধ নাই। আবার এমন হইতেও পারে যে স্পর্শবোধ বেশ ঠিক আছে, অথচ শরীরে বেদনা-বোধ হয় না।

আমরা মন দিয়া দেখি শুনি শুঁকি চাখি; তেমনি বেদনা-বোধও মনের ব্যাপার; অন্যমনস্ক থাকিলে বেদনা-বোধ কমে, মনোযোগী হইলে বেদনা-বোধ বাড়ে। হঠাৎ ঘা লাগিয়া কাটিয়া গেলে প্রথমটা ব্যথা বোধই হয় না; কিন্তু আঙুলে ছুঁচ ফুটাইয়া পরীক্ষার জন্য রক্ত দিতে বেদনায় প্রাণ শিহরিয়া উঠে। ব্যথা কল্পনায় অধিক হইয়া উঠে, তাই দিনের চেয়ে রাতে বেদনার বৃদ্ধি মনে হয়। দার্শনিক কান্ট মনের জোরে বাতের বেদনাকে আমল দিতেন না। এমন মনের জোরের পরিচয় ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়।

"বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক
সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি
একটি কাতর শব্দ।
দর্শকজন মুদিল নয়ন,
সভা হ'ল নিস্তব্ধ।"

বন্দা একটিও কাতর শব্দ করিলেন না, কিন্তু দর্শকেরা চাহিয়া দেখিতেও পারিল না। কার্লাইল বলিয়াছিলেন—বুদ্ধিতে খাটো ও হজমে দড় হইলে অনেক সহ্য করিতে পারা যায়; যাহারা রোগাটে তাহারা ব্যথা বোধ করে বেশী। দারুণ বেদনা বোধের সময় রক্তের চাপ অত্যন্ত বেশী হয়; শূল-বেদনায় ঐ চাপ ১৭০-২১০ হইতে দেখা যায়, এবং উপশম হইলেই চাপ একদমে ১২০তে নামিয়া পড়ে; প্রসব-বেদনার সময় ঐ চাপ আরও বেশী হইতে দেখা যায়।

বেদনার অনুভূতি কমাইবার ঔষধ অনেক বাহির হইয়াছে।

... ...

বিদ্যুৎ-পরিবাহ দণ্ড—

বড় বড় বাড়ীর মাথায় বিদ্যুৎপরিবাহ দণ্ড সংলগ্ন থাকে দেখিয়াছি। ঐ দণ্ডের দুই কাজ—(১) বজ্রপতন নিবারণ; ইমারতে সঞ্চিত বিদ্যুৎ দণ্ডের সূচাগ্র দিয়া চোঁয়াইয়া বাহির হইয়া যায়, এবং তাহাতে করিয়া মেঘের বিদ্যুৎ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি মেঘে সঞ্চিত বিদ্যুৎ এত বেশী হয় যে ইমারত হইতে নির্গলিত বিদ্যুতের পরিমাণে তাহার সমস্ত খানির সাম্যাবস্থা লাভ ঘটিয়া উঠা সম্ভব হয় না তবে (২) বিদ্যুৎপরিবাহ দণ্ড আপনার মাথা পাতিয়া বজ্র ধারণ করিয়া তাহাকে
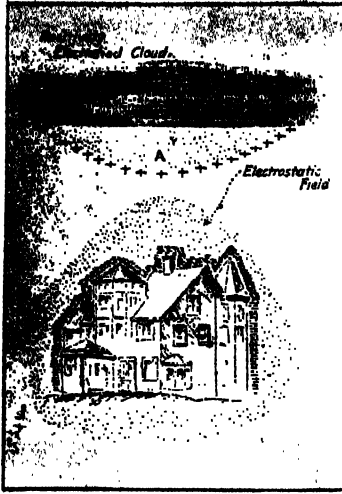
বিদ্যুৎ-পরিবাহ দণ্ড।

দণ্ডহীন বাড়ীর উপর বিদ্যুৎ সমাবেশ।

দণ্ডযুক্ত বাড়ীর উপর বিদ্যুৎ সমাবেশ।

বজ্রপতনের পথ।

রাশি পাতালে পাঠাইয়া দ্যায় এবং ইমারতকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করে। যদি দণ্ড সংলগ্ন না থাকে তবে পতিত বজ্র অর্থাৎ মেঘে সঞ্চিত বিদ্যুৎ রাশি ইমারতের মধ্য দিয়া ভূমিতে যাইবার সহজ রাস্তা না পাইয়া ইমারতের বাধা বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া যায় – কিন্তু দণ্ড ভূমি পর্য্যন্ত ধাতব সংযোগের দ্বারা বিদ্যুতের গতির পথ সহজ করিয়া রাখে।

বিদ্যুৎ পরিবহন বা বজ্রপাতের ফলে ধ্বংসক্রিয়া দুই রকমে সম্পন্ন হয় —(১) তাপের দহন-জনিত, ও (২) গতির বল-জনিত; দ্বিতীয় অবস্থায় বাড়ী চূর্ণ হয়, গাছ বিদীর্ণ হইয়া ফাড়িয়া চিরিয়া যায়, পাহাড় ধসিয়া পড়ে, খড়ের গাদা না পুড়িয়া উল্‌টাইয়া পড়ে।

কতকগুলি জিনিসের উপর কখনো বজ্রপাত হইতে দেখা যায় না, যথা (১) রেলগাড়ী বা তদ্বিধ চলন্ত যান, (২) দেয়াল ও ছাদের তলায় ধাতু মোড়া আছে এমন ইমারত, (৩) ইস্পাতভিত্তিতে স্থাপিত পবনচক্রের স্তম্ভ, (৪) ইস্পাতে নির্ম্মিত যুদ্ধজাহাজ, (৫) ধাতুর কাঠামো করিয়া গড়া ইমারত। এই সমস্ত বস্তু এত শীঘ্র বিদ্যুৎ পরিবহন করে যে ভূমিতে ও মেঘে বিদ্যুৎসঞ্চয়ের বৈষম্য ঘটিতে পারে না, এবং বজ্রপতনও হয় না। যদিই বা কদাচিৎ বিদ্যুৎ চমকে বজ্রপতন হয়, তবে ঐ সব জিনিষে এত বেশী ধাতু ও চুঁচালো অংশ থাকে যে অতি সহজেই বিদ্যুৎ ভূমিতে পরিবাহিত হইয়া যায়। অপর দিকে অপরিবাহ পদার্থের উপর বজ্রপাত হইলে সেই পদার্থ দীর্ণ হইয়া যায়, যেমন— সাধারণ ইমারত, কাঠের বাড়ী, গাছ, মানুষ গরু ঘোড়া, খড়ের গাদা ইত্যাদি; এ সব জিনিস যদি আবার তারের বেড়ার পাশে থাকে তবে ত আর রক্ষাই নাই।

বিদ্যুৎ-পরিবাহ দণ্ডের তত্ত্ব ও উপকারিতা তিনটি চিত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। একখণ্ড বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ (ছবি ১), যদি মাটির কাছাকাছি আসে তবে সেই জায়গার বাতাসও বিদ্যুৎপূর্ণ হইয়া উঠে। পরস্পরের আকর্ষণের বেগে মেঘ হইতে বিদ্যুৎ আসিয়া মেঘের নিকটে বা ঠিক নীচে স্থির কোনো উচ্চ পদার্থে পড়ে—তাহাকেই বলে বজ্রপাত। প্রথম ছবিতে মেঘ যদি ধনাত্মক বিদ্যুতে পূর্ণ থাকে, তবে তাহার নীচের বাড়ীর চারিপার্শ ঋণাত্মক বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। বাড়ীর উপরটা যদি ধাতুনির্ম্মিত হয় তবে বিদ্যুৎপ্রবাহ খুব দ্রুত হইতে থাকিবে; ইট পাথর কাঠ বিদ্যুৎবাহন হইলেও ধাতুর ন্যায় শ্রেষ্ঠ বাহন নয় বলিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ ইট পাথর কাঠের বাড়ীতে মন্থর হয়; তাহার ফলে মেঘের বিদ্যুৎ বজ্রের আকারে বাড়ীটিকে ভেদ করিয়া তাহার সমস্ত বিদ্যুৎ আত্মসাৎ করিয়া সমতা প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় উভয় স্থানের বিদ্যুতের মিলনক্ষেত্র হয় বাড়ীটাই।

যদি বাড়ীর সকল উচ্চ ও চোখা স্থান হইতে চোখা দণ্ড উঠিয়া মাটির সহিত যুক্ত হয়, তবে বাড়ী নিজের বিদ্যুৎ শীঘ্র শীঘ্র আকাশে ত্যাগ করিয়া মেঘের বিদ্যুতের সমতা সম্পাদন করে (২য় ছবি)। ইহাতে বজ্রপাতের আশঙ্কা কমিয়া যায়। এ অবস্থায় উভয় স্থানের বিদ্যুতের মিলনক্ষেত্র হয় মেঘ ও বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী আকাশ।

যদি মেঘে অতি দ্রুত অধিক বিদ্যুৎ সঞ্চিত হইয়া পড়ে এবং তাহার সমতা করিবার মতন বিদ্যুৎ বাড়ী হইতে দণ্ডসূচী বহিয়া উঠিতে না পারে, তবে মধ্যবর্ত্তী আকাশের বাধা অতিক্রম করিবার মতন শক্তি সঞ্চিত হইলেই মেঘের বিদ্যুৎ পরিবাহদণ্ডের সূচীমুখে গিয়া পড়ে (ছবি ৩)। যদি পরিবাহ-দণ্ডের সহিত ভূমির স্পর্শ ভালো ও অবাধ থাকে তবে সেই বজ্রপতনে বাড়ীর কিছু ক্ষতি হয় না; আর যদি পরিবাহ-মুখের ত্যাগ করিবার শক্তির অতিরিক্ত বিদ্যুৎ পরিবাহের মধ্য দিয়া চালিত হয় তবে ইমারতের দেহ বিদীর্ণ করিয়া অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ছড়াইয়া পড়ে।

বিদ্যুৎপরিবাহ দণ্ড সব চেয়ে তামার ভালো হয়; কারণ তামা বিদ্যুতের শ্রেষ্ঠ বাহন এবং উহাতে শীঘ্র মর্চে পড়ে না। চওড়া হইলে লৌহদণ্ডও উত্তম; কিন্তু উহাতে শীঘ্র মর্চে ধরে, এবং তখন কার্য্যকালে সমুৎপন্নে সে দণ্ড কাজে জবাব দিয়া বসে। অসম ধাতুর যোগ হইলে পরিবাহ-দণ্ডে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হয় এবং তাহার ফলে দণ্ডে মর্চে ধরে, সুতরাং দণ্ড সংলগ্ন করিবার সময় দেখিতে হইবে যেন দুই বিভিন্ন ধাতু ঠেকাঠেকি না থাকে। চেপ্টা তারী দণ্ড বাড়ীর গায়ে লাগাইবার পক্ষে ও বিদ্যুৎবাহনের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী।

পরিবাহদণ্ড ইমারতের দেয়ালের গা দিয়া না লইয়া কোণ দিয়া

[illegible]তে হয়, এবং তাহার ৬ ফুটের মধ্যে যদি কোনো ধাতু থাকে তবে তাহারও দণ্ডের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া উচিত। বাড়ীতে যত ধাতব [illegible] আছে তাহাদেরও দণ্ডের সঙ্গে উচ্চতম স্থানে যোগ থাকা দরকার। মাটির সহিত যোগসাধনও বিশেষভাবে আবশ্যক; দশফুট গভীর গর্ত্তের মধ্যে স্যাঁতা রাখিয়া যোগ করিতে হইবে। টেলিফোঁর তার দিয়াও বিদ্যুৎ আসিয়া বাড়ী জখম করিতে পারে। সুতরাং তারের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী বিদ্যুৎ-গ্রেপ্তারী কল সংলগ্ন করা উচিত। তারের বেড়ার খুঁটি ঘন ঘন মাটিতে গভীর করিয়া পোঁতা উচিত, নতুবা ঐ তার বাহিয়া বিদ্যুৎ ছুটিয়া গিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া অগ্নিকাণ্ড ধাক্কা (shock) প্রভৃতি অনর্থ ঘটাইতে পারে। ঝড়জলের সময় নিরাশ্রয় পশু বেড়ার ধারে জমা হয়; তারের বেড়ার খুঁটা যদি মাটির মধ্যে গভীর করিয়া পোঁতা না থাকে তবে সঞ্চরমান বিদ্যুৎপ্রবাহ যেদিকে অল্প বাধা থাকে সেই পথেই মাটিতে মিশিতে চায়, এবং তাহা করিতে গিয়া পশুশরীরের ভিতর দিয়াই রাস্তা করে, এবং তাহাতে পশুর মৃত্যু ঘটে।

* * *

করাতে কাটে কেন ?—

ধারালো ছুরির চেয়ে করাতে কাঠ ভালো করিয়া শীঘ্র কাটা যায় কেন? এক রকম করাতে কাঠের আঁশের আড়াআড়ি কাটা যায়, অন্য রকমে আঁশের বরাবর কাটা যায়; ভোঁতা করাত জোরে চাপ দিয়া দ্রুত চালাইলে কাঠ কাটে কেন? এই সব ব্যাপার নিত্য দেখা

ছুরীর নখ দিয়া তক্তা কাটা।
A-B রেখায় একবার ও C-D রেখায় একবার ছুরীর নখ টানিলে যে ফল হয় করাতের দাঁতির উপর দুইটি সূক্ষ্ম ধার থাকাতে করাতে কাঠ কাটার সময় সেইরূপ ফলই হইয়া থাকে। দুই রেখার মধ্যস্থলের কাঠ গুঁড়া হইয়া ঝরিয়া পড়ে।

যায়, কিন্তু কোনো যন্ত্রতত্ত্ববিদ এখনো ইহার উত্তর দ্যান নাই। [illegible] মি: [illegible] উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন—একটা [illegible] আঁশের টানে বরাবর ঠেলিয়া লওয়া

আড়ি করাতের দাঁতি ও তাহাতে দুইটি সূক্ষ্ম কোণ যেন সমান্তরালে স্থাপিত দুখানি ছুরীর নখের মতন।
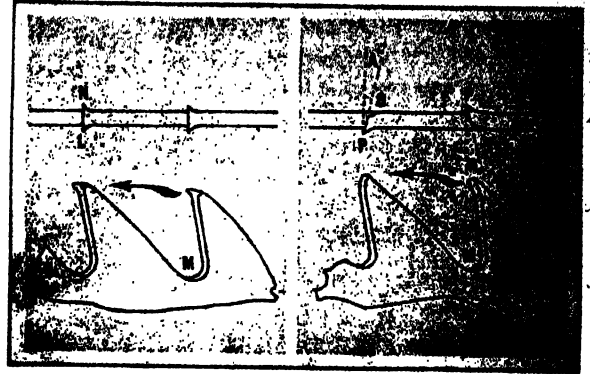
করাতের দাঁতি যেন এক একখানি বাটালি, দাঁতিগুলি এক এক ফালি করিয়া চাঁছিয়া চাঁছিয়া কাঠ বিখণ্ডিত করে।

যায় তবে একটা চাঁচ্‌ ওঠে; করাত এই রকমে কাটে, তার প্রত্যেকটি দাঁতি যেন এক-একখানি ছোট বাটালি, প্রত্যেক ঘর্ষণে উহারা এক এক চাকলা চাঁছনি তুলিয়া তুলিয়া কাঠ কাটিয়া ফেলে। এই জন্য প্রত্যেকবার কাঠ কাটার পর করাতে উখা ঘষিয়া দাঁতিগুলাকে ধারালো করিয়া লইতে হয়। যদি বাটালি কাঠের মধ্যে গভীর হইয়া কাটিয়া বসে তবে উহাকে কাঠের ঘনিষ্ঠ বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর করা কঠিন হয়; এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য করাতের দাঁতির মুখগুলা একটু করিয়া ঢালু ও বাঁকানো থাকে এবং উখা ঘষিয়া মুখগুলা এই জন্যই খুব সরু ছুঁচের মতন করিতে হয়। করাতের দাঁতির উপর দিয়া আঙুল বুলাইলে যদি গোল গোল বোধ হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে করাতে ঠিক ধার করা হয় নাই; যদি ছুঁচবেঁধার মতন বোধ হয় তবে ঠিক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ ধারালো করাতে অত্যল্প পার্শ্বসংঘর্ষণ লাগে, এবং সেইজন্য কাটা পরিষ্কার হয়। করাতের দাঁতিগুলি মাথায় সমান উঁচু হওয়া দরকার; নয়ত লম্বা দাঁতির উপর বেশী চাপ পড়ে ও খাটো দাঁতি আলগা থাকে, তাহাতে কাটা সমান ও চৌরস হয় না। দাঁতির মুখের দুপাশের দাড়া ঠিক সমান করিবার জন্যই করাতের পাতের পাশেও উখা ঘষিতে হয় এবং তাহা[illegible], আবার দাঁতিগুলিকে চোখা করিবার জন্য ফেউরের ঘরে ঘরে উখা ঘষা দরকার। [illegible]

করাত যেমন কতকগুলি বাটালির সমষ্টি, আড়ি-করাত তেমনি কতকগুলি ধারালো নখওয়ালা ছুরির সমষ্টি; কাঠের আঁশের আড়াআড়ি বাটালি চালাইলে কাঠের চাঁছনি গোটা ওঠে না, ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়; কিন্তু ধারালো ছুরি টানিলে আঁশ এড়ো-বাগে কাটা যায়; যদি দুটি পাশাপাশি রেখায় ছুরি টান যায়, তবে সেই দুই রেখার মধ্যবর্ত্তী কাঠের চাকলা সহজেই তুলিয়া ফেল যায়; আড়ি করাতেও ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে: করাতের দাঁতির ছুঁচ-মুখ যেন ছুরির নখ আর দাঁতির পাশ যেন ছুরির ধার, ডবল ডবল লাইনে কাঠের আঁশ আড়াআড়ি কাটিয়া চলে এবং সেই জোড়া লাইনের মাঝের কাঠের চাকলা উঠিয়া আসে—তাহাই করাতগুঁড়া। দাঁতির খাঁজগুলি একেবারে চোখা কোণ না হইয়া একটু গোলালো হইলে করাতগুঁড়া সরিয়া পড়িবার সুবিধা হয়।

* * *

লোকে কেন মাতাল হয়?—

মাতাল হইবার ঝোঁক এক রকম রোগ। শিকাগোর মনোনিদান পরীক্ষাশালার (Psychopathic Laboratory) ডাক্তার উইলিয়াম জে হিকসন ইহা পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এই পরীক্ষার আরম্ভ হয় সুইজারলাণ্ডের জুরিক শহরে প্রথম। ইহারা বলেন যে, যাহারা মাতাল হয় তাহারা মূলে হয় দুর্ব্বলচিত্ত, প্রচ্ছন্ন পাগল, মনমরা, মৃগীরোগী বা এমনি কিছু থাকে; তাহারা একবার মদ খাইলে মদ তাহাদিগকে পাইয়া বসে এবং বারবার না খাইলে তাহাদের মন
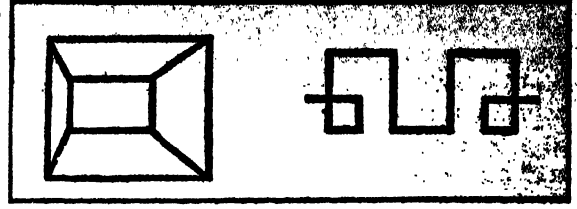
মাতাল ধরিবার নক্সা।

বেশী রকম মাতাল হইবে। অতএব ঐ রকম লোকদের পক্ষে সুপথ্য সৎসংসর্গে স্বচ্ছল উপার্জ্জন অথবা অল্প পরিশ্রমের কোনো কাজে লিপ্ত থাকা। মানুষ যদি দেখে তাহার প্রতি কাহারও বাস্তরিক দরদ আছে, তবে সে গলিয়া যায়; ডাক্তারেরা যদি দরদ দেখাইয়া তাহার মনের অবস্থা পরীক্ষা ও ব্যবস্থা করেন তবে অনেকে ক্রমশ সুস্থ ভদ্রলোক হইয়া উঠিতে পারে। শতকরা ৯৯ জন মাতালের মাতলামির মূলে তাহাদের মনের রোগ থাকে দেখা গিয়াছে, সুতরাং দৈহিক চিকিৎসায় মনের ব্যাধি সারাইবার চেষ্টা বৃথা; মন যাহাতে তাজা পবিত্র হইয়া উঠে তাহার চেষ্টা করাই মাতালের প্রকৃত চিকিৎসা। যাহারা অল্পস্বল্প মদ খায় তাহারা মাতালের দলের কি না তাহা এখনো নির্ণীত হয় নাই। ডাঃ রীড বলেন, যাহারা তৃষ্ণা, বা ক্লান্তি বোধ করিলে মদ খায় তাহারা মূর্খ হইলেও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত নয় বোধ হয়—কিন্তু যদি প্রচ্ছন্ন ব্যাধি কিছু মনের কোণে লুকানো থাকে তবেই সর্ব্বনাশ,—দেহ,
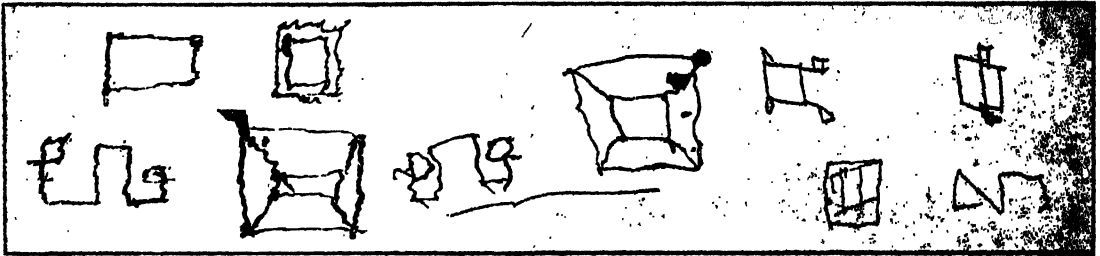
মাতালের হাত কাঁপার নক্সা।

সুস্থির হয় না। তাহারা জানে যে মদ বিষ, তাহারা মদ খাইয়া মরিতে চলিয়াছে, তবু তাহারা ঝোঁক সামলাইতে পারে না। ঐ পরীক্ষাগারে একপ্রকার চিত্রাঙ্কণ-পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; তাহাতে ধরা পড়ে কাহার মন সুস্থ ও কাহার দুর্ব্বল, অসুস্থ। কতকগুলি রেখাবদ্ধ আয়ত ক্ষেত্রের চিত্র দশ সেকেণ্ড দেখিতে দিয়া লোককে মন হইতে উহা আঁকিতে বলা হয়; যাহাদের মন সুস্থ তাহারা সহজেই অবিকল উহা আঁকিতে পারে; কিন্তু যাহাদের মন অসুস্থ, তাহারা কিছুতেই ঠিক করিয়া নক্সাটি আঁকিতে পারে না, এবং তাহাদিগের মদ ছোঁয়া যে একেবারেই উচিত নয় ইহা প্রমাণ হইয়া যায়। মাতালের মাতলামি মদের দ্বারা উদ্বোধিত প্রচ্ছন্ন পাগলামির ফল ছাড়া আর কিছু নয়।

এখন এইসব মাতালদের লইয়া কি করা যায়, রাষ্ট্রের ইহা একটা বিষম সমস্যা। যদি তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখা যায় তবে জেলখানায় সে মদ খাইতে পাইবে না বটে, কিন্তু বাড়ীতে তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবার তাহার উপার্জ্জনে বঞ্চিত হইয়া অন্ন খাইতে পাইবে না। যে লোক স্বভাবত মনমরা বলিয়া মাতাল হয়, তাহার কয়েদে দেহ কিছু লাভবান হইলেও মন আরো দমিয়া যাইবে; এবং ছাড়া পাইলেই সে আরো মন, মণিব্যাগ, সবই ফোঁপরা হইয়া যাইবে অচিরেই! মদের লাল রং বিপদের সঙ্কেতসূচক লাল পতাকা। যে লোকের মদ্যপিপাসা অত্যন্ত তাহার উচিত কোনো মন-চিকিৎসকের শরণ লওয়া, কারণ মদ খাইবার ইচ্ছা অস্বাভাবিক, সুস্থ লোকের উহা থাকে না। চারু।

* * *

সংবাদপত্রের শৈশব—

অতি প্রাচীন কালে চীনে সংবাদপত্র ছিল। পাশ্চাত্য সংবাদপত্রের জন্মভূমি ইটালী। এই দেশবাসীদিগের মস্তকে সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র বাহির করিবার ধারণা আইসে। শাসকসম্প্রদায়ের সাহায্যে ভেনিস সহরে ইহার আবির্ভাব হয়। ভেনিসের দেখাদেখি ইটালীর আর আর সহরেও ক্রমশঃ ইহার প্রচলন ঘটে। সংবাদপত্রের নাম "গেজেটাস"; এই রোমীয় পদটি সম্ভবতঃ "গেজের" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ইহা একপ্রকার পাখীর নাম। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ভেনিস সহরের এক আনা মুদ্রার নাম গেজেটা ছিল; সাধারণতঃ সংবাদপত্রগুলি ঐ মূল্যে বিক্রীত হইত এবং তাহা হইতেই গেজেটাস্ পদটির উৎপত্তি

হইয়াছে। শেষোক্ত মতটিই সমধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। অন্য একদল শব্দতত্ত্ববিদ্ বলেন, লাটিন গাজা (gaza) শব্দটি কথায় বার্ত্তায় একটু বাড়াইয়া গেজেটা বলা হইত; ইহাতে কয়েকটি সংবাদের সংগ্রহ বুঝা যাইত, তাহা হইতে সংবাদপত্রের নামের সৃষ্টি হইয়াছে। স্পেনীয়গণ এই শেষোক্ত মতের সমর্থন করেন এবং তদনুসারে তাঁহারা সংবাদপত্র-লেখকের নাম গেজেতেরো এবং সংবাদপত্রপ্রিয় ব্যক্তির নাম গেজেতিস্তা রাখিয়াছেন।

মিঃ জর্জ্জ চামার্স (Chalmers) তাঁহার রুডিম্যানের (Rudiman) জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, ভেনিস দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার বহুকাল পরে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত হস্তলিখিতরূপে প্রচারিত হইত; সংবাদপত্র মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয় ইহা নাকি শাসকবর্গের স্পৃহনীয় ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ে ফ্লোরেন্স সহরের কোন লাইব্রেরীতে ত্রিশখণ্ড ভেনিস দেশীয় সংবাদপত্র ছিল, সকলই হস্তলিখিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাগ্‌ভাগে ইংলণ্ডে নিয়মিত সংবাদপত্রের আবির্ভাব হয়। চামার্স ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রের স্রষ্টা। তিনি লিখিয়াছেন, "রাজ্ঞী এলিজাবেথের জ্ঞান এবং বার্লের বুদ্ধিবৃত্তি সংবাদপত্র সৃজনে সহায়তা করিয়াছে এজন্য তাঁহাদের নিকট সমগ্র ইংরেজ-সমাজ ঋণী; তাঁহাদের এই চেষ্টায় ইংরেজ-জাতির গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।" স্পেনীয় নৌ-বহরের আতঙ্ক ইংলণ্ডে নবীন জাগরণের সূচনা করিয়াছিল। তৎকালে যাহাতে সমগ্র দেশের সংবাদ সঠিকরূপে প্রচারিত হইয়া জনসাধারণের উৎকণ্ঠা প্রশমিত করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে রাজনৈতিকগণ সংবাদপত্রের অভাব বোধ করেন। তাহার ফলে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী এলিজাবেথের পৃষ্ঠপোষকতায় 'দি ইংলিস মার্কিউরিয়াস' নামে সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে সংবাদপত্র বাহির হয়। এই পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইত না, মধ্যে মধ্যে স্পেনীয়গণের বিরুদ্ধে জাতিকে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে বার্লের উত্তেজনাময় সন্দর্ভসমূহে পুষ্টদেহ হইয়া প্রকাশিত হইত। উক্ত পত্রিকার কয়েক সংখ্যা লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার এক সংখ্যায় স্পেনরাজধানী মাদ্রিদ সহর হইতে একখানা চিঠি আসিয়াছিল তাহার নকল আছে। চিঠিখানিতে রাজ্ঞী এলিজাবেথকে মারিয়া ফেলিবার এবং সমগ্র পোপ-সমাজচ্যুত ইংরেজদিগকে স্পেনের জাহাজে লইয়া গিয়া নির্দ্দয় অত্যাচারে হত্যা করিবার কথা আছে। মিঃ চামার্স দুই শতাব্দীর ধুলা ঝাড়িয়া এই-সমস্ত প্রাচীন সংবাদপত্রের তথ্যান্বেষণ করিতে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন।

লণ্ডনের মিউজিয়মে যে সংবাদপত্রের সংগ্রহ আছে তাহার সর্ব্বপ্রথম সংখ্যা ৫০ নম্বর চিহ্নিত কাগজটি তৎকালীন ইংলণ্ডীয় অক্ষর বা গথিক অক্ষরে লিখিত নহে, রোমীয় অক্ষরে লেখা। ইহাতে আধুনিক লণ্ডনগেজেটে যেরূপ সংবাদ থাকে কতকটা সেইরূপ ভাবেই লিখিবার ধরণ দেখা যায়। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই তারিখের সংখ্যায় ২১শে জুলাই তারিখের এইরূপ একটি সংবাদ আছে—গতকল্য স্কটল্যাণ্ডের রাজদূত, মিঃ ফ্রান্সিস্ ওয়াসিংহামের নিকট পরিচিত হইয়া কিছু সময়ের জন্য রাজ্ঞীর সহিত গুপ্ত পরামর্শ করিবার অনুগ্রহলাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাণীর নিকট তৎকালে একখানা চিঠি দাখিল করিয়াছিলেন তাহাতে তদীয় প্রভু স্কটল্যাণ্ডের নৃপতি আমাদের রাণীকে জানাইয়াছেন যে তিনি ইংলণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট সমাজ ও রাজ্ঞীর স্বার্থ সংরক্ষণার্থ দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রাণব্যয়ে তাহা প্রতিপাদন করিতে প্রস্তুত আছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না, এই দ্বাবিংশবর্ষ বয়স্ক যুবক নৃপতি তৎসভায় ইংরেজদূতকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে ইউলিসীস রাজস পলিফেমাসের নিকট হইতে যে ভদ্রতা পাইয়াছিলেন স্পেনীয়গণের নিকট হইতে আমরাও তাহার বেশী অন্য কিছু আশা করিতে পারি না।

উক্ত মার্কিউরিয়াস পত্রের কোন সংখ্যা হইতে মিঃ চামার্স কতকগুলি পুস্তকের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়াছেন, এগুলিও কতকটা আধুনিক ধরনেরই। ইহার সাহায্যে তৎকালীন ইংরেজি সাহিত্যের অবস্থার একটু আভাষ পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তকগুলি রাজ্ঞীর নিজ মুদ্রাকর ক্রিস্তেফ এবং বেকার কর্তৃক প্রকাশিত এবং বিক্রীত হইত।

ক্রমওয়েল যখন তাঁহার খরধার খড়্গ উন্মোচন করিয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধের অনল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন তৎকালে ইংলণ্ডে নিয়মিত সাময়িক পত্রের উল্লেখযোগ্য প্রাদুর্ভাব ঘটে। পিটার হেইলিন (Heylin) তাঁহার "কসমোগ্রাফী" নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন —প্রত্যেক যুদ্ধরত সহরের ঘটনাসমূহ সাপ্তাহিক সংবাদপুস্তিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। রাজপক্ষ এবং বিদ্রোহীপক্ষ উভয় দিক হইতে স্বকীয় মত সমর্থনার্থ প্রতিপক্ষকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া পত্রিকা প্রচারিত হয়। এইরূপে হল (Hull) সহর হইতে "নিউজ", ইয়র্ক হইতে "ট্রুথ", আয়রল্যাণ্ড হইতে "ওয়ারেন্টেড টাইডিংস্" নামক পত্র প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত "স্কট-পারাবত"কে ঠোকর মারিবার জন্য "পার্লিয়ামেণ্ট চীল" এবং "গুপ্তপেচা," হেরাক্লিটাস রিডেন্সের বিরুদ্ধে ডেমোক্রিটাস রিডেন্স (Democritus ridens). উইকলি ডিস্কভারারের বিপক্ষে "ডিস্কভারার ষ্টার্ক নেকেড," মার্কিউরিয়াস ব্রিটানিকাসের বিরুদ্ধে মার্কিউরিয়াস ম্যাষ্টিক্স প্রভৃতি মুখরা পত্রিকাসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়া সংশয়াকুল জনসাধারণকে গলার জোরে স্বীয় পক্ষভুক্ত করিবার জন্য তৎকালে ইংলণ্ড সর-গরম করিয়া তুলিয়াছিল।

সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ ক্রমে তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য রাজনৈতিক আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া প্রতিপক্ষের সহিত বিবাদ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। ইঁহাদের প্রতিপক্ষকে আক্রমণের রোষতীব্রতায় সমাজে রীতি-নীতি ভদ্রতার বন্ধন চূর্ণ হইয়া যায়। অকথ্য, অশ্রাব্য, অশ্লীল রচনাবিন্যাসের বাসনে ব্রিটনভূমির একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠে। অন্তরে াহ এতৎদ্বারা ইন্ধনপুষ্ট হইয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করে।

প্রত্যেক দেশে একদল লোক আছে যাহারা স্বীয় অসংস্থিত মতির উদ্দামস্ফূর্ত্তিতে তৃপ্তি লাভ করে; দেশ, কাল, পাত্রাপাত্র, ধর্ম্মাধর্ম্ম, রীতিনীতি কিছুই তাহারা লক্ষ্য করে না। সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগের সঙ্কীর্ণতায় এরূপ বহু পুরুভুজ লেখকের প্রাদুর্ভাব ঘটে। নিডহাম, সারজন বার্কেনহেড্ এবং সার রাজার ল' এষ্ট্রেঞ্জ (Sir Rager L, Estrange) ইঁহাদের অন্তর্গত।

নিডহাম সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও রাজনীতিজ্ঞতার আধার ছিলেন। অবস্থানুযায়ী আপনার মত কেমন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চালাইতে হয় তাঁহার চরিত্রে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কলেজের লেখাপড়া শেষ করিয়া ইনি লণ্ডনে আইসেন এবং প্রথমতঃ এক দর্জ্জিস্কুলের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে এক সরাইয়ের কেরানী হন। অতঃপর তাহা ছাড়িয়া দিয়া চিকিৎসা ও রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভাগ্যচক্রের পরীক্ষা করেন। তৎকালে ইংলণ্ডে ইহা দ্বারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করিবার উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করা কঠিন ছিল না। সর্ব্বশেষে তিনি হন কাপ্তেন। কিন্তু তাঁহার কাজের মধ্যে কাজ ছিল সহরের বড় বড় লোকের নিন্দা রটাইয়া গুজবের সৃষ্টি করা। তাঁহার সাফল্য হইল ইহাতেই। দিন কয়েক পরে তাঁহার বন্ধু বান্ধবের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে পড়িয়া তিনি মার্কিউরিয়াস ব্রিটানিকাস নামে এক সংবাদপত্র বাহির করেন। লর্ডই হউন, আর্লই হউন, বিশপই হউন আর ব্যারণই হউন নিডহামের আপ্রাণ চেষ্টায় কাহারও চরিত্রে বিন্দুমাত্র দোষের

দাগ বসিবার অবসর ছিল না। অন্যে পরে কা কথা স্বয়ং রাজাও ইঁহার হাত এড়াইতে পারিতেন না। দৃষ্টির অনুবীক্ষণ কষিয়া তিলকে তালে পরিণত করিয়া ইনি মানুষের দোষ বাছিয়া বাহির করিয়া তাহার ধ্বংসসাধন করিতে নিত্য নিরলস ছিলেন। এমন নির্ভীক লেখকের নাম জাহির হইতে অধিক সময়ের আবশ্যক হইল না; অচিরেই তিনি গ্রে সাহেবের সরাইয়ের কাপ্তেন নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। নিডহামের কলম দিয়া যাহা বাহির হইত তাহাই দেববাণীর মত সম্মানিত হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন লোকরঞ্জন নায়ককেও রাজরোষে পতিত হইতে হইল; কিন্তু নিডহাম ভড়কাইবার লোক ছিলেন না, তিনি অমনি চট্ করিয়া রাজভক্তের শিরোমণি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কাগজের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "মার্কিউরিয়াস প্রাগমাটিকাস" হইল। তখন তাঁহার লেখনীর আক্রমণ আপতিত হইল রাজা চার্লসের বিপক্ষ প্রেসবিটেরিয়ানদিগের উপর। পরে যখন রাজবিপক্ষদলের প্রাধান্য হইল তিনিও দেখিতে দেখিতে আপনার মোড় ফিরাইয়া অতিমাত্র রাজনিন্দুক হইয়া পড়িলেন। এবার তাঁহার খবরের কাগজের নাম হইল "মার্কিউরিয়াস পলিটিকাস"। দ্বিতীয় চার্লস যখন নৃপতি নির্ব্বাচিত হইলেন, তখন পাছে তাঁহার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হয় এই ভয়ে তিনি কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিবার উদ্দেশ্যে হল্যাণ্ডে পলায়ন করেন। অতঃপর কোন সভাসদকে কিছু টাকা ঘুষ দিয়া ইনি রাজার ক্ষমা লাভ করেন। সর্ব্বশেষে নিডহাম অন্য কোন দিকে বিশেষ সুবিধা করিয়া লওয়া নিরাপদ নহে মনে করিয়া আপনার বিষজ্বালা ডাক্তারদের উপর ঢালিতে থাকেন। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ত চুপ করিয়া থাকিবার নয়!

সারজন বার্কেনহেড ছিলেন অটুট রাজভক্ত। চঞ্চলবুদ্ধির প্রাখর্য্যে, পরচরিত্রচিত্রে কলঙ্করেখার প্রতিফলন-পটুতায়, আত্মমত সমর্থনার্থ অন্ধ-আবেগাকুলিত বিষোদ্গিরণে ইনি নিডহামের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। অক্সফোর্ড সহর এই রাজভক্তের সাধনভূমি ছিল। তথা হইতে মারকিউরিয়াস আলিকাস নামে তাঁহার সম্পাদনে এক কাগজ বাহির হইত। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি সাময়িক খণ্ড-পুস্তিকারও তিনি জন্মদাতা ছিলেন। একার্য্যে তাঁহার বুদ্ধির বিশেষ তীক্ষ্ণতা সূচিত হইত। সংস্কারপ্রয়াসী দলকে আক্রমণ করিয়া 'পলস্ চার্চ্চইয়াড' নামে ইনি এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ক্রমওয়েলকে ব্যঙ্গ করিয়া বার্কেনহেড "দি জল্ট" (The Jolt) নামে যে কবিতার বই বাহির করেন তাহার বর্ণনীয় বিষয়টি এইরূপ—জার্ম্মানীর ওল্ডেনবার্গ প্রদেশের কাউণ্ট ক্রমওয়েলকে ছয়ঘোড়ার একখানা ফিটন গাড়ী উপহার দেন। ক্রমওয়েল বড় ফূর্ত্তি করিয়া নিজেই সে গাড়ী হাঁকাইয়া হাইডপার্কে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া সেই দিনই তাঁহার দফা রফা হইতে বসিয়াছিল। কিন্তু হায়! বিধাতা ইংলণ্ডের উপর প্রসন্ন হইতে যাইয়াও হইলেন না। লোকটার এমন ফাঁড়াও কাটিয়া গেল? এ আক্ষেপ রাখিবার কি স্থান আছে?

সার রজার লা এষ্ট্রেঞ্জ তাঁহার প্রতিযোগীগণের মধ্যে রাজনীতি-কুশলতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অব্যবস্থিত ছিল, লেখাও বড় মার্জ্জিত নহে। ইনি রাণী মেরীর চক্ষুশূল ছিলেন।

ফরাসীদেশে ডাক্তার রেনডে (Renaudet) সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্রের সৃষ্টি করেন। ইনি তাঁহার রোগীগণকে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট রাখিবার জন্য নানারূপ সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। ভদ্রলোক ব্যবসায়ে তেমন পসার করিতে না পারিয়া সপ্তাহের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার যুক্তি ঠাওরাইলেন। এ হিসাবে তাঁহার রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে ইহার বিশেষ সুবিধা হইয়া উঠে।

সংস্কারকযুগের শেষে ইংলণ্ডে রাজপ্রভাবমুক্ত স্বাধীনভাবে জনসাধারণের পক্ষসমর্থক "দি অরেঞ্জ ইণ্টেলিজেন্সার" নামক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ হয়।

রাণী এনের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে একখানি দৈনিক এবং অনেকগুলি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। কেহ কেহ সাহিত্যচর্চ্চার উদ্যম প্রকাশ করিতেছিলেন। সার রিচার্ড ষ্টিল সাহিত্য, নীতি এবং রাজনীতি, এই তিন বিষয়ের সমন্বয়ে সংবাদপত্রের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু এডিসনের লেখনীদক্ষতা এবং মার্জ্জিত রুচিই ইংরেজী সংবাদপত্রের যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

* * *

বয়স ও প্রতিভা।—

সমাজ-সমস্যার বিচার উপলক্ষ্যে চিকাগো সহরের মার্কিন-পণ্ডিত সি, এল, রেড্‌ফিল্ড The Dynamics of Evolution নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়াছেন; এবং ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্টে একটি তালিকা দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে যাঁহারা প্রতিভাবলে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই পিতার অল্পবয়সের পুত্র নহেন। এই বিষয় লইয়া তিনি যে দুইটি উপপত্তি গড়িয়াছেন তাহাদের পোষকতার জন্য লিখিয়াছেন যে যদি কেহ তাঁহার উপপত্তিদ্বয়ের বিরোধী কোন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিতে পারেন তবে তিনি ৬০০ শত ডলার অর্থাৎ প্রায় একহাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। রেড্‌ফিল্ডের এই গ্রন্থের কথা এবং তাঁহার ঐ উপপত্তি দুইটির বিষয়, ডেসমণ্ড নামক একজন লেখক সম্প্রতি ইংলণ্ডের 'Daily News' পত্রিকায় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। রেড্‌ফিল্ডের বক্তব্য এই যে যাঁহারা পিতার ৩০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বের সন্তান, তাঁহারা বিষয়-কর্ম্মে দক্ষ হইতে পারেন, এবং যোদ্ধা বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু বড়দরের কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি হইতে পারেন না। ইতিহাসে যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহাদের অক্ষয় যশের বিষয়ে এখন আর বিবাদ বিসম্বাদ নাই তাঁহাদের মধ্য হইতে কেহ যদি গ্রন্থকারের উপপত্তির বিরুদ্ধে কোন দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন তবে তিনি প্রতিশ্রুত পুরস্কারটি পাইবেন। গ্রন্থকার দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন যে পিতার ৩০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের সন্তানেরা সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় অথবা কবিত্বে যশস্বী হইতে পারেন, কিন্তু খুব বড় কবিও পিতার প্রায় ৪০ বৎসরের কমের সন্তান নহে। দৃষ্টান্তস্থলে সেক্সপীয়ার, গেটে প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছেন। যাঁহাদিগকে এ সংসারে প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল এবং বৈজ্ঞানিক বলিয়া জানি তাঁহারা সকলেই যে আপনাদের পিতার ৪০ বৎসর বয়সের পরের সন্তান, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। খ্যাতিসম্পন্ন জীবিত লোকদিগের কথা উত্থাপন করা সুরুচিসঙ্গত নয়। রেড্‌ফিল্ডের গ্রন্থে বুদ্ধদেবের কথা আছে এবং তিনি যে বৃদ্ধ পিতার পুত্র তাহাও উল্লিখিত আছে। যাঁহাদিগকে বড় বলিতে গেলে এদেশে এখন কোন বিবাদের সম্ভাবনা নাই তাঁহাদের কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মনের বিষ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পর দিন প্রভাতে গোবিন্দ আমার সাক্ষাৎপ্রয়াসী হইয়া উপস্থিত হইল। আমি তখন জলযোগে ব্যস্ত ছিলাম। সে অসময়ে আগমনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল "কি করিব মহাশয়, শ্রেষ্ঠিনীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। পুরুষ রমণীর দাস।"

আমি তাহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলাম, "সকলে নয়, রাজ্য-ছাড়া জীব অনেক আছে; ধরুন, আমি। কিছু খাইবেন কি?"

"ধন্যবাদ। আমি জলখাওয়া শেষ করিয়া আসিয়াছি। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আপনার অসুবিধা ঘটাইতে ইচ্ছা করি না। শ্রেষ্ঠিনী বলিয়াছেন—"

আমি তাহার বাক্যে বাধা দিয়া বলিলাম, "আপনি তবে কাল অত রাত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?"

"হাঁ—কয় মিনিটের জন্য। আপনার উপহারের বিষয় উত্থাপন করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আপনাকে শত ধন্যবাদ দিয়া বলিতে বলিয়াছেন, আপনি প্রথমে তাঁহার গৃহে পদধূলি দিয়া তাঁহাকে ধন্য না করিলে কিছুতেই তিনি অন্যের হস্তে এ উপহার গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আপনি তাঁহার পারিবারিক বিশিষ্ট পুরাতন বন্ধু, —উপহার অপেক্ষা আপনার সাক্ষাৎ পাওয়াই তাঁহার অধিক আনন্দের। তিনি আশা করেন আপনি তাঁহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন না। অন্যের পক্ষে শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদ রুদ্ধ সত্য। কিন্তু অন্যের পক্ষে যে ব্যবস্থা আপনার সম্বন্ধে কি তাহাই হইতে পারে। আপনি এ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি শোকে সান্ত্বনা লাভ করিবেন। তিনি ব্যগ্র হইয়া আপনাকে তাঁহার আলয়ে আমন্ত্রণ করিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

আমি বিনীত ভাবে বলিলাম "আমি তাঁহার বাক্যে পরম আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু এমন লোভনীয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার অবকাশ আমার অতি কম। বড় দুঃখের সহিত তাঁহার অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিতে হইতেছে। আপনি আমার হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন, তিনি যেন অসন্তুষ্ট না হন।"

গোবিন্দ একটু বিরক্ত হইয়া বলিল "তবে সত্য সত্যই কি আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইতে অনিচ্ছুক? শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদে পদার্পণ করিবেন না? তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন!"

আমি হাসিয়া বলিলাম "প্রিয় বন্ধু! অনুগ্রহ করিয়া বৃদ্ধকে যুবকের ভাবে বুঝিবেন না। তাঁহাকে উপেক্ষা করা আমার অভিপ্রায় নহে। বন্ধু-পরিবারের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রীকে অগ্রাহ্য ত বেশী কথা, অসন্তুষ্টই কি করিতে পারি? কিন্তু করিব কি? কাজের কাছে কিছুই বড় নয়। অনেক দিন পরে তাম্রলিপ্তিতে ফিরিয়াছি, করণীয় কাজগুলি এখনও শেষ করিতে পারি নাই। ঝঞ্চাট না মিটা পর্য্যন্ত আমার অবসর একবারে নাই। তাঁহাকে আমার অবস্থা বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া ক্ষমাটা আদায় করা চাই। আপনাকে আমি উকিল পাকড়াইয়াছি; আমার যেন হার না হয়, অনুগ্রহ করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিবেন।"

গোবিন্দ বিদ্রূপের স্বরে বলিল "ভাল, ভাল, আপনার ন্যায় ব্যক্তি আমি দ্বিতীয়টি দেখি নাই! বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অপেক্ষাও আপনি কঠোর! স্ত্রীজাতির প্রতি আপনার এত ঘৃণা!"

আমি বলিলাম "না না, আমাকে ভুল বুঝিবেন না;— স্ত্রীলোক মাত্রকেই আমি ঘৃণা করিব কেন? শ্রেষ্ঠিনীর কথা ভিন্ন। সকলেই কি সকলকে ঘৃণা করিতে পারে? প্রথমে ভাল না বাসিলে ঘৃণা করা যায় না। আমি কি কখন কাহাকে ভালবাসিয়াছি? ঘৃণা? না অন্য কিছু? অপছন্দ বলুন। আমার মনে হয় স্ত্রীলোকগুলি বাহ্যিক দৃশ্যে পুরুষের স্কন্ধে এক একটি ছোট খাট হালকা বোঝার মত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের ন্যায় অমন ভারী জিনিষ কমই আছে।"

"সংসারে অনেকেই ত সে ভার স্ব-ইচ্ছায় সানন্দে স্কন্ধে তুলিয়া লইতেছে।"

"স্ব-ইচ্ছায় নয়, প্রবৃত্তির তাড়নায়। মানুষ কাহারও

প্রবৃত্তিকে বশে আনিতে পারে। লালসায় তীব্র বাহ্যিক আনন্দে প্রবৃত্তিকে প্রেম আখ্যা দিয়া লোকে, মাছে বঁড়শী গেলার মত, উহা গলাধঃকরণ করে। গলাধঃকরণ করিয়াই প্রাণ লইয়া টানাটানি;—যদিও কোনক্রমে কায়ঃ-ক্লেশে অব্যাহতি পায়, বঁড়শীর চিহ্ন কিন্তু জন্মে মুছে না।"

গোবিন্দ মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "আপনার সহিত এবিষয়ে আমার একমত হওয়া অসাধ্য। তবু তর্ক করিতে চাই না। আপনার ভাবে আপনি হয় ত ঠিক; কিন্তু যুবক যে, যাহার প্রতি-নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সুখের আশা জাগিতেছে, তাহার পক্ষে রমণীর ভালবাসা, হাস্যলহরী, পদ্মে নিপতিত সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় নয় কি? মানুষ কোন নারী-বিশেষকে আকাঙ্ক্ষা না করিতে পারে, কিন্তু নারীর মাধুর্য্য তাহাকে একদিন-না-একদিন অনুভব করিতেই হইবে। আপনিও যে জীবনে তাহা হইতে মুক্ত, সে কথা ঠিক বলিতে পারেন কিনা সন্দেহ। তাহা অনুভব করিয়াছেন, হয়ত প্রশ্রয় দেন নাই; প্রেম-পিপাসা হৃদয়ে জাগিয়াছে, সে ভালবাসা কাহাকেও দান করেন নাই; কেহ তাহা দান করিতে আসিলেও তাহাকে সুযোগ দেন নাই,—এই যা।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "ওঃ রমণীর প্রেম কোন দিন কল্পনা করি নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে বৈ কি। তবে আমার কল্পিত রমণী ভিন্নপ্রকৃতির, তাহার সন্ধান পাই নাই। যদিও কখন কোন রমণীকে আমার প্রেমিকা বলিয়া মনে করিয়াছি, পরক্ষণেই বুঝিয়াছি আমার ভ্রম, সে সে নয়। সুতরাং আমার প্রেমের স্থান শূন্য; প্রেমের আশা শুধু কল্পনায়, মূল্যও তাহার সুতরাং শূন্য।"

গোবিন্দ বিদ্রূপ করিয়া বলিল "তা ঠিক,—প্রেম জিনিষটা ত অর্থের মত হাতে গুনিয়া পাইবার নয়। অর্থ উপার্জ্জন যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য তাঁহার ওটা কল্পনাতেই যে সুখ! আপনার নায়িকার সৌভাগ্য, তিনি ধন্য!"

"তাঁহার মনে তিনি ধন্য হউন। তাহাতে তাঁহারও মঙ্গল, আমারও মঙ্গল। রমণী ব্যতীত কি সংসারে অন্য কিছুতে আনন্দ নাই? ধরুন আপনাদের চিত্রকলা। আপনাদের ছবিগুলি কবে দেখিতে পাইব?"

গোবিন্দ সহাস্যে বলিল "আপনি আপনার আনন্দ-উপকরণকে ছোট করিয়া দেখিতেছেন কেন? আমার ছবি, তাহাতে কি আনন্দ পাইবেন? আমার ছবি যে ছবির হিসাবে কিছুই না!"

"আপনার বিনয়ে সুখী হইলাম। আপনার অসুবিধা না হইলে আজই বিকালে আপনার চিত্রশালা দেখিয়া সুখী হইতে চাই। চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি সংকীর্ণ। আপনার গুণের সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিবার সাধ্য আমার নাই; তবু সাধারণ ভাবে দেখিয়া সুখী হইব ত।"

"মহাশয়, আমাকে অত বড় করিয়া দেখিবেন না। প্রকৃতপক্ষে আমি চিত্র-শিল্পী নই—সখের পটুয়া মাত্র।"

আমি মৃদু হাস্য করিলাম। গোবিন্দর বিদ্যা আমার অজ্ঞাত নহে। আমি প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলাম, "শ্রেষ্ঠিনীকে যে উপহারটা দিতে চাহিতেছি, আপনি একবার তাহা দেখিবেন কি?"

"অবশ্য, অবশ্য, নিশ্চয়ই সে জহরতগুলি উচ্চ অঙ্গের।"

আমি লৌহসিন্দুক খুলিতে খুলিতে উত্তর করিলাম, "ভাল মন্দ আমি কি বলিব। ভিন্ন লোকের ভিন্ন পছন্দ; আপনি দেখিলে হয় ত বলিতে পারিবেন, সেগুলি শ্রেষ্ঠিনীর পছন্দ হইবে কি না।"

বিবিধ-কারুকার্য্য-খচিত চন্দনকাষ্ঠের কৌটাটি সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া গোবিন্দর সম্মুখে রাখিলাম। কৌটা হইতে অলঙ্কারগুলি বাহির করিয়া বলিলাম "এই সেই উপহার নামের অযোগ্য তুচ্ছ বস্তু। ইহা মূল্য হিসাবে অবশ্য কিছু না, কিন্তু শ্রেষ্ঠী-পরিবারের সহিত আমার যে সম্বন্ধ তাহাতে স্মৃতিচিহ্নরূপে ইহার একটু মূল্য আছে, আশা করি। আপনি সেই ভাবেই শ্রেষ্ঠিনীকে ইহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন।"

গোবিন্দ উপঢৌকনের উপকরণ হস্তে তুলিয়া লইল; বলিল "অদ্বিতীয় সংগ্রহ। পান্নাচুনি-খচিত হার, জড়োয়া-চুড়ি, হীরক অঙ্গুরী, হীরক পুষ্প,— ইহাদের তুলনা নাই। যে কোন ধনকুবের ইহাদের জন্য লালায়িত হইবে। নিশ্চয় বলিতে পারি, শ্রেষ্ঠিনী এমন উপহার প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবেন।"

"সে আমার সম্মান পাইয়া। শ্রেষ্ঠী-পরিবারে এ মূল্যের

অলঙ্কার নূতন নহে, তবে নমুনাটায় বোধ হয় নূতনত্ব আছে; বিদেশে তৈয়ারী কি না।"

"কিন্তু আবার বলিতেছি, মহাশয় আপনি নিজ হাতে না দিলে এ উপহারের অঙ্গহীন হয়; তাহাতে আপনার আপত্তি কি?"

"আপত্তি আর কি? সময়ের অভাব। সুযোগ হইলেই সাক্ষাৎ করিব। তাঁহাতে আর অন্য মহিলাতে আমার এক ভাব হইতে পারে না। পুরাতন বন্ধু-পরিবারের সহিত ভিন্ন সম্বন্ধ। কিন্তু এখন আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। জিনিষগুলা আর বেশী দিন ফেলিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় না; আপনি আমার হইয়া এগুলি লইয়া গেলে বাধিত হইব। দেখা শোনার কথা পরে হইবে।"

"তা ত বটে। কিন্তু তিনি নিজে ইহার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া তুষ্ট হইবেন কি? অন্য সময় হইলে, তিনি হয়ত নিজে আসিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। এখন তাঁহার সে সময় নয়।"

"স্বামীর শোকে তিনি কাতর? বলিবেন, সুযোগ হইবামাত্র তাঁহার সহিত দেখা করিব। আপনিও বলিয়াছেন তাঁহার সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিবেন। এখন এই সূত্রে পরোক্ষে আপনার দ্বারাই কতক পরিচিত হই, পরে এক সঙ্গেই দুই জনে শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদে যাইব—তবে দুই দিন আগে আর পরে।"

গোবিন্দ সানন্দে আমার হাত ধরিয়া বলিল "হাঁ—এখন আমি আপনার দৌত্যের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এমন অদ্বিতীয় রত্ন-অলঙ্কার যে অঙ্গের উপযুক্ত, সে সুন্দরীর শোভা বর্দ্ধন করিতে উপযুক্ত ব্যক্তি যখন তাঁহাকে অর্পণ করিতেছেন, তখন আমার আর তাহাতে আপত্তি কি! এরূপ দৌত্যে কাহার অখুসী? মহাশ্রেষ্ঠী, কে বলে আপনি রমণী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ? যিনি নিজের পছন্দে, রমণীর এমন সৌন্দর্য্য-উপকরণ কল্পনা করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই নারী-সৌন্দর্য্যের ডুবুরি।"

"আপনার নিকট এই নূতন প্রশংসা লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইলাম; এখন তিনি কি বলেন দেখুন।"

"তিনি কি বলিবেন? মনপ্রাণ ভরিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিবেন। তিনিও যেমন সুন্দর, অলঙ্কারগুলিও তেমনি।"

"বটে! সৌন্দর্য্য তুলনার ভার আপনার উপর। আমি অনধিকারী। যাক—আজ বিকালে আপনার ওখানে যাওয়া স্থির থাকিল,—কেমন?"

"নিশ্চয়—আমি অপেক্ষা করিব। আপনার সুবিধাই আমার সুবিধা।"

ঔষধ ধরিয়াছে; অর্থের মোহ এমনই বটে। নীলাকে দান, আর গোবিন্দকে দান একই কথা; অন্ততঃ তাহার তেমনি বিশ্বাস। বহুমূল্য উপহারের উপকরণে সে একদম গলিয়া গেল। বৃদ্ধের নিকট সে আরও প্রাপ্তির আশা রাখে। আমিও তাহাই চাই। অলঙ্কারের কৌটাটি তাহার হস্তে দিয়া, আমি বলিলাম "তবে এখন অন্য কাজে মন দিতে পারি। আমার অবসর বড় কম।"

গোবিন্দ আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া উঠিল। বিদায়কালে সে আমাকে অজস্র ধন্যবাদ দান করিয়াও যেন তৃপ্ত হইল না। আমি মনে মনে হাসিলাম। বন্ধুরূপে অত নিকটে থাকিয়া তাহার যেটুকু বুঝিতে পারি নাই, যাহা তাহার সরলতা বলিয়া ভ্রম করিতাম, আজ তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছি। গোবিন্দ কেবল প্রবৃত্তির দাস নহে; ধনলোভী পরপদলেহী; ধনের জন্য সে সমস্তই করিতে পারে। পূর্ব্বে ভাবিতাম সে আমার বন্ধুত্বে মুগ্ধ, আজ দেখিলাম, সে আমার অর্থের ক্রীতদাস, আমার হস্তের ক্রীড়নক!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিকাল বেলা গোবিন্দর চিত্রশালার উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। ঔৎসুক্যের জন্য নহে; তাহার শিল্পাগার আমার অপরিচিত নহে; জীবনে এমন এক সময় ছিল, যখন তথায় আমি অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করিয়াছি। বিবাহের পূর্ব্বে সেই আমার প্রধান আকর্ষণস্থল ছিল। গোবিন্দ আমার অষ্টপ্রহরের সঙ্গী; আমি তাহার অনুরাগে তাহার আবাসকে সুন্দর দেখিতাম। সে চিত্র আঁকিত; আমি বসিয়া বসিয়া দেখিতাম; তাহার চিত্রে নিজেও দুই এক পোঁচ না দিয়াছি, এমন নহে। অশিক্ষিত হস্তের বর্ণ-যোজনায় চিত্রসৌন্দর্য্য উন্নত হইবার আশা না থাকিলেও গোবিন্দর তাহাতে নিরাশ বা বিরক্ত হইবার কারণ ছিল

না, সে বরং তাহাতে উৎসাহ প্রকাশ করিত, এখন বুঝিতেছি কেন! আমি ব্যতীত তাহার অন্য ক্রেতা বড় ছিল না। চিত্র সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই আমি তাহা কিনিয়া রাখিতাম। চিত্রের ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা বন্ধুত্বের মূল্যেই তাহা ক্রীত হইত; ঘটনাবশে সে দিনের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। গোবিন্দর মত নিম্ন শ্রেণীর চিত্রকরের চিত্রে আমার আকর্ষণ ছিল না; বিশ্বশিল্পীর একখানি জীবন্ত চিত্র-সৌন্দর্য্যে সংসারের অন্য সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাহাতেও গোবিন্দর ক্ষতির কারণ ছিল না। আমি তাহাকে নানাপ্রকারে অর্থসাহায্য করিতাম। সে ক্রমে চিত্র, চিত্রশালা বিস্মৃত হইয়া আমারই একনিষ্ঠ সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। তখন তাহাই মনে করিতাম। আমি তাহার ব্যবহারকে বন্ধুত্বের চরম উৎকর্ষ বলিয়া তাহাকে পরম আত্মীয় রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সে একজন নগণ্য চিত্রকর, সেও তাহার নিজের অবস্থা স্মরণ করে নাই বোধ হয়। যে চিত্র অঙ্কন সে আগে করিয়াছে তাহা ছাড়া তাহার পর আজ পর্য্যন্ত সে অন্য কোন নূতন চিত্রে হস্তক্ষেপ করিয়াছে কি না সন্দেহ। এখন সে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রেমিক, তাহার আর চিত্র অঙ্কনের অবসর কোথায়? সুতরাং তাহার সেই পুরাতন চিত্রশালায়, আমার চক্ষে নূতনত্ব আর কি আছে; তাহার প্রত্যেক বস্তুই আমার সুপরিচিত। তাহার জন্য আমার ঔৎসুক্য কি?

আমার উদ্দেশ্য অন্য। তাহার সাফল্যের চেষ্টায় জাঁকজমকের কম করিলাম না। রাজোচিত সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইলাম। সর্ব্বোৎকৃষ্ট চতুরশ্ব শকটে অনুচরবর্গের সহিত গোবিন্দর নিমন্ত্রণ রক্ষায় রওনা হইলাম। তাহার চিত্রশালার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, আমার আগমনবার্ত্তা তাহাকে জানাইবার পূর্ব্বেই সে গাড়ীর শব্দ শুনিয়াই আমাকে অভ্যর্থনা করিতে ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাহির হইল। নমস্কার করিয়া বলিল "আজ আমার বড় সৌভাগ্য। কে ভাবিয়াছিল, আমার এই দীন কুটীরে আপনার ন্যায় ব্যক্তির অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ ঘটিবে। আমি আজ ধন্য। তাম্র-নির্ম্মিত ধনীদিগের যাহা স্বপ্নাতীত, আমার ভাগ্যে তাহাই সত্যরে পরিণত।"

আমি বাক্যে উত্তর না দিয়া সহাস্য মুখে তাহাকে প্রতি-নমস্কার করিলাম।

গোবিন্দ বলিল, "পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপনাকে হতাশ হইতে হইবে; একে আমি যে শিল্পী, তাহাতে বহু দিন এ ব্যবসা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনাকে দেখাইবার মত কিছুই নাই। এই সুযোগে যে আপনার পদধূলি এ দীনের কুটীরে পড়িল, এই আমার আনন্দ।"

পুরাতন চিত্রশালা নূতন করিয়া দেখিলাম;—সত্যই নূতন, যাহা পূর্ব্বে চক্ষে পড়ে নাই আজ তাহা সুস্পষ্ট ধরা পড়িল। শিল্পীর শিল্পানুরাগ অপেক্ষা অর্থানুরাগ তাহাতে সুস্পষ্ট; অন্যত্র সে বিত্তের আশা পাইয়া চিত্রশালাটিকে মালগুদামে পরিণত করিয়াছে। আমার আগমন উপলক্ষে, তাহার সংস্কার ও সজ্জিত করিবার চেষ্টা হইলেও অধিকারীর বহু দিনের অবজ্ঞার চিহ্ন কিছুতেই দূর হয় নাই। আমি চিত্রগুলি মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলাম; তাহাদের ন্যায্যের অধিক প্রশংসা করিয়া শিল্পীকে উৎসাহিত করিলাম। কয়েকখানি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিলাম। আহ্লাদে গোবিন্দর বদনমণ্ডল উৎফুল্ল হইল। বস্তুতই তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রশংসা পাইবার যোগ্য। আমি আমার মনোভাব গোপন না করিয়া বলিলাম, "দেখুন শিল্পী মহাশয়, আপনি শুধু ব্যবসায়ে শিল্পী নন, চেহারাতেও শিল্পী।"

গোবিন্দর বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল। সে লজ্জিত ভাবে উত্তর করিল, "মহাশয়, প্রকৃতই আমাকে অযথা প্রশংসা করিতেছেন,—এ সমস্তই আপনার স্নেহের ফল। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমি আপনার আদেশ পালন করিয়াছি।"

"আদেশ—না আপনার অনুগ্রহ? সেই অলঙ্কারের কথা বলিতেছেন কি?"

"হাঁ, কল্যই আমি সেগুলি শ্রেষ্ঠিনীকে দিয়াছি। কৌটাটা খুলিয়া তাঁহার কি ভাব হইয়াছিল! অত বড় নিটোল মুক্তা দেখিয়া কে না বিস্ময়ে অভিভূত হয়! তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, যাঁহার হস্ত হইতে এ উপহার আসিয়াছে, তাঁহাকে স্বয়ং ধন্যবাদ দিতে না পারিলে আমার শান্তি নাই।"

গাড়ীর শব্দ হইল। গোবিন্দ উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিল; ত্বরিত জানালার সম্মুখে গিয়া রাস্তার দিকে আগ্রহে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। আমি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তথায় দাঁড়াইয়াই বলিলাম "আপনি অন্য কোন দর্শকের আশা করিতেছেন কি?"

গোবিন্দ আমার প্রশ্নে যেন অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিল, "হাঁ, একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার আসিবার কথা আছে, তিনি না আসিলে ঠিক বলিতে পারি না।"

আমি বুঝিলাম, কে সে। আগন্তুকের আগমনবার্ত্তাজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি হইল। গোবিন্দ অতি বিনীত ভাবে আমার নিকট বিদায় লইয়া দর্শকের অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। সাময়িক উত্তেজনায় আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। শরীরে ঘর্ম্ম দেখা দিল, বক্ষের দ্রুত স্পন্দন নিশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিল। নিজের অবস্থায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। তাহা গোপন করিতে মনের সমস্ত জোর প্রয়োগ করিলাম। সোজা হইয়া দাঁড়াইলাম। চক্ষের নীল ঢাকা ভাল করিয়া আঁটিয়া দিলাম। দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুতে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া সুবিন্যস্ত করিলাম। ধীর গম্ভীর হইয়া একখানি চিত্র পর্য্যবেক্ষণের উপলক্ষে আগন্তুকের অপেক্ষায় রহিলাম। সোপানশ্রেণীতে পদধ্বনি হইল;—তাহার একটি উচ্চ, অসংযত; অপরটি মৃদু, অলস, বিলম্বিত। গোবিন্দ তাহার সঙ্গীর সহিত অনুচ্চস্বরে বাক্যালাপ করিতেছিল,—বোধ হয় আমারই সম্বন্ধে। বায়ু সুরভিশ্বাসে পূর্ণ হইল; মহিলা-পরিহিত পরিচ্ছদের খস্‌খস্ মৃদু শব্দ শ্রুতিগোচর হইল; দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দেখিলাম, রাণীর বেশে, রাণীর মতই হাবভাবে, আমারই পূর্ব্বকালের হৃদয়রাণী আমার সম্মুখে দেখা দিল। আমারই শোকচিহ্ন তাহার অঙ্গে! শোকের সুশুভ্র পরিচ্ছদে তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আমি,—তাহার মৃতস্বামী, তাহার সৌন্দর্য্যে প্রতারিত আমি, মনে মনে তাহার অতুল রূপরাশির প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না;—রূপসীর রূপের এমনি মোহ, এমন আকর্ষণী শক্তি! সে দ্বারদেশে একটু কাশিয়া, তাহার সেই সর্ব্বজয়ী হাসি অধরে আনিয়া আমার পানে দৃষ্টিপাত করিল। ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া বীণাবিনিন্দিত স্বরে বলিল, "মহাশয়কে মহাশ্রেষ্ঠী শেবাস্ত্রি বলিয়া সম্ভাষণ করিলে বোধ হয় ভুল করিব না। নিশ্চয় তিনিই আমার অকৃত্রিম সম্মান গ্রহণ করিতে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনার দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইলাম।"

আমি উত্তর দিতে চেষ্টা করিলাম—বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; আমি আমাতে ছিলাম না। নীলা আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সৌন্দর্য্যতরঙ্গ উত্থিত করিয়া, সেই প্রাণমনহারী পুরাতন ভঙ্গিতে আমার উদ্দেশ্যে তাহার মৃণাল-করপল্লব প্রসারিত করিল। সহাস্য বিনীতকণ্ঠে বলিল "এই নগণ্য শ্রেষ্ঠিনী নীলা,—আপনার বন্ধু পরিবারের কুলবধূ। আমি বন্ধু গোবিন্দর নিকট আপনার এখানে আসিবার প্রস্তাব শুনিয়াছিলাম। শুনিয়া এই সুযোগে আপনার সহিত পরিচিত হইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। আপনার আত্মীয়তায় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনার স্নেহ-উপহার অনিন্দনীয়; জহরতগুলি প্রকৃতই অতুলনীয়। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন!"

আমি তাহার প্রসারিত হস্ত বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় গ্রহণ করিয়া উত্তর করিলাম, "মহাশয়া, ধন্যবাদটা এ পক্ষের নিকট হইতেই বরং আপনার প্রাপ্য। আপনি আপনার এই বিষাদের সময় আমার তুচ্ছ উপহার গ্রহণ করিয়া আমাকে যেরূপ সম্মানিত ও আনন্দিত করিয়াছেন—তাহাতে আমিই ধন্য। আপনার শোকে আমার সহানুভূতি স্বাভাবিক,—আমি আপনার স্বামী-কুলের পুরাতন বন্ধু। আমার দান গ্রহণ করিয়া সে আত্মীয়তা আপনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন—ইহাই আমার সৌভাগ্য। আপনার স্বামী যদি আজ জীবিত থাকিতেন, এ উপহার আপনি তাঁহার হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইতেন; তাহা হইলে উহা আপনার পক্ষে আরও কত আনন্দদায়ক হইত। আমার অযোগ্য হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া পক্ষান্তরে আমাকে সম্মানিত করা হইয়াছে।"

পরলোকগত স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় নীলা বিমর্ষ হইল। আমার হস্ত হইতে তাহার করপল্লব উন্মুক্ত করিয়া বিষাদক্লিষ্ট নিশ্চেষ্টভাবে পার্শ্বস্থ আসনে বসিয়া পড়িল। গোবিন্দ ইতিমধ্যে আতিথ্য সৎকারের আয়োজনের জন্য অন্যত্র গিয়াছিল। সে যখন পিষ্টক, ফল, মিষ্টান্ন

প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিল,—তখনও আমাদের বিনয়বচন বর্ষিত হইতেছে। সে তাহা শুনিয়া হাহা করিয়া হাসিয়া বলিল "মহাশ্রেষ্ঠী আপনি কেমন ধরা পড়িয়াছেন—আমি ও শ্রেষ্ঠিনী যুক্তি করিয়া এ ফাঁদ পাতিয়াছি; নহিলে কি আপনি সহজে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেন? ইনি আপনাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য ভারি ব্যস্ত হইয়াছিলেন। বলুন, দুইকূল রক্ষা করিয়াছি কি না। যথার্থ বলুন ত শ্রেষ্ঠী, আপনি শ্রেষ্ঠিনীর সাক্ষাৎলাভে সুখী হইয়াছেন কি না? আপনাকে স্বীকার করিতেই হইবে, শ্রেষ্ঠিনীর ব্যবহারে ও তাঁহার সৌন্দর্য্যে আপনি এখন মুগ্ধ।"

আমি রহস্যপূর্ণ স্বরে বলিলাম, "নিশ্চয়ই! এমন সুন্দরীর দর্শনলাভ করিয়া কে না মুগ্ধ হয়? শুধু সৌন্দর্য্য নয়, ইঁহার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ। বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে এমন শোকের সময় কে স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে! ইনি আমাকে বন্ধু বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন—সে জন্য আমি পরম আপ্যায়িত।"

নীলা শোকাকুল অস্ফুট স্বরে বলিল "হায়! আজ তুমি কোথায়? এ জগতে তোমার আর সাক্ষাৎ পাইবার উপায় নাই। আজ যদি তুমি থাকিতে, তাহা হইলে তোমার কি আনন্দ!" আমার দিকে তাকাইয়া বলিল "তাঁহার পিতার প্রিয়তম বন্ধু আপনি,—কি আগ্রহে তিনি আপনার সম্বর্দ্ধনা করিতেন আমি ভাবিতে পারি না—তিনি ইহ জগতে নাই। মৃত্যু তাঁহার এরূপ আকস্মিক,—সে যেন আমার স্বপ্ন। তাঁহার অদর্শন কোন দিন ভুলিতে পারিব কিনা ভগবান জানেন!"

নীলা কাঁদিল—তাহার নয়নে অশ্রু,—বদনে বিষাদ। আমি তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম না। স্ত্রীলোকের স্বভাব এখন আমি অনেক বেশী বুঝি। অশ্রু রমণীর হাতধরা; ইচ্ছা করিলেই রমণী কাঁদিতে পারে। মূর্চ্ছার অভিনয়ও তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত;—আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতা তাহার মূল,—তাহার সিদ্ধির জন্য রমণীর কিছুই অসাধ্য নাই। নির্ব্বোধ পুরুষ আমরা, মায়াবিনীর মায়া বুঝিতে না পারিয়া তাহার সান্ত্বনার ছলে কাঁদিয়া মরি; রমণী কেবল মনে মনে হাসে।

গোবিন্দ বিস্ময়াবিষ্ট। নীলার যে ক্রন্দন নহে, অভিনয়, সে তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার আশান্বিত হৃদয়ে আঘাত অনুভব করিতেছিল। স্বামীর জন্য নীলার ক্রন্দন, তাহার পক্ষে সমস্যার ব্যাপার!

আমি আর্দ্রকণ্ঠে বলিলাম "আপনার শোকের সান্ত্বনা নাই; সময় ব্যতীত অন্যের এ সন্তাপ দূর করা অসাধ্য। আমিও আপনার শোকে মুহ্যমান হইয়াছি। কিন্তু শোক আন্তরিক হইলেও তাহাতে ফল কি? আপনার এই কাঁচা বয়স। সুদীর্ঘ জীবন আপনার সম্মুখে পড়িয়া আছে। অতুলনীয় সুন্দরী আপনি, আপনার সৌন্দর্য্যের প্রাপ্য কত সুখের দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আপনি শোকে এত বিহ্বল হইলে চলিবে কেন? ধৈর্য্য ধরিতে চেষ্টা করুন।"

সে হাস্য করিল। তাহার অশ্রু সূর্য্যোদয়ে শিশিরবিন্দুর ন্যায় অন্তর্হিত হইল। সে বলিল "আপনার শুভ ইচ্ছার জন্য শত ধন্যবাদ। আপনার মত বন্ধুর সান্ত্বনার উপর আমার মানসিক স্বচ্ছন্দতা নির্ভর করিতেছে; আশা করি, আপনার দর্শনলাভে বঞ্চিত হইব না। আপনি আমার ওখানে যাইবেন কিনা বলুন। শ্রেষ্ঠী-প্রাসাদের সকলই আপনার।"

আমি কি উত্তর দিব ভাবিতেছি। গোবিন্দ এমন সময় বিদ্রূপের স্বরে বলিল "শ্রেষ্ঠিনী মহোদয়া বোধ হয় জানেন না, মহিলাবর্গের সহিত আপনার কিরূপ প্রীতিপদ নিগূঢ় সম্বন্ধ;—মহিলায় ওঁর যে ঘোর অরুচি।"

আমি তাহার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া অতি গম্ভীরস্বরে বলিলাম "মহাশয় মিথ্যা বলেন নাই। কিন্তু সর্ব্ব বিষয়েই সাধারণ নিয়ম হইতে আর একটা বিশেষ দিক আছে। আমার চক্ষে শ্রেষ্ঠিনী আর অন্য রমণী এক হইতে পারেন না, ইনি আমার বিশিষ্ট বন্ধুপরিবারের বধূ। মহিলা দরবার আমার প্রীতিপদ নয়, কিন্তু বলিতে হইবে কি, শ্রেষ্ঠিনী নীলার সহিত আলাপ পরিচয়ে আমি সুখী হইয়াছি? বিশেষতঃ এমন অপ্সরীর সৌন্দর্য্যে কে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে?"

আমি সসম্মানে মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া নীলাকে অভিবাদন করিলাম। তাহার বদন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আত্মসৌন্দর্য্যে তাহার অসীম আস্থা, সে গর্ব্বে সে চিরকাল

গর্ব্বিত। সৌন্দর্য্যে আমাকে পরাজিত করিয়াছে ভাবিয়া সে আত্মপ্রসাদে আহ্লাদিত হইয়া বলিল "কে বলে, আপনি মহিলা-মজ্‌লিসে লাজুক? আপনি রসিকচূড়ামণি। বলিলেন, রমণী অপ্সরী,—অপ্সরীর স্বভাব জানেন ত?—তাহারা বাধ্যতা আদায় না করিয়া তৃপ্ত হয় না। আপনি তাহা হইলে কল্যই আমার গৃহে পদধূলি দিতেছেন। ঠিক ত? গোবি—ওঃ—মহাশয় গোবিন্দ—আপনিও অবশ্য শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে যাইতেছেন?"

গোবিন্দর ভাবটা তখন গম্ভীর; সে যেন অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিল। সে ব্যঙ্গমিশ্রিত কর্কশস্বরে বলিল "তাইত? দেখিয়া সুখী হইলাম,—শ্রেষ্ঠিনী, শ্রেষ্ঠীর উপর আপনার সৌন্দর্য্যশক্তি অনেক কার্য্য করিয়াছে। আমি এত বলিয়াও যাহাতে তাঁকে সম্মত করিতে পারি নাই, আপনার প্রভাবে অতি সহজেই তাহাতে তিনি স্বীকৃত!"

নীলা আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এ আর নূতন কি বলিলেন? চিরকালই ত রমণী পুরুষকে জয় করিয়া আসিতেছে,—অন্যায় বলিতেছি কি শ্রেষ্ঠী?"

নীলা আবার আমাকে তাহার বিদ্যুৎললাম কটাক্ষে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। ঈর্ষ্যান্ধ গোবিন্দর হৃদয়ভাব নীলা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছিল; প্রেমিককে কষ্ট দিয়াই কি তাহার সুখ? না এও এক প্রেমপরীক্ষা?

আমি উত্তর করিলাম "সুন্দরীর অনুগ্রহলাভ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই,—আমি আর কি বলিব! তবে আজ মনে হইতেছে, আপনার কথাই ঠিক; সুন্দরীর চক্ষু সন্ন্যাসীকেও মুগ্ধ করে।"

আবার কটাক্ষ। নীলা আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল।

আমি রহস্যের ভাবে বলিলাম, "অপ্সরীর সাক্ষাৎ এমনি বটে,—এমন মিষ্ট কিন্তু এত ক্ষণস্থায়ী!"

সে সহাস্যে বলিল "মহাশয়ের অনুগ্রহ হইলে দীর্ঘকাল-ব্যাপী হওয়া অসম্ভব হইবে না। কাল অবশ্য আপনার দর্শন পাইব। আশা করি, এ বিষয়ে আপনার প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছি। অবশ্য অবশ্য দেখা দিবেন। বেলা থাকিতেই—নহিলে আমার কন্যার সহিত দেখা হইবে না—সে সকাল-সকাল ঘুমাইয়া পড়ে। চম্পা অনেকটা আমার স্বামীর মত। তবে আসি—বিদায়—অবশ্য কালপর্য্যন্ত। নমস্কার।"

নীলা আবার তাহার হস্ত প্রসারিত করিল। আমি তাহা ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া ধরিলাম। সে হাসিতে হাসিতে হস্ত নামাইয়া লইল। আমার মুখের দিকে—না আচ্ছাদিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া বলিল "আপনার কি চোখের অসুখ?"

"আঃ মহাশয়া, অসুখ বলিতে অসুখ, আলো একেবারে সহ্য করিতে পারি না। তা—চোখেরই বা দোষ কি, এ বয়সে প্রায় সকলেরই এই দশা!"

সে গম্ভীরভাবে বলিল "কিন্তু আপনাকে দেখিয়া ত তেমন বৃদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না।

"বলেন কি? বৃদ্ধ নয় আমি! আমার শাদা চুলগুলা কি আপনার চোখে পড়ে নাই?"

"চুল পাকিলেই কি বৃদ্ধ হয়? অনেক যুবকেরও চুল পাকে। তা নয়—আপনার বয়স যতই হোক—শরীরটা খুব ঠিক আছে;—আপনাকে দেখিয়া কে বলিবে আপনি বৃদ্ধ—আমার শ্বশুরের বয়সী! আপনার দিব্য যুবার ন্যায় কান্তি!"

হাস্যমিশ্রিত মধুর স্বরে নীলা আমার বৃদ্ধত্বের বোঝা সরাইয়া দিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে হেলিতে দুলিতে প্রত্যাগমনোন্মুখ হইল। আমি ও গোবিন্দ তাহার অনুগমন করিলাম। দ্বারে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। আমিই তাহার বিগত জন্মদিনে যে শকট ও লালবর্ণের অশ্বজুড়ি উপহার দিয়াছিলাম, সেই শকট, সেই অশ্ব। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি শকটদ্বার উন্মুক্ত করিয়া নীলাকে যানারোহণে সাহায্য করিবার আশায় হস্ত প্রসারিত করিল। নীলা সময়োচিত একটা রহস্য করিয়া তাহার হস্ত সরাইয়া দিল ও আমার স্কন্ধে বাহু স্থাপন করিল। আমি তাহাকে ধরিয়া শকটে উঠাইয়া দিলাম। সে মধুর হাস্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া মস্তক সঞ্চালনে বিদায়সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিল। আমরা প্রতিনমস্কার করিলাম। শকট ছুটিয়া চলিল। ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। গোবিন্দর দিকে ফিরিয়া চাহিলাম। তাহার বদন গম্ভীর, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত। ঈর্ষা-মক্ষিকা তাহার হৃদয়ে দংশন করিয়াছে বুঝি। রমণীর একটু সামান্য অনুগ্রহ,—হয়ত ভদ্রতার খাতির,—

গাড়ীতে উ য়া দিবার দাসত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াই গোবিন্দর এত অনুতাপ! আমার মত হইলে কি করিত? মনে মনে হাসিলাম। এমন লঘুচেতাকে প্রতিহিংসা-বিষে জর্জ্জরিত করা কত সহজ। বিকট আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল। আমি সহাস্যে গোবিন্দর স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিলাম। বলিলাম, "স্বপ্নের প্রশ্রয় দিয়া আর প্রয়োজন কি? আজ আর সমুদ্রমন্থনে মোহিনী উঠিতেছে না; স্বর্গের নৃত্যশালা ছাড়িয়া মেনকার অভিসারেরও আশা নাই; প্রতীক্ষায় আর ফল?"

গোবিন্দ আমার বাক্যের উত্তর করিল না। আমি পূর্ব্ববৎ রহস্যের স্বরে বলিলাম, "ভাল, বন্ধু ভাল! হঠাৎ আপনাকে গম্ভীর করিল কিসে? আমার শোনা ছিল, রমণীর তীক্ষ্ণধার নয়নজ্যোতিঃ পুরুষের স্ফূর্ত্তিকে তীক্ষ্ণ করে; আমার দুরদৃষ্টে, আপনাকে কি তাহা ভোঁতা করিয়া গেল,—অথবা সে প্রীতিভার, মুখে নাহি বলিবার, সংগোপনে ভাবিবার, অন্তরে অন্তরে। তাই কি? তাতে আশ্চর্য্য নাই, শ্রেষ্ঠিনীর রূপ তেমনই বটে।"

সে সহসা আমার মুখের দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "পূর্ব্বেই কি আমি তা' বলি নাই? অমন রূপসী জগতে বিরল। আপনার ন্যায় স্ত্রীবিদ্বেষীকেও তিনি বশীভূত করিয়াছেন। সত্য কি না?"

আমি বলিলাম "সত্য নাকি? সে তথ্যটা আমি নিজে ধরিতে পারি নাই—এই যা'। হইয়া থাকি ত, ভালই,—জীবনে যাহা হয় নাই, আজ একদণ্ডে তাহা লাভ করিয়া থাকি যদি সৌভাগ্য সন্দেহ নাই।"

গোবিন্দ গম্ভীরভাবে বলিল "সৌভাগ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে সাবধান করিলে বোধ হয় আমার অন্যায় হইবে না।"

"সাবধান? কাহা হইতে সাবধান? শ্রেষ্ঠিনী নীলা হইতে কি? তাহা হইলে আপনি কেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন? কথা বলিতেছেন না যে? তবে বুঝি শ্রেষ্ঠিনী হইতেই আমার বিপদের আশঙ্কা? ব্যাপার কি? শ্রেষ্ঠিনী কি কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন? খুলিয়া বলুন—সময় থাকিতে সাবধান হই। কে বাবা, প্রাণটাকে সাধ করিয়া বলি দিবে।"

জীবনের ভয়ে যেন ভীত আড়ষ্ট হইয়া মুখের ভঙ্গি এমন করিয়া কথাগুলি বলিলাম যে গোবিন্দ না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার চিত্তের অন্ধকার সেই সঙ্গে অনেকটা কাটিয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল "মাভৈঃ শ্রেষ্ঠী মাভৈঃ। সে কথা বলিতেছি না। শ্রেষ্ঠিনীর ব্যবহারকে অন্যভাবে লইয়া ভুল না করেন, এই আমার বলিবার উদ্দেশ্য। তাঁহার স্বভাবই অমনি,—অনেক সময় বন্ধুবর্গের সহিত তিনি এমনভাবে আলাপ আপ্যায়ন করেন, যে, তাঁহার নবপরিচিত বন্ধুর পক্ষে সে ব্যবহারকে অনুরাগ বলিয়া ভ্রম করা আশ্চর্য্য নহে।"

আমি করতালি দিয়া, হাহা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলাম "বলিয়াছেন ভাল,—অবশেষে প্রেমে পড়া! ছ্যা—ছ্যা। যুবক আপনি, এ সন্দেহ করা আপনার উপযুক্ত বটে। বৃদ্ধ হইলে, ভুলিয়াও এ কথা আপনার মনে আসিত না। সমাজে থাকিতে হইলে ও সকল মিথ্যা অভিনয় না করিয়া উপায় নাই। নহিলে কি আর সে বয়স আছে। শ্রেষ্ঠিনীর স্বামী হইব আমি? তার চেয়ে বলুন না কেন তাঁহার বা আপনার ঠাকুরদাদা হইবার উমেদারী করি। নাতনির প্রেমটা বোধ হয় আরও মিষ্ট।"

গোবিন্দ আমার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল "আপনাকে দেখিয়া ত বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয় না!"

শ্রেষ্ঠিনীর মন্তব্য গোবিন্দর প্রাণে শেল বিদ্ধ করিয়াছে; সে তাহার জ্বালায় ছটফট করিতেছে। আমার প্রতিহিংসা-বিষবৃক্ষের প্রথম ফল;—তাহার তীব্রতায় অতুল আনন্দ অনুভব করিলাম। বলিলাম, "ওঃ এই কথা! ওটা শ্রেষ্ঠিনীর সৌজন্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তিনি বোধ হয় অন্ধ বা দৃষ্টিহীন বৃদ্ধা নন যে, আমার মত একটা বৃদ্ধকে যুবক ঠাওরাইবেন! বিশেষতঃ আপনার মত যুবকের জ্বলন্ত আদর্শ সম্মুখে থাকিতেও কি বৃদ্ধকে যুবক বলিয়া ভুল হয়। বৃদ্ধ চিরকালই সকলের চক্ষেই বৃদ্ধ;—যুবক যুবকই।"

এতক্ষণে তাহার সন্দেহ দূর হইল। সে লজ্জিত হইয়া বলিল, "ক্ষমা করিবেন শ্রেষ্ঠী। আমি অন্যভাবে কথাগুলি ধরি নাই। শ্রেষ্ঠিনী আমার ভগিনীর মত;

স্বর্গীয় বন্ধু আমাকে সেই চক্ষেই দেখিতেন। এখন তিনি গত,—আমার কি কর্ত্তব্য নয় যে বন্ধু-পত্নীকে সমস্ত প্রলোভন হইতে দূরে রক্ষা করা? সে যুবতী, সুন্দরী, রহস্যপ্রিয়া,—এমন কি সংসারজ্ঞানহীনা; এখন বোধ হয় বুঝিলেন, কেন আমি ও-সকল কথা বলিতেছিলাম।"

আমি মস্তক সঞ্চালনে তাহার বাক্যে সম্মতি জানাইলাম। তাহার উদ্দেশ্য আমার অজ্ঞাত নহে। দুরাত্মার মনে সর্ব্বদা ভয়;—আমার বংশমর্য্যাদা পদদলিত করিয়া সে যে অন্যায় অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাতে কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়ায় সেই আশঙ্কায় সর্ব্বদা শঙ্কিত। অথচ আমার ন্যায় ধনকুবেরের প্রসাদলাভের জন্যও সে লালায়িত! খাও, দাও, পান কর—ইহাদের জীবনের নীতি। যে সমাজ এই সাংঘাতিক নীতিকে প্রকাশ্যে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহা জগতে সভ্য বলিয়া কোন্ মন্ত্রবলে পরিচিত, তাহাই আমার নিকট প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মে যাহারা আস্থাহীন, দৈহিক সুখ যাহাদের লক্ষ্য—তাহারাও কি মানুষ,—সভ্য? গোবিন্দর সঙ্গ ক্রমেই আমার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। ভয় হইতেছিল, আর অধিকক্ষণ থাকিলে আত্মগোপন অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আমি সভ্যতার রীতি অনুসারে মনের ভাব বুকে চাপিয়া, সে দিনের আনন্দের জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া সহাস্যবদনে বিদায় প্রার্থনা করিলাম। সেও আমাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল। "ছবিগুলি কি আজই পাঠাইয়া দিব?"

"এত তাড়াতাড়ি কি,—সেজন্য আপনার কষ্ট পাইবার আবশ্যক নাই; আমি লোক পাঠাইয়া লইয়া যাইব।"

বলা বাহুল্য আমি চিত্রের মূল্য তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রদান করিয়াছিলাম। বিদায় হইলাম। তাহার তৎকালের ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে প্রকৃতই আমাকে দর্শকরূপে প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইয়াছে; তাহার মনের মেঘ সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছে। গেলেই মঙ্গল।

বাসায় ফিরিয়া দেখি, ফল-পুষ্পে পরিপূর্ণ একটি সুদৃশ্য ঝুড়ি রক্ষিত আছে। তাহা কোথা হইতে আসিল, আমার প্রধান ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম। শ্রেষ্ঠিনী নীলা মহোদয়া উহা উপহার পাঠাইয়াছেন। ঝুড়ির গাত্রে আমার স্ত্রীর স্বহস্তে লিখিত একখানি চিঠি লাগান আছে;—"আগামী কল্য মহাশ্রেষ্ঠী মহোদয়ের দর্শন দানের প্রতিশ্রুত দিন,—তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য।"

ঘৃণায় পিত্ত জ্বলিয়া গেল। ছি নীলা, প্রবৃত্তির দাসী হইলেই কি একবারে এমনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইতে হয়? আত্মসম্মান কি তোমাতে একবিন্দুও নাই? ধৈর্য্য ধরিবার ক্ষমতা কি এককালে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে? নতুবা যে তোমার অপরিচিত, যাহার সহিত তোমার মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের আলাপ, স্বভাব যাহার তোমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, যে তোমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া তোমাকে সম্মানিত করিবে কি না জান না, তাহার মাত্র অর্থের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াই তাহাকে আয়ত্ত করিতে এত অধৈর্য্য হইয়াছ? একটা দিন, না আর কয়েক দণ্ড অপেক্ষা করিবারও কি তোমার শক্তি ছিল না। গৃহে ফিরিয়াই তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য আয়োজন করিয়াছ? কর—সেও ত তাহাই চায়! রূপের বিনিময়ে রূপেয়া আদায় করিবে? তাহাই হইবে! অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অনন্ত কালের জন্য তোমার অতুল রূপের সমাধির ব্যবস্থা করিব। আপনার ফাঁদে আপনি মরিবার আয়োজন, তুমি নিজেই করিতেছ। সেই ভাল! আমি ভাবিতে পারি নাই, এত শীঘ্র, এত সহজে, সুবর্ণের মোহময় আধার গলাধঃকরণ করিবে! তুমি মানুষ না হিতাহিতজ্ঞানবিবর্জ্জিত পশু? না পশুরও অধম। পশু কেবল উদরের জন্য ব্যস্ত,—মানুষ শুধু উদর নয়, স্বার্থসিদ্ধির জন্য উন্মত্ত। পশু প্রতারণা কি জানে না, শারীরিক অস্ত্র তাহার আত্মরক্ষার জন্য,—মানুষ পদে পদে প্রতারণা করে, মানুষের বিবিধ অস্ত্র লালসা পরিতৃপ্তির জন্য। সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষ নাকি বড়; পশু ছোট। বড় মানুষের পাপও বড়! হিংস্রক পশু হইতেও সে ভয়ঙ্কর। যে জীব, শত্রুতা সাধনের জন্য, লালসার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে নিত্য নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ সে পশু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর নয় কি? ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত, পবিত্রবৃত্তিহীন, হৃদয়হীন যে মানুষ সে পশু হইতে সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর—পশ্বাধম নরকের কীট!

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানজীবরত বিশ্বাস।

আঁধার পারে

আঁধার নহে—এ যে আমার মুক্তালোকের গুপ্ত ঝরা।
অনুভূতির উপাদানে উঠছে গড়ে' লুপ্ত ধরা।
প্রলয়ান্তে এ যে শান্ত মৃত্যুঞ্জয়ের শুদ্ধি কথা;
আত্ম-ভোলা স্বার্থ-মাঝে সুপ্রসন্ন উদ্দীপনা।
এ যে নির্ব্বাপিত লীলার উজ্জীবিত উষ্ণ হাসি।
এ যে প্রাচীন শুষ্কমালায় প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি।

দিনেই আগে উঠত সূর্য্য, রাতেই কেবল চন্দ্র-তারা;
শ্যামলিমার ছিল সীমা; শূন্য ছিল অন্ত-হারা;
প্রহেলিকায় ছিল ঢাকা সিন্ধু-পারের ধুধু ছায়া;
প্রীতির মুখে থাক্‌ত ফুটে শুধু মোহ, শুধু মায়া।
চিরদীপ্ত পটের কোলে নিত্য দোলে মোতির মালা।
আঁধার নহে এ যে আমার দেবপূজার জ্যোতির ডালা।

ধরার থালায় শুষ্ক সিন্ধু, জল-বিন্দু গেছে উড়ে;
মিটে গেছে পটের চিহ্ন, ঘটের আকাশ গেছে পুড়ে।
রুদ্ধ নহে ক্ষুব্ধ নহে—নিত্য বহে শুদ্ধ বাতাস;
তুমার চেয়েও সীমা-হারা পরিপূর্ণ মুক্ত আকাশ।
অতি দূরে পিছন-পথে ঝঞ্ঝা তোলে ঘূর্ণী বায়ু,
ছড়িয়ে পড়ে' আছে যথায় স্বার্থ-শিলার চূর্ণ আয়ু।

ছন্দোবন্ধের বাঁধন ভেঙে, ফেলে ভবের সপ্তস্বরা,
গড়্‌ব অসীম প্রাণের তানে কবিতা অমিতাক্ষরা।
শিশুর হাসির চেয়ে শুভ্র, নারীর প্রাণের চেয়েও কোমল,
সেবার মত সুখ-গন্ধি, মায়ের চুমার মত অমল,
দয়ার মত বিকশিত লক্ষ লক্ষ তাজা দলে
ফুটে রবে ভাবের পুষ্প, সেই কবিতার প্রাণের তলে।

গানের মন্ত্রে কারার রন্ধ্রে ঝলকিবে স্থির জ্যোতি,
দুঃখ-ব্যথার মেঘের মাথায় জ্বল্‌বে ধ্রুব অরুন্ধতী;
প্রহেলিকার প্রাকার ভেঙে আস্‌বে আমার
গানের শ্রোতা;
আমার কণ্ঠে মিলিয়ে কণ্ঠ গাহ কবি গাহ স্তোতা!
জাগ তুমি উদ্বোধনে, শোন গীতি ওহে দূত,—
উদ্বেলিত সিন্ধুকূলে হে প্রশান্ত, হে অচ্যুত।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মার্কিন মেয়েদের কথা

দ্বিতীয় প্রস্তাব

মার্কিন কবি হোম্‌স্ মার্কিন কুমারীদের উদ্দেশে লিখিতেছেন—

> Our own sweet Yankee girls!
> Our free-born Yankee girls!
> God bless our Yankee girls!

বাস্তবিক আমেরিকায় নারী যে স্বাধীনতার অধিকারী জগতের অন্য কোথাও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। নারীর স্বাধীনতা সর্ব্বথা শ্রদ্ধেয়; ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র না হইলেও নানা স্থানে আজও নারীর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে। স্বাধীনতা এক জিনিস, স্বেচ্ছাচারিতা আর এক জিনিস। আমেরিকায় স্ত্রীস্বাধীনতা নারীকে অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

যেমন একদিকে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা সর্ব্বথা নিন্দনীয় ও দমনীয় তেমনি যথার্থ স্বাধীনতা হইতে নারীকে বঞ্চিত রাখা একান্ত গর্হিত। এই স্বাধীনতার জন্য একটা শিক্ষার প্রয়োজন, নূতন একটা আবহাওয়া বিশেষ দরকার। বাঙলা দেশের হিন্দুসমাজ আজ যেমন আছে ঠিক তেমনি রাখিয়া যদি পুরুষ ও নারীর অবাধ সাহচর্য্যের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে একটা বিপ্লব বাধিবারই আশঙ্কা বেশি। শৈশব হইতে কন্যা ও ভগিনীদের এমন করিয়া গড়িতে হইবে যে বহির্জগৎটা আর তাঁহাদের নূতন বলিয়া ঠেকিবে না—সেখানে আপনার স্থান করিয়া লইতে তাঁহাদের বেগ পাইতে হইবে না। মহারাষ্ট্র, রাজপুতনা, কাশ্মীর, মাদ্রাজ, মালাবার প্রভৃতি প্রদেশ ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় নারীকে যে স্বাধীনতা দিয়াছেন তাহার পরিসর বাড়াইবার সময় আসিয়াছে। আংশিক স্বাধীনতার কুফল রোমান্ ক্যাথলিকগণ যেরূপ ভোগ করিয়াছেন ও আজও করিতেছেন তাহা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। বয়ঃপ্রাপ্ত অবিবাহিত পুত্রকন্যাদিগকে ইঁহারা সর্ব্বদা সন্দেহের চক্ষে নজরবন্দী করিয়া রাখেন; ইহার ফলে অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত গ্রেট্‌জ নগরের শতকরা ৬৫ জন, ক্লাগেনফার্ট নগরের শতকরা ৫৬ জন, ও রাজধানী ভিয়েনা নগরের শতকরা ৫১ জন লোক

জারজ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।* বেড়া দিয়া, পর্দা ঢাকিয়া নারীকে খাঁটি রাখিবার চেষ্টা যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা আমাদের দেশের অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।

এ দেশে ভদ্র পরিবারে বারো হইতে সতর আঠারো বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েদের চলা-ফেরা সম্বন্ধে তাহাদের জননীগণ খুব কড়া নজর রাখেন; এই চারি পাঁচ বৎসরে জননী কন্যাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। শরীরধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের যাহা যাহা বলিবার তাহা বন্ধুর মত বুঝাইয়া দেন। এই চারি পাঁচ বৎসর মেয়েরা সাধারণতঃ হাই স্কুলের ছাত্রী থাকে। যৌবনের প্রথম উন্মেষকালে নানা প্রকার চাঞ্চল্য আসা স্বাভাবিক এবং সেজন্য যে-সকল হাই স্কুলে ছেলেমেয়েদের একত্র পড়িবার ব্যবস্থা আছে সেখানে মধ্যে মধ্যে হঠাৎ "লভে"-পড়া বা ছাত্রছাত্রীর একত্র পলায়ন অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ের প্রতিকারকল্পে শিক্ষাবিভাগ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন ও অল্পদিনের মধ্যে কিছু সুফল দেখা দিয়াছে। উনিশ কুড়ি বৎসর হইতে জননী মেয়ের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উপর খুব বেশি নির্ভর করেন। সাধারণতঃ কলেজের ছাত্রীগণের জীবন এ দেশের কুমারীজীবনের আদর্শ। স্ত্রীস্বাধীনতার মধুময় ফল ইহাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্বাধীনতা কিরূপ তাহার আভাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণের একটা বনভোজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

য়ুনিভার্সিটিতে ছাত্রছাত্রীদের নির্ম্মল বন্ধুত্ব নিন্দনীয় তো নহেই বরং অধ্যাপক ও কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সর্ব্বৈব অনুমোদিত। কন্‌ভোকেশনের পূর্ব্বে স্বয়ং চ্যান্সেলার স্বীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগের নিকট বনভোজনের এইরূপ একটা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই—

ছাত্রগণের প্রতি—

তোমাদের মধ্যে যাহারা সাম্‌নের কন্‌ভোকেশনে ডিগ্রি পাইবে তাহাদের আগামী ১২ই মে প্রাতে ৮৷৹ টার পূর্ব্বে লিঙ্কল্‌ন্ বার্লিংটন রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। ঐ দিন ডিগ্রিপ্রার্থীদের বনভোজন হইবে। অবশ্য যিনি যাইতে ইচ্ছা না করেন তাঁহার সম্বন্ধে কোনো পীড়াপীড়ি নাই। ক্রীটে যাতায়াতের টিকিট পূর্ব্বদিন কোনো সময়ে কিনিয়া রাখিলে ভালো হয়, উহাতে পরদিন প্রাতে ষ্টেশনে ভিড় বাঁচাইবে। ট্রেনভাড়ার অতিরিক্ত টাকাকড়ি সঙ্গে লইবার প্রয়োজন নাই; যাঁহার ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারেন কিন্তু দলপতিগণ টাকাপয়সা, মণিমুক্তা, পিরাণের ধোয়া কলার, অথবা ভালো পোষাকী কাপড়-চোপড়ের কোনো ক্ষতির জন্য দায়ী হইবেন না। ক্রীট্ ষ্টেশন হইতে হর্কির পার্কে যাতায়াতের জন্য ব্লু নদীর যাবতীয় ষ্টীমার ও নৌকা ভাড়া করা হইয়াছে; আমরা অনেকেই দল বাঁধিয়া ঐসকল ষ্টীমারে হর্কির পার্কে যাইব। তবে যে-সকল ছাত্র স্ব স্ব বান্ধবীর প্রীত্যর্থে স্বতন্ত্র নৌকায় দাঁড় বাহিয়া উক্ত স্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া যাইবে। আহার্য্য সামগ্রী উৎকৃষ্ট হইবে, সেজন্য কোনো আশঙ্কা নাই, কারণ পরিবেষণের পূর্ব্বে স্থানীয় রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণের দ্বারা পরীক্ষিত হইবে ও তদ্দ্বারা উহার উপাদেয়তা নিরূপিত হইবে। ইত্যাদি।

ভবদীয় চ্যান্সেলার।

প্রায় সকল বড়-বড় য়ুনিভার্সিটির একখানা করিয়া দৈনিক কাগজ আছে। উহা য়ুনিভার্সিটির অধীভূত। এই কাগজখানিতে ছাত্রছাত্রীগণ লেখনী চালনা করিয়া

* In Catholic countries abroad, speaking generally, girls are prisoners until they are married; they are never permitted to be away from their mother's or guardian's side. Girls are taken to school by a parent, a servant, or a friend, and kept till called for; they cannot be permitted to be alone in the streets. Marriages are arranged by parents, and the young people who are to be wed never meet except in the presence of a parent or trusted friend. The first time they are permitted to be alone is after the marriage ceremony has been performed. Of the healthy, happy liberty enjoyed by our girls they know nothing. To a great extent boys are treated in the same way, and for same reasons. But it does not prevent them from becoming precociously vicious...... In spite of the fact that females in Catholic countries abroad are hedged round with every conceivable protection from the Catholic males, there is twice as much illegitimacy in those countries as in Scotland, and three times more than in England; yet in this country (Scotland) of ours, boys and girls enjoy the freedom of constant companionship, and young men and women mix in every kind of sport and recreation with the utmost freedom." (From Protestant Progress and Papal Claims by A. P., pages 69, 70).

থাকেন, য়ুনিভার্সিটি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করেন। উহাতে সাহিত্য আছে, রাজনীতি আছে, কবিতা ও সুকুমার শিল্পের আলোচনা আছে, য়ুনিভার্সিটি সংক্রান্ত সংবাদ আছে, তদুপরি নানাবিধ রংতামাসা আছে। অনেক সময়ে ছাত্রগণ, যাহা আমাদের কাছে আপত্তিজনক বলিয়া বোধ হইবে এমন কথাও উহাতে লিখিয়া থাকেন। কিন্তু উহা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, সেজন্য কর্তৃপক্ষীয়গণ উহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। *

যাহা হউক বনভোজনের কথাটা চাপা পড়িয়া না যায়। চান্সেলারের নিমন্ত্রণ পাইয়া যাহারা ডিগ্রি পাইবে তাহারা আয়োজন আরম্ভ করিল। যাহাদের বান্ধবী আছে তাহারা পূর্ব্ব হইতে বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিল। ১১ই মে রাত্রে সকলে কিরূপ ঘুমাইয়াছিল জানি না; ১২ই মে প্রাতে সহরে বাহির হইয়া দেখি চারিদিকেই হাসি-হাসি চেনা মুখ। কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদ সকলেরই বড় সাধারণ, এমন কি ময়লা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ধনী পরিবারের যে-সকল মেয়েরা অন্যান্য দিন চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিবার জন্য আয়োজনের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন না, তাঁহারাও সেদিন অতি তুচ্ছ পরিচ্ছদে বাহির হইয়াছেন। অবশ্য কারণ বুঝিতে দেরি হইল না। দাঁড় বাওয়া, ছুটাছুটি করা, দোল খাওয়া, গাছে চড়া এ-সকল করিতে হইলে ভালো পোষাক পরা চলে না।

লিঙ্কলন্ সহর হইতে ক্রীট্ কুড়ি মাইল; ক্রীট্ হইতে হর্কির পার্ক তিন মাইল। প্রথম কুড়ি মাইল রেলে যাইতে হয়, বাকি তিন মাইল নৌকা অথবা ষ্টীমারযোগে গন্তব্য। আমাদের ট্রেন রিজার্ভ করা হইয়াছিল; বেলা ৮।০টার পূর্ব্বেই ট্রেন ছাত্রছাত্রীতে পূর্ণ হইয়া গেল। চ্যান্সেলার ও তাঁহার পত্নী ষ্টেশনে পৌছিতেই খুব "হিপ্ হিপ্ হুররে" ধ্বনি উঠিতে লাগিল। চ্যান্সেলার ট্রেনে উঠিবার সঙ্গে-সঙ্গে একটি ছাত্র তাঁহার টাই ও কলার খুলিয়া ফেলিতে অনুরোধ করিল, তৎক্ষণাৎ অনুরোধ রক্ষিত হইল; ছাত্রদের মধ্যে দুই চারিজন যাহারা ভালো টাই ও কলার পরিয়া আসিয়াছিল তাহাদের উহা পূর্ব্বেই খুলিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। ট্রেন ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের অনেকে চ্যান্সেলারের খরচে চুরুট ধরাইল; কেবল আগুন ধরাইবার পূর্ব্বে মেয়েদের নিকট একবার অনুমতি প্রার্থনা প্রয়োজন। সাধারণতঃ এ অনুমতি দুষ্প্রাপ্য নহে।

ক্রীটে পৌছিয়া যে-সকল ছাত্র বান্ধবীসহ আসিয়াছিল তাহারা যুগলরূপে এক একটি নৌকা দখল করিল। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীগণ দলে দলে ছোট ছোট ষ্টীমারে গিয়া উঠিল। হর্কির পার্কে পৌছিয়া ছুটাছুটি, গাছে-চড়া, দোল-খাওয়া, টেনিস্ খেলা ও নূতন করিয়া দাঁড় বাওয়া আরম্ভ হইল। একজন ছাত্র একটি ছোট্ট ডিঙিতে উঠিয়া তাহার বান্ধবীকে হাত ধরিয়া যেমন উঠাইতে যাইবে অমনি ডিঙি উল্টাইয়া গেল। বান্ধবী ডাঙায় সবুজ ঘাসের উপর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া, বন্ধু হ্যাটকোট সমেত ব্লু-নদীর ঘোলা জলে হাবুডুবু! দূর হইতে অন্যান্য ছাত্রগণ দেখিতে পাইয়া একটা শক্ত লম্বা দড়ি ছুড়িয়া দিয়া তাহাকে টানিয়া ডাঙায় তুলিল। বেচারা শীতে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, তখনি তাহার কাপড় বদলান আবশ্যক, কিন্তু কয়েকজন ছাত্র তাহাকে ধরিয়া সেই অবস্থাতেই তাহার ফোটো তুলিয়া লইল। কোন কোন ছাত্র মাছ ধরিবার জন্য ছিপ্ ফেলিয়া উইলো গাছের নীচে বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করিতে বসিল। পার্কে ছুটাছুটি করিয়া কেহ ক্লান্ত হইয়া জল পান করিবার জন্য কূপের সন্ধানে বাহির হইল। মাটিতে পাম্প বসাইয়া জল শুষিয়া তুলিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল। নদীতে মন্থরগতি ছোট ছোট নৌকায় যুগলযাত্রীদের মৃদু হাস্য, কৌতুক ও জলক্রীড়া দেখিয়া রত্নাবলী নাটকের কোনো কোনো দৃশ্য অস্পষ্টভাবে মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে মাটিতে ঘাসের উপর বসিয়া সকলকে আহার করিতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যায় লিঙ্কলন্ সহরে পৌছিয়া তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী ষ্টেশন হইতে দল বাঁধিয়া য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরীর উদ্দেশে যাত্রা করিল। রাস্তায় তাহারা University Yell

* "What is so rare as a night in May at Capital Beach, where soft tango music invites you with the girl of your dreams to enjoy its fullest measure; where you can sit out a dance beneath some shadowy tree, or push your boat out across the shining water humming sighs of joy all the while, or what's the use, it can't be told in words." The Daily Nebraskan, April 22, 1914.

পৃথিবীর বুক বিঁধিয়া জল তুলিতেছে।

গাহিতে গাহিতে চলিল। প্রত্যেক য়ুনিভার্সিটির এরূপ একটি গান আছে। ছাত্রীগণ অবশ্য এই Yellএ যোগ দেয় না, কিন্তু তাহাদের উৎসাহ ছাত্রদেরই সমান। অন্যান্য দিন য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরীর মধ্যে টুঁ শব্দটি করা কঠিন, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় সেই বৃহৎ দল লাইব্রেরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সকল শৃঙ্খলা ভাঙিয়া University Yell গাহিতে গাহিতে সমস্ত হলটি প্রদক্ষিণ করিল। ইহার পর সেদিনকার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইল।

এদেশে বহু য়ুনিভার্সিটিতে পুরুষ ও মেয়েদের একত্র পড়িবার ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজও অনেকগুলি আছে। ইহাদের মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন র‍্যাডক্লিফ কলেজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে হার্ভার্ডে মেয়েদের পড়াইবার ব্যবস্থা হয়; ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে "উচ্চ নারীশিক্ষা পরিষৎ" (Society for the Collegiate Instruction of Women) গঠিত হয়; অবশেষে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে উহা র‍্যাডক্লিফ কলেজে পরিণত হয়। এখন উহা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত একটি উচ্চশ্রেণীর কলেজ; বহু ছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করেন এবং জগদ্বিখ্যাত হার্ভার্ডের যত কিছু সুবিধা ও অধিকার তাহা ভোগ করেন। পুরুষ অধ্যাপক ব্যতীত অনেকগুলি বিদুষী মহিলা র‍্যাডক্লিফ কলেজে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। প্রাচ্যভূমির মেয়েদের জন্য এ দেশের কলেজগুলির দ্বার অবারিত আছে; কিন্তু ছাত্রী কোথায়? যাহাদের আমরা "অসভ্য" বলি সেই চীন ও জাপানের মেয়েরা র‍্যাডক্লিফ কলেজে আসিয়া পড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু ভারতের মেয়ে একটিও নাই। গত বৎসর বষ্টননিবাসী জনৈক হিন্দু (বাঙালী) ডাক্তারের কন্যা হার্ভার্ডের বি-এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন; ইহার নাম কুমারী এমা স্যাণ্ডেল রায় (Miss Emma Sandel Ray); ইহার জননী স্কচ মহিলা। ইহারা এ দেশের বাসিন্দা, সুতরাং হিন্দু হইলেও ভারতের নারীসমাজের বিশেষ কোন সেবা উক্ত মহিলার দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই।

এদেশে অধ্যাপকদিগের একটা সাধারণ বিশ্বাস যে ছাত্রীগণ ছাত্রদিগের অপেক্ষা অধিক চিন্তাশীল। ইহার মধ্যে কতকটা সত্য আছে তাহা বলা বাহুল্য। কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ যে কবিতা লেখেন তাহা লক্ষ্য করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য সময়ে সময়ে ছাত্রগণও যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়া থাকেন। তুলনা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া একটি ছাত্রী ও

একটি ছাত্রের বিভিন্নভাবের দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করা গেল।

Cupid's Blunder.

Poor Cupid froze his wings one day
When winds were cold and skies were gray,
And clouds with snow were laden.
A little maid was passing by;
She caught the rogue,—he could not fly,—
O naughty little maiden!

She sent him off with sharpen'd dart,
To steal for her a certain heart;
But, Oh, the mishap stupid!
Since Cupid's blind, and cannot see,
He went astray, and came to me,
O naughty little cupid!

So that is why my heart is gone,
And I am dreary and forlorn,
With tears my eyes are laden.
She does not want my heart—ah, no!
I did not wish to have it go;
O Cupid, and O maiden!
(Gertrude Jones, Wellesley Magazine).

The Truth Seekers.

1. They who sought Truth since dawn
And sought in vain,
Now at the close of day,
Come with slow step and faces drawn
With nameless pain,
To meet the night half-way.

2. "She whom we love is not!
Of her no sight
Had we, nor faintest trace!"—
"Nay here am I ye sought!"—
Beyond the night
They met her face to face.
(Francis Charles Mc Donald, Princeton Nassau Lit. Monthly).

প্রথম কবিতাটির মধ্যে যেমন বেশ একটি সলীল, সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, দ্বিতীয় কবিতাটির মধ্যে তেমনি একটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার শান্ত ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় কবিতাটি পড়িতে পড়িতে উপনিষদুক্ত ঋষিদিগের অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের সাক্ষাৎলাভের কথা অনেকের মনে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সহিত সংসৃষ্ট ও স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য সমিতির মধ্যে এদেশের সামাজিক জীবনের বেশ একটা আভাস পাওয়া যায়। য়ুনিভার্সিটিতে সমস্তদিন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত থাকে কাজেই তাহাদের পরস্পরের সহিত মিশিবার বিশেষ সুযোগ ঘটে না। সেই অভাব দূর করিবার জন্য ও স্বাভাবিক উপায়ে পরস্পরের সহিত পরিচিত হইবার ও পরস্পরকে অপেক্ষাকৃত ভালো করিয়া জানিবার সুযোগ দিবার পক্ষে এই-সকল সমিতি খুব সাহায্য করে। মধ্যে মধ্যে অধ্যাপকগণ সপত্নীক এই-সকল সভায় উপস্থিত থাকেন; তাহাতে রসভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক্, আসর বেশ জমিয়া উঠে। আমাদের দেশে পাঠশালার গুরুমহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের অধ্যাপক পর্য্যন্ত সকলের সম্বন্ধেই ছাত্রদের একটা বিভীষিকা চিরদিন বিদ্যমান থাকিয়া যায়। এ দেশে সে ভাবটি একেবারে জন্মিতেই পারে না। অথচ সেজন্য শিক্ষকের প্রতি সর্ব্বদা শ্রদ্ধার অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্লাশের বাহিরে শিক্ষক ও ছাত্র সব বিষয়ে বন্ধু; ক্লাশের মধ্যে যদি কোনো ছাত্র কোনোরূপ বে-আদবি করে তবে অধ্যাপক শুধু সাবধান করিয়া দেন। উহাই যথেষ্ট।

পূর্ব্বোক্ত সমিতিসমূহের উদ্দেশ্য সব সময়ে এক নহে; কোনোটি সাহিত্য সম্বন্ধীয়, কোনোটি সঙ্গীত সম্বন্ধীয়,

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের বসন্ত-উৎসব।
সুন্দরীরা বসন্ত-রাণী সাজিয়া রূপের হাট বসাইয়াছে।

কোনোটি শিল্পচর্চ্চার জন্য, কোনোটি বা সমাজসেবার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে যে-সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার মধ্যে উক্ত সব বিষয়েরই কিছু-না-কিছু আছে; সাহিত্যচর্চ্চা আছে, গান বাজনা আছে, অভিনয় আছে, ক্রীড়াকৌতুক আছে, সর্ব্বোপরি মধুরেণ সমাপয়েৎ আছে। বৎসরের মধ্যে একদিন উহাদের বার্ষিক উৎসব হয়; ঐদিন রাত্রে যত পুরাতন সভ্যদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। যে সমিতি যত পুরাতন তাহার পুরাতন সভ্যগণও তত প্রাচীন হন। একটি পঞ্চাশ বৎসরের সমিতির বার্ষিক উৎসবের রাত্রে উপস্থিত ছিলাম; অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে অষ্টাদশবর্ষীয় বালক-বালিকার অপূর্ব্ব আনন্দসম্মিলন দেখিবার জিনিস বটে। ঐদিন রাত্রে জনৈক প্রৌঢ়া অধ্যাপকপত্নী উক্ত সমিতির অতীত হর্ষবিষাদের স্মৃতি লইয়া যে কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন তাহার দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।—

1. Backward, turn backward, Oh Time in your flight,
Make me a girl again, just for to-night!
Let Youth come back from Eternity's shore
Oh write my name on the "slate" as of yore!
Smooth from my forehead the furrows of care
Pluck all these silver threads out of my hair—
Heat up the iron—the rest I must curl—
Make me a girl again, make me a girl!

2. Touch up my cheeks whence the roses have flown—
Don't let the fact that I have wrinkles be known!
Help me forget I've been married for years,
Give me girlhood freedom, and girlish fears.
Let me be youthful, with parties and "dates"
Facing the question, "Oh who'll scratch the slate?"
Will my 'bid' come early, or will it come late?"
Make me a girl again, make me a girl.

পঞ্চকেশ অধ্যাপকও ছাত্রাবস্থায় ঐ সমিতির সভ্য ছিলেন এবং যখন তাঁহার বিদুষী স্ত্রী ঐ কবিতা পাঠ করিতেছিলেন তখন তিনি তাঁহার পত্নীর লাবণ্যময়ী কুমারীমূর্ত্তি মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছিল। অধ্যাপকের যুবতী কন্যাও সেখানে উপস্থিত। এইরূপ সম্মিলনে সকলেরই হৃদয়ে একটি অনাবিল প্রীতির সঞ্চার হয় ও অনেকের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, এবং তাহা হইতে ভবিষ্যতে নরনারী দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন কুমারীদের পক্ষে স্বাধীনতা শুধু পোষাকী জিনিসের মত মধ্যে মধ্যে বাহির করিয়া দেখাইবার সামগ্রী নহে; বস্তুতঃ উহা নারীর নারীত্ব বিকাশের অপরিহার্য্য পাথেয়স্বরূপও।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

খাসিয়া

ভারতের যে-সকল পশ্চাৎপদ জাতি বৃটিশ শাসন ও আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে অপেক্ষাকৃত অল্প কালের মধ্যে দ্রুত পাদবিক্ষেপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে খাসিয়া জাতিকে সম্ভবতঃ তাহাদের অগ্রণী বলা যাইতে পারে। খাসিয়া-পাহাড় জেলা, ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত এবং প্রাকৃতিক বিচিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ ও মানবজাতিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের গবেষণা ও আবিষ্কার হইতে জানা যায় যে খাসিয়াজাতি মঙ্গোলীয় মহাজাতির মন-আনাম (Mon-Annam) শাখার একটি ক্ষুদ্র প্রশাখা।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে খাসিয়াগণ সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থান করিত, তখন তাহাদের পরিধানের উপযুক্ত বস্ত্র পর্য্যন্ত ছিল না। লিখিবার অক্ষর এবং পড়িবার পুস্তকাদি কিছুই ছিল না। তখন নিম্নশ্রেণীর পুরুষেরা অত্যন্ত মোটা কাপড়ের একটা ছিলাযুক্ত কোর্ত্তা পরিধান করিত এবং একখণ্ড অপ্রশস্ত বস্ত্র কোমরে জড়াইয়া তাহা কৌপীনরূপে ব্যবহার করিত। সম্ভ্রান্ত লোকেরা ইহার উপর মস্তকের জন্য পাগড়ী এবং গাত্রাবরণের জন্য একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করিত। রমণীরা ক্ষুদ্র একখণ্ড ডোরা-কাটা কাপড় কোমরে জড়াইয়া বাঁধিত, তাহাতে জানু এবং দক্ষিণ উরু আবৃত হইত না। আর একখানি বস্ত্র ভাঁজ করিয়া দুই স্কন্ধের উপর গ্রন্থিবদ্ধ করিত। তৃতীয় এক বস্ত্রে পশ্চাৎভাগ আবৃত হইয়া তাহার উপরের দুই কোণ সম্মুখের দিকে বন্ধন করা হইত। এই-সকল বস্ত্র মোটা কার্পাস বা অপরিষ্কৃত রেশমে প্রস্তুত হইত। চেরাপুঞ্জীতে আসাম প্রদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই সম্ভ্রান্ত খাসিয়ারা বাঙ্গালী পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে;

খাসিয়া রাজা ডাকোর সিং।

এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের কিছুকাল পরে কয়েকজন খ্রীষ্টান খাসিয়া ইউরোপীয় পোষাক গ্রহণ করিয়াছে। পুরুষের সেই আদিম পরিচ্ছদ কৌপীন ও ছিলাযুক্ত কোর্ত্তা এখনও দূরবর্ত্তী গ্রামের অনেক লোকে ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন প্রণালীর সেই-সকল বস্ত্র আর প্রায় দেখা যায় না। রমণীরা এক্ষণে সেমিজ জেকেট সম্বলিত রুচিসঙ্গত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে লোকে বাঁশ বা তক্তার বেড়া দেওয়া এবং পাতা বা খড়ে ছাওয়া চালের কুটীরে বাস করিত। তাহার কোনও গবাক্ষ বা জানালা থাকিত না। সম্ভ্রান্ত লোকে বৃহৎ আয়তনের কুটীর নির্ম্মাণ করিত। তখন গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে প্রস্তর এবং পেরেক শিকল প্রভৃতি লৌহনির্ম্মিত উপকরণ-সকল ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। এখনও পুরাতন ধরণের শত শত কুটীর পাহাড়ের চারিদিকে গ্রামে গ্রামে রহিয়াছে; কিন্তু অবস্থাপন্ন সভ্য খাসিয়াগণ ইতিমধ্যে সুন্দর সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহা চিমনী এবং নানাপ্রকার আসবাবে সজ্জিত করিয়াছে। পূর্ব্বে দীর্ঘ বাঁশের চোঙ্গা জল রাখিবার পাত্ররূপে এবং ছোট চোঙ্গা জল পানের গ্লাসরূপে ব্যবহৃত হইত। শুষ্ক লাউএর খোল পূর্ব্বে এবং এখনও কলসীর কার্য্য করে। লোকে সাধারণতঃ জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে আনীত মাটির হাঁড়িতে রন্ধন করিত, এবং কোন কোন স্থানে কাঁচা বাঁশের চোঙ্গাতেও ভাত রান্না করিত। সহর হইতে দূরে অনেক স্থানে অদ্যাবধি এই-সকল উপকরণ ব্যবহৃত হইতেছে; কিন্তু যে-সকল স্থানে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে তথায় আসাম ও বঙ্গদেশ হইতে আনীত কাঁসা ও পিতলে নির্ম্মিত বাসন প্রচলিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ বিলাতী লোহার এবং কাচের বাসন ব্যবহার করিতেছে। লোকে পূর্ব্বে কাঠের বারকোষ বা বৃক্ষপত্র ভোজনপাত্র রূপে ব্যবহার করিত এবং এখনও কোন কোন স্থানে তাহার ব্যবহার দেখা যায়। কেহ কেহ ভোজনের পরেই কাঠের বারকোষটি উল্টাইয়া বসিবার পীঁড়িরূপে ব্যবহার করে। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকে মাটির সরা এবং ধাতু বা চিনামাটির পাত্রে ভোজন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে কচু, জোয়ার, নানাজাতীয় বন্য আলু এবং সর্ব্ব প্রকারের মাংস খাসিয়াদের খাদ্য ছিল। এখনও কোন কোন স্থানের লোকে এই প্রকার খাদ্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। শ্রীহট্ট হইতে থারিয়া ঘাট হইয়া গৌহাটী যাইবার পথের দুই পার্শ্বে যে-সকল গ্রাম অবস্থিত এবং যে-সব গ্রাম নিম্নভূমির নিকটে অবস্থিত কেবল সেই-সকল স্থানে ইংরেজদের অধিকারের বহু পূর্ব্ব হইতে শ্রীহট্টের চাউল আমদানি হইত; অন্য স্থানে চাউল পাওয়া যাইত

শিলং শহরের বিভিন্ন দৃশ্য।
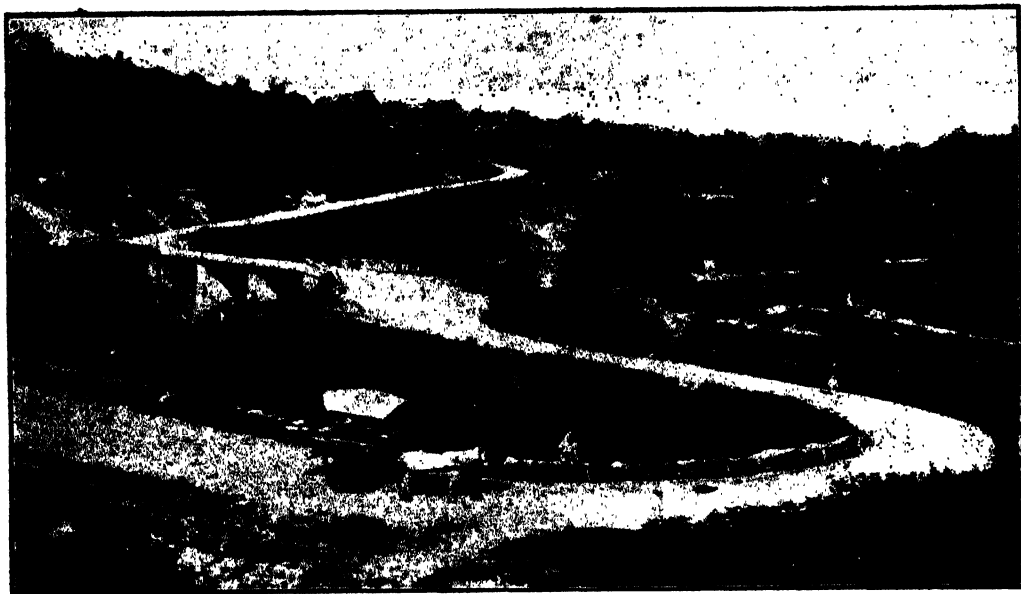
গৌহাটী যাইবার পথের মোড়।

মা। এই-সকল গ্রামে সর্ব্ব প্রথমে সভ্যতার প্রভাব বিস্তার হয় বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং চেরাপুঞ্জীই সেই সময়ে বাণিজ্য ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল এবং ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের বাসস্থান ছিল। চেরাপুঞ্জী ও শিলঙের মধ্যপথে একস্থানে লৌহের খনি ছিল। সেই লৌহ পরিষ্কৃত হইয়া বঙ্গদেশে রপ্তানি হইত। এই ব্যবসায়ে একদিকে যেমন লোকে অর্থোপার্জ্জন করিত, অপর দিকে তাহারা শ্রীহট্টবাসীদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইত।
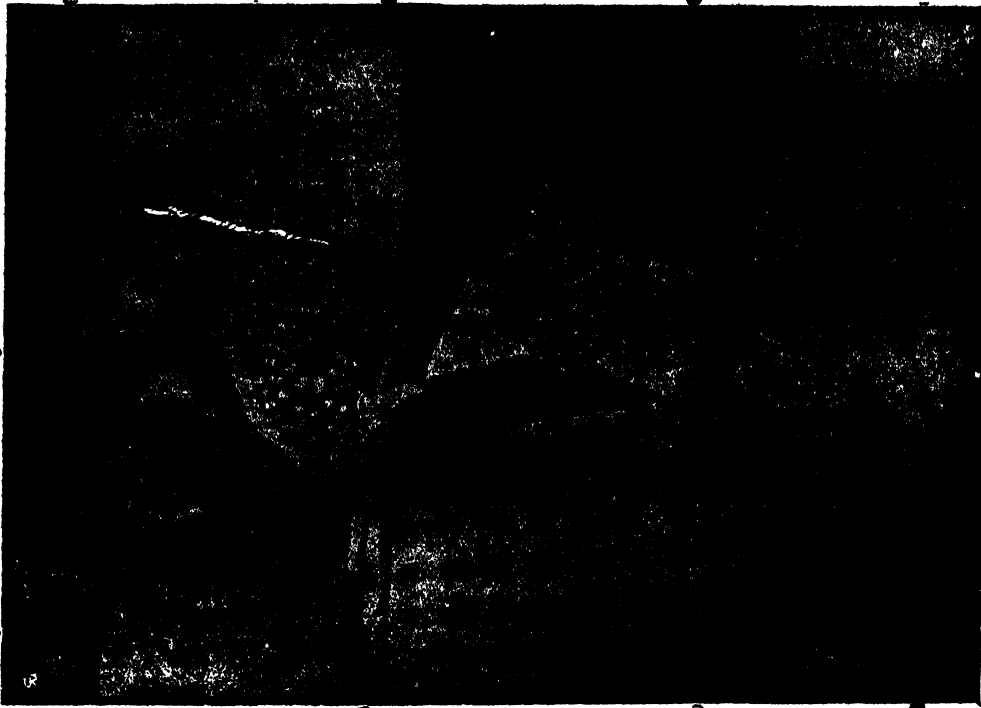
অবস্থাপন্ন খাসিয়া স্ত্রীলোক উৎসব-বেশে।

শিলঙে মাত্র অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সহর স্থাপিত হইয়াছে। বহুকাল হইতে যে-সকল পণ্যদ্রব্য লইয়া খাসিয়াগণ নিম্নভূমির লোকের সঙ্গে বাণিজ্য করিয়া আসিয়াছে কমলা-লেবু ও চুনপাথর তাহার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ লোকে এই দুই দ্রব্যকে শ্রীহট্ট হইতে উৎপাদিত বলিয়া মনে করে।

অন্যান্য অসভ্য জাতির ন্যায় খাসিয়াদের মধ্যে কোন কোন বংশ কুষ্মাণ্ড, কর্কট, বানর, কোন কোন প্রকারের লেবু এবং মৎস্য প্রভৃতিকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং তজ্জন্য এই-সকল দ্রব্য ভোজন করা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। পূর্ব্বে লোকে দুগ্ধ এবং তদুৎপাদিত কোনও খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিত না এবং এখনও শতকরা ৯০ জন লোকে দুগ্ধকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে। শিশুদিগকে কদলী খাইতে দেওয়া হয়।

খাসিয়ারা স্বভাবতঃ খুব ভদ্র, আলাপী ও প্রফুল্লচিত্ত, ইহাদিগকে স্ফূর্ত্তিবাজ বলিলেও চলে। পিঠের উপর মোটের বোঝা চাপাইয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতেও ইহারা হাস্যধ্বনিতে পর্ব্বতমালা মুখরিত করিয়া তোলে। কর্ণেল বিভার ১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দের শাসন-বিভাগের বিবরণীতে বলিয়াছেন বটে যে খাসিয়ারা আপনাদের সুবিধামত না হইলে সত্য কথা বলে না, কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে সরলতা ও সত্যপরায়ণতার কিছুমাত্র অভাব নাই। অন্যান্য গুণের ন্যায় সত্যপরায়ণতাও সভ্যতা ও উন্নতির সহিত বাড়িতে থাকে; কাজেই যে জাতির ধর্ম্মভাব সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় নাই তাহার নিকট সত্যপ্রীতির আশা করা বাবলা-বনে গোলাপ খোঁজার মতনই শোনায়। বিদেশীদের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া ধূর্ত্ততা শিখিবার পূর্ব্বে তাহারা কারবারে সততা ও সরলতা রক্ষা করিয়া চলিত; তাহাদের পণ্যদ্রব্যে কোনও প্রকার দোষ থাকিলে তাহারা আপনারাই তাহা সর্ব্বদা ক্রেতাদিগকে দেখাইয়া দিত। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেও তাহারা সাক্ষী সাবুদ কিম্বা দলিল পত্রাদির আবশ্যক বোধ করিত না, উত্তমর্ণদেরও ইহাতে কোনই অসুবিধায় পড়িতে হইত না। মূল্যবান সামগ্রী চুরি যাইবার কোনও ভয় না থাকায় লোকে সারাদিনের
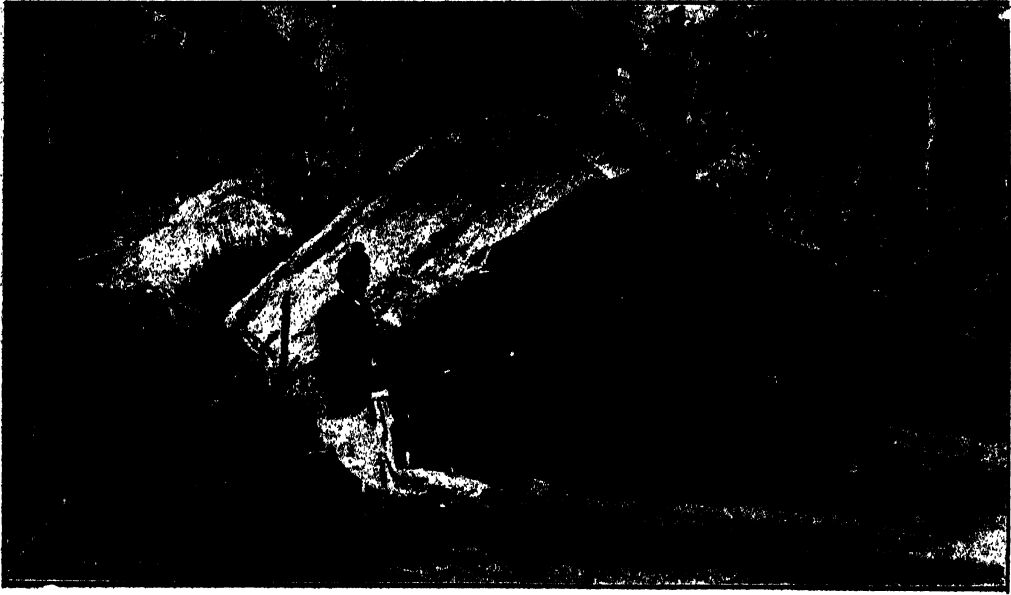
খাসিয়াদের গৃহ।

জন্ম কাজে বাহির হইয়া যাইবার সময়ও ঘরে তালা না দিয়াই যাইত। কথিত আছে যে একবার একজন কয়েদী জেল হইতে পলাইয়া যাওয়াতে তাহাকে কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না; পরদিন সে আপনা হইতেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে বিশেষ একটা জরুরি কাজের জন্য তাহাকে একবার বাড়ী যাইতে হইয়াছিল। আত্মনির্ভরের ভাব সমগ্র জাতিটির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইত, সকলেই আপন আপন জীবিকা উপার্জ্জন করিত, ভিক্ষুকের মত অপরের কাছে হাত পাতিতে কেহই যাইত না, পাতিলে পাইবার আশাও ছিল না। মানুষ ভালবাসার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে-সকল কার্য্যকে কর্ত্তব্য বোধ করিয়া থাকে তাহার পথে এইপ্রকার স্বার্থপর স্বাবলম্বনের ভাব বিশেষ বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; পারিবারিক পবিত্র বন্ধনগুলি দৃঢ় করিবার পক্ষেও ইহা অন্তরায় স্বরূপ ছিল। খাসিয়ারা শ্রমশীল ও বুদ্ধিমান জাতি; পরিশ্রম সহ্য করিবার ইহাদের বিশেষ ক্ষমতা আছে, নূতন নূতন জিনিষ ও নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ইহারা আশ্চর্য্যরূপে নিজেদের আবশ্যক-মত আপন করিয়া লয়। আদিম অবস্থাতে ইহাদের শিল্পকুশলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির অভাব ছিল বটে, কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহারা ক্রমশঃ শিল্পে দ্রুত উন্নতি করিয়াছে।

প্রাচীনকাল হইতে ধনুর্বিদ্যাই ইহাদের জাতীয় ক্রীড়ার স্থান লাভ করিয়া আসিতেছে। হাটের দিনে তীর ধনুক লইয়া দুই দলে সামান্য বাজি রাখিয়া খেলা আরম্ভ করে, বিজয়ী দল এই বাজির টাকা মদ খাইয়া ও অন্যান্য আমোদ করিয়া উড়াইয়া দেয়। খাসিয়ারা গান বাজনা ভাল বাসিলেও তাহাদের সঙ্গীতবিদ্যা এখনও শৈশব পার হয় নাই। 'দুতারা' ও কয়েক প্রকার টেমটমি ব্যতীত ইহাদের অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র নাই। প্রকৃত সঙ্গীত ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। লোকে ক্ষেত্রে কাজ করিবার সময় কিম্বা জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ কাটিবার সময় আপন মনে একঘেয়ে সুরে যাহা মাথায় আসে তাহাই গাহিয়া যায়, এই গানের কোন বিশেষ ছন্দ কি কোন নির্দ্দিষ্ট সুর নাই। ইহাকেই ইহারা সঙ্গীত নাম দেয়। নিজেদের গান না থাকায় নবীনদলের অনেকে ইংরেজি সুরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিয়া থাকে। বাংলা সুরের ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ইহারা পূর্ব্বোক্ত গানের অপেক্ষা অনেক বেশী পছন্দ করে, ইহার চলনও আরো সুদূরব্যাপ্ত হইবার কথা, কিন্তু এই-সকল

করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের রচিত দশ বারটি গান বাংলা ও ইংরেজি সুরের খিচুড়ী সুরে গাওয়া হইয়া থাকে। ধর্ম্ম অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিম্বা কেবল মাত্র আমোদ করিবার জন্য উৎসবাদি হইলে খুব জাঁকজমক করিয়া নাচ হয়। ঐ দিনে নর্ত্তকী ও দর্শক সকলেই উৎসব-সজ্জায় ও বিচিত্র অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আসে।

খাসিয়া স্ত্রীলোক পিঠে বাঁধিয়া শিশু বহন করিতেছে।

খাসিয়া স্ত্রীলোক ধান ভানিতেছে।

গানের সুর শিখিতে খাসিয়াদের বিশেষ কষ্ট হয় বলিয়াই তাহা হয় না। শেলার কতকগুলি লোক বৈষ্ণবদের প্রভাবে পড়িয়া মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে বাংলা সংকীর্ত্তন গাহিতে শিখিয়াছে। স্বর্ণকারেরা নানা গ্রামে কাজ করিতে গিয়া তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে নাচিয়া গাহিবার উপযুক্ত লঘু সুরের অনেক বাংলা গান চলিত করিয়া তুলিয়াছে। শিলঙএর কয়েক জন যুবক—ইহাঁদের মধ্যে কয়েক জন পূর্ব্বে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতেন—একটি ক্লাব স্থাপন
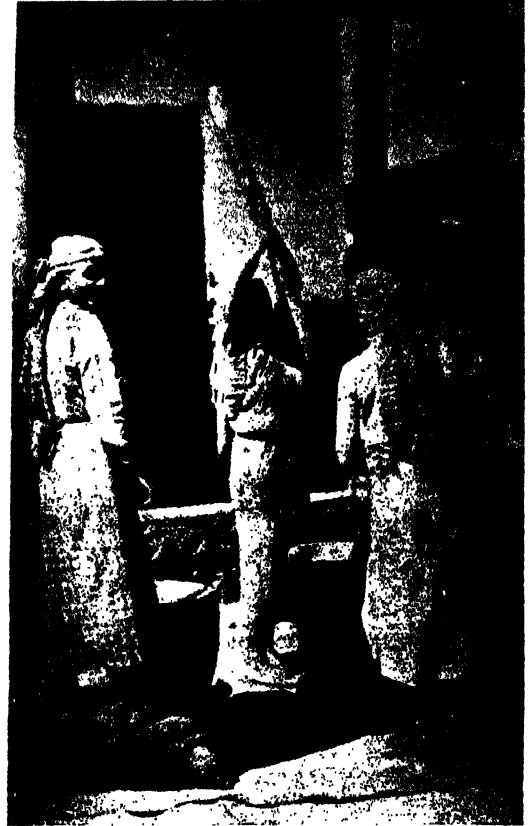
পূর্ব্বে খাসিয়ারা সাঁওতালদের হাঁড়িয়া ও কোলদের পচই মদের ন্যায় এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করিত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একজন বিদেশী খৃষ্টান মিশনারি তাহাদিগকে উগ্র সুরা চুয়াইতে শিখাইয়াছিলেন; এখন ইহারা এই সুরায় আসক্ত হইয়া পড়িয়া তজ্জনিত নানা প্রকার কুফলে কষ্ট পাইতেছে। কর্ণেল ডিভার বলিয়াছেন যে, ইহারা অত্যন্ত জুয়া খেলার ভক্ত। চেরাপুঞ্জী যখন ঐ প্রদেশের সদর সহর ছিল, তখন তথাকার ভারতীয়

খাসিয়া ভোজ। থালার পরিবর্ত্তে পাতা ও গেলাসের বদলে বাঁশের চোঙা ব্যবহৃত হয়।

সিপাহিগণ ও ইয়ুরোপীয় সেনাধ্যক্ষদের সহিস প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যগণই ইহাদিগকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল। ইহারা দোক্তা খায় ও ধূমপান করে, অল্প কয়েকজন গাঁজা ও আফিং খাইয়া থাকে। খাসিয়ারা পান খাইতে খুব ভালবাসে; প্রায় প্রত্যেকেই একটি ছোট থলিতে করিয়া পান সুপারি চূন খয়ের জাঁতি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া ফেরে। সভ্যতার প্রভাবে আসিয়া আজকাল অনেকে স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে ও অন্যান্য ব্যাপারে অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতে শিখিয়াছে, কিন্তু জন্মের পর আঁতুড়ঘরের বাহিরে কোনো দিন স্নান করে নাই, এবং গায়ের কাপড় গায়েই পচিয়া গা হইতে খসিয়া পড়িবার পূর্ব্বে খুলিয়া কাচে নাই,—এমন অনেক লোক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকাতে শেলার লোকেরা অনেক দিন হইতেই পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা করিয়াছে।

খাসিয়াদের মধ্যে বাল্যবিবাহ একেবারেই নাই, এবং বিধবাবিবাহ কিম্বা স্বামী অথবা স্ত্রী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিবাহও ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নয়। ইহাদের বিবাহ-বন্ধন এত শিথিল যে অতি সামান্য কারণে কিম্বা বিনা-কারণেই তাহা ছিন্ন করা যাইতে পারে। বহুবিবাহ জিনিষটা ইহাদের অজ্ঞাত। সভ্যতার আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে একপ্রকার বিবাহ-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে কোনপ্রকার অনুষ্ঠান না করিয়াই, এমন কি অপর লোককে না জানাইয়াও কেবল মাত্র পরস্পরের অনুমতি লইয়াই যে-কোন মুহূর্ত্তে স্বামী স্ত্রী একত্র সংসার পাতিতে পারে। পাপাচরণ ও দুর্নীতি আদিমকালে অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার ছিল, কিন্তু সভ্যতার আগমনের সহিত ইহাদেরও জন্ম হইয়াছে এবং ফলে নানাপ্রকার ঘৃণ্য ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে। মালাবারের নায়ারদের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও একটি উল্লেখযোগ্য প্রথা প্রচলিত আছে—কন্যারাই এদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী [illegible]

খাসিয়া পিঠে করিয়া মাল এবং লোককে পাহাড়ে তুলিবার চেয়ার বহন করিতেছে।

'উস্তারি'র (বোঝা বহিবার সময় মাথায় আটকাইবার একপ্রকার চর্ম্মপেটী) কোন সাদৃশ্য থাকিবে না।"

খাসিয়া ধর্ম্মের সহিত মানুষের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের যে কোন সম্পর্ক নাই তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। সমস্ত অনুষ্ঠানই স্বাস্থ্য ও পার্থিব ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য করা হইয়া থাকে।

খাসিয়া ভাষায় "ধর্ম্ম" কথাটির ঠিক প্রতিশব্দই নাই। "নিয়াম" ও "রুকাম" এই দুইটি শব্দ ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলা 'নিয়ম' ও 'রকম' শব্দের অপভ্রংশ এই দুই শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূজা পার্ব্বণ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। স্বর্গ নরক সম্বন্ধে ইহাদের যে অতি অস্পষ্ট ধারণা আছে, তাহাও ধার-করা বলিয়া বোধ হয়; কারণ 'দুজোক' (নরক) শব্দটি ফার্সি 'দোজক' শব্দের অপভ্রংশ এবং 'বুেং' শব্দ আকাশের প্রতিশব্দ মাত্র।

খাসিয়াদের পূজার অনুষ্ঠানপদ্ধতি বিভিন্ন গ্রাম ও স্থানে বিভিন্ন প্রকারের। এইসকল অপদেবতার নাম অসংখ্য। নিম্নে কতকগুলি অপদেবতার ও তাহাদের শাসিত বিভাগের নাম দেওয়া গেল, ইহা দ্বারা ইহাদের সম্বন্ধে অনেকটা স্পষ্ট ধারণা হইবে।—"কা রামশান্দী (যুদ্ধ-দেবী), কা খ্লাম (কলেরা প্রভৃতি রোগের দেবতা), কা প্রোই (ক্যানসার, টিউমার প্রভৃতি রোগের দেবা), স্থইদ-রেম (স্ত্রীরোগের দেবী)। শেলা শহরের চারিটি প্রধান অধিষ্ঠাত্রী অপদেবতার নাম—উ রাম, উ বামোন, উ প্দা ও উ লোই উমতন; ইহাদের প্রতিনিধিদের নাম উ খাবাজ্জার, উ জুলোম সিং, উ বিয়াৎ রায়, ও উ মংস্লিয়ার।

কোন পরিবারে অর্থহানি, দারিদ্র্য, নানা জনের রোগ প্রভৃতি কোন প্রকার অকল্যাণ ঘটিলেও পূজার আশ্রয় লওয়া হয় এবং সেই অকল্যাণকারী দেবতার ক্রোধ শান্তির জন্য নানা চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় লোকেরা অনেক দিন ধরিয়া পূজার পর পূজা করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে

খাসিয়া রমণীদের নৃত্য।

এবং সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া বসে। দূরদেশে যাত্রার পূর্ব্বে কিম্বা কোন-একটা কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিশ্বাসী খাসিয়ারা ভূতের নিকট প্রার্থনা করিয়া পূজায় প্রকাশিত লক্ষণাদি দ্বারা ভবিষ্যৎকার্য্যের ফলাফল নির্দ্ধারণ করে।

খাসিয়াদের নিজস্ব কোনপ্রকার ঔষধ পথ্য নাই; ভূত প্রেতের অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে বিদেশী ঔষধ খাইতেও ইহারা বিশেষ আপত্তি করিত। কিন্তু বিদেশী ঔষধের ক্ষমতায় ইতিমধ্যেই ইহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এই ঔষধ প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গেই ইহাদের ভূতপ্রেতে বিশ্বাসও ক্রমশঃ দূর হইয়া যাইতেছে। অবশ্য এখনও এমন অনেক লোক আছে, যাহারা হাজার অসুখেও ঔষধ স্পর্শ করে না, এমন কি ঔষধের শিশি হাতে থাকিলে সে লোককে ঘরেই ঢুকিতে দেয় না। দিন দিন পেটেণ্ট ঔষধের মান বাড়িতেছে এবং হাতুড়ে ডাক্তারদের গৃহে পেটেণ্ট ঔষধের পুলিন্দা ক্রমশই বেশী করিয়া আমদানী হইতেছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে খাসিয়া ধর্ম্মের মরণকাল দিনে দিনে ঘনাইয়া আসিতেছে।

ইহাদের বিশ্বাস যে মৃত পূর্ব্বপুরুষগণ জীবিত বংশধরগণের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বপুরুষ-পূজার প্রচলন আছে। বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা কিম্বা পীড়া উপলক্ষে পূজা হইলে অমঙ্গলটির কারণ ঘরে (অর্থাৎ মৃতপূর্ব্বপুরুষের কুনজর পড়াতে) কি বাহিরে (অপদেবতার কুনজর লাগিয়া) প্রথমে তাহাই নির্দ্ধারণের চেষ্টা হয়। এই মৃতপূর্ব্বপুরুষগণের ভিতর মাতামহী, মাতুল ও পিতা প্রধান; ইহাদের মধ্যে এক প্রকার ত্রয়াত্মক যোগ আছে বলিলেও চলে। মৃত আত্মাদের সম্মানার্থ এক অখণ্ড প্রস্তরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়। পর্ব্বতগাত্রে সর্ব্বত্র তিন, পাঁচ, সাত, এইরূপ বিজোড় ভাবে সারি সারি স্মৃতিস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে মাঝের তিনটি পূর্ব্বোক্ত ত্রিমূর্ত্তির উদ্দেশ্যে স্থাপিত।

খাসিয়াদের মধ্যে যাদুকর আছে। লোকে বলে ইহারা ভূতপ্রেত লাগাইয়া মানুষ মারিতে, মানুষকে পীড়াগ্রস্ত

খাসিয়া ফলবিক্রেতা।

চেরাপুঞ্জি বড় বাজার।

করিতে এবং দুষ্ট আত্মা তাড়াইতে পারে। শেলা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কতকগুলি স্ত্রীলোক ভূত-গ্রস্ত (মিডিয়মের ন্যায়) হইয়া রোগশান্তি, মোকদ্দমাজয় প্রভৃতি বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে। এই-সকল কুসংস্কারের মধ্যে 'থ্লেন' নামক কল্পিত সর্প-সম্পর্কীয়টিই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। লোকের বিশ্বাস কোন কোন পরিবার এই বৃহদায়তন ভীষণ সর্পটিকে নররক্ত, নখ, চুল প্রভৃতি দ্বারা সেবা ও পূজা করে। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রায় প্রতি বৎসরই অনেক রহস্যময় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া থাকে। খুনীরা বেশীর ভাগই ধরা না পড়িয়া বা বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি পাইয়া যায়।

খাসিয়া ফলবিক্রেতা।

খাসিয়া জাতি যে এখনও সভ্যতার বহুনিম্নস্তরে পড়িয়া আছে তাহা তাহাদের বর্ণমালার ও সময়বিভাগপ্রণালীর অভাব দেখিয়াই—বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার অব্দ প্রচলিত নাই, কাজেই তাহারা বয়স বলিতে হইলে নিজ নিজ জন্মকালীন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার নাম করিয়া এ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দিতে চেষ্টা করে। ইহাদের মধ্যে চান্দ্রমাস প্রচলিত, মাসের নামগুলি ঋতু ও তৎকালীন প্রাকৃতিক অবস্থা অনুসারে দেওয়া হয়; আষাঢ় মাসে ঘনবৃষ্টিপাত হইয়া জল গভীর হয় বলিয়া তাহার নাম 'গভীরজল' মাস। শ্রাবণ মাসে পাতা ও ঘাস পচিয়া দুর্গন্ধ উঠে বলিয়া তাহার নাম 'দুর্গন্ধচন্দ্র' বা 'দুর্গন্ধমাস'। এইরূপে মাস গণনায় একটা মুস্কিল আছে,—প্রতি অমাবস্যায় এক-একটি নূতন মাস গুণিতে আরম্ভ করিলে গভীরজল মাস বর্ষাকালে নাও পড়িতে পারে; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইহারা আষাঢ় মাসকেই ঐ নামে অভিহিত করে। ইহাদের গণনায় আটদিনে এক সপ্তাহ হয়, হাটবার হইতে এই গণনার সৃষ্টি; পরে পরে আট গ্রামে আটদিন হাট হয় বলিয়া হাটের নাম অনুসারে বারের নাম হয়। এই আটটি গ্রাম ছাড়া অন্য কয়েকটি গ্রামের নিজস্ব বাজার আছে। সকাল, বিকাল, দুপুর প্রভৃতি ব্যতীত দিনবিভাগবাচক আর কোন শব্দ ইহাদের মধ্যে চলিত নাই। 'বাজে' এই বিদেশী শব্দটি পকেট ঘড়ি, বড় ঘড়ি, পেটা ঘড়ি, ঘণ্টা প্রভৃতি যে-কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা;—এগার বাজে, অর্থ—একাদশ ঘণ্টা কিম্বা এগারটা বেলা কি রাত্রি সবই হইতে পারে।

খাসিয়ারা যদি সত্য সত্যই 'মন-আনাম' জাতির শাখা-বংশ হয় তাহা হইলে উক্ত আদিমজাতির মধ্যে লিখিত

ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ হইবার পূর্ব্বেই নিশ্চয় ইহারা মাতৃজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খাসিয়া পর্ব্বতে বাসস্থাপন করিয়াছে; নতুবা ইহারা 'মন-আনাম' জাতির সাহিত্যের কিয়দংশ কিম্বা অন্ততঃপক্ষে বর্ণমালাগুলিও সঙ্গে করিয়া আনিত। খাসিয়া ভাষাকে ভাষাতত্ত্বানুযায়ী কোন একটি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করা শক্ত, কারণ মোক্ষমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতদের সংজ্ঞানুসারে ইহাকে একমাত্রিক ভাষা বলা ঠিক নয়। ইতিমধ্যেই খাসিয়াভাষা বহু বিদেশী শব্দ সম্পদে পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহাতে শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিষয়ের, এমন কি দৈনন্দিন কথাবার্ত্তা চালাইবারও বহু শব্দের অভাব আছে। খাসিয়াভাষার শতকরা পঁচিশটি শব্দ সিলেটী বাংলা শব্দ
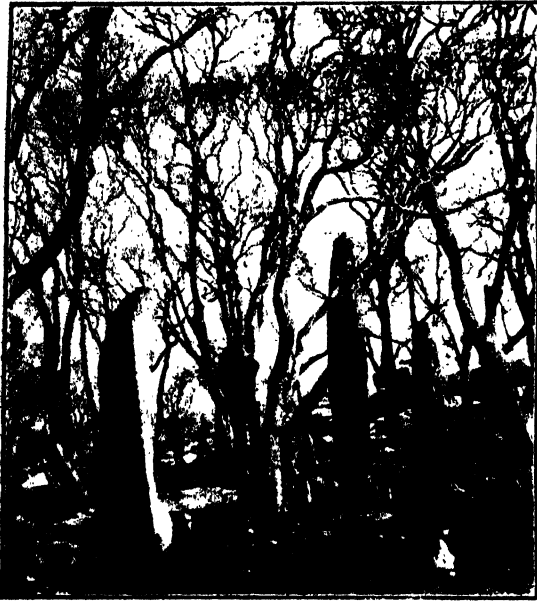
খাসিয়াদের অখণ্ড প্রস্তরের সমাধিস্তম্ভ।
শিলং বড় বাজারের একাংশে।

অথবা তাহার অপভ্রংশ; কয়েক পুরুষ ধরিয়া সিলেট প্রভৃতি সমতলপ্রদেশবাসী বাঙালীদের সহিত ব্যবসায় ও অন্যান্য বহু কারবার করিতে করিতে ইহারা এই-সকল শব্দ সংগ্রহ করিয়াছে। উক্ত অঞ্চলের মুসলমান ব্যবসাদারদের ব্যবহৃত কতকগুলি উর্দ্দু শব্দও খাসিয়াভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা খাসিয়াদের মধ্যে একটি মিশন স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলা অক্ষরের সাহায্যে উঁহাদের ভাষাটি লিখিত ভাষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হওয়ায় ওয়েলস্ ক্যালভিনিষ্টিক মিশনের অগ্রদূতেরা আসিয়া রোমান অক্ষরের প্রবর্ত্তন করেন। উক্ত অক্ষর অবলম্বন করিয়াই খাসিয়াভাষা বর্ত্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

খাসিয়া-পর্ব্বতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তিনটি খৃষ্টান মিশন কাজ করিতেছেন; ইঁহাদের মধ্যে ওয়েলস ক্যালভিনিষ্টিক মেথডিষ্ট মিশনই (Welsh Calvinistic Methodist Mission) সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও ক্ষমতাশালী। গত ৭৪ বৎসর ধরিয়া ইঁহারা ধর্ম্মমত প্রচারে, কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনে, বহু কেন্দ্র হইতে অল্প মূল্যে ঔষধ বিতরণে ও অন্যান্য সৎকার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন। ইহা ভারতবর্ষের সমস্ত বিদেশী মিশন অপেক্ষা ধনী বলিয়া খ্যাত, ইঁহাদের অনুগামীও যথেষ্ট আছেন; কিন্তু ইঁহারা যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, সে পরিমাণে ইঁহাদের কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য ইঁহারা লোককে যে প্রকারে প্রলুব্ধ করেন, তাহাকে মোটেই সজ্জনোচিত কার্য্য বলা চলে না। এই মিশন খাসিয়াভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তক এবং কতকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খাসিয়াভাষাকে একটি দ্বিতীয় ভাষা (Second language) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সমতলপ্রদেশের পুস্তকাদির সহিত তুলনা করিলে খাসিয়াভাষায় Middle Vernacular Examinationএর উপযুক্ত একখানিও পুস্তক নাই বলিতে হয়; এমন কি এই ভাষায় গদ্য, পদ্য, ভূগোল, ব্যাকরণ প্রভৃতি নিতান্ত সাধারণ শব্দেরও প্রতিশব্দ নাই। এইরূপ ভাষাকে গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষার আদর্শকে হীন করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বাংলাই খাসিয়াদের পরীক্ষার দ্বিতীয় ভাষা হওয়া উচিত; অনেকে বাংলা শিখিতেও খুব উৎসুক। অনেক স্থান হইতে বাংলা স্কুল খুলিবার অনুরোধও খাসিয়া-পাহাড়ের ব্রাহ্মমিশনের কাছে আসে। খাসিয়ারা বাংলা শিখিলে বাঙালীদের সঙ্গে সহজে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারে; শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে গিয়া দ্বিতীয়

ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে বা কৃষি চিকিৎসা পশুচিকিৎসা বা শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত একটি বাংলা স্কুল ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ভাঙিয়া গিয়াছে, বাঙালী কর্ম্মীর অভাবে নূতন স্কুল করিতে পারা যায় নাই; খাসিয়ারাই অল্পস্বল্প বাংলা শিখিয়া অপরকে শিখায়। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বাস্থ্য, অর্থ ও লোকের অভাবে এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রতিকূলতার জন্য শেলা বা চেরাপুঞ্জীতে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। খ্রীষ্টান মিশনরীরা খাসিয়াদিগকে বাঙালী হইতে একেবারে স্বতন্ত্র করিবার জন্য তাহাদিগকে বাংলা শিখিতে দিতে নারাজ এবং খাসিয়াদের সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য খাসিয়া সাহিত্য গড়িতে ব্যাপৃত আছেন। খাসিয়া সাহিত্যের সৃষ্টিকার্য্য পূর্ব্বে কেবল খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু প্রায় পনের বৎসর হইল দেশীয় লোকেরাও একার্য্যে যোগ দিয়াছেন। প্রথম এক্‌ষ্ট্রা অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনর স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত জীবন রায় কেবলমাত্র স্বীয় কর্ম্মোৎসাহ ও প্রতিভার বলে উচ্চপদ লাভ করিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য কয়েকজন বন্ধুর উৎসাহে পূর্ব্বোক্ত খাসিয়া ভদ্রলোক খ্রীষ্টানদিগের সম্মুখে খ্রীষ্টধর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মের মূল্যবান শিক্ষাসমূহের একটা মোটামুটি ছবি ধরিবার উদ্দেশ্যে খাসিয়াভাষায় বুদ্ধ ও চৈতন্যের জীবনী এবং একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ প্রকাশ করেন। ইনি শিলংএ হাই ইংলিশ স্কুল স্থাপনে সাহায্য করেন এবং ইঁহার দুই পুত্রই সর্ব্বপ্রথমে এই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলমণি বাবুর বন্ধু; ইনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া একটি মাসিক পত্র পরিচালন করিতেছেন এবং ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি বাংলা ভাষা বেশ জানেন এবং আচার ব্যবহারে পোষাকে ধরণে প্রায় বাঙালী বনিয়া গিয়াছেন। বাবু হর্‌রায় যে আর একখানি সংবাদপত্র পরিচালন করিতেছিলেন তাহা এখন উঠিয়া গিয়াছে। জীবন বাবুর দুই পুত্রের প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার (১৮৮০খৃঃ) পরবর্ত্তী কালের পরীক্ষাদির ফলাফল দেখিয়া বোধ হয় এ অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি বড় ধীরে ধীরে হইতেছে। সমস্ত জাতির মধ্যে এই ৩৫ বৎসর সময়ে মাত্র ছয়জন গ্রাজুয়েট, জনকয়েক অণ্ডার-গ্রাজুয়েট, একজন এম্‌-এ (১৯১৪ খৃঃ), একজন বি-এল, একজন এল-এম-এস (ডাক্তার) ও একজন মহিলা অণ্ডার-গ্রাজুয়েট হইয়াছেন। সমগ্র জেলার মধ্যে মাত্র একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয় ও তিন চারিটি মধ্যশ্রেণীর (Middle) বিদ্যালয় আছে; তবে নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয় অনেকগুলি আছে। শ্রীযুক্ত জীবন রায় এবং শেলার অধিবাসীগণ ব্যতীত এ পর্য্যন্ত খাসিয়া-পর্ব্বতনিবাসী অন্য কোন ব্যক্তি নেহাৎ ছোটখাট একটা পাঠশালা স্থাপনেরও চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু এখানেও এমন অনেক প্রতাপশালী সর্দ্দার আছেন যাঁহারা অনায়াসেই এক-একটা পাঠশালার খরচ চালাইতে পারেন। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে এখানকার অধিবাসীরা এখনও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

আগামী বারে খাসিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের পরিচয় দেওয়া যাইবে।

এই প্রবন্ধের প্রায় সমস্ত ছবি শিলংএর ফটোগ্রাফার ঘোষাল ব্রাদার্সের তোলা ছবির নকল।

পরিনির্ব্বাণ

আমার হৃদয়, হায় দুর্ব্বল হৃদয়—
মন্ত্রজপ সম শুধু মোর কানে কয়,
সহেনা সহেনা আর এ শূন্য বিরহ
এ বেদনা অনিবার হায় অহরহ।
সুদূরে নিকট করি, এস হে দয়িত
পরাণের পাশে মোর করাও শায়িত
পরাণ তোমার; তৃপ্ত বেঁচে থাক্‌ দোঁহে
সুখস্বপ্নছায়ালোকে আশা-মায়া-মোহে!
এস মরে যাই শুধু মোরা দুই জনে
আপন সর্ব্বস্ব-হারা অসীম বিজনে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা

মনুষ্যের অনেক কার্য্য এইরূপ যে, সে প্রকার কার্য্য সকল-জীবেই করে; আবার তাহার কতকগুলি কার্য্য এইরূপ যে, সে প্রকার কার্য্য আর কেবল মনুষ্যই করে—আর কোনো জীব করে না। মনুষ্যকৃত শেষোক্ত প্রকার কার্য্যের মধ্যে প্রধান-একটি কার্য্য—তত্ত্ব-নির্দ্ধারণ।

নীড় হইতে সদ্যো-বিনির্গত পক্ষিশাবক যেমন প্রথম প্রথম বাসবৃক্ষের এ ডালে ও-ডালে সে-ডালে উড়িয়া বসে; তাহার পরে এ-গাছে ও-গাছে সে-গাছে উড়িয়া বসে; তাহার পরে মুক্ত আকাশে উড্ডীয়মান হয়; মনুষ্যের ধীশক্তি তেমনি—প্রথম-প্রথম, কালাকাল-নিরূপণের জন্য যে-টুকু জ্যোতিষ-তত্ত্ব আশু-প্রয়োজনীয়, ক্ষেত্রাদি বিভাজনের জন্য যেটুকু জ্যামিতি-তত্ত্ব আশু-প্রয়োজনীয়, ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার জন্য যেটুকু রসায়ন-তত্ত্ব আশু-প্রয়োজনীয়, আয়-ব্যয় পর্য্যবেক্ষণের জন্য যেটুকু গণিততত্ত্ব আশু-প্রয়োজনীয়, সেইসব ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আপাত-প্রয়োজনীয় তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে; তাহার পরে সেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আপাত-প্রয়োজনীয় তত্ত্বের সহিত নানা প্রকার সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত পরপরবর্ত্তী আর-আর তত্ত্ব, একটির পর আরেকটি করিয়া, উত্তরোত্তরক্রমে নির্দ্ধারণ করিতে থাকে; তাহার পরে সেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পূর্ব্বনির্দ্ধারিত তত্ত্বপরম্পরার সঙ্গত মাফিক ব্যূহ সাজাইয়া জ্যোতিষ, জ্যামিতি, রসায়ন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা গড়িয়া দাঁড় করায়; তাহার পরে সকল বিদ্যার সরিতের সাগর যে-এক মহাবিদ্যা কিনা ব্রহ্মবিদ্যা তাহার প্রতি ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণ করে। উপনিষদে শেষোক্ত মহাবিদ্যাকে বলা হইয়াছে পরাবিদ্যা, এবং অপরাপর বিদ্যাকে বলা হইয়াছে অপরাবিদ্যা। কিয়ৎ পরিমাণ অপরাবিদ্যা জ্ঞানে আয়ত্ত না করিলে মনুষ্যের কিছুতেই চলিতে পারে না; কেননা, তাহার উপরে মনুষ্যের সংসার যাত্রা-নির্ব্বাহের উপযোগী পাথেয় সম্বলের আয়োজন-সামর্থ্য নির্ভর করে; আবার, কিয়ৎ পরিমাণ পরাবিদ্যা জ্ঞানে আয়ত্ত না করিলেও মনুষ্যের কিছুতেই মঙ্গল নাই; কেননা, তাহার উপরে মনুষ্যের পারমার্থিক জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের উপযোগী পাথেয় সম্বলের আয়োজন-সামর্থ্য নির্ভর করে।

প্রশ্ন। তা যদি হয়—এরূপ যদি হয় যে, মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলের জন্য পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা দুইই সমান আবশ্যক, তবে দুয়ের মধ্যে ঐক্য এবং সামঞ্জস্য কত না প্রার্থনীয়? কিন্তু দেখিতে পাই আমরা ঠিক তাহার বিপরীত। ঐক্যের পরিবর্ত্তে দেখিতে পাই তেলে জলে যেমন তেমনিতর অমিল; সামঞ্জস্যের পরিবর্ত্তে দেখিতে পাই সতীনে সতীনে যেমন তেমনিতর আড়াআড়ি। এই বিসদৃশ ব্যাপারটির গোড়ার বৃত্তান্তটা কি—সেইটিই তোমার নিকটে আমার জিজ্ঞাস্য।

উত্তর। আমাদের দেশের পুরাণাদি শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এটা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পুরাকালে আমাদের দেশে সংসার-নির্ব্বাহোপযোগী অপরাবিদ্যার চর্চ্চা তখনকার কালের অপরাপর সভ্য দেশের অপেক্ষা বেশী বই কম ছিল না। কিন্তু হইলে হইবে কি—অপরাবিদ্যা শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আমাদের দেশের সরস্বতীর বরপুত্রেরা তাহাকে অবিদ্যা ধাত্রীর হস্তে অযত্নে ফেলিয়া রাখিয়া আপনারা পরাবিদ্যার অনুশীলনে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিকে এ যেমন দেখা গেল—আর এক দিকে তেমনি পাশ্চাত্য দেশের প্রভূত কাণ্ডকারখানা'র ভিতরে অনুসন্ধান-দৃষ্টি চালনা করিলে এটাও বেস্ বুঝিতে পারা যায় যে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে গ্রীস্ দেশীয় মহাজ্ঞানী প্লেটো'র জীবৎকাল পর্য্যন্ত পরাবিদ্যার চর্চ্চা চলিয়াছিল নিতান্ত কম না। কিন্তু প্লেটোর সারস্বত উত্তরাধিকারী যিনি ছিলেন—আরিষ্টটেল্, তিনি তাঁহার গুরুকে ডিঙাইয়া পরাবিদ্যার বাগ ফিরাইয়া দিলেন অপরাবিদ্যার দিকে। আরিষ্টটেলের আধুনিক সারস্বত উত্তরাধিকারীরা আবার তাঁহার দেখাদেখি—তিনি পরাবিদ্যার যেটুকু বাকি রাখিয়াছিলেন তাহা সুদ্ধ সমস্ত পরাবিদ্যাকে বিজ্ঞানের গণ্ডির মধ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এই বহিষ্করণ ব্যাপারটির আদি গুরু ছিলেন বেকন্। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা পরাবিদ্যাকে "দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়া" প্রাচীনা বাইবেল্ ধাত্রীর হস্তে অযত্নে ফেলিয়া রাখিয়া আপনারা অপরাবিদ্যার ক্ষেত্রকর্ষণে,

উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন তো খুবই—তা ছাড়া তাহা হইতে তাঁহারা পরমাদ্ভুত বিপর্য্যয় মহামারী কাণ্ড প্রচুর পরিমাণে ফলাইতে আরম্ভ করিয়াছেন এম্নি যে, তাহা দেখিয়া পৃথিবীসুদ্ধ লোকের তাক্‌ লাগিয়া গিয়াছে। শিবদেব—যাঁহার আর-এক নাম মঙ্গল, তিনি রহিয়াছেন অগম্য কৈলাশ শিখরে! উমা—যাঁহার আর এক নাম ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা, আর, পাতাল গঙ্গা ভোগবতী (অর্থাৎ ফণাবতী) যাহার আর এক নাম তামসী অপরাবিদ্যা—এই দুই সপত্নীর কন্দলে নিম্নের পৃথিবীতল অশান্তির আলয় হইয়া উঠিয়াছে।* বলিলাম "তামসী অপরা বিদ্যা"—সাত্ত্বিকী অপরাবিদ্যা পাত্রী স্বতন্ত্র। সাত্ত্বিকী অপরাবিদ্যা সাক্ষাৎ পতিতপাবনী ভূ-গঙ্গা—তাঁহার কল্যাণ-স্রোতে মরুভূমি সরস উদ্যান হইয়া উঠে—তিনি অন্নপূর্ণা দেবীর সমদুঃখসুখী প্রাণসখী। সাত্ত্বিকী অপরাবিদ্যা সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিব; এখন তাহা যবনিকার আড়ালে ঢাকাঢুকি দিয়া রাখা গেল। পরাবিদ্যারূপিণী উমা এবং তামসী অপরাবিদ্যারূপিণী ভোগবতী—এ দুই সপত্নীর মধ্যে বিবাদ-আর কিছুতেই যখন মেটে না, তখন "জন্মেও যেন আমাকে তোমার মুখ দেখিতে না হয়" এই বলিয়া পরাবিদ্যা উমা রহিলেন তাঁহার পিত্রালয় উদয়াচল-ঘ্যাঁসা ভারতবর্ষে, তামসী অপরাবিদ্যা ভোগবতী গেলেন তাঁহার পিত্রালয় অস্তাচল ঘ্যাঁসা সাগরপারে।

ক্রমশঃ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সার্থকতার প্রতীক্ষা

শুক্তির পরাণ মন পথ চেয়ে আছে—
স্বাতী-বিন্দু পেলে সে যে মুক্তা হয়ে বাঁচে।
হৃদয় মেলিয়া আছি—যারে ভালো বাসি
মোর লাগি তার চোখে জল দেখে হাসি।

শ্রী—

---

* উপনিষদের একস্থানে বাস্তবিকই ব্রহ্মবিদ্যার নাম দেওয়া হইয়াছে উমা। শব্দকল্পদ্রুমে ভোগবতীর অর্থ করা হইয়াছে এইরূপ:—ভোগ, অর্থাৎ সর্পশরীর যাহাতে প্রচুর পরিমাণে আছে। এতদনুসারে ভোগবতীর সহিত বিষাক্ত শ্রেণীয় তামসী অপরাবিদ্যার উপমা খাটে মন্দ না।

চীনা স্বরাজের ভবিষ্যৎ

চীনে আজকাল বিষম রাষ্ট্রীয় গোলযোগ চলিতেছে। ইংরেজি সংবাদপত্রের সাহায্যে যেরূপ বুঝিতেছি তাহাতে প্রধানতঃ তিনটী রাষ্ট্রীয় দলের পরিচয় পাওয়া যায়। মাঞ্চু-বংশীয় সম্রাট্‌দিগের দল প্রথম হইতেই 'স্বরাজ' বা রিপাব্লিক স্থাপনের বিরোধী রহিয়াছে। বিগত তিন বৎসর ধরিয়াই তাহাদের ষড়যন্ত্র চলিতেছে—পুনরায় রাজতন্ত্র স্থাপনের কথা বিশেষ জোরের সহিতই আলোচিত হইতেছে। মাঞ্চু-বংশের উত্তরাধিকারীকে সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাবও প্রচারিত হইতেছে।

এদিকে 'স্বরাজে'র সভাপতি যুয়ান্-শি-কাই প্রজাতন্ত্র-শাসনের মুণ্ডপাত করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সম্রাট হইয়া বসিয়াছেন। ইঁহার ক্ষমতা অতি প্রবল—মাঞ্চুপক্ষীয়েরা ইঁহাকে কোন মতেই জব্দ করিতে পারিতেছেন না। বরং যুয়ান্-শি-কাইয়ের দল কাগজে কাগজে প্রচার করিতেছে—"চীনে প্রজাতন্ত্রশাসন টিকিতে পারে না। আমাদের সমাজে এখনও বহুকাল রাজতন্ত্রশাসনের ব্যবস্থাই আবশ্যক। অথচ মাঞ্চুবংশীয় নরপতিগণের আমলে বহুকাল পর্য্যন্ত কুশাসন চলিয়াছে। এই জন্য যুয়ান্-শি-কাইকে খোলাখুলি সাম্রাজ্যের সিংহাসন প্রদান করা হউক। কারণ দেশে এক্ষণে ইঁহার মত সুবিবেচক ও কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি দ্বিতীয় নাই।" এদিকে যুয়ান্-শি-কাই স্বয়ং প্রচার করিতেছেন—"আমি দেশমাতার নিকট প্রথম হইতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, চীনে রাজতন্ত্র পুনঃ স্থাপিত হইতে দিব না, প্রজাতন্ত্রশাসনই চীনে চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টিত হইব। আমি রাজসিংহাসনে বসিতে চাহি না—আমাকে সম্রাট করিবার জন্য আন্দোলনসমূহ আমাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিতেছে। যদি জবরদস্তি করিয়া আমাকে সিংহাসন প্রদান করা হয় তাহা হইলে আমি দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। রিপাব্লিকের ধ্বংস সাধন করা আমার দ্বারা হইবে না।" বলা বাহুল্য যুয়ান্-শি-কাই চালে চলিতেছেন। ফরাসীবিপ্লবের ইতিহাসেও এইরূপ ধড়িবাজি কয়েকবার দেখা গিয়াছিল। লুই নেপোলিয়ানও প্রজাতন্ত্রের সভাপতি মাত্র থাকিতে থাকিতে রাজপদ আকাঙ্ক্ষা করিতেন।

সুতরাং য়ুয়ান্-শি-কাইয়ের চরিত্রে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

এদিকে চরমপন্থী স্বরাজপক্ষীয়েরা সান্-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে য়ুয়ান্-শি-কাইকে ধনেপ্রাণে মারিবার চেষ্টায় প্রাণপণ ব্রতবদ্ধ। য়ুয়ান্-শি-কাই এই দলের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আইনের জোরে হত্যা করাইতে পারিয়াছেন। সান্-ইয়াৎ-সেনের ন্যায় বহু ব্যক্তি দেশ হইতে নির্ব্বাসিতও রহিয়াছেন। তাঁহারা জাপানে, আমেরিকায়, ইয়োরোপে, এবং চীনের ইংরেজ, জার্ম্মান, ফরাসী, জাপানী ও অন্যান্য কন্‌সেশন ভূমিতে বাস করিয়া আন্দোলন চালাইতেছেন। বলা বাহুল্য এই ষড়যন্ত্রকারীরা পুরাপুরি প্রজাতন্ত্রশাসনের আকাঙ্ক্ষা করেন। মিঙ্‌বংশীয় নরপতির সিংহাসনপ্রাপ্তিও ইহাঁদের ইচ্ছা নয়—আবার য়ুয়ান্-শি-কাইয়ের সাম্রাজ্যলাভও ইহাঁদের মনোনীত নয়। য়ুয়ান্-শি-কাইয়ের অধীনে প্রজাতন্ত্রশাসন বা স্বরাজের যে দুর্গতি ঘটিয়াছে তাহাই নিবারণ করা ইহাঁদের উদ্দেশ্য। এইজন্য য়ুয়ান্‌কে সভাপতিত্ব হইতে বিতাড়িত করিয়া উপযুক্ত স্বরাজসেবককে কার্য্যভার প্রদান করা ইহাঁদের লক্ষ্য।

সান্-ইয়াৎ-সেনের দল বলিতেছেন—"য়ুয়ান্ একজন বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদী চোরস্বরূপ। আমরা যখন মাঞ্চু‌বংশের বিরুদ্ধে বিপ্লব সুরু করি তখন সাম্রাজ্যপক্ষীয় সৈন্যগণের অধ্যক্ষ হইয়া য়ুয়ান্ আমাদিগকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন—পরে আমাদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সম্রাট্‌কে তাঁহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। পরে আমরা ইহাঁকে প্রজাতন্ত্রশাসনের সভাপতিত্ব প্রদান করি। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই য়ুয়ান্ মাঞ্চু‌সম্রাটের অধিকারসমূহ দখল করিয়া বসিলেন—প্রজাতন্ত্রশাসনের নামগন্ধও আর থাকিল না। চীনে 'স্বরাজ' আজকাল শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত। তাহাতেও য়ুয়ান্ সন্তুষ্ট নন—ইনি নামেও সম্রাট্ হইতে ইচ্ছা করেন। এইজন্য নানা কৌশলে দেশের ভিতর রাজতন্ত্রীদিগের আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতেছেন। সুতরাং সকল দোষের গোড়া এই য়ুয়ান্‌কে নিধন না করিলে চীনা জনসাধারণের সুখ ও শান্তি হইবে না।"

এদিকে চীনে যে-সমুদয় বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জ জুড়িয়া বসিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেক ষড়যন্ত্রের পশ্চাতেই ধুয়া ধরাইতেছেন। ইহাঁরা জানেন যে, স্বরাজই হউক বা রাজতন্ত্রই হউক, য়ুয়ান্‌ই প্রবল হউন বা মাঞ্চুই প্রবল হউন বা শেষ পর্য্যন্ত সান্-ইয়াৎ-সেনের দলই জয়লাভ করুন—চীন মোটের উপর দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেই। প্রত্যেক দলকেই বিদেশী ধনী ও জ্ঞানী ব্যক্তির শরণাপন্ন হইতে হইবেই। কাজেই কোন প্রকার বিপ্লব বা গণ্ডগোল বাধিলে বিদেশীদিগের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। বরং ঘটনাচক্রে দুই চারিবার কোন বিদেশী কন্‌সেশন ভূমিতে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইলে প্রভুরা চীনের উপর জুলুম করিবার সুযোগ বেশী পাইবেন। তাহার ফলে চীনের অনেক অংশ চীনাদের হাতছাড়া হইতে থাকিবে। সুতরাং বিদেশীরা "বরের ঘরের পিসী এবং কনের ঘরের মাসী" সাজিতেছেন। দুই দিকেই ইহাঁদের কাঠি বাজিতেছে। তবে সংবাদপত্রের লেখায় বুঝা যায় ইহাঁরা রাজতন্ত্রের দিকেই বেশী ঝুঁকিতেছেন। কিন্তু মাঞ্চু‌বংশীয়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ইহাঁরা সুখী হইবেন এমনও বুঝা যাইতেছে না।

তবে বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে একটা সহজসাধ্য মীমাংসা শীঘ্র ঘটিয়া উঠা কঠিন। আজ যদি ইয়োরোপে মহাকুরুক্ষেত্র না চলিত তাহা হইলে চীনের এই গণ্ডগোলে সকলেই মহা সন্তুষ্ট থাকিতেন—কারণ তখন সকলেই জাহাজ ও সৈন্য লইয়া চীনের বন্দরে বন্দরে লুটপাটের সুযোগ অন্বেষণ করিতে পারিতেন। আর, কোন উপায়ে চীনের ভিতর একবার হস্তক্ষেপ সুরু হইলে এশিয়ার বুকের উপরে জার্ম্মান, ফরাসী, রুশ, জাপানী ও ইংরেজ শক্তিসমূহের বিরাট কুরুক্ষেত্র চলিত। চীনের ভাগ-বাটোয়ারা সম্বন্ধে একটা রফা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ আজকাল ঘর সামলাইতেই ব্যতিব্যস্ত। একমাত্র জাপানের হাত খালি রহিয়াছে। চীনে গণ্ডগোল সুরু হইলে জাপান যত লাভবান্ হইবেন ইয়োরোপীয়েরা তাহার শতাংশও পাইবেন না। এইজন্য খৃষ্টান রাষ্ট্রপুঞ্জ চীনের বর্ত্তমান অবস্থায় কিছু উদ্বিগ্ন বুঝিতেছি।

দেখা যাউক কতদূর গড়ায়—যে-কোন মুহূর্ত্তেই একটা দাঙ্গাহাঙ্গামার আশঙ্কা করা যাইতেছে। এমনও অসম্ভব

নয় যে য়ুয়ান্‌-শি-কাই স্বয়ংই ওস্তাদিচালে মাঞ্চু-বংশীয় সম্রাটকে সিংহাসন প্রদান করিতে উদ্যত হইতে পারেন। বস্তুতঃ তাহা হইলে য়ুয়ানের চৌর্য্য-অপরাধ ক্ষালিত হয়, রাজতন্ত্রীরাও সন্তুষ্ট হন। এদিকে য়ুয়ানের প্রতাপও প্রকৃত প্রস্তাবে বজায় থাকে। একমাত্র সানের দল এবং চীনের ও মানবসমাজের হিতৈষীরা দুঃখিত হইবেন।

নব্য চীন

বরাহমিহিরের "বৃহৎ সংহিতায়" উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে ম্লেচ্ছের নিকটও বিদ্যা অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য এবং গুরু ম্লেচ্ছ হইলেও পূজনীয়। গ্রীক পণ্ডিতদিগের নিকট হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদগণের ঋণ গ্রহণ উপলক্ষ্যে বরাহমিহির এই কথা বলিয়াছিলেন। সে খৃষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। তখন বিদেশীর নিকট ঋণ স্বীকার করিতে ভারতবাসী কুণ্ঠিত হইত না। বিধর্ম্মীর শিষ্যত্বগ্রহণও ভারতে নিন্দিত হইত না। বস্তুতঃ সেই যুগে আমাদের সঙ্গে বিদেশীগণের লেনদেন সমানে সমানে চলিত; কাজেই আদানপ্রদানে ও বিনিময়ে আমরা দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতাম না।

কিন্তু মুসলমান অধিকারের পর হইতে ভারতসমাজে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাশক্তির কার্য্য খানিকটা মন্দীভূত হইয়াছে। পরদেশ ও পরধর্ম্মকে আমরা বিষবৎ বর্জ্জন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। পরকীয় সকল পদার্থই সন্দেহের চোখে দেখিতে শিখিয়াছি। কাজেই একদিকে কূপমণ্ডূকত্ব অপরদিকে আত্মাভিমান আমাদের চরিত্রে দেখা দিয়াছে। "আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জগতের সকল ক্ষেত্রেই চরম সত্য-সমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—আমরা সেই আর্য্য জ্ঞানবিজ্ঞানের উত্তরাধিকারী, আমাদিগকে বিদেশীরা আবার কি শিখাইতে পারে?"—এই চিন্তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় পণ্ডিতমহলে বিরাজ করিত। অবশেষে ঘটনাক্রমে বিদেশী ম্লেচ্ছরাজগণের অধীনে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়া আমরা আবার বরাহমিহিরের উপদেশ মানিতে শিখিয়াছি।

দুনিয়ার সকল জাতিই অপরাপর জাতিকে ম্লেচ্ছ বর্ব্বর ও অসভ্য বিবেচনা করিয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীকেরাও করিত—আধুনিক পাশ্চাত্যেরাও করিতেছে—ভারতবাসীও করিত জাপানীরাও করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবাসী ইয়োরোপকে যেরূপ ভাবিত, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানীরাও ইয়োরোপ-আমেরিকাকে সেইরূপ ভাবিত। কিন্তু শিমনোসেকির যুদ্ধে পরাজিত হইবা মাত্র তাহাদের চোখ ফুটিল। তখন জাপানের দূরদর্শীরা বুঝিলেন "ম্লেচ্ছদিগের নিকটও বিদ্যা অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।" এক্ষণে ম্লেচ্ছবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া জাপান ভারতবর্ষের দশা এড়াইতে পারিয়াছেন।

চীনেও ভারতীয় এবং জাপানী অহঙ্কার অত্যধিক ছিল। চীনারা ভাবিত—"কন্‌ফিউশিয়াস যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার অতিরিক্ত উপদেশ দুনিয়ার আর কে প্রচার করিতে পারেন? ইয়োরোপ-আমেরিকার ম্লেচ্ছবর্ব্বরেরা ত নাবালক শিশু মাত্র। আমরা উহাদের গুরুস্থানীয়।" কাজেই কূপমণ্ডূকত্ব এবং আত্মাভিমান উভয় ব্যাধিই চীনা-সমাজে প্রচুর ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত চীনারা ম্লেচ্ছকে তুচ্ছ করিয়াই চলিত। অবশেষে ১৮৯৪।৫ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদ্র জাপানের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া চীন-সম্রাট বুঝিলেন—"তাই ত! অসভ্য জাপান ম্লেচ্ছবিজ্ঞানে হাত মক্‌স করিতে না করিতেই আমাদের প্রবল শক্তিকে পদানত করিল! তবে কি কন্‌-ফিউশিয়াস এবং চীনাপ্রাচীরের বাহিরেও বিদ্যাবুদ্ধি আছে?" জাপানীরা চীনাদের আত্মাভিমান প্রথম ভাঙিয়া দেয়। তখন হইতে ইহারা নব্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়।

চীনাদের যথার্থ চৈতন্যোদয় হইতে আরও কিছুকাল কাটিয়াছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে চীনের দেশভক্ত স্বেচ্ছাসেবক-গণ বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের আধিপত্য নষ্ট করিবার জন্য খড়্গ ধারণ করেন। চীনের ভিতর যে-সমুদয় বিদেশী কন্‌-সেশনভূমি এবং অধিকৃত ভূমি রহিয়াছে সেই সমুদয়ে পুনরায় চীনাসাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তার করা ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই স্বদেশী আন্দোলনের ধুরন্ধর ছিলেন কুস্তীগির লাঠিয়ালেরা। চীনাসমাজে দেশী কসরত পালোয়ানী ঘুষাঘুষি ইত্যাদির অসংখ্য আখ্‌ড়া ছিল। সেই সকল আখড়ার খেলোয়াড় বা কুস্তীগিরেরা (Boxer)

দলবদ্ধ হইয়া বিদেশীগণকে আক্রমণ করেন। এইজন্য ১৯০০ সালের চীনা স্বদেশী আন্দোলনকে বিদেশীরা Boxer Rising বলিয়া থাকে। আন্দোলন শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—বিদেশীরা তাহার পর হইতে চীনে আরও ক্ষমতাবান্ হইয়াছে। যাহা হউক, চীনাদের আত্মাভিমান এইবার ষোল আনা ভাঙ্গিয়া গেল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিলেন—"বিদেশীগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা একপ্রকার অসম্ভব। এক্ষণে সময় থাকিতে থাকিতে বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত না করিলে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাইবে না।" কাজেই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনা সমাজে নব্যবিদ্যা প্রবর্ত্তনের যুগ আরব্ধ হইয়াছে—সুতরাং নব্য চীন মাত্র ১৫ বৎসরের শিশু।

এশিয়ায় নব্যভারত দেখা দিয়াছে পরাধীনতার ফলে এবং নব্যজাপানের উৎপত্তি হইয়াছে পরাধীনতার ভয়ে। নব্যচীনের জন্মও পরাধীনতার ভয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু জাপানের সৌভাগ্য চীনের ঘটিবে বলিয়া আশা নিতান্ত কম। কারণ চীন ইতিপূর্ব্বেই একপ্রকার পরাধীন হইয়া পড়িয়াছেন। স্বাধীনভাবে আভ্যন্তরীণ অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার সুযোগ চীনাদের আদৌ নাই—প্রত্যেক পদবিক্ষেপে ইঁহাদিগকে সংখ্যাতীত রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, পরামর্শ বা উপদেশ ভোগ করিতে হয়।

নবীন চীনের শৈশবকাল চলিতেছে। দেশের ভিতর নানা কেন্দ্রে বিদেশীর বিদ্যাপ্রচারের আয়োজন হইতেছে। ১৮৬৮ হইতে ১৮৮৫ পর্য্যন্ত জাপানে যে যুগ গিয়াছে চীনে আজকাল সেই যুগ দেখিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী জাপানে, আমেরিকায়, ও ইয়োরোপে বিদ্যা অর্জন করিতে যাইতেছে। রুশযুদ্ধের পর জাপানের প্রতিপত্তি এশিয়ায় যৎপরোনাস্তি বাড়িয়া যায়। সেই সময়ে এক জাপানেই চীনা ছাত্র ছিল ১৫০০০এরও অধিক। এদিকে ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে বহু ছাত্রের আমদানি হইতে থাকে। ইয়াঙ্কি সরকারের বদান্যতা এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের "বক্সার-বিপ্লবের" পর বিদেশীরা চীনসাম্রাজ্যের নিকট অত্যধিক ক্ষতিপূরণ আশা করেন। ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা চীনসাম্রাজ্যকে ফিরাইয়া দেন। কিন্তু একটা চুক্তি হয় যে, ঐ টাকার সুদে প্রতিবৎসর উপযুক্ত চীনা ছাত্রদিগকে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য ইয়াঙ্কিস্থানে পাঠাইতে হইবে। ইয়াঙ্কি ভাবুকতার ইহা এক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। সেই টাকার সুদে বিগত ৮।১০ বৎসর ধরিয়া শত শত ছাত্র নানাবিধ পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে পারদর্শী হইতেছে। প্রধানতঃ রসায়ন, ব্যাঙ্কিং, এঞ্জিনিয়ারিং, ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ এই সকল ছাত্রের উদ্দেশ্য। ইহারা দেশে ফিরিলে রাষ্ট্রকর্ম্মে নিযুক্ত হয়। ইয়াঙ্কিস্থানে থাকিবার সময়ে নানা কেন্দ্রে এইরূপ চীনা ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, এই সকল যুবক ছাত্রের চরিত্র কখন্ কি আকার ধারণ করে সহজে অনুমান করা চলে না। মাত্র দশ বার বৎসরের আন্দোলন দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা সুকঠিন। এক্ষণে একটা বিরাট এক্‌সপেরিমেণ্টের সূত্রপাত দেখিতেছি মাত্র। জাপানের মত কালে চীন শক্তিশালী হইবে, কি তুরস্কের মত ক্ষীণকায় হইবে, তাহা বুঝিবার মত উপকরণ এখনও পাওয়া যাইতেছে না। অন্ততঃ ১৫ দিন মাত্র পিকিঙে বাস করিয়া বুঝা অসম্ভব।

দুইজন প্রবীণ জননায়কের সঙ্গে আলাপ হইল। ইঁহারা চীনাসমাজে নামজাদা লোক। উভয়ের বয়সই পঞ্চাশের উর্দ্ধে। বিংশ শতাব্দীর চীনাজাগরণের বহু-পূর্ব্ব হইতেই ইঁহারা পাশ্চাত্য ম্লেচ্ছগণের নিকট জ্ঞান অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক জনের নাম ইয়েন্-ফু। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অপর জনের নাম কু-হুং-মিঙ। ইনি এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। উভয়েই সাহিত্য দর্শন ইত্যাদির চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

ইয়েন্-ফু য়ুয়ান্-শি-কাইয়ের দলস্থ ব্যক্তি। এইজন্য ইনি আজকালকার তথাকথিত স্বরাজের মন্ত্রণাসভায় একজন সদস্য। কু-হুং-মিঙ মাঞ্চুবংশের পৃষ্ঠপোষক। ইনি য়ুয়ান্‌কেও পছন্দ করেন না, সান্‌কেও পছন্দ করেন না। কাজেই স্বরাজের আমলে ইনি বড়ই দুঃখে জীবন যাপন করিতে-ছেন। স্বরাজবাদী ইয়েনের মাথায় লম্বা চুল নাই, কিন্তু মাঞ্চুভক্ত কু এখনও টিকি রাখিয়াছেন।

ইয়েন্ বিদেশী সাহিত্য চীনে প্রবর্ত্তন করিবার

জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন—কু চীনা সাহিত্য বিদেশে প্রচার করিবার জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইংরেজী গ্রন্থের চীনা অনুবাদের জন্ত ইয়েন্ প্রসিদ্ধ, চীনা গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের জন্ত কু প্রসিদ্ধ।

ইয়েন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার অনূদিত কোন্ গ্রন্থ চীনে বিশেষরূপে প্রভাবশালী হইয়াছে? ইয়েন্ বলিলেন হাক্‌স্‌লে-প্রণীত Evolution and Ethicsএর অনুবাদ যখন চীনাভাষায় প্রচারিত হয় তখন দেশের লোকেরা আমাকে ধর্ম্মবিরোধী দেশের শত্রু বলিয়া তিরস্কার করে। চীনা ধর্ম্ম ও সমাজ একটা প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞানবিজ্ঞান কিরূপ চীনারা এই গ্রন্থে প্রথম তাহার পরিচয় পায়।" ইয়েন্ হার্বার্ট স্পেন্সারের The Study of Sociology, মণ্টেস্কুর The Spirit of Laws এবং অ্যাডাম স্মিথের The Wealth of Nations অনুবাদ করিয়াছেন। ইয়েন্ বলিলেন—"চীনাভাষায় অনুবাদ করা বড় কঠিন। আমাদের ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈয়ারি করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য। একই চীনালিপি নানাভাবে উচ্চারণ করা যায়। লেখা চোখে দেখিলে আমরা যাহা বুঝি তাহা পাঠ করিতে শুনিলে সেরূপ বুঝি না। কাজেই কতকগুলি নূতন শব্দ তৈয়ারি করিলেই কার্য্য শেষ হইয়া যায় না। কারণ পাঠকমহলে তাহা বুঝান বিশেষ সহজ নয়।"

পিকিঙে যেদিন প্রথম পৌঁছি সেইদিন হোটেলের দোকানে দেখি The Spirit of the Chinese People গ্রন্থ বিক্রয় হইতেছে। পরদিন রাত্রে গ্রন্থকার কু হুং-মিঙ হোটেলে আসিয়া উপস্থিত। কু বলিলেন—"মহাশয়, আমি রুশ, জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজ, জাপানী ইত্যাদি সকল জাতীয় লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়াছি। কোন ভারতবাসীর সঙ্গে কখনও দেখা হয় নাই। কাজেই আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিলাম।" আমি বলিলাম—"আমি ইতিমধ্যে আপনার পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আপনার সঙ্গে আলাপ করিবার কথা ভাবিতেছিলাম।" ইত্যাদি।

কু বলিলেন—"আমি কন্‌ফিউশিয়াসের শিষ্য। কন্‌ফিউশিয়ান তত্ত্ব জগতে প্রচার করা আমার জীবনের ব্রতস্বরূপ। বিদেশী লেখকেরা চীনা সাহিত্যের অনুবাদ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য প্রায়ই ভ্রমাত্মক। আমি দুএকটা ক্ষুদ্র অনুবাদ করিয়া যথার্থ তত্ত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছি।" আমি বলিলাম—"এতদিন আমি কন্‌ফিউশিয়াসের নাম মাত্র জানিতাম। বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় যে কন্‌ফিউশিয়াসের দেশে একজন কন্‌ফিউশিয়ান্‌-তত্ত্ব প্রচারকের সাক্ষাৎ পাইলাম।" কু বলিলেন—"মহাশয়, ইংরেজি-জানা কনফিউশিয়াস-তত্ত্ব-প্রচারক চীনে দুর্লভ। আজকাল যে-সকল চীনাযুবক ইংরেজী জানে তাহাদের প্রায় কেহই চীনের প্রাচীন সাহিত্য জানে না। আবার যাঁহারা প্রাচীন সাহিত্যে পারদর্শী তাঁহারা কেহই ইংরেজি জানেন না। কাজেই আপনার মত বিদেশীর পক্ষে চীনাসমাজ বুঝা এক প্রকার অসম্ভব।"

বস্তুতঃ পিকিঙে আসিয়া অবধি উপযুক্ত বন্ধুর অভাব যথেষ্ট বুঝিতেছি। একমাত্র ইংরেজিভাষা সম্বল করিয়া চীনে বেড়াইতে আসা নিতান্ত বিড়ম্বনা। কু যাহা বলিলেন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

কু বলেন—"মহাশয়, চীনের স্বদেশী আবিষ্কার কন্‌ফিউশিয়াস-দর্শন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে ইহা নীরস ও জীবনহীন হইয়া যায়। পরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে চীনে নবযুগ নবজীবন দেখা দেয়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে কন্‌ফিউশিয়াসের আবির্ভাব—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তন—অষ্টম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ মতের যথার্থ প্রভাব বিস্তার। এই সময়ে Chinese Renaissance অর্থাৎ চীনা নবজন্ম সুরু হয়। বৌদ্ধধর্ম না আসিলে আমাদের দেশ নিতান্ত কাব্যহীন, শিল্পহীন ও সৌন্দর্য্যহীন হইয়া থাকিত। ভারতবর্ষকে না জানিলে চীনের যথার্থ জীবন বুঝা অসম্ভব। অথচ ভারতবর্ষের সংবাদ আমরা কিছুই রাখি না।"

কু-হুং-মিঙ একজন ঘোরতর "স্বদেশী"। রাইন্‌শ্ (Reinsch) প্রণীত Intellectual and Political Currents in the Far East গ্রন্থে এই কন্‌ফিউশিয়াস-ভক্তের আশা প্রচারিত হইয়াছে। Confucianism, with its way of the Superior man, little as the Englishman suspects, will one day

change the Social order and break up the Civilisation of Europe."

চীনের এই বাণী বহুকণ্ঠে এখনও প্রচারিত হইতেছে না, কিন্তু নব্যচীন শীঘ্রই এই বাণীর মর্ম্ম বুঝিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

পিকিঙ্। শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

কষ্টিপাথর

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এখনও একটু আছে।

পাঠানেরা ও মোগলেরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াও জানিতেন না যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম্ম ছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমেও সে কথা জানা ছিল না। ১৮১৬ সালে নেপালের সঙ্গে ইংরেজের সন্ধি হয়; সেই সন্ধির বলে ইংরেজরা নেপালের রাজধানীতে একজন রেসিডেণ্ট রাখেন। হজসন সাহেব বহুদিন সেই রেসিডেন্সির ডাক্তার থাকেন, পরে তিনি রেসিডেণ্টও হন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে এক নূতন রকমের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দেখিতে পান।

হজসনের পুস্তক পড়িয়া লোকের বিশ্বাস হয় যে মহাযান নামে একপ্রকার বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে চলিতেছিল এবং ভারতবর্ষ হইতেই সেই ধর্ম্ম চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে।—ক্রমে চীন ও তিব্বতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অনেক সংস্কৃত পুস্তকের তর্জ্জমা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে লোকের আগ্রহ বাড়িয়া উঠে।

আমরা অনেক সময় আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম যে, এই যে এত বড় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যাহা বাঙ্গালা বেহার হইতেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বাঙ্গালায় তাহার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বেহারে তবু ভাঙ্গা বাড়ীগুলি আছে, বাঙ্গালায় তাও নাই। এই সময় বঙ্গবাসীর যোগেনবাবু ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশ করেন। সে বইখানা পড়িয়া মনে হয় যে ধর্ম্মপূজাই হয় ত' বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ অবস্থা। ধর্ম্মঠাকুর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের উপর, তাঁর পুরোহিত ডোম, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্ম্মমঙ্গলের সম্বন্ধ বড় বেশী নাই। তখন ধর্ম্মঠাকুরের পূজা দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। নানা জায়গায় ধর্ম্মঠাকুরের নানা মন্দির পূজা-প্রণালী মূর্ত্তি দেখিয়া ও পূজার ধ্যান মন্ত্র শুনিয়া ধ ঠাকুর যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরই অবশেষ তাহা আমার বেশ বিশ্বাস হইল। ইহার পর একখানি পুঁথি সংগ্রহ হয়—উহার নাম "ধর্ম্ম-পূজাবিধি"। পুস্তকখানি পড়িলেই বেশ বুঝা যাইবে ধর্ম্মঠাকুর শিবও নন, বিষ্ণুও নন, ব্রহ্মাও নন, কারণ ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ইঁহাদের ধ্যান, পূজা ও নমস্কারাদির ব্যবস্থা স্বতন্ত্র আছে। ধর্ম্মঠাকুর ইঁহাদের ছাড়া; ইঁহাদের চেয়ে বড়। ধর্ম্মঠাকুরের শক্তির নাম কামিন্ত্যা। বল্লুকানদীর তীরে ইঁহার প্রথম আবির্ভাব হয়।

ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তি কচ্ছপের ন্যায়। এইটি বুঝিতে হইলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনেক কথা বুঝিতে হয়। বৌদ্ধদের তিনটি রত্ন ছিল। তিনটিই উপাসনার বস্তু—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। বুদ্ধ বলিতে শাক্যসিংহ বুঝাইত, ধর্ম্ম বলিতে প্রজ্ঞাবলী বুঝাইত এবং সঙ্ঘ বলিতে ভিক্ষুমণ্ডলী বুঝাইত। কোন কোন সম্প্রদায় বুদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়া ধর্ম্মকেই প্রথম স্থান দিতেন। তাঁহাদের মতে ত্রিরত্ন হইত 'ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ'। ক্রমে ধর্ম্ম বলিতে স্তূপ বুঝাইত। মহাযান মতে শাক্যসিংহ কেবলমাত্র লেখক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—ত্রিরত্নের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। সেখানে ধ্যানী বুদ্ধেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই-সকল ধ্যানী বুদ্ধ অনাদি ও অনন্ত। ধ্যানী বুদ্ধগণের মন্দির ক্রমে স্তূপের গায়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ ধর্ম্ম ও তথাগত এক হইয়া গেল। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গী কাটা হইতে লাগিল। পূর্ব্বের কুলুঙ্গীতে অক্ষোভ্য বসিলেন, পশ্চিমে অমিতাভ, দক্ষিণে রত্নসম্ভব, এবং উত্তরে অমোঘসিদ্ধি। প্রথম ধ্যানী বুদ্ধ যে বৈরোচন তিনি স্তূপের ঠিক মধ্যস্থলে থাকিতেন। এইরূপ চারিটি কুলুঙ্গীওয়ালা স্তূপই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে প্রধান ধ্যানী বুদ্ধকে এরূপে লুকাইয়া রাখা লোকে পছন্দ করিল না। দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আর-একটি কুলুঙ্গী করিয়া সেইখানে তাঁহার স্থান করিয়া দিল। পাঁচটি কুলুঙ্গীওয়ালা স্তূপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মত হইল। আমাদের ধর্ম্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। সুতরাং তিনি এই শেষকালের স্তূপেরই অনুকরণ। স্তূপ আবার ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি। সুতরাং স্তূপ, ধর্ম্ম, এবং কচ্ছপাকৃতি তিনই এক হইয়া গেল। ইহাতেই মনে হয় কচ্ছপাকৃতি ধর্ম্মঠাকুর পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তির সহিত ধর্ম্মমূর্ত্তির স্তূপ—আর কেহ নহে।

সঙ্ঘ কোথায় গেল? মহাযানে সঙ্ঘ বোধিসত্ত্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অনেক বোধিসত্ত্বের স্বতন্ত্র পূজা হইত। এখন ভদ্রকল্প চলিতেছে। এ কল্পে অমিতাভের পালা। অমিতাভের বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, তিনিই কর্ত্তা, তিনিই জগৎ উদ্ধার করিতেছেন, তাঁর সহস্র সহস্র নাম, তাঁর সহস্র স্বতন্ত্র মন্দির আছে। স্তূপ হইতে তাঁহাকে এখন পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে—ত্রিরত্ন এখন আর নাই। আছেন কেবল ধর্ম্মঠাকুর—কচ্ছপাকৃতি।

নেপালে প্রত্যেক বিহারে ফটকের কাছে এক একটি হারীতির মন্দির। হারীতিই বসন্তের দেবতা, আমাদের দেশের শীতলা। বিহারবাসী বৌদ্ধভিক্ষুরা শীতলাকে বড় ভয় করিতেন, সেইজন্য তাঁহারা হারীতিকে পূজা না দিয়া, বিহারে প্রবেশ করিতেন না। আমাদের এখানেও ধর্ম্মঠাকুরের সহিত শীতলার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির সেইখানেই প্রায় শীতলা।

গণেশ ও মহাকাল নেপালে বুদ্ধমন্দিরের দ্বার-দেবতা। যেখানে বুদ্ধের মন্দির, মন্দিরের মধ্যে ছোট চৈত্যই থাকুক বা শাক্যসিংহের মূর্ত্তিই থাকুক—দ্বারের একদিকে গণেশ, একদিকে মহাকাল। নেপালে দু'জনেই মাংসাশী, দু'জনেই মাতাল। বাঙ্গালায় মহাকালের জায়গায় পঞ্চানন্দ হইয়াছেন। বাঙ্গালায় গণেশ মাংস খান না, কিন্তু পঞ্চানন্দ যেমন মাতাল তেমন মাংসাশী এখনও আছেন।

তার পর ধর্ম্মঠাকুরের চোখ। এখন ত লোকে Paper-fastener দিয়া ধর্ম্মঠাকুর ও শীতলার চোখ তৈয়ার করিয়া থাকে। কিন্তু চোখ স্তূপের একটা অঙ্গ। স্তূপের গোল শেষ হইয়া গেলে তাহার উপর একটা চৌকা জিনিস থাকে। তাহার চারিদিকেই দুইটা করিয়া চোখ থাকে। তথাগত প্রাতঃকালে উঠিয়াই একবার চারিটি দিক অবলোকন করিতেন। তিনি চক্ষু হইতে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের রশ্মি বাহির করিয়া ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর অন্তপর্য্যন্ত অবলোকন করিতেন। সেইজন্য এই ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর নাম অবলোকিত। সুতরাং স্তূপের গোলার্দ্ধের উপর চারিদিকে চার জোড়া চোখ থাকাই উচিত। এখনকার ধর্ম্মঠাকুরেরও সেইজন্য অনেক চক্ষু। ইহাতেও ধর্ম্মঠাকুরকে পুরাণো বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ বলিয়া মনে হয়।

আমরা শাক্যসিংহের মতাবলম্বীদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া থাকি, কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে কি বলিত? তাহারা আপনাদিগকে সদ্ধর্ম্মী বলিত

এবং আপনাদের ধর্ম্মকে সদ্ধর্ম্ম বলিত। অনেক জায়গায় দ ও ধ-য়ের যে সংযুক্ত বর্ণ তাহার পরিবর্ত্তে শুধু ধ বলিত। অশোকের শিলালিপিতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নাম সধর্ম্ম। অনেক সংস্কৃত পুস্তকেও উহার নাম সধর্ম্ম। রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজার পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরঞ্জনের উষ্মা নামে যে ছড়া লিখিয়াছেন তাহাতেও ধর্ম্মঠাকুরের পূজক-দিগকে সধর্ম্মী বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রামাই পণ্ডিতও মনে করিতেন যে, ধর্ম্মঠাকুরের পূজা ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এক। এ ছড়া পড়িলে আরও বোধ হইবে যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মণবিরোধী ধর্ম্ম। কারণ ছড়ার বলিতেছে "ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত অত্যাচার করাতেই সধর্ম্মীরা ধর্ম্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে আপনি আমাদের আপদ উদ্ধার করুন। ধর্ম্মঠাকুর অমনি মুসলমান মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে জব্দ করিয়া দিলেন।"

(নারায়ণ, মাঘ)　　　　শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

* *
*

জাতীয় জীবনে ধ্বংসের লক্ষণ।

১। লোকসংখ্যা হ্রাস—।

বাঙ্গালাদেশের বৃদ্ধির হার। (শতকরা)

১৮৭২—৮১	১৮৮১—৯১	১৮৯১—১৯০১
১১·৫	৭·৩	৫·১

সমগ্র ভারতবর্ষেও লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে দেখা যায়; যথা—

১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১
২৩·১	১৩·১	১২·১	৭

আবার হিন্দু-সমাজে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকায়স্থাদি উচ্চবর্ণের ভিতর এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে বেশী কমিতেছে তাহার প্রমাণ আমরা সেন্সাসে পাই। বাঙ্গলাদেশে মুসলমানদের তুলনায় সমগ্র হিন্দুদের বৃদ্ধির হার অতি কম দেখা যাইতেছে। গত দশ বৎসরে (১৯০১—১৯১১) হিন্দুর তুলনায় মুসলমানেরা তিন গুণ পরিমাণে বাড়িয়াছে।

২। জন্মমৃত্যুর অসামঞ্জস্য।—লোকসংখ্যার হ্রাস বা লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হারের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জন্মের হার কম অথবা মৃত্যুর হার বেশী হইতে দেখা যায়। জন্মের হার কমিলেই যে তাহা দুর্লক্ষণ, তাহা নহে। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নতিশীল দেশসমূহে জন্মের হার অপেক্ষাকৃত কমিয়াই যাইতেছে; এবং আধুনিক অনেক পণ্ডিত তাহাকে সমাজের ব্যষ্টিগত উন্নতির সহকারী ফল বলিয়াই মনে করিতেছেন। কিন্তু সেই-সকল স্থানে আবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর হারও কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং তাহার ফলে বৃদ্ধি খুব দ্রুত না হইলেও স্থির ও নিশ্চিত ভাবে হইতেছে। কিন্তু জন্মের হারের তুলনায় মৃত্যুর হার যদি বেশী হয়, অথবা জন্মের হার যদি ক্রমাগত কমিতে থাকে, কিন্তু মৃত্যুর হার প্রায় একরূপই থাকে, তবে তাহা সুলক্ষণ নহে। ফলতঃ মৃত্যুর হার বৃদ্ধি হওয়াটাই বেশী ভয়ের কারণ। অনেকে মনে করেন আমাদের ভারতবর্ষে ইউরোপের তুলনায় জন্মসংখ্যা খুব বেশী। কিন্তু ভারতবর্ষে জন্মের হার যেমন বেশী, মৃত্যুর হারও তেমনই বেশী। ভারতবর্ষে জন্মের হার প্রতি হাজারে ৩৮ জন (১৯০১), কিন্তু পক্ষান্তরে মৃত্যুর হারও হাজার-করা প্রায় ৩১ জন। Statesman's Year Bookএ দেখা যায় যে ১৯০৮-১৯১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের জন্মের হার ছিল হাজার-করা ৩৭·৭, কিন্তু মৃত্যুর হার ছিল হাজার-করা ৩৪·৩। সুতরাং লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার সমগ্র ভারতবর্ষে মোটের উপর ইউরোপ প্রভৃতি দেশের তুলনায় কমই হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইংলণ্ডের জন্মের হার গড়ে, হাজার-করা ২৫।২৬ জন, কিন্তু মৃত্যুর হারও আবার প্রতি হাজারে মাত্র ১৭ জন (১৯১১)। গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার শতকরা ১০ জন আছে—আর ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১৮৬৮-১৯১১ সাল পর্য্যন্ত গড়ে মাত্র ৪·৩ জন। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ-জিল্যাণ্ডে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মের হার ছিল শতকরা ৪০ জন—এখন কমিয়া হইয়াছে শতকরা ২৬।২৭ জন (১৯১১)। কিন্তু মৃত্যুর হারও কমিয়া দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৯৫ জন। ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা কম মৃত্যুর হার। সুতরাং স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ঐ-সকল দেশে কম নহে। দেখা যায় যে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের সকলের অপেক্ষা কম—মাত্র শতকরা ৩৪ জন।

সমাজতত্ত্ববিৎ গিডিংস জন্মমৃত্যু-সংখ্যার অনুপাতে জীবনীশক্তি নির্দ্ধারণ করিয়া লোকসংখ্যার নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন;—

প্রথম শ্রেণী—যাহাদের মধ্যে জন্মের হার বেশী এবং মৃত্যুর হার কম। জীবনীশক্তি হিসাবে ইহারা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী।

দ্বিতীয় শ্রেণী—যাহাদের মধ্যে জন্মের হারও কম, মৃত্যুর হারও কম। ইহারা জীবনীশক্তি হিসাবে মধ্যম শ্রেণী।

তৃতীয় শ্রেণী—যাহাদের মধ্যে জন্মের হার বেশী আবার মৃত্যুর হারও বেশী। জীবনীশক্তি হিসাবে ইহারা সর্ব্বনিম্নশ্রেণী।

গিডিংসএর এই প্রণালী অনুসারে ভারতবর্ষ সর্ব্বনিম্নশ্রেণীতে স্থান পাইবে। কত বেশী লোক জন্মগ্রহণ করে, উপর উপর তাহাই দেখিয়া খুসী হইলে চলিবে না; কত লোক জন্মের পর টিকিয়া থাকে তাহাই খতাইয়া দেখিতে হইবে।

৩। স্ত্রী-সংখ্যা ও উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস—ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইবার সময়ে সমাজে স্ত্রীলোকদের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তির সমধিকরূপে হ্রাস হইতে দেখা যায়। তাহার ফলে জন্মের হার সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইতে থাকে। অবশ্য স্ত্রীলোকদের মধ্যে নানা কারণে উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইতে পারে। সমাজে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যাহ্রাসও অবনতির একটা লক্ষণ। সমগ্র ভারতবর্ষে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু কম—প্রতি এক হাজার পুরুষের তুলনায় ৯৫৪ জন স্ত্রীলোক। পাঞ্জাব, বাঙ্গলা প্রভৃতি ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম; পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অনুপাত ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা কম হইলে বিবাহসংখ্যা কম হয়,—সুতরাং জন্মসংখ্যাও কম হয়। আবার সমাজে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীসংখ্যা কম হইলে ব্যভিচার প্রভৃতি দোষেরও আত্যন্তিক বৃদ্ধি হয়;—ইহার ফলেও জন্মসংখ্যা কমিয়া যায়। সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম হইলে তাহা সেই সমাজের জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতাও সূচনা করে। পাঞ্জাবে ও বাঙ্গলাদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। আর হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের বৃদ্ধির হারও বেশী।

৪। শিশুমৃত্যু—সাধারণ মৃত্যুর হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শিশু-মৃত্যুর হার বাড়িতে দেখা যায়। শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি হওয়া জাতীয় জীবনের পক্ষে যার পর নাই আশঙ্কার কথা। সমাজ যখন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সুস্থ ও সবল শিশুর জন্ম হয়, মৃত্যুসংখ্যা কম হইতে থাকে এবং লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে। কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ সমাজে রুগ্ন ও দুর্ব্বল শিশুই বেশী জন্মগ্রহণ করে। জীবনসংগ্রামে টিকিতে না পারিয়া সংখ্যায় শিশুরা বেশী মরিতে থাকে এবং লোকসংখ্যা কম হইতে থাকে। ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর হার এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা ঘোরতর আশঙ্কার কারণ। এবারকার সেন্সাসে দেখা যাইতেছে যে সমগ্র বঙ্গে প্রতি পাঁচজনে একজন করিয়া শিশু মরে;—আর কলিকাতা সহরে শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা ত্রিশ জন।

রাজপুরুষেরা বলেন—এ দেশীয় লোকদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, নানা প্রকার কু-প্রথা, স্বাস্থ্যতত্ত্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, শ্রমজীবীদের মধ্যে দারিদ্র্যই ইহার কারণ। কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে জাতীয় জীবনীশক্তির মূলে যাইতে হইবে। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, সংক্রামক রোগ প্রভৃতি কতকটা সাময়িক কারণ বটে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা জাতির জীবনীশক্তি যখন কম হইয়া যায়, তখনই তাহার মধ্যে এইরূপ পরিবর্দ্ধমান শিশুমৃত্যুর হার দেখা যাইয়া থাকে। দারিদ্র্য ও সংক্রামক রোগ প্রভৃতি সেই জীবনীশক্তি-হ্রাসের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

৫। দুর্ভিক্ষ—দেশব্যাপী ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হওয়া জাতীয় জীবনের পক্ষে বড় দুর্লক্ষণ। যদি কোন জাতির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া পুনঃ-পুনঃ দুর্ভিক্ষ হইতে দেখা যায়, তবে সেই জাতির মধ্যে দারিদ্র্য যে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, জীবনযুদ্ধে ক্রমেই যে তাহারা পিছাইয়া পড়িতেছে—ইহাই অনুমান করিতে হয়। অতীতে অনেক ধ্বংসোন্মুখ জাতির মধ্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জীবন-যুদ্ধে সেই জাতির ক্রমবিবর্দ্ধমান অক্ষমতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার খাদ্য-সংগ্রহের ক্ষমতা—শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধির ক্ষমতা হ্রাস হইতেছে ইহাই মনে করিতে হয়। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যেরূপ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেছে, তাহা খুব আশাপ্রদ নহে। যে দেশের অধিকাংশ লোক দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, যে দেশের লোকের বাৎসরিক আয় গড়ে পঁচিশ ছাব্বিশ টাকা মাত্র, তাহার দারিদ্র্যের কথা না তোলাই ভাল। চির-দুর্ভিক্ষ কিয়ৎপরিমাণে দেশের রাজস্ব ও বাণিজ্য-নীতির উপরেও নির্ভর করে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ আরও গভীরতর; চির-দারিদ্র্য ও চির-দুর্ভিক্ষ পরস্পরের সহোদর; আর উভয়েই ধ্বংসের অগ্রদূত।

৬। মহামারী—ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের ন্যায় ঘন ঘন মহামারীর প্রাদুর্ভাবও তেমনই জাতীয় জীবনের পক্ষে অমঙ্গলের সূচনা করে। যাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দেহেই যেমন নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, ধ্বংসোন্মুখ জাতিদের মধ্যেও তেমনই নানা ব্যাধি মজ্জাগত হইয়া পড়ে—নানা নূতন নূতন রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা যায়। ম্যালেরিয়া-পীড়িত অধিবাসীদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। পরিশ্রম-পটুতা কর্ম্মের উৎসাহ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে; আলস্য, নিরাশা, জীবনে বিতৃষ্ণা প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। ইহারই মধ্যে কত গ্রাম নগর ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শ্মশান হইয়া গিয়াছে; লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রাণত্যাগ করিতেছে;—যাহারা বাঁচিয়া থাকিতেছে তাহারাও জীবন্মৃতবৎ অবস্থায় তিলে তিলে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে। আর শুধুই কি ম্যালেরিয়া? প্লেগ, কলেরা ও আরও নূতন নূতন ব্যাধি ক্রমেই এই দুর্ভাগ্য দেশে রাজত্ব বিস্তার করিতেছে। ইউরোপেও অনেক স্থলে দুই এক বার হইয়াছে। কিন্তু সেই দেশের লোকেরা সেগুলিকে দূর করিয়া দিয়া আপনাদের দেশকে নিরাপদ করিয়াছে। কিন্তু এই দেশে একবার যে রোগ প্রবেশ করিতেছে, তাহা আর যাইতেছে না। কোন জীবদেহের যখন জীবনী-শক্তি হ্রাস হইতে থাকে, তখন তাহার বাহিরের রোগের আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি আর পূর্ব্বের মত থাকে না,—যেটুকু থাকে তাহাও ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। পূর্ব্বপ্রবিষ্ট রোগ ক্রমেই স্বীয় প্রভাব বেশী করিয়া বিস্তার করিতে থাকে এবং নূতন নূতন নানা রোগও সুবিধা পাইয়া অধিকার লাভের চেষ্টা করিতে ছাড়ে না। কোন বিশেষ জীবদেহের ন্যায় একটা জাতির পক্ষেও একথা সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে।

৭। প্রতিভাশালীর সংখ্যা হ্রাস—কোন জাতি যখন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার শারীরিক শক্তির ন্যায় মানসিক শক্তিরও হ্রাস হইতে থাকে। দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যেরও ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে। সমাজেরও মস্তিষ্ক ও মানসিক শক্তি আছে;—প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাই তত্তৎস্থানীয়। উন্নতিশীল সমাজে বহু প্রতিভা-শালী লোক জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। পক্ষান্তরে যে-সকল জাতি ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে বা অধোগতির পথে গিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রতিভা-শালীর সংখ্যা স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইয়াছে। তাই যখন দেখি যে-কোন জাতি বা সমাজের মধ্যে আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের জন্ম হইতেছে না; যাঁহারা ধর্ম্মে, সমাজে বা রাষ্ট্রে নূতন ভাব আনয়ন করেন, যাঁহারা তাঁহাদের শক্তির প্রাবল্যে দেশময় আলোড়ন উপস্থিত করেন,—এমন মানুষ কোন জাতির মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আর বড় একটা দেখা যাইতেছে না—তখন বুঝিতে হইবে সে জাতি ক্রমে ধ্বংসের দিকে অধোগতির দিকে যাইবার মুখেই দাঁড়াইয়াছে। তাহার মানসিক শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। যে প্রখর বুদ্ধিবলে বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য বিধানের নব নব উপায় সমাজ প্রতিনিয়ত উদ্ভাবন করে, তাহার সে বুদ্ধি মলিন হইয়া যাইতেছে;—ধরাপৃষ্ঠে তাহার পক্ষে আত্মরক্ষা করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষে কি এবিষয়ে আমাদের নূতন আশার কোন কারণ দেখা যাইতেছে? কেহ কেহ বলিবেন যে-দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রাণাড়ে বা গোখেলের জন্ম, সে দেশের ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নতিশীল অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা কর, মনে হইবে এ বুঝি নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপের তীব্রোজ্জ্বল জ্যোতিঃ। জীবনের সর্ব্ববিভাগে অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে প্রতিভাশালীর সংখ্যা যে নিতান্তই অল্প, ইহা কি করিয়া অস্বীকার করা যায়? আর সেই সংখ্যা যে অনুকূল অবস্থার অভাবে, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হইয়া হ্রাসের দিকেই যাইতেছে ইহাও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

জাতীয় ধ্বংসের প্রাক্কালে যে-সকল লক্ষণ দেখা দেয় আমরা তাহার কতকগুলি যথাসাধ্য অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। ধ্বংসোন্মুখ জাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই যে এই লক্ষণগুলি একত্রে বা একসময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা নহে। তবে তাহার কোন কোনটি বা কতকগুলি প্রবলভাবে প্রকাশ পাইলেই যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয় বলিতে পারা যায়; কেননা এই-সকল লক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে জড়িত,—একটি আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলি আসিয়া উপস্থিত হয়। যে-সকল শক্তি জাতীয় জীবনের গোড়ায় থাকিয়া জাতিকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায় আমরা সেই-সকলকেই জাতীয় ধ্বংসের কারণ বলিয়া মনে করি। এই-সকল লক্ষণ অন্তর্নিহিত সেই কারণসমূহেরই বহিঃপ্রকাশ।

(নারায়ণ, মাঘ) শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

* *
*

বাঙ্গালার কৌলীন্যের কথা।

কুলতত্ত্বার্ণব একটি কুলগ্রন্থ, সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ ছন্দোবন্ধে রচিত। ইহাতে মহারাজ আদিশূরের রাজ্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪০৭ শকাব্দ (১৪৮৫ খৃঃ) পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্ত বিস্তৃতরূপে নিবদ্ধ রহিয়াছে। যে-সকল রাজগণের অধিকারকালে উক্ত ব্রাহ্মণ-গণের সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটে, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস। গ্রন্থকর্ত্তা স্বনামধন্য কুলাচার্য্য শ্রীধ্রুবানন্দ

মিশ্রের পুত্র শ্রীসর্ব্বানন্দ মিশ্র। গ্রন্থকার স্বীয় বংশের পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—

দেবীবরের পর ১৪০৭ শাকে (১৪৮৫ খৃঃ) আমার পিতা শ্রীধ্রুবানন্দ কুলাচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন মেলী কুলীনদিগের মেল-ব্যতিক্রম দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে তিনি মেলকারিকা নামক গ্রন্থ রচনা করিলেন। প্রত্যেক মেলের যে অন্য প্রতিযোগী মেল, অর্থাৎ যাহার সহিত কুলকর্ম্ম করিলে মেল দূষিত হয় না, তাহা আমার পিতা মেলকারিকার নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। মহারাজ আদিশূর গৌড়েশ্বর ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় বাহুবলে বহু রাজাকে পরাজিত করিয়া একটি সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে আসাম, পশ্চিমে গুজরাট, উত্তরে মগধ ও মালব এবং দক্ষিণে কর্ণাট ও মালাবার উপকূল পর্য্যন্ত ভূভাগের রাজগণ তাঁহার সামন্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দী কান্যকুব্জাধিপতিকে তিনি পরাজিত করিতে পারেন নাই। তদীয় রাজ্য মালবের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। তিনি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহুরাজগণকে, অর্থাৎ রাজভট্ট বা তদ্বংশীয়দিগের অধিকৃত কামরূপ এবং মগধ, অঙ্গ (ভাগলপুর), বঙ্গ, কলিঙ্গ (উড়িষ্যা), কর্ণাট (কর্ণাটিক), কেরল (মালাবার উপকূল), সৌরাষ্ট্র (সুরাট), গুর্জ্জর (গুজরাট), ও মালবদেশের নরপতিগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন; কান্যকুব্জের অধিপতি ব্যতীত অন্য নৃপতি-সকল তৎকালে তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন।

একদা মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশীয় সারস্বত ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া পাদ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক বলিলেন, পূর্ব্বে অন্ধ্রবংশীয় শূদ্রক নৃপতি অনপত্যতানিবন্ধন পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিবার নিমিত্ত সারস্বত প্রদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া এই বিপ্রবর্জ্জিত বঙ্গদেশে বাস করাইয়াছিলেন। আপনারা তাঁহাদের বংশধর; অতএব আমার প্রতি কৃপা করিয়া একটি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, মহারাজ! আমরা বৈদিক অনুষ্ঠানে একান্ত অনভিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছি, আপনি কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। রাজা তাঁহাদিগের উপদেশে কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মহারাজ! নৃপতি বীরসিংহ এই পতিত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিবেন না। তখন রাজা পুনর্ব্বার দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন যে, পাঁচটি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রেরণ না করিলে তিনি কান্যকুব্জ আক্রমণ করিবেন। দূতমুখে এই কথা শুনিয়া রাজা বীরসিংহ বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বিনাযুদ্ধে ব্রাহ্মণ পাঠাইবেন না। তখন মহারাজ আদিশূর যুদ্ধ-সজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রধান অমাত্য তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ, শুনিয়াছি রাজা বীরসিংহ অতীব ধার্ম্মিক ও গোবিপ্র-প্রতিপালক; অতএব যদি কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে লোকক্ষয়ের প্রয়োজন কি? আপনি ব্রাহ্মণগণকে সৈনিক করিয়া বৃষবাহনে প্রেরণ করুন, তাহা হইলে তিনি গোবিপ্র-বধভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। ফলতঃ তাহাই হইল, রাজা বীরসিংহ জয় অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষণকেই শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিয়া পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। এদিকে যে সাত শত সারস্বত ব্রাহ্মণ সৈনিকবেশে গিয়াছিলেন, রাজা তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া বৃষারোহণজ দোষ হইতে মুক্ত করিলেন। এই সাত শত সারস্বত ব্রাহ্মণই সপ্তশতী নামে আখ্যাত হইলেন।

রাজা বীরসিংহের আদেশে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ পঞ্চ মহাবল রক্ষকের সহিত বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। এই পঞ্চ রক্ষক বিপ্রের ঔরসে ও বিপ্রের পরিণীতা ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভজাত অর্থাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তনামক ক্ষত্রিয়জাতি ছিলেন। অসি, বাণ, ধনুঃ ও রম্য কবচ প্রভৃতি সেই ব্রাহ্মণগণের শরীরের শোভা সম্পাদন করিতেছিল; তাঁহারা পঞ্চ ঘোটকে আরোহণ করিয়া কোলাঞ্চ অর্থাৎ কান্যকুব্জদেশ হইতে ৮৭৫ শাকে (৯৫৩ খৃঃ) বঙ্গে আগমন করিলেন।

দূত ব্রাহ্মণগণের আগমনসংবাদ মহারাজ আদিশূরের নিকট জ্ঞাপন করিলে তিনি স্বীয় জন্ম সার্থক মনে করিলেন এবং আনন্দে দূতকে স্বীয় কাঞ্চনময় হার পারিতোষিক প্রদান করিলেন। অনন্তর ভূপতি দ্বিজদর্শনের নিমিত্ত বহির্গত হইয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণগণ সৈনিকবেশধারী, ব্রাহ্মণের বেশ-ভূষার চিহ্নমাত্র তাঁহাদিগের নাই; তখন বিস্মিত চিত্তে এ কি, এ কি, বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণগণ রাজাকে না দেখিয়া সহসা তাঁহাদিগের হস্তস্থিত দূর্ব্বা ও অক্ষত অশ্ব-কাষ্ঠের মৌলিদেশে স্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিবামাত্র উহাতে অঙ্কুর দৃষ্ট হইল। দূত এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজাকে সংবাদ দিয়া বলিল—মহারাজ! অতীব আশ্চর্য্য দর্শন করিলাম, যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ, তাঁহাদিগের শিরোদেশে উষ্ণীষ, মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু ও পৃষ্ঠদেশে সশর ধনুঃ; তাঁহাদিগের আশীর্ব্বচনের প্রভাবে ক্ষণকালমধ্যে শুষ্ক শুষ্ককাষ্ঠের চতুর্দ্দিকে অকস্মাৎ অঙ্কুরসমূহ উৎপন্ন হইল।

রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্তম্ভসমীপে আসিয়া স্তম্ভ অঙ্কুরিত দেখিয়া অপরাধীর ন্যায় ব্রাহ্মণগণের চরণে নিপতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন; এইরূপে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, আপনারা দয়া করিয়া স্ব স্ব গোত্রনামাদির পরিচয় দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

রাজার এই বাক্য শুনিয়া ক্ষিতীশ তাঁহাকে বলিলেন, আমি শাণ্ডিল্য-গোত্রজ, আমার নাম ক্ষিতীশ। ইনি কাশ্যপগোত্রজ, ইঁহার নাম বীতরাগ। ইনি বাৎস্যগোত্রজ, ইঁহার নাম সুধানিধি। ইনি ভরদ্বাজ-গোত্রজ, ইঁহার নাম মেধাতিথি। আর ইনি সাবর্ণগোত্রজ, ইঁহার নাম সৌভরি। আমরা পাঁচজন কান্যকুব্জাধিপতির আদেশে আপনার যজ্ঞসাধনের নিমিত্ত গৌড়মণ্ডলে সমাগত হইয়াছি।

ইহা শুনিয়া রাজা হর্ষপরিপ্লুত হইলেন এবং পাদ্যাদিদ্বারা ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগকে মনোরম বাসস্থান প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা শুভ দিনে সদক্ষিণ যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের আদেশে পুত্রকারক চরু মহিষীকে প্রদান করিলেন। দ্বিজগণ এইরূপে আদিশূরের যজ্ঞ সমাধান করিয়া স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের স্বদেশস্থ দ্বিজগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনারা বঙ্গদেশে গমন করিয়াছিলেন এবং অজ্ঞাত লোকের যাজন করিয়াছেন; এই হেতু আপনারা পতিত হইয়াছেন; অতএব আপনারা যদি পুনঃসংস্কার-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা আপনাদের সহিত ব্যবহার করিতে পারি, নতুবা নহে। যখন পঞ্চ ব্রাহ্মণ দেখিলেন প্রায়শ্চিত্তব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতে কেহই সম্মত নহেন, তখন তাঁহারা ভার্য্যাপুত্রাদি ও পঞ্চ রক্ষকের সহিত পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহারাজ আদিশূর তাঁহাদিগের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগের বাসের নিমিত্ত গঙ্গাতীরের সমীপে পাঁচটি গ্রাম ও বিবিধ রত্ন প্রদান করিলেন।

তখন নরপতি ক্ষিতীশকে ব্রহ্মপুরী, বীতরাগকে কামঠি, সৌভরিকে বটগ্রাম, মেধাতিথিকে সুন্দর কঙ্কগ্রাম, এবং সুধানিধিকে কমনীয় হরিকোট প্রদান করিলেন। ক্ষিতীশাদি দ্বিজগণের সহিত পঞ্চ রক্ষক আসিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের নাম মকরন্দ, দশরথ, পুরুষোত্তম, কালিদাস ও দাশরথি; তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী। তাঁহাদিগের প্রার্থনায় রাজা তাঁহাদিগকেও বাসের নিমিত্ত ভূমি প্রদান করিলেন।

কিছুকাল অতীত হইলে আদিশূর পরলোক গমন করিলেন, তদীয়

পুত্র ভূশূর পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। অনন্তর মগধেশ্বর ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (গৌড়-রাজধানী) হইতে বিতাড়িত করিলেন। এইরূপে ভূশূর বরেন্দ্রভূমি পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে আগমন করিলেন এবং তথায় সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের তেইশটি পুত্র হইয়াছিল।

ভট্টনারায়ণ, দামোদর, সৌরি, বিশ্বেশ্বর ও শঙ্কর এই পাঁচজন ক্ষিতীশের পুত্র; দক্ষ, সুষেণ, ভানু ও কৃপানিধি, এই চারিজন বীতরাগের পুত্র; ছান্দড় ও ধরাধর এই দুইজন সুধানিধির পুত্র; শ্রীহর্ষ, গৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি ও শশী, এই আটজন মেধাতিথির পুত্র; এবং বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর ও মহেশ্বর, এই চারিজন মহাত্মা সৌভরির পুত্র। ইঁহারা সকলেই তপস্যা, বিদ্যা ও সদ্‌গুণে পিতৃতুল্য। (ইঁহাদিগের মধ্যে) ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ, এই পাঁচজন পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া ভূশূর নৃপতির সহিত রাঢ়দেশে আগমন করিলেন। মহারাজ ভূশূর ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিকে বাসের নিমিত্ত স্থান ও বহু রত্ন প্রদান করিলেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ রাঢ়দেশে বসতিহেতু দেশের নামানুসারে রাঢ়ীয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন; কিন্তু দামোদর প্রভৃতি (অন্য ভ্রাতৃগণ) যাঁহারা পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিলেন না, তাঁহারা বরেন্দ্রদেশে বাসহেতু বারেন্দ্র নামে খ্যাত হইলেন।

এদেশে প্রসিদ্ধি আছে যে, ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই প্রসিদ্ধিহেতু একটি সহজ বিষয় জটিল হইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে কুলতত্ত্বার্ণবের ইতিবৃত্ত তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিল। শাণ্ডিল্যগোত্রজ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ, বারেন্দ্রগণের আদিপুরুষ নারায়ণভট্ট। ভরদ্বাজগোত্রে রাঢ়ীয়মতে আদিপুরুষ শ্রীহর্ষ, বারেন্দ্র মতে গৌতম; কাশ্যপগোত্রে রাঢ়ীয়মতে আদিপুরুষ দক্ষ, বারেন্দ্রমতে সুষেণ। বাৎস্যগোত্রে রাঢ়ীয়মতে আদিপুরুষ ছান্দড়, বারেন্দ্রমতে ধরাধর। সাবর্ণগোত্রে রাঢ়ীয়মতে আদিপুরুষ বেদগর্ভ, বারেন্দ্রমতে পরাশর। যদি রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশধর হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আদিপুরুষ ভিন্ন হইতে পারে না।

বস্তুতঃ ভট্টনারায়ণাদি পাঁচজন ব্রাহ্মণ ভূশূরের সহিত রাঢ়দেশে আগমন করেন, কালক্রমে এই ঘটনা বিকৃত হওয়ায় তাঁহারাই কান্যকুব্জ হইতে প্রথম আসিয়াছিলেন, এই ভ্রান্ত মত প্রচারিত হইয়াছে।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের রক্ষক, তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী। তাঁহারা বঙ্গীয় প্রধান কায়স্থগণের আদিপুরুষ। কায়স্থগণ কি বিশিষ্ট কারণে ও কোন্ সময়ে তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয় আচার পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রাচার গ্রহণ করিলেন? কেহ কেহ বলেন তাঁহারা ত্রেতাযুগে পরশুরামের ভয়ে শূদ্রাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন; এ সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহারা রাজন্যধর্ম্মী হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন এ কথার সহিত বিরোধ ঘটে।

ভূশূরের মৃত্যুর পর ক্ষিতিশূর পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার পিতা বরেন্দ্রভূমি হইতে ভট্টনারায়ণাদি যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ছাপ্পান্নটি পুত্র হইয়াছিল। মহারাজ ক্ষিতিশূর তাঁহাদিগের বিদ্যাব্রাহ্মণ্যানুসারে তাঁহাদিগের বাসের নিমিত্ত ছাপ্পান্নটি গ্রাম প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা গ্রামের নামানুসারে 'গ্রামী' এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।

ক্ষিতিশূর পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র মহীশূর রাজা হইয়া পিতা ও পিতামহের অনুসৃত পদ্ধতিক্রমে ব্রাহ্মণগণের পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পৃথ্বীশূর রাজা হন; তিনিও বেদবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণগণের পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তে তদীয় পুত্র ধরাশূর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি দেখিলেন ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মকর্ম্মের অর্থাৎ বেদোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বিধিবৎ অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের পরীক্ষা করিলেন এবং কুলাচল ও সৎ শ্রোত্রিয় এই দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। অনন্তর ধরাশূরের লোকান্তে তদীয় পুত্র চন্দ্রশূর রাজা হইলেন এবং চন্দ্রশূরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সোমশূর পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সোমশূর অপুত্রক ছিলেন; তিনি পরলোক গমন করিলে বল্লালসেন তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইনি বৈদ্যবংশোদ্ভব, শূরবংশের দৌহিত্র ছিলেন। বল্লালসেন দেখিলেন কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ অতি গুণবান্, তাঁহারা যেন আদিশূর নৃপতির মূর্ত্তিমান্ যশোরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন আদিশূরের কীর্ত্তির পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইয়া আমার কীর্ত্তি যাহাতে ক্রমে সজ্জনগণের গৃহে বিস্তৃত হয়, আমাকে তাহা করিতে হইবে। একদা এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ব্রাহ্মণগণের কুলবন্ধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। অনন্তর বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদিগের গুণদোষের বিচার করিয়া মুখ্য কুলীন, গৌণ কুলীন ও শ্রোত্রিয় এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। যাঁহারা আচারাদি নবগুণসম্পন্ন, তাঁহারা মুখ্য কুলীন; যাঁহারা পূর্ণমাত্রায় গুণসম্পন্ন নহেন তাঁহারা গৌণ কুলীন; এবং যাঁহারা গুণদোষবিমিশ্র তাঁহারা শ্রোত্রিয় হইলেন। যে-সকল শ্রোত্রিয়ের অল্প দোষ ও বহু গুণ ছিল, তাঁহারা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় এবং যে-সকল শ্রোত্রিয়ের গুণ অল্প কিন্তু দোষের বাহুল্য ছিল তাঁহারা কষ্ট শ্রোত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন। এইরূপে মহারাজ বল্লালসেন বাইশ গ্রামী ব্রাহ্মণকে কুলীন করিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সহর্ষে তাম্রশাসন প্রদান করিলেন। কিছুদিন গত হইলে মহারাজ পুনর্ব্বার বাইশ গ্রামী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বন্দ্য, মুখোটী, গাঙ্গুলী, কাঞ্জি, কুন্দ, পুতি, ঘোষাল ও চট্ট এই আটগ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে মুখ্য কুলীন করিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে বল্লাল ভূপতি চিন্তা করিলেন, আমি যে আটগ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে মুখ্য কুলীন করিয়াছিলাম, তাঁহারা এক্ষণে কে কিরূপ আচরণ করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া যাহাদিগকে দোষযুক্ত দেখিলেন, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন; তাঁহারা অবরকুল হইলেন। যাঁহারা বৈধ ও অবৈধ মিশ্র আচরণ করিতেছিলেন, তাঁহারা গৌণ কুলীন হইলেন এবং যাঁহারা সদাচারমাত্রনিরত ছিলেন, তাঁহারা মুখ্য কুলীন হইলেন। ১০৯৭ শাকে (১১৭৫ খীঃ) এই কুলবন্ধন সম্পন্ন হয়।

এইরূপ কুলনির্দ্ধারণ করিয়া ভূপতি বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগকে গো, ভূমি, স্বর্ণ ও বস্ত্রাদি দান করিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা একটি সুমহান্ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন, এবং যজ্ঞান্তে একটি স্বর্ণময়ী ধেনু দক্ষিণা প্রদান করিলেন। পঁচিশজন ব্রাহ্মণ সেই ধেনুটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইলে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে কুল হইতে বহিষ্কৃত করিলেন এবং পুত্র লক্ষ্মণসেনকে ডাকিয়া উপদেশ দিলেন,—

আমি এক্ষণে যে যে কার্য্য করিলাম, তুমি সেই সমস্ত আলোচনা ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া ব্রাহ্মণদিগের কুলচর্চ্চা মুহুর্ম্মুহুঃ করিবে।

রাজা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ক্ষিতীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বাপর বংশধরদিগের নাম সন্নিবেশ করিয়া ১১০৩ শাকে (১১৮১ খৃঃ) একখানি কুলগ্রন্থ রচনা করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে বল্লালসেন পরলোক গমন করিলেন। লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পিতা বল্লাল-

সেন জাহ্লন প্রভৃতি উনিশ জন ব্রাহ্মণকে কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাধান্ত খ্যাপন করিয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কলহ-বৃত্তান্ত মহারাজ লক্ষ্মণের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি পিতৃনির্দ্দিষ্ট কুলকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি প্রথমতঃ বংশপরিবর্ত্ত দেখিলেন, অর্থাৎ কুলীন কন্যাটি যাঁহার গৃহে প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহার গৃহ হইতে কন্যা গ্রহণ করা হইয়াছে কি না। দ্বিতীয়তঃ বংশের বলাবল দেখিলেন, অর্থাৎ কে কি প্রকার উচ্চ বা নীচ বংশে আদানপ্রদান করিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিলেন। তিনি কুলীনদিগের আর্ত্তি, ক্ষেম্য ও মধ্যাংশাদি পঞ্চদশ প্রকার অংশ বা ভাব নিরূপণ করিলেন। অনন্তর দুইবার সমীকরণ করিলেন, অর্থাৎ কুলীনগণের আচারাদি গুণদ্বারা মর্য্যাদার সমতা নির্দ্ধারণ করিলেন। প্রথম সমীকরণে উৎসাহের পুত্র আহিতাদি সাতজন ব্রাহ্মণ ও দ্বিতীয় সমীকরণে অরবিন্দ প্রভৃতি চৌদ্দ জন ব্রাহ্মণ সমতাহেতু কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন এই একুশ জন ব্রাহ্মণকে বিশেষরূপে পূজা করিলেন।

(নারায়ণ, মাঘ) শ্রীকুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।

* *
*

মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার।

সম্রাট জাহাঁগীরের দরবারে হিন্দু আমীর।

উদাজী রাম।—দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ, বিশেষ সুদক্ষ কর্ম্মী পুরুষ, সর্ব্বাগ্রে দাক্ষিণাত্যের অধিপতি মালেক আম্বরের দরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; পরে সম্রাট জাহাঁগীরের দরবারে চারি হাজার পদাতিক ও চারিহাজার অশ্বারোহী সৈন্যের নায়কের পদে উন্নীত হন। তিনি সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে পঞ্চহাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রাজা বাসু।—তিন হাজার পাঁচ শতী পদে নিযুক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যের অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন।

যসন্তরাও—মরাঠী বংশীয় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি দুই হাজারী অশ্বারোহী ছিলেন পরে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি সম্রাট শাহজানের আমলে তিন হাজারী নিযুক্ত ছিলেন। ১০৬৮ হিজরীতে সম্রাট আওরঙ্গজেব ও যশোবন্ত সিংহের উজ্জয়নীর যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন।

রায় বেহারী দাস বখশী।—দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান।

রায় বনমালী।—পীলখানার দারোগা। পরে ছয়শত পদাতিক ও ১২০ অশ্বারোহীর অধিনায়ক। সম্রাট শাহজানের আমলে হাজারী পদে নিযুক্ত হন।

রাজা ভারত বোন্দিলা।—রামচন্দ্রের পৌত্র। রামচন্দ্রের কন্যা আকবরের অন্তঃপুরে স্থান পাইয়াছিলেন। রাজা ভারত প্রথমতঃ ছয়শত পদাতিক ও চারিশত অশ্বারোহীর নায়কের পদে দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত হন। পরে দুই হাজার পাঁচ শত পদাতিক ও দুই হাজার অশ্বারোহীর অধিনায়ক হন। শাহজাহানের সময় তিনি তিন হাজারী হইতে ক্রমে সাড়ে তিন হাজারী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

যাদুন রাও। ইনি শিবাজী মারাঠীর মাতামহ, তাঁহার মূল নাম লক্ষজী। তিনি পূর্ব্বে আহমাদ্ নগরের নেজাম শাহী বংশের স্বনামখ্যাত আমির মালেক আম্বারের সামরিক বিভাগে দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। সম্রাট জাহাঁগীরের সহিত মালেক আম্বরের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, যাদুন রাও যুবরাজ সেনাপতি শাহজাহানের সহিত যোগদান করেন। জাহাঁগীরের দরবারে তিনি পঞ্চ হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে ২৪ হাজারী পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময় হইতে মারাঠীগণ মোগল বংশের সামরিক বিভাগে প্রবেশ লাভ করে। তদীয় ভ্রাতা জগদেব রায়কে চার হাজারী পদে, যাদুনের পৌত্র তেলঙ্গ রাওকে তিন হাজারী পদে এবং বিঠুজিকে দুই হাজারী পদে নিযুক্ত করা হয়। সম্রাট শাহজাহানের সময়ে যাদুন রাওয়ের পুত্র বাহাদুরকে পঞ্চ হাজারীর উচ্চপদ দেওয়া হয়। তাঁহার পুত্র দয়াজী তিন হাজারী পদে নিযুক্ত হন।

রাজা বাবার সিং বোন্দেলা।—তিনি রাজা নরসিংদেব বোন্দেলার পুত্র। চারি হাজারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের আমলে সপ্ত হাজারী পদের সম্মান লাভ করেন। এরূপ উচ্চ পদ লাভ মুসলমানের মধ্যেও কচিৎ কাহারও ভাগ্যে সংঘটিত হইত। আজ বাঙ্গালা মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের গবর্ণরের যে ক্ষমতা, সপ্ত হাজারী পদের ক্ষমতা তদপেক্ষা অধিক ছিল।

রাজা জগৎ সিংহ।—তিনি রাজা বাসুর কনিষ্ঠ পুত্র। তিন হাজারী। শাহজাহানের সময় কাবুলের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

রাজা রাজ সিং কচ্চ।—চারি হাজারী। পরে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা। তাঁহার পুত্র রামদাস দুই হাজারী পদে উন্নীত হন।

রাজা রায়সেন।—দুই হাজারী পদ হইতে উন্নতি পাইয়া দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত হন।

রাও রতন।—পাঁচ হাজারী। তিনি বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের বিরুদ্ধে অভিযানের অধিনায়করূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শাহজাহানের আমলেও তিনি স্বীয় পূর্ব্বপদে বহাল ছিলেন।

রূপচাঁদ।—গোয়ালিয়রের আমীর নিযুক্ত ছিলেন। কাঙ্গড়া অভিযানে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাজা রামদাস।—দুই হাজারী।

সূর্য্য সিংহ।—পাঁচ হাজারী। দাক্ষিণাত্যের অভিযানে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাজা সূর্য্যমল।—দুই হাজারী। কাঙ্গড়া ও দাক্ষিণাত্যের অভিযানে যেও দুর্গাদি তাঁহারই দ্বারা বিজিত হয়।

রায় সূর্য্য সিং।—হাজারী। তিনি দেলেপ সিংহের বিদ্রোহ দমনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। শাহজাহান তাঁহাকে চার হাজারী পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার দুই পুত্র সওয়ায়সেন ও রাওকর্ণ সপ্তশতী ও ষষ্ঠশতী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

রায় রায়ান রাজা বিক্রমাদিত্য সুন্দর দাস।—অমর সিংহের বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রেরিত হয়, তাহাতে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। বিজাপুরের অধিপতি ইব্রাহিম আদেল শাহের দরবারে রাজদূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। দৌত্যকার্য্য বিশেষ সফলতার সহিত সম্পাদন করায়, সম্রাট তাঁহার পদোন্নতি সাধন করেন। কাঙ্গড়ার দুর্গ জয়েও তিনি বিশেষ কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। জাহাঁগীরের দরবারে তিনি 'রায় রায়ান রাজা বিক্রমাদিত্য' উপাধি লাভ করেন।

রাজা রাজদেব।—১ হাজার পাঁচশতী ছিলেন।

রাজা সংগ্রাম।—দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

সওয়ার সাল কচ্চ।—দেড় হাজারী।

রাণাশঙ্কর।—আকবরের সময় দরবারে প্রবেশ করিয়া দুইশতী পদে নিযুক্ত হন। জাহাঁগীরের সময়ে তিন হাজারী ও বেহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রাজা শ্যাম সিং।—আড়াই হাজারী। বঙ্গদেশের অভিযানে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাজা কিষণ দাস।—আকবরের সময় পিলখানা এবং আস্তাবলের

দারোগা ছিলেন। জাহাঙ্গীরের সময় দুই হাজারী পদে উন্নতি লাভ করেন।

রাজা রাউল কলিয়ান।—আকবরের সময় পাঁচশতী পদে নিযুক্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার কন্যার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই রাণী রাজান্তঃপুরে "মালকায়ে জাহান" উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার ভ্রাতাকে দুই হাজারী পদ দেওয়া হয়।

রাজা কিষণ সিংহ রাঠোর।—রাণার বিরুদ্ধে অভিযানে মোহাবত খাঁর সহযোগী তিন হাজারী ছিলেন।

রাজা কল্যাণ।—বাঙ্গালার সুবাদার ইস্‌লাম খাঁর অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে তিনি উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন।

কিশোর দাস।—আকবরের সময় তিন শতী। জাহাঙ্গীরের সময় দুই হাজারী হন।

করমসী রাঠোর।—হাজারী। সম্রাট শাহজাহানের সময় দেড় হাজারী।

রাণা কর্ণ।—উদয়পুরের রাজবংশজ; তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ পাঁচ হাজারী পদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন।

রাজা গিরিধর কচ্ছ।—দুই হাজারী।

রাজা রাজসিংহ।—পঞ্চ হাজারীর উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট শাহজাহান স্বীয় রাজত্বকালে তাঁহার পূর্ব্ব পদ স্থায়ী রাখেন। এরূপ মহৎ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে অতি দুর্ল্লভ।

মনোহর দাস।—দেড় হাজারী। জাহাঙ্গীর স্বপ্রণীত জীবনীতে তাঁহার সাহিত্যজ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। রাণা অমর সিংহের বিরুদ্ধে অভিযানে সাহজাদা পরবেজের সহিত গিয়াছিলেন।

রায় মণি দাস।—জাহাঙ্গীরের প্রাসাদের দারোগার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রায় উপাধি ও ছয় শতী পদ প্রাপ্ত হন। তিনি শাহজাহানের আমলে 'দেওয়ানেতন' অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর বেতন-বিভাগের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। প্রধান মন্ত্রীর দুইজন সেক্রেটারী থাকিতেন, পদটি অতি সম্মানিত ও উন্নত ছিল।

রাজা মানসিংহ।—হাজারী। কাঙ্গড়া দুর্গাধিকারে সেনাপতি শেখ ফরিদের সহকারীরূপে গিয়াছিলেন। সেনাপতির মৃত্যুর পর তিনি বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত অভিযানের কার্য্য সম্পাদন করেন এবং তৎপর তিনি দেড় হাজারী পদ লাভ করেন। তিনি দ্বিতীয় বার সেনাপতিরূপে কাঙ্গড়া দুর্গাধিকারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মহারাজা নরসিংহ দেব।—শাহজাদা জাহাঙ্গীরের ইঙ্গিতে নরসিংহদেব সম্রাট আকবরের প্রিয়তম মন্ত্রী শেখ আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে উজ্জয়িনীর নিকট আক্রমণ করেন, একটি খণ্ড যুদ্ধের পর বর্শাঘাতে আবুলফজল নিহত হন। জাহাঙ্গীর সিংহাসনারোহণ করিলে, নরসিংহদেবকে প্রথমতঃ তিন হাজারী পদে নিযুক্ত করেন। তিনি আবুলফজলের নিকট প্রাপ্ত ধনরত্ন হইতে ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মথুরা নগরীতে একটি অতুলনীয় দেবমন্দির স্থাপন করেন। তাঁহার জায়গীর বিন্ধ্যাচলে বহু দালান, ধর্ম্মমন্দির এবং শিবসাগর নামে একটি বৃহৎ সরোবর এবং মথুরা পরগণাতে 'সমন্দর সাগর' নামে দীঘি প্রস্তুত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তিনশত ছোট বড় সরোবর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি শেষে চারি হাজারী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

রাজা ভীম নারায়ণ। গড় পরগণার জমিদার, হাজারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ভরজু।—বকাশব জমিদার, চারি শতী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

দেবী চাঁদ।—দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

হাকিম রঘুনাথ।—আটশতী পদে ছিলেন।

রায়ঘনেশ্বর।—বেহার প্রদেশের দেওয়ান ছিলেন, পরে গুজরাটের দেওয়ান হন।

মোহনদাস।—পাঁচ শতী। পরে গুজরাটের দেওয়ান।

রায় সঙ্গত ভদোয়োরির।—বঙ্গের অভিযানে রাজা শ্যাম সিংহের সঙ্গী ছিলেন।

রায় মানসিংহ।—রাজকীয় সৈন্যের সরদার ছিলেন।

রাজা নথমল।—দুই হাজারী।

হর ভান।—চন্দ্রকোটার জমিদার, এবং আড়াই হাজারী।

হর নারায়ণ হাড়া। তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত কাঙ্গড়া অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন—নয়শতী ছিলেন।

সম্রাট শাহজাহানের দরবারের হিন্দু আমীরগণের নাম।

১। রাজা অর্জ্জুন গৌড়।—তিনি গৌড়ের বিথলদাস গৌড়ের জ্যেষ্ঠপুত্র—প্রথমতঃ আজমিরের ফৌজদার বা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন, পরে দেড় হাজারী পদে নিযুক্ত হন। কান্দাহার অভিযানে দুইবার তিনি শাহজাদা আওরঙ্গজেব ও দারা শেকোর সহিত উপস্থিত ছিলেন।

২। উদাজীরাম।—পাঁচ হাজারী বা প্রাদেশিক গবর্ণরের উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যোগজীবন তিন হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৩। অর্জ্জুন গৌড়।—সাড়ে তিন হাজারী পদে অধিষ্ঠিত এবং আশগুরের দুর্গ রক্ষার পদে নিযুক্ত ছিলেন। কান্দাহার অভিযান এবং শাহজাদাগণের সঙ্গে অনেক যুদ্ধেই তিনি সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

৪। রাজা অমরসিংহ।—দেড় হাজারী। আওরঙ্গজেব ও মোরাদ বখ্‌শের সহিত বদোখশান অভিযানে উপস্থিত ছিলেন। দারা শেকোর সহিত কান্দাহার অভিযানেও সহযোগী ছিলেন। আওরঙ্গজেবের আমলে আসাম অভিযানে এবং পাঠান বিদ্রোহ দমনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন।

৫। রাও অমরসিংহ রাঠোর।—তিন হাজারী। দাক্ষিণাত্যের অভিযানে প্রেরিত হন—শাহজাদা সুজার সহিত কাবুলেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র যশোবন্ত সিংহ তিন হাজারী পদে নিযুক্ত হন। শাহজাদা মোরাদ বখ্‌শের সহিত কাবুলে বদলি হইয়াছিলেন। কালে চারি হাজারী পদে নিযুক্ত হন।

৬। রাও অমরসিংহ চন্দ্রাবত।—দেড় হাজারী। কান্দাহার অভিযানে দুইবার শাহজাদাগণের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন; দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৭। ইন্দ্রসাল।—ঝঞ্ঝার সিংএর বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্বপদ লাভ করেন। বিজাপুরের রাজা আদেল শাহের বিরুদ্ধেও তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন—আটশতী পদে নিযুক্ত ছিলেন। শাহজাদা মোরাদ বখ্‌শের সহিত কাবুলেও কিছুকাল ছিলেন।

৮। ভূর্জী।—তিন হাজারী। তাঁহার পুত্র প্রেমজী স্বেচ্ছায় এস্‌লাম গ্রহণ করিয়া দৌলতমন্দ খাঁ উপাধি ধারণ করেন এবং হাজারী পদে নিযুক্ত হন। তিন হাজারী পদ বর্ত্তমানের বিভাগীয় কমিশনারের পদের প্রায় সমতুল্য ছিল। হাজারী পদ বর্ত্তমান সবডিপুটীর পদের সমান।

৯। যুবরাজ বিক্রমাদিত্য।—দুই হাজারী। দাক্ষিণাত্যের অভিযানে ও দৌলতাবাদের দুর্গাবরোধে ছিলেন।

১০। রাজা বাদলসিংহ।—হাজারী। একবার পদাঘাতে একটি উন্মত্ত হস্তীকে বিতাড়িত করিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেওয়াতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বার্ষিক দেয় দুইলক্ষ টাকা নজরানার মধ্যে বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা চিরকালের জন্য রেহাই দিয়াছিলেন। তিনি

২১৩বার কান্দাহার অভিযানে বিশেষ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

১১। রাজা বিঠলদাস গৌড়।—পাঁচ হাজারী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আজমির প্রদেশের সুবাদার বা গবর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে আকবরাবাদের গবর্ণর নিযুক্ত হন—কাবুলের সুবাদারী পদেও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কয়েক পুত্র হাজারী ও দুই হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১২। বলভদ্র।—হাজারী। নেজাম শাহের অভিযানে ছিলেন।

১৩। বেহারীদাস।—দেড় হাজারী। কাবুলে দুই হাজারী পদে নিযুক্ত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য সম্পাদন করেন।

১৪। রাজা ভীম রাঠোর।—দেড় হাজারী। বোরহানপুরের কালেক্টরের পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিদ্রোহী জমিদারগণের নিকট হইতে সুকৌশলে টাকা ও হস্তী আদায় করিয়া রাজ দরবারে প্রেরণ করেন।

১৫। রায় বলভী।—উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১৬। রায় বেহারীমল।—লাহোরের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। পরে সোলতানের দেওয়ানী পদে বদলি হন। তৎপর প্রধান মন্ত্রীর দ্বিতীয় সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন। আবার শেষে পাঞ্জাবের দেওয়ানী পদও লাভ করেন। হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১৭। রাজা পাহাড়সিং।—চারি হাজারী। ইহা অতি সম্মানিত পদ। এই পদের লোকেরাই সুবাদার বা প্রাদেশিক গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইতেন। সেই কালে গভর্ণরের ক্ষমতা বিস্তর ছিল। শাসন ও সমর উভয় বিভাগের তাঁহারা প্রাদেশিক হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বলখ বাদোখশান ও কান্দাহার অভিযানে শাহজাদা আওরঙ্গজেব ও দারা শেকোর সহিত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রাজা ইন্দ্রমল পাঁচশতী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮। পৃথ্বীরাজ।—দুই হাজারী। আকবরাবাদের দুর্গাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন।

১৯। প্রসুজী।—খেলোজীর পুত্র। খেলোজী পাঁচ হাজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রসুজী তিন হাজারী পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভিযানে যশোবন্ত সিংহের সহকারী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে বহুকাল শাসনকর্ত্তার সহকারী পদে ছিলেন। মামুজী বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা এবং প্রসুজী ২০ হাজার টাকা পেন্‌সেন প্রাপ্ত হইতেন। প্রসুজী পেন্‌সনে এত অধিক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, তিনি আশী হাজার টাকা দ্বারা জলগাঁওয়ে জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব-প্রতিষ্ঠিত আওরঙ্গাবাদের বক্ষে একটি মহল্লা এখনও নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরভাগে 'প্রসুজী পুরা' নামে খ্যাত আছে। অথচ ইহাঁরা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন।

২০। রাজা প্রতাপচাঁদ।—বেহার ভোজপুরের অধিবাসী। দেড় হাজারী। তাঁহাকে স্থানীয় শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ভোজপুরের দুর্গকে দুর্ভেদ্য করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বেহারের সুবাদার আব্দুল্লাহ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহাকে বন্দী ও হত্যা করেন।

(আল্‌-এস্‌লাম, পৌষ) এস্‌লামাবাদী।

দেশের কথা

বঙ্গবিভাগ করিয়া বাংলা দেশকে পঙ্গু করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তারপর একটা কথা উঠিয়াছিল বাংলা ভাষাকেও দুই ভাগ করা হইবে, বাংলা সাহিত্যের প্রভাব খর্ব্ব করাই বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হৌক কথাটা কাজে পরিণত হয় নাই। এখন দেখা যাইতেছে বাংলা ভাষার প্রভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের প্রভাব অন্যান্য প্রদেশে বিস্তৃত হয় ইহা কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত নয়। তাই বাংলা ভাষার প্রভাব রোধ করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে "চারুমিহির" যাহা বলিয়াছেন তাহা সকল বাঙালীরই মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহাও "চারুমিহির" দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—

যে-সকল চিহ্নদ্বারা জাতীয় সজীবতা প্রমাণিত হইয়া থাকে, ভাষার উন্নতি তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। গত অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি ও আমাদের জাতীয় জীবনের স্ফূর্ত্তিলাভ ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধে আমরা আর এখন পূর্ব্বের ন্যায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিতেছি না।

কোনও দেশের ভাষা ও সাহিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার এক অতি সহজ উপায় হইতেছে—সেই দেশের প্রান্তবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীগণ তদ্দেশের ভাষা ও সাহিত্যের আদর করিতেছে, কি তৎসংলগ্ন অন্য দেশের ভাষা ও সাহিত্যের আদর করিতেছে তাহা দেখা। ইহাদ্বারা প্রত্যেক দেশের লোকের স্বদেশ-প্রিয়তা ও কার্য্যক্ষমতাও প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রান্তবর্ত্তী স্থানের লোকদিগকে আমার জাতীয় আদর্শে গঠিত করিতে পারিলে, তদ্দ্বারা আমার জাতিরই উন্নতি সাধিত হইল।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও আসাম ও উড়িষ্যা প্রদেশের স্কুলসমূহে বঙ্গভাষা পঠিত হইত। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যেই ঐ-সকল স্কুলে শিক্ষাদানকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। ফলে, আসাম ও উড়িষ্যার অধিবাসী-বর্গের জাতীয় জীবন বঙ্গদেশের আদর্শে গঠিত হইতেছিল। কিন্তু আমাদের আলস্যবশতঃ ও যত্নের ত্রুটীতে এবং ভেদনীতির প্রাবল্যে ঐ ভাব এখন সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আসাম ও উড়িষ্যা প্রদেশে বিভিন্ন ভাব প্রচারিত হইলেও মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও গোয়ালপাড়া ইত্যাদি প্রান্তবর্ত্তী জেলাসমূহে কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বঙ্গদেশের আদর্শই অনুসৃত হইতেছিল; ঐ-সকল জেলার লোক আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিত। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যেই ঐ-সকল স্থানের স্কুল ও পাঠশালায় শিক্ষাদানের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গের পর যখন রাজাজ্ঞায় বঙ্গদেশ পুনর্ব্বার একত্রীকৃত হইল, তখন ঐ-সকল জেলা কতিপয় রাজপুরুষের ইচ্ছার অনুবলে বঙ্গের বাহিরে পড়িয়া গেল।

ঐ-সকল জেলার বিচার-আদালতে ও আফিসাদিতে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গভাষার ব্যবহার রহিত করিয়াছেন। তজ্জন্য বিদ্যালয়গুলিতেও বঙ্গভাষার আদর কমিয়া গিয়াছে এবং কোনও কোনও বিদ্যালয়ে উহার

ব্যবহারই রহিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ-সকল স্থানের অধিবাসীবর্গের বঙ্গভাষার প্রতি আদর এখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। আমরা চেষ্টা করিলে উহা কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। কি কি প্রকারে এই চেষ্টা করা আবশ্যক তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

সকলেই অবগত আছেন, ঐ-সকল জেলায় শিক্ষার প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প। ঐ কারণে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও তথায় অতি কম। কিন্তু লোকের শিক্ষার স্পৃহা কম নহে। আমরা যদি এই-সকল জেলার স্থানে স্থানে আবশ্যকীয় শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপন করি এবং ঐ-সকল বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ভালরূপে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করি, তাহা হইলে ঐ-সকল স্থানের অধিবাসীগণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারেরও বন্দোবস্ত হয় এবং বঙ্গভাষার সহিতও তাহাদের সম্বন্ধ বজায় থাকে। বঙ্গসাহিত্যের সহিত পরিচিত হইলে ঐ-সকল লোক যে বঙ্গভাষার সহিত কখনও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবে না, ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।

বঙ্গভাষায় যে-সকল সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে যেগুলির ভাষা সরল ও সহজবোধ্য তাহা এ-সকল স্থানে নিয়মিত ভাবে বিতরণ করিলে তদ্দ্বারা ঐ-সকল লোকের মধ্যে বঙ্গভাষার অসাধারণ প্রতিপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা। আজকাল সকলেই নানা প্রকার সংবাদ জানিতে ব্যগ্র। ঐ-সকল স্থানের লোকের মধ্যেও এই ব্যগ্রতা দৃষ্ট হয়। তাহারা সহজে বাঙ্গলা সংবাদপত্রের সাহায্যে এই সুযোগ প্রাপ্ত হইলে বাঙ্গালা ভাষার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা নাই।

বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ সরল ও সহজবোধ্য সংবাদপত্র কিম্বা সাময়িক পত্রের অভাব আছে, তাহা আমরা মনে করি না। তবে প্রয়োজন হইলে এই জন্য বিশেষ ভাবে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করাও কঠিন ব্যাপার নহে।

ঐ-সকল অধিবাসীবর্গের শিক্ষা, রুচি ও অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বঙ্গভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার করিয়া উহা তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিলেও ফললাভের সম্ভাবনা।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মুসলমানেরাও উপলব্ধি করিতেছেন, বড়ই সুখের বিষয়। "মোহাম্মাদী" লিখিয়াছেন—

যখন মিঃ গোখলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার শিক্ষা সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছিলেন, তখন মান্যবর মিঁয়া মোহাম্মদ শফী, মান্যবর নওয়াব আবদুল মজীদ প্রভৃতির ন্যায় নেতৃধুরন্ধরের', আর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে দুই এক খানি জাতীয় সংবাদপত্র ঐ আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কারণ—গবর্ণমেণ্ট ঐ আইনের সমর্থন করিতেছিলেন না। মিঃ গোখলের সেই পাণ্ডুলিপি প্রথমবারের জন্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তিনিও আমাদিগকে ছাড়িয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে আজ ভারতবর্ষ একমত হইয়া তাঁহার প্রস্তাবিত আইনের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া আছে। সে দিন ভারতীয় মোসলেম শিক্ষা-সমিতির অভ্যর্থনা-কমিটীর সম্পাদক জনাব হাজী ইউসফ সওবানী সাহেব, তাঁহার অভিভাষণে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত বিনামূল্যে সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা না হইবে, ততদিন মুসলমান সমাজের প্রত্যাশিত উন্নতি সুদূরপরাহত। শিক্ষা কেবল অবৈতনিক হইলেই যথেষ্ট হইবে না। যাহাতে প্রত্যেক প্রজা তাহার অল্পবয়স্ক সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে বাধ্য হয়, এইরূপ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন না করিলে রাজকর্তব্য শেষ হইবে না। শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনেও পুনঃ পুনঃ এই প্রকার মন্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়া আসিয়েছে, এবারও হইয়াছে।

আমাদের কএকজন "মোহকুম" মান্যবর যদি সরকারের পক্ষে 'ভিটো" না দিতেন, তাহা হইলে মিঃ গোখলের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের এ পরিণাম কখনই হইতে পারিত না। সেইজন্য বলি, ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি পাঠাইবার সময় সাবধান হওয়া খুব আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা এ কথাটার গুরুত্ব আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

আমরা বড়ই অন্তঃসারশূন্য তাই আড়ম্বর ভালোবাসি। যার কিছু নাই সেও সময় সময় বেজায় আড়ম্বর করে। বিবাহের সময় আতসবাজি কাঁশি ঢোল শানাই ইংরেজি বাদ্য (তথাকথিত) প্রভৃতিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করে, ইহাতে ঋণ করিতে হয় তাহাও স্বীকার। এই সেদিন শুনিলাম কলিকাতার কোনো ধনী তাঁর পুত্রের বিবাহের বিরাট মিছিলে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিলেন। ঐ টাকা কত সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারিত। বিবাহে সদ্ব্যয়ের নিম্নলিখিত সংবাদটি "২৪ পরগণা বার্ত্তাবহে" প্রকাশিত হইয়াছে—

শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন দাঁ জাতিতে গন্ধবণিক। সম্প্রতি ডাক্তার শ্রীযুত রতনচন্দ্র পালের কন্যার সহিত ইহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দাঁ মহাশয় বিবাহে পণ, যৌতুক বা লৌকিকতার হিসাবে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। শুধু ইহাই নহে, আলোক বাদ্য প্রভৃতি আড়ম্বরে বৃথা অর্থব্যয় না করিয়া, ইনি দুই হাজারেরও অধিক দরিদ্রকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে দেড় টাকা মূল্যের এক এক খানি কম্বল দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন কলিকাতার অনাথ আশ্রমে ৭০খানি ও বেলগেছিয়া হাঁসপাতালে ১০০ খানি কম্বল দান করিয়াছেন।

উপাধিটাও আমরা বড় ভালোবাসি। উপাধি কিনিবার জন্য আমাদের দেশের কত লোক হাজার হাজার টাকা খরচ করেন ইহাও কাহারো অবিদিত নাই। উপাধিলোলুপ ব্যক্তিগণের জন্য এই সুসংবাদটি "মোহাম্মাদী"তে প্রকাশিত হইয়াছে—

কলিকাতার ব্যারিষ্টার মিঃ স্যামি (সেন!) এক সভা করিয়া এদেশের আড়ম্বরপ্রিয় চাতকদিগের জন্য মুষলধারে উপাধি বর্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুসলমানদিগের জন্য ব্যবস্থা, মীর সাহেবের বিষাদ-সিন্ধু বা সেখ আব্দুল জব্বার কৃত হজরতের জীবনী পড়িয়া পরীক্ষা দিলে—অবশ্য উত্তীর্ণ হইলে—কাব্যবিনোদ বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি উপাধি লাভ। কেহ এ সভায় যাবার হেলায় হারাইবেন না। একেবারে জাহাজ ডুবি, জদাম সাবাড়, সস্তার চূড়ান্ত, মহাজন কা মাল লুটা দিয়া!!

"যশোহর" সংবাদ দিতেছেন—

আমরা পরম্পরায় অবগত হইলাম যে যশোহর জেলাবোর্ড প্রত্যেক সবডিভিজনে এক একটি চলন্ত ঔষধালয় করিবার কল্পনা করিতেছেন।

এই ঔষধালয়ে এক একজন ডাক্তার থাকিবেন, তিনি গ্রামে গ্রামে যাইয়া দরিদ্র রোগীদিগকে ঔষধ বিতরণ ও সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্য-তত্ত্বাদি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন। জেলাবোর্ডের এরূপ সংকল্পের কথা জানিয়া আমরা সুখী হইয়াছি, ইহাতে দরিদ্র জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে প্রতি সাবডিভিসনের নিকটস্থ ২।৪ খানি গ্রামে পানীয় জল পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা এবং জঙ্গল পরিষ্করণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা করা উচিত। ইহাতে ২টি ফল হইতে পারে। ১ম ঐ গ্রামগুলির স্বাস্থ্য উন্নত হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ ঐ গ্রামগুলি দেখিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীদিগের মনে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইলেও হইতে পারে। তারপর ঐ-সকল গ্রামে ঐরূপ স্বাস্থ্যোন্নতি দর্শনে যদি সকলের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা বলবতী হয় তাহা হইলে আর কোন কথাই থাকে না।

আমাদের দেশ স্থিতিশীল; এখানে কোনো চলন্ত জিনিসের খবর পাইলে মন খুসি হয়। বড়োদায় চলন্ত পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, জাপানে চলন্ত কৃষি-শিক্ষকের দল দেশময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাষাদের কৃষি সম্বন্ধে নানা সুপরামর্শ দিয়া থাকেন, চাষাদের ব্যবসা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে তাহার সদুত্তর দিয়া থাকেন। বাংলাদেশেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান কবে হইবে!

আমাদের রোগজর্জ্জর দরিদ্র দেশে সহজলভ্য ঔষধের প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে। তুলসী গাছ প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, ঔষধ হিসাবে তুলসীর মাহাত্ম্য "মেদিনীপুর-হিতৈষী"তে প্রকাশিত হইয়াছে—

গোলমরিচ ও চিনি মিশাইয়া তুলসী পাতার রস সেবন করিলে কাশী, জীর্ণজ্বর ও বুকের বেদনা দূর হয়। সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ রোগে তুলসী পাতা শুঁকিলে খাইলে ও লাগাইলে অত্যন্ত ফল হয়। তুলসী পাতা চিবাইলে জিহ্বার ও ঠোঁটের ঘা সারে, মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। যকৃৎ পীহা ও অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে তুলসী পাতা খাইলে ও লাগাইলে খুব ফল পাওয়া যায়। তুলসী পাতা পিত্তঘ্ন, সর্পাঘাতের ঔষধ, বিসূচিকা ও প্লেগে উপকারী এবং কুষ্ঠরোগেও ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ফলপ্রদ। প্রত্যহ স্নানের পর কয়েকটি করিয়া তুলসী পাতা চিবাইয়া খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। ম্যালেরিয়া স্থানে গৃহের সম্মুখে অধিক সংখ্যক তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ তিরোহিত হয়। ইহা পরীক্ষিত।

"স্বরাজে" প্রকাশ—

১৯১৪-১৫ সনে সমগ্র পাবনা জেলায় জলাশয় খননের জন্য ডিঃ বোর্ড ২০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই টাকা ইন্দারা খননের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। জেলার কোন স্থানে নূতন পুষ্করিণী খনিত অথবা পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কৃত হইয়াছে কি না তাহা জানা যায় নাই। আমরা অবগত হইলাম আগামী বর্ষেও বোর্ড জেলার জলকষ্ট প্রশমনের জন্য ২২ হাজার টাকা পরিমাণ ব্যয় করিবেন।

পুষ্করিণীর চেয়ে ইঁদারা খননই ভালো। ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া জল অপরিষ্কার হইতে পারে না। গ্রামে সংক্রামক ব্যাধি হইলেও জল দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ কেহ জলে নামিয়া স্নান করিবে না বা পীড়িত ব্যক্তির বস্ত্র জলে ডুবাইবে না। কিন্তু সংস্কার বশে আমাদের দেশের লোক পুষ্করিণীর অধিক পক্ষপাতী; ইহা ভালো নয়। তারপর পুষ্করিণী খনন বা সংস্কার করিতে খরচ অনেক, ইঁদারা অতি অল্প খরচেই খনন করানো যায়।

"বীরভূমবার্ত্তা"য় পড়িলাম—

কলিকাতা হেয়ারস্কুলের হেড মাষ্টার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের সভায় প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ জেমসের হস্তে প্যারীচরণ স্মৃতি ও বিমলচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারের জন্য নিজ হইতে চারিশত টাকা প্রদান করেন। কোন স্কুলের শিক্ষক এরূপ ভাবে অন্য শিক্ষকের স্মৃতি উপলক্ষে মুক্তহস্তে ইতিপূর্ব্বে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন শুনা যায় নাই।

প্রতীক্ষা

(গল্প)

ছোট্‌দি!

আজ তোমার চিঠিখানা পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। ছ'মাস হলো আমরা এখানে এসেছি, এতদিন পরে যে আমাদের খবর নেবার অবসর তোমার হয়েছে, তবু ভাল! এখানে এসে আমি ভালই আছি। আর জ্বর হয়নি। এ জায়গাটি কেমন জান্‌বার জন্যে নিশ্চয় তোমার খুব আগ্রহ হয়েছে? জায়গাটি আমার কিন্তু বেশ লাগছে। ছায়াশীতল শ্যামশোভাময় পল্লীগ্রাম যাকে বলে, এটা তাই। সহরের গোলমালের মধ্যে ব'সে এখানকার শান্তসৌন্দর্য্য বোঝবার শক্তি তোমার হবে কি? আমাদের বাসাটি গ্রামের এক প্রান্তে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাঝারী ধরণের বাড়ীটি। সম্মুখে রাস্তা, তার পরেই খরস্রোতা শ্যামতটিনী সুন্দরী নদী। আর তিন পাশে মাঠ বা শস্যক্ষেত্র। বাহিরের ঘরের বারাণ্ডায় দাঁড়ালে নদীর সুশীতল মুক্ত হাওয়ায়, শস্যক্ষেত্রের শ্যামশোভায় মন প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে। ওখানে ম্যালেরিয়া জ্বরে কেমন ভুগছিলুম তা তো জানই। এখানকার ডাক্তারবাবু সকল ওষুধপত্র বন্ধ ক'রে সকালে বিকেলে নদীর ধারে বেড়ানোর ব্যবস্থা দিয়েছেন। আপিসে বাবার বেশী কাজের ভিড় না থাকলে তিনি সঙ্গে ক'রে বেড়াতে

নিয়ে যান। বেশী কাজ থাকলে নিজেই বাড়ীর সাম্‌নে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াই। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ আছে, তার ছায়ায় বসেও বেশ হাওয়া খাওয়া হয়।

এখানে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তার কথা তোমায় বলতে চাই। তোমারও বোধ হয় মন্দ লাগবে না। নদীতীরে যে প্রকাণ্ড বটগাছের কথা বলেছি, সেই গাছটা আমাদের বাসাবাড়ীর খুব কাছে। ঠিক্ সম্মুখে নয়, বাঁ ধারে একটু সরে। গাছের বাঁ পাশেই পল্লীনারীদের স্নানের ঘাট। সকালে, বিকালে, দ্বিপ্রহরে কৃষকবধূরা এই ঘাটে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, জল নেওয়া স্নান করার ছলে শতবার আসে, বসে, গল্প গুজব করে। আমিও বেড়ানোর ছলে তাদের নিপুণ হস্তের কাজ দেখি, সংসারের ছোট খাটো নানা কথা শুনি। সকাল বেলা গাছতলায় পাতালতা নিয়ে ধূলোর ভাত রেঁধে, উলঙ্গ অর্দ্ধ-উলঙ্গ কৃষকশিশুদের খেলতে দেখি। কোন দিন জনশূন্যও থাকে। বিকালে আর সবই ঠিক সকালের মত, কেবল গাছতলায় একটি মেয়েকে নির্নিমেষ চক্ষে একাগ্রচিত্তে নদীর দিকে চেয়ে বসে থাকৃতে দেখি। ঘাটের রমণীগণের কথোপকথন, ক্রীড়ারত শিশুদের আনন্দ-কোলাহল, কিছুই যেন তার কানে বা মনে প্রবেশ করে না। কোন দিকেই লক্ষ্য নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই। সে যেন ধ্যানরতা পাষাণমূর্ত্তি। সংসারের সহস্র কোলাহল তাকে এতটুকু বিচলিত করতে সমর্থ নয়। তার বিষাদাচ্ছন্ন মুখখানিতে কি যেন দারুণ উৎকণ্ঠা ফুটে থাকে। আরও আশ্চর্য্য এই যে এ মেয়েটির কাছে কোন রমণী কিম্বা বালকবালিকাকে যেতে বা তার সঙ্গে কোন বাক্যালাপ করতেও দেখি না।

তারা আসে যায় বসে কথা বলে, ওর দিকে লক্ষ্য করে না। বোধ হয় তার এমন ব'সে থাকা সকলের কাছে অতি পুরাতন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যহ একই স্থানে এক ভাবে এক সময়ে মেয়েটিকে ব'সে থাকৃতে দেখে আমার কৌতূহল দুর্দ্দমনীয় হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো। বেশ লক্ষ্য করে দেখলেম সে বেলা সাড়ে চারটায় পাঁচটায় এসে ঐখানে বসে, সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এলে উঠে চলে যায়। তার বেশ ভূষা দেখে মুসলমানের মেয়ে বলেই মনে হয়। (পরে জেনেছি সত্যই সে মুসলমানী) বয়েস বোধ হয় পঁচ-ত্রিশের নীচে হবে না। (তোমার মত আমার বর্ণনাশক্তি নেই, সব কথা সংক্ষেপেই লিখবো, তুমি ভেবে চিন্তে বুঝে নিও, কেমন?) নিখুঁৎ সুন্দরী যাকে বলে, মেয়েটি তাই। এমন সুন্দরী যে কৃষক মুসলমানের গৃহে আছে বা থাকৃতে পারে, সে বিশ্বাস ইতিপূর্ব্বে আমার ছিল না। বেশভূষা অতি সামান্য। পরনে এই দেশের তাঁতে তৈরী অত্যন্ত মোটা (ক্যাম্বিস বল্লেই হয়) সরু লালপেড়ে শাড়ী। নীচে হাতে রুলীর মত লাল দুগাছি চুড়ী। আর-কোন গহনা নেই। কিন্তু এতেই তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে গহনা পরার প্রয়োজন মনেও হয় না। দাদা যে বলে "যাকে ভগবান সৌন্দর্য্যসম্পদ দিয়েছেন তাকে গহনা পরালে সৌন্দর্য্যের হানি করা বা অপমান করা হয়" কথাটা তখন হেসে উড়িয়ে দিলেও আজ কিন্তু ঠিক্ বলে মনে হচ্ছে। ওকে দেখে আমারও মনে হয় গহনা পরলে ওকে বুঝি এত সুন্দর লাগতো না। এমনি রমণীয় কমনীয় রূপখানি তার, অমনটি সর্ব্বদা চোখে পড়ে না। আরও আশ্চর্য্য, সেই সুন্দর মুখখানি কি এক অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত। সে মুখের দিকে চাইলেই শ্রদ্ধা ভক্তিতে বুক ভরে ওঠে, মাথা আপনি নত হয়ে আসে। সে মুখে যুবকের কামনার কিছু নেই, সে যেন মূর্ত্তিমতী শিশুর সান্ত্বনা! প্রত্যহ নদীর দিকে চেয়ে বসে থাকে, সে কি ব্যাকুল দৃষ্টি! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে যার পথ চেয়ে থাকে, সে যেন আস্‌বেই। কিন্তু দিনের পর দিন যাচ্ছে, কৈ কেউ তো আসে না। তবু সে হতাশ নিরুদ্যম নয়, প্রত্যহ নিত্য নূতন আশা আগ্রহ বল সঞ্চয় করে ঐ জায়গায় এসে বসে বিফল প্রতীক্ষা করে।

একদিন বেলা ৩টা ৩॥০টা থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। প্রথমে টিপ্ টিপ্, ক্রমে বেগেই বর্ষণ হ'তে লাগ্‌লো। এমন দিনে বেড়াতে বেরুনো অসম্ভব। অগত্যা বই খাতা নিয়ে বিছানায় শুয়ে ব'সে নাড়া চাড়া করে সময়টা কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করলেম। কিন্তু অমন জড়ের মত শুয়ে বসে কতক্ষণ থাকা যায়? বিরক্ত লাগ্‌তেই উঠে পড়লেম। কেমন খেয়াল হলো বাহিরের ঘরের জানালা দিয়ে নদীর অবস্থা দেখ্‌তে গেলেম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাবা

আপিসে ছিলেন, কাজেই বাহিরের ঘর জনশূন্য বন্ধ ছিল। তখন বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বেশ বাতাসও দিচ্ছিল। জানালা খুলে দেখছি, নদীর বুকে তখন একখানিও নৌকো নেই, এ দুর্য্যোগে কে নৌকো ছাড়বে ?

হঠাৎ তার কথা মনে হলো। আজ নিশ্চয় সে আসেনি। সে যার আসার আশায় পথ চেয়ে থাকে, সে কখনই এমন দুর্য্যোগে নৌকো ছাড়বে না, তবে আজ আর কিসের প্রতীক্ষা ? অনুমানটা কতখানি ঠিক্ হলো দেখার জন্যে সেই পাশের জানালাটা খুলে দেখলেম। সে ঠিক্ সেই জায়গায় তেম্নি নীরব নিশ্চল নিষ্কম্প বসে আছে। তেম্নি মুখের ভাব। বৃষ্টিতে গা মাথা কাপড় ভিজে জল গড়িয়ে পড়ছে, তার কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। যেন কোন জ্ঞান নেই, প্রাণ নেই, সে যেন ভাস্কর-খোদিত পাষাণ-মূর্ত্তি। আমি অবাক্ ! এ কিসের কার প্রতীক্ষা ? এমন তো কোন গল্পেও পড়িনি। যেমন করে হোক্ ব্যাপারটা জান্‌তেই হবে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জানালায় দাঁড়িয়ে রইলুম, সেও ঠিক্ এক ভাবেই বসে রইলো। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে সে (বুঝি হতাশার ভারে পীড়িত হৃদয়ে) ধীরে ধীরে চলে গেল। আমিও জানালা বন্ধ করে ঘরে এসে শুয়ে পড়লেম। প্রত্যহই ফিরে যাবার সময় তার মুখ দেখে (যদিও সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না) মনে হতো নিরাশকাতর হৃদয়ের বেদনা যেন অসহ হয়ে উঠেছে। সে যেন আর আপনাকে সাম্‌লে বহন করে বাড়ী ফিরে নিয়ে যেতে কোন মতে পারছে না। এখনি বুঝি হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র দেহখানি শতধা হয়ে ভেঙে চুরে খসে পড়বে।

জানি না এত অসহ কি সে ব্যথা ! পরদিন যখন সে নিয়মিত সময়ে এসে বস্‌লো, তখন মুখ দেখে মনে হলো সে যেন নতুন আশা আগ্রহ ধৈর্য্য সংগ্রহ করে এনেছে। এমন অক্ষয় ভাণ্ডার সে কোথায় পেয়েছে ? সকলেরি সীমা আছে, ধৈর্য্যের কি নাই ? এমন অসীম ধৈর্য্য কি মানুষে সম্ভবে ? তারপর আরও কত দিন ওর চেয়েও বেশী ঝড় জলে ভিজে ভিজে তাকে অম্নি বসে থাকৃতে দেখেছি। সে দেহ এক বারও শীতে কাঁপেনি। বাতাসে এতটুকুও টলেনি। নীরব স্থির বসে থাকা। এতটুকু অধৈর্য্যের লক্ষণ তাতে দেখিনি। একেই কি বলে যোগ ? সাধনা ? সেকালের মুনি ঋষিরা বুঝি এম্নি করে তপস্যা করে ভগবানের দর্শন পেতেন। যে তপস্যার ফলে বা বলে ভগবান বাঁধা পড়ে দেখা দেন, তেম্নি তপস্যার বলে একটা ছার মানুষকে বেঁধে আন্‌তে পারে না কেন ? এ সাধনার সিদ্ধি কতদূরে ?

তার সঙ্গে আলাপ করবার আগ্রহ আমার যত বাড়তে লাগলো সুযোগও তত দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠতে লাগলো। তার যোগ ভঙ্গ করে আলাপ করবার সাহস আমার হচ্ছিল না। তার সম্বন্ধে সকল কথা হয় তো চেষ্টা করলে অন্যান্য প্রতি-বেশিনীর মুখে শুন্‌তে পেতুম, কিন্তু কেন জানিনে সে প্রবৃত্তিও আমার মোটে হলো না। যেন ওর কথা ওর ব্যথা ওর মুখেই শোভা পায়।

একদিন সুযোগ মিল্‌লো। বাবার আপিসে তখন থেকে কাজের ভিড় বেশী পড়ায় আর আমারও সব চেনা শোনা হয়েছে দেখে বাবা আর সঙ্গে যান না। আমি একাই বাড়ীর সাম্‌নে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াই। সেদিন সকাল বেলা ঘাটের ওপরে বেড়াতে যেয়ে তাকে ঘাটে থানকত ব সন মাজ্‌তে দেখলেম। আমিও এম্নি একটা অবসরের প্রতীক্ষা করছিলেম। বাঞ্ছিত প্রথম সুযোগ মূর্খের মত নষ্ট হতে দিলেম না, "নদীতে কোন্ সময় কেমন জল থাকে, বর্ষায় কতদূর পর্য্যন্ত আসে" এই কথার সূত্র ধরেই প্রথম আলাপ সুরু করা গেল। তারপর নানা কথা হলো। সে আমার আমি তার মোটামুটি পরিচয় পেলেম। এর পর প্রত্যহ ঘাটে দেখা হয়, গল্প গুজব চলে। ক্রমে আমি তার বাড়ী যেতে আরম্ভ করলেম। কৃষক মুসলমানের বাড়ী বলে ঘেন্না করতে পারবে না, তা হলে তোমার ভুল হবে, এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অনেক ভদ্রলোকের বাড়ীও নয়। বাড়ীতে ছোট বড় চারখানা ঘর। শোবার ঘর, রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর, গোশালা। মাটির দেয়ালের উপর খড়ের চাল। এ দেশের মাটির দেয়াল ভারী সুন্দর, ইটের গাঁথুনীর চেয়ে কোন অংশে হীন নয়, নিদেন আমার তাই মনে হয়। উঠানটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোময়লিপ্ত। কোথাও এতটুকু জঞ্জাল নেই। গোশালায় একটি হৃষ্টপুষ্ট সবৎসা গাভী। বাড়ীর চারিপাশে কঞ্চির বেড়া দেওয়া। স্থানে স্থানে ছোট বড় মাচায় লাউ, কুমড়ো,

সিমের গাছ। কোথাও গোটাকত লঙ্কা, বেগুনের গাছ। বাড়ীর ঘরগুলি থেকে আরম্ভ করে গাভী, গাছ, খুঁটিনাটি সমস্ত জিনিস দেখলেই বোঝা যায় স্বামিনী তার সমস্ত সেবা, যত্ন, স্নেহ মুক্তহস্তে এদের উপর ব্যয় করছে, কোন খানে এতটুকু ত্রুটি লক্ষ্য হয় না। মেয়েটির নাম "ফুলজান"। স্বভাবসুন্দরী ফুলজানের বাড়ীটি তারই বাসযোগ্য। তার বাপের এক পতিপুত্রহীনা-অনাথা চাচী (খুড়িমা) এখন তার অভিভাবিকা। ফুলজান প্রাণপণে বুড়ীটির সেবা যত্ন করে, বুড়ীও তার সমস্ত স্নেহটুকু দিয়ে তাকে আপন শোকসন্তপ্ত বক্ষের মধ্যে ঢেকে রেখেছে। আশে পাশে আরও জ্ঞাতি কুটুম্বের বাড়ী আছে। স্বভাবের গুণে সকলেই ফুলজানকে স্নেহ করে, তত্ত্ব নেয়, অভাব আব্দার পূরণ করে। তা-ছাড়া পাড়ার ছেলেমেয়েগুলি ফুলজানের স্নেহ-যত্নে বাঁধা। তারা নির্ভয়ে তার বাড়ীতে সব সময় আনন্দে খেলাধূলা করে। অনেকে রাত্রেও তার শূন্য বক্ষ পূর্ণ করে শুয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়। পাড়ার সকলেই ফুলজানের সরল নিষ্কলুষ স্বভাবে মুগ্ধ, দুঃখে দুঃখিত। তার উপর শ্রদ্ধা নির্ভরও অনেকখানি করে। ছেলেদের মা-বাপ নিজেদের ছেলে মেয়ে তার হাতে সঁপে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তেই থাকে। সন্তানহীনা ফুলজান তার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের গুণে পরের ছেলেগুলিকে নিতান্ত আপনার করে বেশ শান্তিতেই থাকে। এই দেবতার মত পবিত্র শিশুদের ফুলের মত সুন্দর মুখগুলিই বুঝি তাকে নিত্য নূতন জীবন দান করে, নতুবা তার বেঁচে থাকা বুঝি অসম্ভব হতো। খতিয়ে দেখ্‌তে গেলে এ জগতে তার আপনার বলবার কিছু নেই। যার কিছু নেই, সমস্ত দুনীয়াই তার। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, সেবা, যত্ন সবই তার হৃদয়ে নারীহৃদয়ের মতই আছে, কিন্তু দিবে কাকে? সাধারণের মত তার ভাগ্য নয়। পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, ছেলে মেয়ে কিছুই নেই, তবে সে কি নিয়ে বেঁচে থাকে? কাকে দেবে সব? ভগবান তাকে পথ বা পাত্র দেখিয়ে দিয়েছেন, আর দুঃখ নেই। সুগৃহিণী ফুলজান সকলকে মুক্ত হস্তে অথচ সমভাগে তার অসীম স্নেহ দান করে। অবুঝ অজ্ঞান পাওনাদার-গুলিও সুদ সমেত বুঝে নেয়, যায় গাভীটি পর্য্যন্ত। শিশু-গুলির মাঝে তাকে স্নেহক্ষমাশীলা জননীর মতই দেখা যায়। তার সঙ্গে আমার খুব বেশী দিনের আলাপ নয়, তবু যেন মনে হয় সে আমার জন্মজন্মান্তরের পরিচিতা। সেও আমাকে চিরদিনের বন্ধুর মত ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। আমার কাছে কোন কথা সে "কিন্তু" রেখে বলে না। ক্রমে ফুলজান তার অতীত জীবনের কাহিনী বা নদীতীরে প্রত্যহ প্রতীক্ষার কারণ ধীরে ধীরে আমাকে সমস্তই বল্লে।

কাজের ভিড়ে অবসরের অভাবে বাবা আমার বেড়নোর সময় সঙ্গে আস্‌তে পারেন না, তাতে আমার সুবিধাই হয়েছে। এখন কেবল ফুলজানের বাড়ীতে বসে তার সুখদুঃখের কাহিনী শুনতে যাওয়াই আমার বেড়ানো। তার বাড়ী আমাদের বাড়ীর খুব কাছে, সেই বটগাছের সোজাসুজি। এখন রোজ সকালে সে তার নিত্যকর্ম্মগুলি শেষ করে আমার যাওয়ার আশায় পথ চেয়ে থাকে, আমিও কোনমতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচি। সকাল বেলাই আমাদের দেখা, কথা, হয়। বিকালে সে তার সেই বটতলায় বসে, আমিও আর বেড়াতে বেরুইনে। এতদিন বয়েস হলেও ম্যালেরিয়ার প্রভাবে বা প্রসাদে দেহটি তেমন বাড়্‌তে পায়নি। এখন আর সেদিন নেই, ম্যালেরিয়া ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেহটিও তার এতদিনের ত্রুটি সংশোধন করতে আরম্ভ করেছে। কাজেই যখন তখন রাস্তায় বেড়ানো বা বেরুনো উচিত মনে হয় না। তবে এটা নির্জ্জন পল্লী বলেই যা। ভদ্রলোকের চেয়ে চাষালোক মন্দ কিসে ভাই? ভদ্রপল্লী হলে এত বড় মেয়েকে রাস্তায় বেড়াতে দেখলে কে ক্ষমা করতো? বরং পাঁচটা টিপ্পনী কাটবার এমন সুযোগটি কখনই ছাড়তো না। কানাঘুষোর জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠতে হতো। এরা গরীব নিরীহ চাষীলোক, সাম্‌নে পড়লেও সসম্ভ্রমে স'রে দাঁড়ায়, মুখ তুলে চাওয়ার সাহস করে না। তবু এরাই চাষা! যাক। তারপর যা বলছিলুম। ফুলজানের কাহিনীটাই বলি।

ফুলজান বাপ-মায়ের শেষ বয়েসের নিতান্ত নিরাশার সময়ে ভগবানের অসম্ভব অনুগ্রহ বা দান একমাত্র মেয়ে। তার বাপের এই বাড়ী; জমী জমা যা

আছে তাতে খাওয়া পরা নিশ্চিন্ত চ'লেও হাতে দু'দশ টাকা থাকে। বাপ মায়ের একমাত্র আদরিণী কন্যা সুন্দরী ফুলজানের বাল্য-জীবন যে আদর আনন্দের মধ্যেই কেটেছিল, তা বোধহয় বলতে হবে না। বিবাহযোগ্য বয়েস হ'লে তার রূপের মোহেই হোক্, কিম্বা বাপের জমী জমার লোভেই হোক্, অনেক বর জুটলো। কিন্তু একটি বরও পিতার মনোমত হলো না। তাদের দেশে বা সমাজে দশ থেকে জোর এগারো বৎসরের মধ্যেই কন্যা পাত্রস্থ করা নিয়ম। তার বেশী বয়েস হ'লে ভারী নিন্দা হয়। ফুলজানের কিন্তু বর বাছাই করতে করতে সে বয়েস উতরে গেল। বাপের ইচ্ছা ছেলেটি নেহাৎ নিরক্ষর চাষা না হয়; একটু আধটু লেখা পড়া জানে; চেহারাতেও মেয়ের অযোগ্য না হয়; স্বভাবটি বেশ শান্তশিষ্ট হয়; ঘরজামাই থাকে। এমনটি মিললো না। ঠক্ বাছতে গ্রাম উজাড় হলো। এদিকে মেয়ের বয়েস তের পেরিয়ে যায় দেখে অনেকে বন্ধুভাবে তার বাপকে সৎপরামর্শ দিয়ে বলেছিল "ভাই, আর কেন? যা হয় ওর মধ্যেই একটা দেখে শুনে দিয়ে ফেল। আর কি মেয়ে ঘরে রাখা ভাল দেখায়?" উত্তরে সে বলেছিল, "আমার জান্ কবুল্, তবু আমার ফুলকে আমি যার-তার হাতে দিতে পারবো না। ওর নসীবে যদি লেখা থাক্‌লে মনের মত বর মিল্‌বেই।"

সেইবার বর্ষায় কোথা থেকে একখানা বিদেশী ব্যাপারীর পাট-বোঝাই নৌকো এল। (অমন প্রতি বৎসর বর্ষাতেই এসে থাকে।) তারা কয়েক দিন ঘাটে নৌকো বেঁধে পাট কিন্‌তে লাগলো। হঠাৎ একদিন সকাল বেলা উঠে সকলে দেখতে পেলে নৌকো ঘাটে নেই। বটগাছ-তলায় ধুলোর উপর একটি সুন্দর ছেলে (উনিশ কুড়ি বৎসর বয়েস হবে) পড়ে আছে। ছেলেটি পীড়িত সংজ্ঞাহীন। ফুলজানের বাপ ছেলেটিকে সযত্নে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ী গেল। (ছেলেটিও মুসলমান।) অনেক চিকিৎসা শুশ্রূষার পর সে ভাল হয়ে উঠলো। তখন তার পরিচয় সবিশেষ পাওয়া গেল। তার নাম "রহিম"। বাড়ী যশোর জেলার কোন গ্রামে। সংসারে এক বুড়ো মা ছাড়া আর কেউ নেই। বাপমায়ের অনেকগুলি ছেলে মেয়ে মারা যাওয়ার পর শেষ সন্তান রহিম আল্লার দোয়ায় বেঁচে রইল। বাপ মা তাকে প্রাণে ধরে কষ্টকর চাষের কাজে না দিয়ে গ্রাম্যস্কুলে দিয়েছিল। সংসারের অবস্থা খুব ভাল না হলেও মন্দ ছিল না। যা জমীজমা ছিল, বাপ নিজে হাতে চাষ আবাদ করে তাই থেকে সংসার ও পুত্রের পাঠের ব্যয় স্বচ্ছন্দেই চালাত। যখন রহিমের বয়েস চোদ্দ বৎসর, তখন হঠাৎ বাপের দিন ফুরিয়ে গেল। বুড়ো মা প্রথমটা চক্ষে অন্ধকার দেখলেও পরে প্রতিবাসীদের পরামর্শ নিয়ে কোনমতে সকল কাজ চালাতে লাগল। পুরুষমানুষের হাতে সংসারটি যেমন সুশৃঙ্খলায় চলছিল, মেয়েমানুষের হাতে তেমন চল্লো না। রহিমের মাকে নেহাৎ সাদাসিধে মানুষ পেয়ে পাঁচজনে ঠকিয়ে নিতে লাগল। তবুও ধার কর্জ্জ করে বৃদ্ধা কয়েক বৎসর পুত্রের পাঠের খরচ যোগাচ্ছিল। তার পর দেনার দায়ে সমস্ত বিক্রি হয়ে গেলে স্কুল ছেড়ে রহিম চাকরীর চেষ্টা করতে বাধ্য হল। ক্ষুদ্র গ্রামে চাকরীর সুবিধা না হওয়ায় অগত্যা ঐ বিদেশগামী নৌকার ব্যাপারীর হিসাব পত্র রাখার কাজ নিয়েছিল। মা তার একমাত্র নয়নানন্দ পুত্রকে বিদেশ পাঠাতে প্রথমে কিছুতেই রাজী হয়নি। তার পর অন্নকষ্টেও বটে, পুত্রের অনেক বলা কওয়াতেও বটে রাজী হ'তে হয়েছিল। আজ দেড় মাস রহিম নৌকোয় এসেছে, এইবার ফিরে যাওয়ার কথা, এমন সময় তার কলেরা হওয়ায় তারা তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছে। এখান থেকে যশোর বহুদূর। যাওয়া আসার তেমন সুবিধাজনক একটানা পথ নেই। নৌকোয় যাওয়া যায়, কিন্তু অতদূরে কোন নৌকো যেতে রাজী হ'ল না। অগত্যা সকলের আশ্বাসবাক্যে, আগামী বর্ষায় স্বদেশের কোন নৌকো আসার আশায় রহিম এখানে রয়ে গেল।

রহিম চেষ্টা ক'রে এক মহাজনের আড়তে দশ টাকা মাহিয়ানার একটা চাকরী পেলে। ফুলজানের বাড়ীতেই রইল। সকাল বেলা নেয়ে খেয়ে কাজে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে দাওয়ায় ব'সে ফুলজানের বাপ-মাকে কোরানশরীফ প'ড়ে শোনায়। রান্না হ'লে খেয়ে বাইরের চালায় শুয়ে নিদ্রা যায়। এম্নি ক'রে ছ'মাস

গেল। ক্রমে সে ফুলজানদের ক্ষুদ্র সংসারের সঙ্গে মিলে তাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী নিতান্ত আপনার জন হ'য়ে পড়্‌লো। তার সুমিষ্ট ব্যবহার, শান্ত স্বভাবের গুণে ফুলজানের বাপ মা মুগ্ধ হ'য়ে তাকে সত্যিই আপনার ক'রে নেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে ফুলজানের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করলে। উত্তরে রহিম বল্লে "আপনারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনাদের ঋণ শোধ দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। আপনাদের কথার ওপর বল্‌বারও কিছু নাই। আপনাদের মতেই আমার মত। কেবল আমার মাকে একবার না দেখে কোনমতে স্থির হতে পারছিনে। বড় দুঃখী মা আমার, আমি ভিন্ন তার আর কেউ নেই তাকে দেখবার। আর কিছু দিন অপেক্ষা করুন, আমি যেয়ে মাকে নিয়ে এসে বিয়ে কর্‌বো।" এরা বল্লে, "তা কেন? এখনো তোমার যাওয়ার দেরী আছে। বিয়ে যখন কর্‌বেই, তখন মেয়েকে আর বড় করে নিন্দের সৃষ্টি করা কেন? বিয়ে করেই মাকে আন্‌তে যেও।" রহিম আর প্রতিবাদ করলে না বা করতে সাহস করলে না। নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হয়ে গেল।

ফুলজানের বাপ মায়ের সুখের সীমা রইল না। তারা যা চায় তা পেলে, তারা রহিমকে আল্লার প্রেরিত দয়ার দান মনে করে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সেলাম জানালে। ফুলজান রহিমও সুখী, কারণ কেউ কারও অযোগ্য নয়, এর অধিক কেউ আশাও করেনি। স্বামীর স্ত্রীকে যতখানি স্নেহ, যত্ন, আদর করা উচিত, রহিমের তাতে ত্রুটি ছিল না। ফুলজানও তার সমস্ত মন, প্রাণ, পতি-দেবতার পায়ে নিবেদন করে পূজো করত। স্বামী লেখা পড়া ভালো বাসে, তাই ফুলজান তার কাছে পড়ত। সংসারের নানা কাজের মধ্যেও সে সযত্নে পড়া করত। রান্না চড়িয়ে ধান সিদ্ধ চড়িয়ে সেই হেঁসেলে বসেই পড়া মুখস্থ করত। তাই ফুলজান মোটামুটী লেখা পড়া জানে। স্বামী পছন্দ করত, তাই এখনো সে চর্চ্চা ছাড়েনি, অবসর মত পড়াশুনা করে। যাকে সুখ বলে, তার ত্রুটি না থাকলেও একটি দিনের জন্যেও রহিম মন খুলে হাসত না, বা হৃদয়ে শান্তি পেতো না। এত সুখের মধ্যেও মায়ের মলিন মুখখানি সর্ব্বদা স্মৃতিপটে জেগে তাকে বেদনা দিত। দুই তিন খানা চিঠি লিখেও কোন উত্তর এল না। রহিমও অন্তরে অন্তরে অধৈর্য্য হয়ে উঠতে লাগল। ফুলজান স্বামীর বেদনা বুঝে নানা আশা সান্ত্বনার কথা বলত।

তারপর বর্ষা এল। কত দেশের কত নৌকো এল, গেল, রহিমের দেশের নৌকো একখানিও এল না। আশায় আশায় বর্ষা চলে গেল, রহিমের যাওয়ার সুবিধা হলো না। প্রথমটা মন বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল, শেষে ফুলজানের যত্নে সান্ত্বনায় অনেকটা সুস্থ হয়ে আগামী বর্ষার অপেক্ষায় আশায় বুক বেঁধে দিন গুনতে লাগলো। ক্রমে এম্নি করে চার বৎসরের চারটি বর্ষা এল গেল, রহিমের যাওয়া হলো না।

রহিম কারারুদ্ধের মত ছট্‌ফট্‌ করে চার বৎসর কাটিয়েছিল। দারুণ মানসিক কষ্টে ধৈর্য্যচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। অল্প অল্প জ্বর, আহারে অরুচি হয়ে শরীর শীর্ণ করে ফেল্লে। দিন দিন সে যেন নির্জ্জীব হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো। সে আর লোকের সঙ্গে বেশী কথা বলতো না, এক কোণে চুপ করে পড়ে থাকতেই চাইত। মাঝে মাঝে ফুলজানকে বলতো "ফুলজান, আমি বড় দুর্ভাগা, তাই তোমার মত স্ত্রী পেয়েও একদিনের জন্যে সুখী হতে পারলেম না। তোমাকেও কেবল দুঃখই দিলেম। একবার মাকে দেখতে পেলেই আমি বাঁচি। আমার সব অসুখ ভাল হয়ে যায়। মাকে না দেখে, তোমায় ফেলে আমার মরণেও সুখ শান্তি মুক্তি নেই বুঝি। এ অসুখ আমার শরীরের নয়, মনের। আমি বেশ বুঝতে পারছি। মাকে যে আমি কত আশা দিয়ে বুঝিয়ে রেখে এসেছি। এতদিন আমায় না দেখে সে কি বেঁচে আছে? কেমন করে আমার অন্ন জল রোচে? মা হয় তো না খেতে পেয়ে মরেছে। এমন বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরণ ভাল ছিল।" সরলা পতিপ্রাণা ফুলজানও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদে, তার সকল বেদনা আপন হৃদয়ে অনুভব করে, স্বামীর অশ্রু সযত্নে মুছিয়ে দিয়ে নূতন আশা সান্ত্বনার কথা ব'লে বুঝাতে চেষ্টা করে, প্রাণপণে স্বামীর সেবা যত্ন করে।

আবার বর্ষা এল। এবার রহিমের গ্রামের না হলেও দেশের একখানা নৌকো এল। মায়ের সংবাদ তারা দিতে পারলে না, কিন্তু রহিমকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হলো। যাওয়ার জন্তে রুগ্ন রহিম ব্যাকুল। সে যেন আশার আনন্দে শরীরে নূতন বল পেলে। এখন আর এক মুহূর্ত্ত সে বিলম্ব করতে পারে না। তেমন কাহিল শরীর নিয়ে নিস্পরের সঙ্গে যেতে দিতে ফুলজানের বাপ মা কিছুতেই সম্মত হলো না। ফুলজান কিন্তু স্বামীর ব্যথা বুঝে নীরবেই রইল, বাধা দিলে না। রহিম শ্বশুর, শাশুড়ী, পাড়া-প্রতিবাসী সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে যাবার জন্তে প্রস্তুত হলো। তখন রাগে দুঃখে ফুলজানের বাপ জ্ঞান হারাল। পাঁচজন প্রতিবাসী ও স্বজনকে ডেকে এনে রহিমের পথ আগলে বল্লে "যাবে যদি তবে আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে যাও। নইলে তোমায় কিছুতেই যেতে দেবো না।"

রহিম অবাক্! কিছুক্ষণ পরে বল্লে "কেন? আমি তো একেবারে যাচ্ছিনে। মাকে নিয়ে এই মাসেই আবার ফিরে আসবো।" ফুলজানের বাপ বল্লে "যদি পথে কিম্বা সেখানে যেয়েই তুমি মারা যাও, আমরা খবর পাবো কি করে? যদি ইচ্ছে করেই না ফিরে এসো? বিদেশী লোককে বিশ্বাস কি? একবার বিশ্বাস করে ঠকেছি, আর ঠক্‌বো না। চার বৎসর এত যত্ন মমতা করেও যখন তোমার মন বাঁধতে পারিনি, তখন আবার কিসের বিশ্বাস?" রহিম বল্লে "কি অপরাধে তাল্লাক দেবো? বিনা অপরাধে তাল্লাক দিলে খোদার কাছে গুনা হয়।" ফুলজানের বাপ বল্লে "বেকুফ বাপের হতভাগা মেয়ে বলে তাল্লাক দাও। কাঙালের ছেলের ঘোড়ায় চড়বার সখের মত আমি মূর্খ চাষা হয়েও বিদ্বান জামাইএর সখ্‌ করেছিলাম, সেই অপরাধে তাল্লাক দাও। তাল্লাক তোমায় দিতেই হবে, নইলে কিছুতেই তুমি যেতে পাবে না।" কাতর স্বরে রহিম বল্লে "তবে তাকে একবার ডাক, শুনি সে কি বলে।" ফুলজান বাইরে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিল। তার কর্ত্তব্য সে স্থির করে রেখেছিল। সে এলে সবাই সরে গেল। রহিম তার মুখপানে চেয়ে নিরাশ কাতর স্বরে "কি করি ফুল?" বলে আর কিছুই বলতে পারলে না। তার অবসন্ন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌লো। সে উপায়হীন বালকের মত কাঁদতে লাগলো। ফুলজান সযত্নে স্বামীর শীর্ণ দেহ আপনার বুকে তুলে নিয়ে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না, কিন্তু সে নিজের অধীরতা এতটুকুও কাউকে জান্‌তে দেয়নি। স্বামীর চক্ষের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে "অত অস্থির হয়ো না, আমার কথা শোন। ফারখৎ-পত্রে সই করে দিয়ে তুমি চলে যাও। কিছু ভেবো না, ভাববার কিছু নেই এতে। মায়ের চেয়ে দুনীয়ায় কেউ বড় নয়। আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে, আমায় জান তুমি, তবে ভাব কেন? তুমি মাকে দেখে এসো। তোমার আসার আশাটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তাই নিয়ে আমি জন্মজন্মান্তর কাটিয়ে দিতে পার্‌বো। তোমার ওপর আমার অসীম বিশ্বাস আছে, আসবেই তুমি আমার কাছে। আমার ওপরেও যেন তুমি বিশ্বাস হারিও না। মায়ের কাছে যাও, কোন বাধা গ্রাহ্য কোরো না। তাঁর ওপর কর্ত্তব্য সব চেয়ে বেশী। আমাকে সব চেয়ে বড় দেখলে কখনই তোমার ওপর এমন ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা আসতো না আমার। যে স্ত্রীর জন্তে মাকে ভুলে থাকতে পারে, সে কি মানুষ? যাও তুমি। যতটুকু জ্ঞান তুমি আমায় দিয়েছ, তাই নিয়ে তারই বলে বুক বেঁধে তোমার আসার আশায় পথ চেয়ে থাকতে পারবো। তালাকনামার জন্তে ভেবো না, আল্লার হুকুমে তোমায় আমায় যে সম্বন্ধ, তুচ্ছ তালাকনামার সাধ্য কি সে সম্বন্ধ মুছে ফেলে। এ বন্ধন জন্মজন্মান্তরের, কার সাধ্য ছিঁড়ে ফেলবে? আমি তোমার স্ত্রী, আশীর্ব্বাদ কর আল্লার দোয়ায় যেন 'স্ত্রী' নামে কলঙ্ক না আনি। হাসিমুখে তোমার সমস্ত সুখ-দুঃখের যেন সমভাগিনী হতে পারি।" তারপর উঠে স্বামীকে সেলাম করে বল্লে "মনে রেখো জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার আসার প্রতীক্ষা করবো। আসবে তুমি?" দৃঢ়স্বরে রহিম বল্লে "নিশ্চয়। মরণ ভিন্ন আর কেউ আমায় ধরে রাখতে পারবে না। আল্লা জানে, এখানে আমার প্রাণ ফেলে রেখে গেলেম। ফুলজান, তোমায় একবার না দেখে বেহেস্তে যেয়েও আমার সুখ হবে না।" স্বামীর কাছে

বিদায় নিয়ে ফুলজান বেরিয়ে আসতে আবার সকলকে নিয়ে তার বাপ ঘরে গেল। এবার রহিম বিনা বাক্যব্যয়ে ফারখৎপত্রে সই করে দিয়ে চলে গেল।

নৌকো চলে গেলে ফুলজান বাড়ী ফিরে এসে শয্যার আশ্রয় নিলে। তার তখন মনে হচ্ছিল আজ থেকে যেন তার সংসারের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ মুছে গেল, সকল বন্ধন যেন খসে পড়েছে, করণীয় আর যেন কিছু নেই, তাকে যেন আর কারুর প্রয়োজন নেই, সে যেন সংসারের আবর্জ্জনা, তাই বিধাতার হস্তচালিত অদৃষ্ট শতমুখী তাড়নায় সংসারের এক কোণে এনে তাকে জড়ো করেছে। দুর্ব্বহ জীবন বহন করবার মত শক্তি ও প্রয়োজন নেই। দুনীয়ায় সে আজ বড় একা। তার যেন সকল কর্ত্তব্যের শেষ হয়েছে। এখন কোনমতে বেঁচে থাকাও এক বিড়ম্বনা। যেন সমস্ত দুনীয়া খুঁজে তার জন্যে এতটুকু সান্ত্বনা, এতটুকু আলো, কোন কিছু অবলম্বন মিল্‌বে না। ভাবতে ভাবতে কখন্ নিদ্রার ঘোর এসে স্বপ্নের উজ্জ্বল চিত্র তার সম্মুখে ধর্‌লে। সে দেখলে রহিম এসে স্নেহকোমল স্বরে বল্‌ছে "ছিঃ ফুল, আমায় এত বুঝিয়ে এখন নিজে ভেঙে পড়ছো কেন? কই তোমার সে ধৈর্য্য? এই বুঝি তোমার প্রতীক্ষা করা? আমি যে তোমার কাছে না এসে পারিনে সে বিশ্বাস এর মধ্যেই হারালে? যে কর্ত্তব্যের জন্যে আমি তোমা হেন স্ত্রীকে ফেলে যাচ্ছি, সে কর্ত্তব্যের দ্বার, চেয়ে দেখ, তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত। বুড়ো বাপ মায়ের মনে কষ্ট দিও না। দুনীয়ায় নিজের সুখটুকুই সবচেয়ে বড় নয়, কর্ত্তব্য সবচেয়ে বড়। নিজের আরাম পশুতেও খোঁজেবোঝে, আমরাও যদি তাই চাই তবে আমরা তাদের চেয়ে বড় কিসে? মানুষ নামের যোগ্য কিসে? ওঠো, মন বাঁধ। তোমার অসীম স্নেহ অক্লান্ত সেবা-যত্নকে একজন মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা খোদার অভিপ্রায় নয়। সমস্ত শিশু, পশু, অনাথ, আর্ত্তের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করে দাও, শান্তি পাবে। আল্লার উপর বিশ্বাস রাখ, তাঁর মেহেরবানীর সীমা নেই, মূর্খ আমরা অন্ধ আমরা দেখতে বুঝতে পারিনে, চেষ্টাও করিনে। আমি আস্‌বোই ফিরে, কোন কিছু ভেবো না, আল্লার দোয়ায় সব হয়।" পরদিন থেকে ফুলজান সত্যই আশায় আশ্বাসে বুক বেঁধে এই স্বপ্নাদেশ কাঁটায় কাঁটায় প্রতিপালন করে আসছে। সত্যই সে পিতা, মাতা, অতিথি, প্রতিবাসী, শিশু, পশু, রোগীর সেবায় জীবন উৎসর্গ ক'রে শান্তি পেয়েছে। রহিম চলে যাওয়ায় ফুলজানের বাপ-মায়ের মনেও যথেষ্ট আঘাত লেগেছিল। তারা জামাইকে ছেলের মতই স্নেহের চক্ষে দেখেছিল। এক বৎসর পরে ফুলজানের নিকার কথা অল্প কানাঘুষো হতেই সে দৃঢ়স্বরে মাকে বলেছিল "ফের ও-কথা শুনলে নদীতে ডুবে মরবো।" বাপ মা মেয়ের মেজাজ বুঝে আর কোন কথা মুখে আনতে সাহস করেনি।

তারপর কত বৎসর চলে গিয়েছে। বাপ মা মৃত্যুর কোলে স্থান পেয়েছে। রহিম বা তার কোন সংবাদ আসেনি। তবু ফুলজানের আশা বিশ্বাস অক্ষয় অটুট চিরনূতন। বিকালে নদীতীরে প্রতীক্ষা করাটা তার অভ্যাস বা রোগের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যহ বিকালে মন্ত্রচালিতের মত তাকে যেতেই হবে, না যেয়ে পারে না। রহিম কখনো ফিরবে কি না ভগবান জানেন। ফুলজানের কিন্তু ধ্রুব বিশ্বাস সে ফিরে আসবেই। বিশ্বাসের উজ্জ্বল আলোকে দুঃখ-চিন্তার অন্ধকার তার মনের কোণেও দাঁড়াতে পারে না। সংসারে যে কাজ খোঁজে তার কাজের অভাব হয় না। ফুলজান সারাদিন নানা কাজের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে রাখে। সমস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যেও লোকে যেমন চেষ্টা যত্ন করে আহ্নিক, উপাসনা, নমাজের জন্যে একটু নির্দ্দিষ্ট নিশ্চিন্ত অবসর সময় ক'রে নেয়, ফুলজান তেম্নি এই প্রতীক্ষার সময় ক'রে নিয়েছে। সমস্ত দিন রাত্রির বাকি সময়টা সে হাসিমুখে বিশ্বসংসারের কাজে ব্যয় করতে পারে, কেবল ঐটুকু নয়, ঐটি তার নিজের কাজ, ওথেকে এক মুহূর্ত্তও সে কারুর জন্যে ব্যয় কর্‌তে পারে না। আমি কিন্তু ভেবে অবাক্! এই পনেরো ষোল বৎসরেও (ঠিক্ জানিনে, জিজ্ঞাসাও করি নি) ওর দমবন্ধ হ'য়ে আসেনি? আমার মনে হয় ফুলজানের তুলনা ফুলজান, এমন অসীম ধৈর্য্যের কথা কোথাও শুনিনি। সামান্য কৃষককন্যা হলেও তার পতিভক্তি অতুলনীয়। কি বল? আমার কিন্তু ওর পায়ের ধূলো মাথায় নিতে ইচ্ছে হয়। সত্যি করে বলো তো, শিক্ষিতা ভদ্র মহিলাদের মধ্যে এই

অশিক্ষিতা চাষার মেয়ের স্থান কোথায়? এমন ফুলজান ক'টা দেখেছ? জানিনা সাধ্বী ফুলজানের প্রতীক্ষার শেষ কতদূরে। এটা যদি প্রেতের রাজ্য না হয়, যদি ন্যায়বান্ ভগবানের রাজ্য হয়, তবে তার পুণ্যের পুরস্কার সে নিশ্চয় একদিন পাবে।

লিখ্‌তে লিখ্‌তে অনেক লিখে ফেলেছি, তোমার বিরক্ত লাগ্‌ছে? মাফ ক'রো ভাই। তারপর একটা নতুন খবর দিয়ে আজকের মত ইতি কর্‌বো। আমরা এই মাসেই বাড়ী যাবো। কেন তা বোধ হয় বল্‌তে হবে না? আমার অবস্থাটা না বুঝেই তুমি হয় তো হেসেই আকুল হবে। আমার কিন্তু ফুলজানের দশা দেখে সে অজানা পথের অচিন সাথীটির মন যুগিয়ে চলার কথা ভেবে বড্ড ভয় হচ্ছে। আমাদের বাড়ী যাওয়ার কথা শুনে ফুলজানের চোক দুটি জলে ভরে আসে। আমারও তাকে ছেড়ে যাবো ভাবতে কেমন কষ্ট বোধ হয়। তাকে কখনো ভুল্‌তে পার্‌বো না।

বেশ গুছিয়ে লেখা আমার আসে না, বিদ্যা তো জানই! তবু গল্পটা কেমন লাগে লিখো। এ কাহিনীটি যে কল্পনাপ্রসূত গল্প বা একবর্ণ অতিরঞ্জিত নয়, এ কথাটা যেন মনে থাকে। ইতি—তোমার স্নেহের ঊষা।

শ্রীপুরুবালা রায়।

ভারতে রৌপ্যমুদ্রা

অধুনা আমাদের দেশে, স্বর্ণ, রৌপ্য, এবং তাম্র প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতবর্ষে রৌপ্যমুদ্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তৎপ্রচলন হেতু অধুনাতন কালে আমাদের কি লাভালাভ হইতেছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।

প্রাচীনকালে এদেশে স্বর্ণমুদ্রারই অধিক প্রচলন ছিল। অন্ততঃ বড় বড় ব্যাপারে সুবর্ণ ব্যতীত অপর কোনও ধাতুর ব্যবহার সচরাচর হইত না—ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার অল্প হইত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে তাম্রমুদ্রা এবং কড়ির ব্যবহার হইত। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তে এবং ১৮১৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে মুদ্রার ইতিহাস এইরূপই ছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী হইতে মুসলমানেরা যখন আর্য্যাবর্ত্তের এক রাজ্যের পর অপর রাজ্যে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে লাগিলেন তখন সর্ব্ববিষয়েই এক মহাবিপ্লবের অভিনয় আরম্ভ হইল। কিন্তু ভারতেতিহাসে এইরূপ অভিনয় নূতন ছিল না। যবন, শক, হুন প্রভৃতি ম্লেচ্ছেরা এইরূপ বিপ্লব বহুবার ভারতবর্ষের স্থানবিশেষে সংঘটন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে হিন্দুর দেশে কেহবা ষোল আনা কেহবা বারো আনা কেহবা আঠার আনা হিন্দু সাজিয়া বাস করিয়াছেন—ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্যই প্রদান করিতেছে। মুসলমানেরা কিন্তু শেষপর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্বতোভাবে না হইলেও প্রায় সর্ব্ববিষয়ে এবং বহুল পরিমাণে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা এদেশে রাজ্যস্থাপন করিয়াই আরবী দীনার প্রভৃতি মুসলমানী মুদ্রার প্রচলনে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু ইহাতে সফলকাম হইতে না পারিয়া ১২৩১ খ্রীঃ অব্দে একশত রতি ওজনের "তঙ্কা" নামধেয় মুদ্রার সৃষ্টি করিলেন। সেই সময়ে একশত রতি ওজন ইংরেজি ১৭৫ গ্রেনের সমান ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট্ সের সাহ রতির কাল্পনিক ওজন বর্দ্ধিত করিয়া "তঙ্কার" পরিবর্ত্তে প্রায় ১৮০ গ্রেনের ওজনের "রূপেয়া" নামক মুদ্রার সৃষ্টি করিলেন। সম্রাট আকবর মুদ্রা বিষয়ে বহু পরিবর্ত্তন সংসাধিত করেন। তাঁহার সময়েই "রূপেয়া"র ওজন বর্ত্তমান ১৮০ গ্রেনে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য দাক্ষিণাত্যে মহম্মদীয় প্রভাব কস্মিন্‌কালেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। তথায় ১৮১৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ শেষ মহারাষ্ট্রা যুদ্ধে হিন্দুর স্বাধীন রাজত্বের ধ্বংসের সময় পর্য্যন্ত প্রাচীন কালের ন্যায় ও সুবর্ণ তাম্র মুদ্রারই ও কড়ির প্রচলন ছিল। ইংরেজাধিকারের পর হইতে তথায় টাকা চলিতেছে।

অর্থশাস্ত্র প্রচলিত মুদ্রাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—চলত সিক্কা (Legal tender)। এবং সংকেত মুদ্রা (token money)। আমাদের টাকা এবং আধুলি এই দুইটি রৌপ্যমুদ্রা চলত সিক্কা। সিকি, দুয়ানি, একআনি, পয়সা প্রভৃতি সংকেত মুদ্রা। ধরুন যদি আমি আপনার

কাছে একশত টাকা ধারি তাহা হইলে আমাকে এই একশত টাকা কেবল টাকা বা আধুলিতে অথবা টাকা এবং আধুলিতে পরিশোধ করিতে হইবে। যদি সংকেত মুদ্রা (সিকি, পয়সা ইত্যাদি) ব্যবহার করিতেই হয় তাহা হইলে টাকা মূল্যের পর্য্যন্ত এই-সকল মুদ্রা দিতে পারা যায়, এক টাকার অধিক সংকেত মুদ্রা গ্রহণ করিতে আপনি বাধ্য নহেন। ফলকথা আমাদের দেশীয় আইন অনুসারে সংকেত মুদ্রা এক টাকা মূল্যের পর্য্যন্ত চলত সিক্কা বা Legal tender রূপে পরিগণিত। ইংলণ্ডে সভারিন্ নামধেয় স্বর্ণমুদ্রাই চলত সিক্কা। শিলিং প্রভৃতি মুদ্রা দুই পাউণ্ড মূল্যের পর্য্যন্ত চলত সিক্কা। আর যদি কোনও দেশে দুই ধাতুর মুদ্রাই চলত সিক্কা রূপে আইনানুসারে প্রচলিত থাকে তবে সেই দেশে "বাইমেটেলিজম্" বা "দ্বি-ধাতু-পরিমাণ" প্রচলিত আছে এইরূপ কথিত হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় প্রকারের মুদ্রাই চলত সিক্কা রূপে চালাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যের অনুপাত সকল সময় স্থির না থাকাতে এবং বিবিধ প্রকারের স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা দেশে প্রচলিত থাকায় তাঁহারা বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। কথিত আছে ১৭৭৩ অব্দে ১৭৯ প্রকারের স্বর্ণমোহর এবং ৫৫৬ রকমের টাকা এদেশে প্রচলিত ছিল। মনে রাখিবেন এই-সকল মুদ্রায় প্রকৃত ধাতু-পরিমাণের মূল্যে (intrinsic value) তারতম্য ছিল। তখন কোম্পানী আদেশ দিলেন যে দ্বিতীয় সাহ আলমের রাজত্বের উনবিংশ বর্ষে অর্থাৎ ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে যে টাকা প্রস্তুত হইয়াছে তদনুরূপ মুদ্রা কলিকাতার টাকশালে প্রস্তুত হউক এবং ইহাই প্রধানতঃ সিক্কা রূপেয়া রূপে পরিগণিত হউক। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে কোম্পানী বাইমেটেলিজম্ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন এবং টাকাকেই সমগ্র ভারতবর্ষের চলত সিক্কা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ইহার পরেও গবর্ণমেণ্ট স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফোর্ণিয়াতে বহুপরিমাণে স্বর্ণ আবিষ্কৃত হয়। অর্থশাস্ত্রের একটা মূলসূত্র এই যে যদি কোনও বস্তুর আমদানী (supply) প্রয়োজন (demand) অপেক্ষা বাড়িয়া যায় তবে বাজারে ইহার মূল্য কমিয়া যায়। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। স্বর্ণের মূল্যও হ্রাস প্রাপ্ত হইল। তখন আমাদের গবর্ণমেণ্টের ভয় হইল স্বর্ণমোহর গ্রহণ করিলে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন। কেননা তখন যতগুলি রৌপ্যমুদ্রা দিয়া তাঁহারা প্রত্যেকটা মোহর ক্রয় করিবেন ভবিষ্যতে এই মোহরের বদলে ততগুলি রৌপ্যমুদ্রা হয়ত পাইবেন না, তাহার চাইতে অল্প পাইবেন। ১৮৫৩ অব্দে লর্ড ডালহৌসী আদেশ করিলেন—সরকারী অর্থকোষে কেহ মোহর ভাঙ্গাইতে আসিলে উহা গ্রহণ করিও না। কিন্তু ১৮৬০ খৃঃ অব্দ হইতে অর্থাৎ এই আদেশ প্রচারের সাত বৎসর পরে স্বর্ণের আমদানী কমিতে থাকিল। ইতিমধ্যে আবার রৌপ্যের আমদানী এত বাড়িয়া গেল যে স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের মূল্য বহুল পরিমাণ কমিয়া গেল। তখন ইউরোপের অনেক দেশেই চলত সিক্কা রূপে রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার উঠিয়া গেল। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে আমাদের একটা টাকা ইংলণ্ডের সভারিন্‌এর হিসাবে ১ শিলিং ১১ পেন্সের সমান ছিল। কিন্তু তারপর টাকার মূল্য কমিতে কমিতে ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে ১ শিলিং ৩ পেন্স অপেক্ষা কম দাঁড়াইল। সহজ কথায় ১৮৭২ অব্দে ১০॥৶০ ব্যয়ে একটা সোনার সভারিন্ পাওয়া যাইত। কিন্তু ১৮৯২ অব্দে তাহার মূল্য ১৮॥৶ হইয়া গেল। ইহার ফল বড়ই ভয়ানক হইল। প্রথমতঃ ইংলণ্ড জর্ম্মনী প্রভৃতি দেশে স্বর্ণমুদ্রাই একমাত্র চলত সিক্কা হওয়াতে সেই-সকল দেশ হইতে আনীত জিনিসপত্রের দাম খুব বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের মূল্যের স্থিরতা না থাকায় হোমচার্জ্জ পরিশোধ করিতে আমাদের গবর্ণমেণ্ট ভারি অসুবিধায় পড়িলেন। রেলওয়ের জন্য আমাদের প্রায় ১২॥০ কোটী, ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারীদের বিদায়কালীন ভাতা প্রভৃতির নিমিত্ত ৮ কোটী, ইংলণ্ডে লোকের নিকট আমাদের গবর্ণমেণ্টের যে ঋণ আছে সেইজন্য প্রায় ৩ কোটী এবং আরও নানা কারণে আমাদের যে দেনা আছে সেই নিমিত্ত প্রায় ৩॥০ কোটী টাকা আমাদের বৎসর বৎসর ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক ২৭ কোটী টাকা

প্রত্যেক বৎসর আমাদের গবর্ণমেণ্টকে ইংলণ্ডে ব্যয় করিতে হয়। ইংলণ্ডের লোকেরা রৌপ্যমুদ্রা গ্রহণ করে না। যেহেতু সেই দেশে উহা চলত সিক্কা রূপে পরিগণিত নহে। সেইজন্য টাকার বদলে তাহাদিগকে সভারিন্ দিতে হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কুড়ি বৎসরের মধ্যে একটা সভারিনের মূল্য ১০।১০ হইতে ১৮৷৷১০তে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এখন হিসাব করিয়া দেখুন শুধু হোমচার্জ্জ বাবদে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় কত বাড়িয়া গেল। এতদ্ব্যতীত সভারিনের মূল্যের স্থিরতা না থাকাতে সম্বৎসরের আয় ব্যয়ের ফর্দ্দ (Budget) প্রস্তুত বিষয়েও ভারি অসুবিধা হইতে লাগিল। কারণ কোন্ বৎসর সভারিনের মূল্য কত বাড়িবে তাহার কোনও স্থিরতা ছিল না। রাজস্ব-সচিবের (Finance Member) অনুমান প্রায়ই ব্যর্থ হইত। সুতরাং নূতন নূতন করের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু যখন দেখা গেল আর ত করভার বাড়ানো যায় না, তখন উপায়? তখন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া একটা কমিটি বসান হইল। তাহাতে বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। কমিটী বলিলেন আইন করিয়া রৌপ্যমুদ্রার সংখ্যা নিয়মিত করিতে হইবে। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় মুদ্রাও যোগান (supply) এবং প্রয়োজনের (demand) নিয়মের বশীভূত। অর্থাৎ যদি টাকার সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহার মূল্য কমিয়া যাইবে - টাকার তুলনায় স্বর্ণমুদ্রার মূল্য বাড়িয়া যাইবে। পক্ষান্তরে টাকার সংখ্যা কমাইয়া দিলে উহার মূল্য বাড়িয়া যাইবে অর্থাৎ টাকার তুলনায় স্বর্ণমুদ্রার মূল্য কমিবে।

পূর্ব্বে যে-কেহ টাকশালে রৌপ্য ধাতু (Silver bullion) পাঠাইয়া সেই মূল্যের টাকা পাইত। ইহাতে দেশে টাকার সংখ্যা যথেচ্ছ বর্দ্ধিত হইত। কমিটির পরামর্শে গবর্ণমেণ্ট ১৮৯১ অব্দে এইরূপ টাকা প্রস্তুত করা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। কারণ তাহা হইলে টাকার সংখ্যা যথেচ্ছ বাড়িতে পারিবে না। এমন কি ইহার পর ছয় বৎসর কাল গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংও টাকা প্রস্তুত করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ কমিটি বলিলেন বিদেশ হইতে আনীত রৌপ্যের উপর আমদানী শুল্ক বসাইয়া রৌপ্যের আমদানী হ্রাস করিতে হইবে। তাহাতেও রৌপ্যের দাম বাড়িবে। বস্তুতঃ এখন প্রত্যেক আউন্স রৌপ্যের উপর চারি আনা শুল্ক নির্দ্দিষ্ট আছে। তৃতীয়তঃ দেশে যাহাতে স্বর্ণ ধাতু ও স্বর্ণ মুদ্রার আমদানী বাড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ উহার আমদানী বাড়িলে মূল্য কমিবে। আর যে সভারিনের মূল্য ১৮৯২ অব্দে ১৮৷৷১০ ছিল গবর্ণমেণ্ট তাহার মূল্য ১৫৲ টাকা করিলেন। ফল কথা জোর জবরদস্তি করিয়া রৌপ্যমুদ্রার মূল্য বাড়াইয়া দেওয়া হইল। কারণ ১৮৯২ অব্দে একটা টাকার মূল্য ছিল ১ শিলিং ৩ পেন্সেরও কম, ১৮৯৩ অব্দে গবর্ণমেণ্ট তার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন ১ শিলিং ৪ পেন্স, ১৮৯৪ অব্দে একটা টাকার প্রকৃত মূল্য ১ শিলিং ১ পেন্স মাত্র হইল। অর্থাৎ রৌপ্যের মূল্য আরও কমিয়া গেল। কিন্তু ১৮৯৫ হইতে আইনের সুফল ফলিতে লাগিল—রৌপ্যের মূল্য ক্রমশঃ বাড়িতে চলিল; পরিশেষে ১৮৯৯ অব্দে এক টাকার মূল্য প্রায় ১ শিলিং ৪ পেন্সে উঠিল। পাঁচ বৎসরেই গবর্ণমেণ্টের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। প্রজারা নূতন নূতন করভারের উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইল এবং রাজস্ব-সচিবের চিন্তানল নির্ব্বাপিত হইল।

কিন্তু এইরূপ বিধানের ফলে দেশবাসীর কয়েকটা অসুবিধাও হইল। প্রথমতঃ টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়াতে দেশের রপ্তানী বাড়িবার কথা। কারণ বস্তুর উৎপাদনকারীরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা পাইবার জন্য জিনিস অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে চাহে। তাহাতে দেশের উৎপাদিকাশক্তি বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু জোর করিয়া টাকার মূল্য বাড়াইয়া দেওয়াতে রপ্তানী হ্রাস হইল। দ্বিতীয়তঃ একটা টাকাতে শুধু রৌপ্য থাকিতে পারে না। রৌপ্যের সহিত নিকৃষ্ট ধাতু মিশাইয়া টাকাটাকে মজবুত করিয়া লইতে হয়। আমাদের ১০০৲ টাকাতে ৯৯·৬ তোলা করিয়া রৌপ্য থাকে। এই পরিমাণ রৌপ্যের মূল্য মাত্র ৫৮৲ টাকা। কাজেই ১০০৲টাকা বানাইতে একজন লোকের ৫৮৲ টাকা মূল্যের রৌপ্য ব্যয়িত হয়। সুতরাং ৪২৲ টাকা লাভ থাকে। এই লোভে বহু লোকে জাল টাকা তৈয়ার করিতেছে। তাহাতে সর্ব্বসাধারণের অসুবিধা হইতেছে। তৃতীয়তঃ ১৮৯৩ অব্দের মুদ্রা বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে অভাব অনটনের সময় অলঙ্কারাদির রৌপ্যের বিনিময়ে

টাকশাল হইতে সমান ওজনের রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যাইত। কিন্তু এখন টাকশাল বন্ধ হওয়াতে সেই সুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল। যাহারা ঘরে অলঙ্কার বা অন্য প্রকারে রৌপ্য রাখিয়াছিল এখন তাহাদের ঐ রৌপ্যের শতকরা ৪২৲ ক্ষতি সহ্য করিতে হইল। কারণ পূর্ব্বে যতটুকু রৌপ্যের পরিবর্ত্তে ১০০৲ টাকা পাইত এখন তাহা ৫৮৲ টাকা মাত্র মূল্যে বিক্রয় করিতে হইল। এতদ্ব্যতীত যাহারা এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার অনতিপূর্ব্বে ঋণ করিয়াছিল তাহারাও ক্ষতিগ্রস্থ হইল। যেমন যদি কোনও ব্যক্তি ১৮৯১ সালে কোনও মহাজনের নিকট হইতে দশ টাকা ধার করিয়া থাকে এবং তখন ঐ টাকা দ্বারা তিন মন চাউল ক্রয় করিয়া থাকে, ১৮৯৯ সালে ঐ টাকা পরিশোধ করিতে হইলে তাহাকে তিন মন অপেক্ষা অধিক চাউল বিক্রয় করিতে হইবে। যেহেতু টাকার মূল্য বর্দ্ধিত হওয়াতে উহার ক্রয়শক্তিও (Purchasing power) বাড়িয়া গেল। উল্লিখিত উদাহরণে সুদ বাদ দেওয়া হইয়াছে। কমিটির কাছে কোন কোনও সাক্ষী এই সকল বিষয়ের উল্লেখও করিয়াছেন। তবে অনেকগুলি ক্ষতি সাময়িক মাত্র। মোটের উপর ইহাতে লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস।

নেপাল রাজ্যের সামাজিক রীতি নীতি

প্রকৃতির রমণীয় লীলাক্ষেত্র নেপাল রাজ্যে জীবনের প্রায় দুবৎসর অতিবাহিত করিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম। নেপাল স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। হিন্দুর সুপ্ত বীর্য্য এখনও এইস্থানে জাগ্রত আছে। গিরিরাজ হিমাচল শুভ্র শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া নেপাল রাজ্যের দৌবারিকের কার্য্য করিতেছেন। অস্তাচলগামী হিন্দুগৌরব-সূর্য্য এখনও এইস্থানে ক্ষীণকিরণ বিস্তার করিতেছে। এই স্বাধীন দেশের সামাজিক রীতি নীতির মধ্যে এখনও স্বাধীনতার স্রোত প্রবাহিত আছে। বহু শতাব্দীর পরপদবিদলিত ও পরমুখাপেক্ষী বঙ্গসমাজে যাহা অসত্য ও পাপ বলিয়া ঘৃণিত, এমন অনেক রীতিনীতি স্বাধীন নেপাল রাজ্যে গৌরবের সামগ্রী। তাই এই প্রবন্ধে নেপালের কতিপয় সামাজিক রীতি নীতির বিষয় উল্লেখ করিতে ইচ্ছা যাইতেছে।

শারীরিক অবয়ব ভেদে নেপাল সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়।

১। আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণ এইস্থানে একমাত্র অবিমিশ্রিত জাতি।

২। মঙ্গোলিয়ান জাতি—নেওয়ার, গুরুম, মগর ও লামা। নেপালের বর্ত্তমান রাজবংশ জাতিতে ছত্রি। আর্য্য ও মঙ্গোলিয়ান জাতিদ্বয়ের সংমিশ্রণে এই জাতি গঠিত হইয়াছে।

ধর্ম্মভেদে নেপাল সমাজ আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

১। শৈবমার্গী—ব্রাহ্মণ ও ছত্রিরা সকলেই শৈবমার্গী। নেওয়ার, গুরুম কেহ কেহ শৈবমার্গীও আছেন।

২। লামারা প্রায় সকলেই বৌদ্ধমার্গী। এতদ্ভিন্ন নেওয়ার গুরুম ও মগরদের মধ্যেও কেহ কেহ বৌদ্ধমার্গী আছেন।

শৈবমার্গী ও বৌদ্ধমার্গী উভয় সম্প্রদায়ই আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন এবং এই উভয় সম্প্রদায়ে পরস্পরের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, যেমন আমাদের দেশে বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের বৈবাহিক আদানপ্রদান চলে। বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন না, যে-কোনও ব্যক্তি তাঁহাদের ধর্ম্মযাজক হইতে পারেন। এমন কি লামাগণ মৃত গোমাংস পর্য্যন্ত আহার করেন, তবুও শৈবমার্গী ও বৌদ্ধমার্গীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য সকল জাতির মধ্যে মাতুলকন্যা বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে।

ব্রাহ্মণ নেপালের সর্ব্বোচ্চ জাতি। রাজ-পরিবারের গুরু ও পুরোহিত ব্রাহ্মণ। রাজগুরুকে 'ধর্ম্মাধিকার' উপাধি দেওয়া হয়। নেপালের জাতি বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারের মীমাংসা রাজগুরুই করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতর যে-কোনও জলচল জাতির রমণীকে বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ বিবাহের সন্তানগণ ছত্রি আখ্যা প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ-রমণীকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও ব্রাহ্মণেতর পুরুষ

বিবাহ করিতে পারেন না, এরূপ বিবাহ আইনবিরুদ্ধ ও বিচারে দণ্ডনীয়। ব্রাহ্মণের ন্যায় ছত্রিগণও নেওয়ার, গুরুম্, মগর, লামা যে-কোনও জাতির স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারেন। এরূপ বিবাহোৎপন্ন সন্তানগণ সমাজে ছত্রিরূপেই পরিগণিত হয়।

নেপালে ব্রাহ্মণ-বিধবার কঠোর বৈধব্যব্রত গ্রহণের প্রথা বিদ্যমান নাই। এইদেশে বিধবারা মৎস্য মাংস সবই আহার করিয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে বিধবা ব্রাহ্মণী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন। বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানগণকে জৈসি ব্রাহ্মণ বলা হয়। তাঁহারাও অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় দান গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কুমারীর গর্ভজাত ব্রাহ্মণের ন্যায় এঁদের গৌরব ও সম্মান নহে। নরহত্যা অপরাধে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হইতে পারে না, কিন্তু জৈসি ব্রাহ্মণের তাহা হইতে পারে। ছত্রি এবং অন্যান্য জাতির মধ্যেও বিধবারা মৎস্য মাংস আহার করিয়া থাকেন; তবে কতকগুলি চিহ্ন আছে যাহা সধবা ভিন্ন বিধবারা পরিধান করেন না, যেমন—মাথায় লাল ফিতা, গলায় পুঁতির মালা, হাতে কাঁচের চুড়ি; তাহা দেখিয়াই সধবা বিধবা চেনা যায়। এই সমস্ত সধবার লক্ষণ ছাড়া অন্যান্য বেশভূষা সধবার ন্যায় বিধবারাও করিয়া থাকেন। ছত্রি এবং অন্যান্য জাতির মধ্যেও পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা আছে, তবে নেপালাধিপতির বংশের ও রাণাবংশের পরিবারে বিধবা-বিবাহের প্রথা নাই।

নেপালের অধিপতিকে "ধিরাজ" নামে অভিহিত করা হয়। ধিরাজের বিবাহ সাধারণ লোক হইতে স্বতন্ত্র। বিবাহের রাত্রে নেপালাধিপতি এক সময়ে দুইটি ছত্রি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই দুই স্ত্রীই মহারাণীর আসন প্রাপ্ত হন। মহারাণীদ্বয়ের গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী। নেপালাধিপতি ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মণকন্যাও বিবাহ করিতে পারেন। নেপালের রাজ-পরিবারে অগণন ক্রীতদাসী আছে; নেপালি ভাষায় তাহা-দিগকে "কেটী" বলে। রাজপ্রসাদে এই কেটীবৃন্দ সযত্নে রক্ষিতা হন। কেটীদের কেহ যদি নেপালাধিপতির দ্বারা সন্তানবতী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে রাণীর পদে বরণ করা হয়। কেটী রাণীর গর্ভজাত সন্তানকে "সাহেবজি" এবং কন্যাকে "সাহাজাদা" বলা হয়। এই-সমস্ত সন্তানগণও রাজ্য হইতে মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নেপালের প্রধান মন্ত্রীকে "মহারাজা" নামে অভিহিত করা হয়। মহারাজার বিবাহিতা স্ত্রীকেও 'মহারাণী' বলা হয়। ধিরাজের স্ত্রীকে "শ্রীপাঁচ মহারাণী" এবং প্রধান মন্ত্রীর স্ত্রীকে "শ্রীতিন মহারাণী" বলা হইয়া থাকে। প্রধান মন্ত্রীর পরিবারের কোনও কেটী যদি তাঁহার দ্বারা সন্তানবতী হয়, তাহা হইলে সেই কেটীকেও রাণীর পদে বরণ করা হয়। এই রাণীর গর্ভজাত পুত্রসন্তানকে সৈন্যবিভাগে জেনারেলের পদ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়, কিন্তু সে প্রধান মন্ত্রীর পদ কখনও প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রধান মন্ত্রী ইচ্ছা করিলে তাঁহার যে-কোনও কেটীকে শ্রীতিন মহারাণীর পদে উন্নত করিতে পারেন। কেটী যদি শ্রীতিন মহারাণীর পদে অভিষিক্তা হন, তাহা হইলে তাঁহার গর্ভজাত পুত্র-সন্তানগণও বিবাহিতা শ্রীতিন মহারাণীর গর্ভজাত পুত্রদের ন্যায় প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

নেওয়ার জাতির বিবাহ ছত্রিদের বিবাহ হইতে স্বতন্ত্র। নেওয়ার রমণীগণ জীবনে কখনও প্রায় বিধবা হন না। শৈশবে নেওয়ার বালিকাকে একটি বেলফলের সঙ্গে আড়ম্বরের সহিত বিবাহিতা করা হয়। এই বেলফলই নেওয়ার বালিকার প্রকৃত স্বামী। পিতৃগৃহে এই বেলফল সযত্নে রক্ষা করা হয়। যদি কোনও দৈব ঘটনায় এই বেল-ফলটি বিনষ্ট হয় তাহা হইলে তখন নেওয়ার রমণী বিধবা হয়। যৌবনপ্রান্তে বেলফলের স্ত্রী নেওয়ার যুবতীকে একজন পুরুষের সহিত বিবাহিতা করা হয়। বিবাহের রাত্রিতে স্বামী স্ত্রীকে বিবাহবন্ধনের চিহ্নস্বরূপ একটি সুপারী প্রদান করেন। বিবাহিতা নেওয়ার রমণী সযত্নে সুপারিটিকে অঞ্চলে রক্ষা করেন। যদি কোনও কারণে নেওয়ার রমণী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিবার সময় অঞ্চল হইতে সুপারিটি খুলিয়া স্বামীর উপাধানের নিম্নে রাখিয়া স্বেচ্ছাক্রমে স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, এবং অন্য স্বামী গ্রহণ করেন। এইসব মানুষ স্বামীর কাহারও মৃত্যুতে নেওয়ার রমণী বিধবা হইতে পারে না কারণ

তাহার প্রথম বিবাহের বেলকল স্বামী বিনষ্ট না হইলে সে বিধবা হইবে না।

লামাদের বিবাহের প্রথা ছত্রি ও নেওয়ারদের বিবাহের প্রথা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লামা রমণী এক সময়ে বহু পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। সাধারণতঃ সহোদর ভ্রাতাগণ মিলিয়া এক স্ত্রী বিবাহ করেন। এই বিবাহজাত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান সর্ব্বজ্যেষ্ঠ স্বামীর সন্তান বলিয়া পরিগণিত হয়।

নেপালে (Divorce) ডিভোর্স বা বিবাহবন্ধনভঙ্গপ্রথা বিদ্যমান আছে। স্বামী চিররুগ্ন হইলে বা দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত হইলে, অথবা বহুবর্ষব্যাপী প্রবাসী হইলে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন। কোন বিশেষ কারণে যদি পারিবারিক জীবন অশান্তিময় হয় তাহা হইলেও বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাক্রমে স্বামীকে পরিত্যাগ করেন এবং অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক গৃহীতা হন, তাহা হইলে যে পুরুষ কর্ত্তৃক গৃহীতা হইয়াছেন সেই পুরুষ পূর্ব্বের স্বামীকে বিবাহের ব্যয়স্বরূপ অবস্থা অনুসারে অর্থ প্রদান করিতে আইন দ্বারা বাধ্য। পুরুষ যদি স্বেচ্ছাক্রমে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে যতদিন স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ না করেন ততদিন তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে বাধ্য।

বিবাহিতা নয় অথচ রক্ষিতা স্ত্রী হইতে সন্তানোৎপাদনের প্রথা নেপালে বিদ্যমান আছে। রক্ষিতা রমণীর গর্ভজাত সন্তানগণ সমাজে ঘৃণিত কিম্বা পরিত্যক্ত নয়। রক্ষিতা রমণীর গর্ভজাত সন্তানগণ সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশের অধিকারী। কোন পুরুষের যদি দুইজন বিবাহিতা স্ত্রী থাকে ও তিনজন রক্ষিতা রমণী থাকে এবং এই পাঁচজনের গর্ভে ১০ জন সন্তান হয়, তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তি ছয়ভাগে বিভক্ত হইয়া পাঁচভাগ বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণকে সমভাগ করিয়া দেওয়া হয়, আর বাকী এক অংশ রক্ষিতা রমণীর সন্তানগণকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

নেপালে বালিকাদিগের বিবাহের কোনও নির্দ্দিষ্ট বয়স নাই। গৌরী দান করিয়া অতুল পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য নেপালের হিন্দু প্রত্যাশী নয় এবং বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা পুষ্পিতা হইলে সপ্তমপুরুষ নরকগামী হইবার ভয়েও তাঁহারা ভীত নন্। সাধারণতঃ ১৬ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকের বিবাহ হইয়া থাকে। বালিকার বিবাহের কোনও নির্দ্দিষ্ট বয়স না থাকাতে এবং বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবিধ প্রকারের বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকাতে গরিব পিতা কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া পণের বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া পথের ভিখারী হন না।

পতিতা রমণীর ব্যবসা নেপালে রাজদণ্ডে দণ্ডিত। যে ঘৃণিত সামাজিক প্রথা বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে শত শত ভ্রূণের রক্ত গায় মাখিয়া ভৈরব মূর্ত্তিতে ঘুরিতেছে, বীরভূমি নেপালে তাহার চিহ্নও নাই। উদার বিবাহরীতি প্রচলিত থাকাতে প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ নেপালে বিবাহিত জীবন সম্ভোগ করিবার সুবিধা পাইতেছেন। যে-সমস্ত কারণে আজ নেপালী গুরখার বীরত্বে সমস্ত ভারত গৌরবান্বিত নেপালের উদার বিবাহরীতি তাহার প্রধান কারণ।

শ্রীজগমোহন দাস।

হারামণি

[এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। অনেক গ্রামেই এমন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন ; কবিওয়ালা, তর্জ্জাওয়ালা, জারিওয়ালা, বাউল, দরবেশ, ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের।]

গীত

আমার মন রাইকে বেঁধে লয়ে যায় রে।
বাড়ির পাশে বেউড়ের বাঁশ সেও সদর ভাই রে।
ওরে জীয়ন্তেতে কাটি কুটি, মলেও সঙ্গে যায় রে।
বাড়ির শোভা দেয়াল পাঁচির, গগনের শোভা চাঁদ রে
নারীর শোভা কবি ছেলে স্তনে দুগ্ধ খায়রে—
এসব ছেড়ে কেমন ক'রে আমায় নিয়ে যায়রে।
মা কাঁদে বাছা বাছা, ভগ্নী কাঁদে ভাই রে!
পরের মেয়ে সেও কাঁদে আমারও কেউ নাই রে।
ছোট ছোট খেজুর গাছে বাবুয়ের বাসা রে
একটি ঝড়ে কোথায় ওড়ে কোথায় চলে যায় রে।
(ওরে) উড়ে যায় যে হংস পাখি শূন্য খাঁচা রয় রে।

এ গানটির রচয়িতার নাম জানিতে পারি নাই, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে র ভিক্ষুকদের মুখে শোনা।

সংগ্রহকারক
শ্রীপ্রভাকর চক্রবর্ত্তী।

গরুর গান।

হায়রে গিরস্থ ভাইরে কি ধার ধারি তোর ;
বনের ঘাস খাইয়া আমি শুইয়া থাকি ঘর।
বিহানে উঠিয়া গিরস্থ দোয়ারে দিলে টান
চমকিয়া চমকিয়া উঠে গাইর (১) পরাণ।
গিরস্থের ছালিয়া পুয়া (২) দুধে ভাতে খায় ;
যাতা মারিয়া ধরে পালট (৪) জিগর (৩) ফাটিয়া যায়।
গিরস্থের কালিয়া কুত্তা আল্লা নাই সে মানে ;
ফালদি ফালদি (৭) মারে কামড় লৌ (৬) পড়ে ধারে।
হায়রে গিরস্থ ভাইরে কি ধার ধারি তোর ;
বনের ঘাস খাইয়া আমি শুইয়া থাকি ঘর।
কাঠের লাঙ্গল, বাঁশের জোয়াল, গলে দেও দড়ি ;
নিদান (৮) পড়িলে মোরে বেচিয়া লও কড়ি।
হাল বও, দুধ খাও, বেচিয়া লও কড়ি ;
তার উপর চাও, ছাহেব আল্লা গলে দিতায় ছুরী।
পোড়া বনে গেলাম আমি ডেমা (৯) খাইবার আশে ;
চিতরা (১০) বাঘে পাইয়া মোরে লেজে ধরি টানে।
খাইলায় খাইলায় আরে বাঘা তাতে নাই মোর ডর ;
গিরস্থে তুকাইয়া (১১) মরব রাত্রি আড়াই পহর।
তুকাইয়া তাকাইয়া গিরস্থ তুলিয়া দিব গালি ;
গিরস্থের যত ছামান (১২) পুড়িয়া হইব ছালি (১৩)।

গ্রাম্য অশিক্ষিত কবির মনের ভাব চলতি ভাষার মধ্য দিয়াও কেমন সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহা গোজাতির প্রভুভক্তি ও পরোপকারিতার একটি সুন্দর চিত্র। গরু জঙ্গলের ঘাস খায়, গৃহস্থের কিছুই ধারে না, তথাপি সেই গৃহস্থের জন্য নিঃস্বার্থভাবে ধান ফলায়, দুধ দেয়, এমন কি নিজে বিক্রী হইয়াও মালীকের মুস্কিল আসান করে; শুধু তাই নয়, প্রভুর মনস্তুটির জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। বাঘে লইয়া যাইতেছে তাহাতে দুঃখ নাই, গৃহস্থ যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইবে সেই ভাবনাতেই আকুল। না পাইয়া গালি দিলে পর নিজের মালীকের অমঙ্গল হইবে, মৃত্যুর প্রাক্কালেও সেই চিন্তাতেই গরু অস্থির !

উপরোক্ত গানটি আমাদের বাবুর্চির গাহিবার সময় লিখিয়া লওয়া হইল।

শ্রীরশিদআলী লস্কর।

(১) গাভীর, (২) ছেলেপুলে, (৪) সজোরে লাঙ্গল দেওয়া, (৩) বুক, (৭) লাফদিয়া, (৬) রক্ত, (৮) দুর্ভিক্ষ, (৯) নূতন গজান বন, (১০) ডোরাওয়ালা, (১১) তালাস করা, (১২) ধন, (১৩) ছাই।

আলোচনা

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।

এলাহাবাদ-প্রবাসী সুলেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় বিগত চতুর্দ্দশ বৎসর যাবৎ প্রবাসী-পত্রিকায় প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠাভাজন ও বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর সেই-সকল কীর্ত্তি-কাহিনী সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত ও বাঙ্গালী পাঠকের প্রাণে আনন্দধারা প্রবাহিত করিয়াছে।

কিন্তু এই সুবৃহৎ পুস্তকে যে কোন ভ্রমপ্রমাদ থাকিবে না ইহা কখনও আশা করিতে পারা যায় না এবং এই আশঙ্কা করিয়াই গ্রন্থকার পুস্তকের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন "যাঁহারা কৃপা করিয়া এই পুস্তককে নির্ভুল দেখিবার জন্য ইহার অন্তর্গত ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিবেন তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।"

প্রায় ১৬ বৎসর হইল আমরা সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে দিল্লী-প্রবাসী হইয়াছি। দিল্লীতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে তন্মধ্যে "বঙ্গসাহিত্য-সভা" অন্যতম। দ্বাদশবর্ষ হইল এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিল্লী-প্রবাসী বাঙ্গালীদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছে। এই সভার অস্তিত্বের কথা এবং ইহার অনুষ্ঠিত কোন কোন কার্য্য সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি জ্ঞানেন্দ্র বাবু তাঁহার পুস্তকে এই সভার কথা অতি যৎসামান্যই উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে দুচার কথায় এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন তাহাও ভ্রমপরিপূর্ণ। এই ভ্রম অপনোদনের জন্য এবং দিল্লী-বঙ্গসাহিত্য-সভার প্রকৃত সংবাদ সাধারণের অবগতির নিমিত্ত আমরা উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "বাবু যতীন্দ্রনাথ মিত্রের যত্নে ও উৎসাহে এখানে (দিল্লীতে) বান্ধব-সমিতি নামে একটি মিলনস্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বান্ধব-সমিতিতে পুস্তকালয় ও পাঠাগার ব্যায়াম-শালা সঙ্গীতসভা এবং নির্দ্দোষ আমোদ ও প্রীতিভোজনের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পুস্তকবিভাগ ও পাঠগোষ্ঠী পূর্ব্বোল্লিখিত বঙ্গসাহিত্য-সভা নামে অভিহিত।"

এই বৃত্তান্তটি অতীব মনোমোহন ও শ্রুতিসুখকর হইলেও ইহার মধ্যে অতি অল্পই সত্য নিহিত আছে। বান্ধবসমিতি নামে একটি সঙ্গীত-সমিতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির যত্নে এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে কিন্তু উহার সহিত বঙ্গসাহিত্য-সভার কোন সংশ্রব ছিল না। বান্ধবসমিতি ১৯০১ সালের শ্রীপঞ্চমীর সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়া নগরের রাজপথে সঙ্গীতের মিছিল বাহির করিয়া বাঙ্গালী ও এদেশবাসীদিগের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতে উহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং অচিরেই উহার অস্তিত্বের বিলোপ সাধিত হয়।

বঙ্গসাহিত্য-সভা তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই, আর বান্ধবসমিতির ব্যায়ামশালা পাঠাগার প্রভৃতি কোন শাখা বর্ত্তমান ছিল না। সে সময় প্রবাসী-পত্রে শ্রীজীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রের লেখক ও উহার বিবরণ উভয়ই প্রায় সম্পূর্ণ-কাল্পনিক। জ্ঞানেন্দ্র বাবু এই পত্রের বিষয়ীভূত বৃত্তান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সে সময় উক্ত পত্রের একাধিক প্রতিবাদপত্র প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ঘোর বাক্‌বিতণ্ডা আশঙ্কা করিয়া কেবলমাত্র

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরিত একখানি পত্র পত্রিকায় করিয়া অতঃপর আর কোন পত্র প্রকাশিত হইবে না বলিয়া এ প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত লর্ড কর্জ্জনের দিল্লী দরবারের অব্যবহিত পরেই দিল্লী বঙ্গসাহিত্য-সভা ও তৎসংশ্লিষ্ট পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা তদানীন্তন ডেপুটী কণ্ট্রোলার আফিসের (এখন Office of Deputy Accountant General Post Office and Telegraphs) কর্ম্মচারী—শ্রীযুক্ত নবগোপাল ভট্টাচার্য্য, অবিনাশচন্দ্র দত্ত, নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক ও অমূল্যধন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ও এখানকার হরিসভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় এবং জানকীনাথ সাহা, সুরেন্দ্রনাথ সাহা, শরদিন্দুপ্রকাশ মিত্র, অনাদিকৃষ্ণ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সূর্য্যকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সভ্যগণের যত্নে সংস্থাপিত হয়। এই সভার সভ্যসংখ্যাও অধিক নহে এবং দু একজন কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার ও উকীল ভিন্ন ইহার অধিকাংশ সভ্য সামান্য ব্যক্তি—আফিসের কর্ম্মচারী মাত্র। তথাপি এই সভার উদ্যোগে এখানে বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চার যে একটা আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সভা দিল্লী-প্রবাসী বাঙ্গালীদের মুখপাত্র হইয়া কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনস্বীগণের পরলোক গমন উপলক্ষে স্মৃতি-সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহাদের চরিতমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া জীবনের উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই সভার সাধারণ অধিবেশনে উপযুক্ত লোকের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির দ্বারা প্রবাসী বাঙ্গালীর চিত্তবিনোদন ও তাঁহাদের হৃদয়ে প্রীতি ও সদ্ভাব সঞ্চার করিতে এই সভা চিরদিনই যত্নশীল রহিয়াছে।

সম্প্রতি দুই বৎসর হইল এখান হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে ভারত গভর্মেণ্টের ভারতীয় কর্ম্মচারীবৃন্দের নিবাসস্থলে (Indian Clerks Quarters) মহা সমারোহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু উহার দূরত্বনিবন্ধন উহাতে যোগদান করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গসাহিত্য-সভাই এখানকার বাঙ্গালীদিগের সাহিত্যচর্চ্চার একমাত্র স্থান রহিয়াছে।

বরিশাল জেলা নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় বর্ত্তমানে এই সভার সম্পাদক।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক,
সহকারী সম্পাদক বঙ্গসাহিত্য-সভা, দিল্লী।

প্রবাসীতে নূতন বানানের প্রবর্ত্তন।

প্রবাসীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে একটি নূতন বানান দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। সকলেই "শোয়া" (শয়ন করা), "খোয়া" (হারাইয়া যাওয়া), "গোয়াল" লিখিয়া থাকেন। কিন্তু কয়েক মাস হইল সম্পাদকীয় একটা বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছিলাম যে "খো আ" লিখিত হইয়াছে। আবার গত পৌষ মাসের প্রবাসীতে Nasirwanji নামটা বাঙ্গলায় "নসিরওআন্জী" রূপে লিখিত হইয়াছে। মাঘ মাসের প্রবাসীতে "খাওআ দাওআ" আছে। চারি পাঁচ বৎসর হইল আমি এইরূপ বানানের প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় আপত্তি করিয়া ঢাকা রিভিউতে লিখিয়াছিলেন ও-কারের গায়ে আকার দিয়া অশিক্ষিত লোকেরাই লিখিয়া থাকে, সুতরাং সেরূপ বানান করা কখনই উচিত নহে। এখন যখন বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান সাহিত্যিক পত্রিকার সম্পাদক উক্তরূপ বানান আরম্ভ করিয়াছেন তখন বোধ হয় বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার আপত্তি প্রত্যাহরণ করিবেন। বাস্তবিক ওকারের গায়ে আকার জুড়িয়া দেওয়ায় কি দোষ হয় তাহা বুঝা যায় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে এ, ঐ, ও এবং ঔ এই চারিটি যুক্ত স্বর অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকটাই দুইটা স্বরের সংমিশ্রণ। লাটিন ভাষায়ও এরূপ সংমিশ্রণ আছে। সেগুলিকে dipthong এবং tripthong বলে। তাহা হইলে বাঙ্গলায় সেরূপ বানান প্রচলনের ত কোন যুক্তি-মূলক আপত্তি হইতেই পারে না।

সম্পাদক মহাশয়কে আর একটি নূতন বানানের বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। ইংরেজীতে যে সকল শব্দে st আছে বাঙ্গলায় সেই সকল শব্দ বর্ণান্তরিত করিবার সময়ে ষ্ট লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমার বিবেচনায় তৎস্থলে স্ট হওয়া উচিত। হিন্দীতে স্ট লেখা হয়। বাঙ্গলায় কেবল খৃষ্টিয়ান মাসিকপত্রিকা "বান্ধবে" কখন কখন স্ট দেখিয়াছি।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

সম্পাদকের মন্তব্য—আমরা অ ও য় অক্ষরের উচ্চারণ পৃথক রাখিবার জন্য খোআ গোআলা লিখি। ইংরেজীতে W কখনো স্বর, কখনো ব্যঞ্জন এবং কখনো বা যুক্ত স্বর রূপে ব্যবহৃত হয়; হিন্দীতে ও সংস্কৃতে অন্তস্থ ব আছে; বাংলায় পেটকাটা ব চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু দুই ব এক প্রকার উচ্চারণ করিয়া অভ্যস্ত আমরা পেটকাটা সত্ত্বেও ব-এর উচ্চারণ W-এর মতন করিতে ভুলিয়া যাই। তাহার একমাত্র প্রতিকার W-সম উচ্চারণের স্থলে ও ব্যবহার—ও কখনো স্বর, কখনো ব্যঞ্জন, কখনো যুক্তস্বর রূপে উচ্চারিত হইবে। প্রাচীন বাংলায় এরূপ ব্যবহার ছিল। স্ট লিখিতেও কোনো আপত্তি নাই, কেবল ছাপাখানায় হরপের অভাব বাধা; লিখিতে হইলে নূতন হরপ তৈরি করাইতে হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে মঙ্গোলীয় প্রভাব।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত সাংখ্য জৈন ও বৌদ্ধ-মত সম্বন্ধে অভিনব সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও অপরাপর লেখক যে সমালোচনা করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সে সম্বন্ধে আপত্তির কয়েকটি কারণ উপস্থিত করিয়াছেন।

এ বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একথা বলা আবশ্যক যে আমরা আর্য্য না হইয়া মঙ্গোলীয় হইলেই যে আমাদের মর্য্যাদাজ্ঞানে কোনও একটা গুরুতর আঘাত পড়িতে হইবে একথা আমি স্বীকার করি না। আর্য্যজাতি অতীতকালে ভারতবর্ষে যতই গৌরবান্বিত হউন না কেন, আর্য্য হইলেই যে কোনও জাতি অসম্ভব মহৎ হইয়া পড়িবে আর অনার্য্য হইলেই যে তাহারা একেবারে অবনতির পাঁকে ডুবিয়া থাকিবে এমন কোনও কথা ইতিহাসে বা বর্ত্তমান জগতে পাই না। ভারতের আর্য্যগণ যখন দ্রবিড় মঙ্গোল ও শক জাতীয় ও পরবর্ত্তীকালে নানা জাতীয় মুসলমান বিজেতৃগণের পদতলে দলিত হইতেছিলেন তখন যে তাঁহারা আর্য্য বলিয়াই শ্রেষ্ঠ ছিলেন একথা বলা চলে না। আর ব্যাবিলোনীয় বা আসিরিয়গণ কিম্বা ইজিপ্টবাসী বা মঙ্গোল জাতীয় জাপানীদের বিষয়ে অনার্য্য বলিয়াই যে সকল আর্য্য জাতির কাছে মাথা নত করিয়া থাকিতে হয় তাহা বোধ হয় কেহ বলিতে স্পর্দ্ধা করিবেন না। আমরা আর্য্য হই বা মঙ্গোলীয় হই তাহাতে আমাদের বর্ত্তমানের হিসাবে কিছুই লাভ ক্ষতি নাই। যদি বাঙ্গালী

হিন্দু বা ভারতবাসী হইয়া আমরা নিজেদের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে পারি তবেই আমরা বড়; আর তাহা না পারিলে শ্রেষ্ঠ আর্য্যকুল হইতে আগাগোড়া অনিন্দ্য বিবাহপ্রসূত বংশে উৎপন্ন হইলেও আমাদের কিছু মান বাড়িবে না। তা ছাড়া ধার করিয়া কোনও জ্ঞান পাইলে যে কোনও জাতি উত্তমর্ণ অপেক্ষা খাটো হইবেই একথা মনে করা বাতুলতা। সুতরাং আমরা আর্য্য না মঙ্গোলীয় বা আমাদের কোন্ মতটি আর্য্যদের কোন্‌টি বা মঙ্গোলীয়দের, সে কথা আলোচনা করিতে জাতীয় গৌরবের কোনও কথা উঠিয়া আমাদের তর্ক ও যুক্তিকে অভিভূত না করিয়া ফেলিলেই ভাল হয়।

আরও বলা আবশ্যক যে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে ঋগ্বেদের সময় হইতে চিরকাল আর্য্যসমাজ আর্য্যেতর নানাজাতির সহিত সংস্পর্শে আসিয়া নানা মত ও নানা সামাজিক বিধি সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং কাপিল দর্শন বা বৌদ্ধমতের মূলসূত্র যে আমাদের মঙ্গোলীয়দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব তাহা আমি মনে করি না।

কিন্তু এ-সমুদয় আলোচনায় প্রমাণের ভার (onus of proof) কাহার উপর? বেদপন্থীদিগের গ্রন্থে যে-কোনও মতবাদ আছে তাহাই যে বৈদিক তাহা বলা চলে না সত্য। কিন্তু অন্য প্রমাণাভাবে তাহাকে অবৈদিক ধরিয়া লইবার অধিকার আমাদের নাই। বরং তাহা বিরুদ্ধপ্রমাণাভাবে বৈদিক বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। যিনি বলিতে চান যে এইরূপ কোনও একটি মত বৈদিক নয় তাঁহাকে তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। প্রমাণ করিতে হইলে যেখানে ধার করার কোনও স্পষ্ট প্রমাণ নাই সেখানে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে (১) আলোচ্য মতটি বৈদিক হওয়া অসম্ভব, (২) বৈদিক সমাজের বাহিরে কোথাও তাহার অস্তিত্ব আছে, (৩) যে অবৈদিক সমাজে সে মতের অস্তিত্ব আছে তাহার সহিত বেদপন্থী সমাজের সংযোগের কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বা সম্ভাবনা আছে।

সাংখ্যমত বা শাক্যমত বৈদিক কি অবৈদিক, তাহা আর্য্য না মঙ্গোলীয় তাহা বিচার করিবার যোগ্যতা আমার নাই। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রবন্ধের প্রমাণাবলী আলোচনা করিয়া আমরা প্রথমতঃ দেখিতে পাই যে যদিও মঙ্গোলীয় সমাজের সহিত শাক্যমতের সংযোগ থাকা অসম্ভব নয় তথাপি কপিলমতের সহিত মঙ্গোলীয় মতের সেইরূপ সংযোগের সুবিধার কোনও প্রমাণ নাই। দার্শনিক কপিল ঋষির নাম ঋগ্বেদে আছে; কোনও কোনও উপনিষদে সাংখ্যমতের স্পষ্ট ছায়াপাত দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ আধিপত্যের পূর্ব্বে রচিত প্রাচীন যে-সমুদয় গ্রন্থ (যথা কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র") তাহাতে অপরাপর দর্শনের অস্তিত্বের পরিচয় না থাকিলেও সাংখ্য যোগ ও লোকায়ত দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বিদ্যা বলিয়া উল্লিখিত আছে। এইরূপ প্রাচীন কালে আর্য্যজাতির সহিত মঙ্গোলীয় জাতির সংযোগের কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, মঙ্গোলীয় সমাজে কুত্রাপি কপিলমত বা শাক্যমতের প্রাচীন কালে অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ শাস্ত্রীমহাশয় উপস্থিত করেন নাই। তৃতীয়তঃ, যে-সমুদয় মত বা অনুষ্ঠান তিনি অবৈদিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অবৈদিকতা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত ব্যতীত অপর কোনও প্রমাণ তিনি দেন নাই। কোনও বস্তুর ভাবের প্রমাণ অপেক্ষা অভাবের প্রমাণ বহুলপরিমাণে কঠিন, শাস্ত্রীমহাশয় যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা অভাবের প্রমাণ পদবাচ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও অপরাপর পণ্ডিতগণ যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে এই-সমুদয় মত ও অনুষ্ঠানের বৈদিক সমাজে সত্তার স্পষ্ট প্রমাণ না হইলেও একটা খুব স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়।

বিজয় বাবুর আপত্তি এই যে যে-সমুদয় গ্রন্থ হইতে উত্তরপক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা যে কপিল, মহাবীর ও বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং তাহাতে এই-সমুদয় মত ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ থাকিলেও, এই-সমুদয় গ্রন্থ যে সাংখ্য ও বৌদ্ধমত হইতে এগুলি ধার করেন নাই একথা বলা চলে না।

এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে প্রমাণের ভার পূর্ব্বপক্ষের উপর। যাঁহারা বেদপন্থী গ্রন্থোক্ত কোনও মত বা অনুষ্ঠান ধার করা বলিতে চান তাঁহারা এস্থলে যে পূর্ব্বপক্ষ তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ, যাহা বেদসংহিতায় নাই অথবা সংহিতার কোনও বিশেষ বচনের বিরোধী তাহাই যে অবৈদিক এ কথা বলা চলে না। বৈদিক সমাজের মধ্যে যে-সমস্ত আচার অনুষ্ঠান ও মতামত ছিল তাহার সমস্তই যে বেদের মন্ত্রে বা উপাখ্যানে ধৃত হইয়াছে এরূপ মনে করা বাতুলতা। রোম গ্রীস প্রভৃতি যে-সমস্ত দেশের ধর্ম্ম ও ব্যবহারের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত সুপরিজ্ঞাত সেখানকার ইতিহাসে এ কথার প্রচুর প্রমাণ আছে যে এক-একটি আচার অনুষ্ঠান অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই এবং অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীনকালে তাহা কোনওরূপ গ্রন্থে বা ব্যবস্থাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহেরিং (Ihering) এইরূপ হওয়ার দুইটি প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; প্রথমতঃ যাঁহারা প্রাচীনকালে গ্রন্থ লিখিতেন তাঁহারা লিখিতেন সমসাময়িকদের জন্য, পরবর্ত্তীগণের জন্য নহে; তাই যাহা সকলের কাছে সুপ্রসিদ্ধ তাহা তাঁহারা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বোধ করিতেন না। দ্বিতীয় কারণ প্রাচীনকালের লোকেদের অশক্তি। একদিকে তাঁহাদের সমসাময়িক আচার অনুষ্ঠান লক্ষ্য করিবার শক্তির (Beabachtungsgabe) ত্রুটি ছিল। অপরদিকে তাঁহাদিগের নিজেদের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিবার শক্তি (Darstellnugstalent) আমাদের অপেক্ষা অনেকটা নিকৃষ্ট ছিল। তাহা ছাড়া আমাদের সুদূর অতীত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের একটা প্রধান অন্তরায় এই যে বেদের সমুদয় গ্রন্থ আমরা পাই নাই। লুপ্তশ্রুতি সম্বন্ধে মীমাংসকেরা অনেকটা বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, কিন্তু কতকটা শ্রুতি যে লুপ্ত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই-সমুদয় কারণে বেদসংহিতাগুলিতে কোনও আচার বা অনুষ্ঠানের পরিচয় নাই বলিয়াই যে সে আচার বা অনুষ্ঠান অবৈদিক তাহা প্রমাণ তো হয়ই না, সেরূপ কোনও সম্ভাবনাও জন্মে না।

বেদের কোনও বচনের বিরুদ্ধ কোনও আচারও যে অবৈদিক হইতেই হইবে এমন কথা বলা চলে না। বেদ একজনের রচনা নয়, যুগ যুগ ধরিয়া আর্য্য-সমাজে যে-সমুদয় রচনা নানা স্থলে উদ্ভূত হইয়া লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, বেদসকল তাহার সমষ্টি মাত্র। বলা বাহুল্য এপ্রকার রচনায় যে পরস্পর বিরুদ্ধতা থাকিবে তাহা স্বাভাবিক, এবং এরূপ বিরুদ্ধতা আছেও অনেক। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক মত কোনও কালে একমত ছিল না, তাহা নানা মতের সমষ্টি; শাখাভেদ ও পরবর্ত্তীকালে চরণভেদে বেদপন্থীদিগের ভিতর আমরা যেপ্রকার মতভেদের নিদর্শন পাই তাহার আদি আমরা বেদসংহিতায়ই দেখিতে পাই। সুতরাং বৈদিক কোনও একটি বচনের বা একশ্রেণীর বচনের বিরুদ্ধ হইলেও কোনও বৈদিক গ্রন্থধৃত আচারকে নিশ্চয়রূপে অবৈদিক বলা চলে না।

তৃতীয়তঃ, কল্পসূত্রগুলি প্রাচীন হউক বা অর্ব্বাচীন হউক তাহাতে যে বৈদিক সমাজের আচার অনুষ্ঠান ও তাহাদিগের স্বাভাবিক পরিণতিজাত আচারাদি প্রধানতঃ রক্ষিত হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিজয় বাবুর কাছে এ সম্বন্ধে বুলার (Buhler) ইয়াকোবি (Jacobi) ইয়োলির (Jolly) মত বলিয়ে

চলিবে না, কেননা "স্বয়ং পণ্ডিত হরপ্রসাদকেই অনেক ইয়াকোবির বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে পারা যায়।" কিন্তু বুলার ইয়োলি প্রভৃতি যে-সমুদয় যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া তাঁহাদের নামোল্লেখ দ্বারা তাহার ইঙ্গিত করা বোধ হয় বৃথা নহে।

এই-সমুদয় শাস্ত্রগ্রন্থ কি প্রকারে রচিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আমরা যে ইঙ্গিত পাই তাহাতে এই সিদ্ধান্ত সম্ভব বলিয়া মনে হয়। সমুদয় প্রমাণ আলোচনা করিয়া ইহা দেখা যায় যে আর্য্য-সমাজে পণ্ডিতগণ ধর্ম্মের নিয়ন্তা ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্ম ও আচার বিষয়ে ব্যবস্থা দিতেন এবং বিবাদের বিষয় বেদজ্ঞদিগের পরিষদে নির্ণীত হইত। বেদজ্ঞগণ বেদকে ধর্ম্মের প্রমাণ জানিয়া বেদের অবিরুদ্ধ আচার-সকল বৈদিক বিধির সহিত মিলাইয়া ব্যবস্থা দিতেন। কল্পসূত্রগুলি এই-সমুদয় পরিষদের ব্যবস্থিত ধর্ম্মের সংগ্রহপুস্তক। সুতরাং এগুলি হয় বৈদিক আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা তাহার স্বাভাবিক পরিণতি একথা অনুমান করা যাইতে পারে।

আর্য্যেতর জাতির সহিত সংস্পর্শ এবং তজ্জনিত ধর্ম্ম ও আচারের পুষ্টি যে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ বেদেই আছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের একথা ভুলিলে চলিবে না যে আচার ও ধর্ম্মের একটা স্বাভাবিক পরিণতি আছে। বাহির হইতে কোনও রূপ আঘাত না পাইলেও সমাজ আপনি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সময়ের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যাঁহারা অণুবীক্ষণ লইয়া আর্য্য ধর্ম্ম ও আচারের উপর আর্য্যেতর জাতির ধর্ম্ম ও সমাজনীতির ছায়া অনুসন্ধান করেন তাঁহারা এই স্বাভাবিক পরিণতির কথাটা প্রায়ই হিসাবে ধরেন না। কোনও একটা ব্যাপার একটু নূতনতর হইলেই যে সেটা বাহির হইতে আসিয়াছে এ কথা অনুমান করিবার কারণ নাই। সামাজিক বিধিব্যবস্থা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত সংঘাতে এবং পরিবর্ত্তিত সামাজিক অবস্থার পেষণে বাহির হইতে কোনও আঘাত না পাইয়াও আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে যে বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা "মধ্যমা প্রতিপৎ", নগ্নতা, মলধারণ, ভূমিশয়ন প্রভৃতি, সেগুলি বৈদিক সমাজে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারেই সৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারে, এই সব তুচ্ছ পরিবর্ত্তন পরের কাছে ধার করা কোনও সমাজের দরকার বলিয়া মনে হয় না।

চতুর্থতঃ, গৃহ্যসূত্র (অথবা ধর্ম্মসূত্র) গুলিকে কপিল মহাবীর বা বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণ করা যায় না বিজয় বাবু এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি যে-সকল যুক্তি দিয়াছেন তাহা প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত না করিলেও তাহা হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার মতে কতকটা এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই যুক্তিগুলির ভিতর অনেকগুলি দোষ আছে। তাঁহার প্রথম যুক্তির মূল চরণব্যূহ। এখানি অতি অর্ব্বাচীন গ্রন্থ এবং পরবর্ত্তীকালের ঘটকদিগের গ্রন্থ অপেক্ষা প্রমাণ হিসাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মোটে ধরা যায় না। চরণব্যূহে মহার্ণব নামক এক গ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে—এখানি বোধ হয় "স্মৃতিমহার্ণব"। এ অনুমান সত্য হইলে চরণব্যূহ খৃষ্টীয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারে না। বিজয় বাবু গৌতম বৌধায়নাদিকে বৈদিক সমাজের বিধি সম্বন্ধে প্রমাণ স্বীকার করিতে চান না, তাঁহার পক্ষে চরণব্যূহের আশ্রয় গ্রহণ আশ্চর্য্য। খৃষ্টীয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর একখানি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী ও খাদিরসূত্র দক্ষিণাপথের আর্য্যদিগের জন্য রচিত। ইহা হইতে এ কথা প্রমাণ হয় না যে তাহাদিগের রচনা-বিষয়ে এই উক্তি সত্য। চরণব্যূহ-রচয়িতার সমসাময়িক কালে এই গ্রন্থত্রয় দক্ষিণাপথে প্রচলিত ছিল এবং একটা প্রবাদ জন্মিয়াছিল যে সে গ্রন্থ তাহাদিগের জন্য রচিত হইয়াছিল, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই ইহা হইতে প্রমাণ হয় না। আর দক্ষিণাপথে যে অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণ ছিল না, ইহার যে প্রমাণ আছে তাহা আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যদিগের রচনা। দক্ষিণাপথ সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তি যে অনেক স্থলেই অবিশ্বাসযোগ্য কলিঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তি হইতেই তাহা প্রমাণ হয়। অন্ধ্র ব্রাহ্মণগণ উত্তর দেশ হইতে আসিয়া অন্ধ্র দেশে উপনিবেশ স্থাপন করাই সম্ভব। যদি কেহ বলে যে তাঁহারা সেখান হইতেই আপস্তম্বসূত্র লইয়া আসিয়াছিলেন তবে তাহার উত্তরে কেবল ইহাই বলা যায় যে শুধু অন্ধ্র দেশেই আপস্তম্বীয় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও অসম্ভব নয় যে উত্তর দেশে আপস্তম্বীয় ব্রাহ্মণগণের ভিতরে আপস্তম্বের ব্যবহার নানা কারণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সুদূর অন্ধ্র দেশের ব্রাহ্মণগণ সেই-সমস্ত অবস্থার আঘাত অনুভব করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের ভিতর আপস্তম্ব এখনো জীবিত রহিয়াছেন।

আপস্তম্ব নিজেকে "অবর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছুই প্রমাণ হয় না। তিনি বলিয়াছেন যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সেকালে হইত, এখন আর হয় না। তবে শ্বেতকেতুর ন্যায় কেহ কেহ শ্রুতর্ষি হইয়াছেন। ইহা হইতে যদি কিছু প্রমাণ হয় তবে তাহা এই যে আপস্তম্ব যে সময় জীবিত ছিলেন তখন উপনিষদের উল্লিখিত শ্বেতকেতুকে আধুনিক বলা চলিত, এবং শ্বেতকেতুর উপাখ্যানযুক্ত উপনিষদ্ তখনও শ্রুতি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। এ হিসাব ধরিলে আপস্তম্বকে নিতান্ত অর্ব্বাচীন বলা চলে না।

তাহা ছাড়া আপস্তম্বের গ্রন্থে এমন অনেক নিয়ম ও ব্যবস্থা আছে যাহা এমন কি গৌতমাদির গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন স্তরের বলিয়া অনুমান হয়। নিয়োগ ও ক্ষেত্রজ পুত্র সম্বন্ধে আপস্তম্বের বিধান মন্বাদি অর্ব্বাচীন স্মৃতির বিরুদ্ধ, এবং আমার বিবেচনায় আপস্তম্বের প্রাচীনত্বের নিদর্শন।

বৌধায়নের ভিতর অবৈদিক প্রভাবের প্রমাণস্বরূপ বিজয় বাবু বলিয়াছেন, "খাঁটি বৈদিক অনুষ্ঠান প্রাচীনকাল হইতে যেরূপভাবে চলিয়া আসিতেছিল, কেবল তাহাই যদি নিঃসন্দেহে বৌধায়ন লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে হয় তো কথা হইত না; কিন্তু তিনি যখন অন্যবিধ মতবাদের উল্লেখ ও বিচার করিতে ছাড়েন নাই, তখন তাঁহার গ্রন্থকে অবিকৃত বৈদিক পদ্ধতিসংগ্রহ বলিতে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইতে হয়।" বৈদিক পদ্ধতি বলিতে যদি কেবলমাত্র বেদের লিখিত পদ্ধতি না ধরি তবে এ কথার ভিতর কোন যুক্তি নাই বলিতে হয়। বৈদিক অনুষ্ঠান "প্রাচীনকাল হইতে" কোনও এক ভাবে চলিয়া আসিতেছিল এ কথা মীমাংসকদিগের একটা legal fiction—ইহার কোনও প্রমাণ নাই, বিরুদ্ধ প্রমাণ যথেষ্ট আছে। বেদের শাখাভেদ গোভিলাদি গৃহ্যসূত্রের অপেক্ষাও অনেক প্রাচীন। শাখাভেদ অনুসারে যে আচার অনুষ্ঠানাদির ভেদ হইত তাহার প্রমাণ অতিপ্রাচীন গৃহ্যসূত্রে আছে। বেদের ভিতরই পরস্পরবিরুদ্ধ আচারের প্রমাণ আছে এবং সে-সকল স্থানে মীমাংসকেরা বিকল্পের ব্যবস্থা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং চিরকালই যে বৈদিক আর্য্যসমাজে দেশ-কাল-জন-জন্ম-ভেদে সামাজিক বিধি-বিষয়ে মতভেদ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাখা ভেদের পরও ক্রমে সমাজের ভিতর নানা কারণে ভেদের সৃষ্টি হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিষদে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; সেই-সমুদয় ভেদের প্রবর্ত্তক ও নিয়ামক এই-সমুদয় কল্পসূত্র, এবং এই-সমুদয় ভেদ হইতেই চরণভেদের সৃষ্টি। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন চরণের প্রামাণিক গ্রন্থে যে পরস্পরের মত কাটাকাটি হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রগুলিতে বিরুদ্ধমত খণ্ডিত আছে বলিয়াই যদি সেই

বিরুদ্ধ মতকে অনার্য্যমত বলিতে হয়, তবে রোমীয় ব্যবহারশাস্ত্রে Proculean এবং Sabinian সম্প্রদায়ের গ্রন্থে যে-সমুদয় পরস্পরের মত খণ্ডন আছে তাহা হইতে রোমক সাম্রাজ্যে জার্মান জাতির ব্যবহার সমুদ্ভূত মতের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

ফাল্গুনী

শুভ্র বালুতীরে সমুদ্রের কালো জলে সাদা ঢেউগুলির বারে বারে ফিরে ফিরে এসে আষাঢ়ের সঙ্গে শীতের শেষে বৎসরে বৎসরে আমাদের মাঝে সুদূর শান্তিনিকেতনের এই শুভ্র শিশুগুলির আসা যাওয়ার একটা সাদৃশ্য। এল তারা, ক্ষণিকের জন্য আপনাদের লীলা-চঞ্চল সঙ্গীত-মুখর অবিশ্রান্ত হিল্লোলিত জীবনের সমস্ত আনন্দ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা আমাদের সমস্ত শুষ্কতা সকল পিপাসার উপরে—কূলের বালি ওতঃপ্রোত হয়ে মিশে গেল জলের খেলায়।

আর আজ দেখলেম তারা ফিরে চলেছে সেই শুভ্র তরঙ্গটি গভীর যেখানে অসীম যেখানে ব্যক্ত করছেন আপনাকে আকাশের সুনীল পরিসরে তপোবনের গভীরতম নীরবতায়।

যাবার বেলায় এবারে এই যে শিশুদল রেখে গেল আমাদের কর্ম্মজীবনের দৈন্যতা শুষ্কতার উপরে একটি সজল শীতল প্রলেপ এটা কি আমরা ভুলতে পারি? এটি আমরা কোন পেষাদার রঙ্গব্যবসায়ীর কাছ থেকে যে পেতে পার্ত্তেম না সেটা নিশ্চয়!

ফাল্গুনীর সৃষ্টি হয়েছে, এদেরই নূতন জীবনের নব বসন্তের আব হাওয়ায়, এদের তরুণ কণ্ঠ ফাল্গুনের আরম্ভে আমাদের প্রাণে যে সুরটি দিয়ে গিয়েছে সেটা তো কোন ওস্তাদের দ্বারায় বা সুপরিপক্ক অভিনেতার দ্বারায় দেওয়া সম্ভব হোতো না! সত্যই বেণুযষ্টিখানির মত দখিন হাওয়ার যথার্থ সাড়াটি এরাই যে পাচ্ছে, প্রাণের গানের ঢেউ পেয়ে এদেরই কচি কচি শাখা পল্লব যে দুলে উঠছে ফুটে উঠছে ঋতু থেকে ঋতুর মধ্য দিয়ে! কেবল ঐক্যতান বাদ্যের তুরী ভেরীর রব দিয়ে এদের তরুণ গলার মধুরতা যে আরো মধুর করে তোলা যায় এটা এক খবরের কাগজের বাঙ্গালী সমালোচক ছাড়া আর কারো ধারণার অতীত!

এদের অভিনয়ে যেটা কাঁচা অপরিণত সেটাকে যে এরা পরিপূর্ণ করে তুলেছিল রসে ভরে দিয়েছিল নবীনতার মাধুরী দিয়ে নূতন প্রাণের উচ্ছ্বাস দিয়ে!

পাকামির সুদৃঢ় বাঁধ দিয়ে কৃত্রিমতার অশোভন ভঙ্গিমা দিয়ে কচি ছেলেদের এই অবাধ আনন্দটুকু যারা নষ্ট করে' দিতে পরামর্শ দিচ্ছে সেই-সকল জীর্ণপন্থীদের জন্য কাগজের মুকুটই প্রশস্ত, নবমল্লিকার মালা নয়।

একটা দোদুল দোলার মাঝে, বেণুবনের একটুখানি শিহরণ দিয়ে ফাল্গুনের আরম্ভ হচ্ছে, আর একটা নব-জাগ্রত নবীন প্রাণের আয়রে তোরা আয়রে আহ্বানে তার শেষ হচ্ছে! এরি উপরে নীলাকাশ আপনার চন্দ্র-তারকা নিয়ে অতন্দ্র স্থির রয়েছে অনন্তকাল ধরে! বিশ্ব-রাজের সভায় নবীন সে আপনাকে নানা ছলে প্রকাশ কচ্ছে ফাল্গুনী চিত্রের এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। চতুষ্পদী জাতির তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা তাঁদেরই জন্য, যাঁরা বুড়োরও বুড়ো, যাঁদের কাছে আর সব খবর পৌঁছয় আসল খবরটি ছাড়া।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুস্তক-পরিচয়

পল্লীছায়া—শ্রীরোহিণীকুমার গণ প্রণীত। মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ৩৪ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ৪৩ পৃষ্ঠা। ছয় আনা।

পল্লীর পূর্ব্বশ্রীর সঙ্গে বর্ত্তমান হীনদশার তুলনা করিয়া পল্লীবাসীর দৈহিক নৈতিক মানসিক আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশা অমিত্র পদ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে কবিত্ব অপেক্ষা উচ্ছ্বাস বেশী, যুক্তি উপদেশ অপেক্ষা বক্তৃতা বেশী হওয়াতে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পথে বিঘ্ন জন্মিয়াছে। তথাপি আশা করি সাধু উদ্দেশ্য একেবারে নিষ্ফল হইবার নয়।

পূজা—নন্দিনী-সম্পাদক শ্রীআশুতোষ মহলানবীশ প্রণীত। ৩১ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা। শিবপুর, হাবড়া। সচিত্র।

পূজা বলিতে আমরা দুর্গাপূজা দুর্গোৎসবকেই বুঝি। সেই পূজা যে সঙ্কীর্ণ নয়, কোনো প্রতিমা-বিশেষের পূজা নয়, সে পূজা যে সকল ধর্ম্মেরই কেন্দ্রগত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবেরই পূজা।—"দেশ পরাধীন থাকুক, সমাজ যেমন ইচ্ছা তেমন পরিবর্ত্তিত হউক, তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারিলে সর্ব্বজগৎ আমার স্বদেশে পরিণত হইবে, সর্ব্বজীব লইয়া আমার সমাজ গঠিত হইবে"—এ পূজা তেমনই পূজা। আমরা এই পূজাকে "প্রহসন" করিয়া তুলিয়াছি। পূজার জন্য জীবনকে প্রস্তুত করিতে হইবে, আপনাকে বিশুদ্ধ পূজারী করিবার সাধনা করিতে হইবে।

এই কথাগুলি ভাবোচ্ছ্বাস দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায়

জড়াইয়া এই পুস্তিকার প্রকাশ করা হইয়াছে। লেখক পূজার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সৎসঙ্গ—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দাসঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। হরিনাভি বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরী, সোনারপুর পোষ্টঅফিস ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। ডঃ ক্রঃ ১৬ পেজি ৫৯ পৃষ্ঠা। মূল্য চার আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশের বহু ঋষি মুনি সাধক কবি মনীষীর বচন সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পুরোবচন চণ্ডীদাসের "সতের সঙ্গে পীরিতি করিলে সতের বরণ হয়" এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছে।

তত্ত্ব-প্রকাশিকা বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—মহাত্মা রামচন্দ্র প্রণীত। কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান হইতে স্বামী যোগবিনোদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণ। ডিমাই অষ্টাংশিত ৪৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

মহাসাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিবিধ সময়ের বিবিধ বিষয়ে উপদেশ এই বৃহৎ পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। মহাত্মা রামচন্দ্রই বোধহয় এই কর্ম্মের অগ্রণী, সুতরাং এই পুস্তক প্রামাণ্য। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ সাধারণ চলতি কথায় রূপকের সাহায্যে বিবৃত বলিয়া সাধারণ লোকের হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য; এইসমস্ত উপদেশ আমাদের দেশে এত সমাদৃত যে উহার নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। যাঁহাদের গভীর বিষয়ের ধারাবাহিক চিন্তা ও যুক্তিপ্রণালী অনুসরণ করিবার অবসর ও শক্তি নাই তাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ-পরম্পরার মধ্যে অনেক উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। অবশ্য সাধুবচন হইলেও তাহা নিজের বিচারবুদ্ধিতে যাচাই করিয়া তবে মান্য করা উচিত; অন্ধ আনুগত্যের কোনো মূল্য নাই। এবং কোনো সাধক যতবড়ই মহাপুরুষ হউন না, তিনি অপূর্ণ মানুষই, তাঁহার সব উপদেশই যে অভ্রান্ত বা অকাট্য অথবা সর্ব্ব কাল ও অবস্থা ও দেশের উপযোগী ইহা যদি কেহ মনে করেন তবে তাঁহার ভুল করা হইবে।

জাতক-রহস্য—শ্রীপ্রমথনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। রাজসাহী, নওগা। ২৭ পৃষ্ঠা। মূল্য চার আনা।

এই চটি পুস্তিকায় ঠিকুজি কোষ্ঠী প্রস্তুত করিবার উপায়ের সঙ্কেত বিবিধ উদাহরণ দিয়া সহজ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বইখানি মন দিয়া পড়িয়া নিয়মগুলি আয়ত্ত করিতে পারিলে একখানা পাঁজি দেখিয়া সহজেই নবজাত শিশুর জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে। যাঁহারা ঠিকুজী কোষ্ঠীতে বিশ্বাস করেন বা যাঁহারা ঠিকুজি কোষ্ঠীর বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন, তাঁহারা এই পুস্তিকার সাহায্যে অনায়াসেই ও অল্প খরচেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিবেন।

বিবাহমঙ্গল—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী প্রণীত। হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ। মূল্য আট আনা। সচিত্র।

এই পুস্তিকায় বেদ, সংহিতা, শ্রুতি, উপনিষৎ, গৃহ্যসূত্র, ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্র হইতে বিবাহের মন্ত্র, উদ্দেশ্য, দম্পতির কর্ত্তব্য, গৃহিণীধর্ম্ম ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়া মূল ও অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে; এই পুস্তিকার উপদেশ পালন করিলে দম্পতিজীবন ও গৃহস্থালি মধুময় হইবে; বিবাহ যে কি গুরুতর কর্ম তাহা এই পুস্তিকা পাঠ করিলে বর ও বধূ উপলব্ধি করিবেন। সুতরাং এই পুস্তিকা বিবাহিতদের সংহিতা; বিবাহকামীদের অবশ্যপঠনীয়; এবং বরবধূকে উপহার দিবার উপযুক্ত।

ইহার বাহ্য দৃশ্যও সুন্দর। প্রচ্ছদের উপর আলপনার পরিকল্পনা ও মুখপাতে শিব-অন্নপূর্ণার নৃত্য যোগের পরিকল্পনা চমৎকার ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে। বইএর ছাপা দুই রঙে; কাগজ পুরু উজ্জ্বল মসৃণ। গ্রন্থশেষে রবীন্দ্রনাথের রচিত বিবাহ-সম্পর্কীয় গুটিকয়েক গান আছে।

বিসূচিকা-দর্পণ—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্‌-ডি প্রণীত। প্রকাশক গৃহস্থ পাবলিশিং হাউস, ২৪ মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা। ৩৫৪ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা। মূল্য আড়াই টাকা।

ওলাউঠা রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আশুফলপ্রদ ও রোগীর পক্ষেও আরামদায়ক ইহা সর্ব্বজনবিদিত ও স্বীকৃতও বটে। এই পুস্তকে ওলাউঠা রোগের নিদান, প্রকারভেদ, ওলাউঠা বিস্তৃতির কারণ, রোগের লক্ষণ ও ভাল মন্দ চিহ্ন নির্ণয়, রোগ নিবারণের উপায়, রোগের পূর্ব্বাবস্থার ও পরিণত রোগের বিস্তারিত চিকিৎসা, রোগ উপশমের পরবর্ত্তী চিকিৎসা, ঔষধনির্ব্বাচন-প্রদর্শিকা, হোমিওপ্যাথি ঔষধের শক্তি অথবা ক্রমবিচার, প্রথম শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ, ভেষজসমূহের লক্ষণাবলী, প্রধান প্রধান ঔষধের প্রকৃতিগত পার্থক্যবিচার ও তুলনা দ্বারা সেই প্রভেদের স্বরূপ নির্ণয় প্রভৃতি অতি বিচক্ষণতার সহিত সবিস্তারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তকের সাহায্যে উদরাময়ের যাবতীয় প্রকারভেদের চিকিৎসা সহজে সুন্দররূপে করা যায়। এই পুস্তক এমন সুপ্রণালীতে লেখা যে প্রথম শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত ডাক্তার উভয়েরই উপকারে লাগিবে। এই একখানি পুস্তকে অনেকগুলি ইংরেজী প্রামাণ্য চিকিৎসা-গ্রন্থের মত-সমাহার থাকাতে ইহার উপকারিতা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

জ্ঞানাঞ্জন—শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত বিরচিত। প্রকাশক ডাঃ পি এম সরকার, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম। গদ্যাংশ ১০৪ পৃষ্ঠা, পদ্যাংশ ৫৬ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

স্কুলপাঠ্য বই। এই পুস্তকে জ্ঞান বিজ্ঞান নীতি রাজভক্তি জীবনচরিত প্রকৃতিবর্ণনা সম্বন্ধে কতকগুলি সন্দর্ভ ও পদ্য আছে। গদ্যের ভাষা খুব আড়ম্বরপূর্ণ ও চোয়ালভাঙা বড় বড় সংস্কৃতপ্রায় শব্দে ভরা, কিন্তু তাহাদেরই পাশে চলতি ভাষা বসিয়া উহাদেরও জাত মারিয়াছে নিজেরও জাত খোয়াইয়াছে, দুই রকম ভাষায় ওজন ঠিক থাকে নাই। পদ্যের মধ্যে কতকগুলি খ্যাতনামা কবিদের, কতকগুলি স্বরচিত। অনেক বানান ভুল আছে। বালকপাঠ্য বইএ ভুল থাকা উচিত নয়।

ছেলেদের ব্যাকরণ—শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক বেঙ্গল বুক ক্লাব, ১৪ রামমোহন দত্ত রোড, ভবানীপুর কলিকাতা। মূল্য দেড় আনা।

এই ছোট ব্যাকরণখানিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণের ঐক্য ও স্বতন্ত্রতা বুঝাইয়া বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম অতি সুন্দর সহজবোধ্য প্রণালীতে যুক্তিপরম্পরা দ্বারা ও উদাহরণ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়া প্রমাণের দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। এই ব্যাকরণখানি ছোট বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে বাংলা ভাষার স্বরূপ ধরিবার প্রযত্ন আছে; ইংরেজী ব্যাকরণের মাপকাঠিতে সংস্কৃতের ছদ্মবেশ প্রস্তুত করিয়া বাংলা ভাষাকে পরাইয়া ইহাতে বাহির করা হয় নাই, ইহা লেখকের মাতৃভক্তির ও সদ্বিবেচনার পরিচায়ক।

চন্দন—শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। মানসী প্রেস হইতে প্রকাশিত। ৯৯ পৃষ্ঠা। মূল্য দশ আনা।

কবিতার বই। অধিকাংশই সনেট; বাকি কয়েকটিও পয়ার ছন্দে লিখিত; তাহার মধ্যেও ছন্দপতন আছে, যতিভঙ্গ আছে। ভাষা কবিতার পক্ষে ভারী ও মন্থরগতি হইলেও ওজস্বী গর্ব্বি। ভাবে নূতনত্ব নাই—শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন এই পুস্তক লেখকের প্রথম চেষ্টা। তাহা হইলে ইহা নিতান্ত মন্দ হয় নাই বলিতে হইবে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"গন্ধে উদাস হাওয়ার মত উড়ে তোমার উত্তরী

কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।"—

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩২২

৬ষ্ঠ সংখ্যা

খোলা জানালায়

আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে
তোমার মনের দিকে।
সকালবেলার আলোয় আমি সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে।
দেখতে পেলেম তুমি মোরে
সদাই ডাক যে নাম ধরে
সে নামটি এই চৈত্র মাসের পাতায় পাতায় ফুলে
আপনি দিলে লিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে।

আমার সুরের পর্দ্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে
তোমার গানের পানে।
সকালবেলার আলো দেখি তোমার সুরে সুরে
ভরা আমার গানে।
মনে হল আমারি প্রাণ
তোমার বিশ্বে তুলেছে তান,
আপন গানের সুরগুলি সেই তোমার চরণমূলে
নেব আমি শিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে॥

২১ চৈত্র ১৩২১
সুরুল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবিধ প্রসঙ্গ

সরকারী গৃহস্থালি।

সব গৃহস্থ সমান বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, সমান গোছাল, সমান বুদ্ধিমান নহেন। সব গৃহিণীও ঘরকন্নার কাজে সমান দক্ষ নহেন। কিন্তু সবাই নিজের গৃহস্থালি নিজে করেন। এক জন গৃহস্থ বেশী বুদ্ধিমান বা বেশী গোছাল বলিয়া আর-একজনের কর্ত্তৃত্ব লুপ্ত করিয়া তাহার আয়ব্যয় কিরূপ হইবে, নিজের সুবিধার জন্য, তাহার ব্যবস্থা করিতে পান না। কিন্তু জাতির বেলায় পৃথিবীতে বহুকাল হইতে অন্যরূপ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। এক জাতি অন্য জাতিকে বলিতেছেন, "তোমরা নাবালকের মত, তোমরা কাজকর্ম্ম আয়ব্যয় বুঝ না। আমরা তোমাদের ব্যবস্থা করিব।" একজাতি অন্যের গৃহস্থালির ব্যবস্থা অবৈতনিক বা নিঃস্বার্থ ভাবে করেন না। তাহা হইতে "বিলক্ষণ দু-পয়সা" রোজগার করেন; অধিকন্তু "নাবালক" জাতির কৃতজ্ঞতাও দাবী করেন।

এক জাতি যখন অন্য জাতির আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন, তখন তাহাতে যে অনেক খুঁত থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আমাদের যাহা দরকার, তাহা অন্যেরা কি ঠিক্ বুঝিতে পারে? যতটা বা বুঝিতে পারে, কাজের বেলায় তাহার উপরও সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারে না। কারণ, দুজন মানুষের যখন স্বার্থের সংঘর্ষ হয়, তখন কখন

কখন উন্নতমনা কেহ কেহ নিজের স্বার্থ ছাড়িয়া দিয়াছেন, এরূপ দেখা গিয়াছে; কিন্তু একটা জাতি নিজের ক্ষতি করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে আর-একটা দুর্ব্বল জাতির মঙ্গল করিয়াছে, এপর্য্যন্ত এরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে দেখা যায় নাই;—পরে দেখা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের সরকারী কাজ চালাইবার ভার ইংরেজের উপর। কি পরিমাণে কোন্ ট্যাক্স বসাইয়া কত টাকা রাজস্ব আদায় করিতে হইবে, এবং সেই রাজস্ব কি কি বাবতে খরচ করা হইবে, তাহা স্থির করা ইংরেজের কাজ। এ বিষয়ে দেশের ২১৫ জন লোকের খুব নরম স্বরে ২।৪ কথা বলিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহাতে বেশী কিছু পরিবর্ত্তন হয় না; মোটের উপর ইংরেজের ব্যবস্থাই ঠিক থাকে। তাহা হইলেও সামান্য সামান্য বিষয়েও যদি দেশের পক্ষে হিতকর কিছু পরিবর্ত্তন বক্তৃতা ও যুক্তি দ্বারা করান যায়, তা ভালই। কিন্তু আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত যে আমরা নিজেই কেমন করিয়া নিজেদের দেশের আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে পারি। কাহারও যুক্তি অকাট্য হইতে পারে, কাহারও বাগ্মিতা আকাশভেদী ও পাষাণদ্রাবক হইতে পারে; কিন্তু ক্ষমতা ও স্বার্থ যদি অন্যপক্ষে সম্মিবদ্ধন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি কি করিতে পারেন? তথাপি যদি আন্দোলন করিতে হয়, মূল কথাটা লইয়াই সম্বৎসর খুব বেশী পরিমাণে লেখা পড়া ও চীৎকার করা ভাল।

গৃহস্থের যদি কোন কারণে কোন বৎসর অবস্থা অসচ্ছল হয়, তাহা হইলেও, জীবনমরণের ব্যাপারে তাহাকে যেমন করিয়াই হউক যথেষ্ট ব্যয় করিতে হয়। ছেলেটির কলেরা হইয়াছে; তখন ত গৃহস্থ বলিতে পারেন না, "এটা বড় দুর্ব্বৎসর, আস্‌ছে বৎসর হাতে বেশী টাকা হ'লে ডাক্তার ডাক্‌ব"। কারণ, তৎপূর্ব্বেই ছেলেটির পরলোকে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। মেয়েটি ম্যালেরিয়ায় পুনঃ পুনঃ ভুগিতেছে। তাহারও চিকিৎসা ফেলিয়া রাখা চলে না। ফেলিয়া রাখিলে প্লীহা ও যকৃৎ এত বড় হইতে পারে যে তখন আর চিকিৎসা চলিবে না। পাঁচ বৎসর বা দশ বৎসর পরে আমার আয় বেশী হইবে, তখন আমি মেয়ে বা ছেলের হাতে খড়ি দিব, এরূপ চিন্তা কোন বুদ্ধিমান পিতামাতা করেন না; কারণ সময় চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। এবং শিক্ষার সময়ে শিক্ষা না দিলে পরে শিক্ষালাভের যোগ্যতা কমিয়া যায়। মাটী যখন ভিজা ও নরম থাকে, কুমার তখনই তাহা হইতে নানা রকম পাত্র ও মূর্ত্তি গড়ে; ধাতু যখন দ্রব বা নরম থাকে, তখনই তাহাতে ঢালাই বা পেটাই হয়। কৃষিই যদি গৃহস্থের সম্বল হয়, তাহা হইলে তাহাকে যথাসময়ে বাঁধ বাঁধিতে হয়, লাঙ্গল দিতে হয়, বীজ বপন করিতে হয়, শস্যে পোকা লাগিলে তাহা মারিবার উপায় করিতে হয়। এ সব কাজে দেরী সয় না; দেরী করিলে সে বৎসর আর আয় হয় না, কিম্বা কম আয় হয়।

এক একটা জাতির কাজ এক একটা গৃহস্থের কাজের মত। তফাৎ এই, যে, আমাদের দেশে এমন লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ আছে, যাহাদের গৃহ না থাকার মধ্যে, যাহাদের অবস্থা তাহাদের জীবিতকালে কখন ভাল ছিল না, হইবারও আশা কম; এবং তজ্জন্য তাহাদের বাড়ীতে কলেরা হইলেও তাহারা ডাক্তার ডাকিতে পারে না, ছেলেমেয়েরা চিরজীবন নিরক্ষর থাকিলেও পাঠশালায় পাঠাইতে পারে না, এবং লাঙ্গল দিবার কোন জমীও তাহাদের নাই। কিন্তু এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, নিঃসম্বল, ভূমিশূন্য জাতি পৃথিবীতে একটিও নাই। আমাদের জাতি ত নিশ্চয়ই এরূপ দরিদ্র নয়। পুরা কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কত বিদেশী জাতি ভারতবর্ষের সমৃদ্ধিতে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া আসিতেছে। আমরা যে দরিদ্র তার একটা প্রধান কারণ এই যে আমাদের দেশের সরকারী গৃহস্থালির কর্ত্তা আমরা নই, কর্ত্তৃত্ব অন্য হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য জাতির মঙ্গলের জন্য আমরা যাহা একান্ত আবশ্যক মনে করি, তাহার জন্য যথেষ্ট টাকা আগেও ইংরেজ জনভৃত্যেরা (Public Servants) কখন খরচ করেন নাই, আগামী বৎসরের জন্য আবার তার চেয়েও কম খরচের ব্যবস্থা হইতেছে।

দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কখন্ যথেষ্ট টাকা ব্যয় করিবেন, জানি না; কিন্তু গত ১৯১৪ সালে যে ৮৯,২২৪ জন কলেরায়, ১০,৬১,০৪১ জন জ্বরে এবং আরো কত নিবার্য্য রোগে

আরো কতজন মরিয়াছে, এবং প্রতিবৎসর মরিতেছে, তাহারা ত আর ফিরিয়া আসিবে না। সকল বালকবালিকা যুবকযুবতীর শিক্ষার ব্যবস্থা কথন্ হইবে জানি না; কিন্তু এখন যাহারা মূর্খ অবস্থায় বড় হইতেছে, তাহাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, শিক্ষার বয়স, আর ত ফিরিয়া আসিবে না। কত মানুষ জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিয়া বার্দ্ধক্যে পৌঁছিল ও মারা গেল, তাহাদের ব্যর্থ জীবনের জন্য কে দায়ী হইবে? দেশের কৃষি ও শিল্পের সুব্যবস্থা কথন্ হইবে, জানি না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে কত লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে, অর্দ্ধাশনে, দারিদ্র্যজনিত রোগে, প্রাণ হারাইয়াছে, তাহারা ত আর ফিরিয়া আসিবে না। কত লোক দারিদ্র্যের জন্য চুরি ডাকাতি করিয়া, দারিদ্র্যনিবন্ধন শিক্ষার অভাবে দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া, নিজের ও দেশের অবনতি করিয়াছে, তাহার জন্য কি কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন?

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ে ব্যয়সংক্ষেপ হইতেছে, কিন্তু সিবিলিয়ানদের পাওনা বাড়িয়াছে, এবং পুলিশের জন্য অর্থের ব্যবস্থা পুরা মাত্রায় আছে। আমরা চোর-ডাকাতকে নিশ্চয়ই ভয় করি, এবং তথাকথিত এনার্কিষ্ট বা অন্য খুনীদের হাতে প্রাণটা যায়, এরূপ ইচ্ছাও করি না। কিন্তু খুব সহজেই বুঝা যায় যে নিবার্য্য রোগে দেশে যত লোক মরে, খুনিদের হাতে তাহার হাজার ভাগের একভাগও মরে না। অথবা অনুমানের প্রয়োজন কি? কি রকমে কত লোক মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা লউন। ১৯১৪ সালে কোন-না-কোন রকমের ৭৯১টি খুনের মোকদ্দমা হইয়াছিল। মোটামুটি ৮০০ মানুষ খুন হইয়াছিল ধরা যাক্। অতএব যেরূপ মৃত্যু পুলিশে নিবারণ করিতে পারে, কিম্বা, নিবারণ করিতে না পারিলেও, যাহার কারণস্বরূপ হত্যাকারীকে ধরিয়া পুনর্ব্বার তাহার দ্বারা সমাজের অনিষ্ট যাহাতে না হয় এরূপ চেষ্টা করিতে পারে, তাহার সংখ্যা বৎসরে গড়ে ৮০০, না হয় ১০০০ ধরা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ১৯১৪ সালে ৮৯,২২৪ জন কলেরায় মরিয়াছিল। সকল দেশের ডাক্তারেরা একমত যে কলেরা নিবার্য্য রোগ। ১৯১৪সালে ম্যালেরিয়া জ্বরে ১০,৬১,০৪১ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ডাক্তারেরা বলেন যে ইহাও নিবার্য্য রোগ। নিবার্য্য দুটিমাত্র রোগে ১৯১৪সালে বাংলাদেশে সাড়ে এগার লক্ষ লোক মরিয়াছিল। নিবার্য্য অন্যান্য রোগে আরও মানুষ মরিয়াছে। ৮০০জনের মৃত্যু লইয়া পুলিশের কাজ, এবং অন্যূন সাড়ে এগার লক্ষ মৃত্যু লইয়া স্বাস্থ্য-বিভাগের কাজ। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পুলিশের জন্য যত ব্যয় করেন, এবং পুলিশকে যত দরকারী মনে করেন, স্বাস্থ্যবিভাগের জন্য তত ব্যয় করেন না, এবং স্বাস্থ্যকর্ম্মচারীদিগকেও তত দরকারী মনে করেন না। স্বাস্থ্যের জন্য পুলিশের ব্যয়ের ষষ্ঠাংশও ব্যয় করেন কিনা সন্দেহ।

অবশ্য খুন নিবারণ বা খুনের তদন্ত করাই পুলিশের একমাত্র কাজ নয়। চুরি, ডাকাতি নিবারণ, চোরডাকাত ধরা, ইত্যাদিও পুলিশের কাজ। তাহার কথাও বলিতেছি। বাংলাদেশে বৎসরে সকল রকমের চুরি ডাকাতিতে লোকের কত টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়, তাহার কোন হিসাব পাইতেছি না। ডাকাতি ও দস্যুতা (robbery) বৎসরে ৮০০র বেশী হয় না। ১৯১৪ সালে তাহা অপেক্ষা কম ছিল। প্রত্যেক ঘটনায় যদি গড়ে হাজার টাকা অপহৃত হয় বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে মোট ৮লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরিতে আরও ৮লক্ষ টাকা যায় বলিয়া ধরিলে মোট অপহৃত সম্পত্তির মূল্য দাঁড়ায় ১৬লক্ষ টাকা। উর্দ্ধপক্ষে ইহা অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না। মানুষগুলাকে কেবল উপার্জ্জনের যন্ত্র বলিয়া মনে করিয়া সভ্যদেশে এক-একজন মানুষের জীবনের গড়পড়তা মূল্য অনুমিত হইয়াছে। আমেরিকার সম্মিলিতরাষ্ট্রমণ্ডলের (U. S. A. র) এক-একজন মানুষের জীবনের দাম ৮৭০৲ টাকা, এবং ইংলণ্ডের এক-একজনের জীবনের মূল্য ২৫০০০৲ টাকা ধরা হয়। আমাদের দেশের এক একজন লোকের প্রাণের দাম না হয় খুব কম করিয়া ৫০০৲ টাকা ধরুন। তাহা হইলে বৎসরে সাড়ে এগারলক্ষ প্রাণের মূল্য সাড়েসাতান্ন কোটি টাকা হয়। বাংলা গবর্ণমেণ্ট ১৯১৪ সালে সিবিল পুলিসের জন্য ৮২,২৮,৬৩৪৲ টাকা এবং মিলিটারী পুলিশের জন্য ২,৯০,৮২৩৲ টাকা, অর্থাৎ মোট পুলিশের জন্য ব্যয় প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা করিয়াছিলেন। যে ৮০০ জন মানুষ খুন হইয়াছিল, তাহাদের প্রাণের মূল্য চারিলক্ষ টাকা, এবং সমুদয় চুরি ডাকাতিতে অপহৃত ১৬ লক্ষ টাকা,

মোট ২০ লক্ষ টাকা ১৯১৪ সালে নষ্ট হইয়াছে। পাছে এই প্রকারে আরো ক্ষতি হয়, মনে করুন যেন এইরূপ ভয়েই গবর্ণমেণ্ট ৮৫ লক্ষ টাকা বাৎসরিক ব্যয়ে পুলিশ রাখিয়াছেন। রোগে যে বৎসরে সাড়ে সাতান্নকোটি টাকা লোকসান হইতেছে, তাহা বন্ধ করিবার বা কমাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কত কোটী টাকা খরচ করেন?

জ্বর প্রভৃতি রোগে যত মানুষ মরে, তাহাই যে একমাত্র ক্ষতি তাহা নয়। ইতালী দেশে গড়ে বৎসরে ১৫০০০ লোক ম্যালেরিয়ায় মারা পড়ে। এইরূপ গণনা করা হয় যে কুড়ি লক্ষ আক্রমণে ১৫০০০ মারা পড়ে। এই হিসাব অনুসারে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়াতে বার্ষিক দশলক্ষ মৃত্যুর মানে অন্যূন ১৩ কোটি আক্রমণ। এক এক জন ১৩ বার আক্রান্ত হয়, ধরিলে, মোট এক কোটি লোক আক্রান্ত হয়। এই এক কোটি লোক সুস্থ থাকিলে তাহাদের চিকিৎসার ব্যয় ত বাঁচিতই, অধিকন্তু তাহারা ও তাহাদের শুশ্রূষাকারীরা অনেক উপার্জ্জন করিতে পারিত।

এই যে প্রভূত আর্থিক ক্ষতি, ইহার কথা ভাবিলেই স্তম্ভিত হইতে হয়। উপার্জ্জন-শক্তি ছাড়া আরো কত উচ্চতর শক্তি নষ্ট হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

ভাল করিয়া শিক্ষা দিয়া মানুষকে নীতিমান ও উপার্জ্জনক্ষম করিলে দেশে আইনভঙ্গ অপরাধ কম হয়, পুলিশের প্রয়োজনও কম হয়। ইংরেজীতে কথা আছে, যে একটা স্কুল খোলে, সে একটা জেল বন্ধ করে। তবে যদি মানুষের শিক্ষা পাইবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, অথচ তাহার পরিতৃপ্তির উপায় না থাকে, তাহা হইলে শান্তি থাকে না। কিন্তু শিক্ষা না দিলেও অন্য প্রকারে দুর্নীতি বাড়ে, অশান্তি বাড়ে। অতএব শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের উপায়, উপার্জ্জনের পথ, সবই করিয়া দেওয়া চাই।

কিন্তু বাংলা গবর্ণমেণ্ট আগামী বৎসরের বজেটে বর্তমান বৎসর অপেক্ষা শিক্ষার জন্য ১৭ লক্ষ টাকা কম ধরিয়াছেন।

যাহা হউক, বজেটের এইরূপ এক-একটি বিষয়ের সমালোচনা করা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না হইলেও, আমাদের জাতীয় গৃহস্থালির আয়ব্যয়ের উপর আমাদের নষ্ট কর্তৃত্ব কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহার চিন্তা ও চেষ্টা করা অধিকতর ফলপ্রদ ও আবশ্যক।

নূতন ট্যাক্স।

যুদ্ধ ও অন্যান্য নানা কারণে গবর্ণমেণ্টকে এবার নূতন আয়ের পথ দেখিতে হইয়াছে, রাজস্ব-মন্ত্রী এইরূপ বলিয়াছেন। তজ্জন্য ২১টি নূতন ট্যাক্স বসিয়াছে, এবং পুরাতন কোন কোন ট্যাক্স বাড়ান হইয়াছে।

ইন্‌কম্ ট্যাক্সের হার বাড়ান হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বের মত, যাহাদের আয় বার্ষিক হাজার টাকার কম, তাহাদিগকে ট্যাক্স দিতে হইবে না, এবং যাহাদের আয় পাঁচ হাজার টাকার কম তাহাদের ট্যাক্সের হার বাড়ান হয় নাই। বার্ষিক ৫০০০ ও তদূর্দ্ধ আয়ের লোকদিগকে বর্দ্ধিত হারে কর দিতে হইবে। ইহাতে আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু কর হইতে রেহাই বার্ষিক ১২০০ টাকা আয়ের লোকদিগকেও দিলে ভাল হইত।

ভারতবর্ষ এত গরীব দেশ যে বৃটিশভারতের সাড়েচব্বিশ কোটি লোকের মধ্যে কেবল ৩৩২,০০০ জনকে ইন্‌কম্‌ট্যাক্স দিতে হয়। তাহার মধ্যে ২৩৬০০০জনের আয় ১০০০ হইতে ১৯৯৯টাকার মধ্যে এবং ৭১০০০জনের ২০০০ হইতে ৪৯৯৯টাকা আয়। অতএব এখন যাহারা এই ট্যাক্স দেয়, তাহাদের মধ্যে ২৯৫০০০জনের ট্যাক্স বাড়িল না। অপেক্ষাকৃত ধনী ৩৭০০০জনকে বর্দ্ধিত হারে কর দিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে বিস্তর ইংরেজ আছে। এইজন্য ইংরেজদের অনেক কাগজে এই ট্যাক্সটির বৃদ্ধির বিরুদ্ধে খুব চীৎকার চলিতেছে।

লবণের উপর কর মণকরা ১৲ টাকা ছিল, তাহা বাড়াইয়া মণকরা ১।০ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ—খুচরা বিক্রয়ে প্রতিসেরে মুদি অন্ততঃ আধপয়সা করিয়া দাম বেশী লইবে। কিন্তু পল্লীগ্রামের মুদিরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে কিনা সন্দেহ। তাহারা বোধ হয় প্রতি সেরে একপয়সা করিয়া দাম বাড়াইবে। একবারে একসের বা তার চেয়েও বেশী নুন কিনিতে পারে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের অবস্থা এরূপ নয়। লক্ষ-লক্ষ-লোক আধপয়সা সিকিপয়সার নুন কিনে। নুনের দাম যে
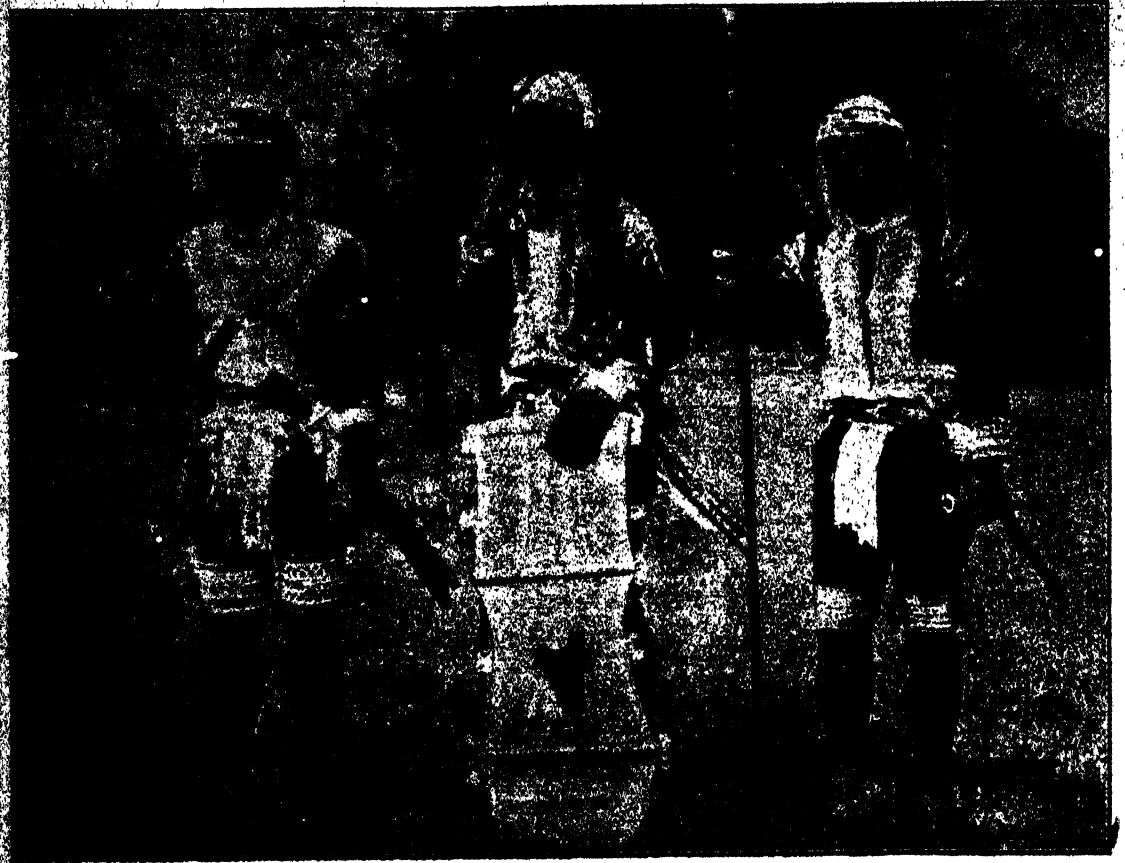
ফিলিপাইন দ্বীপের বাগোবো জাতীয় যোদ্ধা।

বাগোবো জাতি স্বভাবত যোদ্ধা না হইলেও তাহাদের অদ্ভুত ধর্ম্মমত তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে রক্তপাত করিতে ও বীভৎস কর্ম্মে প্ররোচিত করে; যুদ্ধে হত শত্রুর মাথা হাত ও কলিজা কাটিয়া লওয়া উহাদের বিজয়-রীতি। উহারা তাহাদের 'দেবতা' নামক ঠাকুরের বাৎসরিক পূজার উৎসবে গৃহপালিত ক্রীতদাসদিগকে বলি দেয়; এবং নরবলি দিয়া বলির মাংস আহার করে। অতি অল্পদিন আগেও উহারা নরবলি দিয়া আসিয়াছে। উহারা সাধারণত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না; তবে উহারা তামাকপাতা বা বুয়ো-পাতার সঙ্গে সুপারি চিবাইয়া খাইতে খুব ভালো বাসে। যে-সমস্ত লোক নরহত্যা করিয়াছে তাহারা আপনাদের কৃত কর্ম্মের বাহাদুরীর চিহ্নস্বরূপ লাল ও হলদে ছিটের পোষাক পরে; যে নরহত্যা করিতে পারে নাই তাহার ওরূপ পোষাক পরিবার অধিকার নাই; নরহন্তার স্ত্রীও লাল ও হলদে ছিটের চুনারী শাড়ী পরে, অপরে নহে। বুকিডনোন জাতীয় নরহন্তারা জরি-দেওয়া কাপড়ে এক রকম গোল টোপর করিয়া মাথায় দেয় এবং সেই টোপর হইতে টকটকে লাল নীল বা সাদা থোপনা ঝালর ঝুলিতে থাকে (পরপৃষ্ঠায় ছবি দেখুন)।

ফিলিপাইন দ্বীপের বণ্টক ইগরট জাতীয় সৈন্য।

অল্পদিন আগে পর্যন্ত ইহারা নরহন্তা অসভ্য বর্ব্বর ছিল। এখন শিক্ষার ফলে ইহারা হাল-ফ্যাশানের উৎকৃষ্ট সৈন্য হইয়াছে। ইহারা উর্দ্ধ অঙ্গে উর্দ্দি পরিয়াছে, কিন্তু পাজামা পরিলে লটপট করে চলিতে বাধ-বাধ ঠেকে বলিয়া পাজামা পরে নাই।

পরিমাণে বাড়িল, এইসব গরীব লোক আধপয়সা সিকি-পয়সার নুন ঠিক্ সেই অনুপাতে কম পাইলেও রক্ষা ছিল; কিন্তু তাহা তাহারা পাইবে না। আধপয়সায় সিকিপয়সায় আগে তাহারা যত নুন পাইত, তার চেয়ে, বেশ-বুঝা-যায়-এমন কম নুন পাইবে। গরীব লোকের পক্ষে ইহা তুচ্ছ ব্যাপার নয়। অনেকের সামান্য-পরিমাণ খাদ্যকে স্বাদু করিবার একমাত্র উপায় লবণ। মানুষের ও গবাদি পশুর স্বাস্থ্যরক্ষার একটি উপায়ও ঐ লবণ। এমন জিনিষের উপর কর বাড়ান ভাল হয় নাই।

লবণের কর বাড়াইয়া ৯০ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইবে। ১৯১৬-১৭ সালের শেষে ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে ১,৫৭,৮০,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে, এইরূপ আন্দাজ করা হইয়াছে। হয় উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমাইয়া ৬৭,৮০,০০০ করিলে হইত; কিম্বা তাহা অবাঞ্ছনীয় মনে হইলে মদ, চুরুট, সিগারেট, প্রভৃতির উপর আরও বেশী করিয়া কর বাড়াইয়া এই ৯০ লক্ষ টাকা তুলিয়া লইলে ভাল হইত। যাঁহারা গরীবের মা-বাপ হইবার দাবী রাখেন, তাঁহারা গরীবের এই নিত্য- ও অবশ্য-ব্যবহার্য্য জিনিষটির উপর হাত না দিলেই ভাল করিতেন।

বিদেশী কার্পাস বস্ত্রের উপর শুল্ক।

বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে তাঁহারা বিদেশী (প্রধানতঃ বিলাতী) কাপড়ের উপর যে সামান্য শুল্ক আছে, তাহা বাড়াইতে পারেন নাই। লণ্ডনে অধিষ্ঠিত ভারতসচিব এ-বিষয়ে এখানকার ভারত গবর্ণমেণ্টকে যাহা বলিয়াছেন সোজা ভাষায় তাহার মানে এই হয়, যে, এখন কাপড়ের উপর যে শুল্ক আছে, তাহা বাড়াইতে গেলে ম্যাঞ্চেষ্টারের ধনী ও প্রভাবশালী তাঁতিরা বড় গোলমাল করিবে, এবং হয়ত যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের নূতন কোন অধিকারলাভের কথা উঠিলে তাহাতে বাধা দিবে। এখন ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের উপর কর বাড়ান হইল না বলিয়া ভবিষ্যতে তাহারা আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের সহায় হইবে, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। ব্রিটিশ মূল-ধনীরা জানে যে আমরা স্বরাজের দিকে যত অগ্রসর হইব, ভারতের শিল্পের উন্নতির দ্বারা আমরা ততই দেশের টাকা দেশে রাখিতে পারিব। সুতরাং তাহারা আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের বিরোধী হইবেই। তাহাদের শক্তিকে ভয় করিয়া গরীবের নুনে হাত দেওয়া অশোভন ও ন্যায়বিরুদ্ধ হইয়াছে।

ভারতসচিব ও অন্যান্য বিলাতী মন্ত্রীরা ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল খুব যে বেশী চিন্তা করেন, এমন ত মনে হয় না। ম্যাঞ্চেষ্টারের শক্তিশালী তাঁতিদের আন্দোলনের ভয়েই তাঁহারা কাপড়ের ট্যাক্স বাড়ান নাই।

ব্যয়ের অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় অনুচিত।

কর বাড়াইয়া উদ্বৃত্ত টাকা বেশী দেখান, ভাল রাষ্ট্রনীতি নহে। কারণ, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়ী হইবার ইচ্ছা প্রশ্রয় পায়। এবং এই অমিত-ব্যয়িতা, ভারতবর্ষের যাহাতে উপকার নাই, এইরূপ কাজেই দেখা যায়। বেশী টাকা হাতে থাকিলে ইংরেজ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়ান, সিবিলিয়ান ও অন্যান্য ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, সৈনিক বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি, এইরূপ নানা কাজে উচ্চপদস্থ ইংরেজ জনভৃত্যদের (Public Servants) মন যায়। এইজন্য আমরা বেশী টাকা উদ্বৃত্ত রাখিবারই বিরোধী। গরীবের নুনের দাম বাড়াইয়া উদ্বৃত্ত বাড়াইবার আরও বিরোধী।

ইহা স্বীকার্য্য যে কিছু টাকা হাতে রাখা দরকার। কারণ, যে বিভাগে যত রাজস্ব আদায় হইবে অনুমান করা হইয়াছে, সে বিভাগে প্রাকৃতিক বা অন্য আকস্মিক কারণে তত না হইতে পারে; এবং যাহা আগে হইতে বুঝিতে পারা যায় নাই, এরূপ কারণে অনেক টাকা ব্যয়ও বাড়িতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য, নুনের কর না বাড়াইলেও টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবার কথা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবং অন্যান্য কোন কোন জিনিষের উপর শুল্ক আরও যে বাড়ান চলিত, তাহাও বলিয়াছি। নুনের কর না বাড়াইয়া একেবারে তুলিয়া দিলে তবে ঠিক হয়।

সকল রকমের মোটর গাড়ীর উপর বেশী রকম কর বসাইলে ভাল হইত। কারণ মোটর গাড়ী ধনী লোকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ব্যয় বাদে যাহা সঞ্চিত থাকে, তাহা হইতে তাঁহারা অনায়াসে ট্যাক্স দিতে

পারেন। গরীবের নুনের উপর ট্যাক্স বসানর মানে তাহারা যতটুকু নুন খাইত, তাহা অপেক্ষা কম খাইতে পাইবে; কারণ তাহাদের কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না, অধিকন্তু বিস্তর লোক আজীবন ঋণী থাকে। সকল রকম মোটর গাড়ীর উপর কর ধার্য্য না করিয়া কেবল মাল বহিবার মোটর গাড়ীর উপর ট্যাক্স বসান হইয়াছে। অন্যান্য মোটরের সংখ্যাই বেশী। সেগুলাকে কেন বাদ দেওয়া হইল?

কাগজ আদির উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি।

পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী কাগজের মূল্যের উপর শতকরা ৫৲ টাকা কর ছিল। এখন তাহা বাড়াইয়া সাড়ে সাত টাকা করা হইল। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বে ছাপিবার কালী প্রভৃতি সরঞ্জাম এবং প্রেস আদি যন্ত্রের উপর কর ছিল না। এখন তাহাদের মূল্যের উপর শতকরা আড়াই টাকা কর বসিল। আমরা ইহার বিরোধী। ভারতবর্ষে যত কাগজ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় দ্বিগুণ কাগজ বিদেশ হইতে আসে। খবরের কাগজ, সাময়িক পত্র, এবং পুস্তক লোকশিক্ষার উপায়। কাগজ কালী ইত্যাদি এখনই খুব দুর্মূল্য হইতেছে। কোন কোন রকমের কাগজ পাওয়াই যাইতেছে না। কতকগুলির দাম দ্বিগুণ, কতকগুলির দেড়গুণ হইয়াছে। তাহার উপর, পূর্ব্বেকার কর বাড়ান ও নূতন কর বসানর ফল—শিক্ষা আরও দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য করা। ইহা অনুচিত হইয়াছে। শিক্ষার জন্য অনেক লক্ষ টাকা কম বরাদ্দ করা হইয়াছে। তাহার উপর এই কর বৃদ্ধি।

বিলাতী বহির বিনা করে আমদানী।

এ অবস্থায় আমরা যদি এ দেশে স্কুল বা কলেজের পাঠ্য বা অন্যবিধ কোন বহি, বা কোন সাময়িক পত্র আদি ছাপি, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা খরচ অধিক হইবে; কিন্তু বিলাতের প্রকাশকেরা সেখান হইতে ছাপিয়া পুস্তকাদি যাহা পাঠাইবেন, তাহার উপর ট্যাক্স নাই। সেগুলি বিনা করেই আসিবে। ইহা দ্বারা বিলাতী প্রকাশকদিগের সুবিধা করিয়া দিয়া ভারতবর্ষীয় প্রকাশকদিগকে অসুবিধায় ফেলা হইল। এই পক্ষপাতিত্ব ভারতগবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত না হইতে পারে কিন্তু কার্য্যতঃ এইরূপই দাঁড়াইতেছে।

আমরা এরূপ বলিতেছি না যে বিদেশ হইতে আমদানী বহির উপরও কর বসান হউক; কারণ, তাহা হইলে বিলাতী প্রকাশকেরা বহির দাম বাড়াইয়া করটা আমাদের নিকট হইতেই আদায় করিয়া লইবে, এবং আমাদেরই ছেলে-মেয়েদের পাঠ্যপুস্তক-সকল আরও দুর্মূল্য হইবে। আমাদের বক্তব্য এই, বিদেশী বহি যেমন বিনা করে আমদানী হইবে, ছাপাখানার সরঞ্জাম, যন্ত্র আদিও তেমনি বিনা করে এবং বিদেশী কাগজ পূর্ব্বেকার কর দিয়া আমদানী করিতে দেওয়া উচিত ছিল।

ভারতবর্ষের কাগজের কল।

যাহা হউক, মন্দের ভাল এই যে কাগজ প্রস্তুত করিবার উপাদান অর্থাৎ মালমশলা-সকলের উপর কোন কর বসান হয় নাই। ভারতবর্ষে ১১টি কাগজের কল আছে। তাহার মধ্যে তিনটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাকী আটটি বিদেশ হইতে যে-সব মালমশলা আমদানী করিবে, তাহা বিনা শুল্কেই করিতে পারিবে। বিদেশী কাগজের আমদানী কমিয়াছে, তাহার দামও খুব বাড়িয়াছে, এবং বিদেশ হইতে আমদানী কাগজ প্রস্তুত করিবার মালমশলার উপর ট্যাক্স বসে নাই। এই সুযোগে কাগজের কলগুলি যদি বেশী পরিমাণে কাগজ উৎপন্ন করিয়া দাম না বাড়াইয়া কাগজ দিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। কিন্তু দেশী কাগজের দামও দেড়গুণ দ্বিগুণ হইয়াছে। এই অবসরে দেশের লোকেরা কতকগুলি নূতন কাগজের কল স্থাপন করিতে পারিলে খুব ভাল হইত। কাগজ প্রস্তুত করিবার মত ঘাস, বাঁশ, এবং দেবদারুজাতীয় নানাপ্রকার গাছ ভারতবর্ষে প্রচুর জন্মে। কাগজে পড়িয়াছিলাম, আমেরিকায় পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে কাপাসের গাছ হইতে কাগজ হইতে পারে। আকের রস বাহির করিয়া লইয়া যে ছিবড়া থাকে, তাহা হইতে, শুনিয়াছি, কাগজ হইতে পারে। জাপানে তুতগাছের ছাল হইতে এক-প্রকার ভাল কাগজ প্রস্তুত করে। এগাছও আমাদের দেশে হয়। যাঁহাদের ব্যবসাবুদ্ধি আছে এবং যাঁহাদের ধন আছে, তাঁহারা একযোগে এখন একবার লাগুন না।

সুরাসার বা স্পিরিটের উপর ট্যাক্স।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাসম্মত নানাবিধ ঔষধ এবং কোন

কোন রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য সুরাসার বা স্পিরিট ব্যবহৃত হয়। ১৯১০ সাল হইতে এই জিনিষটির উপর প্রতি গ্যালনে ৭৮/ শুল্ক লাগিতেছে। বিদেশী ঔষধ- ও রাসায়নিক-দ্রব্য-ব্যবসায়ীদিগকে এরূপ শুল্ক দিতে হয় না। এইজন্য এখানকার ব্যবসায়ীদের এই শুল্কে আপত্তি বরাবরই আছে। তবে এইটুকু সুবিধা ছিল যে বিদেশ হইতে আমদানী পানীয় সুরার শুল্ক ৯।৮/ অপেক্ষা এই ৬৮/ টা কম ছিল। এখন পানীয় সুরার শুল্ক বাড়াইয়া প্রতি গ্যালন ১১।০ করা হইল, এবং ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির জন্য ব্যবহৃত স্পিরিটেরও শুল্ক প্রতি গ্যালন ১১৷৯ করা হইল। ইহাতে ভারতবর্ষীয় ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানাগুলির অসুবিধা হইল। আমাদের দেশী কারবারের সুবিধা অসুবিধা কিসে হয়, তাহা রাজস্ব-মন্ত্রীর মত উচ্চপদস্থ জনভৃত্যের বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত।

বিদেশী চিনির উপর কর।

বিদেশ হইতে যে চিনি আমদানী হয়, এ পর্য্যন্ত তাহার মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকা কর ছিল। তাহা বাড়াইয়া এখন শতকরা দশ টাকা করা হইল। এই উপায়ে বার্ষিক ষাটলক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে। বিদেশী চিনির দাম বাড়িল। এখন দেশী চিনির ছোটবড় যত কারখানা আছে, তাহার মালিকেরা তৎপর হইয়া চিনির বাজার দখল করিতে চেষ্টা করুন; যে-সকল কারখানা প্রায় অচল অবস্থায় ছিল, তাহার মালিকেরা জাগুন। তারপুর চিনির কারখানা অনেক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। তাহার চিনি কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সম্প্রতি কিন্তু কোন কোন ইংরেজী দৈনিক কাগজের সম্পাদক ইহার নমুনা পরীক্ষা করিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা চলিলে খুব সুখের বিষয় হইবে। এলাহাবাদে বিস্তর টাকা মূলধন লইয়া একটা চিনির কারখানা খোলা হয়। উহা উঠিয়া গিয়াছে; একদিনও চলিয়াছিল কিনা জানি না। যে-সব কারখানা একবারে বন্ধ হয় নাই, তাহা আবার চালাইবার চেষ্টা করা হউক, এবং প্রয়োজনমত আরও ছোট বড় কারখানা খোলা হউক।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ।

বাঁকুড়া জেলার লোকদের অবস্থা ক্রমশঃ আরও শোচনীয় হইতেছে। ক্রমশঃ অধিকতর লোক সাহায্য চাহিতেছে। তাহার উপর **ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত**। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে লোকে ভাল জল ত পাইবেই না; অনেক গ্রামের লোক কর্দ্দমাক্ত পঙ্কিল দুর্গন্ধ জলও বহুদূর গিয়া অল্প পরিমাণে মাত্র পাইবে। এখন ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড কোন্ কোন্ গ্রামে কূপের প্রয়োজন, অতি সত্বর তাহার তালিকা, এবং এক এক স্থানের কূপ খননের মোটামুটি ব্যয়ের ফর্দ্দ বাহির করুন। জলকষ্ট-পীড়িত গ্রামের লেখাপড়া-জানা লোকেরা ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডে, খবরের-কাগজে, এবং দুর্ভিক্ষে-সাহায্যকারী যে সভা সমিতি ইত্যাদি তাঁহাদের অঞ্চলে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে পত্র লিখুন। পত্রে কূপ নির্ম্মাণের আনুমানিক ব্যয় যেন থাকে। শীঘ্র জলের বন্দোবস্ত না হইলে ওলাউঠা আদি রোগে বিস্তর লোক মারা যাইবে।

গবাদিপশুর খাদ্যাভাব খুব হইয়াছে। তাহার উপর জলাভাবেও অনেক পশু মারা পড়িবে।

দরিদ্রলোকদের আর-একটি কারণে কষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশের দুই বৎসর, কাহারও কাহারও তিন বৎসর **ঘরের চালে খড় পড়ে নাই**। তাহারা চালে গাছের ডাল পাতা ঢাকা দিয়া কোনপ্রকারে রাত্রি কাটাইয়াছে। এখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্র এবং বর্ষার বৃষ্টিতে কোন আশ্রয় না থাকিলে তাহারা কেমন করিয়া বাঁচিবে? সুতরাং গ্রামসকলে প্রয়োজন-মত ঘর মেরামতের জন্য লোকের সাহায্য করিতে হইবে।

বাঁকুড়া-দর্পণ বলিতেছেন, "শুনিলাম আগামী ১লা এপ্রেল হইতে গবর্ণমেণ্ট বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিবেন।" অন্য সূত্রেও আমরা শুনিলাম যে দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হইবে। ইহাতে আরও অধিক লোকের সাহায্য পাইবার সুবিধা হইবে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে; কেননা সরকারী কর্ম্মচারীরা সহজে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিতে চান না।

কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক কিছু কিছু সাহায্য পাই-

তেছে, তাহা ২৫শে ফাল্গুনের বাঁকুড়া-দর্পণে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে জানা যায়।

জেলার অনেক লোক পূর্ব্বাঞ্চলে কাজ করিতে গিয়াছে। অনেকে কুলি-ডিপো আশ্রয় করিয়া আসাম কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চলে চা-বাগানে চলিয়া গিয়াছে।

সদাশয় গবর্ণমেণ্টের অর্থে তন্তুবায়-সাহায্য-সমিতি তন্তুবায়গণকে কার্য্য দিতেছেন। তাহারা সূতা ও বানী পাইয়া একরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ সাহায্য-ফাণ্ড হইতে শিল্পজীবীদের মধ্যে কর্ম্মকার-শ্রেণীকে কিছু কিছু টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে তাহারা আপনাদের দুর্দ্দিন কাটিয়াছে। এখন আবার ভগবানের কৃপায় তাহাদের কারবার একরূপ মোটামুট চলিতেছে। মহাজনেরাও এক্ষণে তাহাদের দ্বারা বাসন প্রস্তুত করাইতেছেন এবং সেই-সকল বাসন বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করিতেছেন। এই দুর্দ্দিনে যে-সকল দরিদ্র ব্যক্তির কুটীর দৈব দুর্ব্বিপাকে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে, তাহাদিগকেও এই সমিতি কোথাও কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন এবং স্থলবিশেষে তাহাদের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য অর্থদান করিয়াও সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা এক সময়ে জমীদার শ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন, পরে কাল-প্রভাবে নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রীলোকগণ ও বালকবালিকাগণ কোন কোন থানায় কিছু কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন।

যাঁহারা সাহায্য পাইতেছেন না,

ইহার পর বাঁকুড়া-দর্পণ তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

শ্রমজীবী-সম্প্রদায় ও অন্ধ, খঞ্জ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের জীবন রক্ষার একরূপ উপায় ত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু দরিদ্র শ্রেণীর ভদ্র গৃহস্থগণের কষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এখন প্রতিদিনই তাঁহাদের ক্রন্দনধ্বনি আমাদের শ্রুতিগোচর হইতেছে। এসম্বন্ধে বহু দরিদ্র ভদ্রলোকের পত্র আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। তাহা গণনা করিতে পারি না। তাঁহারা অন্নসত্রে গিয়া ভিক্ষা করিতেও পারেন না, আর বাঁধ পুষ্করিণীতে গিয়া মাটী কাটিতেও পারেন না। তাঁহাদের দশা যে কি হইবে, তাহা বাস্তবিকই ভাবনার বিষয়।

ফাল্গুন মাসের কাগজে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ প্রাপ্ত টাকা যতদূর স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার পর হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছে, অন্যত্র কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকৃত হইল। যথাসময়ে এবং যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হইলেও ভাদ্র আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত দরিদ্রলোকদের সাহায্য করিতে হইবে। সুতরাং আরও টাকার প্রয়োজন। কূপনির্ম্মাণ, গৃহমেরামত, এবং গবাদির খাদ্য সরবরাহ কার্য্যে, বেশী টাকা না পাইলে, হাত দেওয়া যাইবে না।

ফিলিপাইনের অসভ্য জাতিবৃন্দ।

গত মাসে আমরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের যে-সকল অধিবাসী অসভ্য, তাহাদের বিষয় কিছু লিখিয়াছিলাম। ৯০ লক্ষ ফিলিপিনোর মধ্যে প্রায় অষ্টমাংশ বা শতকরা ১২।১৩ জন বর্ব্বর অবস্থায় কালযাপন করে। ইহারা যে কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা কতকগুলি ছবি দিলাম। ছবি ও তাহার নীচে লেখা বর্ণনা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন তাহারা সভ্যতার পথে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে। আমেরিকায় দি ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন (The National Geographic Magazine) নামক একটি মাসিকপত্র আছে। ১৯১৩ নবেম্বর মাসের কাগজে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আভ্যন্তরীন ব্যাপারের কমিশনার মিষ্টার ডীন সী উর্ষ্টার (Dean C. Worcester, Secretary of the Interior of the Philippines, 1901-1913) অসভ্য ফিলিপিনোদের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে ছবি ও বর্ণনাগুলি গৃহীত হইল।

ভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

ভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ কয়েকবৎসর হইল কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছিলেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন, এবং ভক্তিপূর্ণ বিস্তর গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। গীতরত্নাবলী, বিধানভারত, পথের সম্বল, ব্রহ্মগীতা, নববৃন্দাবন, যুগলমিলন, ঈশাচরিত, ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা, কেশবচরিত, সাধু অঘোরনাথ, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, জগতের বাল্য-ইতিহাস, বিংশ শতাব্দী, গরলে অমৃত, ইহকাল পরকাল, বাল্যসখা, যৌবনসখা, প্রভৃতি তাঁহার সাহিত্যিক শক্তি ও কর্ম্মভাবের পরিচায়ক।

বাংলাদেশের সরকারী ব্যয়।

বাংলাদেশের ১৯১৫-১৬ সালের বজেটে শিক্ষার ব্যয় প্রথমে ধরা হয় ১,০৫,৬২,০০০ টাকা। ১৯১৬-১৭র বজেটে ধরা হইয়াছে ৮৮,৩০,০০০ টাকা, অর্থাৎ ১৭ লক্ষ টাকারও উপর কম। ১৯১৫-১৬র শিক্ষা-ব্যয় কমাইয়া সংশোধিত বজেটে ৮৯,৬১,০০০ করা হয়। ১৯১৬-১৭র বজেটে ইহা অপেক্ষাও এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা কম ধরা হইয়াছে। কাজ চলিতে চলিতে যখন আবার এই প্রস্তাবিত

ব্যয়ের পরিমাণ সংশোধন করা হইবে, তখন ইহা আরও কম হইবে, সন্দেহ নাই। জাতীয় সকল উন্নতির মূল শিক্ষা। শিক্ষার ব্যয় কমান অনুচিত হইয়াছে।

১৯১৫-১৬ সালের পুলিশের প্রকৃত ব্যয় ধরা হইয়াছে, ১,১০,২৬,০০০ টাকা; শিক্ষার ব্যয় ৮৯,৬১,০০০। অর্থাৎ শিক্ষা অপেক্ষা পুলিশের ব্যয় ২০,৬৫,০০০ টাকা বেশী। ১৯১৬-১৭র বজেটে শিক্ষার ব্যয় ৮৮,৩০,০০০ এবং পুলিশের ব্যয় ১,০৯,৬২,০০০ ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ শিক্ষাবিভাগ অপেক্ষা পুলিশ বিভাগ ২১,৩২,০০০ টাকা বেশী পাইবে। ইহার মানে এই যে ১৯১৫-১৬ সালে পুলিশ শিক্ষাবিভাগ অপেক্ষা যত বেশী টাকা পাইয়াছিল, ১৯১৬-১৭ সালে তাহা অপেক্ষাও ৬৭,০০০ টাকা বেশী পাইবে। অথচ পুলিশের কাজের চেয়ে শিক্ষকের কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনেক বেশী।

শিক্ষা যেমন দেশের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়, স্বাস্থ্যোন্নতিও তেমনি। পুলিশের কাজের চেয়ে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিভাগের কাজের গুরুত্ব যে কম নয়, বরং বেশী, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু ১৯১৬-১৭র বজেটে পুলিশের বরাদ্দ ১,০৯,৬২,০০০ টাকা, চিকিৎসা বিভাগের বরাদ্দ ২৭,২৫,০০০; অর্থাৎ পুলিশের সিকিরও কম। স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ মোটে দেড়লক্ষ টাকা মাত্র। তাহাও আবার কয়েকটি সহরের জন্য ব্যয়িত হইবে। গ্রাম্য রায়ৎদের জন্য আলাদা করিয়া কিছু রাখা হয় নাই। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানসমূহে বিনামূল্যে সাহায্য দানের জন্য **পাঁচ হাজার** টাকা মাত্র রাখা হইয়াছে!

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিবিভাগের জন্য অথচ রাখা হইয়াছে মাত্র ১১,২৯,০০০ টাকা, অর্থাৎ পুলিশের দশমাংশের কিঞ্চিৎ বেশী।

সরকারী আয় ব্যয় বুঝিতে হইলে মনে রাখা দরকার, যে, বৎসর আরম্ভ হইবার আগে একটা আনুমাসিক হিসাব ধরা হয়, তাহার পর ঐবৎসর শেষ হইবার আগে সংশোধিত আন্দাজ একটা করা হয়, এবং সর্ব্বশেষে ঐ বৎসর শেষ হইয়া গেলে কড়াক্রান্তিতে ঠিক কত আয় ব্যয় হইয়াছিল, তাহা স্থির হয়। ১৯১৪-১৫র শেষ হিসাব হইয়া গিয়াছে; ১৯১৫-১৬র প্রথম আন্দাজ ও সংশোধিত আন্দাজ হইয়াছে, শেষ হিসাব বাকী; ১৯১৬-১৭সালের (যাহা আগামী ১লা এপ্রিল আরম্ভ হইবে) কেবল প্রথম আনুমানিক আয়ব্যয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে। এই আগামী বৎসরে পুলিশের ব্যয় এই প্রথম অনুমান অপেক্ষা বেশী হইবার এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ইত্যাদি বিভাগের ব্যয় প্রথম অনুমান অপেক্ষা কম হইবার আশঙ্কা আছে। কারণ টাকা বজেটে বরাদ্দ থাকিলেই যে খরচ হয়, তাহা নহে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য অর্থ প্রার্থনা।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বঙ্গে ম্যালেরিয়া নাশ করিবার জন্য ১৯১৬-১৭র জন্য ছয়লক্ষ টাকা মঞ্জুর করুন। ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে যেরূপ অর্থের প্রয়োজন, তাহার তুলনায় কমই চাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সার্ শঙ্করন্ নায়ার এই টাকা মঞ্জুর না করিয়া উত্তর দিলেন, যে, "বাংলা-গবর্ণমেণ্ট ত টাকা চান নাই, এবং বাংলাগবর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া নাশের কোন কার্য্যপ্রণালীও স্থির করিয়াছেন বলিয়া বলেন নাই। সুরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল।" নায়ার মহাশয় ইহাও বলেন যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিস্তর টাকা মজুত আছে, যাহা বিনা অনুমতিতে বাংলা-গবর্ণমেণ্ট খরচ করিতে পারেন না। বাংলাগবর্ণমেণ্ট টাকা চান নাই, বা ম্যালেরিয়া নাশের কোন উপায় স্থির করেন নাই, বলিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট বঙ্গের লক্ষ লক্ষ লোককে বৎসর বৎসর মরিতে দেখিবেন, অথচ বাংলাগবর্ণমেণ্টকে কিছু করিতে বলিবেন না ও করিবার জন্য টাকা দিবেন না, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। বাংলাগবর্ণমেণ্ট যদি কর্ত্তব্য-পরায়ণ না হন, তাহা হইলে তাহাকে কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য করা উচিত। বঙ্গের উচ্চতম জনভৃত্যেরা আপনাদের কর্ত্তব্য করিতেছেন কিনা জানিনা। কিন্তু যদি তাঁহারা না করেন, তাই বলিয়া আমাদিগকে বিনাবাক্যব্যয়ে মরিতে হইবে, এ ব্যবস্থায় আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী অল্প টাকা জমিয়া নাই; সাতান্ন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা জমিয়া আছে। ঐ টাকা খরচ করিবার অনুমতি বাংলা গবর্ণমেণ্ট চান নাই, না, ভারত গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন নাই, না, উভয়েই উদাসীন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু এইটুকু অতি অল্পবুদ্ধি লোকেও বুঝে, যে টাকার বরাদ্দ যখন হয়, তখন খরচ করিবার জন্যই হয়, কাগজে ছাপা থাকিবার জন্য হয় না। যে প্রণালীতে এবং যে উপায়েই হউক, এই টাকার সাহায্যে বঙ্গের অন্ততঃ কতকগুলি স্থানও স্বাস্থ্যকর হইলে লোকেরা গবর্ণমেণ্টের জয়জয়কার করিবে।

বাঙ্গালীছাত্রের রাসায়নিক আবিষ্কার।

শ্রীযুক্ত প ক দত্ত কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম্ এস্‌সী পাস করিয়া বিলাত যান। সেখানে তাঁহার গবেষণার সাহায্যে যুদ্ধে ব্যবহার্য্য একপ্রকার বিস্ফোরক (explosive) পদার্থ প্রস্তুত করিবার নূতন প্রণালী আবি-

ক্ষত হইয়াছে। ইনি ঢাকার উকীল শ্রীযুক্ত ললিতকুমার দত্তের পুত্র।

যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালী।

যে-সকল বাঙ্গালী যুদ্ধে আহত সৈন্যদের শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাগদাদ জেলার অন্তর্গত টেসিফন নামক স্থানের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন; ঘোরতর শেলবৃষ্টির মধ্যে হত ও আহত লোকদিগকে সরাইয়া লইয়া যাওয়া তাঁহাদের কাজ ছিল। এই কাজ তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবে করিয়াছেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রের যাহা কিছু কষ্ট তাহাও পুরামাত্রায় সহ্য করিয়াছেন। এই সরকারী খবর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অস্ত্র হাতে করিয়া যুদ্ধ করায় একটা উত্তেজনা আছে; তাহাতে সাহস বাড়ে বই কমে না। কিন্তু কাহারও শরীরে শত্রুর গোলাগুলি শেল্ লাগিতে পারে, অথচ তাহাকে তাহা না ভাবিয়া ধীর ভাবে আহতদের সরাইয়া লইয়া যাইতে ব্যস্ত থাকিতে হইবে, ইহা যুদ্ধে-নিরত সৈন্যদের চেয়ে কম সাহসের কাজ নয়, বরং বেশী। সব রকম সাহসের কাজ করিতে বাঙ্গালী সমর্থ, এ বিশ্বাস আমাদের ছিল। যাঁহারা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন, তাঁহাদের জন্য এই একটি প্রমাণ উপস্থিত।

যশস্বী প্রবাসীবাঙ্গালীর স্মৃতিরক্ষা।

পরলোকগত ডাক্তার আশুতোষ মিত্র কাশ্মীর রাজ্যে অনেক উচ্চ রাজকীয় কার্য্য করিয়া জীবনের শেষভাগে কাশ্মীরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Home Minister) হইয়াছিলেন, এবং এই পদের কাজ পূর্ণ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিধবা সহধর্ম্মিণী কলিকাতাস্থ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগের চিকিৎসালয়ে (Hospital for Tropical Diseases) একটি গবেষণাবৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই বৃত্তিটি মাসিক তিনশত টাকা পরিমিত, এবং "ইহা ডাক্তার আশুতোষ মিত্র গবেষণা-বৃত্তি" নামে অভিহিত হইবে। মিত্রজায়া মহোদয়া স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থ উপযুক্ত সদুপায় অবলম্বন করিয়াছেন। আশা করি এই বৃত্তি ভারতীয় ছাত্রদের জন্য অভিপ্রেত।

মুসলমান শিক্ষার জন্য দান।

অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-ইন্স্পেক্টর মৌলবী আব্‌দুল করীম মহোদয় মুসলমানদের মধ্যে লৌকিক ও পারমার্থিক জ্ঞান বিস্তারের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ দান।

স্কুলপাঠ্য বহিতে ধার্ম্মিকের নিন্দা।

অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত ইংরেজ ইতিহাসের গল্পাবলীর তৃতীয়খণ্ডে একস্থানে ইসলাম-প্রবর্ত্তক মহম্মদকে "False prophet" "ঝুঁটা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক" বলা হইয়াছে। এই বহি হেয়ারস্কুলে এবং সম্ভবতঃ অন্য কোন কোন বিদ্যালয়ে পড়ান হয়। ধার্ম্মিকের মিথ্যা নিন্দায় কলুষিত এরূপ বহি পাঠ্যতালিকা হইতে বাদ দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

ইংরেজ বণিকের মনের কথা।

বাংলাদেশ-প্রবাসী ইংরেজ বণিকদের একটি সমিতি আছে; তাহার নাম বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স্। ইহার বার্ষিক সভায় সভাপতি মিষ্টার ষ্টুয়ার্ট বলেন—"ভারতবাসীদের নিজেদের ব্যবহার্য্য জিনিষের কিয়দংশও নিজেরাই উৎপাদন করিতে এখনও অনেক বৎসর লাগিবে, এবং প্রসঙ্গত ইহাও বলা যায় যে, ভারতবাসীরা যখন তাহা করিতে পারিবে, তখন তাহা ব্রিটেনের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না।" তা ত বটেই!

"দেশী" ও বৃটিশ ভারত।

ইংলণ্ডের শেফীল্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ফিশার সাহেব সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ কর্ত্তৃক পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশনে সভ্য নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি গত জানুয়ারী মাসে ইয়র্ক সহরে ভারতবর্ষের সমস্যা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে ভারতবর্ষের দেশী রাজ্যগুলি সম্বন্ধে বলেন, "যে রাজ্যগুলির প্রজারা সুশাসিত, সেখানে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মূর্ত্তি লক্ষিত হয়, এবং আমার ধারণা এই যে, লোকেরা তথায়, মোটের উপর, ব্রিটিশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিকতর সুখী ও অধিকতর আরামে বাস করে।" ব্রিটিশ শাসন অপেক্ষা দেশী লোকদের শাসন অন্ততঃ কতকগুলি রাজ্যেও যে ভাল, একজন বিদ্বান ইংরেজের এই উক্তির মূল্য আছে। আমরা স্বরাজ পাইলে দেশটা উচ্ছন্ন যাইবেই, এ কথা তাহাহইলে খুব জোর করিয়া বলা যায় না।

ফিশার সাহেবের বক্তৃতার আর একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিয়াছিলেন:—"আমি সরল অন্তঃকরণে বলিতেছি, ভারতবর্ষে আমি এমন অতি পবিত্রচরিত্র, অতি সূক্ষ্ম- ও মার্জ্জিত-বুদ্ধি, অতি ভদ্র লোক দেখিয়াছি, যাঁহাদের জুতার ফিতা খুলিবার আমি অযোগ্য।"

বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ।

কয়েক বৎসর আগে যখন পেশাওয়ারের নিকট বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ কিছু পাওয়া যায়, তখন তাহা ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। সম্প্রতি পঞ্জাবে প্রাচীন তক্ষশিলার নিকট বুদ্ধদেবের আর কিছু দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। পাছে তাহাও বিদেশে চালান হইয়া যায়, এই ভয়ে বাকি-

পুরের অধিবাসীবর্গ এক সভা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে তাহা ভারতবর্ষের বাহিরে না, পাঠাইয়া যেন বিহারে কোথাও রাখা হয়, কারণ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বিহারেরই বুদ্ধদেবের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। অস্থি যেখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে সেখানেই যদি রাখা না হয় তাহাহইলে এই অনুরোধ খুব সঙ্গত। বুদ্ধদেবের অস্থি ভারতের বাহিরে গেলেই যে তিনি আমাদের পর হইয়া যাইবেন, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার অস্থি অন্য জায়গায় পাঠাইবারই বা আবশ্যক কি? তাঁহার মর্ত্ত্য শরীর মাটিতে বাতাসে যেখানেই মিলিয়া যাউক, তাঁহার জীবন, চরিত্র ও উপদেশ আমাদের গৌরব ও সম্পত্তি, সকল মানুষের গৌরব ও সম্পত্তি হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষে যাহা রক্ষিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষে রাখা স্বাভাবিক। তাহা জেদ করিয়া অন্যত্র পাঠাইলে লোকে সন্দেহ করিবে, যে, ভারতবর্ষের কোন স্থান নূতন করিয়া এশিয়ার নানা স্বাধীন দেশবাসী বৌদ্ধদিগের তীর্থে পরিণত হয়, তাহাদের চক্ষে ভারতবাসী পরোক্ষভাবেও গৌরবমণ্ডিত হয়, ইহা কতকগুলি ক্ষমতাশালী ইংরেজ কর্ম্মচারীর অসহ্য। এই জন্য গবর্ণমেণ্টের এরূপ কিছু হইতে দেওয়া উচিত নয়।

বাঁকিপুরের সভায় দশজন গণ্যমান্য মুসলমান উপস্থিত ছিলেন, এবং সভাস্থলে নির্ব্বাচিত কমিটিতে সৈয়দ মজহর্-অল্-হক্ মহাশয় আছেন। এইরূপই হওয়া চাই।

বিহারে বাঙ্গালী।

বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরের লাট সাহেব সার্ এড্ওয়ার্ড গেটকে ভাগলপুরের বাঙ্গালীরা সম্প্রতি অভিনন্দিত করেন। অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে তিনি বলেন:—

"বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা বাঙ্গালীরা যে বুঝিয়াছেন যে তাঁহাদের ভালমন্দ বিহারের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, ইহা সুখের বিষয়। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে অতীত কালে বাঙ্গালীরা বিহারের অনেক উপকার করিয়াছেন, এবং ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতি বহু পরিমাণে সকল শ্রেণীর ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে।"

লাটসাহেব ঠিক কথা বলিয়াছেন। বাঙালীদের আর একটি অভিনন্দনপত্রের উত্তরেও তিনি বলিয়াছেন:—

"এই সুযোগে আমি আমার সহকর্ম্মীদিগের ও আমার নিজের পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট এই অঙ্গীকার করিতে চাই যে আমরা সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিতে এবং পক্ষপাতিত্বের মত কিছু পরিহার করিতে চেষ্টা করিব।"

ইহা অপেক্ষা পরিষ্কার কথা আর হইতে পারে না। তথাপি বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা বাঙ্গালীদের নানা অসুবিধা হইতেছে, এবং পক্ষপাতিত্ব না হইতেছে, এমনও নয়। কিছুদিন হইল একটি "কর্ম্মখালি"র বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহাতে লেখা ছিল যে বিহার-উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর আফিসের জন্য ৩ জন ইউরোপীয় কিংবা ফিরিঙ্গী সহকারী চাই; এক জন কেরানী, বেতন ২০০, আর এক জন কেরানী, বেতন ১৫০, তৃতীয় ১ জন সংক্ষিপ্ত-লেখক (stenographer) বেতন ৩০ হইতে ৫০। এই কাজগুলির জন্য বিহারী বা ওড়িয়া বা বাঙ্গালী পাওয়া যাইবে না, ইহা কেন মনে করা হইল, অথবা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইতে পারে জানিয়াও কেন তাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইল? পাটনার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের মত প্রবীণ সুদক্ষ বয়োজ্যেষ্ঠ উকীলের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহা অপেক্ষা যোগ্যতর বা বয়োজ্যেষ্ঠ নহেন, এমন একজনকে কেন নূতন পাটনা হাইকোর্টের গবর্ণমেণ্ট উকীল নিযুক্ত করা হইল? ইহা কি পক্ষপাতিত্ব নহে। পূর্ণেন্দু বাবু বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা, বিদ্বান বুদ্ধিমান্, গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্সও তিনি দেন, হিন্দীও বলেন, বিহারের উন্নতির চেষ্টাও তিনি করেন; কেবল তাঁহার মাতৃভাষা বাংলা বলিয়া তাঁহার দাবী কেন অগ্রাহ্য হইল?

বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরের বাঙালীরা আর-সকলের মত খাজনা দেয়, আইন মানে, গবর্ণমেণ্টের ও ঐ প্রদেশের হিতকর কাজ করে, প্রাদেশিক লোকদিগকে কাজ দেয়, তথাকার শস্য ও শিল্পদ্রব্য ক্রয় করে; তাহারা তবে কেন অবাঞ্ছনীয় অধিবাসী বলিয়া বিবেচিত হইবে?

ইহা বেশ ভাল নিয়ম যে প্রত্যেক প্রদেশের প্রাদেশিক আফিসগুলিতে তথাকার অধিবাসীদের কাজ পাইবার দাবী সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু "অধিবাসী"র মানে কি? ইহার মানে এ নয় যে যাহার পূর্ব্বপুরুষ স্মরণাতীত কাল হইতে ঐ প্রদেশে বাস করিতেছে; তাহা হইলে প্রত্যেকের বংশাবলী ও বংশের বাসস্থান পরিবর্ত্তনের ইতিহাস খুঁজিতে হয়। তাহা অসম্ভব। যে-কেহ ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া কোন প্রদেশে স্থায়ীভাবে বাস করে, তথায় বিষয়কর্ম্ম করে এবং পরিবার প্রতিপালন করে, সেই তথাকার অধিবাসী। মাতৃভাষা লইয়া বিচার করিলে চলিবে না; এবং যদি তাহা করিতেই হয়, তাহা হইলেও যে ভাষাভাষীর সংখ্যা কোন প্রদেশে বেশী একমাত্র সেই ভাষাটিকেই তথাকার মাতৃভাষা বলিয়া ধরিলে চলিবে না। বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরে হিন্দী বলে সকলের চেয়ে বেশী লোকে, তার নীচে ওড়িয়া, তার পর বাংলা এবং তার পর সাঁওতালী, ইত্যাদি। এইসবগুলিই বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের ভাষা। মানভূম, ধলভূম প্রভৃতি স্থানের প্রধান বাসিন্দা বাঙ্গালীরা ইংরেজ ও মুসলমান রাজত্বের

আগে হইতে তথায় বাস করিতেছে। এই জায়গাগুলি এখন সরকারী ভূগোলে বিহার-উড়িষ্যার অন্তর্গত বলিয়া তথাকার অধিবাসী বাঙ্গালীরা বি-প্রদেশী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যে-সব বাঙালী ইংরেজ-রাজত্বের আগে মুসলমানী আমলে বিহারে উড়িষ্যায় ছোটনাগপুরে আড্ডা গাড়িয়াছে, তাহাদিগকেও বি-প্রদেশী বলা অসঙ্গত। আর, সর্ব্বশেষে যাহারা ইংরেজ-রাজত্বের সময় ইংরেজ-রাজেরই কাজের সুবিধার জন্য এবং নিজেদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরে গিয়া বাস ও বিষয়কর্ম্ম করিতেছে, তাহারাও বাসিন্দা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। বাংলা দেশে তাহাদের স্থান নাই, ও চাকরী বা অন্য বিষয়কর্ম্মের উপায় নাই; বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরেও যদি তাহারা কাজ না পায়, তাঁহাহইলে তাহারা কি পৃথিবীর কোন স্থানেরই অধিবাসী নয়?

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, মলয়ালম, ওড়িয়া, প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত। তাহার মধ্যে শতকরা ৭ জন মলয়ালম বলে, এবং শতকরা ৪ জন করিয়া ওড়িয়া ও কানাড়ী বলে। কিন্তু তাহার জন্য ত মলয়ালম, ওড়িয়া, বা কানাড়ী ভাষীরা মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীতে বি-প্রদেশী বলিয়া পরিগণিত এবং চাকরী হইতে ও শিক্ষার সুযোগ হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বঞ্চিত হয় না? বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরের শতকরা ৬ জন বাংলা বলে। সুতরাং ঐ প্রদেশের বাঙালীরা সমুদয় অধিবাসীর যত বড় অংশ, মলয়লামভাষীরা মান্দ্রাজীদের প্রায় তত বড় অংশ, এবং ওড়িয়াভাষী ও কানাড়ীভাষীরা তার চেয়ে কম অংশ। আগ্রা-অযোধ্যাপ্রদেশে শতকরা ৩ জনের মাতৃভাষা মধ্য-পাহাড়ী (Central Pahari)। এই পাহাড়ীভাষীরা কেহই চাকরী হইতে বঞ্চিত হয় না; বরং ইহাদের মোট সংখ্যার তুলনায় আগ্রা-অযোধ্যা গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারিয়েট আফিস-সকলে পাহাড়ী কর্ম্মচারীর সংখ্যা অধিক। লেখাপড়ায় অগ্রসর বলিয়া বাঙালীদের দাবী অগ্রাহ্য হওয়া উচিত, এইরূপ অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ-কর্ম্মচারীর মনের ভাব। পাহাড়ীরাও লেখাপড়ায় বেশ অগ্রসর। কিন্তু তাহারা ত চাকরীতে বঞ্চিত হয় না। বোম্বাই-প্রেসিডেন্সিতে শতকরা ৫ জন তেলুগু, ১১ জন কানাড়ী, ১৩ জন সিন্ধি এবং ২৮ জন গুজরাতী বলে। ইহারা কেহই চাকরীতে বা শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয় না, এবং ইহাদের মধ্যে কোন ভাষাভাষীই বুদ্ধিবিদ্যায় অনগ্রসর নহে। সকল প্রদেশ হইতেই এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বিহারের স্কুলকলেজে বাঙালীর ছেলেদের ভর্ত্তি হওয়া, এবং খুব বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী হইলেও বৃত্তি পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। বিহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় পাটনা কলিজিয়েট স্কুলে এখন আর বাংলা পড়ান হয় না। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা একটি পরীক্ষার বিষয়, অথচ আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের বাঙালী অধিবাসীর সংখ্যা ২২ হাজার মাত্র। আর বিহার-উড়িষ্যায় প্রায় ২৩ লক্ষ বাঙালীর বাস, কিন্তু তথাকার প্রধান বিদ্যালয়ে বাঙালীর মাতৃভাষা শিখান হয় না। বাঁকীপুরের স্কুলকলেজগুলিতে মোট ছাত্রছাত্রী কত, এবং তন্মধ্যে বাঙালী ছাত্রছাত্রী কত, তাহা যদি "বেহার হেরাল্ড" প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, যে, কত বেশী পরিমাণ ছাত্রকে বৃত্তিলাভ এবং মাতৃভাষা শিক্ষালাভ বিষয়ে অসুবিধায় ফেলা হইয়াছে।

এক পরিবারের ৭টি ছেলেমেয়ের মধ্যে যদি ২টি বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং ৫টি শীর্ণকায় হয়, তাহা হইলে বাড়ীর কর্ত্তা বলিষ্ঠ দুটিকে খাইতে না দিয়া শীর্ণকায় অন্য পাঁচটির সমান করেন না; শীর্ণ ৫টির খাইবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদিগকেও হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তুলেন। যদি ৭টির মধ্যে ২টি লেখাপড়ায় ভাল এবং ৫টি তত ভাল না হয়, তাহা হইলে ভাল দুটিকে স্কুল যাইতে না দিয়া এবং তাহাদের বহিগুলি কাড়িয়া লইয়া কর্ত্তা তাহাদিগকে অন্য ৫ জনের সমান করেন না; অনগ্রসর পাঁচজনের জন্য ভাল শিক্ষক রাখিয়া ও অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে ভাল ২ জনের সমান করিয়া তুলেন। বিহার গবর্ণমেন্টেরও এইরূপ করা উচিত। বিহারীদের ও ওড়িয়াদের জন্য বিশেষবৃত্তি স্থাপন বা অন্য সুবিধা করা হউক; কিন্তু সাধারণ বৃত্তি হইতে, শিক্ষা লাভের সাধারণ সুযোগ হইতে বাঙ্গালীকে বঞ্চিত করা বড়ই অন্যায়, এবং শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতির অননুমোদিত। বাঙালী বিহারী ওড়িয়া সকলেরই শিক্ষার জন্য যথেষ্ট স্কুলকলেজ না থাকে, আরও স্কুলকলেজ স্থাপিত হউক; কিন্তু শিক্ষা পাইতে ব্যগ্র, শিক্ষালাভে সুনিপুণ কোনও ছাত্রকে শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা সভ্য গবর্ণমেন্টের কোন কর্ম্মচারীর পক্ষে অতিশয় লজ্জার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের বাহিরে বিস্তর দেশে একাধিক ভাষা প্রচলিত আছে। আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডল (U. S. A.), অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, প্রভৃতি দেশের উল্লেখ না করিয়া বিলাতের কথাই বলি। ১৯১১ সালে ওএল্‌সের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭.৯ জন শুধু ওএল্‌শ্‌ ভাষা, ৩২.৫ জন ওএল্‌শ্‌ এবং ইংরেজী, এবং বাকী প্রায় ষাট ইংরেজী বলিত। কিন্তু যে যে-ভাষাই বলুক, চাকরী, ছাত্রবৃত্তি, বা শিক্ষার সুবিধা হইতে কেহই বঞ্চিত হয় না। স্কটল্যাণ্ডের হাজারে ৪ জন শুধু গেলিক, হাজারে ৩৯ জন ইংরেজী ও গেলিক এবং বাকী হাজারকরা ৯৫৭ জন শুধু ইংরেজী বলে। কিন্তু সবাই সব বিষয়ে সমান অধিকার ভোগ করে। অথচ, বাঙালীদের মত

স্বচ ছাত্রদেরও খুব বুদ্ধিমান্ বলিয়া খ্যাতি আছে। আয়ার্‌ল্যাণ্ডে হাজারে ৩৯ জন শুধু আইরিশ, ১২৯ জন ইংরেজী ও আইরিশ, এবং ৮৩২ জন কেবল ইংরেজী বলে। সকল বিষয়ে সকলের অধিকার সমান।

সরকারী কাজকর্ম্মের জন্য উড়িষ্যায় ওড়িয়া, এবং বিহারে হিন্দী জানা চাই, গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিলে তাহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু কোন বিহারী বা ওড়িয়া যদি মানভূম, ধলভূম, আদি বাংলাভাষী স্থানে কাজ চান, তাঁহাকেও বাংলা জানিতে হইবে, এবং দেশের যে-কোন স্থানে ইংরেজ চাকরী করিবেন, তাঁহাকেও তথাকার চলিত ভাষা শিখিতে হইবে, এই নিয়ম করা চাই।

সেদিন বিহারের খুব উচ্চপদস্থ একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীর সঙ্গে একজন বাসিন্দা বাঙ্গালীর পুত্র বাসিন্দা এক ব্যারিষ্টার দেখা করিতে যান। ইংরেজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কেন?" অর্থাৎ বাঙ্গালীর বিহারে আসাটা অনধিকার-প্রবেশের মত। বাঙ্গালীটি উত্তরে বলিতে যাইতেছিলেন, "আপনিই বা এখানে কেন?" কিন্তু সামলাইয়া বলিলেন, "আপনি যে বাড়ীতে বাস করিতেছেন, উহা আমার পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল।" বাস্তবিক ইংরেজরা মনে করেন, টাকা রোজগারের জন্য তাঁহারা, শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাইতে অধিকারী; কিন্তু বাঙালী ঘরের চৌকাঠ পার হইয়া বিহার যাইতে পাইবে না; এমন কি যদি বিহারে তাহার ঘরবাড়ী থাকে, যদি তাহার বাপ-পিতামহকে ইংরেজই নিজের কাজ অচল দেখিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাহাকে বিহারে উপার্জ্জনের আশা ছাড়িতে হইবে! ইংরেজ মনে করেন, তিনি জেতা বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা চলে না। কিন্তু অন্যত্র যাহাই হউক, বাংলাবিহার-উড়িষ্যা ইংরেজ প্রথমে দেওানী সূত্রে দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, জয় করিয়া নহে।

ঔষধাদিতে ব্যবহৃত স্পিরিটের উপর ট্যাক্স।

"সুরাসার বা স্পিরিটের উপর ট্যাক্স" সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যটি ছাপা হইয়া যাইবার পর ঠিক খবর পাইলাম। সাবেক বন্দোবস্ত এইরূপ ছিল:—বিদেশ হইতে আমদানী পানীয় স্পিরিটের ট্যাক্স ছিল প্রতি গ্যালনে ৯৸৵৩, কিন্তু আমদানী ঔষধে যে স্পিরিট থাকিত, তাহার উপর ট্যাক্স ছিল ৭৸৴। ভারতবর্ষস্থ ঔষধ-উৎপাদক কারখানাগুলি যদি দেশী স্পিরিট ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ৭৸৴ ট্যাক্স লাগিত; কিন্তু দেশী স্পিরিট অপকৃষ্ট এবং সব সময়ে যথেষ্ট পাওয়া যায় না বলিয়া তাঁহারা বিদেশ হইতে আমদানী স্পিরিট ব্যবহার করিতেন, এবং তাহার উপর প্রতি-গ্যালনে ৯৷৵৹ দিতে হইত। এইজন্য বিদেশী ঔষধ-উৎপাদকদের তাঁহাদের চেয়ে সুবিধা ছিল। এখন ট্যাক্সের যে নূতন বন্দোবস্ত হইল, তাহাতে দেশী বিদেশী পানীয় বা ঔষধে ব্যবহৃত সব স্পিরিটেরই উপর প্রতি গ্যালনে ১১৷ ট্যাক্স বসিল। ইহাতে একপ্রকার সাম্য হইল বটে; কারণ দেশী বিদেশী সব কারখানাওয়ালাকেই সমান ট্যাক্স দিতে হইবে। কিন্তু একে ত ঔষধ মাত্রেরই দাম চড়িয়াছে, তাহার উপর এই ট্যাক্স বাড়াতে ঔষধ আরও দুর্ম্মূল্য হইবে। ইহাতে রোগীরও অসুবিধা, এবং দামী জিনিষের কাট্‌তি কম হওয়ায় কারখানারও অসুবিধা।

সকলের চেয়ে ভাল হইত, যদি ঔষধে ব্যবহৃত স্পিরিটের অপেক্ষাকৃত কম সাবেক ট্যাক্স (৭৸৹) বজায় রাখিয়া, উহা ভারতবর্ষে ও বিদেশে প্রস্তুত ঔষধে ব্যবহৃত দেশী ও বিদেশী উভয় স্পিরিটের উপরই সমান হারে আদায় করা হইত। অর্থাৎ আগে দেশী ঔষধের কারখানায় ব্যবহৃত বিদেশী স্পিরিটের ট্যাক্স ছিল ৯৷৵৹; উহা কমাইয়া, বিদেশী ঔষধকারখানায় ব্যবহৃত তথাকার স্পিরিটের ট্যাক্স ৭৸৹র সমান করিয়া দিলে ভাল হইত। পানীয় স্পিরিটের উপর ট্যাক্স যত টাকা আদায় হয়, তাহার তুলনায় ঔষধের স্পিরিট হইতে অতি অল্প টাকাই পাওা যায়। সুতরাং শেষোক্ত স্পিরিটের ট্যাক্স না বাড়াইলে রাজস্ব এমন কিছু কমিত না যাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আসে। ট্যাক্স বাড়াইয়া ভারতবর্ষস্থ কারখানাগুলিকে সামান্য টাকার জন্য অসুবিধায় ফেলা হইল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ব্যাপার।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের সহিত একজন অধ্যাপকের সংঘর্ষ, ছাত্রদের ধর্ম্মঘট, অধ্যাপকের উপর আক্রমণ,

প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার তদন্তের রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বেই কলেজ বন্ধ করা হইয়াছিল, কয়েকটি ছাত্র কলেজ হইতে তাড়িত বা অন্যরূপে দণ্ডিত হইয়াছিল, এবং ইডেন ছাত্রাবাস হইতে দ্বিতীয় ও চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ব্যতীত অন্য সকলে তাড়িত হইয়াছিল। তাহার পর ৫ম ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর যে-সব ছেলে আইন পড়ে তাহাদিগকে থাকিতে অনুমতি দেওা হয়। সমস্তই বিচিত্র ব্যাপার। বিচারাধীন ব্যাপারে হয় দুই পক্ষকেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্তি দিতে নাই, কিম্বা উভয় পক্ষকেই নিজ নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতে হয়। কিন্তু এস্থলে বরাবর একপক্ষেরই উপর শাস্তির হুকুম হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানকমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান সেশনের শেষ পর্য্যন্ত কলেজ বন্ধ থাকিবে, অর্থাৎ উহা একবারে গ্রীষ্মের বন্ধের পর খুলিবে; কিন্তু প্রিন্সিপাল ১ম ও ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষা, তারিখ নির্দ্দেশ করিয়া, গ্রহণ করিবেন। এইরূপ আদেশের প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমরা মনে করি না; ইহা ছাত্রদের পক্ষে হিতকর, কিম্বা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, বলিয়াও মনে করি না। এক হাতে তালি বাজে না। যে অধ্যাপককে লইয়া এত হাঙ্গামা, তাঁহার কি কোন দোষ ছিল না? যদি দোষ ছিল, তাহা হইলে তাঁহার কি দণ্ড হইল? যদি দোষ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করা হইল না কেন? যদি বলেন, সে-সব বিচার পরে হইবে; তাহা হইলে, জিজ্ঞাসা করি, ছাত্রদের শাস্তিটাই বরাবর এত তাড়াতাড়ি দেওা হইতেছে, এবং অধ্যাপককে কিছু বলিতেও বিলম্ব হইতেছে কেন? ইংরেজীতে যে কথা আছে, The king can do no wrong, তাহার রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু A European professor can do no wrong এমন কোন কথা নাই।

ইডেন ছাত্রাবাস হইতে যে-সব ছেলে তাড়িত হয়, তাহারা অনেকে সেদিন দুমুঠা খাইতেও পায় নাই, অন্য কোথাও এক বেলা বা একদিন থাকিবারও বন্দোবস্ত করিতে পারে নাই। কেহ কেহ পীড়িত ছিল। একটি পীড়িত ছেলের মাসীর বাড়ী কলিকাতায় বলিয়া সে কোনপ্রকারে আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়াছে। এইরূপ ব্যবহারে কি খুব মমতার পরিচয় পাওা যায়? না, ইহা দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বাড়ে? এক প্রকারের ভয় বাড়ে বটে।

প্রথম যখন অধ্যাপক ওটেনের সহিত ছেলেদের সংঘর্ষ হয়, তখন উভয়পক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করায়, বাহ্যতঃ, মিটমাট হইয়া যায়। অথচ ছেলেদের জরিমানা পাঁচ টাকা করিয়া মাফ হইল না, তাহা দিতে হইল! অর্থাৎ তাহারা অধ্যাপকের ত্রুটি ভুলিয়া গেল, কিন্তু তাহাদের ত্রুটি শিকায় তোলা থাকিল, এবং জরিমানার আকারে তাহাদের ঘাড়ে পড়িল। ইহাতে তাহাদের পক্ষে এরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে যে তাহাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইল। পরে যখন অধ্যাপক ওটেন কয়েকটি ছেলেকে, পূর্ব্বের যে ব্যাপারের জন্য উভয় পক্ষের ত্রুটি স্বীকার ও করমর্দ্দনাদি হইয়াছিল, তাহারই জন্য ক্লাস হইতে তাড়াইয়া দিলেন, এবং তাহারা প্রিন্সিপ্যাল জেমসের নিকট গিয়া কোন প্রতীকার পাইল না, তখন ছেলেদের এই ধারণা সম্ভবতঃ আরও বদ্ধমূল হইল যে অধ্যাপক ও কর্ত্তৃপক্ষকে বিশ্বাস নাই। গুরুশিষ্যের মধ্যে মনের ভাব এরূপ হওয়া যে অত্যন্ত শোচনীয়, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু ছাত্রেরা বয়ঃকনিষ্ঠ, শিষ্য ও দুর্ব্বলপক্ষ বলিয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের জন্য একমাত্র তাহাদিগকেই দায়ী করা যায় না। সম্ভবতঃ, কিছু দায়ী হইলেও, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা কম দায়ী।

অধ্যাপক ওটেনের উপর আক্রমণ।

অধ্যাপক ওটেনকে কে মারিয়াছে, এখনও প্রকাশ পায় নাই। মানুষকে, বিশেষতঃ গুরুস্থানীয় ব্যক্তিকে, মারা অনুচিত। এ বিষয়ে কোনই মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু বিশ্বের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, যাহা ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে খাটিয়া থাকে। কেহ যদি মাথা দিয়া তাল ঠুকিয়া দেওাল ভাঙ্গিতে চায়, দেওালও তাহার মাথাকে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। কেহ যদি প্রতিধ্বনিকে বলে, "তুই বর্ব্বর," প্রতিধ্বনিও তাহাকে বলে, "তুই বর্ব্বর।" কেহ যদি

অপরকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করে, অপরেও তাহাকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করিবে। বিশ্বে এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম আছে। উহার হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। অধ্যাপক ওটেন আপনিই আপনাকে এই নিয়মের অধীন করিয়া ফেলিয়াছিলেন কিনা, অনুসন্ধান-কমিটীর রিপোর্ট বাহির হইলে হয়-ত তাহা জানা যাইবে। এখন কিছু বলা যায় না।

আইনের প্রতিশোধ ও ব্যক্তিগত প্রতিশোধ।

বিশ্বে যে ঘাত-প্রতিঘাত আছে, মানুষের ঝগড়া-বিবাদেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অসভ্য সমাজে বা অনুন্নত ভাবে শাসিত দেশে একজন যদি আর এক-জনকে মারে বা অপমান করে, তাহা হইলে আক্রান্ত বা অপমানিত ব্যক্তি নিজেই মারিয়া বা অপমান করিয়া তাহার প্রতিশোধ দেয়। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। উন্নত প্রণালীতে শাসিত দেশে আইন মাঝখানে দাঁড়াইয়া আঘাতের প্রতিঘাত করিবার ভার লইয়া থাকেন। ইহাই বাঞ্ছনীয়। এই জন্য আইনের, বিচারকের, শাসনকর্ত্তার সমদর্শী হওয়া প্রার্থনীয়। আইনের চক্ষে, শুধু কেতাবে কাগজে নয়, মাঠে ঘাটে রাস্তায়, রেলগাড়ীতে, ষ্টীমারে, আফিস আদালতে, কলকারখানায়, সর্ব্বত্র সকলের সমান ব্যবহার পাওয়া দরকার। বিজ্ঞ ও বিবেচক রাজনীতিজ্ঞেরা ইহা মনে রাখিয়া এমন ব্যবস্থা করিতে থাকেন, যাহাতে ক্রমেই ব্যক্তিগত প্রতিশোধের অভ্যাস ও প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়া তাহার স্থানে আইননির্দ্দিষ্ট প্রতিবিধান ও প্রতিঘাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

যাঁহার প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা আছে, তিনি যদি ক্ষমা করেন, তাহা হইলে তাহাই মনুষ্যত্বের নমস্য আদর্শ। কিন্তু প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি থাকিলে আইনের আশ্রয় লওয়াই ভাল। আইন যেখানে অপক্ষপাতে প্রতিবিধানের ভার লইয়া থাকেন, তাহাই আদর্শ দেশ, জাতি ও সমাজ। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কোনপ্রকারের ব্যক্তিগত প্রতিশোধই ভাল নয়। গুপ্ত আক্রমণ ও আঘাত করিয়া ভয়ে ভয়ে থাকাটা মনুষ্যত্ব-বিকাশের অন্তরায়। অতএব ইহা বিহিত নহে। আবার প্রকাশ্যভাবে দু একটা চড় চাপড় দিলে স্বাধীন দেশে যেরূপ ফল ফলে, তাহার তুলনায়, আমাদের দেশে, বিশেষতঃ ইউরোপীয়কে আঘাত করিলে, ফল বড় গুরুতর হয়।

এই উভয়সঙ্কট ব্যক্তিগত প্রতিশোধের বিপরীত দিকে ভারতবাসীকে স্বভাবতই লইয়া যাইতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক। আর যে-কৃপাপাত্র ব্যক্তি ভয় অসাড়তা বশতঃ সর্ব্বপ্রকার অপমান-বোধের প্রতিবিধানচেষ্টার অতীত, সে ত বেশ নিরাপদ স্থানেই আছে। তাহাকে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহাকেও বলিতেছি, "শক্তিশালী হও, এবং তাহার পর ক্ষমা কর।"

গুরুশিষ্য।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ব্যাপার লইয়া গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা হইতেছে। শিষ্যের যে গুরুকে ভক্তি করা উচিত, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু গুরুর পদে অধিষ্ঠিত মানুষটি যত অপদার্থ, অভদ্র বা দুষ্ট হউক, তাঁহাকে ভক্তি কর ও তাহার বাধ্য হও, ইহা খুব উচ্চ উপদেশ হইলেও সে-ক্ষেত্রে ভক্তি ও বাধ্যতা কি স্বাভাবিক? উপদেশ বড় হইতে পারে, কিন্তু স্বভাব সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠিত। এক পক্ষের চরিত্র, মনের ভাব, আচরণ যদি গুরুর মত না হয়, তথাপি অপর পক্ষের ব্যবহার শিষ্যের মত হইবে, ইহা কি আশা করা যায়?

গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ কৃত্রিম সম্বন্ধ। পিতামাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ স্বাভাবিক; তথাপি কোন কোন সভ্য দেশে শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য সভা ও আইন করিতে হইয়াছে। কেননা, এরূপ স্নেহপূর্ণ স্বাভাবিক সম্পর্ক সত্ত্বেও পিতামাতা কখন কখন নিষ্ঠুর হয়। গুরুপদে অধি-ষ্ঠিত ব্যক্তিও যে কখন কখন নিষ্ঠুর, অভদ্র, অপমানকারী হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সেরূপ ক্ষেত্রে অধ্যা-পকের নিষ্ঠুরতা, অভদ্রতা, বা অপমান নিবারণের ব্যবস্থা চাই কিনা, বিবেচ্য। যদি চাই, তাহা হইলে তেমন স্থলেও কি শিষ্যের মনের ভাব স্বভাবতঃ ভক্তির মত কিছু হইতে পারে?

আমাদের মনে হয়, ইংরেজ অধ্যাপক যদি আপনাকে উৎকৃষ্ট ও প্রভুজাতীয়, এবং ছাত্রকে নিকৃষ্ট ও দাস জাতীয়,

বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ যথাযোগ্য হইতে পারে না। বর্ত্তমানে এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। ভারতবাসী ও ইংরেজের রাজনৈতিক সাম্য না হইলে, এবং শিক্ষাবিভাগের উচ্চতমস্তরে জাতি (race) অনুসারে নিয়োগ না হইয়া কেবল গুণ অনুসারে নিয়োগ না হইলে, এইরূপ ধারণার কারণ দূর হইবে না। এ বিষয়ে আমরা ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসের মডার্ণ-রিভিউতে লিখিয়াছিলাম :—

In England the political status, aims and goals of both professors and students are the same. The student is, or may be, when he comes of age, as much a citizen as his professor. There is no desire, inducement or thought in the professor's mind to keep his students in political tutelage or subordination."

"Supervision and control of students with a political object in view is nowhere absent, degenerating in parts of the country into actual shadowing and spying. We are not here discussing how far such a state of things may or may not have arisen from political or administrative necessity, we are stating circumstances as they are. And these circumstances lead many, if not most, European professors, to bring to their work the minds of police superintendents to some extent, making them look upon their students as potential political offenders. We do not see how mutual love and confidence can grow in such an atmosphere. Nor do we see how manhood can develop under such circumstances."

"In England, professors and students can and do mix on terms of perfect *social* equality. They belong to the same community, race and society. In India European professors and some Indian professors, too, cannot and do not mix on terms of *social* equality with their students. They belong to different communities, races and societies. However affable the English professors here in India may be, the gulf between them and their students, generally speaking, is impassable, so long, at any rate, as India continues to be treated as the Cinderella of the British Empire. This may be a harsh truth, but it is a fact which it is perfectly useless to conceal or blink.

"In England the intellectual and cultural aims and goals of professors and students are the same, and are not in any way antagonistic. An English professor there naturally desires and intends that his English students should in time equal him...; nay, he must often be delighted with the prospect of his students leaving him behind in the race, and outshining him in original work and name and fame.—What a great stimulus all this must be to the work of both teachers and students! In India do the European professors welcome the prospect of their Indian students becoming their equals, not to speak of their being superior to them in culture, in intellectual equipment and strength, in original work and in position? Or do they work with such a prospect in view to bring about its realisation?"

ভাইস-চ্যান্সেলারের রুদ্রমূর্ত্তি।

২৮শে ফাল্গুন কনভোকেশ্যনে ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিয়াছেন :

Indications have been disagreeably in evidence of late that some students so far forget what is due to themselves, their guardians and their Colleges as to let their protests take the shape of unwarrantable combinations and strikes—sometimes worse—in preference to constitutional methods of redress for grievances, always and clearly open to them. When they forget themselves like this, they also forget that the mere fact of going on what is known as strike, not only makes them liable to academic penalties, but they also voluntarily resign their connection with the college, which may be more than difficult to re-establish if the colleges choose to take other than a lenient view of their case. The University, in which control and discipline are vested by law, cannot tolerate such a deplorable state of affairs and is determined sternly to put down disorder and violation of discipline in all shapes.

Principals of some of the colleges held a conference after the earlier regrettable incidents in some of the Calcutta Colleges and they unanimously recommended to the Syndicate that strict measures should be taken to maintain discipline. The Syndicate have accepted their recommendations and have fully endorsed them.

আমরাও মনে করি ছাত্রদের নিয়মাধীন হওা খুবই উচিত, এবং তাহাদের কোন দুঃখ কষ্ট অভিযোগ থাকিলে তাহা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করা উচিত। কিন্তু প্রতিকার না পাইলে, কারখানার মজুর এবং গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের ধর্ম্মঘটরূপ যে আইনসঙ্গত উপায় আছে, তাহা হইতে তাহারা কেন বঞ্চিত হইবে? প্রিন্সিপ্যাল ও অধ্যাপকেরাও ত রাগ দ্বেষ ভুলভ্রান্তির অধীন? ছাত্রদিগকে নিয়মের নিগড়ে একেবারে হাতে পায়ে বাঁধিয়া তাঁহাদের হাতে ফেলিয়া দিলে চলিবে কেন? সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ভ্রান্ত বা বিপথগামী ছাত্রদের দিকে তাঁহার রুদ্রমুখ ফিরাইয়াছেন, কিন্তু অন্যায়াচারী অধ্যাপকদিগের সম্বন্ধে ত কোন কথা বলিলেন না। শক্তের ভক্ত নরমের যম হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজে না। সব কলেজের ছেলেরা ধর্ম্মঘট করিবে, ইহা সম্ভবপর নয়, এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু অসম্ভবও ত নয়। সব কলেজের সব ছেলেকে তাড়াইয়া দিলে কলেজগৃহগুলিতে ও সেনেটের গৃহে, "এই বাটী ভাড়া দেওয়া যাইবে," লিখিতে হইবে। শুধু একপক্ষকে ভয় না দেখাইয়া ভালবাসা ও ন্যায্য ব্যবহার দ্বারা ছাত্রদের হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কনভোকেশ্যনে লর্ড কারমাইকেলের বক্তৃতা অন্য রকমের হইয়াছিল ;—কতকটা মিঠেকড়া মেজাজের ঠাকুরদাদার মত। কিন্তু ছাত্রদের প্রতি হুকুমওলা ঠাকুরদাদার মত হইতেছে না।

বংশ ও জাতি

বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও বংশোন্নতি।

বিবাহ-করা এবং বংশবৃদ্ধি-করা মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক কাজ। এমন কি মানবজাতি তাহার ধর্ম্মসাহিত্যে এই কার্য্যের অতি উচ্চ মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছে। বাইবেল বলিয়াছেন—"Live and Multiply"। হিন্দু জানেন—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই প্রায় এক সিদ্ধান্ত দেখা যায়।

কিন্তু বংশবৃদ্ধি এক বস্তু এবং বংশোন্নতি আর এক বস্তু। বংশবৃদ্ধি হইতে থাকিলেই যে বংশের উন্নতি হইতে থাকিবে তাহার কোন কথা নাই। আবার বংশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে হয়ত অনেক স্থলে বংশবৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করা আবশ্যক হয়।

একমাত্র বংশবৃদ্ধির কথাই মানুষ ভাবে না—বংশোন্নতির বিষয় চিন্তা করাও মানুষের স্বভাব। প্রাচীন কালের মানব, মধ্যযুগের মানব, ইয়োরোপের মানব, ভারতবর্ষের মানব—সকলেই কর্ম্মঠ, স্বাস্থ্যশীল, ধীমান্ সন্তানসন্ততির জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে। এইজন্য প্রত্যেক যুগের সমাজব্যবস্থায়ই বংশোন্নতির প্রয়াস ও লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যুগে যুগে দেশে দেশে যত সমাজ-সংস্কারক, রাষ্ট্রসংস্কারক, আদর্শজীবনপ্রচারক ও শিক্ষাপ্রচারক আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারাও বংশোন্নতির উপায় আলোচনা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। একমাত্র বংশবৃদ্ধির কথা আলোচনা করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। সকলেই বিবাহ, যৌন সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় এমনভাবে নির্দ্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন যাহাতে সমাজের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ উৎকর্ষের অধিকারী হইয়া জন্মিতে পারে। ভূমিষ্ঠ হইবার সময়েই সন্তান যাহাতে উন্নত চিত্ত এবং সুস্থ শরীরের বীজ বহন করিতে সমর্থ হয় সমাজসংস্কারক মাত্রেই তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রয়াসী।

হার্ভার্ডের Quarterly Journal of Economics পত্রিকায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক কীড্ লিখিয়াছেন:—

"Twenty-three hundred years ago the political dialogues of Plato outlined a policy of controlling marriage selection and parentage for the general good of society and declared that the statesman who would advance the welfare of his citizens should, like the fancier of birds, or dogs or horses, take care to breed from the best only."

পাশ্চাত্যেরা কথায় কথায় তাঁহাদের প্লেটোসংহিতার নজির দেখান—আমরা মনুসংহিতার উল্লেখ করি। বলা বাহুল্য বিবাহবন্ধন কিরূপ হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে বৃদ্ধমনু, অতিবৃদ্ধমনু, কনিষ্ঠমনু, এবং মায়ুলিমনু অতি বিস্তৃত এবং বিশদ আলোচনাই করিয়াছেন। কেবল মাত্র মনুর নামে যে-সকল গ্রন্থ, প্রবাদ, প্রবচন ইত্যাদি সুপ্রচলিত সেগুলিই হিন্দুর বিবাহতত্ত্বের শেষ কথা নয়। স্মৃতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা ইত্যাদি নামে পরিচিত এমন কোন ভারতীয় গ্রন্থ নাই, যাহাতে বংশোন্নতির জন্য যৌন-নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আলোচিত হয় নাই। প্রণালীগুলি ভাল হউক বা মন্দ হউক ভারতীয় সমাজব্যবস্থাপকগণ, ধর্ম্মপ্রচারকগণ এবং শিক্ষাধুরন্ধরগণ সকল যুগেই ভবিষ্যৎ বংশধরগণের উন্নতিবিধানের জন্য এই-সমুদয় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্যের পাতায় পাতায় Eugenics অর্থাৎ সুপ্রজনন বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রজনন-বিদ্যার আলোচনা এত বিস্তৃত ও গভীরভাবে অন্য কোথাও হইয়াছে কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষে যাহাকে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ বলা হইয়া থাকে তাহার গোড়ার কথাই বংশোন্নতি ও সুপ্রজনন। কখন্ বিবাহ করিবে, কাহাকে বিবাহ করিবে, কোন্ বয়সে কিরূপ অবস্থায় সন্তান-সৃষ্টির উপযুক্ত হইবে, সন্তানপ্রসবের পূর্ব্বে কিরূপ বিধি-ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক ইত্যাদির আলোচনাই "বর্ণাশ্রমে"র ভিত্তি।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" "প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং" কিম্বা Live and Multiply ইত্যাদি সূত্র অতি সহজ ও সরল। এত সহজে সমাজশাসন এবং সমাজ পরিচালনা চলিতে পারে না। এই জন্যই ভারতবাসীর বর্ণাশ্রম এত জটিলতাপূর্ণ। বর্ণাশ্রমী সমাজ বলিলে দুই শ্রেণীর নিয়ম-পালন বুঝিতে হইবে:—প্রথমতঃ বর্ণভেদের নিয়ম। ইহার দ্বারা বংশের পর বংশ, জাতির পর জাতি, পরিবারের পর

পরিবার, বর্ত্তমানের পর ভবিষ্যৎ ইত্যাদির সকল প্রকার উন্নতি সহজলভ্য হয়। এ নিয়মগুলি প্রধানতঃ বিবাহ ও যৌননির্ব্বাচন সম্বন্ধীয়। দ্বিতীয়তঃ আশ্রমভেদের নিয়ম। ইহার দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের সমগ্রজীবনে সকল প্রকার উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়। মানবমাত্রেরই জীবনে নানা স্তর থাকা অবশ্যম্ভাবী—তাহার মধ্যে বিবাহের স্তরও আছে। কাজেই আশ্রমভেদের নিয়মে বিবাহের নিয়মও পালন করিতে হয়। কিন্তু আশ্রমভেদের সকল নিয়মই বিবাহ সম্বন্ধীয় নয়। এক কথায় নিয়মগুলিকে ব্যক্তিত্ববিকাশ বা শিক্ষাপ্রণালীর নিয়ম বলা যাইতে পারে। ইহার আদর্শ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।"

এই ফর্ম্মুলায় আশ্রমের নিয়ম বুঝা গেল—বর্ণের নিয়ম নয়।

মোটের উপর দেখিতে পাই বিবাহ-তত্ত্ব বর্ণভেদের এবং আশ্রমভেদের উভয় নীতিরই মূলে রহিয়াছে। কাজেই বর্ণাশ্রমী সমাজের প্রবর্ত্তকগণ বিবাহ-বিজ্ঞানে এবং যৌন-নির্ব্বাচন-বিদ্যায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না বিবেচনা করা যাইতে পারে। তবে বর্ণাশ্রমী সমাজ যুগে যুগে কিরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছে তাহার কথা স্বতন্ত্র। বর্ত্তমানকালেই বা বর্ণাশ্রমী সমাজ কি কি কারণে আধুনিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহার আলোচনা সম্প্রতি করিতেছি না। এইটুকুমাত্র জানিয়া রাখা আবশ্যক যে Eugenics ইউজেনিক্‌স্ নামক একটা নূতন পারিভাষিক শব্দ বিগত ৫০ বৎসরের ভিতর ইয়োরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতমহলে দেখা দিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজপরিচালকগণ এই বিদ্যার প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

বর্ণাশ্রমপ্রথার দুই শ্রেণীর নিয়ম দেখিলাম। আধুনিক বিজ্ঞানবিভাগের পরিভাষা ব্যবহার করিলে বলিব যে প্রথমশ্রেণীর নিয়মগুলি Eugenics বা সুপ্রজনন-বিদ্যার অন্তর্গত এবং দ্বিতীয়শ্রেণীর নিয়মগুলি Education Pedagogy বা শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত। অধ্যাপক ইয়ার্কিসের Introduction to Psychology গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে সুপ্রজননবিদ্যা এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রভেদ বুঝান হইয়াছে। এই প্রভেদ দেখিলে আমাদের বর্ণতত্ত্ব এবং আশ্রম-তত্ত্বের প্রভেদ বুঝিতে পারিব।

আশ্রমতত্ত্ব শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত ও ব্যক্তিগত। এই সম্বন্ধে ইয়ার্কিস (Yerkes) বলিতেছেন "Education deals directly with the mind of the *individual.* It directs its development, modifies its activities, leads it to efficiency."

অর্থাৎ কোন্ বয়সে কোন্ ব্যক্তির পক্ষে কি শ্রেয় এবং কি প্রেয় তাহা বিশ্লেষণ করা এবং ব্যক্তির সমগ্রজীবনের সোপান প্রস্তুত করিয়া দেওয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের কার্য্য। "আশ্রম"-ভেদের নিয়ম এই সোপান প্রস্তুত করিবারই প্রণালীমাত্র।

বর্ণতত্ত্ব বংশোন্নতি-বিজ্ঞান অর্থাৎ সুপ্রজনন-বিদ্যার অন্তর্গত ও বংশগত। ইয়ার্কিস বলিতেছেন—"Eugenics deals with mind in the *race.* It directs the course of phylogenesis by controlling inheritance and it thus makes for increased efficiency in the individual."

সুপ্রজনন-বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা বৈজ্ঞানিক (Sir Francis Galton) গ্যাল্টনের ভাষায়—"Eugenics is the study of agencies under social control that may improve or impair the racial qualities of future generations either physically or mentally."

অর্থাৎ কোন্ কোন্ ব্যক্তি জনক বা জননী হইবার উপযুক্ত, কাহার সঙ্গে কাহার বিবাহ বাঞ্ছনীয়, সন্তান-জন্মের পূর্ব্বে পিতামাতার জীবন কিরূপ পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, এই-সকল তত্ত্ব আলোচনা করা Eugenics বিদ্যার কার্য্য। ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থসমূহ আলোচিত তথ্যগুলিতে আগাগোড়া এই বংশোন্নতি-বিধানের প্রয়াসই দেখিতে পাই না কি?

আজকাল ভারতবর্ষে "আশ্রম" আর দেখা যায় না। শিক্ষাপ্রণালী গবর্মেন্টের আদর্শ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতীয় "গুরুগৃহ"-বাসরীতি গলার মত ক্রমশঃ নির্জ্জীব হইয়া আসিতেছে। ইহাতে আর জীবনের স্রোত ও

গতিবিধি দেখিতে পাই না। এমন কি "আশ্রমভেদ" নামক কোন পদার্থ ভারতসমাজে ছিল তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। আশ্রম-তত্ত্বের কথা আমরা একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি।

এখন আছে মাত্র বর্ণভেদ বা জাতিভেদ। ইহাও আজকাল নির্জ্জীব, পঙ্কিল, গতিবিধিহীন, নড়নচড়নহীন। সজীব সমাজের বিবাহবন্ধন, যৌননির্ব্বাচন, রক্তসংমিশ্রণ ইত্যাদি যেরূপ হয় সেরূপ দেখা যায় না। এদিকে বর্ণভেদের আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতা লইয়া মহা দলাদলি চলিতেছে। প্রধানতঃ দুইদল। একদল বলিতেছেন:—"মানবসমাজে উচ্চ নীচ, ছোটবড়, ইতরভদ্র ইত্যাদি থাকা উচিত নয়—অতএ বর্ণভেদ ভাঙ্গিয়া ফেল।" ইঁহারা ফরাসী পণ্ডিত রুসোর Equality of Man অর্থাৎ মানবসমাজের সাম্যবাদ অবলম্বন করিয়া থাকেন। অপরপক্ষ বলিতেছেন:—"ভেদ অবশ্যম্ভাবী—সমাজে ছোটবড় থাকিবেই। পাশ্চত্যসমাজে টাকাপয়সার পরিমাণ অনুসারে জাতিভেদ সৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে গুণানুসারে জাতিভেদের ব্যবস্থা করিয়াছি। গুণগুলি বংশগত। কাজেই আমরা বংশপরম্পরায় জাতিভেদের সাহায্যে গুণগুলি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি।"

দেখা যাইতেছে যে দুই দলই একএকটা দার্শনিক যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন। যদি আলোচনাটা বিদ্যালয়ের ডিবেটিংক্লবের চতুঃসীমায় আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে উভয়ের ভিতর বুঝাপড়া চলিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু উভয়েই নিজ নিজ মত অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সমাজকে ভাঙ্গিতে গড়িতে চাহেন। কাজেই উভয়েই অন্ধভাবে স্বকীয় দর্শনবাদ অনুসরণ করিতেছেন। যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ তাঁহাদের পক্ষে বিজ্ঞান-সেবকের ন্যায় "রাগদ্বেষবহিষ্কৃত" হওয়া অসম্ভব। কাজেই বর্ণভেদ, অথবা আশ্রমভেদ, এবং মোটের উপর বর্ণাশ্রমীসমাজ নিরপেক্ষ সমালোচনার বস্তু হইতে পারে নাই। আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময়ে আমরা যেরূপ চিত্তে অগ্রসর হই—অথবা কোন পুষ্পের দলগুলি গণনা করিবার সময়ে আমরা যেরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন থাকি, বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমরা সেরূপ থাকিতে পারি নাই। খৃষ্টানেরাও তাঁহাদের ধর্ম্ম, সমাজ ইত্যাদি আলোচনা করিবার সময়ে পুরাপুরি নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন না। ইহা মানুষের স্বধর্ম্ম।

যাহা হউক দলাদলি বহুকাল চলিয়াছে—দুইদলে অনেকটা বুঝাপড়াও হইয়াছে। মতভেদ এবং কর্ম্মভেদ থাকা সত্ত্বেও আজকাল দুইদলের ধুরন্ধরগণ নানাক্ষেত্রে জীবনযাপন করিতেছেন। এইরূপ পরস্পরে সহানুভূতি, ভাববিনিময় এবং সমবায়প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া বিশ্বাস হইতেছে যে শীঘ্রই বর্ণাশ্রমতত্ত্ব নিরপেক্ষ সমালোচনার বস্তু হইতে পারিবে। আজকালকার ভারতীয় ইংরেজী ও প্রাদেশিক সাহিত্যে তাহার লক্ষণও দেখিতে পাইতেছি।

বিশেষতঃ কিছুকাল হইল—বিগত ৮।১০ বৎসরের ভিতর Eugenics বা সুপ্রজনন-বিদ্যা এবং Anthropology বা নৃতত্ত্ব বিদ্যা পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে মাথা তুলিয়াছে। ব্যক্তিগত উন্নতি, বংশের উন্নতি, জাতিসমস্যা, পীতাতঙ্ক, কৃষ্ণাতঙ্ক, বর্ণসঙ্কর, Race Questions ইত্যাদি আলোচনা করিবার জন্য রাষ্ট্রবীর, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। ভারতবর্ষেও তাহার প্রভাব আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বলা বাহুল্য পাশ্চাত্যেরা তাঁহাদের নিজ নিজ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য নানাপ্রকার সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিতেছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি রোজই বদলাইতেছে—মতপ্রতিষ্ঠা এবং মতখণ্ডন প্রতিদিনই চলিতেছে। ভারতবাসীরা নিজেদের সমস্যা স্বাধীনভাবে আলোচনা ত করেনই না—বিদেশীয় ধুরন্ধরগণের সিদ্ধান্তসমূহের যথার্থমূল্যও বুঝিতে অসমর্থ। আজ একজন আমেরিকার পণ্ডিত প্রচার করিলেন—নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গের বিবাহ হইলে সুফল লাভ হয়। অমনি একদল ভারতীয় সমাজ-সেবক সুর ধরিলেন—"ভারতবর্ষেও এইরূপ বর্ণসঙ্করের আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়।" অথবা হয়ত একজন ইংরেজ পণ্ডিত প্রচার করিলেন—"পণ্ডিতের সন্তানেরাই পণ্ডিত হন, বদমায়েসের সন্তানেরা বদমায়েস হয়। সুতরাং বংশগত জাতিভেদই প্রশস্ত।" অমনি ভারতীয় ধুরন্ধর বলিতে লাগিলেন—"এই জন্যই ভারতবর্ষের ঋষিগণ ব্রাহ্মণের সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই জন্যই Heredityর মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন।" আর একজন জার্ম্মান পণ্ডিত সপ্রমাণ

করিলেন যে মানবচরিত্র আবেষ্টন, জন্মনিকেতন এবং শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা গঠিত হয়, জনকজননীর চরিত্রের উপর নির্ভর করে না। অমনি ভারতীয় প্রচারক বলিতে আরম্ভ করিলেন—"বর্ণভেদের নিয়মানুযায়ী বিবাহবন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত। যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে যে-কোন ব্যক্তির বিবাহ হইতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।"

পরাধীন জাতির অশেষ দোষ—কোন বিষয়েই তাহার স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে না। এই জন্যই কি গ্রীক পণ্ডিত য়্যারিষ্টটল বলিতেন—"'A slave is a living tool"—অর্থাৎ গোলামের জাতি সজীব যন্ত্রমাত্র? আজকাল তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান আলোচিত হইয়া থাকে। মনস্তত্ত্ববিদেরা পাগলের চিত্ত, প্রতিভাবান্ ব্যক্তির চিত্ত, শিশুর চিত্ত, মূর্খের চিত্ত ইত্যাদি নানাবিধ চিত্ত বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহারা গোলামের চিত্ত ও মনিবের চিত্ত, দাসের চিত্ত এবং প্রভুর চিত্ত, পরাধীনের চিত্ত এবং স্বাধীনের চিত্ত আলোচনা করেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে Comparative Psychology বিদ্যার Normal and Abnormal Psychology বিভাগের এক শাখায় এই দুই ধরণের চিত্ত বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। তাহার নাম হইবে The Psychology of the Slave and the Psychology of the Master. জার্ম্মান দার্শনিক নীটশে Master-morality এবং Slave-morality এই দুইটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে এই দুইটি নূতন শব্দ জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে মনোবিজ্ঞানের এই নূতন প্রস্তাবিত বিভাগের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান ভারতীয় পণ্ডিতগণের সমাজতত্ত্ব-আলোচনায় Slave psychologyর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আশা হইতেছে ভারতবর্ষের গবেষণাকারীগণ আর বেশী দিন এইরূপ Slave-psychologyর দৃষ্টান্তস্থল থাকিবেন না। স্বাধীনভাবে নিজদৃষ্টিতে নিজের ভবিষ্যৎ-স্বার্থ-অনুসারে স্বদেশীয় তথ্যসমূহ ভারতবর্ষে আলোচিত হইতে পারিবে, কথায় কথায় পরকীয় ফর্ম্মূলাগুলি ভারতসমাজে প্রযুক্ত হইবে না।

কতকগুলি সাময়িক কারণে ইয়োরোপে ইউজেনিক্স বা বংশোন্নতিবিজ্ঞান বা সুপ্রজননবিদ্যার প্রচলন হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বর্ষে অধ্যাপক কার্ল পীয়ার্সন এক বক্তৃতা করেন। তখন ইংলণ্ডে ঘোরতর আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। বুয়ার সমরে ইংরেজজাতির শারীরিক ক্ষমতা পরীক্ষিত হইতেছিল। বিচক্ষণেরা বুঝিয়াছিলেন—ইংরেজ নরনারীগণ সকল বিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্য শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যলাভ, বংশোন্নতি, কর্মঠ সন্তানের জন্ম ইত্যাদি বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ বাড়িতেছিল। অধ্যাপক (Karl Pearson) কার্ল পীয়ার্সনের "National Life from the standpoint of Science" নামক প্রবন্ধ সর্ব্বত্র আলোচিত হইতে লাগিল। তখন হইতে বিলাতে Eugenics বিদ্যার চর্চ্চা উৎসাহিত হইতেছে—এক্ষণে ১৫ বৎসরের ভিতর ইয়োরোপে এবং আমেরিকার নানা স্থানে ইহা একটা ফ্যাশনে দাঁড়াইয়াছে। বুঝিয়া না বুঝিয়া সকলেই সুপ্রজননবিদ্যার সূত্র আওড়াইতে চেষ্টা করেন।

অধ্যাপক ফীল্ড তাঁহার The Progress of Eugenics প্রবন্ধে কার্ল পীয়ার্সনের বক্তৃতার সমালোচনা করিয়া ইংরেজসমাজের শোচনীয় চিত্র প্রদান করিতেছেন—

"The time (Nov. 1900), indeed, appears to have been unusually favourable to the reception and spread of such teachings. The shock of the reverses in South Africa, by which, throughout England, spirit 'were depressed in a manner probably never before experienced by those of our countrymen now living' was more or less directly the reason for Professor Pearson's choice of his topic: 'I have endeavoured to place before you a few of the problems which, it seems to me, arise from a consideration of some of our recent difficulties in war and in trade. England in manufactnre and commerce as in war, had shown a want of brains in the right place.' But lack of physique as well as lack of brain was causing apprehension, as evidenced later by the appointment (Sept. 2, 1903) of an Inter-Departmental Committee on Physical Deterioration 'to make a preliminary inquiry into the allegations concerning the deterioration of certain classes of the population as shown by the large percentage of rejections for physical causes of recruits for the Army and by other evidence, especially the Report of the Royal Commission on Physical Training (Scotland)'—which had been created the year before. Subsequently the Committee was further instructed 'to indicate generally the causes of such physical deterioration as does exist in certain classes, and to point out the

means by which it can be most effectually diminished.' Probably the public had been prepared for notions of degeneracy in some parts of the population by the epoch-making investigations of Charles Booth in London—investigation which were just then culminating, after a duration of more than a decade. Finally, it was not without significance that the school of biologists who stood for quantitative studies by means of the technique of modern mathematical statistics, and among whom Galton was a recognised leader, signalised their growing solidarity and influence by establishing in October 1901, their journal Biometrika, which from the time of its initial number has published many articles bearing more or less directly upon eugenics."

সম্মুখ সমরে পরাজিত হইয়া ইংরেজ বংশোন্নতি-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় মনোযোগী হইলেন। সমর-বিজ্ঞান শক্তি-বিজ্ঞানের সূত্রপাত করিল। উপযুক্ত সৈনিকপুরুষ উৎপন্ন করিবার জন্ম বিলাতে Eugenics বা সুপ্রজননবিদ্যার আদর হইয়াছে।

সুপ্রজননবিদ্যা সম্বন্ধে বেশী গ্রন্থ এখনও প্রণীত হয় নাই। সেদিন অধ্যাপক কাস্‌ল্ বলিতেছিলেন—"আমরা পশুপক্ষী এবং তরুলতা সম্বন্ধে যৌননির্ব্বাচনের ফলসমূহ তালিকাকারে সংগ্রহ করিতেছি মাত্র। মানবজীবন এবং মানবসমাজ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সময় এখনও আসে নাই। অধিকন্তু কোন প্রকার সমাজসংস্কারের নিয়ম প্রচার করিবার ক্ষমতা আমাদের এখনও জন্মে নাই। কিন্তু হাতুড়ে সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ ইতিমধ্যেই নানা প্রকার দল পাকাইয়া সমাজগঠন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।"

কয়েকখানা ইংরেজী গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

1. Galton—Hereditary Genius, English Men of Science, Inquiries into Human Faculty, Natural Inheritance, Eugenics : it Definition Scope and Aims.
2. Woods—Heredity in Royalty.
3. Thompson—Heredity.
4. Ribot—Heredity.
5. Saleeby—Parenthood and Race-Culture.
6. Meken—Heredity and Human Progress.
7. Goddard—Heredity of Feeblemindedness.
8. Whethamo—The Family and the Nation.
9. Kellicott—The Social Direction of Human Evolution.
10. Davenport—Race Improvement through Eugenics.
11. Ward—Applied Sociology.
12. Fay—Marriages of the Deaf in America.
13. Jordan—The Blood of the Nation, The Human Harvest.
14. Warner—American Charities.
15. Rentoul—Race Culture or Race Suicide ?.

বর্ণসঙ্কর ও জাতি সংমিশ্রণ।

আজকাল সকল দেশেই মানবের জাতিবিভাগগুলি বুঝিবার প্রয়াস চলিতেছে। বর্ত্তমান যুগে যে-সমুদয় জাতি দেখা যাইতেছে এগুলির উৎপত্তি কেন হইল? এগুলি পুনরায় কিরূপ আকার গ্রহণ করিবে? ভিন্ন ভিন্ন ধরণের রক্তসংমিশ্রণে জাতিপুঞ্জের আকৃতি কিরূপ হয়? এই-সকল প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য সর্ব্বত্রই একটা আগ্রহ দেখা যায়। ভারতবর্ষের 'জাতিভেদ' বা 'বর্ণভেদ' বুঝিবার প্রয়াসও এই সাধারণ প্রয়াসেরই অন্যতম লক্ষণ।

নরনারী লইয়া ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা কঠিন। বিশেষতঃ মানবজাতির বিবাহ, যৌননির্ব্বাচন, রক্তসংমিশ্রণ ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞানগৃহে অনুসন্ধান চালান অসম্ভব। কাজেই জীবজন্তু, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি ইতর প্রাণীসমূহের বংশবৃদ্ধি, বংশোন্নতি ও বর্ণসঙ্কর, ইত্যাদি আলোচনা করার উপর নির্ভর করিতে হয়। পশুপক্ষী তরুলতা কীট পতঙ্গ ইত্যাদির যৌন সম্বন্ধের পরীক্ষা হইতে মানবজাতির যৌনসম্বন্ধ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ পরীক্ষার একটা কারখানা দেখিলাম। ইহার নাম বাস্‌সে ইন্‌ষ্টিটিউশন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইহা পরিচালিত হয়। কেম্ব্রিজ এবং বষ্টন উভয় নগর হইতেই কথঞ্চিৎ দূরে ইহা অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-বিজ্ঞানাধ্যাপকগণ ইহার কর্ত্তা।

অধ্যাপক কাস্‌ল্ এই কারখানার গৃহগুলি দেখাইয়া অনুসন্ধান-প্রণালী বুঝাইতে লাগিলেন। একটা গৃহে দেখিলাম—বহু সংখ্যক ইঁদুর নানা খাঁচার ভিতর রাখা হইয়াছে। অধ্যাপক বলিলেন—"এই গৃহে আমি এবং পি, এইচ, ডি উপাধিপ্রার্থী ছাত্রেরা Variation, Heredity and Principles of Animal Breeding সম্বন্ধে অনু

সন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া থাকি।" কাস্‌লের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

Genetics and Eugenics. The reproduction of animals, the origin of new races, the influence of heredity and of environment; applications to animal breeding and human society."

কাস্‌ল এবং আমেরিকার অন্যান্য প্রাণ-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বংশতত্ত্ব, রক্তসংমিশ্রণ, জাতিভেদ এবং বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে যে-সকল মতের সমর্থন করেন সেগুলি কিছুদিন হইল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইয়াছে। গ্রন্থের নাম Heredity and Eugenics. এই গ্রন্থে কয়েকজন প্রসিদ্ধ জীবনতত্ত্ববিদের প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অপর নাম "A Course of Lectures summarising recent advances in Knowledge in Variation, Heredity, and Evolution and its relation to Plant, Animal and Human Improvement and Welfare." অধ্যাপক (Castle) কাস্‌ল্‌-এর দুইটি প্রবন্ধ ইহাতে আছে।

কাস্‌ল দেখাইলেন ধূসরবর্ণ বন্য ইঁদুর হইতে কৃষ্ণবর্ণ ইঁদুরের জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইতে আবার নূতন এক বংশের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের বর্ণ শ্বেত—কিন্তু মাঝে মাঝে কাল দাগযুক্ত।

অধ্যাপক বলিলেন—"এই দেখুন এক বিচিত্র রংয়ের ইঁদুর। সাধারণতঃ পীতবর্ণ ইঁদুর দেখা যায় না। বিলাতে দৈবক্রমে কয়েকটা পাওয়া গিয়াছিল। আমি এইটা বিলাত হইতে আনাইয়াছিলাম। তাহার পর ইহার সঙ্গে একটা কৃষ্ণবর্ণ ইঁদুরের সংযোগ স্থাপন করি। সন্তান জন্মিলে দেখিলাম উহা ধূসরবর্ণ বন্য জাতীয় হইয়াছে। আবার কাল দাগযুক্ত শ্বেতবর্ণ ইঁদুরের সংযোগেও এই পীত ইঁদুর সেই পূর্ব্বতন ধূসরজাতীয় সন্তানই প্রসব করিয়াছে। সুতরাং অষ্ট্রিয়ান্‌ পণ্ডিত মেণ্ডেলের (Mendel) সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হইতেছে।"

কাস্‌ল নূতন নূতন বংশ ও জাতিসমূহের উৎপত্তি বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইনি বলিলেন যে অসংখ্য প্রকারের জন্তু সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। ল্যাবরেটরীর পরীক্ষায় বুঝা যায় যে যৌন-নির্ব্বাচনে হাত থাকিলে মানুষ পশু-সমাজে অগণিত জাতিভেদের সূত্রপাত করিতে পারে।"

একটা বাক্সের ভিতর দেখিলাম—কতকগুলি কার্ড সাজান রহিয়াছে। কাস্‌ল বলিলেন—"এই-সকল কার্ডে প্রত্যেক ইঁদুরের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেকের biography ইহার ভিতর লিপিবদ্ধ। ক্রমপুরুষে কাহার কিরূপ আকৃতি-পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা সহজে বুঝিবার জন্য এই-সকল কোষ্ঠী রাখা হইতেছে।" বুঝিলাম এগুলি ইঁদুরের কুলজী গ্রন্থ।

ইঁদুরের ঘর হইতে খরগোশের ঘরে আসিলাম। এই গৃহেও পূর্ব্বোক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। গিনিপিগের সমাজেও মেণ্ডেলতত্ত্বই সপ্রমাণ হয়। কাস্‌ল্‌ বলিলেন—দক্ষিণ আমেরিকার আদিম ইণ্ডিয়ানেরা গিনিপিগ্‌ খাইয়া জীবন ধারণ করিত। ইয়োরোপের অন্যান্য পশু তখন দক্ষিণ আমেরিকায় ছিল না। আমি দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এই জীবগুলি লইয়া আসিয়াছি। একটা নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছি। সাধারণতঃ গিনিপিগের পায়ে তিনটা মাত্র নখ থাকে। আমি একটা বংশ সৃষ্টি করিয়াছি তাহার প্রত্যেকের পায়ে চারিটা করিয়া নখ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"চারিটা নখ কোন দিন হইতে পারিবে তাহা প্রথমে আন্দাজ করিলেন কি করিয়া?" কাস্‌ল বলিলেন—"দৈবক্রমে একটা গিনিপিগ্‌ নজরে পড়ে—তাহার পায়ে চতুর্থ নখের সামান্য মাত্র সূচনা গজিয়া উঠিতেছিল। তাহা দেখিয়া এই দিকে অনুসন্ধান চলিতে থাকে। এক্ষণে নানা যৌননির্ব্বাচনের পর নূতন একটা জাতি গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছি।"

জীবজন্তুর গৃহগুলি দেখিতে মাঠের ভিতর পড়িলাম। কাস্‌ল বলিলেন—"ঐ দেখুন একটা বাগান। ইহাতে দুনিয়ার সকল উদ্ভিদই আছে। অবশ্য আমেরিকার জলবায়ুতে যে-সকল উদ্ভিদ জীবিত থাকিতে পারে—পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে সেই-সকল উদ্ভিদ এখানে আনা হইয়াছে।"

তাহার পর গরম-গৃহে আসিলাম। কাস্‌ল বলিলেন—"আমি জীবজন্তুর সম্বন্ধে যে-সকল অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা চালাইতেছি—আমার সহযোগী অধ্যাপক ইষ্ট উদ্ভিদ সম্বন্ধে সেইপ্রকার গবেষণাই করিতেছেন। উদ্ভিদের বর্ণসঙ্কর, জাতিভেদ, আকৃতি-পরিবর্ত্তন ইত্যাদি আলোচনা করিয়া

ইট মেণ্ডেলের সিদ্ধান্তই সমর্থন করেন। কতকগুলি উদ্ভিদ লইয়া রংয়ের পরিবর্ত্তন আলোচিত হইতেছে। সন্তান-উদ্ভিদ জনক-উদ্ভিদের বর্ণ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে কি না তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। লতাবাহারের চারাগুলি লইয়া এইরূপ অনুসন্ধান করা হইতেছে। কোন কোন উদ্ভিদের পাতাগুলি শীর্ণ দেখিলাম। কাস্‌ল বলিলেন—"এইগুলি ব্যাধিগ্রস্ত। এই ব্যাধি জনক হইতে সন্তানে সংক্রামিত হইবে কি না তাহা পরীক্ষা করা এখানে উদ্দেশ্য।" নূতন নূতন বীজসৃষ্টির উদ্যোগও দেখা গেল।

এই-সমুদয় দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কালিফর্ণিয়ায় লুথার বার্ব্বাঙ্ক উদ্ভিদসমূহের যে-সমুদয় পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন তাহা অবশ্য আপনারা দেখিয়াছেন। বার্ব্বাঙ্ক কি ইয়াঙ্কিস্থানের বিজ্ঞান-মহলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি?" কাস্‌ল বলিলেন—"বার্ব্বাঙ্ক সাধারণ কৃষক মাত্র। তাঁহার বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তি কিছুই নাই। অন্যান্য হাতুড়ে কৃষকেরা যেরূপ কার্য্য করে ইনিও সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। তবে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণশক্তি এবং নির্ব্বাচনের দক্ষতা অসাধারণ। তিনি যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ওস্তাদ। শিশু, বীজ, চারাগাছ, পাতা ইত্যাদি দেখিবামাত্র ইনি বুঝিতে পারেন কাহার সন্তান বা ভবিষ্যৎ কিরূপ। কিন্তু বিজ্ঞানরাজ্যে বার্ব্বাঙ্ক একটি মাত্রও সূত্র অথবা নূতন সত্য অথবা নূতন আলোচনা-প্রণালী দান করিতে পারেন নাই। তাঁহার কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটা তাহা বুঝিবার জন্য হার্ভার্ডের এক অধ্যাপক কালিফর্ণিয়ায় গিয়াছিলেন। ইনি দুই বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ প্রকাশিত হইলে বার্ব্বাঙ্কের বৈজ্ঞানিক মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে।"

বাস্‌সে ইনষ্টিটিউশান পূর্ব্বে কৃষিবিদ্যালয় ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ম্যাসাচুসেটস প্রদেশ-রাষ্ট্র সমগ্র প্রদেশের কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই জন্য হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় কৃষিকলেজ তুলিয়া দিয়াছেন। বাস্‌সে প্রতিষ্ঠানে জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ লইয়া উচ্চ অঙ্গের পরীক্ষা হয়-মাত্র। ইহা Applied Biologyর ল্যাবরেটরী। অবশ্য প্রদেশ-রাষ্ট্রের বিজ্ঞানালয়েও এই-সকল পরীক্ষা হইয়া থাকে। কিন্তু সরকারী বিভাগের বৈজ্ঞানিকেরা ব্যবসায়ে এবং শিল্পে ফলপ্রদ বস্তুসমূহের আলোচনাই বেশী করেন। হার্ভার্ডের অধ্যাপকগণ বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য নানাবিধ "নিরর্থক" experiments করিতে সুযোগ পান।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ব্যথা

প্রভাতের নব হরিৎ কিরণে এই,
ছোট্ট পাতাটি পাখাটি মেলিল যেই ;
সেকি জানে সেকি জানে ওগো সেকি জানে,—
কার খেলা হ'য়ে জাগিলরে এইখানে !

লাজে ভরা এই ধরণীর হিম তুষার জড়ান গায়,
ওযে—প্রভাত-আলোর প্রথম চুমোটি হায়,
উঠিল হাসিয়া শিশিরের জলে জমাট হইয়া ফুটি,
ধরার বুকের আকুলতা-ভার লুটি।

পাগল দিবা সে—এতটুকু তারে নিয়া,
আপন গায়ের বর্ণেতে মিলাইয়া,
করে গো হরিৎময় ;
সে যে দিনের আকুল বুকের উপরে
ঘুম-ঘোরে চেয়ে রয়।

সন্ধ্যা আসিল দিগন্ত-পারে নামি';
চলিতে চলিতে ক্ষণকাল পথে থামি',
ক্লান্ত পাতারে যতনে টানিয়া বুকে,
নীল চুম্বন আঁকিল তাহার মুখে।

কত যে দিনের জমান হরিৎ, সন্ধ্যার নীলিমায়,
দিনে দিনে সে যে সবুজ হইয়া উঠে ;
এতটুকু তার পরাণে কাহার বাসনার জালা হায়
চুম্বনে কার গন্ধ বহিয়া ফুটে,—
—আবরিয়া বুকে গোপন অশ্রুজল,
মেলিয়া শতেক শিহরণে ভরা দল ?
সেকি জানে—সেকি জানে,—
কার খেলা হ'য়ে আসিল হেথায়,
কার খেলা ওর প্রাণে !

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গলা ভাষা

বাঙ্গলা না বাংলা?

বঙ্গদেশকে মুসলমানেরা "বাঙ্গালা" বলিতেন। মহাকবি মিলটনও "বাঙ্গালা" (Bengala) শব্দ তাঁহার Paradise Lost নামক কাব্যে লিখিয়াছেন। এখন ইংরেজেরা ইহাকে "বেঙ্গল" বলেন।* আমরা অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "বাঙ্গালা" লিখিতাম। কিন্তু চিরদিনই "বাঙলা" উচ্চারণ করিয়া থাকি। এখন এই শব্দটার পাঁচটা বানান প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়—বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙলা, বাংগলা এবং বাংলা। এই পাঁচটির মধ্যে কোন্ বানানটা সাহিত্যে প্রচলিত হওয়া উচিত তাহার আলোচনা করা উচিত। বিষয়টা অতি ক্ষুদ্র হইলেও সাহিত্যিকদিগের আলোচ্য বলিয়া মনে করি। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় "ঢাকা রিভিউ"তে লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালা শব্দটার মধ্যবর্ত্তী আকারের লোপ হইয়াছে। অথচ তিনি "বাঙ্গালা"ই লিখিয়া থাকেন। তাঁহার এই মতের সহিত তাঁহার লেখার সামঞ্জস্য নাই। পাণিনি বলেন "অদর্শনং লোপঃ।" যোগেশ বাবুর "আ"কার যদি দেখাই গেল তাহা হইলে তাহার লোপ হইল কিরূপে বলা যাইতে পারে? যে যাহা হউক শব্দটা যখন সম্পূর্ণ সংস্কৃত নহে এবং উহার মধ্যাক্ষরের যখন "আ"কারের উচ্চারণ আমরা মোটেই করি না তখন "বাঙ্গালা" লেখা উচিত নহে। আশা করি এই সিদ্ধান্তকে কেহই অপসিদ্ধান্ত বলিবেন না। সুতরাং অবশিষ্ট চারিটি বানানের মধ্য হইতেই আমাদিগকে নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এই চারিটির মধ্যে "বাঙ্গলা" এবং "বাংগলা" অভিন্ন। প্রভেদের মধ্যে এই যে দ্বিতীয় শব্দটি অপেক্ষা প্রথমটি অল্পায়াসে এবং অল্প সময়ে লেখা যায়। সুতরাং "বাংগলা" পরিত্যাজ্য। অতএব প্রতিযোগিতা রহিল "বাঙ্গলা", "বাঙলা" এবং "বাংলার" মধ্যে। এই তিনটির মধ্যে প্রথমে "বাঙলা" ও "বাংলা"র পরীক্ষা করা যাউক। সংস্কৃত অনুস্বারের উচ্চারণ মোটেই সুসাধ্য নহে। বঙ্গদেশে ও আসামে এবং মিথিলারও অনেক স্থলে ইহা সর্ব্বত্রই ঠিক ঙ্ রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু দক্ষিণাপথে ও পশ্চিমদেশে কোন বর্গীয় বর্ণের পূর্ব্বে অনুস্বার থাকিলে সেই বর্ণের পঞ্চম বর্ণরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। এরূপ উচ্চারণে ব্যাকরণের সম্মতি আছে। কথং জীবামি, অহং তিষ্ঠামি, কিং দদেন ইত্যাদি বাক্য মহারাষ্ট্রীয়েরা এবং হিন্দুস্থানীরা কথঞ্জীবামি, অহন্তিষ্ঠামি, কিন্দদেন রূপে উচ্চারণ করেন। তাঁহারা এইরূপ করিয়া ক্ষান্ত হন না, তাঁহারা সর্ব্বত্রই বর্গীয় বর্ণের পূর্ব্বের ঙ, ঞ, ণ, ন এবং ম স্থলে অনুস্বার লিখিয়া থাকেন, যথা আমাদের অঙ্ক, চঞ্চল, কণ্টক, দন্ত, কম্বল, বোম্বাই তাঁহাদের দ্বারা অংক, চংচল, কংটক, দংত, কংবল এবং মুংবই রূপে লিখিত হয়। অন্য পক্ষে অন্তঃস্থ এবং উষ্মবর্ণের পূর্ব্বে অনুস্বার থাকিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা ম রূপে এবং হিন্দুস্থানীরা ন রূপে উচ্চারণ করেন। "সংস্কার" শব্দটাকে মহারাষ্ট্রীয়েরা বলেন সম্স্কার, হিন্দুস্থানীরা বলেন সন্স্কার এবং আমরা বলি সঙ্স্কার। অশুদ্ধ করিয়া ঙ উচ্চারণ করি বলিয়া যেখানে ঙ হইবে সেখানেই অনুস্বার লেখা উচিত নহে। আমরা 'স'-কে 'শ'-রূপে উচ্চারণ করি বলিয়া যেমন আমাদের শ স্থানে স লেখা উচিত নহে—যেমন "শরীর" "বাদশাহ" Shelly প্রভৃতি শব্দ "সরীর", "বাদসাহ", "সেলি" রূপে লেখা উচিত নহে, তেমনই "বাঙলা" শব্দটা "বাংলা" রূপে লেখা উচিত নহে। ইহার আর একটা দোষ এই যে হিন্দীতে "বাংলা" শব্দ "বাঙ্গা"য় বর্ণান্তরিত করিলে উহার উচ্চারণ আর-একরূপ হইয়া যাইবে। সুতরাং 'বাংলা' বানানও পরিত্যাজ্য। অবশিষ্ট রহিল "বাঙ্‌লা" ও "বাঙ্গলা"। মূল বঙ্গ শব্দে গ আছে এবং "বাঙ্গলা" শব্দেও গ আছে, সুতরাং মূল শব্দের সহিত সাদৃশ্য রাখিবার জন্যও "বাঙ্গলা" বানানই আমার বিবেচনায় সাহিত্যিক হওয়া উচিত। আমরা অনুস্বারের বিকৃত উচ্চারণ করি ইহাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। আবার ঙ-কারের ভুল বানান প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? আমার বিবেচনায় "শিলং" "দারজিলিং" প্রভৃতি বানানের পরিবর্ত্তে 'শিলঙ' 'দারজিলিঙ্গ' লেখা উচিত। ইংরেজ শব্দটাও ইঙরেজ বা ইঙ্গরেজ রূপে লেখা উচিত।

* Bengal শব্দের e, ফ্রেঞ্চ e বা হিন্দী বা সংস্কৃতের অ বা হ্রস্ব আকারের ন্যায় পূর্ব্বে উচ্চারিত হইত বলিয়া বাঙ্গালা লিখিতে Bengala লেখা হইত। পরে e ইংরেজী উচ্চারণে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ করাতে Bengal হইল বেঙ্গল, এবং এই উচ্চারণ ভুল।—প্রবাসীর সম্পাদক।

কিন্তু এই বানান বহুদিনের প্রচলিত। হয়ত ইহার পরিবর্ত্তনে অনেকেই আপত্তি করিবেন।

ইংরেজ না ইংরাজ ?

কেহ ইংরাজ কেহ ইংরেজ লিখিয়া থাকেন। বানানটা কি হওয়া উচিত ? আমার বোধ হয় ইংরেজ বা ইঙ্গরেজ লেখাই উচিত। কেননা শব্দটা English শব্দ হইতে হইয়াছে *। মুসলমানেরা বলেন আঙ্‌রেজ। ইঙ্‌রাজ অপেক্ষা ইঙ্‌রেজ ধ্বনিই ইঙ্‌লিশ শব্দের সমধিক নিকট-বর্ত্তী। যেহেতু ই-কার এ-কারের হ্রস্বমাত্র।

ভাষায় অনুনাসিকের আগম।

সকল ভাষাতেই এক একটা শব্দে অকারণে অনুনাসিক প্রবেশ করে। সংস্কৃত রাত্রি এবং দিবা একত্র হইয়া রাত্রিন্দিব হইয়াছে। জায়া এবং পতি একত্র হইয়া দম্পতী এবং জম্পতী হইয়াছে। এই-সকল শব্দে নকার এবং মকারের আগম কেন হয় বুঝা যায় না। ইংরেজীতে passage এবং message হইতে passager এবং messager হওয়াই উচিত, কিন্তু তাহা না হইয়া passenger এবং messenger হয়। হিন্দিতে সাপকে সাঁপ, অক্ষিকে আঁখ, সমুদ্রকে সমুন্দ্র এবং সমন্দর এবং পা'কে পাঁও বলে। আসামের মিরিরা কপালকে কম্পাল বলে। নেপালীরা দারোগাকে দারোঙ্গা বলে। সেইরূপে আমরাও শাপকে শাঁপ, কাচকে কাঁচ, আচমনকে আঁচান, অক্ষিকে আঁখি, আতুরকে আঁতুড় বলি। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী অল্প-স্থান ব্যতীত বাঙ্গলা দেশে ও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হাস্যকে হাঁসি, হাঁসা এবং ইষ্টককে ইঁট, ইঁটা বলে। কেবল কলি-কাতায় উচ্চারণ হাসি, হাসা, ইট। প্রাচীরকে কিন্তু কলিকাতায় পাঁচিল বা পাঁচির বলে। এই-সকল শব্দে অনুনাসিকের আগম হয় কেন ?

বর্ণবিপর্য্যয়।

অনেক ভাষাতেই কোন কোন শব্দের বানানে এবং উচ্চারণে বর্ণবিপর্য্যয় হয়। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালীদের মত বোধ হয় এই অপরাধে আর কেহই অপরাধী নহে। সংস্কৃতে হিংস শব্দ সিংহ হইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যাকরণেও উক্ত হইয়াছে। ইয়োরোপের একটা দ্বীপের নাম Ithaca, Thiaca রূপেও লিখিত হইয়া থাকে। আসামের মিরিরা রেলগাড়ীকে লেরগাড়ী বলে। অশিক্ষিত হিন্দু-স্থানীরা আদমীকে আমদী, রুমালকে উরমাল, লখনউকে নখলউ, পঁহচাকে চঁহপা বলে। আমাদের চড়ক শব্দ চক্র এবং চামড়া চর্ম্ম শব্দ হইতে হইয়াছে। অশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাতাসকে বাসাত, পিশাচকে পিচাশ, বাতাসাকে বাসাতা বলে। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালীদেরও অনেকে বাসককে বাকস, নূতনকে নতুন, মুকুটকে মটুক বলেন। সংস্কৃত "চুলি" বা "চুলিক" হইতে ভদ্রাভদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল বাঙ্গালীরই "লুচি" প্রস্তুত হইয়াছে। বাকারি এবং কাবারি উভয় শব্দই প্রচলিত। বর্ণবিপর্য্যয় পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গে অধিক। সংস্কৃত লম্ফ হইতে লাফ হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে এবং আসামের গোআলপাড়া পর্য্যন্ত লাফকে ফাল, লাফালাফিকে ফালাফালি, লাফ দেওয়া ও লাফ মারাকে ফাল দেওয়া ও ফাল মারা বলে। বাঁধিয়া, হাঁটিয়া, করিয়া প্রভৃতি শব্দ সে অঞ্চলে প্রায় বাঁইধা, হাঁইটা, কইরা রূপে উচ্চারিত হয়। অনেক ইংরেজী শব্দেরও আমরা বর্ণবিপর্য্যয় করিয়া উচ্চারণ করি। Desk শব্দ-টাকে আমরা ডেক্‌স বলি। কেহ কেহ বাক্‌সকে বাস্ক এবং টেক্‌সকে টেস্ক বলেন। আমরা ফোটগ্রাফকে ফটো-গ্রাফ, নিউসান্‌স (nuisance)কে নুইসান্‌স, টিউস্‌ডে (Tuesday)কে টুইসডে, হিরেডিটি (Heredity)কে হেরিডিটি, হিরেডিটারি (Hereditary)কে হেরি-ডিটারি বলি। আমরা সংস্কৃত হ্রদকে হ্রঁদ, হৃদয়কে হিঁদয়, ব্রহ্মকে ব্রম্‌হ, ব্রাহ্মণকে ব্রাম্‌হন, মেহতরকে মেথর অর্থাৎ মেংহর, প্রহ্লাদকে প্রল্‌হাদ, আহ্লাদকে আল্‌হাদ, জাহ্নবীকে জান্‌হবী, বহ্নিকে বন্‌হি বলি।

বাঙ্গালায় বিসর্গবির্জ্জনের প্রস্তাব।

অনুস্বারের প্রকৃত উচ্চারণ করিতে না পারিলেও উহার একটা বিকৃত উচ্চারণ আমরা করিয়া থাকি এ কথা প্রথমেই বলা গিয়াছে। কিন্তু ক, খ, প, ফ, শ, ষ এবং স

* ইংরেজ হইয়াছে ফরাসী Anglais শব্দ হইতে; আঙ্‌রেজ উচ্চারণই ঠিক; অন্ততঃ ইংরেজ। ইংরাজ কিছুতেই নহে। যোগেশ বাবুরও এই মত; প্রবাসীতে কদাচ ইংরাজ ছাপা হয়।—

প্রবাসীর সম্পাদক।

এই কয়েকটি বর্ণের পূর্ব্বে বিসর্গ থাকিলে উহার যে বিকৃত উচ্চারণ হয় আমরা তদ্ভিন্ন অন্য কোন স্থানে বিসর্গের উচ্চারণ করিতে পারি না। কোন কোন বাঙ্গালী পণ্ডিতকে বলিতে শুনিয়াছি যে বিসর্গের প্রকৃত উচ্চারণ হ্। কিন্তু এ কথা কি ঠিক? সংস্কৃতে দুইটি বর্ণের উচ্চারণ একরূপ নহে। যদি তর্কস্থলে হ্-ই বিসর্গের উচ্চারণ বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে সে কথা কেবল হ্রস্ব স্বরের পর বিসর্গ থাকিলেই খাটে। দীর্ঘস্বরের, বিশেষত প্লুত স্বরের পর হ্-কারের উচ্চারণ হইতেই পারে না। বিসর্গের উচ্চারণ সংস্কৃত ভাষার একটা বিশেষত্ব।* হিন্দী, পারসী এবং সেমিটিক ভাষায় অনেক স্থলে দীর্ঘস্বরের পর যে হ থাকে তাহার উচ্চারণ কতকটা বিসর্গের অনুরূপ কিন্তু বিসর্গের উচ্চারণের সহিত একেবারে অভিন্ন নহে, যথা মেঁহ্ (মেঘ), মুঁহ্ (মুখ); বাদশাহ্ (সম্রাট), মসীহ্ (প্রেরিত), রূহ্ (আত্মা) ইত্যাদি।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে "নমঃ" "হরিঃ" প্রভৃতি শব্দে বিসর্গের প্রকৃত উচ্চারণ শুনা যাইত। এখন তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু দীর্ঘস্বরের পর বিসর্গের উচ্চারণ বাঙ্গালীকে করিতে কখনই আমি শুনি নাই। পাঁচবৎসর হইল কলিকাতায় একটি বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। সংস্কৃত মন্ত্রের মধ্যে একটা "আবয়োঃ" শব্দ ছিল। এক পক্ষের পুরোহিতের মুখে তাহা "আবয়ঃ" হইয়া গেল। তিনি আরও একবার কি দুইবার শব্দটা শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রতিবারই "অবয়ঃ" হইল। তিনি আর চেষ্টা করিলেন না। সে যাহা হউক সংস্কৃতেও যখন এইরূপ নিয়ম আছে যে যে-স্থলে বিসর্গের উচ্চারণ হয় না সেস্থলে তাহা মোটেই লিখিত হয় না, যথা "অতএব", তখন আমরা বাঙ্গলায় কেন যেখানে বিসর্গের উচ্চারণ করি না সেখানে বিসর্গ লিখি? "পুনঃ পুনঃ" শব্দের প্রথম বিসর্গ আমরা উচ্চারণ করি কিন্তু দ্বিতীয়টা কখনই করি না। সুতরাং বানানটাও "পুনঃপুন"ই হওয়া উচিত। মনঃ, তেজঃ, চক্ষুঃ, স্রোতঃ, প্রভৃতি শব্দ আমরা বিসর্গ না দিয়াই লিখি। কিন্তু আপাততঃ, স্বভাবতঃ, স্বতঃ, ক্রমশঃ, প্রথমতঃ, বিশেষতঃ প্রভৃতি বহুশব্দে কেন আমরা বিসর্গ দিয়া থাকি? বস্তুত বাঙ্গলায় ক, খ, প, ফ, শ, ষ এবং স এই কয়েক বর্ণের পূর্ব্বে বিসর্গ রাখিয়া অন্য সর্ব্বত্র বিসর্গের বিসর্জ্জন দেওয়া কি সঙ্গত নহে?*

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

* এ কথা সংস্কৃত ব্যাকরণেই উক্ত হইয়াছে যে বিসর্গ আশ্রয়স্থানভাগী অর্থাৎ যখন যেস্বরের পরে থাকে তাহারই উচ্চারণ পায়। কিন্তু হ্-কারের সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নহে।

* কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের বাঙ্গলা ব্যাকরণে একটা সাধারণ সূত্র আছে মনে পড়ে যে পদের অন্তস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। এই সূত্র মানিলে আর কোনো গোলযোগ থাকে না, যথা: বক্ষ: ধনু: বাঙালীয় লিখিলে পাণ্ডিত্য ফলানো হয়, বাংলা হয় না।—প্রবাসীর সম্পাদক।

মার্কিন মেয়েদের কথা

শেষ প্রস্তাব

১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মিশৌরি ষ্টেটের অন্তর্গত ক্যান্‌সাস্ সিটিতে কয়েকদিনের জন্য গিয়াছিলাম। ক্যান্‌সাস্ জনসংখ্যায় ও ঐশ্বর্য্যে দিন দিন বর্দ্ধমান সহর। অনেকের বিশ্বাস উহা আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই শিকাগোর সমান হইবে।† হঠাৎ একদিন এক অপরিচিতা মহিলা সেখানে আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাক্ষাতে নয়, চিঠিতে নয়, লোক-মারফতে নয়, টেলিফোনে! আমি Y. M. C. A.র বাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছিলাম। ক্যান্‌সাস্ বেশ বড় সহর, শেষকালে কোন্ ফ্যাসাদে পড়িব ভাবিয়া দু'একজনের সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। তাঁহাদের কেহই একটা স্পষ্ট পরামর্শ দিতে পারিলেন না। অবশেষে আমি টেলিফোনেই তাঁহাকে জানাইলাম ক্যান্‌সাস্ সহরে আমি সম্পূর্ণ নূতন, তাঁহার বাড়ীর কিনারা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। তিনি বলিলেন, সন্ধ্যা পাঁচটার সময় তাঁহার মোটর Y. M. C. A.র বাড়ীর দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া যাইতে সম্মত

† "No city in the country has a finer park system than Kansas City; few of them even approach it." Louis W. Hill, President Great Northern Railway.

"In ten years' time Kansas City will not have a peer in the world as a residence city." W. C. Dufour, City Counsellor, New Orleans. "Kansas City is destined to become the greatest inland city in the United States—except possibly Chicago." Leslie M. Shaw.

হইলাম। বেলা ঠিক পাঁচটার সময় এক নিগ্রো বালক বৃহৎ এক মোটর লইয়া দরজায় উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে কাগজে আমার নাম লেখা ছিল, সুতরাং নিশ্চিন্তমনে মোটরে গিয়া উঠিলাম। মোটর ছুটিল। শীতকাল, বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। মোটরের মধ্যে কম্বলে হাত-পা ঢাকিয়া বসিয়া ছিলাম। মোটর অনেকক্ষণ ছুটিল। অবশেষে মনে হইল ক্যান্‌সাস্ সহর পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। সে উজ্জ্বল আলোকমালা নাই, সে লোকাকীর্ণ পথ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে।

অবশেষে মোটর এক উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল। গাড়ী-বারান্দায় গিয়া পৌঁছিলে নিগ্রো চালক নামিয়া দরজার ঘণ্টা টিপিল; দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহার পর আমি গৃহকর্ত্রীর সম্মুখে নীত হইলাম। প্রথম পরিচয়সম্ভাষণের পরেই মহিলাটি কবিবর রবীন্দ্রনাথের কথা পাড়িলেন। ইংরেজী গীতাঞ্জলি তাঁহার কণ্ঠস্থ দেখিলাম। যখন তিনি উৎসাহে উহার নানা স্থান হইতে আবৃত্তি করিতেছিলেন তখন তাঁহার দুই চক্ষু জল্‌জল্ করিতেছিল। ভারতীয় কবির প্রতি অনুরাগে ও ভক্তিতে তাঁহার মুখমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথের মুখের সাদৃশ্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা টেনিসনের কাছে শুনিয়াছি—

> "—————————— and none,
> In so young youth, was ever made knight
> Till Galahad; and this Galahad when he heard
> My sister's vision, filled with amaze;
> His eyes became so like her own, they seem'd
> Hers, and himself her brother more than I."
>
> The Holy Grail.

এই মহিলাটি ধনী ও বিদুষী; ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি ইঁহার একান্ত অনুরাগ। ইংরেজী ভাষার সাহায্যে ইনি ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। ভারতের স্তুতি আরম্ভ করিলে থামানো দুষ্কর। এরূপ আরো দুই চারিটি মহিলার সঙ্গে ইহার পরে সাক্ষাৎ হইয়াছে।

সৌখীন সমাজে মহিলাদের মধ্যে ধূমপান একেবারে বিরল নহে।

নৃত্য সম্বন্ধে এ দেশে সাধারণতঃ লোকের বিরাগ নাই। প্রবীণ, গোঁড়া, ধার্ম্মিক খ্রীষ্টানরা মধ্যে মধ্যে আপত্তি করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেজন্য গির্জ্জার নিম্নতলে (basement) নৃত্য প্রায় বন্ধ থাকে না। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে গির্জ্জার ডাইনিং হল নৃত্যমন্দিরে পরিণত হইতে বেশি বিলম্ব হয় না। সম্ভবতঃ ভূরিভোজনের অব্যবহিত পরেই নৃত্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দ্বারা অনুমোদিত। একবার এক বিশিষ্ট য়ুনিটেরিয়ান্ (একেশ্বরবাদী) পরিবারে থ্যাঙ্কস্‌গিভিং ডিনারের (?) হোমের নিমন্ত্রণে গিয়া খানিক আমোদপ্রমোদের পর নৃত্যের আয়োজন হইতেছে দেখিয়া বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বহু যুগলমূর্ত্তির নৃত্যে গৃহতল মুখরিত হইয়া উঠিল। পিয়ানোর সঙ্গে বহু বাহুর ললিত বিলাস, নরনারীর ক্ষিপ্র পাদক্ষেপ, উষ্ণ নিঃশ্বাস ও দেহনিলীন সৌরভে গৃহ যেন জমিয়া উঠিল। নৃত্যের নিয়ম,—পুরুষগণ অভিমত মহিলাদের তাঁহাদের সহিত নৃত্য করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুরোধ করিবেন। মহিলারা সাধারণতঃ পুরুষদের অনুরোধ করেন না। আমি গৃহের এক কোণে বসিয়া গৃহস্বামীর সহিত গল্প করিতেছিলাম, এমন সময় তরুণীদের মধ্যে একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি নৃত্যে যোগ দিবেন না?"

আমি বলিলাম, "আমার নৃত্যের অভ্যাস নাই।"

"আরম্ভ করুন, অভ্যাস আপনি হইবে।"

"এবার আমাকে ক্ষমা করুন।"

"আচ্ছা, আগামীবার কিন্তু আপনার প্রস্তুত হইয়া আসা চাই।" বলা বাহুল্য দ্বিতীয়বার নৃত্যে আহূত হইবার সৌভাগ্য আর ঘটে নাই।

নৃত্য সম্বন্ধে শুধু এই কথা বলিতে পারি উহার দ্বারা অনেকের অধোগতি হইয়া থাকে। এমন অনেক আদর্শ-চরিত্র যুবকযুবতীকে জানি যাঁহারা নৃত্যে পারদর্শী ও উহাতে যথেষ্ট আনন্দ পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারাই আমার নিকট সাক্ষ্য দিয়াছেন যে উহা দ্বারা অনেকের অধঃপতন হইয়াছে। আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নৃত্যের দ্বারা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আর্ট হিসাবে নৃত্যের আদর অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বস্তু ও মায়া এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত যে ঠিক কোন্‌খানে নীতি ও আর্টের নির্বন্ধ কোলাকুলি সম্ভবপর তাহা নির্দ্ধারণ করা বড় কঠিন।

আমাদের দেশে নিঃসম্পর্কীয়া নারীকে স্পর্শ করাতেও দোষ বর্ত্তায়। এ দেশে স্পর্শদোষ বলিয়া একটা জিনিস নাই বলিলেই চলে। অর্থাৎ যদি নাকি মনে কিছু কুভাব না থাকে, অথবা মনে থাকিলেও বাহিরে তাহার বিন্দুমাত্রও আভাস না পাওয়া যায় তবে প্রয়োজনমত কোনো নারীর হাত ধরিলে, বা ট্রামে বা ট্রেনে পাশাপাশি বসিতে বাধ্য হইলে বিন্দুমাত্রও দোষ বর্ত্তায় না। ট্রামে ও ট্রেনে পুরুষ কণ্ডাক্টর মেয়েদের হাত ধরিয়া উঠাইবে ও নামাইবে, উহাতে যিনি যতই তরুণ ও রূপসী হউন না কেন, কিছুই বাধবাধ ঠেকিবে না। মেয়েদের চিকিৎসায় সর্ব্বদাই পুরুষদের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে, তবে স্ত্রীরোগে ও সন্তানসম্ভাবনায় পুরুষের পরামর্শ বা সাহায্য লইতে হইলে ভদ্র পরিবারের নারীগণ উক্ত চিকিৎসক সচ্চরিত্র কিনা সে বিষয়ে সংবাদ লইয়া থাকেন। সন্দেহের কারণ থাকিলে অনেক সময়ে তাঁহারা বাড়ীর নিকটস্থ ডাক্তারকে না ডাকিয়া দূরতর স্থান হইতে অভিপ্রায়ানুযায়ী ডাক্তার ডাকিয়া থাকেন। এ দেশের নারীগণ স্বাধীন হইলেও তাঁহারা সর্ব্বৈব নির্লজ্জ এমন কথা বলিতে পারি না। আবার যে লজ্জা নারীকে অক্ষম ও পঙ্গু করিয়া রাখে তাহাকে লজ্জা বলিতেও প্রাণ সায় দেয় না। সে লজ্জা লজ্জাই নয় যাহা নারীকে আপাদমস্তক বোর্‌খায় মুড়িয়া লজ্জিত দেখিতে চায়। লজ্জা নারীচরিত্রের ভূষণ, উহা নারীর অস্থিতে মজ্জাতে মিশিয়া থাকিবে। সে লজ্জা এই অবাধ স্বাধীনতার দেশে দেখিয়াছি। বহুবার অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টিপাতমাত্রেই সুন্দরীদের কর্ণমূল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মুখমণ্ডল অস্তমান সূর্য্যের রক্তরাগে আলোহিত হইতে দেখিয়াছি। যেমন কারারুদ্ধার প্রেম অতি অকিঞ্চিৎকর, তেমনি বালিশের ওয়াড়ে-মোড়া নারীর লজ্জাভিনয়ও অতি তুচ্ছ সামগ্রী।

বাল্যকাল হইতে আমেরিকার লাল ইণ্ডিয়ানদের কথা শুনিয়া আসিয়াছিলাম। আমেরিকায় "অসভ্য লাল ইণ্ডিয়ান" আজো দেখা যায়। ওক্লাহোমা ষ্টেটে ইঁহাদের প্রধান আড্ডা। মধ্য যুক্তরাজ্যের প্রায় প্রত্যেক ষ্টেটেই অল্পাধিক পরিমাণে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই মিশ্র—অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গজ। ক্যান্‌সাস্ সিটিতে ইহাদের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া আমি একটি সন্ধ্যা ইহাদের সঙ্গে কাটাইয়াছিলাম। লাল ইণ্ডিয়ান্ মেয়েগুলি বাস্তবিকই বড় নম্র ও সহজেই লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে। আমি যে চল্লিশ পঞ্চাশ জনকে দেখিয়াছি তাহার মধ্যে দুই তিনজন ব্যতীত সকলেই মিশ্র। ইহারা ইংরেজী শিক্ষা পাইয়াছেন। রং কাহারো ময়লা, কেহ বা ঈষৎ হরিদ্রাভ, কেহ বা গৌরবর্ণ। ক্যান্‌সাসের "লরেন্স" নামক স্থানে লাল ইণ্ডিয়ানদের একটি বড়-রকমের বিদ্যালয় আছে, উহার নাম "হ্যাস্কেল্ ইন্‌ষ্টিটুট" (Haskell Institute); এ দেশের কর্ম্মে ও চিন্তায় লাল ইণ্ডিয়ানগণ অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিখ্যাত হার্ভার্ড ও প্রিন্সটন্ বিশ্ববিদ্যালয় এই লাল ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।* এ দেশের সাহিত্যেও ইহারা অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে; লংফেলোর "হিয়েওয়াথা"ও হুইটিয়ারের "মগ মেগোন্" তাহার প্রমাণ। নিগ্রোদের প্রতি এ দেশের লোকসাধারণের যেরূপ ঘৃণা দেখিতে পাওয়া যায়, লাল ইণ্ডিয়ানদের প্রতি সেরূপ দেখা যায় না। অতীতে শ্বেতে ও লালে অনেক বিবাহ হইয়াছে, এখনো উহা বন্ধ হয় নাই। "লাল" বলিতেছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না উঁহারা সত্যসত্যই লাল। বস্তুতঃ উহারা তাম্রবর্ণ বলিলেই ঠিক বলা হয়। ঐরূপ বিবাহের সন্তান সমাজে স্থানহারা হয় না; কিন্তু একব্যক্তি যতই কেন ধবধবে শাদা হউক না, ও তাহার পাণ্ডিত্য ও চরিত্র যতই উচ্চ শ্রেণীর হউক না কেন, যদি তাহার শরীরে এককোঁটা নিগ্রো রক্ত থাকে তবে সে নিগ্রোই, ও শ্বেত-সমাজ হইতে বঞ্চিত।

"অসভ্য লাল ইণ্ডিয়ান"ও আজ আমাদের লজ্জা দিতে চাহিতেছে। পূর্ব্বোক্ত হ্যাস্কেল ইন্‌ষ্টিট্যুটের একটি ছাত্রী আমাকে লিখিয়াছিলেন—"আমরা দিনের অর্দ্ধেক সময় স্কুলে কাটাই, অর্দ্ধেক সময় অন্য কাজ করি। তা' ছাড়া আমাদের পড়িবার জন্য, ব্যায়ামের জন্য, বাইবেল আলোচনার জন্য, নানাপ্রকার সভাসমিতি ও ধর্ম্মসঙ্ঘে যোগ দিবার জন্য যে সময়ের আবশ্যক হয় তাহাতে আর অন্য কিছু করিবার অবসর থাকে না। আমাদের স্কুলের

* Charter of the Harvard University, May 31, 1650. Charter of the Princeton University, 1746.

সকলকে আপনার কথা বলিয়াছিলাম। তাহারা সকলেই আপনার কথা শুনিয়া খুসি হইয়াছে ও আপনাকে শুভ-ইচ্ছা জানাইতেছে। আপনাদের য়ুনিভার্সিটির কাগজে আপনার লিখিত প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা সকলেই আনন্দিত হইয়াছি।* * * লোকের মুখে শুনিয়া আমাদের সম্বন্ধে আপনি যে ধারণা পোষণ করিতেন আমাদের স্বচক্ষে দেখিয়া আপনার সে ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি। আমরা আমাদের শ্বেত প্রতি-বাসীদের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিতেছি এবং আশা করি শীঘ্রই এ চেষ্টায় আমরা সফল হইতে পারিব। অবশ্য এ সফলতার পথে অনেক বাধা আছে; যেমন আপনাদের দেশের জাতিভেদ বা অন্যান্য দেশের অন্য প্রকার সামাজিক কুসংস্কার তাহাদের জাতীয় উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া আছে, আমাদেরও সেইরূপ অনেক বিঘ্ন আছে। কিন্তু তবু আমরা উহার বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিব, নতুবা এ জীবনধারণের কোনো মূল্য নাই।"*

লাল ইণ্ডিয়ানের কোনো গৌরবময় অতীত ইতিহাস নাই। কাজেই সে তাহার নিকট-প্রতিবেশীর সমকক্ষতায় একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গণনা করিতেছে, আর আমরা আমাদের উজ্জ্বল অতীতের স্বপ্নঘোরে নিকট-ভবিষ্যৎকে অবহেলা করিতেছি। অনুকরণ লাল ইণ্ডিয়ানের পক্ষে শোভন হইতে পারে, কিন্তু আমরা অতীতের সঙ্গে নাড়ীর যোগ রাখিয়া আমাদের আত্মবোধকে ধর্ম্মে কর্ম্মে, সাহিত্যে শিল্পে, গৃহে ও সমাজে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করিবার সুযোগ থাকিতেও কেন উহা ষোলআনা কাজে লাগাইতে পারিতেছি না ইহা বিশেষভাবে ভাবিবার বিষয়।

নিগ্রোদের প্রতি এ দেশের লোকের ঘৃণা কখনো দূর হইবে বলিয়া মনে হয় না। একবার একটি জার্ম্মান-আমেরিকান্ পরিবারে নিমন্ত্রণে গিয়া আহারকালে উক্ত পরিবারের দুইটি কন্যার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমরা একজন নিগ্রোর সঙ্গে এক টেবিলে খাইতে পার, কেমন?"

দুইজনেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "Oh my no!"

ইহাদের একজনের বয়স আঠারো, আর একজনের, ষোল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

ছোট বোন বলিল, "কেন? সে যে নিগ্রো!"

"তাহাতে কি আসে যায়?"

"সে আদৌ আমাদের মত নয়—তাহার সঙ্গে আমরা মিশিতে পারি না।"

"আমি তো সর্ব্বৈব তোমাদের মত নই, তবে আমাকে তোমরা কেন নিমন্ত্রণ করিয়াছ?"

বড় বোন্ বলিল, "আপনি তো আর নিগ্রো নয়—তা' ছাড়া অনেক দূর-সম্বন্ধ হইলেও আপনারা আমাদের জাতি।"

"আমি যদি জাপানী অথবা চীনদেশীয় হইতাম?"

"তবু আপনার সঙ্গে নিশ্চয় খাইতাম, কিন্তু চীনেম্যান ও জাপানীদের আমরা পছন্দ করি না।"

"তাহার কারণ সম্ভবতঃ আমাকে তোমরা যতটা জানিতে পারিয়াছ তাহাদের ততটা জানিতে পার নাই।"

সমগ্র এসিয়ার লোকের প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব এ দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। তাহার একটি প্রধান কারণ বহু সহস্র চীনদেশীয় ও জাপানী শ্রমজীবী ক্যালিফর্ণিয়ায় আসিয়া মার্কিন শ্রমজীবীদের মজুরীর উচ্চ হার কমাইয়াছে। তা' ছাড়া উহারা দেখিতে স্বতন্ত্র রকম, উহাদের আচার ব্যবহার ভিন্ন, ভাষা সর্ব্বৈব পৃথক্, এ-সকল কারণেও এই বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইতেছে। ইহার উপর হাজার পাঁচেক পাগড়ীপরা হিন্দুস্থানী ক্যালিফর্ণিয়ায় মজুরের কাজে প্রবৃত্ত হওয়ায় এ বিদ্বেষের ভাব আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে। হিন্দুদের রং ময়লা হইলেও যদি ইহারা পাগড়ী ছাড়িতে পারিত তাহা হইলে বিদ্বেষ কতকটা কম হইত। য়ুরোপে রেশমী পাগড়ীর কিছু মর্য্যাদা আছে; আমি নিজেও সেখানে কালো রেশমী পাগড়ী ব্যবহার করিয়াছি। আমেরিকা নূতন দেশ, বিশেষতঃ এখানকার সাধারণ লোকে

* I am very glad you found us "American Indians" different from what most people make us out to be. We are trying to raise ourselves to a level equal to that of the white man and hope that we may succeed soon. Of course, we have many difficulties, the same as your people, or any other, who are handicapped by caste or social prejudice, but we must all work hard to overcome them or we are not worth much.

মার্কিন-সভ্যতা ছাড়া অন্য কোনো সভ্যতার অস্তিত্বই জানে না। সেই জন্য এখানে জোর করিয়া পাগড়ী চালাইবার চেষ্টা আমি সমীচীন মনে করি না। ক্যালিফর্ণিয়ায় দক্ষিণ ইটালী হইতে সমাগত শ্রমজীবীদের "ডেগো" (Dago) ও হিন্দুদের "র‍্যাগহেড" (Raghead) নামকরণ হইয়াছে। চীন ও জাপানের লোকদের ইহারা আদৌ হিসাবের মধ্যেই ধরিতে চায় না, ঘৃণায় অনেকে উঁহাদের নিগ্রোদের সামিল বলিয়া ধরিয়া থাকে। তবে জাপানীকে সব-চেয়ে বেশী ঘৃণা করিলেও তাহার সম্মুখে ইহারা কিছু বলিতে সাহস পায় না।

নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে জন কুড়িক মঙ্গোলীয় ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন; ইহারা চীন, জাপান ও কোরিয়া হইতে সমাগত। এ দেশীয় ছাত্রগণকে তাঁহাদের সঙ্গে অতি অল্পই মিশিতে দেখিয়াছি। কুমারী ছাত্রীদিগকে ইহাদের সঙ্গে আদৌ বাক্যালাপ করিতে দেখি নাই। দুই একটি বয়স্কা ও বিবাহিতা ছাত্রী সময়ে সময়ে ইহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন। একবার আমার পরিচিত একটি বিবাহিতা ছাত্রী কোরিয়াদেশীয় একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "Do you feel very homesick here?" ছাত্রটি নম্রভাবে বলিয়াছিল, "No Madam, we are more race-sick than homesick here." তিন সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া ফিরিয়াও ইহারা নির্ব্বান্ধব ও অনভ্যর্থিত ভাবেই দিন কাটাইতে বাধ্য হয়। আমার সহাধ্যায়িনী একটি য়ুনিটেরিয়ান্ কুমারী একদিন ইহাদের লক্ষ্য করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "I wish I could speak with them, but I am afraid I would make myself too conspicuous." "পাছে লোকে কিছু বলে" এই ভয়ে ইনি তাঁহার করুণ হৃদয়ের সদ্ভাব চাপা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নিগ্রো-সমস্যা এ দেশের একটা খুব বড় সমস্যা, অথচ এ সমস্যার সমাধান না করিয়া মার্কিন পাদ্রী ভারতের আর্য্য ও অনার্য্যের জাতি ভাঙিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ যদি কৃষ্ণবর্ণ কৈবর্ত্তের সহিত একপঙক্তিতে আহার না করেন তাহা হইলে ভারতপ্রবাসী মার্কিন পাদ্রীদের প্রেম আহত হয়, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে নিগ্রো আমেরিকায় তাঁহাদের বাড়ীতে আসিলে কখনই বসিবার জন্য চেয়ার পাইবে না। নিগ্রোর প্রতি এ দেশের মেয়েদের কিরূপ ভাব তাহার আভাস মাত্র পূর্ব্বে দিয়াছি। আমি যখন নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম তখন তিনটি নিগ্রো ছাত্র ও একটি ছাত্রী সেখানে অধ্যয়ন করিতেন। ইহাদের একজনকে আমি জানিতাম। সুবিধা পাইলেই ইহার সহিত কথা কহিতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনের দিন গির্জ্জা হইতে বাহিরে আসিতেছি এমন সময় এক পূর্ব্ব সহাধ্যায়িনী "Let me congratulate you" বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন; তাঁহার সহিত করমর্দ্দন শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমার পরিচিত নিগ্রো ছাত্রটি হঠাৎ আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "I want to congratulate you"—আমি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া দিলাম, কিন্তু ফিরিয়া দেখিলাম উক্ত সতীর্থা পাঁচ সাত হাত দূরে সরিয়া গিয়াছেন!

নিগ্রোপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। স্থানান্তরে কথিত বিবাহিতা ছাত্রীটি লিঙ্কন্ সহরের জনৈক স্বচ্ছল আইনব্যবসায়ীর পত্নী। বহুদিন বিবাহিত হইলেও ইনি নিঃসন্তান। সুবিধা করিতে পারিলেই ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীকেই যে ইনি চেনেন তাহা নয়, কিন্তু তবু য়ুনিভার্সিটির ছাপা লিষ্ট দেখিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। একবার এইরূপ দশ বারো জনকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইবার পর এক স্থান হইতে উত্তর পাইলেন—

"প্রিয় মহাশয়া, আমি আপনার নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম এবং সে জন্য আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে আমি আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অসমর্থ। আমি কে তাহা জানিলে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেন না। বাহিরের অনেকে না জানিলেও আমি কি তাহা আমি জানি, এবং আমার উপস্থিতি নিশ্চয়ই আপনার অন্যান্য নিমন্ত্রিতবর্গের পক্ষে রুচিকর হইবে না। আমি নিগ্রো; সুতরাং আপনার

নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া আপনাকে বিড়ম্বনায় ফেলা কখনই আমার পক্ষে উচিত হইবে না। পুনরায় ধন্যবাদ। ভবদীয় * * *"

মহিলাটি এই চিঠি পাইয়া কাঁদিয়া চক্ষু জবাফুলের মত লাল করিয়া ফেলিলেন। স্বামী প্রবোধ দিতে লাগিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "তা হইতেই পারে না, আমি তাহাকে আসিতে বলিব, ইহাতে যে আমায় যা ইচ্ছা বলুক—আমি কিছুতেই নিমন্ত্রণ ফেরৎ লইতে পারিব না।" স্বামীর অনেক অনুনয় বিনয়ের পর স্ত্রী ক্ষান্ত হইলেন ও পর সপ্তাহে তাহাকে আবার স্বতন্ত্রভাবে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই নিগ্রো বালকটির শরীরে এত অল্প নিগ্রো রক্ত ছিল যে সম্ভবতঃ সে নিজে ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কেহ সে কথা জানিত না। কিন্তু তাহার আত্মসম্মানবোধ ও সত্যবাদিতা তাহাকে ঐরূপ নিমন্ত্রণগ্রহণে বিমুখ করিয়াছিল। এই ছাত্রটির সঙ্গে আমার আলাপ হয় নাই এবং ইহাকে দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না, দেখিয়া থাকিলেও তাহাকে অন্যান্য মার্কিন ছাত্র হইতে স্বতন্ত্র করিয়া চিনিবার সুযোগ হয় নাই; কিন্তু পর সপ্তাহে সে উক্ত মহিলার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তাঁহার গৃহে যে অল্পকাল ছিল তাহার মধ্যে উক্ত মহিলার মনে একটি চমৎকার শ্রদ্ধা ও স্নেহের ভাব সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আমার সহিত দেখা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "I wish our own boys were half as courteous and noble as he is. Oh, how blindly cruel is our society in dealing with people !"

নিগ্রো নারীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার সুযোগ হয় নাই। একটি মাত্র নিগ্রো দাসীকে কয়েক মাস ধরিয়া জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। এই দাসীটি যুবতী ও বিধবা। বেচারীর রংটি আবলুসের মত কালো হইলেও তাহার প্রাণটি তুষারের মত শুভ্র, তাহার প্রমাণ বহু বার পাইয়াছিলাম। একদিন প্রাতে প্রাতরাশের সময় বলিলাম, "মার্গারেট্, আজ আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে, ব্রেক্‌ফাষ্ট চট্‌পট্ সেরে নিতে হবে।" একটা টেবিলে আমরা সাতজন খাইতে বসিয়াছিলাম, প্রত্যেকেরই একটা-না-একটা ফরমাস আছে। মার্গারেট্ আমার আহার্য্য আনিতে দেরি করিতেছে দেখিয়া আমি বিনা প্রাতরাশে য়ুনিভার্সিটিতে চলিয়া গেলাম। মধ্যাহ্ন আহারের (lunch) সময় টেবিলে উপস্থিত হইলে দেখিলাম তাহার মুখ অত্যন্ত ভারি। আমি একটু বিলম্বে আসিয়াছিলাম; অন্যান্য সকলে একে একে উঠিয়া গেলে মার্গারেট্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "Sir, why did you go away without taking your breakfast ?" আমি বলিলাম, "মার্গারেট্, আমার অপেক্ষা কর্‌বার জো ছিল না।" মার্গারেট্ বলিল, "I thought you were angry with me for being late, and went away." আমি বলিলাম, "মার্গারেট্, আমি যদি মনে করতাম তুমি ইচ্ছা করে দেরি কর্‌ছিলে তবে রাগ কর্‌তাম, তুমি তো একা একজনের চাকর নও—আমি তোমার ওপর একটুও রাগ করিনি।" আমার কথা শেষ হইতে না হইতে সেই কুৎসিতা, সর্ব্বসাধারণের ঘৃণিতা, সামান্য দাসীর দুই চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে এপ্রন্ দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। করুণ কথায় সকলেরি প্রাণ গলে, প্রাণের কোনো শাদা বা কালো চাম্‌ড়া নাই, প্রাণ জাতিভেদ মনুর শাসন মানে না।

আর একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। যে কয়টি মার্কিন ছাত্রের সঙ্গে আমি আহার করিতাম তাঁহাদের মধ্যে একজনের মেজাজ বড় সুবিধা রকমের ছিল না। একদিন মার্গারেট্ তাঁহার একটি হুকুম তামিল করিতে সামান্য দেরি করায় টেবিলে উপস্থিত সকলের সাম্‌নেই ইনি তাহাকে, "ড্যাম্ নিগার্" বলিয়া গালি দিয়া উঠিলেন। মার্গারেট্ নীরবে গালি সহ্য করিল। কিন্তু আর একজন ছাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "You can't treat Margaret like that, she may be a Negress, but she has never been other than ladylike !" অপরাধী ছাত্রটি উপযুক্ত তিরস্কার পাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। যখন আহার শেষ করিয়া তিনি উঠিয়া যাইবেন তখন মার্গারেট্ ধীরভাবে বলিল, "Curse me as you please, but I won't be any worse for that." "Ladylike" হইতে হইলে তুষারধবলা হইতেই হইবে এমন কোনো নিয়ম ভগবান্ সৃষ্টি করেন নাই।

য়ুনাইটেড্ ষ্টেটসে ভারতবাসীর প্রতিভার মর্য্যাদা আছে। একমাত্র ক্যালিফর্ণিয়ার এ মর্য্যাদার সামান্ত হানি হইয়াছে। শিক্ষিত ভারতবাসী সাধারণ শ্রমজীবী না হইয়া অন্তবিধ শক্তির পরিচয় দিবার নিমিত্ত,' অথবা উচ্চশিক্ষা লাভের জন্ত এ দেশে আসিলে সাধারণতঃ য়ুরোপীয়দের সমান আদর ও সম্মান পাইবেন। কিন্তু আর কয়েক সহস্র ভারতীয় শ্রমজীবী আসিলে মঙ্গোলীয়দের স্তায় ভারতবাসীর অবস্থাও এখানে সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে। এক ক্যালিফর্ণিয়া ব্যতীত হিন্দুবিদ্বেষ এখনো অন্তত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। চীন ও জাপান হইতে সমাগত শ্রমজীবীগণ এ দেশের সর্ব্বত্র ঘৃণিত হইলেও পূর্ব্বাঞ্চলে (New England States) উক্ত দেশের ছাত্রগণ ক্যালিফর্ণিয়া ও তৎসন্নিহিত ষ্টেটগুলি অপেক্ষা বহু পরিমাণে সুখী ও সামাজিকতার অধিকারী।

পাশ্চাত্য জগৎটা অনেক বিষয়ে প্রাচ্যের মত নয় তাহা ঠিক, কিন্তু এ বৈষম্যসত্ত্বেও আমাদের মিলনের ভূমি নিশ্চয়ই আছে। অন্ধ পশ্চিম আমাদের স্বীকার করিতে চায় না তাহার কারণ আমাদের জাতীয়জীবনের গোপনতম আকাঙ্ক্ষা কি তাহা সে জানে না। পশ্চিমকে আমরা ঘৃণা করি তাহার কারণ প্রাণ দিয়া আমরা তাহাকে যাচাই করিবার সুযোগ পাই নাই। অন্তরে আমরা অনেক বিষয়ে এক, কিন্তু অবস্থাবৈষম্যে ও অন্তান্ত কারণে আমাদের মনের প্রকাশ ভিন্ন আকার পাইয়াছে। ইংরেজ ও আমেরিকান্ বলিতেছেন, "Woman is the queen of the home"—আমরা স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহাকে "গৃহলক্ষ্মী" বলিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছি। আদর্শে দ্বন্দ্ব কোথায়?

স্ত্রীস্বাধীনতার আদর্শে ভারত ও পাশ্চাত্যজগতে দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই না। কিন্তু তবু ভারতে নারী এত অসহায় কেন? তাহার প্রধান কারণ আমরা নিজেরা অন্ধকারে পড়িয়া আছি; যাহাকে আমরা জাগরণ মনে করিতেছি তাহা সত্য জাগরণ নহে। সত্য জাগরণ হইলে সর্ব্বাগ্রে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও যথাসম্ভব রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্ত আমরা একাগ্র হইয়া উঠিতাম। আমরা আজ পর্য্যন্ত স্বপ্নে জাত হইয়া আছি; অথচ উত্তরাধিকারে আমরা জগতের অন্ত কোনো সভ্য জাতির তুলনায় হীন নহি। অবশ্য কি নারী, কি পুরুষ, উভয়কেই স্বাধীনতার মধ্যে অনেক অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। পাশ্চাত্যজগতের স্ত্রীস্বাধীনতার মধ্যে যে কঠোর সমাজবিধি আছে উহা সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। যে যুগের ভারতবর্ষের গর্ব্ব করিয়া আমরা জগতের কাছে মাথা তুলিয়া কথা কহি সে যুগে নারীর অব্যাহত স্বাধীনতা ছিল। ভারত যদি আবার নূতন গৌরবমুকুট মাথায় ধারণ করে তবে নারীর স্বাধীনতা সেই মুকুটের উজ্জ্বলতম কোহিনূররূপে দীপ্তি পাইবে। "অসভ্য জাপানে" নারী স্বাধীন, যুগযুগান্তের নিদ্রার পর চীনে নারী শক্তিমতী, মুসলমান-অধ্যুষিত তুর্কী, আরব, ও পারস্যে নারী আপনার অধিকার ধীরে ধীরে লাভ করিতেছেন তাহা আমরা শুনিতে পাইয়াছি। ভারত, এশিয়ার মুকুটমণি ভারত, শুধু তুমিই কি তোমার নারীশক্তি ও নারীপ্রতিভাকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়া জগতের চির অবজ্ঞার সামগ্রী হইয়া থাকিবে?

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাগরের শাস্তি

(Cooffer এর অনুকরণে গ্রীক পৌরাণিক উপাখ্যান।)

রাজা ছিলেন সীক্স (Ceyx), রাণী ছিলেন হ্যালসায়নী। গ্রীসেরই কোনও একস্থানে তাঁহাদের রাজত্ব ছিল। দুইজনের মধ্যে এমনই মনের মিল ছিল যে কেহ কাহাকেও না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। চিরকাল, এমন কি আজ পর্য্যন্ত, তাঁহারা একসঙ্গেই আছেন। মাত্র একবার তাঁহাদের ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল।

বৎসরের পর বৎসর তাঁহাদের দিনগুলি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিতেছিল। কিন্তু চাঁদের মাঝে কলঙ্কের আঁচড় ভগবানের না দিলেই নয়। একদিন রাজাকে বিদেশে যাইতে হইল। কোনও একটি কারণে দৈববাণী শুনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। দৈববাণী শুনিতে হইলে তখন ডেল্‌ফিতে যাইতে হইত। সেইখানে এপলো দেবের মন্দিরে দৈববাণী শোনা যাইত।

হ্যালসায়নীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া রাজার খুব কষ্ট হইল। রাণীও পথের বিপদের কথা বলিয়া তাঁহাকে রাখিতে চেষ্টা করিলেন, শেষে নিজে সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। কিন্তু রাজা থাকিতে পারিলেন না, সমুদ্রের বিপদের মাঝে রাণীকে লইয়া যাইতেও তাঁহার মন সরিল না।

জাহাজ সাজান হইল। যাইবার দিন দেখিতে দেখিতে চলিয়া আসিল। অশুভ দিন এইরূপেই আসে। রাণী চোখের জল চাপিয়া কষ্টে হাসিয়া রাজাকে বিদায় দিলেন। বলিলেন "“এই জাহাজ যখন আবার ঘরে ফিরিবে তখন আবার আমাকে এইখানে দেখিবে।” এইরূপ কত সুখ-দুঃখের কথাবার্ত্তার পর জাহাজ ছাড়িয়া দিল। হ্যালসায়নী সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে জাহাজখানি নীল আকাশে মিশাইয়া গেল; শুধু রৌদ্রদীপ্ত সাগরে তরঙ্গ-রাশি তাঁহার জলভরা চোখের পলক-পাতের মতন খেলা করিতে লাগিল। নীরবে হ্যালসায়নী প্রাসাদে ফিরিলেন।

(২)

এদিকে জাহাজ বাতাসের আগে ছুটিয়া চলিল। পাল-গুলি বাতাসে কাঁপিতে লাগিল। দাঁড়িমাঝিরা সুখে গান ধরিল। সীক্স ভিতরে বসিয়া হ্যালসায়নীর মঙ্গলচিন্তা করিতেছিলেন।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন, চারদিন এই ভাবে চলিয়া গেল। পাঁচদিনের দিনে আকাশে একটু মেঘ দেখা গেল। সন্ধ্যার মধ্যেই সেই মেঘ আকাশ ছাইল—ঝড় উঠিল। ছোট ছোট নীল ঢেউগুলি কালো আর প্রকাণ্ড হইয়া উঠিল। কালো কালো জলের পাহাড় জাহাজখানির উপর আছড়িয়া পড়িতে লাগিল। রাত্রিতে ঝড় আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। চাঁদ তারা সব আকাশে মুখ ঢাকিল। শুধু বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে আকাশের সেই কালো পর্দ্দা যেন ছিঁড়িয়া দিতেছিল। ঢেউএর শব্দে ও বজ্রের শব্দে আকাশ যেন বিঁধিতেছিল। এই অবস্থায় রাজা সীক্স্ দাঁড়াইয়া লোকজনদের উৎসাহ দিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার আদেশবাণী বজ্রের গম্ভীর বাণীর নীচে পড়িয়া কাহারও কানে পৌঁছিতেছিল না।

ভাঙা মাস্তুলের উপর পালের কাপড় ছিঁড়িয়া পড়িল। জাহাজের তক্তা সরিয়া চারিদিক হইতে জলরাশি জাহাজ ভরিয়া ফেলিল। তাহার পরে একটি প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া জাহাজের গায়ে লাগিল। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার, সেই বিরাট গর্জ্জন! তাহার মাঝে অতি ক্ষীণ করুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল, তাহার পরই সে ক্ষীণ তুচ্ছ শব্দ মহাগর্জ্জনে মিলাইয়া গেল। মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া সেই ভীষণ স্রোতে রহিলেন শুধু সীক্স। তিনি জলের ঢেউএর সঙ্গে উঠিতে ও পড়িতে লাগিলেন। তখনও ভাসিতে ভাসিতেও হ্যালসায়নীর মুখখানি তাঁহার চোখের সামনে ভাসিতে-ছিল। মৃত্যুর মুখেও তিনি হ্যালসায়নীর নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন।

(৩)

এ দিকে হ্যালসায়নী অতি অধীরভাবে রাজার প্রত্যা-গমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকালে জুনোর মন্দিরে রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন।

মৃতব্যক্তির জীবনের জন্য প্রার্থনায় জুনো অধীর হইয়া উঠিলেন। শেষে আইরিস্ দেবীকে ডাকাইলেন। আই-রিস্ দেবী জুনোর দূতী, বিদ্যুদ্দেবীর কন্যা। জুনো শেষে ইঁহাকে রামধনুতে পরিণত করেন। বিদ্যুতের কন্যা রামধনু, সুতরাং দৌত্যে ইঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল সন্দেহ নাই। জুনো তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—“সমনাসের বাড়ী যাইয়া তাহাকে বলিয়া আইস, যেন সীক্স মৃত এই মর্ম্মে হ্যালসায়নীর নিকট এক স্বপ্ন পাঠায়।” সমনাস রজনী দেবীর পুত্র নিদ্রাদেব।

(৪)

আইরিস্ রামধনু-রঙের পোষাক পরিয়া দেখিতে দেখিতে নিদ্রাদেবের সেই আঁধারগুহার কাছে উপস্থিত।

সে গুহায় কখনও সূর্য্যরশ্মি যায় নাই। একটা নিবিড় জীবনী-ভাবশূন্য আঁধারে সর্ব্বদাই সেটা পূর্ণ থাকিত। কোনও পাখীর ডাকে কখনই সেই আঁধার রাজার রাজ্যের শান্তি ভাঙে নাই। সেখানে ত সূর্য্যের সোনার আলো পড়িত না, পাখী ডাকিবে কি করিয়া? দুয়ারে আফিমের বন। ধুতুরার ফুল ফুটিয়া কিছুদূর একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। এই রকম আরও অনেক মাদক গাছ। তাহা খাইলেই মানুষ অজ্ঞান হইয়া যায়। সেই গুহার ঠিক মাঝে আবলুসের পালঙ্কে নিদ্রাদেব ঘুমঘোরে অচৈতন্য। স্বপ্নেরা বাষ্পের মত, একটা ছায়ার পর্দ্দার মত চারিদিকে ছড়াইয়া আছে।

যখন সুন্দরী আইরিস সেই গুহায় প্রবেশ করিলেন, তখন সেই আঁধারে একটা জ্যোতি খেলিয়া গেল। সম্‌নাস তন্দ্রাবেশে মাথা তুলিলেন। আইরিস বলিলেন,—

"আমি মহাদেবী জুনোর আদেশে আসিয়াছি। তিনি আপনাকে হ্যালসায়নীর নিকট সীক্সের মরণের কথা স্বপ্নে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।" তরল জ্যোতি খেলাইয়া আইরিস চলিয়া গেলেন।

সম্‌নাস নিদ্রাবিজড়িতকণ্ঠে একজন স্বপ্নকে সেইরূপ আদেশ করিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি আসিলে সে নীরবে পাখা মেলিয়া চলিয়া গেল।

(৫

হ্যালসায়নী স্বপ্ন দেখিলেন তাঁহার স্বামীর সর্ব্বাঙ্গ জলসিক্ত। গায়ে ছোট ছোট ঝিনুক আর শঙ্খ লাগিয়া আছে। সীক্সরূপী স্বপ্ন করুণভাবে সমস্ত কথা বর্ণনা করিল। ঘুমন্ত অবস্থাতেই হ্যালসায়নী অজ্ঞান হইয়া গেলেন। যখন জাগিলেন তখন তাঁহার বুক দুরদুর করিতেছে। ছুটিয়া তিনি সাগরতীরে গেলেন। সমুদ্র আবার তেমনই শান্ত। সেই শান্ত বুকের উপর দিয়া একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া হ্যালসায়নীর পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িল। সীক্সের শব তীরে তুলিয়া দিয়া স্রোত ফিরিয়া গেল। হ্যালসায়নী শুধু বলিলেন—"ওঃ! আমার স্বপ্ন কি দারুণ সত্য।"

আর কিছু না বলিয়া তিনি পাহাড়ের উপর উঠিলেন। সমুদ্রের ধারেই পাহাড়। সেইখান হইতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু—"তন্ন ভবতি যন্নভাব্যম্" যাহা হইবার নহে তাহা হয় না। দেবী জুনো তাঁহাকে পড়িতে দিলেন না। রাজাকে ও রাণীকে পাখী করিয়া দিলেন। আজও সে পাখী সমুদ্রেই থাকে।

যত ভীষণ সাগরই হৌক বৎসরে সাত দিন তাহাকে দর্পণের মত সমতল থাকিতেই হইবে। দেখা যায় সেই শান্ত সমুদ্রের উপর হ্যালসিয়ান পাখী উড়িয়া বেড়ায়। ইহাই সাগরের শান্তি। এই সাত দিনকে হ্যালসিয়ন দিন (Halcyon day) বলে।

শ্রীলীলাবতী ঘোষ।

খাসিয়াদের উন্নয়ন

খাসিয়া জাতির উন্নতিকল্পে এ পর্য্যন্ত যত মিলিতশক্তি কার্য্য করিয়াছেন তন্মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক স্থাপিত ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম-প্রচার-আশ্রম অন্যতম। এই আশ্রম পঁচিশবৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। খাসিয়াদের উন্নতিকল্পে ইহা আপনার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের যথাসম্ভব নিয়োগ করিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা।—১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে খাসিয়া পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রধান সহর শিলং হইতে কয়েক জন বাঙালী ব্রাহ্ম খাসিয়া-ভাষায় ব্রাহ্মসমাজের মূলসূত্র-সম্বলিত একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। শেলার তিনজন অধিবাসী এই পুস্তিকাখানি পড়িয়া শিলঙের ব্রাহ্মদিগকে খাসিয়াদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষাদিবার জন্য একজন প্রচারক পাঠাইতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধপত্র কলিকাতায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পাঠানো হয়। নীলমণি বাবু তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের সহকারীর কার্য্য করিতেন ও তাঁহার পত্রাদির উত্তর দিতেন। এই অনুরোধ-পত্র পড়িয়া নীলমণি বাবুর খাসিয়া-পর্ব্বতে যাইবার ইচ্ছা হইল। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহকসভার অনুমতি পাইয়া নীলমণি বাবু যাত্রা করিলেন। এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তিনি শিলং পৌঁছিলেন।

খাসিয়াদের সঙ্গে অধিক পরিমাণে মিশিবার সুযোগ পাইতে হইলে এবং তাহাদের মধ্যে কাজ করিতে হইলে বাঙালী ব্রাহ্মদের মধ্যে না থাকিয়া খাসিয়াদের মধ্যে থাকারই অধিক প্রয়োজন দেখিয়া তিনি শিলংএর মৌখর নামক খাসিয়া-পাড়ায় উঠিয়া গেলেন। তখন খাসিয়া-ভাষায় যে দুইতিনখানি বই ছিল, সবগুলিই বিদেশীর লেখা ও ভ্রমপ্রমাদযুক্ত দেখিয়া তিনি খাসিয়াদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহাদের ভাষা শিখিতে মনস্থ করিলেন। এই সময় নীলমণি বাবু মৌখর ব্রাহ্মসমাজে ইংরেজিতে উপদেশ দিতেন এবং আর একজন তাহা খাসিয়া-ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। চেরাপুঞ্জী, শেলা ও অন্যান্য কয়েক জায়গায় কিছুদিন কাজ করিয়া তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন যে এই পার্ব্বত্য প্রদেশে কাজ করিলে

খেসী ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কয়েকজন লোক।

শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী ও তিনজন একেশ্বরবাদ প্রচারক এবং একেশ্বরবাদী মণ্ডলী।

যথেষ্ট ফললাভ হইবে। সুতরাং তিনি খাসিয়াদের মধ্যে দুই বৎসর কাজ করিবেন বলিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে লিখিয়া পাঠাইলেন। এই সময় তিনি খাসিয়া-ভাষায় সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিতে পারিতেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে কলিকাতায় ফিরিবার সময় চলনসই ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসূত্রসকল ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজের মত, বিশ্বাস, ও মূলসূত্রসকল খাসিয়া-ভাষায় লিখিত ও কলিকাতায় প্রকাশিত হইল।

খাসিয়া ভাষায় প্রার্থনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা।— ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে 'মসমই'তে একটি এবং শেলাতে দুইটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে একজন বাঙালী ও একজন খাসিয়া একত্রে কতকগুলি বাংলা ব্রহ্মসঙ্গীত খাসিয়া-ভাষায় অনুবাদ করিলেন। শেলার একজন নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণব ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে, নীলমণি বাবু উক্ত অঞ্চলে পৌঁছিলে কতকগুলি সংকীর্ত্তন রচনা করিতে অনুরুদ্ধ হন। কাজেই তিনি দুইটি সংকীর্ত্তন অনুবাদ করিয়া তাহার সুর সেখানকার অধিবাসীদের শিখাইয়া দিলেন। খ্রীষ্টান সমাজের একজন প্রধানলোক তিন ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিতে না পারিয়া পরিবারবর্গকে চেরাপুঞ্জীতে ত্যাগ করিয়া শেলায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি একজন বস্ত্রব্যবসায়ী। তিনি শেলায় নদীর ধারে একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ স্থাপন করিয়া, আপনার দোকান হইতে লম্বা লম্বা বস্ত্রখণ্ড আনিয়া তাহা আচ্ছাদন করিয়া এক সভার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। নীলমণি বাবু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে মস্ত একদল লোক হুঁকো, ধূমপানের নল, তামাক, ঢাক ও ঘণ্টা প্রভৃতি জড়ো করিয়া তাহার চারিধারে জমা হইয়াছে। তিনি ইঙ্গিত করায় ঐ জিনিষগুলি সরাইয়া লওয়া হইল। শেলায় ইহার পর হইতে ঢোলের পরিবর্ত্তে খোলের ব্যবহার আরম্ভ হইল। কিন্তু অন্যান্য জায়গার লোকেরা খোল করতাল সহযোগে সংকীর্ত্তনে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। কোন কোন জায়গায় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সিলেটের স্বর্ণকারদের নিকট নাচিতে ও ঢোল বাজাইয়া কুরুচিপূর্ণ গান গাহিতে শিখিয়াছিল। এই কারণে এবং কতকটা খৃষ্টানদের প্ররোচনায় খাসিয়াদের মধ্যে বাংলা সুরের প্রতি একটা অস্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য প্রথম প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রচলন করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। জনসাধারণের অজ্ঞতা ইহার পথে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একজন খৃষ্টান শিক্ষক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উৎসাহের সহিত একটি সমাজের কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল উপরি উপরি দুই সপ্তাহ ধরিয়া কেহই উপাসনামন্দিরে যাইতেছে না। খোঁজ করিয়া দেখা গেল উক্ত শিক্ষকের "অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি" গানটি মনের মতন না হওয়াতে তিনি সকলকে মন্দিরে আসিতে বারণ করিয়া দিয়াছেন। গানের প্রথম পঙ্ক্তিটিতে পর্ব্বতমালা ও অরণ্যানীকে তাহাদের স্রষ্টার গুণকীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। শিক্ষকমহাশয় বলিলেন "পর্ব্বত ও অরণ্যসমূহকে ভগবানের গুণগান করিতে হুকুম করিবার আমাদের কি অধিকার আছে?" এইরূপ অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি এখন বেশ প্রচলিত ও লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শিক্ষক মহাশয়ের এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববাসগৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রচারাশ্রমের নিকট নূতন গৃহস্থাপন করিয়াছেন। এখন তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ও প্রার্থনা করিতে করিতে প্রেমাশ্রু মোচন করেন। তিনিই নীলমণি বাবুকে খাসিয়া-ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীতের একটি বৃহৎ পুস্তক রচনা করিতে ও প্রকাশ করিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন। বাংলা সুর-সম্বলিত এই সঙ্গীতপুস্তকটির তিনটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে।

খাসিয়াদের মধ্যে চিকিৎসার প্রবর্ত্তন।- খাসিয়া পাহাড়ে আসিবার দুইতিন মাস পরে নীলমণি বাবু পাহাড়ীদের চিকিৎসাকার্য্যে সাহায্য করা দরকার বোধ করিলেন। পূর্ব্বেই তাঁহার কিছু কিছু হোমিওপ্যাথি জানা ছিল। ক্রমে আরও কতকগুলি ডাক্তারী গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পড়িয়া ফেলিলেন। কতকগুলি যন্ত্রও কিনিলেন। সেই সময় একটা গ্রামে খুব পীড়ার উৎপাত হওয়াতে তিনি ঘরে ঘরে গিয়া রোগী দেখিয়াও ঔষধ বিতরণ করিয়া আসিতে লাগিলেন। দিনের পর

দিন তিনি বেলা ১টা ২টার পূর্ব্বে অন্ন স্পর্শ করিতে পাইতেন না। দরিদ্র ও অসমর্থদিগকে আবার পথ্যও দিতে হইত। অনেক সময় বৃদ্ধবৃদ্ধারা মরিতে বসিয়াও কুসংস্কারবশতঃ ঔষধ ব্যবহার করিতে চাহিত না। ইহাদিগকে অনেক খোসামোদ করিয়া, এমন কি অর্থের লোভ দেখাইয়া ঔষধ গ্রহণ করাইতে হইত। ক্রমশঃ লোকের ঔষধে বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিতে লাগিল। হাটের দিনে ত নীলমণিবাবুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে ভীড় লাগিয়া যাইত। বহুদূরের গ্রাম হইতে রোগীরা আসিত। তিনি ও তাঁহার বাঙালী সহকারী অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঔষধ বিতরণ করিতেন। আজকাল চারিদিকের লোকেদের মধ্যেই এই বিশ্বাস ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনেক স্থলে আবার বিশ্বাসের মাত্রা এত বাড়িয়াছে যে লোকে বেশী করিয়া ঔষধ খাইতে আরম্ভ করিয়াছে! গ্রামে গ্রামে হাতুড়ে ডাক্তারেরা ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে ও বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইজন্য প্রচারাশ্রমের চিকিৎসাকার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক লঘু হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখনও চারিটি কেন্দ্র হইতে সাহায্যদান করা হয়। কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের জন্য সকলের পরিত্যক্ত অসহায় গৃহহীন রোগীদিগের ও দূরগ্রাম হইতে চিকিৎসার্থে আগত ব্যক্তিদের জন্য চেরাপুঞ্জীর প্রচারাশ্রমের প্রাঙ্গণে তিনটি-কক্ষযুক্ত একটি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বাড়ীর দুইখানি ঘরে রোগীরা বাস করে, তৃতীয় ঘরখানিতে একজন দরিদ্র ব্রাহ্ম বিনাভাড়ায় বাস করেন ও বাড়ীটির তদারক করেন। হোমিওপ্যাথিক ও অন্যান্য ঔষধগুলি ক্রমশঃ এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের সর্ব্বত্রই প্রবেশলাভ করিয়াছে। আজকাল অনেকেই বাড়ীতে এই-সকল ঔষধ রাখে। সম্প্রতি চেরাপুঞ্জীতে গভর্ণমেণ্ট একটি দাতব্যচিকিৎসালয় খুলিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পর যখন জ্বরে শত শত লোক মারা যাইতে লাগিল তখন চেরাপুঞ্জীর যুবরাজ চন্দ্রসিংহ, নীলমণি বাবুর পরামর্শে, গভর্ণমেণ্টের কাছে একজন ডাক্তার চাহিয়া পাঠান। তাহা হইতেই চেরাপুঞ্জীর সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়।

সেই ভূমিকম্পের পর নীলমণি বাবু স্বয়ং শেলায় গিয়া পীড়িতদের ঔষধ পথ্য সেবা সাহায্য করিতেছিলেন; গ্রামকে-গ্রাম ধসিয়া গিয়াছে, গৃহ ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার উপর বন্যা ও পীড়ার প্রকোপ; কে কাহাকে দেখে ঠিক নাই; মৃতের সৎকার করিবার লোক নাই; বহু চিন্তা নিরন্তর জ্বলিতেছে। এই ভীষণ অবস্থায় অনাহারে অনিদ্রায় নিজে কষ্ট সহ্য করিয়া নীলমণি বাবু আর্ত্তদের সেবা করিতেছিলেন। শেষে লোকে তাঁহাকে এমন ঘিরিতে লাগিল যে ঔষধ ফুরাইয়া যাওয়াতে তাঁহাকে গোপনে পলাইয়া আসিতে হইল।

এইরূপে চিকিৎসা-প্রণালীর প্রবর্ত্তনে দেশের লোকেদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, ইহাতে অনেকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যে পীড়ার সময় ঔষধ সেবনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সৎকার্য্যটি এখনও চলিতেছে। প্রত্যেক প্রচারককেই রোগ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

মাদক ব্যবহার নিবারণ।—পূর্ব্বে শিলং ছাড়া খাসিয়া-পর্ব্বতের আর কোনও স্থান আবকারী বিভাগের অধীন ছিল না। যে-কোন লোকই যত ইচ্ছা মদ চুয়াইতে পারিত। ইহার জন্য লাইসেন্সের আবশ্যক হইত না। খাসিয়াদের দেশী মদ বিশেষ অনিষ্টকর ছিল না। কিন্তু জোন্‌স্ নামক কোনও ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারী ইহাদিগকে উগ্র সুরা প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখাইবার পর তাহাই সমগ্র প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে নানাপ্রকার দুর্নীতির প্রচার হইয়াছে, মাঝে মাঝে খুনও হয় এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে অনেকের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

গত বারো তের বৎসর ধরিয়া নীলমণি বাবু ইহাদের মধ্যে সুরাপান নিবারণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, উপদেশ ও কথোপকথনের দ্বারা অনেকের মতি ফিরাইয়াছেন। তিনি ডেপুটি কমিশনারদের সহিত নিজে সাক্ষাৎ করিয়া ও চিঠিপত্র লিখিয়া তাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, ও নানাপ্রকার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারাও প্রস্তাব-অনুযায়ী অনেক কার্য্য করিয়াছেন। চার বৎসর হইল এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে আবকারী বিভাগের আবির্ভাব হইয়াছে। এখন যে-কেহ মদ্য প্রস্তুত করে

শিলঙের ঝিলের বাঁধ।

চেরাপুঞ্জী ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির।
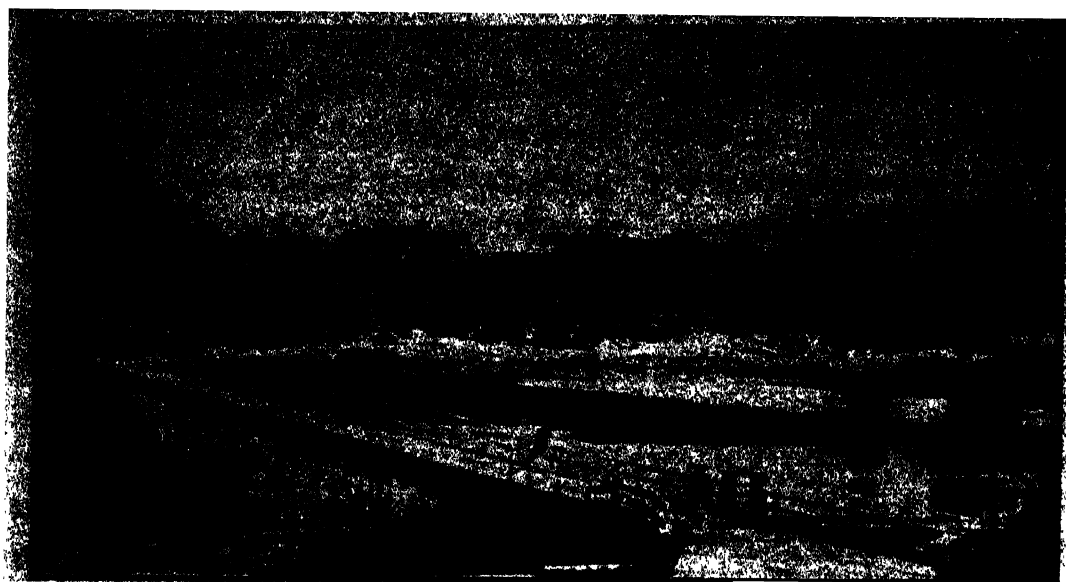
তাহাকেই বাৎসরিক পাঁচটাকা করিয়া লাইসেন্স-ফি দিতে হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে ডিসেম্বর কলিকাতায় All-India Temperance Conferenceএর যে অধিবেশন হয় তাহাতে নীলমণি বাবু নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেন এবং একজন খাসিয়া ভদ্রলোক তাহার সমর্থন করেন :—

"খন্দ খাসিয়া ও অন্যান্য অসভ্যজাতির মধ্যে সুরাপান নিবারণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে এই সভা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু পানাসক্তির জন্য এই-সকল জাতি যাহাতে দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া না পড়ে গভর্ণমেণ্ট তাহার জন্য আরও চেষ্টা করুন এই সভার অনুরোধ।"

তখন হইতে প্রত্যেক মদ্যপ্রস্তুতকারীর লাইসেন্স-ফি বৎসরে পাঁচটাকা করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে জন-প্রতি কুড়িটাকা লাইসেন্‌স্-ফি দাঁড়াইয়াছে। খোলাভাটির সংখ্যা দিন-দিনই কমিতেছে। একটি গ্রামে ১৭০ খানি গৃহের মধ্যে ৭৫ খানিতে মদ চোয়ান হইত, এখন মাত্র ২৫ খানি গৃহে হয়। মদ্যবিক্রেতার কার্য্যে যে বহু বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একগ্রাম হইতে অপর গ্রামে কি একরাজ্য হইতে অপর রাজ্যে মদের আমদানী-রপ্তানীর নিষেধটিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুফল ফলিয়াছে। খাসিয়া পর্ব্বতে পাশাপাশি অনেকগুলি ছোট রাজ্য আছে। এক গ্রাম কি এক রাজ্য হইতে অপর গ্রামে কি অপর রাজ্যে মদ লইয়া যাইতে না পারিলে বিক্রয়ও কম হয়, কাজেই মদ চোয়ানও কমিয়া আসে।

ডেপুটি কমিশনর নীলমণিবাবুকে বলিয়াছেন যে তিনি যথাসম্ভব মদ্য-উৎপাদন কমাইয়া দিবেন।

তিন চার বৎসর পূর্ব্বে নীলমণি বাবুই পার্ব্বত্যপ্রদেশে গাঁজার চাষ ও সমতল প্রদেশে তাহার গুপ্ত চালানের দিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং তিনি ইহার নিবারণের উপায় উত্থাপন করেন। গাঁজার চাষ প্রায় সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া গিয়াছে। একটি গ্রামে ইহার চাষ এখনও পুরা দমে চলিতেছে। এদিকে ডেপুটি কমিশনরের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে তিনি আবকারীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরকে তথায় পাঠাইয়া দেন। নীলমণিবাবু ডেপুটি কমিশনরকে এবিষয়ে আবার লিখিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ-নিবারণ।—নীলমণি বাবুর বাসকালের মধ্যে খাসিয়া-পর্ব্বতে তিন-চারিবার অন্নকষ্টের ও তজ্জনিত অন্যান্য দুঃখের আবির্ভাব হয়। প্রত্যেকবারেই তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বিপন্নদের সাহায্য করিয়াছেন। কখনো বা গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লোকদিগকে সাহায্য দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শেলা তখন ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অধীন ছিল না বলিয়া তাঁহারা সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলে সে ভার বারবার লোকের চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া নীলমণি বাবুকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

তিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল অন্নহীনকেই দান করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মগণ এইরূপ নির্ব্বিচার দানে আপত্তি তুলিলেন। তাঁহারা বলিলেন খৃষ্টান মিশন যখন কেবল খ্রীষ্টানদেরই সাহায্য করেন তখন তাঁহারও কেবল ব্রাহ্মদেরই সাহায্য করা উচিত; ইহা দ্বারাই ওদেশের অন্যান্য মিশনের কার্য্যপ্রণালী বুঝিতে পারা যায়।• একগ্রামে ইউনিটেরিয়ান খাসিয়াদের মধ্যে অন্নকষ্ট দেখা দেয়। নীলমণি বাবু তখন লণ্ডনের British and Foreign Unitarian Association নিকট টেলিগ্রাম করেন এবং সেখান হইতে যে টাকা পান তাহা দ্বারা ঐ গ্রামস্থ ইউনিটেরিয়নদের সাহায্য করেন। ইহার জন্য একজন রাজকর্ম্মচারী তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার সহিত অসদ্‌ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন।

মাঝে মাঝে তাহাকে দারিদ্র্য-পীড়িত, ক্ষুধার্ত্ত ও কর্ম্মহীন লোকদেরও সাহায্য করিতে হয়। পাহাড়ের দেশে শীত খুব বেশী বলিয়া দরিদ্রদের আবশ্যক-মত কাপড়চোপড়ও জোগাইতে হয়।

খাসিয়াদের শিক্ষাদান।—পূর্ব্বে খাসিয়া-পর্ব্বতে শিক্ষা-কার্য্য-বিষয়ে ওয়েল্‌স্ ক্যালভিনিষ্টিক মিশনেরই একাধিপত্য ছিল। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ইহাদের অনেকগুলি ছোট ছোট বিদ্যালয় আছে, মিশনের নিযুক্ত শিক্ষকেরা এই-সকল বিদ্যালয়ে একাধারে শিক্ষক ও প্রচারক দুইএর কার্য্যই করেন। গভর্ণমেণ্টকে খাসিয়াদের স্কুল-পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক, স্কুল-সবইন্‌স্পেক্টর ও পরীক্ষক জোগাইয়া দিবার সম্পূর্ণ ভার পূর্ব্বে এই

মিশনের হাতেই ছিল। ছাত্রবৃত্তি বিতরণের নির্ব্বাচনও অনেকটা ইহার ইচ্ছামত হইত। স্কুলপাঠ্য পুস্তকসকল উক্ত মিশনের মিশনারীদের দ্বারা লিখিত হইত বলিয়া সেগুলি খৃষ্টধর্ম্মের ক্যালভিনিষ্টিক শাখার ধর্ম্মমতে পরিপূর্ণ থাকিত। পূর্ব্বে বাংলাদেশে প্রচারিত বাংলা বাইবেল ও অন্যান্য খৃষ্টধর্ম্মের পুস্তিকা প্রভৃতি যেমন তাহাদের অত্যদ্ভুত বাংলাভাষার জন্য পরিচিত ছিল, এই বইগুলিও ইহাদের অপূর্ব্ব খাসিয়া-ভাষার জন্য সেইরূপ বিখ্যাত। প্রচার-আশ্রমের সংস্রবে বিদ্যালয় খুলিয়া নিজ গুরুভার কার্য্য আরও বাড়াইবার ইচ্ছা নীলমণি বাবুর প্রথমে ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। খৃষ্টানদের স্কুলে তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের কোনই যত্ন লওয়া হয় না, অকারণ একই শ্রেণীতে অনেক দিন ধরিয়া রাখা হয় এবং জোর করিয়া রবিবারে গির্জ্জায় লইয়া যাওয়া হয় বলিয়া অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অগত্যা নীলমণি বাবু বাধ্য হইয়া দুইটি বিভিন্ন কেন্দ্রে দুইটি স্কুল খুলিলেন। এখন পাঁচটি স্কুল খোলা হইয়াছে। এই-সকল বিদ্যালয়ে প্রচার-আশ্রমের সেবকগণ সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার সহিত নীতিশিক্ষাও দিয়া থাকেন। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের শিক্ষাপ্রণালীর দোষগুলি গভর্ণমেণ্টের চক্ষের সমক্ষে ধরিতে ও তাহার প্রতিবিধান করাইতে নীলমণি বাবুকে যথেষ্ট সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। যাহা হউক তাঁহার এই সাধারণের হিত-চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের অনেক ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে, পাঠ্য-পুস্তকগুলির অনেক উন্নতি হইয়াছে, জনসাধারণকেও কোন কোন বিষয়ে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এখনও কোন কোন স্থানে অলক্ষিতভাবে অনেক দোষ রহিয়া গিয়াছে। নীলমণি বাবু গভর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন, "সরকার বাহাদুর বাহিরে আপনাকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলিলেও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা-সমূহে ওয়েল্‌স্ মিশনের পুস্তকগুলি পাঠ্যরূপে চালাইতে উৎসাহ দেখাইয়াছেন। ইহাতে পরোক্ষ-ভাবে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সহায়তাই করা হয়।" নীলমণি বাবুর প্রস্তাব ও পরামর্শ অনুসারে এবং আরও কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে প্রথম খাসিয়া একষ্ট্রা অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুক্ত জীবন রায় কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন; এই পুস্তকগুলি সরকার বাহাদুর ইচ্ছাপাঠ্য (optional) করিয়া দিয়াছেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে নীলমণি বাবু Indian Messenger পত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন, তাহার মধ্যে "খাসিয়া পর্ব্বতে শিক্ষাকার্য্য" শীর্ষকটি পড়িয়া তখনকার চীফ কমিশনর স্যার হেন্‌রি কটন মহোদয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরকে এ বিষয়ে খোঁজ করিতে বলেন। প্রথমে ডিরেক্টর মহাশয় নীলমণি বাবুর সহিত শিক্ষা-বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য চেরাপুঞ্জী যাইবেন স্থির করেন। কিন্তু পরে তাঁহার মত বদ্‌লাইয়া যাওয়াতে নীলমণি বাবুকে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট পূর্ব্বোক্ত আবেদন প্রেরণ করিতে হয়।

নীলমণিবাবু-প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীযুক্ত জীবনরায় মৌখর ব্রাহ্মসমাজ হলে একটি বিদ্যালয় খুলিয়া বাংলা, ইংরেজী ও খাসিয়া ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। উক্ত ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর সাহায্যের অভাবে বিদ্যালয়টি অকালে উঠিয়া গিয়াছে। ওয়েল্‌স্ মিশনের পুস্তকে কতকগুলি কথায় ভুল বানান ব্যবহার করা হইত। ১৮০৯ অব্দে নীলমণিবাবু এই-সকল শব্দের নূতন বানানপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিলেন। উক্ত শব্দগুলি এবং খাসিয়া লেখকদের প্রবর্ত্তিত আরও কতকগুলি শব্দই আজ-কাল সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বিবাহ-আদর্শের উৎকর্ষসাধন।—খাসিয়া বিবাহবন্ধনের শৈথিল্যের কথা গত মাসের প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। নীলমণিবাবু খাসিয়া ব্রাহ্মদের বিবাহিত ও পারি-বারিক জীবনের আদর্শ উচ্চতর করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যান্য খাসিয়াদিগকেও এ বিষয়ে উপদেশাদি দিয়াছেন। কথায় কথায় ইহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। স্বামীস্ত্রীর বিবাদবিসম্বাদই বিবাহবিচ্ছেদের একমাত্র কারণ নয়। বহুকাল সন্তানসন্ততি লইয়া একত্রে সুখে বাসের পর কেবলমাত্র স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনের প্ররো-চনায় ইহারা সুখের ঘর ভাঙিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত পরস্পরকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এদেশের স্ত্রীলোকেরা সচরাচর স্বামী অপেক্ষা পিত্রালয়ের আত্মীয়গণকেই অধিক
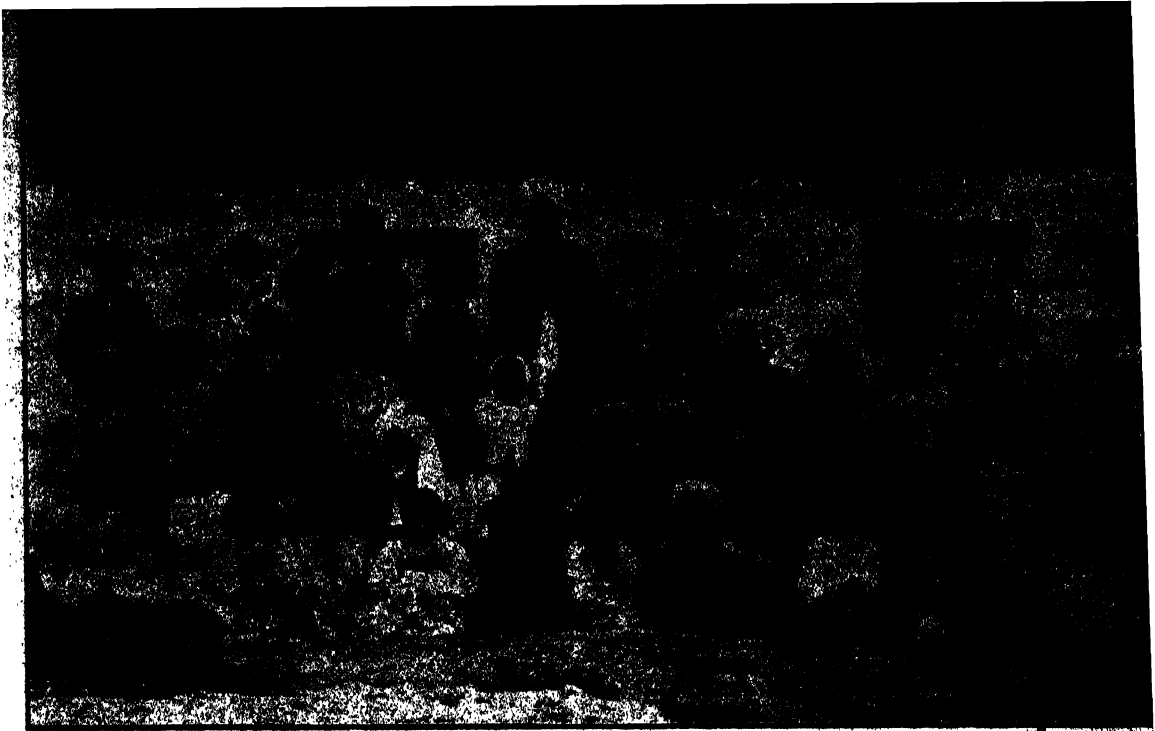
শিলঙের ব্রাহ্ম অনাথ-আশ্রমের আশ্রিত বালকবালিকা।

খাসিয়া স্কুলের ছাত্রী।
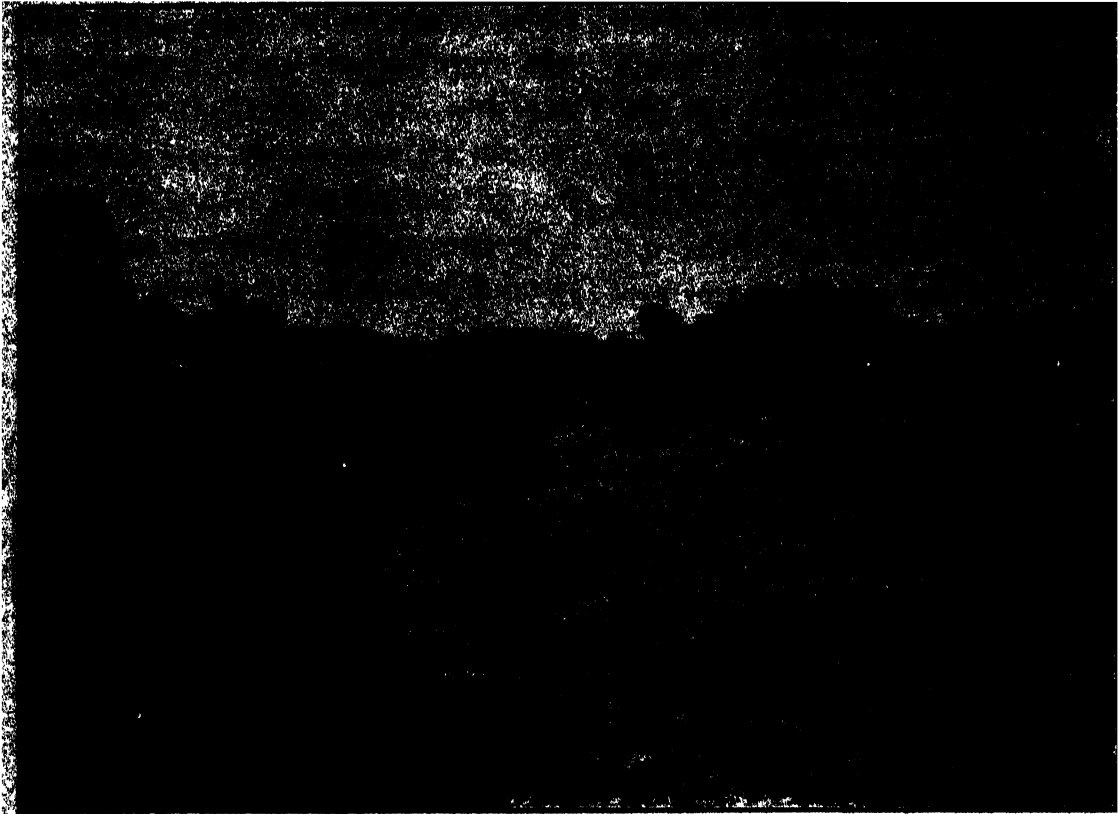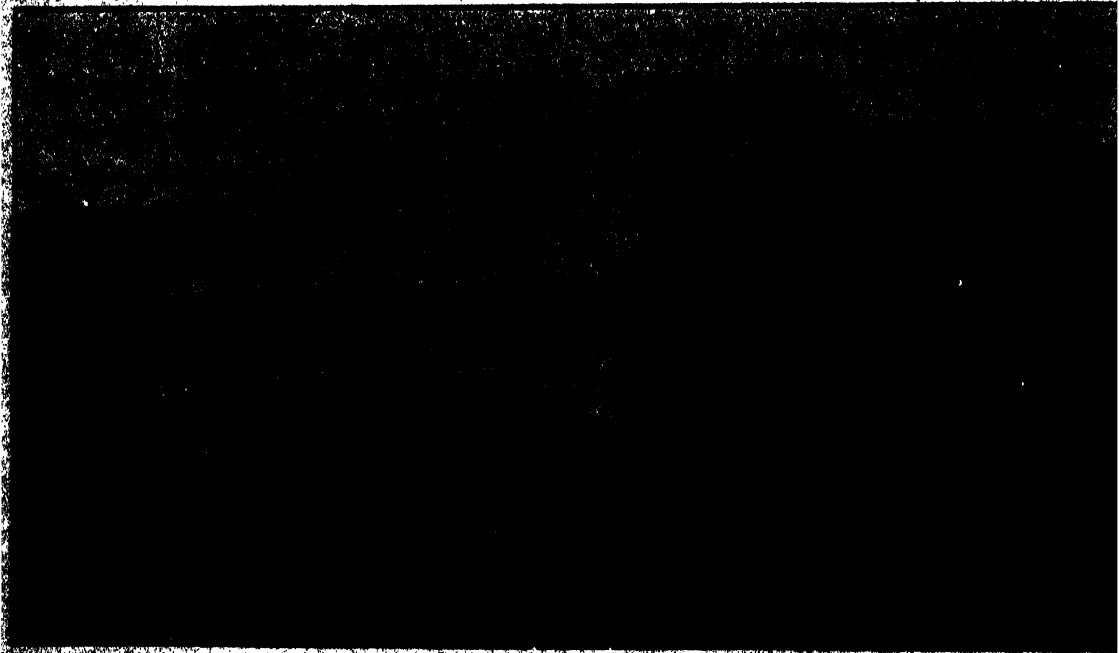
বিশ্বাস করে ও তাহাদের কথামত চলে। ব্রাহ্ম স্বামীগণের প্রভাব ক্রমশঃ বাড়িতেছে, ইহাদের পত্নীরাও স্বামীর প্রতি অধিক বিশ্বাসবতী হইতে শিখিতেছে। স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে যে-সকল স্ত্রীলোক পুত্রকন্যা লইয়া অশেষ ক্লেশে জীবন যাপন করে, তাহাদের মনে ব্রাহ্ম পরিবারের এই আদর্শ পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

স্বাস্থ্যরক্ষা।—স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে খাসিয়াদের কোন জ্ঞানই নাই। ইহাদের ঘরদোর অপরিষ্কার, প্রাঙ্গণ আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। মুরগী ও শূয়র প্রভৃতিতে আরও অপরিষ্কার করিয়া রাখে। নীলমণিবাবু সুবিধা পাইলেই ইহাদের পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পথ্যাদির বিষয় শিক্ষা দেন। একবার কলেরার সময় একটি ছোট গ্রামে কয়েক দিনের মধ্যে কুড়িজন লোক মারা যায়। সেই সময় একজন মাতাল তাজা থাকিবার জন্য ক্রমাগত মদ খাইতেছিল এবং মৃতদেহের সংকারকার্য্যে লোকজনদের সাহায্য করিতেছিল। সে একজন কলেরা রোগীকে বার বার ভেদ ও বমি করিতে দেখিয়া প্রত্যেকবারে তাহাকে ভাত ও শুট্‌কি মাছ খাইতে দিয়া বলিতেছিল "যত বেরিয়ে আসবে, আমি তত ভর্ত্তি করে দেবো।"

ইহাদিগকে স্বাস্থ্য ও পথ্যাদির বিষয় শিক্ষা দিবার সময় নীলমণিবাবুকে সাগু, এরারুট প্রভৃতি বিতরণ করিতে ও তাহার রন্ধনপ্রণালী শিক্ষা দিতে হইত। তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কলেরার আবির্ভাবের কথা গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া ইহাদিগের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করিতে ও স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষা দিতে সব-অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পাঠাইতে অনুরোধ করেন। ডেপুটীকমিশনর মহাশয় তাঁহার কথামত মহামারীর সময় স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন।

খাসিয়াদের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি।—নীলমণিবাবু খাসিয়াদিগকে কৃষিকার্য্যে নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে ও অন্যান্য প্রকারে উন্নতি করিতে উৎসাহ দিয়াছেন। খাসিয়া শিল্পীদের পণ্যদ্রব্য বাজারে বিক্রয় করাইবার জন্য ইনি এই-সকল জিনিষ Director of Commercial Intelligence ও কলিকাতার বণিকদের নিকট লইয়া গিয়াছেন। আসামের কৃষিবিভাগের ডিরেক্টরের সহিত ইনি চাষ-বাস সম্বন্ধে পত্রালাপ করেন। যে-সকল বৃদ্ধবৃদ্ধা কঠিন পরিশ্রম করিতে পারে না তাহাদিগকে তিনি মোটা কাপড় বোনা শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছেলেন, কিন্তু চেরাপুঞ্জীর অত্যধিক বৃষ্টি প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

অনাথাশ্রম।—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস গুপ্তের অধীনে শিলঙে একটি অনাথাশ্রম আছে। আশ্রমে ২০।২৫টি বালক বাস করে। মন্মথবাবু বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াও এই আশ্রমের সেবায় আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি আশ্রমের জন্য ভিক্ষা করেন না; প্রার্থনা সম্বল করিয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। এই সদনুষ্ঠানটি খাসিয়ামিশনের সংশ্লিষ্ট না হইলেও নীলমণিবাবুর কথাতেই উক্ত ভদ্রলোকের মনে ইহার সঙ্কল্প জাগিয়া উঠে। নীলমণি বাবু অনাথ বালক সংগ্রহ প্রভৃতি অন্যান্য উপায়েও ইহাকে সাহায্য করিয়াছেন। এই-সকল অসহায় শিশুদের অন্নবস্ত্র ও শিক্ষাদান যে কতখানি আবশ্যক তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। পরদুঃখকাতর দাতাগণের নিকট এই অনাথাশ্রমের জন্য আরও অধিক সাহায্য প্রার্থনীয়।

দরিদ্রের বন্ধু।—নীলমণি বাবু বিপন্নের বন্ধু ও অসহায়ের সহায়। ধর্ম্ম ও ন্যায় অনুকূল হইলে তিনি বিপন্নকে উদ্ধার করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, সকল শ্রেণীর লোক সকল সময়েই তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারে। সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সময় সাহায্য প্রার্থনা করিতে কিম্বা জরুরি কার্য্যে পরামর্শ লইতে আসিয়া লোকে অনেক সময় তাঁহার রজনীর বিশ্রামটুকুও হরণ করিয়া লইয়াছে। ইয়ুরোপীয় মিশনরীদের আশ্রিত খৃষ্টানগণও বিপদে পড়িলে তাঁহারই নিকট আসিয়া সাহায্য চায় ও পায়। এখানকার জনসাধারণের জন্য তিনি অতি কঠিন কার্য্য স্বেচ্ছায় মস্তক পাতিয়া লইতেন; তিনি প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের পক্ষ হইতে সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট আবেদন লিখিয়া, মোকদ্দমা তদ্বির করিয়া, প্রবল অত্যাচারীকে বুঝাইয়া আপোষে মিটমাট করিয়া ভাষাহীন পার্ব্বত্যলোকদের বিবিধপ্রকারে বিধিমত সাহায্য করিতেন।

নীলমণি বাবু নিঃস্বার্থভাবে মৌলংবাসীদের বিপদে

সাহায্য করিলে তাহারা তাঁহাকে টাকা দিতে চায়। তিনি সে টাকা গ্রহণ না করাতে তাহারা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ নিজব্যয়ে একটি সুন্দর পাকা ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। কাঁচা খোড়ো বাড়ীটি নীলমণি বাবুর কলিকাতা-বাসকালে এক মাতাল পুড়াইয়া দিয়াছিল।

একটি ছোট রাজ্যের দুইদল ১৬।১৭ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ঝগড়া করিয়া চলিতেছিল; সাত আট জন ডেপুটি কমিশনরের চেষ্টাতেও কিছু ফল হয় নাই। নীলমণি বাবু এই দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দ্যান।

নীলমণি বাবুর অন্যান্য কার্য্য।—নীলমণি বাবু নিজ-কার্য্যের উপর দশ বৎসর ধরিয়া ইউনিটেরিয়ানদের কার্য্যের সহায়তা করিয়া আসেন। ইনি গ্রামে গ্রামে গিয়া ইঁহাদের সেবার কার্য্য শিক্ষা দিয়া আসিতেন। জয়ন্তীয়া পাহাড় সব-ডিভিজন ইঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র। নীলমণি বাবুর কথাতেই ইঁহারা একটি যুবককে বাৎসরিক ৩০০৲ টাকা হিসাবে কলিকাতা ব্রাহ্মবালক-বিদ্যালয়ে চারি বৎসর পড়িবার জন্য বৃত্তি দিয়াছেন।

এই মিশন দর্শন করিতে আসিয়াই আমেরিকার শ্রীযুক্ত জে টি সণ্ডারল্যাণ্ড ব্রাহ্মসমাজ ও ইউনিটেরিয়ান মিশনের ঘনিষ্ঠতা-সাধন-বিষয়ে নীলমণি বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করেন। নীলমণি বাবু নিম্নোক্ত চারিটি প্রস্তাব করেন; (১) প্রচারকার্য্য-গ্রহণেচ্ছু যুবকগণের তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত; (২) উদারনৈতিক ধর্ম্মসাহিত্যপ্রচারের উপায়বিধান; (৩) কলিকাতানিবাসী ইংরেজ একেশ্বরবাদী প্রভৃতির জন্য সাপ্তাহিক ইংরেজী উপাসনার বন্দোবস্ত; (৪) ভারতে কার্য্য করিবার জন্য একজন ইউনিটেরিয়ান আচার্য্য প্রেরণ ও ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্নশাখার পুনর্ম্মিলনের চেষ্টা। নিম্নোক্ত প্রকারে এই প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করা হয়; (১) অক্সফোর্ডের ম্যান্‌চেষ্টার কলেজে অধ্যয়নের জন্য একজন ভারতবর্ষীয় যুবককে বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড বৃত্তিদান, (২) ডাকযোগে শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে প্রচারের জন্য নানাস্থানের প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মদের হস্তে পুস্তক ও পুস্তিকা প্রদান, (৩) এবং (৪) পরলোকগত এম ফ্রেচার উইলিয়ামস্‌কে ভারতবর্ষে প্রেরণ; ইনি কলিকাতা এলবার্ট হলে প্রতিসপ্তাহে উপাসনা করিতেন, বিভিন্ন শাখার ব্রাহ্মদের মিলিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ভারতের নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া উদারনৈতিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ-ত্রয়ের একত্র কার্য্যাদি করিবার সুবিধার জন্য একটি কমিটি (ব্রাহ্মসমাজ কমিটি) স্থাপনের চেষ্টায় নীলমণিবাবু ও ডাঃ সণ্ডারল্যাণ্ড পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান; সেখানে তিন সমাজ হইতে কমিটির সভ্য নির্ব্বাচন করা হয়। ১৮৯৭ অব্দের ভূমিকম্পে আসাম এবং উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক সমাজমন্দির ভাঙিয়া পড়াতে নীলমণিবাবু সাহায্য ভিক্ষা করিয়া Inquirer পত্রে এক পত্র লেখেন; ইহার ফলে ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ানগণ অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করেন। নীলমণিবাবু সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্র বলেন "এককালে প্রচারক মহাশয়কে কুঁড়েঘরে অনিদ্রায় রাত কাটাইতে হইত, এখন তাঁহার যত্নে সমাজমন্দির, ডিস্পেন্সারী ও হাসপাতালযুক্ত সুন্দর প্রচার-আশ্রম হইয়াছে। এমন দিন ছিল যখন সারাদেশে তাঁহার বন্ধু বলিবার একজন লোক ছিল না, আজ কেবলমাত্র তাঁহার নাম করিয়া কত লোকে কত আদর অভ্যর্থনা পাইতেছে। যেখানে একটি ব্রাহ্ম খুঁজিলে পাওয়া যাইত না, সেখানে আজ শত শত ব্রাহ্ম। অতিকষ্টে খাসিয়াভাষা শিখিয়া তিনি আজ এক ধর্ম্মসাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন সংস্কার আনিয়াছেন। পূর্ব্বে এদেশে ধর্ম্মপ্রচারক মানে বিলাসী ধনী সৌখীন বাবু ছিল। 'বাবু'র অর্থই প্রচারক। এইরূপ মালমশলার ভিতর হইতে তিনি এখন সাতটি প্রচারক ও আচার্য্য প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন।"

পঞ্চাশ মাইল ক্ষেত্রের মধ্যে ১৪টি ব্রাহ্মসমাজ, ৫টি ছোট বিদ্যালয়, ৫টি ঔষধ-বিতরণকেন্দ্র, একটি হাসপাতাল, নারীসভা, সঙ্গতসভা, নীতিবিদ্যালয়, বিতর্কসভা ও পারিবারিক উপাসনা-সভা প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। উপাসনা-কার্য্যের জন্য কোথায়ও মন্দির আছে, অন্যত্র সামান্য কুটিরেই কার্য্য সমাধা হয়। অর্থাভাবে সর্ব্বত্র মন্দির স্থাপিত হয় নাই। এই আদিম অজ্ঞ জাতির ভিতর হইতে ধর্ম্মপ্রচারক গড়িয়া তুলিতে নীলমণিবাবুকে নীরবে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে।
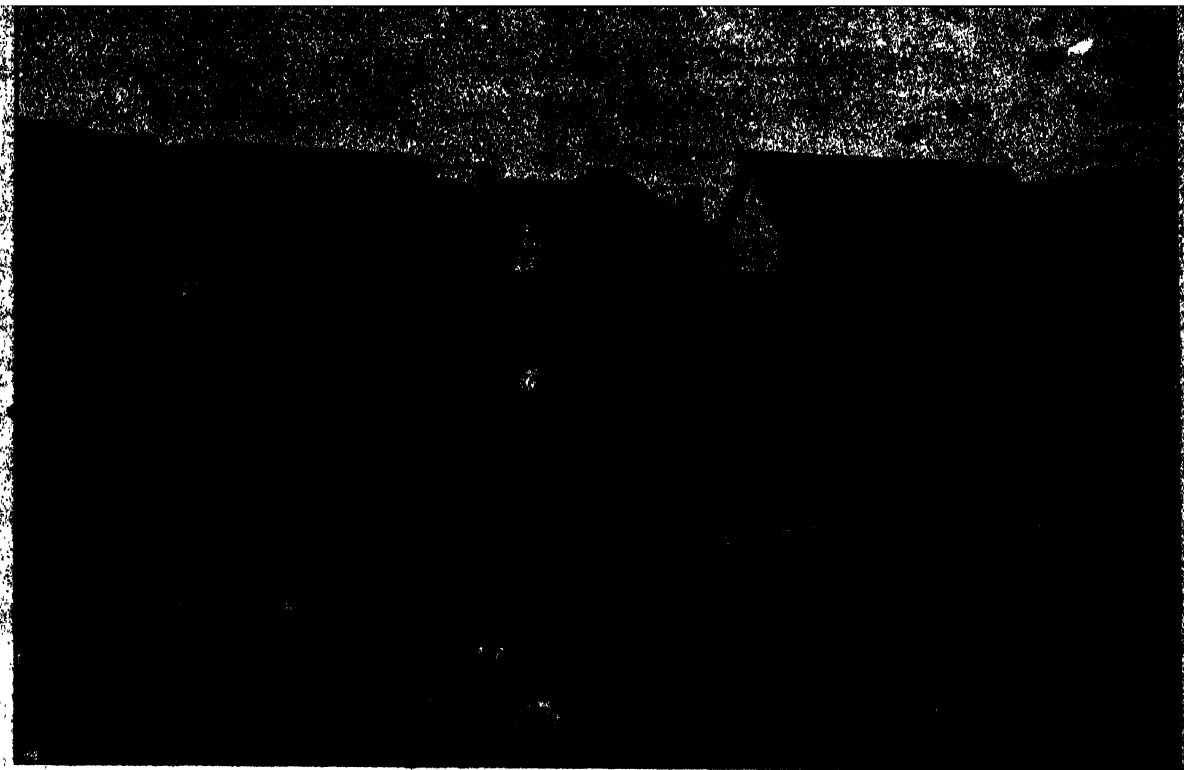
শেলা ব্রাহ্ম প্রচার-আশ্রম (সম্মুখ ভাগ)   (১) ডিস্পেন্সারি (২) প্রচারগৃহ (৩) ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির।

শেলা ব্রাহ্ম প্রচার-আশ্রম (পশ্চাৎ ভাগ)।
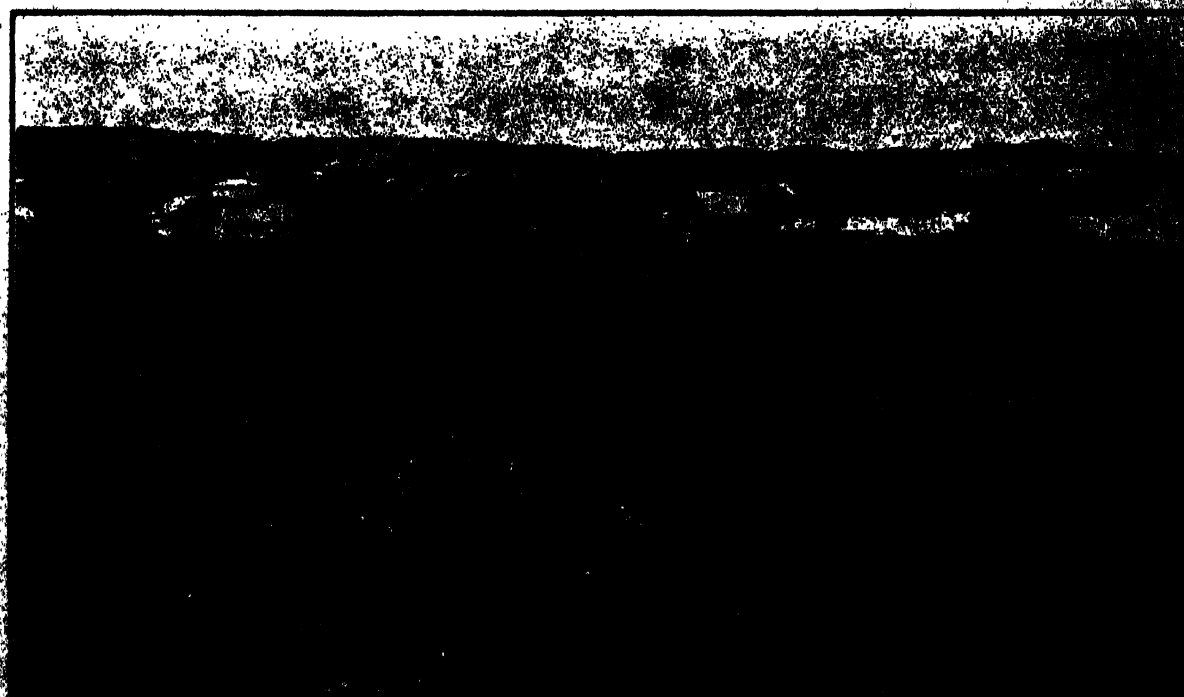
পূর্ব্বে নীলমণিবাবু নিজ আহার্য্য নিজেই রন্ধন করিতেন। এখন অন্যদের শিখাইয়া লইয়াছেন।

পূর্ব্বে খাসিয়াপর্ব্বতে ধোপা নাপিত মুচি কিছুই ছিল না। নীলমণিবাবু নিজেই এই-সমস্ত কাজ করিতেন। এখন মুচি হইয়াছে। ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য ছুতার ও রাজমিস্ত্রীর কাজও তিনি স্বহস্তে করিয়াছেন। পূর্ব্বে লোকে তাঁহাকে বিশেষ বিশ্বাস করিত না; আজকাল আত্মীয় স্বজনের নিকট টাকাকড়ি না রাখিয়া তাঁহারই নিকট রাখিতে আসে। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে অপরের নিকট বলিতে না পারিয়া তাঁহারই নিকট মীমাংসা করিতে আসে।

খাসিয়া মিশনের ভবিষ্যৎ।—দিন দিন মিশনের কার্য্য বাড়িয়া চলিতেছে; আরও প্রচুর অর্থ ও সেবকের প্রয়োজন। নানাস্থান হইতে শিক্ষক ও ধর্ম্মপ্রচারকের জন্য আবেদন আসিয়া নিষ্ফলভাবে পড়িয়া থাকিতেছে। খৃষ্টানদের এক-দশমাংশ অর্থ পাইলেই তাহাদের দশগুণ কার্য্য করা যাইতে পারে। পঁচিশবৎসরব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে নীলমণিবাবুর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এখন তাঁহাকে বিশ্রাম দিবার জন্য শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় তাঁহার গুরুকার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা জয়যুক্ত হউক। খাসিয়ামিশনের কার্য্য আশাপ্রদ।

খাসিয়ারা ক্রমশঃ বিদেশীভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। ইহারা ভারতবাসী, সুতরাং ইহাদের মধ্যে ভারতীয় ভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত।

খাসিয়াদের মধ্যে ব্রাহ্মসংখ্যা নির্ণয় করা শক্ত। আদমসুমারীর সময় নিযুক্ত খৃষ্টান গণনাকারী ইচ্ছা করিয়াই অনেক ভুল করিয়াছেন। একটি গ্রামে ২৯ জন ব্রাহ্মের নাম ছাড়িয়া দেওয়া হয়; অন্যান্য গ্রামেও এইরূপ হওয়া সম্ভব। নীলমণিবাবু এই-সকল কথা ডেপুটিকমিশনর মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী খাসিয়াদের মধ্যে আশ্চর্য্য উন্নতি দেখা যাইতেছে। ইহারা মদ, গাঁজা প্রভৃতি নেশা ছাড়িয়া দিয়াছে। সামাজিক, নৈতিক ও পারিবারিক আদর্শেরও অনেক উন্নতি করিয়াছে। জ্ঞানস্পৃহা ও ধর্ম্মভাবও বর্দ্ধিত হইয়াছে। অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াও অনেকে মিশনের কার্য্য করিতেছে। ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম অনেকে খৃষ্টানদের সহিত তর্ক করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রমাণ করে। পূর্ব্বে ইহারা এইরূপ স্থলে একটিও কথা বলিতে পারিত না।

খাসিয়াদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের এইরূপ প্রভাব দেখিয়া অনায়াসেই বোঝা যায় যে আদিম অসভ্যজাতির পক্ষেও একেশ্বরবাদ গ্রহণ সম্ভব। অনেকের বিশ্বাস যে খাওয়া পরা ও চালচলনে অতিরিক্ত স্বাধীনতালাভের জন্যই লোকে ব্রাহ্ম হয়। কিন্তু খাসিয়ারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অতিরিক্ত স্বাধীনতা ছাড়িয়া তাহাদের জীবনের শিথিল বন্ধনগুলি দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছে। নিষেধ-বিধি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া চলিতেছে। ইহাতে ধর্ম্মেরই জয় ঘোষিত হইতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সামান্য উপকরণের দ্বারা নীলমণি বাবু এক চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়িয়া তুলিয়াছেন। অপরেও ইহাতে কিছু কিছু মালমশলা জোগাইয়াছেন। তাঁহার কার্য্য বহুমুখ, ইহার কোন-না-কোন অঙ্গ সকল হৃদয়বান নরনারীর মন মুগ্ধ করিবে। এই আদিম অধিবাসীদের উন্নতির কার্য্যে মুক্তহস্ত হইলে ও আপন আপন শক্তি নিয়োগ করিলে ভগবান তাঁহাদের উপর প্রসন্ন হইবেন। অসভ্য জাতির উন্নতিকল্পে আমাদের দেশে যে-সকল অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহার মধ্যে খাসিয়া-মিশনই বোধহয় খাঁটি স্বদেশীর কার্য্য। স্বদেশপ্রাণ নরনারীর নিকট দাবি করিবার ইহাও একটি মুখ্য কারণ।

একগাছা দড়ির একটা জায়গাতেও যদি কম পাক থাকে বা পচা সুতা থাকে, তাহা হইতে সমস্ত দড়িটাই কম মজবুত হইয়া যায়। একটা শিকলের একটি মাত্র আংটা যদি দৃঢ় না থাকে, তাহা হইলে শিকলটা অকেজো হয়। কলসীর একটা জায়গা আপোড়া থাকিলে তাহাতে জল রাখা যায় না; হাঁড়ির একটা জায়গা কাঁচা থাকিলে তাহাতে ভাত রাঁধা যায় না। খিলানের একটা ইটের গাঁথনির মসলা খারাপ হইলে খিলান ফাটিয়া যায়। কড়ির এক জায়গায় ঘুণ ধরিলে ছাত পড়িয়া যাইতে পারে। কোন দেশকে উন্নত করিতে হইলে সকল শ্রেণীর সমুদয় মানুষকে উন্নত করা আবশ্যক। কোন জাতিকে শক্তিশালী করিতে হইলে তাহার সমুদয় অংশের দৈহিক ও

আত্মিক দুর্ব্বলতা দূর করিতে হয়। ভারতবর্ষের যে-সব আদিম অধিবাসী বহুশতাব্দী ধরিয়া অনুন্নত রহিয়াছে, তাহাদিগেরও অপর সকল অধিবাসীর সমান হওয়া দরকার। এখন কিন্তু তাহাদিগকে বলিলে চলিবে না, "তোমরা আমাদের সমাজের নিম্নতম স্থানে আসিয়া আশ্রয় লও।" তাহাতে মানুষের আত্মসম্মানে আঘাত পড়ে, এবং তাহা ন্যায়সঙ্গতও নহে। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা অপেক্ষাও প্রবল আপত্তি রহিয়াছে। খৃষ্টিয়ান সমাজ তাহাদিগের আর্থিক ও শৈক্ষিক অবস্থার উন্নতি করিয়া তাহাদিগকে দেশী অন্য খৃষ্টিয়ানদের সহিত এক পংক্তিতে স্থান দিতেছেন। সুতরাং আর যাঁহারা তাহাদিগের সাহায্য করিতে চান, তাঁহাদিগকেও এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। খৃষ্টিয়ান পদ্ধতির একটি এই ত্রুটি আছে যে উহা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে উপেক্ষা করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ খাসিয়াদিগের মধ্যে যে কাজ করিতেছেন, তাহাতে মানবের ভ্রাতৃত্ব যেমন কথায় ও কাজে স্বীকৃত হইতেছে, ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার সার অংশও তেমনি রক্ষিত হইতেছে। এইজন্য ব্রাহ্মসমাজের এই কাজ উল্লেখযোগ্য এবং ভারত-ভক্ত মাত্রেরই সাহায্য পাইবার উপযুক্ত।

পঞ্চশস্য

চিবুকে লোক-চরিত্র—

আমেরিকার জেরাল্ড এলটন ফসব্রুক চরিত্রানুমান-বিদ্যার একখানি বই লিখিয়াছেন, তাহার নাম ক্যারাক্টার রীডিং থ্রু অ্যানালিসিস্ অফ্ দি ফীচাস্ অর্থাৎ মুখসৌষ্ঠব দেখিয়া চরিত্রানুমান। মুখের চোআলের গড়ন দেখিয়া অনেক দিন হইতেই সভ্য অসভ্য, সু কু, সাধু অসাধু লোক চিনিবার বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রচলন হইয়াছে; এক্ষণে ফসব্রুক বলিতেছেন মানুষের মুখের মধ্যে চরিত্রদ্যোতক প্রধান অংশ হইতেছে চিবুক। মানুষ যখন বানর-সম অসভ্য ছিল তখন তাহার চিবুক সামনের দিকে ঠেলিয়া থাকিত; জীবন-সংগ্রাম তখন কঠিন ও কঠোর ছিল বলিয়া মানুষের চিবুক ও চোআল শিম্পাঞ্জি গরিল্লার ন্যায় খুব মজবুত ছিল; পরে সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আগ-বাড়া চিবুক গুটাইয়া আসিতে লাগিল। চিবুক ও নাক, মুখের মধ্যে দুটি মর্ম্মস্থান, উহাতে অল্প আঘাতেই মানুষ কাবু হইয়া পড়ে, এখনো ঘুষির লড়াইয়ে দেখা যায় দাড়ির উপরে ঘুষি কষাইতে পারিলেই কুস্তিগিরেরা খুসী হইয়া উঠে যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে এইবার পাড় হইতে হইবে। সুতরাং যাহাদের চিবুক ও চোআল বানর-ঘেঁষা অর্থাৎ মজবুত তাহার জয়ের সম্ভাবনা বেশী। যে-সব লোক একগুঁয়ে, স্বেচ্ছাচারী, প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু, তাহার চিবুক দেখিলে মনে হয় সে গরিল্লা শিম্পাঞ্জিরই বংশধর। সমস্ত মুখমণ্ডলেই স্বভাবচরিত্রের একটি ছাপ থাকে; মাথার গড়ন দেখিয়া মানুষের মনের গড়ন ধরা যায়, চোখ দেখিয়া তাহার মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়, মুখ দেখিয়া তাহার দৈহিক অবস্থার জ্ঞান হয়, এবং চিবুক দেখিয়া তাহার দৈহিক প্রবৃত্তির ঝোঁক ধরা পড়ে; কানের পিছনে মাথার তৃতীয়াংশ থাকিলে তাহার দৈহিক শক্তির আভাস মিলে; মানুষের মুখমণ্ডলও তিন অংশে বিভক্ত—১ম, নাকের তলা হইতে চিবুকের ডগা পর্য্যন্ত, এই ভাগ মানুষের দৈহিক ও পাশবিক প্রবৃত্তির অনুমান-ক্ষেত্র; উপরের অংশের দুইভাগ—নাক হইতে ভ্রূ, এবং কপাল; এই সব মিলিয়া মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করে। স্ত্রীলোকের মুখের নীচের ভাগ প্রায়ই খুব স্বল্প হাল্কা পাতলা রকমের হয়—তাহাতে উঁহাদের দেহের উপর মনের প্রাধান্যই সূচিত হয়; উঁহারা যাহা করে তাহা ভাবুকতার জন্য, দেহের তাড়নায়স্ততটা নহে। যাহাদের শরীরের কাঠামো খুব মোটা মোটা লম্বা চওড়া হাড়ে-গড়া এবং পেশীপুষ্ট তাহারা অত্যন্ত আবেগময় ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির বশীভূত হয়; মেয়েদের শরীর ইহার উল্টা বলিয়া উঁহাদের প্রকৃতিও উল্টা রকমের—উঁহাদের মনের ঝোঁকই প্রবল, পুরুষদের দেহের আগ্রহই প্রধান। মেয়েদের চিবুক প্রায়ই মাঝিকসই আদর্শ মাপের মাঝারি আকারের হয়, বরং একটু গুটানো রকমের হয়, বাড়ানো চোখা রকমের প্রায়ই হয় না, উঁহাদের মুখের নিম্নাংশ উপরাংশের চেয়ে চওড়ায় ছোট, চোআল চওড়া নয়, লম্বাও নয়। পুরুষের আদর্শ-মুখের প্রস্থ মাথার প্রস্থের সমান; সেই মুখের চিবুক প্রায়ই মুখ হইতে সামনের দিকে একটু বাহির হইয়া থাকে, তাহার প্রান্তটা চওড়া, পুষ্ট এবং গোল, চোআলের হাড়ের সঙ্গে দুপাশে দুটা কোণ করিয়া সেখানটায় বেশী চওড়া হয়। নীচু মুখের পেশীর সঙ্কোচন হইলে চিবুকের ডগার গুলিটা উপর দিকে উঠিয়া পড়ে। মনের মধ্যে দ্বিধা সঙ্কোচ প্রবল হইলে উপর মুখের পেশী ঝুলিয়া পড়ে; কিন্তু চিবুকটা দৈহিক প্রবৃত্তির ক্ষেত্র বলিয়া মনের সঙ্কল্প কাজে খাটাইবার জন্য নিজের পেশীগুলিকে উপর দিকে টানিয়া রাখে; এই অনিচ্ছা ও ইচ্ছা, অপ্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ টানে মানুষের দেহ ও মনের ক্রিয়া সংযত অথচ শক্তিযুক্ত হইয়া সফলতা অর্জ্জন করে—দৈহিক বল না থাকিলে মনের বল ব্যর্থ পণ্ড হয়। পুরুষের চিবুকের ন্যায় স্ত্রীলোকের চিবুক মুখের মধ্যে প্রধান ও বাহিরের দিকে আগানো হইলে সে পুরুষধর্ম্মী হয়।

* * *

মনের উপন্যাস—

পোল্যাণ্ড দুর্ভাগা দেশ; তাহাকে তিন ডাকাতে ভাগ করিয়া লইয়াছিল—রুষিয়া, অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মানী। রুষিয়ার দখলের পোল্যাণ্ড এই যুদ্ধে জার্ম্মানী জয় করিয়া লইয়াছে; তাই রুষিয়া উড়ো-খৈ গোবিন্দায় নমঃ বলিয়া পোল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মানীর কবলে পড়িয়া পোল্যাণ্ডের কি দশা হইবে যুদ্ধ শেষ না হইলে বুঝা যাইবে না। এই পোল্যাণ্ড দুর্ভাগা দেশ হইলেও এখানকার লোকেরা দুঃখবোধে অশক্ত এখনো হয় নাই; উঁহাদের বহু সাহিত্যিক দেশের মর্ম্মপীড়ার পরিচয় দিয়া বিশ্বসাহিত্যের সভায় স্থান লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানদের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন যিনি তাঁহার নাম Przybyszewski —এই বিকট ব্যঞ্জনবহুল নামের উচ্চারণ প্‌শীবেশেফ্‌স্কী।

জগতের একদিন ছিল যখন মানব-বুদ্ধি জীবনের মোটা মোটা বাহ্য ঘটনা বর্ণনা করিতেই পারিত এবং সেই সবই ভালো বুঝিত; তাই প্রাচীনকালে রচিত হইত মহাকাব্য বা পুরাণ, কেবল বাহ্য অবস্থার ঘটনাপরম্পরার শৃঙ্খল বা তালিকা, কেবল যুদ্ধবিগ্রহ হরণ

প্রথম চিবুকে একগুঁয়ে রাগী
পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি
অথচ অস্থিরমতি লোকের।
তৃতীয় যে-লোকের সে লোকের-সঙ্গে
মানাইয়া চলিতে পটু কিন্তু তাহার মধ্যে
চাতুর্যের অভাব থাকাতে সে অদ্ভুত
প্রকৃতির।

প্রভৃতি ঘটনা, এবং সেই সূত্রে যতটুকু মনের পরিচয় পাওয়া যাইত তাহাই তখনকার কালের সাহিত্যের উপজীব্য ছিল। ক্রমশ বাহ্য ঘটনা গৌণ ও মনের ভাব মুখ্য হইয়া উঠিতে লাগিল; ইংরেজী সাহিত্যে শেষ যুগের কবিরা ও ঔপন্যাসিক জর্জ এলিয়ট বাহিরকে খর্ব্ব করিয়া অন্তরকে প্রাধান্য দিলেন; ফরাসী সাহিত্যে মেটারলিঙ্ক বাহিরকে একেবারেই বাতিল ও না-মঞ্জুর করিয়া মনের নাটক লিখিলেন; বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বরাবর মনকেই প্রাধান্য দিয়া গীতিকবিতার বহুল প্রচলন করিয়াছেন ও মনন-প্রধান উপন্যাস চোখের বালি গোরা নৌকাডুবি লিখিয়াছেন, এক্ষণে নিছক মনের উপন্যাস ঘরে বাইরে লিখিতেছেন—তাহার মধ্যে ঘটনা নাই, আছে শুধু মনের বিচিত্র ভাব-সংঘাত ও চিন্তার দ্বন্দ্ব! পোলিশ ঔপন্যাসিক প্‌শীবেশেফ্‌স্কী এইরূপ মনের উপন্যাসরচনার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার অনেকগুলি বই আছে—The Sons of Earth (a trilogy), Androgyne, De Profundis, Satan's Synagogue, For Happiness, The Golden Fleece, The Man of Strength (a trilogy), The Children of Misery, The Feast of Life, and Homo Sapiens.

The Feast of Life গ্রন্থের উপজীব্য বিষয় হইতেছে একটি স্ত্রীলোক নিজের মহৎ আত্মার অনুশাসন মানিয়া চলিতে গিয়া সমাজে রাষ্ট্রে কিরূপ ভাবে পীড়িত নির্যাতিত অত্যাচরিত হইয়াছেন।

Homo Sapiens বইখানি তিন ভাগে লিখিত—Overboard, By the way, In the Maelstrom. শেষ দুই ভাগ আগে লিখিয়া প্রথম ভাগ পরে লেখা; ইহার ফলে গঠনশৃঙ্খলা একটু বেখাপ্পা হইয়াছে। এই উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয় এই—ইহার নায়ক বা কেন্দ্র এরিক ফক্; সে ফাউষ্ট, ডন জুয়ান ও মেফিষ্টোফিলিস মিলাইয়া একটি শয়তান-অবতার; প্রকৃতি বা স্বভাবের নিষ্ঠুর উচ্ছৃঙ্খলতা ফুটিয়া প্রকাশ করা তাহার রোগ—তাহাতে সে নিজের ও কতকগুলি সহজে নমনীয় রমণীর ভয়ঙ্কর রকমে মুণ্ডপাত করিয়া বসে। সে যেন স্বয়ং ভাগ্য-দেবতা, সে যেন একটা শুধু হওয়া, তাই সে নিজের ধর্ম্মবুদ্ধি ছাড়া আর সকল জিনিস লইয়া এমন ভাবে নাড়াচাড়া করে যেন সমস্তই তাহাকেই তৃপ্তি যোগাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে সে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্ত্রীটিকে আত্মসাৎ করিল এই ওজুহাতে যে সেই রমণীটি তাহারই মনের মতন, প্রকৃতির নিরপেক্ষতা মানিতে হইলে তাহাকে পাওয়াই চাই, এবং প্রকৃতির নিরপেক্ষতা রূঢ় রকমে সত্য প্রমাণ হইয়া গেল তাহার বন্ধুর আত্মহত্যায়। তারপর সেই রমণীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে ভালোবাসা সত্ত্বেও সে একবার এক পাক ঘুরিয়া একটি শিশুপ্রকৃতির মেয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিল, কেবল মাত্র সয়তানী করিবার খেয়ালের বশে। এমনি সে বারবার তাহার দিগ্বিজয়ে বাহির হয়, কিন্তু তাহার স্ত্রীকেই সে প্রাণের সহিত ভালো বাসে। অবশেষে তাহাকে অবাক করিয়া তাহার স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল—অবশ্য আর একজনের হাতে। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খল শয়তানীতে সে সকলকে পরাভূত করিলেও নিজের ধর্ম্মবুদ্ধি বিবেককে সে দমন করিতে পারে নাই; নিত্য নিরন্তর ধর্ম্মবুদ্ধির কশাঘাতে তাহার অন্তরের যে দুরবস্থা হইয়াছিল তাঁহার সঙ্গে তাহার তৃপ্তির জন্য বলিপ্রদত্ত কোনো হতভাগ্যের দশাই তুলনা হয় না; কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র তাহার জন্য তেমন কঠিন ও কঠোর শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে পারে না লেখক তাঁহার গ্রন্থনায়কের অন্তরের মধ্যে নির্ম্মম বিবেকের যেমন অপরিহার্য্য শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দেখাইয়াছেন।

এই-সব গ্রন্থে যেটুকু বাহিরের ঘটনা স্থান পাইয়াছে তাহা কেবল মাত্র অন্তরে ভাবের ঢেউ ধাক্কা দিয়া তুলিবার জন্য; গ্রন্থকার বেশীর ভাগ আলোচনা করিয়াছেন আত্মার দ্বন্দ্ব ও মনের ভাবতরঙ্গ লইয়া। তাই তাঁহাকে একজন সমালোচক বলিয়াছেন A novelist who has dramatized the Battle-fields of the Soul.

মনের ভাব লইয়া নাড়াচাড়া করায় তিনি অদ্বিতীয় নহেন; মেটার-লিঙ্ক, রোডেনবাক এবং অল্প পরিমাণে ষ্ট্রীণ্ডবার্গ ও আণ্ড্রিভ এই পথের যাত্রী। কিন্তু প্‌শীবেশেফ্‌স্কীর রচনার যে শেষফল তাহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব। মানুষের মনটার সমস্ত-কিছু রহস্য যেন তাঁহার নখদর্পণে জানা আছে; তাই তাঁহার হাতে পড়িয়া মনের সমস্ত রকম অভিজ্ঞতা ও বিপদ সম্পদ এমন সত্যরূপে প্রকাশ পায় যে পাঠক মনে করে যেন সে উহাদের চেনে; এবং পাঠক যত বড়ই বস্তুতন্ত্র হোক না কেন সে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। মনের ব্যাপারের জটিলতা পাঠকের মনকে তেমনি আগ্রহে দোল দেয় যেমন ঘটনার জটিলতা সাধারণ উপন্যাসে দিয়া থাকে। এই অরূপকে রূপ দিবার ক্ষমতাতেই প্‌শী-বেশেফ্‌স্কীর অসাধারণত্ব। ডাক্তার ভাইকজেল বলেন—তিনি মধ্য-য়ুরোপের নব-ভাবরসিকদেরই (neo-mystics) দলভুক্ত——সে দলের দলপতি 'ইচ্ছা' 'খুনী' 'জেদ' মন্ত্রের দীক্ষাদাতা শোপেনহাওয়ার; এই মহাক্রমের কাণ্ড ও মূল শোপেনহাওয়ার, এবং তাহার বিকশিত পুষ্পের স্বর্ণপরাগ নীটশের চিন্তা। প্‌শীবেশেফ্‌স্কী নিজের মধ্যে বিশ্ব-আত্মার স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন, তিনি বিশ্ব-আত্মার অদম্য ইচ্ছা, অনন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং তুচ্ছতার স্পর্শে তাহার বেদনার সন্ধান পাইয়া-ছেন। জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় নিয়ম যাহা মানুষের অস্থি মজ্জা রক্তের মধ্যে জীবন্ত তাহার মধ্যে সৃষ্টির পরম-ইচ্ছারই আভাস তিনি ধরিয়াছেন। এই যে সহজ হইয়া-উঠার বেগ, তাহাকে তিনি অস্তিত্বের দুই বড় কোটায় ভাগ করিয়াছেন—প্রেম ও মৃত্যু। তাঁহার মতে মানবত্বের পথ ব্যক্তির অন্তর দিয়া তৈয়ারী; সেইজন্য আত্মার গহনতা ভেদ করা, অস্তিত্বের অগাধতা লঙ্ঘন করা, নিত্যকর্ম্মের তুচ্ছতা ও প্রতারণার অন্তরালে ভাগ্যের অবোধ্য রসমাধুর্য্যপূর্ণ মুখশ্রীর একটু আভাস দেখিয়া লওয়া তাঁহার রচনার সাধনা। আমাদের অহং যে সচেতনতার মধ্যে বিচরণ করে তাহার গণ্ডী বড় ছোট; তাহার অন্তরালে যে অন্তর-সমুদ্র অনন্ত অপার তাহাতে গোপনতার ও হেঁয়ালির ঢেউ উঠে, সেখানে আশ্চর্য্য বিস্ময়ের ঝড় বহে। সেখানে আলিবাবার গুপ্ত গুহার মধ্যে অফুরান ধনরত্ন আছে; কত আশ্চর্য্য আছে; বাক্যে প্রকাশের অতীত কত জিনিস আছে, যাহার এখনো নামকরণ হয় নাই; সেই গোপন গুহার গহনতা আমরা এখনো ভেদ করিতে পারি নাই, আলি-বাবার Open Sesame তিলখোলো মন্ত্রটির সাধনা করিলেই সেই লুকানো রহস্য তিলে তিলে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিবে। মানুষের অন্তরের আবেগই জড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা, জড়ের মধ্যে প্রাণের-চঞ্চলতা সঞ্চারিত করে, যাহা অন্তরের আবেগের স্পর্শ পায় না তাহা ত ব্যর্থ পণ্ড উদাসীনতার আবর্জ্জনাস্তূপ। আবেগের তরঙ্গের আঘাতেই বিশ্বের ইতিহাস দোল খায়—আবেগই তাহাকে স্বর্গে তোলে, আবেগেই সে রসাতলে যায়। মনের আবেগ মত্ত হইয়া উঠিলে তাহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে তুষের মতন কুটিয়া ফেলে, ঝাড়িয়া চলে, ছড়াইয়া দেয়—তখন বিপ্লবের ঘূর্ণী জাগে, মত্ততার অভিযান ছোটে, বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধ লাগে!

ডাক্তার ভাইকজেল এই অসাধারণ লেখকের পরিচয়ের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন the most original super-individualist in the whole of European literature—তিনি সমস্ত য়ুরোপীয় সাহি-ত্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক অতিমানবত্ববাদী ও অতিব্যক্তিত্ববাদী। তিনি সেই সময়ের সংস্কিপুদার যে সময় সমস্ত মূল্যের মূল্য কষিয়া মূল্যের মূল্য নাই স্থির করিয়াছে। তিনি তাঁহার অতি-মনুষ্যত্বের যন্ত্রণায়

অস্থির হইয়া একজন খৃষ্টপন্থী; তিনি একজন ভাবপ্রবণ শয়তান। তিনি চরম নীতিশীল; কিন্তু তিনি সেই রকমেরই নীতি-পরায়ণ যে জগতের সত্ত্বগুণাত্মক অমিল অসামঞ্জস্যকে মন খুলিয়া গ্রহণ করিতে পারে; যে ক্রুদ্ধ অদৃষ্টের তীক্ষ্ণবাণ বুক পাতিয়া ধরিতে পারে; যে জগতের দোষপ্রবণতার সঙ্গ পরিহার না করিয়া জগতের ছেঁড়া-খোঁড়ার স্তূপের উপরে নিজেরও ছেঁড়া প্রাণটাকে মিলাইয়া দিতে পারে। তিনিই প্রকৃত নীতিপরায়ণ যিনি আবহমান কাল পাপের আর্ত্তনাদ বহমান রাখিতে পারেন, যিনি হত্যাকারীর দুঃখ, হন্যমানের দুঃখ এবং পরের দুঃখ বহনের দুঃখ একসঙ্গে স্বাদ লইয়াছেন; যাঁহার মধ্যে কেন্ (Cain) সক্রেটিস ও ক্রাইষ্ট সম্মিলিত হইয়াছে; তিনি শিশু বালিকার দৃষ্টিতে অম্বপালী বা মেরী ম্যাগডেলীনের মতন অনুতাপবিদ্ধা পতিতা রমণীর নির্ব্বেদ দেখিতে পান। এমন নীতিপরায়ণ ছিলেন টলষ্টয়, জোলা, ইবসেন; প্শীবেশেফ্স্কী তাঁহাদের জাতি। ইঁহারা পীড়িত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সংসারকে ঘৃণা করিয়া দূরে সরিয়া থাকিয়া সাধুতা ফলান না, ইঁহারা তাহাকে আপনার জানিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়াছেন; ইঁহারা নিজেদের অন্তরে সর্ব্ব-আত্মীয়তার একটা পবিত্র বেদনা ও সমস্ত বুঝিতে পারার একটা পবিত্র বিষণ্ণতা বহন করিয়া ফিরেন। প্শীবেশেফ্স্কী একজন চরিত্রপরায়ণ এইজন্য যে তিনি জানেন, বুঝিতে পারেন যে সৃষ্টির জটিলতার মধ্যে প্রকৃতির যেসব অনিবার্য্য নিষ্ঠুরাচরণ আছে তাহাতে মানুষ নিজের গড়া অনেক জটিলতা জুড়িয়া পীড়িত হয়; সমাজের পথের দুধারি শুধু ধ্বংসের চিহ্ন—উচ্চাকাঙ্ক্ষার ধসিয়া-পড়া প্রাসাদ, গৌরবের ভগ্ন মন্দির, আনন্দের সুখের প্রণয়ের শ্মশান। তিনি জানেন যে সেই পথের ক্রোশ অন্তর খাড়া আছে—ফাঁসি কাঠ, হাড়কাঠ, যূপকাষ্ঠ; এবং সেই হিংসামন্ত্রের পর-শাতন শুষ্ক স্বার্থের শুষ্ক রুদ্রাক্ষমালায় জপ করিতেছি আমরা সকলেই, কোনো মিঞা বাদ যান না, তা তিনি যতই তিলকফোঁটা কাটুন আর যত বড় বড় বচনই আওড়ান।

প্শীবেশেফ্স্কী প্রুশিয়ার পোল্যাণ্ডে ১৮৬৮ সালে জন্মলাভ করেন। যৌবনে জার্ম্মান সাহিত্য ও দর্শনে ডুবিয়া গেলেও তাঁহার রুষ সীমান্ত ঘেঁষিয়া জন্মের ফলে বিদেশী প্রভাবও তাঁহার উপর অল্প পড়ে নাই। সুতরাং তাঁহার মন সঙ্কীর্ণ-বর্জ্জিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। ২১ বৎসর বয়সে তিনি বার্লিনে স্থপতির কাজ শিখিতে যান। তৎপরে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং বিশেষ করিয়া শারীরতত্ত্বসম্বন্ধী মনস্তত্ত্ব পাঠে মন দ্যান। তিনি বার্লিনের আর্বাইটের-টুসাইটুং কাগজের সম্পাদক হন ১৮৯১ সালে। ইঁহার অল্পদিন পরেই তিনি জার্ম্মান নব্যসাহিত্যিক দলে ভিড়িয়া যান। তার পরে তিনি নানা সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাজ, নাটক রচনা ইত্যাদি করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি পোল্যাণ্ডে যুদ্ধ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

* * *

গাছের মুখ—

গাছের পাতার গায়ে যে ছিদ্র থাকে তাহার মধ্য দিয়া গাছ নিশ্বাস লয়; গাছের ছালের গায়েও যে ছিদ্র থাকে তাহা দিয়াও গাছ অক্সিজেন গ্যাস ছাড়িয়া কার্বনিক এসিড গ্যাসের নিশ্বাস লয় বলিয়া সম্প্রতি জানা গিয়াছে। এই ছিদ্রপথে গাছের মধ্যকার জল বাতাসে যায় বা বাতাসের মধ্যকার বাষ্প শোষিত হইয়া গাছে রস জোগায়। যে গাছ যত উন্নত পর্য্যায়ের তাহার শ্বাসযন্ত্র তত সুপরিণত, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে বাতাস চলাচলের শ্বাসনাড়ী থাকে এবং স্থানে স্থানে জন্তুর নাসারন্ধ্রের ন্যায় গাছের গায়ে ছিদ্রও থাকে। এই-সব ছিদ্র গাছের পাতায়, শিকড়ে, পাতার ডাঁটায়, কাণ্ডে, এবং এমন কি ফলে পর্য্যন্ত থাকে—বাদাম আখরোট ও কমলালেবুর গায়ের গর্ত্তগুলি খালি চোখেই দেখা যায়। কোনো কোনো গাছে এই নাসারন্ধ্র এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; যেমন হানিসাক্ল্ লতা, য়ুরোপের দ্রাক্ষালতা ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে উহাদেরই জ্ঞাতিদের ঐ ইন্দ্রিয় আছে—যেমন, যে হানিসাক্ল্ লতাইয়া উঠে না তাহার নাসারন্ধ্র থাকে, যাহা লতাইয়া উঠে তাহার থাকে না; আমেরিকার দ্রাক্ষার থাকে, য়ুরোপের দ্রাক্ষার থাকে না। অনেক সময় ঐসব রন্ধ্র উপরে ঠিক থাকিলেও ভিতরে রুদ্ধ হইয়া যায়; তখন গাছের নিশ্বাস প্রশ্বাস কেমন করিয়া চলে তাহাও বোঝা যায় না। ইহাতে অনেক উদ্ভিদ্‌শরীর-শাস্ত্রী বলেন যে ঐসব ছিদ্র দেখিতে নাসারন্ধ্রের মতন হইলেও বাস্তবিক উহারা নাসারন্ধ্র নহে। কিন্তু ঐ ছিদ্রপথে যে বায়ু চলাচল হয় তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। একটা কাঠির দু ধার গালা দিয়া ঢাকিয়া সেই কাঠিটাকে গরম জলে ডুবাইয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে কাঠির ভিতরকার ঠাণ্ডা বাতাস বাহির হইয়া জলে ভুড়ভুড়ি তোলে দেখা যায়; এ বাতাস কাঠির ভিতর হইতে বাহির হয় কাঠির গায়ের ছিদ্র দিয়া। কোনো কোনো গাছের গায়ের ছিদ্র সিকি ইঞ্চিরও বড় হয়, কোনো কোনো গাছে অণুবীক্ষণগম্য থাকে। গাছের ডালের ডগায় তলার দিকে ছিদ্র বেশী থাকে, আর গাছের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। বর্ষা কালে এই-সব ছিদ্রের মধ্যকার এক-একটি কোষ জলে পূর্ণ হইয়া ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আঁচিলের মতন ঝুলিয়া পড়ে দেখা যায়; এই কোষগুলি গাছের রস-সামঞ্জস্য রক্ষা করে;—রস বেশী হইলে ভাণ্ডার-জাত করিয়া রাখে, কম হইলে সর্ব্বাঙ্গে চারাইয়া দ্যায়।

* * *

অদৃশ্য উড়ন জাহাজ—

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত এইচ জি ওএলস্ তাঁহার Invisible Man নামক পুস্তকে কল্পনা করিয়াছেন যে গল্পের নায়ক তাহার শরীরকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এমন স্বচ্ছ করিয়া ফেলিয়াছিল যে তাহাতে আলোক প্রতিফলিত বা পরাবর্ত্তিত না হওয়াতে তাহা কেহই দেখিতেই পাইত না। ব্যাপারটা আলোকবিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু সেরূপ স্বচ্ছ কাচও প্রস্তুত হয় নাই; কাচের চৌরস টালি স্বচ্ছ বটে কিন্তু তাহার উপর-তল হইতে আলোক অল্প প্রতিফলিত হয়, কোণ বা অসমান স্থান থাকিলে ত কথাই নাই। জার্ম্মানরা নাকি এমন একটা পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছে যাহা কাচের চেয়েও স্বচ্ছ; উহাতে তৈরী উড়ন জাহাজ আকাশে উড়িলে আকাশে কোনো পদার্থ উড়িতেছে দেখা যায় না। ঐ পদার্থ সেলুলয়েডের ন্যায় স্বচ্ছ ও হাল্কা, কিন্তু উহার ন্যায় দাহ্য নহে। জার্ম্মান বিজ্ঞান- ও রসায়ন-শাস্ত্রে অদ্ভুতকর্ম্মা; উহারা নকল গালা হইতে হাতির-দাঁত হাড় শিং প্রভৃতির নকল প্রস্তুত করিয়া সস্তাদামের ছুরীর বাঁট বোতাম টুথব্রাশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিত; সেই নকল গালা জলে দ্রাবকে সুরায় তেলে গলে না, নষ্ট হয় না, তাপেও শীঘ্র গলে না। এই নকল গালার পাতে উড়ন জাহাজ তৈরী হইতেছে, এবং মিশ্রধাতুর জাল ও পেরেকে গাঁথা হইতেছে তাহার ফলে উড়ন জাহাজ প্রহ্লাদের ন্যায় অনলে অনিলে সলিলে অগ্নিতে গোলাগুলিতে নষ্ট হয় না; সর্ব্বাঙ্গ স্বচ্ছ বলিয়া উড়ন-মাঝির দৃষ্টি অবাধ থাকে; সে উপর হইতে সবাইকে ও সব কিছু দেখিতে পায়। মাটির লোকে দেখিতে পায় কেবল উড়ন জাহাজের কলটাকে ও লোকটাকে; তাহা উঁচুতে এমন ছোট দেখায় যে শুধু সেইদিকে তাগ করিয়া মারা কোনো গোলন্দাজের সাধ্যে কুলায় না।

চারু।

* * *

কলার রস সর্প-বিষের প্রতিষেধক—

সর্প-দংশনে প্রতি বৎসর অসংখ্য লোককে প্রাণ দিতে হয়। ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা প্রভৃতির ন্যায় সর্পও মানবের এক প্রতিবাসী

শত্রু। সর্পদষ্ট হইয়া যে পরিমাণ লোকের মৃত্যু হয়, আরোগ্য লাভের সংখ্যা সে অনুপাতে অনেক কম। পূর্ব্বে এ দেশে সর্পাঘাত হইলে তন্ত্র-মন্ত্রেরই ব্যবস্থা ছিল। ইদানীং যে কারণেই হউক সে সব ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। এখন সর্পবিষ নষ্ট করিবার নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে—নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ও উদ্ভাবিত হইতেছে। তাহা অনেক স্থলে সফলও হয়, বিফলও হয়। কিন্তু সর্পের প্রধান ক্রীড়াভূমি পল্লী-অঞ্চলে এ-সকলের প্রচলন না থাকায় এদেশে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

সম্প্রতি Times of Ceylonএ নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। (Mr. Daudley) শ্রীযুক্ত ডডলী নামক একজন ভদ্রলোক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে কলার রস সর্পদংশনের অব্যর্থ ও আশুফলদায়ী মহৌষধ। কয়েকজন ডাক্তারের সম্মুখে এই বিষয়ের পরীক্ষা দেখান হইয়াছিল। সদ্যধৃত এক বিষধর সাপের নিকট একটি বিলাতী কুক্কুর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কুকুরকে দেখিবামাত্র সাপটা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাকে কামড়াইতে পারিল না। কুকুর সাপটাকে আক্রমণ করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল। সেই সময় আর একটা দেশী কুকুরকে তথায় ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এইবার সাপটা এই কুকুরটাকে সজোরে বারংবার দংশন করিল। কুকুর যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল, এবং তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া গেল। তখন কুকুরটার মুখে সদ্য-সংগৃহীত কলার রস একটু একটু করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইল। এক পোয়া আন্দাজ রস কুকুরটার পেটে গেলে তাহার ক্রমশঃ চেতনা হইতে লাগিল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে সে সবল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল। অতঃপর তাহার শরীরে যে বিষের ক্রিয়া বিদ্যমান ছিল সেরূপ কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

আর একবার একটা কাক ধরিয়া উক্ত ভদ্রলোক এই বিষয়ের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতেও এইরূপ আশ্চর্য্যজনক ফল লাভ হইয়াছিল।

এই হিতকর আবিষ্কারটি মনুষ্য-শরীরেও ফলদায়ী কি না সে বিষয়ের পরীক্ষা হওয়া উচিত।

* * *

আমরা চা খাই, কি বিষ খাই !—

চা আজকাল আমাদের একটি প্রয়োজনীয় আহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশে অবস্থাপন্ন লোকেদের মধ্যেই ইহার প্রচলন ছিল। এক্ষণে ধনীর প্রাসাদ ও দরিদ্রের কুটীর সর্ব্বত্রই ইহার অব্যাহত প্রভাব স্থাপিত হইয়াছে। সহরের ত কথাই নাই, পল্লীগ্রামের নিঃস্ব, নিরক্ষর লোকেদের মধ্যেও ইহার ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বাড়ীতে ভদ্রলোক বা অভ্যাগত আসিলে জাপানীদের মত এক পেয়ালা চা দিয়া প্রাথমিক অভ্যর্থনা করিবার রীতি আজকাল আমাদের মধ্যেও দেখা দিয়াছে। হয়ত এমন এক সময় আসিবে, যখন চা দেবপূজার একটি উপকরণের অন্তর্ভূত হইয়া দাঁড়াইবে। চায়ের আদর এত বাড়িয়াছে যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা ইহার ঘোরতর ভক্ত হইয়া উঠিতেছে। সকালে উঠিয়া এক পেয়ালা চা আগে চাই। আহারে বিলম্ব হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু চায়ের বিলম্ব হইলে সর্ব্বাঙ্গ বিকল হইয়া পড়ে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝিয়া সুঝিয়াই বলিয়াছিলেন—

"বিপদ সম্পদ ধন নাহি চাই,
যশ মান চাহি না;
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই
ভাল এক পেয়ালা চা।"

কিন্তু এই চা যে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থে পূর্ণ এবং আমরা তাহা প্রত্যহ উদরস্থ করিয়া শরীরের অপকার সাধন করিতেছি এ কথা অতি অল্প লোকেই অবগত আছেন। আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরের খ্যাত-নামা ডাক্তার জন্ ব্রিড্‌ল্ (John Briddle) এ সম্বন্ধে এক অদ্ভুত গবেষণা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে এক-পাউণ্ড পরিমিত চা দ্বারা ১৭০০০ হাজার খরগোসের প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে। এক পাউণ্ড ওজনের চা এক কোয়ার্ট জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার ১০ ফোঁটা মাত্র একটি বলবান খরগোসকে খাওয়াইয়া দেওয়াতে সে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি ১ পাউণ্ড চা তিন মাসে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই হিসাবে এত চা প্রত্যহ তাহাকে ব্যবহার করিতে হয় যে তাহার দ্বারা ১৭৫টি খরগোসের জীবন নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু আমরা প্রত্যহ এতখানি করিয়া বিষ পান করিয়া থাকি একথা বিশ্বাস করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় কি?

আজকাল এ দেশের নানা স্থানে চা উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার আদি উৎপত্তিস্থান চীনদেশ ও জাপান। বহুকাল যাবৎ ইহার অস্তিত্ব অন্য দেশবাসীগণের অজ্ঞাত ছিল। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ইংলণ্ডে ইহা প্রথম আমদানী হয়। তৎকালে ২ পাউণ্ড ২ আউন্স চা ইংলণ্ডেশ্বরকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করা হইয়াছিল, সেই সময় হইতে জগতে চা ব্যবহারের সূত্রপাত। এক্ষণে এক ইংলণ্ডেই প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ কোটী পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হয়। ১৮৭৫ সালে বিলাতে ১০৮২৭৭২৭২ পাউণ্ড চা খরচ হইয়াছিল, ইহার মূল্য ১,৪০,০০,০০০ ষ্টারলিং অর্থাৎ ২১,০০,০০,০০০ টাকা। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্যে চায়ের ব্যবহার এতদপেক্ষাও অধিক।

চা পান করিলে শরীরের অবসন্নতা দূর হইয়া সতেজ ভাব আসে বটে, কিন্তু তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। ইহাতে মাদকতা-শক্তি থাকা হেতুই এরূপ হইয়া থাকে। মাদক দ্রব্য শরীরের রক্ত উৎপাদনে বা মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধনে কোনও প্রকার সহায়তা করে না। চা'কে অনেকাংশে মাদক শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। যে যে উপাদানে চা গঠিত তন্মধ্যে মাদকদ্রব্য কি পরিমাণে আছে বা কি প্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে, তাহার পরীক্ষা কোনও রসায়নবিৎ করিয়া-ছেন কি না জানা নাই, কিন্তু ইহার ব্যবহারে যে স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি হয় না একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। অধিক মাত্রায় চা ব্যবহার করিলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য, মাথাধরা প্রভৃতি শারীরিক গ্লানি দেখা যায় এবং দেহের বর্ণ হলুদে হইয়া চর্ম্ম শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। চায়ের সহিত বিষাক্ত পদার্থ থাকা হেতু এরূপ হওয়া সম্ভব।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

* * *

ভক্তির অপমাত্রা।—

যেখানকার মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও সম্মানের মর্য্যাদা বুঝে না, তথায় ঐশ্বর্য্যের উচ্চ আসনের গোড়ায় মানুষকে হক্-না-হক্ মাথা কুটাকুটি করিতে দেখা যায়। এই অতি-ভক্তি স্থানে স্থানে এমন গাঁজাখুরি মাত্রায় চড়ে যে তদ্দর্শনে বিবেচক ব্যক্তির হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কোন কোন দেশে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের নামের পিছনে উপাধিস্বরূপ যে লেজুড়ি জুড়িয়া দেওয়া হইয়া থাকে হয়ত তাহার অনেকগুলারই অর্থ আদবে সম্মান-জ্ঞাপক নহে। একটা লম্বাচৌড়া কথায় আপনার নাম জাহির করিলে সাধারণের বাহ্যিক ভক্তি আদায় করা যায় ইহাই যথেষ্ট। বর্ব্বর আফ্রি-কার মোনোমোটাপা রাজ্যের রাজাকে ঘিরিয়া বন্দী ও কবি সমস্বরে এই মোলায়েম স্তুতি-গীতিতে তাঁহার তুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন—হে চন্দ্র-সূর্য্যের অধিপতি, হে পরম মায়াবী, হে পাকাচোর, তোমাকে নমস্কার।

ব্রহ্মদেশের আরাকান রাজ্যের রাজাকে তাঁহার প্রজাগণ—নিম্নলিখিত উপাধিভূষণরাজিতে মণ্ডিত করিয়া থাকেন—আরাকানের সম্রাট, যুগলকুণ্ডলধারী, শ্বেতহস্তীর মালিক, পেগু এবং ব্রহ্মদেশের একমাত্র ন্যায্য অধিকারী, বাংলার দ্বাদশভৌমিকের অধিপতি, তোমার পায়ের তলে বারোজন রাজা মাথা লুটাইতেছে, ইত্যাদি।

আভার রাজার পরমেশ্বর খেতাব। তাঁহার লেজুড়ির পরিমাণ এইরূপ, সর্ব্বজনপূজ্য রাজাধিরাজ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, ষড়ঋতুর নিয়ন্তা, সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সর্ব্বময় নিয়ামক, সূর্য্যের ভ্রাতা ও চতুর্বিংশতি ছত্রধারী মহিমাময় নৃপতি। ইঁহার রাজসম্মানের চিহ্নরূপে সর্ব্বত্র ইঁহার অগ্রে চব্বিশটি ছাতা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

আসামের রাজাদিগের পদবীও বেশ জাঁকাল গোছের ছিল। ত্রিলোকের অধিপতি, সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর, রূপে পূর্ণচন্দ্র, ধ্রুবতারার ন্যায় চক্ষুশালী, তাঁহার উদয়ে প্রজারা শীতল হয়—তাঁহার পাদপদ্মের গন্ধ কি মনোমদ!

ডাক্তার ডেভী তাঁহার সিংহলের ইতিহাসে কাণ্ডীর রাজাদিগের একটা ধারাবাহিক উপাধির তালিকা দিয়া জগতে একটা কাজের মত কাজ করিয়া গিয়াছেন। সেখানকার রাজাদিগকে দেও (দেব) বলা হইয়া থাকে। উপাধি এইগুলি—ধর্ম্ম-গোপ্তা, অনন্তযশস্বী, রূপে চন্দ্র মল্লিকাকলিকা এবং নক্ষত্র জিনিয়া, পদতল-নিঃসৃত সৌরভের প্রভাবে প্রবল নৃপতিবর্গের নাসিকার তৃপ্তিদায়ক।

পারস্যের বাদশাহের নামের সঙ্গে প্রথমে তদধিকৃত স্থানগুলির একটা লম্বা ফর্দ্দ দিয়া পরে এই উপাধিগুলি দেওয়া হইয়া থাকে—সম্মানের শাখা, ধর্ম্মের আরশী, দিলদার গোলাপ ইত্যাদি।

প্রাচীন রোমে বড় সুন্দর ভাবে রাজসম্মান দেখান হইত। প্রজারা রাজা কিংবা Pro-consulএর মূর্ত্তি মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিত। লেক্টিষ্টার নিয়মে উৎসবের দিন রোমে বড় ধুম-ধড়াক্কা। সেদিন মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুর-ভোগের মহা-আয়োজন করা হইত। পাথুরে দেবমূর্ত্তিগুলাকে বেদীর হইতে নামাইয়া বালিস মাথায় দিয়া পালঙ্কের উপর শোয়ান হইত। দেবতারা যখন এইরূপে মহা আরামে থাকিতেন তখন তাঁহাদের ভোগ সরান হইত। Proconsulএর মূর্ত্তিটিও ইহা হইতে বঞ্চিত হইতেন না! তাঁহাকেও দেবতার পংক্তিতে শোয়াইয়া চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় ভোগ দেওয়া হইত। সীজার যখন রোম জয় করিলেন তখন মহারাজভক্ত সিনেট তাঁহাকে এই সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। সীজার বিগ্রহের সামিল হইয়া নিগ্রহের একশেষ পাইলেন এবং অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তাঁহার হুকুমে রোমের রাজদেবালয়ের সীজার-মূর্ত্তির নিম্ন হইতে অতঃপর উপদেবতার উপাধি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ৪০৪ অব্দে রোমের নৃপতি আর্কাডিয়াস এবং অনোরিয়াস নিম্নলিখিত আইনজারী করিয়াছিলেন 'এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, যে বা যাহারা আমাদিগকে ঈশ্বর বলিতে ইতস্ততঃ করিবে তাহাকে বা তাহাদিগকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে এবং তাহার বা তাহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। ভক্তি করা চাই-ই।' চীনের উপরেও এককাঠি।

পুণ্যশ্লোক রাণা প্রতাপসিংহকে রক্ষা করিবার দায়ে মান্না যে আত্মদান করিয়াছিলেন তাহা বীরেন্দ্রবর্গ-বাঞ্ছিত সন্দেহ নাই, কিন্তু পোর্ট-আর্থার-বিজয়ী নোগী ও তাঁহার পত্নী বিগত মিকাডোর দেহত্যাগের পর তাঁহার অনুগমনার্থ যে হারাকিরী বা পেটের নাড়ী ছোরা মারিয়া বাহির করিয়া তাহা টানিয়া ছিঁড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আদিম বর্ব্বর-সুলভ দেশাচার জাপানের পাঁজর ছাড়িয়া এখনও উঠে নাই। তাহার রাক্ষসী জ্বালায় জাপান একটি মহার্ঘ রত্ন হারাইয়াছে। বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন মোগল সম্রাটেরা কোন বিষয়ে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিবামাত্র তাঁহাদের প্রধান ওমরাহগণ যাত্রার দলের জুরীদারদিগের মত ঝাঁক বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতেন "ক্যাবাৎ, ক্যাবাৎ, ক্যাবাৎ!" এতদ্দেশে একটা প্রবাদ আছে, রাজা যদি দিনে দুপুরে বলেন এটা রাত, তবে তাঁহার পারিষদগণ বলিবেন হাঁ হুজুর, ঐ চাঁদ দেখা যায়। এটা একটা কথার কথা হইলেও অনেক বুদ্ধিমানকে আজিও ইহার কাছাকাছি যাইতে দেখা যায়। বাস্তবিকপক্ষে এই-সমস্ত কৃত্রিম অতিভক্তির চাপ কিরূপ আরামদায়ক বুঝা যায় না। ইহার দ্বারা কাহারও সুনার সম্পত্তি এক তিলও বাড়ে না। অথচ লৌকিক খ্যাতির কাঙ্গাল এই বিপন্ন বান্দাগুলি দুনিয়ার একরকম আশ্চর্য্য জিনিষ বটে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

মনের বিষ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"আসিতে আজ্ঞা হোক, মহাশ্রেষ্ঠী, প্রাসাদ আজ আপনার পদস্পর্শে ধন্য।"—সাদর সম্ভাষণ কর্ণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে আঘাত করিল, বিহ্বল হইলাম। হা, ভগবান! আমারই গৃহে আজ আমিই অতিথি! আমারই স্ত্রী, আমারই পৈতৃক ভবনে, বাল্য যৌবনের সুখস্মৃতিময় আনন্দ-আলয়ে আমাকে নিতান্ত অভ্যাগত অতিথির ন্যায় অভ্যর্থনা করিতেছে! এই সংসার! ইহার জন্য এত! দুই দিন পূর্ব্বে আমি যাহার একমাত্র অধীশ্বর ছিলাম, তাহাতে আজ আমার কোন অধিকার নাই? পান্থশালায় পথিকের যতটুকু স্বত্ব, আমার গৃহে আমার সে দাবিটুকুও নাই। পথিক ইচ্ছা করিলে তুল্য অধিকার লইয়া পুনঃ অতিথিশালায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। আর আমি? চিরকালের জন্য সর্ব্ব অধিকার হইতে বঞ্চিত। কত সাধের না এই গৃহ, এই লতামণ্ডপ, মল্লিকামালতীর বিথিকা, শ্যামল শষ্পাচ্ছাদিত উদ্যানের মধ্যস্থ বিচরণক্ষেত্র আমার বড় আদরের, অশেষ প্রীতির, কিন্তু আজ তাহাদের সহিত আমার কি সম্বন্ধ? আনন্দ-আলয় এখন আমার সুখ-শান্তির শ্মশান; তাহাদের সুখস্মৃতি আমাকে শত বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেছে। হায়! কাহার জন্য অত যত্নে সুখ-সম্ভারের অর্ঘ্য রচনা করিয়াছিলাম। তাহারা এখন কাহার ভোগ্য? গোবিন্দ অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার উপর আমার উদভ্রান্ত দৃষ্টি পতিত

হইবা মাত্র চমকিয়া উঠিলাম। এই পিশাচ,—বিশ্বাসহন্তা—ইহারই জন্য কি এ সুখের হাট সাধ করিয়া সাজাইয়াছিলাম? না—না—সে কখনই হইতে পারে না। এ নারকী শ্রেষ্ঠীবংশের পরম শত্রু, এ যদি শ্রেষ্ঠীবংশের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয় তাহা হইলে ধর্ম্মের মহিমা যে এককালে রসাতলে যায়। এরূপ ব্যভিচারের জয় হইলে লোক আর কোন্ পাপে দ্বিধা করিবে? বলিতে হইবে তাহা হইলে পৃথিবী দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। ভগবানের রাজ্যে এত অবিচার সম্ভবে না। কিন্তু এ গৃহ গোবিন্দর না হইলেই বা আমার ইহাতে স্বার্থ কি? আমি আমার নিজের ধনে যে-কাঙ্গাল সেই কাঙ্গালই। মস্তক রাখিবার স্থান নাই যাহার সেই ভিখারী হইতেও আমি দুঃখী। ভিখারীর নাই বলিয়াই নাই, আমার থাকিতেও আমি বঞ্চিত। ইহার মধ্যেই প্রাসাদে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে। হইবারই ত কথা—গৃহকর্ত্রীর আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ, তাহারও আমার স্মৃতি বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। লতামণ্ডপের মধ্যস্থ আমার নির্দ্দিষ্ট নিভৃত কোণ হইতে আমার প্রিয় আসনখানি স্থানান্তরিত হইয়াছে; আমার বহু যত্নে পালিত পাখীর পিঞ্জরটি সেখানে নাই? অবজ্ঞার অযত্নের চিহ্ন তথায় স্পষ্টতর। আমার বড় আদরের কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর বাঘা তাহার চির অভ্যস্ত বারান্দার কোণটি হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। হয় ত সে আমার সঙ্গে-সঙ্গেই নির্ব্বাসিত হইয়াছে। ক্ষোভে দুঃখে বক্ষ শতধা হইবার উপক্রম হইল। মানুষ অত দুঃখে কাঁদিতে পারে না; তাই বুঝি আমি পাষাণের ন্যায় নিশ্চল, নির্ব্বাক্ ছিলাম।

আমাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া আমার স্ত্রী আবার সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিল। আমি তাহাকে মন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ মস্তক নত করিয়া প্রতিনমস্কার করিলাম। আমার স্ত্রী আজ আমার নমস্কারের পাত্রী।

নীলা আমার ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল "শ্রেষ্ঠী বোধ হয় আমার এখানে আসিয়া সুখী হইতে পারেন নাই।"

তাহার বাক্যে জাগ্রত হইলাম। আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম, "আঃ মহাশয়া, আমি যদি সুখী না হইয়া থাকি জগতে তাহা হইলে আমার ন্যায় অকৃতজ্ঞ আর দ্বিতীয় নাই। যুধিষ্ঠিরকে যখন স্বর্গদর্শনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, তিনি কি দুঃখিত হইয়াছিলেন? আমার প্রিয়-বন্ধুর স্মৃতি মুহূর্ত্তের তরে আমাকে বিমনা করিয়াছিল। আশা করি, সে জন্য আপনি দোষ লইবেন না।"

নীলার বদনে হাস্য-রেখা দেখা দিল; প্রকৃতই তাহার নয়নে আনন্দ-জ্যোতি খেলিতেছিল। গোবিন্দ ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; বাক্যব্যয় করিল না। নীলা আমাকে সময়োচিত মিষ্টবাক্যে আপ্যায়িত করিয়া, বৈঠকখানায় লইয়া গেল। সেখানে দেখিলাম, প্রায় সমস্তই পূর্ব্ববৎ সজ্জিত আছে; কেবল আমার বাল্যকালের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিখানি স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেখানে একটি বীণা আবরণ-মুক্ত রহিয়াছে দেখিয়া বুঝিলাম, আমি আসিবার পূর্ব্বে গীতবাদ্য চলিতেছিল। আমি গৃহের সাজসজ্জার প্রশংসা করিয়া বলিলাম, "এ স্থানটি আমার কত পরিচিত।"

গোবিন্দ বিস্মিত হইয়া বলিল "আপনার আজও স্মরণ আছে?"

"ইহা কি ভুলিবার! বাল্যে আমি অধিকাংশ সময়ই এখানে কাটাইয়াছি, বন্ধুর ও আমার খেলিবার প্রিয় স্থানই ছিল এইটি। বাল্যস্মৃতি মানুষ বার্দ্ধক্যেও ভুলে না; আজ মনে হইতেছে, সে যেন সেদিনের কথা!"

নীলা আগ্রহের সহিত আমার কথা শুনিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার স্বামীকেও কি আপনি দেখিয়াছেন?"

গম্ভীরভাবে উত্তর করিলাম, "হাঁ,—সে তখন শিশু। যতদূর মনে আছে, তাহার চেহারায় কেমন একটা মাধুর্য্য ছিল, দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। বন্ধু ছেলেটিকে বড় ভাল বাসিতেন। ছেলের মাকেও আমি দেখিয়াছি।"

নীলা আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল "তাঁহাকে ত আপনার দেখিবারই কথা। তিনি কাহার মত ছিলেন?"

আমি উত্তর দিতে একটু ইতস্তত করিলাম। সেই প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশ্লোকা দেবী-চরিত্র ইহারা বুঝিবে কি?—তাঁহার নাম করিয়া অন্যায় করিয়াছি। অগত্যা বলিলাম, "আমি তাঁহার সৌন্দর্য্যের তুলনা দেখি না। সৌন্দর্য্যের অধীশ্বরী হইয়াও কখন তিনি আত্ম-সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই—বলিলেই তাঁহাকে এক কথায় বর্ণনা করা হয়। তাঁহার জীবনের লক্ষ্যই ছিল আত্মবিস্মৃত হইয়া

পরসেবা ; সংসারের পবিত্রতা, বংশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহার ব্রত ছিল। দুই দিনের জন্য সংসারে আসিয়াছিলেন ; একমাত্র পুত্র রাখিয়া অকালে স্বর্গে চলিয়া গেলেন !"

গোবিন্দ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "তিনি অল্প বয়সে মরিয়াছেন, সেই তাঁহার সৌভাগ্য। নতুবা দীর্ঘদিনে দাম্পত্যজীবনের নূতনত্ব কাটিয়া গেলে, কি হইত কে জানে ?"

আমার শরীরের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। ক্রোধে বদন রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ঈষৎ রুক্ষ স্বরেই বলিলাম, "আপনার কথার অর্থ বুঝিলাম না।' সে ভদ্রমহিলা যে-যুগের তখনও দাম্পত্য-প্রেমের নূতন মূর্ত্তি দেখা দেয় নাই। বিবাহ অর্থে ছিল আত্মার মিলন। এ যুগে আত্মায় বিশ্বাস উড়িয়া গিয়াছে ; মিলন হইবে কি শূন্যে শূন্যে ! বৃদ্ধ আমরা জানি না মহাশয়, বিবাহের কোন্ অংশে নূতনত্ব,—কোন্টুকু অরুচির ! নব্য যুবক আপনারা এ যুগের ধর্ম্ম আপনারাই ভাল বুঝেন। "

সুচতুরা নীলা, তাড়াতাড়ি মধ্যে পড়িয়া বলিল, "না-না—ইহাঁর কথা অনুগ্রহ করিয়া কানে তুলিবেন না। উনি না ভাবিয়া, সময় সময় যা'-তা' বলিয়া বসেন। কাহাকেও অসন্তুষ্ট করা উহাঁর অভিপ্রেত নয়, ওঁর ওটা একটা অভ্যাস ! আমার স্বামীও এই জন্য ওঁকে কতদিন দোষারোপ করিতেন, কখন কখন কথান্তর পর্য্যন্ত হইত, অথচ ইনি তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। যাক ওকথা—আপনি এ পরিবারের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, আপনাকে বলিবার ও আপনার কাছে শুনিবার যথেষ্ট বিষয় আছে। আমি যা' না জানি, এই পরিবারের এমন সব সংবাদ আপনি জানেন। এ সময়ে আপনাকে পাইয়া আমি কত সুখী হইয়াছি ; আশা করি আমার ছোট্ট মেয়েটিকে দেখিয়া আপনি সুখী হইবেন। চম্পাকে ডাকাইব কি ? না—ছোট ছেলে মেয়ে আপনার ভাল লাগে না ?"

আমার প্রিয়তমা কন্যাকে দেখিবার জন্য প্রাণ কি করিতেছিল, আমিই জানি। এ গৃহে আসিয়া—শুধু এ গৃহে কেন, বিদেশেও তাহার কথা কখনও বিস্মৃত হইতে পারি নাই ; মৃত্যু আমাকে, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে ; আমি আবার, হউক অপরিচিতের বেশে, তাহার সহিত মিলিত হইব,—এ সুখের তুলনা নাই,—দুঃখেরও সীমা নাই ; আমার প্রাণাধিকা কন্যাকে তাহার ন্যায্য অধিকার পূর্ণভাবে প্রকাশ্যে দান করিতে পারিব না,—এও কি কম দুঃখ ! আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম, "ভাল লাগে না ! ছেলে মেয়ে আমার অতি প্রিয় ; এ ত আমার বন্ধুপুত্রের আদরের ধন,—আমি তাহাকে দেখিয়া কত সুখী হইব !"

নীলা দাসীকে ডাকিল। দাসী তথায় উপস্থিত হইলে চম্পাকে পাঠাইয়া দিতে আদেশ দিল। গোবিন্দ তাহার মন্তব্যের জন্য অপ্রতিভ হইয়াছিল, (বোধ হয় 'আমাকে অসন্তুষ্ট করা তাহার স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল নহে ভাবিয়াও) আমাকে প্রীত করিবার মানসে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিতে প্রয়াসী হইল ; আমিও তাহাকে সে সুযোগ দান করিতে কার্পণ্য করিলাম না। খট্ করিয়া শব্দ হইল। চম্পা ! নিশ্চয়ই তাহার কোমল ক্ষুদ্র হস্তখানি দরজার কড়ায় এ শব্দ করিতেছে। নীলা অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিল "ভিতরে এস, ভিতরে এস—ভয় কি ?"

ধীরে ধীরে দ্বার উন্মুক্ত হইল। আমার চম্পা স্নেহের পুতলী, আমার সম্মুখে উপস্থিত ! এই কয়েক দিনেই তাহার চেহারায় কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ! মুখখানি মলিন, বিশুষ্ক,—ভয় ও বিরক্তি তাহা অধিকার করিয়াছে ; নয়নে তাহার সেই চাঞ্চল্যময় মধুর হাসি নাই, তৎপরিবর্ত্তে আশঙ্কা ! সর্ব্বদাই যেন ভয়, কখন কেবা কি ছল ধরিয়া ভর্ৎসনা করে। আমার সহিত তাহারও সুখের দিন অন্তর্হিত হইয়াছে। সে এখন অবহেলার বস্তু, নিপীড়িত ! মর্ম্মে মরিয়া গেলাম। ধীরে ধীরে, অতি ধীরে ভয়চকিত দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে চম্পা আসিয়া দাঁড়াইল। চকিত ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে বার বার গোবিন্দর দিকে তাকাইতে লাগিল। সে তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল "চলে এস চম্পা, ভয় পাচ্ছ কেন ! তুমি দুষ্টামি না করিলে আমি বকিব কেন। দুষ্ট মেয়ে, তাকানোর ভঙ্গী দেখ—আমি তোমাকে উপকথার দৈত্যের মত গিলিয়া ফেলিব না,—ভয় নাই। এই ভদ্রলোকের নিকটে এস,—ইনি তোমাকে ডাকাইয়াছেন ; ইনি তোমার বাবাকে জানিতেন।"

[illegible]বাবাকে [illegible]?" বালিকার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। সে [illegible] আমার নিকটে আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র [illegible] আমার হস্তে ন্যস্ত করিল। কি সুখস্পর্শ,—আনন্দে আত্মহারা হইলাম। প্রাণের আবেগে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম। অন্তরের অশ্রু চক্ষে বাঁধিয়া রাখিবার শক্তি আমার ছিল না। চক্ষের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল। আমি চম্পাকে চুম্বন করিবার ছলে, তাহার কুঞ্চিত কেশদামে মুখ লুকাইলাম; ভাগ্যে আমার চক্ষুর উপর আবরণ লম্বিত ছিল। ভাবিয়াছিলাম, আমার সেই বেশে হয়ত বালিকার ভয় উৎপাদন করিবে। কিছুই না। সে সহাস্যে তাহার ক্ষুদ্র বাহুদ্বয়ে আমার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল! শিশুরা কি জাতিস্মর! আমি আমার স্ত্রী ও গোবিন্দর দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। তাহারা সন্দেহ করিতেছে না ত? আমার আশঙ্কা অমূলক; তাহারা আমার মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। নীলাও আমার দিকে চাহিয়া ছিল। আমি বালিকাকে স্নেহের সহিত বক্ষে গ্রহণ করিয়াছি দেখিয়া সে আমোদ অনুভব করিতেছিল।

আমি হাসিয়া চম্পাকে বলিলাম "তুমি ত খুব সুন্দর মেয়ে, নামটিও তোমার তেমনি—চম্পা। তুমি সুন্দর একটি ক্ষুদ্র ফুল—ঠিক না কি?"

তাহার প্রফুল্ল বদনমণ্ডল গম্ভীর হইল। সে কচি মুখে মধুর কণ্ঠে ছোট করিয়া বলিল "বাবা আমাকে তাই বলিতেন।"

নীলা তাহা শুনিয়া বলিল "তোমার বাবাই ত তোমাকে আই দিয়া নষ্ট করিয়াছেন! তাঁর কথা বরং তুমি শুনিতে, আমার সঙ্গে তোমার দুষ্টামি বড় বাড়িয়াছে।"

চম্পা ডাগর ডাগর চক্ষু দুইটি তুলিয়া তাহার জননীর দিকে তাকাইল মাত্র, কোন উত্তর করিল না। আমি বলিলাম, "না,না, তুমি দুষ্ট হইতে যাইবে কেন? ছোট ছোট ফুলগুলি সকলেই সুন্দর। তাহারা কেমন নির্মল, কোমল; পৃথিবীর শোভা বৃদ্ধি করিয়া তাহারা কেমন মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে।"

চম্পা নীরব! নীরবে বালিকা বর্ষীয়সীর ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। আমার বক্ষে মস্তক ন্যস্ত করিয়া, আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কি আমার বাবাকে দেখিয়াছেন? তিনি কবে আসিবেন?"

আমি সহসা তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না।

গোবিন্দ বলিল "পাগলের মত বকিতেছ কেন চম্পা? তুমি ত শুনিয়াছ তোমার বাবা চলিয়া গিয়াছেন,—তোমার মত দুষ্ট মেয়ের নিকট তিনি আর কখন ফিরিয়া আসিবেন না। যে দেশে দুষ্ট ছেলে মেয়ে নাই, সেই দেশে তিনি গিয়াছেন,—তোমার দুষ্টামি দেখিতে কি তিনি আসিবেন?"

অবিবেচকের কি হৃদয়হীন নিদারুণ বাণী! সরল শিশুর সহিতও এই ভাব। পশুর অধম—অন্যের প্রাণের সুখদুঃখের জ্ঞান কি ইহাদের এক বিন্দুও নাই? বালিকা গোবিন্দর দিকে গর্ব্বিত ঘৃণাব্যঞ্জক কাতর দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া নয়ন নত করিল। সে দৃষ্টি সে গর্ব্ব শ্রেষ্ঠী-বংশের নিজস্ব, পারিবারিক বিশিষ্ট স্বভাবের পরিচায়ক। শ্রেষ্ঠীরা বাক্যে হৃদয়যন্ত্রণা ব্যক্ত করিয়া লঘুত্ব প্রকাশ করিতে জানে না। আমি ঠিক বলিতে পারি, বালিকা এত নির্য্যাতনেও কখনও গলা ছাড়িয়া কাঁদে নাই; আজিও কাঁদিল না; কিন্তু তাহার মানসিক কষ্ট কি গভীর! গোবিন্দ তাহাকে বুঝাইয়াছে, পিতা তাহারই দুষ্টামির জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। পিতৃবিরহকাতর কন্যার প্রাণে তাহা শেলসম বিদ্ধ হইয়াছে। সে জানে না তাহার কি অপরাধ; এমন কি অপরাধ যাহার জন্য পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। যদি সে দোষই করিয়াছিল, পিতা তাহাকে ক্ষমা করিলেন না কেন। তিনি কি ফিরিয়া আসিবেন না? পিতার প্রত্যাগমনের চিন্তা মনে উদয় হইবামাত্র, তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা তাহাকে আকুল করে, কিন্তু পরিতৃপ্তির পথ সে ভাবিয়া পায় না; কাহাকেও মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। কেবল শত অব্যক্ত চিন্তা, তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধির সমাধানের সাধ্যাতীত শত সমস্যা হৃদয়ে উদিত হইয়া ম্রিয়মাণাকে অশেষ যন্ত্রণা দান করে! কুসুমকোরক স্নেহ সহানুভূতি আলোক বাতাসের অভাবে অকালে শুকাইতে চলিয়াছে, কে তাহা লক্ষ্য করে। শিশুর সহিতও বঞ্চনাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বঞ্চক ব্যস্ত, স্বার্থান্ধের চক্ষে আত্ম ব্যতীত সকলই অন্ধকার। অন্যের সুখ অসহ্য। চম্পার দৃষ্টি গোবিন্দর

অসহ্য হইল। সে বিরক্তির সহিত বলিল, "এই যে—মেয়েটার সকলই ওর বাপের মত,—সেও অমনি তাকাইত। এই বয়সেই বাপের ধরণটা খুব ধরিয়াছে, যা হোক!" এই বলিয়া গোবিন্দ চম্পার মস্তকের পশ্চাতের কয়েক গুচ্ছ কেশ তুলিয়া ধরিয়া টানিতে লাগিল। বালিকা যতই সজোরে মস্তক সঞ্চালন করিয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইতে লাগিল, গোবিন্দ ততই হাসিয়া হাসিয়া তাহাকে অধিকতর ত্যক্তবিরক্ত করিতে লাগিল। তাহার মাতা সেজন্য একটি কথাও বলিল না। আমি আর নীরব থাকিতে না পারিয়া গোবিন্দকে বলিলাম, "মহাশয়, ছেলের খেলা, ভেকের মরণ। এই ক্ষুদ্র ভদ্রমহিলা বড় হইলে ইহার প্রতিশোধ লইতে কখনও ভুলিবে না। ছোট বেলায় একজন পুরুষ তাহাকে বিরক্ত করিয়াছিল, স্মরণ করিয়া যৌবনে এ সমস্ত পুরুষজাতিকে নাকে কাঁদাইয়া ছাড়িবে। সত্য বলিতেছি কিনা শ্রেষ্ঠিনী?"

গোবিন্দ একটু হাসিয়া জানালার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। নীলা রহস্তের স্বরে বলিল "যৌবনে ঠিক যে তাহাই করিবে, আমি আপনার সহিত একমত হইয়া বলিতে পারিতেছি না। বাল্যে একজন বিরক্ত করিয়াছিল, তাহা যদি ওর মনে আসে, তবে আর একজন যে কত স্নেহ করিয়া আদর করিয়াছিল, তাহা কি স্মরণ হইবে না?"

নীলা আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিল। আমি মাথা নাড়িয়া তাহার হৃদয়গ্রাহী মন্তব্যের জন্ত ধন্তবাদ দিলাম। নীলা তাহার বর্ত্তুল ওষ্ঠে হাস্ত ফলাইয়া আমার অভিনন্দন সাদরে গ্রহণ করিল। সকলই নীরবে।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, আহার প্রস্তুত। মাতা কন্তাকে শয়নগৃহে যাইতে ইঙ্গিত করিল। সে আমার ক্রোড় হইতে নামিবার সময় তাহার কানে কানে বলিলাম "আমি তোমাকে আবার শীঘ্রই দেখিতে আসিব; তুমি তাহা পছন্দ করিবে কি?"

বালিকা আমারই মত নিম্ন স্বরে বলিল, "আপনি আসিবেন ত?—নিশ্চয় আসিবেন, ভুলিয়া যাইবেন না যেন।"

পরক্ষণেই সে কক্ষ পরিত্যাগ করিল। সে অদৃশ্য হইলে, আমি শতমুখে তাহার মাতার নিকট তাহার প্রশংসা করিলাম; সত্যই সে প্রশংসার যোগ্য। গোবিন্দের না হউক নীলার মন কন্যার সুখ্যাতিতে প্রহৃষ্ট হইবার কথা। হইয়াছিল কি না জানি না, অন্ততঃ বাহ্যিক ভাবে ত তেমন কিছু বুঝিতে পারি নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভোজন-কক্ষে আমরা উপনীত হইলাম।

নীলা বলিল "মহাশয়, আপনি এই পরিবারের পুরাতন বন্ধু। আশা করি, পারিবারিক কর্ত্তাদের প্রাপ্য মধ্যবর্ত্তী বিশিষ্ট আসনখানি গ্রহণ করিয়া আমাকে সম্মানিত করিতে আপনার আপত্তি হইবে না।"

আমি অন্তরের সহিত তাহাকে ধন্তবাদ দিলাম। যে ভাবেই হউক, আমি আমার বৈধ অধিকার লাভ করিয়া সুখী হইয়াছিলাম। পূর্ব্বের ন্যায় আমার দক্ষিণপার্শ্বের আসনে গোবিন্দ, ও আমার বামে নীলা উপবেশন করিল। সম্মুখে আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবের চিত্র। চিত্রিতের স্থির নয়ন দুঃখ সহানুভূতিতে আমার দিকে যেন চাহিয়া আছে। আমি কিছুতেই একটি দীর্ঘশ্বাস গোপন করিতে পারিলাম না।

গোবিন্দ সহসা বলিয়া উঠিল, "চিত্রখানিতে কি আপনি আপনার বন্ধুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতেছেন?"

"জীবন্ত চিত্র! বন্ধুকে যেন সম্মুখে দেখিতেছি। তাঁহার কথা কত ভাবে মনে আসিতেছে। সে স্মৃতি যেমন মধুর, তেমনি হৃদয়-অবসাদক; বন্ধু চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রিয়তম পুত্রটিও নাই। সে থাকিলে ত আজ কত আনন্দ পাইতাম। শ্রেষ্ঠিনী বোধ হয় আমার ক্ষোভের কারণ অনুভব করিতে পারিতেছেন?"

নীলা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "সে কি আর বলিতে! আপনাতে তাঁহার স্মৃতি জাগিয়া উঠে, আপনাকে তাই সর্ব্বাপেক্ষা আপনার বলিয়া আজ মনে হইতেছে; তাঁহাদের আপনি পরমাত্মীয় ছিলেন,—আমারও পর নয় ভাবিয়া আমি গর্ব্বিত।"

বলিলাম, "আমিও কম সম্মানিত হই নাই। আপনাকে আমি পরমাত্মীয়া রূপেই গ্রহণ করিয়াছি। সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ আপনি আমাকে দান করিয়াছেন।"

নীলা হাসিয়া বলিল, "উভয়তই।"

আমার পিতৃ আমলের পাচক জিতকাম খাদ্যসামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইল। বেচারী নীরবে খাদ্যগুলি যথাস্থানে রক্ষা করিতেছিল। গোবিন্দর বোধ হয় সর্ব্বদাই হেমরাজের (আমার) অসারত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা। সে আমার উদ্দেশ্যে বলিল, "এই যে জিতকাম,—অনেক কাল হইতে এ এ-সংসারে চাকরী করিতেছে; পিতা পুত্র উভয় শ্রেষ্ঠীকেই এ বিশেষভাবে জানিত; ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই হেমরাজের সম্বন্ধে আমার মন্তব্যের সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন।"

জিতকাম মুখ ফিরাইয়া কাশিল। আমি জানিতাম, কোন অপ্রীতিকর বিষয়ে মাথা দিবার পূর্ব্বে, এরূপভাবে কাশা তাহার পুরাতন অভ্যাস। আমি তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মুখ আমার নিকট পরিচিত নয়; আমি যখন বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে এখানে আসিতাম, তখন বোধ হয় তুমি নিযুক্ত হও নাই।"

সে আমাকে নমস্কার করিয়া অতি বিনীতস্বরে উত্তর করিল, "না হুজুর। যে বৎসর আমার মুনিব-পত্নীর মৃত্যু হয়, তাহার পূর্ব্ব বৎসরে আমি এখানে আসি।"

বলিলাম "তাহা হইলে অতি অল্পের জন্য তোমার সঙ্গে সে সময় পরিচিত হইতে পারি নাই। আমি তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে তাম্রলিপ্তি পরিত্যাগ করি। ছোট শ্রেষ্ঠীকে তবে তুমি খুব ছোট বেলা হইতেই দেখিয়াছ?"

সে ছলছল নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "হাঁ হুজুর,—তাঁহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম।"

তাহার গদগদভাব দেখিয়া আমি বলিলাম, "তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে ভালবাসিতে?"

"অমন মনিব কি হয় হুজুর। যেমন সুন্দর চেহারা, মনটিও ছিল তেমনি সুন্দর; বিদ্যা, বুদ্ধি, দান দাক্ষিণ্যে অমন আর একটি পাইব না। আমাদের দুরদৃষ্ট, নতুবা ভগবান এমন অকস্মাৎ আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন কেন। আমি এখনও বিশ্বাস করিতে পারি না, তিনি ইহজগতে নাই। অমন শরীর যাঁহার, কখন মাথা পর্য্যন্ত ধরিতে দেখি নাই, তাঁহার কিনা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু, সব শেষ, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না! তাঁহার শেষ দৃশ্যটা পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাইলাম না—সে কি কম দুঃখ! যখন সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তখনি আমারও মৃত্যু হয় নাই কেন। শ্রেষ্ঠী কেবল আমার মুনিব নন—পুত্রাধিক। প্রাণ ফাটিয়া গিয়াছে। কখনও কি এ বেদনা ভুলিতে পারিব। কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখিতে পারি না,—কি করিতে কি করিয়া বসি। কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন;—তিনি আমার অমনোযোগিতায় কত বিরক্ত হন।"

আমার স্ত্রী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ঠিকই জিতকাম, আজকাল তুমি বড় ভুলা হইয়া পড়িয়াছ; এক কাজ দশবার বলিলেও মনে রাখিতে পার না। একটা কাজ একবারের বেশী বলিতে হইলে কাজেই বিরক্ত হইতে হয়।"

জিতকাম তাহার আয়ত নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি আমার বদনে স্থাপন করিয়া, ললাট-ঊর্দ্ধস্থ কেশগুচ্ছে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। মুখে বাক্য নাই, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস তাহার অন্তরের বার্ত্তা নিবেদন করিল। তখনই আত্মসম্বরণ করিয়া বৃদ্ধ স্বকার্য্যে মন দিল। আমরাও প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিলাম। নীলা চিরদিনই বাকপটু। আজ তাহার বাক্‌চাতুর্য্য অন্যদিনকে অতিক্রম করিয়াছিল। হাস্যকৌতুক, গল্প প্রসঙ্গ, সমাজের সংবাদ, বিনয়, ভদ্রতা কিছুরই অভাব ছিল না। নীলার সমস্তই সুন্দর;—সেই সঙ্গে যদি তাহার হৃদয় থাকিত! আমিও তাহার বাক্যের সহিত যথারীতি যোগ দিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারি নাই। গোবিন্দ আজ গম্ভীর। আমার স্ত্রীর উৎসাহ কথায় কথায় যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, গোবিন্দ তেমনি দমিয়া যাইতেছিল। আমি নানাছলে তাহাকে বাক্যালাপের মধ্যে টানিয়া আনিতে চেষ্টা পাইতেছিলাম; তাহার আরাধ্য চিত্রশিল্পের প্রসঙ্গ তুলিয়া, তাহাকে প্রশংসা করিয়া, উৎসাহিত করিবার প্রয়াস সমস্তই বিফল হইয়াছিল। যেটির উত্তর না দিলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না গোবিন্দ সেইটির মাত্র এক কথায় উত্তর দিয়া নীরব হইতেছিল। নীলা, তাহার সে ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল;

কিন্তু তাহাতে না দমিয়া উৎসাহের মাত্রা চড়াইয়া দিতেছিল। অবশেষে গোবিন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া ফেলিল "গোবিন্দ, ব্যাপার কি? শরীর আপনার ভাল নাই কি—এত বিমর্ষ কেন?"

আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কিছু মনে করিবেন না; আমি উঁহাকে অনেক সময়ই ডাকনাম ধরিয়া সম্বোধন করি। উনি আমার স্বামীর বন্ধু, আমার ভ্রাতার মত; স্বামী জীবিত থাকিতে সর্ব্বদাই আমরা একত্র কাটাইয়াছি।"

গোবিন্দ কট্‌মট্ দৃষ্টিতে নীলার পানে চাহিল কিন্তু কিছু বলিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। নীলা তাহা দেখিয়াও দেখিল না। তরল হাস্যে বন্ধুকে আরও বিদ্ধ করিল। আমি মনে মনে বলিলাম "গোবিন্দ, এখন একবার চম্পার কথা স্মরণ কর, সরলা বালিকাকে বিরক্ত করিয়া যে সুখ অনুভব করিয়াছ, তাহার তুলনায় তোমার এখনকার অবস্থা!"

নীলা আসন পরিত্যাগ করিয়া চলিল।

আমি সত্বর উঠিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। মৃদু হাসিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিল। আমি ফিরিয়া আসিয়া আসনে বসিলাম। গোবিন্দ বিমর্ষভাবে নীরবে বসিয়া ছিল। পাচক প্রভৃতি বহু পূর্ব্বে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিল। আমরা তখন তথায় মাত্র দুইটি প্রাণী। আমার সঙ্কল্পটা মুহূর্ত্তের মধ্যে একবার ভাবিয়া লইলাম—দাবার চাল হইতেও আমার চালগুলি আনন্দপ্রদ। আমি বলিলাম "কি সুন্দরী রমণী,—যেমন কথাবার্ত্তায়, তেমনি বুদ্ধিতে। পছন্দটাও যেমন হওয়া উচিত তাই—ঠিক বলিতেছি না কি মহাশয়?"

সে চমকিয়া উঠিল। অতি কর্কশ স্বরে বলিল "পছন্দ—কিসের—আমি আপনার হেঁয়ালি ভাঙিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।"

আমি গোঁফে তা দিয়া বন্ধুর ন্যায় সহাস্যে বলিলাম, "যুবক চিরকালই যুবক, তাঁহাদের সকলেরই একধরণ। ভাল, বন্ধু, ইহাতে আর বৃদ্ধের নিকট লজ্জা করিবার কি আছে? আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার সাফল্য কামনা করি। যদি কোন যুবতী এমন একজন যুবহৃদয়ের অকৃত্রিম প্রশংসা না বুঝেন, আমি সে সুন্দরীকে নির্ব্বোধ বলিতে বাধ্য। তাঁহার সুখের আশাও সুদূর-পরাহত!"

গোবিন্দ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল "আপনি বুঝি ভাবেন—আমি—আমি—"

আমি ধীরভাবে বলিলাম "হাঁ, আপনি নিশ্চয়ই এই রমণীকে ভালবাসেন। কেন বাসিবেন না? যদি না বাসিতেন তাহা হইলেই বলিতাম, আপনার চক্ষু নাই—হৃদয় নাই,—আপনি অকালে আমাদের মতই বৃদ্ধ! যাহা স্বাভাবিক তাহাই সুন্দর। যুবক যদি এমন অবস্থাতেও এরূপ সুন্দরীর পক্ষপাতী না হন, তবে আর তাঁহার যুবকত্বের পরিচয় কোথায়? আপনার বন্ধুপত্নী অন্যের প্রণয়ভাগিনী হইবেন, তাহা কখনই হইতে পারে না; সে স্থান আপনারই প্রাপ্য! আপনার অভিপ্রায় পূর্ণ হোক। আমি তাহা হইলে কত সুখী হইব!"

চিত্তবৃত্তিহীন নির্ব্বোধ পশু, আমার বাক্যে গলিয়া গেল, শ্যামল শষ্পের স্পর্শে বাষ্পকণার ন্যায় একবারে শীতল শিশির! আমার হস্ত আগ্রহে গ্রহণ করিয়া সে বলিল "ক্ষমা করিবেন মহাশ্রেষ্ঠী! নির্ব্বোধ বন্ধুর দোষ লইবেন না। আমি আজ এমন সুখের মজ্‌লিসে আপনার সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারি নাই; চরম অভদ্রতা করিয়াছি। অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, আমি আপনাকে বুঝিতে পারি নাই। আপনার ন্যায় সহৃদয় বিজ্ঞ বন্ধুর নিকট কিছু আর গোপন করিয়া অপরাধ বৃদ্ধি করিব না। আমি জ্ঞানহারা হইয়াছিলাম, আপনার স্নেহময় বাক্য আমার ভুল ভাঙিয়া দিয়াছে, নতুবা আরও কতকাল আমি হিংসায় জ্বলিয়া মরিতাম। আমি সত্যই মনে করিয়াছিলাম, আপনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী,—আপনিও শ্রেষ্ঠিনীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ,—অবিবেচক বন্ধু বলিয়া ক্ষমা করিবেন,—আমার মনে হইতেছিল—আপনাকে আমি খুন করি!"

আমি হাহা করিয়া হাসিয়া বলিলাম "বলিয়াছি, যুবক যুবকই! প্রতিহিংসার উপযুক্ত স্থল বটে! আমার বুড়া হাড়—এক ঘায়ের তোড় সহিবে না। এই হাড়ে আবার প্রেম! ভাবিয়াছিলেন ভাল! জীবনে যদি অমন প্রতিহিংসার দিন আবার ফিরিয়া পাইবার আশা থাকিত

বুকারা আনন্দে অধীর হইয়াই মারা যাইত—অন্য উপায় আবশ্যক হইত না।”

“মহাশ্রেষ্ঠী, আপনি আমাকে স্নেহে মারিয়া ফেলিলেন। প্রতিহিংসা লইতে চাহিয়াছিলাম আমি, প্রকৃত পক্ষে তাহা লইলেন আপনি। এমন একটা গুরুতর কথা, প্রাণবধের প্রসঙ্গ কেহ এমন তরলভাবে গ্রহণ করিতে পারে, আমার তাহা ধারণা ছিল না। আপনি যথার্থই মহাত্মা,—আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। উঃ! কি কষ্টেই আজকার দিনটা গিয়াছে।”

আমি বলিলাম “প্রেমিকের যা হওয়া উচিত ঠিক তাই। প্রেমিকের প্রাণে শত সন্দেহ; বিনা কারণে কেবল কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরা বাঁচা প্রেমিকের রোগ। তাঁহাদের সুখদুঃখের লীলাখেলা দেখিয়া আমাদের এ-বয়সী বৃদ্ধের হাসি পায়। বন্ধু ঠাট্টা ভাবিবেন না, আমার বয়সে আপনিও বলিবেন—স্বর্ণের সুন্দর আভা, সুন্দরীর বর্ণ হইতে অনেক প্রীতিপদ,—স্বর্ণমুদ্রার টুং শব্দ, রমণীর কণ্ঠ হইতে কত মধুর। অবশ্য এসব বৃদ্ধের কথা; যুবক আপনারা, আপনাদের মত ভিন্ন।”

গোবিন্দর মুখের ভাব দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, সে আমাকে প্রেমিকের পর্য্যায় হইতে মুক্তিদান করিয়াছে, বিশ্বাস করিয়াছে, রমণীর প্রেমে আমার লিপ্সা নাই; শ্রেষ্ঠীনীকে আমি প্রেমের চক্ষে দেখি নাই, বরং তাহার সহিত গোবিন্দর পরিণয় সম্পন্ন হইলে আমি সুখী। তাহার প্রেমের অভিনয়ে আমার সহানুভূতি কল্পনা করিয়া সে আর হৃদয়াবেগ দমন করিতে পারিল না। বলিল “মহাশ্রেষ্ঠী, আপনি বহুদর্শী, সকলই বুঝিয়াছেন; আপনার নিকট কিছু গোপন করিব না। শ্রেষ্ঠীনীকে আমি যে কত ভালবাসি কথায় তাহা কি বলিব। আমার মনের ভাব ভালবাসা এই সামান্য শব্দে ব্যক্ত হইবার নয়। তাঁহার স্পর্শে আমাকে পাগল করে, তাহার স্বরে শরীরের প্রতি শিরা হর্ষে কাঁপিতে থাকে, তাহার দৃষ্টিতে আমার অন্তর মন জ্বলিয়া উঠে—যেমন আলোকিত হয়, পুড়িয়া তেমনি ছারখার হয়। মহাশ্রেষ্ঠী, আপনি বুঝিবেন না, শ্রেষ্ঠীনীর ভালবাসায় কি আনন্দ,—তাহাতে কি তীব্র যন্ত্রণা!”

মনে হইতেছিল পাষণ্ডের সুখদুঃখের তীব্রতা সেই মুহূর্ত্তেই ইহজীবনের মত ঘুচাইয়া দেই। আত্মসম্বরণ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম “ধৈর্য্য ধরুন। রক্ত যখন সুখসন্তাপে উষ্ণ হইয়া ফুটিতে থাকে মস্তিষ্ককে শীতল রাখাই তখন বুদ্ধিমানের কাজ। আপনার প্রেম প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে জানা চাই শ্রেষ্ঠীনী আপনাকে ভালবাসেন কি না। ঠিক নয় কি?”

সেও তুল্য আবেগে উত্তর করিল “জানা? তা কি জানিতে বাকী—” একটু থামিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, “না—সে কথা তুলিয়া কাজ নাই—বলিবার অধিকার নাই। আমি জানি, শ্রেষ্ঠীনী তাঁহার স্বামীকে পছন্দ করিতেন না।”

বলিলাম, “তাহা হইলে, বিধবাকে জয় করিবার আশা আপনার সম্পূর্ণ। তাঁহার স্বামীকে যে ভাল বাসিতেন না—তাহা হাবভাবেই প্রকাশ বটে।”

সে বলিল “তাহার জন্য শ্রেষ্ঠীনীকে দোষী করা যায় না। হেমরাজ একটা কিম্ভূতকিমাকার খামখেয়ালী লোক ছিল। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তাহার কোন্ গুণে আকৃষ্ট হইবেন? এরূপ বিবাহ তাহার করা কেন?”

আমার অন্তরের প্রবল ক্রোধ গোপন করা কঠিন হইল। ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলাম “আপনাদের ন্যায় বন্ধুর জন্যই তাঁহার বিবাহ! তিনি বিবাহ না করিলে, এ সুন্দরীর আশা আপনার ন্যায় ব্যক্তি করিতে সাহসী হইতেন কি?”

তাহার মুখের ভাবে বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমার বাক্যে তাহাকে আঘাত করিতেছে। সুতরাং ঘুরাইয়া বলিলাম “কিন্তু যদি বিধবাকে আবার বিবাহ করিতে হয়—তাঁর যে বয়স, তিনি যেমন সুন্দরী—বিবাহ তিনি করিবেনই—তবে আপনার আশা কিছুতেই অন্যায় নয়—আপনাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধ ও বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে বলিতে হয় আপনিই তাঁহার বরণীয় হওয়া উচিত—হইলে হইবেও তাহাই।”

সে কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিল “আপনি বরং তাহা হইলে শ্রেষ্ঠীনীর পক্ষপাতী নন?”

পাপাত্মা তখনও সন্দেহমুক্ত হইতে পারে নাই। আমি হাসিয়া বলিলাম “পক্ষপাতী নই? কেন, নিশ্চয় পক্ষপাতী। শ্রেষ্ঠীনীর ন্যায় রমণীকে কে না পছন্দ করে। কিন্তু আপনার

ভাবে আমি তাঁহার পক্ষপাতী নই। এখন ত আমি বৃদ্ধ, যৌবনেও কখন আমি রমণীর প্রণয়প্রার্থী হই নাই। আমার প্রতিজ্ঞা যদি কোন—"

অধীর যুবক বলিয়া উঠিল "যদি কি?"

"যদি স্ত্রীলোক নিজে যাচিয়া আমার প্রণয় ভিক্ষা না করে, তবে স্ত্রীর ভালবাসা কি বস্তু আমি চিন্তাও করিব না—এই আমার প্রতিজ্ঞা!"

সে হাসিয়া বলিল, "অসম্ভব! যাহা কেহ কখন শুনে নাই, আপনার জন্ত কি তাহাই হইবে?"

আমিও সহাস্তে বলিলাম, "জানি তা—স্ত্রীলোক কখন প্রকাশ্যে মুখ ফুটিয়া পুরুষের প্রণয় ভিক্ষা করে না। প্রণয় আমার উপাস্য নয়—কাজেই আমার এই অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা। এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণও হইবে না, আমি কখন বিবাহও করিব না। বিবাহের বিরুদ্ধে এটা কি তীক্ষ্ণ অস্ত্র নয়?"

গোবিন্দ এবারে প্রকৃতই সন্দেহমুক্ত হইল। সে আমাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া বলিল "চলুন, বারান্দায় যাই, শ্রেষ্ঠিনী অনেকক্ষণ গিয়াছেন।"

গোবিন্দর সংকীর্ণ হৃদয়পাত্রে মোহের মদিরা ঢালিয়া দিয়া স্বচ্ছন্দ মনে নীলার উদ্দেশ্যে কক্ষ পরিত্যাগ করিলাম। নীলা আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল; আমরা তাহার দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র সে অগ্রসর হইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিল। গৃহকর্ত্রীর পার্শ্বেই আমার আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, উপবেশন করিলাম। গোবিন্দর স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল, সে হাস্যকৌতুকে আসর জমাইয়া তুলিল। সে রাত্রিটাও অতি সুন্দর, নির্ম্মল গগনে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। অদূরের লতাকুঞ্জ হইতে পাপিয়ার সুমধুর সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছিল। কুসুম-সুরভিতে স্থানটি মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। নীলা আমাদের জন্ত স্বহস্তে সুবাসিত পান বিতরণ করিতেছিল; আমার ভ্রম হইতেছিল, পূর্ব্বের সুখের দিন যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সহসা কাতরতাব্যঞ্জক একটা 'ভেউ-এউ' শব্দ কর্ণে পৌছিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম "একি! কিসের শব্দ?" প্রশ্ন করা নিষ্প্রয়োজন ছিল, আমি জানিতাম সে শব্দ কাহার!

নীলা বিরক্তির স্বরে উত্তর করিল "ঐ একটা আপদ জুটিয়াছে, আমার স্বামীর কুকুর; ঘরটা ওর কি বিরক্তিকর, রোজ রাত্রে এমনি করিয়া জ্বালাতন করিবে! স্বামীর কুকুর তাই আজও ওকে তাড়াই নাই; দেখিতেছি, বাধ্য হইয়া অবশেষে দূরই করিতে হইবে। তারও যেমন কাজ ছিল না—এই-সকল আপদ জুটাইয়াছিল!"

বলিলাম, "আপনার স্বামী থাকিতেও কি ও এইরূপ বিরক্তিকর ছিল? কুকুরটা কোথায়?"

নীলা সহাস্যে বলিল, "আপনিও বুঝি কুকুরভক্ত! কুকুরটা প্রথমে এমন ছিল না। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর ওটা যেন ক্ষেপিয়া উঠিল; দিনরাত কেবল চীৎকার, কেবল এঘর-ওঘর করিয়া ছটফট করিয়া বেড়াইত! সত্যই প্রভুর অদর্শনে বেচারীকে পাগল করিয়াছিল। রাত্রে ওর জ্বালায় নিদ্রা যাইবার উপায় ছিল না। কি করি অগত্যা শিকলে বাঁধিতে বাধ্য হইয়াছি; চম্পার শয়ন-কক্ষের কোণ কিছুতেই ছাড়িতে চায় না,—সেখানে থাকিলে শান্তভাবে থাকে,—সেখানেই আছে।"

হতভাগ্য কুকুর! তোর কর্ত্তব্য তুই এত নির্য্যাতনেও ভুলিস নাই! প্রভুভক্তির জন্ত তোর আজ এই শাস্তি! নিমকের মাস্তই কি সংসারে অপরাধ!

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঠিকই বলিয়াছেন, কুকুর আমার বড় প্রিয়। তাহাদের বোধশক্তি আশ্চর্য্য! যে তাহাদিগকে ভালবাসে, দৃষ্টিমাত্রই তাহারা তাহা বুঝিতে পারে; যে-কোন কুকুর মুহূর্ত্তে আমার বাধ্য হয়। আপনার কুকুরটিকে দিয়া তাহার পরীক্ষা করিবেন কি?"

নীলা বলিল, "আনন্দের সহিত। গোবিন্দ অনুগ্রহ করিয়া কুকুরটার শিকল খুলিয়া সঙ্গে আনিবেন কি?"

গোবিন্দ ভীতির সহিত বলিল "তাহা হইলেই হইয়াছে! আপনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন, সে দিন ও আমাকে আর একটু হইলেই টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছাড়িত আর কি! কুকুর নয় ত বাঘ! যদি মনে কিছু না করেন, আমি জিতকামকে কুকুরটাকে আনিতে বলিতেছি।"

নীলা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "মহাশ্রেষ্ঠী! বন্ধু গোবিন্দর দুর্দ্দশার কথা শুনিয়াও কি কুকুরটাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন? সত্যই, সেদিন জিতকাম কুকুরটাকে তাড়াতাড়ি না বাঁধিলে উহার মহাবিপদ হইত।

আশ্চর্য্য! ইঁহার উপরই ওর রাগটা যেন বেশী। কুকুরটার মেজাজ বুঝা ভার, চম্পার সঙ্গে বিড়ালের মত খেলা করে; কাহাকেও আবার ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচে; এমন দুর্দ্দান্ত কুকুরকেও কি দেখিতে ইচ্ছা করেন?"

বলিলাম, "বলিয়াছি ত পরীক্ষা—কুকুরটা আমার সামনে আসিলেই বুঝিবেন।"

নীলা জিতরামকে ডাকিল। জিতরাম যন্ত্রচালিতের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিল। গৃহকর্ত্রী হুকুম দিলেন, "বাঘাকে এখানে লইয়া এস।"

জিতরাম প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আমার প্রতি প্রশ্ন-জ্ঞাপক একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। আমার মনে হইল, পুরাতন ভৃত্য বোধ হয় আমার ছদ্মবেশকে ধরি ধরি করিয়া চঞ্চল হইয়াছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটি লম্বা লোমবহুল কৃষ্ণবর্ণ জীব চন্দ্রকিরণে দেখা দিল। বাঘা ছুটিয়া আসিতেছিল; সে তাহার কর্ত্রী বা গোবিন্দকে লক্ষ্য না করিয়া একবারে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল; আনন্দে মৃদু শব্দ করিতে করিতে আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িল; লেজ নাড়িয়া কখন লাফাইয়া কখন আমার গায়ে নাসিকা ঘর্ষণ করিয়া আমার সম্বর্দ্ধনা করিতেছিল। নীলা ও গোবিন্দ তাহার হর্ষোন্মত্ততা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। আমি তাহাদের বিস্ময়ভাব অনুধাবন করিয়া হাসিয়া বলিলাম, "আমি কি পূর্ব্বেই বলি নাই কুকুর মাত্রেই আমাকে নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় মনে করে?"

আমি বাঘার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিলাম। সে তৎক্ষণাৎ শুইয়া পড়িল; কেবল তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। সে যেন বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিসে আমাকে এতটা বদলাইয়া দিয়াছে। বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমার ছদ্মবেশ তাহাকে প্রতারিত করিতে পারে নাই,—প্রভুভক্ত জীব প্রভুকে চিনিতে পারিয়াছে। নীলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—তাহা বিবর্ণ, তাহার অলঙ্কারভূষিত শুভ্র হস্ত কাঁপিতেছিল। আমি বলিলাম, "মহাশয়া কি কুকুরটাকে দেখিয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছেন?"

নীলা চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল "না,—ভাবিতেছি, বাঘা সাধারণতঃ অপরিচিতের কাছে ঘেঁসিতে চায় না। এক আমার স্বর্গীয় স্বামী ব্যতীত অন্যকে দেখিয়াও কখন এমন ভাবে আনন্দ করে নাই। আশ্চর্য্য! আপনাকেও তাহার প্রভুরই মত আপনার মনে করিয়াছে।"

গোবিন্দ নীলার বাক্য সমর্থন করিয়া বলিল, "আশ্চর্য্য বলিতে আশ্চর্য্য! ও আমাকে দেখিলে, একবার মুখ না খিঁচাইয়া যায় না। আজ আমাকে লক্ষ্যই করিল না!"

গোবিন্দর স্বর শুনিয়া বাঘা অসন্তোষব্যঞ্জক গোঁ গোঁ রব করিল। আমি তাহার মাথা চাপড়াইয়া শান্ত করিলাম। গোবিন্দর প্রতি তাহার বর্ত্তমান ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইলাম; আমি সমাহিত হইবার পূর্ব্বে কৈ সে ত গোবিন্দর সহিত এরূপ ব্যবহার করিত না। সেও কি তবে গোবিন্দর স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছে?

আমি বলিলাম "এমন সময় গিয়াছে, যখন কুকুরই আমার প্রধান সখের সামগ্রী ছিল। উহাদের অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির পরিচয় আমি অনেক পাইয়াছি। যে উহাদের পছন্দ করে, উহারা দেখিবামাত্র তাহা বুঝিতে পারে; আপনার এই বাঘা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে তাহার স্বজাতীয়ের মধ্যে আমার বন্ধুর সংখ্যা কম নয়; তাহার এই বাধ্যতার সেইটাই মূলকারণ।"

কত স্থানে আরও কত দুর্দ্দান্ত কুকুর কেমন সহজে আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, সে-সকল কাহিনী এরূপ ভাবে বর্ণনা করিলাম যে, আমার বাক্যপ্রভাবে তাহাদের সন্দেহের কোন কারণ থাকিল না। নীলা বলিল "আপনি দেখিতেছি মানুষ হইতে পশুকে সদ্ভাবে বাধ্য করিতে অসাধারণ পণ্ডিত; অন্যে না বুঝুক, আমি তাহা বেশ অনুভব করিয়াছি।"

আমি মস্তক অবনত করিয়া বিনয় প্রকাশ করিলাম। নানা প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থাপিত হইল; তিনজনের মধ্যে বন্ধুত্ব বেশ জমিয়া আসিল। আমি "রাত্রি অধিক হইতেছে" ওজরে বিদায় প্রার্থনা করিলাম। নীলা সে রাত্রির সুখ-সন্তোষের জন্য বিবিধ প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। সর্ব্বদা দর্শন দিয়া তাহার শোকময় বিরস দিবসগুলিকে আনন্দপ্রদ করিতে সে বার বার অনুরোধ করিল। আমিও

সময়োচিত বিনয়বাক্যে তাহাকে আপ্যায়িত করিলাম। গোবিন্দ আমার সম্বর্দ্ধনার উদ্দেশ্যে আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল, বাঘা এতক্ষণ আমার পদপ্রান্তে শয়ন করিয়া আনন্দে ক্রীড়া করিতেছিল। গোবিন্দকে উঠিতে দেখিয়া বিরক্তির সহিত গোঙরাইতে লাগিল। আমি তাহাকে শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, "বাঘাকে আজ আমি নিজে বাঁধিয়া যাই, দেখিবেন রাত্রে ও-আর ডাকিয়া বিরক্ত করিবে না।"

আমি তাহাকে পশ্চাৎগামী হইবার সঙ্কেত করিবামাত্র সে আমার অনুগমন করিল। চম্পার শয়ন-কক্ষ আমার সুপরিচিত, তবুও জনৈক পরিচারিকাকে তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য সঙ্গে লইলাম। চম্পা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এইটুকুই তাহার শান্তির সময়। অতি ধীরপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া বাঘাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলাম। কক্ষ পরিত্যাগ করিবার সময় চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; সে যে পশু তাহা বিস্মৃত হইয়া আবেগভরে বলিলাম, "প্রিয় বাঘা, আমার একমাত্র বিশ্বাসী বন্ধু! ধন্য তোর ভালবাসা। সকলেই আমাকে ভুলিয়াছে, ভুলিস নাই কেবল তুই। তোর স্নেহ-ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। কে বলে তুই পশু! তুই মনুষ্যনামধারী অনেক নরপশু হইতে শ্রেষ্ঠ; তোর তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে আমি প্রতারিত করিতে পারি নাই; তোর নিকট আত্মগোপনের আবশ্যকতাও নাই; মনুষ্যও যদি তোর মত হইত, শত বাধা সত্বেও তাহার নিকট আত্ম-কাহিনী বর্ণনা করিতাম, কারণ বিশ্বাসী বন্ধু আত্মার অপেক্ষাও আপনার। তুই শান্ত হ বাঘা, বৃথা রোদনে ফল কি?"

পশু আমার বাক্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। আমার কিন্তু বিশ্বাস আমার আবেগময় কণ্ঠস্বর নিরর্থক হয় নাই; তাহার তাৎকালীন ব্যবহারে আমি তাহাই বুঝিয়াছি। শুনিয়াছি, সে দিন হইতে বাঘা আর রাত্রে চীৎকার করে নাই।

শ্রেষ্ঠি-প্রাসাদ হইতে বিদায়ের কালে নীলা তাহার সেই চির-অভ্যস্ত হৃদয়প্রাণ-বিমোহনকারী তরল হাস্যে অতিথির প্রাণ বিমোহিত করিয়া বিদায় দিল। সে জানে, সে মন্ত্রমাধুর্য্যে আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে স্পর্শ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। একবার অন্তরে সে সময় ভাবিয়াছিলাম, এমন সুন্দরীকে কোন্ প্রাণে দুঃখ দিব! পরক্ষণেই শত বৃশ্চিক হৃদয়ে দংশন করিয়াছিল;—নীলা,—কালসাপিনী,—তাহার বিষ কি তীব্র! সে একবার ভুলিয়াও ত নিঃস্বার্থভাবে আমার প্রতি চাহে নাই; সে কেবল আত্মস্বার্থ রক্ষা করিতেই প্রয়াস পাইয়াছে। তাহার নিকট আমার আদর, তাহার স্বকার্য্য সাধনের জন্য,—আমার সুখের উদ্দেশ্যে নহে,—তাহাকে আবার দয়া!

গোবিন্দ দরজা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আসিল। আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি অশেষ ধন্যবাদের সহিত তাহার অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিলাম! বলিলাম "আপনার ন্যায় বন্ধুর সাহায্যে অদ্য যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিয়াছি; এখন একা একা তাহা পরিপাক করিতে দিন।" বন্ধুজনোচিত হাস্য রহস্যে আপ্যায়িত করিয়া নমস্কার প্রতিনমস্কার অন্তে বিদায় হইলাম। বিদায় হইলাম সত্য, কিন্তু তখন গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। প্রকাশ্য রাজপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আবার শ্রেষ্ঠীপ্রাসাদাভিমুখে ফিরিলাম। সে গৃহের কোন স্থান আমার অজ্ঞাত নহে। আমি জানি, ভৃত্যদিগের গমনাগমনের জন্য গৃহপশ্চাতের একটি ক্ষুদ্র দ্বার অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অনর্গল অবস্থায় থাকে; আমি তাহার ভিতর দিয়া প্রাসাদে পুনঃপ্রবেশ করিলাম। বারান্দার পার্শ্বে লতামণ্ডপের অন্তরালে দাঁড়াইলাম। গোবিন্দ আমার সদ্য-পরিত্যক্ত আসনখানিতে নীলার অতিসন্নিকটে উপবেশন করিয়া আছে। উভয়েই নীরব। কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দ প্রেমিকের ভঙ্গীতে বলিল "সত্যই নীলা, তুমি বড় নিষ্ঠুর। আজ আমাকে কি কষ্ট না দিয়াছ! তোমার মুখে ঐ ধনগর্ব্বিত বৃদ্ধের প্রত্যেকটি প্রশংসা আমার বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছে। তোমার কি বেদনা নাই?"

নীলা হাসিল; বলিল "বল কি গোবিন্দ! সত্য নাকি? আচ্ছা, তুমিই বল ত সে প্রশংসা পাইবার যোগ্য কি না? যেমন ভদ্র, চেহারাটাও তেমনি সুন্দর,—কেবল যদি তাহার চোখের উপর বিশ্রী চশমাটা না থাকিত! দেখ তাহার উপহারে আমাকে কেমন মানাইয়াছে। আমার ইচ্ছা—এমন দুষ্প্রাপ্য জহরত আরও যদি পাইতাম! [illegible]

জানি—তাহার অতুল ভাণ্ডারে এগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে; ইহার উপরে আরও অনেক আছে।"

গোবিন্দ ঈর্ষায় জ্বলিয়া বলিল "ভাল, ভাল! পলিত-কেশ গলিত বৃদ্ধ,—সে তোমাকে সহস্র উপহার দান করিলেই কি তুমি তাহাকে ভাল বাসিবে? তোমার ন্যায় সুন্দরীর পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর নয়! সেও যে তাহা না বুঝে তাহা নয়। শোন নাই কি তাহার রাজ্যছাড়া প্রতিজ্ঞ,—কোন রমণী নিজমুখে প্রণয় ভিক্ষা না করিলে, সে নাকি প্রণয়ের নাম মুখেও আনিবে না।"

নীলা আবার হাসিল। হর্ষ যেন তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী! বলিল, "এই জন্যই ত বলি, তাহার দ্বিতীয় নাই; সকল তাতেই তাহার বিশেষত্ব।"

কতক্ষণ পরে বলিল, "বল ত গোবিন্দ, হেমরাজের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য কি নাই? ইহার চালচলন, ধরণধারণে আজ আমার কতবার হেমের কথা মনে হইয়াছে।"

গোবিন্দ বলিল "আমারও যে হেমের কথা মনে হয় নাই, তা নয়; কিন্তু মানুষে মানুষে সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয়! যেমন এক-আধটু সাদৃশ্য আছে, হেমের সহিত উহার বৈসাদৃশ্যও বিস্তর। আমার মনে হয়, ও এই পরিবারেরই কেহ। হেমের কোন এক কাকা নাকি বিদেশে মারা গিয়াছে, বলিয়া প্রকাশ,—বৃদ্ধ সে নয় ত? সে প্রকৃত সম্বন্ধ স্বীকার করিতেছে না। আর করিলেই বা এতকাল পরে কে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে? মোটের উপর বৃদ্ধ লোক ভাল। সেকেলে লোক; সময়-সময় তাহার ব্যবহারকে অন্যভাবে লইয়া দুঃখ করিয়াছি বটে, কিন্তু এখন বেশ বুঝিয়াছি, বৃদ্ধ হইতে আমাদের কোন অপকারের আশঙ্কা নাই; বরং অমন একটা ধনকুবের আমাদের বন্ধু হইলে সকল দিকেই সুবিধা।"

নীলা আর বাক্যব্যয় না করিয়া গমনোদ্যতা হইল। গোবিন্দ তাহার অনুগমন করিল। আমিও নিশ্চিন্ত মনে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। আমাকে তবে তাহারা সন্দেহ করে নাই; মৃত সমাহিত যে ব্যক্তি তাহার পুনর্জ্জীবন কে কল্পনা করিতে পারে? ভাল, শিকার জালে পড়িয়াছে; এখন তাহাদিগকে লইয়া আমার যদৃচ্ছা খেলা করিবার পালা! (ক্রমশ)

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো, স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি!
তুমি জগৎ-ধাত্রী-রূপা পালন কর পীযূষ দানে,
মমতা তোর মেদুর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে।
পদ্ম তোমার পায়ের অঙ্ক ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে,
কেয়াফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ—নিশাস সে তোর,—হৃদয় বলে।
সাগরে তোর শঙ্খ বাজে—শুনতে যে পাই রাত্রি দিবা,
হিমাচলের তুষার চিরে চক্র তোমার চল্‌ছে কিবা!
দেখ্‌ছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যুতে তোর খড়্গ জ্বলে বজ্রে তোমার ডঙ্কা বাজে।

* * *

অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ্-পা নহিস্ বৈরীকে,
গৌরী তুমি—তৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরিকে!
লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গসাগর মন্থনে,
পারিজাতের ফুল তুমি গো ফুট্‌লে ভারত-নন্দনে;
চন্দনে তোর অঙ্গ-পরশ, হরষ নদী-কল্লোলে,
শ্রাবণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো কেশ দোলে।
শিবানী তুই, তুই করালী, আলেয়া তোর খর্পরে!
শক্র-ভীতি জ্বল্‌ছে চিতা, তুল্‌ছে ফণা সর্প রে!
বাঘিনী তুই বাঘ বাহিনী, গলায় নাগের পৈতা তোর,
চক্ষু জ্বলে—বাড়ব-কুণ্ড—বহ্নি প্রলয়-স্বপ্ন-ভোর;
অভয়া তুই ভয়ঙ্করী, কালো গো তুই আলোর নীড়,
ভূগর্ভে তোর গর্জ্জে কামান টনক নড়ে নাগপতির,
ভৈরবী তুই সুন্দরী তুই কান্তিমতী রাজরাণী,
তুই গো ভীমা, তুই গো শ্যামা, অন্তরে তোর রাজধানী!

* * *

ভাঁটফুলে তোর আগুন ঝাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়,
ভাট-শালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক ধায়,
নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সঙ্গীতে,
অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চের-পুঞ্জিতে।
তোমার চেলী বুন্‌বে ব'লে প্রজাপতি হয় তাঁতী,
বিনি-পশুর পশম তোমায় জোগায় কাপাস দিন রাতি,
পর-গাছা ওই মল্লি-আলী বিনিসুতায় হার গাঁথে,
অশথ-বট আর ছাতিম-পাতার ছায়ার ছাতা তোর মাথে।

তুই যে মহালক্ষ্মীরূপা, তুই যে মণি-কুণ্ডলা,
ইভ-রদে কবরী তোর ছন্ন কানন-কুন্তলা !
ভাণ্ডারে তোর নাইক চাবী, বাইরে সোনা তোর যত,—
মাটিতে তোর সোনা ফলে, কে আছে বল্ তোর মত ?
তোর সোনা সুবর্ণরেখার রেখায় রেখায় থিতিয়ে রয়,
ছুট্‌বে কে পারস্য সাগর ? মুক্তা সে তোর ঝিলেই হয় ;
ঝিলে তোমার মুক্তা ফলে, জলায় ফুলের জল্‌সা রোজ,
তোমার বিলে মাছরাঙা আর মাণিক-জোড়ের নিত্য ভোজ।
তুঁষের ভিতর পীযুষ তোমার জম্‌ছে দানা বাঁধছে গো,
গাছের আগায় জল-রুটি তোর পথিকজনে সাধছে গো।
ধূপ-ছায়া তোর চেলীর আঁচল বুকে পিঠে দিছিস্ বেড়,
গগন-নীলে ভিড়ায় ডানা সান্ত্রী তোমার গগন-ভেড়।
গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর ;
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর।
কিরীট তোমার বিরাট হীরা হিমালয়ের জিম্মাতে,—
তোর কোহিনুর কাড়বে কে বল ? নাগাল না পায় কেউ হাতে
তিস্তা তোমার ঝাঁপ্টা সীঁথি যে দেখেছে সেই জানে,
ডান কানে তোর বাঁকার ঝিলিক্, কর্ণফুলী বাম কানে।
বিশ্ব-বাণীর মৌচাকে তোর চুয়ায় যশের মাক্ষি গো,—
দূর অতীতের কবির গীতি তোর সুদিনের সাক্ষী গো।
নানান্ ভাষা পূর্ণ আজো, বঙ্গ ! তোমার গৌরবে,
ভার্জ্জিল্ এবং শ্রীকালিদাস যোগ দিয়েছেন জয়-রবে।
কহ্লনে তোর শৌর্য্য-বাখান্, বীর্য্য মহাবংশময়,
দেশ বিদেশের কাব্যে জাগে মূর্ত্তি তোমার মৃত্যুঞ্জয়।
যুঝলে তুমি বনের হাতী নদীর গতি বশ ক'রে,
জিৎলে চতুরঙ্গ খেলায় নৌকা-গজে জোর ধ'রে।
শত্রুজয়ের খেল্‌লে গো শত্রুঞ্জ' খেলা উল্লাসে,
কল্লোলে রাজ-তরঙ্গিনী গৌড়-সেনার জয় ভাষে।

* * *

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি ! ছিলে তুমি সুদুর্জ্জয়,
অঞ্জনেরি গিরি তোমার সৈন্যে সবাই করত ভয়,
গঙ্গাহৃদি-বঙ্গ-মুখো ফৌজ আলেক্‌জান্দারী
ঘর-মুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি।
তখনো যে কেউ ভোলেনি সিংহবাহুর বাহুর বল,
তখনো যে কীর্ত্তি খ্যাতি জাগ্‌ছে তোমার আসিংহল,
তখন্ যে তুই সবল স্ববশ স্বাধীন তখন স্ব-তন্ত্র
সাম্রাজ্যেরি স্বর্গ-সিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্দ্র।
ধ্যানে তোমার সে রূপ দেখি' গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ
তিতি আনন্দাশ্রু জলে, ক্ষণেক ভুলি সকল ক্লেশ।

* * *

কলিযুগের তুই অযোধ্যা, দ্বিতীয় রাম তোর বিজয়,—
সাতখানি যে ডিঙা নিয়ে রক্ষোপুরী করলে জয় ;
রাম যা' স্বয়ং পারেন্ নি গো, তা'ও যে দেখি করলে সে—
লঙ্কাপুরীর নাম ভুলিয়ে ছত্র দণ্ড ধরলে সে।
দীঘি, জাঙাল, দেউল, দালান গড়লে দ্বীপের রক্ষী গো,
বঙ্গ ! মহালক্ষ্মীরূপা ! জননী ! রাজলক্ষ্মী গো !
'ইচ্ছামতী' ইচ্ছা তোমার, 'অজয়' তোমার জয় ঘোষে,
'পদ্মা' হৃদয়-পদ্ম মৃণাল সঞ্চারে বল হৃদ্‌কোষে ;
'ডাকাতে' আর 'মেঘনা' তোমায় ডাক্‌ছে মেঘের মন্দ্রে গো,
'ভৈরবে' আর 'দামোদরে' জপ্‌ছে "মাভৈঃ" মন্ত্রে গো ;
রাঢ়ের ময়ূরাক্ষী তুমি, বঙ্গে কপোতাক্ষী তুই,
সাপের ভীতি রমার প্রীতি দুই চোখে তুই সাধিস দুই।

* * *

উৎসাহকর, চাঁদ সদাগর উৎসাহী তোর পুত্র সব,
ঘুচিয়ে দেছে চরিতগুণে বেনে নামের অগৌরব ;
সকল গুণে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে শ্রেষ্ঠী নামটি কিন্‌লে গো,
সাধু হ'ল উপাধি—যাই সাধুত্বে মন জিন্‌লে গো ;
সিন্ধুসাগর, বিন্দুসাগর, লক্ষপতি, শ্রীমন্ত
বঙ্গে আজো জাগিয়ে রাখে লক্ষ্মী-প্রদীপ নিবন্ত।
কামরূপা তুই, কামাখ্যা তুই, দাক্ষায়ণী, দক্ষিণা,
বিশ্বরূপা ! শক্তিরূপা ! নও তুমি নও দীনহীনা !

* * *

চৌরাশী তোর সিদ্ধ সাধক নেপাল ভুটান তিব্বতে,
চীন-জাপানে সিদ্ধি বিলায় লঙ্ঘি' সাগর পর্ব্বতে ;
হাতে তাদের জ্ঞানের মশাল মাথায় সিদ্ধি-বর্ত্তিকা,
সত্য ও সিদ্ধার্থ-দেবের বিলায় মৈত্রী-পত্রিকা।
শিষ্য সেবক ভক্ত এদের হয়নিক লোপ নিঃশেষে,
অনেক দেশের মুগ্ধ চক্ষু নিবদ্ধ সে এই দেশে ;
যেথাই আশা আশার ভাষা জাগছে আবার সেইখানে—
কন্তুতে স্নেহের পদ্মা জাগে জীবন-ধারার জয় গানে।

জাগছে সুপ্ত জাগছে গুপ্ত জাগছে গো অক্ষয় বটে
কবির গানে জ্ঞানীর জ্ঞানে ধ্যান রসিকের ধ্যানপটে।
অশেষ মহাপীঠ গো তোমার আজকে ভুবন উজ্জ্বলে,
অংশ তোমার মার্কিনে আজ, অঙ্গ তোমার ব্রিষ্টলে;
বিশ্ব-বাংলা উঠছে গ'ড়ে জাগছে প্রাণের তীর্থ গো,
জাতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়ছে মোদের চিত্ত গো।
তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশ-মাতৃকা!
দিচ্ছ বুদ্ধি দিচ্ছ গো বল জ্বালিয়ে আঁখির স্থিরশিখা!

* * *

মরণ-কাঠি জীয়ন্-কাঠি দেখছি গো তোর হাতেই দুই,—
ভাঙন দিয়ে ভাঙিস্ আবার পড়িয়ে পলি গড়িস্ তুই;
নদ নদী তোর প্রাণের আবেগ, আবেগ বানের জল রাঙা,
পলি দিয়ে পল্লী গড়িস ভাঙন-তিমির দাঁত ভাঙা;
'গম্' ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গাহৃদি নামটি গো,
গতির ভুখে চলিস্ রুখে, বাংলা! সোনার তুই মৃগ।
গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে আঁকড়েছিস—
বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাকড়েছিস।
সংহিতাতে তোমায় কভু করতে নারে সংহত,
বৌদ্ধ নহিস্ হিন্দু নহিস্ নবীন হওয়া তোর ব্রত;
চির-যুবন-মন্ত্র জানিস্ চির-যুগের রঙ্গিনী!
শিরীষ ফুলে পান-বাটা তোর ফুল্লকদম-অঙ্গিনী!
হেসে কেঁদে সাধিয়ে সেধে চলিস্, মনে রাখিস্ নে,
মনু তোরে মন্দ বলে,—তা তুই গায়ে মাখিস্ নে।
কীর্ত্তিনাশা ফূর্ত্তি তোমার, জানিস্ নে তুই দীর্ঘশোক,
অপ্‌রাজিতা-কুঞ্জে নিতি হাসছে তোমার কাজল চোখ।

* * *

কে বলে রে নেই কিছু তোর? নেইক সাক্ষী গৌরবের?
কে বলে নেই হাওয়ায় নিশান পারিজাতের সৌরভের?
চোখ আছে যার দেখছে সে জন, অন্ধজনে দেখবে কি?
উষার আগে আলোর আভাস সকল চোখে ঠেক্‌বে কি?
যে জানে সে হিয়ায় জানে, জানে আপন চিত্তে গো,
জানে প্রাণের গভীর ধ্যানে নও যে তুমি মিথ্যে গো।
আছ তুমি, থাক্‌বে তুমি, জগৎ জুড়ে জাগবে যশ,
উথলে ফিরে উঠবে গো তোর তাম্র-মধুর প্রাণের রস;
গরুড়ধ্বজে উষার নিশাস লাগছে ফিরে লাগছে গো,
বিনতা তোর নতির নীড়ে গরুড় বুঝি জাগছে গো!
জাগছে গানে গানের তানে প্রাণের প্রবল আনন্দে,
জাগছে জ্ঞানে আলোর পানে মেল্‌ছে পাখা সুমন্দে,
জাগছে ত্যাগে জাগছে ভোগে জাগছে দানের গৌরবে,
আশার সুসার জাগছে উষার স্বর্ণকেশের সৌরভে।
ধাত্রী! তোমায় দেখছি আমি—দেখছি জগৎ-ধাত্রী-বেশ,
জয়-গানে তোর প্রাণ ঢেলে মোর গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ফাল্গুনী

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছলিক বলে একরকম গীতাভিনয় হ'ত, সেই অভিনয়ে অভিনেতা আপন মনের কোনও গূঢ় অভিপ্রায়, অভিনয় ও গানের আছিলায় প্রকাশ করত, নাচ ও গান ছিল তার প্রধান অঙ্গ, পাত্রপাত্রীর চরিত্র সমাবেশের বাহুল্য তাতে কোনও স্থান পেত না। কাব্য-রসের মধ্য দিয়ে অভিনেতার কোনও ইঙ্গিত যাতে সূক্ষ্ম ভাবে ফুটে উঠ্‌তে পারে—এই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।

ফাল্গুনীকেও আমরা একরকমের নূতন ধরণের ছলিক বল্‌তে পারি। তবে এতে কোনও ব্যক্তিগত ইঙ্গিত নেই। সমস্ত জগতের লীলা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে যে ইঙ্গিতটি যুগ-যুগান্তর ধরে নিত্য নব ভাবে ফুটে উঠ্‌ছে, সেইটিই হচ্ছে এই ছলিকের ভিতরকার কথা। গ্রীষ্মের রুদ্র নিশ্বাসের প্রবল ঘূর্ণিতে যখন দিক্‌বিদিক্ থেকে যেন একটা চিতা-ভস্মের কুহেলিকা টেনে এনে আকাশের মণিঝলসিত দেহ-খানিকে ধূসরিত করে দেয়, তখনই দেখতে পাই যে মেঘের শ্যামল জটাভার থেকে স্বর্গমন্দাকিনীর ধারাকে উন্মুক্ত করে মহাযোগী আর-এক নূতন মূর্ত্তিতে সম্মুখে উপস্থিত। শ্মশা-নের ছাই পথের ধূলো কোথায় উড়ে গেছে, কোথায় গেছে সেই নীল আকাশের নিরালম্ব নগ্নতা। মেঘের কৃত্তিবাস পরে সৌদামিনী গৌরীকে উৎসঙ্গে নিয়ে দিগন্তব্যাপী মৃদঙ্গনিনাদের মধ্যে এ আর এক নূতন অভিনয়। দেখতে দেখতে আবার পট পরিবর্ত্তন হল, চারিপাশে কাশের চামর

ফুলে উঠেচে, কৃত্তিবাসের সে মেঘবাস আর নাই, এখন তাঁর শুভ্রজ্যোৎস্না-দুকূলের রাজবেশ। শিউলি ফুলের খই ছড়িয়ে তাঁর অভ্যর্থনা আরম্ভ হয়েছে। আবার দেখতে দেখতেই বানপ্রস্থের সময় এসে পড়ল, পৃথিবী যেন একটা জীর্ণতা ও ভঙ্গুরতায় একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ল। আর সেই সঙ্গেই দেখি যে আমের মুকুলের মুকুট পরে, কোকিল ও মধুকরের স্তুতিগানের মধ্যে মহারাজের আবার নূতন করে যৌবরাজ্যের অভিষেক আরম্ভ হয়ে গেছে। এমনি করে ঋতুর পর ঋতুর যে খেলা চিরকাল থেকে চলে আসচে, তার থেকে আমরা রূপের বিকাশকে কেবলি দেখতে থাকি রূপান্তরের মধ্যে। যাকে একদিক থেকে দেখি হারানো, তাকেই অপর দিক থেকে দেখি পাওয়া। পাওয়ার আরম্ভেই হারানো উপস্থিত হয়, আবার সেই হারানোর পরিসমাপ্তিতেই পাওয়ার সম্পূর্ণতা। বসন্তের গুপ্ত আবির্ভাবের নামই শীত। পুরোনোকে যে আমরা হারাই, নূতনকে যে আমরা পাই, এ দুটা একই সৃষ্টি-নৃত্যের দুইপদবিক্ষেপ। কিন্তু মোহবশত রূপের প্রকাশ, রূপের লয় ও রূপান্তরের উদয় এ তিনকে আমরা কোনও একটা প্রাণক্রিয়ার মধ্যে এক করে দেখি না বলেই রূপ ও তার ধ্বংসটুকুই আমাদের চোখে পড়ে; বিলয়ের মধ্যে দিয়ে যে বিকাশেরই কাজ চলচে, এ কথা আমরা বুঝতে পারি না। সমস্ত প্রকৃতির প্রতিদিনের পরিণামের মধ্যে এই যে ইঙ্গিতটি জেগে উঠ্‌ছে যে পুরোনোর ভিতর দিয়ে হারিয়ে ফেলেই আমরা নূতনকে নূতন করে পেয়ে থাকি; এই কথাটিই ফাল্গুনীর বসন্তরাগিণীর তারে তারে রী রী করে বাজ্‌চে। অনেকদিন পূর্ব্বে কবি একবার জন্ম ও মৃত্যুর দেওয়া-নেওয়ার লুকোচুরি প্রত্যক্ষ করে বলেছিলেন

চিরকাল একি লীলা গো
অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল।
দুলিছ গো দোলা দিতেছ!
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি!
সমুখে যেমন পিছেও তেমন
মিছে করি মোরা গোল,
চিরকাল একই লীলা গো
অনন্ত কলরোল।

এই জন্মমৃত্যুর সমস্যা কবি ব্রাউনিংএর সাম্‌নেও এসেছিল। এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে ইহজন্মের জরা বার্দ্ধক্য মৃত্যু প্রভৃতি অপূর্ণতা দ্বারা আমরা এইটুকু অনুমান করতে পারি যে পরলোকে আমাদের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন অপেক্ষা করে রয়েছে, সেইখানে আমাদের জীবনতন্ত্রীর সমস্ত ভাঙাসুর একত্র হয়ে একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীতের সৃষ্টি করবে। কাজেই জরা ও মৃত্যু হচ্ছে আমাদের পরিপূর্ণতার সূচনা। কিন্তু সে পূর্ণতার স্থান এখানে নয়, ভবিষ্যতের অজ্ঞাত স্বর্গরাজ্যে। La Saisiaz কবিতায় এ বিষয়ে তিনি খুব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন কিন্তু Rabbi Ben Ezra, Deaf and Dumb, Abt Vogler প্রভৃতি নানা কবিতায় এর আভাস পাওয়া যায়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ Abt Vogler থেকে এক্‌টা শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

And what is our failure here but a triumph's evidence.
For the fullness of the days? Have we withered or agonised?
Why else was the pause prolonged but that singing might issue thence?
Why rushed the discords in but that harmony should be prized?
Sorrow is hard to bear and doubt is slow to clear,
Each sufferer says his say, his scheme of the weal and woe;
But God has a few of us whom he whispers in the ear;
The rest may reason and welcome: 'tis we musicians know.

সংসারের ব্যর্থতাই বহে সার্থকতা,
জীর্ণতাই পূর্ণতার এনেছে বারতা।
তানে কেন মাঝে মাঝে দীর্ঘচ্ছেদ আসে,
আবার ভরিবে বলে সঙ্গীত-উচ্ছ্বাসে।
ক্ষণে ক্ষণে ছুটে আসে কঠোর বেসুর,
সুরের মাধুরী আরো করে সুমধুর।
কত যে সংশয়জাল, বেদনার ক্ষত,
সংসারের ব্যাখ্যা তারা করে কতমত।
আছে কোনো ভাগ্যবান শোনে দৈববাণী,
কেহ তর্ক করে, মোরা গান গেয়ে জানি।

আবার La Saisiazএও দেখতে পাই

Only grant a second life, I acquiesce
In this present life as failure, count misfortune's worst assaults
Triumph, not defeat, assured that loss so much the more exalts

Gain about to be. For at what moment did I so advance
Near to knowledge as when frustrate of escape from ignorance ?
Did not beauty prove most precious when its opposite obtained
Rule, and truth seem more than ever potent because falsehood reigned ?
While for love—Oh how, but losing love, does whoso loves succeed
By the death-pang to the birth throe—learning what is love indeed ?

জন্মান্তর আছে সত্য লহ যদি মানি
এজন্মের বিফলতা লবঁ শিরে ধরি।
জয় বলে মেনে নেব দুঃখের আঘাত,
ক্ষতিরে জানিব লাভ। যখন অজ্ঞান
পথ রোধ করে, তখনি নিশ্চয় জানি
এসেছি জ্ঞানের দ্বারে। সৌন্দর্য্যের মূল্য বুঝি
কদর্য্যের নিকষে কষিয়া। মিথ্যা যবে
রাজা হয়, সত্যের প্রভাব উঠে ফুটি।
পরাভূত প্রেমেও যে পায় বাঞ্ছিতেরে,
মৃত্যুবেদনায় জানে প্রসববেদনা,
সেই ত পেয়েছে সত্য প্রেমের সন্ধান।

রবীন্দ্রবাবুর পূর্ব্বের লেখার মধ্যেও এই রকমের একটা সংশয়ের ছায়া মধ্যে মধ্যে দেখা যায় :—

হেথায় যে অসম্পূর্ণ সহস্র আঘাতে চূর্ণ বিদীর্ণ বিকৃত,
কোথাও কি একবার সম্পূর্ণতা আছে তার জীবিত কি মৃত ;
জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন ছিন্ন ছড়াছড়ি,
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি অর্থপূর্ণ করি ?
হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময় অনিত্য চঞ্চল,
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব্ব নূতন রূপে হয় সে সকল ;
চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তর-নবপ্রাতে সে হয়ত আপনাতে পেয়েছে উত্তর।

উপনিষদে দেখা যায় যে নচিকেতাও যমকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন আর তিনি তার উত্তর দিয়াছিলেন যে জন্মমৃত্যু কল্পনা মাত্র, একমাত্র সত্ত্ব-স্বরূপ ব্রহ্মই সত্যবস্তু। রবীন্দ্রবাবু কিন্তু এ সমস্ত এড়িয়ে যে জায়গা থেকে উত্তর দিতে চেয়েছেন তাতে দেখা যায় যে তিনি ব্রাউনিংএর মতন এই জীবনের অপূর্ণতা থেকে অন্য এক জগতে পরিপূর্ণ সমাপ্তির বার্ত্তা পেয়েছেন এমন কথা বলেন নি, এবং বেদান্তের মত সমস্ত অপূর্ণতাকে তুচ্ছ ও অসত্য বলেন নি। ছবির মধ্যে যেমন ছায়া-পরম্পরার, ভিতর দিয়ে আলোর নব নব বর্ণবিকাশ ঘটে থাকে তেম্‌নি জরার ভিতর দিয়ে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে সমস্ত প্রকৃতির এবং মানুষের যৌবনের নব নব অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে এ কথাটা বোঝা একটু শক্ত হয়; প্রকৃতির পক্ষে যদিও আমরা বুঝতে পারি যে জরার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি তাঁর যৌবনের বসন্তোৎসব নিত্য নবভাবে উপভোগ করে থাকেন এবং এই বিচিত্র উপভোগের ও বিকাশের লীলাতেই ঋতুপর্য্যায়ের সৃষ্টি, তথাপি মানুষ যে কেমন করে জরার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপনার যৌবনকে প্রতিবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে নূতন করে নিতে পারে এ কথা বোঝা আমাদের পক্ষে একটু কঠিন। মানুষের দেহটা একেবারে ছাই হয়ে যায়, কাজেই তার যে আবার পুনরুত্থান হতে পারে তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। আর যদি বা পারি হয়ত জন্মান্তরবাদের রূপক আশ্রয় করে করতে হয়। কিন্তু প্রকৃতির এই শীতবসন্তের লীলা-প্রচার'কে যদি কোনও তরুলতার সঙ্গে পৃথক্ করে না দেখে সমস্ত তরুলতাকে নিয়ে পৃথিবীব্যেপে একই রমণীয়া প্রকৃতিসুন্দরীকে সজীবভাবে দেখ্‌তে শিখি, তা হলেই বুঝতে পারব যে প্রতিশীতের মধ্য দিয়ে তিনিই তাঁর যৌবনকে নব-নবভাবে প্রস্ফুটিত করে উপভোগ কর্‌চেন! তাতে পৃথক্ ভাবে কোনও বৃক্ষের বা লতার কোনও বিশেষ দাবী নেই ; তাদের মধ্যে আমরা যে পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য করতে পারি, সেটা একটা সমষ্টিভূত প্রাণশক্তির ব্যষ্টিগত প্রকাশ। তরু লতা জল স্থল আকাশ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র এই সমস্ত নিয়েই প্রকৃতির দেহ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে কোনওটিরই এঁর থেকে স্বতন্ত্র ভাবে কোনও প্রাণ নেই ; এরা সব তাঁরই অবয়বের মতন, তাঁরই প্রাণের ছটায় এরা প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে। প্রতি বসন্তে এই প্রকৃতিসুন্দরীরই নবযৌবন ফুটে উঠছে।

সমস্ত মানুষকে নিয়েও যদি আমরা এমনি করে একটা বিরাট্ প্রাণশক্তির বিপুল চেতনার সন্ধান করি ; যদি মানুষকে ব্যক্তিগত ভাবে না দেখে, সমস্ত মানুষকে ব্যেপে যে একটা চৈতন্য পর্য্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, তাকে আমরা দেখতে চেষ্টা করি ; তবে বুঝব যে শতদল পদ্মের যেমন সমস্ত দলগুলির বিকাশ নিয়ে একটি পদ্মের অখণ্ড বিকাশ, তেমনি সমস্ত মানুষকে নিয়ে বিশ্বের চিৎপদ্মের একটা অখণ্ড বিকাশ চল্‌ছে। সমষ্টিকে বাদ দিয়ে যখন খণ্ডভাবে ব্যক্তি হিসাবে আমরা এই ব্যাপারটিকে তথ্য সম্বন্ধে বিচার কর্‌তে যাই তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে মিল বা সামঞ্জস্য

রাখতে পারি না। দেখি যে জরা-মৃত্যুর এক একটা প্রকাণ্ড বিশ্বগ্রাসী গহ্বর, একের থেকে অপরকে একেবারে তফাৎ করে রেখেছে। কিন্তু সমস্ত প্রাণপর্য্যায়কে যদি একই প্রাণের বিকাশ বলে বুঝতে পারি, তবে আর তাদের ব্যক্তিগত জরামৃত্যুর ছায়া এসে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। একটা মানবপর্য্যায়ের মৃত্যুর পর নূতন পর্য্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়, আবার তাদের মৃত্যুর পর আর এক পর্য্যায় আসে, এম্‌নি করে পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ের নব নব ধারা চল্‌তে থাকে, কোথাও এর বিরাম নেই। জড় প্রকৃতির মত চেতন প্রকৃতির মধ্যেও শীতবসন্তের ঋতুলীলা চল্‌ছে। নূতন জ্ঞান নূতন আশা নূতন আদর্শের রঙ্গীন পতাকা উড়িয়ে নবযৌবন এসে উপস্থিত হয়, আবার যেই সেটা জরার রুক্ষ বাতাসে মলিন হয়ে আসে অমনি মানুষ মৃত্যুর মানস-সরোবরে স্নান করে চ্যবন ঋষির মত তার যৌবনকে নূতন করে নেয়। কবি তাঁর একখানা অপ্রকাশিত চিঠিতে লিখেছেন—"জীবনটা অমর বলেই তাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারে বারে নবীন করে নিতে হয়। পৃথিবীতে জরাটা হচ্ছে পিছনের দিক্, ওর সামনের দিক্‌টা যৌবন। এই জন্য জগতে চারিদিকে যৌবনটাকে দেখচি, জরাটা চলে চলে যাচ্ছে। তাকে এই দেখচি তার পরক্ষণেই দেখচিনে। যেই শীতে সমস্ত ঝরে পড়ল অমনি দেখলুম শীত নেই; বসন্ত এসে সমস্ত পূর্ণ করে বসেচে। তার থেকেই বুঝতে পারি আমাদের জরা নবতর যৌবনের বাহন। পুরাতন আপনাকেই পুনঃ পুনঃ করে পেতে চায়, এই জন্য সে নিজেকে পুনঃ পুনঃ হারায়,—হারিয়ে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে সে যদি না চলে তা হলে পুরাতন আর নূতন হয় না—আমাদের প্রাণকে নূতন ভাবে উপলব্ধি করতে হবে বলেই আমরা মরি।" এম্‌নি করে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবন আপনাকে নব নব ভাবে প্রতিষ্ঠিত করচে। এই ক্রিয়াত্মিক পরিণাম-ব্যাপারের মধ্যেই মানুষ বাস্তবিক হিসাবে অমর; হেগেলের ভাষায় বলতে গেলে একেই Dialectic movement of life কিম্বা Non-beingএর মধ্য দিয়ে Beingএর নিত্যনবীভাব বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তত্ত্ব-বিদ্যানিপুণ ব্যক্তিরা জানেন দার্শনিকেরা কত চিন্তা কত ক'রে পরিণামবাদের এই গূঢ় সূত্রটিকে ধরতে পেরেছেন; কিন্তু কবি তর্ক-চক্ষুতে দেখেন না। নীতি-শাস্ত্রে লেখে যে

> গাবঃ পশ্যন্তি ঘ্রাণেন বেদৈঃ পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
> চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ চক্ষুর্ভ্যাম্ ইতরে জনাঃ॥
>
> ঘ্রাণ দিয়ে দেখে পশু, বেদ-দৃষ্টি পণ্ডিতগণের,
> চর-চক্ষু রাজাদের, চর্ম্মচক্ষু ইতর জনের।

কবি এর কোনটি দিয়েই দেখেন না, তিনি দেখেন তাঁর হৃদয় দিয়ে। দর্শনের ভিতর দিয়ে জিনিষটাকে পরোক্ষভাবে দেখা যায়, তাই সেখানে তর্কযুদ্ধের হাঁ না চালানো যায়, কিন্তু ফাল্গুনীর বাউলের মতন কবি তাঁর সমস্ত শরীর ও হৃদয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন, কাজেই তাঁর অনুভূতির উপর যতই তর্কের তলোয়ার চালাওনা কেন কোনও আঁচড় লাগতে পারে না।

ফাল্গুনী নাটকে দুটি অংশ আছে—প্রথমটি হচ্ছে গীতি-কলা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে নাট্যকলা। একটিতে আছে প্রকৃতির কথা, আর একটিতে মানুষের। কাব্য-সংসারের অপূর্ব্ব প্রজাপতি রবীন্দ্রনাথ, উভয়কে পাশাপাশি বসিয়ে, তাদের নিগূঢ় মর্ম্মকথার মধ্যে যে একটি সুগভীর উপমা নিহিত রয়েছে সেইটুকু অভিব্যঞ্জিত করেছেন।

ফাল্গুনের কাননে কবি বেরিয়ে পড়ে দেখলেন, বেণু-বনে দখিন হাওয়ার দোলোৎসব, পাখীরা আকাশে গানের আবির হান্‌চে; চাঁপাগাছের প্রাণের চঞ্চলতা তার পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে ফেটে বেরিয়েচে; দুরন্ত বসন্তের দূতেরা এসে জলস্থল আকাশের ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্যে বিষম উৎপাত বাধিয়ে দিয়েচে; শীত তার জীর্ণ কাঁথা গায়ে দিয়ে বিদায় নেবার পথে যমের দক্ষিণ দুয়ারের মুখে চলেছিল; কিন্তু তাকেও এরা ছাড়বে না; তার বেশ বদল করে তাকেও এরা খেলার সাথী করে তুল্‌বে।

সমস্ত ভুবনব্যেপে নবীনের জয়ধ্বনি উঠল; বকুল পারুল আমের মুকুল কামিনীফুল এমন কি সিমুল পর্য্যন্ত নানা রঙের বরণডালা নিয়ে হুলু দিতে লেগে গেল। যে বসন্ত বারে বারে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল সে আবার নূতন হয়ে ফিরে এসেছে। শীতের ভিতরে যে বসন্ত লুকানো ছিল তার আজ ছদ্মবেশ কিছুতে টিঁকল না। যৌবনের কাছে তাকে হার মান্‌তে হল, মৃত্যুর কুঁড়িকে বিদীর্ণ করে তার অমৃত ফুটে উঠল। চারিদিকে একেবারে আনন্দরূপমমৃতং।

এই ছোট গীতনাট্যটির ভিতর দিয়ে সমস্ত প্রকৃতির একটি গূঢ়মর্ম্মকথা ব্যক্ত হয়ে উঠচে। বসন্তের মধ্যেই শীতের পরিণতি। শীতে বসন্তে সত্য পরিচয় হবামাত্র তারা পরস্পর দেখতে পায় তারা একাত্মা। বিরোধ ঘটল বলেই তাদের মিলন ঘটল। ব্রাউনিংএর সঙ্গে আমাদের রবীন্দ্রনাথের এইখানে একটু তফাৎ আছে।

রবীন্দ্রনাথ বল্‌চেন মৃত্যুকে নিয়েই অমৃত; তাই উভয়ে একত্রে অনন্তের পরিণাম-লীলা সম্পন্ন করুচে। তাই অমৃতের জন্য আমাদের লোকান্তরের সন্ধানে বেরুতে হবে না। তাই ব্রাউনিংএর মত রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পরে অমৃতকে আশা করচেন না, তিনি মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌চেন।

এই ত গেল ফাল্গুনীর গীতিকলা। তারপরে তার নাট্য-কলা। শিল্পে, সাহিত্যে, সমাজে, চারিদিকে মানুষের যৌবন যেমন উন্মেষিত হয়ে ওঠে, তেমনি আমরা দেখতে পাই যে ফাল্গুনীর নাট্যাংশে কতকগুলি লোক বসন্ত-সমাগমে উৎসবময় হয়েছে। সে উৎসব অনিমিত্ত উৎসব, খেলার উৎসব জীবনের উৎসব আনন্দের উৎসব। তার কোনও হেতু নেই তাই তার কোনও বাঁধনও নেই, সে সব করতে পারে, কোথাও তাকে ঠেকিয়ে রাখবার জো নেই। যে যৌবনের জীবনীশক্তি মানুষের মানববৃত্তিকে চারিদিকে উৎসবময় করে তোলে, সর্দ্দারকে দেখে পুনঃ পুনঃ আমাদের সেই কথা মনে হয়। মানবের বহুমুখি বিবিধ উদ্যোগের মধ্যে তার যৌবন উচ্ছ্বসিত হয়ে চিরকাল ধরে তাকে বার্দ্ধক্যের দিকে নিয়ে আসে। সকলেই এই বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুকেই ভয় করে, অথচ সকলেই তার খোঁজ করুচে। কে গো ঐ জরা মৃত্যু! কে সেই, "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।" নচিকেতা একবার তাকে মৃত্যুর বাড়ী গিয়ে খোঁজ করেছিল, আর সমস্ত সংসারের যৌবন আজও সেই খোঁজে চলেছে।

এই কথাটি ৪টি অংশে বিবৃত। (১) সূত্রপাত (২) সন্ধান (৩) সন্দেহ (৪) সমাপ্তি। "সন্দেহে"র মধ্যে এই অনিমিত্ত সন্ধানের ভিতরেও জরামৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের চিরন্তন সন্দেহটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সমাপ্তির মধ্যে, বাউলের উপদেশ-মতে চলতে চলতে চন্দ্রহাস গিয়ে মৃত্যুগুহার মধ্যে প্রবেশ করে' সেই অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে এই জগতের সেই চিরবার্দ্ধক্যকে ধরে ফেল্লে, যেই ধরলে অমনি দেখতে পেলে তিনি বালক, শুধু বালক নয় যাঁর প্রেরণায় তারা এই সন্ধানে বেরিয়েছে, তিনি হচ্ছেন সেই সর্দ্দার। যে যৌবন সমস্ত প্রাণনার মূল, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে পুনঃ পুনঃ সেই যৌবনই ফিরে ফিরে আসচে। তাই মানুষের সকল বৃত্তির মধ্যে সব সময়ই দেখতে পাই যে যৌবন খেল্‌চে, মুহূর্ত্তের জন্য যে আচ্ছিন্ন হ'য়ে আসে সেটা পটান্তরের বিশ্রাম মাত্র। পাব বলেই আমরা হারাই, এবং হারানোর মধ্য দিয়েই পাই।

প্রকৃতির ও মানুষের ভিতরকার গূঢ় মর্ম্মকথাটি একটি উপমার মধ্যে ব্যক্ত করবার জন্য গীতিনাট্যটির পাশে নাট্যটি বসান হয়েছে। এই ছলটুকু থেকেই বুঝতে পারি যে প্রকৃতির ভিতর থেকেই কবির কাছে বিশ্বের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, সে জন্য কোনও পুঁথি ঘাঁটবার দরকার হয় না।

কবি তরুলতার ভাষা জানেন, পশুপক্ষীর ভাষা জানেন; তাই বেণুবন থেকে ফুলন্ত গাছ থেকে পাখীর নীড় থেকে অবিরত যে অনাহত বীণাটি বেজে উঠ্‌ছে, সেটা তিনি বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন, এবং সেই অনুসারে নিজের মনের তারটিও বাঁধতে পারেন। শাস্ত্রে লেখা আছে এই পৃথিবীর সৃষ্টিস্থিতিলয় নিয়ে ব্রহ্মের লীলা চল্‌ছে। লীলা মানে খেলা। আমরা তা না বুঝে যতই যুক্তিতর্কের জাল বুনে এই খেলার রহস্যকে ধরুতে চেষ্টা করি, ততই ধরুতে পারি না, শ্রান্ত হয়ে ফিরে আসি। কারণ খেলার এক-মাত্র উপায় হচ্ছে খেলায় যোগ দেওয়া। যতই খেলার তত্ত্ব নিয়ে বুদ্ধির আন্দোলন করি, খেলাটা ততই দুরূহ হয়ে ওঠে। খেলা মানেই হচ্ছে প্রাণের অনিমিত্ত স্ফূর্ত্তি; যতই একটা কল্পিত নিমিত্তের মধ্যে তাকে বাঁধতে চেষ্টা করি ততই সেটা ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। নাট্যাংশের দাদাটি রাশিকৃত পুঁথি মগজে পুরে নিয়ে তাঁর প্রয়োজনের বাস্তবতা দিয়ে প্রকৃতি ও কাব্যকে বাঁধতে চেষ্টা করে-ছিলেন; তিনি বংশীধ্বনিতে বেণুর কোনও সার্থকতা দেখতে পান না, আকাশের অগণ্য নক্ষত্র-জ্যোতির মধ্যে তিনি কোনও আবশ্যকতা খুঁজে পান না, এই জন্যই খেলার Holy questএ তিনি যোগ দিতে পারেন্‌নি।

সমস্ত ফাল্গুনীটার হাওয়া থেকে, এই সুরটা বেরুচ্ছে, যে জগতের ভিতরকার কথাটি যদি কেউ জান্‌তে চায় ত সে কেবলমাত্র খেলার সঙ্গে যোগ দিয়েই জান্‌তে পারে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। কোনও তত্ত্বচিন্তার কূটজালে প্রবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই, কোনও দার্শনিক কল্পনার মাপকাঠি ব্যবহার কর্‌তে চেষ্টা কোরোনা, শুধু জগতের মধ্যে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর যে একটি আনন্দলীলা চলেছে, বাউলের মতন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাকে স্পর্শ কর, পুঁথির চোখটাকে, তর্কের চোখটাকে একেবারে কাণা করে দাও; সমস্ত প্রাণ দিয়ে বিশ্বকে আলিঙ্গন কর, তা হলেই দেখ্‌তে পাবে যে অন্তরে বাহিরে দুই যন্ত্রে একই সঙ্গীত উঠ্‌চে; সেই সঙ্গীত যতই তোমার মনকে স্পর্শ কর্‌বে ততই তোমার বিশ্বখেলায় যোগদান করা সার্থক হবে। ইতিপূর্ব্বে কোনও কবি জগতের রহস্যটিকে ধরবার এমন সুন্দর উপায় এত পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করেছেন বলে আমি জানি না। ব্রাউনিং এই দিক্‌টা একটু আধটু ইসারা করেছেন; Abt Vogler থেকে যে শ্লোকটি আমরা তুলেছি তার মধ্যে "We musicians know" এই কথাটির ভিতরও তার পরিচয় পাওয়া যায়।

দর্শনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে বর্ত্তমান ফরাসী মনীষী ব্যার্গসঁ ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে তাঁর Intuition Theory বা অনুভূতিবাদকে স্থাপন করবার চেষ্টা করেচেন। তিনিও সমস্ত প্রমাণের মূলগুলি সমালোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন, যে, তর্ক ও অনুমানের দ্বারা জগতের তথ্যকে ধরা যায় না; সত্যের মধ্যে অনবরত যে স্পন্দন-খেলা চল্‌ছে, তাকে সেখান থেকে টেনে এনে দেখাবার কোনও উপায় নেই, দেখতে হয় ত সেইখানে তাকে স্পর্শ কর্‌তে হবে, যুক্তি-প্রয়োজনের দাদাগিরিতে চলবে না। তাই তিনি Metaphysics-এর লক্ষণ দিয়েছেন—Metaphysics is the science which claims to dispense with symbols (তাকেই তত্ত্ব-বিদ্যা বলা যাবে যাতে তর্কশাস্ত্রের কোনও সংজ্ঞা ব্যবহার করা চল্‌বে না) আর Intuition বা অনুভূতির লক্ষণ দিয়েছেন—By intuition is meant the kind of intellectual sympathy by which one places oneself without an object in order to coincide with what is unique in it and consequently inexpressible (মনের যে সহচার বৃত্তি দ্বারা আমরা কোনও বস্তুর তদ্গত বিশিষ্ট অনির্বচনীয় সত্তার মধ্যে আমাদিগকে মিশাইয়া লইতে পারি, তাহাকেই Intuition বা অনুভূতি বলা যায়।)

মূলের চেয়ে আমার প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে চলেছে, তাই এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বল্‌ব না, শুধু পরিশেষে পাঠক-দিগকে এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে, আমরা ফাল্গুনী থেকে যে অর্থগুলি টেনে বার কর্‌তে চেষ্টা করলুম সে সমস্তই এতে আছে, অথচ এটা রূপক নয়, উপদেশাবলিও নয়। সাধারণ নাটকে যেমন চরিত্র ও দৈবের (character and accident) গাঢ় সংমিশ্রণ থাকে, এতে তা নেই, কাজেই সে রকম নাটক হিসাবে এর কোনও জায়গা নেই, এবং সেজন্যে এটা লেখাও হয় নি। অথচ কাব্যহিসাবে এর স্থান অত্যন্ত উঁচুতে; কারণ, অভিধা বা সোজা কথায় কিছুই বলবার চেষ্টা করা হয় নি। এর একদিকে যেমন গানে গানে একটা উচ্ছল আনন্দ-রস ধ্বনিত হয়ে উঠেছে অপরদিকে তেমনি যে কথাগুলি আমরা বল্‌লাম সেইগুলি নিয়ে একটা বস্তুধ্বনিও যুগপৎ ভেসে উঠেছে, কিন্তু কোনওটাকে কোনওটা থেকে পৃথক্ করা যায় না, অথচ যেন ফুলের গন্ধের মতন এরা গায়ে গায়ে জড়িয়ে রয়েছে। অভিধার অতিসূক্ষ্ম তারের উপর সমস্ত রাগরাগিণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। শীতের মধ্যে দিয়ে বসন্তের আগমন হচ্ছে এর উপাখ্যান-ভাগ বা Mythopœic process; এই ব্যাপারটার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করে আমাদের জীবনকে যে নূতন ঢঙে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে, সেইটি হচ্ছে এখানকার "সমালোচন" বা objective criticism of life; এবং এই সমালোচনের ফলে জীবনপ্রবাহের মধ্যে জরা-যৌবনের যে গূঢ় কথাটি ধ্বনিত হয়েছে, সেটি হচ্ছে, ব্যঞ্জনফল ধ্বনি বা Crowning transfiguration। সমস্ত ব্যাপারটিকে সংযম অসংযমের মাঝখানে রেখে এমন করে ধরা হয়েছে, যে, এতে যে কোনও কথা বলা হবে, এমন আড়ম্বরের চিহ্নমাত্রও নেই, সমস্ত নাটকখানিই যেন একটি

ফাল্গুনের বসন্তোৎসব ; যেন হঠাৎ কবির হৃদয়ের মধ্য থেকে পরভৃতিকা গান গেয়ে উঠেছে—

আতাম্ব হরি অপাঙর জীবিঅ সব্বস্‌স মহুমাসস্‌স।
দিট্টোসি চূদঙ্কুরো তুমং পমাদেমি॥

বিশ্বনাথের খেয়াল ও কবির খেয়ালে মিলে একটি অপূর্ব্ব খেলার সৃষ্টি করেছে, আর অভিনেতৃবর্গের পায়ের নূপুরের সঙ্গে সঙ্গে একটি নব জীবন নবীন আশার বাণী উঠচে—

জীবনে যত পূজা
হল না সারা
জানি হে জানি তাও
হয়-নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে
হারাল ধারা।
জানি হে জানি তাও
হয়নি হারা।
জীবনে আজো যারা
রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও
হয়নি মিছে।
আমার অনাগত
আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে
বাজিছে তারা
জানি হে জানি তাও
হয়নি হারা॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

আলোচনা

তত্ত্বানুসন্ধানে প্রমাণের ভার।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয়ের সুলিখিত আলোচনা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। প্রথমতঃ যে bias সকল অনুসন্ধানের পথের বাধা, তিনি তাহা পরিহার করিতে বলিয়াছেন, এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার বিচার-পদ্ধতিতে বিতণ্ডা তুলিবার ভাব নাই। এইরূপ আলোচনায় অনেক উপকার হইবে মনে করিয়া এই প্রবন্ধে আর-একটি কথার আলোচনা উপস্থাপিত করিতেছি।

যে শ্রেণীর তর্কে 'রণ-জয়'-ই উদ্দেশ্য সেখানে প্রমাণের ভার কাহার উপর, এ কথা লইয়া তর্ক করা চলে। সত্য অনুসন্ধানের সময়ে ঐ তর্ক যে অনেক সময়ে উঠিতে পারে না, তাহা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। আমাদের পূর্ব্ব-বিচারিত বিষয়ের দৃষ্টান্তেই সে কথা বলিতেছি।

দেখা গেল, বেদ সংহিতাদিতে যে ভাব পাওয়া যায় না, তাহাই অন্যত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ স্থলে এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হইবে না, যে বৈদিক সাহিত্যের যাহা লুপ্ত হইয়াছে তাহাতে ঠিক ঐরূপ কোন ভাব ছিল। পরের নিকট ধার করিয়াই হোক অথবা কালবশের নূতন উন্নতিতেই হোক, নূতন ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে মনে করিতে হইবে। বৈদিক মন্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া যে-সকল বিধি রচিত এবং অনুষ্ঠিত হইত, তাহাতে বেদের বাহিরের কোন জিনিষ সহসা স্থান লাভ করিতে পারিত না; বাঁধাবাঁধি নিয়মে ঐরূপই হইয়া থাকে। কোন একটা বিশেষ School বা বিদ্যাবংশে নূতন তত্ত্ব বড় উদ্ভাবিত হয় না। কাল-ধর্ম্মে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, সে পরিবর্ত্তনের একটা বড় কারণ এই, যে, বাহিরের লোকের স্বাধীন চিন্তায় যাহা উদ্ভাবিত হয়, তাহা আর অঙ্গীভূত না করিয়া লইলেই চলে না। এই জন্যই অনেক উপনিষদের গ্রন্থ বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়াছিল।

এই-সকল প্রাকৃতিক অবস্থা বিচার করিয়া স্বাভাবিক ভাবে এই উপপত্তি গড়াই সঙ্গত, যে, বৌদ্ধধর্ম্মে যাহা নূতন দেখিতে পাই, এবং যাহা নূতন হইয়াছিল বলিয়াই কোলাহল উঠিয়াছিল, মূলতঃ কোন বেদপন্থার সহিত তাহার সংশ্রব ছিল না। গৃহ্যসূত্রগুলির বয়স যখন সুনিরূপিত নহে, তখন ঐগুলির দৃষ্টান্ত দিয়া, নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবনের ইতিহাস একেবারে স্থির করিয়া ফেলা, অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা গোঁড়ামি। উপপত্তিটি যখন সুসঙ্গত কারণ দেখিয়া স্থির করা হইল, তখন তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানই চালাইতে হইবে; কিন্তু একটা অবিচারিত কথা তুলিয়া অনুসন্ধান বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলে চলিবে না। বেদেই সব ছিল বলিয়া আন্দাজের কথার উপর নির্ভর করিয়া পূর্ণচ্ছেদ দিলে চলিবে না। উপপত্তিটি যখন কিয়ৎ পরিমাণেও যুক্তিসঙ্গত তখন সেই যুক্তি কাটিবার অথবা সমর্থন করিবার, অথবা ঐ প্রসঙ্গে নূতন তত্ত্ব আনিয়া বিচারের ক্ষেত্র প্রসার করিবার ভার সকল শ্রেণীর তত্ত্বানুসন্ধানকারীর উপরেই রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় সৃষ্ট উপপত্তি লইয়া সকলকে বিচার করিতে হইবে; কারণ উহাতে বিতণ্ডা তুলিবার কিছুই নাই। কাজেই স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কোন কথা বলিতে গেলেই, প্রমাণের ভার বক্তার উপরেই পড়ে।

প্রকৃতি-পুরুষ ঘটিত তত্ত্বটা যে চীনদেশে অতি প্রাচীন, এবং এদেশে উহা সর্ব্বাদৌ কপিলের মতে লক্ষ্য করা যায়, এবং ঐ বিদ্যাবংশের মত এ দেশের প্রাচীন heterodox বা অবৈদিক ধর্ম্মভাবের মূলে, তাহা নরেশ বাবু তাঁহার আলোচনায় অস্বীকার করেন নাই। সাংখ্যতত্ত্ব যখন কালক্রমে বৈদিকপন্থার উত্তরাধিকারীরা গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা ঐ ভাবের প্রভাবে আপনাদের মত পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিয়া লইয়াছিলেন, তখন কি কি প্রভাবে গৃহ্যসূত্রাদিতে নূতন কথা দেখা দিল, তাহা অনুসন্ধানের জিনিষ। ঠিক যে জিনিষটা নূতন, এবং যাহা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া প্রাচীনের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়, ঠিক সেইটিই বেদের লুপ্তাংশের সঙ্গে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং সেই অজানা কথাটুকু পাইলেই সকল কথা মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে, এরূপ বিচার সুবিধা-জনক মনে হইতেছে না। কেবল গৃহ্যসূত্রগুলি কেন, অতি প্রাচীন উপনিষদও ভগবান্ শাক্যসিংহের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হইয়াছে। ঠিক এরূপ আলোচনায় ঐ কথার বিচার করিতে পারি না। যাঁহারা নরেশ বাবুর মত bias শূন্য, তাঁহারা অন্ততঃপক্ষে স্বীকার করিবেন যে আমার উল্লিখিত ঐ গ্রন্থগুলি যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ নাই, বরং নিকায় গ্রন্থ পড়িলে অন্যবিধ সিদ্ধান্তই ধ্বনিত হয়। এ কথাগুলির প্রমাণের ভারও সকলের উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

* * *

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।

সেদিন ঘটনাক্রমে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত একখানি **'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী'** হাতে পড়িয়াছিল। নাটক-নভেল-প্লাবিত বাঙ্গলা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ একখানা গ্রন্থের অভ্যুদয় দেশের গৌরব বলিয়া মনে করি। 'ঘরমুখো বাঙ্গালী' কথাটা যে সাধারণভাবে বাঙ্গালীজাতির পক্ষে প্রযুজ্য নহে, যাঁহারা বাঙ্গালী জাতির অতীত ইতিহাস ধীরভাবে আলোচনা করেন তাঁহারাই একথা স্বীকার করিবেন। যখন 'প্রবাসী' পত্রে জ্ঞানেন্দ্র বাবুর লিখিত 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' প্রকাশ হইত তখনি আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সেগুলি পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতাম। এক্ষণে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হওয়ায় অনুসন্ধিৎসু পাঠকের একান্ত আনন্দের কারণ হইয়াছে। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' এক হিসাবে বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাস। প্রত্নতত্ত্বের গভীর গবেষণার দ্বারা আবিষ্কৃত অতীত যুগের বাঙ্গালীর গৌরব-কথায় আত্মপ্রসাদ লাভ অপেক্ষা বর্ত্তমান যুগেও ভারতের ও জগতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষায়, সভ্যতায়, মহত্ত্বে ও শৌর্য্যে বীর্য্যে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-কথা অধিকতর মহিমোজ্জ্বল এবং গৌরবব্যঞ্জকও বটে। অতীতের কীর্ত্তিকথায় আমাদের যত-না-গৌরব, বর্ত্তমানে বর্ত্তমান যুগের কৃতী বাঙ্গালীগণের গৌরবকাহিনী যেন তাহার চেয়ে বেশী মধুর লাগে। বোধ হয় সেটা আমরা বর্ত্তমান যুগের লোক বলিয়াই খুব বেশী স্বাভাবিক।

যাক্, বাজে বকিয়া লাভ নাই, কারণ আমি এ গ্রন্থের সমালোচনা করিতে বসি নাই। গ্রন্থকার তাঁহার নিবেদনে পাঠকসাধারণকে পুস্তকখানির ভ্রম ইত্যাদি দেখাইয়া দিবার জন্য বিনীতভাবে আহ্বান করিয়াছেন। আমি তাঁহার আহ্বান অনুসারে গ্রন্থ-মধ্যে যে ভ্রম দেখিতে পাইয়াছি তাহার উল্লেখ করিলাম। আশাকরি ভবিষ্যতে তিনি তাঁহার এই ভ্রমটি সংশোধন করিয়া দিবেন। কারণ এরূপ একখানা মূল্যবান গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল হয় ইহা যে-কোন স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিরই বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে "হুগলী তড়া গ্রামের দয়ারাম বসুর পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে কলিকাতায় লবণের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং তাহাতে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে ইনি ২০০০, টাকা বেতনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। ইনি বঙ্গদেশে দান ও জনহিতকর কার্য্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেন এবং কাশীবাসকালে এখানে নানা স্থানে শিব স্থাপনা করিয়া কাশীপ্রবাসে প্রসিদ্ধ হন। * * * শ্রীরামপুরে যে মাহেশের রথ বলিয়া শুনা যায় তাহাও তাঁহারই কীর্ত্তি। তিনি ভাগলপুরে জাহাঙ্গিরা নামক স্থানে গঙ্গা-গর্ভস্থ একটি পাহাড়ের উপর সুবৃহৎ শিব-মন্দির স্থাপন করেন এবং তাঁহার জন্মস্থান তড়া হইতে মথুরাবাটী পর্য্যন্ত একটি পথ প্রস্তুত করাইয়া দেন। ঐ পথ সর্ব্বসাধারণে কৃষ্ণজাঙ্গাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেওয়ান কৃষ্ণরামের পৌত্র এবং সাধক কবি লালা রামপ্রসাদের পুত্র সাধু রামগতি পঞ্চাশ বৎসর বয়সে যোগানুশীলনের জন্য কাশীবাসী হন। কথিত আছে তিনি এখানে ৪০ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ৯০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে ইহাঁর দেহ ভস্মীভূত হয় এবং ইহার পত্নী সহমৃতা হন। লালা রামগতি মায়াতিমির-চন্দ্রিকা, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় প্রভৃতি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর কন্যা বিদুষী আনন্দময়ী অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। ইহাঁর বিদ্যাবত্তা ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়া "বিক্রমপুরের ইতিহাস"-প্রণেতা সাধারণের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।" (১৪-১৫ পৃঃ)

এখানে জ্ঞানেন্দ্র বাবু একটি গুরুতর ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ত্রুটীটিও নদীয়ায় নব বিক্রমপুর উদ্ভবের চেয়ে বড় কম নহে, বরং আরও বেশী মারাত্মক। বোধ হয় লেখক ভ্রমক্রমে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ফেলিয়াছেন। হুগলী তড়া গ্রামের দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর সহিত বিক্রমপুরবাসী বৈদ্যজাতীয় কৃষ্ণরাম বা তাঁহার বংশধরগণের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া জানি না। গ্রন্থকার বোধ হয় বিক্রমপুরের ইতিহাসের প্রাচীন সাহিত্যের অংশটুকু ভাল করিয়া পড়িয়া লন নাই, তাহা হইলে এমন গুরুতর ভ্রম কখনও হইত না। ল.। রামগতি ও বিদুষী আনন্দময়ীর পরিচয় 'বিক্রমপুরের ইতিহাসে' নিম্নলিখিতরূপ লিখিত হইয়াছে—"যে সময় আলোয়াল কবির 'পদ্মাবতী' ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরাদি পশ্চিম বঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তখন পূর্ব্ববঙ্গের নিভৃত প্রদেশ বিক্রমপুরে কয়েকখানা কাব্য বিরচিত হইয়াছিল। আমরা এস্থলে সে সমুদয় কাব্যের ও তাহাদের রচয়িতাবর্গের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম। 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা' ও 'যোগকল্পলতিকা' প্রণেতা লালা রামগতির বাড়ী বিক্রমপুর পরগণার পদ্মানদীর দক্ষিণতীরস্থ জপসা গ্রামে ছিল। বৈদ্যবংশোদ্ভব বেদগর্ভসেন পাঠাভ্যাস হেতু নিজ পৈত্রিক বাসগ্রাম ইটনা পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে আগমন করেন এবং তথায় সত্যবন্ত দাসের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বিলদায়নিয়া (রাজনগর), জপসা, ভোজেশ্বর, প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া বিলদায়নিয়াতে নিবাস স্থাপন করেন। বেদগর্ভের পঞ্চম স্থানীয় বংশধর গোপীরমণ সেন একজন সৌভাগ্যশালী পুরুষ ছিলেন, মিঃ বিভারেজ প্রণীত বাখরগঞ্জের ইতিহাসেও তাঁহার নাম উল্লিখিত আছে। গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণরাম নবাব সরকারের চান্দপ্রতাপ পরগণার রাজস্ব আদায় করিতেন বলিয়া সেকালে 'দেওয়ান' উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণরামের পুত্র লালা রামপ্রসাদের পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে লালা রামগতি ও লালা জয়নারায়ণ উত্তরকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন * * * রামগতি অত্যন্ত সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। ইনি পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিবাহিত হইলে যোগানুশীলনের নিমিত্ত প্রথমে কলিকাতায় কালীঘাটে ও পরিশেষে কাশীধামে অবস্থিতি করেন। নব্বই বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। কাশীর মহাশ্মশানে তাঁহার দেহভস্মের সহিত তদীয় সাধ্বী সহধর্ম্মিণীও অনুমৃতা হন।" বিদুষী আনন্দময়ী লালা রামগতির কন্যা। আর বেশী টিপ্পনীর প্রয়োজন নাই, ইহা হইতেই বিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁহার ভ্রমটুকু বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

* * *

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।

গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে দিল্লী বঙ্গসাহিত্য-সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক মহাশয় উক্ত সভার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া ও বর্ত্তমান সাহিত্যিক প্রচেষ্টার সংবাদ দিয়া আমায় যেমন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন, সাধারণেরও তদ্রূপ উপকার করিয়াছেন। সাহিত্যানুরাগী নির্ম্মল বাবুর ন্যায় সত্যপ্রিয় মহোদয়গণ "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থে সংগৃহীত জীবনী ও জাতীয় অনুষ্ঠানগুলির বিবরণীর মধ্যে যে যে স্থল ভ্রমাত্মক, অতিরঞ্জিত বা অসম্পূর্ণ বোধ করিবেন, তাহা পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধিত দেখিবার জন্য একটু কষ্টস্বীকার করিয়া প্রকাশক প্রবাসীসম্পাদক মহাশয়কে অথবা ৬৯ নং গ্রে ষ্ট্রীট এই ঠিকানায় আমায় পত্র লিখিলে বিশেষ বাধিত হইব। ভ্রম প্রদর্শন কালে প্রয়োজন ও সম্ভব-মত প্রমাণ উদ্ধৃত বা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারিলে আরও ভাল হয়।

যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের নানা পুস্তকালয় ও বঙ্গসাহিত্য সভার কার্য্যবিবরণী ও তালিকাদি আমার হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু দিল্লীর বান্ধব-সমিতি বা সাহিত্যসভা হইতে কোন সংবাদই পাই নাই। কয়েক-বার দিল্লী গিয়া তথায় বাঙ্গালা পুস্তকালয় স্থাপনাদি সম্বন্ধে নানা মতভেদ ও বাদপ্রতিবাদের কথা শুনিয়াছিলাম ও পরে প্রবাসীতেও কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম। দিল্লী সাহিত্যসভা ও পুস্তকালয়ের ন্যায় আলোচ্য-গ্রন্থের উত্তর ভারত খণ্ডে অন্যান্য স্থানেরও সাহিত্যসভাদির উল্লেখ বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ ব্যতীত তথাকার বাঙ্গালীদিগের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয় নাই, কারণ উহা "বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসাহিত্য" প্রস্তাবের বিষয়ীভূত হইয়াছে। যাহা হউক বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের কোন বৃত্তান্ত সত্য না হইলে তাহা যতই মনোমোহন বা শ্রুতিমধুর হউক না কেন, তাহা বর্জ্জনীয় এবং তাহা গ্রন্থগত করা আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। সুতরাং বাঙ্গালীর ইতিহাস নির্ভুল করিবার পক্ষে প্রবাসীবন্ধুগণ আমাদের সহায় হন ইহা প্রার্থনীয়। ইতি

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

জাতির পাঁতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাই রে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।

যুগে যুগে মরি কত নির্মোক
আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি'
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাড়ে
উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি' ;
উঠেছি চলেছি দলে দলে ফের
যেন মোরা হ'তে জানিনে আলা
চলেছি গো দূর-দুর্গম পথে
রচিয়া মনের পান্থশালা ;
কুল-দেবতার গৃহ-দেবতার
গ্রাম-দেবতার বাহিয়া সিঁড়ি
জগৎ-সবিতা বিশ্বপিতার
চরণে পরাণ যেতেছে ভিড়ি'।
জগৎ হয়েছে হস্তামলক
জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে,
অভেদের বেদ উঠেছে ধ্বনিয়া,—
মানস-আভাস জাগিয়া উঠে ;
সেই আভাসের পুণ্য আলোকে
আমরা সবাই নয়ন মাজি
সেই অমৃতের ধারা পান করি'
অমেয়-শকতি মোদের আজি।
আজি নির্মোক-মোচনের দিন
নিঃশেষে গ্লানি ত্যজিতে চাহি,
আছাড়ি আকুলি আস্ফালি তাই
সারা দেহ মনে স্বস্তি নাহি।
পরিবর্ত্তন চলে তিলে তিলে
চলে পলে পলে এমনি ক'রে
মহাভুজঙ্গ খোলোস খুলিছে
হাজার হাজার বছর ধরে !
গোত্র-দেবতা গর্ত্তে পুঁতিয়া
এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি,
আর দুই মহাদেশের মানুষে
কোন্ মহাজন মিলাল শুনি !
আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে

যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম্মে
মন্থর ধর্ম্ম বিলীন হবে।
ভোর হ'য়ে এল আর দেরী নাই
ভাঁটা সুরু হ'ল তিমির-স্তুরে,
জগতের যত তূর্য্য-কণ্ঠ
মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে!
মহান্ যুদ্ধ মহান্ শান্তি
করিছে সূচনা হৃদয়ে গণি,
রক্ত-পঙ্কে পঙ্কজ-বীজ
স্থাপিছেন চুপে পদ্মযোনি।
ভোর হ'য়ে এল ওগো! আঁখি মেল
পূরবে ভাতিছে মুকুতাভাতি
প্রাণের আভাসে তিতিল আকাশ
পাণ্ডুর হ'ল কৃষ্ণা রাতি।
তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে
মহামানবের গাহরে জয়,
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ
নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।

বংশে বংশে নাইক তফাৎ
বনেদী কে আর গর্-বনেদী,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ্
দুনিয়া সবারি জনম-বেদী।
রাজপুত আর রাজা নয় আজ
আজ তারা শুধু রাজার ভৃত,
উগ্রতা নাই উগ্রক্ষত্রে
বনেদ হয়েছে অ-মজবুত।
নাপিতের মেয়ে মুরার দুলাল
চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি,
গোয়ালার ভাতে পুষ্ট যে কানু
সকল রথীর সেরা সে রথী।
বঙ্গে ঘরানা কৈবর্ত্তেরা
বামুন নহে গো—কায়েৎও নহে,
আজো দেশ কৈবর্ত্ত রাজার
যশের স্তম্ভ বক্ষে বহে।

এরা হেয় নয় এরা ছোটো নয়
হেয় তো কেবল তাদেরি বলি—
গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্যে
পটু যারা করে গঙ্গাজলী;
তার চেয়ে ভাল গুহক চাঁড়াল,
তার চেয়ে ভাল বলাই হাড়ী
যে হাড়ীর মন পূজার আসন
তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি'।

ধর্ম্মের ধারা ধরেছে সে প্রাণে
হাড়ীর হাড়ে ও হাড়ীর হালে,
পৈতা তো সিকি পয়সার সূতা
পারিজাত-মালা তাহার ভালে।
রইদাস মুচি, সুদীন কসাই'
গণি শুকদেব-সনক-সাথে,—
মুচি ও কসাই আর ছোটো নাই
হেন ছেলে আহা হয় সে জাতে।

চণ্ডাল সে তো বিপ্র-ভাগিনা
ধীবর-ভাগিনা যেমন ব্যাস
শাস্ত্রে রয়েছে স্পষ্ট লিখন
নহে গো এ নহে উপন্যাস।

নবমাবতার বুদ্ধ-শিষ্য
ডোম আর যুগী হেলার নহে
মগধের রাজা ডোম্‌নি রায়ের
কাহিনী জগতে জাগিয়া রহে।

মদের তৃষ্ণা শুঁড়িরে গড়েছে
মিছে তারে হায় গণিছ হেয়
তান্ত্রিক দেশে মদের পূজারী
তাহ'লে সবাই অপাংক্তেয়।

কেউ হেয় নাই সমান সবাই
আদি জননীর পুত্র সবে
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল
জাতির তর্ক কেন গো তবে?
বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর,
পাটনী, কোটাল, কপালী, মালো,

বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর,
তাঁতি, তিলি, মালি সমান ভালো ;
বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে,
তামুলি, বারুই তুচ্ছ নয়,
মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ
সকল জগৎ ব্রহ্মময় ।

সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে
লাগিছে—লাগিবে দু'দিন পরে,
মহা-মানবের পূজার লাগিয়া
সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে।
মালাকর তার মাল্য জোগায়,
গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়,
নট তারে তোষে নৃত্যে গানে,
স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়,
গোয়ালা খাওয়ায় মাখন ননী,
তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়
বণিকেরা তারে করিছে ধনী।
যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়,
বিদ্বান্ তার ফোটায় আঁখি
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য জোগায়
কিছু যেন জানা না রয় বাকী।
ভাবের পন্থা ধরে সে চলেছে
চলেছে ভবিষ্যতের ভবে,
জাতির পাঁতির মালা সে গাঁথিয়া
পরেছে গলায় সগৌরবে।
সরে দাঁড়া তোরা বচন-বাগীশ
ভেদের মন্ত্র ডুবা রে জলে,
সহজ সবল সরস ঐক্যে
মিলুক মানুষ অবনীতলে।
ডঙ্কা পড়েছে শঙ্কা টুটেছে
দামামা কাড়ায় পড়েছে সাড়া
মনে কুণ্ঠার কুষ্ঠ যাদের
তারা সব আজ সরিয়া দাঁড়া ;

তুষার গলিয়া ঝোরা দুরন্ত
চলে তুরন্ত অকূল পানে
কল্লোল ওঠে উল্লাসভরা
দিকে দিগন্তে পাগল গানে ;
গণ্ডী ভাঙিয়া বন্ধুরা আসে
মাতেরে হৃদয় পরাণ মাতে ;
গো-ত্র আঁকড়ি গরুরা থাকুক,
মানুষ মিলুক মানুষ সাথে।
জাতির পাঁতির দিন চ'লে যায়
সাথী জানি আজ নিখিল জনে
সাথী বলে জানি বুকে কোলে টানি
বাহু বাঁধে বাহু মন সে মনে।
যুদ্ধের বেশে পরমা শান্তি
এসেছে শঙ্খ চক্র হাতে,
প্লাবন এসেছে পাবন এসেছে
এসেছে সহসা গহন রাতে।
পঙ্কিল যত পল্বলে আজ
শোনো কল্লোল বন্যাজলে !
জমা হ'য়ে ছিল যত জঞ্জাল
গেল ভেসে গেল স্রোতের বলে।
নিবিড় ঐক্যে যায় মিলে যায়
সকল ভাগ্য সব হৃদয়,
মানুষে মানুষে নাই যে বিশেষ
নিখিল ধরা যে ব্রহ্মময় ॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পুস্তক-পরিচয়

কয়েকটি কবিতা—শ্রীশচীন্দ্রলাল দাসবর্ম্মা প্রণীত। প্রকাশক কাণ্ডিক প্রেস, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫২ পৃষ্ঠা। কাগজ ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্য ছয় আনা।

কবিতার বই। বিবিধ ছন্দে স্বচ্ছ কোমল ললিত ভাষায় রচিত; সকল কবিতাতেই কবিত্ব যথেষ্ট আছে ; সরসতা কবিতাগুলির প্রাণ। কিন্তু বিচিত্র ছন্দে অধিকার জন্মিলেও ছন্দপতন ও যতিভঙ্গ যে হয় নাই এমন নহে। এই নবীন কবি ছন্দ সম্বন্ধে একটু অবহিত হইলে ইঁহার কবিতা পরম উপভোগ্য হইবে—তাহার যথেষ্ট পরিচয় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আমরা পাইয়াছি। আমরা সানন্দে ইঁহার আবির্ভাব অভিনন্দন করিতেছি।

ধারা—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ১০১ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

কবিতার বই। সব কবিতাই ঈশ্বর-প্রেমে অভিষিক্ত। লেখকের ছন্দের উপর দখল আছে, তবে একেবারে নিখুঁত নয়; ভাষাও মন্দ নয়; কবিত্ব বা নবীনতা না থাকিলেও ভাবে সরসতা আছে। সুতরাং সুপাঠ্য।

ধারা—শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅনাথবন্ধু সেন, "বিরাম," বরিশাল। ১১২ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। ছাপা কাগজ ভালো।

কবিতার বই। দেবকুমার বাবুর পরিণত লেখনীর রচনা; তাহার পরিচয় অনাবশ্যক। লেখকের পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে রচিত উপেক্ষিতা কবিতাটি উৎকৃষ্ট হইলেও ছোট মেয়ের মুখে যে ভাষা দেওয়া হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক হয় নাই। অপর সমস্ত কবিতাই সরস মধুর কবিত্ব-মণ্ডিত হইয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য।

রামায়ণ—শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি, ৮ ও ৯ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৪৫৫ পৃষ্ঠা। সুন্দর বাঁধানো, পরিষ্কার ছাপা। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

ইহা প্রথম খণ্ড। মহর্ষি বাল্মীকির মূল রামায়ণের আদিকাণ্ড হইতে সুন্দরকাণ্ড পর্য্যন্ত পদ্যে মর্ম্মানুবাদ। প্রায় সমস্তটাই পয়ার ছন্দে রচিত; আজকাল মাত্রা গণিয়া ছন্দ রচনার কাল; তাহাতেই কান অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; এই বইএ যুক্তাক্ষরকেও এক অক্ষর ধরাতে স্থানে স্থানে ছন্দে যতিভঙ্গ হইয়া পড়ে; একটু সাবধান হইলে ইহা সামলাইয়া চলা কঠিন হইত না। রচনা বেশ সরস ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। মূল রামায়ণের পদ্যানুবাদ রাজকৃষ্ণ রায় করিয়াছিলেন, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস তাহার সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বৃহৎ। সংক্ষিপ্ত আকারে মূল রামায়ণের মর্ম্মের সরস পদ্যানুবাদের অভাব বঙ্গসাহিত্যে ছিল; তাহা পূর্ণ করিয়া লেখক একটা ধন্যবাদের যোগ্য কাজ করিয়াছেন। এই বই স্বল্পাবসর লোকের, মহিলাদের ও বালকবালিকাদের পাঠের উপযুক্ত। আশা করি ইহার যথোচিত সমাদর হইবে। এই বই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত—ছেলেরা জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে যেরকম অজ্ঞতার পরিচয় দায় তাহা লজ্জাজনক; এই সরস কবিত্বময় উৎকৃষ্ট ভাষায় রচিত রামায়ণ পড়িলে তাহারা উপকৃত হইবে।

তুফান—শ্রী পঞ্চানন নিয়োগী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ১২৫ পৃষ্ঠা মূল্য বারো আনা।

তুফানের সাতটি তরঙ্গ। নাম,—গীতাব্যাখ্যায় প্রলাপ, প্রফেসার ও অধ্যাপক, বাঙ্গালায় চিঠি লেখা, তিন, বঙ্গে অকালবার্দ্ধক্য, ডাকঘরের আত্মকাহিনী। এগুলি রসরচনা; রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকতাই ইহাদের উদ্দেশ্য।

নাম প্রসঙ্গে লেখক এই বুঝাইতে চাহিয়াছেন—What's in a name—নামে কিবা আসে যায়, উক্তিটি ঠিক নহে; আজকাল দেখা যায় নামের জোরেই জিনিষ বিকায়; নামেরই দর, জিনিসের উৎকর্ষের উপর মূল্য তত নির্ভর করে না।

গীতাব্যাখ্যায় প্রলাপ প্রসঙ্গে লেখক গীতার প্রধান তিনটি বিষয়—আত্মা, যোগ ও নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপে—আত্মা কিনা ভূত; যোগ যোগশ্রেষ্ঠ জলযোগেরই প্রকারভেদ; আর নিষ্কাম কর্ম্ম উই আর ইঁদুরের ব্যবহার।

প্রফেসার ও অধ্যাপক একার্থবাচক হইলেও অধ্যাপক নামে পরিচিত হইতে আজকাল কেহ বড় রাজি নন, যদিও প্রফেসার আজকাল সবাই—যে কুস্তি লড়ে সেও প্রফেসার, যে সার্কাস করে সেও প্রফেসার, যে ম্যাজিক করে সেও আর যে সঙ্গীতব্যবসায়ী সেও; কে নয়? লেখক অধ্যাপক ও প্রফেসারের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এইরূপ—শিক্ষকগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়া যাহারা প্রাচীন ভারতের অতীত যুগে বাস করেন তাঁহারাই অধ্যাপক, আর যাহারা ইংরেজী ভাষার সাহায্যে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা বিদেশে বাস করেন তাঁহারা প্রফেসার। ইহাঁদের পার্থক্য কয়েকটি বিষয়ে দেখা যায়—(১) টিকি, (২) পোষাক, (৩) আহার, (৪) স্বদেশ-ও বিদেশ-ঘেঁষা ভাব।

বাংলায় চিঠি লেখা আজকাল চলে না বলিয়া লেখক ব্যঙ্গ করিয়াছেন। আমরা সাক্ষী লেখক নিজে ঐ অপরাধে অপরাধী। ইহার কারণ লেখক দেখাইয়াছেন যে ইংরেজী চিঠি লেখার কায়দায় কতকগুলি বাঁধিগৎ থাকায় ইংরেজী চিঠি লেখা সহজ হইয়া পড়িয়াছে—ভাবিতে চিন্তিতে হয় না। কিন্তু সমস্ত শিক্ষিত বাঙালী যদি পরস্পরের মধ্যে বাংলাতেই চিঠি লেখেন তবে বাংলা চিঠিরও 'ফর্ম' গড়িয়া উঠিতে বেশী বিলম্ব হইবে না।

তিন সংখ্যাটা অনেক দেশের magic number অর্থাৎ তুকতাক করিবার সংখ্যা। তাহার প্রভাব সর্ব্বক্ষেত্রে কত তাহাই রঙ্গচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বঙ্গে অকালবার্দ্ধক্যের কারণ ও প্রতিকার আলোচিত হইয়াছে। ইহা অনুধাবনযোগ্য।

ডাকঘরের আত্মকাহিনীতে ডাকঘর বেচারা কী সেবার পরিবর্ত্তে কী লাঞ্ছনাটাই ভোগ করে, তাহার কি কি কাজ ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে।

এই রচনাগুলি যে-ধরণের লেখকের ভাষা তদনুরূপ হাল্কা ও সবেগ নয়; হাস্যরস উজ্জ্বল ধারালো হয় নাই; রঙ্গরচনার উদ্দেশ্য—যখন ক্লান্ত মনে আর কিছু রুচিবে না তখন তাহাকে স্বচ্ছ লঘু তরল পথ্যে চাঙ্গা করিয়া তোলা। সে উদ্দেশ্য যথেষ্ট সফল হয় নাই। রসিকতা জিনিসটা spontaneous স্বতঃ উৎসারিত না হইলে টানিয়া বুনিতে গেলে দরকচা-মারা হইয়া থাকে, তাহাতে রসের আস্বাদ যথেষ্ট পাওয়া যায় না। রসরচনা বঙ্গসাহিত্যে অতি অল্পই আছে—বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর ও লোকরহস্য, রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক ব্যঙ্গকৌতুক প্রজাপতির নির্বন্ধ, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাংলাভাষায় Classic হইয়া গিয়াছে; তাঁহাদের পরে ঐ ক্ষেত্রে যাঁহারা নাম কিনিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রজনীকান্ত সেন, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঠিক এই শ্রেণীর না হইলেও গল্পের মধ্যে রঙ্গ (humour) ফলাইতে সিদ্ধহস্ত প্রভাতকুমার বোধ হয় প্রধান। পঞ্চাননবাবু রসায়নরসিক; সুতরাং তিনি রসরচনা করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী। প্রথম নমুনা মনোহারী না হইলেও মৌলিক, এবং ভবিষ্যতের আভাসে পূর্ণ; সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের এই বিভাগে 'তুফান' বৈচিত্র্য সম্পাদন করিবে। বাঙালীর হাসির উপকরণ দিন দিন কমিয়া চলিতেছে; যিনি যতটুকু জোগাইতে পারেন তিনিই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার, এবং জলচল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার—শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল, এম-এ, বি-এল, আয়ুর্ব্বেদ শান্তিকুটীর, সিরাজগঞ্জ। ডিমাই ১২ পেজি ১৩২ পৃষ্ঠা। মূল্য প্রত্যেকের আট আনা।

ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগকে ব্রাহ্মণেরা স্বার্থহানির ভয়ে আবহমান কাল হইতে দাবাইয়া রাখিয়া আসিতেছেন বলিয়া ব্রাহ্মণের একটা

অখ্যাতি হইয়াছে। অভিযোগটা কিন্তু স্ববিরোধী—যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ তিনি সর্ব্বভূতহিতেরত, ব্রহ্মজ্ঞ; তাঁহার অন্তরে ভেদবুদ্ধি স্থান পাইতে পারে না; আর যিনি ভেদবুদ্ধির বশে অপরের উন্নতির পরিপন্থী তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। ব্রাহ্মণের সেই অখ্যাতির অপনোদনের কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণেরই—নহিলে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। সেই ভার এযুগে গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ব্রাহ্মণসত্তম ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষি রামমোহন; তাঁহার পুণ্যপদবীর উত্তরাধিকার অল্পবিস্তর অনেক ব্রাহ্মণই পাইয়াছেন। সমালোচ্য পুস্তক দুইখানির প্রণেতা ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই উত্তরাধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নির্ভীক অকপটতার সহিত সত্য ও মানবের জন্মগত অধিকার সমর্থন করিয়া বার বার আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার হৃদয়ের প্রথম পরিচয় পাইয়াছিলাম সুলিখিত "জাতিভেদ" নামক পুস্তকে; আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াই তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন জাতিভেদের কুফল কত। এই দুইখানি পুস্তকে তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বেদ মানে জ্ঞান, তাহাতে অনধিকার কাহারও নাই। আজকাল আমরা সকলেই শূদ্রধর্ম্মী; তাহার মধ্যে কতক লোক বিশেষ একবংশে জন্মিয়াছে বলিয়া বেদাধিকারী এবং অপর এক শাখা ভিন্ন বংশীয় বলিয়া অনধিকারী হইবে ইহার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কারণ "পৈতার বল বড় নহে—যোগবল, তপোবল, মনোবল, ব্রহ্মবল" চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ করে; সকলেরই ব্রাহ্মণ হইবার অধিকার আছে, সকলকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে—এবং তবেই ভারতের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হইবে। ছুতমার্গে কোনো জাতি জীবন্ত থাকিতে পারে না। যাঁহারা জড়তার বশে নিজেদের শূদ্র মানিয়া হীন হইয়া আছেন তাঁহাদের মোহভঙ্গের সময় আসিয়াছে। সেই আত্মবিস্মৃত শূদ্রনামাঙ্কিত লোকেদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—হে শূদ্ররূপ মনঃকল্পিত আখ্যায় অভিহিত অমৃতের পুত্রগণ, স্বর্গচ্যুত দেবনন্দনগণ, দিব্যধামবাসী জ্যোতির তনয়গণ, কন্যাগণ, তোমরা শ্রবণ কর, উঠ, জাগ্রত হও।" শূদ্র যে সর্ব্বশক্তির আধার, সমাজের মেরুদণ্ড—তাহার মধ্যে "সকল জ্ঞান, সকল শক্তি, সকল পবিত্রতা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান!" যাহারা মানুষ, মানুষের সকল অধিকার তাহাদেরও আছে—দেবপূজা, জ্ঞানচর্চ্চা, সমাজ ও দেশের সেবা সমস্তই। ব্রাহ্মণ যদি স্বার্থান্ধ হইয়া কাহাকেও শূদ্র বলিয়া মানুষের অধিকার না দ্যায় তবে তাহাদের দ্বারা তাঁহারা স্বাধিকারে বঞ্চিত হইয়া নিরস্ত থাকিবেন কেন? শূদ্রের হাতেই ত সমস্ত সমাজের সেবার ভার, তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় জন্মিলেই তাঁহারা জলচল হওয়া ত সামান্য কথা ব্রাহ্মণেরও শ্রেষ্ঠ হইবেন—মুচি, মুদ্দাফরাস, মেথর, কলু, ধোপা, তাঁতি, ছুতার, কামার, কুমার নহিলে ব্রাহ্মণের একদিন চলে? এই শূদ্র আত্মপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানকর্ম্মে-উন্নত হইয়া স্বাধিকার লাভ করুন এই কামনায় গ্রন্থকার ওজস্বী ভাষায় অকুতোভয়ে শাস্ত্রের অবিচার ও সত্যের যুক্তিমূলক বিচার করিয়াছেন। এই দুখানি বই এমন সত্যনিষ্ঠ সত্যপ্রতিষ্ঠ কুসংস্কারবর্জ্জিত যে এই দুখানি ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই পাঠ করিয়া দেখিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি। এই সঙ্গে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যন্ত্রস্থ পুস্তক "অভ্র ও আবীর" হইতে প্রবাসীর এই সংখ্যার ৫৯৭পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "জাতির পাঁতি" কবিতার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি—

বাউরী চামার কাওরা তিওর
পাটনী কোটাল কপালী মালো,
বামুন কায়েৎ কামার কুমোর
তাঁতি তিলি মালী সমান ভালো।
বেনে চাষী জেলে ময়রার ছেলে
তামুলী বারুই তুচ্ছ নয়,
মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ
সকল জগৎ ব্রহ্মময়।

অপর এক নির্ভীক সত্যসন্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ মহাশয় 'শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার' পুস্তকের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন তাহারও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"এই গ্রন্থে হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্ম কি এবং তাহাতে শূদ্রের কতটা শাস্ত্র-সম্মত অধিকার আছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্রে অত্যুদার মতের অসদ্ভাব নাই। ইঁহাই প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্র। ইহাকে অবলম্বন করিয়া বহুতর অনুদার ব্যবহার ও পুরাকালোচিত ব্যবস্থা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থে ঢুকিয়া গিয়াছে। এই-সকল অংশ ধর্ম্ম-প্রতিপাদক নহে, ইহারা ব্যবহারশাস্ত্র মাত্র। এই-সকলে শূদ্রাদির বহুতর নিন্দা আছে। সাধারণ লোকে মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের এই দুই অংশকে পৃথক্ করিতে না পারিয়া মনে করেন যে হিন্দুর ধর্ম্মই শূদ্রকে শালগ্রাম পূজা এবং বেদপাঠে অধিকার দেন নাই।

"আজকাল বঙ্গদেশে যাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেই, প্রকৃতপক্ষে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভূত। সুতরাং তাঁহাদের দেবপূজাদিতে অধিকার গোঁড়া হিন্দুদেরও অননুমোদিত হইবার কারণ নাই।

"নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে বড় অর্থাৎ দ্বিজ করিতে হইলে, উহাদের জন্য সুশিক্ষার বন্দোবস্ত চাই। মনে রাখিতে হইবে, কি ভদ্র কি অভদ্র সকলেরই শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করা ভগবানের নিয়ম। জমিদার উকিল হাকিম ডাক্তার ব্যবসায়ী প্রভৃতি সমৃদ্ধগণের পুত্রদের রান্নাবাড়া, ঘরামির কাজ, ছুতারের কাজ, মাটি-কাটা, কাঠফাড়া, কোদলান প্রভৃতি অভ্যাস করা উচিত। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাদি জাতীয় শিক্ষকগণ যদি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে, অন্ত্যজ বালকদিগের সঙ্গে সঙ্গে, হাতে-কলমে পরিশ্রমের কাজ করেন, তাহা হইলে ঐ-সকল বালকের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে এবং তাঁহাদের আত্মসম্মান উদ্বুদ্ধ হইবে। ছাত্র ও শিক্ষকদের কৃত, কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থে এইরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলে, অন্ত্যজেরা ক্রমে দ্বিজ হইয়া বেদপাঠে যথার্থ অধিকারী হইতে পারিবে। নতুবা সামাজিকেরা মুখে অধিকার দিলে ত সে অধিকারের কেহ সদ্ব্যবহার করিবে না। অনুষ্টুভ ছন্দোবদ্ধ হইয়া অশাস্ত্রীয় কথা শাস্ত্রগ্রন্থে প্রবেশলাভ করিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত বাক্য মাত্রই শাস্ত্র নহে।

"সকল দেশেই সাবমার্জ্জড্ ক্লাসই লেখা পড়ায় বঞ্চিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে অন্যান্য দেশে তাঁহারা লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আর আমাদের মৃতপ্রায় সমাজে, আমরা নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি।"

রাক্ষস-রহস্য—শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র প্রণীত। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ৮২+।৵০+॥৵০। মূল্য ।৵০ আনা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকায় পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় দিয়াছেন এইরূপ—

"আমরা আশৈশব যক্ষরক্ষ, দৈত্য-দানব ও অসুর-গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির কথা শুনিয়া আসিতেছি, অথচ বস্তুতঃ ইহারা কে, তৎসম্বন্ধে আমরা সকলেই অনভিজ্ঞ; কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া কত কত মহা-মহা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং তৎসমুদয়ের রস আস্বাদন করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিতেছি। গ্রন্থকার বহু শ্রম ও চিন্তা করিয়া এবং বহু প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন

যে, ঐ জীবসমূহ 'ব্রহ্মার মানসসন্তান সম্প্রদায়ভুক্ত, অতএব মানসচক্ষে দর্শনীয়'; ইহারা কল্পনার ফল মাত্র, বাস্তব সত্তা ইহাদের নাই। সংসারে যাহা সু, যাহা মঙ্গল, তাহাই দেবশ্রেণীতে; এবং যাহা কু, যাহা অমঙ্গল, তাহাই প্রকৃতিভেদে যক্ষ-রক্ষ, দৈত্য-দানব ও পিশাচাসুর বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য শুভাশুভ প্রবৃত্তি ও দেবাসুর নামে কথিত হইয়া থাকে; জগতের এই যে পরিদৃশ্যমান শুভাশুভের সম্পদ-বিপদের ও ইষ্টানিষ্টের দ্বন্দ্ব বিরোধ, তাহাই কবির কাব্যে দেবদৈত্য, সুরাসুর বা নররাক্ষসের সমর-সংগ্রাম।

"যাঁহারা বৈদিক সাহিত্য বা উপনিষদের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা অনেক আখ্যায়িকাতেই দেখিতে পাইয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়সমূহের সৎপ্রবৃত্তিসমূহকে, অথবা যথার্থ জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত ইন্দ্রিয়সমূহকে দেবতা, এবং তাহার বিপরীত ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়সমূহকে অসুর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহারা উভয়েই প্রাজাপত্য, অর্থাৎ প্রজাপতির সন্তান। বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের সংগ্রাম যে মেঘ ও বায়ুর পরস্পর সংঘর্ষে বৃষ্টির উৎপত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাও বৈদিক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। ইন্দ্রকর্ত্তৃক পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদনও ইহাই; পর্ব্বত শব্দের অর্থ মেঘ; ইন্দ্রশব্দের অর্থ বায়ু। পর্ব্বত বা মেঘ উড়িয়া বেড়ায় আর বায়ুস্পর্শে বৃষ্টি হওয়ায় মেঘ আর উড়ে না, ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, ইহাই তাহার পক্ষচ্ছেদন। এইরূপ প্রাকৃতিক বা লৌকিক বহুবিধ ব্যাপার বিশেষ বিশেষ আখ্যায়িকায় চেতনধর্ম্মারোপে (Personification) প্রকাশ করা সর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে; এবং ভারতবর্ষেও তাহা অন্যরূপ হয় নাই।

"গ্রন্থকার বলিতেছেন বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র বা Æsop's Fableএ যেরূপ পশুপক্ষীর পরস্পর আলাপ অবলম্বন করিয়া বিবিধ নীতি-উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষের মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ ইতিহাসেও সেইরূপ স্বকপোলকল্পিত ঘটনা পুরোবর্ত্তী করিয়া নীতি-উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারত ও রামায়ণের সমস্ত কথাই কল্পিত, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্য কিছুমাত্র নাই, সমস্তই রূপক, সমস্তই কল্পনা—রামায়ণ ও মহাভারত প্রমুখ যাবতীয় ইতিহাসই কতকগুলি রূপকের সমষ্টি।

"গ্রন্থকার কি জন্য এই মত পোষণ করেন, তাহা তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি মহাভারতের সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু বলেন নাই, যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি অল্প, কিন্তু রামায়ণ সম্বন্ধে তিনি সবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন, তিনি ইহাতে স্বমত সমর্থনের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

"তাঁহার ব্যাখ্যা বা যুক্তির সহিত বহুস্থলে আমার অনৈক্য থাকিলেও এবং স্থানে স্থানে অতি কষ্টকল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস দেখা গেলেও, বহুস্থানে তাঁহার যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্যাকৌশলের রমণীয়তার অপলাপ করা যায় না; তিনি যে এক নবীন পথে চিন্তা করিয়াছেন, এবং সেই চিন্তা যে অনেকের চিত্তে আরও নূতন চিন্তা আনয়ন করে, তদ্বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই।

"রামায়ণের রূপকাবরণ উন্মোচন করিতে গিয়া তিনি যাহা বলিতে চাহেন, তাহার সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, সমস্ত রামায়ণ একটি কৃষি-কার্য্যের বর্ণনা। রাবণ বলিতে মেঘ, যে মেঘ কেবল ঘোর গর্জ্জন করে, অথচ কিঞ্চিন্মাত্রও বারিবর্ষণ করে না। মেঘ গগনপথে বিহরণ করে বলিয়াই রাবণের গগনবিহারী পুষ্পক রথ আছে বর্ণিত হয়। সমুদ্র হইতে মেঘের উৎপত্তি হয়, এজন্য রাবণের গৃহ সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী লঙ্কায়। রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ অতিবর্ষণকারী মেঘ ভিন্ন আর কিছু নহে, 'অজস্র বর্ষণে কানে কানে কুম্ভ পূর্ণ করে বলিয়া কুম্ভকর্ণ।' বিভীষণ ভীষণস্বভাবশূন্য সুবর্ষণকারী মেঘ। সূর্পনখা বলিতে ঝটিকা বাত্যা। সীতা বলিতে কৃষিশ্রী। তাহার পিতা সীরধ্বজ, 'সীর কিনা লাঙ্গল, সীর যাহার ধ্বজা...সে সীরধ্বজ হলধর কৃষক।' হরধনু বলিতে হলধনু (র=ল)। সীতা অর্থাৎ কৃষিলক্ষ্মী, তিনি বৈদেহী বীর্য্যশুল্কা, যে হলধনু ভাঙ্গাইতে সমর্থ সেই তাহাকে পাইবে, সে নিশ্চয়ই বীর্য্যবান্ হইবে, তাহাকে অহল্যা অর্থাৎ কর্ষণের অযোগ্য ভূমির অপবাদ ঘুচাইতে হইবে, যে ইহা করিয়াছিল, সে সীতাকে লাভ করিল, সীতার বিবাহ হইল। তাহার বাস অযোধ্যা নগরীতে—যাহাকে কেহ যুদ্ধে আক্রমণ করিতে পারে না, অর্থাৎ সুরক্ষিত কৃষিপল্লীতে কৃষকরাজই ইহার রাজা, তিনি দশরথ, দশ দিক্ হইতে রথে করিয়া তাঁহার শস্য-সামগ্রী আসিত। সীতাপতি বনে গেলেন, কৃষিশ্রী সীতাদেবী অনুগামিনী হলেন। সীতাপতি কালে মৃগয়াসক্ত হইয়া সীতাকে ছাড়িয়া মায়ামৃগের অনুসরণ করিলেন, অবর্ষণকারী ও অতিবর্ষণকারী মেঘস্বরূপ রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসদের প্রভাবে সীতা অপহৃত হইল। * * *

"গ্রন্থকার এইরূপে ধারাবাহিকভাবে রামায়ণের একটি চিত্র উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও ইহাতে তিনি সফলতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না, এবং অনেকেরই মতের সহিত তাঁহার অসামঞ্জস্য হইবার সম্ভাবনা আছে, তথাপি তাঁহার চিন্তাপ্রণালী যে রমণীয় এবং অনেকেরই ইহা দিগ্‌দর্শন দিবে, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ভাষা স্থানে স্থানে অসংস্কৃত হইলেও তাহার রীতি সরস। গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিয়া পাঠকবর্গ আনন্দিত হইবেন, এবং সেই জন্যই ইহার সহিত তাঁহাদের পরিচয় স্থাপন করিতে গিয়া আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি।"

এবং কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই লিখিয়াছেন—

"রাক্ষস-রহস্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি প্রীতি লাভ করিয়াছি। বহুশাস্ত্র মন্থন করিয়া লেখক মহাশয় নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহার রচনা-রীতিও সরস, এবং স্বাধীন পন্থা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থের সিদ্ধান্তের সহিত আমার মতের ঐক্য নাই কিন্তু পদে পদে যুক্তিনৈপুণ্য ও দৃষ্টান্ত-সমাবেশের গুণে পাঠকালে আমার চিত্ত আকৃষ্ট ও চিন্তা জাগরূক হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।"

বাস্তবিক এই পুস্তকে গ্রন্থকারের অনুসন্ধান, স্বাধীন নির্ভীক চিন্তা-প্রণালী এবং পুরাতন বিষয়কে নূতন আলোকে ধরিবার শক্তি সবিশেষ প্রশংসার্হ। এই বই পড়িবার সময় কৌতুক কৌতূহল দুই হয়; মনের মধ্যে চিন্তার শতধারা খুলিয়া যায়। ইহা কাব্যরসিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন অতিবিশ্বাসী যে কেহ পাঠ করিলে শিক্ষা ও আনন্দ পাইবেন। আমরা সাগ্রহে ইহা আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি।

মুদ্রারাক্ষস।

সর্ব্বধর্ম্ম ও তপস্যা—( ) সর্ব্বধর্ম্ম বা Fundamental Principle of All Religion, পৃষ্ঠা ৮০+১০১, মূল্য একটাকা মাত্র; (খ) তপস্যা বা Faith-Cure, পৃষ্ঠা ১৮/০+৬২+৩২; শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এল্ কর্ত্তৃক অনূদিত, ৯, বাদুড়বাগান সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট, ও ৩০ কর্ণোয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। পুস্তক দুইখানি প্রত্যেক একটাকা মূল্যে পৃথক-পৃথকও পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার সর্ব্বধর্ম্মের সূচনায় বলিয়াছেন—"বঙ্গভাষায়......এমন একখানি পুস্তক নাই যাহা পাঠ করিলে ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলি, বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী ধর্ম্ম, সর্ব্বদুঃখবিনাশক প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম এবং ঈশ্বরোপাসনা—এই সকল বিষয়ে অনুষ্ঠানযোগ্য জ্ঞানলাভ করা যাইতে

পারে। এই অসুবিধা বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা আর্য্য মহর্ষিগণের কয়েকটি মুখ্য অনুশাসন মাত্র অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হইল। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলপ্রকার বঙ্গবাসী একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলি অভ্রান্তরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।" তাঁহার উদ্দেশ্য খুবই সাধু, এবং পুস্তকখানির সর্ব্বত্রই সেজন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাতে তাহা পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

মনু এই কয়টিকে চতুর্ব্বর্ণের সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"(১) অহিংসা (২) সত্যম্ (৩) অ-স্তেয়ম্ (৪) শৌচম্ (৫) ইন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।" গ্রন্থকার সর্ব্বধর্ম্মের প্রথম পাঁচ পরিচ্ছেদে এই পাঁচটি বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া শেষ দুই পরিচ্ছেদে মিতাহার ও ব্রহ্মচর্য্যের বর্ণনা করিয়া উপসংহার করিয়াছেন। তিনি উল্লিখিত বিষয় কয়টিকে পরিস্ফুটতর ভাবে বুঝাইবার জন্য বেদ-বেদান্তাদি হিন্দুশাস্ত্র এবং বাইবেল ও কোরান প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে রাশি রাশি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি সুন্দর সুন্দর প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎসমুদয়কে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই,—গ্রাস করিয়া জীর্ণ করিয়া কাজে লাগাইতে সমর্থ হন নাই; তাই তাহাতে গ্রন্থের পুষ্ট না হইয়া বরং প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। আবার স্থানে স্থানে এরূপ বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে যাহার প্রকৃত বিষয়ের সহিত কোনো যোগ নাই। কোনো কোন স্থলে আবার একটি বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া আর-একটা ধরা হইয়াছে; মূলকে ছাড়িয়া দিয়া ঝাঁকড়া লইয়াই বেশী আলোচনা করা হইয়াছে, যথা শৌচ-প্রকরণে ঈশ্বরপূজনাদি প্রসঙ্গ। স্থানবিশেষে ভাবের আবেগে সহসা বঙ্গভাষা ছাড়িয়া দিয়া ইংরেজী ভাষায় লেখা হইয়াছে (তপস্যা, পৃঃ ১৪-২২)। গ্রন্থকার যদি বর্ণনীয় বিষয়গুলির নিজে ব্যাখ্যা না করিয়া পুরাতন আচার্য্যগণের ব্যাখ্যারই অনুবাদ করিয়া দিতেন, তবে অনেক ভাল হইত। উপকরণগুলি গুছাইয়া লিখিতে পারিলে বইখানি ভাল হইত।

তপস্যা-অংশে শাস্ত্রবর্ণিত চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠানে যে বহুবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগের নিবারণ হইতে পারে, তাহাই যুক্তি প্রদর্শনে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি নিজের অনুভব এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন (৩৩ পৃ)—"লেখক নিজে গৃধ্রসী বাতরোগে (Sciatica) আক্রান্ত হইয়া তিন বৎসরকাল অশেষ কষ্ট পাইয়াছেন। প্রচলিত লৌকিক সর্ব্ববিধ চিকিৎসা নিষ্ফল হওয়ার পর লেখক অবশেষে পরাক ব্রত আচরণে রোগমুক্ত হইয়াছেন।" এই সমস্ত ব্রত আচরণ করিতে হইলে অনেক উপবাস করিতে হয়। ইহাতে অনেকেরই ভয় হইতে পারে, কিন্তু যথাবিধি উপবাস করিলে অপকার না হইয়া উপকারই হয়। এই বিষয়টি পাশ্চাত্যদেশপ্রসিদ্ধ Fasting Cure বা উপবাস-চিকিৎসার প্রণালীর উল্লেখে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে এই উপবাস-চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ অনেক ডাক্তারের মত সংগৃহীত হইয়াছে। এই মতসমূহ পাঠ করিলে উপবাসের উপকারিতা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। ধর্ম্মসাধনাতেও যে উপবাস আবশ্যক তাহা কেবল শাস্ত্রের প্রমাণ ছাড়া খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি সাধকেরও উদাহরণ দিয়া বুঝান হইয়াছে। খৃষ্ট ৪০ দিন উপবাসী ছিলেন। ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। জৈনদের মধ্যে এখনো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুধা সহ্য করা (ক্ষুৎপরিষহ) জৈনদের একটি অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। গত সেপ্টেম্বর মাসের জৈনগেজেটে (The Jaina Gazette, Vol. XI. No 9, 1915, Pp. 1-2) উক্ত হইয়াছে, একজন জৈন একমাস পর্য্যন্ত উপবাস করিয়াছেন।

Fasting Cure সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশে বিবিধ গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীবাবু বলেন, পাশ্চাত্য দেশে উপবাসের যে প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা আমাদের ঋষিদের বিহিত প্রণালী অনেক ভাল। বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য ও পরীক্ষণীয়।

গীতাধর্ম্মামৃত—সাধনার প্রথম ও প্রধান সোপান। চট্টগ্রাম জজ আদালতের ভূতপূর্ব্ব একাউন্টেণ্ট শ্রীযাত্রামোহন দাস-সম্পাদিত পৃঃ ॥/০ + ৫৭। মূল্য।০ আনা মাত্র। পোষ্ট সীতাকুণ্ড, জেলা চট্টগ্রাম, এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮।৪৮) উক্ত হইয়াছে—"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।" এই সহজ কর্ম্ম এবং ইহার অনুষ্ঠানের জন্য সহজমন্ত্র কি তাহাই এই পুস্তিকাখানির প্রধান প্রতিপাদ্য। প্রতিপাদিত হইয়াছে জীবের নিশ্বাস-প্রশ্বাসই সহজকর্ম্ম, এবং প্রণব বা ওঙ্কারই হইতেছে সহজমন্ত্র। প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টিতত্ত্ব, শক্তিসঞ্চার, পুরুষকার, গীতাধর্ম্ম, উপাসনা, কর্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ, ধ্যানযোগ, প্রাণায়াম, ষট্‌চক্র, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দুই-চারিটি স্থল (যথা, মানস-পূজা, পরাপূজা) ভিন্ন ইহাতে উপভোগ্য কিছুই নাই। গীতার ধর্ম্মামৃতের স্থলে আমাদের ভাগ্যে অধর্ম্ম-গরল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! এরূপ অদ্ভুত অসঙ্গত আধ্যাত্মিক শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা

ভগবদ্গীতায় আছে

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বং এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ ॥"

ইহার অর্থ—

পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ এবং প্রজাবর্গ একসঙ্গে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন "এই যজ্ঞ হইতে যাহা তোমরা চাও ফলাইয়া লও। এ তোমাদের অভীষ্টফল-প্রদাতা হোক। তোমরা ইহা দ্বারা দেবগণের হিতসাধন কর, আবার সেই দেবগণ তোমাদের হিতসাধন করুন। এইরূপে তোমরা পরস্পরের হিতসাধন করিলে, তাহাতে তোমাদের পরম মঙ্গল হইবে। দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছানুরূপ ভোগ-সামগ্রীসকল তোমাদিগকে দিবেন। তাঁহাদিগকে তাহার পাল্টা কিছুই না দিয়া যদি তাঁহাদের প্রদত্ত সামগ্রীসকল উপভোগ কর, তবে সেরূপ কার্য্য ভদ্রলোকের মতো কার্য্য

হইবে না—তাহা চোরের মতো কার্য্য হইবে। ইতি অর্থ সমাপ্ত। সত্যযুগে আমাদের আদিম পিতৃপুরুষেরা ঠিক ব্রহ্মার এই বচনটির অনুযায়ী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন।

সত্যযুগ কত পূর্ব্বে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং কতকাল ধরিয়া পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল—এটা মস্ত একটা **জাহাজের খবর**; আমার মতো আদা'র ব্যাপারীদের পক্ষে উহা নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা। এ বিষয়টির প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে প্রায়শই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশীয় পণ্ডিতচূড়ামণিরা তিল'কে তাল করিতে যেমন পটু, ইংরেজ পণ্ডিতচূড়ামণিরা তাল'কে তিল করিতে তেমি পটু। পণ্ডিতে পণ্ডিতে যেখানে গজকচ্ছপের যুদ্ধ চলিতেছে এইরূপ, সেখানে তোমার আমার মতো অপণ্ডিত লোকের কী কর্ত্তব্য—এবিষয়ের একটি সেরা উপদেশ দিয়াছিলেন আমাদিগকে **এক মহাত্মা** অর্দ্ধশতাব্দীর বছর চারপাঁচ পূর্ব্বে। মহাত্মা তিনি আর কেহ ন'ন—প্রেসিডেন্সি কালেজের বঙ্গীয় বিভাগের অযোধ্যাপুরীতে যাঁহার একাধিপত্যকালে আমরা নিত্যনবোৎসবপূর্ণ **রামরাজ্যে** বাস করিয়া ঘণ্টাদুঘণ্টাকাল পরম-সুখে যাপন করিতাম। হিতগর্ভ উপদেশটি সে এই :—

"পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী—আমার উপদেশ-মতে যদি চল' তবে তোমাদের ভয় নাই:—পরীক্ষা-পত্রের অন্তর্গত কোনো প্রশ্নের উত্তর লিখিবার সময় তোমাদের মনে "কলসের স তালব্য কি দন্ত্য" এরূপ যদি সংশয় উপস্থিত হয়, তবে "কলস" লিখিও না—লিখিও "ঘট"। এই গুরু-বাক্যটির জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় চৈতন্য লাভ করিয়া তদনুসারে—"সত্যযুগ পৃথিবীতে কবে অবতীর্ণ হইয়া কতকাল ধরিয়া বর্ত্তমান ছিল" তাহার তারিখের বিবরণবার্ত্তা আমার লেখনীর মুখ হইতে আমি ঘুণাক্ষরেও বাহির হইতে দিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাহার পরিবর্ত্তে আমি বলিতে চাই শুধু এই যে, আমাদের আদিম পিতৃপুরুষগণের অভ্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সত্যযুগ অবতীর্ণ হইয়াছিল, আর, সাময়িক জলবর্ষী আকাশ, শস্যশালিনী পৃথিবী, নির্ম্মল জলবায়ু, চন্দ্রসূর্য্য ওষধি বনস্পতি এই-সকল দেবতাদিগের কল্যাণে তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্তের সরস্বতী-তীরে ঘরদ্বার বাঁধিয়া স্ত্রীপুত্রপরিবার এবং অশ্বগবাদি লইয়া যত শতাব্দী ধরিয়া বা যত সহস্রাব্দী ধরিয়া সুখস্বচ্ছন্দে যাপন করিয়াছিলেন, ততকাল ধরিয়া সত্যযুগ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিল। তাহার পরে যখন তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য রাজাদিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সত্যযুগ তিরোভূত হইয়া ত্রেতাযুগ আবির্ভূত হইল। ত্রেতাযুগের প্রধান ঘটনা—(১) বর্ণভেদের বিধানব্যবস্থা; (২) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ; (৩) রামরাবণের যুদ্ধ। দ্বাপর-যুগের প্রধান ঘটনা—(১) কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ; (২) বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মণধর্ম্মের পুনঃসংস্করণ; (৩) বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানের উপরে যুগাবসানের যবনিকা-পতন। তাহার পরে যখন কলির যবনিকা উদ্ঘাটিত হইল, তখন নানাপ্রকার উপধর্ম্ম এবং অপধর্ম্ম রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া—বৌদ্ধ তীর্থস্থান যেমন গয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্মমন্দির যেমন জগন্নাথ-মন্দির, বৌদ্ধ সমদর্শিতা যেমন জগন্নাথ-ক্ষেত্রে সমাগত যাত্রীদিগের জাতিবিচার পরিবর্জ্জন, এই-সকল এবং আরো অনেকানেক বৌদ্ধধর্ম্মের নিজস্ব সম্পত্তি ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিতে লাগিল। তাহার পরে এই পাপের রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল মুসলমানের আক্রমণ হইতে। এ ছার প্রায়শ্চিত্তের কি অন্ত নাই? উহার অন্ত হইবে সেই শুভদিনে—যেদিন অপ এবং উপ এই দুই উপসর্গের রাহু কেতুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণধর্ম্ম ভারতবাসীদিগের চক্ষুতে জ্যোতি প্রদান করিবে, হস্তে আর মনে বলবীর্য্য প্রদান করিবে, এবং প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিবে।

দুর্বীন-দিয়া চন্দ্র দেখিবার সময় দর্শক যেমন আপনার চক্ষুর দৃষ্টি-সামর্থ্যের মতো করিয়া দুর্বীনের নলাঙ্গের দৈর্ঘ্য কমাইয়া বাড়াইয়া তাহার সন্ধান কেন্দ্র (focus) ঠিক্ করিয়া লন্, আমি তেমি আমার মনশ্চক্ষুর দৃষ্টি-সামর্থ্যের মতো করিয়া কালের যুগাঙ্গ কমাইয়া বাড়াইয়া তাহার সন্ধান-কেন্দ্র ঠিক করিয়া লইলাম।

সত্যযুগে ব্রহ্মাবর্ত্তনিবাসী আর্য্যসন্তানেরা পৃথিবী-জল-বায়ু-অগ্নি আকাশ-ওষধি-বনস্পতির নিকট হইতে যখন যাহা চাহিতেন তাহা হাত বাড়াইলেই পাইতেন। তাঁহারা পৃথিবীকে মাতা বলিয়া জানিতেন, আকাশকে পিতা বলিয়া জানিতেন, অগ্নিকে বন্ধু বলিয়া জানিতেন; তার সাক্ষী—

ঋক্‌বেদে আছে "দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবী মাতরধ্রুক্ অগ্নে"। ইহার অর্থ—"হে দ্যৌ পিতা, হে দোহনশীলা পৃথিবী মাতা, হে অগ্নি"। ইহা ব্যতীত প্রভাতের উষা, নিশীথের বরুণ, অন্তরীক্ষের মরুৎ, ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের ইন্দ্র, সবাই এঁরা তাঁহাদের প্রীতিভাজন পরম বন্ধু এবং পরম সহায় ছিলেন। সত্যযুগের ঋষিরা তাঁহাদের এই-সকল পরম হিতৈষী দেবতা-বন্ধুদিগকে যজ্ঞে আহ্বান করিয়া সোমরস, পশুমাংস এবং নবনব-রচিত শ্রবণমনোহর ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা তাঁহাদের বিধিমত্‌প্রকারে পরিতোষ সাধন করিতেন। কলিযুগের ছিদ্রান্বেষী মহাত্মারা ওকালতির সম্মোহনমন্ত্রে—দলভীত যে আমি—আমাকে স্বকৃ দলে টানিয়া সমস্বরে বলিবেন সন্দেহ নাই—"যাহাদের তুমি নাম করিলে সবই তো ভৌতিক বস্তু—দেবতা তাহাদের কোন্‌খানটায় তাহা তো দেখিতে পাইতেছি না!" দেখিতে পাইবেন তাঁহারা কেমন করিয়া? একে তো তাঁহাদের চক্ষু সবে-মাত্র একটি; তাহাতে আবার সে চক্ষুটিকে ভূতে পাইয়াছে এম্নি যে, তাহার দৃষ্টিক্ষেত্রে ভূত এবং ভৌতিক ছাড়া আর যে তিলমাত্রও কোনোকিছু নিপতিত হইবে তাহার পথ একেবারেই অবরুদ্ধ। পক্ষান্তরে, সত্যযুগের ছলকপটতাশূন্য সত্যনিষ্ঠ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ঋষিরা একযোগে তিন চক্ষে জগৎ দর্শন করিতেন; বাহিরের বিষয় দেখিতেন বহিশ্চক্ষে; অন্তরের তত্ত্ব দেখিতেন মনশ্চক্ষে; অন্তরতম পরম তত্ত্ব দেখিতেন ধ্যানচক্ষে; তিনই দেখিতেন একযোগে। এ বিষয়ে বেশী বাক্যব্যয় না করিয়া একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আমি দেখাইতেছি—তাহাই এখানকার পক্ষে যথেষ্ট।

ত্রিনেত্রের দৃষ্টান্ত।

সত্যযুগের ঋষিদিগের প্রাণের দেবতা-একটি ছিলেন অগ্নি। তাঁহাদের সেই প্রিয় অগ্নি দেবতা'কে তাঁহারা বহিশ্চক্ষে দেখিতেন বাহিরের অগ্নিমাত্র; মনশ্চক্ষে দেখিতেন অরণীকাষ্ঠের অন্তর্নিগূঢ় অগ্নি; ধ্যানচক্ষে দেখিতেন নিখিল বিশ্বভুবনের অন্তরতব পাপদাহক ব্রহ্মাত্মক তেজ। তার সাক্ষী—কঠোপনিষদে আছে

"অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ। দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভিরগ্নিঃ॥ এতদ্বৈ তৎ॥" ইহার অর্থ:—গর্ভিণী কর্ত্তৃক সুভৃত গর্ভের ন্যায় অরণী-কাষ্ঠের অন্তর্নিহিত এই যে অগ্নি—যাহা জাগন্ত ঘৃতপ্রদাতা মনুষ্যদিগের দিনে দিনে সম্ভজনীয়—ইহা নিশ্চয়ই তাহা, অর্থাৎ ইহা সেই পাপদহনকারী ব্রহ্মাত্মক তেজ যাহা গায়ত্রী মন্ত্রে সবিতৃদেবের (অর্থাৎ জগৎপ্রসবিতা দেবতার) বরণীয় ভর্গ বলিয়া গীত হইয়াছে। সায়নাচার্য্যকৃত গায়ত্রীভাষ্যে ভর্গঃ শব্দের অর্থ করা হইয়াছে এইরূপ—অবিদ্যাতৎকার্য্যয়ো র্ভর্জনাৎ ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ।" ইহার অর্থ—"ভর্গঃ" অর্থাৎ অবিদ্যা-এবং-অবিদ্যাপ্রসূত কার্য্যের ভর্জনকারী কিনা দহনকারী স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মক তেজ।

সত্যযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঋষিদিগের ধ্যানচক্ষুর তেজ নরমিয়া আসিতে লাগিল, আর, সেই তেজোহ্রাসজনিত অন্ধকারের সুবিধা পাইয়া তাঁহাদের অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে ফলাভিসন্ধি প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মাবর্ত্তের সরস্বতীও বালুকারাশির মধ্যে গা-ঢাকা দিলেন, আর, সেই সঙ্গে ঋষিদিগের নিষ্কামপ্রীতিবাহিনী ঋক্‌মন্ত্রের সরস্বতীও ফলকামনার মরুভূমিতে আত্মবিসর্জন করিলেন। এইরূপ রসহীন মনের অবস্থায় ত্রেতাযুগের ঋষিরা পূর্ব্বযুগের ঋষিদিগের প্রাণভরা মন্ত্রবাণী-সকলের সংহিতা বাঁধিয়া তাহা হইতে একপ্রকার দৈববিদ্যা গড়িয়া দাঁড় করাইলেন; গড়িয়া দাঁড় করাইয়া তাহার নাম দিলেন ব্রাহ্মণ-শাস্ত্র। ব্রাহ্মণ-শাস্ত্র কী? না কোন্ কোন্ মন্ত্র বা মন্ত্রাংশ কোন্ কোন্ দেবতার উদ্দেশে, কোন্ কোন্ যজ্ঞে, কাহার পরে কোন্‌টি উচ্চারণ করিতে হইবে, আর, মন্ত্রোচ্চারণ-কালে কিরূপ করণ এবং উপকরণ (অর্থাৎ যন্ত্র এবং দ্রব্য) কিরূপে ব্যবহার করিতে হইবে—এই-সমস্ত বিষয়ের বিধানশাস্ত্র। কার্য্যগতিকে ব্রাহ্মণশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখার অধ্যয়ন অধ্যাপন এবং বিধানসম্মত যজ্ঞাদির পৌরোহিত্য-কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন ঋষি-কুলের স্বাধিকারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহার পরে ব্রাহ্মণশাস্ত্রের এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন অধিকর্ত্তারা সাধারণত লোকসমক্ষে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। লোকসমাজের দল-বিভাগ শুধু কেবল ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর ব্যবচ্ছেদন পর্য্যন্তেই থামিয়া থাকিল না—দুগ্ধের এক স্থানে অম্ল নিপতিত হইলে যেমন তাহার আদ্যোপান্ত

সর্ব্বস্থান ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তেমি, ব্রাহ্মণশ্রেণীর ব্যবচ্ছেদন হইতে ভাঙিতে আরম্ভ করিয়া লোকসমাজ চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িল। চারিবর্ণ সে যে কি প্রকার তাহা কাহারো জানিতে বাকি নাই!—শ্বেতবর্ণ—শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—শস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয়; মলিন শ্যামবর্ণ—কৃষিবাণিজ্যজীবী বৈশ্য; কৃষ্ণবর্ণ—ভৃতিজীবী শূদ্র।

একদিকে ক্ষত্রিয় নরপতি এবং আর একদিকে ব্রাহ্মণ কুলপতি—দুয়ের মধ্যে বড় কে? ভূপাল বড় না ভূদেব বড়? এ প্রশ্নের যথাবৎ মীমাংসা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে অনেককাল যাবৎ হইয়া চুকিয়াছে। ক্ষমতাশালী রাজাদিগের মনের ইচ্ছা এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক যে, সকল লোকে তাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মান্য করুক্। লোকে কিন্তু রাজকীয় শক্তি অপেক্ষা দৈব শক্তিকে—রাজদণ্ড অপেক্ষা ব্রহ্মশাপ'কে—বেশী ভয় করে, আর সেই জন্য বেশী বড় বলিয়া মান্য করে। দেশসুদ্ধ লোকে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মান্য করে, দেশের রাজা তাহাকে আপনা অপেক্ষা বড় বলিয়া মান্য না করিয়া পার পাইবেন কিরূপে? এই কারণেই ক্ষত্রিয় নরপতিরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রাহ্মণ কুলপতিদিগের নিকটে মাথা হেঁট করিতে অগত্যা বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পুরাণে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, নরপতি বিশ্বামিত্র কুলপতি-বশিষ্ঠের গোধন বলপূর্ব্বক হরণ করিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'ন নাই। কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন আবার ছিলেন সহস্রবাহু অর্থাৎ আকাই একসহস্র বিশ্বামিত্র। এই ক্ষত্রিয়-মহাপুরুষটি জমদগ্নি-তপোধনের আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত আশ্রম লণ্ডভণ্ড করিয়া—হরণ করিবার মতো যখন আর কোন কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন তপোধন-মহাত্মা স্বয়ং আশ্রমে উপস্থিত না থাকাতে তাঁহার সর্ব্বস্বধন গোরু-বেচারিটির বৎস হরণ করিয়া তাঁহার মর্ম্মে বিষাক্ত শেল বিদ্ধ করিতে ত্রুটি করিলেন না। কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে তাঁহার এইপ্রকার বলোন্মত্ততার প্রতিফল যাহা দিলেন একটু পরেই পরশুরাম—এমন সর্ব্বনেশে প্রতিফল কেহ কখনো দেখে নাই শোনে নাই। উপর্য্যুপরি তিনি একুশবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করিলেন। পরশুরাম কিবারে একশত ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অন্ততঃ নিরেনব্বই জন হাতে রাখিয়া পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; কেননা রাগের মাথায় পৃথিবীকে একবার সমূলে নিক্ষত্রিয় করিয়া চুকিয়া, ফের-আবার তাহাকে নিক্ষত্রিয় করিতে উদ্যত হওয়াকে ঠিক্ যদিচ "শিরোনাস্তি-শিরঃপীড়া" বলা যাইতে পারে না, কিন্তু "শিরোনাস্তি-শিরশ্ছেদন" খুবই জোরের সহিত বলা যাইতে পারে।

ত্রেতাযুগের মধ্যমাঝে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ কুলপতিরা ক্ষত্রিয় নরপতিদিগের বাহুবল হইতে গোধন আগ্‌লিয়া রাখিতে যাওয়াসূত্রে দুইপক্ষের মধ্যে যোঝাযুঝি চলিয়াছিল গজকচ্ছপের যুদ্ধের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর, আর এক দিকে তেমনি শাস্ত্রী এবং শস্ত্রী উভয় পক্ষ স্ব স্ব অধিকারায়ত্ত বিদ্যাধন পরপক্ষের হাতের নাগাল হইতে সরাইয়া রাখিতে গিয়া পরস্পরের মধ্যে বাক্যবাণের ঠোক্‌রাঠুকরি চলিয়াছিল দম্পতি-কলহের ন্যায় অতি মনোহর। শেষোক্ত রহস্যটির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—(১) ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি আখ্যায়িকার মধ্যে এইরূপ—

গৌতম নামক কোনো ব্রাহ্মণ—পঞ্চালাধিপতি প্রবাহনের নিকটে গিয়া যখন তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন, তখন প্রবাহন রাজা মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন:—

বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণকে "বিদ্যা দিব না" বলিয়াও ফিরাইতে পারেন না, আর, এতকাল ধরিয়া যে-বিদ্যা ক্ষত্রিয়দিগের হস্তায়ত্ত ছিল তাহা ব্রাহ্মণের হস্তসাৎ করিতেও তাঁহার মন চাহিতেছে না। তিনি গৌতমকে বলিলেন কিছুকাল আপনি এখানে থাকুন্। বৎসরাবধি রাজসদনে অবস্থানের পর গৌতম যখন পুনর্ব্বার রাজার সমীপে আগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের প্রার্থনা জানাইলেন, রাজা তখন বলিলেন "আপনি আমাকে বিদ্যা-একটির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন না? বিদ্যাটি যখন আপনি চাহিয়াছেন, তখন আপনাকে তাহা আমি দিতে বাধ্য; কিন্তু এতকাল এ বিদ্যা ব্রাহ্মণেতে যায় নাই, আর সেই জন্য সারা পৃথিবার মধ্যে ক্ষত্রিয়দিগেরই ভিতরে এই বিদ্যার আদানপ্রদান এযাবৎকাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

(২) বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি আখ্যায়িকার মধ্যে এইরূপ :—

গার্গ্যনামে একজন গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকটে আসিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিব।" রাজা বলিলেন "এই কথাটা যাহা আপনি আমাকে বলিলেন ইহার জন্য আপনাকে সহস্র গো প্রদান করিব।" তাহার পরে গার্গ্য ব্রহ্মবিষয়ে যাহা তাঁহার বলিবার তাহা ক্রমান্বয়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন। যাহা যাহা তিনি বলিতে থাকিলেন সব-কথারই উত্তরে রাজা বলিতে লাগিলেন "উহা আমি জানি; অধিকন্তু আরো আমি যাহা জানি, তাহা এই" এইরূপ বলিয়া কথাগুলির বাকি পূরণ করিয়া দিতে লাগিলেন। তাহার পরে তিনি বলিলেন "আপনার কথা এই পর্য্যন্ত তো?" গার্গ্য বলিলেন "হাঁ।" রাজা বলিলেন "ঐটুকু জানিলে ব্রহ্ম জানা হয় না।" গার্গ্য বলিলেন "তবে আমিই আপনার নিকট ব্রহ্মবিদ্যার জন্য উপস্থিত হইলাম।" তখন অজাতশত্রু বলিলেন "এ বড় আশ্চর্য্য যে, ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন ক্ষত্রিয়ের নিকটে ব্রহ্ম জানিতে। আচ্ছা—জ্ঞাতব্য বিষয়টি আমি আপনাকে জ্ঞাপন করিব।"

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন এবং আদানপ্রদানের অধিকার'কে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের জাতীয় গণ্ডির মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে পারিয়া ওঠেন নাই। ইউরোপের অন্ধকেরে মধ্যমাঝে শাস্ত্রীয় বিদ্যার উপরে ধর্ম্মযাজকদিগের যেরূপ একাধিপত্য ছিল, আমাদের দেশে শাস্ত্রীয় বিদ্যার উপরে কোনোকালেই ব্রাহ্মণদিগের সেরূপ একাধিপত্য ছিল না;—একাধিপত্য ছিল না কেবল শাস্ত্রীয় **বিদ্যার** উপরে, নচেৎ, শাস্ত্রীয় বিধান-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন এবং ক্রিয়াকর্ম্মের সম্পাদনের উপরে তাঁহাদের একাধিপত্য খুবই ছিল; তখনই যে কেবল ছিল তাহা নহে—এখনও পর্য্যন্ত তাহা লোকসমাজে অটুট রহিয়াছে। একবার কেবল ইহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল,—বিশ্বামিত্র যখন ত্রিশঙ্কু-রাজার পৌরোহিত্যকার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতে পিছপাও হ'ন নাই। কিন্তু স্থল-বিশেষে এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম-ঘটনাতে, নিয়মের বলবত্তা পদস্খলিত হওয়া দূরে থাকুক তাহা সকৃদ্‌বিচ্যুতির প্রতিযোগিতাগুণে সুপরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়া জনসাধারণের মনে আরো দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হয়। ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ইতিহাসবার্ত্তা রামায়ণাদি কাব্য-পুরাণে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয় যে, ক্ষত্রিয় ভূপতিদিগের ভূ-রাজ্ঞীর গর্ভে শস্য অজন্মা হইলে অথবা গৃহ-রাজ্ঞীর গর্ভে পুত্র অজন্মা হইলে, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদিগের চরণে মস্তক অবনত না করিয়া তাঁহাদের পরিত্রাণলাভের উপায়ান্তর ছিল না। দশরথ রাজাকে তো ব্রাহ্মণেরা পাইয়া বসিয়াছিলেন বলিলেই হয়। তিনি যখন-যে-কোনো কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রয়োজন মনে করিতেন—মন্ত্রী-পুরোহিতদিগের অনুজ্ঞা না লইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন না। রামচন্দ্রও ব্রাহ্মণদিগের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন অতিশয়। রামায়ণের বালকাণ্ডের ৫৭ম সর্গের সর্ব্বশেষের শ্লোকে স্পষ্ট লেখা আছে :—

"ইক্ষাকুনাং হি সর্ব্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।"

ইহার অর্থ:—ইক্ষাকু বংশীয় রাজাদিগের পুরোহিতই পরমা গতি। মহাভারতে কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজাদিগের উপরে ব্রাহ্মণ-আধিপত্যের অমনতর বেজায় বাড়াবাড়ি কোনো স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, বিরাট প্রভৃতি রাজাদিগের রাজসভায় ব্রাহ্মণের গলা'র বড় একটা সাড়াশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। ত্রেতাযুগের রামাবতার ছিলেন সাদাসীধা ক্ষত্রিয়বীর; পরন্তু দ্বাপরযুগের কৃষ্ণাবতার ছিলেন স্বতন্ত্রপ্রকৃতির মহাত্মা। তিনি ছিলেন **উপেন্দ্র**, অর্থাৎ সহস্রনেত্রের ছোটো ভাই শতনেত্র—তাঁহার চক্ষু ছিল শত দিকে। শ্রীকৃষ্ণকে তাই ব্রাহ্মণ কুলপতিরা আপনাদের হাতে বাগাইয়া আনিতে ইচ্ছানুরূপ পারিয়া ওঠেন নাই। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া এই যে একটি কথা বাহির করানো হইয়াছে—"বেদবাদী মূর্খদিগের (অর্থাৎ যাজক ব্রাহ্মণদিগের) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিবিষয়ক প্রলোভন-বাক্যে যাহাদের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, সেই-সকল ভোগৈশ্বর্য্য-লোলুপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমাধিতে মন বসানো অসম্ভব"—ইহাতেই আকা ইঙ্গিতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কাহারো কোনোপ্রকার ভেল্কিবাজিতে ভুলিবার পাত্র ছিলেন না।

ফল কথা এই যে, দ্বাপর যুগের আগমনের যখন আর বড় বিলম্ব নাই, সেই সময় হইতে আমাদের দেশে ব্রহ্মণ্য শাস্ত্রের উপরে (অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি, কর্ম্মকাণ্ডের বিধান-শাস্ত্রের উপরে) অনেকের মনে অনেকপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহা হইবারই কথা:—যাঁহারা যাজক ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া তাঁহাদিগকে দিয়া পুত্রার্থে যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া লইলেন, তাঁহাদের পাঁচজনের মধ্যে দুইজনের পুত্র হইল—বাকি তিনজনের হইল না! যাঁহারা ধনবৃদ্ধির উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া লইলেন—ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি অনুষ্ঠেয় কার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহের দায়ে পড়িয়া তাঁহাদের ধনক্ষয়ের চূড়ান্ত হইল—ধনবৃদ্ধির আশা সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া গেল। যাগযজ্ঞকর্ত্তাদিগের এইরূপ ভস্মে ঘৃতাহুতি চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বিবেচক ব্যক্তিরা যে ব্রহ্মণ্যশাস্ত্রের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইবেন ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। যখন কিন্তু দুর্দ্দমনীয় সংশয় ব্রহ্মণ্যশাস্ত্রের দুর্গপ্রাচীরের নানা স্থানের নানা ছিদ্রের মধ্য দিয়া ভূরিদক্ষিণ ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল, তখন বাস্তবিকই তাহা ব্রাহ্মণ কুলপতিদিগের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল। কেননা তখনকার কালের ব্রাহ্মণ কুলপতিদের মনোমধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান যেমন ছিল, তেমনি তাহার একপার্শ্বে এ জ্ঞানটাও চাপাচুপি দেওয়া ছিল যে, ক্ষত্রিয় রাজাদিগের হাত বন্ধ হওয়ার নামই মধ্যবিত্ত এবং দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা-সংস্থানের পথ বন্ধ হওয়া। কিন্তু আবার এটাও দ্রষ্টব্য যে, যুক্তিগর্ভ সংশয় একপ্রকার সাংক্রামিক ব্যাধি; তাহাকে পরিমিত গণ্ডির মধ্যে আটকাইয়া রাখা অসম্ভব। অল্পে অল্পে ক্রমশ ক্রমশ যাজ্ঞবল্ক্য-মুখ্য ব্রাহ্মণ কুলপতিদিগের গাত্রে জনক-মুখ্য ক্ষত্রিয় নরপতিদিগের বাতাস লাগিতে আরম্ভ করিল, আর, সেই গতিকে ব্রাহ্মণ কুলপতিদিগের মনোমধ্যে তাঁহাদের আপনাদেরই প্রবর্ত্তিত যাগযজ্ঞাদি-ভূয়িষ্ঠ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি সংশয় দেখা দিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কুলপতিদিগের ক্রমে যখন চক্ষু ফুটিল তখন তাঁহারা প্রকৃত সত্যের জন্য লালায়িত হইলেন। তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিলেন "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?" ইহার অর্থ এই যে, "কোন্ দেবতাকে হবিদ্বারা সেবার্চ্চনা করিব?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তাঁহাদের মনোমধ্যে ব্রহ্ম শব্দের নিগূঢ় অর্থটি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পরিত্যক্ত যজ্ঞবেদী অধিকার করিয়া বসিল।

ঋক্‌বেদে ব্রহ্মশব্দের গোড়া'র অর্থটির সন্ধান পাওয়া যায় এইরূপ:—"প্রাচৈর্দেবাসঃ প্রণয়ন্তি দেবযুং ব্রহ্মপ্রিয়ং জোষয়ন্তে বরা ইব।" ইহার অর্থ:—

"(হে ইন্দ্র) সকল দেবতারা দেবগণের আহ্বানকারী যজ্ঞপাত্র'কে তোমার সম্মুখে ধারণ করে, আর, ব্রহ্মপ্রিয় যে তুমি—তোমাকে সেবা করে, বরগণ যেমন কন্যাকে।" সায়নাচার্য্যকৃত ভাষ্যে "ব্রহ্মপ্রিয়" এই বচনটির এখানে অর্থ করা হইয়াছে স্তোত্রপ্রিয়। ঋক্-বেদের আরএক স্থানে আছে "প্র সম্রাজে বৃহৎ অর্চ্চা গভীরং ব্রহ্মপ্রিয়ং বরুণায়"। ইহার অর্থ:—"সম্রাট এবং বহুশ্রুত বরুণের উদ্দেশে প্রিয় ব্রহ্ম উচ্চারণ কর।" সায়নাচার্য্যকৃত ভাষ্যে "প্রিয় ব্রহ্ম" এই বচনটির এখানে অর্থ করা হইয়াছে প্রিয় বাণী। তবেই হইতেছে যে, ব্রহ্মশব্দের গোড়া'র অর্থ—বাণী, বিশেষত স্তোত্র-বাণী। তখনকার কালের স্তোত্র-রচয়িতা কবিদিগের মুখ দিয়া যে-সকল প্রাণভরা দেবোন্মুখী বাণী বাহির হইত তাহাকে বলা হইত "মন্ত্র"—মন হইতে উত্থিত এই অর্থে মন্ত্র; যেমন ঋক্‌মন্ত্র, ওঙ্কারমন্ত্র, গায়ত্রীমন্ত্র, ইত্যাদি। ইহাই ব্রহ্মশব্দের গোড়া'র অর্থ।

ব্রাহ্মণ কুলপতিদিগের মনোমধ্যে যখন হবির্ভুক্ দেবতাগণের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, তখন তাঁহাদের মনের অবস্থা হইল এইরূপ দ্বৈধাক্রান্ত যে, **ভিতরে** রহিয়াছে দেবোন্মুখী মন্ত্রবাণী বলবতী অথচ **বাহিরে** দেবতা কেহ আছেন কি না সন্দেহ। ক্রমে ভিতরের সেই বাণীকেই—ব্রহ্মকেই—একমাত্র সার সত্য বলিয়া তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল। তাহার কিয়ৎকাল পরে তাঁহাদের মনোমধ্যে জিজ্ঞাসা যাহা উপস্থিত হইল, আর, তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর যাহা আসিল, তাহা ঋক্‌বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ষ্টি সূক্তে ৩৪।৩৫শ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ:—

"পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম।
ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম॥"

ইহার অর্থ:—"জিজ্ঞাসা করি বাণীর পরম প্রতিষ্ঠা কে?

ব্রহ্মা-ইনি বাণীর পরম প্রতিষ্ঠা।" এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আদিম বৈদিক কালে দেবোন্মুখী মন্ত্রবাণীর নাম ছিল ব্রহ্ম, আর, যে-দেবতা সেই বাণীর পরম প্রতিষ্ঠা সেই জগৎপিতা পরম দেবতার নাম দেওয়া হইয়াছিল ব্রহ্মা।

এতক্ষণে, আমাদের দেশের গোড়া'র শাস্ত্রের একটি মর্ম্মগত ভিতরের কথার রহস্য সমাচার জানিতে পারা গেল; সে কথা এই যে, আত্মার গভীর প্রদেশ হইতে দেবোন্মুখী মন্ত্রবাণী যখন যাহা উত্থিত হয় (যেমন ওঙ্কার বাণী) তাহার পরম প্রতিষ্ঠা আর কেহ না—সওয়ায় সেই পরম দেবতা যিনি সর্ব্বজগতের পিতা! প্রকৃত কথা এই যে, ভবনদীর এপারে জীবাত্মা, ওপারে পরমাত্মা, এরূপ অবস্থায়—সম্মিলন-ঘটনের পূর্ব্বে আত্মা-পরমাত্মার মধ্যে বাণীবিনিময় অনিবার্য্য:—আর্ত্তের ক্রন্দনবাণী জীবাত্মা হইতে উত্থিত হয়, মাতার আশ্বাসবাণী পরমাত্মা হইতে অবতীর্ণ হয়; ভক্তের স্তোত্রবাণী জীবাত্মা হইতে উত্থিত হয়, পিতার কল্যাণ-বাণী পরমাত্মা হইতে অবতীর্ণ হয়; প্রাণের আকাঙ্ক্ষাবাণী জীবাত্মা হইতে উত্থিত হয়—অনির্বচনীয় রসপূর্ণ প্রেমের মধুর বাণী পরমাত্মা হইতে অবতীর্ণ হয়। পরমাত্মার নানারসবৃত মঙ্গলবাণীতে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল ভরা রহিয়াছে—যাঁহার কর্ণ আছে তিনি শুনিতে পা'ন। ঋক্-বেদে আছে—

> "অহং সুবে পিতরম্ অস্য মূর্ধন্।
> মম যোনি রপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
> ততো বি তিষ্ঠে ভবনানু বিশ্বা
> উতামূং দ্যাং বর্ষ্মণা উপস্পৃশামি।"

ইহার অর্থ:—"(বাণী বলিতেছেন) ইহার (অর্থাৎ এই পৃথিবীর) মূর্দ্ধস্থিত পিতা-আকাশকে আমি প্রসব করিয়াছি। আমার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রের গভীরে পরিব্যাপ্ত জলরাশিতে। সেখান হইতে উত্থান করিয়া আমি সমস্ত ভুবনে পরিব্যাপ্ত হই এবং ভুবন ছাড়াইয়া ঐ দ্যুতিমান্ আকাশ শরীরদ্বারা স্পর্শ করি।" ঋক্‌বেদের আরএক স্থানে আছে "সরস্বতী সাধয়ন্তী ধিয়ং নঃ। ইলা দেবী ভারতী বিশ্বতূর্ত্তিঃ।" ইহার অর্থ:—"সরস্বতী আমাদের বুদ্ধি সাধন করিতেছেন:—সেই ইলা—সেই দেবী ভারতী যিনি সর্ব্ববিষয়গতা—তিনি আমাদের বুদ্ধি সাধন করিতেছেন।" এই দুই ঋক্‌মন্ত্র জোড়া দিয়া তাহার মধ্য হইতে আমরা পাইতেছি যে, যে-বাণী সমুদ্রের গভীর অন্তস্তল হইতে উত্থান করিয়া সমস্ত ভুবন এবং ভুবন ছাড়াইয়া দ্যৌ (অর্থাৎ দ্যুতিমান্ আকাশ) স্পর্শ করে, জগৎপিতা ব্রহ্মার (বা অপর ব্রহ্মের) সেই বাণী—সেই দেবী ভারতী আমাদের বুদ্ধি সাধন করিতেছেন। পরমাত্মার বাণী এবং জ্যোতি পুরাণতন্ত্রাদিতে নাদ এবং বিন্দু নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে। * বিন্দু কি? না সমস্ত জগতের কেন্দ্রস্থিত সেই শুদ্ধসত্ত্বখ্যাসা রজক্ষ ত্রিরূপী সূর্য্যাতি-সূর্য্য যাহা জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার সৃষ্টিশক্তি মূর্ত্তিমতী, এককথায়—সাবিত্রী। বেদোক্ত অপর-ব্রহ্মের বাণী সেই যে সরস্বতী দেবী, আর, জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার জ্যোতিঃসেই যে সাবিত্রী দেবী, দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই একটুও। ইনিই ব্রহ্মজ্ঞানার্থী সাধকগণকে বুদ্ধি প্রদান করেন—ইনিই পরাবিদ্যার মূল উৎস। †

* ওঁ-অক্ষরের মূর্দ্ধস্থিত চন্দ্রবিন্দুটি একরূপ সাঙ্কেতিক ভাষা (hieroglyphic)। নাদ—কালে প্রবাহিত হয়, বিন্দু—আকাশে প্রতিষ্ঠিত। কালে যাহা পরিবর্ত্তিত হয় তাহার মূর্ত্তিমান আদর্শ ক্ষয়বৃদ্ধিশীল চন্দ্র, আর, আকাশে যাহা স্থিরপ্রতিষ্ঠিত তাহার মূর্ত্তিমান্ আদর্শ সূর্য্য বা সৌরজগতের জ্যোতিষ্কেন্দ্র। ঁ এই চন্দ্রবিন্দু-সংজ্ঞক রেখাঙ্কটির অর্থ পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত অপরিবর্ত্তনীয় পুরুষ।

† এ যাহা বলা হইল তাহার যবনিকার আড়ালে তত্ত্ব-একটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এম্নি নিগূঢ় যে, তাহা কথায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ওঙ্কার-নাদ কালে প্রবাহিত হয়, আর, জগতের মূলস্থিত জ্যোতিষ্কেন্দ্র বা সূর্য্যাতিসূর্য্য আকাশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ত্রিকালাতীত এবং আকাশাতীত পরব্রহ্মকে ওঙ্কাররূপে বা জ্যোতির জ্যোতিরূপে ধ্যান করিবার তবে সার্থকতা কি? এ প্রশ্নটি প্রশান্তচিত্তে মনে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়—মুখে বলিবার কহিবার বিষয় নহে। জড়পদার্থের অপরিহার্য্য ধর্ম্ম অনবগাহ্যতা (Impenitrability); চেতনপদার্থের অপরিহার্য্য ধর্ম্ম অনিরুদ্ধতা। অগ্নি যেমন বস্ত্রের বন্ধন মানে না—চেতন পদার্থ তেমনি কালেরও বন্ধন মানে না, দেশেরও বন্ধন মানে না। এমত স্থলে সেণ্ট অগষ্টাইন্ (St. Augustine) যে দুইটি কথা ইঙ্গিত-ইসারায় বলিয়াছেন তাহা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে শিরোধার্য্য। একটি কথা এই যে God is Eternal Now পরমাত্মা নিত্য সদোবর্ত্তমান; আরেকটি কথা এই যে God is a circle whose centre is everywhere and circumference nowhere পরমাত্মা এম্নি এক অখণ্ড মণ্ডল যাহার কেন্দ্র সর্ব্বস্থানে, পরিধি কোথাও না। তাই আমাদের দেশের সর্ব্বশাস্ত্রেই এক-বাক্যে বলে যে সমস্ত বিশ্বভুবনের জ্যোতিষ্কেন্দ্র সেই যে সূর্য্যাতি-সূর্য্য তাহা বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডেও যেমন—ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি—উভয় ব্রহ্মাণ্ডেই প্রতিনিয়ত স্ফূর্য্যমান; তদ্বৎ, নিখিল বিশ্বভুবনের দেবোন্মুখী মন্ত্রবাণী সেই যে, ওঙ্কার, তাহা বৃহৎব্রহ্মাণ্ডেও যেমন—ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি—উভয় ব্রহ্মাণ্ডেই প্রতিনিয়ত গীয়মান ক্রমশঃ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশের কথা

বাঁকুড়ার অবস্থার কোনো উন্নতি দেখা যাইতেছে না। শীঘ্র যে অবস্থান্তর ঘটিবে এমন লক্ষণও নাই। দেশবাসীর দুঃখ যাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে তাঁরা যথাসাধ্য সাহায্য করুন। "বাঁকুড়া-দর্পণে" প্রকাশ—

দীর্ঘকাল বারিপাত না হওয়ায় জেলায় সর্ব্বত্রই জলকষ্ট হইয়াছে। বাঁধ পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় শুকাইয়া গিয়াছে। নানাস্থান হইতে বসন্ত, বিসূচিকা প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার সংবাদ আসিতেছে। গবাদি পশুর খাদ্যাভাব হইয়াছে। বিচালি অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। বনে, মাঠে কোথাও তৃণ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কি খাওয়াইয়া যে গো-ধন রক্ষা করিবে তাহা লোকে ভাবিয়া পাইতেছে না।

দরিদ্র মধ্যশ্রেণীর লোকের কষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহারা কুলির ন্যায় মাটি কাটিতে অভ্যস্ত নহেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি যে-সকল লোক এতদিন কেবল কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন বিষম দুর্দ্দশায় পড়িয়াছেন। তাঁহাদের ১০।২০ বিঘা জমি আছে, মুনিস মান্দার রাখিয়া কৃষিজাত শস্যদ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এবৎসর ধান্য আদৌ জন্মে নাই, বস্ত্র, লবণ, তৈজসপত্র আদি সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য; কাজেই তাঁহাদের অন্নবস্ত্র উভয়েরই অভাব হইয়াছে। জমি বন্ধক পড়িয়াছে; আর ঋণ মিলিতেছে না। মজুর-শ্রেণী খাটিয়া খাইতেছে; অন্ধ, খঞ্জ, অক্ষম ব্যক্তিগণ ভিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু এইরূপ দরিদ্র মধ্যশ্রেণীর লোকের জীবন রক্ষার উপায় কি?

বাংলা দেশে স্বদেশী প্রবর্ত্তনের সময় হইতে দেখিয়া আসিতেছি যাঁর যে কাজ নয় তিনিই সেই কাজ করিতে অগ্রসর। শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় সম্বন্ধে যাঁদের কোনো অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা নাই তাঁরাই হন কারখানার ডিরেক্‌টার। এই-সব অনাড়ির হাতে পড়িয়া কত কোম্পানির দফা রফা হইল। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও এই ভাব; "রায়ত" লিখিয়াছেন—

দেশবাসীর অভাব অভিযোগের সীমা পরিসীমা নাই। পল্লীগ্রামবাসী নিরীহ দরিদ্র শ্রেণীর নানা দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিলে পাষাণ ফাটিয়া যাইতে চায়। যে-সমস্ত লোক ব্যবস্থাপক সভায় সেই দেশ-ও পল্লীবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপে আসন গ্রহণ করিবেন, পল্লী-জীবসম্পদ যদি তাঁহারা অজ্ঞাত থাকেন, তবে সেখানে যাইয়া কি ঘাস কাটিবেন? কাজেই খাতিরে পড়িয়া আমরা এরূপ শ্রেণীর সহরবাসী ফুলবাবুকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী নহি। হউন তিনি আইনজ্ঞ বক্তৃতাবীর, হউন তিনি বি-এ এম-এ ডিগ্রিধারী মহাপুরুষ হউন তিনি রাজা মহারাজা জমিদার বা দ্বিতল-ত্রিতল-অট্টালিকা-বাসী। পল্লীবাসীর অভাব অভিযোগ যিনি রাজদ্বারে জানাইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন, তিনি পল্লীবাসীর পল্লীর পরিচিত হন, ইহা আমাদের একান্ত আশা।

"মোহাম্মাদী"র লেখায় আমরা প্রায়ই চিন্তাশীলতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় পাইয়া থাকি। ইহা সুখের বিষয়। কারণ ঐ দুইটি গুণ না থাকিলে কোনো সংবাদপত্র দেশের কোনো কাজে লাগিতে পারে না। আর একটি গুণ থাকা দরকার, সেটি নির্ভীকতা; "মোহাম্মাদী"র তাহাও আছে। মুসলমানদের ত্রুটী সম্বন্ধে "মোহাম্মাদী" বলেন—

আমাদের ত্রুটী পদে পদে। আমরা যে কি, আমাদের ধর্ম্ম যে কিরূপ মহান, আমাদের পয়গম্বর যে কিরূপ মহিমান্বিত মহাপুরুষ, আমাদের ইতিহাস যে কিপ্রকার গৌরবময়, তাহা আমরা দেশবাসীকে দেখাইতে শিখাইতে চেষ্টা করি নাই। কোরআনের বঙ্গানুবাদ করিলেন প্রথমে একজন হিন্দু। হজরতের জীবনচরিত পর পর দুইজন হিন্দুকর্ত্তৃক লিখিত হইল, তোমার সাধুসজ্জনগণের চরিত্রের মহিমা বঙ্গবাসীর সম্মুখে প্রথমে উপস্থিত করিল হিন্দু, তোমার পয়গম্বরের হাদিস তুমি প্রথম শুনিলে হিন্দুর মুখে। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী পার্সী হইতে বঙ্গানুবাদ করিলেন হিন্দু, ওমর খাঁইয়ামের কাব্যের স্বাদ পাইলে তুমি হিন্দু লেখক ও লেখিকার নিকট, আর তোমার জাতীয় ইতিহাসের কলঙ্ক স্খালন করিতেছেন অক্ষয়চন্দ্র নিখিলনাথ যদুনাথ প্রভৃতি! তুমি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বঙ্কিম প্রমুখ লেখকদিগকে গালাগালি দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই কর নাই। করিতে পার না ততদিন—যতদিন জাতীয় ভাষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষাকে তুমি আয়ত্তাধীন করিতে না পার। তোমার যাহা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অনুবাদের অনুবাদ, পরের মুখে ঝাল খাওয়া সাত-নকলে আসল খাস্তা। হিন্দু নিজের জাতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের দ্বারা তোমাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, তুমি প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া কেবল হাহাকার করিতেছ। তুমি সত্যের বিকাশের জন্য, আপনার স্বরূপ প্রকাশের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, তাহা হইলেই দেশবাসী তোমাকে চিনিতে পারিবে।

আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারের একটি অন্তরায় কী? "মোহাম্মাদী"র উত্তর মিথ্যা নয়—

প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ উচ্চতম হইতে নিম্নতর প্রত্যেক পরিদর্শক কর্ম্মচারীর ভয়ে কম্পমান। সকলের মন জোগাইতে তাঁহারা বাধ্য। আজকাল শিক্ষা-বিভাগের অধিকাংশ অর্থই শিক্ষার পরিবর্ত্তে শিক্ষার তাদারকে ব্যয় করা হইয়া থাকে। আবার এই তাদারক-তদন্তে শিক্ষা অপেক্ষা স্কুলের খাতাপত্র ও স্কুলঘরের বেড়া, চাল ও ফুলবাগানের প্রসঙ্গটাই অধিক উঠিয়া থাকে। ফলতঃ তদন্ত যথেষ্ট হইয়া থাকে। কারণ আইনের বজ্রবাঁধন খুবই আছে। তাদারক তদন্তের বিরোধী আমরা নহি। কিন্তু কথা হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল বা বোর্ডস্কুলের যে-সকল হতভাগ্য শিক্ষক এই তদন্তের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া, ও গ্রামবাসী বিভিন্ন মতাবলম্বী 'মোড়ল'দিগের মন জোগাইয়া, ৩০ দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া আসিতেছে, যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সাহায্য বা বেতন—অনুপাতে যাহা অতি সামান্য—তাহারা নিয়মিতরূপে মাসে মাসে পাইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থাও তাহাদের জন্য সম্ভবপর হয় না কি?

নারীনিগ্রহ-প্রসঙ্গে "মোহাম্মাদী" লিখিয়াছেন—

দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নারীনিগ্রহের যতগুলি বর্ণনা বাহির হয়, তাহার শতকরা ৯০ টিতে মুসলমান আসামীর উল্লেখ দেখা যায়। দুর্বৃত্তদিগের প্রতি কঠোরতর দণ্ড বিধানেরও ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু অপরাধের সংখ্যা কমিতেছে না, মুসলমানের এই কলঙ্কের বোঝা লঘু হইতেছে না। কেবল রাজকীয় দণ্ডের দ্বারা কোন দেশেই অপরাধের

রাবণের কৈলাস উত্তোলন চিত্র

ক্ষেপার গান।

পাগল হ'তে পাল্লাম কই ?
লোকে আমায় পাগল বলে—
আমি ত সে পাগল নই।
পাগল হ'তে পাল্লে কি আর
পাপ সংসারে পড়ে রই,
মিছে ভূতের বেগার খেটে মরি
আর পাপের বোঝা মাথায় বই।
পাগল যেজন এ সংসারে জানে না সে সেজন বই,
বাসনাকে জয় করে সে হয়েছে রে বিশ্বজয়ী।
যেজন অনুরাগী সর্ব্বত্যাগী
শুদ্ধ পাগল তারে কই,
যার গৃহ শ্মশান দুই সমান তার চরণ-ধূলি মাথায় লই
ক্ষেপা বলে হায় কি দশা করছি শুধু হৈ রৈ চৈ,
আমি পাগল সাজতে বড়ই পটু,
আসল কাজে নিশান-সই। (ঢেরা-সই)

সংগ্রাহক—শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

(৭)

ওরে মন, কেবা পার করে,
আমি কাঁদিয়া আকুল হইলাম বসে নদীর পারে।
নাউ আছে কাণ্ডারী নাই,
মানুষ নাই ওপারে,
পাটনী তার নাম জানি না
ডাক দিব কারে—কেবা পার করে।
সুসময়ে দিন কাটাইলাম,
অসময়ে এলাম নদীর পারে।
সেই নদীতে কালকুমীর
উঠেছে সেই বালুচরে
আমায় কখন জানি ধইরা নিবেরে
প্রাণ কাঁপে ডরে।
ভাই বল বন্ধু বল সঙ্গে নিবা কারে।
সঙ্গে আছে ছয় বম্বেটে আগে পাছে ফেরে
সময় মত লাগাল পাইলে সব নিয়ে যায় কেড়ে।
খেউয়ার কড়ি নাই মোর সাথে পার হইব কিসে,
গুরু বিনা পারের বন্ধু কে আছে সংসারে।
অধম জেনে দয়াল গুরু তরায়ে নাও মোরে
কেবা পার করে।

(৮)

আমার নাউনি ডুবে চাইও রে
ওরে মাঝি খবরদার।
খবরদার পাহারাদার
নিতাই চৌকিদার রে।
মস্তুল তুলিয়া মাঝি চারিদিকে চায়,
সুবাতাস পাইয়া মাঝি রঙ্গের পাল উড়ায়।
আইড়া কোণ * ধইরা সাজ
দেওয়ায় মারল ডাক,
ভাঙ্গল নায়ের চাড়ী বৈঠা
নায়ে মারল পাক।
আমার নাউনি ডুবে—ইত্যাদি।
মাঝি বাইয়া যাওরে, মাঝি বাইয়া যাওরে
এ লহর দরিয়ার মাঝে, আমার ভাঙ্গা নাওরে,
মাঝি বাইয়া যাওরে।
কুমারের হাড়ি পাতিল ভাঙ্গলে না লয় জোড়া,
এমন সোনার তনু, কেমনে যাবে পোড়া।
মাঝি বাইয়া যাওরে * * * ভাঙ্গা নাওয়ে।

* বায়ুকোণ।

প্রথম গানটি একজন লোকের নিকট শোনা, রচয়িতার কোন পরিচয় বলিতে পারিল না। ২য় গানটি আমাদের গ্রামেরই একজন নমশূদ্র মাঝির নিকট শুনিয়াছিলাম; ইহার আরও পদ বোধ হয় আছে কিন্তু সবটা বলিতে পারিল না।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত।

বিগত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসীর' হারামণি-বিভাগে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দত্তরায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত "মাঝি বাহিয়া যাওরে, এ-লহর দরিয়া-মাঝে, আমার ভাঙ্গা নাওরে" শীর্ষক সংগীতটি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও ঐ সঙ্গীতটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু দত্তরায় মহাশয়ের সংগৃহীত গানের সহিত আমাদের গানের বিস্তর পাঠান্তর দৃষ্ট হওয়াতে পাঠকগণের জন্য উহা প্রকাশিত হইল। আর সংগ্রহকর্ত্তা উক্ত গানের রচয়িতার সন্ধান করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা তাহা পারিয়াছি। বিক্রমপুরান্তঃগত ষোলঘর গ্রাম নিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব পূর্ণচন্দ্রমল্লিক মহাশয়ই এই গানটি রচনা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। বিক্রমপুরাঞ্চলে এইরূপ ধরণের গানগুলি "রাগের" গান বলিয়া পরিচিত।

যখন মাঝিগণ অনুকূল বাতাসে পাল দৌড়াইয়া যায় তখন নৌকার ছাদের উপর মণ্ডলাকারে বসিয়া তাহারা এইরূপ ধরণের অনেক গান করিয়া থাকে।

শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তী।

আগে যদি জান্‌তেম রে মনাই, মাঝি এমন চোর
তবে কিরে জায়গা দিতান দোমাল্লার উপর।
মাঝি বাইয়া যাওরে * * * ভাঙ্গা নাওরে।
স্ত্রী হৈল পায়ের বেড়ী, পুত্র হৈল কাল,
এড়াইতে না পাল্লাম আমি এ ভব-জঞ্জাল।
মাঝি বাইয়া যাওরে * * *
শত বরণ গাভীরে মনাই, একই বরণ দুধ,
আপন মনে ভেবে দেখ, আমরা একই মায়ের পুত।
মাঝি বাইয়া যাওরে * * *
কামারের "হাইতনা" যেমন ঘন ঘন তায়
সেই রকম দেহের মালিক আসে আর যায়।
মাঝি বাইয়া যাওরে * * *
ঘরখানি বাঁধরে মনাই দুয়ারখানি ছান্দ
আপনে মরিয়ারে যাইবা কার লাইগা কান্দ।
মাঝি বাইয়া যাওরে * * *

(গায়কের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, কোন পরিবর্তন না করিয়া তাহাই লিখিয়াছি)

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ

(১)

বোম্বাই নগরে গত ৩০শে ডিসেম্বর ভারতীয়-সামাজিক-সমিতির যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল তাহার সভাপতি অধ্যাপক ঢোণ্ডে কেশব কার্ভে মহাশয় তাঁহার সভাপতির অভিভাষণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শের এক নূতন ইঙ্গিত করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার অভিভাষণ পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তিনি স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগীদিগকে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

(১) "শিক্ষার্থিনীকে মাতৃভাষার সাহায্যে অল্লায়াসে শিক্ষাদান করা যাইতে পারে।" (২) "মহিলাদিগের যে-সকল সামাজিক কর্ত্তব্যসাধন করিতে হয় সেইগুলি পুরুষদিগের কর্ত্তব্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।" প্রথম বিষয়টি লইয়া দৈনিক এবং মাসিক পত্রে অনেক দিন ধরিয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে এরূপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা অনুভব করিয়া এবং কেহই এ বিষয়ে আলোচনা করিতে অগ্রসর হন নাই দেখিয়া আমি আমার ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের সহিত, বালক, এবং বালিকা, প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী এবং পুরুষ একই ভাবে শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছে, ইহারা একই বিষয় পাঠ করে, একই বিষয় অধ্যয়ন করে, একরূপভাবেই পরীক্ষা দেয়, কেবল স্বতন্ত্রস্থানে পাঠাভ্যাস করে। আমাদের স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগী সমাজসংস্কারকগণ যে বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্ররূপ শিক্ষার ব্যবস্থার অভাব অনুভব করেন নাই তাহা বলা চলে না। মহাত্মা কেশবচন্দ্র 'নিকেতন' স্থাপনের সময় এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ ভিক্টোরিয়া বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের সময় বিজ্ঞানসম্মত সেবা, রন্ধন প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাত্মা আনন্দমোহন ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ও এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে বিদ্যালয়ে স্থান পায় তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু। কালের স্রোতে সে-সকল কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, এখন ন-মাসে ছ-মাসে এইরূপ বিষয়ে এক একটি বক্তৃতার ব্যবস্থার মধ্যে ইহার অস্তিত্ব মাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

স্ত্রীশিক্ষার ভিন্ন ব্যবস্থার উল্লেখমাত্রে নরনারীর সমান অধিকারবাদী একদল স্ত্রী এবং পুরুষ বলিয়া উঠেন যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের অপেক্ষা কিসে কম যে পুরুষদিগের সহিত তাহাদের সমানভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে না। তাঁহাদের বিশ্বাস এইরূপ ভিন্ন ব্যবস্থার প্রস্তাব দ্বারা স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তির উপরই কলঙ্ক আরোপ করা হয়। স্ত্রীশিক্ষার ভিন্ন ব্যবস্থার প্রস্তাব যে নারীদিগের বুদ্ধিবৃত্তির হীনতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া উত্থাপিত হয় এরূপ বিশ্বাস করিবার হেতু আজকাল আর নাই। স্ত্রীলোকেরা যে বুদ্ধিবৃত্তিতে এবং জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহায় পুরুষদিগের সমকক্ষ তাহা বিদেশে বহুকাল স্বীকৃত হইয়াছে এবং আমাদের দেশেও তাহা প্রত্যক্ষ ব্যাপার। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে স্ত্রীলোকের শিক্ষার ভিন্ন আদর্শ এবং ব্যবস্থার কথা উত্থাপিত হইতেছে এবং সামাজিক মহাসমিতির সভাপতি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ যে আমরা এই শিক্ষার প্রভাবেই দেখিতে পাইতেছি যে নারীগণের

কর্ত্তব্য এবং কর্ম্মক্ষেত্র পুরুষদিগের হইতে বিভিন্ন। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্য যে যথার্থ সত্যপদার্থ, ইহা যে লোকাচারের কৃত্রিম সৃষ্টি নয়, ইহা যে বিজ্ঞানসম্মত জন্মগত সংস্কারগত প্রভেদ, তাহা আমরা জীববিজ্ঞান (Biology) এবং সমাজবিজ্ঞান (Sociology) হইতে জানিতে পারি। এইরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আমরা স্ত্রীলোকের স্বরূপটি কি তাহা চিনিতে পারি বলিয়া ইহার আলোচনা এইস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

জীবজগতের নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তর পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষের কি প্রভেদ তাহা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রাণশক্তিতে অধিক শক্তিশালিনী। স্ত্রীজাতি যতখানি সংগ্রহ করে এবং তদনুযায়ী যতটুকু ব্যয় করে, পুরুষ যতটুকু সংগ্রহ করে সেই অনুপাতে তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করে। অর্থাৎ সংগ্রহের পরিমাণকে যদি ব্যয়ের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করা যায় তবে দেখা যাইবে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর অংশ বেশী। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে পুরুষ তাহার শক্তি অধিক পরিমাণে ব্যয় করিতে সক্ষম এবং ব্যয় করিয়া ফেলে, কিন্তু স্ত্রীর অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি পুরুষ অপেক্ষা বেশী। এই অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির প্রভাবেই স্ত্রী সন্তান ধারণ করিতে সক্ষম এবং এই সন্তানধারণের জন্যই স্ত্রীর মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জীবনীশক্তি বর্ত্তমান। প্রাণীজগতে আমরা দেখিতে পাই যে যতই জটিল এবং ক্রমশ-উন্নত প্রাণী জন্মলাভ করিতে থাকে ততই স্ত্রীরা পুরুষ হইতে শারীরিক এবং মানসিক গুণে পৃথক হইয়া পড়িতে থাকে, যাহার ফলে এই জটিল সন্তান নিরাপদে জন্মলাভ করিতে এবং জন্মলাভ করিবার পরও অনেকদিন পর্য্যন্ত জীবনসংগ্রামে প্রস্তুত হইতে সক্ষম হয়। নারীর শারীরিক গঠনের অভিব্যক্তির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে তাহা ক্রমশ-উন্নত জটিল সন্তানকে নিরাপদে জন্মদান করিবার জন্যই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, অপরপক্ষে এই ক্রমশ-উন্নত জীবের উদ্ভবের সঙ্গে-সঙ্গেই স্নেহ প্রেম প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি দেখা যায়। মৎস্যজগতে আমরা দেখি মৎস্যমাতা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডিম পাড়িতেছে কিন্তু তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা তাহার মধ্যে দেখা যায় না—মৎস্যসন্তান জন্মলাভ করিবার পরও তাহার পালন বা রক্ষার ভার মৎস্যমাতাকে লইতে হয় না। অবশ্য কোন কোন স্থলে দেখা যায় মৎস্যমাতারা কিছুকাল ধরিয়া সন্তানদিগকে রক্ষা করিতেছে কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা বিশেষ কিছু যত্ন লয় না। পক্ষীমাতার মধ্যেই আমরা প্রথম সন্তানপালন এবং সন্তান-স্নেহের উপকরণ দেখিতে পাই। আমরা দেখি পক্ষীমাতা বাসা বাঁধিয়া ডিম্ব রক্ষা করে এবং ডিম্ব হইতে সন্তান বাহির হইবার পর তাহাকে আহার সংগ্রহ করিয়া পালন করে এবং বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। স্তন্যপায়ী-জগতে মাতা যে কেবল গর্ভে বহুকাল সন্তানকে রক্ষা করে তাহাই নয়—তাহাকে শিশুকালে নিজ শরীর হইতে দুগ্ধ দিয়া পালন করে এবং নিজ শক্তি সামর্থ্য স্নেহ প্রেম দিয়া তাহাকে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারী করে। মানুষ এই স্তন্যপায়ীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সন্তান-স্নেহে এবং পালনবিদ্যায় মানুষ্যমাতা প্রাণীজগতে শ্রেষ্ঠ। অতএব আমরা দেখিতেছি পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তির আরম্ভকাল হইতে যুগের পর যুগের বহু সাধনার ফলে এই নারী-দেহ গঠিত হইয়াছে এবং স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য নারী-হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে।

জীববিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা যেমন নারীর জননী-স্বরূপটি কতযুগের সাধনার অভিব্যক্তি তাহা দেখিতে পাইলাম—তেমনি সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস হইতে নারীর আরেকটি স্বরূপ দেখিতে পাই। সেটি তাহার গৃহিণীরূপ। মানবসমাজের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে মানুষ যখন আদিম বর্ব্বর অবস্থায় ছিল এবং একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়ানো খাদ্যসংগ্রহ করিবার এবং জীবনধারণের একমাত্র উপায় মনে করিত, তখন সেই আদিমযুগের নারীগণ সন্তানপালনের সুবিধার জন্য ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিয়া এবং ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতি পশুপালন করিয়া প্রথম গৃহপ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সন্তানকে গর্ভে লইয়া এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ানো অতি কষ্টসাধ্য; কাজে-কাজেই নারীকেই প্রথম গৃহপত্তন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। নারীগণ ক্রমে সেবা, শুশ্রূষা,

চিকিৎসা, পশুপালন, রন্ধন প্রভৃতির দ্বারা গৃহকে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া এমন আরামের স্থান করিয়া তুলিলেন যে পুরুষগণ তাহাদের শীকার এবং যাযাবর প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া এই আরামের কাছে ধরা দিল এবং নারীদিগের সহিত যোগ দিয়া গৃহকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। এই প্রথম গৃহপত্তনের যুগে মাতাই গৃহের প্রধান কর্ত্রী ছিলেন এবং সন্তানেরা মাতার নামেই পরিচয় জ্ঞাপন করিত। এই যুগকে মাতৃপরতন্ত্রযুগ (mother age) বলা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপে গৃহ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর একদল অন্যদলের সুবিধা অথবা সম্পদ দেখিয়া যখন একে অন্যকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল তখন গৃহপ্রতিষ্ঠাত্রী-দিগকে পুরুষের বলের সাহায্য লইতে হইল—এই সময় হইতেই পুরুষের আধিপত্যের সূত্রপাত এবং পিতৃপ্রধান যুগের আরম্ভ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গৃহরক্ষা করা পুরুষের কর্ম্ম, কিন্তু গৃহপ্রতিষ্ঠা করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম—ইহা নারীর সামাজিক সংস্কারগত। এইখানে আমরা নারীর দ্বিতীয় স্বরূপটি দেখিতে পাই—তাহার গৃহিণীরূপ। অতএব আমরা দেখিতেছি নারী স্বরূপত সন্তানের জননী এবং গৃহিণী। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে জোরের সহিত বলা যাইতে পারে যে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ এবং ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাহাতে বালিকারা সুমাতা এবং সুগৃহিণী হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে। সুমাতা হইতে হইলে সন্তানকে গর্ভে-অবস্থান কাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাপ্ত বয়স পর্য্যন্ত কিরূপে পালন করিতে হয় এবং শিক্ষা দিতে হয় তাহার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। সুগৃহিণী হইতে হইলে কিরূপে গৃহকে স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে, সেবায়, ধনে, সম্পদে সুন্দর করিয়া তুলিতে হয় তাহার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। এইরূপ সন্তানপালন, স্বাস্থ্যপালন, সৌন্দর্য্যবোধ, সেবা, ধনসঞ্চয় প্রভৃতি নানাবিষয়ের জ্ঞান কি আপনি জন্মে? এইগুলি কি শিক্ষণীয় বিষয় নয় এবং ইহাদের উৎকর্ষ সাধনের জন্য কি অধ্যয়ন পরীক্ষা (Experiment) এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই? এইগুলি কি যে-কোন শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত নয়? আমাদের দেশে অধিকাংশ নারীরই যখন মাতা এবং গৃহিণী হইবার জন্য ডাক আসে তখন কি তাঁহারা উপযুক্তরূপে তাহা পালন করিতে সক্ষম হন? এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতেছেন এবং যাঁহারা পাইতেছেন না উভয়েরই এক অবস্থা, কারণ বিদ্যালয়ে এ-সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই।

অনেকে বলেন যে গৃহেই এ সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা হয় সুতরাং ইহার জন্য বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। গৃহে যে এ সম্বন্ধে মেয়েরা শিক্ষা পান তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু গৃহের এই শিক্ষা কি খুবই অসম্পূর্ণ এবং অনেক স্থলে ভুল এবং অনিষ্টকারী নয়? আমাদের সমাজে জননীদের সন্তান প্রসব পালন, শিক্ষা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে জ্ঞান কি খুব পাকা? এ বিষয়ে সরকার পক্ষ হইতে ক্রমাগত শুনিতেছি যে উপযুক্তরূপ শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশে শিশুমৃত্যু অধিক, স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মগুলি না জানার দরুণ অল্পবয়স হইতে সন্তানেরা নানা রোগে ভুগিয়া স্বাস্থ্য হারাইতেছে এবং এইজন্য আমাদের দেশে সাধারণ মৃত্যুর হার বাড়িয়া যাইতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের দেশে বড় বড় চিকিৎসকেরাও ইহা সমর্থন করেন এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য অনেকে চেষ্টাও করিতেছেন। আমাদের দেশে শিক্ষিত পুরুষেরাও এ সম্বন্ধে নারীদিগকে বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারেন না, কারণ অন্যান্য নানা বিষয়ে পুরুষদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কিছু অধিক দেখা গেলেও এই-সকল বিষয়ে তাঁহারা নারীদিগের অপেক্ষাও অজ্ঞ। এইজন্য মেয়েদের অসম্পূর্ণ এবং অল্প শিক্ষার উপরই ইহাঁদের সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। বলা বাহুল্য অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের ন্যায় এই-সকল বিষয়ে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ জননীদিগকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন আছে। স্ত্রীশিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যদি সন্তানজন্ম, সন্তানপালন, গৃহের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য এবং ব্যয় প্রভৃতি বিষয়ের স্থান থাকিত তবে আমরা ইহার বিকাশ অতি শীঘ্রই দেখিতে পাইতাম এবং 'যা আছে বেশ আছে' বলিয়া চুপ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতাম না।

আমাদের দুর্ভাগ্য, যে, সকল বিষয়েই য়ুরোপের নজীর না দেখাইলে আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোকে

সত্যকে সহজে বিশ্বাস করিতে রাজী হন না। আমরা দেখিতেছি য়ুরোপ এবং আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগীগণ ঐই-সকল বিষয়ে অনেক দিন চিন্তা করিতেছেন এবং ইহা লইয়া সেখানে অনেক পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে এবং কতকগুলি পরীক্ষা হইতে উত্তম ফলও পাওয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের অনেক স্কুলে এখন ছোট ছেলেমেয়েদের শিশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং আমেরিকার অন্তর্গত যুক্তরাজ্যের কোন্ কোন রাজ্যে শিশুপালন প্রত্যেক বালিকা শিক্ষা করিতে বাধ্য। নীউ-জীলাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে বালিকাদিগকে শিশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় আছে এবং জননীদিগকে সন্তান প্রসব এবং পালনে সাহায্য করিবার জন্য সরকার হইতে নিযুক্ত পাশকরা-ধাত্রী আছে। মাঘ মাসের প্রবাসীতে স্বয়ং সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এইরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এই-সকল দেশে শিশুমৃত্যুর হার কিরূপ কমিয়া গিয়াছে। সুগৃহিণী হইবার শিক্ষার প্রবর্ত্তনও তথায় হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক টমসন লিখিতেছেন—

"A notable sign of progress is surely that of the rise of Colleges of Domestic Economy, with their vast crowds of girl students—in Edinburgh alone some four thousand and this with but a few years' growth. Moreover, these, from modest beginnings of household management, are growing up—prominently both in London and Edinburgh—to claim academic rank as a new and true faculty of the University."*

সামাজিক মহাসমিতির সভাপতি মহাশয় এইজন্য বলিয়াছেন "সাধারণের (স্ত্রীলোকের) জন্য একটি স্বতন্ত্র শাখা খুলিয়া দেওয়া হউক। শিক্ষার দ্বারা যাহাতে নারীগণ আপন কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইয়া যথোচিত গৌরব লাভ করিতে পারেন তাহাই করিতে হইবে। নর ও নারী মানবসমাজের দুইটি শাখা। সমগ্র সমাজের উন্নতির জন্য এই দুই শাখারই উন্নতি বিধান করিতে হইবে।" এইরূপ শিক্ষা যে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিতে বাধ্য তাহা আমরা অধ্যাপক টমসন মহাশয়ের উক্তিতে দেখিয়াছি। সভাপতি মহাশয়ও বলিতেছেন "শিক্ষার্থিণীরা যদি বুঝিতে পারে যে নূতন ব্যবস্থায় তাহারা উপাধির ছাপ হইতে বঞ্চিত হইবে না অথচ জ্ঞান লাভও করিতে পারিবে তাহা হইলে নূতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি তাহারা কেন আকৃষ্ট হইবে না? অতএব আমাদের স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে শিক্ষার আরম্ভ হইতেই বালিকারা শিশুপালন প্রভৃতি নারীর অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলিকে শিক্ষণীয় বলিয়া সম্মান করিতে শিক্ষা করে এবং তাহারা সন্তানের জননী এবং গৃহের কর্ত্রী হইবার জন্য যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার জন্য বিশেষ গৌরব অনুভব করে।"

(২)

কিন্তু নারীকে কি কেবল "বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সন্তান-লালনপালন" এবং স্বামী ও অন্যান্য পরিজনের সেবা এবং সাহচর্য্য করিতে পারার মত শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট? অনেকে বলেন 'হাঁ, ইহাই যথেষ্ট'—বড় জোর কেহ কেহ ইহার উপর শিশুজীবনে সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবার মত সামান্য লেখাপড়ার ব্যবস্থা নারীদিগের জন্য বরাদ্দ করিতে রাজী আছেন। ইহাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে যে নারীজীবনের আদর্শ কি কেবলমাত্র সুসন্তান প্রসব করা এবং পালন করা? কেবল কাজের সুবিধার তরফ হইতেই শিক্ষার আদর্শকে খাড়া করিলে কি কাজের উন্নতি সত্যসত্যই হয়? ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য এবং বাণিজ্য-বিস্তারের পশ্চাতে কি আমরা অগণ্য আদর্শের সেবক এবং বিজ্ঞানের সেবকের দেখা পাই না? গত ৫০ বৎসরে জার্ম্মানীর বাণিজ্যের উন্নতি কি তথাকার বিশুদ্ধ জ্ঞানপিপাসী বৈজ্ঞানিক দলের দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানের এবং তত্ত্বের অন্বেষণে অক্লান্ত পরিশ্রমের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না? আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে-সকল কবি বা বৈজ্ঞানিক কেবল ভাব বা তত্ত্ব লইয়া আছেন তাঁহারা দেশের কাজে ফাঁকি দিতেছেন; এইজন্য তাঁহাদের লোকসাহিত্য রচনা করিবার জন্য অথবা ব্যবসাবাণিজ্যে নামিবার জন্য আহ্বান করিতে দ্বিধা বোধ হয় না। ভাব, আদর্শ, তত্ত্বই যে কাজের প্রাণ। আমরা যদি আইডিয়ার উপর বিশ্বাস হারাইয়া কাজকে বড় করিয়া দেখি তবে কাজের প্রাণশক্তির মূলে কুঠারাঘাত

* 'Sex'—Thomson and Geddes.

করিয়া তাহার উন্নতির কামনায় প্রচুর জল সেচন করিলেও তাহা নিশ্চয়ই নিষ্ফল এবং মৃতপ্রাণ হইবে। অধ্যাপক টমসন এইজন্য লিখিতেছেন

"Some who have a firm grip of the fact that women are wives and mothers at heart, who are also influenced by the pravalent technical education fallacy of our day, have advocated a more predominantly domestic and maternal education for the girls. But there are great danger in exaggerating what in moderation is sound enough. A broadly educated intellectually alert mother means much for the mental atmosphere of the home and that means much for the children. But an over-emphasised domestic education is apt to force a premature development of mental and perhaps bodily instincts."

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কাজের সুবিধার জন্য যদি নারীকে কেবল সন্তান প্রসব পালন এবং গৃহস্থালির কর্ম্মের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহাকে যদি বিশ্বের শক্তি এবং সৌন্দর্য্য মন্থন করিয়া যে বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য সঙ্গীত এবং কলাবিদ্যার অমৃত যুগযুগান্ত হইতে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে তাহা পুরুষের সহিত একাসনে বসিয়া সমানভাবে গ্রহণ করিবার এবং উপভোগ করিবার অধিকার এবং সুযোগ প্রদান না করা যায়, তবে আমরা নারীকে মাতৃত্ব এবং গৃহিণীত্বে যতই দীক্ষিত করি না কেন তাহা ব্যর্থ হইবে এবং নারীর জননী- এবং গৃহিণী-রূপকে যত বড় করিয়াই দেখি না কেন, তাহার যথার্থমর্য্যাদা এবং মূল্য আমরা প্রদান করিতে সমর্থ হইব না। ক্রমেই আমরা তাহাকে সন্তান ধারণ এবং পালনের উপযুক্ত কলরূপে দেখিব। এই জন্যই মনে হয় হিন্দুশাস্ত্রে এবং সংহিতায় নারীর মর্য্যাদা এবং মূল্য সম্বন্ধে অনেক উপদেশ থাকা সত্ত্বেও কার্য্য কালে অনেক হিন্দুগৃহেই হিন্দুরমণী নারীর যথাযোগ্য মূল্য এবং সম্মানলাভে বঞ্চিত হইয়া আসিয়াছেন।

(৩)

সকল দেশেই এতদিন পর্য্যন্ত এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে নারীদিগের মানসিক নৈতিক এবং কর্ম্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য যে-শিক্ষার প্রয়োজন তাহার জন্য পৃথক কোন আয়োজনের দরকার নাই, তাহা পুরুষদিগের সহিত একত্র হইতে পারে। য়ুরোপের অনেক দেশে নারীদিগের জন্য বিশেষ ভাবে উচ্চবিদ্যালয় (Women's College) থাকিলেও তাহার পাঠ্য বিষয় এবং প্রণালী প্রায় সমস্তই পুরুষদিগের অনুরূপ। আমেরিকার উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে অধিকাংশ-স্থলেই স্ত্রী এবং পুরুষের একত্র শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

মহাসমিতির সভাপতি মহাশয় বোধ হয় এইজন্য বলিয়াছেন "যে-সকল ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সহিত সমকক্ষতা করিয়া বিশেষ গৌরবলাভের অভিলাষিণী তাঁহাদের জন্য সেই পথ খোলা থাকুক।" অন্যস্থানে বলিতেছেন "বালকদিগের উচ্চ স্কুলসমূহে বালিকাদিগকে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হউক। * * যে-সকল মহিলারা কলেজে উচ্চশিক্ষা পাইতে চাহেন তাঁহাদিগকে কেন ছাত্রদিগের কলেজগুলিতে গ্রহণ করা হইবে না আমি তো তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না।" *

অবশ্য মোটামুটিভাবে ইহা সত্য হইলেও যদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা স্ত্রী এবং পুরুষের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক শক্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় তবে দেখা যাইবে স্ত্রী এবং পুরুষের শারীরিক শক্তির বৈষম্য যেমন বর্ত্তমান, সেইরূপ মানসিক এবং নৈতিক গুণগুলি সম্বন্ধেও স্ত্রী-পুরুষে কোন কোন বিষয়ে প্রভেদ আছে। এ সম্বন্ধে আন্দাজী বা সংস্কারগত কোন সাধারণ মত প্রকাশ করা বৈজ্ঞানিকপ্রণালীসম্মত নয় এবং তাহা অনিষ্টকর। আমরা বলিয়া থাকি স্ত্রীলোকের সদ্গুণ অধিক, তাহার সহজজ্ঞান (intuiton) পুরুষ অপেক্ষা অধিক, ইত্যাদি ইত্যাদি। অপরপক্ষে বলিয়া থাকি পুরুষের কর্ম্ম-শক্তি অধিক, তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রখর, এবং বড় জিনিষকে একসঙ্গে দেখিবার শক্তি (stronger grasp of generalities) নারী অপেক্ষা বেশী, ইত্যাদি। এই-সকল আন্দাজের মধ্যে সত্য থাকিলেও তাহা কতটুকু সত্য তাহা নির্ণয় করা দরকার। "What we now require is an extension of experiments."

শারীরিক শক্তির পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে নারীর শারীরিক বল সাধারণতঃ সকল দেশেই পুরুষ অপেক্ষা কম।

"Miss Helen B. Thomson's careful experiments confirmed the general verdict that women have much less muscular force than men."

* মহারাষ্ট্র দেশে পর্দাপ্রথা নাই এবং মহিলারা য়ুরোপীয় মহিলা-দিগের ন্যায় পুরুষদিগের সহিত রাস্তায় ঘাটে অবাধে বিচরণ করিতে পারেন। কাজেই এইরূপ প্রস্তাবে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

মানসিক শক্তির প্রভেদ সম্বন্ধে পরীক্ষার দ্বারা যতটুকু জানা গিয়াছে তাহা হইতে দেখা গিয়াছে যে ছাত্রীদিগের শব্দের রঙের প্রভেদ বুঝিবার শক্তি ছাত্রদিগের অপেক্ষা অধিক। তাহাদের মুখস্থশক্তি এবং স্মরণশক্তিও পুরুষের অপেক্ষা বেশী। অপরপক্ষে মনস্তত্ত্ববিদেরা পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়াছেন যে নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক ভাবপ্রবণ (emotional); এইজন্য তাহারা শীঘ্র স্বার্থত্যাগ করিতে পারে এবং ন্যায়বিচার করিতে কম সক্ষম। এবং তাহাদের Subconscious বা সুপ্তচেতন মন পুরুষদিগের অপেক্ষা প্রবল, এইজন্য তর্কবিচার না করিয়াও তাহারা শীঘ্র এবং সহজে সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে। অবশ্য এ সম্বন্ধে পরীক্ষা এতই কম হইয়াছে যে মানসিক এবং নৈতিক শক্তির সকল বিভাগে নারী এবং পুরুষের জন্মগত প্রভেদ কতটুকু এবং সামাজিক সংস্কার এবং শিক্ষার প্রভাবই বা কতটুকু তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু এইরূপ পরীক্ষা এবং গণনার দ্বারা যতটুকু জানা গিয়াছে এবং তদনুসারে যে-সকল বিদ্যালয়ে কাজ আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে নারীদিগের প্রকৃতিগত মানসিক এবং নৈতিক গুণগুলির যদি উৎকর্ষ সাধন করিতে হয় তাহা হইলে তদুপযুক্ত সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে, এবং বিশেষভাবে সঙ্গীত এবং কলাবিদ্যার চর্চ্চার আয়োজন এবং উপকরণের প্রয়োজন আছে। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে সাহিত্য এবং চিত্রবিদ্যার ন্যায় সঙ্গীত এবং নৃত্যকলা মানব-অন্তরের গভীরতম ভাবপ্রস্রবণগুলিকে উন্মুক্ত করিয়া দিবার স্বাভাবিক এবং সুন্দর উপায়। এইজন্য দেখিতে পাই অতি অসভ্য ও বর্ব্বর জাতি হইতে অতি সুসভ্য জাতির সামাজিক অনুষ্ঠানে স্ত্রী এবং পুরুষের এবং বিশেষভাবে নারীর নৃত্যগীতের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এইজন্যই য়ুরোপীয় সকল দেশেই গৃহে এবং বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের দেশে দেবপূজার সময় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা নৃত্যগীতের অভাব অনুভব করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের নারীরা ইহাতে যোগ দিতে পারেন না এবং পুরুষেরা যোগ দিতে অসমর্থ। এইজন্য দেখিতে পাই এই-সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে সংগীত এবং নৃত্য করিবার জন্য অনেকে ভাড়া করিয়া বাই অথবা নর্ত্তকী প্রভৃতি এমন সব স্ত্রীলোক লইয়া আসেন যাহাদের সহিত কথা বলিতে বা বাড়ীর ত্রিসীমানায় আনিতে অন্য সময়ে ইঁহারাই লজ্জাবোধ করেন। শুধু কি আমোদ-প্রমোদের জন্যই ইহাদের ডাক পড়ে? ধর্ম্ম-সংগীত শুনিবার জন্যও ত দেখিতে পাই শ্রাদ্ধবাসরে এবং অন্যান্য পুণ্যদিনে অনেকে কীর্ত্তনওয়ালী ডাকিয়া লইয়া আসেন। একজন পাদ্রীর বইএ পড়িয়াছিলাম ইংরেজ-রাজত্বের কিছু পূর্ব্বে একজন ফরাসী পর্য্যটক লিখিতেছেন ভারতে নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা সংগীত কেবল একদল স্ত্রীলোকের মধ্যেই আবদ্ধ যাহারা পতিতা বলিয়া সমাজে স্থান পায় না। অবশ্য সেই সময়ের সামাজিক অবস্থা হইতে এখনকার অবস্থা অনেক পরিষ্কার। এখন হিন্দুরমণী সংগীত শিক্ষা করিলে তাহা দূষণীয় বলিয়া মনে করেন এরূপ লোক খুবই কম আছেন। কিন্তু এখনও ইহার প্রচার তেমন বিস্তৃত হয় নাই। আমাদের গৃহে গৃহে এই সংগীতবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেইজন্য নারীশিক্ষার ব্যবস্থায় ইহার স্থান খুব বড় হওয়া উচিত।

বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে নারীদিগের চিত্তবৃত্তি এবং মানসিক শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিবার জন্য কোন প্রকার উদ্যোগ বা চেষ্টা এখনও দেখা যাইতেছে না। এ সম্বন্ধে এখন হইতেই আমাদের সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। য়ুরোপ এবং আমেরিকায় এ সম্বন্ধে কিরূপ চেষ্টা হইতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি জাতীয় বিশেষত্বের ভিত্তির উপর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই শিক্ষাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করি তবেই আমরা জগতের শিক্ষা-বিজ্ঞানের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে সমর্থ হইব, নহিলে কেবলি পিছনে পড়িয়া থাকিতে হইবে। আমাদের দেশে নারীবিদ্যালয়গুলি যাহারা পরিচালন করিতেছেন তাঁহারা উদ্যোগী হইলে এইরূপ নারীশিক্ষার আদর্শকে আকার প্রদান করিতে পারেন। এইরূপ শিক্ষার সূত্রপাত হইলে আশা করিতেছি দেখিতে পাইব যে যে-নারীশিক্ষা এখন পুরুষের শিক্ষার পিছনে গাধা-বোটের মত শক্তিহীন অবস্থায় অগ্রসর হইতেছে তাহা

নিজ শক্তিতে নিজ পথ কাটিয়া অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে।

নারীশিক্ষার—কেবল নারীর কেন, নারী এবং পুরুষ সকলের শিক্ষার আদর্শের মধ্যে আর একটি জিনিষ থাকা বিশেষ প্রয়োজন—সেটি হইতেছে গার্হস্থ্যজীবনকে ভগবানের বিধান জানিয়া গ্রহণ করা এবং ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্ম জানিয়া ইহা পালনে সচেষ্ট থাকা।

য়ুরোপীয় সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ অতি দুঃখের সহিত স্বীকার করিয়াছেন যে সমাজে চিন্তাশীল মননশক্তিসম্পন্ন নরনারীর মধ্যে সন্তানসংখ্যা কম। হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ অনেক বৈজ্ঞানিক ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—যখনি প্রাণী কোন কারণে বিশেষত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যলাভ করে তখনি তাহার উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস পায়।

"Reproductivity decreases as individuation increases."

উচ্চশিক্ষার ফলে আমরা এইরূপ উন্নত স্বাতন্ত্র্যবোধী নরনারী প্রাপ্ত হই। অতএব উচ্চশিক্ষা সন্তান-উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাসের কারণ।

"It is urged that infertility is the nemesis of higher education and of individuation generally."

কিন্তু এইরূপ স্বতন্ত্রতা লাভই যে উৎপাদিকাশক্তির হ্রাসের একমাত্র কারণ তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রাণী-জগতে আমরা দেখিতে পাই যে যতই উন্নত প্রাণীর উৎপত্তি হইতে থাকে ততই পিতামাতার অধিক যত্নের প্রয়োজন হয়। এইজন্য ক্রমেই সন্তানসংখ্যার হ্রাস এবং এক সন্তান জন্মিবার পর আরেক সন্তানের উৎপত্তির মধ্যে কালের ব্যবধানের দূরত্ব দেখা যায়। অপর পক্ষে এইরূপ উন্নত সন্তানেরা পিতামাতার যত্নে এবং শিক্ষায় জীবনসংগ্রামে খুব পটুত্ব লাভ করে বলিয়া সংখ্যায় কম হইলেও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের নিয়মানুসারে টিঁকিয়া থাকিতে সক্ষম হয়। অধ্যাপক টমসন এই জন্য বলিতেছেন

"It was not the heightened individuation that directly lowered the rate of multiplication, although as individuation increased it became possible for the multiplication to be decreased."

মানবসমাজেও মানুষ যতই উন্নত হয় ততই যে তাহার উৎপাদিকাশক্তি কমিয়া যায় এরূপ কোন প্রমাণ নাই। (Francis Galton) ফ্র্যান্সিস গ্যাল্‌টন তাঁহার Hereditary Genius গ্রন্থে লিখিতেছেন

"I regret I am unable to solve whether and how far men and women who are prodigies of genius are infertile. I have however shewn that men of eminence are by no means so."

অতএব দেখা যাইতেছে য়ুরোপীয় সমাজে চিন্তাশীল এবং মানসিকশক্তিতে উন্নত নরনারীর সন্তানসংখ্যা যে কম হইতেছে উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস বা অবনতি তাহার কারণ নয়। তবে তাহার কারণ কি? গার্হস্থ্যজীবনের আদর্শকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখা। যখনি যে সমাজে গার্হস্থ্য-জীবনকে ভোগসুখের উপায় বলিয়া তাহার আদর্শকে ছোট করা হইয়াছে তখনি দেখা যায় সেই দেশে বা সমাজে একদল বিলাসী স্বার্থপর ভোগান্বেষণকারী নারী এবং পুরুষ গার্হস্থ্যজীবনে সন্তান ভোগসুখের অন্তরায় জানিয়া বিবাহ করে না এবং বিবাহ করিলেও যাহাতে সন্তান উৎপন্ন না হয় তাহার চেষ্টা করে। ফ্র্যান্সিস গ্যালটন এথেন্সের অধঃপতনের কারণ আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন

"Morality grew exceeding loose, marriage unfashionable and accomplished women were avowed courtesans."

অপর পক্ষে অন্য একদল নরনারী গার্হস্থ্যজীবন অপেক্ষা ধর্ম্মচর্চ্চার, জ্ঞানচর্চ্চার জীবন আদর্শ মনে করিয়া এবং গার্হস্থ্যজীবনকে ইহার অন্তরায় মনে করিয়া বিবাহ করে না। এইরূপ উচ্চশিক্ষিতা নারীরা মনে করেন

"The intellectuals among women should keep themselves free for work in the world which needs them badly and should leave it to their more placid, less ambitious and less intellectual sisters to be the wives and mothers."

এইরূপ কৌমার্য্যব্রতের দ্বারা সমাজে প্রথম-প্রথম প্রভূত উন্নতি সাধিত হইলেও ইহা সমাজের অকল্যাণের কারণ এবং কালের কষ্টিপাথরে ইহা ধরা পড়ে। সমাজে বহু নরনারী অবিবাহিত থাকিলে, ইহাদের আদর্শ বড় হইলেও ইহাদের মধ্যে সামাজিক দুর্নীতি প্রবেশ করে—এইজন্য বৌদ্ধধর্ম্ম নীতির মহিমা প্রচার করা সত্ত্বেও বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের মধ্যে নৈতিক অবনতি দেখা দিয়াছিল এবং মধ্যযুগের খৃষ্টীয় পাদ্রী এবং সন্ন্যাসিনীদিগের মধ্যে পাপ

দুরাচার দেখা দিয়াছিল। কেবল তাহাই নয়। জীব বিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলেও এইরূপ স্বেচ্ছা-কৌমার্য্য-ব্রত যে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয় তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

"We cannot countenance a theory which deliberately leaves maternity to the less intellectual. In addition to the clever mother's contribution to the organic inheritance of the child, there is hardly less important nurtural influence in the home."

অতএব দেখা যাইতেছে যে য়ুরোপীয় চিন্তাশীল, মননশক্তিতে উন্নত নরনারীর মধ্যে যে সন্তানসংখ্যার হ্রাস হইতেছে তাহার কারণ উচ্চশিক্ষা নয়,—শিক্ষার অসম্পূর্ণতা, আদর্শের অসম্পূর্ণতা। শিক্ষার অন্যান্য অঙ্গের সহিত যদি গার্হস্থ্যজীবনের উন্নত আদর্শের শিক্ষা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে উচ্চশিক্ষার সহিত যে-সকল বিকৃত অবস্থা অন্য দেশে দেখা গিয়াছে তাহা হইতে আমরা অব্যাহতি পাইব।

(৫)

গার্হস্থ্যজীবনের এই উন্নত আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি উপায়ে ?

হিন্দুসমাজে নারীদিগকে বিবাহে বাধ্য করিয়া এবং অধিক বয়স পর্য্যন্ত অতিবাহিত থাকা অধর্ম্ম এইরূপ সামাজিক নিয়মের প্রচলনের দ্বারা সমাজে গার্হস্থ্যজীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুসমাজে গার্হস্থ্যজীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য কিন্তু উন্নত গার্হস্থ্যজীবনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ না করিলেই নারী সমাজে পতিতা হইবে এই সামাজিক নিয়ম যদি প্রচলিত হয় তবে তাহার ফলে পিতামাতা অল্পবয়স হইতেই বিবাহের জোগাড় করিতে বাধ্য হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বাল্যবিবাহ এইরূপ নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল। বরপণ প্রভৃতি অপরাপর কুপ্রথারও উৎপত্তি এইজন্য। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিষময় ফল হইতেছে নারীর পরাধীনতা, পতি নির্ব্বাচনের অক্ষমতা এবং সেইজন্য সমাজে যোগ্যের সহিত অযোগ্যের বিবাহ এবং প্রেমহীন বিবাহের উৎপত্তি। গৃহের ভিত্তিভূমি কোথায়? নরনারীর স্বাভাবিক প্রেমমিলনের উপর। নরনারীর এই প্রেমের উৎপত্তির মধ্যে কতযুগের সাধনা জড়িত রহিয়াছে।

"The human ideal of love is one in which all the finer threads of prehuman sex-attraction are interwoven and sublimed—physical fondness, aesthetics appeal, affection, intellectual sympathy and some capacity for working together.

নরনারীর মিলন প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সমাজে মনোনয়ন প্রথা প্রচলিত থাকা প্রয়োজন। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের সমানভাবে মনোনয়নের সুযোগ এবং সুবিধা থাকা প্রয়োজন। য়ুরোপীয় সমাজে মনোনয়ন প্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও যে সেখানে প্রেমহীন বিবাহ অনেক দৃষ্ট হয় তাহার একটি খুব বড় কারণ এই যে সেখানেও নারীদিগের মনোনয়ন করিবার যথার্থ স্বাধীনতা নাই। সেখানেও কন্যারা পিতার সম্পত্তি পুত্রের ন্যায় সমানভাগে প্রাপ্ত হয় না এবং কাজ করিলে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদাহানি হয় এইরূপ ভ্রান্তধারণা সমাজ হইতে একেবারে অপসারিত হয় নাই, এইজন্য সেখানেও স্ত্রীলোক পুরুষকে আশ্রয়স্বরূপ গ্রহণ করে, সহায় এবং সঙ্গীরূপে নয়। যতদিন পর্য্যন্ত না নারীর কার্য্যক্ষমতার আর্থিক মূল্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে ততদিন পর্য্যন্ত সমাজে উন্নত গার্হস্থ্যজীবনের আদর্শ কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে না। অধ্যাপক টমসন এই সম্বন্ধে লিখিতেছেন

"What an engine of progress there is in sexual selection, we shall more clearly realise when economic conditions make more discriminate preferential mating on the woman's part possible."

অপরপক্ষে আজকাল দিনের পর দিন জীবনসংগ্রাম যেরূপ কঠোর হইয়া উঠিতেছে তাহাতে পুরুষেরা যদি এরূপ নারী জীবনসঙ্গিনীরূপে পান যাহারা এই জীবন-সংগ্রামে সহায়তা করিতে পারে তাহা হইলে পুরুষদিগের মধ্যে যে বিবাহবিমুখীনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। এইরূপ প্রেম ও কর্ম্মসহযোগিতার মিলনের উপর যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত তাহাই আদর্শ গার্হস্থ্যজীবনের পক্ষে অনুকূল।

নারী কিরূপে জীবনসংগ্রামে পুরুষের সহায় এবং সঙ্গিনী হইতে পারে তাহা একটি কঠিন সমস্যা। য়ুরোপীয় সমাজে আমরা দেখিতে পাই নারী পুরুষের সহিত টক্কর দিবার জন্য অথবা আর্থিক সঙ্কটে পড়িয়া পুরুষের সহিত সকল কাজেই যোগ দিয়াছে। এক সৈনিক বিভাগ ভিন্ন আপিসে, রেলে,

দোকানে, বাজারে, খনিতে, কারখানায় সকল স্থানেই স্ত্রীলোক কাজ করিতেছে। এইরূপে পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে নারী যতই বেশী ভাগ বসাইতেছে ততই কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ হওয়ার দরুণ একদিকে পুরুষের জীবনসংগ্রাম বাড়িয়া চলিয়াছে এবং অন্যদিকে পুরুষের কাজ নারীর দ্বারা সাধিত হওয়ার দরুণ নারীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে এবং নারী মাতা হইবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। সুপ্রসিদ্ধ সমাজতত্ত্ববিদ এলেন কী (Ellen Key) বলিয়াছেন

"To put women to do men's work is as foolish as to set a Beethoven or a Wagner to do engine driving."

এইজন্য মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে যে-সকল কাজে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় অথবা দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন কাজে লাগিয়া থাকিতে হয় অথচ তাহাতে বিশ্রাম-সময় এবং অবসর অল্প, সেরূপ কাজ স্ত্রীলোকের পক্ষে উচিত নয়। য়ুরোপে নানা সংগ্রাম এবং বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া নারীর জন্য বিশেষ ভাবে যে যে কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে তাহা হইতে দেখা যায়—শিশুদিগের শিক্ষা, দোকান পসার, বেচা কেনা এবং বিশেষভাবে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় গৃহশিল্পের সাহায্যে নারীরা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং জীবনসংগ্রামে পুরুষের সাহায্য করিতে পারেন। এইরূপে গৃহে গৃহে কন্যারা এবং গৃহিণীরা যদি পিতা ভ্রাতা স্বামী পুত্রের সাহায্যে অগ্রসর হন তবে দেশের দারিদ্র্য সমস্যা এবং অর্থ-সমস্যার মীমাংসা অনেক পরিমাণে সহজ হইয়া আসে এবং দেশের প্রভূত উন্নতি হয়। ইহা যে কেবল ভাবের কথা নয়, কল্পনা নয়—ইহা যে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব তাহা জাপানের গৃহশিল্পের অদ্ভুত উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই। অনাগারিক ধর্ম্মপাল মহাশয় রামমোহন লাইব্রেরীতে জাপানের শিল্প-বাণিজ্যের ক্রমশ কিরূপ উন্নতি হইল সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন

"Every house was an industrial factory, man woman and daughter all engaged in some sort of activity or other. It was this home industry of Japan which has been able to compete with the mill products of Europe and America."

ইহা বহু দিনের ঘটনা নয়। কেবল দুই বৎসর মাত্র পূর্ব্বে তিনি যখন জাপানে গিয়াছিলেন তখন ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। সামাজিক মহাসমিতির সভাপতি মহাশয় এইজন্যই মনে হয় বলিয়াছেন "মহিলাদিগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে আমাদিগকে জাপানের মহিলা-বিদ্যালয়ের পন্থানুবর্ত্তন করিলেই চলিবে।" ফরাসী সমাজ-তত্ত্ববিদ মনস্বী আল্‌ব্যার্গ্‌ এই স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে একটি ভারী সুন্দর কথা বলিয়াছেন। আমি তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করি। তিনি বলিতেছেন

"The real task of a feminist is to devise an education for girls so that they shall be capable of earning their living and sharing world's work and yet remain fit for the future wifehood and motherhood."

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে "হিন্দু-বিধবা গৃহসমিতি" যে-'হিন্দু বিধবা-স্কুল'কে কলেজে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহা যেন সামাজিক মহাসমিতির সভাপতি মহাশয়ের নারী-শিক্ষার আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হয় এবং ভারতের প্রদেশে প্রদেশে নগরে নগরে যেন আরও এইরূপ নারীশিক্ষার আয়োজন হয়। অধ্যাপক কার্ভে শুধু কথায় আদর্শ দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই; তিনি মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সকল প্রদেশের সমর্থন ও অনুকরণের যোগ্য।

শ্রীসুজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

চীনের প্রাচীনতম বৌদ্ধজনপদ

(১) চিলি ও হোনান প্রদেশ।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুশান নরপতি কনিষ্কের আমলে ভারতীয় বৌদ্ধ পুরোহিতগণ চীনে আসিয়া বুদ্ধমত প্রচার করেন। চীনে তখন হানবংশীয় সম্রাট মিংতি রাজত্ব করিতেছিলেন। পিকিঙের ৫০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তাঁহার রাজধানী অবস্থিত ছিল। রাজধানীর নাম হোনান—এই নগরেই চীনে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধকেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তীকালে জাপানে নারাহোরিয়ুজির যে স্থান হইয়াছিল, এই সময়ে চীনে হোনানের সেই স্থান ছিল। আজ চীনে "বৃহত্তর ভারত" প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান দেখিবার জন্য পিকিঙ পরিত্যাগ করিলাম।

পিকিঙ্ নগর চিলিপ্রদেশে অবস্থিত। এই প্রদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ৩॥ কোটি। এই প্রদেশের সংলগ্ন হোনান প্রদেশে হোনান নগর অবস্থিত। এই প্রদেশের লোকসংখ্যা ২॥ কোটিরও অধিক। দেখা যাইতেছে যে এই দুই প্রদেশের সমবেত লোকসংখ্যা সমগ্র জাপান অথবা সমগ্র জার্ম্মানি, অথবা সমগ্র ফ্রান্স ইত্যাদি রাষ্ট্রের লোক-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। নূতন বাঙ্গলা দেশ বঙ্গ-ভাষী লইয়া গঠিত। এক্ষণে "সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ-করালে"র প্রিয়ভূমিতে মাত্র ৪॥ কোটি নরনারীর বাস। সুতরাং চিলি ও হোনান প্রদেশ যে বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষা বড় তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান যুগে এই লোক-সংখ্যা লইয়াই চীনাদের প্রধান রাষ্ট্রীয় সমস্যা। চারি কোটি, পাঁচকোটি, ছয়কোটি মাত্র লোক লইয়া বর্ত্তমান জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। এই হিসাবে ৪০ কোটি চীনা নরনারীর দেশে সাতটা বা আটটা বড় বড় প্রবল রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে গঠিত হইতে পারে না কি? সমগ্র ইয়োরোপকে কোন এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিবার জন্য কোন দিন আন্দোলন উপস্থিত হয় না। বিরাট চীনাসমাজেও একটা তথাকথিত ঐক্যের নামে আন্দোলন উপস্থিত হইবে কেন? চাল্লিশকোটি নরনারীর সমাজে আদর্শগত ঐক্য, সভ্যতাগত ঐক্য, ধর্ম্মগত ঐক্য ইত্যাদি নানা ধরণের ঐক্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্যও স্থাপিত হইবে কে বলিল? ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যেও কি মোটের উপর একটা Fundamental Unity মূলগত ঐক্য নাই? ফ্রান্সে, জার্ম্মানিতে, রুশিয়ায় ও ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে আদর্শগত, সভ্যতাগত, ধর্ম্মগত ঐক্য ইত্যাদি কম আছে কি? তথাপি ইয়োরোপের লোকেরা "ঐক্য, ঐক্য" করিয়া মরে না। তাহারা জানে ঐক্য একটা উপায় মাত্র, কোন নরসমাজের চরম উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেক সমাজের লক্ষ্য শক্তিলাভ ও জীবনবিকাশ। যে কয়জন নরনারীর সমবায়ে শক্তি অর্জ্জিত হইতে পারে এবং জীবন বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়, সেই কয়জন নরনারী লইয়াই বর্ত্তমান যুগের জাতিগণ রাষ্ট্রগঠন করিয়াছেন। যেন-তেন-প্রকারেণ ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—কোন বিচক্ষণ জাতি এরূপ ভাবেন না। যেন-তেন-প্রকারেণ শক্তিশালী হইতে হইবে তাঁহারা এইরূপ চিন্তাই করিয়া থাকেন।

চল্লিশকোটি নরনারী সমবেত হইয়া একটা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র জগতে এখনও গঠন করে নাই। আমেরিকার বিরাট যুক্তরাষ্ট্রেও লোকসংখ্যা মাত্র দশকোটি। কিন্তু যখন যুক্তরাজ্য প্রথম স্থাপিত হয় তখন লোকসংখ্যা বর্ত্তমানের চতুর্থাংশও ছিল না। গত শতাব্দীতে কতকগুলি বিশেষ কারণে এবং নানাপ্রকার বাঁধাবাঁধির বিধানে ইয়োরোপ হইতে ইয়াঙ্কিস্থানে লোকের আমদানি হইয়াছে। কিন্তু দুনিয়ার সর্ব্বত্র ৪।৫।৬ কোটি লোকই এক-একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। চীনাদের সমাজেও এইরূপ বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রতাপশালী হইতে থাকিলেই জগতের মঙ্গল। পৃথিবীতে শক্তির কেন্দ্র যত বেশী হইবে ততই মানবসমাজের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইতে থাকিবে। চীনে শক্তিসাধনার যুগ আসিয়াছে। ইহারা যতদিন তথাকথিত ঐক্যের মোহে থাকিবে ততদিন ইহারা অন্ধভাবে বাজে কাজে সময় নষ্ট করিবে মাত্র। চীনাদের ভবিষ্যৎ ঐক্যবদ্ধ মহাচীন গঠনে নয়—বহুসংখ্যক ছোট বড় মাঝারি স্বাধীন ও শক্তি-শালী চীন গঠনে। এই বহুত্ব-বাদ এবং শক্তিকেন্দ্রের মাহাত্ম্য চীনারা বুঝিবে না কি?

ডাহিনে পশ্চিম দিকে কিছু দূরে পাহাড় দেখিতে পাইতেছি আর চারিদিকে উত্তরচীনের চিরপরিচিত শস্যশ্যামল প্রান্তর। এই অঞ্চল আগাগোড়া নদী-মাতৃক দেশ। আমাদের উত্তরভারত যেমন সিন্ধু ও গঙ্গা এবং ইহাদের উপনদ উপনদীর ধারাপ্লাবিত জনপদ, চীনের যতখানি দেখিলাম সমস্তটা সেইরূপ নদনদীপ্লাবনে গঠিত ভূখণ্ড। রেলপথে কতবার কত নদী পার হইয়াছি তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। নদীর স্রোত প্রায়ই অত্যধিক—জল আমাদের বর্ষাকালের পীতাভ কর্দ্দমযুক্ত প্রবাহের অনুরূপ। এরূপ ঘোলাজলের ধারা বেশী দেখি নাই। আমাদের দেশে এই জনপদের দুইটা নদীর নাম জানা আছে। একটার নাম পীহো। পিকিঙ নগর এই নদীর উপর অবস্থিত। অপরটার নাম হোয়াংহো বা পীতনদী। পিকিঙ হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বাহির হইলে এই দুই নদীর শাখা উপশাখা

ইত্যাদিরই সহিত সাক্ষাৎ হয়। সর্ব্বত্র রক্তবর্ণ আঠালো মাটির ক্ষেত্র দেখিতে পাই।

সিন্ধু-গঙ্গা-গঠিত আর্য্যাবর্ত্ত যেমন ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, উত্তর অঞ্চলের এই নদীমাতৃক জনপদও চীনাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। প্রাচীনতম কাল হইতেই এই অঞ্চলে চীনা জাতির সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। মঙ্গোলিয়া ও তুর্কীস্থানের পার্ব্বত্য মরুদেশ ও অনুর্ব্বর ভূমি হইতে চীনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমিতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। অন্ততঃ চারি হাজার বৎসর ধরিয়া এই চীনা "আর্য্যাবর্ত্তে" মানবসভ্যতার ধারা অব্যাহত রহিয়াছে।

রেলে বসিয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল স্থানের পরিচয় পাইতেছি। প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনেই দেওয়াল-ঘেরা সহর ও তাহার ভিতর দুএকটা প্যাগোডা চোখে পড়িতেছে। এই-সমুদয়ের কোন-কোনটা খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন যুগের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

লো-কু-বিয়া নগরের নিকট একটা নদী পার হইলাম। এই নদীর উপর একটা প্রস্তর-সেতু আছে। শুনা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগল-আমলে মার্কোপোলো যখন চীন পর্য্যটনে আসেন তখন তিনি ইহা দেখিয়াছিলেন। পিকিঙ হইতে প্রায় ৩২ মাইল দূরস্থিত একটা নগরের নিকট নদীর উপর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রস্তর-সেতু দেখিতে পাওয়া যায়। আরও কিছু দূরে অন্য এক নদীর উপর মাঞ্চুসম্রাট-নির্ম্মিত প্রস্তর-সেতু রহিয়াছে।

বৌদ্ধস্মৃতিপূর্ণ পল্লী ও নগরের সংখ্যা করা সুকঠিন। একস্থানে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পিত্তলনির্ম্মিত বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। উহার দৈর্ঘ্য ৭৩ ফুট। পিকিঙ হইতে ৪০ মাইল দূরে বো-বৌ-নগর অবস্থিত। ইহার নিকটস্থ পর্ব্বত-গাত্রের অভ্যন্তরে বৌদ্ধসূত্র খোদিত আছে। সুতরাং ভারতমণ্ডলের ভিতর দিয়াই যাইতেছি।

বৌদ্ধপ্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের চিহ্নও এই পথে পাওয়া গেল। খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিয়াং-সিয়াং-সিয়েন্ নগরে রাষ্ট্র-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। সেই যুগের একটা প্যাগোডা মাত্র এক্ষণে দণ্ডায়মান। চীনে প্রাচীনতর যুগের স্মৃতিচিহ্ন বহুস্থানেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

ষ্টেশনে ষ্টেশনে আঙ্গুর, নাশপাতি, আপেল ইত্যাদি ফল বিক্রয় হইতেছে। চীনে আঙ্গুর খুব সস্তা। দুই আনায় একসের পাওয়া যায়। ফল-বিক্রেতারা এবং অন্যান্য ফেরিওয়ালারা প্লাটফর্ম্মে আসিয়া জিনিষ বেচিতে অধিকারী নয়। ইহারা প্লাটফর্ম্মের বেড়ার বাহিরে থাকিয়া দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র হৈচৈ হট্টগোলের সীমা থাকে না। ফেরি-ওয়ালার চীৎকার, দরদস্তর, মোসাফেরদিগের কলরব ইত্যাদি ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর আর পাই নাই। এই ধরণের হল্লা ইয়োরোপ-আমেরিকায় কুত্রাপি নাই, জাপানেও নাই।

চীনের কুলী চাকর বাবর্চি ইত্যাদি শ্রেণীর লোককে সতর্ক করা অসম্ভব। জাপানে এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। জাপানীরা আইন জানে এবং নিয়ম মানিয়া চলে। বক্শিশ "টিপ্" দরকষাকষি ইত্যাদির উপদ্রব জাপানী সমাজে নাই। কিন্তু চীনাসমাজে ভারতীয় গণ্ডগোল শৃঙ্খলার অভাব অবাধ্যতা মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গাম ইত্যাদি সবই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

বাধ্যতা নিয়ম-পালন শৃঙ্খলাজ্ঞান ইত্যাদি গুণ সামরিক জীবনে বিকশিত হয়। যে কর্ম্মক্ষেত্রে "Theirs not to reason why" নীতি প্রচলিত, অর্থাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে হুকুম তালিম করিবার সুযোগ সৃষ্ট হয়, সেই কর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে সমগ্র সমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে থাকে। কিন্তু যে সমাজে এরূপ কর্ম্মক্ষেত্র নাই সেখানে লোকেরা পরস্পর পরস্পরের মূল্য স্বীকার করে না—সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান ভাবে জীবন চালাইয়া থাকে—কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক সেবিষয়ে কোন ব্যক্তির সম্যক্ জ্ঞান জন্মে না। ভারতীয় জনগণ বহুকালাবধি সমর-বিভাগের কর্ত্তব্য ভুলিয়া রহিয়াছে। চীনাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আজও নামে মাত্র আছে বটে কিন্তু প্রবল রাষ্ট্রশক্তির প্রভাবে সমাজে যেরূপ সামাজিক জীবনের অভ্যুদয় হয় তাহার কিছুই নাই। কিন্তু জাপান ৫০।৬০ বৎসরের ভিতর জগতের মধ্যে প্রবলতম সামরিক শক্তি-সম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। কাজেই জার্ম্মানি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়ারের জনগণ যেরূপ শৃঙ্খলাপ্রিয়, স্বল্পভাষী এবং disciplineএর অধীন

জাপানের নরনারীও সেইরূপ। জাপানের লোকেরা বহুক্ষেত্রে সমগ্র সমাজের জন্য ব্যক্তিগত খেয়াল বা মত বা স্বার্থ বর্জ্জন করিতে অভ্যস্ত হয়। এই অভ্যাসের ফলে তাহাদের চরিত্রে নিয়ম-পালন গুণ স্বতই দেখা দেয়। এইজন্য ইহাদের সঙ্গে ছোটখাট কাজকর্ম্মের সময়ে বিশেষ দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে ও চীনে দশের স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থ বর্জ্জন করিবার সুযোগ কখনই উপস্থিত হয় না। কাজেই সকলক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা স্বকীয় স্বাধীন মত ও কার্য্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা; "কুছ-পরোয়া-নাই"—ভাব, এক কথায় Disciplineএর অভাব পদে পদে দেখা দেয়। একমাত্র শ্বেতাঙ্গ প্রভুগণের রক্তবর্ণ চক্ষুর ভয়ে এই সত্তরকোটি নরনারী শৃঙ্খলা ও "ডিসিপ্লিনের" অধীন হয়। স্বাধীনভাবে "Theirs not to reason why"—গুণ অর্জ্জন করিবার সুযোগ ও ক্ষেত্র ইহাদের জুটিবে না কি ?

চিলি-প্রদেশের একটা প্রসিদ্ধ নগর পথে পড়িল। নাম পাও-টীঙ্। পিকিঙ ও টিনসিনের পরেই ইহার নাম-ডাক। এখানে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীর ও নগর দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে নব্যধরণের সমরবিদ্যালয় এবং শিল্প-কারখানার প্রতিষ্ঠা হইতেছে।

পিকিঙ হইতে ৩০০ মাইল আসিবার পর হোনান-প্রদেশে পড়িলাম। বহুসংখ্যক নদী ও খাল এই ভূমিকে ধৌত করিতেছে। কৃষিজাত দ্রব্য এবং খনিজপদার্থ উভয় প্রকার ধনই হোনানে উৎপন্ন হয়। উত্তর চীনের বহুস্থানেই কয়লার খাদ আছে।

মাটির দেওয়াল এবং ভুট্টা ও বজরার ক্ষেত্র দেখিয়া বিহারের কথা মনে পড়ে। বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর কেরো-সিনের কুপী অথবা লণ্ঠন দেখিলে ভারতীয় পল্লীই সম্মুখে উপস্থিত হয়। লোকজনের কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারি না—কিন্তু ধরণধারণ সবই আমাদের সুপরিচিত। কলিকাতার বাঙ্গালী যদি পুনার মারাঠাকে এবং মাদ্রাজের তামিলকে নিজের ভাই বলিয়া ডাকিতে পারে তাহা হইলে উত্তর চীনের জনগণকেও ভাই বলিয়া কেন ডাকিতে পারিবে না ? মারাঠী এবং তামিল ভাষা না বুঝিয়াও যদি পুনা-বাসীকে এবং দ্রবিড়কে আপনার জন বলিতে দ্বিধাবোধ না করি, তাহা হইলে চীনাদের ভাষা না বুঝিয়া চিলি-হোনানের নরনারীকে নিজের লোক বিবেচনা করিতে দ্বিধা থাকিবে কেন ? ইহারাও ডাল রুটি তরকারি ভাত খাইয়া জীবনধারণ করে। বসনভূষণ কেশ-বিন্যাস ইত্যাদি খাঁটি বাঙ্গালীর মত না হইলেও কোন-না-কোন ভারতীয় প্রদেশবাসীর অনুরূপ। তাহার উপর বুদ্ধাবতারের প্রভাব ত আছেই। অধিকন্তু চীনা বৌদ্ধেরাও ভারতীয় শৈব শাক্ত পৌরাণিক তান্ত্রিক ইত্যাদি গণের ন্যায় প্রতিমাপূজক এবং বারমাসে তেরপার্ব্বণের মর্য্যাদারক্ষক। বস্তুতঃ ভারতবর্ষকে যদি এক দেশ বিবেচনা করা চলিতে পারে তাহা হইলে সেই এক দেশের মধ্যে চীনকেও টানিয়া লইতে কল্পনার প্রয়োজন নাই। সমগ্র এশিয়াই এক।

রাত্রি প্রায় দেড়টার সময়ে হোয়াংহো নদী পার হইলাম। প্রবল স্রোতের বেগ দেখা গেল। অন্যান্য নদীর মত এই পীতনদীর জলও যারপরনাই ঘোলা। আধঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা ষ্টেশনে আসিয়া নামিলাম। এইখানে রাত্রি কাটাইতে হইবে। শাখা লাইনের গাড়ীতে কাল পশ্চিমমুখে হোনান-যাত্রা করিব।

একটা চীনা সরাইয়ে রাত্রি যাপন করা গেল। ইহা নিতান্ত ধর্ম্মশালার মত নয়। চীনারা এখানে ঘরের আরামই পায়। বিছানা মশারি ইত্যাদি সরাই হইতেই পাইলাম। সকালে ভারতীয় পায়খানার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। স্নানের জল পাওয়া কঠিন। চীনারা স্নানের ধার বেশী ধারে না। জাপানীরা এ বিষয়ে ভারতবাসীর মত, প্রত্যহ স্নান করা তাহাদের অভ্যাস।

চীনের মফঃস্বলে পুরাতত্ত্বানুসন্ধান।

চীনা দোভাষী মহাশয় বড়ই অকর্ম্মণ্য। ইনি কোন মতে ইংরেজিতে কথা বলিয়া মনোভাব প্রকাশ করেন মাত্র। কিন্তু মিশরে ও জাপানে interpreter এবং গাইড শ্রেণীর লোকেরা যেরূপ সুদক্ষ প্রদর্শক, চীনে সেরূপ নয়। অথচ শুনিতেছি পিকিঙের হোটেলের ম্যানেজার নাকি একজন শ্রেষ্ঠ গাইডই দিয়াছেন। ইনি পর্য্যটককে সাহায্য করিতে নিতান্তই অপারগ। রিক্‌শ-ওয়ালাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলা এবং দোকানে দরদস্তুর করা ব্যতীত ইহার দ্বারা

অন্য কোন কার্য্য চলে না। ইহাকে সঙ্গে লইয়া চীন-ভ্রমণ একপ্রকার বিড়ম্বনা-বিশেষ। চীনা ইতিহাসের কোন তথ্য ইহার জানা ত নাইই—স্থান-মাহাত্ম্যও ইনি বর্ণনা করিতে অসমর্থ। কোন একজন অর্দ্ধ-শিক্ষিত বাঙ্গালী মান্দ্রাজের কোন পল্লীতে যেরূপ অবস্থায় পড়িবে পিকিঙের এই চীনা দোভাষী মহাশয়েরও হোনান প্রদেশে আসিবামাত্র সেই অবস্থা। ফলতঃ পর্য্যটকের অনর্থক অপব্যয়, লোকসান ইত্যাদি সহ্য করিতে হয়। চীনারা সকল কাজেই এইরূপ অপটু কাণ্ডজ্ঞানহীন ও inefficient। বর্ত্তমানযুগের মাপকাঠিতে ভারতবাসী এবং চীনাজাতি উভয়েই এক শ্রেণীর অন্তর্গত। জাপানের পর চীনে আসিয়া ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়ারের মানবচরিত্র এবং মৃতপ্রায় জাতির জীবনধারণের প্রভেদ সহজেই বুঝিতে পারিতেছি। চীনাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার স্বজাতীয়গণের দশা স্মরণ করিলাম। ভারত ও চীন বর্ত্তমানযুগের পেরিয়া—ইহারা মানবসমাজের সুদক্ষ কর্ম্মক্ষম অঙ্গে কোন দিন পরিণত হইতে পারিবে কি?

রেল ষ্টেশনের নিকটে দেখি একটা ডোবার জলের মধ্যে নামিয়া চীনা নারীরা কাপড় কাচিতেছে। ভিক্ষুকের সংখ্যা অত্যধিক—অনাহার ও অ-বসনের মূর্ত্তি চারিদিকে বিদ্যমান। চীনে ৪০ কোটি নরনারীর বাস শুনিয়া যাহারা জগতে Yellow Peril বা পীতাঙ্গ-বিভীষিকার আশঙ্কা করেন তাঁহারা নিতান্তই কুসংস্কারে মগ্ন। বর্ত্তমান-যুগে যন্ত্র, শিক্ষা, কল, বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রভাবে একজন লোক এক হাজার যন্ত্রহীন বিজ্ঞানহীন শিক্ষাহীন লোকের কার্য্য করে। এক শত বৎসর পূর্ব্বেও নেপোলিয়ানের যুগে বিজ্ঞান যন্ত্র ইত্যাদির প্রভাব বেশী ছিল না। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে যে পক্ষে লোকসংখ্যা অধিক সেই পক্ষের জয়লাভই আশা করা যাইত। কিন্তু একশত বৎসরের মধ্যে রণ-বিদ্যা, রণ-নীতি ইত্যাদি আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। ড্রেডনট, জেপেলিন, মেসিন-গান ইত্যাদির কালে একমাত্র শারীরিক বল, নৈতিক চরিত্র, অদম্য-সাহসিকতা, এবং মরীয়া ভাবের সাহায্যে শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব। আধুনিক কলকারখানা শিল্প বিজ্ঞান ইত্যাদির অভাবে ৪০ কোটি নরনারী প্রকৃত প্রস্তাবে চারিলক্ষ ইয়োরো-আমেরিকান অথবা জাপানীর সমান। কাজেই চীনারা কোন দিন দুনিয়া লুটিতে অগ্রসর হইবে সেরূপ আশঙ্কা করা নিতান্তই পাগলামি। বরং চীনেই দুনিয়ার প্রবল রাষ্ট্রসমূহ আসিয়া জুড়িয়া বসিবে—ইহাই অধিকতর সম্ভবপর। জাপান, জার্ম্মানি, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি ফার্ষ্টক্লাস পাওয়ারের প্রত্যেকেই একাকী এই ৪০ কোটী নরনারীর দেশকে সহজে দখল করিতে সমর্থ। এতদিন চীন এইরূপ বিদেশীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া পড়িত। কেবল বিদেশীয় রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আছেন বলিয়া চীনের সর্ব্বনাশ সাধিত হয় নাই। যদি ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়ারগণ চীনের ভাগ-বাটোয়ারা সম্বন্ধে নিজেদের ভিতর একটা চলনসই রফা ও সন্ধি সাব্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারেন তাহা হইলে চীনের স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ পাইবে। আধুনিক কালের বিজ্ঞানাবলম্বী efficient ও সুনিয়ন্ত্রিত সৈন্যের সম্মুখে ৪০ কোটি নরনারী তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। যাহারা সংখ্যার কথা অত্যধিক ভাবে তাহাদের বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অতি অল্প। যাহা হউক, চীনের নাম মাত্র শুনিয়া যাঁহারা পীতাঙ্গ-বিভীষিকা প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা চীনের ভিতর প্রবেশ করিয়া চীনাদিগকে স্বচক্ষে দেখিলে মত বদলাইতে বাধ্য হইবেন। বিংশ-শতাব্দীর মাপকাঠিতে চীনজাতির মূল্য কিছুই নয়—যে-কোন বিজ্ঞানশীল লোক আসিয়া ইহাদিগকে "পাঁচজুতা" লাগাইতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন ইংরেজের দখলে আসে তখন ইংরেজের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ফরাসী। ফরাসীবীর নেপোলিয়ানের পরাজয় হইলে ইংরেজ ভারতে অনেকটা একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ভোগ করিতে সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু আজ-কালকার দিনে কোন এক শক্তি দুনিয়ার যেখানে-সেখানে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছেন না। কাজেই চীনে কোন একজাতির প্রাধান্য স্থাপিত হইবে না। আফ্রিকার মত চীন নানাজাতির দখলে আসিবে—ইতিমধ্যেই তাহার সূত্রপাতও হইয়াছে। অবশ্য ঘটনাচক্রে যদি চীনের কোন নিভৃতস্থান হইতে বিংশ শতাব্দীর চীনা নেপোলিয়ানের আবির্ভাব হয় তাহা হইলে চীনের মানচিত্র

সম্পূর্ণ অন্য আকার ধারণ করিবে সন্দেহ নাই। যদি কোন কর্ম্মবীর এক হাতে বিজ্ঞান ও প্রকৃতপুঞ্জের স্বায়ত্ত-শাসন এবং অপর হাতে কন্‌ফিউশিয়াস ও বুদ্ধদেবের বাণী লইয়া চীনের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে চীনাসমাজে জাপানী "মেজি" যুগ প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সেই চীন-সংরক্ষক প্রবলপ্রতাপ চীনা-নেপোলিয়নের আবির্ভাব হইবে কি? যত বিলম্ব হইতেছে ততই বিদেশীয়গণের প্রভাব বাড়িয়া যাইতেছে।

চীনের সহরে সহরে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ব্যবহৃত হয়—প্রদেশে প্রদেশে ত আছেই। আজ গাড়ীতে বসিয়া মুদ্রা-বিভ্রাটে পড়িলাম। পিকিঙের টাকা বা নোট এই অঞ্চলে চলে না। আমার সঙ্গে যে-সমুদয় নোট রহিয়াছে সেগুলির কোনটাই হোনান প্রদেশে চলিবে না। শাংহাই পৌছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে-গুলি ট্র্যাকস্থ থাকিল। দোভাষী মহাশয়ের গুণপনা এইরূপ। ইহার পাল্লায় পড়িয়া টিকেট-বিভ্রাটও কম হয় নাই। তাহাতে যথেষ্ট অর্থনাশ হইয়া গেল। ভাবিতেছি—চীনের মফঃস্বল দেখিবার জন্য এই মূল্য দেওয়া যাইতেছে।

রেলে ফরাসীভাষার বিজ্ঞাপন দেখিতেছি—ফরাসী-কর্ম্মকর্ত্তা ও পরিদর্শক গাড়ীতে আছেন। রেলের একজন লোকের সঙ্গে দোভাষী মহাশয়ের ঘোরতর বচসা হইয়া গেল। ভয়ঙ্কর গরম পড়িয়াছে। মরুসদৃশভূমির সকলদিক হইতে গাড়ীর ভিতর ধূলা বালু উড়িয়া আসিতেছে। এক-গ্লাস জল আনিতে যাইয়া দোভাষী বাবর্চির তিরস্কার ভোগ করিলেন। মেজাজ গরম করিয়া বাবর্চি বলিল—"জল দিব না। যা পার কর।" দোভাষী বেকুবের মত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন—"কি বলিব মহাশয়, দক্ষিণ দেশী লোকেরা বড়ই অহঙ্কারী। আমাদিগকে উত্তরের লোক বলিয়া গ্রাহ্য করিতেই চাহে না।" ব্যাপার সুবিধাজনক নয় বুঝিয়া ফরাসী পরিদর্শককে ডাকা গেল। তখন বিনা বাক্যব্যয়ে জল পাইলাম। ভারতবর্ষের অবস্থাও এইরূপ নয় কি? গোলামস্থাতির সকল দোষই চীনাসমাজে দেখিতেছি—অথচ এখানে রিপাব্লিক, স্বরাজ বা প্রজাতন্ত্র শাসন স্থাপিত হইয়াছে! ইহাকে অরাজ বা পর-রাজ বলাই উচিত।

চারি ঘণ্টা রেলে কাটাইলাম। সমস্ত পথে প্রাচীন-ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল। ভাঙ্গা দেওয়াল, অট্টালিকার স্তূপ, ইট পাথরের রাশি, দুর্গপ্রাচীর-সদৃশ নগরপ্রাচীর, প্যাগোডা, স্মৃতি-ফলক, ইত্যাদির আবেষ্টনের মধ্য দিয়া চলিতেছি। কোথাও গাড়ী হইতে পার্ব্বত্যকন্দরের অভ্যন্তরস্থিত গুহাবলী দেখা যাইতেছে—কোথাও বা প্রাচীন দেওয়ালের ভিতর দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকাময় পর্ব্বতের ভিতর সুড়ঙ্গও কয়েকটা অতিক্রম করিলাম। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ বড় বেশী পাইলাম না—চাষ আবাদের লক্ষণও অল্পমাত্র। চারিদিকে মাটির চাপ, দুর্গের ভগ্নাবশেষ, প্রাচীন জনপদের চিহ্ন বিরাজ করিতেছে। ভূমি সমতল।

রৌদ্র-স্নান ও ধূলি-স্নান উপভোগ করিতে করিতে হোনান ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। একটা চীনা সরাইয়ে অতিথি হওয়া গেল। বহুকাল পরে খোলা মাঠে মলমূত্র ত্যাগের সুযোগ পাইলাম। পাতকূয়া হইতে জল তোলাইয়া উঠানে বসিয়া স্নান করা হইল। এক পয়সার চিনি আনাইয়া সরবৎ পান করিলাম। কাটা তরমুজের পীতবর্ণ দেখিয়া লোভ হইয়াছিল, মুখে দিয়া সন্তুষ্ট হইলাম না।

চৌকিসদৃশ কাঠের পাটাতন বা মঞ্চের উপর সরাই-ওয়ালা একখানা চাটাই বিছাইয়া দিল। ইহাতে শুইয়া দেখিতেছি ঘরের দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে বহুসংখ্যক ছারপোকার শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। ক্রমশঃ একটা তোষক এবং লেপ আসিল। রাত্রিকালে ঠাণ্ডা পড়িবে।

চীনাদের রুচিতে আর বাঙ্গালীরুচিতে কোন প্রভেদ নাই। কাজেই সরাইয়ে খাদ্যকষ্ট হয় না। পুরাপুরি নিরামিষাশী হওয়া গেল। বেগুনের ঝোল, শসার ঝোল, মাশকলাইয়ের ডাল ভিজান, ধনিয়ার শাক, আদা শিম ইত্যাদি নানা তরকারি আহার করিলাম। যাহারা আমাদের মফঃস্বলে গরমের দিনে সফর করিতে অভ্যস্ত তাঁহারা এই তৃপ্তি বুঝিতে পারিবেন। ঠিক বাঙ্গলা-দেশের একটা পল্লীকুটীরে যেন স্নানাহারের পর শান্তি উপভোগ করিতেছি।

বিকালে গর্দ্দভ-শকটে পল্লীভ্রমণে বাহির হইলাম। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র বলেন—"গরুরগাড়ী-পাশ না

হইলে কেহ বাঙ্গলা দেশে পুরাতত্ত্বের অধিকারী হইতে পারেন না।" চীনে পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানকারীদিগের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। গাধার গাড়ীতে আর গো-শকটে কোন প্রভেদ নাই। "বিহারে বিঘোরে চড়িনু এক্কা" কথাটাও কিছু মনে পড়ে। রাস্তার বর্ণনা করা অসম্ভব। গাড়ী এক ধাপ উঠিতেছে, পরক্ষণেই নীচে আছড়াইয়া পড়িতেছে—পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়। দোভাষীর পরামর্শে এই গাড়ীতে বসিয়াছিলাম—পরে পদব্রজে চলাই যুক্তিসঙ্গত ভাবা গেল।

কয়েকটা বৌদ্ধমন্দিরের পোড়ো অবস্থা দেখিলাম। বুদ্ধদেবের নাম চীনা ভাষায় "ফইয়ো"। ভারতবর্ষকে চীনেরা "তেন্‌জুক" বলে। এই শব্দের অর্থ স্বর্গ। চীনাদের বিশ্বাস হ্যান্ বংশীয় সম্রাট মিং-তি স্বর্গে দূত পাঠাইয়া বৌদ্ধপ্রচারকগণকে হোনানে আনাইয়াছিলেন। জাপানীরাও ভারতবর্ষকে স্বর্গ নামেই ডাকে। ভারতীয় কৈলাস-পর্ব্বত, নন্দনকানন, স্বর্গ-ধাম ইত্যাদিও কি এইরূপ কোন জনপদের নাম হইতে পারে না? শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের "প্রত্নতত্ত্ববারিধি" গ্রন্থে বৈদিক ভারতের ভূগোল যে ভাবে বুঝান হইয়াছে তাহার ভিতর কিছু সত্য নাই কি?

পল্লীদৃশ্য দেখিয়া আধুনিকের চোখে মধ্যযুগের চিত্র মনে পড়িবে। জাঁতা, ঘানি, ইটের পাজা ইত্যাদি ভারতবাসীর সুপরিচিত। ইটের দেওয়াল এবং ঘরের বাহির দেখিয়া লোকজনকে নেহাত দরিদ্র মনে হয় না। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের চিহ্ন কোথাও নাই।

একটা বিদ্যালয় দেখিলাম। গৃহগুলি সুন্দর ও পরিষ্কার। চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া ছাত্রেরা প্রাচীন সাহিত্য সমস্বরে মুখস্থ করিতেছে। ইংরেজি ভাষা শিখিবার আয়োজনও আছে। কতকগুলি কাঠের বন্দুক এক বারাণ্ডায় দেখিলাম। এইগুলি হাতে লইয়া ছাত্রেরা সামরিক ড্রিল শিক্ষা করে।

একটা লেওৎসের মন্দির দেখিলাম। অন্য এক মন্দিরের মধ্যস্থলে বিরাট ধ্যানীবুদ্ধ অবস্থিত। তাহার দুইধারে নয়টা করিয়া বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধমূর্ত্তি। চীনে সর্ব্বসমেত ১৮ প্রদেশ—এইজন্য ১৮ মূর্ত্তির সমাবেশ।

সন্ধ্যাকালে ষ্টেশনের সম্মুখে ভারতীয় সন্ধ্যার হাট দেখিলাম। বিচিত্র নরনারীর সমাবেশ—পুরুষের সংখ্যাই বেশী। লোকজনের গতিবিধি দেখিলে বোধ হয় যেন ইহারা কোন বাঁধাবাঁধির ধার ধারে না। সকলেই আপন-মনে স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা করিতেছে। সমাজ-প্রকৃতির বিকাশকে কাটিয়া ছাঁটিয়া কোন কৃত্রিম আকার প্রদান করিলে তাহার যে মূর্ত্তি হয় চীনে এবং ভারতবর্ষে তাহা দেখা যায় না। এইজন্য ইয়োরো-আমেরিকান এবং জাপানী শৃঙ্খলা চীনেও নাই, ভারতেও নাই। চীনা ও ভারতীয় ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা এবং বৈচিত্র্যের নিন্দা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। কিন্তু বর্ত্তমানকালের যন্ত্র-চালিত সভ্যতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই ধরণের চরিত্র পরাজিত হইতে বাধ্য।

রাত্রিকালে সরকারী পুলিশ আসিয়া হোটেলের অতিথিগণের নাম ধাম লইয়া গেল। জাপানে এবং জার্ম্মানিতেও এই দস্তুর।

খোলা আকাশের নীচে খাটিয়া পাড়িয়া আকাশের তারা গুণিতেছি। আজ বোধ হয় জন্মাষ্টমী। দেশে হয়ত জলবৃষ্টি হইতেছে।

যেন বিন্ধ্যাচলের ধর্ম্মশালায় রাত্রি কাটান যাইতেছে। কেরোসিনের বাতি অথবা মোমবাতির আলো মিটিমিটি জ্বলিতেছে। উঠানে বসিয়া আহার করিলাম। এক কামরায় চীনাম্যান কালোয়াতী ধরিয়াছেন—হোটেলের বাহিরে কাঠ বাজাইয়া এক ভিক্ষুক তালে তালে গাহিতেছে। ইহার নাম Nature's plenty। দুঃখের কথা, প্রকৃতির প্রাচুর্য্যকে বন্ধনের ভিতর না আনিলে শক্তি সঞ্চিত হয় না। বর্ত্তমানকালে ব্যক্তিগতজীবনের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ও স্বাভাবিকতা আর থাকিবে না। শৃঙ্খলা, সংযম, বাঁধাবাঁধি, organisation, discipline ইত্যাদির দিকেই মানব-সভ্যতার ক্রমিক বিকাশ।

হোনানে ভারত-মণ্ডল।

হোনান সহরের অদূরে চীনের প্রথম বৌদ্ধমন্দির অবস্থিত। গাড়ীতে বসিয়াই প্যাগোডা দেখিয়া লইলাম। পরদিন বিকালে চেংচাও জংসনে ফেরা গেল। রিক্‌শতে

সহর দেখিতে বাহির হইলাম। ভারতীয় তৃতীয় শ্রেণীর জেলার পল্লীগ্রামের উপযুক্ত পথ ঘাট দোকান বাজার। নবজীবনের কোন অনুষ্ঠান চোখে পড়িল না। সুদৃঢ়-প্রাচীরবেষ্টিত নগর। একটা দ্বাদশছাদবিশিষ্ট অষ্টকোণ প্যাগোডা দেখিলাম। এত উচ্চ প্যাগোডা বোধ হয় এই প্রথম দেখা হইল। ইহার চূড়া এবং প্রত্যেক ছাদের কার্নিশগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—কিন্তু বিরাট অট্টালিকার প্রমাণ পাওয়া যায়। নগরপ্রাচীরের ফটকে উঠিয়া মিঙ আমলের একটা লৌহ কামান দেখিলাম।

বর্ত্তমান সহর যাহাই হউক, প্রাচীনকালে এই নগর অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। দীর্ঘাকৃতি প্যাগোডা এবং নগর-প্রাচীরের গঠন দেখিয়া আজও তাহা অনুমান করা চলে। শুনিলাম এই নগর অষ্টম নবম শতাব্দীতে তাব্‌র্‌ বংশীয় নরপতিগণের অন্যতম রাজধানী ছিল। হোনান প্রদেশ এইরূপ একাধিক রাজধানী বক্ষে ধারণ করিয়াছে। সর্ব্ব-পশ্চিমে সিঙ্গাও, তাহার পর হোনান, তাহার পর চেং-চাও, সর্ব্বপূর্ব্বে কাই-ফেঙ। সুঙ্‌ আমলে অর্থাৎ দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কাইফেঙ চীন সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। তাহার পর কুব্‌লা খাঁ মোগলবংশ প্রবর্ত্তন করেন। সেই সঙ্গে পিকিনে রাজধানী স্থাপিত হয়।

মাঠের ভিতর দিয়া ষ্টেশনে ফিরিতেছি, এমন সময়ে সন্নিহিত পল্লী হইতে বহু-কণ্ঠোত্থিত গীতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মনে হইল যেন কোন ভারতীয় গায়কদলের একতান গীত শুনিতেছি। ভাষা বুঝিলাম না—কিন্তু সুর, স্বর, তাল ইত্যাদি যেন পরিচিত বোধ হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে এবং চীনে যে অর্থেই গৃহীত হইয়া থাকুক না কেন, ইহার দ্বারা ভারতীয় ধর্ম্মোপদেষ্টার নাম ১০ কোটি নরনারীর সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর।"—জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর চীনের নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে এই কথা যথার্থ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা গেল। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই-সকল জনপদের যে-সমুদয় লোক মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নয় তাহারাও জীবনের নানা আচার ব্যবহারে বুদ্ধের প্রভাব স্বীকার করিতেছে। এইরূপে শিন্তোধর্ম্মী, তাওধর্ম্মী এবং কনফিউশিয়াসধর্ম্মী সকলেই কোন-না-কোন উপায়ে বুদ্ধধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছেন। সে দিন ইয়েন-ফু বলিতে-ছিলেন—"চীনারা সকলেই বৌদ্ধ একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যাহারা ইসলাম অথবা কন্‌ফিউসিয়াসের ভক্ত এমন কি তাহাদের কাজকর্ম্মে এবং চিন্তাপদ্ধতিতেও ভারতীয় মহাত্মার আধিপত্য লক্ষ্য করিতে পারিবেন। স্বয়ং মাঞ্চুসম্রাট হইতে পল্লীর কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই বৌদ্ধভাবাপন্ন।"

খৃষ্টীয় ৬৭ অব্দে বুদ্ধমত চীনে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। সাই-ইন (Tsai Yin) নামক একজন দূত কনিষ্কের পেশোয়ার-দরবারে প্রেরিত হন। তিনি সম্রাট মিং-তির নিকট দুইজন বৌদ্ধপুরোহিত লইয়া আসেন। একজনের নাম মাতঙ্গ, অপরের নাম ধর্ম্মরক্ষ। ইহাঁদের সঙ্গে এক শ্বেত অশ্ব আসে। অশ্বের উপর বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ আনীত হইয়াছিল। হোনান-নগরের যেস্থানে মৃত্যুর পর অশ্বের কবর দেওয়া হইয়াছিল সেই স্থানে একটি প্যাগোডা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার নাম পাই-মা-জ্‌ বা শ্বেতাশ্ব-মন্দির। এই প্যাগোডাই রেল হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বিক্রমপুরে রাজাবাড়ির মঠ, শ্যামসিদ্ধির মঠ ইত্যাদি যেপ্রকার অট্টালিকা দেখিয়া থাকি হোনানের এই প্যাগোডা এবং চীনের অন্যান্য প্যাগোডাগুলি সেই ধরণে গঠিত। চেং-চাও নগরে যে প্যাগোডা দেখিলাম, এবং কাইফেঙ নগরেও যে লৌহ প্যাগোডা আছে, তাহাদের গঠনাকৃতিও এইরূপ। অর্থাৎ দীর্ঘাবয়ব-শিখর-সমন্বিত হিন্দু-মন্দিরের মূর্ত্তি চীনের প্যাগোডা-রচনায় দেখিতে পাই।

হোনানে বৌদ্ধমত প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে তিব্বতে তুর্কীস্থানে এবং সিংহলে ইহার বিস্তার সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু চীনে এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবামাত্র সম্রাটগণ ইহার যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন। চীনা ভাষায় সূত্র-সমূহের অনুবাদ প্রচারিত হইতে থাকিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হোনান প্রদেশে নানা বংশীয় রাজগণের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে রাজধানীও স্থানান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পের প্রতি অনাদর কখনও

হয় নাই। এমন কি পরবর্ত্তীকালে যখন বিদেশীয় মোগলেরা পিকিঙে চীন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন তখনও বৌদ্ধ প্রভাব চীনে বাধা প্রাপ্ত হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মিং-তির পর বহু চীন সম্রাট এই ভারতীয় মতবাদের সংরক্ষক হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয় শতাব্দীর সম্রাট উ-তি, এবং সপ্তম শতাব্দীর সম্রাট তাই-সুঙ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উ-তির আমলে বোধিধর্ম্ম নামক ভারতীয় ভিক্ষু হোনানে আগমন করেন। তিনি ধ্যানতত্ত্ব চীনে প্রথম প্রচার করিয়াছেন। তাই সুঙের আমলে চীনা ভিক্ষু উয়ান্-চুয়াঙ ভারত পর্য্যটনে বাহির হন। তিনি ১৭ বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের আমল তখন ভারতে চলিতেছিল। উয়ান্-চুয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত ভারতেতিহাসের মূল্যবান্ তথ্যে পরিপূর্ণ। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের আদান প্রদান প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যায়। হোনান নগরই সেই চীনা-ভারতীয় বিনিময়ের প্রধানতম চীনা কেন্দ্র ছিল। তাই সুঙ্ এই নগরে এক বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-তত্ত্বের সবিশেষ চর্চ্চাই হইত এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণই চীনের সকল অঞ্চলে এবং সুদূর কোরিয়া ও জাপান পর্য্যন্ত ভারতীয় প্রভাবের মণ্ডল বিস্তৃত করেন।

উয়ান্-চুয়াঙ হোনানে ফিরিয়া আসিবার পর ই-চিঙ ভারত-ভ্রমণে বাহির হন। তিনি ২৫ বৎসর বুদ্ধদেবের জন্মভূমি চীনাদের স্বর্গভূমিতে কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের ফলেও ভারত-প্রভাব চীনে সবিশেষ ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে চীনা ও ভারতীয় পণ্ডিতগণের গমনাগমনের ফলে চীনের সমাজ সাহিত্য ও শিল্প অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ভারতীয় আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। ফলতঃ প্রাচীন কনফিউশিয়াসের মতবাদ নবভাবাপন্ন হইয়া যায়। দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুঙ রাজ-গণের আমলে কন্‌ফিউশিয়াস-মতবাদ নূতন আকার ধারণ করে। এই নূতন আকারের গঠনে বৌদ্ধদিগের ধ্যানতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করিতে পারি।

সপ্তম শতাব্দীতে তাঙবংশীয় নরপতি তাই-সুঙের আমল হইতে পরবর্ত্তী সুঙরাজগণের আমল পর্য্যন্ত ছয়শত বৎসর ধরিয়া চীনা নরনারীর সমগ্র জীবনে ভারতবর্ষের প্রভাব বিদ্যমান। এই কথা না বুঝিলে মধ্যযুগের চীনা সমাজ বুঝা যাইবে না—আবার ভারতেতিহাসেরও একটা অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিবে। ভারতবাসীর পক্ষে এই বিষয়ে গৌরব-জনক তথ্যই প্রাপ্ত হইতে পারি। কারণ চীনারা তাহাদের ইতিহাসের এই যুগকে স্বর্গযুগ বা সত্যযুগ বিবেচনা করে। চীনা সমাজে যখন বৃহত্তর ভারতের মণ্ডল বিশেষরূপে বিস্তৃত ছিল সেই সময়েই চীনাদের Augustan Age বা চরম গৌরবের যুগ,—এ কথা শুনিলে ভারতসন্তান মাত্রই পুল-কিত হইবেন সন্দেহ নাই।

হোনান হইতে ফিরিবার সময়ে গাড়ীতে বসিয়া "শ্বেতাশ্ব-প্যাগোডা" দেখিতে দেখিতে চীনে এই ভারতীয় প্রভাবমণ্ডলের প্রাথমিক ভিত্তি দেখিলাম। যাহারা বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস রচনা করিবেন তাঁহারা এই প্যাগোডাকে ভারতবাসীর প্রধান বিজয়স্তম্ভ বিবেচনা করিবেন সন্দেহ নাই।

তাঙ-আমলের চীনা সাহিত্যে প্রকৃতির অভ্যন্তরে চেতনা ও আত্মার অস্তিত্ব প্রচারিত হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বের অন্তর্য্যামী বিরাট পুরুষের ধারণাও কবিগণ করিয়া-ছেন। এদিকে কন্‌ফিউশিয়াসের শাস্ত্রসমূহ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াও পণ্ডিতগণ এই-সকল অভিনব তত্ত্বের অবতারণা করিতে লাগিলেন। সুঙ-আমলে এই নূতন ব্যাখ্যাপ্রণালীর কার্য্য সবিশেষ হইয়াছিল। অবশেষে বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত কন্‌ফিউশিয়াস-মতবাদ নূতন আকারে চীনে দেখা দিয়াছে। এই নূতন আকৃতিবিশিষ্ট কন্‌ফিউ-শিয়ান তত্ত্বই আজও চীনাসমাজে কন্‌ফিউশিয়াসের কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমানকালের কন্‌ফিউশিয়াস-ধর্ম্মীদিগের জীবনে সুঙবংশীয় ব্যাখ্যাকারগণের বৌদ্ধভাবও লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

সুঙ-আমলের যে দার্শনিকের ব্যাখ্যাপ্রভাবে কন্‌ফিউ-শিয়াস আজ পর্য্যন্ত চীনে পূজা পাইতেছেন তাঁহার নাম চু-সি (Chu-hsi)। চুসি-প্রচারিত মতবাদ কেবলমাত্র চীনে নয়, জাপানেও লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন গঠন করিয়া আসিতেছে। ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব এইরূপে নব নব নামে

ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্থায়ী হইয়াছে। হোনানপ্রদেশের পল্লীতে পল্লীতে সেই ভারতপ্রভাবের স্মৃতিচিহ্ন বিরাজমান। কাজেই ভারত-ঐতিহাসিকের পক্ষে হোনান প্রদেশ বিশেষ মূল্যবান। কপিলবাস্তু, কুশীনগর, সারনাথ ইত্যাদি যেরূপ ভারতবাসীর নিজের জিনিষ, সেইরূপ চীনের হোনানও আমাদের আপনার বস্তু। হোনানের কথা আমাদের ঘরেরই কথা।

সুঙ-আমলে একজন চীনাদার্শনিক নূতন ধরণের এক রচনা করেন। তাহার নাম "তাই সু" বা Great Nothing। শূন্য হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে এই তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য গ্রন্থ লিখিত। বলা বাহুল্য ইহা ভারতীয় "শূন্যবাদে"র চীনা সংস্করণ মাত্র।

তাঙ সম্রাটগণ ৬১৮ খৃঃ অঃ হইতে ৯১৯ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুঙ বংশের রাজত্বকাল ৯৬০ হইতে ১২৭৯ পর্য্যন্ত। এই সাড়ে ছয়শত বৎসর কাল ভারতের নানাস্থানে নানা সম্রাট রাজচক্রবর্ত্তী ও রাজন্যবর্গের আধিপত্য ছিল। প্রধানতঃ হর্ষবর্দ্ধন, পুলকেশী, ধর্ম্মপাল ও রাজেন্দ্রচোল এই যুগের ভারতবীর। বলাবাহুল্য তাঙ-সুঙ আমলের চীনা জাতির কার্য্যকলাপ এবং বর্দ্ধন-চালুক্য-পাল-চোল আমলের হিন্দুজাতির কার্য্যকলাপ একত্র মিলাইয়া আলোচনা করা আবশ্যক। জলপথে এবং স্থলপথে হিন্দুরা চীন হইতে কোন্ কোন্ বস্তু আমদানি করিয়াছে তাহার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন। মুসলমানধর্ম্ম বিস্তারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের সঙ্গে চীনের আদান-প্রদান যে গভীরভাবেই সম্পন্ন হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই। চীনের সাহিত্যে ও শিল্পে তাহার ইঙ্গিত পাইতেছি, কিন্তু তাহার সুবিস্তৃত বিবরণ এখনও বাহির হয় নাই।

হোনানের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের নাম সুং-শান। ভারতবর্ষে যেরূপ সপ্তপর্ব্বত বিখ্যাত সেইরূপ চীনে পঞ্চ পর্ব্বত বিখ্যাত। হোনানের সুংশান তাহাদের অন্যতম। এই পর্ব্বতে বহু মন্দির ও মঠ আছে। ভারতীয় ভিক্ষু বোধিধর্ম্ম একটি মন্দিরে নয়বৎসর কাল ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সেই মন্দিরের নাম শাওলিং জু।

হোনানের পাহাড়ে পাহাড়ে ভারতীয় প্রভাবের বহু চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তাহার মধ্যে Cave Temples গুহামন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গিরিকন্দরস্থ মন্দিরগুলির অধিকাংশ ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা—তাঙ-আমলে তৈয়ারি মন্দিরও আছে।

মন্দিরের ভিতর বহু বুদ্ধমূর্ত্তি অবস্থিত—সকলগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত। এই বাস্তুশিল্পে এবং স্থাপত্যশিল্পে ভারতীয় গান্ধার-রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তুর্কীস্থানের খোতানেও এই শিল্পের দৃষ্টান্ত অনেক। অধিকন্তু কোরিয়া এবং জাপানেও এই ধরণের মূর্ত্তিগঠনই দেখিতে পাই। সুতরাং গান্ধার-রীতিতে যদি গ্রীক-প্রভাব থাকে তাহা হইলে সমগ্র এশিয়ায় প্রাচীন ইয়োরোপের স্থাপত্যরীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিতে হইবে।

তাঙ নরপতিগণ হোনানের রাজধানী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আমলে প্রাসাদ, মন্দির, বিদ্যালয়, প্যাগোডা ইত্যাদির নির্ম্মাণ ও সংস্কার সাধিত হয়। বাস্তুশিল্পের সঙ্গে-সঙ্গে চিত্রশিল্প এবং স্থাপত্যশিল্পেরও যথেষ্ট ব্যবহার করা হইয়াছিল। হোনানের নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতকন্দরে বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি অবস্থিত—ইহা ৮৫ ফুট দীর্ঘ।

তাঙ এবং সুঙ বংশদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীকালে উ-ইউ বংশীয় (Wu-yueh) নরপতি ভারতসম্রাট অশোকের অনুকরণে তাঁহার রাজ্যের ভিতর ৮৪০০০ স্তূপ বিতরণ করিয়াছিলেন (৯৬০ খৃঃ অঃ)। এইগুলিতে প্যাগোডার আকারে গঠিত স্তূপগাত্রে বৌদ্ধ "সূত্র" খোদিত আছে। তামা এবং লোহার মিশ্রণে এই-সমুদয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। চীনের নানাস্থানে আজও ইহাদের কোন-কোনটা চোখে পড়ে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

অস্বীকার

তোমায় আমি মান্‌বো না গো মান্‌বো না,
লোকের মুখের শোনা-কথার আন্দা জানায় জান্‌ব না।
হাওয়ায় যে বীজ উড়ে এসে লাগে মনের উপর-দেশে
তার সে ক্ষণিক ফুলের নেশায় পরাণ আমার ভুলবে না,
প্রাণের গোপন গভীর তলে রসের চিরধারা চলে
সেথায় যদি না রহে মূল সুধার ফল যে ফল্‌বে না।
কল্পতরুর আশা করি আছি চিরজনম ধরি

অল্প সুখের আশায় আমি দুয়ারে কর হান্‌বো না ;
জনরবের কলরবের কথাই কানে আনবো না।
তোমার জানা সে তো অমন চোরের মত আস্‌বে না ;
সকল জানা অজানা মোর তার আলোতে হাস্‌বে না ?
জান্‌বে না মোর সকল স্নায়ু পরাণব্যাপী পরাণ-বায়ু
জানার সুখ কি বুকের রক্তে তালে তালে নাচবে না ?
আমার চেতনটুকু গ্রাসি দেহে মনে জড়ের রাশি
বিপুল মরণপুঞ্জ কি সেই ওই জানাতে বাঁচবে না ?
অযুত যুগের পদ্মকুঁড়ি ফুটলে কি বাস ছুটবে না।
অমন দূতীর মুখের খবরে মোর মরমের মান টুটবে না।
তোমায় নিয়ে যার খুসী যায় করুক জানার খেলা,
আমার প্রাণে সইবে না গো অমন হেলাফেলা।
যতদিন না আসে সুদিন আমি কঠোর আমি কঠিন
মুখ ফিরিয়ে রইব দূরে কর্‌বো অস্বীকার—
সুপারিসে চিন্‌বো না গো সস্তা দরে কিন্‌বো না গো
চিরদিনের সফলতা অসীম বাসনার।
আমায় ছেড়ে একেবারে তোমার যদি চল্‌তে পারে
আমারো যে চলবে না গো সে কথা তো মানবো না।
ভালবাসার মাঝে আমি আর তো কিছুই টানবো না।
ওগো লোভী জানি তোমার কি লোভ জাগে অন্তরে !
ভাবছো ব'সে মনখানি মোর কাড়বে যে কোন্ মন্তরে।
অসীম শক্তি বিপুল সজ্জা দাগবে প্রাণে অশেষ লজ্জা
একটুখানি প্রাণ বটে মোর তবুও তাহা টলবে না।
বজ্রে যদি হানো হৃদয় মান্‌বো মৃত্যু, তোমায় সে নয়,
চির মনোহরণ বিনে মন যে আমার গলবে না।
আপন মনের মরমখানি আপনি আমি নাহি জানি,
তুমিই জান প্রাণ যে আমার ভুলবে কিসে নিঃশেষে,
তোমায় ধরা দিতেই হবে বক্ষে আমার সেই বেশে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

আগামী বর্ষের উপন্যাস

অনেকেই পূর্ব্বাহ্নেই জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন যে আগামী বর্ষে নূতন উপন্যাস কি বাহির হইবে। তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে আগামী বর্ষের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত "পরগাছা" নামক উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

ন্যূনমূল্যের সুবিধা প্রত্যাহার।

মডার্ণরিভিউর গ্রাহকদিগকে আমরা ১৲ টাকা কম মূল্যে অর্থাৎ বার্ষিক ২।৵০ মূল্যে প্রবাসী দিতেছিলাম। আগামী বৎসর হইতে পূর্ণমূল্য ৩।৵০ই লাগিবে। ন্যূনমূল্যে আর দেওয়া যাইবে না।

ভ্রম-সংশোধন।

ভাদ্রের প্রবাসী, ৫৬১ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ, ২৮ পংক্তিতে "খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে," এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে "খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে" এই কথাগুলি বসিবে।

পৌষের প্রবাসী, ২২৯ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ১২ পংক্তিতে "দৌহিত্র" শব্দটি "জামাতা" হইবে।

"ভারতে রৌপ্যমুদ্রা" প্রবন্ধটিতে (ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে) মুদ্রাকরের ভ্রম রহিয়াছে। নিম্নে দুটি প্রদর্শিত হইতেছে :—

পৃষ্ঠা	কলম্	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৫২২	২	১৯	১৮৭২	১৮৯২
৫২৩	২	২৮	৯৯.৬	৯০.৬

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত